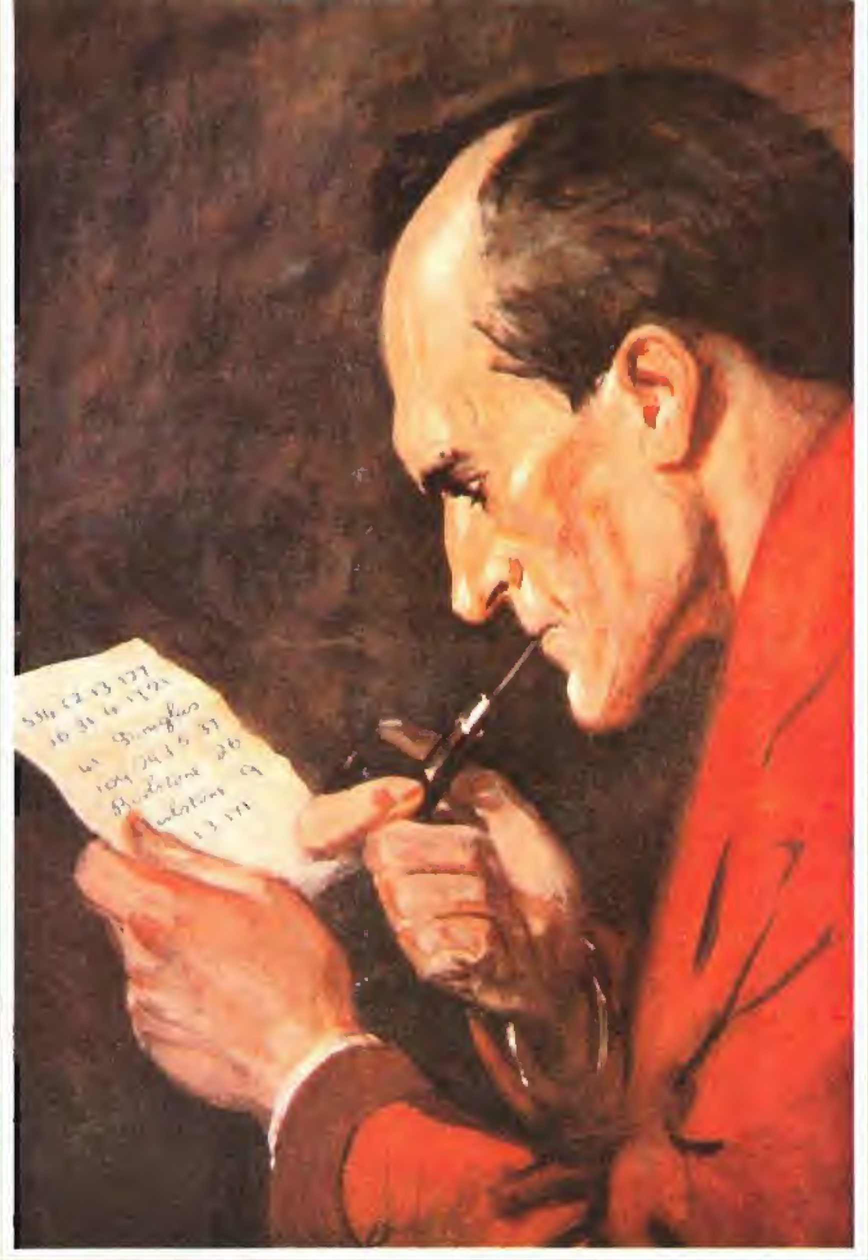

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল

শার্লক হোমস সমগ্র

সটীক সংস্করণ

অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

টীকা প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত সৌম্যেন পাল

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল

শার্লক হোমস সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সটীক সংস্করণ

অনুবাদ

অদ্রীশ বর্ধন

টীকা ও সম্পাদনা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত সৌম্যেন পাল

লালমাটি

Sherlock Holmes Samagra (II) *by* Sir Arthur Conan Doyle
Translated *by* Adrish Bhardhan
Annotations *by* Prasenjit Dasgupta & Soumen Paul

ISBN : 978-93-81174-22-7

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৪১৯
এপ্রিল ২০১২

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন : ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

অনুবাদ স্বত্ব
অদ্রীশ বর্ধন

টীকা স্বত্ব
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
সৌম্যেন পাল

গ্রন্থনা স্বত্ব
লালমাটি

প্রচ্ছদ
সৌম্যেন পাল

অক্ষরবিন্যাস
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ৫৫০ টাকা

ভূমিকা

অদ্রীশ বর্ধনের বিখ্যাত শার্লক হোমস অনুবাদের সটীক সংস্করণের দ্বিতীয় পর্যায়টি হাতে এসে গেল এবার। এই বই ডাউন মেমোরি লেনের মতো ঝটিতি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় ছুটির দুপুরের টানটান রোমাঞ্চের অতীত দিনগুলিতে। আর সেটি যদি সটীক হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আসলে গোয়েন্দার চোখ-কান খোলা থাকে শিকারি কুকুরের মতো। যদি সেই গোয়েন্দা আবার শার্লক হোমস হন তাহলে আমাদের রোমাঞ্চের কোনো উর্ধ্বসীমা থাকে না। দ্বিতীয় পর্বের এই ভূমিকার পাতায় আমি অকপটে স্বীকার করছি যে প্রথম খণ্ডটিই হোমস-মার্কা নেশা ধরাবার জন্য যথেষ্ট। স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল স্কটিশ লেখক এবং চিকিৎসক। খেয়ালে খুশিতে নয় অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করেছিলেন হোমস-এর চরিত্র। লন্ডনের এই গোয়েন্দা কনসালটিং ডিটেকটিভ হিসেবে কাজ শুরু করেন। পাঠক মানে লন্ডনের জনগণ তাঁর সম্পর্কে জানতে পারেন ১৮৮৭ সাল থেকে। চারটি উপন্যাস এবং ছাপ্পান্নটি ছোটো গল্পের আড়ালে সেদিনের লন্ডনবাসী জেনেছিলেন যে কী অসম্ভব যুক্তির মারপ্যাঁচে একের পর এক রহস্যের কিনারা করেছিলেন হোমস।.হোমসের সমস্ত গল্পই আমরা পেয়ে যাই ডাক্তার ওয়াটসনের বয়ানে, শুধুমাত্র দুটি ঘটনার কথা হোমস নিজের বয়ানে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, দুটি গল্প হোমস নিজের স্মৃতিকথা থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। পাঠক পড়তে পড়তেই বুঝতে পারবেন এই গল্পগুলির চলন। যে চলনগুলো একজন লেখকের ভাবনাচিন্তা বা পরীক্ষানিরীক্ষাকেও প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি একজন মানুষকে বর্ণময় করে তুলতেও জুড়ি নেই লেখকের। যেমন লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়লে হয়তো আমরা ধারণা করতে পারব যখন শার্লক হোমসের মাথা কাজ করত না তখন তিনি কোকেন নিতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কোকেন তাঁর মস্তিষ্কের জট পাকানো অবস্থাকে তরল করে ও তাঁকে চাঙ্গা করে। আবার কোকেনের সলিউশন (যা থাকত সাত শতাংশ) গ্রহণ করবার জন্য তিনি বিশেষ প্রকৃতির সিরিঞ্জ ব্যবহার করতেন। এই সিরিঞ্জটি তিনি আবার রেখে দিতেন একটি চামড়ার বাক্সে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে এইসব ছোটো ছোটো খুঁটিনাটিকে যদি মস্তিষ্কে খেলা করার সুযোগ দেওয়া যায় তবে চরিত্রগুলি নিশ্চিতভাবে জীবনের স্পর্শ পেয়ে যায়। আর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সেই ঘটনাগুলির আবহকে আমাদের আরও কাছের করে তোলার জন্যই টীকাকরণের কাজে হাত দিয়েছেন প্রসেনজিৎ আর সৌম্যেন। পাশাপাশি আমরা হাতে পেয়ে যাই আরও হরেক প্রকার তথ্য। গবেষণার যে চলন থাকে তাতে এই জাতীয় তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের এক পর্বে যদি গোয়েন্দা চর্চার ইতিহাস লেখা যায় তাহলেও এই জাতীয় তথ্য বিন্যাসের গুরুত্ব থাকবে। যেমন দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব। এটি পড়তে শুরু করার আগে যদি জানা যায় যে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯২-এর মার্চের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে তখন লেখাটির সময়কাল ও সেই সময়ের চেহারার ধারণা যে আমরা গল্পে পাচ্ছি তা আমরা বুঝতে পারি।

এসবের সাথে সাথে নানা ধরনের 'ক্লু' নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন এই দুই টীকাকার। সেগুলিও চোখে পড়ার মতো। পাঠকদের জন্য বাকিটা রেখে দিয়ে একটির প্রসঙ্গ আলোচনা করি। এই যে 'ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই' গল্পটি, এটির কোথাও কন্যান ডয়াল লেখেননি লোকটির কোন হাতের বুড়ো আঙুল নিয়ে ঘটনাটি এগোচ্ছে, সেটি ডান হাত না বাম হাত। উত্তরটি লেখক দেননি। উত্তরটি তৈরি করেছিলেন শিল্পী। স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত সিডনি প্যাগেটের আঁকা ছবিতে দেখা যায় শিল্পী দেখিয়েছেন বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটা পড়েছিল। অথবা ওঁদের টীকাকরণ থেকেই আমরা জানতে পারি যোসেফ লিস্টার নামের এক ব্যক্তি ব্যান্ডেজে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহারের প্রচলন করেন। আবার ডয়াল

একটি জায়গার নাম লিখছেন আইফোর্ড। কিন্তু টীকাকারের গবেষণায় আমরা জানতে পারছি ইংল্যান্ডে এই নামের কোনো জায়গা নেই। এই তথ্যটি আমাদের সেই সূত্র দেয় যে, লেখক নিজের প্রয়োজনে জায়গার নামও তৈরি করেছেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। টীকাকরণের কলাকৌশল আমাদের এভাবেই নানা অজানা দিকের প্রতি দিকনির্দেশ করে।

এইসঙ্গে আরও বলতে হয় যে এই টীকাকরণের আড়ালে রয়েছে সমাজচর্চারও নানা দিক। যেমন শার্লক হোমস-এর গল্প পড়তে পড়তেই আমরা জেনে নিতে পারি ভিক্টোরীয় যুগে ইংল্যান্ডে নকল মুদ্রা ছেয়ে গিয়েছিল ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে এ-রকম একটা আশঙ্কায় ১৭৯১ সালে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব অর্ডিন্যান্স দক্ষিণ ব্রিটেনে জরিপ শুরু করে সামরিক ম্যাপ বানানোর জন্য। প্রথম ম্যাপটি ছিল কেন্ট কাউন্টির। এইভাবে সটীক সংস্করণ শুধুমাত্র নিছক টীকাকরণে আটকে থাকে না। এরই পাশে পাশে হয়ে ওঠে গবেষণার আকর গ্রন্থ।

আমাদের দেশের ব্যোমকেশ কিম্বা ফেলুদাকে নিয়েও এ ধরনের দুরন্ত গবেষণার সুযোগ আছে। হোমস নিয়ে এই চমৎকার গবেষণা আমাদের সেই দিকটির কথাও মনে করায়। টীকাকরণ মানে যে পরিশ্রম আর গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গির যোগফল তা প্রমাণ করলেন এই দুই টীকাকার। আর সেইসঙ্গে বলতেই হবে লালমাটির প্রকাশক নিমাই গরাইয়ের কথা। যিনি নিরলসভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন যেকোনো ধরনের দুরন্ত গবেষণামূলক ভাবনাকে। যার ফলে তাঁর প্রকাশনা বাজারি তকমার আওতায় পড়ে না। এই ধরনের প্রকাশ ভাবনা বাংলা প্রকাশনাকে নিঃসন্দেহে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে মাটি দিয়ে গড়তে হয়। গড়বার জন্য ভাবতে হয়। যে গড়নের অন্তরে থাকবে জীবন স্পন্দনের রক্তজাত প্রাণ।

১৪ এপ্রিল ২০১২ — দেবদত্ত গুপ্ত
কলকাতা

সূচি

দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ শার্লক হোমস ৯

বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি ১১

লাল-চুলো সংঘ ২৪

ছদ্মবেশীর ছলনা ৩৫

বসকোম ভ্যালির প্রহেলিকা ৪৬

পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি ৬০

বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য ৭০

নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার ৮১

ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান ৯১

ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই ১০৫

খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি ১১৮

পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার ১৩০

রহস্য নিকেতন 'কপার-বিচেস' ১৪২

দ্য মেমোয়্যার্স অফ শার্লক হোমস ১৫৫

ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ ১৫৭

লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি ১৭২

হলদে মুখের কাহিনি ১৮৬

সোনা-দাঁতের রহস্য ১৯৫

কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট ২০৪

মাসগ্রেভ-সংহিতা ২১৪

রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার ২২৪

বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান ২৩৬

আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি ২৪৬

গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা ২৫৬

নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র ২৬৮

শার্লক হোমস বিদায় নিলেন ২৮৮

দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস ৩০১

মোর্যানের মারাত্মক হাতিয়ার ৩০৩

কুটিল বুড়োর কুচক্র ৩২১

নাচিয়েদের নষ্টামি ৩৪০

সুন্দরীর শতেক জ্বালা! ৩৬০

গোরুর খুরের রহস্য ৩৭৭
তিমি শিকারির বুকে হারপুন ৪০৭
ভাংচি দেওয়ার ভয়ংকর কাহিনি ৪২৬
কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয় ৪৪১
প্রশ্নপত্রের পলায়ন ৪৫৯
প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর ৪৭৬
খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি ৪৯৭
তিন গেলাসের রহস্য ৫১৭
কার্পেটের কারচুপি ৫৩৯

হিজ লাস্ট বাও ৫৬৫
উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি ৫৬৯
রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি ৫৯১
নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক ৬০৫
শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায় ৬২৭
লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান-রহস্য ৬৪১
শয়তানের পা ৬৫৭
বিদায় নিলেন শার্লক হোমস ৬৮০

দ্য কেস-বুক অফ শার্লক হোমস ৬৯৫
বিখ্যাত মক্কেলের বিচ্ছিরি বিপদ ৬৯৭
সাদাটে সৈন্যর সাংঘাতিক সংকট ৭১৩
হলদে হিরের হয়রানি ৭২৫
পাণ্ডুলিপির প্যাঁচ ৭৩৭
রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো কাহিনি ৭৫০
তিনের ত্র্যহস্পর্শ ৭৬৪
প্রস্তরের প্রহেলিকা ৭৭৬
বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেমি ৭৯৩
সিংহ-কেশরের সংহার মূর্তি ৮০৭
ঘোমটার ঘোরালো ঘটনা ৮২১
পাতালের পাপচক্র ৮২৯
রং-ব্যাপারীর বিরং ব্যাপার ৮৪৩

দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ
শার্লক হোমস

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি[১]

[এ স্ক্যানডাল ইন বোহেমিয়া]

শার্লক হোমসের চোখে তিনিই নাকি একমাত্র 'মহিলা' পদবাচ্য স্ত্রীলোক। তার মানে এই নয় যে মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা ছিল হোমসের। মন যার ঘড়ির কাঁটার মতো সুসংযত, কোনো ভাবাবেগ সেখানে ঠাঁই পায় না। হিসেবি মন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টির একটা যন্ত্র বললেই চলে তাকে। ভাবালুতার কোনো দামই নেই তার কাছে— বিচারশক্তি নাকি ঘুলিয়ে যায় এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে, তা সত্ত্বেও আইরিন অ্যাডলারকে শ্রেষ্ঠ মহিলার সিংহাসনে বসিয়েছিল শার্লক হোমস।

বিয়ের পর থেকেই হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছিল আমার। নিজের সংসার আর আলাদা ঘর নিয়েই তখন আমি মশগুল। হোমস সামাজিকতার ধার ধারে না। বেকার স্ট্রিটের ডেরায় রাশি রাশি বই; গোয়েন্দাগিরি আর কোকেনের নেশা নিয়ে সে রইল সম্পূর্ণ আলাদা জগতে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে চোখে পড়ত তার চমকপ্রদ কীর্তিকাহিনির সংবাদ।

নতুন করে ডাক্তারি শুরু করার[২] পর একদিন রাত্রে রুগি দেখে বাড়ি ফিরছি (২০। ৩। ১৮৮৮) বেকার স্ট্রিট দিয়ে, এমন সময়ে চোখে পড়ল ওপরের ঘরে দ্রুত পায়চারি করছে হোমস। পর্দার গায়ে দু-বার ছায়া পড়ল তার লম্বা রোগা শরীরের। দেখলাম মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, দু-হাত পেছনে। অর্থাৎ কোকেনের নেশা কাটিয়ে উঠেছে হোমস, কাজের নেশায় বুঁদ হয়েছে। মাথায় সমস্যার ভূত চেপেছে বলেই এত ছটফট করছে ঘরময়।

উঠে এলাম ওপরকার ঘরে। হোমস আমাকে দেখল, খুশি হল, কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে সুরাপাত্রের[৩] দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বসতে বলল চেয়ারে। তারপর তন্ময় চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

'বিয়ে করে সুখী হয়েছ দেখছি। সাড়ে সাত পাউন্ড ওজন বেড়েছে।'

'সাত পাউন্ড।'

'আবার ডাক্তারি শুরু করেছ?'

'তুমি জানলে কী করে?'

'দেখে। আরও দেখছি, সম্প্রতি খুব ভিজেছ বৃষ্টিতে, আর একটা অকম্মার ধাড়ি ঝি জুটেছে বাড়িতে।'

'ভায়া, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? সেকাল হলে তোমায় নির্ঘাত জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত! গত বেস্পতিবার গাঁয়ে গিয়েছিলাম হেঁটে, ফিরেছি অতি কষ্টে। কিন্তু জামাকাপড় পালটানোর পরেও তুমি জানলে কী করে বল তো? যাচ্ছেতাই ঝি-টাকেও বিদেয় করেছে স্ত্রী। অথচ তুমি—'

হাসল হোমস। দু-হাত ঘষে বললে, 'তোমার বাঁ-পায়ের জুতোয় পাশাপাশি দুটো আঁচড় পড়েছে— কাদা তুলতে গিয়েছিল এমন কেউ যে ডাহা আনাড়ি। অর্থাৎ, বাদলার দিনে রাস্তায়

বেরিয়েছিলে এবং যে ঝি-টিকে দিয়ে জুতো সাফ করিয়েছিলে, ঝাল ঝেড়েছে সে জুতোর ওপরেই। তোমার গায়ে আয়োডোফর্মের গন্ধ[৪], ডান হাতের বুড়ো আঙুলে সিলভার নাইট্রেটের[৫] কালচে দাগ, আর স্টেথিস্কোপ রাখার জন্যে উঁচু টুপি[৬] দেখে অনায়াসেই বলা যায় রুগি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে ডাক্তার।'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'এত সহজ করে বললে যে মনে হল আমারও বলা উচিত ছিল।'

চেয়ারে বসল হোমস। চুরুট ধরাল। বলল, 'তুমি দেখ ঠিকই, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখ না— তোমার সঙ্গে আমার তফাত সেইখানেই। যেমন ধর নীচের হল ঘর থেকে এই ঘরে ওঠবার সিঁড়ি তুমি দেখেছ?'

'নিশ্চয়।'

'কতবার দেখেছ?'

'কয়েক-শো বার তো বটেই।'

'ক-টা ধাপ আছে সিঁড়িতে?'

'তা তো বলতে পারব না।'

'কিন্তু আমি পারব। কেননা, তুমি শুধু দেখেছ, ঠাহর করনি— আমি করেছি। সতেরোটা ধাপ আছে সিঁড়িতে। আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি লেখালেখি শুরু করেছ বলেই তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি,' টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা গোলাপি চিঠি আমার দিকে নিক্ষেপ করল হোমস, 'জোরে পড়ো।'

চিঠির কাগজ বেশ পুরু; কিন্তু তারিখ, সই, ঠিকানা— কিছুই নেই!

চিঠিটা এই : 'আজ রাত পৌনে আটটায় একটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে মুখোশ পরে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ঘরে থাকবেন।'

বললাম, 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। তোমার কী মনে হয়?'

'সূত্র হাতে না-আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো মারাত্মক ভুল। চিঠি দেখে তোমার কী মনে হয়?'

'চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি বড়োলোক। কাগজটা রীতিমতো শক্ত, মজবুত আর দামি।'

'খাঁটি কথা। এ-কাগজ ইংলন্ডে পাওয়া যায় না। আলোর সামনে ধরো।'

ধরলাম। জলছাপটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। g এর পাশে E, একটা P, G-এর সঙ্গে t.

'কী বুঝলে?' হোমসের প্রশ্ন।

'কারিগরের নাম বা মনোগ্রাম।'

'না। g এর সঙ্গে t থাকার মানে গেসেল শাফট। জার্মান শব্দ। মানে, কোম্পানি। আমরা যেমন কোম্পানিকে কোং লিখি, ওরাও তেমনি গেসেল শাফটকে এইভাবে লেখে। P মানে পেপার। বাকি রইল E আর g এর মানেটা। কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার[৭] দেখলেই বোঝা যাবে।'

তাক থেকে বাদামি রঙের ইয়া মোটা একখানি বই নামিয়ে পাতা ওলটাল হোমস।

'ইগ্রো, ইগ্রোনিৎস, ইগ্রিয়া[৮]। আর এই হল বোহেমিয়া[৯]। ভাষা জার্মান। কাচ আর কাগজের কারখানার জন্যে বিখ্যাত। বল, কী বুঝলে?'

'সতর্কতার সঙ্গে আমি লেখাটা পরীক্ষা করলাম।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

'কাগজটা তৈরি হয়েছে বোহেমিয়ায়?'

'এবং পত্রলেখক একজন জার্মান। চিঠি লেখার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। জার্মানরাই কথার শেষে ক্রিয়া বসায়। ভদ্রলোক কিন্তু এসে গেছেন।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ, গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজ এবং দোরগোড়ার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

শিস দিয়ে উঠল হোমস। বললে, 'দু-ঘোড়ায় টানা গাড়ি মনে হচ্ছে।'

পরক্ষণেই উঁকি দিল জানলায়, 'ঠিক বলেছি। জোড়াঘোড়ায় টানা ব্রুহ্যাম[১০] গাড়ি। এক-একটা ঘোড়ার দামই কমসেকম দেড়শো গিনি[১১]। ওয়াটসন, এ-কেসে টাকা আছে হে।'

'আমি যাই।'

'মোটেই না। কেসটা ইন্টারেস্টিং, না-থাকলে আফশোস করতে হবে।'

ধীর স্থির ভারিক্কি পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে স্তব্ধ হল দরজার সামনে। পরক্ষণেই টোকা পড়ল পাল্লায়— বেশ জোরে গাঁট ঠোকার আওয়াজ— যেন কর্তাব্যক্তি কেউ।

'ভেতরে আসুন,' বললে হোমস।

ঘরে যিনি ঢুকলেন, মাথায় তিনি রীতিমতো ঢ্যাঙা— সাড়ে ছ-ফুটেরও বেশি। হারকিউলিসের[১২] মতো গড়নপেটন। পোশাক দারুণ দামি, কিন্তু ভীষণ জমকালো— ইংলন্ডের রুচিতে আটকায়। সারাগায়ে কুবেরের সম্পদ যেন ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মাথায় হ্যাট, আধখানা মুখ কালো মুখোশে ঢাকা। একটা হাত মুখোশ ছুঁয়ে রয়েছে— যেন ঢোকবার আগে এইমাত্র লাগালেন। মুখের নীচের দিকে প্রখর ব্যক্তিত্ব যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। মোটা ঠোঁট আর লম্বা থুতনিতে গোঁয়ারতুমি, গাজোয়ারি আর মনের জোর বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

রুক্ষ জার্মান উচ্চারণে বললেন— 'চিঠি পেয়েছেন?' বলে পর্যায়ক্রমে আমার আর হোমসের দিকে তাকালেন। যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কার সঙ্গে কথা বলবেন।

'বসুন', বললে হোমস। 'ইনি আমার বন্ধু এবং সহযোগী ডক্টর ওয়াটসন। কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি?'

'আমার নাম কাউন্ট ফন ক্র্যাম— বোহেমিয়ার খানদানি আদমি আমি। এঁকে বিশ্বাস করা চলে তো?'

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, টেনে বসিয়ে দিল হোমস।

বলল, 'হয় দুজনে শুনব, নয় কেউ শুনব না। এঁর সামনেই বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে কাউন্ট বললেন, 'তাহলে কথা দিন অন্তত দু-বছর এ-ব্যাপার প্রকাশ করবেন না— করলে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম দাঁড়াতে পারে।'

'কথা দিলাম', বললাম আমি আর হোমস।

'আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি চান না আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাক। মুখোশ লাগিয়েছি সেই কারণে। আমার আসল নামও আপনাকে বলিনি।'

'জানি,' কাঠখোট্টা গলায় বললে হোমস।

'বোহেমিয়ার আর্মস্টাইন রাজবংশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এত সাবধান হতে হচ্ছে জানবেন।'

সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে হোমস বললে, 'তাও জানি।'

অবাক হলেন রহস্যময় মক্কেল। হোমসের নামডাক যে অকারণে হয়নি, তা যেন বুঝতে পারলেন।

চোখ খুলল হোমস। বললে, 'মহারাজ যদি মন খোলসা করে সব বলেন তাহলে আমার দিক দিয়ে পরামর্শ দিতে সুবিধে হয়।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বিরাটদেহী আগন্তুক। দুমদাম করে ঘরময় কিছুক্ষণ চরকিপাক দিয়ে একটানে মুখোশ খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন মেঝেতে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই রাজা। অত লুকোছাপা কীসের?'

'আমিও তাই বলি। আপনি মুখ খোলার আগেই বুঝেছিলাম আজ আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন স্বয়ং ডিউক[১৩]।'

'ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি— প্রাহা থেকেই ছদ্মবেশ ধরে আসছি।'

'শুরু করুন,' ফের চোখ বন্ধ করে হোমস।

'বছর পাঁচেক আগে ওয়ারশ[১৪] নগরে নামকরা অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নামটা শুনেছেন নিশ্চয়?'

'ডাক্তার, নামের লিস্টটা বার করো তো!'

নামি ব্যক্তিদের যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখে রাখত হোমস। দরকারমতো তা কাজে লাগত। আইরিন অ্যাডলারের নাম পেলাম একজন ইহুদি প্রফেসর আর মিলিটারি অফিসারের নামের মধ্যে।

'দাও। হুঁ! নিউজার্সিতে জন্ম ১৮৫৮ সালে। ইম্পিরিয়াল ওয়ারশ রঙ্গমঞ্চের মূল গায়িকা। হুঁ! থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে আছেন। বুঝেছি। এঁকে যেসব চিঠি লিখেছেন, এখন তা ফেরত চাইছেন— এই তো?'

'তাই বলতে পারেন।'

'লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন?'

'মোটেই না।'

'দলিল-টলিল বা প্রশংসাপত্র জাতীয় কিছু আছে কি?'

'একদম না।'

'তাহলে সে-চিঠি যে আসল, তা প্রমাণ করা যাবে কী করে?'

'আমার হাতের লেখা দেখে।'

'হাতের লেখা জাল করা যায়।'

'প্যাডের কাগজ আমার।'

'তাও চুরি করা যায়।'

'সিলমোহরটাও যে আমার।'

'তাও নকল করা যায়।'

'আমার ফটো?'

'সে আর এমন কী— কিনতে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু দুজনে একসঙ্গে আছি যে ফটোতে।'

'সর্বনাশ! খুব কাঁচা কাজ করেছেন।'

'তখন কি আর কাণ্ডজ্ঞান ছিল আমার? বয়স কম। যুবরাজ ছিলাম। এখনই তো মোটে তিরিশ বছর বয়স আমার।'

'ফটোটা ওঁর কাছ থেকে সরাতে হবে।'

'সে-চেষ্টাও হয়েছে। পারিনি।'

'তাহলে কিনে নিন।'

'বেচবে না।'

'চুরি করান।'

'পাঁচবার চেষ্টা করেছি। দু-বার চোর দিয়ে, একবার দেশ বেড়ানোর সময়ে মালপত্র সরিয়ে, আর দু-বার পথে ঘাপটি মেরে থেকে। একবারও পারিনি।'

'ছবি নিয়ে কী করতে চান উনি?'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ার[১৫] রাজকন্যের সঙ্গে শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে আমার। মেয়েটি যদি জানতে পারে আমার চরিত্র ভালো নয়, বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। আইরিন অ্যাডলার ছবিখানা সেইখানেই পাঠাবে।'

'পাঠিয়ে দেননি তো?'

'না। বিয়ের কথা যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে, সেইদিন পাঠাবে। অর্থাৎ সামনের সোমবার।'

হাই তুলল হোমস— 'তিনটে দিন পাচ্ছি হাতে। আপনি লন্ডনেই আছেন তো?'

'হ্যাঁ। ল্যাংহ্যামে[১৬] পাবেন আমাকে।'

'খবর সেইখানেই দেব। দেনাপাওনার ব্যাপারটা কী হবে?'

'যা বলবেন তাই হবে। রাজ্যের খানিকটা দিয়ে দিতে পারি ফটোর দাম হিসেবে।'

'হাতখরচ?'

একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে টেবিলে রাখলেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

'এর মধ্যে তিন-শো মোহর আর সাত-শো পাউন্ডের নোট আছে।'

রসিদ লিখে দিল হোমস— 'আইরিন অ্যাডলারের ঠিকানাটা কী?'

'ব্রায়োনি লিজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভিন্যু, সেন্ট জনস উড[১৭]।'

'ফটোটা ক্যাবিনেট সাইজের[১৮]?'

'হ্যাঁ।'

'গুড নাইট। শিগ্‌গিরই খবর পাবেন।'

গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। হোমস বলল, 'কাল বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এস, এই নিয়ে কথা বলা যাবে'খন।'

২

পরদিন ঠিক তিনটেয় গেলাম। হোমস সকাল আটটায় বেরিয়েছে, তখনও ফেরেনি। আগুনের চুল্লির ধারে বসে রইলাম ফেরার পথ চেয়ে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজতেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন কদাকার সহিস। পোশাক নোংরা, মুখে দাড়িগোঁফ, চোখ রাঙা, ভাবভঙ্গি, মাতালের মতন। তিন-তিনবার আপাদমস্তক চোখ বুলোনোর পর চিনলাম বহুরূপী হোমসকে। শোবার ঘর থেকে পাঁচ মিনিট পরেই বেরিয়ে এল টুইড-সুট পরা ভদ্রলোকের চেহারায়। আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে পেটফাটা হাসি হাসল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

'ব্যাপারটা কী?' শুধোই আমি।

'দারুণ মজা হয়েছে আজ সকালে।'

'আইরিন অ্যাডলারের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলে বুঝি?'

'ঠিক। সহিসের ছদ্মবেশে বেরিয়েছি সকাল আটটায়। গাড়োয়ান আর সহিসে খুব মাখামাখি সম্পর্ক থাকে— খবর পেতে অনেক সুবিধে হয়। ব্রায়োনি লজ বাড়িটা দোতলা, রাস্তার ওপরেই, পেছনে বাগান, ডান দিকে সাজানো বসবার ঘর, বড়ো বড়ো জানলা। বাগানের পাঁচিল বরাবর একটা নোংরা গলি ঢুকেছে ভেতরে। সহিসরা ঘোড়া ডলাইমালাই করছে সেখানে। আমিও হাত লাগালাম। বিনিময়ে পেলাম দুটো পেনি, আধ বোতল মদ, তামাক আর আইরিন অ্যাডলার সম্পর্কে অনেক খবর। নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা। ভোরে বেড়াতে যাওয়া আর কনসার্টে গান গাইতে যাওয়া ছাড়া রাস্তায় বেরোন না। সাতটায় ফিরে ডিনার খান। পুরুষ বন্ধু শুধু একজনই। সুপুরুষ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, গায়ের রং গাঢ়, রোজ আসেন। পেশায় উকিল, নাম গডফ্রে নর্টন। খটকা লাগল। আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা স্রেফ উকিলের সঙ্গে মক্কেলের সম্পর্ক, না ভালোবাসাবাসির ব্যাপারও আছে? প্রথমটা যদি ঠিক হয়, তাহলে ফটো তাঁর হেপাজতেই আছে। অর্থাৎ তদন্তের ক্ষেত্র আরও বাড়ল।

'ভাবছি কী করব, এমন সময়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক। চেহারা দেখেই বুঝলাম ইনিই গডফ্রে নর্টন। ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়োয়ানকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ঝি-এর পাশ দিয়ে বোঁ করে ঢুকে গেলেন ভেতরে— যেন হরদম যাতায়াত আছে বাড়িতে।

'ভেতরে রইলেন আধঘণ্টা। জানালা দিয়ে দেখলাম হন হন করে পায়চারি করছেন আর হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন। আইরিন অ্যাডলারকে খুব একটা দেখা গেল না। তারপর বেরিয়ে এলেন আগের চেয়েও ব্যস্তভাবে। গাড়োয়ানকে হেঁকে বললেন— 'বিশ মিনিটের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রিট হয়ে সেন্ট মনিকা চার্চে যেতে হবে, আধ গিনি বকশিশ পাবে।'

'পেছন নেব কি না ভাবছি, এমন সময়ে একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। খুব তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া জোতা হয়েছে গাড়িতে, কোর্টের বোতাম লাগানোর সময়ও পায়নি কোচোয়ান। ঝড়ের মতো হল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আইরিন অ্যাডলার, গাড়িতে উঠেই হেঁকে বললেন— "বিশ মিনিটে সেন্ট মনিকার গির্জেয়[১৯] চল। আধ পাউন্ড বকশিশ দোব।"

'ঠিক এই সময়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ি এসে গেল সামনে। তড়াক করে লাফ মেরে ঢুকে গেলাম গাড়ির ভেতরে। চিৎকার করে বললাম, "সেন্ট মনিকার গির্জেয় চল— বিশ মিনিটের মধ্যে যেতে পারলে আধ পাউন্ড বকশিশ।"

'উল্কাবেগে গাড়ি পৌঁছাল গির্জার সামনে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আইরিন অ্যাডলার, গডফ্রে নর্টন আর পাদরি ছাড়া কেউ আর নেই— বেদির সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে। আমাকে দেখেই কিন্তু তিনজনেই দৌড়ে এল আমার দিকে। আমি তো অবাক!

'গডফ্রে নর্টন টানতে টানতে আমাকে বেদির কাছে নিয়ে গেলেন, "চলে এসো! চলে এসো! তোমাকেই দরকার! আর মোটে তিন মিনিট বাকি! সাক্ষী না-থাকলে আইনের ফাঁক থেকে যাবে।"

পরমুহূর্তে শুনলাম বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া হচ্ছে আমার কানের কাছে এবং আমিও তা দিব্যি

আউড়ে যাচ্ছি। যা জানি না, তার সাক্ষী দিচ্ছি। অর্থাৎ গডফ্রে নর্টন আর আইরিন অ্যাডলারের বিয়েতে মধ্যস্থতা করছি। চক্ষের নিমেষে বিয়ে হয়ে গেল। সবাই খুব খুশি। এক পাউন্ড পুরস্কারও পেলাম পাদরির কাছে। ব্যাপারটা বুঝলাম। সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না— রাস্তা থেকে সাক্ষী আনতে গেলে সময় পেরিয়ে যেত— তাই আমাকে পেয়ে বর্তে গিয়েছে সকলে। এত হাসছিলাম সেই কারণেই।'

'তারপর?' শুধোই আমি।

'গির্জের বাইরে এসে দুজনে গেলেন দু-দিকে— যাওয়ার আগে গডফ্রে নর্টন বলে গেলেন, সন্ধে নাগাদ রোজকার মতো আসবেন। কনে ফিরলেন বাড়িতে, আমিও এলাম এখানে— তোড়জোড় করতে।'

'কীসের তোড়জোড়?'

'খেয়ে নিয়ে বলব। পেটে আগুন জ্বলছে। বিকেলে তোমাকে দরকার। কাজটা কিন্তু বেআইনি। ধরা পড়ার সম্ভাবনাও আছে। রাজি?'

'এক-শোবার। উদ্দেশ্য মহৎ হলে সব কিছুতেই রাজি। কিন্তু মতলবটা কী তোমার?'

খাবার এসে গেল। খেতে খেতে হোমস বললে, 'উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ। এখন পাঁচটা বাজে। দু-ঘণ্টা পরে ব্রায়োনি লজে পৌঁছোব আমরা— আইরিন অ্যাডলার তখন খেতে ফিরবেন।'

'তারপর?'

'আমি ভেতরে যাব, তুমি বাইরে থাকবে। বসবার ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতে এই জিনিসটা রাখবে'— চুরুটের মতো একটা লম্বাটে বস্তু বাড়িয়ে দিল হোমস— 'সামান্য ধোঁয়া-বোমা। ছুড়ে দিলেই আপনা থেকে জ্বলে ওঠে। চার-পাঁচ মিনিট পরে জানলা খুললে তুমি আমার হাতের দিকে নজর রাখবে। যখন দেখবে এইভাবে হাত নাড়ছি', বিশেষ একটা হস্তভঙ্গি করে হোমস, 'বোমাটা জানলা গলিয়ে ভেতরে ছুড়ে দিয়ে "আগুন আগুন" বলে চেঁচিয়ে উঠবে। ভিড় জমে উঠলেই সরে পড়বে। রাস্তার অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াবে। দশ মিনিট পরে আমি আসব সেখানে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

শোবার ঘরে গেল হোমস। ফিরে এল পাদরির ছদ্মবেশে[২০]। শুধু পোশাক নয়, চোখ-মুখের চেহারা পর্যন্ত পালটে গিয়েছে। হোমস অপরাধ তাত্ত্বিক হওয়ায় অভিনয় জগৎ হারিয়েছে একজন কুশলী শিল্পীকে, বিজ্ঞান জগৎ হারিয়েছে একজন চুলচেরা বিশ্লেষককে।

বেকার স্ট্রিট থেকে বেরোলাম ছ-টা বেজে পনেরো মিনিটে— ব্রায়োনি লজের সামনে যখন পৌঁছোলাম তখন ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলে উঠেছে।

বাড়ির সামনেটা যত ফাঁকা হবে ভেবেছিলাম, দেখলাম তা নয়। বেশ কিছু লোক এদিকে সেদিকে হয় আড্ডা মারছে, নয় ঘোরাফেরা করছে।

হোমস বললে, 'ওয়াটসন, নর্টন-অ্যাডলার বিয়ের ফলে আমাদের কাজ কিন্তু সহজ হয়ে এল। আইরিন অ্যাডলার এখন কখনোই চাইবেন না ছবিটা গডফ্রে নর্টনের চোখে পড়ুক। কিন্তু রেখেছেন কোথায়, সেইটাই এখন সমস্যা।'

'কোথায় বলে মনে হয় তোমার?'

'সঙ্গে যে রাখেননি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্যাবিনেট সাইজের ছবি মেয়েরা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে না— তা ছাড়া যেকোনো মুহূর্তে গ্র্যান্ড ডিউকের লোক তাঁকে ধরে সার্চ করতেও পারে।'

'তাহলে?'

'কারো কাছেও রাখেননি— কেননা ছবিটা কয়েকদিনের মধ্যে দরকার হবে। তা ছাড়া মেয়েরা যখন কিছু লুকোয়— নিজেরাই লুকিয়ে রাখে— কারো সাহায্য নেয় না— বিশেষ করে যাদের আত্মবিশ্বাস আছে। কাজেই ধরে নিচ্ছি ছবি তাঁর নাগালের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, বাড়ির মধ্যে।'

'কিন্তু বাড়ি খোঁজাও তো হয়েছে।'

'ওকে খোঁজা বলে না।'

'তুমি কী করে খুঁজবে?'

'আমি তো খুঁজব না।'

'তবে?'

'উনিই দেখিয়ে দেবেন।— এই যে এসে গেছে গাড়ি।'

মোড়ের মাথায় দেখা গেল গাড়ির আলো— এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সঙ্গেসঙ্গে প্রাপ্তিযোগের আশায় একজন নীচু ক্লাসের লোক দৌড়ে এসে খুলে ধরল দরজা। দৌড়ে এল আরও একজন— প্রথম জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বকশিশটা নিজেই নেওয়ার আশায়। লেগে গেল ঝগড়া। ছুটে এল আরও অনেকে। দুটো দল হয়ে যেতেই শুরু হল হাতাহাতি, ঘুসোঘুসি, লাঠালাঠি। হোমস দৌড়ে গেল আইরিন অ্যাডলারকে বাঁচাতে— কিন্তু লাঠি খেয়ে কাতরে উঠে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়— রক্ত ঝরতে লাগল মুখ বেয়ে। দেখেই ফর্সা হয়ে গেল হামলাবাজরা। অন্যদিক থেকে কয়েকজন ছুটে এসে ঘিরে ধরল জখম পাদরিকে। আইরিন অ্যাডলার ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছেন।

সেখান থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'চোটটা কি মারাত্মক?'

কেউ বলল, শেষ হয়ে গিয়েছে। কেউ বললে, না, না এখনও মরেনি— নিশ্বাস পড়ছে। তবে হাসপাতাল পর্যন্ত টিঁকবেন কিনা সন্দেহ। আর একজন বললে— 'ভেতরে নিয়ে যাব?'

'নিশ্চয়। বসবার ঘরে এনে সোফায় শুইয়ে দাও।'

ধরাধরি করে হোমসকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল সোফায়। আলো জ্বলল বটে, জানলার পর্দা টানা হল না। দেখলাম, ভদ্রমহিলা নিজে শুশ্রূষা করছেন আহত পাদরিকে। ধোঁয়া বোমা হাতে নিয়ে তৈরি হলাম— সংকেত পেলেই ছুড়ব।

কষ্টেসৃষ্টে সোফায় উঠে বসেছে হোমস— বাতাসের অভাবে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। একজন ঝি গিয়ে খুলে দিল জানলা। সঙ্গেসঙ্গে সেই বিশেষ কায়দায় হাত তুলল হোমস এবং আমিও ধোঁয়া বোমা ঘরের মধ্যে ছুড়ে দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম 'আগুন আগুন' করে। একই সঙ্গে সমস্বরে আকাশফাটা চিৎকার আরম্ভ করল রাস্তার লোকজন। গলগল করে পুঞ্জীভূত ধোঁয়া বেরিয়ে এল জানলা দিয়ে। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে কেউ কেউ টেনে লম্বা দিলে সেখান থেকে। তারই মাঝে শুনলাম হোমসের গলা— আগুন-ফাগুন নাকি সব বাজে কথা, নিশ্চয় কেউ ভয় দেখাচ্ছে।

সরে এলাম রাস্তার কোণে। দশ মিনিট দাঁড়ালাম। হোমস এসে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

'শাবাশ ডাক্তার!' বললে হোমস।

'ফটোটা?'

'কোথায় আছে জেনে ফেলেছি।'

'কী করে জানলে?'

'উনি দেখিয়ে দিলেন।'

'কিচ্ছু বুঝলাম না।'

'রাস্তার লোকগুলো যে আমার ভাড়াটে অভিনেতা[২১], তা নিশ্চয় বুঝেছ?'

'সন্দেহ হয়েছিল।'

'গোলমালের শুরুতে দৌড়ে গিয়েই দু-হাত মুখে রগড়ে নিয়েছিলাম— আগে থেকেই লাল রং মেখে রেখেছিলাম হাতে। জখম হওয়ার ভান করতেই বৈঠকখানা ঘরে না-ঢুকিয়ে পারলেন না ভদ্রমহিলা। বাড়ির কোন ঘরে ফটো লুকিয়েছেন সঠিক জানতাম না। বসবার ঘরও হতে পারে, শোবার ঘরও হতে পারে। সেটা জানবার জন্যেই ঘরের মধ্যে ধোঁয়া-বোমা ছোড়ালাম তোমাকে দিয়ে।

'বাড়িতে আগুন লাগলে মেয়েরা আগে সবচেয়ে দামি জিনিস বাঁচাতে ছুটে যায়। মায়েরা দৌড়োয় বাচ্চার দিকে, কুমারীরা গয়নার দিকে। আইরিন অ্যাডলার দৌড়োলেন ঘণ্টার দড়ির ওপরকার একটা আলগা তক্তার দিকে— আধখানা টেনে সরাতেই ভেতরকার ফাঁকে দেখলাম ফটোটা। তারপরেই যখন বললাম— আগুন লাগেনি, উনি যেখানকার ফটো সেখানেই রেখে দিয়ে ধোঁয়া-বোমাটার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সেই ফাঁকেই ছবিটা সরিয়ে নিলে হত, কিন্তু কোচোয়ান লোকটা ঘরে ঢুকে এমন কটমট করে চেয়ে রইল আমার দিকে যে ভরসা হল না। বেশি তাড়াহুড়ো না-করাই ভালো।'

'এবার কী করবে?'

'কাল সকাল আটটায় খোদ মহারাজকে নিয়ে যাব আইরিন অ্যাডলারের বসবার ঘরে। উনি অবশ্য নেমে এসে আমাদের কাউকেই দেখতে পাবেন না— সেইসঙ্গে দেখবেন ফটোও নেই খুপরির মধ্যে। আমি চাই মহারাজ নিজের হাতে ছবি উদ্ধার করুন। আর দেরি নয়, এখুনি লিখে জানাচ্ছি মহারাজকে।'

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম কথা বলতে বলতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবির জন্যে পকেটে হাত দিল হোমস। অমনি কানের কাছে শুনলাম স্বাগত ভাষণ, 'গুডনাইট, মি. শার্লক হোমস!'

রাস্তায় তখন গমগম করছে লোকজন। মনে হল আলস্টারধারী শীর্ণকায় এক ছোকরার দিক থেকে ভেসে এল কথাটা। হনহন করে আমাদের পাশ দিয়ে সে চলে গেল সামনে।

শ্যেনদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে হোমস, 'চেনা গলা! কিন্তু লোকটা কে?'

সে-রাতে আর বাড়ি ফিরলাম না— বেকার স্ট্রিটের বাড়িতেই থেকে গেলাম। পরের দিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন বোহেমিয়ার গ্র্যান্ড-ডিউক।

ঢুকেই হোমসের কাঁধ খামচে ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, 'পেয়েছেন?'

'এখনও পাইনি— কিন্তু এবার পাবেন।'

'তাহলে চলুন, আর দেরি নয়।'

নেমে এলাম নীচে। ব্রুহাম গাড়িতে চেপে রওনা হলাম ব্রায়োনি লজ অভিমুখে। যেতে যেতে হোমস বললে, 'আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'বলেন কী? কবে?'

'কালকে।'

'কার সঙ্গে?'

'উকিল গডফ্রে নর্টনের সঙ্গে।'

'কিন্তু আইরিন কি তাকে ভালোবাসে?'

'আশা করি বাসেন। আর বাসেন বলেই আপনাকে তিনি ভালোবাসেন না। তাই আপনার ভালোমন্দ নিয়ে তাঁর আর মাথা ব্যথাও থাকবে না।'

বোবা হয়ে গেলেন গ্র্যান্ড-ডিউক। বিষাদাবরণে আবৃত রইলেন পথের বাকিটুকু। উদ্‌বেলিত আবেগ প্রকাশ করলেন না বাইরে।

ব্রায়োনি লজের সামনে গিয়ে দেখি দরজা খোলা, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ি ঝি। আমাদের দেখেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'আপনিই কি মিস্টার শার্লক হোমস?'

চমকে উঠল হোমস। বলল, 'হ্যাঁ, আমিই শার্লক হোমস।'

'দিদিমণি আজ ভোর পাঁচটা পনেরোর ট্রেনে চলে গেছেন। স্বামীকে নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি আসতে পারেন।'

'সেকী! ইংলন্ড ছেড়ে গেছেন নাকি?' ফ্যাকাশে হয়ে গেল হোমস। মনে হল এই বুঝি টলে পড়ে যাবে।

'হ্যাঁ। আর ফিরবেন না।'

'কাগজপত্রগুলো!' গলা ভেঙে গেল গ্র্যান্ড-ডিউকের।

ঝিকে ঠেলে সরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল হোমস। তছনছ অবস্থা ঘরের, দেরাজগুলো খোলা, তাক ফাঁকা। ঘণ্টার দড়ির ওপরের ঢিলে তক্তাটা ভেঙে ফেলল হোমস। ভেতর থেকে বার করল একটা ফটো আর একটা চিঠি।

ফটোটা আইরিন অ্যাডলারের। চিঠিটা শার্লক হোমসের। খামের ওপরে তার নামের তলায় লেখা : শার্লক হোমস না-আসা পর্যন্ত যেন এ-চিঠি এখানেই থাকে।

একটানে খাম ছিঁড়ে ফেলল হোমস। রাত বারোটার সময়ে লেখা হয়েছে চিঠি। হুমড়ি খেয়ে একই সাথে পড়লাম তিনজনে :

ডিয়ার মিস্টার শার্লক হোমস,

আপনার কাজের ধারাই আলাদা— শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। 'আগুন আগুন' চিৎকার শোনার আগে পর্যন্ত বুঝিনি ফাঁদে পড়েছি। বুঝলাম যখন, তখন খটকা লাগল। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম ছবি উদ্ধারের জন্যে আপনার দ্বারস্থ হতে পারেন মহারাজ। তাই কোচোয়ানকে

আপনার পাহারায় রেখে ওপরে গিয়ে পুরুষমানুষের ছদ্মবেশ ধরলাম। জানেন তো অভিনয় জিনিসটা আমি ভালোভাবেই রপ্ত করেছি এবং বহুবার দেখেছি পুরুষের ছদ্মবেশেই কাজ হয় বেশি।

আপনার পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত এসে যখন দেখলাম সত্যিই আপনি শার্লক হোমস, তখন বিবেচকের মতো গুড নাইট জানিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে।

ঠিক করলাম, এ-রকম দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষর খপ্পর থেকে রেহাই পেতে হলে দেশ ছেড়ে চম্পট দেওয়া ছাড়া আর পথ নেই। তাই কাল সকালে এসে দেখবেন আমি নেই। ফটো নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হবে না গ্র্যান্ড-ডিউককে। আমাকে ভালোবেসে যিনি বিয়ে করেছেন, তিনি ওঁর চাইতে উঁচু জগতের মানুষ। রাজা হয়ে আমাকে যে-আঘাত উনি দিয়েছেন, তার পালটা আঘাত আমি দেব না। তবে ছবিটাও দেব না। ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসেবে কাছে রাখব। তার বদলে অন্য একটা ছবি রেখে গেলাম, ইচ্ছে হলে উনি রাখতে পারেন।

বিশ্বস্ত

আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন গ্র্যান্ড-ডিউক—'মেয়ের মতো মেয়ে— আমার রানি হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সমশ্রেণির নয়, এই যা দুঃখ।'

উচ্ছ্বাস না-দেখিয়ে হোমস বললে, 'আমিও তাই দেখছি, উনি আপনার সমান শ্রেণির নন। আফশোস রয়ে গেল কেসটাকে এর চাইতে ভালোভাবে শেষ করা গেল না বলে।

'বলেন কী! এর চাইতে ভালো শেষ আর হয় নাকি? আইরিন অ্যাডলার দু-কথা বলে না। ফটোটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এত নিশ্চিন্ত থাকতাম না। বলুন কী পুরস্কার চান আপনি? এই আংটিটা যদি দিই[২২]—' বলে আঙুল থেকে মরকত আংটি খুলে নিলেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

'আংটির চেয়েও দামি জিনিস কিন্তু রয়েছে আপনার কাছে?'

'কী বলুন তো?'

'এই ফোটোটা।'[২৩]

'আইরিনের ফটো আপনি রাখবেন? বেশ তো নিন।'

'হেঁট হয়ে অভিবাদন জানিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল হোমস— পেছনও ফিরে দেখল না প্রতি-অভিবাদন জানাচ্ছেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

এই ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা ছেড়ে দেয় হোমস।

টীকা

১. **বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি :** আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এর জুলাই সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষত আমেরিকার কাগজে এই গল্প "উম্যান'স উইট" কিংবা 'দ্য কিংস সুইটহার্ট' নামে প্রকাশিত হয়।

২. **নতুন করে ডাক্তারি শুরু করার পর :** হোমস-কাহিনিতে এর আগে যে ওয়াটসন ডাক্তারি করতেন, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই গল্পের ঘটনা ১৮৮৮-র। 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭-তে। তখনও ওয়াটসন ডাক্তারি করতেন না। মাঝের সামান্য সময়টুকুর কথা অবশ্য জানা যায়নি।

৩. **সুরাপাত্র :** সে-যুগে সুরাপাত্র বলতে কাট-গ্লাসের বোতল বোঝাত।

৪. **আয়োডোফর্ম :** আইয়োডিন থেকে তৈরি এই যৌগিক বস্তুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পরবর্তী যুগেও অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৫. **সিলভার নাইট্রেট :** কস্টিক গুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক যৌগ। সে-যুগে ব্যবহৃত হত অ্যান্টিসেপটিক এবং ডিসইনফেকট্যান্ট হিসেবে।

৬. **উঁচু টুপি দেখে :** ১৮১৯ সালে রেনে ল্যামেক আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ বর্তমানে ব্যবহৃত স্টেথোস্কোপের মতো দেখতে ছিল না। ফাঁপা পাইপের তৈরি এই যন্ত্র ডাক্তাররা সাধারণত তাঁদের টপ-হ্যাটের ভেতরে রেখে দিতেন।

৭. **কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার :** 'সাইন অব ফোর' উপন্যাসে শার্লক হোমসকে কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

৮. **ইগ্রিয়া :** পূর্বতন বোহেমিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ইগার (Eger) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ইগার। বর্তমানে উত্তর হাঙ্গেরিতে অবস্থিত ইগার শহর বিখ্যাত এখানকার রেড ওয়াইন 'বুলস ব্লাড'-এর জন্য।

৯. **বোহেমিয়া :** প্রাচীন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের দখল নিয়ে জার্মান এবং চেকদের দ্বন্দ্ব বহুদিনের। কয়লাখনির কারণে বোহেমিয়ার প্রশস্তি। ঊনবিংশ শতকের শেষে হোলি-রোমান সাম্রাজ্য বা অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় বোহেমিয়া। ১৯১৮ সালে এই অঞ্চল চেকোস্লোভাকিয়ার অধীনে আসে। বর্তমানে বোহেমিয়া চেক রিপাবলিকের অন্তর্গত।

১০. **ব্রুহ্যাম :** দুই বা চার আসনবিশিষ্ট হালকা এবং আচ্ছাদিত ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

১১. **গিনি :** ইংলন্ডে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা গিনির বর্তমান যুগে প্রচলন নেই। এক গিনি একুশ শিলিঙের সমতুল। একসময়ে বিলাসদ্রব্য হিসেবে বা পেশাদার মানুষ, যেমন ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির সাম্মানিক গিনিতে দেওয়া বা নেওয়ার চল ছিল।

১২. **হারকিউলিস.:** গ্রিক উপকথার নায়ক হারকিউলিস ছিলেন অসীম শক্তিধর এবং বিশাল চেহারার অধিকারী।

১৩. **ডিউক :** সমসাময়িক ডিউকদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট ফ্রনজ যোসেফের একমাত্র পুত্র আর্চডিউক রুডলফ এবং আর্চডিউক ফার্দিনান্দ।

১৪. **ওয়ারশ :** বর্তমানে পোল্যান্ডের রাজধানী এই শহর।

১৫. **স্ক্যান্ডিনেভিয়া :** সুইডেন এবং নরওয়ে, এই দুটি দেশ নিয়ে গঠিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় হোমস কাহিনি 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' এবং 'দ্য নোবল ব্যাচেলর' গল্পে।

১৬. **ল্যাংহ্যাম :** ল্যাংহাম হোটেল খোলা হয় ১৮৬৩-র বারোই জুন। বর্তমান নাম ল্যাংহ্যাম হোটেল হিলটন। এখানে থাকবার ঘরের সংখ্যা ছ-শোরও বেশি।

১৭. **সেন্ট জনস উড :** সেন্ট জনস উড-এর দূরত্ব বেকার স্ট্রিট থেকে সামান্যই। এই অভিজাত পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন লেখক জর্জ ইলিয়ট, থমাস হাক্সলি, জর্জ দ্য মরিয়ে প্রমুখ।

১৮. **ক্যাবিনেট সাইজ :** দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং প্রস্থে প্রায় চার ইঞ্চি মাপের ছবিকে ক্যাবিনেট বলা হয়।

১৯. **সেন্ট মনিকার গির্জে :** এই নামটি কাল্পনিক। তবে এজওয়্যার রোডের কাছাকাছি ক্রিকলডাউনে অ্যাগনেস গির্জা, সেন্ট অ্যান্থনির গির্জা এবং সেন্ট সেভিয়ারের গির্জা অবস্থিত।

২০. **পাদরির ছদ্মবেশ :** কোনো চার্চের সঙ্গে যুক্ত পাদরির পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো সে-যুগে ইংল্যান্ডে অপরাধ হিসেবে গণ্য হত।

২১. **ভাড়াটে অভিনেতা :** কোনো কোনো সমালোচক এত কম সময়ে ভাড়াটে অভিনেতা সংগ্রহ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

২২. **আংটিটা যদি দিই :** 'আ কেস অব আইডেন্টিটি' গল্পে হোমসের কাছে একটি সোনার নস্যদানি দেখা গিয়েছে, সেটি নাকি বোহেমিয়ার এই রাজারই দেওয়া।

২৩. **ফোটোটা :** পরবর্তীকালে কখনো দেখা হলে আইরিন অ্যাডলারকে চিনতে পারার জন্য হোমস ফোটোটা রেখে দিয়েছিলেন— এমনই মনে করেন কয়েকজন হোমস-গবেষক।

লাল-চুলো সংঘ[১]

[দ্য রেড হেডেড লিগ]

গত বছর[২] শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম শরৎকালে। লাল-চুলো মোটাসোটা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল হোমস। শুধু লালই নয়। আগুনের মতোই জ্বলজ্বলে চুলের বাহার দেখবার মতো। হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, হোমস আমাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

বললাম, 'পাশের ঘরে বসি?'

'না।— মি. উইলসন, ডক্টর ওয়াটসন আমার সহযোগী। একে দিয়ে আপনারও কাজ হবে।'

ভদ্রলোকের চর্বি-ঘেরা কুতকুতে চোখে কৌতূহলের রোশনাই দেখা গেল।

হোমস বসল। বলল, 'আমার কাজকারবারে তোমার উৎসাহ কম নয়। আমাকে নিয়ে অনেক কাহিনিও লিখেছ— যদিও তা অতিরঞ্জন-দুষ্ট। এর আগেও তোমাকে বলেছি, কল্পনা দিয়ে রাঙানো ঘটনা কখনোই বাস্তব ঘটনার মতো চাঞ্চল্যকর হতে পারে না।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

'তাহলে আরও উদাহরণ হাজির করা যাক। মি. জাবেজ উইলসন একটা অসাধারণ কেস এনেছেন আজ। এর আগেও তোমাকে বলেছি, খুব অদ্ভুত আর অসাধারণ ঘটনার পেছনে বড়ো অপরাধ নাও থাকতে পারে— থাকে কিন্তু এমন ব্যাপারের পেছনে যা চোখ এড়িয়ে যায় অতি সহজেই। এই যে কেসটা এখন শুনছি, এর মধ্যে অপরাধের ছায়াটুকুও দেখছি না। তা সত্ত্বেও বলব ইদানীংকালের মধ্যে এমন বিচিত্র মামলা আর হাতে আসেনি। মি. উইলসন, আপনার আশ্চর্য কেসটা আবার গোড়া থেকে বলুন। ডক্টর ওয়াটসনের শোনা দরকার।'

লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা নোংরা দলা পাকানো খবরের কাগজ বার করে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখতে লাগলেন মি. উইলসন। ভদ্রলোক একটা ঢিলেঢালা টাইপের। পোশাক পরিচ্ছদও তাই। কারবারি ইংরেজের চেহারা যেরকম হয় আর কি। ওয়েস্টকোটে ঝুলছে তামার অ্যালবার্ট চেন[৩], তাতে লাগানো একটা চৌকোনা ধাতু। চেহারার মধ্যে একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর আগুন-রাঙা লাল চুল, ভাবভঙ্গি বেশ অশান্ত।

দেখলাম, আমার মতো শার্লক হোমসও বিশ্লেষণী দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে। চোখাচোখি হতেই হাসল।

বলল, 'কিছুদিন ইনি মজুরের কাজ করেছেন, নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে। রাজমিস্ত্রির কাজও করেছেন, চীনদেশে ছিলেন এবং এখন খুব লেখালেখি নিয়ে আছেন।'

দারুণ চমকে উঠলেন জাবেজ উইলসন। কাগজে তর্জনী রেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন হোমসের পানে।

বললেন, 'আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে? সত্যিই তো মজুর হিসেবেই আমার কর্মজীবনের শুরু। জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি ছিলাম।'

'আপনার হাত দেখে জানলাম। ডান হাতটা বাঁ-হাতের চেয়ে বেশি মাংসল— কাজের হাত কিনা।'

'নস্যি নিই জানলেন কী করে? অথবা রাজমিস্ত্রি ছিলাম?'

'আপনার ব্রেস্টপিন দেখে জানলাম আপনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন। নস্যির ব্যাপারটা বলে আপনার বুদ্ধিকে খাটো করতে চাই না।'

'লেখা নিয়ে আছি বুঝলেন কীভাবে?'

'আপনার ডান হাতার তলার পাঁচ ইঞ্চি বেশ চকচক করছে। আর বাঁ-হাতার কনুইটা কালচে মেরে গেছে টেবিলে ভর দিয়ে থাকার দরুন।'

'চীনদেশে থাকাটা?'

'ডান কবজিতে একটা উল্কি আঁকিয়েছেন। মাছের টাট্টু। আঁশটা গোলাপি। এ-কাজ চীন দেশেই হয়। উল্কি নিয়ে আমি একটু কাজ করেছি, প্রবন্ধও লিখেছি। তা ছাড়া ঘড়ির চেনের ওই চীনে মুদ্রাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আপনি চীন ঘুরে এসেছেন।'

অট্টহেসে জাবেজ উইলসন বললেন, 'ওঃ, এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম না-জানি কী অসাধারণ ক্ষমতাই দেখাচ্ছেন।'

'অত খুলে না-বললেই ভালো হত দেখছি— সুনামটা আর রইল না— পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন। যত গণ্ডগোল এই বিজ্ঞাপন থেকেই। ডক্টর ওয়াটসন, পড়ুন আপনি।'

আমি পড়লাম :

'যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত হপকিন্সের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী লাল-চুলো সংঘে আর একটা সদস্য-পদ শূন্য হয়েছে। সামান্য কাজের বিনিময়ে হপ্তায় চার পাউন্ড মাইনে দেওয়া হবে। বয়স যার একুশের বেশি, চুলের রং লাল, তিনি আবেদনপত্র নিয়ে বেলা এগারোটায়, ফ্লিট স্ট্রিটের[৪] সাত নম্বর পোপস কোর্টে সংঘ-দপ্তরে ডানকান রসের সঙ্গে দেখা করুন।'

হতভম্ব হয়ে বললাম, 'এ আবার কী বিজ্ঞাপন!'

জোরে হেসে উঠল হোমস। বলল, 'তাহলেই দেখ ব্যাপারটা মামুলি নয় মোটেই। মি. উইলসন, এবার আপনার আর্থিক অবস্থাটা খুলে বলুন। ওয়াটসন, কাগজটার নাম তারিখ লিখে রাখো।'

'মর্নিং ক্রনিকল[৫]। তারিখটা দেখছি দু-মাস আগেকার[৬]— ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০।'

'বলুন মি. উইলসন।'

'আমার একটা বন্ধকি কারবার[৭] আছে। ছোটো কারবার। কর্মচারী মাত্র একজন— তাও হাফ মাইনের— তা না-হলে রাখতে পারতাম না।'

'নাম?'

'ভিনসেন্ট স্পলডিং। বয়স খুব কম নয়, তেমন ধড়িবাজও নয়— নইলে এই মাইনেতে পড়ে থাকে? দোষের মধ্যে ফটো তোলার বাই আছে। দিনরাত ক্যামেরা কাঁধে টো-টো করছে, ছবি তুলছে। নীচের অন্ধকার ঘরে ডেভোলাপ করছে।'

'এখনও কাজ করছে আপনার?'

'তা করছে। সেইসঙ্গে একটা মেয়েও আছে। বছর চোদ্দো বয়স। সংসারের কাজ করে।

কারণ আমি বিপত্নীক। বেশ ছিলাম এই তিনজনে— কিন্তু মাস দুয়েক আগে এই বিজ্ঞাপনটা এনে স্পলডিং বললে— আহারে, আমার যদি লাল চুল থাকত!

'অবাক হয়ে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী। ও তখন বিজ্ঞাপনটা দেখাল। বললে, লাল-চুলো লোকের আকাল পড়েছে বলেই নিশ্চয় বিজ্ঞাপন দিয়েছে অছিরা। চুলের রংটা পালটে নিতে পারলে সে নিজেই যেত। বছরে দু-শো পাউন্ড কি চাট্টিখানি কথা? অথচ আমার চুল টকটকে লাল হওয়া সত্ত্বেও ঘর থেকে নড়ছি না।

'কিছুদিন ধরে কারবার ভালো চলছিল না। লাল চুলের দৌলতে দু-শো পাউন্ড রোজগারের খবর শুনে তাই লোভ হল।"

'বললাম, "ঝেড়ে কাশো, কী বলতে চাও?"

'ও তখন এই বিজ্ঞাপনটা দেখাল। বললে, 'তার চাইতে আপনি নিজেই পড়ে দেখুন। একজন লাল-চুলো আমেরিকান কোটিপতি একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেই লাল-চুলো সংঘ। ভদ্রলোকের নিজের মাথার চুল লাল ছিল বলে লন্ডনের সব লাল-চুলোদের জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল। সামান্য গতর খাটিয়ে যাতে তারা দু-পয়সা পকেটে পায় সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকাটা দেওয়া হয় তাঁর সম্পত্তির সুদ থেকে। দরখাস্ত করলেই চাকরিটা পাওয়া যাবে।'

'শুনে তো চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমার, "সেকী! লাখে লাখে লাল-চুলো দরখাস্ত নিয়ে ছুটবে যে।"

'স্পলডিং বললে, "মোটেই না। প্রথম কথা বয়স কম হলে চলবে না। তারপর লন্ডনের বাসিন্দা হওয়া চাই— কেননা ব্যাবসা করে টাকা কামিয়েছিলেন তিনি এখান থেকেই। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, চুলের রং শুধু লাল হলেই চলবে না— আগুনরাঙা হওয়া চাই— ঠিক আপনার চুলের মতো। দরখাস্ত করলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন কাজটা— যদি দরকার মনে করেন।"

'দেখলাম, অনেক খবরই রাখে স্পলডিং। কথাটাও মন্দ বলেনি। আমার চুলের রংখানা দেখেছেন? ঠিক যেন আগুন। কাজেই সেদিন দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে।

'গিয়ে মুণ্ডু ঘুরে গেল কাতারে কাতারে লাল-চুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তবে হ্যাঁ, আমার মতো আগুন রাঙা চুল কারোরই নেই। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল লাল মাথা। এরই মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে স্পলডিং আমাকে টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে অফিস ঘরের সামনে। সিঁড়িতেও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লাল-চুলোরা— কেউ কেউ মুখ কালো করে নেমে আসছে চাকরি না-পাওয়ায়।

'অফিস ঘরে ঢুকে একজন লাল-চুলোকে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। আমার চাইতেও রাঙা চুল। প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তৎক্ষণাৎ নাকচ করছে দেখে মনটা দমে গেল। কিন্তু আমার পালা আসতে বুকটা নেচে উঠল আমার প্রতি তার পছন্দ ভরা চাহনি দেখে। উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘাড় কাত করে বেশ করে দেখল আমাকে। দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার পর এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তারপর আচমকা আমার চুল খামচে ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারল যে চেঁচিয়ে মেচিয়ে চোখে জল এনে ফেললাম। ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বললে, "কিছু

মনে করবেন না— নকল চুল কিনা দেখে নিলাম। দু-বার ঠকেছি কিনা— রং করা চুল নিয়েও এসেছে অনেকে।”

‘এই বলে জানলার সামনে নিয়ে হেঁকে বললে, “লোক পাওয়া গেছে— চাকরি আর খালি নেই।” হতাশ হয়ে সরে পড়ল লাল-চুলোরা।

‘ভদ্রলোক বলল, “আমি এখানকার ম্যানেজার। নাম ডানকান রস। আপনি কী করেন?”

‘সামান্য একটা ব্যাবসা,’ বললাম আমি।

‘স্পলডিং বলে উঠল, “সে-কাজ আমি আপনার হয়ে করে দিতে পারব, মি. উইলসন।”

‘এখানকার কাজ ক-টায়?’

‘দশটা থেকে দুটো।’

‘ভেবে দেখলাম, বন্ধকি কারবার চলে সাধারণত সন্ধের দিকে— সকালের দিকে আমার কোনো কাজই নেই। সেই ফাঁকে বাড়তি পয়সা স্বচ্ছন্দে রোজগার করতে পারব। ব্যাবসাটা স্পলডিং দেখতে পারবে।

‘বললাম, “আমি রাজি। কত মাইনে?”

‘হপ্তায় চার পাউন্ড।’

‘কাজটা কী?’

‘খুবই সামান্য। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দেখে স্রেফ নকল করে যাওয়া। কালি কলম কাগজ সব আপনি নিয়ে আসবেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে একদম বেরোতে পারবেন না— কোনো অছিলাতেই নয়— অসুখবিসুখ বা হঠাৎ কাজের চাপেও ডুব মারা চলবে না— তাহলেই জানবেন চাকরিটা যাবে। শর্তটা পরিষ্কারভাবে লেখা আছে উইলে। বলুন, পারবেন কাল থেকে আসতে?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ।’

‘বিদায় জানিয়ে স্পলডিংকে নিয়ে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

‘বাড়ি ফিরে কিন্তু সাত পাঁচ ভাবতে গিয়ে মনটা আবার মুষড়ে পড়ল। জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লাম কি? সামান্য এই কাজের জন্য এত টাকা কেউ দেয়? স্পলডিং অবশ্য সমানে উৎসাহ জুগিয়ে চলল আমাকে।

‘পরের দিন কাগজ কলম কালি নিয়ে গেলাম[৮] সংঘের দপ্তরে। ডানকান রস হাজির ছিল। আমাকে ‘A’ অক্ষর থেকে শব্দকোষ কপি করতে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মাঝে মাঝে এসে দেখে গেল ঠিকঠাক কাজ করছি কি না। ছুটি দিল ঠিক দুটোর সময়।

‘শনিবারে পেলাম চারটে পাউন্ড। একদিনের জন্যেও কামাই না-করে প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো হাজিরা নিয়ে চললাম দপ্তরে। ডানকান রস ক্রমশ আসা কমিয়ে ছিল। রোজ একবার আসাও শেষকালে বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিন্তু প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত নকলনবিশি চালিয়ে গেলাম স্রেফ টাকার লোভে। কী জানি বাবা, একদিন না-এলে যদি টাকাটা খোয়া যায়।

‘এইভাবে গেল আটটা সপ্তাহ। A প্রায় শেষ করে এনেছিলাম। এমন সময়ে আচমকা শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা।

‘আজ সকালে কাজে গিয়ে দেখি দরজায় তালা দেওয়া। এই পিচবোর্ডটা ঝুলছে পাল্লায়।’

চৌকানা একটা পিচবোর্ড এগিয়ে দিলেন জ্যাবেজ উইলসন। আকারে নোটবইয়ের চাইতে বড়ো নয়। তাতে লেখা :

লাল-চুলো সংঘ
উঠে গেল
অক্টোবর ৯, ১৮৯০[৯]

জাবেজ উইলসনের মুখের চেহারা দেখেই আমি আর হোমস কেউই হাসি সামলাতে পারলাম না। যাকে বলে অট্টহাসি, তাই হেসে উঠলাম।

একে তো ওইরকম লাল চুল ভদ্রলোকের, তার ওপর আমাদের ছাদ কাঁপানো অট্টহাসি শুনে যেন আরও লাল হয়ে গেল চুলের গোড়া পর্যন্ত।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে রক্তিম মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, আমার দুর্দৈব দেখে এত মজা পাবেন আপনারা বুঝিনি।'

হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল হোমস। বলল, 'আপনার কেস আমি নিলাম।— দরজায় এই পিচবোর্ডটা দেখবার পর কী করলেন এবার বলুন!'

'নীচের তলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে রক্তকেশ সংঘের নাম করতে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। ডানকান রস নামটাও নাকি জীবনে শোনেননি। কিন্তু লাল-চুলো চেহারার বিবরণ দিতেই চিনলেন। বললেন, 'সলিসিটর[১০] ভদ্রলোকের কথা বলছেন তো? ওঁর নাম তো উইলিয়াম মরিস[১১]। নিজের অফিস গুছোনো না-হওয়া পর্যন্ত আমার অফিসে ছিলেন। কালকেই চলে গেছেন। ১৭ নম্বর কিং এডওয়ার্ড স্ট্রিটের অফিসে গেলেই দেখা পাবেন।'

'গেলাম সেখানে। গিয়ে আবার বোকা বনলাম। ঠিকানায় একটা কারখানা আছে। উইলিয়াম মরিস বা ডানকান রসের নামও কেউ শোনেনি। বাড়ি ফিরে স্পলডিংকে সব বললাম। ও বললে, দেখাই যাক না দু-দিন সবুর করে। নিশ্চয় চিঠিতে খবর আসবে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ বলুন? চাকরিটা তো আর পাব না। তাই ভাবলাম আপনার বুদ্ধি নিতে আসি— গরিব দুঃখীদের অনেক সাহায্য আপনি করেন জানি।'

'বেশ করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। বেশ গুরুত্ব আছে।'

'তা তো আছেই। হপ্তায় চার পাউন্ড কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার পেছনে বত্রিশটা পাউন্ড খরচ করে এই ঠাট্টাটা করার কী দরকার ছিল?'

'স্পলডিং লোকটা আপনার কাছে কদ্দিন কাজ করছে?'

'মাসখানেক।'

'ওকে কাজে নিলেন কীভাবে?'

'বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেকেই এসেছিল। ওর চাহিদা দেখলাম সবচেয়ে কম।'

'সস্তায় কিস্তি মেরেছেন বলতে পারেন। চেহারা কীরকম স্পলডিংয়ের?'

'মাথায় খাটো, গাঁট্টাগোট্টা। তড়বড়ে। পরিষ্কার গাল। বয়স বছর তিরিশ। কপালে একটা সাদা দাগ— অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল।'

সিধে হয়ে বসল হোমস। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল উত্তেজনা, 'ঠিক ধরেছি। দু-কানের লতিতে কি ফুটো আছে?'

'আছে। ছেলেবেলায় নাকি একজন বেদে জোর করে কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস, 'এখন সে কোথায়?'

'আমারই ডেরায়।'

'হুম। আজ শনিবার। আশা করছি সোমবারের মধ্যেই কিছু একটা করতে পারব।'

বিদেয় হলেন জাবেজ উইলসন।

হোমস বললে, 'ওয়াটসন, কী বুঝলে বলো।'

'কিস্সু না। দারুণ ধোঁয়াটে।'

'যে-মামলা বেশি ধোঁয়াটে মনে হয়, তাতেই বরং ধোঁয়া কম থাকে। কিন্তু যা একেবারেই সাদাসিদে, রহস্য তাতেই বেশি।'

'মতলব কী তোমার?'

'আপাতত তামাক খাওয়া। পরপর তিন পাইপ তামাক না-খাওয়া পর্যন্ত একদম কথা বলব না।' বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে পাইপ কামড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল। ঢুলুনি আমারও এল। তারপরেই চমকে উঠলাম ওর লাফিয়ে ওঠায়।

পাইপ নামিয়ে বললে, 'চলো, ঘণ্টা কয়েক সেন্ট জেমস হলে বাজনা শুনে আসা যাক। সময় হবে?'

'নিশ্চয়।'

'তবে চলো। বেরিয়ে পড়া যাক। প্রোগ্রামে দেখছি অবশ্য জার্মান বাজনাই বেশি। ফরাসি বা ইটালিয়ান বাজনার চেয়ে ভালো। নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়— এখন যা দরকার।'

হোমস কিন্তু বাজনার আসরে আগে গেল না— গেল স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারে[১২]। ভারি অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল। কোণের বাড়িটায় বোর্ডে লেখা জাবেজ উইলসনের নাম। লাল-চুলো মক্কেলের বন্ধকি দোকান নিশ্চয়। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল হোমস সেইদিকে। তারপর দু-পাশের ইটের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে এল মোড় পর্যন্ত। ফের ফিরে এল দোকানের সামনে। জোরে জোরে দু-তিনবার লাঠি ঠুকল দরজার কাছে। অমনি খুলে গেল দরজা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক পুরুষ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।'

বললে, 'আসুন।'

'ধন্যবাদ। স্ট্র্যান্ডে[১৩] যাওয়ার রাস্তাটা বলতে পারেন?' শুধোয় হোমস।

পথের হদিশ বলে দিয়ে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিলে লোকটা।

হোমস বললে, 'দেখলে তো কীরকম চটপটে? এ-রকম স্মার্ট লোক লন্ডনে আছে আর তিনজন। বুকের পাটার দিক দিয়ে এ কিন্তু তিন নম্বর।'

'রাস্তা জানতে চাইলে কেন? চেহারাটা দেখবার জন্যে তো?'

'না, না।'

'তবে?'

'ট্রাউজার্সের হাঁটুটা দেখলাম।'

'তাই নাকি! কী দেখলে হাঁটুতে?'

'দরজাটা তৎক্ষণাৎ খুলে গেল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

'যা দেখব বলে এসেছিলাম।'

'মেঝেতে লাঠি ঠুকলে কেন?'

'এখন দেখবার সময় ওয়াটসন, কথা বলার সময় নয়। এদিকের রাস্তা দেখা হয়েছে, চলো এবার পেছনে যাই।'

পেছনের রাস্তা কিন্তু জমজমাট পথচারী আর যানবাহনের ভিড়ে। স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারের নির্জনতার ঠিক বিপরীত। দু-পাশে সারি সারি ঝলমলে দোকান।

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল হোমস। যেন আপন মনেই বললে, 'তামাকের দোকানের পরেই খবরের কাগজের দোকান; ব্যাঙ্কের পরেই রেস্তোরাঁ; তারপর বাড়ির কারখানা। চলো ওয়াটসন। এখানকার কাজ শেষ। এবার একটু চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বাজনা শোনা যাবে।'

হোমস ভালো বেহালা বাজাতে পারে, ভালো বাজনা শুনতেও ভালোবাসে। নতুন নতুন সুর তুলতে তার উৎসাহের অন্ত নেই। বাজনার আসরে বসে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেলল গানের জগতে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রহস্যসন্ধানী বলে তখন তাকে আর মনেই হল না। এই সময়টাই কিন্তু শত্রুশিকারের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি খাপখোলা বাঁকা তরবারির মতোই রহস্যকে কচুকাটা করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায় এহেন অলস মুহূর্তে! ওর চরিত্রের এই দ্বৈত রূপ আমি দেখেছি বলেই বুঝলাম শত্রুপক্ষের কপাল পুড়তে আর দেরি নেই।

বাজনা শেষ হল। রাস্তায় বেরিয়ে হোমস বললে, 'ডাক্তার, কেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ— গুরুত্বটা বেড়েছে আজকে শনিবার হওয়ায়। সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে এই কোবার্গ স্কোয়ারে। আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে— কিন্তু আজ রাত্রে তোমার সাহায্যও দরকার। আসবে?'

'ক-টায়?'

'এই ধর দশটায়?'

'আসব— বেকার স্ট্রিটে দেখা হবে।'

'সঙ্গে মিলিটারি রিভলভারটা এনো— দরকার হতে পারে।' বলেই সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

শার্লক হোমসের তুলনায় আমি যে কত নির্বোধ, সে প্রমাণ বারে বারে পেয়েছি। লাল-চুলো সংঘের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার আমি যা জানি, সে-ও তা জানে; আমি যা দেখেছি, সে-ও তা দেখেছে। তা সত্ত্বেও হোমস জেনে ফেলেছে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে এখানে এবং এমনই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে পিস্তল পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারলাম না হেঁয়ালির— হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

যথাসময়ে গেলাম বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে। দেখি ঘরে হাজির হয়েছেন একজন পুলিশ ইনস্পেকটর আর একজন দামি পোশাক পরা বিষণ্ণ ভদ্রলোক। প্রথম জনকে আমি চিনি— স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের[১৪] গোয়েন্দা। নাম, পিটার জোন্স[১৫]। দ্বিতীয়জন অপরিচিত।

পরিচয় করিয়ে দিল হোমস। ভদ্রলোকের নাম মি. মেরিওয়েদার। নৈশ অভিযানে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।

ব্যাজার মুখে মি. মেরিওয়েদার কিন্তু গজগজ করতে লাগলেন, 'নিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু পণ্ডশ্রম হবে। সাতাশ বছরে এই প্রথম শনিবারের তাস খেলাটা হল না আমার।'

হোমস বললে, 'তাসের চাইতেও বেশি বাজি জিতবেন আজ রাতে— তিরিশ হাজার পাউন্ড কি কম হল? আর মি. জোন্স পাবেন একজনকে যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন দীর্ঘদিন।'

'সে আবার কে?'

'তার নাম জন ক্লে। মানুষ খুন বলুন, কি চুরিচামারি বলুন, ডাকাতিই হোক কি জালিয়াতি হোক— সব বিদ্যেতেই সে তুখোড়। বয়স কম, রাজবংশের ছেলে। উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু নীচ পেশায় রপ্ত হয়েছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনার। চলুন এবার বেরোনো যাক।' বলে শিকারের চাবুক নিয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

পথে নেমে দুটো গাড়িতে উঠলাম চারজনে। আমি আর হোমস রইলাম পেছনের গাড়িতে। বেশ কিছুক্ষণ মনের আনন্দে নানারকম সুর ভেঁজে চলল গোয়েন্দা বন্ধু।

তারপর বললে, 'এসে গেছি। শোনো ওয়াটসন, এই মেরিওয়েদার লোকটা একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। আজকের অভিযানে ওঁর থাকা দরকার ওঁর নিজের স্বার্থে। জোন্সকে সঙ্গে নিলাম ওর বুলডগের মতো জেদ আর সাহসের জন্যে।'

দিনের আলোয় ঝলমলে যে দোকান পসারির সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রাস্তায় নামলাম গাড়ি থেকে। মি. মেরিওয়েদার আমাদের একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট দরজা খুলে ভেতরে ঢোকালেন। সেখান থেকে করিডর পেরিয়ে লোহার ফটক খুলে ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলায় নামলেন। লোহার দরজা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে ঢুকলেন একটা পাতাল ঘরে— ঘরভরতি কেবল বড়ো বড়ো কাঠের বাক্স।

আসবার পথে একটা লণ্ঠন জ্বেলে এনেছিলেন মেরিওয়েদার। সেইটা মাথার ওপর তুলে হোমস বললে, 'বিপদটা ওপর থেকে আসছে না।'

'নীচ থেকেও আসবে না', বলে ঠক ঠক করে মেঝেতে লাঠি ঠুকলেন মি. মেরিওয়েদার। চমকে উঠলাম সঙ্গেসঙ্গে, 'আরে সর্বনাশ! মেঝেটা ফাঁপা মনে হচ্ছে না?'

রেগে গেল হোমস। বললে, 'ঘাটে এসে তরী ডুববে দেখছি আপনার জন্যে। দয়া করে বাগড়া না-দিয়ে বাক্সের ওপর উঠে বসবেন?'

মি. মেরিওয়েদারের মুখ লাল হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে একটা কাঠের বাক্সে উঠে বসে রইলেন।

হোমস তখন লণ্ঠন আর আতশকাচ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে পাথরের জোড় পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল হৃষ্টচিত্তে।

বললে, 'হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। জাবেজ উইলসন ঘুমিয়ে কাদা না-হওয়া পর্যন্ত ওরা কাজে নামবে না। ওয়াটসন, কোথায় দাঁড়িয়ে আছ বুঝেছ তো? ব্যাঙ্কের ভল্ট এটা— মি. মেরিওয়েদার এই ব্যাঙ্কের সর্বময় কর্তা। লন্ডনের ডাকসাইটে ক্রিমিনালরা হঠাৎ এই ভল্ট নিয়ে কেন উঠে পড়ে লেগেছে উনিই ভালো বলতে পারবেন।'

মি. মেরিওয়েদার খাটো গলায় বললেন, 'সোনার জন্যে।'

'সোনা?'

'হ্যাঁ, ফরাসি সোনা। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স থেকে আনিয়ে এই ভল্টে রাখা হয়েছে আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্যে। আনা হয়েছে মাসখানেক আগে, এখনও রয়ে গেছে এইসব বাক্সের মধ্যে। আমি যে-বাক্সে বসে, এর মধ্যেও সিসের পাত দিয়ে মুড়ে সোনা রাখা আছে। এত সোনা কোনো ব্যাঙ্কে থাকে না— নেইও।'

হোমস বললে, 'ব্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন প্রত্যেকে— ওরা বেপরোয়া— আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে সেইভাবে। আপাতত আমি লণ্ঠনে ঢাকা দেব, ঘর অন্ধকার করব। কিন্তু আলো ফেলবার সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন আড়াল থেকে। 'ওয়াটসন, যদি দেখ গুলি চালাচ্ছে, নির্দ্বিধায় তুমিও গুলি চালাবে।'

রিভলভার বার করে কাঠের বাক্সের ওপর রেখে আড়ালে বসে পড়লাম আমি। হোমস ঘর অন্ধকার করে দিল লণ্ঠনে ঢাকা দিয়ে। সে কী অন্ধকার! পাতালঘর বলেই যেন আরও বেশি অন্ধকার। কোনো ভাষায় সে-অন্ধকারের বর্ণনা করা যায় না। তেলপোড়া গন্ধটা নাকে ভেসে আসায় বুঝলাম বাতি এখনও জ্বলছে, সময়মতো আলো দেখা যাবে।

ফিসফিস করে হোমস বললে, 'এদিকে তাড়া খেয়ে পালালে বেরোবার পথ কিন্তু একটাই— স্যাক্স কোবার্গের সেই বাড়ি। মি. জোন্স, যা করতে বলেছি করেছেন তো?'

'নিশ্চয়। একজন ইনস্পেকটর দুজন চৌকিদার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে সেখানে।'

'চমৎকার। সব পথ বন্ধ। এবার শুধু প্রতীক্ষা।'

প্রতীক্ষা বলে প্রতীক্ষা! ওত পেতে ছিলাম মাত্র সওয়া একঘণ্টা। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন পুরো রাতটাই কাবার হয়ে গেল। ঘর নিস্তব্ধ। ফলে প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় সচল হৃদযন্ত্রের আওয়াজ ঘরের মধ্যে যেন ধুপধাপ শব্দে শোনা যাচ্ছে। একে তো অন্ধকার, তার ওপর উৎকণ্ঠা— স্নায়ুর অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। হঠাৎ একটা রোশনাই দেখা গেল মেঝেতে।

সামান্য একটা আলোর রেখা। অতি ক্ষীণ। পাথরের জোড় ভেদ করে আলোক রশ্মি অন্ধকারের বুকে প্রকট হয়ে উঠল। এতটুকু শব্দ শোনা গেল না— কিন্তু হলদেটে আলোর পরিধি বেড়েই চলল— দেখা গেল একটা গর্ত। মেয়েলি হাতের মতো একটা সাদা হাত বেরিয়ে এল সেই ফুটো দিয়ে। মিনিট খানেক বাদে হাতটা অদৃশ্য হল পাতালে। তার কিছু পরেই সশব্দে উলটে পড়ল একটা বড়ো সাইজের পাথর। চৌকোনা গর্ত দিয়ে ঠিকরে এল লণ্ঠনের আলো। বাচ্চা ছেলের মুখের মতো একটা মুখ উঁকি দিল সেই গর্ত দিয়ে। এদিক-ওদিক জুলজুল করে তাকিয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এল মেঝেতে— টেনে তুলল আর একজন হালকা চেহারার পুরুষকে— এর চুল টকটকে লাল রঙের।

বাতাসের মতো সুরে বললে শেষোক্ত ব্যক্তি, 'বেলচা আর থলি দাও।— আরে সর্বনাশ! পালাও, পালাও, আর্চি— লাফিয়ে পড়ো গর্তে।'

কিন্তু পালানোর আর সময় কোথায়? বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে তার জামার কলার খামচে ধরল শার্লক হোমস। রিভলভারের নল ঝলসে উঠতেই সপাং শব্দে চাবুক হাঁকড়াতেই ঠিকরে গেল রিভলভার। পড়-পড় আওয়াজ হল। আর্চির জামা ছিঁড়ে যাওয়ায়— জোন্সের হাত ফসকে গর্তে লাফিয়ে পড়েছে সে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে হোমস বললে, ‘জন ক্লে, তোমার খেল খতম হয়েছে— এবার ক্ষ্যামা দাও।’

‘কিন্তু আমার দোস্তকে তো ধরতে পারেননি’, ততোধিক শান্ত কণ্ঠে বললে লাল-চুলো লোকটা। ‘তার জামার খানিকটা কাপড়ই কেবল পেয়েছেন।’

‘তার জন্যে সুড়ঙ্গের ও-মুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন— কিচ্ছু ভেবো না।’

‘বাঃ। চমৎকার নিখুঁত কাজ হয়েছে দেখছি।’

‘তা হয়েছে, তোমারটাও কম নিখুঁত হয়নি। লাল-চুলোর আইডিয়া সত্যিই প্রশংসার করার মতো!’

জোন্স বললে, ‘বন্ধুর জন্যে মন কেমন করছে তো? শিগ্‌গিরই দেখা হয়ে যাবে। এবার এসো দিকি বাছাধন, হাতকড়াটা লাগিয়ে দিই।’

‘খবরদার!’ খ্যাঁক করে ওঠে জন ক্লে। ‘মনে রাখবেন আমার গায়ে রাজরক্ত আছে। নোংরা হাতে ছোঁবেন না আমাকে।’ ততক্ষণ কবজিতে লেগে গেছে হাতকড়া। তা সত্ত্বেও তড়পানি কমল না জন ক্লে-র— ‘‘বাজে কথা একদম বলবেন না। ‘হুজুর’ বলে ডাকবেন। সবসময়ে ‘দয়া করে’ কথাটা বলবেন।’’

‘তাই ডাকব হুজুর’, মুচকি হেসে বললে জোন্স, ‘এখন দয়া করে উঠে আসুন, থানায় যেতে হবে যে।’

‘বাঃ, এই তো চাই’, বসে বাতাসে মাথা ঠুকে আমাদের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে জোন্সের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল জন ক্লে।

গদ গদ কণ্ঠে মেরিওয়েদার বললেন, ‘মি. হোমস আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন! ব্যাঙ্ক লুঠের এ-রকম আশ্চর্য চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। শুধু আপনার জন্যেই বানচাল হয়ে গেল ওদের ষড়যন্ত্র।’

হোমস বললে, ‘জন ক্লে-র সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া বাকি ছিল— তাই তা চুকিয়ে নিলাম। এতে আমার কিছু খরচপত্র হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে তা দিয়ে দিলে বাধিত হব। আমার সবচেয়ে বড়ো লাভ কিন্তু লাল-চুলো সংঘের এই অসাধারণ মামলার সুরাহা করা।’

পরের দিন সকাল বেলা বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে মদ্যপান করতে করতে হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করল শার্লক হোমস।

বলল, ‘লাল-চুলো সংঘের বিচিত্র বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শব্দকোষ নকলের অছিলায় রোজ চার ঘণ্টা একটা ঘরে বসিয়ে রাখার একটাই উদ্দেশ্য— নিজের বাড়ি থেকে মাথামোটা বন্ধকি কারবারিকে সরিয়ে রাখা। চার পাউন্ডের লোভ বড়ো কম নয়। জাবেজ উইলসনের মাথার লাল চুল দেখেই আইডিয়াটা মাথায় আসে শয়তানদের। দুজনে মিলে বড়ো করে লাল-চুলো সংঘের নাম করে বেচারিকে সরিয়ে রাখল বাড়ির বাইরে।

‘কিন্তু কেন? আর্থিক অবস্থা তাঁর ভালো নয়, কারবারও ছোটো, কাজেই বাড়ির মধ্যে তেমন ধনদৌলত নেই। সোমত্ত মেয়েও নেই যে প্রেম করার জন্যে বাড়ির মালিককে বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তাহলে নিশ্চয় আসল কাণ্ডটা ঘটছে অন্য কোথাও। ষড়যন্ত্র চলছে এই বাড়িতেই। তারপর যখন শুনলাম, মাটির তলার ঘরে ফটো ডেভালাপ করতে যায় কর্মচারী— তখনই

রহস্য-তিমিরে আলো দেখতে পেলাম। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝলাম লন্ডনের বড়ো অপরাধীদের মধ্যে সে-ও একজন। দু-মাস ধরে রোজ চার ঘণ্টা হিসেবে মাটির তলার ঘরে সে কী করেছে? নিশ্চয় সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে[১৬] অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্যে।

'অকুস্থলে পৌঁছে লাঠি ঠুকে দেখলাম সুড়ঙ্গটা বাড়ির সামনে না পেছনে। সামনে যে নয়, নিরেট আওয়াজ শুনেই বুঝলাম। কর্মচারী বেরিয়ে আসতেই দেখলাম হাঁটুতে মাটি লেগে কি না। সত্যিই লেগে আছে— ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে মাটি খুঁড়লে প্যান্টের যা অবস্থা, অবিকল তাই। আমরা কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখিনি বলেই এই ঝুঁকিটা নিলাম।

'বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পেরোলেই ব্যাঙ্ক। তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না। তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে সোজা গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ব্যাঙ্ক ডিরেক্টরের কাছে।'

'কিন্তু জানলে কী করে যে সেইদিনই ওরা আসবে?'

'সংঘ তুলে দেওয়ার নোটিশ দেখে। অর্থাৎ জাবেজ উইলসনকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রাখার দরকার নেই— সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে গেছে— এবার সোনা লুঠ[১৭] করা দরকার। এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। সেদিক দিয়ে শনিবার প্রশস্ত সময়— কেননা পালাবার জন্যে দুটো দিন হাতে পাওয়া যাবে। ওইসব ভেবেই শনিবারের ফাঁদ পাতলাম।'

'চমৎকার! এ যে দেখছি যুক্তির শেকল— ফাঁক নেই কোথাও!' বললাম সোচ্ছ্বাসে।

হাই তুলে হোমস বললে, 'এসব মামলা হাতে নিলে একঘেয়েমি থেকে বাঁচা যায়। এইটাই আমার বড়ো লাভ।'

'সেইসঙ্গে মানুষ জাতটারও কত মঙ্গল হল বল তো?'

'তা হয়তো হল, তবে মানুষের চেয়েও বড়ো হল তার কীর্তি— যা থেকে যাবে।'

টীকা

১. **লাল-চুলো সংঘ** : 'দ্য রেড-হেডেড লিগ' প্রথম প্রকাশিত হয় অগাস্ট ১৮৯১-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে।

২. **গত বছর** : প্রথম প্রকাশের হিসেবে ১৮৯০ সাল। সেই সময়ে শুধুমাত্র 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' এবং 'দ্য সাইন অব ফোর' প্রকাশিত হয়েছে।

৩. **অ্যালবার্ট চেন** : পকেট ঘড়ি আটকানোর চেন। ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী, প্রিন্স অ্যালবার্ট এই ধরনের চেন ব্যবহার করতেন। তাঁর নাম থেকেই চেনের নামকরণ।

৪. **ফ্লিট স্ট্রিট** : লন্ডনের এই ব্যস্ত রাস্তায় বহু সংবাদপত্র এবং প্রকাশন সংস্থার দপ্তর এখনও বিদ্যমান। সংবাদপত্রের জন্য এই রাস্তার খ্যাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে।

৫. **মর্নিং ক্রনিকল** : এই নামের সংবাদপত্রটি ১৮৬০ সাল নাগাদ দেউলিয়া ঘোষিত হয়ে উঠে যায়। সেক্ষেত্রে ত্রিশ বছর পরে লেখা নামটি কাল্পনিক।

৬. **দু-মাস আগেকার** : এই সময়কাল যে সম্পূর্ণ অবাস্তব, একটু পরেই তা বোঝা যাবে।

৭. **বন্ধকি কারবার** : ভিক্টোরীয় যুগে এবং তার কিছুকাল পরও ইংলন্ডে বন্ধকি কারবারের যথেষ্ট রমরমা ছিল। সমাজের প্রায় সব শ্রেণির মানুষ নিজেদের দামি জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার করত এই ধরনের দোকান থেকে।

৮. **কাগজ কলম কালি নিয়ে গেলাম** : যারা সপ্তাহে চার পাউন্ড মাইনে দিতে পারে, তারা কেন যে কাগজ কলম কালি জোগাতে পারল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন কিছু সমালোচক।

৯. **অক্টোবর ৯, ১৮৯০ :** ওপরের ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য। উইলসন কাজে লেগেছিলেন ২৯ এপ্রিল। কাজ করেছেন আট সপ্তাহ। তাহলে অক্টোবর মাসে প্রায় সাড়ে চোদ্দো সপ্তাহের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

১০. **সলিসিটর :** সলিসিটররা আইন ব্যাবসা করতেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অব দ্য পিস-এর ওপরের কোনো আদালতে তাঁরা সওয়াল করতে পারতেন না।

১১. **উইলিয়াম মরিস :** এই গল্প যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে লন্ডনে উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪-১৮৯৬) নামে এক খ্যাতনামা সমাজবাদী নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি, চিত্রকর এবং ব্যবসায়ী।

১২. **স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ার :** লন্ডনে এই নামে আদৌ কোনো রাস্তা বা এলাকা নেই।

১৩. **স্ট্র্যান্ড :** টেমস নদীর তটরেখা বরাবর লন্ডন শহর থেকে ওয়েস্ট এন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা। এই রাস্তা এবং সাদাম্পটন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের কার্যালয়।

১৪. **স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড :** লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর ৪, হোয়াইট হল প্লেস ছিল স্কটল্যান্ডের রাজপরিবারের সম্পত্তি। ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের সংযুক্তিকরণের আগে স্কটল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি বা দূত এই সম্পত্তি ব্যবহার করতেন।

১৫. **পিটার জোন্স :** 'দ্য সাইন অব ফোর' উপন্যাসে অ্যাথলেনি জোন্স নামের এক গোয়েন্দার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৬. **সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে :** অতখানি লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে যে মাটি বেরোল, সেগুলি কোথায় রাখা হল তার ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায়নি।

১৭. **সোনা লুঠ :** ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখা সোনার ওজন কিছু কম ছিল না, সুড়ঙ্গ দিয়ে অত সোনা সরানো এবং তারপর সেগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কী ব্যবস্থা চোরেরা করেছিল, তাও অজানা রয়ে গিয়েছে।

ছদ্মবেশীর ছলনা[১]

[এ কেস অফ আইডেনটিটি]

বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় বসে আছি আমি আর হোমস। সামনে আগুনের চুল্লি।

হোমস বললে, 'ভায়া, কল্পনার রং কখনো বাস্তবের রঙের চেয়ে জোরদার হতে পারে না। আটপৌরে নাটক নভেল মাঠে মারা যাবে যদি জীবন থেকে তুলে নেওয়া সত্য ঘটনাকে সঠিকভাবে দেখা যায়।'

আমি বললাম, 'আমার তাতে সন্দেহ আছে। কই, হাজার রং চড়িয়েও তো পুলিশ কোর্টের কেসগুলোকে নিছক কেলেঙ্কারির ঊর্ধ্বে তোলা যায় না?'

'সেটা হয় খুঁটিয়ে রিপোর্ট পেশ করার মতো মগজ নেই বলে। যা নজর কাড়ে না, তা এড়িয়ে যাওয়া বোকামি। তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেই বৃহৎ চমকে থাকে।'

মেঝে থেকে দৈনিক সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে বললাম, 'তোমাকে ঘায়েল করার জন্যে একটা শুধু উদাহরণ দিচ্ছি। এই দেখ একটা কেলেঙ্কারির খবর। স্ত্রী-র ওপর স্বামীদেবতার অকথ্য অত্যাচার। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যা লেখা হয়েছে যেকোনো নিকৃষ্ট লেখকও এর চাইতে ভালো জিনিস মন থেকে লিখতে পারবে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে হোমস চোখ বুলিয়ে বললে, 'ভায়া নিজের উদাহরণেই ঘায়েল হলে তুমি। কেসটা অসাধারণ। আমি নিজে তদন্ত করেছিলাম। স্বামীটি মোটেই বদচরিত্রের লোক নন। তিনি মদ খাওয়া বরদাস্ত করেন না, পরকীয়া ব্যাপারটা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না— তা সত্ত্বেও

বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু করা হল তাঁর বিরুদ্ধে? কেন? না, তিনি খাওয়ার শেষে বাঁধানো দাঁত ছুড়ে[২] স্ত্রীকে মারতেন। অদ্ভুত ঘটনা, তাই নয় কি? কল্পনা করতে পারবে কোনো লেখক? নাও হে, এক টিপ নস্যি[৩] নিয়ে মাথাটা সাফ করো।'

বলে এগিয়ে দিল দামি অ্যামেথিস্ট রত্ন বসানো সোনার নস্যির ডিবে।

অবাক হয়ে বললাম, 'এটা আবার কোথায় পেলে?'

'বোহেমিয়ার সেই রাজা দিয়েছে। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

অনামিকার হিরের আংটি দেখিয়ে বললাম, 'এটা?'

'হল্যান্ডের রাজপরিবারের উপহার। তাঁদের একটা গোপন ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম।'

'এখন কী করছ? হাত খালি, না কেস আছে?'

'আছে দশ বারোটা, কিন্তু কোনোটাই চিত্তাকর্ষক নয়। যে-মামলা যত বিরাট বলে মনে হয়, আসলে তা তত সহজ। আকারটাই প্রকাণ্ড— ভেতরে ফক্কা। মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একজন মক্কেল আসতে পারে।'

বলে, উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা। সাজপোশাক জমকালো। ভীষণ উত্তেজিত। আঙুল কাঁপছে। আমাদের জানলায় চোখ পড়তেই জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সাঁৎ করে রাস্তা পেরিয়ে এসে ঢং ঢং করে বাজিয়ে দিলেন দরজার ঘণ্টা। হোমস বললে, 'প্রেমের কেস মনে হচ্ছে— নইলে ঘণ্টা নিয়ে এভাবে হ্যাঁচকা টান কেউ মারে? গোপনীয় কাণ্ড বলেই প্রথমটা মনস্থির করতে পারেননি— দোটানায় পড়েছিলেন।'

একটু পরেই চাকরের[৪] পেছন পেছন হাজির হলেন ভদ্রমহিলা। নাম মিস সাদারল্যান্ড। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল হোমস।

বললে, 'চোখের বারোটা বাজিয়ে বসে আছেন। অথচ টাইপের কাজ করেন কী করে বুঝলাম না।'

'প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে— আন্দাজে বুঝি কোথায় কোন টাইপটা আছে।' এই পর্যন্ত বলেই যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? নিশ্চয় আগে শুনেছেন?'

'জানাটাই আমার কাজ', স্মিত মুখে জবাব দেয় হোমস। 'অন্যের চোখে যা ধরা পড়ে না— আমি তা দেখে ফেলি।'

'দেখুন, আমি খুব বড়োলোক নই। টাইপের কাজ করে সামান্য রোজকার করি, তা ছাড়াও এক-শো পাউন্ড হাতে আসে। সব আপনাকে দেব শুধু একটা খবরের বিনিময়ে। মিস্টার হসমার এঞ্জেল এখন কোথায় আছে বলে দিন।'

শিবনেত্র হয়ে হোমস বললে, 'এসেছেন তো দেখছি ঊর্ধ্বশ্বাসে। কেন বলুন তো?'

অবাক হলেন মিস সাদারল্যান্ড, 'ঠিক ধরেছেন তো! সত্যি আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আমার বাবা, মি. উইন্ডিব্যাঙ্ক, একদম পাত্তা দিচ্ছেন না ব্যাপারটাকে। পুলিশে খবর দেবেন না, আপনার কাছেও আসবেন না। তাই খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।'

'সৎ-বাবা? পদবি আলাদা দেখছি।'

'শার্লক হোমস তাঁকে স্বাগত জানালেন।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

'হ্যাঁ। বয়সে আমার চেয়ে মোটে পাঁচ বছর দু-মাসের বড়ো। মায়ের চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো। বিধবা হয়েই এঁকে বিয়ে করে মা। বাবার ব্যাবসা ছিল টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে। মি. উইন্ডিব্যাঙ্ক নানা জায়গায় ঘুরে মদ বেচেন। তিনি মাকে দিয়ে বাবার ব্যাবসা বিক্রি করে দিলেন— তাতে সুদে আসলে যা পাওয়া যায়— বাবার জীবদ্দশায় তার চাইতে বেশি আসত।

'আপনার রোজগারের টাকা কি এ থেকেই আসে?'

'না। কাকার মৃত্যুর পর তার কিছু কোম্পানির কাগজ আমি পেয়েছি। তা থেকে বছরে সুদ পাই প্রায় এক-শো পাউন্ড।'

'সে তো অনেক টাকা। বছরে ষাট পাউন্ডেই একজন মহিলার জীবন বেশ কেটে যায়।'

'কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলে আমাকেও কিছু দিতে হয়। তিন মাস অন্তর সুদের টাকাটা মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক এনে মাকে দেন। আমি টাইপ করে যা পাই, তাতে নিজের খরচ বেশ চলে যায়।'

'হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক, দয়া করে খুলে বলুন। সংকোচ করবেন না— ডক্টর ওয়াটসন আমার বন্ধু।'

প্রদীপ্ত মুখে মিস সাদারল্যান্ড বললেন, 'গ্যাসফিটারের[৫] নাচের আসরে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। এসব আসরে আমার যাওয়াটা পছন্দ করতেন না মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক। কোথায় যাব শুনলেই খেপে যেতেন। কিন্তু আমি যখন বেঁকে বসলাম, তখন উনি রাগ করে ফ্রান্সে চলে গেলেন। মা আর ফোরম্যান মি. হার্ডির সঙ্গে গেলাম নাচের আসরে। আলাপ হল মিস্টার হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে।'

'ফ্রান্স থেকে ফিরে মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক নিশ্চয় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন?'

'মোটেই না। হাসতে লাগলেন। বললেন, মেয়েরা বড্ড জেদি— যা করব বলে, তা করে ছাড়ে। খুব সহজভাবে নিলেন সমস্ত ব্যাপারটা।'

'আলাপ হওয়ার পর?'

'বাড়িতে একবার এসেছিলেন। আমিও দু-বার তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর আর বাড়িমুখো হননি।'

'কেন?'

'বাড়িতে কারো আসাটা সৎ-বাবা পছন্দ করেন না বলে। ওঁর মতে মেয়েদের উচিত ঘরকন্না নিয়ে থাকা।'

'মিস্টার হসমার এঞ্জেল তখন কী করলেন?'

'চিঠিতে যোগাযোগ রাখলেন। বলতেন, সৎ-বাবা ফের ফ্রান্সে গেলে বাড়ি আসবেন।'

'বিয়ের কথা কি চিঠির মধ্যেই হয়?'

'প্রথমবার বেড়াতে যাওয়ার সময়ে। উনি লেডেনহল স্ট্রিটে[৬] একটা অফিসের ক্যাশিয়ার—'

'কোন অফিস?'

'তা তো জানি না।'

'আস্তানা?'

'অফিসেরই ঘরে।'

'ঠিকানা?'

'লেডেন হল স্ট্রিট।'

'চিঠি কোন ঠিকানায় লিখতেন?'

'লেডেন হল পোস্ট অফিসের ঠিকানায়। পাছে অফিসের মেয়েরা পেছনে লাগে আমার চিঠি দেখলে, তাই উনি নিজে গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে আসতেন প্রত্যেকটা চিঠি। আমি টাইপ করে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম— উনি রাজি হননি।[৭] আমার হাতের লেখার মধ্যেই যেন আমাকে দেখতে পান। কতখানি ভালোবাসলে এমন কথা বলা যায় ভাবুন তো?'

হোমস বললে, 'ব্যাপারটা ছোট্ট হলেও বেশ সংকেতময়। এ-রকম ছোটোখাটো ব্যাপার আর মনে পড়ছে?'

'রাত না-হলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন না— এত লজ্জা। নিরালায় থাকতে ভালোবাসেন, কথা বলেন খুব আস্তে— গ্ল্যান্ডের অসুখ হওয়ার পর থেকেই জোরে কথা বলা বন্ধ। খুব ফিটফাট। চোখে রঙিন চশমা— চোখটাও নিশ্চয় আমার মতো খারাপ।'

'মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাওয়ার পর কী হল?'

'হসমার আমার বাড়ি আসতে লাগলেন। সৎ-বাবা ফিরে আসার আগেই এই সপ্তাহেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইলেন। আমাকে দিয়ে বাইবেল ছুঁইয়ে কথা আদায় করলেন কখন কী ঘটে বলা যায় না— কিন্তু আমি যেন তাঁকে না-ভুলি। সৎ-বাবার মত নেওয়ার ব্যাপারে মা আর হসমার দুজনেই বললেন, তার দরকার কী? মা আমার চেয়েও যেন বেশি ভালোবাসত হসমারকে। বললে, মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ককে বোঝানোর ভার তার। তা সত্ত্বেও সৎ-বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম ফ্রান্সের ঠিকানায়— কিন্তু চিঠি পৌঁছোনোর আগেই উনি ইংলন্ড রওনা হওয়ায় চিঠি ফিরে এল বিয়ের দিন সকালে।'

'আচ্ছা! বিয়েটা তাহলে শুক্রবারেই হয়ে যেত? কোথায়?'

'সেন্ট জেভিয়ার্স গির্জেতে। একটা ভাড়াটে গাড়িতে আমাকে আর মাকে বসিয়ে উনি পেছন পেছন এলেন আর একটা গাড়িতে। গির্জের সামনে আমরা নামতেই পেছনের গাড়ি এসে দাঁড়াল— কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখা গেল না। অথচ গাড়োয়ান তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন। সেই থেকে তাঁকে দেখিনি।'

'আপনার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারটা খুবই যাচ্ছেতাই হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'না, না, ওসব ভাববেন না। ওঁর মতো মানুষ এ-কাজ করতেই পারেন না। সকাল থেকেই কিন্তু একটা কথা বার বার বলেছিলাম। আচমকা কোনো কারণে যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়— আমি যেন তাঁকে না-ভুলি— শপথটা মনে রাখি। বিয়ের ঠিক আগে এসব কথার তখন মানে খুঁজে পাইনি— এখন পাচ্ছি।'

'আপনার বিশ্বাস তাহলে উনি সাংঘাতিক কোনো বিপদে পড়েছেন?'

'নইলে আগে থেকেই ওইসব কথা বলবে কেন?'

'বিপদটা কি আঁচ করতে পারছেন?'

'না।'

'মায়ের মত কী?'

'রেগে গেছে। এ নিয়ে আর কোনো কথা আমি না-বলি।'

'বাবার?'

'বাবা সব শুনে বললেন, হসমারের খবর নিশ্চয় পরে পাওয়া যাবে। আমার সম্পত্তির ওপর তাঁর একদম লোভ ছিল না। কাজেই খামোকা বিয়ের লোভ দেখিয়ে গির্জে পর্যন্ত ছোটাতে যাবেন কেন? নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। এদিকে ভাবনাচিন্তায় আমার রাতের ঘুম উড়ে গেছে।' বলতে বলতে রুমালে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

উঠে দাঁড়াল হোমস। বললে, 'আমার যথাসাধ্য করব কথা দিচ্ছি। আপনি কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। হসমার এঞ্জেলকে ভুলে যান।'

'সে কী। আর কি তাহলে দেখা হবে না?'

'মনে তো হয়।'

'কিন্তু তার হলটা কী?'

'জবাব পরে দেব। আপাতত তাঁকে দেখতে কীরকম বলে যান, আর চিঠিপত্র কিছু থাকে তো দিয়ে যান।'

'গত শনিবার খবরের কাগজে ওঁর জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম— এই নিন চারখানা চিঠি।'

'আপনার ঠিকানা?'

'৩১, লায়ন প্রেস, ক্যাম্বার ওয়েল।'

'আপনার সৎ-বাবার কারবারের ঠিকানা?'

'ফেনচার্চ স্ট্রিটের ওয়েস্ট হাউস অ্যান্ড মারব্যাঙ্ক কোম্পানি।'

'ধন্যবাদ। ফের বলছি, ব্যাপারটা ভুলে যান।'

'কিন্তু তা তো আমি পারব না। হসমারকে যে কথা দিয়েছি— সারাজীবন পথ চেয়ে থাকব তার জন্যে।'

কাগজপত্র টেবিলে রেখে বিদায় নিলেন মিস সাদারল্যান্ড। সাদামাটা মুখ আর বদখত টুপি দেখে প্রথমটা মনে অন্য ধারণা হয়েছিল, এখন কিন্তু শ্রদ্ধা না-করে পারলাম না। সরল ভাবে যে বিশ্বাস করতে পারে, তার ভেতরটা অনেক পবিত্র।

দু-পা সামনে ছড়িয়ে শিবনেত্র হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল শার্লক হোমস। তারপর পাইপ বের করে তামাক ঠেসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল ভলকে ভলকে।

অনেকক্ষণ পরে বললে— 'কেসটা নতুন কিছু নয়— এ-রকম ঘটনা এর আগেও ঘটেছে— আমার কাগজপত্র[৮] লেখা আছে। কিন্তু মেয়েটি ইন্টারেস্টিং।'

বললাম, 'কী দেখলে ওর মধ্যে?'

'ভায়া, দেখেছ তুমিও, কিন্তু দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জামার হাতা, বুড়ো আঙুলের নখ আর জুতোর ফিতের মধ্যেও অনেক রহস্য থাকে। মেয়েটাকে দেখে তোমার কী মনে হল শোনা যাক।'

'মাথায় পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা কালচে-ধূসর বেতের টুপি, গায়ে পুঁতি বসানো কালো পাথরের ঝালরওলা কালো জামা, হাতার বেগুনি দাগ, ধূসর দস্তানা— ডান হাতের আঙুলের ডগা ছিঁড়ে গেছে, কানে দুল, জুতো দেখিনি। সব মিলিয়ে অবস্থা ভালো, কিন্তু শৌখিন নন।'

হাততালি দিয়ে উঠল হোমস। হাসতে হাসতে বলল, 'চমৎকার বলেছ! খুঁটিয়ে দেখেছ। কিন্তু আসল জিনিসগুলোই দেখনি। রঙের তফাতটা বেশ চোখে পড়েছে দেখলাম। আমি কিন্তু মেয়েদের আস্তিন আর পুরুষদের ট্রাউজার্সের হাঁটু আগে দেখি— অনেক খবর ওইখানেই থাকে। মেয়েটার আস্তিনে তুমি বেগনি দাগ দেখেছ, কিন্তু কবজির ঠিক ওপরে সমান্তরাল দুটো রেখা লক্ষ করনি— টাইপিস্ট টেবিলে হাত রাখলে[৯] এই দাগ দেখা যায়। সেলাই মেশিনেও হয়— তবে দাগটা তখন এতটা চওড়া হয় না। মেয়েটির নাকের দু-পাশেও প্যাঁসনে[১০] চশমার দাগ— যা থেকে বললাম চোখ খারাপ সত্ত্বেও টাইপের কাজ করেন কী করে। শুনে খুবই অবাক হলেন ভদ্রমহিলা।'

'আমিও।'

'অবাক আমিও হয়েছিলাম ভদ্রমহিলার জুতো দেখে। দু-রকমের জুতো পরেছিলেন। বোতামগুলোও সব লাগাননি। এক পাটিতে পাঁচটা বোতামের শুধু তলার দুটো লাগিয়েছেন। আরেক পাটিতে একনম্বর, তিননম্বর আর পাঁচনম্বর বোতাম লাগিয়েছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কীরকম ছুটতে ছুটতে তিনি এসেছিলেন।'

'আর কিছু?' যুক্তি আর বিশ্লেষণের চমক লাগে আমার মনে।

'আসবার আগে তাড়াতাড়ি করে একটা চিঠি লিখে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। দোয়াতে কলমটা একটু বেশিই ডুবিয়েছিলেন— আঙুলে তাই দাগ লেগেছিল। দস্তানা ছেঁড়া তুমি লক্ষ করেছিলে— কিন্তু দাগটা দেখনি। আজ সকালেই দাগটা লেগেছিল বলে অত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যাকগে সে-কথা, বিজ্ঞাপনের কাটিং থেকে হসমার এঞ্জেলের সুরতটা কীরকম একটু পড়ে শোনাও তো ওয়াটসন।'

আমি পড়লাম, 'গত, চোদ্দো তারিখ থেকে হসমার এঞ্জেল নামে এক ভদ্রলোককে পাওয়া যাচ্ছে না। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ভালো গড়ন, পাণ্ডুর বর্ণ, সামান্য টাক আছে, কালো গোঁফ আর জুলপি আছে, চুলের রংও কালো। রঙিন চশমা পরেন, ফিসফিস করে কথা বলেন। গায়ে কালো ফ্রককোট[১১], কালো ওয়েস্টকোট। ধূসর টুইডের ট্রাউজার্স আর সোনার অ্যালবার্ট চেন। পায়ে ইলাস্টিক বুট আর বাদামি চামড়ার পটি। লেডেনহল স্ট্রিটের একটা অফিসে কাজ করেন। যদি কেউ দয়া করে—'

'এতেই হবে', বলল হোমস চিঠিগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, 'মামুলি চিঠি। কিন্তু একটা ব্যাপার চোখে পড়ার মতো।'

'কী?'

'সব চিঠিই তো দেখছি টাইপ করা— তলায় হসমার এঞ্জেল নামটাও টাইপ করা। তারিখ আছে, ঠিকানা নেই। লেডেনহল স্ট্রিট নামটা আবছাভাবে লেখা। মোক্ষম প্রমাণ কিন্তু নামের সইটা।'

'কীসের প্রমাণ?'

'ভায়া ওয়াটসন, সইটাই এ-কেসের মোদ্দা রহস্য।'

'চুক্তি না-রাখার মামলায় সই অস্বীকার করবে বলেই নামটা টাইপ করেছে?'

'আরে না। যাকগে, দুটো চিঠি লিখতে হবে এখন। একটা লন্ডনের একটা কোম্পানিকে। আর একটা মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ককে— কাল সন্ধে ছ-টায় যেন দেখা করেন আমার সঙ্গে। দুটো চিঠির জবাব না-আসা পর্যন্ত এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়।'

হোমসের বিচার বুদ্ধি আর বিশ্লেষণী যুক্তির ওপর অগাধ আস্থা আমার। বেশ বুঝলাম, রহস্য আর রহস্য নেই ওর কাছে— তাই এত নিশ্চিন্ত।

পরের দিন রুগি নিয়ে কাটল সারাদিন। সন্ধে ছ-টা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে বেকার স্ট্রিটে ঢুকে দেখলাম, ইজিচেয়ারে গুটিসুটি মেরে ঝিমোচ্ছে বন্ধুবর— সামনে গাদা গাদা টেস্টটিউব। রাসায়নিক গবেষণায় বুঁদ[১২] হয়ে ছিল এতক্ষণ নিশ্চয়।

বললাম, 'ওহে, সমস্যার সমাধান হল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইসালফেট অফ ব্যারাইটা[১৩]।'

'আরে দুর! সেই কেসটার কী হল?'

'সে তো হয়েই রয়েছে। ওর মধ্যে আবার সমস্যা কোথায় দেখলে? তবে কী জানো, আইন নিয়ে শয়তানটার চুল পর্যন্ত ছোঁয়া যাবে না।'

'কে সে?'

জবাব শোনবার আগেই করিডরে ভারী পদশব্দ শুনলাম।

হোমস বললে, 'মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক এলেন। ছ-টার সময়ে আসবেন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।'

ঘরে ঢুকল মধ্যমাকৃতি এক ভদ্রলোক। বয়স বছর তিরিশ। দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ, রংটা একটু ফ্যাকাশে, ধূসর চোখে আশ্চর্য খরখরে দৃষ্টি।

অভিবাদন বিনিময়ের পর চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল আমার। মেয়েটা অযথা আপনাকে জ্বালাতন করে গেছে। বড্ড জেদি আর আবেগপ্রবণ। বারণ করা সত্ত্বেও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আসা উচিত হয়নি। অবশ্য আপনি পুলিশের লোক নন— কাজেই ঘরের কেলেঙ্কারি খুব বেশি পাঁচ কান হবে না। তা ছাড়া, হসমার এঞ্জেলকে খুঁজে পাওয়াও আর যাবে না।'

'আমার তো বিশ্বাস পাওয়া যাবে!'

উইন্ডিব্যাঙ্ক যেন আঁতকে উঠল। হাত থেকে দস্তানা ছিটকে গেল মেঝেতে, 'তাই নাকি! তাহলে তো খবর খুব ভালোই।'

'মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক, হাতের লেখার মতো টাইপ করে লেখারও জাত থাকে— আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। খুব নতুন না-হলে এক-একটা মেশিনে এক একরকম লেখা হয়। টাইপগুলো বিশেষভাবে ক্ষয়ে যায়, চোট খায়। যেমন ধরুন আপনার এই চিঠিই। E ভালো নয়, R-এর তলায় দোষ। এ ছাড়াও চোদ্দোটা বৈশিষ্ট্য আছে।'

কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে হোমসকে দেখতে দেখতে উইন্ডিব্যাঙ্ক বললে, 'অফিসের মেশিন, সব কাজ এতেই হয়।'

হোমস বললে, 'এবার এই চারখানা চিঠি দেখুন। সবগুলোই নিখোঁজ হসমার এঞ্জেল পাঠিয়েছে। প্রত্যেকটায় E খারাপ, R-এর তলায় গলদ। মাইক্রোস্কোপে দেখলে দেখবেন আরও চোদ্দোটা বৈশিষ্ট্য এতেও আছে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে উইন্ডিব্যাঙ্ক বললে, 'বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই। যদি তাকে ধরতে পারেন, আমাকে জানাবেন।'

ততোধিক বেগে এগিয়ে দরজার চাবি লাগিয়ে দিয়ে হোমস বললে, 'ধরে তো ফেলেছি।'

'কোথায়?' ফাঁদে আটকানো ইঁদুরের মতো চিমড়ে গেল উইন্ডিব্যাঙ্ক, সাদা হয়ে গেল ঠোঁট।

'ওতে সুবিধে হবে না, মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক। বসুন।'

ঘামতে ঘামতে বসে পড়ল উইন্ডিব্যাঙ্ক। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল যেন। বলল তোতলাতে তোতলাতে, 'কিন্তু কিস্সু করতে পারবেন না। এ-কেসে মামলা হয় না।'

'জানি। কিন্তু কাজটা খুব নোংরা। নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা। আমি বলে যাচ্ছি, আপনি শুনুন।'

উইন্ডিব্যাঙ্কের অবস্থা দেখে মনে হল যেন নাভিশ্বাস উঠেছে— মাথা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর। ম্যান্টলপিসের কোণে পা তুলে দিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন নিজের মনে কথা বলে গেল হোমস।

'বয়সে বড়ো মহিলাকে বিয়ে করেছিল একজন শুধু টাকার লোভে— মহিলাটির মেয়ের টাকাও সংসারে খরচ হচ্ছিল।'

'কিন্তু মেয়েটা বড়ো আবেগপ্রবণ আর জেদি। হাতে টাকা থাকায় বেশিদিন আইবুড়ি নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বছরে এক-শো পাউন্ড লোকসান হবে। তাই তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হত না। কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না। কিন্তু একদিন সে বেঁকে বসল নাচের আসরে যাবে বলে।'

'মেয়েটির মা আর সৎবাবা তখন জবর ফন্দি আঁটল। সৎবাবা ছদ্মবেশ ধরল। রঙিন চশমা পরে ধারালো চাহনি ঢাকা দিল। নকল গোঁফ আর জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা পালটাল। গলা শুনে যাতে চিনতে না-পারে, তাই ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। রাত্রে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করত এই কারণেই। চোখ খারাপ থাকায় মেয়েটিও কিচ্ছু ধরতে পারল না। এই হল গিয়ে হসমার এঞ্জেল। মেয়েটিকে দিয়ে বিয়ের চুক্তি করিয়ে নিয়ে অন্যের সঙ্গে বিয়ের পথ বন্ধ করা হল।

আকুল কণ্ঠে উইন্ডিব্যাঙ্ক বলল, 'আমরা একটু রগড় করতে চেয়েছিলাম। ও যে অমন মজবে কে জানত।'

'মেয়েটা সরল মনে ভাবতেও পারেনি কী নিষ্ঠুর খেলা হচ্ছে তাকে নিয়ে। ব্যাপারটাকে জমাটি করার জন্যে ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ চলল তার সঙ্গে। বাইবেল ছুঁইয়ে দিব্যি করানো হল— যাতে আর কাউকে মনে ঠাঁই না-দেয়। বিয়ের দিন কিছু একটা ঘটতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হল। ফ্রান্স যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে এবং বেশ কিছুদিন মেয়েটিকে মুহ্যমান রাখার জন্যে এবার বিয়ের খেলায় নামা হল। হসমার এঞ্জেল গাড়ির এ-দরজা দিয়ে ঢুকে ও-দরজা দিয়ে নেমে গেল। গির্জেয় পৌঁছে দেখা গেল গাড়ি ফাঁকা। কী মশাই, ঠিক ঠিক বলছি তো?'

উঠে দাঁড়াল উইন্ডিব্যাঙ্ক। নির্বিকার মুখে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'ঠিক হতে পারে, বেঠিকও হতে পারে। আপনার ঘটে এত বুদ্ধি আছে, কিন্তু এটুকু কেন বুঝছেন না যে আমার কাজে আইন ভাঙা হয়নি— কিন্তু আপনি আমাকে দরজা বন্ধ করে আটকে রেখে আইন ভাঙছেন।'

দরজা খুলে দিল হোমস।

বলল, 'কথাটা সত্যি। আইন আপনাকে শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু মেয়েটার যেকোনো বন্ধু পারে। এই ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে আগাগোড়া চাবকানো উচিত আপনাকে।'

মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলল উইন্ডিব্যাঙ্ক। দেখেই 'তবে রে' বলে দেওয়ালে ঝোলানো চাবুকের দিকে এগোল হোমস। পরমুহূর্তেই দুমদাম শব্দ শোনা গেল করিডর আর সিঁড়িতে, দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ হল নীচে। জানলা দিয়ে দেখলাম পড়ি কি মরি করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক।

হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে পড়ল হোমস।

বলল, 'লোকটা নিজের ফাঁদেই একদিন নিজে জড়িয়ে পড়বে, ফাঁসিকাঠে উঠবে। কেসটা কিন্তু সহজ হলেও বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'কিন্তু ধরলে কী করে বল তো?'

মোটিভ বিচার করে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে কার লাভ? না, মেয়েটির সৎ-বাবার। তাকে আর হসমার এঞ্জেলকে কখনো এক জায়গায় দেখা যায়নি— একজন না-থাকলে আরেকজনের আবির্ভাব ঘটেছে। ফিসফিস করে কথা বলা, জুলপি গোঁফ আর রঙিন চশমা কিন্তু ছদ্মবেশে কাজে লাগে। মোক্ষম প্রমাণ ওই নাম সই— হাতে লেখা নয়— টাইপ করা। কেন? না, হাতের লেখাটা এত চেনা যে দুটো শব্দ দেখলেও মেয়েটা চিনে ফেলতে পারে। সন্দেহগুলো যাচাই করলাম দুটো চিঠি লিখে। উইন্ডিব্যাঙ্কের অফিসের ঠিকানা জেনে নিয়ে চিঠি লিখলাম। বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় হসমার এঞ্জেলের মুখে জুলপি, গোঁফ আর রঙিন চশমার কথা আছে। ফিসফিস করে বলাটাও ছদ্মবেশ ধরতে কাজে লাগে। এইসব বাদ দিয়ে একটা বর্ণনা খাড়া করে জানতে চাইলাম এই ধরনের কেউ তাঁদের কোম্পানির ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কাজ করে। উইন্ডিব্যাঙ্ককে লিখলাম এখানে আসতে। তার জবাব এল। হসমার এঞ্জেলের চিঠির টাইপে যেসব গোলমাল, এর চিঠিতেও তাই লক্ষ করলাম। এদিকে কোম্পানির জবাবও এসে গেল। জেমস উইন্ডিব্যাঙ্কের চেহারার সঙ্গে আমার দেওয়া বর্ণনা মিলে যায়।'

'মিস সাদারল্যান্ডের এখন কী হবে?'

'কী আবার হবে— মেয়েদের ভুল ভাঙতে নেই[১৪]। বাঘিনীর বাচ্চা কেড়ে আনার মতো বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা।'

টীকা

১. **ছদ্মবেশীর ছলনা** : 'আ কেস অব আইডেনটিটি' ১৮৯১-এর সেপ্টেম্বর মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **বাঁধানো দাঁত ছুড়ে** : বাঁধানো দাঁত এভাবে ছুড়লে তা প্রথমদিনই ভেঙে যাওয়ার কথা। তাই এই ঘটনা দিনের পর দিন ঘটার সম্ভাবনা কতখানি, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেশ কিছু সমালোচক।

৩. **নস্যি** : হোমসকে অন্য কোথাও নস্যি নিতে দেখা যায়নি। তবে 'দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার' গল্পে শার্লকের দাদা মাইক্রফটকে দেখা গিয়েছে নস্যি নিতে। বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত নস্যি নিতেন। নস্যি নেন অদ্রীশ বর্ধনের লেখা গল্পের ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

৪. **চাকরের** : চাকরের উল্লেখ বেশ কয়েকটি গল্পে পাওয়া গেলেও, তার নাম বলা হয়েছে মাত্র খান-তিনেক গল্পে। নামটি হল বিলি।

৫. **গ্যাসফিটারের** : গ্যাসের পাইপ বা অন্য যন্ত্রাংশ বিষয়ক মিস্ত্রিকে গ্যাসফিটার বলা হয়।

৬. **লেডেনহল স্ট্রিট** : লেড (Lead) বা সিসার ছাউনি দেওয়া হল ঘরের নাম লেডেন হল। সেই হলের নামেই রাস্তার নাম, লন্ডনের এক খ্যাতনামা মেয়র ডিক হুইটিংটন শহরের তরফে এই হল কিনে নেন।

৭. **উনি রাজি হননি** : সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, হসমার এঞ্জেলের টাইপ করে লেখা চিঠির সম্পর্কে মিস সাদারল্যান্ড কিছু বলেননি কেন।

৮. **কাগজপত্র** : এই কাগজপত্র ঘেঁটেই ড. ওয়াটসন হোমসের কাহিনি লিখতেন কি না সঠিক বলা যায় না।

৯. **টাইপিস্ট টেবিলে হাত রাখলে** : একজন সমালোচক বলেছিলেন, ড্রেসিং টেবিল বা পিয়ানোতে হাত রাখলেও ও-রকম দাগ হওয়া সম্ভব।

১০. **প্যাঁসনে :** এই বিশেষ ধরনের চশমার বহুল ব্যবহার দেখা যেত ভিক্টোরীয় যুগে। অনেক গল্প-উপন্যাসে একটু মেয়েলি-গোছের পুরুষ চরিত্রদের প্যাঁসনে ব্যবহার করতে দেখা যেত। হোমসের গল্প, দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে-তে এইরকম একটি চশমা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা গিয়েছিল।

১১. **ফ্রককোট :** পুরুষদের ব্যবহার্য এই কোটের আসল বিশেষত্ব হল এর সামনে এবং পেছনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুল। এগুলি সাধারণত ডাবল-ব্রেস্টেড।

১২. **রাসায়নিক গবেষণায় বুঁদ :** 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসে ওয়াটসনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই হোমস তার এই অভ্যাস বা বদভ্যাসের কথা জানিয়েছিল ওয়াটসনকে।

১৩. **বাইসালফেট অব ব্যারাইটা :** রসায়নশাস্ত্রে সালফেট হল লবণ বা সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত কোনো পদার্থ। ব্যারাইটা হল বেরিয়াম সালফেট। বাইসালফেট অব ব্যারাইটা নামক যৌগিক পদার্থটির সম্পর্কে কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

১৪. **মেয়েদের ভুল... :** এই উক্তিটির সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায় বিখ্যাত পারসিক কবি হাফিজের একটি কবিতায়। হাফিজের সম্পূর্ণ নাম মহম্মদ সামসুদ্দিন হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯)।

বসকোম ভ্যালির প্রহেলিকা[১]

[দ্য বসকোম ভ্যালি মিস্ট্রি]

শার্লক হোমসের টেলিগ্রামটা[২] এল সকাল বেলা— আমি তখন স্ত্রীকে[৩] নিয়ে প্রাতরাশ খেতে বসেছি।

'দিন দুয়েকের জন্য বসকোম ভ্যালি[৪] যাবে? এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। তলব পড়েছে। প্যাডিংটন[৫] থেকে সওয়া এগারোটায় গাড়ি আছে।'

স্ত্রী-র উৎসাহে যাওয়াই মনস্থ করলাম। আফগানিস্তানে সামরিক জীবনে একটা জিনিস খুব ভালো রপ্ত করেছি। ঝট করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা হতে পারি। তাই যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম প্ল্যাটফর্মে পদচারণা করছে শার্লক হোমস। আঁটসাঁট ধূসর পোশাকে দীর্ঘ কৃশ শরীরটা আরও তালঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।

উঠে বসলাম ট্রেনে[৬]। কামরায় আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। তন্ময় হয়ে একগাদা কাগজ পড়ে চলল হোমস, মাঝে মাঝে কী সব টুকে নিতে লাগল। তারপর দলা পাকিয়ে কাগজের তাড়া বাঙ্কের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'কেসটা সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'কোনো কাগজই পড়িনি ক-দিন।'

'মনে হয় খুব সহজ, সেইজন্যেই খুব জটিল।'

'ধাঁধায় ফেললে দেখছি।'

'কিন্তু কথাটা খাঁটি। যে-কেস চোখে পড়ার মতো, জানবে জলের মতো সোজা। কিন্তু যা সাদাসিদে— গোলমাল তাতেই বেশি। এ-কেসে অভিযোগ আনা হয়েছে যিনি মারা গেছেন, তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে।'

'খুনের মামলা?'

'সেইরকমই মনে করা হয়েছে। কিন্তু তলিয়ে না-দেখা পর্যন্ত আমি সে-রকম কিছু মনে করার পাত্র নই। কেসটা শোনো।

'বসকোম ভ্যালির সবচেয়ে বড়ো জায়গিরদার হলেন জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়া[৭] থেকে অনেক টাকা রোজগার করে এনে জমিজমা কিনে চাষবাস করছেন। একটা গোলবাড়ি ভাড়া দিয়েছেন চার্লস ম্যাকার্থি নামে এক ভদ্রলোককে— ইনিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন। সেখানে আগে আলাপ ছিল— এখানেও তাই প্রতিবেশী হয়ে রয়ে গেলেন। টার্নারের টাকাপয়সা বেশি থাকলেও তা মেলামেশার অন্তরায় হল না। দুজনেরই বউ গত হয়েছেন। টার্নারের এক মেয়ে, ম্যাকার্থির এক ছেলে— দুজনেরই বয়স আঠারো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেউই খুব একটা মিশতেন না। টার্নারের বাড়িতে চাকরবাকর ছ-জন। ম্যাকার্থির দুজন।

'গত সোমবার তেসরা জুন ম্যাকার্থি বিকেল তিনটে নাগাদ বসকোম হ্রদে যান— চাকরকে বলে যান কার সঙ্গে নাকি দেখা করার কথা আছে। আর ফেরেননি।

'গোলাবাড়ি থেকে হ্রদ সিকি মাইল দূরে। দুজন দেখেছে ম্যাকার্থিকে যেতে। একজন বুড়ি— নাম জানা নেই। আর একজন বাগানের মালি। ম্যাকার্থির বেশ কিছু পেছনে তাঁর ছেলে জেমসকেও যেতে দেখেছে সে— হাতে বন্দুক ছিল। বাপকে যেন চোখে চোখে রেখে হাঁটছিল ছেলে।

'মালির মেয়েও দেখেছে বাপবেটাকে হ্রদের ধারে। বনের মধ্যে ফুল তুলছিল মেয়েটা। সেখান থেকেই দেখতে পায় কথা কাটাকাটি হচ্ছে বাপবেটায়— ছেলে এমনভাবে একবার হাত তুলল যেন এই বুঝি মেরে বসবে বাপকে। ভয়ের চোটে মেয়েটা দৌড়ে এসে মাকে সবে ঘটনা বলতে শুরু করেছে, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে জেমস এসে বললে— বাবাকে এইমাত্র মরে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে বনের ধারে। জেমসের তখন বিহ্বল অবস্থা, মাথায় টুপি নেই, বগলে বন্দুক নেই, হাতে আর আস্তিনে কাঁচা রক্ত লেগে আছে। জেমসের সঙ্গে গিয়ে দেখা গেল, সত্যিই ম্যাকার্থির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে হ্রদের ধারে— খুব ভারী কিন্তু ভোঁতা ধরনের কোনো অস্ত্র দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘা মেরে খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেন ছেলের বন্দুকের কুঁদোর মার। বন্দুকটাও পাওয়া গেল একটু তফাতে ঘাসের ওপর। ছেলেকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সব শুনে আমি বললাম, 'এ অবস্থায় জেমসকেই দোষী বলতে হয়।'

'সেভাবে দেখতে গেলে হয়তো অবিচারই করা হবে। জেমস দোষী হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। শুধু পরিস্থিতি দেখলে হবে না, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। টার্নারের মেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছে। তারই নির্বন্ধে আমার এখন ছুটতে হচ্ছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে।'

'কিন্তু হালে পানি পেলে হয়— শেষ পর্যন্ত তোমাকে সুনাম খোয়াতে হবে মনে হচ্ছে। কেস তো জলের মতো পরিষ্কার।'

হাসল হোমস। বলল, 'পরিষ্কার ব্যাপারেই অনেক কিছু চোখের বাইরে থেকে যায়। লেসট্রেড যা দেখেনি, আমার চোখে তা পড়তে পারে। যেমন ধর না কেন তোমার শোবার ঘরের জানলাটা যে ডান দিকে, এ জিনিস হয়তো লেসট্রেডের চোখ এড়িয়ে যাবে— কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি।'

সত্যিই অবাক হলাম, 'কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'তোমার নাড়িনক্ষত্র জানি যে আমি। মিলিটারিতে থাকার ফলে পরিষ্কার থাকা তোমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ দাড়ি কামাও। এইসব মাসে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কামাও। কিন্তু দেখছি তোমার দাড়ি তেমন কামানো হয়নি। তার মানে কি এই নয় যে, যে-জানলায় দাঁড়াও সেখানে রোদ থাকে না সকালে? খুঁটিয়ে দেখলে এমনি অনেক কিছু আবিষ্কার করা যায়, এই কেসেও সে-সুযোগ আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'কীরকম?'

'ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোলাবাড়ি ফিরে আসার পর— অকুস্থলে নয়। তখন সে বলেছিল, সে নাকি জানত তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে।'

'তার মানেই খুনের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া হল।'

'কিন্তু তারপরেই বলেছে খুন সে করেনি।'

'কিন্তু তাতে সন্দেহ যায় না— বরং বাড়ে।'

'মোটেই না— সন্দেহ একেবারে চলে যায়। গ্রেপ্তারের সময়ে মেজাজ দেখালেই বরং সন্দেহ হত— পাগলকে পাগল বললেই রেগে যায়। কিন্তু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরেই বাপ খুন হয়েছে— সুতরাং যে কেউ বলবে খুনি সে-ই— এই সোজা কথাটা সোজা ভাবে যে বলতে পারে, বুঝতে হবে তার মনে পাপ নেই।'

'কিন্তু ফাঁসি কি আটকানো যায়? এর চেয়ে কম সন্দেহের জোরে অনেকে ফাঁসিকাঠে উঠেছে।'

'অন্যায় সন্দেহেও অনেকে ফাঁসিতে ঝুলেছে।'

'ছেলেটি কী বলে?'

'এই কাগজটা পড়লেই বুঝবে,' বলে কাগজের তাড়ার একটা জায়গা আমাকে দেখিয়ে দিল হোমস।

জেমস ম্যাকার্থি গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছিল। এটা সেই জবানবন্দি। সে বলেছে :

তিন দিন পরে বাড়ি ফিরে দেখলাম বাবা বাড়ি নেই। একটু পরে গাড়ির আওয়াজ শুনে দেখলাম, বাবা ফিরেছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই হনহন করে ফের বেরিয়ে গেল। কোন দিকে গেল বুঝতে পারলাম না। বন্দুক নিয়ে আমি বেরোলাম হ্রদের পাড়ে গিয়ে খরগোশ শিকার করব বলে। রাস্তায় মালির সঙ্গে দেখা হল। আমি বাবার পেছনে পেছনে চলেছিলাম, সে বলেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমি জানতামই না বাবা আমার সামনে আছে। হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে একটা 'কু' ডাক শুনলাম। এভাবে বাবা আমাকে ডাকে— আমিও বাবাকে ডাকি। তাই হনহন করে এগিয়ে গিয়ে দেখি লেকের ধারে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে অবাক হল, রেগে গেল, মারতে এল। বাবার মেজাজ খুব উগ্র। আমি তাই কথা না-বাড়িয়ে চলে এলাম। কিন্তু কিছুদূর আসতে-না-আসতেই বিকট চিৎকার শুনলাম পেছনে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম সাংঘাতিক জখম হয়েছে বাবা— মাথা ছাতু হয়ে গেছে বললেই চলে! বন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিলাম, বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম, প্রায় সঙ্গেসঙ্গে মারা গেল বাবা। কাছেই বাড়িটা মি. টার্নারের— মিনিট কয়েক বসে থাকার পর গেলাম সেখানে। সব বললাম। বাবার শত্রু নেই, এটুকু আমি জানি। বন্ধুও তেমন নেই।

করোনার[৮] তখন জিজ্ঞেস করে, 'প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাবা কিছু বলেছিলেন?'

'ইঁদুর সম্বন্ধে কী যেন বলছিল।'

'মানে কি বুঝলে?'

'ভুল বকছিল।'

'বাবার সঙ্গে ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?'

'বলব না।'

'বলতেই হবে।

'তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সেটা কোর্ট বুঝবে। জবাব না-দিলে তোমার ক্ষতি হবে।'

'হোক।'

'কু ডাক দিয়ে বাবা তোমাকে ডাকত, তুমিও বাবাকে ডাকতে?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু বাবা তো জানতেন না তুমি বাড়ি ফিরেছ? ডাকলেন কেন?'

ঘাবড়ে গেল জেমস। বললে, 'বলতে পারব না।'

'বিকট চিৎকার শুনে ফিরে এসে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলে?'

'সে-রকম কিছু দেখিনি।'

'তাহলে কী দেখেছিলে?'

'আমি তখন পাগলের মতো বাবার দিকে দৌড়োচ্ছি— কোনোদিকে খেয়াল নেই। সেই সময়ে মনে হল যেন বাঁ-দিকে ধূসর রঙের কী-একটা পড়ে আছে— অনেকটা আলখাল্লার মতো। বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটা আর দেখিনি।'

'মি. টার্নারের বাড়ি যাওয়ার আগেই দেখলে জিনিসটা নেই।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক কী বলে মনে হয় জিনিসটা?'

'কাপড়ের মতো কিছু।'

'ডেডবডি থেকে কত তফাতে?'

'প্রায় বারো গজ তফাতে।'

'বন সেখানে কদ্দূর?'

'ওইরকমই।'

'তাহলে বলতে চাও তুমি থাকতে থাকতেই জিনিসটা উধাও হয়ে গেল?'

'আমি কিন্তু সেদিকে পেছন করে বসে ছিলাম।'

জেরা এইখানেই শেষ।

পড়া শেষ করে বললাম, 'করোনার ঠিক ঠিক পয়েন্টেই চেপে ধরেছে। এক, বাবা তাকে দেখেনি, অথচ ডাকল কেন? দুই, ঝগড়ার বৃত্তান্ত চেপে যাওয়া। তিন, মরবার সময়ে ইঁদুর সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন ম্যাকার্থি— মানেটা ছেলে বোঝেনি।'

হোমস হাসিমুখে বললে, 'যে-অসংগতিগুলো দেখে তুমি আর করোনার খড়্গহস্ত হয়েছ

ছেলেটির ওপর— সেগুলোই কি ওর সত্যি কথা বলার প্রমাণ? পুরো ব্যাপারটা বানিয়ে বলার মতো কল্পনাশক্তিই যদি ওর থাকত, তাহলে ওই তিনটে অসংগতি চাপাচুপি দিয়ে চমৎকার তিনটে গল্প শুনিয়ে দিতে পারত। মিথ্যে যে বলে, সে কি গল্পের মধ্যে সন্দেহের বীজ রেখে উদ্ভট অসংগতি শোনাতে চায়? না হে, ছেলেটা সত্যিই বলেছে। এখন আর এ নিয়ে কোনো কথা নয়। এই বইটা পড়তে বসলাম, বিশ মিনিটে সুইনডনে[৯] পৌঁছে লাঞ্চ খাব।'

রস শহরে যথাসময়ে পৌঁছোলাম। বেজির মতো ক্ষিপ্র, ইনস্পেকটর লেসট্রেড[১০] দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে। চোখে সেয়ানা চাহনি! আগে নিয়ে গেল সরাইখানায়। ঘর ঠিক করাই ছিল। চা খেতে খেতে বললে, 'এখুনি গাড়ি আসছে। সোজা অকুস্থলে চলুন।'

'আজ রাতে গাড়ির দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'তাই বলুন। কাগজ পড়েই তাহলে সমাধানে পৌঁছে গেছেন? খুবই সোজা কেস। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা। আপনার সঙ্গে কথা না-বলা পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না।— এই যে এসে গেছে।'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সরাইখানায়। হুড়মুড় করে ঢুকল একজন পরমাসুন্দরী তরুণী। উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠায় সামলাতে পারছে না নিজেকে।

'মি. শার্লক হোমস?' পর্যায়ক্রমে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হোমসকে ঠিক চিনে নিল মেয়েটা, 'খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাকে দেখে। জেমস নির্দোষ। এইটুকু বয়স থেকে ওকে চিনি। মাছি পর্যন্ত যে মারতে পারে না, সে করবে খুন? মি. হোমস, শুধু এই বিশ্বাস নিয়েই আপনি তদন্ত শুরু করুন।'

'নিশ্চয় করব, জেমস যে নির্দোষ তাও প্রমাণ করব।'

'ওর জবানবন্দি পড়ে কি আপনার মনে হয়নি ও নির্দোষ?'

'সেইরকমই মনে হয়েছে।'

'কী! বলেছিলাম না?' লেসট্রেডের দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে মেয়েটা।

লেসট্রেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, 'মি. হোমস একটু তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন।'

'কিন্তু হক কথা বলেছেন। জেমস নির্দোষ। বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা কেন বলেনি জানেন? ওর মধ্যে আমিও আছি বলে।'

'কীরকম?' শুধোয় হোমস।

'জেমসের বাবা চান আমার সঙ্গে জেমসের বিয়ে হোক। কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকে ভাইবোনের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে এসেছি। বাপবেটায় প্রায়ই ঝগড়া হত এই নিয়ে।'

'তোমার বাবা কী বলত?'

'তার মত নেই। জেমসের বাবা ছাড়া কারোরই মত নেই,' বলতে বলতে সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে গেল মিস টার্নারের।

'কালকে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।'

'ডাক্তার রাজি হবেন বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'গত কয়েক বছর ধরেই শরীর খুব খারাপ। তারপর এই ধাক্কায় একেবারে বিছানা নিয়েছেন।

হাল ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। ভিক্টোরিয়ায়[১১] থাকার সময় থেকেই তো বন্ধুত্ব মিস্টার ম্যাকার্থির সঙ্গে।'

'ভিক্টোরিয়ায়? খবরটা কাজে লাগবে।'

'খনির কাজে ছিলেন।'

'সোনার খনি[১২], তাই না? টাকা রোজগার করেছেন সেইখানেই?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। এ-খবরটাও কাজে লাগবে।'

'জেমসের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যাবেন জেলখানায়? ওকে বলবেন আমি জানি ও নির্দোষ।'

'বলব, নিশ্চয় বলব!'

'আর বসব না, চলি। বাবার অবস্থা ভালো নয়।' বলতে বলতে বেগে বেরিয়ে গেল মিস টার্নার। একটু পরেই শুনলাম চাকার আওয়াজ— মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

গম্ভীর গলায় লেসট্রেড বললে, 'কাজটা ভালো করলেন না মি. হোমস। মিথ্যে আশা দিলেন মেয়েটাকে!'

'লেসট্রেড, জেমসকে খালাস করতে পারব এ-বিশ্বাস আমার আছে। জেলখানায় গিয়ে দেখা করার অনুমতি পাব কি আমি?'

'শুধু আপনি আর আমি পাব।'

'তাহলে চল বেরিয়ে পড়া যাক। ট্রেন পাওয়া যাবে?'

'পাবেন।'

'ওয়াটসন, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরছি আমি।'

এই দুটো ঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইল না আমার। ওদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে সরাইখানায় ফিরলাম। চটকদার উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন চলে আসতে লাগল খুনের রহস্যে। বিরক্ত হয়ে বই ফেলে ভাবতে বসলাম। হোমসের খাতিরেই যদি ধরি ছেলেটা সত্যি বলছে, তাহলে সে বাবার কাছ থেকে চলে আসার সময় থেকে আরম্ভ করে বাবার চিৎকার শুনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছিল। আবার, বাবার কাছে পিছন ফিরে বসে থাকার সময়েও কেউ সেখানে এসে পেছন থেকে ধূসর জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! জিনিসটা কী? খুনির পোশাক? আমি নিজে ডাক্তার। কাজেই আঘাতের ধরনটা অনুধাবন করতে গিয়ে দেখলাম, চোট লেগেছে খুলির পেছনকার বাঁ-দিকের হাড়ে— গুঁড়িয়ে গেছে গুরুভার অস্ত্রের আঘাতে। অথচ ছেলেটিকে দেখা গেছে বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে। অবশ্য এ-যুক্তির কোনো মানে নেই। বাপ পেছন ফিরতেই হয়তো হাতিয়ার চালিয়েছিল জেমস। কিন্তু মরবার ঠিক আগে ইঁদুর নিয়ে বিড়বিড় করতে গেলেন কেন মি. ম্যাকার্থি? এ সময়ে আচমকা আঘাতে কেউ তো আবোল-তাবোল বকে না? কী বলতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক?

হোমস একা ফিরল অনেক দেরিতে— লেসট্রেড শহরে থেকে গেছে।

আসন গ্রহণ করে বললে, 'অকুস্থলে পৌঁছোনোর আগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ব।— জেমসের সঙ্গে দেখা হল জেলখানায়।'

'কী মনে হল? অন্ধকারে আলো দেখাতে পারল জেমস?'

'একেবারেই না। প্রথমে মনে হয়েছিল খুনিকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। পরে দেখলাম নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। খুব চৌকস নয় ছেলেটা, কিন্তু সুদর্শন। মনটা পরিষ্কার।'

'মিস টার্নারের মতো মেয়েকে বিয়ে করতে যে চায় না, তার পছন্দরও খুব একটা তারিফ করা যায় না।'

'ওহে ওর মধ্যেও একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা রয়েছে। ছোকরা বোর্ডিং স্কুলে থাকার সময়ে ব্রিস্টলের একটা হোটেলের মেয়ের পাল্লায় পড়ে। তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে পর্যন্ত করে। বোকা আর বলে কাকে। কাউকে কথাটা বলাও যাচ্ছে না। এদিকে বদমেজাজি বাবার কাছে ধমক খেতে হচ্ছে মিস টার্নারকে বিয়ে করতে চাইছে না বলে। হাত-পা ছুড়ে লেকের পাড়ে প্রতিবাদ জানিয়েও লাভ হয়নি। সত্যি কথাটা বললেই তো বাড়ি থেকে বার করে দেবে বাবা— গুমরে গুমরে তাই মরছে। তিন দিন ব্রিস্টলে স্ত্রী-র সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পরেই খুন হয়ে গেল বাবা। কাগজে খবরটা পড়ল হোটেলের মেয়ে। জেমসের ফাঁসি হবেই বুঝতে পেরে নিজে থেকেই কেটে পড়ল। চিঠি লিখে জানিয়েছে, ওর আগের স্বামী বর্তমান— কাজেই জেমসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'বেশ তো, জেমস যদি খুন না-করেই থাকে, তাহলে করলটা কে?'

'দুটো ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে বলব। এক নম্বর হল, জেমসের বাবা জানতেন না ছেলে বাড়ি ফিরেছে— তা সত্ত্বেও তিনি "কু" করে ডেকেছিলেন। দু-নম্বর হল, লেকের পাড়ে যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে আর যেই হোক তাঁর ছেলে নয়— কারণ উনি জানতেন ছেলে এ-তল্লাটেই নেই। আজ আর এ-নিয়ে কোনো কথা নয়।'

সকাল বেলা গাড়ি নিয়ে এল লেসট্রেড। আকাশ নির্মেঘ। রাতেও বৃষ্টি হয়নি। গোলাবাড়ি আর হ্রদের দিকে রওনা হলাম আমরা।

যেতে যেতে লেসট্রেড বললে, 'মি. টার্নার আর বাঁচেন কি না সন্দেহ।'

'বয়স অনেক হয়েছে বুঝি?' হোমস বললে।

'ষাট বছর তো বটেই। শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন বিদেশে থাকার সময়ে। এমনিতেই কাহিল ছিলেন, বন্ধু ম্যাকার্থির মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। বন্ধুর জন্যে কম করেননি— গোলাবাড়ির ভাড়া পর্যন্ত নেন না।'

'বটে। খবরটা শুভ।'

'বিনা ভাড়ায় শুধু থাকতেই দেননি, আরও অনেক উপকার করেছেন ম্যাকার্থির— পাঁচজনে বলেছে।'

'তাই নাকি! একটা ব্যাপারে কি তোমার খটকা লাগেনি লেসট্রেড?'

'কী বলুন তো?'

'এত উপকার করা সত্ত্বেও মেয়ের সঙ্গে মি. ম্যাকার্থির ছেলের বিয়ে দিতে মি. টার্নার রাজি নন। অথচ মি. ম্যাকার্থি বিয়ের কথা সমানে বলে যাচ্ছেন— যেন খুবই স্বাভাবিক প্রস্তাব। মেয়েটি কিন্তু মি. টার্নারের সব সম্পত্তি পাবে। কী? আঁচ করতে পারলে?'

'ঘটনার ঠেলায় অস্থির হয়ে পড়েছি, আঁচ করার হেপাজত আর পোয়াতে পারব না।'

'তা ঠিক। ঘটনার ঠেলায় তুমি হিমশিম খাচ্ছ, গম্ভীর গলা হোমসের।'

চটে গেল লেসট্রেড। 'আপনি কিন্তু এখনও মরীচিকা দেখছেন। যা ভাবছেন, তা নয়।'

'কুয়াশার চাইতে তো ভালো!' হেসে বললে হোমস। 'এই যে, এসে গেছে গোলাবাড়ি।'

বেশ বড়ো গোলাবাড়ি। দোতলা। সদ্য শোকের ছাপ সর্বত্র। দরজায় ধাক্কা দিতেই ঝি বেরিয়ে এল। হোমস তার কাছে দু-জোড়া জুতো চাইল। মারা যাওয়ার সময়ে মি. ম্যাকার্থি যে বুট পরে ছিলেন, সেইটা। আর তাঁর ছেলের একজোড়া বুট।

'কাজের মেয়েটি আমাদের জুতোগুলো দেখাল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

জুতো এল। ফিতে বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাত আট রকম মাপ নিল হোমস। তারপর রওনা হলাম লেকের দিকে।

এবং পালটে গেল ওর চোখ-মুখের চেহারা। বরাবর দেখেছি এই ধরনের সন্ধানী অভিযানে নামলেই ও যেন শিকারি কুকুরের মতো আত্মনিমগ্ন আর হন্যে হয়ে উঠে। তখন কারো কথা কানে ঢোকে না— বেশি কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে। ভুরু কুঁচকে ইস্পাত-কঠিন চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে, দু-কাঁধ বাঁকিয়ে, নাকের পাটা ফুলিয়ে হনহন করে হেঁটে যায় হেঁট মাথায়।

এইভাবেই মাঠে নামল, গেল লেকের ধারের জঙ্গলে। জলা জায়গায় অসংখ্য পদচিহ্ন। হোমসের নজর সব দিকেই। কখনো জোরে যাচ্ছে, কখনো আস্তে। মাঠটাকেও চক্কর দিয়ে এল একবার। রকম-সকম দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসছে লেসট্রেড। আমার কৌতূহল কিন্তু বেড়েই চলেছে। শার্লক হোমসকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। অকারণে সে কিছু করে না।

বসকোম লেকটাকে একটা বড়োসড়ো দিঘি বললেই চলে। একদিকে জায়গিরদার মি. টার্নারের বাড়ি আর একদিকে মি. ম্যাকার্থির গোলাবাড়ি। লেক ঘিরে আগাছা, ঘাস, জঙ্গল আর জলাজমি। এইখানে একটা ঘাস জমির ওপর পাওয়া গেছে মৃতদেহ। বেশ ভিজে জায়গা। হোমস শিকারী কুকুরের মতো আবার দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছে। অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে। ঘাসজমির উপর পায়ের দাগ বিস্তর।

হঠাৎ ফিরল লেসট্রেডের দিকে, 'এখানে কী করতে এসেছিলে?'

'দেখছিলাম হাতিয়ারটা যদি পাওয়া যায়।'

'খুব কাজ করেছ! পায়ের ছাপগুলোর বারোটা বাজিয়ে বসে আছ। নিজের পায়ের ছাপেই সব জায়গা ভরিয়ে তুলেছ! উফ! এর চাইতে একপাল মোষ এলেও[১৩] বুঝি এ-রকম হত না! চিনতে পারছ এই জুতোর দাগটা? তোমার জুতো! আর এই যে বনরক্ষক মশায় দলবল নিয়ে কর্তব্য করে গেছেন— এখানে— ডেডবডির চারধারে ছয় থেকে আট ফুট পর্যন্ত জায়গায় যত পায়ের ছাপ ছিল, মাড়িয়ে দফারফা করে গেছেন। আ! এই যে একজোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। একদম আলাদা দাগ দেখছি,' বলতে বলতে ভিজে মাটিতে বর্ষাতি বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল হোমস। আতশকাচ বার করে মাটির ওপরকার বুট চিহ্ন দেখতে দেখতে যেন স্বগতোক্তি করে বলল, 'এই হল গিয়ে ছেলেটার জুতোর দাগ। দু-বার যাতায়াত করেছে— তারপরে টেনে দৌড়েছে— দৌড়েছে বলেই গোড়ালির ছাপ প্রায় ওঠেনি— চেটোর ওপরেই ভর পড়েছে বেশি। তার মানে, ছোকরা খাঁটি কথাই বলেছে। বাপের চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিল। আর এইখানে পায়চারি করছিলেন মি. ম্যাকার্থি। পাশেই বন্দুকের কুঁদোর দাগ— বাপ বেটায় কথা হচ্ছিল এখানে। আরে! আরে! ওইটা আবার কী! বুটের মালিক একবার এল— আবার গেল— আবার এসেছে দেখছি... ও হ্যাঁ, আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু এল কোত্থেকে? দেখা যাক।'

চেনা গন্ধ পেয়ে ব্লাড হাউন্ড যেভাবে নাক নামিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়, হোমসও এবার সেইভাবে মাটি দেখতে দেখতে দৌড়োতে লাগল। পেছনে ছুটলাম আমরা। এসে পৌঁছোলাম বনের ধারে। আরও কিছুদূর গেল হোমস। ফের সটান উপুড় হয়ে শুয়ে মাটি পরীক্ষা করল আতশকাচ দিয়ে। শুকনো পাতা-টাতা সরিয়ে ধুলোর মতো খানিকটা বস্তু নিয়ে খামের মধ্যে ভরল। খুশিতে চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আশপাশ আবার দেখল আতশকাচের মধ্যে দিয়ে। এবড়োখেবড়ো একটা পাথর নিয়েও তন্ময় হয়ে রইল অনেকক্ষণ। শ্যাওলার মধ্যে পড়ে ছিল পাথরটা। গেল বড়োরাস্তা পর্যন্ত।

ফিরে এসে সহজ গলায় বললে, 'ইন্টারেস্টিং মামলা। ডান হাতি বাড়িটা নিশ্চয় মি. টার্নারের। তোমরা এগোও— আমি আসছি মি. টার্নারের বাড়ির সরকারের সঙ্গে দেখা করে। একটা চিঠি লিখে আসতে হবে।'

মিনিট দশেক পরে হোমস এল। গাড়ি ছুটল শহরের দিকে।

হোমসের হাতে শ্যাওলায়-পড়ে-থাকা সেই পাথরটা দেখলাম। লেসট্রেডের হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই নাও হত্যার হাতিয়ার।'

'কী করে বুঝব যে এটা দিয়েই খুন করা হয়েছিল? গায়ে তো কোনো দাগ দেখছি না।'

'না, দাগ নেই। কিন্তু এটা যেখানে পড়ে ছিল, তার তলায় ঘাস ছিল। কোত্থেকে তুলে এনে ফেলা হয়েছে, তাও দেখতে পাইনি। যে ধরনের চোট দেখা গেছে খুলিতে, এই পাথর দিয়েই তা সম্ভব।'

'খুনটা করেছে কে?'

'সে মাথায় বেশ ঢ্যাঙা, ল্যাটা, ডান পা টেনে চলে, পুরু সোলের শিকারের বুট পরে, গায়ে ধূসর আলখাল্লা আছে, নলে ভারতীয় চুরুট লাগিয়ে খায়, পকেটে ভোঁতা পেনসিলকাটা ছুরি রাখে। এতেই হবে তোমার।'

হেসে ফেলল লেসট্রেড, 'আদালতে গ্রাহ্য হবে না যা বললেন। কল্পনা দিয়ে কারবার করলে চলে না আমাদের।'

আস্তে আস্তে হোমস বললে, 'তাহলে তুমি তোমার পদ্ধতিতে কাজ চালাও— আমি চালাই আমার পদ্ধতিতে। সন্ধের ট্রেনে লন্ডন ফিরব ভাবছি।'

'সে কী! তদন্ত শেষ না-করেই যাবেন?'

'আরে না, শেষ করেই যাব।'

'সমস্যার সমাধান?'

'সে তো হয়ে গেছে।'

'খুনি কে?'

'যার বর্ণনা দিলাম।'

'তার নাম?'

'খুঁজলেই পেয়ে যাবে— খুব একটা লোকজন এ-তল্লাটে নেই।'

'দুর মশায়! খোঁড়া ল্যাটার সন্ধানে টো টো করলে হেসে কুটিপাটি হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড!'

হোমস শুধু বলল, 'সূত্র দিয়ে দিলাম— আমার কর্তব্যও শেষ হল। এসে গেছে তোমার আস্তানা।'

নেমে গেল লেসট্রেড। আমরা ফিরলাম সরাইখানায়। খেতে বসে বিশেষ কথা বলল না হোমস। মুখ দেখে বুঝলাম, দোটানায় পড়েছে।

খাওয়া শেষ হল। চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, এ মামলায় দুটো অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার শুনে নিশ্চয় তোমার খটকা লেগেছে। এক হল, "কু" ডাক। দুই, মরবার সময়ে "ইঁদুর" শব্দটা বলা। "কু" ডাকটা অস্ট্রেলিয়ায় চালু আছে। সেখানে একজন আর একজনকে এইভাবে ডাকে। মি. ম্যাকার্থি যাকে ডেকেছিল, সে-ও তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকত। সেখানেই দুজনের পরিচয়। দেখাও করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে— ছেলেকে ডাকেননি।'

'ইঁদুর-ইঁদুর করে মারা গেলেন কেন?'

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টেবিলে বিছিয়ে ধরল হোমস।

বলল, 'এই হল ভিক্টোরিয়া কলোনির ম্যাপ। ব্রিস্টলে কাল চিঠি লিখে আনিয়েছি।' ম্যাপের এক জায়গা হাত চাপা দিয়ে— 'কী আছে পড়ো তো?'

'ARAT'

হাত তুলে বলল, 'এবার?'

'BALLARAT'[১৪]

'এই নামটাই[১৫] মরবার আগে বলেছিলেন মি. ম্যাকার্থি— ছেলে শুধু শুনতে পায় শেষটুকু। নামটা নিশ্চয় খুনির।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'তিন নম্বর অদ্ভুত ব্যাপার হল সেই ধূসর জিনিসটা— যা একটা আলখাল্লা। তাহলে, ব্যালারাট নামে এক অস্ট্রেলিয়াবাসী গায়ে ধূসর আলখাল্লা চাপিয়ে ডাঙশ মারার মতো পাথর হাঁকিয়ে খুন করে গেছে মি. ম্যাকার্থিকে। পরিষ্কার?'

'নিশ্চয়।'

'এ-অঞ্চল তার নখদর্পণেও বটে। কেননা লেকে পৌঁছোনোর দুটোই তো কেবল রাস্তা— একটা গোলাবাড়ি থেকে, আর একটা মি. টার্নারের বাড়ি থেকে।'

'ঠিক, ঠিক।'

'জমি পরীক্ষা করে খুনির দেহের যে-বর্ণনা মাথামোটা লেসট্রেডকে শোনালাম, তুমিও তা শুনেছ।'

'শুনেছি ঠিকই, কিন্তু কীভাবে অত খবর জানলে বুঝিনি। কতখানি লম্বা, সেটা না হয় দুটো পায়ের ছাপের মধ্যে ফাঁকটা দেখে আন্দাজ করলে। জুতোর চেহারাও ছাপ দেখে বলা যায়। কিন্তু এক পায়ে খোঁড়া জানলে কী করে?'

'ডান পা সবসময়ে আলতোভাবে জমি ছুঁয়ে গেছে— চাপ পড়েনি। পা টেনে চলে বলেই অমন হয়েছে।'

'কী করে বললে সে ল্যাটা?'

'খুলির পেছনে হাড় কীভাবে গুঁড়িয়েছিল, তুমি জান। চোট লেগেছিল বাঁ-দিক ঘেঁষে। অর্থাৎ বাঁ-হাতে পাথর মেরেছে খুনি। বাপ-বেটায় ঝগড়ার সময়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে চুরুট খেয়েছে আর ছাই ঝেড়েছে। ১৪০ রকম তামাকের ছাই নিয়ে একটা প্রবন্ধ এককালে লিখেছিলাম। তাই ছাই দেখেই বুঝলাম, ইন্ডিয়ান সিগার। কিছুদূরে পেলাম চুরুটের গোড়া— ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'নলে লাগিয়ে খাওয়া হয়েছে বুঝলে কী করে?'

'গোড়াটায় দাঁতের কামড় নেই— নিশ্চয় নলে লাগানো হয়েছিল। যে-ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, সেটা ভোঁতা— কেননা, কাটাটা অসমান।'

'বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ। খুনি হলেন—'

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে গেল। হোটেলের চাকর একজন আগন্তুককে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'মি. জন টার্নার।'

ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখবার মতো। বার্ধক্যের ভারে কাঁধ ঝুলে পড়েছে, পা টেনে টেনে

হাঁটছেন, বলিরেখা আঁকা রুক্ষ মুখটি কিন্তু দুর্জয় মনোবলের প্রতিচ্ছবি। দাড়িতে জট, কার্নিশের মতো জটিল ভুরু— খানদানি, শক্তিমান চেহারা। কিন্তু মুখে যেন রক্ত নেই, ঠোঁট আর নাকের খাঁজ নীল হয়ে এসেছে। নিশ্চয় ছিনেজোঁক রোগের খপ্পরে পড়েছেন দীর্ঘদিন।

প্রশান্ত কণ্ঠে হোমস বললে, 'চিঠি পেয়েছেন তাহলে। বসুন।'

'আপনি লিখেছেন, কেলেঙ্কারি যদি না-চাই, তাহলে আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি।'

'নিজে আপনার কাছে যায়নি ওই কারণেই।'

'বলুন কেন ডেকেছেন?' কথাটা জিজ্ঞেস করলেন বটে, কিন্তু ক্লান্ত আর হতাশ চোখ দেখে মনে হল জবাবটা তিনি জানেন।

চোখে চোখে চেয়ে হোমস বললে, 'ম্যাকার্থি ঘটিত সব ব্যাপার আমি জানি!'

দুই করতলে মুখ লুকিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ টার্নার।

বললেন জড়িত স্বরে, 'কিন্তু জেমসের সর্বনাশ হতে আমি দেব না। যদি দেখি বিনা পাপে তার শাস্তি হচ্ছে, ঠিক করেই রেখেছি সব কবুল করব।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'এতদিন কবুল করিনি মেয়েটার কথা ভেবে। বুক ভেঙে যাবে আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনলে।'

'কিন্তু অতদূর জল গড়ালে তো।'

'তার মানে?'

'দেখুন মশায়, আমি সরকারের নুন খাই না। এ-কেসে নাক গলিয়েছি স্রেফ আপনার মেয়ের পীড়াপীড়িতে। আপনার মেয়ে যা চায়, আমিও তাই চাই— জেমসের গায়ে যেন আঁচ না-লাগে।'

'মি. হোমস, বহুমূত্র রোগে[১৬] আমি শেষ হয়ে এসেছি— বড়োজোর আর মাসখানেক আমার আয়ু। মৃত্যুটা বাড়িতেই হোক, এই আমি চাই— জেলে যেন না হয়।'

কলম আর কাগজ নিয়ে হোমস বললে, 'আপনি বলুন কী করেছিলেন, আমি লিখে নিচ্ছি। সাক্ষী ওয়াটসন। জেমসকে যদি কোনোমতেই আর বাঁচানো না-যায়, শুধু তখনই প্রকাশ করব এই স্বীকারোক্তি।'

'শুধু দেখবেন, অ্যালিস যেন এই ঘটনা শুনে কষ্ট না-পায়। অবশ্য মামলা শেষ হওয়ার আগেই আমি শেষ হয়ে যাব।'

'এই ম্যাকার্থি শয়তানটাকে আপনারা কেউই চেনেন না। গত বিশ বছর ধরে সে আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছিল।'

'ষাট দশকের গোড়ার দিকে আমরা ডাকাতি করতাম। রক্ত তখন গরম। অসৎ সংসর্গে মিশে ছ-জনের দল গড়লাম। চলন্ত গাড়ি থামিয়ে লুঠতরাজ করেছি, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছিনতাই করেছি। ব্যালারাটের পাষণ্ড জ্যাকের নাম শুনলে শিউরে উঠত ওখানকার মানুষ।'

'একদিন একটা সোনাভরতি গাড়ি লুঠ[১৭] করলাম। ছ-জন পাহারাদারের চারজনকে আমরা খতম করলাম— ওরা খতম করল আমাদের তিনজনকে। ড্রাইভারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম— সে কিন্তু আমাকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল। উচিত ছিল মাথাটা তখনই উড়িয়ে দেওয়া।'

'এই লোকটাই হল ম্যাকার্থি। অত সোনা পেয়ে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়ে দল ভেঙে দিলাম। আর কুকাজ নয়, এবার সৎকাজে পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব— এই মনস্থ করে দেশে ফিরলাম, জমিজায়গা কিনলাম, বিয়ে করলাম, মেয়ে হল। স্ত্রী-র মৃত্যুর পর এই মেয়েই আমাকে সৎপথে টেনে রেখেছে— ছন্নছাড়া হতে দেয়নি।'

'এই সময়ে একদিন শহরে দেখা হয়ে গেল ম্যাকার্থির সঙ্গে। অবস্থা রাস্তার কুত্তার মতো। ভয় দেখিয়ে সে আমার সবচেয়ে ভালো জমি বিনা ভাড়ায় ভোগ করতে লাগল, টাকাপয়সা যখন-তখন চেয়ে নিত। নইলে পুলিশকে খবর দেবে— এই হুমকি দিয়ে চলল সমানে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল আমার। অ্যালিস বড়ো হওয়ার পর তার নিগ্রহের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অ্যালিস পাছে আমার অতীতের দুষ্কর্ম জেনে ফেলে, এই ভয়ে আমি সিটিয়ে থাকি দেখে একদিন চেয়ে বসল অ্যালিসকেই।

'কিন্তু এইবার আমি বেঁকে বসলাম। ওর নোংরা রক্ত আমার রক্তের সঙ্গে মিশবে, এ কখনোই হতে পারে না। তা ছাড়া ওর উদ্দেশ্য আমার সর্বস্ব গ্রাস করা। আমার আয়ু যে ফুরিয়ে এসেছে, সে-খবর ও জানত। জেমস ছোকরার ওপর আমার কিন্তু বিতৃষ্ণা নেই— কিন্তু হাজার হলেও শয়তান ম্যাকার্থির ছেলে সে।

'তাই ঠিক করলাম বোঝাপড়া করা যাক। হ্রদের পাড়ে দেখা করার ব্যবস্থা হল। গিয়ে দেখি ছেলের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে ম্যাকার্থির। আড়ালে দাঁড়িয়ে চুরুট খেতে লাগলাম। শুনলাম, ছেলেকে বোঝাচ্ছে আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে। এমনভাবে খেপাচ্ছে জেমসকে যেন আমার মেয়ে একটা বাজারের মেয়ে। শুনতে শুনতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিষিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু এই শয়তান বেঁচে থাকলে যে আমার জীবনে সুখ শান্তি কিছুই থাকবে না। ভাবতে গিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলাম, আর না। ওকে খতমই করব।

'তাই ওকে খুন করলাম মাথায় পাথর মেরে। মরণ-চিৎকার শুনে জেমস এসে পড়বার আগেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু আবার ফিরে আসতে হল ফেলে যাওয়া আলখাল্লাটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'হোমস সব লিখে নিল, ম্যাকার্থিকে দিয়ে সই করিয়ে নিল।'

তারপর বললে, আপনার বিচারের আয়োজন হচ্ছে ওপরকার বড়ো আদালতে[১৮]— এ-আদালতে তাই এই স্বীকারোক্তি আমি আর পেশ করব না। কিন্তু যদি দেখি বিনা দোষে সাজা পেতে যাচ্ছে জেমস, তাহলে তাকে বাঁচানোর শেষ উপায় হিসেবে এই স্বীকারোক্তি আমি কাজে লাগাব। তদ্দিন এ-লেখা আমার কাছেই থাকবে। আপনার মৃত্যুর পরেও থাকবে। কেউ জানবে না।'

'আঃ, বাঁচালেন। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব', বলে পা টেনে টেনে স্খলিত চরণে নিষ্ক্রান্ত হলেন বিশালদেহী বৃদ্ধ টার্নার।

আদালতে স্বীকারোক্তি পেশ করার আর দরকার হয়নি— অন্যান্য প্রমাণের জোরে জেমসকে খালাস করে আনে হোমস। মি. টার্নার এখন পরলোকে। আশা করি তাঁর মেয়েকে নিয়ে সুখে

ঘরকন্না করছে জেমস। আজও জানে না ওরা[১৬], কী কুটিল ছায়ায় একদিন অন্ধকার হয়ে এসেছিল তাদের অতীত জীবন।

টীকা

১. **বসকোম বা বসকম্ব ভ্যালির প্রহেলিকা :** বসকম্ব ভ্যালি মিস্ট্রি প্রথম প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৮৯১ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে।

২. **টেলিগ্রামটা :** ১৮৭৬ সালে লন্ডনে টেলিফোন ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও টেলিগ্রামের জনপ্রিয়তা কমেনি। তখনও, ব্যাটারি, তামার তার, ম্যাগনেটিক সূচ প্রভৃতি সহযোগে তৈরি টেলিগ্রাফ যন্ত্র ১৮৩৭ সালে প্রবর্তন করেন স্যার উইলিয়াম কুক এবং চার্লস হুইটস্টোন। আমেরিকায় স্যামুয়েল মর্স তাঁর আলাদা যন্ত্র এবং বর্ণমালার কোড প্রচলন করেন আরও সাত বছর পরে, ১৮৪৪-এ।

৩. **স্ত্রীকে :** ড. ওয়াটসনের এই স্ত্রী আবশ্যিকভাবে 'দ্য সাইন অব ফোর' উপন্যাসের নায়িকা মেরি মার্স্টন।

৪. **বসকোম ভ্যালি :** বাস্তবে এই নামে কোনো শহর বা অঞ্চল ইংলন্ডে নেই। এটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত।

৫. **প্যাডিংটন :** ইংলন্ডে যাত্রীবাহী রেলগাড়ি প্রথম চালু হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের প্রান্তিক স্টেশন হিসেবে পাডিংটন স্টেশন নির্মিত হয় ১৮৩৮-এ। নির্মাতা-স্থপতি ইসামবার্ড কিংডম ব্রুনেল। রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রথম রেলভ্রমণ শেষ করেছিলেন এই স্টেশনে।

৬. **ট্রেনে :** ১৮৩০-এ রেলপথে যাত্রী পরিবহন শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়ম হাসকিসন ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। সেটিই সম্ভবত প্রথম রেল দুর্ঘটনা। ১৮৪৮-এ ইংলন্ডে মোট রেলপথের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০০ মাইল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০০০ মাইলে।

৭. **অস্ট্রেলিয়া :** সেই সময়ে অস্ট্রেলিয়া ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অস্ট্রেলিয়ান কলোনিজ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট প্রণীত হয় ১৮৫০-এর অগাস্ট মাসে। সেই আইন মোতাবেক নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যান্ড এবং টাসমানিয়া স্বশাসিত কলোনি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৮. **করোনার :** ইংলন্ডের আইনে যেকোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করেন করোনার। তাঁকে সাহায্য করেন বারোজন জুরি। এই কাজের প্রয়োজনে করোনার সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং নিজেই সাক্ষীদের প্রশ্ন করতে পারেন।

৯. **সুইনডন :** গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের যেকোনো ট্রেনকে সুইনডন স্টেশনে দশ মিনিট দাঁড়াতে হত। ১৮৯৫-এ এই প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

১০. **লেসট্রেড :** এই গল্পের আগে প্রকাশিত উপন্যাসে লেসট্রেড হাজির থাকলেও স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কোনো কাহিনিতে এটাই লেসট্রেড-এর আবির্ভাব।

১১. **ভিক্টোরিয়ায় :** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভিক্টোরিয়া নামে একাধিক অঞ্চল, শহর, রাজধানী, পর্বতশৃঙ্গ ইত্যাদি থাকলেও এই ভিক্টোরিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কলোনিয় হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

১২. **সোনার খনি :** ভিক্টোরিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৫০-এ। এর ফলে মাত্র চার বছরে এই কলোনির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় চারগুণ।

১৩. **একপাল মোষ এলেও :** পায়ের ছাপ নষ্ট হওয়ার কারণে এই উপমা হোমসকে অন্যত্র অনেক কাহিনিতে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট'-এ একথা বলেছিলেন শার্লক হোমস।

১৪. **BALLARAT :** মেলবোর্নের পঁচাত্তর মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ব্যালারাটে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৫১ সালে। আবিষ্কার করেন জন ডানলপ নামে এক স্বর্ণসন্ধানী।

১৫. **এই নামটাই :** অন্য নামও হতে পারত। লেখক খেয়াল করেননি, অস্ট্রেলিয়ায় ARARAT (আরারাত) নামেও একটি শহর আছে।

১৬. **বহুমূত্র রোগ :** ডায়াবেটিস মেলিটাস বা বহুমূত্র রোগ একটি মারাত্মক এবং প্রাণান্তকারী রোগ হিসেবে বিবেচিত হত। ১৯২১-এ ইনসুলিন আবিষ্কার হওয়ায় এর প্রতিষেধক পাওয়া যায়।

১৭. **সোনাভরতি গাড়ি লুঠ :** এই ঘটনার সঙ্গে দুটি বাস্তব সোনা লুঠের ঘটনার মিল লক্ষ করা গিয়েছে। প্রথমটি, ১৮৫৩-র ম্যাকআইভর গোল্ড রবারি, অন্যটি, ইউগোরা এসকর্ট রবারি, ঘটেছিল ১৮৬২-তে। দুটি ঘটনাতেই ছ-জন প্রহরী এবং ছ-জন ডাকাতের মধ্যে গুলির লড়াই হয়েছিল বলে জানা যায়।

১৮. **ওপরকার বড়ো আদালতে :** হোমস লেসট্রেডকে টার্নারের চেহারার বিবরণ দিলেও, লেসট্রেডের তাকে ধরতে না-পারার বিষয়টি বেশ আশ্চর্যজনক মনে করেছেন বেশ কিছু হোমস-গবেষক। তা ছাড়া একজন খুনে ডাকাতকে ছেড়ে দিয়ে হোমস উচিৎ কাজ করেননি— মনে করেন অনেকে।

১৯. **আজও জানে না ওরা :** ড. ওয়াটসনের এই কাহিনি স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর জেমস আর অ্যালিস নিশ্চয়ই আসল ঘটনা জানতে পেরেছিল।

পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি[১]

[দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপল]

১৮৮২ থেকে ১৮৯০[২] সালের মধ্যে শার্লক হোমস যেসব রহস্য সমাধানের ভার হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটিতে তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়, কয়েকটিতে তার ক্ষমতা থই পায়নি— অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। আবার কয়েকটিতে আংশিক সমাধান ঘটেছে। এই শেষের কেসগুলোর মধ্যে একটা বেশ চমকপ্রদ। ঘটনাচক্র কিন্তু আজও পুরো স্পষ্ট হয়নি— হবে বলেও আর মনে হয় না।

১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি লন্ডন শহরের ওপর দাপাদাপি করে চলেছে সারাদিন। বউ বাপের বাড়ি যাওয়ায় আমি বেকার স্ট্রিটে এসে উঠেছি দিন কয়েকের জন্যে। চুল্লির ধারে বসে বই পড়ছি। হোমসও মুখখানা কালো করে বসে আছে। মেজাজ বেশ খিটখিটে।

এমন সময় ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল সদর দরজায়।

হোমস বললে, 'এ সময়ে কেউ যদি সমস্যা নিয়ে দ্বারস্থ হয়, বুঝতে হবে সে-সমস্যা খুবই গুরুতর।'

করিডরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন', বলল হোমস।

বছর বাইশের এক যুবক ঘরে ঢুকল। রুচিবান, ফিটফাট, খানদানি চেহারা। হাতে ভেজা ছাতা, গায়ে জলঝরা বর্ষাতি। চোখ উদ্‌বিগ্ন, মুখ ফ্যাকাশে। খুব দুশ্চিন্তায় আছে যেন।

চোখে সোনার প্যাঁসনে চশমা লাগিয়ে বলল, 'এই ঝড়বাদলাকে গায়ে নিয়ে হুট করে ঘরে ঢুকে পড়ার জন্যে ক্ষমা করবেন।'

যুবকের ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে আংটায় ঝুলিয়ে দিল হোমস।

বলল, 'দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হর্সহ্যাম[৩] থেকে আসছি। মেজর প্রেনডেগাস্ট আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁকে মস্ত কেলেঙ্কারি থেকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। উনিই বললেন, আপনি কখনো হারেন না।'

'অতিরঞ্জন করেছেন। মোট চারবার হেরেছি আমি। তিনবার পুরুষের কাছে একবার একটি মহিলার কাছে[৪]।'

'তার চেয়ে অনেক বেশিবার জিতেছেন। আমার কেসেও আপনি তাই হবেন এই আশা নিয়ে আমি এসেছি। ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। আমাদের পরিবারে এ-রকম দুর্বোধ্য ব্যাপার কখনো ঘটবে ভাবতে পারিনি।'

'কৌতূহল বাড়িয়ে দিলেন দেখছি। বলুন আপনার দুর্বোধ্য কেস— শোনা যাক।'

চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের সামনে পা মেলে বসল যুবকটি।

বলল, 'আমার নাম জন ওপেন-শ। যে-কেস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, তার জের চলেছে বাপ-কাকার আমল থেকে।

আমার বাবারা দু-ভাই। এলিয়াস আমার কাকা, জোসেফ আমার বাবা। কভেন্ট্রিতে[৫] সাইকেলের টায়ারের কারখানা চালিয়ে বাবা প্রচুর পয়সা করেন। পরে মোটা টাকায় কারবার বেচে দেন এবং বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাবেন স্থির করেন।

কাকা বয়সকালে আমেরিকা গিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়ে কর্নেল হয়েছিলেন[৬]।

যুদ্ধ শেষ হলে ফ্লোরিডায় বাড়ি ফিরে যান। বছর তিন চার সেখানে থাকার পর ১৮৬৯ কি ৭০ সালে ফিরে আসেন হর্সহ্যামের সাসেক্সে। জমিজমা কিনে বসবাস শুরু করেন। আমেরিকায় টাকা করেছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেননি নিগ্রোবিদ্বেষের জন্যে। নিগ্রোদের ভোট দেওয়ার অধিকার তিনি মানতে পারেননি। কাকা ছিলেন বদমেজাজি, অসামাজিক আর ঘরকুনো। খুব মদ খেতেন, তামাক খেতেন, কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন না— বাবার সঙ্গেও না। বাড়িতেই থাকতেন— নয়তো বাড়ির পাশের মাঠে ময়দানে প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে নিতেন।

আমাকে কিন্তু স্নেহ করতেন কাকা। ইংলন্ডে আসার আট-নয় বছর পর বাবাকে বলে আমাকে ওঁর বাড়িতেই রেখেছিলেন। চাকরবাকর আর বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যাবসার আলাপ আমিই চালাতাম। চাবি-টাবি সব আমার কাছেই থাকত। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই বলতে পারেন বাড়ির কর্তা হয়ে বসেছিলাম। সর্বত্র অবাধ গতি ছিল আমার— ছাদের চিলেকোঠার ঘরটা ছাড়া। চাবির ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি সে-ঘরে রাশি রাশি ভাঙা তোরঙ্গ আর কাগজের তাড়া ছাড়া কিছুই নেই।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের সকাল বেলা আমি আর কাকা টেবিলে বসে আছি, এমন সময়ে একটা চিঠি এল কাকার নামে। নির্বান্ধব ছিলেন বলে ওঁর নামে চিঠিপত্র বড়ো একটা আসত না। খামখানা তুলে নিয়ে বললেন, "পন্ডিচেরি[৭] পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেছি— ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।"

বলে, খামের মুখ ছিঁড়লেন। ভেতর থেকে শুধু পাঁচটা শুকনো খটখটে কমলাবিচি ঝরে পড়ল টেবিলে— আর কিচ্ছু না।

আমি হেসে ফেললাম পত্রলেখকের রসিকতা দেখে। কিন্তু কাকার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিঃসীম আতঙ্কে চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল।

বললেন বিকট ভাঙা গলায়, "K.K.K.! এবার আর রক্ষে নেই আমার! পাপের সাজা পেতেই হবে!"

আমি তো অবাক। বললাম, "কাকা ব্যাপার কী? এসব কী?"

"মৃত্যু! মৃত্যু!" বলতে বলতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকা। ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ভয়ের চোটে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম, আঠা দিয়ে জোড়া মুখের কাছে লাল কালিতে K অক্ষরটা তিনবার লেখা— ভেতরে ওই কমলার পাঁচটি বিচি ছাড়া কিছু নেই।

এর সঙ্গে মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে না-পেয়ে ওপরে যাচ্ছি, দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে কাকা নামছেন। হাতে একটা জংধরা চাবি— চিলেকোঠা খুলেছিলেন নিশ্চয়— আর একটা ছোটো পেতলের বাক্স।

বললেন, "এবার ওদের টেক্কা দোব। জন, মেরিকে বলো আমার ঘরে আগুন জ্বেলে দিতে। আর তুমি উকিল ফোর্ডহ্যামকে ডাকতে পাঠাও।"

উকিল এল। কাকার ঘরে আমার তলব পড়ল। দেখলাম, আগুনের চুল্লির লোহার ঝাঁঝরির ওপর অনেক কাগজ পোড়া ছাই পড়ে আছে। পাশেই সেই পেতলের বাক্স ডালা খোলা অবস্থায় রয়েছে। আঁতকে উঠলাম ডালার ওপর K অক্ষরটা তিনবার খোদাই করা দেখে।

আমি ঘরে ঢুকতেই কাকা বললেন, "শোনো জন, আমার সমস্ত সম্পত্তি দাদাকে দিয়ে যাচ্ছি। তার মানে তুমিই সব পাবে। যদি বোঝ শান্তিতে ভোগ করতে পারছ না— তোমার যে পরম শত্রু, তাকে সব দিয়ে দিয়ো। সাক্ষী হিসেবে উইলে সই করো।"

আমি তো ভয়ে সিটিয়ে গেলাম কথার ধরন শুনে। সই দিলাম বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে কাঠ হয়ে রইলাম। অষ্টপ্রহর কাকার হঠাৎ পরিবর্তন দেখে। নেশা করা, ঘরের মধ্যে নিজেকে চাবি দিয়ে রাখা, কারো সঙ্গে দেখা না-করা, আগের চাইতে বাড়ল। নতুন উপসর্গের মধ্যে দেখা গেল চেঁচামেচি। মাঝে মাঝে মদে চুর হয়ে রিভলভার হাতে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে মাঠে ছুটতেন আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাতেন। কারো ধার ধারেন না তিনি, কারো ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে চান না। ঘোর কেটে গেলেই কিন্তু ফের ঘরে ঢুকে চাবিবন্ধ করে দিতেন। দারুণ শীতেও তখন তাঁকে দেখেছি ঘেমে-নেয়ে যেতে। ভয় যে রক্তে বাসা নিয়েছে, তা ওই মুখ দেখলেই বোঝা যেত।

একদিন রাত্রে এইরকম মাতলামি করতে করতে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন— আর ফিরে এলেন না। বাগানের ডোবায় মাত্র দু-ফুট জলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখা গেল তাঁকে। শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। সাম্প্রতিক পাগলামির বৃত্তান্ত শুনে জুরি বললেন আত্মহত্যা। আমার মনে কিন্তু ধোঁকা থেকে গেল। মৃত্যুর খপ্পর থেকেই বাঁচবার জন্যে উনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে কিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই মৃত্যুর খপ্পরেই পড়লেন।

যাই হোক, উইল অনুসারে কাকার সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত প্রায় হাজার চোদ্দো পাউন্ড বাবা পেলেন।'

এই পর্যন্ত শুনে হোমস বললে, 'এ-রকম অদ্ভুত কাহিনি আগে কখনো শুনিনি। আচ্ছা, চিঠিখানা উনি কবে পেয়েছিলেন? মৃত্যু বা আত্মহত্যাটা কোন তারিখে হয়েছিল মনে আছে?'

'চিঠি এসেছিল ১৮৮৩ সালের ১০ মার্চ, মারা গেলেন ২ মে রাত্রে— মানে, ঠিক সাত সপ্তাহ পরে।'

'তারপর কী হল?'

'সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার পর আমার কথায় চিলেকোঠা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন বাবা। সেই পেতলের বাক্সটা পাওয়া গেল। ডালার ভেতর দিকে একটা কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা K.K.K.— তার নীচে লেখা— পত্র, স্মারকলিপি, নিবন্ধ, রসিদ। কিন্তু ওই ধরনের কোনো কাগজ বাক্সে নেই[৮]— নিশ্চয় সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে যা পাওয়া গেল, তা সবই তাঁর সৈনিকজীবন সংক্রান্ত। আর কিছু রাজনীতির কাগজপত্র।

১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি আমি আর বাবা, এমন সময়ে একটা খাম এল তাঁর নামে। ছিঁড়েই চেঁচিয়ে উঠলেন।

দেখলাম, ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। এতদিন যা নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিলেন, এখন তাই দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। হাতের তেলোয় রয়েছে শুধু পাঁচটা কমলা-বিচি।

তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললেন, "এ... এ আবার কী!"

K.K.K. নাকি? গলা শুকিয়ে এল আমার।

খামের ভেতর দেখে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোর অক্ষরটা তিনবার লেখা রয়েছে। তার ওপরে এসব আবার কী লিখেছে?"

ঘাড় বাড়িয়ে পড়লাম, সূর্য-ঘড়ির ওপর কাগজগুলো রাখো।

'কাগজই-বা কী, সূর্য-ঘড়িই-বা কোথায়?' বললেন বাবা।

'সূর্য-ঘড়ি বাগানে একটা আছে বটে, কিন্তু কাগজ তো সব পুড়িয়ে ফেলেছেন কাকা।'

'যত্তো সব!' অনেকটা সামলে নিয়ে বাবা বললেন, 'এটা সভ্য দেশ। গাড়োয়ানি ইয়ার্কির জায়গা নয়। কোত্থেকে এসেছে চিঠিটা?'

'ডাকঘরের স্ট্যাম্প দেখে বললাম— ডান্ডি[৯] থেকে!

'ফেলে দাও! ইয়ার্কির আর জায়গা পায়নি।'

'পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।'

'ছাড়ো তো! লোক হাসাতে হবে না।'

'আমি নিজে খবর দিতে চাইলাম— বাবা বেঁকে বসলেন, চিরকাল বড়ো গোঁয়ার। আমি কিন্তু সেইদিনই অমঙ্গলের অশনি সংকেত পেলাম চিঠিখানার মধ্যে।

চিঠি পাওয়ার তিন দিন পরে বাবা ছেলেবেলার বন্ধু মেজর ফ্রিবাডির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দ্বিতীয় দিনে টেলিগ্রাম এল মেজরের কাছ থেকে। গিয়ে শুনলাম বাবা আর নেই। খাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। জুরিরা[১০] বললেন, দুর্ঘটনা। আমার মন বলল, হত্যা। অথচ কোনো পায়ের ছাপ কোথাও নেই, আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, রাস্তাঘাটেও অচেনা মুখ দেখা যায়নি। ষড়যন্ত্র যে ক্রমশ চেপে বসছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে তা উপলব্ধি করলাম।

এইভাবেই অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে সম্পত্তি এল হাতে। বলতে পারেন, কেন বেচে দিয়ে সরে পড়লাম না। কিন্তু আমার মন বলছে, পালিয়ে গিয়ে কাকার অতীতের জেরকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর পর দু-বছর আট মাস বেশ সুখেই কাটল। কমলবিচির আতঙ্ক মন থেকে মুছে গেল। ভাবলাম বুঝি, অভিশাপটা শেষ পর্যন্ত রেহাই দিল বংশের শেষ পুরুষকে।

কিন্তু ভুল... ভুল... সব ভুল। কাল সকালে আবার এসেছে সেই খাম। এই দেখুন।'

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা খাম বার করে উপুড় করল যুবাপুরুষ। টেবিলে কড়মড় করে ঠিকরে পড়ল পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বিচি।

বলল, 'ডাকঘরের স্ট্যাম্প মারা হয়েছে লন্ডনের পুব অঞ্চলে। ভেতরে লেখা K.K.K.— "কাগজপত্র সূর্য-ঘড়ির ওপর যেন থাকে।"

'চিঠি পেয়ে কী করলেন?'

'কিছুই না।'

'সে কী! কিচ্ছু করেননি?'

কাঁপা হাতে মুখ ঢেকে শিউরে উঠল জন ওপেন-শ, 'কী করব বলতে পারেন? একটা কুটিল চক্রান্ত আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে আমাকে— বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল আমি। এমন একটা ক্রূর কুটিল অমঙ্গল আমাকে শেষ করে আনছে যার খপ্পর থেকে রেহাই বাবা কাকারাও পায়নি— আমিও পাব না।'

'আপনি কি চুপ করবেন?' চিৎকার করে ওঠে শার্লক হোমস। 'এখন কি ভেঙে পড়ার সময়? বাঁচতে যদি চান, তো উঠে-পড়ে লাগুন।'

'পুলিশের কাছে ধরনা দিয়েছিলাম।'

'কী বলল তারা?'

'হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, ঠাট্টা করেছে কেউ।'

'ইডিয়ট! মানুষ যে এত বোকা হতে পারে ভাবাও যায় না।'

'অবশ্য সঙ্গে একজন কনস্টেবল দিয়েছে।'

'সঙ্গে এনেছেন তো?'

'না, বাড়িতে রেখে এসেছি। সেইরকমই অর্ডার আছে তার ওপর।'

এবার ভীষণ রেগে গেল হোমস। শূন্যে মুষ্টি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বললে, 'তাহলে এখানে আসতে গেলেন কেন? এলেনই যদি তো চিঠি পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এলেন না কেন?'

'আপনার নাম তখনও শুনিনি। মেজর প্রেনডেগাস্টের কাছে শুনেই দৌড়ে আসছি।'

'খুব করেছেন।' রাগে গরগর করতে করতে বলল হোমস। 'চিঠি পাওয়ার পর দু-দুটো দিন বেবাক বসে কাটিয়েছেন। জোগাড়যন্ত্র আগেই করা উচিত ছিল। যত্তো সব! ছোটোখাটো সূত্র-টুত্র কিছু দিতে পারেন? ব্যাপারটা আন্দাজ করার মতো যা হয় কিছু?'

পকেট থেকে একটা নীল কাগজের টুকরো বার করে টেবিলে রাখল জন।

'কাকা যেদিন কাগজ পোড়ান, সেদিন কীভাবে জানি না এই কাগজটা উড়ে এসে মেঝেতে পড়েছিল। ছাইয়ের মধ্যেও এইরকম নীলচে রঙের আধপোড়া কাগজের অনেক টুকরো দেখেছিলাম। এই কাগজটাও মনে হয় ওইসবের মধ্যেই ছিল।'

বাতির আলোয় ছেঁড়া কাগজটার ওপর আমরা দুই বন্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একটা দিকই ছেঁড়া হয়েছে— যেন খাতার পাতা— ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। ওপরে লেখা মার্চ, ১৮৬৯। তলায় একট হেঁয়ালি :

৪ঠা॥ হাডসনের মত পালটায়নি। এসেছিল।

৭ই॥ বিচি পাঠানো হল ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর জন সোয়েনকে।

৯ই॥ ম্যাকাউলি পরিষ্কার।

১০ই॥ জন সোয়েন সাফ।

১৩ই॥ প্যারামোরকে দেখে এলাম। ঠিক আছে।

কাগজটা ফিরিয়ে দিল হোমস।

বলল, 'নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে কোমর বেঁধে লেগে যান।'

'কী করব?'

'এই যে কাগজটা, এই সেই পেতলের বাক্সে রাখবেন। আর একটা কাগজে লিখবেন— "সব কাগজ কাকা পুড়িয়ে ফেলেছেন, এইটেই কেবল রয়ে গেছে।" লিখে কাগজটাকে পেতলের বাক্সে রেখে সবসুদ্ধ সূর্যঘড়ির ওপর সঙ্গেসঙ্গে রেখে আসবেন।'

'বেশ, তাই করব।'

'এ ছাড়া করণীয় আর কিছুই এখন নেই। আগে নিজে বাঁচুন, পরে বাপ কাকার মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে যাবেন।'

উঠে দাঁড়াল জন, 'আপনি আমাকে নতুন শক্তি দিলেন।'

'একদম সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন, মাথার ওপর সাংঘাতিক বিপদের খাঁড়া নিয়ে এখানে আপনি এসেছেন। সত্যিই জীবন বিপন্ন আপনার। বাড়ি ফিরবেন কী করে?'

'ট্রেনে।'

'ন-টা এখনও বাজেনি। রাস্তায় যদিও লোক থাকবে, তাহলেও খুব একটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না।'

'সঙ্গে হাতিয়ার আছে।'

'চমৎকার। কাল থেকে শুরু করব আপনার রহস্য সমাধান।'

'হর্সহ্যামে আসছেন?'

'না। রহস্যের চাবিকাঠি হর্সহ্যামে নেই— লন্ডনে রয়েছে। এখানেই কিনারা করব।'

'ঠিক আছে। দু-একদিনের মধ্যেই বাক্সের খবর দিয়ে যাব আপনাকে।'

হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল যুবাপুরুষ। বাইরে তখন দামাল ঝড় আর পাগলা বৃষ্টির তাণ্ডব নাচ চলছে। খটাখট ঝমাঝম শব্দ শোনা যাচ্ছে জানলায়।

আগুনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল শার্লক হোমস। তারপর তাম্রকূট সেবন করে চলল শিবনেত্র হয়ে।

শেষকালে বললে, 'ওয়াটসন, "সাইন অফ দি ফোর" মামলার পর এ-রকম ভয়ংকর বিচিত্র মামলা আর হাতে আসেনি আমার।'

'জন ওপেন-শ-র মাথায় কোন বিপদের খাঁড়া ঝুলছে বলো তো?'

'ভায়া, যুক্তিবিদ্যায় তাকেই পারঙ্গম বলব যে ঘটনা-শৃঙ্খলের একটা আংটা দেখেই শৃঙ্খলের শেষ পর্যন্ত আঁচ করতে পারে। অস্থিবিদ্যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি যেমন কঙ্কালের একটা হাড় দেখেই সব হাড়ের বর্ণনা দিতে পারেন— এও তেমনি একটা উঁচুদরের আর্ট। এ-আর্টে বড়ো আর্টিস্ট হতে হলে দরকারি সব খবর মগজে জমিয়ে রাখা দরকার। মার্কিন বিশ্বকোষের "K"

'তাঁর দৃষ্টি আগুনের শিখার দিকে স্থির রইল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

খণ্ডটা তাক থেকে নামাও। এবার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা যাক। কর্নেল ওপেন-শ আমেরিকা ছেড়ে হঠাৎ চলে এলেন কেন? ইংলন্ডের পল্লিঅঞ্চলে নির্জনবাস শুরু করলেন কেন? বাড়ি ছেড়ে বেরোনো বন্ধ করলেন কেন? নিশ্চয় কারো ভয়ে— তাই নয় কি? ভয়টা কী ধরনের, এই চিঠিগুলো থেকেই আঁচ করা যায়। পোস্ট অফিসগুলোর ছাপ মনে আছে?'

'প্রথমটা পণ্ডিচেরির, দ্বিতীয়টা ডান্ডির, তৃতীয়টা পূর্ব লন্ডনের।'

'এ থেকে কী আন্দাজ করা যায়?'

'সবগুলোই তো দেখছি জাহাজঘাটা। চিঠির লোক জাহাজে বসে চিঠি লিখেছে।' 'অপূর্ব! এই তো বেরিয়ে গেল একটা সূত্র। এবার দেখো আর একটা ইঙ্গিতময় ব্যাপার। পন্ডিচেরি থেকে হুমকি দিয়ে খুন করতে সময় লেগেছে সাত সপ্তাহ। কিন্তু ডান্ডি থেকে হুমকি দিয়ে খুন করেছে মাত্র তিন চার দিনে। বলো কী বুঝলে এ থেকে?'

'আসতে সময় লেগেছে।'

'চিঠিকেও তো সেই পথেই আসতে হয়েছে।'

'তাহলে?'

'ভায়া, হুমকি যে দিয়েছে, সে এসেছে এমন একটা জাহাজে যে-জাহাজ চিঠি-বওয়া জাহাজের চেয়ে আস্তে চলে। মানে, পাল তোলা জাহাজ। চিঠি এসেছে কলে-চলা জাহাজে।'

'তা হতে পারে।'

'হতে পারে না, তাই হয়েছে। ওপেন-শকে এই কারণেই পইপই করে হুঁশিয়ার করলাম— জীবন তার সত্যিই বিপন্ন। কেন জান? ওর চিঠিটা এসেছে পূর্ব-লন্ডন থেকে। তার মানে আর সময় নেই।'

'সর্বনাশ! কিন্তু এই অমানুষিক অত্যাচারের কারণটা কী বলতে পার?'

'কারণ ওই কাগজপত্র। এই হুমকি আর খুনের পেছনে একজন নেই— অনেকজন আছে। চিহ্ন বা প্রমাণ না-রেখে এইভাবে পর-পর দুটো খুন করা আনাড়ি বা বোকার পক্ষে সম্ভব হয় না। এরা গোঁয়ার, বুদ্ধিমান, ধনবান। বাক্সের কাগজপত্র তারা ফিরে চায়— যার কাছেই থাকুক না কেন। কাজেই K.K.K. অক্ষর তিনটে কোনো বিশেষ একজনের নামের আদ্যক্ষর নয়— একটা সংস্থার নাম।'

'কী সংস্থা?'

ঝুঁকে পড়ল হোমস।

বলল, 'ওয়াটসন, কু-ক্লুক্স-ক্ল্যানয়ের[১১] নাম কখনো শুনেছ?'

'না।'

বিশ্বকোষের পাতা উলটোল বন্ধুবর।

বলল, 'এই দেখো কু ক্লুক্স ক্ল্যান! আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টেপবার সময় একরকম ধাতব শব্দ হয়— তার সঙ্গে মিল রেখেই এই নামের সৃষ্টি। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর পতন ঘটে ভয়ংকর এই সংস্থাটির। উদ্দেশ্য নিগ্রো হয়েও যারা ভোট দিতে চায়, তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। যাকে দেশ থেকে তাড়াতে অথবা খুন করতে চাইত তার কাছে আগে হুমকি পাঠানো হত অদ্ভুত চিহ্ন মারফত। কখনো কমলা-বিচি, কখনো তরমুজ-বিচি, কখনো ওক-গাছের পাতা। হুমকি চিহ্ন পেয়ে যারা তোয়াক্কা করত না, অদ্ভুতভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়া হত ধরাধাম থেকে। অনেক চেষ্টা করেও দমন করা যায়নি সংস্থাটিকে— আকাশে বজ্রের মতোই এরা ছিল ভয়ংকর আর অমোঘ। ১৮৬৯ সালে সংস্থাটি আচমকা টুকরো টুকরো হয়ে যায়— কারণ জানা যায়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য মাথা চাড়া দিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে।

বিশ্বকোষ বন্ধ করে হোমস বললে, 'কর্নেল ওপেন-শ আমেরিকা থেকে চলে আসেন ১৮৬৯ অথবা ৭০ সালে। সংস্থাটি ভেঙেছে ১৮৬৯ সালে। এ থেকে কি বোঝা যায় না যে তিনিও এর মধ্যে ছিলেন এবং সংস্থার অনেকের নামধাম সমেত কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে এসে[১২] ঘাপটি মেরেছিলেন ইংলন্ডে? নিশ্চয় ওদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির রাতের ঘুম ছুটে গেছে সেইদিন থেকে— কাগজ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে তখন থেকেই।'

'আমরা যে-পাতাটা ছেঁড়া দেখলাম—'

'ডায়েরির পাতা। খুন আর হুমকির রেকর্ড। আজ আর কথা নয় ওয়াটসন। বেহালাটা দাও, এই জঘন্য আবহাওয়া আর তার চাইতে জঘন্য মানুষ জাতটাকে ভুলে-থাকা যাক।'

সকাল বেলা আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হল। সূর্য ম্লান মুখে উঁকি দিল কুয়াশা ফুঁড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রাতরাশ খাওয়ার টেবিলে আগেই হাজির হয়েছে হোমস।

আমাকে দেখেই বললে, 'ওহে, আজ থেকেই ওপেন-শ মামলার তদন্ত শুরু করব— এই লন্ডন শহরেই।'

সেদিনকার সদ্য-আসা খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বললাম, 'কীভাবে?'

'দেখি খোঁজখবর নিয়ে।'

হঠাৎ চোখ পড়ল দৈনিকের একটা শিরোনামায়। রক্ত হিম হয়ে গেল আমার।

আঁতকে উঠে বললাম, 'হোমস— হোমস— বড্ড দেরি করে ফেললে!'

'তাই নাকি!' হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখে হোমস। কণ্ঠস্বর সংযত, কিন্তু মুখভাব দেখে বুঝলাম ভেতরে তার কী আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

'কাল রাতে ওয়াটারলু ব্রিজে[১৩] হঠাৎ একটা চিৎকারের সঙ্গেসঙ্গে ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায়। কনস্টেবল দৌড়ে যায় জলের ধারে। লোক নামিয়েও তখন তাকে পাওয়া যায়নি। পরে জলপুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পকেটের মধ্যে একটা খাম ছিল। তা থেকেই জানা যায়, তার নাম জন ওপেন-শ। বাড়ি হর্সহ্যামের কাছে। পুলিশের বিশ্বাস, শেষ ট্রেন ধরার জন্যে ধড়ফড় করতে গিয়ে অন্ধকারে আর জল-ঝড়ে পথ হারিয়ে নদীর পাড়ে চলে যায়। সেখানেই পা ফসকে পড়ে গেল জলে। দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি।'

চোখ তুলে শার্লক হোমসের মুখের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কথা বলতে পারলাম না কিছুক্ষণ। এভাবে তাকে ভেঙে পড়তে কখনো দেখিনি আমি।

তারপর আর বসে থাকতে পারল না চেয়ারে। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। মুখ লাল, আঙুল অস্থির— ক্রমাগত হাত মুঠো করছে আর খুলছে।

আর বলছে, 'বাঁচবার জন্যে এসেছিল আমার কাছে— কিন্তু আমিই তাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলাম। ধড়িবাজ শয়তানের দল! ব্রিজের ওপর লোক ছিল বলে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে জলের ধারে নদীর পাড়ে— কিন্তু কীভাবে সেটা বুঝছি না! ঠিক আছে, দেখা যাক কে হারে কে জেতে!— চললাম ওয়াটসন।'

'কোথায়? পুলিশের কাছে?'

'পুলিশ! আমিই আমার পুলিশ।'

সারাদিন ডাক্তারি নিয়ে কাটালাম। হোমস ফিরল রাত দশটা নাগাদ। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, যেন একটা ঝোড়ো কাক। একটা শুকনো রুটি নিয়ে জলে ভিজিয়ে গিলতে লাগল কোঁৎকোঁৎ করে।

বলল, 'সকালে সেই যে খেয়েছি— পেটে আর কিছু পড়েনি। খাবার কথা মনেও ছিল না।'

'রহস্যের সমাধান হল?'

'অনেকটা হয়েছে। শয়তানগুলোকে কবজায় এনেছি, এবার হুমকি পাঠাব ওদেরই রীতিতে। ওপেন-শ'দের খুন করার বদলা এবার নেব।'

বলতে বলতে একটা কমলালেবু নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলল হোমস। কোয়ার মধ্যে থেকে পাঁচটা বিচি নিয়ে ভরল একটা খামে। ভেতরের ভাঁজে লিখল 'শা.হো. পাঠাচ্ছে জে.কা.কে'।

খামের মুখ এঁটে ওপরে লিখল :

ক্যাপ্টেন জেমস কালহাউন, 'লোন-স্টার' জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

শুকনো হেসে বলল, 'জাহাজঘাটায় এসেই পাবে এই চিঠি। ওপেনশ-দের মতো ওকেও ভয়ে উৎকণ্ঠায় অর্ধেক হয়ে যেতে হবে। শয়তান কোথাকার।'

'কালহাউন লোকটা কে, হোমস?'

'পালের গোদা, নাটের গুরু। চক্রান্ত এর স্যাঙাৎরাও করেছে, লজ্জায় আনব প্রত্যেককেই।' পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে দেখাল আমাকে। কাগজ ভরতি কেবল নাম আর তারিখ।

'পুরানো ফাইল আর দলিল ঘেঁটে[১৪] কাটিয়েছি সারাদিন। ১৮৮৩ সালের জানুযারি আর ফেব্রুয়ারিতে পন্ডিচেরিতে নোঙর ফেলেছিল অনেকগুলো পালের জাহাজ। তার মধ্যে একটা জাহাজের নাম যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রের নামানুসারে— লোন-স্টার।'

'তারপর?'

'ডান্ডিতে ১৮৮৫ সালের জানুয়ারিতেও এই লোন-স্টার নোঙর ফেলেছিল দেখে নিঃসন্দেহ হলাম। খোঁজ নিলাম লন্ডন বন্দরে। হ্যাঁ, এখানেও এসেছে লোন-স্টার। তৎক্ষণাৎ গেলাম জাহাজঘাটায়। শুনলাম সকালে রওনা হয়েছে স্যাভানার দিকে— মানে, দেশে ফিরছে।'

'অতএব!'

'টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি স্যাভানায়— পুলিশ ওত পেতে থাকবে। কলের জাহাজে আমার এই চিঠিও ওদের পাল তোলা জাহাজের আগে পৌঁছে যাবে। ক্যাপ্টেন কালহাউন আর তার দুজন সহকারীই কেবল আমেরিকার লোক— বাদবাকি সবাই অন্য দেশের খালাসি। কাল রাতে এই তিনজন জাহাজে ছিল না— সে-খবর নিয়েছি! কাজেই ওপেন-শ-কে খুনের অপরাধে ত্রিমূর্তিকে গ্রেপ্তারের জন্যে পুলিশ তৈরি হয়েই থাকবে স্যাভানায়।

কিন্তু হায় রে কপাল। নিয়তির লিখন ছিল অন্যরকম। কুচক্রী কালহাউন কোনোদিনই জানতে পারেনি তার চাইতেও ধুরন্ধর এক ব্যক্তি ধরে ফেলেছে তার শয়তানি। পাঁচটা কমলাবিচি কোনোদিন তার হাতে পৌঁছোয়নি। সে-বছরের সেই দামাল ঝড় সমুদ্রের বুকে যে তাণ্ডব নাচ নেচেছিল, তার খপ্পর থেকে রেহাই পায়নি পালতোলা জাহাজ লোন-স্টার। বিধ্বস্ত একটা খোলকে ঢেউয়ের ডগায় ভাসতে দেখা গিয়েছিল কেবল— গায়ে লেখা ছিল— লোন-স্টার!

টীকা

১. **পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি** : ইংলন্ডে প্রকাশিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের নভেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায় এবং আমেরিকান স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপ্‌স'।

২. **১৮৮২ থেকে ১৮৯০** : ১৮৮১-তে ঘটেছিল 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট'-এর ঘটনা। সেটির কথা ড. ওয়াটসন কেন যে বাদ দিলেন তা জানা যায়নি।

৩. **হর্সহ্যাম** : সাসেক্স কাউন্টির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোটো শহর হর্সহ্যামের উপকণ্ঠে জন্মেছিলেন বিখ্যাত কবি পার্সি বৃসি শেলি। এখানকার সংগ্রহশালায় শেলির স্মৃতি-বিজড়িত নানা জিনিসের সঙ্গে তাঁর লেখা বহু গ্রন্থের প্রথম বা অন্য পুরোনো সংস্করণ সযত্নে রাখা আছে।

৪. **একটি মহিলার কাছে :** কোনো কোনো গবেষক দ্বিমত পোষণ করলেও, বেশিরভাগের ধারণা, এই মহিলা হলেন 'আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া' গল্পের আইরিন অ্যাডলার।

৫. **কভেন্ট্রিতে :** প্রাচীন শহর কভেন্ট্রি বিখ্যাত সাইকেল কারখানা ছাড়া, রিবন, ফিতে, পোশাক, ঘড়ি প্রভৃতির উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে। কভেন্ট্রি শহরেই ট্যাক্স কমানোর দাবিতে নগ্ন অবস্থায় অশ্বারোহণ করেছিলেন লেডি গোডিভা। শহরের কেন্দ্রে, দিনে-দুপুরে লেডি গোডিভার ওই দুঃসাহসিক কাজের সময়ে শহরের মানুষ দরজা-জানলা বন্ধ করে নিজেদের গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। কিন্তু লুকিয়ে দেখেছিল সেই দৃশ্য। তাকে বলা হয় 'পিপিং টম'। বাক্যবন্ধটির উদ্ভব এই শহর থেকেই।

৬. **কর্নেল হয়েছিলেন :** এলিয়াস ওপেন'শ ছাড়াও আরও বহু ইংরেজ, আইরিশ এবং স্কটসম্যান আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

৭. **পন্ডিচেরি :** ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পন্ডিচেরি ছিল ফরাসি উপনিবেশ। 'দ্য সাইন অব ফোর'-এ উল্লেখ পাওয়া যায় পন্ডিচেরি লজ নামক একটি বাড়ির।

৮. **কাগজ বাক্সে নেই :** এলিয়াস কেন যে সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল আর কেনই-বা সেই লুকিয়ে রাখা কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছিল, সে-সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

৯. **ডান্ডি :** স্কটল্যান্ডের এক বন্দর-নগরী।

১০. **জুরিরা :** এই জুরিরা সম্ভবত করোনারের সহকারী।

১১. **কু ক্লুক্স ক্ল্যান :** আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের পুলাস্কি শহরে ১৮৬৬ সালে গঠিত হয় কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংস্থা কু ক্লুক্স ক্ল্যান। দলের নামের উদ্ভব গ্রিক শব্দ 'কুকলস' থেকে, যার অর্থ 'বৃত্ত'। এই দলটি ভেঙে যাওয়ার পর ১৯১৫ সালে জর্জিয়ায় এর পুনর্গঠন করেন উইলিয়ম জে. সিমন্স।

১২. **কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে এসে :** কু ক্লুক্স ক্ল্যানের ছ-জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যতম জন সি. লেস্টার দল ভেঙে যাওয়ার পর ১৮৮৪ সালে এই দল সম্পর্কে বিভিন্ন গোপন তথ্য সংবলিত একটি গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশ করেন। তার জন্য কিন্তু লেস্টারকে কেউ দোষারোপ বা হত্যার চেষ্টা করেনি।

১৩. **ওয়াটারলু ব্রিজে :** টেমস নদীর ওপর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই সেতুর অপর নাম 'ব্রিজ অব সাইজ'। এই ব্রিজের রেলিং টপকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ঘটা অগণ্য আত্মহত্যা থেকে এই নামের উৎপত্তি।

১৪. **পুরানো ফাইল আর দলিল ঘেঁটে :** জাহাজ চলাচল বিষয়ক যাবতীয় নথির প্রাচীনতম ভাণ্ডার হল 'লয়েডস রেজিস্টার'। ১৭৬০ থেকে প্রচলিত এই সংস্থা এক-শো টন বা তার চেয়ে বড়ো যাবতীয় বাণিজ্যপোতের রেকর্ড রেখে চলেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটেও লভ্য লয়েডস-এর তথ্যভাণ্ডার।

বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য[১]

[দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইসটেড লিপ]

১৮৮৯ সালের জুন মাস। রাত হয়েছে। হাই তুলে ভাবছি এবার শোওয়া যাক, এমন সময়ে এক ভদ্রমহিলা এল বাড়িতে। মুখে কালো ওড়না।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার বউকে।

ডুকরে উঠে বললে, 'বড়ো বিপদে পড়েছি রে! বাঁচাতেই হবে!'

ওড়না সরিয়ে অবাক হয়ে গেল আমার গিন্নি, 'কেট হুইটনি যে! কী ব্যাপার?'

কেট হুইটনি ও আমার স্ত্রী এক ক্লাসে পড়েছে, অনেকদিনের বন্ধু। ওর স্বামীটি দারুণ নেশাখোর। আফিমের রস[২] মিশিয়ে তামাক খাওয়া ধরেছিল শখ করে, এখন আর ছাড়তে পারে না। আমি ওদের পারিবারিক চিকিৎসক।

কাঁদতে কাঁদতে কেট বললে, 'উনি আজ দু-দিন বাড়ি ফেরেননি। নিশ্চয় বার অফ গোল্ডে পড়ে আছেন।'

বার অফ গোল্ড নেশার আড্ডা। যত রাজ্যের কুলি মজুর যায় সস্তায় বুঁদ হয়ে থাকতে। ও-রকম একটা বীভৎস জায়গায় কেট একলা যেতে চায় না স্বামীকে আনতে, তাই দৌড়ে এসেছে আমার কাছে।

কেটকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। নিজেই একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে গেলাম বার অফ গোল্ডে। জায়গাটা লন্ডন ব্রিজের[৩] পূর্বদিকে জেটির পাশে একটা সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে।

সরু গুহার মতো একটা রাস্তা দিয়ে নামলাম নেশার আড্ডায়। কী বীভৎস কদর্য পরিবেশ— ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না! নীচু ছাদ, লম্বা ঘর। আফিংয়ের বাদামি ধোঁয়ায় চোখ চলে না। ম্যাড়মেড়ে আলোয় কোনোমতে দেখলাম সারি সারি লোক এলিয়ে রয়েছে নানা ভঙ্গিমায়। ঘোলাটে নিষ্প্রাণ চোখ। ছোটো ছোটো আগুনের টুকরো জ্বলছে দপ দপ করে— আফিং পুড়ছে। অর্থহীন বুকনি শোনা যাচ্ছে। এক কোণে জ্বলন্ত কাঠকয়লার সামনে একজন রোগা, লম্বা, বুড়ো মুঠিতে চিবুক আর হাঁটুতে হাত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

আমি আড্ডায় পা দিতেই একজন চাকর আফিংয়ের নল এনে ধরল আমার সামনে। আমি সরিয়ে নিলাম। খুঁজে বার করলাম কেটের নেশাখোর স্বামীকে। আমাকে দেখেই ভীষণ অবাক হয়ে বললে, 'আরে ওয়াটসন যে! ক-টা বাজে বল তো?'

'রাত এগারোটা!'

'সে কী! কী বার আজকে?'

'শুক্রবার।'

'বল কী! এর মধ্যে দু-দিন পেরিয়ে গেল! না, না, নিশ্চয় ভুল বলছ— এই তো ক-ঘণ্টা হল বসেছি, মাত্র ক-টা টাইপ খেয়েছি।'

ওকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ জামায় টান পড়ল।

ফিসফিস করে কে যেন বললে, 'এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাও।'

চমকে উঠলেও এক-পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, সেই রোগা, শুকনো, পিঠ-বাঁকা বুড়োটা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দু-হাঁটুর মাঝে আফিংয়ের নল[৪]— যেন খসে পড়েছে শিথিল হাত থেকে। আড়াল করে দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে ঘটল রূপান্তরটা। দেখলাম, বুড়ো আর নেই। সে জায়াগায় সিধে হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে প্রিয় বন্ধু শার্লক হোমস। চোখের ঘোলাটে ভাব, কপালের বলিরেখা, সারাদেহের বার্ধক্য নিমেষে তিরোহিত হয়েছে।

আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠতাম। ইশারায় এগিয়ে আসতে বলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল হোমস— আবার ন্যুব্জদেহে বলিরেখাঙ্কিত মুখে, নিষ্প্রভ চোখে মিশে গেল সারি সারি নেশাখোরদের ভিড়ে।

খাটো গলায় বললাম, 'এখানে কী করতে এসেছ?'

'আরে আস্তে কথা বল। বন্ধুটাকে বিদেয় করো আগে— কথা আছে।'

'গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি যে।'

'ও-গাড়িতেই বাড়ি পাঠিয়ে দাও। গাড়োয়ানকে বল তোমার ঘরণীকেও যেন খবর দেয়— আজ রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাবে।'

শার্লক হোমসের কথার অন্যথা কখনো করতে পারিনি— এতই প্রবল ওর ব্যক্তিত্ব। তা ছাড়া বন্ধুবরের নতুন অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে কৌতূহলও পেয়ে বসল আমাকে। বাইরে এসে গাড়োয়ানকে বুঝিয়ে বললাম, কী করতে হবে, বউকে কী বলতে হবে। তারপর একটু দাঁড়ানোর পরেই দেখলাম নেশার আড্ডা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে ছদ্মবেশী শার্লক হোমস।

পাশাপাশি হেঁটে দুটো রাস্তা পেরিয়ে আসার পর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পিঠের কুঁজ ঝেড়ে ফেলে সিধে হয়ে দাঁড়াল হোমস এবং অট্টহেসে বললে, 'ভাবছ বুঝি কোকেনের সঙ্গে এরপর আফিং ধরলাম?'

'ওখানে তোমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছি।'

'আমিও কম হইনি তোমাকে দেখে।'

'আমি তো এসেছি ওই বন্ধুটার সন্ধানে।'

'আর আমি এসেছি এক শত্রুর সন্ধানে।'

'শত্রু! কোন শত্রু?'

'যার সন্ধানে এসেছি, তাকে স্বমূর্তি নিয়ে খুঁজতে গেলে ঝামেলায় পড়তাম— লস্করটা শাসিয়ে রেখেছিল। তাই এসেছিলাম ছদ্মমূর্তিতে। এই বাড়ির পেছনে পলের জেটির কোণে একটা চোরা দরজা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কত লাশ যে পাচার হয়ে যায়, কেউ তার হিসেব রাখে না। টেমস নদীর ধারে এর চাইতে ভয়ংকর মানুষখুনের জায়গা আর নেই। নেভিল সিনক্লেয়ারের লাশও হয়তো ওইখান দিয়েই পাচার হয়েছে। যাক সে-কথা, গাড়িটা গেল কোথায়?'

বলে, মুখে আঙুল পুরে শিস দিয়ে উঠল হোমস— অন্ধকারে ভেসে এল আর একটা শিসের আওয়াজ। একটু পরেই ঘড় ঘড় শব্দে একটা একঘোড়ার হালকা গাড়ি[৫] এসে দাঁড়াল সামনে।

'ওয়াটসন, আসবে নাকি?'

'যদি কাজে লাগি, নিশ্চয় আসব।'

'বিশ্বাসী সহযোগীর দরকার সবসময়েই, বিশেষ করে যদি সে জীবনীকার হয়। সিডার্সে আমি যে-ঘরে আছি, সেখানে খাট আছে দু-খানা— কাজেই তোমার অসুবিধে হবে না।'

'সিডার্সে কেন?'

'ওখানেই থাকেন মি. সেন্ট ক্লেয়ার। তদন্ত করছি ওখান থেকেই।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী? আমি যে এখনও অন্ধকারে।'

'অন্ধকার এখুনি কাটবে, বন্ধু। নাও উঠে পড়ো। জন, তোমাকে আর দরকার নেই। এই নাও আধ ক্রাউন। কাল এগারোটায় এসো।'

হোমস নিজেই চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছোটাল এঁকাবেঁকা, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে। তন্ময় হয়ে রইল আপন চিন্তায়— একটা কথাও বলল না শহর ছাড়িয়ে না-আসা পর্যন্ত।

'তিনি চাবুক দিয়ে ঘোড়াটাকে আঘাত করলেন।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। মনে হল চিন্তার ফসল ফলছে— মনের ধাঁধা কেটেছে। তামাকের পাইপ ধরিয়ে বললে, 'ওয়াটসন, সত্যিই তুমি আদর্শ সহযোগী। কী চমৎকার চুপ করে ছিলে এতক্ষণ। ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু মুশকিল কী জানো, ভদ্রমহিলাকে কী বলে বোঝাই যে সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে।'

'আমি কিন্তু এখনও আঁধারে।'

'বলছি, বলছি। সূত্র পেয়েছি অনেক, কিন্তু এমন জড়িয়ে রয়েছে যে খুলতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ তো, খুলেই বলো না।'

'১৮৮৪ সালের মে মাসে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এসে লী-তে বাড়ি ঘরদোর কিনে বেশ বড়োলোকের মতোই বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে ওই তল্লাটেরই একটি মেয়ে বিয়ে করেন এবং দুটি বাচ্চাও হয়। ভদ্রলোক ব্যাবসাসূত্রে রোজ সকালে লন্ডন যান। বিকেল পাঁচটা চোদ্দোর গাড়িতে ফিরে আসেন। বয়স ৩৭। সচ্চরিত্র। খাঁটি ভদ্রলোক— পাড়ায় সুনাম আছে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

'গত সোমবার ভদ্রলোক লন্ডন রওনা হওয়ার সময়ে বলে গেলেন ছেলের জন্যে একবাক্স

চৌকো কাঠ নিয়ে ফিরবেন— খেলনার বাড়ি তৈরির জন্যে। বেরিয়ে যাওয়ার পরেই একটা টেলিগ্রাম এল একটা দামি পার্সেল এসেছে, জাহাজঘাটা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। মিসেস সিনক্লেয়ার নিজেই লন্ডনে গেলেন। পার্সেল ছাড়িয়ে জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে বেরোলেন চারটে পঁয়ত্রিশে। জায়গাটা মোটেই ভালো নয়। জাহাজঘাটা তো। তোমার সঙ্গে যেখানে আজ দেখা হল, তার কাছেই। তাই গাড়ির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে হঠাৎ কানে ভেসে এল একটা চাপা ভয়ার্ত চিৎকার। চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। চোখ তুলতেই দেখলেন একটা দোতলা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী হাত নাড়ছেন— কী যেন বলতে চাইছেন। মুখ-চোখ ভয়ে উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। গায়ে কোট আছে, কিন্তু বাঁ-কলার নেই। আফিংয়ের আড্ডাটা এই বাড়ির তলাতেই— যেখানে আজ তুমি গেছিলে।

'ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। একটু বুঝলেন যে স্বামী বিপদগ্রস্ত। তৎক্ষণাৎ দিশেহারা হয়ে ছুটলেন বাড়ির ভেতরে। কিন্তু দোতলায় ওঠা আর হল না। সিঁড়ি থেকেই বদমাশ লস্করটা তার একজন স্যাঙাতকে নিয়ে বার করে দিল তাকে বাড়ির বাইরে।

'ছুটতে ছুটতে রাস্তা থেকে পুলিশ ডেকে এনে ফের বাড়িতে ঢুকলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। কিন্তু দোতলায় উঠে দেখা গেল সেখানে থাকে একজন কদাকার পঙ্গু। সিনক্লেয়ার বলে কেউ নাকি সেখানে আসেনি, একবাক্যে বললে লস্কর আর বীভৎস-দর্শন পঙ্গুটি।

'এই সময়ে একটা আবিষ্কার করে বসলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। চিৎকার করে দৌড়ে গেলেন টেবিলের দিকে। দেখা গেল সেখানে একবাক্স কাঠের চৌকো ব্লক পড়ে রয়েছে— এই খেলনাটাকেই বাড়ি ফেরার সময়ে কিনে আনবেন বলেছিলেন মি. সিনক্লেয়ার।

'এবার সন্দেহ হল পুলিশের। ঘরদোর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির পেছনেই টেমস নদী। একটা জানলা সেইদিকেই এবং জানলার গরাদে কাঁচা রক্তের দাগ। শোবার ঘরেও পাওয়া গেল মি. সিনক্লেয়ারের ঘড়ি, টুপি, মোজা, জুতো— কেবল তাঁকে বাদে। অথচ জামাকাপড়ে এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যায় দারুণ একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

'লস্করটার পূর্ব ইতিহাস সুবিধের নয়। তার আচরণ সন্দেহজনক— সিঁড়ির মুখে সে-ই পথ আটকেছিল মিসেস সিনক্লেয়ারের। বিকলাঙ্গ ভাড়াটে হিউ বুন সম্বন্ধে সে কোনো খবর রাখে না— মি. সিনক্লেয়ারের জামাকাপড় কীভাবে ওখানে গেল, তাও জানে না।

'কদাকার বিকট ভাড়াটে লোকটা আসলে পেশাদার ভিখিরি। রাস্তার মোড়ে রোজ বসে টুপি পেতে। চকচকে কালো চোখ, একমাথা কমলা রঙের চুল, মুখে যেন কথার খই ফুটছে, মুখজোড়া একটা ভীষণ কাটার দাগ আছে— চামড়া গুটিয়ে যাওয়ার ফলে ওপরের ঠোঁটটা বেঁকে উঠে গেছে ওপরদিকে। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে বেশ কিছু মোমের দেশলাই নিয়ে বসে থাকে রোজ একই জায়গায়। লক্ষ করেছি ওর ওই বীভৎস চেহারার অনুপাতে চটপটে চতুর কথাবার্তা আর কালো চোখের চাহনির জন্যে অন্য ভিখিরিদের চেয়ে ওর দিকেই নজর পড়ে বেশি। রোজগারও বেশি। মনে রেখো, এই লোকই থাকে আফিং আড্ডার দোতলায়— যেখানে শেষবারের মতো দেখা গেছে মিস্টার সিনক্লেয়ারকে।

'কিন্তু বিকৃত যার অঙ্গ, তার দ্বারা এ কাজ কি সম্ভব?'

'সামান্য একটু খুঁড়িয়ে চলে— তা ছাড়া স্বাস্থ্য ভালোই। ডাক্তারি মতে কিন্তু যাদের একটা প্রত্যঙ্গ পড়ে যায়, অন্য প্রত্যঙ্গের জোরে তার অভাব পুষিয়ে নেয়।'

'তারপর?'

'হিউ বুনকে সঙ্গেসঙ্গে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। গ্রেপ্তার যখন করা হল, তার আগেই বদমাশ ওই লস্করটার সঙ্গে তার শলাপরামর্শ হয়ে গেছে, বুনের জামার হাতায় রক্তের দাগ কেন— এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, আঙুল কেটে গেছে বলে। সেই রক্তই জানলার গরাদেও লেগেছে। মি. সিনক্লেয়ার নামধারী যাকে দেখেছেন বলে চেঁচাচ্ছেন মিসেস সিনক্লেয়ার— সে-রকম কেউ তার ঘরে আসেনি। ভদ্রমহিলার মতিভ্রম অথবা দৃষ্টিভ্রম— দুটোর একটা ঘটেছে!

'পুলিশ ইনস্পেকটর বুদ্ধি করে বাড়িতে থেকে গেলেন জোয়ারের জল নেমে গেলে কাদায় কিছু পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে। পেলেনও। একটা কোট। মি. সিনক্লেয়ারের। ডেডবডি কিন্তু পাওয়া গেল না। কোটের পকেটে কী ছিল আন্দাজ করতে পার?'

'না।'

'রাশি রাশি খুচরো পয়সা। কোট ভেসে যায়নি ওই কারণেই— ভারী হয়ে গিয়েছিল। মড়াটা ভেসে গেছে।'

'কিন্তু কোট সমেত একটা মড়াকে ফেলে দেওয়া হল জলে— বাদবাকি জামা জুতো মোজা পাওয়া গেল ওপরের ঘরে— এটাই-বা কী ব্যাপার?'

'ধরো, মড়াটা আগে জানলা দিয়ে ফেলেছে বুন। তারপর ভিক্ষের পয়সা দিয়ে কোটটাকে ভারী করেছে— এমন সময়ে নীচে চেঁচামেচি শুনে তাড়াতাড়ি করে অন্য জামাকাপড় শোয়ার ঘরে লুকিয়ে রেখে কোটটাকে ফেলে দিয়েছে জানলা দিয়ে— যাতে ভারী বলে কাদায় আটকে যায়।'

'তা হতে পারে।'

'বুন এখন হাজতে। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না মরতে মি. সিনক্লেয়ার আফিংয়ের আড্ডায় গেলেন কেন। বুন লোকটাও শান্ত স্বভাবের ভিখিরি— আজ পর্যন্ত কোনো বেচাল দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে এমন রহস্যের গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে যে খেই পাচ্ছি না।'

কথা বলতে বলতে গাড়ি পৌঁছে গেল সিডার্সে। নুড়িবিছানো পথ ধরে একটা বড়ো বাড়ির দিকে এগোল গাড়ি। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা। দুজন পুরুষ মূর্তিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অস্ফুট হর্ষধ্বনি করে উঠেছিলেন। তারপরেই আমাকে দেখে আর হোমসের কালো মুখ লক্ষ করে মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল।

'কী খবর আনলেন? ভালো, না খারাপ?'

'দুটোর কোনোটাই নয়।'

আমার সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন হোমস। বাড়ির ভেতর যাওয়ার পর খাবার ঘরে ঢুকলাম।

তারপরেই আচমকা জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সিনক্লেয়ার, 'মি. শার্লক হোমস, আপনাকে দু-একটা কথা সোজা জিজ্ঞেস করব, সোজা উত্তর দেবেন। ঘোরপ্যাঁচের দরকার নেই। ধাক্কা সইবার মতো শক্ত ধাত আমার আছে— মূর্ছা যাব না।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার স্বামী বেঁচে আছে?'

হকচকিয়ে গেল শার্লক হোমস। হেলান দিয়ে বসল ঝুড়ি-চেয়ারে। কার্পেটে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে ফের বললেন মিসেস সিনক্লেয়ার, 'খুলে বলুন!'

'খুলেই বলছি ম্যাডাম, আমি জানি না।'

'কী মনে হয় আপনার? মারা গেছে?'

'সেইরকম মনে হয়।'

'খুন হয়েছে?'

'অতটা বলব না। হতেও পারে।'

'কবে মারা গেছে বলে মনে হয়?'

'সোমবার।'

'মি. হোমস, এ-চিঠি তাহলে আজকে তার কাছ থেকে পেলাম কী করে বলতে পারেন?'

ইলেকট্রিক শক খেলে মানুষ যেমন ছিটকে যায়, সেইভাবে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল শার্লক হোমস, 'বলেন কী!'

এক টুকরা কাগজ নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে বললেন মিসেস সিনক্লেয়ার, 'হ্যাঁ, আজই পেয়েছি।'

'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

সাগ্রহে কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিল হোমস। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। ডাকঘরের ছাপ গ্রেভসএন্ডের— তারিখ সেই দিনেরই।

'হাতের লেখা তো দেখছি জঘন্য, যেমন মোটা, তেমনি ধ্যাবড়া', আপন মনেই বললে হোমস। 'এ নিশ্চয় আপনার স্বামীর নয়?'

'না, কিন্তু খামের মধ্যে যেটি এসেছে, সেটি আমার স্বামীই লিখেছে।'

'ঠিকানা লেখবার সময়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছে দেখছি।'

'কেন বললেন?'

'নামটা লেখা হয়েছে বেশ ঘন কালো কালিতে— আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছে। বাকি লেখাটা ধূসর রঙের— তার মানে ব্লটিং পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। নামধাম একটানা লিখে গিয়ে ব্লটিংপেপার চেপে ধরলে নামের জায়গাটা কেবল এত নিকষ কালো হত না। অর্থাৎ নাম লেখার পর ঠিকানা জানবার জন্যে সবুর করতে হয়েছে। ব্যাপারটা সামান্য— কিন্তু সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই বেশি গুরুত্ব থাকে। এবার চিঠি নিয়ে পড়া যাক। আরে! আরে! চিঠি ছাড়াও খামের মধ্যে আরও কিছু একটা পাঠানো হয়েছিল দেখছি।'

'আংটি— আমার স্বামীর।'

'চিঠির লেখা আপনার স্বামীর তো?'

'হ্যাঁ। খুব তাড়াতাড়ি লিখলে এইভাবে লেখে।'

চিঠিখানা পড়ল হোমস, 'সুপ্রিয়া, ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিরাট একটা ভুল

হয়েছে। শুধরোতে সময় লাগবে। ধৈর্য ধরো।— নেভিল।' পেনসিল দিয়ে লেখা হয়েছে অক্টেভো সাইজের[৬] বইয়ের পুস্তনিতে— কাগজে জলছাপও দেখছি না। হুম! ডাকে ফেলেছে আজকে— যে ফেলেছে তার বুড়ো আঙুলটা রীতিমতো নোংরা। বাঃ! খামের মুখ যে সেঁটেছে, তার আবার তামাক চিবোনোর অভ্যেসও আছে। লেখাটা তাহলে আপনার স্বামীর?'

'নিশ্চয়।'

'চিঠি যখন আজকে ডাকে ফেলা হয়েছে, তখন অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে— তবে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হয়েছেন— এ-কথা বলা যায় না।'

'বেঁচে তো আছে।'

'সেটা বলাও মুশকিল। হাতের লেখা নকল হতে পারে। আঙুল থেকে আংটিও খুলে নেওয়া যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি বলব হাতের লেখা ওরই।'

'হয়তো চিঠি লিখেছিলেন আগে, ডাকে ফেলা হয়েছে আজকে। এর মাঝে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

'আপনি বড়ো ভয় দেখান, মি. হোমস। এত বড়ো সর্বনাশ হলে আমি টের পেতাম না বলতে চান? জানেন, যাওয়ার দিন পাশের ঘরে হাত কেটে ফেলেছিল, খাবার ঘরে বসে ঠিক টের পেয়েছিলাম, মনে হল, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে ওর। দৌড়ে গিয়ে দেখি সত্যিই আঙুল কেটে বসে আছে। মারা গেলে তো বুঝতে পারবই।'

'ঠিক কথা। অনেক সময়ে দেখা গেছে মেয়েদের মন যুক্তিকেও টেক্কা দেয়। কিন্তু বেঁচেই যদি আছেন তো চিঠি লিখতে গেলেন কেন? আসতে কী হয়েছে?'

'সেইখানেই তো ধোঁকা লাগছে।'

'আচ্ছা, দোতলার সেই বাড়িটায় আপনি ওঁকে খোলা জানলা দিয়ে দেখেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে নাম ধরে না-ডেকে শুধু চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? চেঁচানিটা কী ধরনের? বিপদে পড়ে সাহায্য চাওয়ার মতো কি?'

'হাত নাড়াটা সেই ধরনের।'

'এমনও তো হতে পারে আপনাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়ে দু-হাত শূন্যে উঠিয়েছিলেন?'

'অসম্ভব কিছু নয়।'

'তারপরেই কেউ যেন পেছন থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিল?'

'যেভাবে দুম করে সরে গেল জানলা থেকে, মনে হল পেছনে কেউ ছিল— টেনে নিল।'

'নিজেই লাফ মেরে পেছিয়ে গেছেন কি না জানছেন কী করে? ঘরে ঢুকেও তো আর কাউকে দেখেননি?'

'বিকট চেহারার সেই লোকটা ছিল— নিজে কবুল করেছে।'

'ওই অঞ্চলে বা ওখানকার আফিংয়ের আড্ডায় উনি আগে কখনো যেতেন?'

'না।'

আর কথা হল না। খাওয়ার পর ঢুকলাম শোবার ঘরে। খাটের ওপর বালিশ আর কুশন

সাজিয়ে তার ওপর আয়েশ করে বসল হোমস— সামনে রাখল অনেকখানি তামাক। বুঝলাম সারারাত তামাক খাবে আর ধ্যান করবে কূট-সমস্যা নিয়ে। চোখে ঘুম নামার সময়েও দেখলাম শিবনেত্র হয়ে ঠায় বসে— গল গল করে নীলচে ধোঁয়া উঠছে কড়িকাঠের দিকে।

ভোরবেলা চোখ মেলে দেখলাম, ঠিক এইভাবেই বসে আছে সে— শুধু যা সামনের তামাকস্তূপ উধাও হয়েছে।

'চলো ওয়াটসন, একটু বেরোনো যাক,' প্রসন্ন কণ্ঠ হোমসের— কাল রাতের সমস্যাপীড়িত মুখচ্ছবিও আর নেই।

তখন ভোর চারটে। বাড়ির কেউ ওঠেনি। সহিসকে গাড়ি প্রস্তুত করতে বলে এল হোমস। জামা-জুতো পরতে পরতে বললে, 'ওয়াটসন, ইউরোপের সবচেয়ে হাঁদারাম লোকটা এখন তোমার সামনে। সমস্যার সমাধান করে এনেছি বললেই চলে— চাবির সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'চাবিটি এখন কোথায়?'

'কলতলায়। সেখান থেকে নিয়ে আমার ব্যাগে রেখেছি। দেখি এবার সমস্যার তালা খুলতে পারি কি না!'

গাড়ি ছুটল লন্ডন অভিমুখে। যেতে যেতে হোমস শুধু বললে, 'কেসটা খুবই বিচিত্র। প্রথমটা খুবই ধাঁধায় ফেলেছিল।'

থানায় পৌঁছে ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিটের[৭] ঘরে ঢুকল হোমস।

বলল, 'হিউ বুন এখন হাজতে তো?'

'হ্যাঁ। খুব শান্ত ধরনের আসামি— কিন্তু এত নোংরা যে কহতব্য নয়।'

'কেন বলুন তো?'

'আরে মশাই কিছুতেই মুখের তেলকালি ধোয়াতে পারলাম না! কোনোমতে কেবল হাতজোড়া ধোয়ানো গেছে।'

'এখন একবার দেখা যাবে?'

'আসুন।'

ব্যাগ হাতে ইনস্পেকটরের পেছন পেছন চলল হোমস— এল হাজতখানায়। আমি আছি সঙ্গে। সরু করিডর— দু-পাশে সারি সারি বন্ধ দরজা। একটা দরজার ওপর থেকে তক্তা সরিয়ে ইনস্পেকটর বললে— ঘুমোচ্ছে এখনও।'

আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছে ভিখিরি হিউ বুন। সে কী মুখ! দুনিয়ার কদর্যতা জড়ো হয়েছে বক্র ওষ্ঠ আর বিরাট ক্ষতচিহ্নটার মধ্যে। চোখ থেকে থুতনি পর্যন্ত কেটে গিয়েছিল— ক্ষতস্থান শুকিয়ে যেতে চামড়া টেনে ধরেছে। ওপরের ঠোঁট উলটে গেছে। তিনটে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। দারুণ জ্বলজ্বলে এক মাথা লালচে চুল কপাল আর চোখ ঢেকে রেখেছে। গায়ে রঙিন শার্ট আর ছেঁড়া কোট। নোংরামি দিয়েও কুৎসিত মুখ ঢাকা যায়নি।

'বিউটিফুল, তাই না?' বলে ইনস্পেকটর।

'সেইজন্যেই তো তৈরি হয়ে এসেছি— রূপটাকে ফুটিয়ে তোলা দরকার।' বলে ব্যাগ খুলে একটা বিরাট স্পঞ্জ বার করল হোমস।

'এ আবার কী!' হেসে ফেলে ইনস্পেকটর।

'আস্তে খুলুন দরজাটা— শব্দ না হয়।'

প্রায় নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল ইনস্পেকটর। ঘরের কোণে জলপাত্রে স্পঞ্জ ডুবোল হোমস এবং আচমকা গায়ের জোরে ঘষতে লাগল ঘুমন্ত বন্দির মুখখানা।

সেইসঙ্গে সে কী চিৎকার, 'আলাপ করিয়ে দিই আসুন, ইনিই নিখোঁজ মি. নেভিল সিনক্লেয়ার।'

যেন ম্যাজিক দেখলাম চোখের সামনে। স্পঞ্জের জোরালো ঘর্ষণে দেখতে দেখতে যেন একটা খোসা উঠে গেল ভিখিরিটার মুখ থেকে— ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল তেলকালি আর দগদগে কাটার দাগটা। হ্যাঁচকা টানে অন্তর্হিত হল লাল টকটকে পরচুলা।

লজ্জায় অধোবদনে বিছানায় উঠে বসল খাঁটি ভদ্রলোকের চেহারা নিয়ে এক ব্যক্তি। পরমুহূর্তেই বুঝল— খেল খতম। আর্ত চিৎকার করে আছড়ে পড়ল বিছানায়।

ইনস্পেকটর হতবাক হয়ে গেছিল। এখন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, 'আরে সর্বনাশ! ইনিই তো নেভিল সিনক্লেয়ার— ছবিতে এই চেহারাই তো দেখেছি।'

বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মরিয়া সুরে নেভিল সিনক্লেয়ার বললেন, 'বেশ করেছি। আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তো বলুন।'

'অভিযোগ?' মুচকি হেসে ইনস্পেকটর বলল, 'সেটা তো প্রায় আত্মহত্যার অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়— নিজেই নিজেকে গুমখুন করেছেন।'

হোমস বললে, 'না তা নয়। অভিযোগটা স্ত্রীকে ঠকানোর। তাঁকে সব বলা উচিত ছিল।'

'কী করে বলি বলুন, যদি ছেলে-মেয়েরা জেনে ফেলে? মাথা কাটা যাবে যে।'

'এখন কি আর কিছু চাপা থাকবে। কেলেঙ্কারি যদি এড়াতে চান তো থানায় এজাহার দিয়ে যান— ইনস্পেকটর মনে করলে আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াতে দেবেন না। আপনিও ছাড়া পাবেন।'

ককিয়ে উঠলেন সিনক্লেয়ার, 'বলল, বলব, সব বলব। এ-কথা ছেলে-মেয়েদের কানে উঠলে বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারব না। তার চাইতে ফাঁসিতে মরা ভালো।

'শুনুন কী হয়েছিল ব্যাপারটা! এক সময়ে আমি খুব দেশ বেড়িয়েছি, অভিনয় করেছি, সাংবাদিকতাও করেছি। লেখাপড়াও করেছিলাম ভালোভাবে। একদিন ভিখিরিদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ফরমাশ হল আমার ওপর। ভেবে দেখলাম, ভিখিরিদের নাড়িনক্ষত্র জানতে হলে ভিখিরি সাজাই ভালো। অভিনয় করতে জানতাম বলে ভিখিরির ছদ্মবেশটা ধরলাম ভালোই, ভিক্ষেও করলাম সারাদিন, খুচরো পয়সা গুনতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল! মাত্র সাত ঘণ্টায় ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি!

'যাই হোক, অভিজ্ঞতাটা হঠাৎ একদিন কাজে লেগে গেল। দেনার দায়ে রাতের ঘুম উড়ে গেছিল। পঁচিশ পাউন্ড দেনা মিটিয়ে দিলাম দশ দিনের ভিক্ষের টাকায়!'

'এরপর থেকেই পুরোপুরি ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করলাম। প্রথমটা একটু দোটানায় পড়েছিলাম। অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেছিল টাকার লোভ আর আত্মসম্মানে। শেষ পর্যন্ত সহজে টাকা রোজগারের লোভ আর ছাড়তে পারলাম না। সাংবাদিকতা করেও এত টাকা কখনো পাব না। রোজ বাড়ি থেকে

বেরোতাম ভদ্রলোক সেজে, আফিংয়ের আড্ডার দোতলায় ভিখিরি সাজতাম, বিকেল হলে ওখান থেকেই ফের ভদ্রলোক সেজে বাড়ি ফিরতাম। লস্করটার মুখ বন্ধ রেখেছিলাম পয়সা খাইয়ে।

'এইভাবেই একদিন বাড়ি কিনলাম, বিয়ে করলাম, বাবা হলাম। আমার রোজগার এখন বছরে সাতশো পাউন্ড। আমার চেহারা আর কথার জন্যেই এত রোজগার সম্ভব হয়েছে।'

'গত সোমবার ভিখিরির সাজপোশাক ছেড়ে ভদ্রলোক সাজছি, এমন সময়ে জানলা দিয়ে রাস্তায় স্ত্রীকে দেখলাম। এদিক-ওদিক কাকে খুঁজছে দেখে ভড়কে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠি। সঙ্গেসঙ্গে জানলা থেকে সরে এসে লস্করকে বলি স্ত্রীকে যেন ওপরে উঠতে না-দেয়। নীচে যখন চেঁচামেচি চলছে, আমি তখন নতুন করে ভিখিরি সাজছি— এ এমনই ছদ্মবেশ যে বউ পর্যন্ত ঠকে যাবে জানতাম। কিন্তু পাছে পুলিশের হাঙ্গামা হয়, তাই খুচরো পয়সা দিয়ে কোটোটা ভারী করে ফেলে দিলাম নদীতে। অন্য জামাকাপড়গুলো ফেলবার আগেই এসে হাজির হল পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই লস্করটাকে একটা চিঠি লিখে দিই স্ত্রী-র নামে— সেইসঙ্গে খুলে দিয়েছিলাম হাতের আংটিটা— যাতে উদ্‌বেগে না-থাকে।'

'চিঠি তো পেয়েছেন কালকে।'

'কালকে। সে কী! তাহলে এই সাতটা দিন তো ভীষণ উদ্‌বেগে কেটেছে বেচারির।'

'লস্করের পেছনে পুলিশ ঘুরছিল যে— চিঠিখানা তাই কাউকে দিয়ে কালকে পোস্ট করেছে,' বললে ইনস্পেকটর। 'যাই হোক, ব্যাপারটা আমি ধামাচাপা দিতে পারি যদি এ-কাজ জন্মের মতো ছেড়ে দেন। হিউ বুন হওয়া আর চলবে না।'

'কথা দিচ্ছি।'

'মি. হোমস, এতবড়ো ধাঁধাটা সমাধান করলেন কী করে বলুন তো?'

'বালিশের পাহাড়ে বসে এক আউন্স তামাককে ধোঁয়া বানিয়ে,' বলে হাসতে হাসতে আমাকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল শার্লক হোমস।

টীকা

১. **বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য** : 'দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইস্টেড লিপ' ১৮৯১-এর ডিসেম্বর মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য স্ট্রেঞ্জ টেল অব আ বেগার' নামে ১৮৯২-এর জানুয়ারি সংখ্যায়।

২. **আফিমের রস** : পপি-গাছের কাঁচা বীজের থেকে নিষ্কাষিত আফিমের রস বা লডেনাম (Laudanum) ভিক্টোরীয় ইংলন্ডে বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৩. **লন্ডন ব্রিজের** : প্রথম লন্ডন ব্রিজ টেমস নদীর ওপর নির্মিত হয়, রোমান শাসকদের রাজত্বে ৪৩ খ্রিস্টাব্দে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির পর এই ব্রিজের বহুবার মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। টেমসের ওপরে লন্ডনে প্রথম প্রস্তর নির্মিত সেতুটির নির্মাণ শেষ হয় ১২০৯ সালে। ওই ব্রিজের সামান্য উত্তরে অবস্থিত যে-সেতুর কথা বর্তমান কাহিনিতে বলা হয়েছে, সেটি তৈরি হয় ১৮৩১-এ।

৪. **আফিং-এর নল** : লম্বা নলের প্রান্তে আটকানো ধাতব বাটির মধ্যে আফিম রেখে নলের অপর প্রান্ত দিয়ে আফিং সেবন করা হয়। আফিং সংক্রান্ত নানাবিধ বিধিনিষেধ থাকলেও ইংরেজরা চিন এবং অন্যান্য দেশে নিয়মিত আফিং রপ্তানি করে এসেছে।

৫. **একঘোড়ার হালকা গাড়ি :** এই গাড়ি সম্ভবত ডগ-কার্ট। দু-চাকার এই গাড়িতে পিঠোপিঠি অবস্থায় দুজনের বসবার ব্যবস্থা। পিছনের আসনটি ভাঁজ করে কুকুর নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত, তাই এই গাড়ির নাম ডগ-কার্ট হয়েছে।

৬. **অক্টেভো সাইজের :** ছাপা কাগজ আট ভাঁজ করে সেলাই করা বই। দু-ভাঁজের বইকে ফোলিয়ো সাইজ এবং চার ভাঁজের বইকে কোয়ার্টো সাইজ বলা হয়।

৭. **ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট :** এই গল্প ছাড়া 'দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল' এবং 'দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব' গল্পে ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিটকে দেখা গিয়েছে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইনস্পেকটরের পোস্টিঙের অঞ্চল বদলে যেতে দেখা যায়।

নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্লু কারবাঙ্কল]

বড়োদিনের দু-দিন পরে মঙ্গল কামনা করতে গিয়েছিলাম বন্ধুবর শার্লক হোমসের আস্তানায়। ঘরে ঢুকে দেখলাম আরামকেদারায় শুয়ে আছে সে। গায়ে বেগনি ড্রেসিং গাউন, হাতের কাছে তাক ভরতি তাম্রকূট সেবনের পাইপ, সদ্যপড়া খবরের কাগজের ডাঁই, একটা বিতিগিচ্ছিরি থেঁতলানো শতচ্ছিদ্র পশমের গোল টুপি, আতশকাচ আর ফরসেপস, মানে সন্না। অর্থাৎ টুপি পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

বললাম, 'কাজে বাগড়া দিলাম মনে হচ্ছে?'

'আরে বোসো।' টুপি দেখিয়ে— 'ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি অসামান্য।'

'সাংঘাতিক অপরাধ নাকি?'

'না, না অপরাধ-টপরাধের ব্যাপার এটা নয়— কিন্তু বেশ বিদঘুটে।'

'তার মানে আইন ভাঙা হয়নি, কিন্তু রহস্যময়? এ-রকম তিনটে কেস এর আগেও লিখেছি।'

'সেইরকমই বটে। পিটারসনকে চেনো তো?'

'ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান?'

'হ্যাঁ। টুপিটা তারই আবিষ্কার! মালিক কে, কোথায় থাকে জানা যায়নি। বড়োদিনের দিন ভোর চারটে নাগাদ টটেনহ্যাম কোর্ট রোড দিয়ে ফেরবার সময়ে ও দেখে সাদা রাজহংসী কাঁধে তালঢ্যাঙা একটা লোক টলতে টলতে যাচ্ছে। আচমকা কতকগুলো গুন্ডার সঙ্গে লাগল কথা কাটাকাটি, শেষে মারামারি। ঢ্যাঙা লোকটার টুপি লাঠির ঘায়ে ছিটকে যেতেই সে লাঠি তুলল মারবার জন্যে— লাঠি লাগল পেছনে দোকানে জানলার কাচে— ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল কাচ। গুন্ডাদের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্যে পিটারসন তখন সেদিকেই দৌড়েছে। লোকটা কিন্তু কাচ ভাঙার জন্যে হকচকিয়ে গেছিল। এমন সময়ে ইউনিফর্ম পরা পিটারসনকে দৌড়ে আসতে দেখে পুলিশ ভেবে ভোঁ দৌড় দিল সেখান থেকে— রাজহাঁসটা[২] ফেলে গেল রাস্তায়।

'পিটারসন বেচারা পড়ল মহা ফাঁপরে। রাজহাঁসের বাঁ-পায়ে ছোট্ট একটা কার্ডে কেবল লেখা : মিসেস হেনরি বেকারের জন্যে। টুপির লাইনিংয়েও H.B.[৩] অক্ষর দুটি সুতো দিয়ে লেখা। কাকে ফিরিয়ে দেবে রাজহাঁস বুঝতে না-পেরে পিটারসন এল আমার কাছে। ও তো

জানে সমস্যা যত সাধারণই হোক না কেন, আমি কখনো নারাজ হই না। এই দু-দিন বহাল তবিয়তেই ছিল রাজহাঁস... এখন নিয়ে গেছে পিটারসন— এতক্ষণে রান্নাও বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গেছে। যার হাঁস তার ভোগে লাগল না, এইটাই যা দুঃখ। টুপিটা কেবল রেখেছি মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যে।'

'ঠিকানা তো জান না, ফেরত দেবে কী করে?'

'ঠিকানা এই টুপি থেকেই উদ্ধার করব।'

'কী যে বল!'

'বিশ্বাস হল না? বেশ, এই নাও তোমার আতশকাচ। আমার পরীক্ষা পদ্ধতি তুমি জান। দেখি, টুপি দেখে টুপির মালিককে কীরকম আঁচ করতে পার।'

উলটেপালটে দেখলাম জীর্ণ, বিধ্বস্ত, শ্রীহীন টুপিটা। অত্যন্ত মামুলি ফেল্ট টুপি, রং কালো, আকারে গোল, বেশ শক্ত, লাল লাইনিং একপাশে লেখা দুটো অক্ষর— H.B. আলনায় ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে কয়েক জায়গায় ছ্যাঁদা হয়ে গেছে, ধুলো যে কোথায় লাগেনি বলা মুশকিল, অনেক রকমের দাগও লেগেছে— কালি বুলিয়ে সে-দাগ ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে। ছিরিছাঁদ একেবারেই নেই— তার ওপর বহু ব্যবহারের ফলে অবস্থা বেশ কাহিল। একটা ঢাকনা পরানো হয়েছে টুপি যাতে বেশি নষ্ট না হয়। ইলাস্টিক ছিঁড়ে গেছে।

ফিরিয়ে দিলাম টুপি। বললাম, 'কিছুই দেখছি না।'

'উঁহু, একেবারে উলটো বললে। সবই দেখেছ। কিন্তু চোখের দেখাকে মনের যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারছ না। সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই ঘাবড়ে যাও বড্ড।'

'বেশ তো, তোমার সিদ্ধান্তটাই শোনা যাক না।'

নিবিড় চোখে, টুপির দিকে তাকিয়ে রইল হোমস। চাহনির মধ্যে ফুটে উঠল সেই অন্তর্মুখিতা— যা ওর বৈশিষ্ট্য।

বলল আত্মনিমগ্ন কণ্ঠে, 'লোকটা মাথা খাটিয়ে খায়। এখন একটু টানাটানি চলছে—বছর তিনেক আগে অবস্থা সচ্ছল ছিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারত এককালে— এখন সে-গুণ গোল্লায় গেছে— ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা বা দূরদৃষ্টি আর নেই। নৈতিক অধঃপতন থেকেই তা সম্ভব হয়েছে— খুব সম্ভব মদ ধরেছে— বউয়ের ভালোবাসা হারিয়েছে সেই কারণেই। সম্পত্তি খুইয়েছে নেশা করতে গিয়েই।'

'ভায়া হোমস! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

'ইদানীং লোকটা আত্মসম্মান কিছুটা রাখতে পারছে। কুঁড়ে, ঘরকুনো, হাতের কাজে আনাড়ি, লাইম-ক্রিম[৪] মাখে, চুলের রং ধূসর। চুল কেটেছে এই সেদিন, মাঝবয়েসি, বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা বোধ হয় নেই।'

'খুব ঠাট্টা জুড়েছ দেখছি!'

'এত স্পষ্ট করে বলার পরেও কিছু ধরতে পারছ না।'

'মানছি আমার মাথায় ঘিলু কম। কিন্তু বুঝলে কী করে যে টুপির মালিক মাথা খাটিয়ে খায়?'

টুপিটা নিজের মাথায় দিল হোমস— কপাল ছাড়িয়ে এল নাক পর্যন্ত। বলল, 'দেখলে? এত বড়ো যার মাথার সাইজ[৫], সে মাথা খাটিয়ে খাবে না তো কি গতর খাটিয়ে খাবে?'

'সম্পত্তি খুইয়েছে বুঝলে কী করে?'

'এই ফ্যাশনের টুপি বছর তিনেক আগে চালু ছিল, দামও খুব বেশি। সুতরাং তিন বছর আগে এত দামি টুপি কেনার যার ক্ষমতা ছিল, তিন বছরেও আরও একটা টুপি কিনতে পারেনি দেখে কি মনে হয় না তার অবস্থা পড়ে গেছে?'

'দূরদৃষ্টি হারিয়েছে বললে কেন? নৈতিক অধঃপতনের খবরই-বা জানলে কী করে?'

'আগে দূরদৃষ্টি ছিল বলেই ধুলো হাওয়া থেকে টুপি রক্ষে করার জন্যে ঢাকনা পরিয়েছিল! এখন দূরদৃষ্টি নেই বলেই ইলাস্টিক ছিঁড়ে যাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে লাগায়নি! স্বভাব প্রকৃতিও যে কমজোরি হয়ে আসছে— এটাও তার প্রমাণ। তবে আত্মসম্মান সম্বন্ধে সজাগ বলেই কালি বুলিয়ে দাগ ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'সদ্য চুল ছেঁটেছে বলেই কাঁচিতে কাটা কুচো চুল লেগে ভেতরে, লাইমক্রিমের গন্ধও বেশ নাকে আসছে, বাদামি ধুলোটা রাস্তার ধুলোবালি নয়— ভেতরকার, অর্থাৎ ঘরকুনো মানুষ। ভেতরটা ভিজে-ভিজে চটচটে, মানে চট করে মাথা ঘেমে যাওয়ার অভ্যেস আছে। যারা বেশি মাথা খাটায় হাতে কম কাজ করে— তাদের মাথাই টুপির ভেতরে এইভাবে ঘামে।'

'স্ত্রী আগের মতো ভালোবাসেন না তুমি জানলে কী করে?'

'ভালোবাসলে রোজ বুরুশ দিয়ে টুপির ধুলো ঝেড়ে দিতেন। কিন্তু এ-টুপিতে ধুলো চামাটি ধরে গেছে।'

'হয়তো বিয়েই করেনি।'

'দুর! বউকে তোয়াজ করার জন্যেই তো হাঁসের ডান পায়ে চিরকুট ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঘাড়ে করে।'

'বাড়িতে গ্যাস নেই কে বলল তোমাকে?'

'পাঁচ জায়গায় চর্বি মোমের দাগ রয়েছে। এক হাতে টুপি আর এক হাতে জ্বলন্ত মোম নিয়ে ওপর তলায় উঠেছেন বলেই এমন হয়েছে। বাড়িতে গ্যাসের আলো থাকলে কি চর্বি-মোমের ফোঁটা পড়ত তা থেকে?'

হোমসের বুদ্ধির তারিফ করলাম। হোমস জবাব দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঝড়ের মতো ঢুকল পিটারসন। চোখ-মুখ লাল উত্তেজনায় অস্থির।

বললে রুদ্ধশ্বাসে, 'স্যার, স্যার, সেই রাজহাঁসটা।'

'সে কী! জ্যান্ত হয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে গেল নাকি?'

'এই দেখুন। হাঁসের গলার থলিতে[৬] আটকে ছিল! আমার বউ তো হতভম্ব!' বলে হাতের তেলোয় একটা মটরের দানার মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল নীলচে মণি দেখাল পিটারসন। যেন লক্ষ রোশনাই ছিটকে গেল হাত নাড়াতেই। সোজা হয়ে বসল শার্লক হোমস— আঁতকে উঠে আমি বললাম, 'আরে সর্বনাশ! এই কি সেই নিখোঁজ রত্ন? কাউন্টেস অফ মোরকারের নীলকান্ত পদ্মরাগ[৭]?'

'ধরেছ ঠিক। ক-দিন ধরেই "টাইমস"[৮] কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। শুধু পুরস্কারই দেওয়া হবে হাজার পাউন্ড— যা ওর আসল দামের বিশ ভাগের এক ভাগও নয়[৯]।'

মাথা ঘুরে গেল পিটারসনের। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

হোমস বললে, 'কাউন্টেস তো শুনছি তাঁর আধখানা সম্পত্তিও দিতে রাজি এই মণির বিনিময়ে— ব্যাপারটা সেন্টিমেন্টাল।'

'মণি তো হারিয়েছিল কসমোপলিটান হোটেলে[১০]?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ। পাঁচ দিন আগে জন হর্নার নামে এক পাইপ সারানোর মিস্ত্রি নাকি রত্নটা লোপাট করে গয়নার বাক্স থেকে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল পুরো ব্যাপারটা।'

কাগজের ডাঁই থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে পড়ে শোনাল হোমস :

হোটেল কসমোপলিটানে মণি লুঠ! ছাব্বিশ বছর বয়স্ক প্লাম্বার জন হর্নারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টেস অফ মোরকারের নীলকান্ত পদ্মরাগ মণি চুরির অপরাধে। ঘটনাটা ঘটে এ-মাসের বাইশ তারিখে কসমোপলিটান হোটেলে। চুল্লির একটা শিক হঠাৎ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল বলে হোটেল পরিচালক জেমস রাইডার ডেকে আনেন হর্নারকে। কিছুক্ষণ হর্নারের সঙ্গেই ছিলেন তিনি, তারপর অন্যত্র যান কাজের তাড়ায়। ফিরে এসে দেখেন হর্নার অদৃশ্য, আলমারির কপাট ভাঙা, আর একটা গয়নার বাক্স ডালা খোলা অবস্থায় পড়ে টেবিলে। এই দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন রাইডার, ছুটে আসে কাউন্টেসের পরিচারিকা ক্যাথরিন কুশাক। ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারকে যখন গ্রেপ্তার করতে যান, তখন সে ভীষণ চেঁচামেচি করে, আর ধস্তাধস্তি করে। বিনা দোষে তাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু আগেও একবার চুরির দায়ে হর্নার জেল খেটেছে শুনে বিচারপতি তাকে উচ্চতর আদালতে সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময়ে তার চোখে অনুতাপের যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে।'

পড়া শেষ করে হোমস বললে, 'হুম! এ তো গেল আদালতের খবর। কিন্তু নীলকান্ত পদ্মরাগ হাঁসের পেটে গেল কী করে এবং হেনরি বেকার মশায় ওইরকম শ্রীহীন টুপি মাথায় দিয়ে সেই রাজহাঁস ঘাড়ে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন কেন, এবার তা জানতে হবে। বেশ রহস্যজনক ব্যাপার, তাই না ওয়াটসন? সান্ধ্য কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন দিতে হবে দেখছি।'

'কী বলবে বিজ্ঞাপনে?'

'পেনসিল আর কাগজ দাও, লেখা যাক। এবার শোনো :

'গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা রাজহংসী আর একটা কালো পশমের টুপি পাওয়া গেছে। আজ সন্ধে সাড়ে ছ-টায় ২২১বি বেকার স্ট্রিটে এসে মিস্টার হেনরি বেকার নিয়ে যেতে পারেন।'

'কিন্তু হেনরি বেকারের চোখে পড়বে তো?'

'বন্ধুবান্ধবের চোখেও তো পড়তে পারে— মিস্টার হেনরি বেকারের নাম দেখলেই তাঁকে খবরটা জানিয়ে দেবে। সবকটা সান্ধ্য দৈনিকে বেরুবে বিজ্ঞাপনটা।'

'মণিটা?'

'আমার কাছেই থাক। পিটারসন, একটা ভালো দেখে বদলি রাজহাঁস কিনে দিয়ে যেয়ো— ফেরত দিতে হবে তো।'

পিটারসন বিদেয় হতেই ঝলমলে মণিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বললে, 'সামান্য একটা কার্বনের ডেলা[১১] বই তো নয়— বয়স এখনও কুড়ি বছরও হয়নি— ওজনও মাত্র চল্লিশ গ্রেন— পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ চীনের অ্যাময় নদীর[১২] তীরে— পদ্মরাগ মণি চুনির মতো লাল হয়, এ হল নীলকান্ত। এইটেই এর বৈশিষ্ট্য। তাই এত কম বয়সেই এর জন্যে দুটো

খুন, একবার অ্যাসিড নিক্ষেপ, একটা আত্মহত্যা এবং বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয়ে গেছে। বড়োই কুটিল অতীত। কাজেই আপাতত থাকুক আমার সিন্দুকে। কাউন্টেসকে খবর পাঠাব পরে।'

'হর্নার কি নির্দোষ?'

'বলা মুশকিল। তবে হেনরি বেকার নির্দোষ বলেই মনে হয়। গরিব মানুষ, ভাবতে পারেননি যাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন, তার দাম নিরেট সোনার হাঁসের চাইতেও বেশি। আসুক বিজ্ঞাপনের জবাব, তখন বোঝা যাবে।'

'তাহলে আমি রুগি দেখতে চললাম, আসব সন্ধের সময়ে। ব্যাপারটার রহস্যমোচন ঘটে কী করে দেখতে হবে।'

যথাসময়ে বেকার স্ট্রিটের বাসাবাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি লম্বা মতো এক ভদ্রলোক গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা কোট গায়ে দিয়ে মাথায় স্কচ টুপি[১৩] পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আসতেই দরজা খুলে গেল। দুজনেই উঠে গেলাম হোমসের ঘরে।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, 'বসুন, মি. হেনরি বেকার। এত ঠান্ডায় বড্ড পাতলা কোট পরে বেরিয়েছেন— বসুন আগুনের সামনে। এই টুপি আপনার তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারই।'

ভদ্রলোকের বেশ দোহারা চেহারা, গোল কাঁধ, বিরাট মাথা, প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, তলার দিকটা সরু হয়ে এসে ঠেকেছে ছুঁচোলো ধূসর-বাদামি দাড়িতে। নাক থুতনি ঈষৎ লালচে, হাত কাঁপছে থির থির করে। দেখে মনে পড়ে গেল হোমসের আন্দাজি কথাগুলো। শার্ট পরেননি— কোটের কলার তুলে দিয়ে গলা পর্যন্ত এঁটেছেন। কবজি খুবই সরু। কথা বলেন কাটাকাটা স্বরে— শব্দ বাছাইয়ের যেন বেশ বাছবিচার আছে, যেন ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছেন শিক্ষিত খানদানি এক পুরুষ।

হোমস বললে, 'ভেবেছিলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন।'

কাষ্ঠ হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'পয়সা কোথায় যে বিজ্ঞাপন দেব? আগে ছিল— এখন অযথা খরচ করতে মন চায় না। আমি ভেবেছিলাম গুন্ডার দল টুপি আর হাঁস নিয়ে পালিয়েছে।'

'হাঁসটা কিন্তু আমাদের পেটে চলে গেছে।'

'অ্যাঁ!' লাফিয়ে উঠলেন হেনরি বেকার।

'বদলি হাঁস একটা রেখেছি— ওই দেখুন। ওজনে একই।'

'আঃ, বাঁচালেন!'

'আপনার হাঁসের পালক, পা, গলার থলি অবশ্য রেখেছি। যদি চান তো—'

অট্টহেসে হেনরি বেকার বললেন, 'কী যে বলেন! মরা পাখির পালক নিয়ে আমি কী করব? টাটকা পাখিটাকে দিন, বিদেয় হই।'

আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে নিল হোমস।

বলল, 'এই নিন আপনার জিনিস। আচ্ছা, হাঁসটা কিনলেন কোত্থেকে দয়া করে বলবেন? এ-রকম প্রথম শ্রেণির রাজহাঁস বড়ো একটা দেখা যায় না।'

উঠে দাঁড়িয়ে হেনরি বেকার ততক্ষণে হাঁস আর টুপি বগলদাবা করে ফেলেছেন। বললেন, 'মিউজিয়ামের কাছে[১৪] আলফা-ইনের মালিক উইন্ডিগেট একটা রাজহংসী ক্লাব খুলেছিল। ফি

হপ্তায় কয়েক পেনি জমা রাখলেই বড়োদিনে পাওয়া যাবে একটা হাঁসপাখি। আমিও চাঁদা দিয়েছিলাম— তাই পেয়েছিলাম ওই হাঁস। চললাম।' বিদেয় হলেন হেনরি বেকার। হোমস বললে, 'দেখলে তো ভদ্রলোক নির্দোষ। মণির খবর রাখেন না। তোমার যদি খুব খিদে না-পেয়ে থাকে, চলো একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা যাক।'

'চলো।'

বেরিয়ে পড়লাম শীতের রাতে। ডাক্তার-পাড়ার মধ্যে দিয়ে অনেক রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছোলাম আলফা-ইন সরাইখানায়[১৫]। দু-গেলাস বিয়ারের হুকুম দিয়ে মালিককে হোমস বললে, 'তোমার হাঁসের মতো বিয়ারটাও আশা করি অতি উত্তম হবে।'

'আমার হাঁস!' আকাশ থেকে পড়ল সরাইওলা।

'আরে হ্যাঁ। এইমাত্র হেনরি বেকারের কাছে তোমার সুখ্যাতি শুনে এলাম।'

'তাই বলুন। ও হাঁস তো আমি কিনেছি অন্য দোকান থেকে।'

'কোত্থেকে?'

'কভেন্ট গার্ডেনের[১৬] ব্রেকিনরিজের কাছ থেকে। দু-ডজন হাঁস কিনেছিলাম।'

আর কথা না-বাড়িয়ে বিয়ারে চুমুক দিল হোমস। শেষ করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছোলাম কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে।

ব্রেকিনরিজ লোকটাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। বেশ বড়ো দোকানের মালিক। ঘোড়ার মতো চেহারা, মুখটায় যেন শান দেওয়া, পরিপাটি করে ছাঁটা জুলপি। একটা ছোকরা চাকরকে নিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করছে।

'গুড ইভনিং,' বললে হোমস। 'হাঁস সব বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।'

'কাল সকালে আসুন, পাঁচ-শো দেব।'

'উঁহু, তাতে হবে না।'

'তাহলে পাশের দোকানে চলে যান।'

'কিন্তু সুপারিশ করা হয়েছে তোমাকেই।'

'কে করেছে?'

'আলফা-ইনের মালিক।'

'ও হ্যাঁ, দু-ডজন হাঁস কিনেছে বটে।'

'চমৎকার জাতের হাঁস। কোত্থেকে জোগাড় করেছিলে বল তো?'

'ভালো জ্বালা দেখছি!' রেগে গেল দোকানদার। 'কোত্থেকে হাঁস পেয়েছি তা নিয়ে আপনার কী দরকার?'

'কিন্তু এত ছোট্ট ব্যাপারে এ-রকম রেগে উঠছ কেন বুঝছি না।'

'আরে মশাই এই একই কথা আজ কতবার শুনলাম জানেন? যান, সরে পড়ুন।'

'কারা তোমাকে জ্বালিয়েছে জানি না— কিন্তু আমি এসেছিলাম বাজি জিততে।'

'বাজি জিততে!' উৎসুক দেখা গেল দোকানদারকে।

'আরে হ্যাঁ, হাঁসটা পাড়াগাঁয়ের, না শহরের— এই নিয়ে বাজি ধরেছে একজন। আমি বলছি গাঁইয়া পাখি— সে বলছে শহুরে।'

'তাহলে তো মশাই আপনিই হেরেছেন। এটা খাস লন্ডন শহরের হাঁস।'

'মোটেই না। এক গিনি বাজি ধরছি!'

'ধরেছেন? তবে দেখুন।'

ঝপাঝপ অনেকগুলো খাতা খুলে ফেলল চোয়াড়ে দোকানদার। দেখিয়ে দিল ২২ ডিসেম্বর ১১৭ নম্বর ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশটের কাছ থেকে সাড়ে সাত শিলিং দিয়ে কিনেছিল দু-ডজন হাঁস— সেই হাঁসই বেচেছে উইন্ডিগেটকে বারো শিলিংয়ে।

অকাট্য প্রমাণ। নিজের চোখে ঠিকানা দেখল হোমস। মুখখানা ব্যাজার করে এক গিনি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পেট ফাটা হাসি হাসল অনেকক্ষণ।

বললে, 'যখনই কারো জুলপি দেখবে ওইভাবে ছাঁটা আর পকেটে দেখবে গোলাপি রুমালের কোণ— বুঝবে তাকে বাজির নেশায় কিস্তিমাত করা যাবে। এক-শো পাউন্ড ঘুস দিতে চাইলেও ওকে নোয়াতে পারতাম না। যাক গে এবার যাওয়ার দরকার মিসেস ওকশটের কাছে। যা শুনলাম, তাতে তো দেখছি আমি ছাড়াও আরও অনেকে হাঁসের ঠিকানা জানতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজেই—'

আচমকা ভীষণ চেঁচামেচি শুনলাম। ঘুরে দেখি, দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ব্রেকিনরিজ। ঘুসি তুলে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে গলাবাজি করছে যাকে লক্ষ করে চেহারার দিক দিয়ে সে নেহাতই ভিজে বেড়াল। মুখটা ইঁদুরের মতো। খর্বকায়। ভয়ে সিটিয়ে গেছে।

'ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান করতে আসেন তো কুকুর লেলিয়ে দেব। হাঁস কি আপনার কাছ থেকে কিনেছি? মিসেস ওকশটকে নিয়ে আসুন— যা বলবার তাঁকেই বলব।'

গুঙিয়ে উঠল খুদে লোকটা, 'কিন্তু হাঁসের চালানে আমার হাঁসটাও যে মিশে গিয়েছিল।'

'সেটা মিসেস ওকশটকে গিয়ে বলুন।'

'মিসেস ওকশট তোমাকেই জিজ্ঞেস করতে বললে।'

'তাহলে প্রুশিয়ার[১৭] রাজাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। বেল্লিক কোথাকার!' বলে মারমুখো ভঙ্গিমায় তেড়ে গেল ব্রেকিনরিজ। চম্পট দিল খর্বকায় লোকটা।

হোমস কানে কানে বললে, 'আঃ বাঁচা গেল। ব্রিক্সটন রোডে আর কষ্ট করে যেতে হবে না,' বলেই পেছন নিল লোকটার। লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরে ফেলল একটু পরেই। কাঁধে হাত রাখতেই আঁতকে উঠে লাফিয়ে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে। গ্যাসবাতির আলোয় দেখা গেল নীরক্ত হয়ে গিয়েছে ইঁদুরের মতো মুখখানা।

নরম সুরে হোমস বললে, 'ব্রেকিনরিজকে যা বলছিলেন, আমি তা শুনে ফেলেছি।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম শার্লক হোমস। যে-খবর প্রাণপাত করেও কেউ জানতে পারে না— আমি তা জেনে ফেলি এবং সেইটাই আমার পেশা।'

'আমার ব্যাপার আপনি জানেন?'

'জানি বই কী। আলফা ইন থেকে মি. হেনরি বেকার যে-রাজহাঁসটি এনেছিলেন, সেটি সরাইওলা উইন্ডিগেট কিনেছিল ব্রেকিনরিজের কাছ থেকে।'

'আপনিই উপযুক্ত লোক'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

'আঃ কী উপকারই করলেন আমার!' 'চলুন আমার বাড়ি,' একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল হোমস, 'কিন্তু কথা বলছি কার সঙ্গে এখনও জানলাম না।'

সামান্য দ্বিধা করল লোকটা। তারপর বলল, 'আমার নাম জন রবিনসন।'

'উঁহু,' মধুক্ষরা স্বর হোমসের, 'আসল নামটা বলুন।'

মুখ লাল হয়ে গেল খর্বকায় ব্যক্তির, 'জেমস রাইডার।'

'ঠিক, ঠিক, হোটেল কসমোপলিটানের পরিচারক। উঠুন গাড়িতে। যা জানতে চান, সব বলব।'

জেমস রাইডার গাড়িতে উঠল বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল মহা ধাঁধায় পড়েছে। এক চোখে আশা, আর এক চোখে ভয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগল আমাদের মুখের দিকে। সঘন নিশ্বাস আর হাত কচলানোর মধ্যে ফুটে উঠল নার্ভাসনেস।

আধ ঘণ্টা লাগল বেকার স্ট্রিট পৌঁছোতে। ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করার পর সোল্লাসে বলল হোমস, 'আপনি একটা সাদা হাঁসের পেছনে ধাওয়া করেছেন, তার ল্যাজের দিকে কালো ডোরা কাটা। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' লাফিয়ে উঠল জেমস রাইডার।

'এই ঘরেই ছিল। খানদানি পাখি। মারবার পরেও একটা রত্ন পেড়ে গেছে। নীল ডিম!'

আর একটু হলেই টলে পড়ে যেত রাইডার— ম্যান্টলপিস আঁকড়ে ধরে সামলে নিল কোনোমতে। রীতিমতো টলছে তখনও। সিন্দুক খুলে অত্যাশ্চর্য নীলকান্ত পদ্মরাগ তুলে দেখাল হোমস। যেন লক্ষ রোশনাই ঠিকরে গেল পাথর থেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল রাইডার।

শান্ত কণ্ঠে হোমস বললে, 'জেমস রাইডার, খেল খতম। আহা পড়ে যাবেন যে! ওয়াটসন, তুমি বরং ওঁকে একটু ব্র্যান্ডি গিলিয়ে দাও। এই ধাত নিয়ে এসব পথে আসা কেন বাপু?'

ব্র্যান্ডিতে কাজ হল। ভয়ার্ত চোখে হোমসের দিকে চেয়ে রইল রাইডার।

গম্ভীর গলায় হোমস বললে, 'রাইডার, কাউন্টেসের নীলকান্ত পদ্মরাগের কথা আপনি জানলেন কী করে?'

'ক্যাথরিন কুশাক বলেছিল।'

'কাউন্টেসের সেই পরিচারিকা? পাক্কা শয়তান হওয়ার মতো সব উপাদানই আপনার মধ্যে আছে, জেমস রাইডার। হর্নারের অতীত দুষ্কর্ম আপনি জানতেন। তাই ইচ্ছে করেই কাউন্টেসের ঘরের চুল্লির একটা শিক আলগা করে ডেকে এনেছিলেন এই হর্নারকেই— যাতে সন্দেহ তার ঘাড়েই পড়ে। সে বেরিয়ে যেতেই গয়নার বাক্স ভেঙে মণি সরিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছিলেন।'

দড়াম করে আছড়ে পড়ে খপাত করে বন্ধুবরের দু-পা আঁকড়ে ধরল জেমস রাইডার, 'আমাকে বাঁচান স্যার। আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।'

'দেখা যাবে কী করা যায়,' বজ্রকণ্ঠে বললে হোমস। 'মণিটা হাঁসের পেটে গেল কী করে? হাঁসটাই-বা দোকানে চালান হল কীভাবে?'

'বলছি, স্যার, সব বলছি। মণি পকেটে নিয়ে মহা অশান্তিতে পড়েছিলাম। পুলিশ আমার বাড়ি পর্যন্ত সার্চ করতে পারে। কী করি? কোথায় রাখি? শুকনো মুখে গেলাম ব্রিক্সটন রোডে বোনের বাড়ি— ওকশটকে বিয়ে করেছিল সে। হাঁস-মুরগি পালে, বড়ো করে বিক্রি করে। বসে বসে পাইপ খাচ্ছি আর ভাবছি কী করা যায়, এমন সময়ে পায়ের কাছে হাঁস চলতে দেখে একটা জবর বুদ্ধি মাথায় এল। অনেকদিন ধরেই বোন বলছিল, এবার বড়োদিনে সবচেয়ে মোটা একটা হাঁস আমাকে এমনিই দেবে। মণিটা সেইরকম একটা হাঁসকে খাইয়ে দিলেই তো হয়। তারপর হাঁস নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে'খন! যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ল্যাজে কালো ডোরাকাটা একটা হাঁসকে চেপে ধরে মণিটা ঠেলে দিলাম গলায়— গিলেও ফেলল কোঁৎ করে— কিন্তু এমন প্যাঁক প্যাঁক করতে লাগল যে দৌড়ে এল আমার বোন। হাঁসটা সেই ফাঁকে আমার হাত ফসকে মিশে গেল অন্য হাঁসের মধ্যে। বোনকে বললাম, তুই যে একটা হাঁস দিবি বলেছিলি, এবার দে। ও বলল— বেশ তো নাও যেটা খুশি। আমি হাঁসটাকে ধরে এনে মেরে নিয়ে গেলাম বাড়ি। পেট কাটবার পর যখন পাথর খুঁজে পেলাম না— তখন বুঝলাম সর্বনাশ হয়েছে। ভুল করে অন্য হাঁস মেরে এনেছি— আসলটা বোনের বাড়িতেই রয়ে গেছে। তক্ষুনি গেলাম। দেখি, কোনো হাঁসই নেই। বোনকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, সব হাঁস চালান হয়ে গেছে কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটের ব্রেকিনরিজের দোকানে।

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, ''ল্যাজে কালো ডোরা-কাটা একটা হাঁস ছিল তার মধ্যে?''

'ছিল। ও-রকম দুটো হাঁস ছিল— হুবহু একরকম।'

'শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল আমার। বুঝলাম কী কাণ্ড ঘটেছে। ছুটলাম কভেন্ট গার্ডেনে। ব্রেকিনরিজ হাঁস বেচে দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই বলছে না কাকে বেচেছে। সারাদিন কত জিজ্ঞেস করেছি— বার বার হাঁকিয়ে দিয়েছে। আপনারাও শুনলেন কীরকম ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। যে-জিনিসের জন্যে এতবড়ো পাপ করলাম ভালো করে তা দেখতে পর্যন্ত পেলাম না।'

বলতে বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল জেমস রাইডার।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্য চেপে বসল ঘরে। টেবিলের কোণে আঙুল ঠুকে বাজনা বাজিয়ে চলল শার্লক হোমস।

তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে বলল, 'দূর হও।'

'বাঁচালেন! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন!'

'আবার কথা! বেরোও বলছি।'

দুমদাম করে সিঁড়িতে আওয়াজ শুনলাম, দড়াম করে খুলেই বন্ধ হয়ে গেল সদর দরজা, পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

মাটির পাইপটা তুলে নিয়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, দৈবাৎ এ-কেসে নাক গলিয়ে ফেলেছি— কাজেই কর্তব্য করে গেলাম। এত ভয় পেয়েছে লোকটা যে হর্নারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আর যাবে না— সে বেচারিও খালাস পেয়ে যাবে। পুলিশের মাইনে-করা চাকর আমি নই— তাই ক্ষমা করলাম আসল চোরকে[১৮]। যদি না-করি, যদি জেলে পাঠাই, তাহলে দেখবে সমাজে আর একটা দাগি চোরের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এখন যা করলাম, এর ফলে আর কোনোদিন এ-পথ ও মাড়াবে না। এবার ঘণ্টা বাজাও। বুনো মুরগির মাংস দিয়ে তদন্ত শুরু করা যাক।'

টীকা

১. **নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার :** প্রথম প্রকাশ স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন জানুয়ারি ১৮৯২ এবং নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯২-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। এ ছাড়া ওই সময়েই ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার এবং অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় 'দ্য ক্রিসমাস গুজ দ্যাট সোয়ালোড আ ডায়মন্ড' নামে। স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল' নামে।

২. **রাজহাঁসটা :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে ক্রিসমাসের ডিনারে রাজহাঁসের রোস্ট খাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে আমেরিকার প্রভাবে হাঁসের জায়গা নেয় টার্কি। পাখির রোস্টের সঙ্গে খাওয়া হত প্লাম-পুডিং এবং মাংসর পিঠে বা 'পাই'।

৩. **H.B. :** অনেক হোমস-গবেষক লক্ষ করেছেন H.B. আদ্যক্ষর-বিশিষ্ট নামের চরিত্র দেখা গিয়েছে 'দ্য নোব্‌ল ব্যাচেলর' এবং 'ব্ল্যাক পিটার' গল্পে।

৪. **লাইম-ক্রিম :** মাথার চুলের এই জনপ্রিয় ক্রিমে লেবুর গন্ধ ব্যবহার করা হত।

৫. **এত বড়ো যার মাথার সাইজ :** ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত ধারণা, যার মাথার আকার বড়ো, তার বুদ্ধি বেশি। এই ধারণা যে ভুল তা প্রথম বলেন ভিয়েনার অধিবাসী, চিকিৎসক ফ্রানজ যোসেফ গল।

৬. **হাঁসের গলার থলি :** হাঁসের গলার থলিতে এভাবে কিছু আটকে থাকার সম্ভাবনার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন জীববিদ্যা-বিশারদ।

৭. **নীলকান্ত পদ্মরাগ :** পদ্মরাগ বা গার্নেট সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা, বাদামি বা হালকা বেগুনি রঙের হলেও নীল কখনো দেখা যায় না।

৮. **টাইমস :** ১৭৮৫-র পয়লা জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র ডেইলি ইউনিভার্সাল রেজিস্টারের নাম ১৭৮৮ থেকে দ্য টাইমস হয়।

৯. **আসল দামের বিশভাগের একভাগও নয় :** পুরস্কারের বিশগুণ অর্থাৎ কুড়ি হাজার পাউন্ড যদি বারো ক্যারাটের দাম হয়, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন সমালোচক। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯১-এ রাশিয়ার রাজদণ্ডে লাগানো ১৯৪ ক্যারাটের অরলফ ডায়মন্ডের দাম ধার্য হয়েছিল নব্বই হাজার পাউন্ড, হোপ ডায়মন্ডের দাম ধরা হয়েছিল ত্রিশ হাজার পাউন্ড।

১০. **কসমোপলিটান হোটেলে :** সেই সময়ে বিদেশ থেকে আসা রাজন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন উঠতেন লন্ডনের ক্ল্যারিজস হোটেলে। ফরাসি সম্রাজ্ঞী ইউজিনের সঙ্গে ১৮৬০-এ এই হোটেলেই সাক্ষাৎ করেন রানি ভিক্টোরিয়া। ১৮৮৯-এর অগাস্ট মাসে 'স্যাভয়' হোটেল খোলা হওয়ার পর সেখানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থাকতে শুরু করেন।

১১. **কার্বনের ডেলা :** হিরে হল কার্বনের ডেলা। কিন্তু গার্নেট বা পদ্মরাগ গঠিত হয় ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সংমিশ্রণে।

১২. **অ্যাময় নদী :** অ্যাময় কোনো নদী নয়, দক্ষিণ চিনের একটি শহর। বর্তমান নাম জিয়ামেন (Xiamen)। প্রথম আফিম-যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দখলে আসে অ্যাময়। এই শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম জিউ-লুঙ।

১৩. **স্কচ টুপি :** উলের তৈরি গোল, নরম টুপি।

১৪. **মিউজিয়ামের কাছে :** লন্ডন শহরে একাধিক নামি মিউজিয়াম থাকলেও 'মিউজিয়াম' বলতে প্রথমেই মনে আসে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নাম। বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার হান্স স্লোন-এর (১৬৬০-১৭৫৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং আরও কিছু জিনিস নিয়ে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৩ সালে। মন্টেগু হাউসে এটি স্থানান্তরিত হয় ১৭৫৯-এর ১৫ জানুয়ারি।

১৫. **আলফা-ইন সরাইখানা :** আলফা-ইন নামটি কল্পিত হলেও ক্রিস্টোফার মর্লের মতে এটি মিউজিয়ম ট্যাভার্ন কিংবা ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং লিটল রাসেল স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত 'প্লাও'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

১৬. **কভেন্ট গার্ডেন :** কভেন্ট গার্ডেন মার্কেট ছিল সেকালের সবজি, ফল এবং ফুলের এক বিশাল বাজার। এ ছাড়া মাংস, পোলট্রি এবং মুদিখানার জিনিসপত্রের বাজারও ছিল এখানে।

১৭. **প্রুশিয়া :** জার্মানির অন্তর্গত সর্ববৃহৎ রাজ্য প্রুশিয়ার রাজধানী ছিল বার্লিন। ১৮৬১-তে প্রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রথম উইলিয়ম। অস্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ এবং ফ্র্যাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে জয়ের পর প্রথম উইলিয়ম জার্মান সাম্রাজ্যের 'কাইজার' হন ১৮৭১-এ।

১৮. **ক্ষমা করলাম আসল চোরকে :** হোমস-বিশেষজ্ঞ রবার্ট কিথ লেভিট হিসেব কষেছেন, চোদ্দোটি কেস-এ হোমস অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছেন।

ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য স্পেকলড ব্যান্ড]

শার্লক হোমস মামলা হাতে নিত বেছে। উদ্ভট, অদ্ভুত, ফ্যানট্যাসটিক রহস্য না-হলে টাকার প্রলোভনেও আজেবাজে কেসে নাক গলাত না। ও ভালোবাসত জটিল ধাঁধার সমাধান করতে এবং ভালোবাসার টানেই দেখেছি গত আট বছরে সত্তরটি[২] অত্যদ্ভুদ মামলার সমাধান করেছে। এর প্রতিটিতে ওর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমি পেয়েছি, ওর আশ্চর্য তদন্ত পদ্ধতি লক্ষ করেছি। এইসবের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর কেস হল স্টোকমোরানের নামকরা ফ্যামিলি রয়লটদের ব্যাপারটা।

১৮৮৩ সালে এপ্রিল তখন সবে শুরু হয়েছে। সাতসকালে ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম, আমাকে ঠেলে তুলেছে শার্লক হোমস স্বয়ং। অথচ চিরকালই বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো ওর অভ্যেস।

'ওয়াটসন, মক্কেল এসেছেন। তরুণী মক্কেল। এত সকালে যখন বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে কেসটা ইন্টারেস্টিং। তোমাকে তাই না-ডেকে পারলাম না।'

'আরে ভাই, ভালোই করেছ। এ-সুযোগ কেউ ছাড়ে।'

আশ্চর্য বিশ্লেষণী শক্তি আর যুক্তির খেলা দেখিয়ে হোমস যেভাবে রহস্য সমাধান করে, তা চিরকালই আমার কাছে একটা গভীর আনন্দের ব্যাপার। তাই চটপট সেজেগুজে নিয়ে গেলাম বসবার ঘরে। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন একজন মহিলা। মুখটা কালো ওড়নায় ঢাকা।

প্রসন্ন কণ্ঠে হোমস বললে, 'আমার নাম শার্লক হোমস। ইনি আমার প্রাণের বন্ধু ড. ওয়াটসন— সহযোগীও বটে। এঁর সামনেই সব কথা বলতে পারেন। আপনি বরং আগুনের পাশে বসুন। শীতে কাঁপছেন দেখছি।'

'শীতে নয়, মি. হোমস আমি ভয়ে কাঁপছি,' বলে মুখ থেকে ওড়না সরালেন মেয়েটি। দেখলাম, সত্যিই উদ্‌বেগ আতঙ্কে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, চোখে ভয়তরাসে চাহনি। বয়স তিরিশের নীচে। অকালে চুল পেকেছে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত পিচ্ছিল চাহনি বুলিয়ে নিয়ে হোমস অভয় দিয়ে বলল, 'ভয় কী? সব ঠিক হয়ে যাবে। সকালের ট্রেনে এলেন?'

'হ্যাঁ। আপনি তাহলে চেনেন আমাকে?'

'না, চিনি না, তবে রিটার্ন টিকিটটা দস্তানায় গুঁজে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কাক-ডাকা ভোরে। এক ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়িতে স্টেশনে পৌঁছেছেন। রাস্তা অনেকখানি এবং খুবই খারাপ।'

ভদ্রমহিলা হতভম্ব হয়ে গেলেন।

মৃদু হাসল হোমস, 'জামার সাত জায়গায় কাদা লাগিয়ে এসেছেন। এক ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কোচোয়ানের বাঁ-পাশে বসলে তবে ওইভাবে কাদা ছিটকে লাগে গায়ে।'

'ধরেছেন ঠিক। সত্যিই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ছ-টার আগে। মি. হোমস, এ অবস্থা বেশিদিন চললে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব আমি। আপনি আমাকে বাঁচান। এই মুহূর্তে আপনাকে টাকাকড়ি দিতে পারব না— কিন্তু দু-এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে আমার। আমার টাকা তখন আমারই হাতে আসবে। আপনার পাওনা আমি মিটিয়ে দেব।'

'আপনার সমস্যাটা বলুন।'

'সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ধোঁয়াটে ব্যাপারের জন্যে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছি। একমাত্র একজনই আমাকে উচিত পরামর্শ দিতে পারেন এ-পরিস্থিতিতে— কিন্তু তিনিও খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। ভাবছেন সবটাই মনগড়া ব্যাপার— ভয় পেয়ে উলটোপালটা ভাবছি। মেয়েলি কল্পনা। আপনার কাছে ছুটে এসেছি সেই কারণেই।'

'বেশ তো বলুন না।'

'আমার নাম হেলেন স্টোনার। স্টোকমোরানের[৩] রয়লট ফ্যামিলির শেষ বংশধর আমার

সৎ-বাবা। এককালে এ-বংশের প্রতাপ ছিল, টাকার জোর ছিল— এখন দু-শো বছরের বাড়িটা আর কয়েক একর জমি ছাড়া কিছু নেই।

'আমার সৎ-বাবা এই বংশের শেষ পুরুষ। উনি ভাগ্য ফেরানোর জন্যে কলকাতায় যান, ডাক্তারি করে যথেষ্ট রোজগার করেন। তারপর একদিন রাগের মাথায় খাস চাকরকে মারতে মারতে একদম মেরে ফেলায় কোনোমতে ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে যান, কিন্তু জেল খাটতে হয় অনেক দিন। জেল থেকে বেরিয়ে চলে আসেন ইংলন্ডে।

'বেঙ্গল আর্টিলারির[৪] মেজর স্টোনার আমার বাবা। আমরা দুই বোন— জুলিয়া আর আমি— যমজ। উনি মারা যাওয়ার পর আমাদের বয়স যখন মাত্র দু-বছর, মা বিয়ে করে ডা. রয়লটকে। বিয়েটা হয় ভারতবর্ষে।

'মায়ের যা টাকা ছিল, তা থেকে বছরে হাজার পাউন্ড আয় হত। সৎ-বাবাকে মা সব টাকাই উইল করে দিয়েছিলেন একটা শর্তে। আমাদের বিয়ের পর কিছু টাকা দুই বোনকে দিতে হবে[৫]।

'ইংলন্ডে ফিরে আসার পর আট বছর আগে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মা মারা যায়। লন্ডনে প্র্যাকটিস কররেন ভাবছিলেন সৎ-বাবা, এই ঘটনার পর তিনি আর সেসবের মধ্যে গেলেন না। স্টোকমোরানে বাপ-ঠাকুরদার ভিটেতে ফিরে এলেন।

'প্রতিবেশীরা তখন খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু দু-দিন যেতে-না-যেতেই তারা সৎ-বাবার ছায়া মাড়ানোও ছেড়ে দিল। কারণ তাঁর বদমেজাজ। বাড়ি থেকে বেরোতেন না, কারো সঙ্গে মিশতেন না। বংশের আদিপুরুষের মতো এমনিতেই রগচটা ছিলেন— অনেকদিন গরমের দেশে থাকার ফলে মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা ঝামেলা পুলিশ কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এই সেদিন গাঁয়ের কামারকে পাঁচিলের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন নদীর জলে। গায়ে তাঁর আসুরিক শক্তি। মেলামেশা করেন যাযাবর বেদেদের[৬] সঙ্গে। নিজের কাঁটা জমিতে তাদের থাকতে দেন। নিজেও মাঝে মাঝে তাঁদের তাঁবুতে গিয়ে থাকেন— ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। ভারতবর্ষের জন্তুজানোয়ার পুষতে ভালোবাসেন। একটা চিতাবাঘ[৭] আর একটা বেবুন[৮] তো নিজের বাগানেই ছেড়ে রাখেন— তল্লাটের কেউই তাই আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে চায় না। কোনো চাকরবাকরও বাড়িতে থাকতে চায় না। আমরা দুই বোন সব কাজ করেছি। জুলিয়া মারা যায় তিরিশ বছর বয়সে। আমার মতন তারও চুলে পাক ধরেছিল মৃত্যুকালে।'

'বোন মারা গেছেন?'

'দু-বছর আগে। বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় কেউই আমরা সুখে ছিলাম না। কোথাও বেরোতে পারতাম না— মাসির কাছে যাওয়া ছাড়া। মাসি বিয়ে-থা করেনি— থাকত হ্যারোতে। সেইখানেই গিয়ে থাকতাম মাঝে মাঝে। দু-বছর আগে বড়োদিনের সময়ে সেখানেই নৌদপ্তরে এক আধা মাইনের রিটায়ার্ড মেজরের সঙ্গে জুলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়। স্টোকমোরানে ফিরে আসার পর সৎ-বাবা বিয়ের কথা শুনলেও কোনো আপত্তি করেননি। দিন কয়েক পরেই মানে, বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগে, একটা লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল। মারা গেল জুলিয়া।'

এতক্ষণ চোখ মুদে শুনছিল হোমস। এবার অর্ধনিমীলিত চোখে বললে, 'সমস্ত বলবেন— কিচ্ছু বাদ দেবেন না।'

'নিশ্চয় বলব। সেই ভয়ংকর রাতের কোনো কথাই এ-জীবনে আর ভুলতে পারব না।

স্টোকমোরানের জমিদার ভবন দু-শো বছরের পুরোনো। পোড়োবাড়ির অবস্থায় পৌঁছেছে। একটা অংশে কোনোমতে থাকা যায়। শোবার ঘরগুলো একতলায়। একটা বারান্দার পাশে পাশাপাশি তিনটে শোবার ঘর। তিনটে ঘরেরই জানলার পাশে ঘাস-ছাওয়া লন। প্রথম ঘরটা সৎ-বাবার, দ্বিতীয়টা জুলিয়ার, তৃতীয়টা আমার। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার দরজা নেই— কিন্তু সব ঘরের দরজা আছে একই বারান্দার। বসবার ঘরটা বাড়ির মাঝের অংশে।

'ভয়ংকর সেই রাতে সৎ-বাবা একটু তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন। ঘরে গিয়ে কড়া চুরুট খেতে লাগলেন। ভারতীয় চুরুট। নিজের ঘরে বসে সেই গন্ধে তিষ্ঠোতে না-পেরে জুলিয়া এল আমার ঘরে। আসন্ন বিয়ে সম্বন্ধে একটু গল্পগুজব করার পর এগারোটা নাগাদ উঠে দাঁড়াল নিজের ঘরে যাবে বলে। তারপর বললে, 'হেলেন, তুই কি রাতে শিস দিস?'

আমি বললাম, 'না তো।'

ও বলল, 'কিন্তু রোজ রাতে শিসের আওয়াজ শুনছি ক-দিন। আমি ভাবলাম তুই বুঝি ঘুমিয়ে শিস দেওয়া আরম্ভ করেছিস।'

আমি বললাম, 'দুর আমি কেন দেব। ওই পাজি বেদেগুলোর কাণ্ড নিশ্চয়।'

ও বলল, 'তাহলে তো তুইও শুনতে পেতিস। লন থেকে শিস দিলে তোর কানেও যাওয়া উচিত।'

আমি বললাম, 'তোর মতন পাতলা ঘুম তো নয় আমার।'

'জুলিয়া তখন চলে গেল নিজের ঘরে। ভেতর থেকে দরজায় তালা দেওয়ার আওয়াজ পেলাম।'

শার্লক হোমস বললে, 'রোজ রাতে দরজায় তালা দেন নাকি?'

'দিই। বাগানে চিতাবাঘ আর বেবুন ছাড়া থাকে বললাম না? দরজায় তালা না-দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি না।'

'তারপর?'

ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই। জানেন তো যমজদের আত্মা সূক্ষ্ম যোগসূত্রে বাঁধা থাকে। তাই আসন্ন দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনায় ঘুমোতে পারছিলাম না কিছুতেই। অজানা আতঙ্কে কাঠ হয়ে ছিলাম বিছানায়। বাইরে ঝড়ের হুংকার, জানলায় বৃষ্টির ঝাপটা শুনছি আর শুনছি। আচমকা ঝড়বাদলার এই মাতামাতির মধ্যেই শুনলাম নারীকণ্ঠের একটা ভয়ার্ত চিৎকার। বিষম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে আমার বোন— গলা শুনেই বুঝলাম। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে গায়ে শাল জড়িয়ে ছুটে গেলাম করিডরে। দরজা যখন খুলছি, তখন যেন একটা চাপা শিসের শব্দ কানে ভেসে এল। ঠিক যেমনটি আমার বোন বলেছিল— অবিকল সেইরকম। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝন ঝন ঝনাৎ করে আওয়াজ কানে ভেসে এল। যেন ধাতুর কিছু পড়ে গেল। করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখলাম আস্তে আস্তে কবজার ওপর ঘুরে যাচ্ছে বোনের ঘরের দরজা। আতঙ্কে কাঠ হয়ে চাইলাম সেইদিকে— না-জানি কী জিনিস বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে। বারান্দায় আলোয় কিন্তু দেখলাম, আমার বোনই বেরোচ্ছে ঘর থেকে, ভয়ে বিকট হয়ে গিয়েছে মুখ, দু-হাত সামনে বাড়িয়ে হাওয়া আঁকড়াবার চেষ্টা করছে, মাতালের মতো সারাশরীর দুলছে। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। ঠিক তখনই ওর হাঁটু আর ভার সইতে পারল না— লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। এমনভাবে

পাকসাট খেতে লাগল যেন বিষম যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে শরীরটা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাকে বুঝি চিনতেই পারছে না। তারপরেই আচমকা যন্ত্রণায় ভাঙা গলায় ভীষণ চিৎকার করে বললে, 'হেলেন! হেলেন! ডোরাকাটা পটি! ফুটকি দাগওলা ডোরাকাটা সেই পটি!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আঙুল তুলে ডাক্তারের ঘরের দরজাও দেখিয়েছিল— কিন্তু যন্ত্রণার নতুন তাড়সে সিটিয়ে যেতে মুখ দিয়ে কথা আর বেরোল না। আমি ছুটে গিয়ে তারস্বরে ডাকলাম সৎ-বাবাকে। ড্রেসিংগাউন গায়ে হন্তদন্ত হয়ে উনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বোনের পাশে এসে যখন পৌঁছোলেন, তখন তার জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি গলায় ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলেন, গাঁ থেকে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করলেন— কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না— জুলিয়া আর জ্ঞান ফিরে পেল না। জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল একটু একটু করে— মারা গেল অজ্ঞান অবস্থাতেই। ভয়াবহভাবে শেষ হয়ে গেল আমার প্রাণপ্রিয় বোন।'

হোমস বাধা দিয়ে বললে, 'এক সেকেন্ড। ধাতব আওয়াজ আর শিস দেওয়ার শব্দটা ঠিক শুনেছেন তো?'

'যেরকম ঝড়জলের আওয়াজ হচ্ছিল, তাতে ভুল শোনা বিচিত্র নয়। ভুল শুনেছি বলেই আমার বিশ্বাস। সেকেলে বাড়ি তো, হাজার রকম ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হয় ঝড়ের রাতে।'

'জুলিয়ার পরনে পোশাক কী ছিল?'

'শোয়ার পোশাক। বাঁ-হাতে দেশলাই, ডান হাতে একটা পোড়া কাঠি[৯]।'

'গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। সর্বনাশের মুহূর্তে দেশলাই জ্বালিয়ে উনি দেখেছিলেন। করোনার কী বলেন?'

'অনেক তদন্ত করেও তিনি মৃত্যুর সঠিক কারণ বার করতে পারেননি, ডা. রয়লটের বদনাম তো কম নয়। কুখ্যাত হয়ে গিয়েছেন গোটা তল্লাটে।'

আমার সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, সেকেলে খড়খড়ি আর লোহার মোটা গরাদওলা জানলাও বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। দেওয়াল নিরেট, মেঝেও নিরেট। চওড়া চিমনির মুখ চারটে শিক দিয়ে বন্ধ। সোজা কথায়, মারা যাওয়ার সময়ে জুলিয়া একলাই ছিল। তা ছাড়া ওর শরীরে জোরজবরদস্তিরও কোনো দাগ বা চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

'বিষ দেওয়া হয়েছিল কি না দেখা হয়েছে?'

'ডাক্তাররা দেখেছেন— বিষ পাননি।'

'মৃত্যুর কারণটা তাহলে আঁচ করতে পারেন?'

'সাংঘাতিক ভয়ে স্নায়ুতে চোট পেয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভয় পেল কেন, সেইটাই বুঝতে পারছি না।'

'জিপসিরা কি তখন বাগানেই ছিল?'

'সবসময়েই তো থাকে— তখনও ছিল জনাকয়েক।'

'ডোরাকাটা ফুটকি দাগওয়ালা পটিটা কী হতে পারে?'

'জিপসিরা অনেকে ওইরকম রুমাল মাথায় বাঁধে। হয়তো প্রলাপ বকেছে।'

হোমসের মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম খুশি হতে পারেনি জবাব শুনে।

বলল, 'খুবই গভীর জলের ব্যাপার। যাকগে, আপনি বলে যান।'

'একা একা কাটল দুটো বছর। মাসখানেক আগে আমারও বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। সৎ-বাবা কোনো আপত্তি করেননি। দিন দুয়েক আগে বাড়ির পশ্চিম দিকে মেরামতির কাজ আরম্ভ হল, আমার শোবার ঘরের দেওয়াল ফুটো করা হল। বাধ্য হয়ে বোনের ঘরে এসে শুলাম রাতে— বোনেরই খাটে শুতে হল নিরুপায় হয়ে। আমার মানসিক অবস্থা তখন কীরকম অনুমান করে নিন। একদম ঘুমোতে পারছি না— কেবল এপাশ-ওপাশ করছি। গভীর রাতে আচমকা শুনলাম সেই শিসের শব্দ— যে-শিস শুনেছিলাম জুলিয়া মারা যাওয়ার রাতে। আঁতকে উঠে নেমে পড়লাম খাট থেকে। সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। ভোররাতে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম— সোজা এসেছি আপনার কাছে।'

'ভালোই করেছেন,' বলল শার্লক হোমস, 'কিন্তু মিস স্টোনার, আপনি তো সব কথা খুলে বলেননি— সৎ-বাবার অনেক কীর্তিই আপনি চেপে গেছেন।'

বলেই, হেলেন স্টোনারের কবজির ওপর থেকে জামার কাপড় সরিয়ে দিল হোমস। দেখলাম, পাঁচ আঙুলের স্পষ্ট কালসিটের দাগ।

'জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে[১০] আপনার সঙ্গে, তাই না?'

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল মেয়েটির। তাড়াতাড়ি কবজি ঢেকে বললে :

'গায়ে আসুরিক জোর তো— খেয়াল থাকে না।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তন্ময় হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে রইল হোমস।

তারপর বললে, 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। হাতে সময়ও বেশি নেই। আজই আপনাদের বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই— কিন্তু সৎ-বাবা যেন জানতে না-পারেন। সম্ভব হবে?'

'হ্যাঁ হবে। উনি আজকে শহরে আসবেন জানি।'

'তাহলে ওই কথাই রইল। বিকেল নাগাদ আমরা দুই বন্ধু আপনার বাড়ি যাচ্ছি।'

মিস স্টোনার চলে যাওয়ার পর হোমস বললে, 'ওয়াটসন, কী বুঝলে?'

'অকূল রহস্য। দিশে পাচ্ছি না। জুলিয়া মারা যাওয়ার সময়ে ঘরে তো কেউ ছিল না। তাহলে?'

'তাহলে মরবার সময়ে ডোরাকাটা ফুটকি দাগওলা পটির কথা বলে গেল কেন? কেনই-বা শিসের শব্দ শোনা যেত রাতে?'

'আমার মাথায় আসছে না।'

'ভায়া, ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়েই দেখ না। প্রথমেই ধরে নাও সৎমেয়ের বিয়ে আটকালে ডাক্তারের আর্থিক লাভ রয়েছে। তারপরেই দেখ ভদ্রলোকের সঙ্গে জিপসিদের দহরম-মহরম এবং রাত্রে শিসের আওয়াজ। ডোরাকাটা পটির কথা বলেই মিস স্টোনারের জ্ঞান লোপ এবং একটা ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দ— যা কিনা খড়খড়ি বন্ধ করার জন্যে লোহার খিল ফেলার আওয়াজ হতে পারে। সবকটা ঘটনা এক সুতোয় গাঁথলে রহস্য-সূত্র পাওয়া যাবেই। আরে! আরে! এ আবার কোন আপদ।'

দড়াম করে দরজা খুলে মূর্তিমান উৎপাতের মতো ঘরে ঢুকল দানবাকৃতি এক বৃদ্ধ। মাথার টুপি প্রায় দরজায় ঠেকেছে, এত লম্বা। নিশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে। বলিরেখা আঁকা মুখটা হলুদ হয়ে এসেছে রোদে পুড়ে। মুখের পরতে পরতে অনেক দুষ্কর্ম প্রকট হয়ে রয়েছে। চোখ

তো নয়— যেন আগুনের ভাঁটা— রাগে জ্বলছে। বাজপাখির মতো সরু খাড়া নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছে। সব মিলিয়ে যেন একটা প্রেতচ্ছায়া।

হাতের চাবুকটা নাড়তে নাড়তে ক্রুদ্ধ হুংকার ছেড়ে বললে আগন্তুক, 'শার্লক হোমস কোন জন?'

'আমি,' শান্তস্বরে বললে বন্ধুবর, 'আপনি?'

'স্টোকমোরানের ডাক্তার গ্রাইমসবি রয়লট।'

'বসুন।'

'বসতে আসিনি। আমার সৎ-মেয়ে এখানে এসেছিল। কেন?'

'বড়ো ঠান্ডা পড়েছে বাইরে।'

'কী বলছিল?' হিংস্র চিৎকার ছাড়ল বৃদ্ধ।

'তাহলে ক্রুকাস ভালোই ফুটবে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলে গেল হোমস।

'আচ্ছা! এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? স্কাউন্ড্রেল কোথাকার! তোমাকে আমি চিনি, এগিয়ে এসে নাকের ডগায় চাবুক নাড়তে নাড়তে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল বৃদ্ধ। পরের ব্যাপারে কাঠি দেওয়া তোমার স্বভাব।'

হাসল হোমস।

'পরচর্চায় বড্ড আনন্দ, না?'

হোমসের হাসি সারামুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লক্কা পায়রা কোথাকার!'

প্রাণ খুলে খুক খুক করে হেসে হোমস বললে, 'আপনার কথায় বেশ মজা আছে। যাওয়ার সময়ে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন— ঠান্ডা ঝাপটা আসছে।'

'যা বলতে এসেছি, সেটা বলব, তারপর যাব। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না শার্লক হোমস। মিস স্টোনারের পেছন পেছন আমি এসেছি— আমি জানি এখানে সে এসেছিল! আমি কিন্তু লোক খুব খারাপ— ঘাঁটিয়ো না। দেখ তবে— বলেই আগুন খোঁচানোর লোহার ডান্ডাটা বিশাল বাদামি হাতে তুলে বেঁকিয়ে ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসে।

'আমার মুঠোয় পড়লে এই দশাই হবে বলে দিলাম। দংষ্ট্রাসহ জিঘাংসাকে প্রকট করে তুলে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অসুর আকৃতি।

'অমায়িক মানুষ বটে,' হেসে বলল হোমস। 'আমার চেহারাটা অবশ্য অত বিরাট নয়, তবে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলে দেখিয়ে দিতাম কবজির জোরে আমিও কম যাই না,' বলে ইস্পাতের ডান্ডাটা তুলে এক ঝটকায় ফের সিধে করে দিল আগের মতো।

'লোকটার স্পর্ধা দেখ! আমাকে কিনা সরকারি ডিটেকটিভ বলে গাল পাড়ে! যাকগে, ভালোই হল। তদন্ত করার উৎসাহটা আরও বেড়ে গেল। মেয়েটার ওপর এখন অত্যাচার না-হলেই হয়। ওয়াটসন, প্রাতরাশ খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আমি বেরোব একটু খোঁজখবর নিতে।'

দুপুর একটা নাগাদ বাড়ি ফিরল হোমস। হাতে একতাড়া কাগজ। তাতে অনেক কিছু লিখে এনেছে।

বললে, 'মিস স্টোনারের মা যে উইল করে গেছেন, তা দেখে এলাম। আগে এক বছরের আয় ছিল ১১০০ পাউন্ড। এখন ৭৫০ পাউন্ড।[১১] বিয়ে হলে প্রত্যেক মেয়ে বছরে পাবে ২৫০ পাউন্ড। অর্থাৎ দুই মেয়েই পাত্রস্থ হলে ভদ্রলোকের ভাঁড়ে থাকে মা ভবানী। নাও হে ওয়াটসন, এবার ওঠো। সকালের কাজটা বৃথা যায়নি— এবার শুরু হোক বিকেলের কাজ। সঙ্গে রিভলভারটা নিয়ো। যে-লোক কথায় কথায় লোহার ডান্ডা বাঁকায়, তার সঙ্গে রিভলভার নিয়ে কথা বলাই ভালো।'

স্টোকমোরানে পৌঁছে দেখলাম মিস স্টোনার আমাদের জন্যেই বাড়ির বাইরে পায়চারি করছেন।

হোমসকে দেখেই সাগ্রহে বললে, 'ডক্টর রয়লট লন্ডন গেছেন— ফিরতে সেই সন্ধে।'

'জানি। দেখা হয়েছে আমাদের সঙ্গে,' বলে ঘটনাটা বলল হোমস।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন মিস স্টোনার, 'সাংঘাতিক ধড়িবাজ তো! পেছন নিয়েছিলেন?'

অভয় দিয়ে হোমস বললে, 'ঘাবড়াবেন না। ওঁর চাইতেও ধড়িবাজ লোক ওঁরই পেছনে এবার লেগেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে মাসির কাছে রেখে আসব। চলুন, ঘরটা দেখে আসি।'

সুপ্রাচীন প্রাসাদের প্রায় সবটাই পড়ো-পড়ো অবস্থায় পৌঁছেছে। একদিকে বাসোপযোগী একটা অংশে রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে। ভারা বাঁধা। কিন্তু মিস্ত্রি নেই। একটা বারান্দার ওপর পাশাপাশি তিনটে ঘর। শেষের ঘরটায় দেওয়াল ভাঙা। হোমস সে-ঘরে গেলই না। যে-ঘরে মিস স্টোনার রাত কাটিয়েছেন, সেই ঘরের লনের দিককার জানলার লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ। ভেতর থেকে হুড়কো দিয়ে খড়খড়ি আটকানোর পর বাইরে থেকে অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারল না।

হোমস বললে, 'মিস স্টোনার, আপনার শোবার ঘরটা মেরামত না-করলেই কি চলছিল না?'

'কোনো দরকারই ছিল না। আমার তো মনে হয় ওই অছিলায় উনি আমাকে মাঝের ঘরে সরিয়েছেন।'

'তাহলে চলুন, ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখা যাক।'

ঘরটা সাদাসিদে, বহু পুরোনো দেওয়াল, আসবাবপত্র মামুলি। দেওয়াল-ঘেঁষা একটা সরু খাট, সিন্দুক, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার। এক কোণে বসে তীক্ষ্ণ চোখে সব কিছুই যেন মনের পর্দায় এঁকে নিতে লাগল হোমস।

বিছানার পাশে একটা দড়ি ঝুলছিল কড়িকাঠের কাছ থেকে। ঝুমকো প্রান্ত লুটিয়ে বালিশে।

হোমস বললে, 'দড়িটা কীসের?'

'ঘণ্টার। হাউসকিপারের ঘর পর্যন্ত গিয়েছে।'

'এ-ঘরের সব কিছুই তো দেখছি পোকায় খাওয়া। দড়িটা সে তুলনায় অনেক নতুন মনে হচ্ছে।'

'এই তো বছর দুই হল লাগানো হয়েছে।'

'বোন বলেছিল বলে?'

'না, না। জুলিয়া চায়নি। ঘণ্টা টেনে ফরমাশ করা আমাদের ধাতে নেই। কাজকর্ম নিজেরাই করি।'

'দাঁড়ান, মেঝেটা দেখি,' বলে আতশকাচ হাতে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল হোমস। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝে পর্যবেক্ষণ করল নিমগ্ন চিত্তে। মেঝের প্রত্যেকটা ফাটা, দেওয়ালের তক্তা তন্নতন্ন করে দেখার পর গেল খাটের কাছে। স্থির চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বুলোল দেওয়ালের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। সবশেষে ঘণ্টার দড়ি ধরে মারল টান।

টেনেই বললে, 'আরে! এ তো দেখছি মেকি ব্যাপার!'

'বাজছে না বুঝি?'

'বাজবে কী করে? তারের সঙ্গে বাঁধা থাকলে তো! ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখছি। নিজেই দেখুন না হাওয়া যাতায়াতের ঘুলঘুলির ঠিক ওপরে হুকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দড়িটা।'

'এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! লক্ষই করিনি অ্যাদ্দিন।'

'অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আশ্চর্য ব্যাপার আরও আছে এ-ঘরে। যেমন ধরুন এমন বোকা রাজমিস্ত্রি কখনো দেখেছেন যে হাওয়া যাতায়াতের জন্যে পাশের ঘরের দেওয়ালে ঘুলঘুলি বানায়? একই মেহনতে খোলা বাতাস আনা যেত যদি ঘুলঘুলিটা বানানো হত বাইরের দেওয়ালে!'

'ওটাও সম্প্রতি তৈরি।'

'ঘণ্টার দড়ি যখন এসেছে, সেই সময়ে তো?'

'হ্যাঁ। কিছু রদবদল করা হয়েছিল তখন।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং রদবদল, মিস স্টোনার। এক নম্বর, ডামিঘণ্টার দড়ি— ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। দু-নম্বর— এমন একটা ভেন্টিলেটর যা ভেন্টিলেটরের কাজ করে না।— এবার পাশের ঘর নিয়ে রিসার্চ করা যাক।'

ডা. গ্রাইমসবি রয়লটের ঘরখানা একটু বড়ো— কিন্তু আসবাবপত্র একইরকম সাদাসিদে। ক্যাম্পখাট, কাঠের তাকভরতি বই— বেশির ভাগই যন্ত্রশিল্প সম্পর্কিত, বিছানার পাশে একটা আর্মচেয়ার, দেওয়ালের পাশে একটা কাঠের মামুলি চেয়ার, একটা গোল টেবিল, একটা বড়ো লোহার সিন্দুক। চুলচেরা চোখে তন্ময় হয়ে প্রতিটি বস্তু দেখল হোমস।

সিন্দুকে আঙুল ঠুকে বলল, 'কী আছে এতে?'

'সৎ-বাবার ব্যাবসার কাগজপত্র।'

'ভেতর দেখেছেন?'

'অনেক বছর আগে একবারই দেখেছি— কাগজ ঠাসা ছিল।'

'ভেতরে বেড়াল-টেড়াল নেই তো?'

'ভারি অদ্ভুত কথা বলেন তো!'

ডালার ওপর এক ডিশ দুধ দেখিয়ে হোমস বললে, 'এইজন্যে বললাম!'

'বেড়াল নেই, তবে চিতা আর বেবুন আছে।'

'তা বটে। চিতা আছে— বেড়ালেরই জাত— কিন্তু দুধে তার রুচি নেই,' বলতে বলতে কাঠের চেয়ারটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চেয়ার পর্যবেক্ষণ মন প্রাণ ঢেলে দিলে হোমস।

উঠে দাঁড়িয়ে লেন্স পকেটে পুরে বললে, 'থ্যাংকিউ! সব বোঝা গেছে। আরে! আরে! আবার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!'

যা দেখে তাজ্জব হল শার্লক হোমস তা একটা কুকুর-মারার ছোট্ট চাবুক। ঝুলছে বিছানার কোণে। ডগাটায় কিন্তু একটা ফাঁস।

'ওয়াটসন, কী বুঝলে?'

'মামুলি চাবুক। কিন্তু ফাঁস বাঁধা কেন বুঝছি না।'

'ওইখানটায় কেবল মামুলি ঠেকছে না, কেমন? দুনিয়াটা বদমাশ লোকে বোঝাই হে, তার ওপর যদি চালাক লোক পাপ কাজে নামে তার মতো কুচক্রী আর হয় না। মিস স্টোনার, চলুন এবার, লনে যাওয়া যাক।'

মুখখানা অন্ধকার করে অনেকক্ষণ লনে পায়চারি করল বন্ধুবর। তারপর বললে, 'মিস স্টোনার, আমি যা বলব, আপনাকে তাই করতে হবে।'

'আপনার হাতেই তো ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।'

'তাহলে আজকে আপনি রাত কাটাবেন আপনার পুরোনো ঘরে। আর আমরা রাত কাটাবো আপনার ঘরে।'

মিস স্টোনার আর আমি দুজনেই যুগপৎ অবাক হয়ে গেলাম।

হোমস বললে, 'শিসের শব্দটা কী, আমি জানতে চাই।— ওইটা নিশ্চয় গাঁয়ের সরাইখানা?'

'হ্যাঁ।'

'ওখান থেকে আপনার ঘরের জানলা দেখা যায়?'

'যায়।'

'তাহলে ডাক্তার ফিরে আসার পর মাথা ধরার অছিলায় আপনার ঘরে ঢুকে পড়বেন। যখন বুঝবেন উনি শুয়ে পড়েছেন, জানলা খুলে বাতিটা পাশে রাখবেন— যাতে সংকেত আলো দেখতে পাই। তারপর দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে আপনার পুরোনো ঘরে চলে যাবেন।'

মিস স্টোনার হোমসের বাহু স্পর্শ করে বললে, 'আমার বোন মারা গিয়েছে কেন, আপনি তা আঁচ করেছেন মনে হচ্ছে?'

'করেছি।'

'ভয়ে?'

'না। আরও স্পষ্ট হোক কারণটা, তারপর বলব।

চলে এলাম সরাইখানায়। ওপরতলায় এমন একটা ঘর বেছে নিলাম যেখান থেকে জীর্ণ প্রাসাদে মিস স্টোনারের ঘর দেখা যায়। বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলে উঠল ডাক্তার রয়লট ফিরে আসার পরেই। ভদ্রলোক যে ভয়ঙ্কর রেগে আছে তা দূর থেকেই বোঝা গেল। গেট খুলতে একটু দেরি করছিল গাড়োয়ান— তাতেই এই মারে কি সেই মারে ভাব দেখা গেল। সেইসঙ্গে বাজখাঁই চিৎকার।

অন্ধকারে ঘরের জানলায় বসে এইসব দেখছি, এমন সময়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, আজকের অভিযানে বিপদ আছে। তোমাকে নিয়ে যেতে মন চাইছে না।'

'কীসের বিপদ? আমি যা দেখছি, তুমিও তা দেখেছ? তবে?'

'ভেন্টিলেটরটা দেখলে তো?'

'দুর! অত ছোটো ফুটো দিয়ে ইঁদুর পর্যন্ত গলতে পারবে না।'

'ভায়া, এখানে আসার আগেই জানতাম ও-রকম একটা ফুটো আছে।'

'মাই ডিয়ার হোমস!'

'আরে, এটা বুঝছ না কেন, ফুটো না-থাকলে নিজের ঘরে বসে জুলিখা পাশের ঘরে চুরুট খাওয়ার গন্ধ পেতেন কী করে?'

'কিন্তু তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?'

'ভেন্টিলেটর তৈরি হল, দড়ি ঝোলানো হল, বিছানায় শুয়ে একটি মেয়ে মারা গেল। তিনটে ঘটনার যোগসূত্র কি বিচিত্র নয়?'

'তিনটে ঘটনার মধ্যে আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে বলেই মনে হয় না আমার।'

'বিছানাটার বৈশিষ্ট্য দেখেছিলে?'

'না তো।'

'চারটে পায়াই মেঝেতে আঁটা। ইচ্ছে করলেও সরিয়ে শোয়া যায় না। ঘণ্টার মেকি দড়ির তলাতেই রাখতে হবে।'

'হোমস! হোমস! সাংঘাতিক ক্রাইমের গন্ধ পাইছি। একটু একটু বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ।'

'ভায়া ডাক্তারদের বিদ্যে থাকে, বুদ্ধি থাকে। তারা যদি ক্রাইমে নামে, তাদের চেয়ে বড়ো ক্রিমিন্যাল আর হয় না। এখন আর কথা নয়— তামাক খাওয়া যাক।'

রাত ন-টায় অন্ধকার গ্রাস করল জীর্ণ সৌধকে। এগারোটায় একটা উজ্জ্বল আলো দেখা গেল অন্ধকারে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হোমস।

'সংকেত এসে গেছে। ঠিক মাঝের ঘরেই আলো জ্বলছে। চলো।'

বাগানে পৌঁছে জুতো খুলে পা টিপে টিপে কিছুদূর যেতেই গাছের মধ্যে বিকলাঙ্গ শিশুর মতো কী-একটা সড়াৎ করে মাঠে নেমে গড়াগড়ি দিয়ে ফের সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল গাছের আড়ালে। দারুণ চমকে উঠলাম আমি। সবলে আমার হাত খামচে ধরল হোমস।

তারপরেই নিঃশব্দে হেসে বললে, 'বেবুনটা।'

বেবুন তো বুঝলাম, চিতাও তো আছে। ভাবতেই গা হিম হয়ে এল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তবে নিশ্চিন্ত হলাম।

খড়খড়ি বন্ধ করল হোমস। নিজে বসল বিছানায়, পাশে মোমবাতি আর দেশলাই, হাতে একটা সরু বেত। আমি বসলাম চেয়ারে, হাতে রিভলভার। বাতি নিভিয়ে দিল হোমস।

অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোকরশ্মি নেই। দূরের গির্জেয় পনেরো মিনিট অন্তর বাজছে ঘণ্টা। খড়খড়ির বাইরে একবার চাপা ঘর-ঘর আওয়াজ শুনলাম। অর্থাৎ চিতাবাঘটা সত্যিই টহল দিচ্ছে বাগানে।

সেই উৎকণ্ঠা, সেই উদ্‌বেগ, সেই প্রতীক্ষা জীবনে আমি ভুলব না।

রাত তিনটের ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর আচমকা ভেন্টিলেটরে যেন আলোর ঝিলিক দেখলাম। সেইসঙ্গে নাকে ভেসে এল পোড়া তেল আর ধাতু তেতে ওঠার গন্ধ। অর্থাৎ চোরা লণ্ঠন জ্বলছে পাশের ঘরে। হাঁটাচলার মৃদু শব্দও কানে ভেসে এল। তারপর আধঘণ্টা আর কোনো শব্দ নেই। পোড়া গন্ধটা কিন্তু বেড়েই চলেছে। এর ঠিক পরেই একটা নতুন শব্দ শুনলাম।

সোঁ-সোঁ করে একনাগাড়ে যেন স্টিম বেরিয়ে যাচ্ছে কেটলি থেকে।

শব্দটা কানে যেতেই হোমস বিছানা থেকে ছিটকে ফস করে দেশলাই ঘষে সপাং সপাং করে বেত হাঁকিয়ে চলল দড়িটার ওপর।

সেইসঙ্গে চেঁচাতে লাগল আতঙ্ক বিহ্বল কণ্ঠে, 'ওয়াটসন! দেখেছ? ওয়াটসন! দেখেছ?'

কী দেখব আমি? হঠাৎ আলো জ্বালানোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল— কিন্তু একটা চাপা শিসের শব্দ ভেসে এসেছিল কানে। তারপরেই ওইভাবে পাগলের মতো বেত মারা। দেখেছিলাম শুধু হোমসের মুখের চেহারা। আতঙ্কে[১২], ঘৃণায়, বিভীষিকায় পাণ্ডুরবর্ণ সে-মুখ যেন চেনাই যায় না।

মার বন্ধ করে ভেন্টিলেটরের দিকে চেয়েছিল হোমস। আচমকা নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে জাগ্রত হল একটা অতি ভয়াবহ আর্ত চিৎকার— জীবনে এমন রক্ত জমানো মরণ হাহাকার আমি শুনিনি। ক্রমশ পর্দা চড়তে লাগল চিৎকারের— আতীব্র যন্ত্রণা নিঃসীম আতঙ্ক আর অপরিসীম ক্রোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সব শেষের বুকফাটা চিৎকারটার মধ্যে। লোমহর্ষক সেই চিৎকার শুনে নাকি গাঁয়ের সবাই বিছানায় উঠে বসেছিল— গাঁয়ের বাইরেও অনেকের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। অবর্ণনীয় সেই চিৎকার সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অবশ করে তুলল আমাদের চিত্ত— ফ্যালফ্যাল করে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর হোমস। আস্তে আস্তে প্রতিধ্বনির শেষ রেশ মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে— আবার টুঁটি টেপা নৈঃশব্দ্য চেপে বসল নিশীথ রাতের বুকে।

বললাম রুদ্ধশ্বাসে, 'এ আবার কী?'

'সবশেষ। পিস্তল নাও, চলো ডা. রয়লটের ঘরে।'

গম্ভীর মুখে বাতি জ্বালল হোমস। করিডরে বেরিয়ে দু-বার ধাক্কা মারল দরজায়— সাড়া এল না। তখন হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকল ভেতরে— ঠিক পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে আমি।

দেখলাম এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখলাম, টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা আঁধার লণ্ঠন— শাটারটা অর্ধেক খোলা। তির্যক রশ্মিরেখা গিয়ে পড়ছে পাল্লা সিন্দুকের ওপর। টেবিলের পাশেই চেয়ারে বসে ডা. গ্রাইমসবি রয়লট। পরনে ধূসর লম্বা ড্রেসিং-গাউন, নগ্ন গোড়ালি দেখা যাচ্ছে তলার দিকে, পায়ে লাল তুর্কি চটি। বিকেল বেলা ফাঁসওলা যে-চাবুকটা দেখে অবাক হয়েছিলাম, কোলের ওপর রয়েছে সেই চাবুকখানি। চিবুক ওপরে তোলা, ভয়াবহ আড়ষ্ট চাহনি নিবদ্ধ কড়িকাঠের দিকে, কপাল ঘিরে একটা অদ্ভুত হলদে পটি। ছিট-ছিট বাদামি দাগ দেওয়া ডোরাকাটা পটি! খুব আঁট করে যেন মাথায় বেড় দিয়ে রয়েছে বিচিত্র সেই পটি। আমরা ঘরে ঢুকলাম, ডাক্তার কিন্তু নড়লেন না, কথাও বললেন না।

'হোমস পাগলের মতো চাবুক মারতে লাগল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

'ডোরাকাটা পটি? ফুটকি দাগ দেওয়া ডোরাকাটা সেই পটি!' ফিসফিস করে বললে হোমস।

এক পা এগিয়েছিলাম আমি। অমনি নড়ে উঠল মাথার আশ্চর্য পাগড়ি। সরসর করে খুলতে লাগল বেড় এবং চুলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল চেপটা রুইতনের মতো একটা মাথা— ঘাড় মোটা গা-ঘিনঘিনে একটা সরীসৃপ।

চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'অ্যাডার সাপ[১৩]! বাদায় থাকে! ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষধর সরীসৃপ! ছোবল মারার দশ সেকেন্ডের মধ্যে[১৪] অক্কা পেয়েছে ডাক্তার। নিজের ফাঁদেই শেষ পর্যন্ত পড়তে হয় কুচক্রীকে— অন্যের বুকে ছুরি মারতে গেলে সে-ছুরি নিজের বুকে বেঁধে। যাক, এখন ডেরায় পাঠানো যাক সরীসৃপ মহাপ্রভুকে। তারপর মিস স্টোনারকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে খবর দেব পুলিশকে।'

ঝট করে ডাক্তারের কোল থেকে ফাঁস দেওয়া চাবুক তুলে নিয়ে হোমস অ্যাডারের গলায় ফাঁস আটকে টেনে নিয়ে গেল সিন্দুকের মধ্যে— বন্ধ করে দিল পাল্লা।

পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে হোমস যা বললে তা এই :

'ভায়া ওয়াটসন, জিপসি আর পটির কথা শুনে গোড়া থেকেই ভুল ধারণা করেছিলাম— শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। ওই ভেন্টিলেটরটা চোখ খুলে দেয় আমার। জানলা দিয়ে কিছুই ঢোকা যখন সম্ভব নয়, তখন বুঝলাম ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে এমন কিছুই বেরিয়ে আসে, বিছানা পর্যন্ত যাকে নামবার জন্যে ঝোলানো হয়েছে দড়িটা। ভারতবর্ষের ভয়ানক জীবজন্তু পোষার শখ আছে শুনে সন্দেহ ঘনীভূত হল। রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না এমন বিষ যদি শরীরে ঢোকানো যায়,

মৃত্যুর কারণ ধরা পড়বে না। ছোবল দেওয়ার ছোট্ট দুটো ফুটোও অনেকের নজর এড়িয়ে যাবে। শিস দেওয়া হত সাপটাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে— দুধের লোভও দেখানো হত— কিন্তু ঘুমের ঘোরে সাপের ল্যাজে পা দিলে কামড় তো একদিন খেতেই হবে।

এই সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে ঢুকলাম ডাক্তারের ঘরে। চেয়ার পরীক্ষা করলাম— দেখলাম ডাক্তার তাতে উঠে দাঁড়ায়। নইলে তো ভেন্টিলেটরের নাগাল ধরা যাবে না। ফাঁসওলা চাবুক, লোহার সিন্দুক আর দুধ দেখে[১৫] কোনো সন্দেহই আর রইল না। ঝন-ঝন-ঝনাৎ আওয়াজটা আসলে লোহার সিন্দুকের ডালা বন্ধ করার আওয়াজ— সরীসৃপকে সিন্দুকে চালান করে সিন্দুক বন্ধ করেছিল ডাক্তার। সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনেই বেত মেরে ভাগিয়ে দিলাম যার কাছ থেকে এসেছে— তারই কাছে। মার খেয়ে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই ছোবল মেরেছে। সুতরাং লোকে বলবে আমিই হয়তো ডা. গ্রাইমসবি রয়লটের মৃত্যুর কারণ। তাতে আমার বিবেক কোনোদিন কাতর হবে না।

টীকা

১. **ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান :** প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে। মূল নাম 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকল্‌ড ব্যান্ড'।

২. **আট বছরে সত্তরটি :** এই হিসেবে এগোলে ১৯০৩-এর অক্টোবরে, হোমস রিটায়ার করার সময়ে, মোট কেসের সংখ্যা দাঁড়াত এক হাজার সাতশোর কাছাকাছি। হিসেব করে বলেছেন ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটার্স, তাঁর আপঅন দ্য প্রোবেব্‌ল নাম্বার অব কেসেস অব মি. শার্লক হোমস'-এ।

৩. **স্টোক মোরান :** লেদারহেডের মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত স্টোক ডি'অ্যাবারনন-কে হয়তো নাম বদলে স্টোক মোরান করেছেন লেখক।

৪. **বেঙ্গল আর্টিলারি :** সিপাই বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে, ইন্ডিয়ান আর্মির মোট চব্বিশটি ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে বারোটিই ছিল বেঙ্গল আর্টিলারির অধীনস্থ। যুদ্ধের পর এদের সবকটিকে নিয়ে আসা হয় রয়্যাল আর্টিলারির আওতায়। অর্থাৎ সৈনিকরা ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে ব্রিটিশ আর্মির অন্তর্ভুক্ত হন।

৫. **দুই বোনকে দিতে হবে :** 'আ কেস অব আইডেন্টিটি' গল্পে অনেকটা এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

৬. **বেদেদের :** বেদে বা জিপসিরা চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারত থেকে ইউরোপে আসে বলে অনুমান করা হয়। এই যাযাবর গোষ্ঠীরা নিজেদের 'রোমানী' বলে এবং রোমানী ভাষায় কথা বলে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু চুরি, সংক্রামক রোগ ছড়ানো, সাধারণ চুরি-চামারি প্রভৃতি এদের অভ্যাস মনে করা হত। এমিলি ব্রন্টির 'উইদারিং হাইট্‌স', জর্জ ইলিয়টের 'দ্য স্প্যানিশ জিপসি' প্রভৃতি উপন্যাসে জিপসিদের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। শার্লক হোমসের গল্প 'দ্য প্রায়োরি স্কুল', এবং 'দ্য রেড-হেডেড লিগ' এবং উপন্যাস 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস'-এও জিপসিদের কথা বলা হয়েছে।

৭. **চিতাবাঘ :** চিতা আফ্রিকায় লভ্য। ভারতে যা পাওয়া যায়, তা হল প্যান্থার।

৮. **বেবুন :** বেবুনের প্রাপ্তিস্থান আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপ। ভারতবর্ষে অবশ্য কালো রঙের কলোবাস বাঁদর পাওয়া যায়, তবে সেগুলিকে বেবুন বলা যায় না।

৯. **বাঁ-হাতে দেশলাই, ডান হাতে একটা পোড়া কাঠি :** মৃত্যুর পরও দেখা যাচ্ছে জুলিয়ার এক হাতে দেশলাই, অন্য হাতে পোড়াকাঠি ধরা আছে। তাহলে জুলিয়া কোন হাত দিয়ে দরজার লক খুলল?

১০. **জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে :** আঠারোশো আশির দশকের শেষদিকে রেভারেন্ড বেঞ্জামিন ও এবং আরও কয়েকজনের উদ্যোগে শিশুদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া আরম্ভ হয়। আমেরিকায় এই ধরনের উদ্যোগ শুরু হয় মেরি অ্যালেন ম্যাককরমিকের নেতৃত্বে নিউইয়র্কে। ১৮৭৫-এ নিউইয়র্কে

প্রতিষ্ঠিত হয় নিউইয়র্ক সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন। এরই অনুকরণে ১৮৮৯ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন। এই সোসাইটি আসলে ১৮৮৪-তে রেভারেন্ড ও-র প্রতিষ্ঠিত সোসাইটিরই সরকারি রূপ। রানি ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ছিলেন এর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক এবং রয়্যাল পেট্রন। সোসাইটির ইনস্পেকটররা হেঁটে বা সাইকেলে টহল দিতেন শিশুদের সাহায্যার্থে। অবশ্য হেলেন স্টোনারের যা বয়স, তাতে সে এই সোসাইটির আওতায় আসত না।

১১. **এখন ৭৫০ পাউন্ড :** এইভাবে আয় কমে যাওয়ার কারণ কি ইংলন্ডের বাজারে ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৪-এ কৃষিজাত পণ্যের দাম পড়ে যাওয়া?

১২. **আতঙ্কে :** শার্লক হোমস আতঙ্কিত, এমন ঘটতে দেখা গিয়েছে 'দ্য ডেভিলস ফুট' গল্পে। তবে সেই ঘটনা ওষুধের প্রভাবে ঘটেছিল।

১৩. **অ্যাডার সাপ :** অ্যাডার বা ভাইপার পাওয়া যায় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে। এরা এক থেকে ছয় ফুট লম্বা হয়ে থাকে। তবে বাদায় থাকা আলাদা কোনো ভাইপারের কথা জানা যায় না।

১৪. **দশ সেকেন্ডের মধ্যে :** সব থেকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু ডেকে আনে কেউটের বিষ। তবে তাতে দশ সেকেন্ডের অনেক বেশি সময় লাগে।

১৫. **দুধ দেখে :** জীববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, কোনো সাপই দুধ বা অন্য কোনো তরল পদার্থ খেতে পারে না।

ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব]

শার্লক হোমসের সমীপে দুটো কেস আমি নিজেই নিয়ে এসেছিলাম। একটা মি. হেথার্লির বুড়ো আঙুল সংক্রান্ত, আর একটা কর্নেল ওয়ার্বার্টনের[২] পাগলামি। দুটির মধ্যে অনেক বেশি অদ্ভুত আর নাটকীয় ছিল প্রথমটা।

১৮৮৯ সালের গরমকালের ঘটনা। সবে বিয়ে করেছি। বেকার স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে চলে এসেছি, ডাক্তারি বেশ জমে উঠেছে। হোমসের কাছে প্রায়ই যাই, ওর বোহেমিয়ান স্বভাবটা ভাঙবার চেষ্টা করি।

ডাক্তারি করতাম প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে। কাছেই স্টেশনের অনেক কর্মচারী আসত অসুখ সারাতে। এদের মধ্যে একজনের একটা ছিনেজোঁক যন্ত্রণা এমনভাবে সারিয়ে দিয়েছিলাম যে ভদ্রলোক অষ্টপ্রহর আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। প্রায় রুগি পাঠিয়ে দিতেন আমার কাছে।

একদিন সকাল সাতটার একটু আগে পরিচারিকা এসে বললে স্টেশন থেকে দুজন লোক এসেছেন। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নেমে এলাম। জানি তো, রেলের কেস কখনোই সামান্য হয় না— দেরি করা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময়ে ঘর থেকে আমার সেই পূর্বপরিচিত গার্ড ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন।

ফিসফিস করে বললেন, 'এনেছি ওঁকে। ভালোই আছেন।'

এমনভাবে কথাটা বললেন যেন একটা অদ্ভুত প্রাণীকে এইমাত্র বন্ধ করে এলেন বসার ঘরে।

বললাম, 'কী ব্যাপারটা বলবেন তো?'

'নতুন রুগি। যাতে পালিয়ে না-যান, তাই নিজেই নিয়ে এলাম। কাজ শেষ হল। এখন চলি,' বলে ধন্যবাদ জানানোর ফুরসত পর্যন্ত না-দিয়ে উধাও হলেন গার্ড সাহেব।

ঢুকলাম কনসাল্টিং রুমে। দেখলাম, টেবিলের পাশে বসে এক যুবক। বয়স খুব জোর পঁচিশ। মুখ ফ্যাকাশে, উদ্‌বেগে অস্থির। একটা হাতে[৩] রক্তভেজা রুমাল জড়ানো।

বললেন, 'ডক্টর, সাতসকালে টেনে তোলার জন্য দুঃখিত। কাল রাত্রে একটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম। ভোরের ট্রেনেই চলে এসেছি। স্টেশনে ডাক্তারের খোঁজ করেছিলাম— এক ভদ্রলোক এখানে নিয়ে এলেন। আমার কার্ড টেবিলেই আছে।'

চোখ বুলোলাম কার্ডে।

মি. ভিক্টর হেথার্লি
হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার[৪]
১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চারতলা)

লাইব্রেরি-চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'বসিয়ে রাখার জন্যে কিছু মনে করবেন না। সারারাত ট্রেন জার্নির ধকল তো কম নয়। বড্ড একঘেয়ে লাগে।'

'না না, একঘেয়ে রাত একে বলে না,' বলতে বলতে পাগলের মতো হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। সে কী হাসি! সারাশরীর দুলে দুলে উঠতে লাগল। দেখেই শঙ্কিত হল আমার ডাক্তারি সত্তা।

'থামুন!' তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এগিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু কাজ হল না। বিরাট সংকট পেরিয়ে আসার পরেই যেমন হিস্টিরিয়ায় পেয়ে বসে অনেককে, উনিও সেইভাবে উন্মাদের হাসি হেসে চললেন আপন মনে। আস্তে আস্তে অবশ্য সামলে নিলেন নিজেকে।

বললেন জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে, 'আচ্ছা আহাম্মক তো আমি।'

জলের গেলাসে একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে খাইয়ে দিতেই রং ফিরে এল ভদ্রলোকের রক্তহীন গালে।

'আঃ, বাঁচলাম! ডক্টর, এবার আমার আঙুলটা, মানে, আঙুলটা, যেখানে থাকার কথা— সেই জায়গাটা দেখুন।'

বলে, খুলে ফেললেন রক্তমাখা রুমালের পট্টি। আমার মতো শক্ত ধাতের মানুষও শিউরে উঠল সেই দৃশ্য দেখে। বীভৎস! চারটে আঙুলই কেবল দেখা যাচ্ছে— বুড়ো আঙুলটার জায়গায় কেবল স্পঞ্জের মতো দগদগে মাংস[৫] আর হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে— গোড়া থেকে কুপিয়ে বা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

'সর্বনাশ! নিশ্চয় খুব রক্ত বেরিয়েছে?'

'তা বেরিয়েছে। অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম তখনও রক্ত পড়ছে। তাই রুমাল দিয়ে কবজি পেঁচিয়ে ধরে গাছের সরু ডাল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করেছি।'

'চমৎকার! সার্জন হওয়া উচিত ছিল আপনার।'

'তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান জানি বলেই পেরেছি। হাইড্রলিক্স আমার বিষয়।'

ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বললাম, 'খুব ভারী আর ধারালো কোনো অস্ত্রের কোপ পড়েছে মনে হচ্ছে?'

'মাংস কাটা ছুরি বলতে পারেন।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'মোটেই না।'

'বলেন কী! খুনের চেষ্টা নাকি?'

'তার চাইতেও বেশি।'

'ভয় দেখিয়ে দিলেন দেখছি।'

'স্পঞ্জ দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে ব্যান্ডেজ[৬] করে দিলাম। যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে চুপ করে শুয়ে রইলেন ভদ্রলোক।'

কাজ শেষ হলে বললাম, 'এ নিয়ে আর কথা নয়— নার্ভ সইতে পারবে না।'

'তা কি হয়? এখুনি গিয়ে সব পুলিশকে বলতে হবে। বুড়ো আঙুল নেই বলেই হয়তো বিশ্বাস করবে অসাধারণ এই কাহিনি।— বিশ্বাস করলেও রহস্য ভেদ করতে পারবে কি না সন্দেহ— কেননা সূত্র তো জোগাতে পারব না।'

রহস্যের গন্ধ পেয়ে নিমেষে জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। বললাম, 'আরে মশাই, কূট সমস্যার সমাধান চান তো আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে আগে যান না কেন।'

'নিশ্চয় যাব। পুলিশকেও আমার দরকার।'

'তাহলে চলুন।'[৭]

বসবার ঘরে বসে পাইপ টানছিল শার্লক হোমস। প্রাতরাশ খাওয়ার আগে যে-পাইপ খায়, সেই পাইপ। তার মানে, ব্রেকফাস্ট এখনও খাওয়া হয়নি। 'টাইমস' কাগজ মেলে ধরে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' কলমের খবর পড়ছিল একমনে।

একসঙ্গে খেলাম তিনজনে। নবাগতকে একটা সোফায় শুইয়ে হাতের কাছে জল মিশোনো ব্র্যান্ডির গেলাস রাখল।

বললে, 'মি. হেথার্লি, আপনার অভিজ্ঞতা যে মামুলি অভিজ্ঞতা নয়, তা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে— ক্লান্তি বোধ করলে গেলাসে চুমুক দেবেন। বলুন এবার কী হয়েছে।'

মি. হেথার্লি বললেন, 'বেশি সময় নেব না আপনার। ক্লান্তি কেটে গেছে ডাক্তারের চিকিৎসায়। পেটে খাবার পড়ায় এখন বেশ চাঙা বোধ করছি।

'আমি অনাথ ব্যাচেলর। একলা থাকি। পেশায় হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। সাত বছর কাজ করেছি একটা কোম্পানিতে। অভিজ্ঞতা প্রচুর হয়েছে। তারপর বাবার মৃত্যুর পর হাতে কিছু টাকা আসায় চাকরি ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করব। ঘর নিলাম ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে।

'দু-বছর স্রেফ মাছি তাড়ালাম বলতে পারেন। রোজগার প্রায় শূন্য। হতাশ হয়ে পড়লাম শেষকালে। বেশ বুঝলাম, আমার দ্বারা ব্যাবসা হবে না।

'গতকাল কেরানি এসে খবর দিলে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। ভিজিটিং কার্ডে দেখলাম ভদ্রলোকের নাম— "কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক।"

'কর্নেল ঘরে ঢুকলেন প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই। মাঝারি আকার, কিন্তু ভীষণ রোগা। মুখটা সরু হয়ে নাক চিবুকে ঠেকেছে। চামড়া ঠেলে গালের হনু উঁচু হয়ে রয়েছে। কিন্তু রুগ্‌ণ নন। চোখ উজ্জ্বল, পদক্ষেপ চটপটে। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

'জার্মান উচ্চারণে বললেন, "মি. হেথার্লি, আপনি শুধু দক্ষ নন, গোপন কথা গোপনে রাখতে পারেন— এই সুপারিশ শুনেই দৌড়ে এসেছি আপনার কাছে।"

'তোষামোদে গলে গেলাম আমি, "কে বলেছে বলুন তো?"

'উনিই বললেন— নামটা নাই-বা শুনলেন। তবে শুনেছি আপনার তিনকুলে কেউ নেই, আপনি বিয়ে করেননি, লন্ডনে একলা থাকেন।

'সবই তো সত্যি,' বললাম আমি, 'কিন্তু তার সঙ্গে আমার কাজের কী সম্পর্ক বুঝছি না।'

'সম্পর্ক আছে বই কী, এখুনি শুনবেন। কিন্তু কাজটা অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি যদি ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন, তাহলে এ-গোপনীয়তা আপনার কাছে আশা করতাম না।'

'কথা দিচ্ছি যা বলবেন, তা কেউ জানবে না।'

'সন্দিগ্ধ চোখে যেন আমার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন ভদ্রলোক। এ-রকম তীক্ষ্ণ চাহনি কখনো দেখিনি।

'কথা দিচ্ছেন?'

'দিচ্ছি।'

'হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলেন কর্নেল। বোঁ করে ছুটে গেলেন দরজার কাছে। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে দেখলেন, বাইরে কেউ নেই।

ফিরে এসে বললেন, 'কেরানিগুলো মাঝে মাঝে বড্ড আড়ি পাতে।— যাক এবার কাজের কথায় আসা যাক।' বলে চেয়ারটা আমার কাছে সরিয়ে এনে আবার সেইরকম জিজ্ঞাসু চিন্তাবিষ্ট চোখে চেয়ে রইলেন আমার পানে।

'মাংসহীন লোকটার বিচিত্র আচরণে একটু ভয় পেলাম। মনটা বিদ্রোহী হল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ফেললাম— যা বলবার, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার সময়ের দাম আছে।'

উনি বললেন, 'এক রাতে পঞ্চাশ গিনি রোজগার করতে চান?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাজটা আসলে ঘণ্টাখানেকের। একটা হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেশিন বিগড়েছে। গোলমালটা কোথায় কেবল দেখিয়ে দেবেন।'

'খুবই সামান্য কাজ। দক্ষিণাটা সেই তুলনায় ভালোই।'

'তা ঠিক। আজ রাতেই শেষ ট্রেনে তাহলে আসছেন?'

'কোথায়?'

'আইফোর্ডে[৮]। রীডিং স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে। প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে চাপলে পৌঁছে যাবেন সোয়া এগারোটায়।

'বেশ যাব।'

'আমি গাড়ি নিয়ে আসব স্টেশনে। রাতটা ওখানেই কাটাবেন।'

'ফিরতি ট্রেন পাব না?'

'শেষ ট্রেনে যেতে বলছি কারণ আছে বলেই। এইসব অসুবিধের জন্যেই পঞ্চাশ গিনি দিচ্ছি আপনার মতো অল্পবয়সি অজানা মানুষকে। এখনও ভেবে দেখুন।'

ভেবে দেখলাম। পঞ্চাশ গিনি ছাড়া যায় না। বললাম, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই রইল। কিন্তু একটু খুলে বলুন কী করতে হবে আমাকে।'

'কেউ আড়ি পাতছে না তো?'

'না, না। নির্ভয়ে বলুন।'

'জানেন নিশ্চয় সাজিমাটি[৯] জিনিসটা দারুণ দামি। ইংলন্ডের দু-এক জায়গা[১০] ছাড়া পাওয়া যায় না।'

'শুনেছি!'

'কিছুদিন আগে রীডিং থেকে মাইল দশেকের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা কিনেছিলাম। কপালজোরে সাজিমাটির স্তর আবিষ্কার করলাম সেই জমিতে। তারপর দেখলাম, আমার জমিতে যে-স্তর আছে, তার চাইতেও বেশি স্তর আছে ডাইনে বাঁয়ে আমার প্রতিবেশীদের জমিতে। কিন্তু তারা জানে না সোনার খনির চাইতে দামি জিনিস রয়েছে মাটির তলায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, আমার জমি থেকে প্রথমে কিছু সাজিমাটি তুলে দু-পয়সা রোজগার করব! সেই টাকায় প্রতিবেশীদের জমি কিনে নেব। গোপনে কাজ সারার জন্যে একটা হাইড্রলিক প্রেস[১১] কিনেছি। কিন্তু পাছে কথাটা পাঁচ কান হয়, তাই কাউকে কিছু জানাইনি। আপনাকেও বলব, আইফোর্ড যাচ্ছেন আজ রাতে— কাউকে বলবেন না।'

'আমি বললাম— সবই বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না সাজিমাটি তোলার জন্যে হাইড্রলিক প্রেসের দরকার কী। ওটা তো গর্ত খুঁড়ে তুলতে হয়।'

'আমাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। মাটি চেপে ইট বানিয়ে পাচার করি যাতে কেউ জানতে না-পারে,' উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। 'আপনাকে সব কথাই বললাম। আইফোর্ডে সোয়া এগারোটায় তাহলে আসছেন?'

'নিশ্চয়।'

'কাকপক্ষীও যেন না-জানে,' বলে শেষবারের মতো আবার সেই অন্তর্ভেদী, জিজ্ঞাসু চাহনি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাকে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করলেন ভদ্রলোক। তারপর করমর্দন করে ত্রস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'খুব অবাক হলাম কর্নেলের প্রস্তাবে। মাঝরাতে নিয়ে যেতে চান, কাকপক্ষীকে জানাতে চান না, দশগুণ পারিশ্রমিক দিতে চান। সাজিমাটির গল্পটাও যেন নেহাতই গল্প— বিশ্বাস করতে মন চায় না। যাই হোক, খেয়ে নিয়ে রওনা হলাম ট্রেন ধরতে।

আইফোর্ড পৌঁছোলাম এগারোটার পর। প্ল্যাটফর্মে নামলাম কেবল আমিই। লণ্ঠন হাতে ঘুমন্ত একজন কুলি ছাড়া কাউকে দেখলাম না। বাইরে আসার পর দেখলাম অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেল। আমার হাত খামচে ধরে গাড়ির মধ্যে টেনে তুললেন, জানলা বন্ধ করে দিলেন, তক্তায় টোকা মারতেই ঘোড়া ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

'একটাই ঘোড়া?' শুধোল হোমস।

'হ্যাঁ।'

'রংটা দেখেছিলেন?'

'তামাটে।'

'ক্লান্ত ঘোড়া?'

'না, না, বেশ তাজা, চকচকে।'

'তারপর?'

'গাড়ি ছুটল প্রায় এক ঘণ্টা। কর্নেল বলেছিলেন সাত মাইল পথ। আমার তো মনে হল বারো মাইল। রাস্তা খুব খারাপ। লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল গাড়ি। ওপরদিকে উঠলে বুঝতে পারতাম না— রাস্তা এবড়োখেবড়ো থাকার জন্যে কেবল লাফাচ্ছিল। জানলা বন্ধ থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। কর্নেল কথা বলছিলেন না। সমানে অন্তর্ভেদী চোখে চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। তারপর কাঁকর বিছানো পথের ওপর দিয়ে এসে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম। বাড়িটাকে ভালো করে দেখবার আগেই ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

'ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কর্নেল দেশলাই খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা গেল। ল্যাম্প হাতে এক ভদ্রমহিলা। খুব সুন্দরী। পরনের পোশাকটিও দামি। বিদেশি ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল কর্নেলকে। একটিমাত্র ছোট্ট শব্দে জবাব দিলেন কর্নেল। শুনেই এমন আঁতকে উঠল মেয়েটি যে আর একটু হলেই ল্যাম্প খসে পড়ে যেত হাত থেকে। কর্নেল কানে কানে কী বলে তাকে ঠেলে বার করে দিলেন ঘরের বাইরে— ল্যাম্প নিয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে।

'পাশের ঘরে একটা দরজা খুলে আমাকে বসতে বললেন সেখানে। ঘরে একটা গোল টেবিলের ওপর ছড়ানো কতকগুলো জার্মান বই। ল্যাম্পটা একটা হার্মোনিয়ামের[১২] ওপর রেখে "এখুনি আসছি" বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'জার্মান বইগুলোর মধ্যে দুটো বই বিজ্ঞানের, বাকিগুলো কবিতার। জানলা খুলতে গিয়ে দেখি আড়াআড়িভাবে খিল দিয়ে আঁটা খড়খড়ি। খোলে কার সাধ্য। আইফোর্ড থেকে মাইল দশেক দূরে এসেছি ঠিকই— কিন্তু পুবে, না পশ্চিমে, উত্তরে, না দক্ষিণে বোঝার সাধ্য নেই। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। চরাচর নিস্তব্ধ। বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু একটা সেকেলে ঘড়ি চলার টিক টিক আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে।

'আচমকা নিঃশব্দে খুলে গেল ঘরের দরজা। ভয়ার্ত মুখে ল্যাম্প হাতে ঘরে ঢুকল সুন্দরী সেই মহিলাটি। এমনভবে পাঙাসপানা মুখে বার বার পেছনে চাইতে লাগল যে আতঙ্কে অবশ হয়ে এল আমার হৃৎপিণ্ড।

'আঙুল নেড়ে আমাকে কথা বলতে বারণ করে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললে, "আমি হলে পালাতাম। এখানে থাকতাম না।"

'কিন্তু ম্যাডাম, মেশিন না-দেখে যাই কী করে?'

'থেকে কোনো লাভ নেই। এই দরজা দিয়ে পালান।' আমি মুখ টিপে হাসছি দেখে এগিয়ে এসে দু-হাত এক করে বললে চাপা গলায়, 'ভগবানের নামে বলছি, এখুনি পালান— আর দেরি করবেন না!'

'আমি আবার একটু একরোখা টাইপের— বাধা পেলে গোঁ আরও বেড়ে যায়। এসেছি

পঞ্চাশ গিনি রোজগার করতে এতটা পথ বেরিয়ে অনেক ধকল সয়ে— খামোকা ফিরে যেতে যাব কেন? হাতের কাজ শেষ না-করেই বা পালাতে যাব কেন? মহিলাটির মাথায় ছিট আছে নিশ্চয়। তাই মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, আমি যাব না। আবার কাকুতিমিনতি করতে যাচ্ছে ভদ্রমহিলা, এমন সময়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল ওপরতলায়। সিঁড়িতে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। কান খাড়া করে শুনেই নিঃসীম নৈরাশ্যে দু-হাত শূন্যে ছুড়ে চকিতে নিঃশব্দে ফের অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল ভদ্রমহিলা।

'ঘরে ঢুকলেন কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক আর একজন বেঁটে মোটা ভদ্রলোক। এঁর নাম ফার্গুসন— আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর জানলাম। ভদ্রলোকের থুতনিতে মাংস ডবল ভাঁজ খেয়ে ঝুলছে— তার ওপর চিঞ্চিলা-জন্তুর কোমল ধূসর রোমের মতো দাড়ি।[১৩]

'কর্নেল বললেন, মি. ফার্গুসন আমার ম্যানেজার আর সেক্রেটারি। ভালো কথা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেছিলাম না?'

'গুমোট লাগছিল বলে খুলেছি,' বললাম আমি।

'সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে কর্নেল বললেন— তাহলে চলুন মেশিনটা দেখে আসা যাক।'

'টুপিটা পরে নিই।'

'না, না টুপি পরার দরকার নেই। মেশিন বাড়ির মধ্যেই আছে।'

'সে কী কথা। বাড়ির মধ্যে সাজিমাটি খোঁড়েন নাকি?'

'আরে না। এখানে শুধু চেপেচুপে ইট বানাই। অত কথায় দরকার নেই। আপনি শুধু মেশিনটা দেখে বলে দিন গলদটা কোথায়।'

'ল্যাম্প হাতে কর্নেল চললেন আগে, আমি আর ফার্গুসন পেছনে। বাড়ি তো নয়, একটা গোলকধাঁধা। ঘোরানো সিঁড়ি, নীচু দরজা, সরু গলির যেন আর শেষ নেই। ওপরতলায় কোথাও কার্পেট বা ফার্নিচারের চিহ্নমাত্র নেই। পলেস্তারা খসা দেওয়ালে ছ্যাতলা পড়েছে। ভদ্রমহিলার হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত না-করলেও চোখ রেখেছি দুজনের ওপর— বাইরে যদ্দূর সম্ভব নির্বিকার। ফার্গুসন লোকটাকে মনে হল স্বদেশবাসী[১৪]। বেশ মুষড়ে রয়েছে যেন, কথা একদম বলছে না।

'অবশেষে একটা ছোট্ট নীচু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। ঘরখানা চৌকোনা। এত ছোটো যে একসঙ্গে তিনজনের ঠাঁই হয় না। কাজেই ফার্গুসন রইলেন বাইরে— আমি গেলাম কর্নেলের পেছন পেছন।

'উনি বললেন— "আমরা এখন হাইড্রলিক প্রেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে। পায়ের তলা ধাতুর। মেঝের সঙ্গে চিঁড়েচেপটা হয়ে যাব যদি এখন কেউ মেশিনটা চালিয়ে দেয়— কেননা মাথার ওপরকার ছাদটা আসলে পিস্টনের তলার দিক— হু-হু করে নেমে আসবে নীচে কয়েক টন চাপ দিয়ে। মেশিনটা আগের মতো মসৃণভাবে আর চলছে না— শক্তি কমে গেছে। কেন এ-রকম হচ্ছে, সেইটুকুই কেবল দেখিয়ে দিন।'

ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে মেশিন পরীক্ষা করলাম। সত্যিই দানবিক মেশিন[১৫]। বাইরে গিয়ে হাতল টিপে মেশিন চালালাম। সোঁ-সোঁ আওয়াজ শুনেই বুঝলাম লিক আছে কোথাও। দেখলাম, পাশের একটা সিলিন্ডার থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা রাবারের পটি শুকিয়ে যাওয়ায় ড্রাইভিং-রড ঠিকমতো কাজ করছে না। শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেই কারণেই। কর্নেলকে

দেখিয়ে দিলাম গলদটা এবং বুঝিয়ে দিলাম কীভাবে মেরামত করতে হবে। কান খাড়া করে সব শুনলেন তিনি। তারপর আমি ভেতরে ঢুকলাম নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে। দেখলাম, দেওয়াল কাঠের কিন্তু মেঝে একখানা বিরাট লোহার পাত দিয়ে তৈরি। সাজিমাটি চেপে ইট বানানোর গল্পটা যে একেবারেই কল্পিত, তার প্রমাণ রয়েছে মেঝেতে। একটা ধাতুর স্তর লেগে রয়েছে সেখানে। এইরকম একটা দানবিক মেশিন দিয়ে সাজিমাটি চেপে ইট বানানো তাহলে হয় না। খুঁটিয়ে দেখছি ধাতুর স্তরটা কী, এমন সময়ে অস্ফুট জার্মান বিস্ময়োক্তি শুনলাম পেছনে। সচমকে ফিরে দেখি, বিবর্ণ মাথা হেঁট করে আমার কাণ্ড দেখছেন কর্নেল।

'কী করছেন?'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভুলিয়ে আনার জন্যে, চিৎকার করে বললাম, 'সাজিমাটির তারিফ করছি। সত্যি কথাটা বললে আরও ভালো পরামর্শ দিতে পারতাম কিন্তু।'

'বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। মুখটা কঠিন হয়ে গেল কর্নেলের, নরকের আগুন জ্বলে উঠল দুই চোখে।'

'এখুনি জানবেন সত্যি কথাটা,' বলেই এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলেন কর্নেল। পাল্লায় লাথি ঘুসি মেরে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চললাম আমি।

'আচমকা নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে জাগ্রত হল হাতল টেপবার ঝনৎকার আর জল বেরিয়ে যাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ। মেশিন চালিয়ে দিয়েছেন কর্নেল। কালো ছাদটা ঝাঁকি মেরে নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে। মেঝে পরীক্ষা করার সময়ে ল্যাম্পটা মেঝের ওপর রেখেছিলাম বলে হাতটা খালি ছিল। দু-হাতে পাল্লা খোলার চেষ্টা করলাম, কাকুতিমিনতি করলাম। কিন্তু ফল হল না। হাত বাড়ালেই তখন ছাদ ছুঁতে পারছি— মানে এক মিনিট লাগবে আমাকে মাংসপিণ্ড বানাতে। মাথা তুলে যখন দাঁড়াতেও পারছি না, ভাবছি শুয়ে পড়লেই বরং শিরদাঁড়া সমেত একেবারেই থেঁতলে যাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরার চাইতে ভালো। এমন সময়ে হৃৎপিণ্ড তুড়ুক নাচ নেচে উঠল একটা জিনিস দেখে।

'কাঠের দেওয়াল একটু একটু ফাঁক হয়ে গেল। একটা হলদে আলোর আভা দেখা গেল। দরজা! লাফ দিয়ে সেঁধিয়ে গেলাম ফাঁকটা দিয়ে। দরজাও বন্ধ হল, পেছনে ল্যাম্প গুঁড়ো করে ধাতুতে ধাতুতে মিলে যাওয়ায় ঝন ঝনাৎ শব্দও শুনলাম।

'সম্বিৎ ফিরে পেলাম কবজিতে টান পড়ায়। ডান হাতে ল্যাম্প ধরে বাঁ-হাতে আমার কবজি ধরে হিড় হিড় করে টানছে পরমাসুন্দরী সেই মহিলাটি। আমি পড়ে আছি একটা সংকীর্ণ গলির পাথুরে মেঝেতে।

'এসে পড়বে ওরা! তাড়াতাড়ি।'

'এবার আর অন্যথা হল না। হাঁচড়পাঁচড় করে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটলাম তার পেছনে। গলিঘুঁজি পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে দুজন পুরুষের উচ্চকণ্ঠের চিৎকার শুনলাম। ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে গেলেন। ঝট করে দরজা খুলে ঢোকালেন একটা শোবার ঘরে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলো।'

'লাফান! আর পথ নেই!'

'মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই সরু গলির অপর প্রান্তে দেখা গেল ল্যাম্প হাতে ঝড়ের মতো দৌড়ে আসছেন কর্নেল— তাঁর এক হাতে মাংসকাটা কসাইয়ের ছুরি। আমি ততক্ষণে

জানলার গোবরাট ধরে বাইরে ঝুলে পড়েছি— কিন্তু ভদ্রমহিলাকে ফেলে পালাতে মন চাইছে না। যদি দেখি ওর ওপর অত্যাচার চলছে, তাহলে প্রাণ যায় যাক, উঠে যাব ঘরে।

'মহিলাটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলেন কর্নেল— কিন্তু পারলেন না। তাঁকে আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইংরেজিতে ভদ্রমহিলা বললেন, "ফ্রিৎস! ফ্রিৎস! গতবার তুমি কথা দিয়েছিলে! আর হবে না বলেছিলে। ওঁকে ছেড়ে দাও! উনি কাউকে কিছু বলবেন না!"

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে এলিজ? আমাদের সবাইকে শেষ করে ছাড়বে ওই লোক। অনেক বেশি দেখে ফেলেছে। সরো!' বলে এক ধাক্কায় ভদ্রমহিলাকে সরিয়ে দিয়ে জানলার সামনে ছিটকে এসে কোপ মারলেন ছুরি দিয়ে। আমি সবে গোবরাট থেকে হাত তুলতে গেছি, এমন সময়ে কোপ পড়ল গোবরাটে— একটা সাংঘাতিক তনু-মন-অবশ-করা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল অণুতে পরমাণুতে। আমি পড়ে গেলাম বাগানে।

'পড়ে গেলেও জ্ঞান হারাইনি। উঠেই দৌড়োতে লাগলাম ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। অনেকটা মুহ্যমানের মতো। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে, মাথার মধ্যে যেন লক্ষ ঝাঁঝর বাজছে। এই সময়ে যন্ত্রণাটা আবার চিড়িক দিয়ে ওঠায় বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি আঙুলটাই নেই! দেখেই মাথা ঘুরে গেল। রুমাল দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়াটা বন্ধ করতে গিয়ে আরও যেন কীরকম হয়ে গেলাম। গোলাপ ঝোপের মধ্যে টলে পড়ে গেলাম।

'নিশ্চয় অনেকক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম চাঁদ চলে গেছে, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড আমি পড়ে আছি বড়োরাস্তার একটা ঝোপের ধারে— দূরে রেল স্টেশনের বাড়ি। আশেপাশে কোথাও গত রাতের সেই রহস্যনিকেতন বা বাগিচার চিহ্নমাত্র নেই।

'হাতটা আবার ঝন ঝন করে উঠতে চেয়ে দেখলাম। স্বপ্ন নয়। সত্যিই কাল রাতে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে পড়েছিলাম— কিন্তু মরিনি।

'টলতে টলতে স্টেশনে গেলাম। সেই কুলিটা ছিল। কিন্তু কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক বলে কাউকে সে চেনে না। কাল রাতে কোনো গাড়িও দেখেনি।

'ছ-টার একটু পরেই লন্ডন পৌঁছোলাম। স্টেশন থেকে আঙুল ড্রেস করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসনের কাছে আপনার কথা শুনলাম। সবই বললাম, এখন বলুন কী করব।'

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। অসাধারণ কাহিনি সন্দেহ নেই। তারপর হোমস উঠে গিয়ে মোটা খাতা পেড়ে আনল তাক থেকে। খবরের কাগজের কাটিং সেঁটে রাখে খাতাটায়।

বললে, 'এক বছর আগে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। শুনুন।'

'ন-তারিখে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার মি. জেরেমিয়া হেলিং নিখোঁজ হয়েছেন। রাত দশটার সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান— আর পাওয়া যায়নি। পোশাক— ইত্যাদি, ইত্যাদি। ব্যস! এই তো বোঝা গেল! এক বছর আগে এইভাবেই মেশিন মেরামত করেছিলেন কর্নেল।'

'কী সর্বনাশ! ভদ্রমহিলা তাহলে এঁর কথাই বলছিলেন!' বললেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠহীন রুগি।

'নিশ্চয়। কর্নেল লোকটা পয়লা নম্বরের মরিয়া লোক— ঠান্ডা মাথার বদমাশ। পথের কাঁটা

দূর করতে কোনো পন্থা অবলম্বনেই পেছপা নন। প্রত্যেকটা সেকেন্ড এখন অমূল্য। চলুন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগে যাওয়া যাক। সেখান থেকে দল বেঁধে যাব আইফোর্ড।'

ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেনে চেপে বসলাম আমি, শার্লক হোমস, ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাদা পোশাকি পুলিশ। ব্র্যাডস্ট্রিট একটা সামরিক ম্যাপ[১৬] বিছিয়ে আইফোর্ডকে মাঝে রেখে কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকছিলেন চারধারে।

বললেন, 'এই নিন দশ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্ত। এর মধ্যেই পড়বে। দশ মাইলই তো?'

'আধঘণ্টা টেনে গিয়েছিলাম গাড়িতে।'

'অজ্ঞান অবস্থায় এতটা পথ বয়ে এনেছিল?'

'নিশ্চয় তাই। আবছা মতন মনে আছে কারা যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।'

আমি বললাম, 'বাগানে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে ছেড়ে দিল কেন বুঝছি না।'

ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, 'এখুনি তা বোঝা যাবে। আগে জানা দরকার সেই বাড়িটা কোথায়।'

শান্তকণ্ঠে হোমস বললে, 'আমি দেখিয়ে দিতে পারি।'

'তাই নাকি! তার মানে, মনে মনে আপনি ঠিক করেই ফেলেছেন জায়গাটা কোথায়। বেশ, দেখা যাক আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি কি না। আমি বলব বাড়িটা দক্ষিণে— ওইদিকেই লোকজন কম।'

হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'পুবদিকে।'

'পশ্চিম দিকে,' বললে সাদা পোশাকি ভদ্রলোক, 'নিরালা গ্রামগুলো তো ওইদিকেই।'

'উত্তর দিকে,' বললাম আমি, 'কেননা পাহাড় নেই ওদিকে। মি. হেথার্লি বলেছেন, গাড়ি ওপর দিকে উঠেছে বলে একবারও মনে হয়নি।'

শার্লক হোমস বললে, 'ভুল করলেন প্রত্যেকেই।' বলে আঙুলে রাখল বৃত্তের ঠিক মাঝখানে, 'এইখানে খুঁজলে পাবেন সেই বাড়ি।'

দম আটকে এল যেন হেথার্লির, 'কিন্তু বারো মাইল পথ তো গিয়েছি!'

'ছ-মাইল গেছেন, ছ-মাইল এসেছেন। আপনিই বললেন, ঘোড়ার গা চকচক করছিল, ক্লান্ত মোটেই ছিল না। বারো মাইল খারাপ রাস্তা পেরিয়ে কোনো ঘোড়াকেই ও অবস্থায় দেখা যায় না।'

মাথা চুলকোতে চুলকাতে ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, 'খুব ধোঁকা দিয়েছে মনে হচ্ছে। দলটার কাজকারবার এবার আন্দাজ করা যাচ্ছে।'

'জাল টাকার কারবার[১৭],' বললে হোমস। 'রুপোর নকল হিসেবে খাদ মিশোনো যে-ধাতু লাগে, সেটি তৈরির জন্যেই দরকার ওই মেশিন।'

ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, 'নকল আধ ক্রাউন মুদ্রায় বাজার ছেয়ে ফেলেছে, এমন একটা দলের কীর্তি আমাদের কানে এসেছে। রীডিং পর্যন্ত তাদের হদিশ পেয়েছি— এবার বাছাধনদের ছাড়ছি না।'

কিন্তু পুলিশের হাতে পড়বার পাত্র তারা নয়। ব্র্যাডস্ট্রিটের মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হল না। আইফোর্ডে ট্রেন যখন ঢুকছে, তখনই দেখলাম অস্ট্রিচ পাখির পালকের মতো রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বড়ো বড়ো গাছপালার আড়ালে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

'বাড়ি পুড়ছে নাকি?'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

'বাড়ি পুড়ছে নাকি?' গাড়ি থামলে 'পর স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন ইনস্পেকটর।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'আগুন লাগল কখন।'

'রাত্রে।'

'বাড়িটা কার?'

'ডক্টর বেচারের।'

'ডক্টর বেচার কি জাতে জার্মান, খুব রোগা, খাড়া লম্বা নাক?'

স্টেশন মাস্টার তো হেসেই অস্থির।

বলল, 'আজ্ঞে না, ডক্টর বেচার জাতে ইংরেজ। খাঁটি ভদ্রলোক। তবে ওঁর বাড়িতে একজন বিদেশি রুগি থাকেন— পেটে কিছু সয় বলে মনে হয় না।'

তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম আগুনের দিকে। গিয়ে দেখলাম বিরাট একটা বাড়ি জানলাসমেত দাউ দাউ করে পুড়ছে[১৮]। বাগানে দমকল বাহিনী বৃথাই আগুনকে বাগে আনবার চেষ্টা করছে।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন হেথার্লি, 'ওই তো সেই বাড়ি। এই হল কাঁকর বিছানো পথ, ওই গোলাপি ঝোপে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম আমি[১৯], আর ওই জানলাটা থেকে লাফ দিয়েছিলাম নীচে।'

হোমস বললে, 'ভালো শোধই নিলেন আপনি। যে-ল্যাম্পটা মেশিন ঘরে রেখে এসেছিলেন, গুঁড়িয়ে যাবার পর সেই আগুন কাঠের তক্তায় গিয়ে লাগে। তখন আপনার পেছন নিতে গিয়ে অত কেউ খেয়াল করেনি— পরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেখে সব ফেলে পালিয়েছে— এতক্ষণে এক-শো মাইল দূরে চলে গেছে বলতে পারেন।'

হোমসের কথাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। নৃশংস জার্মান বা বিষণ্ণ ইংরেজের খবর আর পাওয়া যায়নি। তবে সেইদিনই ভোরের দিকে ভারী ভারী বাক্স বোঝাই একটা গাড়িকে রীডিং স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছিল একজন চাষি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গেল কোথায়, তা শার্লক হোমস পর্যন্ত মাথা খাটিয়ে বার করতে পারেননি।

বাড়িটার গোলকধাঁধার মতো গলিঘুঁজি দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল দমকল বাহিনী, চোখ কপালে উঠেছিল ওপরতলার জানলার গোবরাটে একটা মানুষের বুড়ো আঙুল দেখে। সন্ধে নাগাদ আগুন নিভল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ছাদ ধ্বসে পড়েছে, অভিশপ্ত মেশিনটাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বারবাড়িতে পাওয়া গেল কিছু নিকেল আর টিন। পাওয়া গেল না কেবল মুদ্রা— নিশ্চয় পাচার হয়ে গিয়েছে ভোরের সেই গাড়িতে।

হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার প্রাণে বেঁচে গেলেন কীভাবে এবং কে-ই বা তাঁকে বয়ে নিয়ে গেলেন বড়োরাস্তায়— সে-রহস্য পরিষ্কার হল নরম মাটিতে দু-জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কারের পর। একজোড়া খুব ছোটো, আর একজোড়া বেশ বড়ো। অর্থাৎ মহিলাটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে বাইরে। নীরব প্রকৃতি ভদ্রলোকের মন অতটা নিষ্ঠুর নয়, খুন জখমের প্রবৃত্তি নেই বলেই ভদ্রমহিলার মিনতি তাঁকে স্পর্শ করেছে।

লন্ডনগামী ট্রেনে উঠে বসে ক্ষোভের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'ভালো কারবার করে গেলাম বটে! পঞ্চাশটা গিনি তো পেলামই না— রেখে গেলাম বুড়ো আঙুলখানা!' ·

'কিন্তু পেলেন অভিজ্ঞতা', হেসে বলল শার্লক হোমস। 'এই গল্প শুনিয়ে ব্যাবসা জীবনে আপনার সুনাম বাড়িয়ে নেবেন 'খন।'

টীকা

১. **ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই** : 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব' প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯২-এর মার্চ সংখ্যায়।

২. **কর্নেল ওয়ার্বার্টনের** : কর্নেল উইলিয়াম পি. ওয়ার্বার্টন ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থার কন্যান ডয়ালের সহপাঠী।

৩. **একটা হাতে** : কোন হাত? ডান না বাম? লেখেননি কন্যান ডয়াল, তবে স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত সিডনি প্যাগেটের আঁকা ছবি দেখে মনে হয় বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটা পড়েছিল।

৪. **হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার** : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি শাখা। বিভিন্ন মেশিন, মিল, স্টিম ইঞ্জিন, সেকালের রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি পড়ত হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের আওতায়।

৫. **স্পঞ্জের মতো দগদগে মাংস :** এককোপে কাটা পড়া আঙুলের ক্ষত স্পঞ্জের মতো দগদগে হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়।

৬. **ব্যান্ডেজ :** ব্যান্ডেজে ব্যবহার করা হত কার্বলিক অ্যাসিড কিংবা ফিনাইল, যোসেফ লিস্টার (১৮২৭-১৯১২) ব্যান্ডেজে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহারের প্রচলন করেন। তার আগে ইথারের ব্যবহারে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করা হত। এতে রোগীর কষ্ট কম হলেও ভবিষ্যতে ক্ষততে গ্যাংরিন হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যেত না।

৭. **তাহলে চলুন :** এত বড়ো আঘাতের পর ডাক্তার হিসেবে ওয়াটসন রোগীর ঘুমোনোর ব্যবস্থা করলেন না।

৮. **আইফোর্ড :** ইংলন্ডে আইফোর্ড নামে কোনো এলাকা নেই।

৯. **সাজিমাটি :** অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। ধোপাদের কাপড় কাচায় ব্যবহার হওয়া ছাড়া বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদনে এবং কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

১০. **ইংলন্ডের দু-এক জায়গা :** ইংলন্ডের সারে এবং ইয়র্কশায়ারে সাজিমাটি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় স্কটল্যান্ডের মোরেশায়ারে।

১১. **হাইড্রলিক প্রেস :** ইয়র্কশায়ারের যোসেফ ব্রামা ১৭৯৬ সালে আবিষ্কার করেন এই যন্ত্র। একটি ছোটো পিস্টন দিয়ে তরল পদার্থকে ঠেলা দিয়ে অন্য একটি বড়ো পিস্টনের ওপর বহুগুণ বেশি চাপ উৎপন্ন করা যায় এই যন্ত্রে।

১২. **হার্মোনিয়ামের :** হার্মোনিয়াম প্রথম তৈরি করেন আলেকসান্দ্রে ডিবে, ১৮৪৮ সালে। এই বাদ্যযন্ত্র প্রাথমিকভাবে ছোটো চার্চ, চ্যাপেল বা বাড়িতে ব্যবহার করা হত।

১৩. **চিঞ্চিলা-জন্তুর কোমল... দাড়ি :** ঘন, জটা পাকানো দাড়িকে ইংরেজিতে অনেক সময়ে চিঞ্চিলা-বিয়ার্ড বলা হয়।

১৪. **স্বদেশবাসী :** লন্ডনের অধিবাসীরা সাধারণভাবে জার্মানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কাইজার উইলহেলম জার্মানির সিংহাসনে বসলে বার্লিনেও ইংরেজ বিরোধী মত প্রগাঢ় হয়। সম্ভবত এই কারণেই জার্মানের সঙ্গী ইংরেজটির প্রতি হোমসের মক্কেলের এই দরদ-ভরা সম্বোধন।

১৫. **দানবিক মেশিন :** এই ধরনের একটি মেশিন প্রতিবেশীদের সন্দেহের উদ্রেক না-করে বসানো হল কীভাবে, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন সমালোচক।

১৬. **সামরিক ম্যাপ :** ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার আশঙ্কায় ১৭৯১-এ ইংলন্ডের বোর্ড অব অর্ডিন্যান্স দক্ষিণ ব্রিটেনের জরিপ আরম্ভ করে। প্রথম ম্যাপটি ছিল কেন্ট কাউন্টির। এটি সম্পূর্ণ হয় ১৮০১ সালে।

১৭. **জাল টাকার কারবার :** ভিক্টোরীয় যুগে ইংলন্ডে নকল মুদ্রা ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮. **দাউ দাউ করে পুড়ছে :** হেদার্লি হাইড্রলিক প্রেসে জ্বলন্ত লণ্ঠন রেখে আসে আনুমানিক রাত দুটোয়। আগুন তখনই লেগেছে। হোমসরা অকুস্থলে পৌঁছন দুপুর নাগাদ। আগুন নিভল সন্ধের সময়ে। দমকল থাকা সত্ত্বেও অত সময় লাগল? আর কুড়ি ঘণ্টা আগুন জ্বলল বাড়িটা পোড়াতে!

১৯. **ওই গোলাপি ঝোপে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি :** আগুন লাগবার দু-আড়াই ঘণ্টা পরে যখন হেদার্লির জ্ঞান ফিরল তখন সে কোনো পোড়া গন্ধ পায়নি বা ধোঁয়া দেখেনি? নাকি, হাতের ব্যথায় বিব্রত হয়ে কিছু টের পায়নি?

খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য নোবল ব্যাচেলার]

লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ে এবং তারপরেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অদ্ভুত কাহিনি অনেকের কাছেই এখন বাসি হয়ে গিয়েছে। নিত্যনতুন কলঙ্ক কাহিনি রটছে, চার বছর আগেকার ব্যাপারটা আর তেমন আগ্রহ জাগায় না। বিচিত্র এই রহস্য ভেদে কিন্তু শার্লক হোমসের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

আমার বিয়ের কয়েক হপ্তা আগের ঘটনা। ঝড়বাদলার মাতামাতি চলছে বাইরে। জিজেল বুলেটে[২] আহত প্রত্যঙ্গ[৩] টনটনিয়ে উঠছে— বহু বছর আগে আফগান লড়াইয়ে জখম হয়েছিলাম— কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যথাটা বেশ চাগাড় দিয়ে ওঠে। চেয়ারে পা তুলে একরাশ খবরের কাগজ আর হোমসের নামে আসা এক বান্ডিল চিঠি নিয়ে বসে ছিলাম। একটা লেফাফার ওপর সিলমোহর আর মনোগ্রাম লক্ষ করার মতো। ভাবছিলাম খানদানি পত্রলেখকটি কে হতে পারে।

এমন সময়ে বৈকালিক ভ্রমণ সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরল শার্লক হোমস। খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের চিঠিতে চোখ বুলিয়ে বললে, 'ওহে, কেস খুব ইন্টারেস্টিং!'

'সামাজিক ব্যাপার নয় তাহলে?'

'একেবারেই না। পেশার ব্যাপার।'

'খানদানি মক্কেল নিশ্চয়?'

'ইংলন্ডের উঁচু মহলে যে ক-জন আছেন, তাঁদের একজনের চিঠি।'

'বল কী হে! অভিনন্দন রইল।'

'ওয়াটসন, মক্কেলের সমস্যাটাই আমার কাছে বড়ো— তার সামাজিক প্রতিপত্তি নয়। কাগজ তো পড়, লর্ড সেন্ট সাইমনের[৪] বিয়ের ঘটনা নিশ্চয় চোখ এড়ায়নি?'

'আরে না। দারুণ ইন্টারেস্টিং ঘটনা।'

'চিঠিখানা লর্ড সেন্ট সাইমনের লেখা। লিখেছেন :

'মাই ডিয়ার মি. শার্লক হোমস,

আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই আজ বিকেল চারটের সময়ে। অনুগ্রহ করে অন্য কাজ থাকলে তা বাতিল করবেন, কেননা ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড রহস্য সমাধানে উঠে পড়ে লেগেছেন— তাঁর মতে আপনিও যদি এ-সম্পর্কে চিন্তা করেন, তাহলে সুরাহা হতে পারে।

'আপনার বিশ্বস্ত
সেন্ট সাইমন।'

'চিঠিতে তারিখ পড়েছে গ্রসভেনর ম্যানসনের[৫], লেখা হয়েছে পালকের কলমে, খানদানি লর্ড মশাই ডান হাতের কড়ে আঙুলে এক ফোঁটা কালিও লাগিয়ে ফেলেছেন চিঠি ভাঁজ করতে করতে', বলল হোমস।

'এখন তিনটে বাজে। চারটের সময়ে আসবেন লিখেছেন।'

সেই ফাঁকে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক, ম্যান্টলপিস থেকে লাল মলাট দেওয়া একটা বই[৬] পেড়ে আনল হোমস। পাতা উলটে বললে, 'এই তো ডিউক অফ ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট ওয়ালসিংহ্যাম দ্য ভেরে সেন্ট সাইমন। হুম! বয়স একচল্লিশ, বিয়ের বয়স।

কলোনি শাসনব্যবস্থায় আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরে সেক্রেটারি ছিলেন ওঁর পিতৃদেব। ধমনীতে আছে বাপ পিতামহের প্লান্টাজেনেট[৭] রক্ত, বিয়ের সূত্রে তাতে মিশেছে টিউডর[৮] রক্ত। খুব একটা কিছু জানা গেল না এ থেকে। ওয়াটসন, খবরের কাগজে কী দেখেছ বল তো?'

'কয়েক হপ্তা আগে মর্নিংপোস্টে[৯]' প্রথম নোটিশটা বেরোয় পার্সোনাল কলমে। লিখেছে, জোর গুজব, সানফ্রান্সিসকো[১০] নিবাসী মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরানোর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে চলেছে ডিউক অফ ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সাইমনের।'

আগুনের দিকে লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে হোমস বললে, 'বড্ড কাটছাঁট ছোট্ট খবর।'

'গত হপ্তার শেষের দিকেও একটা খবর বেরিয়েছিল। শোনো :

'খোলা বাজারের বিয়ের নীতির ফলে আমাদের দেশের জিনিসই পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে। এ নিয়ে আইনকানুন করা দরকার। ব্রিটেনের খানদানি ফ্যামিলিতে হামেশাই বউ হয়ে আসছে সাগরপারের সুন্দরীরা। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে লর্ড সেন্ট সাইমনের ক্ষেত্রে। এত বছর বীরবিক্রমে আইবুড়ো থাকার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার কোটিপতি-কন্যা হ্যাটি ডোরানের কটাক্ষ বিদ্ধ হয়েছেন। বিয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে, যৌতুক ছয় অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। ডিউক অফ ব্যালমোরালের ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ, সে-খবরও দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে। গত ক-বছর ধরে নিজস্ব ছবি বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন ভদ্রলোক। বার্চমুরের ছোট্ট সম্পত্তি ছাড়া লর্ড সেন্ট সাইমনেরও কপালে কিছু জোটেনি। কাজেই বিয়ের ফলে লাভের কড়ি কেবল ক্যালিফোর্নিয়ার সুন্দরীই পাবেন না— লর্ড সেন্ট সাইমনও বর্তে যাবেন।'

হাই তুলে হোমস বললে, 'আর কিছু আছে নাকি?'

'আছে। সেন্ট জর্জ গির্জায়[১১] সাদাসিধেভাবে বিয়ে হবে— খবর দিয়েছে "মর্নিং পোস্ট"। জনাছয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু কেবল নিমন্ত্রিত হবেন। বিয়ের পর ল্যাঙ্কাস্টার গেটের[১২] বাড়িতে যাবেন মি. ডোরান। দু-দিন পরে— মানে গত বুধবার আর একটা খবর বেরিয়েছে— বিয়ে হয়ে গেছে। বর-বউ হানিমুন করতে যাবেন লর্ড ব্যাকওয়াটারের বাড়িতে। কনে অদৃশ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত এই হল গিয়ে সব খবর।'

'কীসের আগে পর্যন্ত?' সচমকে বলল হোমস।

'লেডি সাইমন অদৃশ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত।'

'অদৃশ্য হলেন কবে?'

'বিয়ের ব্রেকফাস্ট[১৩] খেতে খেতে।'

'আচ্ছা! রীতিমতো ইন্টারেস্টিং আর নাটকীয় মনে হচ্ছে।'

'এ-রকম ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না।'

'বিয়ের আগে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা আছে, এমনকী হানিমুনের সময়েও সটকান দেয় অনেকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো কেউ পালায় না। একটু খুঁটিয়ে বল শুনি।'

'গতকাল সকালে কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে শোনো। শিরোনামা হল হালফ্যাশনের বিয়ের আসরে অভূতপূর্ব কাণ্ড!'

'লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ে নিয়ে টি-টি পড়ে গেছে শহরে। কিছুতেই আর ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

সেন্ট জর্জ চার্চে মোট ছ-জনের উপস্থিতিতে বিয়ে হয়ে যায় দুজনের। গির্জে থেকে বেরিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মি. ডোরানের বাড়িতে সবাই যান। এইসময়ে মিস ফ্লোরা মিলার নামে এক নর্তকী হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। লর্ড সাইমনের ওপর নাকি তার দাবি আছে। বাড়ির মধ্যেও ঢোকবার চেষ্টা করে— কিন্তু ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এই হাঙ্গামা শুরু হওয়ার আগে লেডি সাইমন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। প্রাতরাশ খেতেও বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ শরীর খারাপ বলে উঠে যান। অনেকক্ষণ তাঁকে না-দেখে মি. ডোরান মেয়ের ঘরে গিয়ে আর তাঁকে দেখতে পাননি। কনের পরিচারিকা বলেছে, কোট আর টুপি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন লেডি সাইমন। মি. ডোরান তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেন। তদন্ত চলছে। নর্তকী মিস ফ্লোরা মিলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে— লেডি সাইমনের অন্তর্ধানের পেছনে নিশ্চয় তার হাত আছে।'

'ওয়াটসন,' সব শোনবার পর বললে শার্লক হোমস, 'কেসটা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে হাজার প্রলোভনেও এ-কেস হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই। দরজায় ঘণ্টা বাজছে। চারটেও বেজে গেছে। খানদানি মক্কেলটি এসে গেছেন নিশ্চয়।'

ক্ষণপরেই ছোকরা চাকরের পেছন পেছন ঘরে প্রবেশ করলেন লর্ড সেন্ট সাইমন। বয়স যা-ই হোক না কেন, ঈষৎ হাঁটু বেঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে হাঁটার দরুন একটু বয়স্কই মনে হয়। টুপি খোলার পর দেখা গেল চুলে পাক ধরেছে। ব্রহ্মতালুর চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সাজগোজে শৌখিনতা আছে। ডান হাতে সোনার চশমার সুতো ধরে দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকলেন প্রকৃতই অভিজাত কায়দায়। হুকুম করার জন্যেই যেন তিনি জন্মেছেন।

অভিবাদন বিনিময়ের পর লর্ড বললেন, 'মি. হোমস আপনি অনেকের কেস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু আমি যে-মহলের মানুষ, সে-মহল থেকে বোধ হয় আমিই প্রথম।'

'তারও ওপরের মহল থেকে আসা হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন একটা দেশের রাজা। সেদিক দিয়ে বলতে পারেন আমার দর কমছে।'

'বলেন কী! কোথাকার রাজা?'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ার[১৪]!'

'সর্বনাশ! তাঁরও কি বউ নিখোঁজ হয়েছিল?'

'মাফ করবেন। গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পেশার ধর্ম। আপনি বরং বলুন খবরের কাগজে এই যে-খবরটা বেরিয়েছে, এটা ঠিক কি না।'

কনের অন্তর্ধান সম্পর্কিত সংবাদে চোখ বুলিয়ে লর্ড সাইমন বললেন, 'ঠিক।'

'মিস হ্যাট্টি ডোরানকে প্রথম কবে দেখেন?'

'এক বছর আগে সানফ্রান্সিসকোয়।'

'যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল কি তখনই?'

'না।'

'কিন্তু বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছিল?'

'পরস্পরকে ভালো লাগত বলতে পারেন।'

'ওর বাবা খুব বড়োলোক?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে ভদ্রলোক বলতে যে ক-জন আছেন, উনি তাঁদের পকেটে পুরে রাখতে পারেন।'

'এত টাকা করলেন কী করে?'

'খনির কাজে। বছর কয়েক আগে কানাকড়িও ছিল না। তারপর সোনার খোঁজ পেয়ে রাতারাতি লাল হয়ে গেলেন।'

'আপনার স্ত্রী-র চরিত্র কীরকম?'

হাতের চশমা আরও জোরে দুলিয়ে আগুনের পানে তাকিয়ে বললেন খানদানি ভদ্রলোক, 'স্ত্রী-র বয়স যখন বিশ, তখন পর্যন্ত খনি নিয়েই মেতে থেকেছেন আমার শ্বশুর— বড়োলোক হননি। তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছে— শিক্ষা পেয়েছে প্রকৃতির পাঠশালায়— স্কুলে নয়। ইংলন্ডে যাদের আমরা টম বয় অর্থাৎ গেছো মেয়ে বলি, সে তাই। প্রকৃতি দুর্দান্ত, স্বাধীনচেতা, কোনো সংস্কারের বালাই নেই। খুদে আগ্নেয়গিরি বললেও চলে— আবেগ চেপে বসলে আর তর সয় না। মনস্থির করে তুড়ি মেরে, সেই অনুযায়ী কাজ করে তৎক্ষণাৎ। অন্তরে তার আভিজাত্য দেখেছিলাম বলেই আমার নামের মর্যাদা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি জানি সে নিজেকে বলি দেবে, তাও ভালো— কিন্তু মর্যাদা যায় এ-রকম কিছুই করবে না।'

'কাছে ফটো আছে?'

'সঙ্গেই এনেছি,' বলে একটা লকেট বাড়িয়ে দিলেন লর্ড। লকেটের মধ্যে হাতির দাঁতের ওপর পরমাসুন্দরী একজন তরুণীর মুখশ্রী অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। নিবিড় কৃষ্ণচক্ষুর পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লকেট ফিরিয়ে দিল হোমস।

বলল, 'ইনি লন্ডনে এলে নতুন করে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হয়। তাই তো?'

'ওর বাবা ওই কারণেই ওকে এনেছিলেন এখান। বিয়ের কথাও পাকা হয়ে যাবার পর বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল। তারপর—'

'যৌতুকের টাকা পেয়ে গেছেন?'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। খোঁজখবরও করিনি।'

'বিয়ে যেদিন হয়, তার আগের দিন দেখা হয়েছিল মিস ডোরানের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ!'

'মেজাজ সরস ছিল কি?'

'ও-রকম খুশি চনমনে আর কখনো দেখিনি।'

'বিয়ে যেদিন হল, সেদিন সকালে মেজাজ কীরকম দেখলেন?'

'অত্যন্ত ভালো। বিয়ে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত।'

'তারপর বুঝি মেজাজে চিড় লক্ষ করেছিলেন?'

'তা... হ্যাঁ, সেই প্রথম ওকে একটু অস্থির অবস্থায় দেখেছিলাম। সামান্যই ব্যাপার।'

'হোক সামান্য, বলুন আমাকে।'

'বেদির দিকে যাওয়ার সময়ে ফুলের তোড়াটা পড়ে যায় ওর হাত থেকে। এক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে দিল ওর হাতে। তোড়ার ক্ষতি হয়নি— অথচ কথাটা জিজ্ঞেস করতেই

একটা অসংলগ্ন জবাব দিল। বাড়ি ফেরার সময়ে গাড়ির মধ্যে মনে হল বেশ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে সামান্য এই ব্যাপারে।'

'গির্জের মধ্যে তাহলে বাইরের লোক ছিল?'

'তা তো থাকবেই। গির্জে খোলা থাকলে ঘাড় ধরে কাউকে বার করে তো দেওয়া যায় না।'

'ভদ্রলোক লেডি সাইমনের বন্ধু কি?'

'কী যে বলেন! ভদ্রলোক বললাম ভদ্রতার খাতিরে। চেহারা একেবারেই সাদামাটা। ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি।'

'লেডি সাইমন তাহলে গির্জেতে গেছিলেন মনের আনন্দ নিয়ে। বেরিয়ে এসেছিলেন মন খারাপ করে। বাড়ি এসে কী করলেন?'

'ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলছিল।'

'কে সে?'

'নাম তার অ্যালিস। আমেরিকান মেয়ে। ওর সঙ্গেই এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

'খুব মাই ডিয়ার ঝি বুঝি?'

'খুবই। বড্ড আশকারা পাওয়া ঝি। আমেরিকায় এসব ওরা বরদাস্ত করে, এখানে চলে না।'

'কতক্ষণ কথা বললেন ঝি-য়ের সঙ্গে?'

'মিনিট কয়েক।'

'কী কথা শুনেছিলেন?'

'গাঁইয়া ভাষায় কী যেন বলছিল লেডি সাইমন। "জাম্পিং এ ক্লেম" শব্দগুলো কেবল কানে এসেছিল। মানে বুঝিনি।'

'আমেরিকার গাঁইয়া ভাষায় অনেক মানে থাকে কিন্তু। তারপর উনি কী করলেন?'

'প্রাতরাশের টেবিলে গেলেন।'

'আপনার বাহুলগ্না হয়ে?'

'না। মিনিট দশেক থেকে উঠে পড়ল। বেরিয়ে গেল। আর আসেনি।'

'ঝি-টি কিন্তু এজাহারে বলেছে, ঘরে গিয়ে কোট আর টুপি নিয়ে বেরিয়েছেন লেডি সাইমন!'

'ঠিকই বলেছে। এর ঠিক পরে হাইড পার্কে ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে তাকে হাঁটতে দেখা গেছে। সেই ফ্লোরা মিলার যে বাড়ি বয়ে এসে মামলা জুড়েছিল।'

'ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীরকম, একটু খুলে বলবেন?'

ভুরু কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে লর্ড সাইমন বললেন, 'বছর কয়েক একটু যোগাযোগ ছিল— বান্ধবী বলতে পারেন। আদরের বান্ধবী। কিন্তু মেয়েরা আশকারা পেলে মাথায় উঠে যায়। আমার বিয়ের খবর পেয়ে যাচ্ছেতাই চিঠি লিখতে শুরু করলে। তখনই জানতাম, বিয়ের সময়ে হট্টগোল করতে পারে, আমার মুখে চুনকালি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। হলও তাই। শ্বশুরবাড়িতে জোর করে ঢুকতে গেছিল, আমার স্ত্রী-র বাপান্তও করেছিল। কিন্তু আমি সাদা পোশাকি দুজন পুলিশ মোতায়েন রেখেছিলাম দরজায়, এইরকম কিছু একটা হবে আঁচ করে। তারাই বের করে দেয় ওকে।'

'লেডি সাইমন শুনেছিলেন ধাক্কাধাক্কির ঘটনা?'

'না।'

'অথচ তাঁর সঙ্গেই ফ্লোরা মিলারকে হাইড পার্কে দেখা গেছে?'

'মি. লেসট্রেড সেই কারণেই সন্দেহ করেছেন ফ্লোরাই ষড়যন্ত্র করে সরিয়েছে লেডি সাইমনকে।'

'আপনার কি তাই মনে হয়?'

'না। সামান্য একটা মাছিকেও যে মারতে চায় না, তার পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়। ফ্লোরা নির্দোষ।'

'ঈর্ষায় মানুষ পালটে যায়।'

'দেখুন, আমার মনে হয় হঠাৎ এইরকম উঁচুদরের খেতাব পেয়ে, সমাজের উঁচু মহলের একজন হয়ে গিয়ে লেডি সাইমন মাথার ঠিক রাখতে পারেননি বলেই আমার বিশ্বাস।'

'বেসামাল অবস্থা, এই তো?'

'তা ছাড়া আর কী? হাপিত্যেশ করে থেকেও অনেকে যা পায়নি— ও তা সহজেই পেয়ে যখন চলে গেছে— তখন ওকে অপ্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?'

হাসল হোমস। বলল, 'আশ্চর্য কিছু নয়। এখন আর একটা প্রশ্ন। আপনি প্রাতরাশের টেবিলে যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল কি?'

'রাস্তার উলটো দিক আর পার্কের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'ঠিক বলেছেন। তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমিই খবর দেব আপনাকে।'

উঠে দাঁড়ালেন লর্ড, 'রহস্য ভেদ করতে পারবেন তো?

'রহস্যভেদ হয়ে গেছে।'

'অ্যাঁ! কী বললেন?'

'বললাম যে, রহস্যভেদ হয়ে গেছে।'

'বলুন তাহলে আমার বউ কোথায়?'

'সেটা শিগ্‌গিরই জানব।'

'আমার তো মনে হয় আপনার বা আমার দ্বারা এ-রহস্যভেদ হবে না— আরও পাকা মাথা দরকার।' সেকেলে খানদানি ঢংয়ে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন লর্ড।

হাসতে লাগল শার্লক হোমস।

বলল, 'যাক, আমার মাথাকে লর্ড মশায় নিজের মাথার স্তরে ফেলে সম্মান তো দিলেন। ওহে, জেরা তো অনেক হল, এবার একটু হুইস্কি-সোডা-চুরুটের সদ্‌ব্যবহার করা যাক। মক্কেল ভদ্রলোক ঘরে ঢোকবার আগেই কিন্তু রহস্য ভেদ করে বসেছিলাম আমি।'

'মাই ডিয়ার হোমস!'

'এ-রকম ঘটনার সুরাহা এর আগেও করেছি— তবে এত ঝটপট করিনি।— আরে! আরে! লেসট্রেড যে! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! বসে পড়ো! পাশের টেবিল থেকে গেলাস নাও, চুরুট পাবে এই বাক্সে।'

কালো ক্যানভাস ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকল সরকারি গোয়েন্দা। পরনে মোটা পশমি জ্যাকেট আর গলাবন্ধ। অবিকল নাবিকদের মতো দেখাচ্ছে।

'লেসট্রেড,' চোখ নামিয়ে বললে হোমস, 'এত মনমরা কেন?'

'দুর মশাই!' চুরুট ধরিয়ে বললে লেসট্রেড, 'সেন্ট সাইমনের ছাতার বিয়ে নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলাম।'

'বল কী হে!'

'সূত্র-টুত্রগুলো সব পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাচ্ছে।'

'ভিজলে কী করে?'

'জাল ফেলতে গিয়ে। সার্পেন্টাইনে[১৫] জাল ফেলে দেখছিলাম লেডি সাইমনের ডেডবডি পাওয়া যায় কি না।'

'অ্যাঁ! বলে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে পেট ফাটা হাসি হাসতে লাগল হোমস।

হাসতে হাসতেই বললে, 'ট্রাফালগার স্কোয়ারের[১৬] ফোয়ারায় জাল ফেললে না কেন?'

'তার মানে?'

'ডেডবডি পাওয়ার সম্ভাবনা দু-জায়গাতেই সমান।'

কটমট করে তাকিয়ে লেসট্রেড বললে, 'অনেক কিছু জেনে বসে আছেন মনে হচ্ছে?'

'খবরটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে জানা হয়ে গেছে।'

'সার্পেন্টাইনে জাল ফেলার সঙ্গে এ-রহস্যের কোনো সম্পর্ক নেই বলতে চান?'

'আদৌ নেই।'

'এগুলো তাহলে কী,' বলতে বলতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে জলে চুপসোনো কনের পোশাক, জুতো, মালা, ওড়না আর একটি আংটি বার করল লেসট্রেড। 'দেখি এই ধাঁধার সমাধান করেন কী করে।'

'জাল ফেলে তুললে মনে হচ্ছে?' নীল ধূম্রবলয় শূন্যে উড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে বন্ধুবর।

'আজ্ঞে না।' তিক্ত স্বর লেসট্রেডের। 'জলে ভাসছিল, দারোয়ান দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে। বিয়ের পোশাক যেখানে পাওয়া গেছে, কনে বউকেও সেখানে পাওয়া যাবে, এই আশায় জালটা ফেলা হয়েছিল।'

'অপূর্ব যুক্তি! এই যুক্তির বশেই সব মানুষকেই তাদের জামাকাপড় রাখার আলমারির কাছে পাওয়া উচিত।'

'আমি কিন্তু এই জামাকাপড় থেকেই প্রমাণ করে ছাড়ব ফ্লোরা মিলারের হাত আছে লেডি সাইমনকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে।'

'পারবে না, লেসট্রেড, পারবে না।'

'পারব না? সাংঘাতিক ভুল করে বসলেন কিন্তু মি. হোমস। ফ্লোরা মিলারকে ফাঁসানোর প্রমাণ এই পোশাকেই আছে।'

'কীরকম?'

'বিয়ের পোশাকের পকেটে একটা কার্ডের বাক্স পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পেয়েছি এই চিরকুটটা। শুনুন কী লেখা আছে :

দেখা করো। এখুনি এসো।

এফ.এইচ.এম.

এ থেকে কি বোঝা যায় না ফ্লোরা মিলারই জপিয়ে নিয়ে গেছে লেডি সাইমনকে? চিঠিখানা গির্জেতে ঢোকার সময়ে পাচার করা হয়েছিল ওঁর হাতে।'

'চমৎকার! অতীব চমৎকার!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চিরকুটটা হাতে নিল শার্লক হোমস। চোখ বুলানোর সঙ্গেসঙ্গে কিন্তু পালটে গেল চোখ-মুখের চেহারা। নিমেষে তিরোহিত হল ঔদাসীন্য,

তিনি বললেন, 'এই যে!'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

সে-জায়গায় আবির্ভূত হল নিঃসীম কৌতূহল। বলল চকিত কণ্ঠে, 'আরে! এ যে দেখছি সত্যিই কাজের জিনিস!'

'পথে আসুন।'

'এসে গেছি। অভিনন্দন রইল, লেসট্রেড।'

বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আঁতকে ওঠে সরকারি গোয়েন্দা।

'আরে মশাই, উলটো দিক দেখছেন কেন?'

'উলটো কী হে, ওইটাই তো সোজা দিক।'

'মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি আপনার? চিঠিতা তো এ-পিঠে লেখা।'

'আর ও-পিঠে লেখা একটা খরচের বিল। দারুণ ইন্টারেস্টিং।'

'আগেই দেখেছি, কিস্সু নেই ওর মধ্যে। চৌঠা অক্টোবর ঘর ভাড়ার জন্যে ৮ শিলিং, প্রাতরাশের জন্য আড়াই শিলিং, ককটেলের জন্যে ১ শিলিং, লাঞ্চের জন্যে আড়াই শিলিং আর এক তোলা শেরি মদের জন্যে ৮ পেন্স খরচ করা হয়েছে। এই তো?'

'আরে হ্যাঁ, ওর মধ্যেই তো সব কিছু। চিরকুটটাও কম দরকার নয়— নামের আদ্যাক্ষরগুলো কাজে লাগবে।'

'দেখুন মশায়, আমি হাড়ভাঙা খাটতে ভালোবাসি— আগুনের ধারে আরামে বসে কল্পনাবিলাস আমাকে মানায় না। চললাম, দেখি কে আগে রহস্য ভেদ করে,' গজ গজ করতে করতে ভিজে জামাকাপড়গুলো ব্যাগে পুরে নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লেসট্রেড। পেছন থেকে চিৎকার করে হোমস বললে, 'ওহে একটা কথা শুনে যাও। লেডি সাইমন বলে কেউ নেই, ছিলও না।'

তারপর তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল শার্লক হোমস।

এক ঘণ্টা পরে খাবারের দোকান থেকে লোকজন এসে চমৎকার একটা নৈশভোজ সাজিয়ে দিয়ে গেল খাবার টেবিলে। বলে গেল টাকাপয়সা আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাত ন-টার সময়ে ফিরল হোমস। মুখ গম্ভীর। চোখ উজ্জ্বল। অর্থাৎ সান্ধ্য অভিযান ব্যর্থ হয়নি।

সোৎসাহে বললে, 'যাক, খাবার দিয়ে গেছে তাহলে।'

'পাঁচজনের খাবার দেখছি। অতিথি আসছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। লর্ড সেন্ট সাইমন বোধ হয় এসে গেলেন।'

উল্কাবেগে ঘরে ঢুকলেন লর্ড মশায়। ভীষণ বিচলিত মুখে বললেন, 'এই যে মি. হোমস।'

'চিঠি তাহলে পেয়েছেন?'

'তা তো পেয়েছি। কিন্তু যা লিখেছেন, তা কি জেনে লিখেছেন?'

'মনে তো হয়।'

ধপ করে চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিলেন লর্ড সাইমন। কপাল চাপড়ে বললেন, 'এই অপমানের কাহিনি ডিউকের কানে পৌঁছোলে ওঁর মনের অবস্থাটা কী হবে ভাবতে পারেন?'

'অপমান বলে ধরছেন কেন— নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। এ ছাড়া, ওঁর সামনে অন্য পথ ছিল কি?'

টেবিল বাজিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লর্ড, 'আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। কিন্তু পাঁচজনের সামনে আমার মাথা হেঁট করা কি হয়নি বলতে চান?'

'ভদ্রমহিলার অবস্থাটাও একটু ভাবুন।'

'কারো কথা ভাববার দরকার নেই আমার। অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমার সঙ্গে।'

উৎকর্ণ হয়ে হোমস বললে, 'ওঁরা বোধ হয় এসে গেলেন। লর্ড সাইমন, আমি একজন আইনবিদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি— তিনি এ-ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন।— আসুন।'

ঘরে ঢুকলেন একজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক। সঙ্গেসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন লর্ড মশায়।

হোমস বললে, 'আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুল্টন। মিসেসকে অবশ্য আগেই চেনেন।'

মিসেস মুল্টন এগিয়ে গেলেন লর্ডের সামনে। তিনি পকেটে হাত পুরে মুখ ফিরিয়ে রইলেন অন্যদিকে।

মিনতি মাখানো কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, 'রবার্ট, আমি দুঃখিত।'

'দুঃখ প্রকাশের কোনো দরকার নেই।'

'তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে দেখে আর মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি এই যথেষ্ট।'

আগন্তুক ভদ্রলোক বেশ চটপটে, শানিত মুখচ্ছবি, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। বললেন, 'ব্যাপারটা বড্ড বেশি গোপন করা হয়েছিল বুঝতে পারছি।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তাহলে আমিই বলছি আমাদের কাহিনি। ১৮৮৪ সালে ম্যাককোয়ারের ক্যাম্পে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। জায়গাটা রকি পাহাড়ের ধারে— বাবা খনির কাজ নিয়ে মেতে ছিল ওখানে। ঠিক করলাম আমরা বিয়ে করব। তারপরেই সোনা পেয়ে বাবা বড়োলোক হয়ে গেল— আর কিছুই না-পেয়ে ফ্র্যাঙ্ক দিনকে দিন গরিব হতে লাগল। বাবা বিয়ে

দিতে রাজি হল না। আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোয়[১৭] চলে এল। আমরা কিন্তু লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে গেলাম, বিয়ে পর্যন্ত সেরে নিলাম— ঠিক হল যদ্দিন না ভাগ্য ফিরছে, তদ্দিন খোলাখুলিভাবে আমার বর হিসেবে নিজের পরিচয় ও দেবে না। কিন্তু কেউ কাউকে ভুলব না।'

'ও গেল ভাগ্য অন্বেষণে, আমি গেলাম বাবার কাছে। তারপর নানান জায়গা থেকে ফ্র্যাঙ্কের কয়েকটা খবর পেলাম। শেষ খবরটা এল সাংঘাতিক। রেড ইন্ডিয়ানরা একটা তাঁবু আক্রমণ করে অনেক অভিযাত্রীকে খতম করেছে[১৮], তাদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কও আছে।

'এক বছর পথ চেয়ে রইলাম। কোনো খবরই যখন পেলাম না, বুঝলাম সত্যিই ও আর নেই। শরীর ভেঙে গেল। বাবা দুনিয়ার ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাল। এই সময়ে দেখা হল লর্ড সাইমনের সঙ্গে।

'লন্ডনে এলাম। বিয়ের দিন কিন্তু বেদিতে উঠতে যাওয়ার আগেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম স্বয়ং ফ্র্যাঙ্ককে[১৯]। ভাবলাম বুঝি ফ্র্যাঙ্কের প্রেতমূর্তি। পুরুতঠাকুরের বিয়ের মন্ত্র কানে ঢোকেনি— সম্মোহিতের মতো ভেবেছি, এ কি সত্যি? হয়তো তখুনি একটা কেলেঙ্কারি করে বসতাম যদি না ফ্র্যাঙ্ক আঙুল নেড়ে আমাকে স্থির থাকতে ইশারা করত। তারপর দেখলাম একটা কাগজে চিঠি লিখছে। যাওয়ার সময়ে ইচ্ছে করে ফুলের তোড়া ফেলে দিলাম— ও তুলে দিল, সেইসঙ্গে চিঠিটা।

'চিঠির মধ্যেই নির্দেশ পেলাম কী করতে হবে। আমার স্বামীর নির্দেশ।

'বাড়ি গেলাম। অ্যালিসকে সব বললাম। কোট আর টুপি নিয়ে পালিয়ে গেলাম। ঠিক করেছিলাম, সব কথাই লর্ড সাইমনকে পরে বলব— ওই অবস্থায় নিকট আত্মীয় অভ্যাগতদের সামনে বলা সংগত বোধ করিনি।'

মিস্টার মুল্টন বললেন, 'বিয়ের খবরটা একটা কাগজে পড়েই দৌড়ে এসেছি— শুধু গির্জার ঠিকানা পেয়েছিলাম— ওর বাড়ির ঠিকানা পাইনি।'

মিসেস মুল্টন কথার খেই নিয়ে বললেন, 'ফ্র্যাঙ্ক চেয়েছিল সব কথা সবাইকে বলা হোক। আমি কিন্তু ভয়ে লজ্জায় পেছিয়ে এলাম। একঘর লোককে টেবিলে বসিয়ে এসেছি, ফিরব কী মুখে? তাই ঠিক করলাম একেবারেই উধাও হয়ে যাব। বাবাকে কেবল এক লাইন লিখে জানিয়ে দিলাম— আমি মরিনি, বেঁচে আছি। ফ্র্যাঙ্ক আমার জামাকাপড় আংটি পুঁটলি বেঁধে কোথায় যেন ফেলে এল। কালকেই প্যারির্স রওনা হওয়ার কথা আমাদের। এমন সময়ে এই ভদ্রলোক হোমসকে দেখিয়ে, কী করে যেন আমাদের ঠিকানা জোগাড় করে হাজির হলেন বাড়িতে। বুঝিয়ে বললেন, না-বলে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে, একেবারেই চলে যাওয়াটা আরও বড়ো ভুল হবে। উনি বললেন, লর্ড সাইমনের সঙ্গে নিরালা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন— যাতে সব খুলে বলতে পারি। তাই এসেছি। রবার্ট, তোমাকে আঘাত দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো। নীচ মনে কোরো না।'

মুখ চোখ একইরকম কঠোর রেখে সব শুনলেন লর্ড সাইমন। কিন্তু ক্ষমা করলেন না মিসেস মুল্টনকে।

বললেন, 'ঘরের কেচ্ছা নিয়ে পরের সামনে আলোচনা করতে আমি চাই না।'

'ক্ষমা না-কর, হ্যান্ডশেক তো করবে?'

'তোমাকে খুশি করার জন্যে সেটুকু করা যেতে পারে,' বলে নিরুত্তাপ ভঙ্গিমায় করস্পর্শ করলেন মিসেস মুল্টনের।

'লর্ড সাইমন,' বললে হোমস, 'খেয়ে যাবেন কিন্তু।'

'ধন্যবাদ। বড্ড বেশি আশা করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা ফুর্তি করার মতো নয় আমার কাছে। গুড নাইট।'

কাষ্ঠ ভঙ্গিমায়, বাতাসে মাথা ঠুকে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন লর্ড সেন্ট সাইমন।

'তাহলে আসুন আমরাই বসি টেবিলে। আমেরিকানদের আমি ভালোবাসি, মিস্টার মুল্টন। আসুন।'

অতিথি বিদায় করার পর হোমস বললে, 'যে-কেস গোড়ায় বেশি দুর্বোধ্য মনে হয়, সে-কেস শেষে ততই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম থেকে দুটো ব্যাপার আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এক, বিয়েতে ইচ্ছা ছিল ভদ্রমহিলার। দুই, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেই বিয়েতে অরুচি দেখা গিয়েছে। মাঝখানে তাহলে এমন কিছু ঘটেছে যে মন পালটে গেছে। কী ঘটতে পারে? কাউকে দেখেছেন কি? যদি কাউকে দেখে থাকেন, নিশ্চয় সে আমেরিকান— কেননা দীর্ঘদিন আমেরিকাতেই থেকেছেন তিনি— এদেশের স্বল্পবাসে এমন কেউ ঘনিষ্ঠ হতে পারে না যে ব্যক্তির এত অল্প সময়ের মধ্যে বিয়েতে অরুচি জন্মাতে পারে। তাহলে সে কে? পুরোনো প্রেমিক না, প্রথম স্বামী? যৌবন যার পাহাড় পর্বতে দামালপনার মধ্যে কেটেছে, এ-রকম অতীত তার জীবনে বিচিত্র নয়। গির্জায় সেই সাদামাটা লোকটার কথা তাহলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফুলের তোড়া সে-ই তো তুলে দিয়েছিল, তারপর থেকেই মেজাজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল কনে বউয়ের, বাড়ি ফিরে বাপের বাড়ির ঝিকে বলেছেন, "জাম্পিং এ ক্লেম"। আমেরিকার খনি অঞ্চলের ভাষায় কথাটার মানে হল,' "যার দাবি আগে, সে নিক আগে।" ব্যস, পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

'কিন্তু ঠিকানা জোগাড় করলে কীভাবে?'

'এই একটি ব্যাপারে লেসট্রেড আমাকে সাহায্য করেছে— নইলে মুশকিলে পড়তাম। কাগজটা দেখেই বুঝলাম, ভদ্রলোক গত সাতদিনের মধ্যে লন্ডনের খানদানি একটি হোটেলে উঠেছেন। নামের আদ্যক্ষর পাওয়ায় তাঁকে খুঁজে বার করা আরও সহজ হল।'

'কিন্তু পেলে কী করে হোটেলটা?'

'আগুন-দাম দেখে। ওই দামের খাবারদাবার বা ঘরভাড়া লন্ডনের খুব কম হোটেলেই হয়। খুঁজতে খুঁজতে ঠিক পেয়ে গেলাম।'

'যাঁর জন্যে এত করলে, সেই লর্ড মশায়টি কিন্তু খুব একটা ভালো ব্যবহার করে গেলেন না। দরাজ হতে পারলেন না।'

হেসে ফেলল হোমস।

বলল, 'ভায়া ওয়াটসন, যুগপৎ বউ আর যৌতুক হারালে তুমিও কি খুব একটা ভালো ব্যবহার করতে পারতে? দরাজ হতে পারতে? লর্ড সাইমনকে সেইদিক থেকেই বিচার করা উচিত, কৃপা করা উচিত।— যাক, বেহালাটা দাও, শরতের নিরানন্দ সন্ধে কাটানোর ওইটেই এখন একমাত্র দাওয়াই।'

টীকা

১. **খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি :** 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নোব্‌ল ব্যাচেলর' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের এপ্রিল ১৮৯২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. **জিজ্জেল বুলেট :** আফগান বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত বন্দুকের বুলেট।

৩. **আহত প্রত্যঙ্গ :** আহত প্রত্যঙ্গ কোনটি? একবার ওয়াটসন বলেছিলেন গুলি লেগেছিল কাঁধে। পরে হোমসের কথায় জানা যায় ওয়াটসনের হাতে আঘাত লেগেছিল। আবার কখনো 'আহত পা'-এর কথা শোনা গিয়েছে।

৪. **লর্ড সেন্ট সাইমনের :** রবার্ট সেন্ট সাইমন যেহেতু ডিউক অব ব্যালমোরালের মেজো ছেলে, বড়ো ছেলে নন, তাই তাঁর পরিচিত হওয়ার কথা 'লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন' নামে; 'লর্ড সেন্ট সাইমন' হিসেবে নয়।

৫. **গ্রসভেনর ম্যানসন :** লন্ডন শহরে প্যালেস স্ট্রিট এবং ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত সাততলা বাড়ির ফ্ল্যাটের প্রতিটির ভাড়া সেকালে ছিল বছরে তিনশো পাউন্ড। বাড়িটি নির্মাণ শুরু হয় ১৮৫৮-তে। নির্মাণ শেষ হওয়ার সময়ে একটি ফ্ল্যাটও খালি ছিল না।

৬. **লাল মলাট দেওয়া একটা বই :** কোনো কোনো গবেষকের মতে এটি জেমস ই. ডয়েল সংকলিত 'পিয়ারেজ : দ্য অফিশিয়াল ব্যারোনেজ অব ইংলন্ড'; কিংবা 'দ্য রেড বুক : অর কোর্ট অ্যান্ড ফ্যাশনেব্‌ল রেজিস্টার হওয়া সম্ভব।

৭. **প্লান্টাজেনেট :** ইংলন্ডেশ্বর দ্বিতীয় হেনরি (অভিষেক ১১৫৪ সালে) থেকে তৃতীয় রিচার্ড (মৃত্যু ১৪৮৫-তে) পর্যন্ত রাজাদের প্লান্টাজেনেট বংশীয় বলা হয়। রাজা প্রথম হেনরির মেয়ে রানি মার্টিলডা এবং কাউন্ট অব আনজাউ, জিওফ্রের বংশধররা হলেন প্লান্টাজেনেট। কাউন্টের টুপির শোভাবর্ধক প্লান্টা জেনিস্টা গাছের পাতা থেকে তাঁর বংশধরদের এই নাম হয়েছে।

৮. **টিউডর :** ওয়েলস-এর টিউডর বংশীয় পাঁচজন শাসক ১৪৮৫ থেকে ১৬০৩ পর্যন্ত ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। এঁরা হলেন সপ্তম হেনরি, অষ্টম হেনরি, ষষ্ঠ এডোয়ার্ড, প্রথম মেরি এবং প্রথম এলিজাবেথ। এঁরা হলেন পঞ্চম হেনরির বিধবা পত্নী ক্যাথরিন অব ভ্যালয় এবং ওয়েল টিউডরের বংশাবতংশ। ১৬০৩-এ প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ইংলন্ডের সিংহাসন যায় স্টুয়ার্টদের হাতে।

৯. **মর্নিং পোস্ট :** প্রতিষ্ঠা ১৭৭২-এ। রাজপরিবারভুক্ত এবং খানদানি মানুষদের খবরাখবর প্রকাশে এই সংবাদপত্রের খ্যাতি ছিল। ১৮৮১-তে এই কাগজ পরিণত হয় রক্ষণশীল দলের মুখপত্রে। ১৯৩৭-এ ডেইলি টেলিগ্রাফের সঙ্গে মিলিত হয়।

১০. **সানফ্রান্সিসকো :** আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অবস্থিত বন্দর-নগরী।

১১. **সেন্ট জর্জ গির্জা :** জন জেমসের নকশায় ১৭২১ থেকে ১৭২৪-এ নির্মিত এই অ্যাংলিকান চার্চ বিখ্যাত এখানে অনুষ্ঠিত বহু স্মরণীয় বিবাহের জায়গা হিসেবে। পি. বি. শেলি, বেঞ্জামিন ডিজরেবিন, জর্জ মেরেডিথ, থিয়োডর রুজভেল্ট, জর্জ ইলিয়ট, প্রমুখের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এই গির্জায়।

১২. **ল্যাঙ্কাস্টার গেট :** হাইড পার্কের উত্তরে অবস্থিত সারিবদ্ধভাবে তৈরি বাসা-বাড়ি।

১৩. **বিয়ের ব্রেকফাস্ট :** ১৮৮৭-র আগে পর্যন্ত ইংলন্ডের আইনে বিবাহের অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে হত মধ্যাহ্নের আগে। সেই থেকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার প্রথা চালু হয়। পরে আইন বদল হলেও ব্রেকফাস্টের প্রথা রয়েই যায়।

১৪. **স্ক্যান্ডিনেভিয়ার :** শার্লক হোমসের সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারের যোগসূত্রর উল্লেখ পাওয়া যায় 'আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া' এবং 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে। 'ব্ল্যাক পিটার' গল্পেও হোমসের নরওয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১৫. **সার্পেন্টাইনে :** হাইড পার্কের ভেতরে ১৭৩০-এ নির্মিত এই কৃত্রিম হ্রদ ব্যবহৃত হয় নৌকাবিহার এবং সাঁতার কাটার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে এর জল আসত ওয়েস্টবোর্ন নামের ছোটো খাঁড়ি থেকে। পরে টেমস নদীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো হয়।

১৬. **ট্রাফালগার স্কোয়ার :** ওয়েস্টমিনস্টারের ট্রাফালগার স্কোয়ার উৎসর্গীত ট্রাফালগারের যুদ্ধে মৃত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড নেলসনের স্মৃতিতে। স্কোয়ারের উত্তরে পাশাপাশি দুটি ফোয়ারা আছে।

১৭. **ফ্রিস্কো :** সানফ্রান্সিসকো শহরের সংক্ষেপিত নাম।

১৮. **রেড ইন্ডিয়ানরা একটা তাঁবু আক্রমণ করে অনেক অভিযাত্রীকে খতম করেছে :** অ্যাপাচে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগ জুড়ে। এই ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশ ছিল খনিসন্ধানী। অন্যরা পশুপালন করতেন।

১৯. **দেখলাম স্বয়ং ফ্র্যাঙ্ককে :** ফ্রান্সিস হে মুল্টনকে হ্যাটি ডোরানের বাবা অ্যালসিয়াস ডোরান কেন চিনতে পারল না?

পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য বেরিল করোনেট]

'হোমস', জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'একটা বদ্ধ পাগল আসছে!'

ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে কুঁড়ের বাদশার মতো উঠে এল শার্লক হোমস। ফেব্রুয়ারি মাস। সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় গত রাতের বরফ রোদ্দুরে ঝকঝক করছে। বেকার স্ট্রিট অবশ্য অনেকটা সাফ হয়ে এসেছে। লোকজন কেউ নেই— পিচ্ছিল ফুটপাথের বিচিত্র ব্যক্তিটি ছাড়া।

লোকটার চেহারা এবং জামাকাপড়ে বনেদিয়ানার ছাপ। কিন্তু কখনো হাত ছুড়ছেন, কখনো ছুটছেন, কখনো হোঁচট খাচ্ছেন, কখনো মাথা নাড়ছেন, কখনো মুখভঙ্গি করছেন। পাগল আর কাকে বলে।

'বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে আসছেন দেখছি,' বললাম আমি।

'আমার কাছেই আসছেন,' সোৎসাহে হাত ঘষে বললে হোমস। 'ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।'

মুখের কথা ফুরোল না। বাড়ি কেঁপে উঠল সদর দরজার প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনিতে। ক্ষণপরেই হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঢুকলেন ভদ্রলোক। ঢুকেই এমনভাবে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন যে আমরা ধরে না-ফেললে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত।

চেয়ারে জোর করে বসিয়ে হোমস বললে, 'সুস্থির হোন। খুব বিপদে পড়ে এসেছেন বুঝতে পারছি।'

'বিপদ বলে বিপদ! মি. হোমস, আমাকে পাগল ঠাউরেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার মাথা কাটা যেতে বসেছে। কলঙ্কের যে আর শেষ থাকবে না। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি মানুষকেও বড়ো ভয়ংকরভাবে ভুগতে হবে এইজন্যে।'

'দয়া করে আপনার পরিচয়টা দিন।'

'আমি আলেকজান্ডার হোল্ডার, থ্রেডনীডল স্ট্রিটের হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনশন ব্যাঙ্কের[২] সিনিয়র পার্টনার।'

নামটা পরিচিত। লন্ডন শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অংশীদারের নাম জানে না, এমন লোক এ-শহরে খুব কমই আছে। কিন্তু এমন কী কাণ্ড ঘটেছে যে মাথার চুল ছিঁড়ছেন এহেন বিশিষ্ট নাগরিক?

উন্মুখ হয়ে রইলাম ব্যাঙ্কারের দুর্দৈব শোনবার জন্যে।

উনি বললেন, 'ব্যাপারটা এত জরুরি যে পুলিশের কাছে আপনার নাম শুনেই পাতাল রেলে চলে এসেছি। স্টেশন থেকে গাড়িতে না-এসে হেঁটে আসছি হড়হড়ে রাস্তায়, পাছে গাড়ি আস্তে চলে— এই ভয়ে। তাই হয়তো হাঁপিয়ে গেছি।'

'আপনারা তো জানেন ব্যাঙ্কের লাভ বাড়াতে হলে টাকা খাটাতে হয়। দামি দামি জিনিস বাঁধা রেখে অনেক খানদানি মানুষই আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেন।

'গতকাল সকালে আমার কাছে এলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি শুধু ইংলন্ডেই প্রাতঃস্মরণীয় নন, সারাপৃথিবী তাঁকে চেনে! নামটা নাই-বা বললাম।

'উনি এসেই আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড[৩] ধার চাইলেন। বললেন, "দেখুন, এ-টাকা আমি বন্ধুবান্ধবের কাছে চাইলেও পেতে পারি— কিন্তু তাতে আমার মানসম্মান আর থাকবে না।"

'আমি বললাম, "কিন্তু আমার নিজের তো টাকা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে দিতে হলে যে কিছু একটা বাঁধা রাখতে হবে।"

'উনি তখন কালো মরক্কো চামড়ার[৪] একটা বাক্স দেখিয়ে বললেন, "পান্না[৫] মুকুটের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

'নিশ্চয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ এই পান্না মুকুট।'

'বাক্সটা খুলে মূল্যবান সেই মুকুট বার করে উনি বললেন, "এতে উনচল্লিশটা মস্ত আকারের পান্না আছে। এ ছাড়া সোনা কতখানি আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে এর যা দাম, তার অর্ধেক ধার চাইছি আপনার কাছে। সুদসমেত টাকা ফিরিয়ে দেব চারদিন পরে— সামনের সোমবার। ওইদিন কিছু টাকা হাতে আসবে আমার। এই বন্ধকিতে চলবে?"

'কী যে বলেন!'

'মিস্টার হোল্ডার, মনে রাখবেন, এ-মুকুট জাতীয় সম্পত্তি। একটা পান্নাও যদি খোয়া যায়, দুনিয়া চুঁড়ে এলেও ঠিক ওই জিনিসটি আর পাওয়া যাবে না। কাজেই কথাটা যেন এ-ঘরের বাইরে আর না-যায়। সোমবার সকালে আমি নিজেই আসব।'

'ক্যাশিয়ারকে ডেকে হাজার পাউন্ডের পঞ্চাশটা নোট নিতে হুকুম দিলাম। উনি যাওয়ার পর মুকুটটা আমার প্রাইভেট ভল্টে বন্ধ করে রাখলাম। একটু ভয়ও হল। অমূল্য এই সম্পদের দায়িত্ব না-নিলেই ভালো হত।

'সন্ধে হল। বাড়ি ফেরার সময়ে মুকুটটা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আকছার হচ্ছে। তাই দিনকয়েকের জন্যে এহেন বস্তুকে আমার কাছে রাখব মনস্থ করলাম।

'আমার বাড়িতে চাকরবাকরদের মধ্যে তিনজন ঝি আছে। এদের মধ্যে লুসি পার বলে যে-মেয়েটি, তাকে নিয়েই আমার যত দুশ্চিন্তা। মেয়েটির কাজকর্ম ভালো— আবার দেখতেও ভালো। ফলে, জনকয়েক নাগর দিনরাত ঘুর ঘুর করে গাড়ির আনাচেকানাচে। চাকরবাকর সবাই কিন্তু শোয় বাড়ির বাইরে।

'আমি বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে আর্থার বখে গেছে। লোকে বলে, আশকারা দিয়ে আমিই তাকে একটা বাঁদর তৈরি করেছি। গোঁয়ার, উড়নচণ্ডী, রেস খেলা, জুয়ো খেলা— সব গুণই তার আছে। বদ সঙ্গী তার অনেক— এদের মধ্যে স্যার জর্জ বার্নওয়েল লোকটি ওর প্রাণের বন্ধু— যদিও তিনি বয়সে বড়ো! এঁর খপ্পর থেকে আর্থার বেরোতে পারছে না। এইসব কারণেই আমার কারবারে ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

'আর্থারকে সিধে করে দিতে পারত আমার ভাইঝি মেরি। ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে সে আমার বাড়িতেই মানুষ হয়েছে আমারই মেয়ের মতো। বড়ো ভালো মেয়ে। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আর্থার তাকে দু-বার বিয়ে করতে চেয়েছে[৬]— দু-বারই সে নারাজ হয়েছে। অথচ বিয়েটা হয়ে গেলে আর্থারকে সৎপথে টেনে আনতে পারত মেরি। এই একটি ব্যাপারে মেরি আমার মনে দাগা দিয়েছে। এখন অবশ্য জল এতদূর গড়িয়েছে যে আর কিছুই করার নেই।'

'মুকুটটা বাড়িতে আসবার পর এই নিয়েই কথা হচ্ছিল খাওয়ার টেবিলে। লুসি পার কথা শুরুর আগেই চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে— দরজা বন্ধ করেছিল কি না খেয়াল করিনি।

'মুকুট আমার কাছে, এইটুকুই কেবল বলেছিলাম আর্থার আর মেরিকে— বাঁধা রেখে গেছেন যিনি, তাঁর নামটা বলিনি।

'শুনেই লাফিয়ে উঠল আর্থার আর মেরি দুজনেই। দেখবার জন্যে আবদার ধরল। আমি রাজি হলাম না।

'আর্থার তখন জিজ্ঞেস করল, ‘‘রেখেছ কোথায় মুকুটটা?”

'আমার আলমারিতে।'

'ও বললে, ‘‘চুরি না হয়ে যায়।”

'আমি বললাম, ‘‘চাবি দেওয়া আছে।”

'ও বলল, ‘‘গুদোম ঘরের চাবি দিয়ে ছেলেবেলায় আমি নিজেই ও-আলমারি কতবার খুলেছি। পুরোনো আলমারি তো— একটা-না-একটা চাবি ঠিক লেগে যায়।”

‘‘আর্থারের কথাবার্তাই এইরকম।”

'রাত্রে মুখখানা কালো করে আমার কাছে এল আর্থার। দু-শো পাউন্ড ধার চাইল। না-দিলে নাকি ক্লাবে মাথা কাটা যাবে! ভীষণ রেগে হাঁকিয়ে দিলাম তক্ষুনি। এক মাসে তিনবার এইভাবে টাকা নিয়ে গেছে— আর একটি পয়সাও নয়।

'মুখ অন্ধকার করে ও বলে গেল, ‘‘কিন্তু বাবা, টাকাটা আমাকে জোগাড় করতেই হবে— যে করেই হোক।”

'আলমারি খুলে দেখে নিলাম পান্না-মুকুট ঠিক জায়গায় আছে কি না। তারপর নিজেই বেরোলাম বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ হয়েছে কি না দেখবার জন্যে। কাজটা মেরির— কিন্তু কাল রাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না।

'হল ঘরে এসে দেখি জানলা খুলে কী দেখছে মেরি। আমি যেতেই জানলা বন্ধ করে দিয়ে বললে, ‘‘কাকা, লুসিকে কি বাইরে যেতে বলেছিলে?”

‘‘না তো।”

‘‘কিন্তু এইমাত্র খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল লুসি। নিশ্চয় কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। খুব খারাপ। অভ্যেসটা বন্ধ করা দরকার!”

‘‘কালকে তুমি কড়কে দিয়ো। দরজা জানলা সব বন্ধ হয়েছে?”

‘‘হ্যাঁ বাবা।”

'ঘরে চলে এলাম। ঘুমিয়েও পড়লাম।

'ঘুম আমার এমনিতেই পাতলা, তার ওপর মন উচাটন হওয়ায় ঘুম গাঢ় হয়নি মোটেই। আচমকা তাই কোথায় যেন একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ছুটে গেল আমার। রাত তখন দুটো। পুরো ঘুম ভাঙার আগেই থেমে গেল শব্দটা— কোথায় যেন একটা জানলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ সেটা। কান খাড়া করে রইলাম। পাশের ঘরে শুনলাম পা টিপে টিপে চলার আওয়াজ।

'বুকটা ধড়াস করে উঠল তৎক্ষণাৎ। খাট থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম পাশের ঘরে। দেখলাম গ্যাসের আলোয় মুকুট হাতে নিয়ে গায়ের জোরে বেঁকানোর চেষ্টা করছে আর্থার। পরনে শার্ট আর প্যান্ট।

'দেখেই বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। চমকে উঠল আর্থার। হাত ফসকে মুকুট পড়ে গেল মেঝেতে। তুলে নিয়ে দেখলাম তিনটে পান্নাসমেত একটা কোণ উধাও।

'চিৎকার করে বলেছিলাম, "রাসকেল কোথাকার! আমার মাথা হেঁট করে ছাড়লি শেষকালে! ভাঙলি এমন জিনিসকে! চোর! কোথায় গেল পান্না তিনটে?"

"আমি চোর?" গলাবাজি করে বললে আর্থার।

"আলবাত তুই চোর, কুলাঙ্গার কোথাকার!"

"না, না, না। কিচ্ছু চুরি যায়নি।"

"আবার মুখের ওপর কথা! তিনটে পান্না ভেঙে নিয়েছিস, আরও ভাঙতে যাচ্ছিলিস— নিজের চোখে দেখেছি।"

"বাবা, যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছ। কিন্তু আর নয়। কালই এ-বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব।"

"বাড়ি ছেড়ে যাবি? তার আগে তোকে পুলিশে দোব!"

"দিতে পার। কিন্তু আমার পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না। দেখি পুলিশ চুরির কিনারা করতে পারে কি না।" কথাগুলো আর্থার বলল বেশ আবেগের সঙ্গে— যা তার ধাতে নেই।

'চেঁচামেচি শুনে মেরি দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকল আমার ঘরে। পান্না মুকুট আর আর্থারকে দেখেই বুকফাটা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। চাকরবাকরও দৌড়ে এল তৎক্ষণাৎ। পুলিশ ডাকিয়ে আনলাম ওদের দিয়ে। ইনস্পেকটর আসতেই আর্থার বললে, সত্যিই কি আমি তাকে পুলিশের হাতে দোব? আমি বললাম— "নিশ্চয়। পান্না মুকুট দেশের সম্পত্তি— প্রকাশ্যভাবেই চুরির তদন্ত হোক।"

'আর্থার তখন মিনতি করে বললে, "পাঁচ মিনিটের জন্যে বেরোতে দেবে? তাতে তোমার ভালোই হবে জানবে।"

"না। হয় পালাবি, নয় চোরাই মাল লুকিয়ে ফেলবি। তার চেয়ে বরং বল কোথায় রেখেছিস। আমার মুখে চুনকালি পড়বে, দেশ জুড়ে হইচই পড়বে, আমার চাইতে অনেক উঁচু মহলের এক ভদ্রলোকের মানসম্মান ধুলোয় লুটোবে। আর্থার, এখনও বল কোথায় রেখেছিস— কেলেঙ্কারি বাড়াসনি।"

'মুখ ফিরিয়ে নিল আর্থার। বুঝলাম সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সঙ্গদোষে ও এখন পাকা বদমাশ। পুলিশকে বললাম তাদের যথাকর্তব্য করতে। সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। ওর ঘর তল্লাশ করা হল, দেহ সার্চ করা হল— কিন্তু পান্না তিনটে আর পাওয়া গেল না। ভয় দেখিয়েও আর্থারের পেট থেকে কিছু বের করা গেল না! ওকে হাজতে পাঠিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছি আপনার কাছে। মি. হোমস, আপনি আমাকে বাঁচান। এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছি রত্ন উদ্ধারের জন্যে। এ ছাড়াও আপনার পারিশ্রমিক আমি দোব। আমাকে বাঁচান!' মাথা চেপে ধরে গোঙাতে লাগলেন ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক।

ভুরু কুঁচকে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল শার্লক হোমস।

তারপর বললে, 'বাড়িতে বাইরের লোক কীরকম আসে?'

'আমার পার্টনারের ফ্যামিলি আর আর্থারের বন্ধু স্যার জর্জ বার্নওয়েল ছাড়া কেউ আসে না। বার্নওয়েল ইদানীং ঘনঘন আসছেন।'

'সামাজিকতা রাখেন কীরকম? পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা?'

'ওটা আর্থার করে। আমি আর মেরি বাড়িতেই থাকি।'

'কমবয়েসি মেয়ের পক্ষে অভ্যেসটা একটু অস্বাভাবিক।'

'মেরি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়। এই তো চব্বিশে পড়েছে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হল, ঘটনাটায় প্রচণ্ড শক পেয়েছে মেরি।'

'ভীষণ আঘাত পেয়েছে। আমার চেয়েও বেশি।'

'আপনাদের দুজনেরই বিশ্বাস আর্থারই দোষী?'

'নিজের চোখে দেখেছি তাকে পান্না মুকুট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে।'

'সেটা কিন্তু অকাট্য প্রমাণ নয়। মুকুটের বাদবাকি অংশে চোট লেগেছে?'

'বেঁকে গেছে।'

'বাঁকা অংশ সিধে করার চেষ্টা করছিল বলে মনে হয়নি আপনার?'

'অতই যদি সাধু হবে তো বলতেই পারত।'

'তা ঠিক। এটাও ঠিক যে দোষ করে থাকলে এক-আধটা মিথ্যেও তো বলতে পারত— বলল না কেন? ওর ওই চুপ করে থাকাটার মানে অনেক গভীর। যে-শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙেছে, সে-শব্দ কীসের পুলিশ কি তা ধরতে পেরেছে?'

'ওদের মতে, আওয়াজটা আর্থারের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।'

'গল্প হিসেবে মন্দ নয়। রাতদুপুরে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেওয়ার মতো আওয়াজ করে দরজা বন্ধ করল এমন একটা লোক যে কিনা চুপিসারে চুরি করতে চাইছে রত্ন মুকুট। পান্না তিনটের অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে কী বলে পুলিশ?'

'সারাবাড়ির তক্তা পর্যন্ত খুলে দেখেছে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না।'

'বাড়ির বাইরে দেখবার কথা একবারও ভেবেছে কি?'

'নিশ্চয়। তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছে বাগান।'

'দেখুন মশায়, আপনারা যা ভেবেছেন, এ-কেস ততটা সোজা নয়। বেশ জটিল। আপনার ছেলে খাট থেকে নেমে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে এল আপনার ড্রেসিং রুমে, আলমারি খুলে পান্না মুকুট বের করে গায়ের জোরে তা থেকে তিনটে পান্না খসিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখল যার সন্ধান কেউ পাচ্ছে না— আবার ফিরে এল ছত্রিশটা পান্না সমেত মুকুট হাতে ধরা পড়বার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ড্রেসিং রুমে। মশায়, সম্ভব বলে মনে হয় কি?'

'তা ছাড়া আর কী হতে পারে তাহলে বলুন!' নিঃসীম নৈরাশ্যে যেন ভেঙে পড়লেন বেচারি ব্যাঙ্কার। 'উদ্দেশ্য যদি মহৎ থাকে তো খুলে বলল না কেন?'

'সেইটাই এখন আমাদের দেখতে হবে', বললে হোমস। 'চলুন, আপনার বাড়ি যাওয়া যাক।'

বাড়িটা চৌকোনো, সাদা পাথরের। সামনে বরফ ঢাকা লন। দু-দিকে দুটো লোহার ফটক। ডান দিকে আর বাঁ-দিকে দুটো গলি। বাঁ-দিকেরটা গেছে আস্তাবলের দিকে— লোকজনের যাতায়াত সেখানে কম। ডান দিকেরটা গেছে বাগানের দিকে— এদিকেই বাইরের লোক চলে বেশি। হোমস এই গলি দিয়ে বাগানে গেল তো গেলই— কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়, মি. হোল্ডার

আমাকে নিয়ে বসলেন খাবার ঘরে। এমন সময়ে একজন সুন্দরী তরুণী ঢুকল ঘরে। বিষণ্ণ মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সজল কালো চোখেও বিষাদ ফুটে বেরোচ্ছে। নীরক্ত ঠোঁট। মুখ দেখেই বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছে মেয়েটি। কিন্তু ধাত শক্ত বলেই বাইরে অতটা প্রকাশ করছে না।

ঘরে ঢুকেই সোজা গেল মি. হোল্ডারের কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'কাকা, আর্থারকে ছেড়ে দিতে বলেছ?'

'দুর! আগে ফয়সালা হোক— তারপর।'

'কিন্তু আমি জানি সে নির্দোষ।'

'তাহলে মুখে কথা ফুটছে না কেন?'

'পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছ বলে হয়তো ঘা খেয়েছে মনে।'

'অকারণে তো দিইনি। মুকুট ওর হাতেই দেখেছি আমি।'

'হাতে নিয়ে দেখছিল। ওকে ছাড়িয়ে আনো, কাকা। ও নির্দোষ।'

'মেরি, পান্না তিনটে না-পাওয়া পর্যন্ত আর্থারকে ছাড়া হবে না। লন্ডন থেকে বড়ো গোয়েন্দা নিয়ে এনেছি রত্ন উদ্ধারের জন্যে। যতক্ষণ না পাচ্ছি, কাউকে ক্ষমা করব না।'

'ইনি?'

'না, এঁর বন্ধু। এখন পাশের গলি দেখছেন।'

'গলি দেখছেন?' ভুরু দুটো ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ফেলল সুন্দরী। 'গলিতে কী আছে?— এই যে, এসে গেছেন। আপনিই লন্ডন থেকে এসেছেন? আমার ভাই যে নির্দোষ, প্রমাণ করতে পারবেন তো? আমি যে জানি সে কোনো দোষ করেনি।'

'আমিও তাই বিশ্বাস করি, মিস হোল্ডার', ঘরে ঢুকে পা ঠুকে ঠুকে জুতো থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললে হোমস। 'সেইজন্যেই দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।'

'স্বচ্ছন্দে করুন— তাতে যদি আমার ভাই খালাস পায়, ক্ষতি কী?'

'কাল রাতে আপনি কোনো আওয়াজ শোনেননি?'

'না। কাকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসি— তার আগে কিছু শুনিনি।'

'রাতে সব জানলা বন্ধ করেছিলেন তো?'

'নিশ্চয়।'

'আজ সকালেও সব বন্ধ ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'এ-বাড়ির একজন দাসীর একটা মনের মানুষ আছে শুনেছি। কাল রাতে আপনিই খবরটা দিয়েছিলেন কাকাকে— বাইরে বেরিয়েছিল নাকি তার সঙ্গে দেখা করতে।'

'রত্নমুকুটের কথা কাকা ওর সামনেই বলে ফেলেছিল।'

'তাই নাকি? তার মানে আপনার ধারণা মনের মানুষটিকে খবরটা পৌঁছে দেয় এই দাসী— মুকুট সরায় দুজনে যোগসাজশ করে?'

মি. হোল্ডার বলে উঠলেন, 'ধারণা-টারণার কোনো দরকার আছে কি? আমি নিজের চোখে দেখেছি আর্থারকে মুকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।'

হোমস বললে, 'আর্থারের কথা পরে হবে মি. হোল্ডার। মিস হোল্ডার, মেয়েটি বাড়ি ফিরেছিল কি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে?'

'হ্যাঁ। দরজা বন্ধ হয়েছে কি না দেখতে গিয়ে দেখলাম বাড়ি ফিরছে পা টিপে টিপে। লোকটাকেও আবছাভাবে দেখেছিলাম অন্ধকারে।'

'চেনেন তাকে?'

'চিনি। সবজি বেচে। নাম, ফ্রান্সিস প্রসপার।'

'দরজার একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল— রাস্তার ওপর?'

'হ্যাঁ।'

'একটা পা কাঠের?'

সুন্দরীর ভাবব্যঞ্জক কালো চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল যেন।

'ভয়ের মতো কিছু একটা যুবতীর চোখে ফুটে উঠল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

হাসল। বলল, 'আপনি জাদুকর নাকি? জানলেন কী করে?'

হোমস কিন্তু হাসল না। শীর্ণ মুখটি উদ্দীপ্ত হয়ে রইল আতীব্র আগ্রহে।

বলল, 'বাইরেটা আর একবার দেখব'খন। তার আগে নীচের তলার জানলাগুলো দেখে নিই— তারপর দেখব ওপরতলা।'

দ্রুত পদক্ষেপে এক জানলা থেকে আর এক জানলায় সরে গেল হোমস। থমকে দাঁড়াল বড়ো জানালাটার সামনে— এখান থেকে দেখা যায় পাশের সরু গলি। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং লেন্স বের করে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল গোবরাট।

তারপর বললে, 'চলুন এবার ওপরে যাওয়া যাক।'

ব্যাঙ্কারের ড্রেসিং রুমের আসবাবপত্র অতি সাধারণ। আয়না আলমারি আর কার্পেট। আলমারির তালাটার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল হোমস।

বলল, 'খোলার চাবি কোনটা?'

'আমার ছেলে যে-চাবির কথা নিজের মুখে বলেছে— গুদামঘরের চাবি।'

'আছে এখানে?'

'ড্রেসিং টেবিলের ওপর রয়েছে।'

চাবিটা তুলে নিয়ে আলমারি খুলল শার্লক হোমস।

বলল, 'খোলার সময়ে একদম আওয়াজ হয় না— সেই কারণেই ঘুম ভাঙেনি আপনার। মুকুটটা নিশ্চয় এই বাক্সতে আছে। দেখি কীরকম', বলে বাক্স খুলে অপূর্ব সুন্দর রত্নমুকুট বের করে চেয়ে রইল অনিমেষে। দেখবার মতোই মুকুট বটে। এ-রকম উৎকৃষ্ট পান্না আমি জীবনে দেখিনি। একটা কোণ ভাঙা— তিনটে পান্না খসিয়ে নেওয়া হয়েছে ওইখান থেকে।

'মি. হোল্ডার, কোণটা ভাঙুন দিকি', বললে হোমস।

আঁতকে উঠলেন ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক, 'ও-কথা মুখে আনাও পাপ।'

'তাহলে আমিই ভাঙছি', বলেই হঠাৎ সর্বশক্তি দিয়ে কোণটা ভাঙতে গেল হোমস, কিন্তু পারল না। বলল, 'আমার আঙুলের জোর নেহাত কম নয়[৭], মি. হোল্ডার। কিন্তু এ-জিনিস ভাঙতে গেলে আরও সময় দরকার। সাধারণ মানুষ পারবে না ভাঙতে। ভাঙবার পরেও পিস্তল ছোঁড়ার মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে। এত কাণ্ড ঘটে গেল আপনার খাট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, অথচ আপনি জানতে পারলেন না?'

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

'মিস হোল্ডার, আপনি কী বলেন?'

'কাকার মতো আমিও ধাঁধায় পড়েছি।'

'ছেলেকে যখন দেখেছিলেন, তখন কি তার পা খালি ছিল? জুতো বা চটি কিচ্ছু পরে ছিল কি?'

'প্যান্ট আর শার্ট ছাড়া কিচ্ছু না।'

'ধন্যবাদ, ভাগ্য সহায় আমাদের, তাই কেসটা সহজেই সুরাহা করা যাবে। মি. হোল্ডার, এবার বাইরেটা ফের দেখে আসা যাক।'

গেল কিন্তু একলাই— সবাই মিলে গেলে নাকি অত পায়ের ছাপে সব একাকার হয়ে যাবে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল জুতো ভরতি বরফ আর মুখভরা হেঁয়ালি নিয়ে।

বললে, 'মি. হোল্ডার, যা দেখবার সব দেখা হয়ে গেছে। এবার আপনার কাজটা বাড়ি ফিরে সারব।'

'কিন্তু রত্ন তিনটে কোথায় বলে যাবেন তো?'

'তা তো বলতে পারব না।'

'সে কী! জন্মের মতো খোয়া গেল বলতে চান! ছেলেটা? তার কী হবে?'

'একবার যা বলেছি, তার অন্যথা হবে না।'

'কাল রাতের ব্যাপার একটু খোলসা করে বলুন তাহলে!'

'কাল সকাল ন-টা থেকে দশটার মধ্যে বেকার স্ট্রিটে আমার সঙ্গে দেখা করুন। যা বলবার তখনই বলব। রত্ন উদ্ধারে নিশ্চয় কার্পণ্য করব না। যা খরচ হবে, দেবেন তো?'

'আরে মশাই, যথাসর্বস্ব যদি চান, তাও পাবেন!'

'তাহলে এখন চলি। হয়তো সন্ধে নাগাদ একবার আসতে হতে পারে।'

বেশ বুঝলাম, মনে মনে রত্ন-রহস্যের মীমাংসা করে এনেছে বন্ধুবর। বেশ কয়েকবার কথা বলাতে চেষ্টা করলাম ফেরবার পথে, কিন্তু এড়িয়ে গেল প্রতিবার। বাড়ি ফিরেই ঢুকল নিজের ঘরে। মিনিট কয়েক পরে বেরিয়ে এল পাক্কা লোফারের ছদ্মবেশে।

বললে, 'তোমাকে সঙ্গে নিতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। হয়তো ঠিক পথেই চলেছি, অথবা আলেয়ার পেছনে ধাওয়া করছি। যাই হোক ফিরব ঘণ্টা কয়েক পরে।' তাক থেকে মাংস নিয়ে দুটো পাঁউরুটির মধ্যে রেখে স্যান্ডউইচ বানিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে উধাও হল শার্লক হোমস।

ফিরে এল আমার চা পানের সময়ে। ফুর্তি যেন ফেটে পড়ছে। হাতে এক পাটি ইলাস্টিক লাগানো বুট জুতো। ঘরের কোণে জুতোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বসে গেল চা খেতে।

বলল, 'যাওয়ার পথে ঢুঁ মেরে গেলাম।'

'আবার কোনদিকে?'

'ওয়েস্ট এন্ডের ওপাশে। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

'কাজ এগোল?'

'মোটামুটি। ব্যাঙ্কারের পাড়ায় গেছিলাম এখন, বাড়ি মাড়াইনি। রহস্যটা ছোট্ট হলেও চমৎকার। যাকগে, আপাতত এই বিতিগিচ্ছিরি ধড়াচূড়া ছেড়ে নিজের পোশাকে ঢোকা যাক।'

মুখে না-বললেও চকচকে চোখ আর রক্তিম গাল দেখেই বুঝলাম কাজ ভালোই এগোচ্ছে। দ্রুত উঠে গেল ওপরতলায়। একটু পরেই দড়াম করে বন্ধ হল হল ঘরের দরজা[৮]। তার মানে, আবার অভিযানে বেরোল শার্লক হোমস।

মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ফিরল না, তখন শুয়ে পড়লাম। তদন্তে ডুব দিলে অনেক রাত অনেক দিন এইভাবেই ও বাইরে কাটায়। পরের দিন সকাল বেলা প্রাতরাশের টেবিলে দেখলাম এক কাপ কফি আর দৈনিক কাগজ নিয়ে বসে রয়েছে দিব্যি তাজা চেহারায়।

'ওয়াটসন তোমাকে ফেলেই খেতে বসে গেছি বলে কিছু মনে কোরো না। মনে আছে তো, মক্কেল ভদ্রলোক আজ একটু সকাল সকাল আসবেন?'

বললাম, 'আরে, ন-টা তো বেজে গেছে। এসে গেলেন বোধ হয়, ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।'

ব্যাঙ্কারই বটে। কিন্তু আঁতকে উঠলাম মুখ দেখে। এ কী চেহারা হয়েছে। মুখ আরও ফ্যাকাশে

হয়েছে, চোয়াল আরও ঝুলে পড়েছে, চুল পর্যন্ত যেন আরও সাদা হয়ে এসেছে। পা যেন আর চলছে না— নিঃসীম অবসাদে শরীর ভেঙে পড়েছে। চেয়ার এগিয়ে দিতেই বসে পড়লেন ধপ করে।

বললেন ভাঙা গলায়, 'জানি না কী পাপের জন্যে এত সাজা পাচ্ছি। দু-দিন আগেও আমার ভেতর সুখ আর সম্পদ উথলে উঠেছিল— দুনিয়ার কারো ধার ধারিনি। আজ আমার কেউ নেই। মানসম্মানও নেই। দুঃখ শোক কখনো একলা আসে না— পরের পর আসে। ভাইঝিটা চলে গেল।'

'চলে গেল?'

'হ্যাঁ। বিছানা স্পর্শ করেনি। ঘর ফাঁকা। কাল রাতে রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম, আর্থারকে বিয়ে করলে ছেলেটা আজ সুখে থাকত। বলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। চিঠিতে সে-কথাটাও লিখেছে :

আমার প্রাণপ্রিয় কাকা,

বেশ বুঝেছি আমার জন্যেই আজ তুমি এই ঝামেলায় পড়েছ। যতই তা ভাবছি, ততই বুঝেছি এ-বাড়িতে আমার আর থাকা উচিত নয়। কোনোদিনও আর শান্তি পাব না। তাই জন্মের মতো চললাম। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না— সে-ব্যবস্থা হয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, আমাকে খুঁজতে যেয়ো না— চেষ্টাটা বৃথা হবে। জীবনে মরণে জানবে আমি তোমার পরম স্নেহের সেই,

—মেরি

'মি. হোমস, মানে কী চিঠিটার? আত্মহত্যা?'

'মোটেই না। বলতে পারেন, জটিল সমস্যার চমৎকার সমাধান। মি. হোল্ডার, আপনার রাহুর দশা এবার কাটতে চলেছে।'

'অনেক খবর জানেন মনে হচ্ছে? পান্নাগুলো কোথায়?'

'এক-একটা পান্নার জন্যে হাজার পাউন্ড দিতে পারবেন তো?'

'দশ হাজার দোব।'

'অত দরকার হবে না। পুরস্কার বাবদ কিছু টাকা ধরলে সব মিলিয়ে হাজারেই হবে। চেকবই এনেছেন? এই নিন কলম। চার হাজারের একটা চেক লিখে দিন।'

ভ্যাবাচ্যাকা মুখে চেক লিখে দিলেন ব্যাঙ্কার। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা বস্তু বার করল হোমস। তেকোনা সোনায় বসানো তিনটে পান্না। ছুড়ে দিল টেবিলের ওপর।

তীব্র আনন্দে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠে জিনিসটা খামচে ধরলেন মক্কেল ভদ্রলোক।

'বাঁচালেন! ওঃ, আমার প্রাণটা আপনি বাঁচিয়ে দিলেন!'

কড়া গলায় হোমস বললে, 'মি. হোল্ডার, আপনাকে আর একটা দেনা মেটাতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ কলম তুলে নিলেন ব্যাঙ্কার, 'বলুন কত দিতে হবে?'

'দেনাটা আমার কাছে নয়— আপনার অত্যন্ত মহৎ ওই ছেলের কাছে।'

'বলেন কী! আর্থার তাহলে চুরি করেনি?'

'সে-কথা কালকে বলেছিলাম— আজও বলছি।'

'তাহলে চলুন, এখুনি গিয়ে বলে আসি।'

'ও জানে। আমি গেছিলাম আজকে। দু-একটা ব্যাপারে ধোঁকা কাটছিল না— আপনার

ছেলেই তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। আপনি গিয়ে রত্ন উদ্ধারের খবরটা দিলে নিজেই মুখ খুলবে'খন।'

'রহস্যটা কী এবার বলবেন?'

'নিশ্চয় বলব, খুব আঘাত পাবেন শুনলে। স্যার জর্জ বার্নওয়েল আর আপনার ভাইঝির মধ্যে আঁতাত ছিল। দুজনেই পালিয়েছে একসঙ্গে।'

'মেরি? অসম্ভব!'

'অসম্ভব হলেও সত্যি। স্যার জর্জ বার্নওয়েলকে আপনারা চেনেন না। ইংলন্ডের কুখ্যাত জঘন্য বদমাশদের তিনি অন্যতম। বিবেক বলে কোনো বস্তু নেই। জুয়ো খেলে পথে বসেছেন। বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছেন। এখন করলেন আপনার ভাইঝির। প্রায় প্রতিদিন সন্ধের সময়ে দেখাসাক্ষাৎ হত দুজনের।'

বিবর্ণ হয়ে গেলেন মি. হোল্ডার, 'অবিশ্বাস্য! একেবারেই অবিশ্বাস্য!'

'তাহলে শুনুন সেই রাতের ঘটনা। আপনি শুতে গেছেন জেনে ভাইঝিটি জানলা খুলে মুকুটের খবরটা দিয়েছিল তাঁকে। লোভী তিনি। শুনেই চেয়ে বসলেন রত্নমুকুট। এই সময়ে আপনি এসে পড়ায় জানলা বন্ধ করে দিয়ে দাসীর খবরটা আপনাকে দেয় মেরি।

'আর্থারের সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটির পর দুজনেই শুয়ে পড়লেন। ক্লাবে দেনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আর্থারের— ঘুম উড়ে গেল চোখ থেকে। এমন সময়ে পায়ের শব্দ শুনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে দেখে বোন যাচ্ছে আপনার ড্রেসিং রুমে। তাড়াতাড়ি গায়ে জামা চড়িয়ে খালি পায়ে পিছু নেয় আর্থার। আড়াল থেকে দেখে আলমারি খুলে মুকুট নিয়ে নীচে গেল মেরি, জানলা খুলে পাচার করে দিল বাইরে। মেরি নিজের ঘরে না-যাওয়া পর্যন্ত লোকটার পিছন ধাওয়া করতে পারেনি সে। তারপরেই জানলা খুলে লাফ দিল বাইরে। দেখেই চিনল বার্নওয়েলকে। ধস্তাধস্তির সময়ে ঘুসি মেরে বার্নওয়েলের চোখের ওপর বেশ খানিকটা জায়গা কেটেও দেয়— মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসে বাড়ির ভেতরে। এত কাণ্ড সে করেছে শুধু আপনার সর্বনাশ হতে চলেছে দেখে— চেঁচামেচিও করতে পারেনি মেরির জন্যে। তাকে যে সে ভালোবাসে। একেই বলে শাঁখের করাত।

'ড্রেসিং রুমে ফিরে এসে দেখল মুকুটের কোণ ভাঙা। হাত দিয়ে যখন বাঁকা দিকটা সিধে করার চেষ্টা করছে ঠিক তখন আপনি চড়াও হলেন তার ওপর। এত বড়ো কাজ করার প্রশংসা পেল না— পেল চোর বদনাম। পুলিশে ধরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। তাই প্রচণ্ড অভিমানে একটি কথাও সে বলেনি— মেরিকেও ধরিয়ে দেয়নি— কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে বেরোতে চেয়েছিল মুকুটের ভাঙা কোণটা রাস্তা থেকে খুঁজে আনার জন্যে— ও ভেবেছিল টানাটানিতে ভেঙে গিয়ে নিশ্চয় পড়ে আছে গলির মধ্যেই।

'আপনার বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের দরজার পাশে বরফের ওপর ছাপ দেখে বুঝলাম, একজন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে সেখানে। পুরুষটির একটি পা কাঠের— গোল দাগ পড়েছে বরফে। লুসি আর তার মনের মানুষের ব্যাপারটা তাহলে সত্যি।

'কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকে দেখলাম আশ্চর্য এক কাহিনি। বরফের ওপর আঁকা দু-জোড়া পায়ের ছাপ। একজন বুট পরে গেছে— বুটের ছাপ মাড়িয়ে দৌড়েছে খালি পায়ে একজন। আপনার ছেলের পায়ে জুতো বা চটি ছিল না— আপনিই বলেছেন। অর্থাৎ বুট-পরা লোকটার পেছন

পেছন সে দৌড়েছে। কিছুদূর যেতেই বরফের মধ্যে বেশ খানিকটা গর্ত দেখে বুঝলাম দারুণ ঝটাপটি চলেছে সেখানে। ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ে আছে। বুট-পরা লোকটা এরপর একাই চলে গেছে— ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তার পায়ের ছাপের পাশে পড়তে পড়তে গেছে। অর্থাৎ মারপিটে সে জখম হয়েছে। খালি পা ফিরে এসেছে। অর্থাৎ আপনার ছেলে ফিরে এসেছে।

'আপনার বাড়ি গিয়ে জানলার গোবরাট দেখেছিলাম আতশকাচ দিয়ে। চিহ্ন দেখে বুঝলাম, কেউ যেন লাফ দিয়ে জানলা টপকে বাইরে গেছে। এ থেকেই মনে হয়েছিল, ওপর থেকে কোনো একজন মুকুট এনে বাইরে কারুর হাতে চালান করেছিল। আর্থার তা দেখে ফেলে পিছু নেয়। মারপিট করে মুকুট ছিনিয়ে আনে। টানাটানিতে মুকুট ভেঙে যায়। কিন্তু তারা কারা? ওপর থেকে মুকুট নামিয়ে আনল কে? বাইরে থেকে মুকুট নিয়ে পালাচ্ছিলই-বা কে?

'ভাবতে ভাবতে জবাব পেয়ে গেলাম। মুকুট আপনি নিশ্চয় নামাননি। দাসীদের কেউ চুরি করে থাকলে আপনার ছেলে তার নাম গোপন করে নিজে হাজতে যাবে কেন? তাহলে সে এমন কেউ যার মুখ চেয়ে সে কেলেঙ্কারি গোপন করতে চেয়েছে। মেরিকে সে ভালোবাসে। মেরির জন্যে সে হাজতে যেতেও পারে। মনে পড়ল, মেরিকেই আপনি রাত্রে জানলার সামনে দেখেছিলেন। আর্থার আর মুকুট দেখে এই মেরিই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

'কিন্তু মুকুটটা কার হাতে চালান করেছিল মেরি? বাড়িতে স্যার জর্জ বার্নওয়েল ঘন ঘন আসে— মেরির সঙ্গেও দেখা করে— আপনি বলেছেন। বার্নওয়েলের কুখ্যাতি আমার অজানা নয়। বুটের ছাপ নিশ্চয় তাঁরই— পান্না তিনটেও তাঁর কাছে।

'লোফারের ছদ্মবেশ ধারণ করে গেলাম স্যার জর্জ বার্নওয়েলের বাড়ি। চাকরটার সঙ্গে ভাব জমালাম। শুনলাম আগের রাতে মুখ ফাটিয়ে বাড়ি এসেছেন স্যার জর্জ। ঘুস দিয়ে তাঁর এক পাটি বুট নিয়ে গেলাম আপনার বাড়ি পাশে। দেখলাম, বুটের ছাপের সঙ্গে স্যার জর্জের বুট হুবহু মিলে গেল।'

লাফিয়ে উঠলেন মি. হোল্ডার, 'আরে হ্যাঁ, কাল সন্ধের দিকে একটা লোফার ঘুর ঘুর করছিল বটে গলিতে।'

'আমিই সেই লোফার। বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক সেজে সোজা গেলাম বার্নওয়েলের কাছে। আমি জানতাম সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। কড়া কথাতেও যখন কাজ হল না, কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না— উলটে তেড়ে মারতে এলেন— তখন পিস্তল বার করে রগে ঠেকালাম।

'ফেরত চাইলাম পান্না তিনটে— বিনিময়ে দোব তিন হাজার পাউন্ড। শুনেই চমকে উঠলেন স্যার জর্জ। ভাবতেই পারেননি এত টাকা পাওয়া যেত। বলে ফেললেন, মাত্র ছ-শো পাউন্ডের বিনিময়ে হাতছাড়া করে ফেলেছেন তিনটে পাথর!

'ঠিকানা আদায় করে গেলাম পাথর যে কিনেছে তার কাছে। কথা দিলাম, পুলিশি হামলা হবে না— কিন্তু তিন হাজার পাউন্ডে পাওয়া যাবে পান্না তিনটে। বাড়ি এসে ঘুমোলাম রাত দুটোয়।'

উঠে পড়লেন মি. হোল্ডার, 'মি. হোমস, আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। যা ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আপনি। ইংলন্ডকে এক মস্ত কলঙ্কের হাত থেকে আজ আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। চলি এখন— ছেলেটার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। জানি না মেরি এখন কোথায়।'

'স্যার জর্জ বার্নওয়েলের কাছে। পাপের সাজা সেখানেই পাবে,' বলল— শার্লক হোমস।

টীকা

১. **পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য বেরিল করোনেট' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের মে, ১৮৯২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনশন ব্যাঙ্ক** : এই নামে কোনো ব্যাঙ্ক ইংলন্ডে আদৌ ছিল না। সেই সময়ে এই ধরনের যে জনপ্রিয় ব্যাঙ্কটির নাম পাওয়া যায়, সেটি হল গ্লাইন, মিলস অ্যান্ড কোম্পানি।

৩. **পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড** : সে-কালের পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড, আজকের হিসেবে প্রায় সাত মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি।

৪. **মরক্কো চামড়া** : বিশেষভাবে পাকানো বা 'tan' করা ছাগলের চামড়া।

৫. **পান্না** : বেরিলিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট বেরিল। এর ক্রিস্টাল ছয় কোনা বিশিষ্ট। সবুজ রঙের বেরিলকে পান্না বলা হয়। নীলচে সবুজ বেরিল পরিচিত অ্যাকোয়ামেরিন নামে। নানা ধরনের বেরিলের মধ্যে সবচেয়ে দামি পাথর হল পান্না।

৬. **দু-বার বিয়ে করতে চেয়েছে** : ভিক্টোরীয়-ইংলন্ডে তুতো-ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত, রানি ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট ছিলেন তুতো-ভাইবোন। একই সম্পর্ক ছিল চার্লস ডারউইন এবং তাঁর স্ত্রী এমা ওয়েজউডের।

৭. **আমার আঙুলের জোর নেহাত কম নয়** : শার্লক হোমসের হাতের জোরের পরিচয় পাওয়া যায় 'দ্য স্পেকলড ব্যান্ড' গল্পে ফায়ারপ্লেস খোঁচানোর শিক সোজা করার ঘটনায়।

৮. **দড়াম করে বন্ধ হল হল ঘরের দরজা** : দোতলায় হোমসের ঘর থেকে সোজা হল ঘরে নামবার জন্য আলাদা কোনো দরজা থাকার কথা নয়।

রহস্য নিকেতন 'কপার-বীচেস'[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য কপার-বীচেস]

শার্লক হোমস ছুড়ে ফেলে দিল ডেইলি টেলিগ্রাফের[২] বিজ্ঞাপনের পাতাটা।

বললে, 'ওয়াটসন, আমার কীর্তি নিয়ে তুমি যখনই গল্প লিখেছ, সেগুলো গল্পই হয়ে দাঁড়িয়েছে— রং চড়ানোর দিকে নজর না-দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানের দিকে বেশি নিষ্ঠা দেখালে ভালো করতে।'

কথা বলতে বলতে চেরি কাঠের পাইপটা ধরিয়ে নিল হোমস। তর্ক করার দরকার হলে এই পাইপ খায় ও, ধ্যানস্থ থাকার সময়ে ক্লে পাইপ।

কথা হচ্ছে বেকার স্ট্রিটের বাসায়। বাইরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আগুনের দু-পাশে বসে আছি আমরা দুই বন্ধু। ব্রেকফাস্ট এইমাত্র শেষ হয়েছে। খবরের কাগজ খুলে এতক্ষণ বিজ্ঞাপন পড়ছিল হোমস, এখন তা নিক্ষেপ করে পেছনে লেগেছে আমার।

পাইপে টান মেরে বললে, 'একটা ব্যাপারে অবশ্য তোমার নিষ্ঠা আছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা না-বেছে এমন সব কেস নিয়ে লিখছ যার মধ্যে যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণী ক্ষমতা ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তবে কী জানো, রং চড়াতে গিয়ে সেগুলো গল্পই হয়ে গেছে[৩], নইলে যুক্তিবিজ্ঞানের প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়াত।'

হোমসের চরিত্রের এই অহমিকা এর আগেও লক্ষ করেছি। তাই মুখ গোঁজ করে বললাম, 'সামান্য ঘটনাগুলোই কিন্তু অসামান্য হয়ে উঠেছে তোমার যুক্তিবিদ্যার জোরে।'

'ভায়া, যুক্তিবিদ্যার কদর কি আর আছে? সাধারণ মানুষ আজকাল অন্ধ— চোখ খুলে দেখেও না। দাঁত দেখে তাঁতিকে চেনা অথবা বাঁ-হাতের আঙুল দেখে ছাপাখানার কম্পোজিটর কিনা বলে দেওয়ার মতো বিশ্লেষণ বা অনুমিতি-সিদ্ধান্তর যুগ চলে গেছে। তোমার আর দোষ কী বল। আজকালকার অপরাধীরাও আর তেমন মৌলিক অপরাধ করতে পারছে না! আমার কাজটা এখন কারো পেনসিল হারালে খুঁজে দেওয়া, নয়তো স্কুলের মেয়েদের জ্ঞান দেওয়া। দুর! দুর! এই চিঠিটাই দেখ না কেন। নাও, পড়ো!' দলা-পাকানো একটা কাগজ আমার দিকে ছুড়ে দিল হোমস।

কাগজটা একটা চিঠি। লেখা হয়েছে মন্টেগু প্লেস থেকে— গত সন্ধ্যায়।

প্রিয় মি. হোমস,

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই একটা চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে। চাকরিটা গৃহশিক্ষয়িত্রীর। নেওয়াটা উচিত হবে কি না আপনি বলে দেবেন। কাল সকাল সাড়ে দশটায় আসছি।

আপনার বিশ্বস্ত
ভায়োলেট হান্টার

'ভদ্রমহিলাকে চেনো?' আমার প্রশ্ন।

'না।'

'সাড়ে দশটা তো বাজল।'

'দরজার ঘণ্টাও বোধ হয় বাজল।'

একটু পরেই ঘরে ঢুকল একজন তরুণী। চটপটে চেহারা। চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। বেশবাস সাদাসিধে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। মুখটিতে টিট্টিভ পাখির ডিমের মতো মেচেতার দাগ।

অভিবাদন বিনিময়ের পর হোমসের হৃষ্ট মুখ দেখে বুঝলাম মেয়েটিকে তার খারাপ লাগেনি। আপাদমস্তক সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে আঙুলের ডগায় ডগায় ছুঁইয়ে বললে, 'বলুন আপনার কী সমস্যা।'

মেয়েটি বললে, 'গত পাঁচ বছর যেখানে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিলাম, তাঁরা আমেরিকায় চলে যাবার পর আমি এখন বেকার। তাই চাকরি জোটানোর একটা সংস্থায় প্রায় ফি-হপ্তায় যাই। মিস স্টোপার সেখানকার কাজ দেখেন।

'গত হপ্তায় গিয়ে দেখলাম মিস স্টোপারের সঙ্গে বসে রয়েছেন অসুরবিশেষ এক ভদ্রলোক। থুতনির নীচে চর্বির ভাঁজ, চোখে চশমা। মুখে দেখন-হাসি। আমাকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

"বাঃ এই তো পাওয়া গেছে!" পরমোৎসাহ হাত ঘষতে ঘষতে বললেন মিস স্টোপারকে— "এঁকে দিয়েই কাজ হবে।"

'আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিস, চাকরি চাই, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গৃহশিক্ষয়িত্রীর?"

"হ্যাঁ।"

"কত মাইনে চাও।"

"কর্নেল মনরো দিতেন মাসে চার পাউন্ড।"

"অ্যাঁ! মাসে চার পাউন্ড! কী অন্যায়! কী অন্যায়! সুন্দরী শিক্ষিতা একটা মেয়েকে এত কম মাইনেও কেউ দেয়?" বলতে বলতে হাত ছুড়ে চেঁচিয়ে ভীষণ রাগে যেন ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু আমি খুব একটা লেখাপড়া শিখিনি। ফরাসি আর জার্মান ভাষাটা একটু-আধটু জানি। সামান্য গান-বাজনা আর ছবি আঁকা—"

"আরে দুর। লেখাপড়ার চেয়ে বড়ো হল সহবত। সেইটা না-থাকলে ঘরের ছেলেকে যার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় কি? এ জিনিস যার মধ্যে আছে, তার মাইনে কখনো বছরে এক-শো পাউন্ডের কম হতে পারে না। তোমার মাইনেও তাই হবে। কি, রাজি?"

'মি. হোমস, আমার তখন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অবস্থা বলতে পারেন। পকেট গড়ের মাঠ, দেনাও করে ফেলেছি। তা সত্ত্বেও এত টাকা মাইনের প্রস্তাব শুনে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'ভদ্রলোক তখন হাসতে হাসতে পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললেন, "আমার অভ্যেস হল মাইনের অর্ধেক টাকা আগাম দিয়ে দেওয়া। খরচপত্র আছে তো?" চর্বির ভাঁজের মধ্যে কুতকুতে চোখ দুটো প্রায় অদৃশ্য হয়ে এল হাসির ধাক্কায়। চোখ তো নয়— যেন দুটো আলোকবিন্দু।

'এমন চমৎকার ভদ্রলোক জীবনে দেখিনি। তবুও কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। ভাবলাম একটু বাজিয়ে নিই, আরও খবরাখবর নিয়ে।

'জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম ভদ্রলোক থাকেন হ্যাম্পশায়ারে। মাইল পাঁচেক ভেতরে একটা গ্রামে। বাড়ি নাম 'কপার-বীচেস'। তাঁর দু-বছরের ছেলেকে সামলাতে হবে। ভারি দুষ্টু ছেলে।

'কুতকুতে চোখে হাসতে হাসতে বললেন, "কী বজ্জাত! কী বজ্জাত! চটি দিয়ে চটাচট আরশুলা মারাটা যদি দেখ।"

'বজ্জাতির ধরন শুনে আমার চক্ষু স্থির হয়ে এল। তারপরে চোখ কপালে উঠল ভদ্রলোকের বায়নাক্কা শুনে।

'আমাকে তাঁর স্ত্রী-র ফাইফরমাশ খাটতে হবে। তাতে আপত্তি করিনি। বড্ড খেয়ালি তাঁরা। তাই আমার খুশিমতো পোশাক পরা চলবে না— তাঁদের পছন্দমতো পোশাক পরতে হবে। অবাক হলেও তাও মেনে নিলাম। তারপর নাকি তাঁদের কথামতো এখন সেখানে বসতে হবে। এ-প্রস্তাবেও আপত্তির কিছু দেখলাম না। কিন্তু যখন বললেন স্ত্রী-র ইচ্ছেমতো আমার এই সুন্দর চুলের বোঝা ছেঁটে ফেলতে হবে, তখন বেঁকে বসলাম।

'বললাম, "তা কি হয়? আমার এই চুল দেখে শিল্পীরাও মুগ্ধ হয়ে যায়। এ-চুল তো ছাঁটতে পারব না[৪]।"

'ভদ্রলোক পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। মুখখানা কালো হয়ে গেল আমার মাথানাড়া দেখে।

'বললেন, "মিস, ওইটাই কিন্তু আসল ব্যাপার। আমার গিন্নি গোঁ ধরেছে, ছোটো চুল রাখতে হবে গভর্নেসকে।"

"না, চুল ছাঁটতে আমি পারব না," বললাম শক্ত গলায়।

"তাহলে আর হল না। সব পছন্দ হয়েছিল, তোমার মতো মেয়েই চাইছিলাম। যাক গে, মিস স্টোপার, দেখুন আর কাউকে পাওয়া যায় কি না।"

'এতক্ষণ মিস স্টোপার চুপ করে কথা শুনছিলেন। এবার বিরক্ত সুরে বললেন, "আমি আর তোমার জন্যে চাকরি খুঁজতে পারব না। আসতে পার।"

'বাড়ি ফিরে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সংসারে সবকিছুই বাড়ন্ত দেখলাম। ভাবলাম, দুর ছাই, চাকরিটা নিলেই হত। কী হবে চুল রেখে? চুল ছোটো করলে অনেককে বরং ভালোই লাগে। বছরে এক-শো পাউন্ড কি সোজা কথা! ঠিক করে ফেললাম, পরের দিন ফের ধরনা দেব মিস স্টোপারের কাছে।

'তার আর দরকার হল না। পরের দিন একটা চিঠি এল সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

'চিঠিখানা সঙ্গে এনেছি। শুনুন, পড়ছি।'

কপার-বীচেস।

প্রিয় মিস হান্টার,

মিস স্টোপার তোমার ঠিকানা দিলেন। তুমি আর একবার ভেবে দেখ আমার চাকরি নেবে কি না। আমার খেয়াল মেটাতে গিয়ে তোমার চুল কাটতে হবে ঠিকই— তার খেসারতও পাবে। বছরে এক-শো বিশ পাউন্ড দেব। বিদ্যুৎ-নীল রঙের পোশাক আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ। খামোকা কিনে টাকা খরচ করবার দরকার নেই। আমার মেয়ে অ্যালিস এখন ফিলাডেলফিয়ায় গেছে— তার পোশাকটা তোমাকে ফিট করবে। সকাল বেলা পরবে এই পোশাক। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বসবে— কোনো অসুবিধে তোমার হবে না। ছেলের সম্বন্ধে খুব একটা ভাবতে হবে না। খুব হালকা কাজ, উইনচেস্টারে এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে হাজির থাকব। কোন ট্রেনে আসছ, জানাও।

'তোমার বিশ্বস্ত'
জেফ্রো রুকাসল

'মি. হোমস, চিঠিটা পেয়ে ভাবছি, চাকরিটা নেব। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

'হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯২

'মিস হান্টার', বলল শার্লক হোমস, 'আমার কোনো বোনকে[৫] বলব না এই পরিবেশে চাকরি নিতে। পরিবেশটা আর যাই হোক, কোনো তরুণীর পক্ষে অনুকূল নয়। বিপদ আছে।'

'কীসের বিপদ?'

'তা তো এখুনি বলতে পারব না।'

'ভদ্রলোকের বউ পাগল নন তো? উদ্ভট খেয়াল মেটানোর জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না তো?'

'হতে পারে। আমি শুধু ভাবছি বছরে চল্লিশ পাউন্ড দিলেই যখন গভর্নেস পাওয়া যায়, তার তিনগুণ টাকা খরচ করা হচ্ছে কেন। নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।'

'সেইরকম যদি কিছু বুঝি, আপনাকে চিঠি লিখলে আপনার সাহায্য পাব?'

'এক-শো বার। আপনার কেসটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। যখনই আপনার টেলিগ্রাম পাব, দৌড়ে যাব, কথা দিলাম।'

মিস হান্টারের মুখ থেকে মেঘের ভার সরে গেল। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ রাতে আমি চুল ছেঁটে ফেলছি। কাল রওনা হব উইনচেস্টার। চললাম।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল চটপটে পদশব্দ। আমি বললাম, 'চালাক মেয়ে। নিজেকে সামলাতে জানে।'

'তা ঠিক,' গম্ভীর মুখে হোমস বললে, 'তবে ওর টেলিগ্রাম শিগ্‌গিরই আসবে। বিপদ আসন্ন।'

বিপদটা যে কী, তা হোমস মেয়েটির কাছে ভাঙেনি, আমার কাছেও বলল না। তবে সেইদিন থেকেই প্রায়ই দেখতাম ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে! ভাবনাটা আমার মনেও যে আনাগোনা করেনি, তা নয়। যার খপ্পরে গিয়েছে মিস হান্টার, সে শয়তান না সাধু— কিছুই আঁচ করতে পারতাম না। মনটা কিন্তু অস্থির হয়ে থাকত। হোমসকে জিজ্ঞেস করলে অস্থির হয়ে হাত ছুড়ে বলত, 'দুর! ঘটনা ছাড়া সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় নাকি? তবে কী জানো, আমার বোনকেও আমি যেতে দিতাম না।'

হোমসের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল পনেরো দিন পর। গভীর রাতে টেলিগ্রাম এল হোমসের নামে। ও তখন ওর নৈশ গবেষণার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বকযন্ত্র আর টেস্টটিউব সাজাচ্ছে রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে রাত কাটিয়ে দেবে বলে। এমন সময়ে এল টেলিগ্রামটা।

হোমস চোখ বুলিয়ে নিয়ে গবেষণার সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বললে, 'আজ রাতে ঘুম চাই— কাল অনেক ঝামেলা আছে। ওয়াটসন, উইঞ্চেস্টারের ট্রেন ক-টায়?'

টাইমটেবল দেখে বললাম, 'সকাল সাড়ে ন-টায়।'

টেলিগ্রামটা পড়লাম। লেখা আছে : কাল দুপুরে উইঞ্চেস্টারের 'ব্ল্যাক সোয়ান হোটেল'-এ আসবেন। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। হান্টার।

পরদিন সকাল এগারোটায় চলে এলাম প্রাচীন ইংলন্ডের রাজধানীতে[৬]। ট্রেনে খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসে ছিল হোমস। হ্যাম্পশায়ার পেরিয়ে আসার পর কাগজের ডাঁই ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিসর্গ দৃশ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। বসন্তের সাজে প্রকৃতি সেজেছেও চমৎকার। নীল আকাশ, সাদা মেঘ, মিষ্টি রোদ। চারিদিকে কেবল সবুজ পাতার সমারোহ— ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে খামার বাড়ির ছাদ।

বেকার স্ট্রিটের দম আটকানো কুয়াশা থেকে এই মন মাতানো পরিবেশে পড়ে পুলক জাগল আমারও চিত্তে। সোল্লাসে বললাম, 'হোমস, কী সুন্দর বল তো? সব টাটকা, তাজা, নতুন।'

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস। মাথা নেড়ে বললে, 'ভায়া, শহরে ক্লেদ আছে, কিন্তু আইন ভাঙা সেখানে কঠিন। এখানে প্রকৃতির উদারতার মধ্যে নৃশংস কাণ্ড ঘটে গেলেও কেউ টের পাবে না। মেয়েটা উইঞ্চেস্টারে থাকলে এতটা ভাবনা হত না— পাঁচ মাইল ভেতরে গ্রামের মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটতে পারে।'

'কী ঘটতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

'মোট সাতটা সম্ভাবনা[৭] ভেবে রেখেছি। দেখা যাক কোনটা সত্যি।'

ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানাটা[৮] হাই স্ট্রিটের ওপরে— স্টেশনের কাছেই। মিস হান্টার আমাদের জন্যে লাঞ্চ সাজিয়ে বসে ছিল।

আমরা যেতেই বললে, 'আঃ, বাঁচলাম আপনাদের দেখে। মি. রুকাসলকে বলে এসেছি তিনটের মধ্যে ফিরব। উনি অবশ্য জানেন না কেন এসেছি।'

আগুনের সামনে লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে হোমস বললে, 'বলুন কী দেখলেন?'

'মি. হোমস, প্রথমেই বলে রাখি মি. রুকাসল আমার সঙ্গে মোটেই খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু ওঁদের মতিগতি মাথায় ঢুকছে না।'

'খুলে বলুন।'

'মি. রুকাসল নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে "কপার-বীচেস"-এ নিয়ে গেলেন আমাকে। বাড়িটা চৌকোনা পুরোনো। তিন দিকের জঙ্গল লর্ড সাদাম্পটনের সম্পত্তি। একদিকের জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাদাম্পটন রোড বড়োরাস্তা পর্যন্ত— রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে।

'বাড়িতে গিয়ে ছেলে বউয়ের সঙ্গে আলাপ করার পর বুঝলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়— মিসেস রুকাসল মোটেই পাগল নন। তবে যেন মনে চাপা দুঃখ আছে। চুপচাপ থাকেন। কখনো কখনো গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবেন। সবসময়ে চোখে চোখে রাখেন স্বামী আর ছেলেকে। দুজনেই যেন নয়নের মণি। মাঝে মাঝে কাঁদতেও দেখেছি। স্বামী ভদ্রলোক একটু রুক্ষ হলেও স্ত্রীকে যত্নে রাখেন। গিন্নির এত ভাবনা বোধ হয় ছেলেটার জন্যে। ভারি বদ ছেলে। নিষ্ঠুর। হেঁড়ে মাথা, বেঁটে, গোঁয়ার। ইতর প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে বিকট উল্লাস পায়। আদর দিয়ে বাঁদর করা ছেলে।

'ভদ্রলোক বিপত্নীক— ভদ্রমহিলা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান পনেরো বছর— পঁয়তাল্লিশ আর তিরিশ। প্রথম পক্ষের একমাত্র মেয়ে ফিলাডেলফিয়ায় চলে গেছে সৎমা-র সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে। বয়সের ব্যবধান খুবই তো কম। মেয়েটির বয়স কুড়ি। খবরটা মি. রুকাসলই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন। দ্বিতীয় পক্ষ সংসারে এসেছে বছর সাতেক। খুব শান্ত মহিলা।

'বাড়িতে ঝি-চাকরের পাট প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথম থেকেই খটকা লেগেছে এই নিয়ে। আছে কেবল দুজন— টলার আর তার বউ। টলার লোকটা চোয়াড়ে, চুলদাড়ি খোঁচা খোঁচা, অষ্টপ্রহর মাতাল। বউটা মদ্দা টাইপের— কিন্তু মুখটা সবসময়ে নিমতেতো। বাড়ির গিন্নির মতোই চুপচাপ থাকা স্বভাব। এদের সান্নিধ্য মোটেই সুখের নয়।

'বাড়িতে এসে দু-দিন ভালোই কাটল। তৃতীয় দিন ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্তার কানে কানে কী যেন বললেন গিন্নি।

'হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে কর্তা বললেন, "মিস হান্টার, তুমি আমাদের কথা রেখেছ— চুল ছেঁটে ফেলেছ। চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু। এবার আর একটা কথা রাখো। তোমার বিছানায় ইলেকট্রিক ব্লু কালারের একটা ড্রেস দেখতে পাবে। যাও, পরে এসো।"

'ঘরে গিয়ে দেখলাম সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর একটা পোশাক রয়েছে খাটে। গায়ে দিতে চমৎকার ফিট করে গেল— যেন আমার মাপেই তৈরি।'

'এলাম বসবার ঘরে। এ-ঘরটা বাড়ির সামনের দিকে। পাশাপাশি তিনটে মেঝে পর্যন্ত নামানো বিরাট কাচের জানলা আছে সাদাম্পটন রোডের দিকে। মাঝের জানলাটার সামনে পেছন করে বসানো চেয়ারে বসতে বলা হল আমাকে। আমার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে করতে মজার মজার হাসির গল্প বলতে লাগলেন মি. রুকাসল। হাসতে হাসতে পেটে খিল লেগে যাবার উপক্রম হল। গিন্নি কিন্তু রামগরুড়ের ছানার মতো চুপচাপ বসে রইলেন চেয়ারে। ভাবগতিক দেখে মনে হল যেন উদ্‌বেগে ভুগছেন।'

'ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়ে দেওয়া হল আমাকে। ড্রেস পালটে ছেলে দেখাশুনা করতে গেলাম।

'দু-দিন পরে আবার হুকুম হল নীলবসনা হয়ে জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসবার। এবারও হাসির গল্প শুনিয়ে হাসিয়ে ছাড়লেন মি. রুকাসল। শেষকালে একটা হলদে মলাটের বই হাতে দিয়ে মাঝখান থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনাতে বললেন। একটু পড়বার পরেই উনি আমাকে উঠিয়ে দিলেন— পোশাক পালটে নিতে বললেন।

'লক্ষ করেছি, কিছুতেই জানলার দিকে মুখ ফেরাতে দেওয়া হয় না আমাকে— পেছনে কী ঘটছে দেখতে দেওয়া হয় না। তাই বিষম কৌতূহল হল। অদ্ভুত ব্যাপারটার মানে জানবার জন্য ভেতরটা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। পরের বার নীলবসনা হয়ে বসবার সময়ে রুমালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম ভাঙা আয়নার একটা টুকরো। কথার ফাঁকে ফাঁকে রুমাল তুলে ধরলাম চোখের সামনে। প্রথমটা কিছু দেখিনি। দ্বিতীয়বার দেখলাম, বাড়ির জমির রেলিংয়ে ভর দিয়ে সাদাম্পটন রোডে একজন দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় কত লোক যাচ্ছে— এ কিন্তু চলে যাচ্ছে না— ঠায় তাকিয়ে আছে এদিকে। গায়ে ছাই রঙের পোশাক, আকারে ছোটোখাটো।

'মিসেস রুকাসল খরখরে চোখে চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। মনে হল রুমালের মধ্যে লুকোনো আয়না উনি দেখে ফেলেছেন। কর্তাকে বললেন, "দেখ দেখ, রাস্তার একটা লোক প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে মিস হান্টারের দিকে।"

"তাই নাকি? মিস হান্টারের বন্ধু নয় তো?"

"আজ্ঞে না। এখানকার কাউকেই চিনি না আমি।"

"তাহলে বাজে লোক। তুমি এইভাবে হাত নেড়ে বিদেয় করো ওকে।"

"রাস্তায় কে দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার কী?" উনি কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। উনি যেভাবে দেখালেন, সেইভাবে হাত নাড়ালাম। সঙ্গেসঙ্গে জানলার পরদা টেনে দিলেন গিন্নি ঠাকরুন। এই গেল সাতদিন আগেকার ঘটনা। এরপর আর জানলায় নীল ড্রেস পরে বসতে হয়নি।'

'ইন্টারেস্টিং কেস', বলল হোমস। 'তারপর?'

'প্রথম যেদিন কপার-বীচেস-এ গেলাম, সেদিন মি. রুকাসল আমাকে বারবাড়ির রান্নাঘরের পাশে

একটা ছোটো ঘরের সামনে নিয়ে গেছিলেন। ভেতর থেকে শেকল নাড়ার ঝনঝন শব্দ শুনলাম, সেইসঙ্গে একটা জন্তুর চলাফেরার খচমচ শব্দ।

'তক্তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাতে বললেন মি. রুকাসল। তাকিয়েই রক্ত হিম হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে যেন দু-টুকরো আগুন— একজোড়া চোখ।

'মিষ্টি করে হাসতে হাসতে মি. রুকাসল বললেন, ''ওই হল আমার আদরের ডালকুত্তা— কার্লো[৯]। একবেলা খাইয়ে রাখা হয়— পেটে সবসময়ে খিদে থাকে— মানুষ পেলেই যাতে ছিঁড়ে খেতে পারে। রাত্রে টলার ওকে ছেড়ে দেয়। তাই বলে রাখি, সন্ধের পর বাড়ির বাইরে পা দিয়ো না। টলার ছাড়া ওকে সামাল দিতে পারে না কেউ।"

'কথাটা যে মিথ্যে নয়, দু-দিন পরে চাঁদের আলোয় রাত দুটোর সময়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম জানলার সামনে। এ-বাড়ির কপার বীচেস নাম হয়েছে তামাটে পাতাওলা কপার বীচেস গাছের জন্যে— গাছটা আছে বাড়ির একদম সামনে। তারই ছায়ায় বাছুরের মতো বড়ো কী যেন একটা নড়তে দেখলাম। তারপরেই চাঁদের আলো পড়ল কালো ছায়াটার ওপর। একটা দানব কুকুর। ঝুলন্ত চোয়াল, কালচে নাক, কপিশ বর্ণ। প্রকাণ্ড হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। ভয়ংকর সেই আকৃতি দেখে রাতে ভালো করে ঘুমোতেও পারলাম না।

'এরপর আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আগের চাইতেও আশ্চর্য। লন্ডনে চুল ছেঁটে ফেলে কাটা চুলগুলো আমার ট্রাঙ্কের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। একদিন সন্ধেবেলা ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লে আমার ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেওয়ালের একটা দেরাজে তালা দেওয়া দেখলাম। অন্য দুটো দেরাজ খোলা ছিল। তাতে আমার জামাকাপড় রাখার জায়গা কুলোত না। তাই ভাবলাম এ-দেরাজটা যদি খোলা যায় বাড়তি জামাকাপড় রাখা যাবে। চাবির গোছার একটা চাবি লেগেও গেল। ভেতর থেকে পেলাম সেই কাটা চুলের বোঝা।

'আমি তো অবাক। বেশ মনে আছে আমার চুল আছে আমারই ট্রাঙ্কে— এখানে এল কী করে?

'খুললাম আমার তোরঙ্গ। আমার চুল যথাস্থানেই আছে। বার করে এনে রাখলাম দেরাজে পাওয়া চুলের পাশে। মি. হোমস, বললে বিশ্বাস করবেন না— দুটো চুলই একরকম। একরকম বেণী, একইরকম রং।

'এ কী রহস্য! হাত কাঁপতে লাগল আমার। বেশ বুঝলাম, এ-রহস্য যাতে আমি টের না-পাই, তাই দেরাজে ছিল। খোলাটা অন্যায় হয়েছে। কাউকে বলাটাও ঠিক হবে না।'

'এর পরের ঘটনাও কম অদ্ভুত নয়। আমি যা দেখি, ভালো করেই দেখি। দেখার ব্যাপারে চোখ আমার ধারালো। কপার-বীচেস বাড়িটার একপাশে একটা অংশে কেউ থাকে না গোড়া থেকেই লক্ষ করেছি। টলার-দম্পতি যেখানে থাকে, তার পাশ দিয়ে সেদিকে যেতে হয়। সবসময়ে তালা ঝোলে অংশটায়। একদিন এই দরজা দিয়েই রাগে থমথমে মুখে মি. রুকাসলকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম— হাতে চাবি। দরজায় তালা দিয়ে আমার পাশ দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন— কথাও বললেন না।

'কৌতূহল হল। সেইদিকের অংশটা ঘুরে দেখতে গিয়ে খটকা লাগল। পেছনে চারটে জানলা। তিনটেতে ধুলোবালি জমে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে— আর একটায় কেবল খড়খড়ি দেওয়া। পায়চারি করছি আর জানলা দেখছি, এমন সময়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন মি. রুকাসল— কিছুক্ষণ আগেকার সেই গনগনে রাগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে।

'বললেন, "তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, কিছু মনে করনি তো?"

'আমি বললাম, "না না। মনে করব কেন? কিন্তু এইদিকে কতকগুলো ঘর খালি পড়ে রয়েছে দেখছি— একটাতে আবার খড়খড়ি তোলা।"

'ভদ্রলোক চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে। তৎক্ষণাৎ অবশ্য সামলে নিলেন। বললেন, "ফটো তোলার শখ আছে তো। ওই হল ডার্করুম। কিন্তু তোমার তো দেখছি সবদিকেই চোখ। আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য!" কথার স্বরে স্পষ্ট সন্দেহ আর বিরক্তি— চোখে কপট হাসি।

'বেশ বুঝলাম উনি চান না তালা দেওয়া অংশ নিয়ে মাথা ঘামাই। ফলে, কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। দেখতেই হবে কী আছে ও-ঘরে। শুধু মি. রুকাসল নন, তাঁর স্ত্রীকেও ভেতরে ঢুকতে দেখেছি— একদিন টলারকেও দেখেছি থলি হাতে চৌকাঠ পেরোতে।

'সুযোগ পেলাম হঠাৎ গতকাল। মাতাল টলার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তালা দিতে ভুলে গেছিল। কর্তা গিন্নি আর ছেলেটাও নীচে। ধাঁ করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

'সামনে একটা লম্বা করিডর। শেষের দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে পাশাপাশি তিনটে ঘর। দু-পাশের ঘর দুটোর দরজা খোলা— ভেতরে অন্ধকার আর ধুলো। মাঝের দরজাটা লোহার খিল দিয়ে বন্ধ করা এবং কড়ায় তালা দেওয়া! পাল্লার নীচে আলো দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই ঘর যার খড়খড়ি তোলা থাকে। আলোটা আসছে বোধ হয় স্কাইলাইট দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরের রহস্য নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় স্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শুনলাম ঘরের ভেতরে। পাল্লার নীচে আলোয় যেন কার ছায়াও পড়ল।

'সাংঘাতিক ভয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম বাইরে— আছড়ে পড়লাম মি. রুকাসলের দু-বাহুর মধ্যে।

'মিষ্টি হেসে বললেন, "ধরেছি ঠিক। দরজা খোলা দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়েছ?"

"উঃ ভীষণ ভয় পেয়েছি।"

' "কীসের ভয় মিস হান্টার?" ভাবতে পারবেন না কী আশ্চর্য নরম সুরে বললেন মি. রুকাসল— আদর আর ভালোবাসা যেন ঝরে পড়ল প্রতিটি শব্দ থেকে।'

'শুনেই আমি হুঁশিয়ার হলাম। বেশি মোলায়েম হাত গিয়ে ন্যাকামিটা নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন মি. রুকাসল। মেকি আদর— সাচ্চা নয়।'

'বললাম, "বড্ড অন্ধকার। গা শিরশির করে উঠেছিল! এই দেখুন না কেন এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"ব্যস? শুধু এই?" ধারালো চোখে আমার মুখ দেখতে দেখতে বললেন মি. রুকাসল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার কী?"

"দরজা বন্ধ রাখি কেন জান?"

"না তো।"

"পরের ব্যাপারে যারা নাক গলায় তাদের জন্যে।"

"আমি তো জানতাম না—"

"এখন জেনেছ। ফের যদি দেখি এদিকে এসেছ—" বলতে বলতে মুখটা পিশাচের মতো হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে ভীষণ চোখে তাকিয়ে বললেন, "ওই ডালকুত্তার সামনে তোমাকে ফেলে দেব।"

'এমন ভয় পেলাম যে বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। দৌড়ে এসে অজ্ঞানের মতো পড়ে গেলাম বিছানায়। অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আপনার কথা মনে পড়ল। এই শত্রুপুরীতে কেউ আমার আপন নয়— এমনকী দু-বছরের বাচ্চাটাও আমার অমঙ্গল চায়। আমাকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনি। তাই তক্ষুনি চুপি চুপি চলে গেলাম আধ মাইল দূরে পোস্টাপিসে— টেলিগ্রাম পাঠালাম আপনাকে। টলার মদের ঝোঁকে তখন অজ্ঞান বললেই চলে— সেইজন্যে যাওয়ার সাহস পেলাম— ও ছাড়া ডালকুত্তাকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। বাড়ি ফিরে রাতটা প্রায় না-ঘুমিয়েই কাটালাম। আজ ছুটি নিয়ে এসেছি তিনটে পর্যন্ত। সন্ধ্যায় কর্তা গিন্নি কোথায় যাবেন— বাড়ি থাকবেন না। বাচ্চাটাকে আমি একাই দেখব। মি. হোমস, সব তো শুনলেন, এবার বলুন এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মানে কী?'

এই বিচিত্র কাহিনি শুনলাম আমি আর হোমস মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তারপর পকেটে হাত পুরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে করতে বন্ধুবর শুধোল, 'টলার এখনও মদে বেঁহুশ?'

'হ্যাঁ।'

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রুকাসল? সন্ধের পর বাড়ি থাকছেন না?'

'না।'

'তাহলে একটা কাজ করুন। মিসেস টলারকে কোনো একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিন। কুকুরটাও ছাড়া থাকছে না। সেই ফাঁকে আমরা দুই বন্ধু গিয়ে খানাতল্লাশ করে দেখি রহস্যটা কদ্দুর দানা বেঁধেছে। মিস হান্টার, আমি এই মুহূর্তে যা বুঝেছি, তা এই : আপনি এসেছেন অ্যালিস মেয়েটার ভূমিকায় অভিনয় করতে। অ্যালিসকে দেখতে মোটামুটি আপনার মতো— চুল একরকম। নাছোড়বান্দা কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আপনাকে তারই পোশাক পরিয়ে বসানো হয় জানলার সামনে পিঠ ফিরিয়ে। ছিনেজোঁক এই লোকটা হয় অ্যাসিসের বন্ধু নয় তা হবু-বর। অ্যালিস আমেরিকায় গেছে, এই কথা রটানো রয়েছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে। আপনার ইশারা দেখে ছিনেজোঁকটি যাতে নিশ্চিন্ত থাকে এই হল অ্যালিসের বাবার মতলব। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে দু-বছরের বাচ্চাটা সম্বন্ধে যা শুনলাম।'

'বাচ্চাটা আবার কী করল?' আমি তো অবাক।

'ভায়া, বাচ্চাটা কিছু করেনি— কিন্তু বাচ্চার চরিত্র বিচার করে বাপ-মায়ের চরিত্র আঁচ করা যায়। সন্দেশ দেখে যেমন ছাঁচ কীরকম জানা যায়— এও সেইরকম। ওইরকম উৎকট বিকট নিষ্ঠুরতা যার চরিত্রে জন্মসূত্রে বাসা নিয়েছে— তার বাপ অথবা মা নিশ্চয় দয়ালু যিশু নয়। মাকে বাদ দিলাম— বাপ সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় লোকটা অমানুষিক নৃশংস। একটি মেয়েকে তিনি যন্ত্রণা দিচ্ছেন— তাকে বাঁচাতে হবে।'

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে হাজির হলাম কপার-বীচেস ভবনে। সামনেই সেই গাছ। তামাটে পাতা চকচক করছে পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। মিস হান্টার সদর দরজা থেকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের নিয়ে গেল ভেতরে।

বলল, 'দুমদাম আওয়াজ শুনছেন? মিসেস টলারকে ভাঁড়ার ঘরে আটকে রেখেছি। বুড়ো টলার এখনও বেহুঁশ। এই নিন মি. রুকাসলের চাবির নকল।'

হোমস বললে, 'ভালোই হল। চলুন কোথায় যেতে হবে।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুললাম। অন্ধকার করিডর বেয়ে বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছোলাম। লোহার পাতটা দরজার সামনে থেকে সরিয়ে নিল হোমস, কিন্তু চাবি ঘুরিয়েও তালা খুলতে পারল না। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সব নিস্তব্ধ।

মুখটা কালো হয়ে গেল হোমসের। বিড়বিড় করে বললে, 'দেরি করে ফেললাম নাকি! ওয়াটসন, কাঁধ লাগাও।'

দুই বন্ধু মিলে চাপ মারলাম জীর্ণ দরজায়। মচ মচাৎ শব্দে কবজা থেকে ঠিকরে গেল পাল্লা। হুড়মুড় করে ঢুকলাম ভেতরে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। একটা টেবিল আর বাক্সভরতি কিছু পোশাক ছাড়া কিস্সু নেই ঘরে। স্কাইলাইট খোলা।

লাফ দিয়ে কড়িকাঠের কাছে উঠে স্কাইলাইট ধরে ঝুলতে ঝুলতে হোমস বললে, 'বাইরে একটা দড়ির মই ঝুলছে দেখছি। পিশাচ বাপ মেয়েকে এদিক দিয়েই সরিয়েছে মনে হচ্ছে। বাইরে যাওয়ার নাম করে বাইরে থেকেই সেরেছে কাজ। ধড়িবাজ শয়তান কোথাকার,' ঠিক এই সময়ে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে।

চাপা গলায় হোমস বললে, 'ওয়াটসন, মি. রুকাসল আসছেন মনে হচ্ছে। পিস্তলটা হাতে রাখো। লোক কিন্তু খুব খারাপ।' কথা শেষ হতে-না-হতেই দরজায় আবির্ভূত হল ভীষণ মোটা বিশালদেহী এক পুরুষ, হাতে একটা মোটা লাঠি। দেখেই আর্ত চিৎকার করে উঠে দেওয়ালে সিটিয়ে গেল মিস হান্টার। এক লাফে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু স্বয়ং শার্লক হোমস।

'জানোয়ার কোথাকার! কোথায় আপনার মেয়ে?'

ঘরময় চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্কাইলাইটের দিকে তাকাল মোটকা লোকটা।

বলল বজ্র হুংকারে, 'তবে রে! ওপরচালাকি হচ্ছে! আমাকেই আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। চোর কোথাকার। কোথায় সরিয়েছিস ওকে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোদের মজা!' বলেই করিডর দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে।

'কুকুর আনতে গেল যে!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস হান্টার।

'আসুক না, আমার রিভলভার তো রয়েছে,' অভয় দিলাম আমি।

'সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিই চলো,' বলেই ঘর থেকে ছিটকে গেল হোমস। তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে এলাম নীচে। হল ঘরে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতেই শুনলাম কুকুরের গুরুগম্ভীর গর্জন— পরমুহূর্তেই একটা তীব্র যন্ত্রণাময় আর্ত চিৎকার— রক্ত-জল-করা সেই ভয়ংকর চিৎকার কান পেতে শোনাও যায় না। একজন লাল মুখো বয়স্ক পুরুষ টলতে টলতে বেরিয়ে এল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

'সর্বনাশ। কে ছাড়ল কুকুরটাকে। দু-দিন খাওয়ানো হয়নি যে! তাড়াতাড়ি চলুন, তাড়াতাড়ি।'

হোমস আর আমি তিরবেগে বেরিয়ে এলাম বাইরে, বাড়ির কোণ ঘুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলাম শব্দ লক্ষ করে— পেছন পেছন ছুটে এল টলার। দূর থেকেই দেখতে পেলাম ভয়ংকরদর্শন উপোসি দানব কুকুরটাকে— কালো নাক ঠেকে রয়েছে রুকাসলের গলার ওপর— মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় পাকসাট দিচ্ছেন— রুকাসল— বিকট চিৎকারে খানখান হয়ে যাচ্ছে রাত্রি। কাছে গিয়েই নির্ভুল লক্ষ্যে ঘিলু বার করে দিলাম ডালকুত্তার— সাদা দাঁত তখনও কামড়ে রইল ঘাড়ের থাক থাক চর্বি। অতি কষ্টে চোয়াল ছাড়িয়ে মুমূর্ষুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলাম বাড়ির মধ্যে। প্রাণটা পুরোপুরি

বেরোয়নি— কিন্তু কাঁধের অবস্থা চোখ মেলে দেখা যায় না— এমনি ভয়াবহ। সোফায় শুইয়ে সেবাশুশ্রূষায় মন দিলাম আমি— টলারকে পাঠালাম বউকে খবর দিতে।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল লম্বা, অস্থিসর্বস্ব শুকনো চেহারার একজন স্ত্রীলোক।

'মিসেস টলার!' অস্ফুট কণ্ঠে বললে মিস হান্টার।

'হ্যাঁ, মিস। মি. রুকাসল আপনার সন্ধানে যাওয়ার আগে ঘর থেকে বের করে দিয়ে গেছিলেন আমাকে। আরে মিস, আমাকে বললেই তো হত আপনাদের আসল মতলব। এত ঝামেলার মধ্যে তাহলে আর যেতে হত না।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শার্লক হোমস বললে, 'তাই বল। মিসেস টলার দেখছি কেউ যা জানে না, তাও জানে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সবই জানি। বলতেও এক পায়ে খাড়া আছি।'

'তাহলে বসে পড়ো। কয়েকটা জায়গা ভালো বুঝিনি— খোলসা করে দাও দিকি বাপু।'

'নিশ্চয় দেব। ঘরে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দেওয়ার আগে যদি জিজ্ঞেস করতেন, সব বলতাম। আদালত পর্যন্ত যদি গড়ায় ব্যাপারটা, খেয়াল রাখবেন আপনাদের এই বান্ধবীটির সত্যিকারের বন্ধু আমি— মিস অ্যালিসও কিন্তু আমার বড়ো বন্ধু।'

'দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই এ-বাড়িতে সুখে থাকতে পারেনি অ্যালিস। লাঞ্ছনা মুখ বুজে সয়ে গেছে! অত্যাচার চরমে উঠল মি. ফাউলারের সঙ্গে তার আলাপ হওয়ার পর। উইল অনুসারে অ্যালিসও বেশ কিছু টাকাকড়ি পায়— কিন্তু অ্যাদ্দিন কোনো কথা বলেনি— সব ছেড়ে দিয়েছিল মি. রুকাসলের হাতে। কিন্তু বিয়ের কথা উঠতেই বাপ দেখলেন মহা মুশকিল— এবার সম্পত্তির ভাগ চেয়ে বসবে জামাই— তাই উঠে পড়ে লাগলেন যাতে সব সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। জোর করে অ্যালিসকে দিয়ে একটা কাগজে সই করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, বিয়ে হলেও যাতে টাকার ওপর দখল থাকে মি. রুকাসলের। অ্যালিস বেঁকে বসল। শুরু হল অমানুষিক পীড়ন। ব্রেন-ফিভারে শয্যাশায়ী হল অ্যালিস— ছ-মাস লড়াই চলল যমে মানুষে। প্রাণে বেঁচে গেলেও শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেল— অমন সুন্দর চুলের বোঝাও কেটে ফেলতে হল। তাতে মন টলল না মি. ফাউলারের— ধনুর্ভঙ্গ পণ করে রইল অ্যালিসকেই বিয়ে করবে।'

হোমস বললে, 'এবার বুঝেছি। বাকিটা আমি বলছি। মি. রুকাসল তখন থেকেই মেয়েকে সেইভাবে বন্দিনী করে রাখতে লাগলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লন্ডন থেকে মিস হান্টারকে নিয়ে এলেন ছিনেজোঁক মি. ফাউলারকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে?'

'মি. ফাউলারের জেদ তাতে চিড় খেল না। অসীম অধ্যবসায় তাঁর। বাড়ি অবরোধ করে বসে রইলেন। তোমার সঙ্গেও তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল— বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বার্থের সঙ্গে তোমার স্বার্থের কোনো সংঘাত নেই!'

'মি. ফাউলারের কথাবার্তাই শুধু মিষ্টি নয়, হাতটিও দরাজ।'

'তাই তোমার পতিদেবতার যাতে মদের অভাব না-ঘটে, সে-ব্যবস্থা করে তোমাকে দিয়েই দড়ির মই জোগাড় করে রাখল[১০] যাতে মনিব বেরিয়ে গেলেই ভাবী বউকে নিয়ে চম্পট দেওয়া যায়?'

'আপনি তো দেখছি ঠিক ঠিক সব বলে যাচ্ছেন!'

'ডাক্তার এসে গেছেন দেখছি। মিসেস টলার, অনেক উপকার করলেন, অনেক ধাঁধা কাটিয়ে দিলেন। মিস হান্টারকে নিয়ে আমরা চললাম উইঞ্চেস্টারে।'

তামাটে বৃক্ষ কপার-বীচেসওলা রহস্য-নিকেতনের রহস্য এইভাবেই ফর্দাফাঁই করে ছাড়ল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ শার্লক হোমস। মি. রুকাসল প্রাণে বেঁচে গেলেও খুব সুখে তার দিন কাটেনি— স্ত্রী-র আন্তরিক সেবায় দিন চলে গেছে কোনোরকমে। ঝি-চাকরকে তাড়ানোর সাহস হয়নি ভদ্রলোকের। ওঁর কুকীর্তি এত বেশি জেনে ফেলেছে টলার-দম্পতি যে বাড়িতেই তাদের থাকতে দিতে হয়েছে— এখনও আছে। বাড়ি থেকে পালানোর পরের দিনই সাদাম্পটনে গিয়ে বিশেষ লাইসেন্সের জোরে মি. ফাউলারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় অ্যালিসের। এখন তিনি সরকারি চাকরি নিয়ে মরিশাসে[১১] আছেন। মিস হান্টার একটা প্রাইভেট স্কুলের ভার নিয়ে ওয়ালসালে— তার সম্বন্ধে শার্লক হোমসের আর কোনো আগ্রহই নেই— যা দেখে খুবই হতাশ হয়েছি আমি।

টীকা

১. **রহস্য নিকেতন 'কপার-বীচেস'** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কপার-বীচেস' ১৮৯২-এর জুন মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **ডেইলি টেলিগ্রাফ** : এই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল স্লে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৫-র ২৯ জুন। সানডে টাইমসের মুদ্রক যোসেফ মোজেস লেভি ছাপতেন ডেইলি টেলিগ্রাফ। পরে কর্নেল স্লে-র কাছ থেকে মালিকানা আসে লেভির হাতে। তার ক-দিনদ পরেই এই খবরের কাগজের বিক্রি অন্য সব দৈনিক কাগজের বিক্রিকে ছাড়িয়ে যায়।

৩. **সেগুলো গল্পই হয়ে গেছে** : 'দ্য ব্ল্যাঞ্চড সোলজার' গল্পটি শার্লক হোমস বর্ণিত। তখন কিন্তু হোমস স্বীকার করেন গল্পের বর্ণনা তেমনই হওয়া উচিত, যা পড়তে পাঠকের ভালো লাগে।

৪. **চুল তো ছাঁটতে পারব না** : ভিক্টোরীয়-যুগে ইংরেজ মহিলারা লম্বা চুল পছন্দ করলেও, চুল ছোটো করে ছাঁটারও চল ছিল।

৫. **আমার কোনো বোনকে** : হোমসের কোনো বোন থাকবার কথা আর্থার কন্যান ডয়াল লেখেননি। কিন্তু কোনো কোনো গবেষক তাঁর এক বা একাধিক বোন থাকার সম্ভাবনা অনুমান করেন।

৬. **প্রাচীন ইংলন্ডের রাজধানীতে** : উইনচেস্টার ছিল ৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েসেক্সের স্যাক্সন রাজ্যের রাজধানী। ইংলন্ডের রাজা অ্যালফ্রেড দ্য গ্রেটের সময়ে, ৪২৭ সালে, উইনচেস্টার ইংলন্ডের রাজধানী হয়। ক্যানিউট দ্য ডেন, উইলিয়ম দ্য কনকারার প্রভৃতি রাজাও রাজত্ব করেছেন এই শহর থেকে। ১১৪১-এ ঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এই শহর গুরুত্ব হারায়।

৭. **মোট সাতটা সম্ভাবনা** : সাতটা সম্ভাবনার কথা হোমস বলেছেন 'দ্য মিসিং থ্রি কোয়ার্টার্স' গল্পে। 'দ্য নাভাল ট্রিটি' গল্পে বলেছিলেন সাতটা সূত্রর কথা।

৮. **ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানাটা** : উইনচেস্টার এই নামে সত্যিই একটি হোটেল ছিল।

৯. **কার্লো** : 'দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার' গল্পে এই নামের একটি স্প্যানিয়েল কুকুর দেখা যায়।

১০. **তোমাকে দিয়েই দড়ির মই জোগাড় করে রাখল** : অল্প সময় আগেই কিন্তু হোমস ভেবেছিল ওই দড়ির মই দিয়েই রুকাসল সরিয়ে দিয়েছে অ্যালিসকে।

১১. **মরিশাসে** : মরিশাসে ১৮১০ সাল থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ পত্তন হয়। সেই সময়ে এই দ্বীপ ছিল জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর রাস্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ১৯৬৮ সালে মরিশাস স্বাধীন হয়।

দ্য মেমোয়্যার্স অফ
শার্লক হোমস

ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ[১]

[সিলভার ব্লেজ]

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমস হঠাৎ বললে, 'ওয়াটসন, আমাকেই বোধ হয় যেতে হবে।'

'যাবে? কোথায়?'

'ডার্টমুরে[২]— কিংস পাইল্যান্ডে।'

অবাক হলাম না। যে ঘটনা সারা ইংল্যান্ডকে তাতিয়ে তুলেছে তা নিয়ে হোমস যে কেন এতদিন মেতে ওঠেনি— এইটাই বরং আশ্চর্য।

ঘটনাটা সত্যিই অসাধারণ। 'ওয়েসেক্স কাপ' জিতে নেওয়ার মতো দুর্দান্ত রেসের ঘোড়া 'সিলভার ব্লেজ' হঠাৎ যেন বেমালুম বাতাসে মিলিয়ে গেছে। 'ট্রেনার' ভদ্রলোক খুন হয়েছে নৃশংসভাবে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। হোমস কিন্তু কাগজগুলোয় শুধু চোখ বুলিয়েই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ঘনঘন পাইপ খেয়েছে, ঘরময় পায়চারি করেছে, একটা কথাও কানে তোলেনি।

মুখে কথা না-বললেও 'সিলভার ব্লেজ' রহস্য যে ওকে আকর্ষণ করেছে তা বুঝেছিলাম ওর ওই চেহারা দেখে। শার্লক হোমসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণী শক্তির নবতম পরীক্ষা এই রহস্য— হোমস কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

সত্যিই পারল না। অকুস্থলে যাওয়ার ইচ্ছে মুখ ফুটে বলতেই বুঝলাম আসরে অবতীর্ণ হতে চলেছে বন্ধুবর।

'আমি যাচ্ছি নিশ্চয়?' বললাম আমি।

'অবশ্যই। সঙ্গে তোমার দামি দূরবিনটা নিয়ো।'

এক ঘণ্টা পর চলন্ত ট্রেনে বসে আবার খবরের কাগজ নিয়ে তন্ময় রইল হোমস। রীডিং ছাড়িয়ে আসার পর কাগজের ডাঁই বেঞ্চির নীচে ঠুসে সিগারেট বাড়িয়ে দিল আমাকে।

বলল, 'ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল স্পিডে যাচ্ছি।'

'সিকি মাইল অন্তর খুঁটিগুলো অবশ্য আমি দেখিনি।'

'আমি দেখিনি। টেলিগ্রাফ তারের খুঁটিগুলো কিন্তু ষাট গজ অন্তর পোঁতা। সেই হিসেবেই বললাম ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল স্পিডে যাচ্ছি। কেসটা পড়েছ?'

'কাগজে পড়েছি।'

'অসাধারণ কেস। যুক্তিবিজ্ঞানের চরম পরীক্ষা বলতে পারো। মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পেয়েছি ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস আর তদন্তকারী ইনস্পেকটর গ্রেগরির কাছ থেকে।'

'সে কী! আজ বেস্পতিবার! টেলিগ্রাম পেয়েই তো তোমার যাওয়া উচিত ছিল।'

'ভায়া ওয়াটসন, সেইটাই ভুল হয়েছে আমার। তোমার লেখায় আমাকে যেভাবে আঁকা হয়েছে— আমি যে তা নই, আমিও যে অতি সাধারণ মানুষ, ভুলভ্রান্তি করি— এইটাই তার প্রমাণ। আমি ভেবেছিলাম ডার্টমুরের মতো ফাঁকা জায়গায় নিখোঁজ ঘোড়াকে ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাবে। ''ট্রেনার'' জন স্ট্রেকারকে খুন করেছে নিশ্চয় ঘোড়া-চোর— তাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। কিন্তু সারাদিনে শুধু ফিজরয় সিম্পসন ছেলেটাকে হাজতে পোরা ছাড়া পুলিশ কিছুই করতে পারেনি দেখে গা-ঝাড়া দিতে বাধ্য হলাম। তবে কী জানো, কাল সারাদিনটা একেবারে মাঠে মারা যায়নি।'

'তার মানে রহস্যের অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছ?'

'ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে নিতে পেরেছি। বলছি শোনো।'

'সিলভার ব্লেজ'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯১

'সিলভার ব্লেজ খানদানি ঘোড়া। ভালো বংশ। বয়স পাঁচ। রেসের মাঠে সুনাম হয়েছে। সমস্ত প্রাইজ জিতেছে। ''ওয়েসেক্স কাপ'' রেসে বাজি পড়েছিল তিন টাকায় এক টাকা। খুবই বেয়াড়া বাজি— কিন্তু তবুও মোটা বাজি ধরা হয়েছে ঘোড়াটার ওপর— কারণ ও কখনো হারেনি—

কাউকে রাস্তায় বসায়নি। কাজেই সিলভার ব্লেজ মাঠে নামলে যেমন অনেকের লাভ— মাঠে না-নামলেও অনেকের লাভ।'

'তাই কড়া নজর রাখা হয়েছিল সিলভার ব্লেজের ওপর। কিংস পাইল্যান্ডের আস্তাবলে মোট চারটে ঘোড়ার একটা এই সিলভার ব্লেজ। কর্নেলের জকি জন স্ট্রেকার মুটিয়ে যাওয়ার ফলে ঘোড়া চালানো ছেড়ে ঘোড়া ট্রেনিংয়ের কাজ ধরেছে। তিনটে ছোকরা আস্তাবলের কাজ দেখাশুনো করে। রাতে পালা করে একজন পাহারা দেয়। দুজন ওপরের ঘরে ঘুমোয়। জন স্ট্রেকার নিঃসন্তান। থাকে আস্তাবল থেকে দু-শো গজ দূরে বউ আর একজন ঝি-কে নিয়ে। অবস্থা ভালো। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। ফাঁকা। আট মাইল উত্তরে কতকগুলো ভিলা আছে— ডার্টমুরের হাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য ফেরাতে যারা আসে তাদের জন্যে। মাইল দুই পশ্চিমে ট্যাভিসটক গ্রাম। বাদা পেরিয়ে, দু-মাইল দূরে কেপলটনের বড়োসড়ো আস্তাবল— ঘোড়া ট্রেনিংয়ের বিরাট ব্যাপার। আস্তাবলের মালিক লর্ড ব্ল্যাকওয়াটার— ম্যানেজার সিলাম ব্রাউন। এ ছাড়া বাদার কোথাও কিছু নেই— মাঝে মাঝে ছন্নছাড়া কিছু ভবঘুরে বেদে। সোমবার রাতে এহেন পরিবেশে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনাটা।

'যথারীতি ঘোড়াদের চরিয়ে এনে দানাপানি খাইয়ে রাত ন-টায় তালা দেওয়া হল আস্তাবলে। একজন ছোকরা পাহারায় রইল— দুজন গেল ট্রেনারের বাড়িতে রাতের খাওয়া খেতে। পাহারায় যে রইল, তার নাম নেড হান্টার।

'ঝি এডিথ আসছে হান্টারের খাবার নিয়ে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে, এমন সময়ে দুম করে একজন ভদ্রলোক অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হল তার সামনে। পরনে ধূসর টুইড সুট, মাথায় কাপড়ের টুপি, হাতে গোল মুণ্ডিওয়ালা মোটা ভারী লাঠি। বয়স তিরিশের একটু ওপরে, মুখ ফ্যাকাশে, হাবভাব কেমন যেন অস্থির।

'এডিথকে ডেকে বললে, "ওহে শোনো, কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারো?"

"কিংস পাইল্যান্ড ট্রেনিং আস্তাবলের কাছে।"

"তাই নাকি! কপাল ভালো বলতে হবে! শুনেছি রোজ রাতে একজন ছোকরা ঘুমোয় ওখানে। খাবারটা বোধ হয় তার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না? শোনো, শোনো নতুন ড্রেস কেনার কিছু টাকা ফাঁকতালে রোজগার করতে চাও?" বলতে বলতে ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ টেনে বের করল লোকটা। "ছোকরাটাকে এই কাগজটা আজ রাতে যদি দাও, কালই একটা চমৎকার ফ্রক কিনে আনতে পারবে বাজার থেকে।"

'আস্তাবল সেখান থেকে তিরিশ গজ দূরে। লোকটার কথায় ঘাবড়ে গিয়ে এক দৌড়ে জানলার সামনে পৌঁছোল এডিথ। এই জানলা দিয়ে রোজ রাতে খাবার দিতে হয় তাকে। জানলা খুলে ছোট্ট টেবিলের পাশে বসে ছিল হান্টার। লোকটার কথা সবে বলতে শুরু করেছে এডিথ, এমন সময়ে আগন্তুক নিজেই হাজির হল সেখানে।

'বললে, "গুড ইভনিং। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" এডিথ দেখেছে হাতের মুঠোয় কাগজটা ধরে কথাটা বলেছিল আগন্তুক।

'হান্টার বললে, "এখানে কী চাই?"

"তোমার পকেটে দুটো পয়সা যাতে আসে, সেই ব্যবস্থা করতে চাই। ওয়েসেক্স কাপ

ঘোড়দৌড়ে তোমাদের দুটো ঘোড়া নামছে— সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড— তাই না? ভেতরের খবর একটু জানিয়ে দাও— দেখো তোমার পকেট কীরকম ভরে উঠে। শুনলাম নাকি সিলভার ব্লেজকে পাঁচ ফার্লং দৌড়ে এক-শো গজ পেছনে ফেলে গেছিল বেয়ার্ড? তোমরাও বাজি ধরেছ ওর ওপরেই?"

' "তাই বলুন। ঘোড়ার দালাল[৩]! দাঁড়ান, আপনার মজা দেখাচ্ছি," বলেই কুকুর লেলিয়ে দিতে ছুটল হান্টার। বেগতিক দেখে ভোঁ দৌড় দিল এডিথ। যেতে যেতে দেখল, জানলা দিয়ে ঝুঁকে আছে রেসকোর্সের দালাল লোকটা। হান্টার এসে দেখল ভোঁ-ভাঁ— পালিয়েছে সে।'

'একটা কথা হোমস', জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কুকুর নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল হান্টার? না, খোলা ছিল?'

'এক্সেলেন্ট ওয়াটসন, চমৎকার বলেছ, পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার মাথায় খেলতেই সঙ্গেসঙ্গে ডার্টমুরে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জবাবটা জেনে নিয়েছি। ছোকরা তালা দিয়ে গিয়েছিল দরজায়। জানলাটাও এত ছোটো যে মানুষ গলতে পারে না।

'খেয়েদেয়ে অন্য দুই ছোকরা আস্তাবলে আসতে হান্টার সব খুলে বললে। জন স্ট্রেকারের কানে যেতেই ভদ্রলোক অস্থির হয়ে পড়ল। রাত একটার সময়ে স্ত্রী দেখল জামাকাপড় পরে স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। বাইরে তখন ঝড়জলের মাতামাতি চলছে।

'গেল তো গেলই। সকাল সাতটা বাজল— তখনও বাড়ি ফিরল না দেখে মিসেস স্ট্রেকার পাঠাল এডিথকে। এডিথ গিয়ে দেখল, আস্তাবলের দরজা খোলা, ভেতরে একটা চেয়ারে নিঃসাড়ে জবুথবু ভঙ্গিমায় পড়ে আছে হান্টার। সিলভার ব্লেজ নেই, জন স্ট্রেকারও নেই।

'অন্য ছেলেদুটোকে টেনে তোলা হল। ওরা ওপরের মাচায় ঘুমোয়। ঘুম তাদের গাঢ়। কোনো আওয়াজ শোনেনি। হান্টার নিজেও ঘুমের ওষুধ খেয়ে মড়ার মতো পড়ে থেকেছে। তখনও ঘোর কাটছে না দেখে অন্য ছেলে দুটো ঝিকে নিয়ে দৌড়োল ঢিবিতে উঠে চারপাশ দেখবে বলে— হয়তো ভোরে উঠে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে জন স্ট্রেকার।

'আস্তাবল থেকে সিকি মাইল দূরে একটা ঝোপের পাশে খালের মধ্যে পাওয়া গেল তাকে। দেহে প্রাণ নেই, মাথার খুলি চুরমার— খুব ভারী হাতিয়ার দিয়ে যেন বার বার মারা হয়েছে, ঊরু চিরে গেছে ধারালো অস্ত্রে। ডান হাতে একটা খোলা ছুরি— বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমে রয়েছে— তার মানে আততায়ীদের একজনকে অন্তত জখম করেছে মরবার আগে, বাঁ-হাতে কালো সিল্কের গলাবন্ধ— এডিথ দেখেই চিনেছে— গতরাতে গলায় জড়িয়ে এসেছিল আগন্তুক। ঘোর কাটিয়ে উঠে হান্টারও চিনতে পেরেছে গলাবন্ধটা— তার বিশ্বাস ও যখন কুকুর আনতে দৌড়েছিল, তখনই জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মাংসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল অচেনা লোকটা। ঘুমের ওষুধটা যে আফিং— সেটা মাংস পরীক্ষা করে জানা গেছে। নালার মধ্যে কাদার ওপর সিলভার ব্লেজের খুরের দাগও পাওয়া গেছে। ধস্তাধস্তির চিহ্নও আছে।

'পুলিশ ইনস্পেকটর গ্রেগরি লোকটা এমনিতে চালাকচতুর হলে কী হবে, কল্পনাকে খেলাতে জানে না— জানলে অনেক উঁচুতে উঠত। সে এলে ভিলা থেকে গলাবন্ধর মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। নাম তার ফিজরয় সিম্পসন। একের নম্বরের রেসুড়ে। লেখাপড়া শিখেছে, ভালো বংশে জন্মেছে। কিন্তু টাকাকড়ি সব ফুঁকে দিয়েছে রেসের মাঠে। এখন লন্ডনে স্পোর্টিং ক্লাবে

বুকির কাজ করে লুকিয়ে-চুরিয়ে। পাঁচ হাজার পাউন্ড বাজি ধরেছে যে-ঘোড়া জিতবে বলে মনে হয়েছে তার ওপর। ডার্টমুরে এসেছে কিংস পাইল্যান্ড আর কেপলটন আস্তাবলের ঘোড়া সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে। গত রাতে সে এইজন্যেই বেরিয়েছিল। এই পর্যন্ত সেসব কথা নিজেই বলেছে— লুকোছাপার ধার দিয়েও যায়নি। কিন্তু গলাবন্ধটা দেখেই মুখ আমসি হয়ে গিয়েছে। লোকটার জামাকাপড়ও বেশ ভিজে— রাত্রে ঝড় জলে বেরোনোর চিহ্ন। লাঠিটা সিসে দিয়ে ভারী করা— যার গায়ে মাথার খুলি গুঁড়ো করা সম্ভব।

'সিম্পসনের গায়ে কিন্তু ছুরির দাগ দেখা যায়নি। অথচ স্ট্রেকারের ছুরিতে রক্ত লেগেছিল— আততায়ীদের নিশ্চয় জখম করেছিল। ওয়াটসন, এই হল গিয়ে সমস্ত ব্যাপার। এবার বলো কী বুঝলে।'

'ধস্তাধস্তির সময়ে নিজের ছুরিতেই দাবনা চিরে ফেলেনি তো স্ট্রেকার?' বললাম আমি।

'খুব সম্ভব।'

'পুলিশ কী বলে?'

'পুলিশ বলছে, সিম্পসনই হান্টারকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, দোকড়া চাবি দিয়ে আস্তাবল খুলে সিলভার ব্লেজকে নিয়ে পালিয়েছে। ঘোড়ার সাজও পাওয়া যাচ্ছে না— নিশ্চয় পরিয়ে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময়ে মুখোমুখি হয়েছে জন স্ট্রেকারের সঙ্গে। ধস্তাধস্তির সময়ে স্ট্রেকার নিজেই নিজের ছুরিতে পা কেটেছে। সিম্পসনের লাঠিতে মাথা ভেঙেছে। ঘোড়াটা সেই সময়ে ভোঁ দৌড় দিয়ে জলার কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে— অথবা তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সবই অনুমান। অকুস্থলে না-গেলে বোঝা যাবে না আসল রহস্য।'

ট্যাভিসটক[৪] স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন কর্নেল রস আর ইনস্পেকটর গ্রেগরি। প্রথম জন চটপটে, খর্বকায়। দ্বিতীয়জন দীর্ঘকায়, মাথায় লম্বা চুল, নীল চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বিখ্যাত গোয়েন্দা।

ছাদখোলা ল্যান্ডো গাড়িতে[৫] যেতে যেতে গ্রেগরি বলে ওর ধারণা— চুপ করে শুনে গেলেন কর্নেল রস। মাঝে মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে লাগল হোমস।

গ্রেগরি বললে, 'সিম্পসনই আসামি।'

হোমস বললে, 'স্ট্রেকারের ছুরির ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়ায়?'

'নিজের ছুরিতেই চোট খেয়েছে পড়ে যাওয়ার সময়ে।'

'ওয়াটসনেরও তাই ধারণা। তবে কী জানো, আদালতে এ-কেস গেলে সিম্পসনের বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ তুমি পেয়েছ, সব নস্যাৎ হয়ে যাবে ধুরন্ধর আইনজ্ঞের জেরায়। প্রথমেই ধর না কেন, সিলভার ব্লেজকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কি? ওইখানেই জখম করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। তা ছাড়া দোকড়া চাবি কি পাওয়া গেছে সিম্পসনের কাছে? আফিং কিনেছিল কোন দোকান থেকে? সবচেয়ে বড়ো কথা, সিম্পসনকে এখানে কেউ চেনে না— কিন্তু সিলভার ব্লেজকে সবাই চেনে— তা সত্ত্বেও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাকে? এডিথ বলেছে, একটা কাগজ নাকি হান্টারকে দিতে চেয়েছিল সিম্পসন— কীসের কাগজ?

'দশ পাউন্ডের নোট— সিম্পসন নিজে বলেছে। মানিব্যাগেও পাওয়া গেছে একটা দশ পাউন্ডের নোট। আপনার অন্য যুক্তিগুলো অকাট্য নয়। চাবির কাজ ফুরিয়ে গেলে ছুড়ে ফেলে

দিয়েছে, ঘোড়াকে জলার মধ্যে কোনো পুরনো খনিতে লুকিয়ে রেখেছে, আফিং লন্ডন থেকে এনেছে। এ-জায়গাও তার কাছে খুব একটা নতুন নয়। এর আগেও দু-বার গরম কাটিয়ে গেছে।'

'গলাবন্ধটা?'

'ভুল করে ফেলে গিয়েছিল। আর ঘোড়া পাচার করে দেওয়া ব্যাপারেও নতুন খবর এনেছে।'

'কীরকম?' উৎকর্ণ হল হোমস।

'আস্তাবলের মাইলখানেকের মধ্যে সোমবার একদল জিপসি আড্ডা গেড়েছিল। খুনটা হয়ে যাওয়ার পরেই মঙ্গলবার তারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘোড়াটা তারাই নিশ্চয় নিয়ে গেছে সিম্পসনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।'

'কাছাকাছি আর একটা ট্রেনিং আস্তাবল আছে না?'

'কেপলটনের আস্তাবল। ওখানকার ঘোড়া ডেসবরোর ওপরেও বাজি ধরা হয়েছে বিস্তর— কিন্তু সিলভার ব্লেজের চেয়ে বেশি নয়। ডেসবরোর স্থান সেদিক দিয়ে দ্বিতীয়— সিলভার ব্লেজের প্রথম। কাজেই সিলভার ব্লেজ হারলে ওদের লাভ। স্ট্রেকারের সঙ্গে ওখানকার ট্রেনার সিলাজ ব্রাউনের খুব একটা বনিবনা ছিল না। ওখানেও হানা দিয়েছি— কিন্তু সিলাজ ব্রাউনকে এর মধ্যে টেনে আনবার মতো প্রমাণ পাইনি।'

'একই স্বার্থ নিয়ে সিম্পসন কেপলটন আস্তাবলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এমন কোনো নজির পাওয়া গেছে?'

'একদম না।'

কথা আর জমল না। গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইল হোমস। কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছোলাম একটা ছিমছাম লাল-ইটের তৈরি ভিলার সামনে। একটু তফাতে ধূসর টালি ছাওয়া বার-বাড়ি। চারদিকে ঢেউ-খেলানো জলাভূমি। অনেকদূরে দিগন্তরেখার কাছে ট্যাভিসটক গ্রামের গির্জার চুড়ো, পশ্চিমদিকে কেপলটন আস্তাবল। গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়লাম প্রত্যেকেই— হোমস বাদে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল তো রইলই। আমি বাহুস্পর্শ করতেই ভীষণ চমকে উঠে ধড়মড় করে নেমে এল নীচে।

দুই চোখে নিবিড় বিস্ময় নিয়ে কর্নেল রস তাকিয়ে আছেন দেখে হোমস বললে, 'দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম মশায়, কিছু মনে করবেন না।' আমি কিন্তু বন্ধুবরের চোখের দীপ্তি আর হাবভাবের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ করেই বুঝলাম— দিবাস্বপ্ন নয়, নিশ্চয় জবর সূত্র খুঁজে পেয়েছে সে। কিন্তু সূত্রটা যে কী, তা হাজার ভেবেও মাথায় আনতে পারলাম না।

'মি. হোমস, অকুস্থলে যাবেন তো?' গ্রেগরির প্রশ্ন।

'আগে দু-একটা কথা এখানেই জেনে নেওয়া যাক। স্ট্রেকারের লাশ কোথায়?'

'ওপরতলায়।'

'কর্নেল রস, স্ট্রেকার কদ্দিন কাজ করছে আপনার?'

'বারো বছর। পাঁচ বছর জকি হিসেবে, সাত বছর ট্রেনার হিসেবে। খুবই কাজের লোক।'

'স্ট্রেকারের পকেটের জিনিসগুলো কোথায়, ইনস্পেকটর?'

'বসবার ঘরে।'

'চলো তো দেখি।'

সামনের ঘরে ঢুকলাম সবাই। চৌকোনো টিনের বাক্সর তালা খুলে ইনস্পেকটর গ্রেগরি অনেকগুলো জিনিস রাখল টেবিলের ওপর। এক বাক্স মোমের দেশলাই, ছোট্ট একটা চর্বির মোমবাতি, একটা ব্রায়ার পাইপ, চামড়ার ব্যাগে আধ আউন্স ক্যাভেন্ডিস তামাক[৬], সোনার চেনে ঝোলানো রুপোর ঘড়ি, পাঁচটা মোহর, একটা অ্যালুমিনিয়ামের পেনসিল-বাক্স, কিছু কাগজ, কারুকার্য করা হাতির দাঁতের বাঁটওলা একটা অত্যন্ত মূল্যবান সূক্ষ্ম ছুরি— ফলা শক্ত— নোয়ানো যায় না।

উলটেপালটে ছুরিটা দেখে হোমস বললে, 'অসাধারণ ছুরি দেখছি। ফলায় রক্ত লেগে— তার মানে এই ছুরিও পাওয়া গেছে স্ট্রেকারের হাতের মুঠোয়। ওয়াটসন, দেখো তো ছুরিটা তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের এক্তিয়ারে পড়ে কি না!'

'এ তো ছানিকাটা ছুরি।'

'ঠিক ধরেছ। সূক্ষ্ম অপারেশনের উপযোগী করে ফলাটা এত সরু করা হয়েছে। কিন্তু যে-ছুরি মুড়ে পকেটে রাখা যায় না, সে-ছুরি পকেটে নিয়ে স্ট্রেকার বেরিয়েছিল কেন, এইটাই হল প্রশ্ন। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?'

গ্রেগরি বললে, 'খুব অদ্ভুত নয়। তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেয়েছে, তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। টেবিলেই পড়েছিল ক-দিন— মিসেস স্ট্রেকার দেখেছে। ডগায় একটা ছিপি লাগানো ছিল।'

'কাগজগুলো কীসের?'

'খড়বিচালির তিনটে রসিদ, একটা কর্নেল রসের নির্দেশলিপি, আর এটা একটা মেয়েদের পোশাকের হিসেব। দাম পঁয়ত্রিশ পাউন্ড পনেরো শিলিং। বিক্রি করেছে বন্ড স্ট্রিটের[৭] ম্যাডাম লেসুরিয়ার। কিনেছে উইলিয়াম ডার্বিশায়ার। মিসেস স্ট্রেকারের কাছে শুনেছি এই ভদ্রলোক জন স্ট্রেকারের বিশেষ বন্ধু— চিঠিপত্রও আসত জন স্ট্রেকারের ঠিকানায়।'

হিসেবটা দেখতে দেখতে হোমস বললে, 'ডার্বিশায়ার গিন্নির দামি জিনিস ছাড়া মন ওঠে না দেখছি। একটা পোশাক বাবদ বাইশটা গিনি নেহাত কম নয়। চলো, এবার অকুস্থলে যাওয়া যাক।'

গলিপথে বেরুতেই একজন স্ত্রীলোক এসে গ্রেগরির বাহুস্পর্শ করল। মুখটা উদ্‌বেগ উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্ত, বিশীর্ণ। সাম্প্রতিক বিভীষিকার ছাপ মুখের পরতে পরতে।

বললে হাঁফাতে হাঁফাতে, 'পেয়েছেন?'

'এখনও পাইনি, মিসেস স্ট্রেকার। তবে এবার একটা হিল্লে হবে। লন্ডন থেকে মি. হোমস এসে গেছেন।'

হোমস বলে উঠল, 'আরে মিসেস স্ট্রেকার যে, মনে পড়ে কিছুদিন আগে প্লিমাউথের একটা গার্ডেন পার্টিতে আলাপ হয়েছিল আমাদের?'

'আপনি ভুল করছেন।'

'সে কী কথা! কিন্তু আমার তো বেশ মনে আছে। অস্ট্রিচ-পালকের ঝালর দেওয়া একটা ভারি সুন্দর সিল্কের ড্রেস পরেছিলেন— রংটা গোলাপি ধূসর?'

'এ-রকম কোনো ড্রেস আমার নেই, স্যার।'

কাঁচুমাচু মুখে হোমস আমতা আমতা করে বেরিয়ে এল বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে সবাই পৌঁছোলাম অকুস্থলে। গর্তের মতো একটা জায়গা। ধারে হলদে ফুলের একটা ঝোপ। কোট পাওয়া গিয়েছিল এইখানেই। চেয়ে রইল হোমস। বললে, 'খুনের রাতে হাওয়ার তেমন জোর ছিল না, তাই না?'

'না। তবে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।'

'ওভারকোটটা তাহলে হাওয়ায় উড়ে আসেনি— ঝোপের ওপর খুলে রাখা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ তাই ছিল। ঝোপের ওপর পাতা ছিল।'

'কাদায় অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

'আমরা মাদুর পেতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'শাবাশ!'

'এই থলির মধ্যে সিলভার ব্লেজের পায়ের নাল, সিম্পসন আর স্ট্রেকারের জুতোর একটা করে পাটিও এনেছি।'

'সত্যিই গ্রেগরি, তোমার তুলনা হয় না!'

থলি নিয়ে গর্তের মতো জায়গাটায় নেমে গেল হোমস। মাদুরটাকে ঠেলে দিল মাঝামাঝি জায়গায়। উপুড় হয়ে শুল মাদুরের ওপর। দু-হাতে চিবুক রেখে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল পদদলিত কাদার দিকে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে, 'তোবা! তোবা! এ আবার কী?'

জিনিসটা একটা মোমের দেশলাই কাঠি। আধপোড়া। এত কাদা লেগেছে যে কাঠের টুকরো বলে মনে হচ্ছে।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল গ্রেগরির, 'আশ্চর্য! আমার চোখ এড়িয়ে গেল!'

'কাদায় ঢুকে ছিল বলে দেখতে পাওনি। কিন্তু আমি ঠিক এই জিনিসটাই খুঁজছিলাম বলে দেখতে পেয়েছি।'

'বলেন কী! আপনি জানতেন কাঠি দেখতে পাবেন?'

'সম্ভাবনা ছিল।' বলে থলি থেকে জুতো বার করে ছাপগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল হোমস। সর্বশেষে গর্তের কিনারায় হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এসে হাত পায়ে হামাগুড়ি মেরে এগিয়ে চলল ঝাউ আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে।

'আর ছাপ পাবেন না, মি. হোমস। চারদিকে এক-শো গজ পর্যন্ত জমি তল্লাশ করেছি আমি', বলল গ্রেগরি।

'তাই নাকি? তাহলে নতুন করে খোঁজার ধৃষ্টতা আর দেখাব না। ঘোড়ার নালটা পকেটে নিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পর্যন্ত জলায় একটু বেড়িয়ে নিই বরং— কপাল খুলে যেতে পারে।'

বন্ধুবরের ধীর স্থির পদ্ধতিমাফিক কাজকর্ম দেখতে দেখতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল কর্নেল রসের। ছটফট করছিলেন এতক্ষণ। এবার ঘড়ি দেখলেন।

বললেন, 'ইনস্পেকটর, আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে? আপনার পরামর্শ দরকার কয়েকটা ব্যাপারে— বিশেষ করে ওয়েসেক্স কাপ বাজি জেতার দৌড়ে। সিলভার ব্লেজ যে দৌড়োচ্ছে না— এটা জানিয়ে দেওয়া দরকার পাবলিককে।'

'কক্ষনো না!' জোর গলায় বললে হোমস। 'সিলভার ব্লেজ দৌড়োবে।'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন কর্নেল।

'আপনার অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ। হাওয়া খাওয়া শেষ হলে স্ট্রেকারের বাড়িতে আসবেন। ওখান থেকেই গাড়িতে ট্যাভিসটক ফিরব।'

বলেই, ইনস্পেকটরকে নিয়ে হনহন করে চলে গেলেন ভদ্রলোক। জলার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি আর হোমস। পড়ন্ত রোদে অপূর্ব লাগছে আশপাশের দৃশ্য। হোমস কিন্তু কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। ডুবে রয়েছে নিজের চিন্তায়।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বললে, 'ওয়াটসন, জন স্ট্রেকারকে কে খুন করেছে আপাতত তা নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে চলো ঘোড়াটার কী হল দেখা যাক। ধর, সিলভার ব্লেজ ছুটে পালিয়েছে। ঘোড়ারা কখনো দলছুট হয়ে একলা থাকে না— দলে ফিরে আসে। সেক্ষেত্রে সিলভার ব্লেজ ফাঁকা জলায় ঘুরে মরতে যাবে কেন? হয় কিংস পাইল্যান্ড না হয় কেপলটনের আস্তাবলে গিয়ে ভিড়বে। বেদেরা কখনোই এ-রকম বিখ্যাত ঘোড়া নিয়ে পুলিশের হামলায় যেতে চাইবে না— ওরা ঝঞ্ঝাট একদম পছন্দ করে না। বুঝলে?'

'সিলভার ব্লেজ তাহলে এখন কোথায়?'

'কিংস পাইল্যান্ড অথবা কেপলটন— এই দুটো আস্তাবলের একটায় তার ফেরা উচিত। প্রথমটায় সে যায়নি— তাহলে নিশ্চয় দ্বিতীয়টায় গিয়েছে। অনুমতিটা বাজিয়ে নেওয়া যাক। গ্রেগরি যেদিকে পায়ের ছাপ খুঁজেছে— সেদিকটা শুকনো খটখটে। কিন্তু কেপলটনের দিকে জমি ঢালু হয়ে গেছে, বৃষ্টির জলে কাদাও নিশ্চয় আছে। সিলভার ব্লেজ যদি ওইদিকেই গিয়ে থাকে, পায়ের ছাপ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

একটু খোঁজাখুঁজির পর সত্যিই দেখা গেল একসারি অশ্বখুর-চিহ্ন এগিয়ে গিয়েছে কাদাজমা গর্তের মতো একটা জায়গা দিয়ে। পকেট থেকে সিলভার ব্লেজের নাল বার করে মিলিয়ে দেখল হোমস— একই নালের ছাপ।

সোল্লাসে বললে হোমস, 'দেখলে তো? একেই বলে কল্পনার পুরস্কার। এই একটি ঘাটতি আছে গ্রেগরির ভেতরে! চলো, এগিয়ে দেখা যাক।'

কাদাটে গর্ত পেরিয়ে আবার সিকি মাইলটাক পথ শুকনো খটখটে মাটি মাড়িয়ে এলাম। আবার জমি ঢালু হয়েছে দেখা গেল। আবার কাদার ওপর পাওয়া গেল অশ্বখুর-চিহ্ন। তারপর আধ মাইল রাস্তায় কোনো চিহ্নই নেই। ফের পাওয়া গেল কেপলটনের আস্তাবলের কাছে। বিজয়োল্লাস দেখলাম হোমসের দুই চোখে। সিলভার ব্লেজ এবার একা নয়— পাশে একটা মানুষের পায়ের ছাপও পড়েছে।

'সে কী! এতক্ষণ তো একাই হেঁটেছে সিলভার ব্লেজ!' সবিস্ময়ে বললাম আমি।

'ঠিক কথা, ঠিক কথা! এতক্ষণ একা হেঁটেছে সিলভার ব্লেজ। আরে! আরে! এ আবার কী!'

যুগ্ম পদচিহ্ন সহসা মোড় ঘুরে কিংস পাইল্যান্ডের দিকে গিয়েছে। শিস দিয়ে উঠল হোমস। চললাম দুজনে মানুষ আর ঘোড়ার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যুগল পদচিহ্নকে ফের উলটোদিকে চলতে দেখে।

চললাম সেইদিকে। একটু পরেই এসে পড়লাম পিচ বাঁধানো রাস্তায়। সামনেই কেপলটন আস্তাবলের ফটক। ভেতর থেকে হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এল একজন, সহিস।

'কী চাই? কী চাই? ফালতু লোকের ঘোরাফেরা এখানে চলবে না।'

'তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাল ভোর পাঁচটায় এলে মি. সিলাজ ব্রাউনকে পাওয়া যাবে?'

'ভোরেই তো ওঠেন উনি। কিন্তু তার দরকার হবে না। ওই উনি আসছেন।'

সাঁই-সাঁই শব্দে চাবুক নাড়তে নাড়তে হনহন করে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে এল ভীষণদর্শন এক বয়স্ক পুরুষ।

'ডসন, কীসের আড্ডা হচ্ছে? যাও, নিজের কাজে যাও!— আপনারা এখানে কেন?'

'আপনার সঙ্গে মিনিট দশেক হাওয়া খেতে।' যেন মিছরি ঝরে পড়ল হোমসের বচনে।

'বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। ভাগুন বলছি। নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

গলা বাড়িয়ে ট্রেনারের কানে কানে কী যেন বলল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে আঁতকে উঠল সিলাজ ব্রাউন-- টকটকে লাল হয়ে গেল মুখখানা।

'মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা।'

'বেশ তো, মিথ্যেই যদি হয় তো তা নিয়ে খোলা জায়গায় তর্ক না-করে ভেতরে গেলে হয় না?'

'আসুন! আসুন!'

মুচকি হেসে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, মিনিট কয়েক দাঁড়াও এখানে— চলুন মি. ব্রাউন।'

ঠিক দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এল দুজনে। এইটুকু সময়ের মধ্যে সিলাজ ব্রাউনের মুখচ্ছবি আশ্চর্যভাবে পালটে গিয়েছে। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুখ, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে কপালে। হাতের চাবুক থর থর করে কাঁপছে হাওয়া-আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মতো। চোয়াড়ে মারকুটে চেহারা যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে, প্রভুভক্ত কুত্তার মতো ল্যাজ গুটিয়ে হাঁটছে হোমসের পাশে পাশে।

বললে কেঁউ কেঁউ করে, 'যা বললেন, ঠিক তাই হবে, স্যার।'

'ভুল যেন না হয়।' চোখে চোখ রেখে বললে হোমস। ইস্পাত-কঠিন চোখের সেই দৃষ্টি দেখে সিটিয়ে গেল বেচারি ব্রাউন।

'না, না, কোনো ভুল হবে না। সময়মতো হাজির থাকবে। পালটাব কখন? আগে, না পরে?'

ভেবে নিল হোমস। অট্টহেসে বললে, 'না। এখন কোনো পালটাপালটি নয়। চিঠি লিখে জানাব। কিন্তু যদি দেখি ওপরচালাকির তালে আছেন—'

'না, না। বিশ্বাস করুন আমি কথা দিচ্ছি।'

'ঠিক নিজের মতন যত্নআত্তি করা চাই।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

বলে, করমর্দনের জন্যে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল সিলাজ ব্রাউন। হোমস কিন্তু হাত ছুঁলো না— পেছন ফিরে পা বাড়াল কিংস পাইল্যান্ডের দিকে।

যেতে যেতে বললে, 'এ-রকম একটা কাপুরুষ, চোয়াড়ে আর ছিঁচকে আর দেখিনি।'

'ঘোড়া-চোর তাহলে সে?'

'মানতে কি আর চায়। কিন্তু নিশীথ রাতের কাণ্ডকারখানা যখন হুবহু বলে গেলাম, তখন ভাবল ওর সমস্ত কীর্তি আমি আড়াল থেকে দেখেছি। কাদার মধ্যে অদ্ভুত-মাথা চৌকোনা বুটের ছাপ তুমিও দেখেছ। ব্রাউনের বুটের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় সেই বুট। এ-রকম একটা কুকাজের ভার কেউ অধস্তন লোকের ওপর দেয় না— নিজেই সারে। সাক্ষী রাখে না। খুঁটিয়ে বললাম সে-রাতে কী ঘটেছিল। রাত থাকতে যার ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস, সে নিশ্চয় সেদিনও বিছানা ছেড়ে বেরিয়েছিল জলায়— এমন সময়ে দেখলে সিলভার ব্লেজ আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ঠিক করল, যেখানকার ঘোড়া সেখানেই রেখে আসবে। তাই লাগাম ধরে এগোল কিংস পাইল্যান্ডের দিকে। কিন্তু একটু যেতেই মাথায় ভূত চাপল। ঠিক করলে, ঘোড়দৌড়টা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক। তাই লুকিয়ে রাখল কেপলটনেই।'

'কিন্তু আস্তাবল তো দেখে গেছে গ্রেগরি।'

'আরে ভায়া, ঘোড়ার জালিয়াতিতে যারা হাত পাকিয়েছে, তারা জানে ঘোড়া কী করে লুকোতে হয়।'

'কিন্তু ওর কাছে এখন ঘোড়া রেখে দেওয়া কি ঠিক হল?'

'নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে ও এখন দরকার হলে ঘোড়াটাকেই মাথায় তুলে রাখবে।'

'কিন্তু কর্নেল রস ওর মাথা আস্ত রাখবে বলে মনে হয় না।'

'কর্নেল রস জানলে তো। আমি সরকারের নুন খাই না যে সব কথা বলতে হবে। তা ছাড়া কর্নেল লোকটা আমার সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি। কাজেই ওঁকে নিয়ে একটু মজা করব। ঘোড়া পাওয়া গেছে বলে ফেলো না যেন।'

'পাগল! এবার তাহলে স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবে তো?'

'আরে না। আজ রাতের ট্রেনেই লন্ডন ফিরব।'

মাথায় বাজ পড়লেও এতটা অবাক হতাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এসেছে ও ডেভনশায়ারে। এর মধ্যে তদন্ত ছেড়ে সরে পড়ার মতো কী এমন কারণ ঘটল মাথায় এল না। হোমসের মুখ থেকেও একটি কথাও আর বার করতে পারলাম না।

জন স্ট্রেকারের বাড়ির বারান্দায় দেখা গেল কর্নেল আর ইনস্পেকটরের সঙ্গে।

হোমস বললে, 'ডার্টমুরের চমৎকার বাতাস খুবই ভালো লাগল। মাঝরাতের এক্সপ্রেসে লন্ডন ফিরছি।'

দু-চোখ পুরো খুলে গেল ইনস্পেকটরের— অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকে গেল কর্নেলের।

বললেন, 'স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবার আশা তাহলে ছাড়লেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'একটু অসুবিধে হচ্ছে। আপনার জকি কিন্তু তৈরি রাখবেন— বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে সিলভার ব্লেজ। জন স্ট্রেকারের একটা ফটো পেতে পারি?'

পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল ইনস্পেকটর।

'মাই ডিয়ার গ্রেগরি— তোমার দূরদৃষ্টি দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। আমি কী চাই তা আগে থেকেই আঁচ করে রাখ। একটু দাঁড়াও, ঝি-টাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি।'

ঘর থেকে হোমস বেরিয়ে যেতেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্নেল বললেন, 'লন্ডন থেকে ডিটেকটিভ আনিয়ে পণ্ডশ্রম হল দেখছি।'

'ঘোড়া তো ফিরে পাচ্ছেন,' প্রতিবাদের সুরে বললাম আমি।

'আগে তো পাই', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন কর্নেল।

মুখের মতো জবাব দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা ঝুঁকে পড়ে আস্তাবলের ছোকরাটাকে হোমস জিজ্ঞেস করল, 'ভেড়াগুলোর দেখাশুনো করে কে?'

'আমি।'

'সম্প্রতি অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছ?'

'তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে।'

ভেড়াদের খোঁড়া হওয়ার ঘটনায় খুশি যেন উপচে পড়ল হোমসের চোখে-মুখে। খুকখুক করে শুকনো হেসে দু-হাত ঘষতে ঘষতে চিমটি কেটে বসল আমার হাতে।

বলল, 'দেখলে তো! অন্ধকারে ঢিল ছুড়লাম, ঠিক লাগল গায়ে! মাই ডিয়ার গ্রেগরি, ভেড়াদের এই অত্যাশ্চর্য মড়ক নিয়ে তুমি একটু তলিয়ে ভেবো। কোচোয়ান, চালাও জোরসে!'

বন্ধুবর সম্পর্কে কর্নেল রসের ধারণা যে কতখানি নেমে গেল এই উচ্ছ্বাসে, তা উৎকটভাবে প্রকট হল তাঁর চোখে-মুখে। কিন্তু গ্রেগরির চোখে যেন হিরের ঝিকিমিকি দেখলাম। নিঃসীম আগ্রহ আতশবাজির মতো ফেটে পড়ল চোখে-মুখে।

বলল, 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'আর কোনো ব্যাপারে আমাকে তলিয়ে ভেবে দেখতে হবে কি?'

'গভীর রাতে কুকুরটার কাণ্ডটা নিয়ে একটু ভেবো— সত্যিই অদ্ভুত।'

'কুকুর তো কিছু করেনি।'

'সেইটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার হে।'

চারদিন পর হোমসসহ গেলাম উইঞ্চেস্টার। সেখান থেকে কর্নেলের গাড়িতে রেসকোর্সে। ভদ্রলোক দেখলাম সাংঘাতিক গম্ভীর। ব্যবহারটাও রসকষহীন।

বললেন, 'ঘোড়ার ল্যাজ পর্যন্ত এখনও দেখলাম না।'

'দেখলে চিনতে পারবেন তো?' হোমসের প্রশ্ন।

ভীষণ রেগে গেলেন কর্নেল, 'বিশ বছর রেসকোর্সে আছি— আজ পর্যন্ত এ-কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমাকে। সিলভার ব্লেজের সাদা কপাল আর তার পায়ের দাগ দেখলে বাচ্চা ছেলেও চিনতে পারে।'

'কীরকম বাজি চলছে?'

'সেটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। গতকাল ও ছিল পনেরোতে এক। কমতে কমতে আজ দাঁড়িয়েছে তিনে এক।'

'হুম! তার মানে ভেতরের খবর কেউ রাখে মনে হচ্ছে!'

রেসকোর্সে ঘোড়ার নাম লেখা রয়েছে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম ছ-টা ঘোড়ার মধ্যে সিলভার ব্লেজের নামও রয়েছে। জকির মাথায় কালা টুপি, গায়ে লাল জ্যাকেট।

বললাম, 'ওই তো আপনার ঘোড়া দৌড়োচ্ছে।'

'কোথায়? দেখছি না তো?' আকাশ থেকে পড়লেন কর্নেল।

'নাম যখন আছে, ঘোড়াও আছে। পাঁচটা ঘোড়া গেল— এবারেরটা নিশ্চয় আপনার।'

মুখের কথা খসতে-না-খসতেই ওজন নেওয়ার ঘেরা জায়গা থেকে টগবগিয়ে বেরিয়ে এল একটা তেজি ঘোড়া— সামনে দিয়েই গেল— পিঠে কর্নেলের বহু পরিচিত লাল-কালো চিহ্ন।

'কক্ষনো না, এ-ঘোড়া আমার নয়,' তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন কর্নেল, 'এ কী করলেন মি. হোমস? এর গায়ের একটা লোমও তো দেখছি সাদা নয়।'

নির্বিকার কণ্ঠে হোমস বললে, 'দেখাই যাক না।' আমার দূরবিন টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দূরের দিকে। তারপর বলল, 'চমৎকার! শুরুটা চমৎকার হয়েছে! আসছে! আসছে! মোড় ঘুরে আসছে!'

গাড়িতে বসেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছ-টা ঘোড়া প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে সোজা ধেয়ে আসছে। কেপলটনের ঘোড়াটা এগিয়ে ছিল— কিন্তু মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ দমক মেরে কর্নেলের লাল-কালো ঘোড়া সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

এতক্ষণ দমবন্ধ করে বসে ছিলেন কর্নেল। এবার বিরাট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ! বাঁচলাম! আমার ঘোড়াই বাজিমাত করল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারছি না, মি. হোমস? রহস্য যে আর সইতে পারছি না?'

'এখুনি সব জানবেন, কর্নেল। চলুন, যাওয়া যাক আপনার ঘোড়ার কাছে,' ওজন নেওয়ার ঘেরা অঞ্চলে ঢুকলাম আমরা। 'মদ দিয়ে মুখ আর পা ধুইয়ে দিন, কর্নেল— সিলভার ব্লেজকে দেখতে পাবেন।'

'বলেন কী!'

'ঘোড়া জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিল সিলভার ব্লেজ— ওই অবস্থাতেই মাঠে নামিয়েছি।'

'মাই ডিয়ার স্যার, ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অশেষ উপকার করলেন আমার। এবার ধরিয়ে দিন জন স্ট্রেকারের খুনিকে।'

'ধরিয়ে তো দিয়েছি।' শান্তকণ্ঠ হোমসের।

আমি আর কর্নেল দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। সমস্বরে বললাম, 'কোথায় সে?'

'এখানেই।'

'এইখানে? কোথায়?'

'আমাদের সঙ্গে।'

রেগে গেলেন কর্নেল, 'দেখুন মশায়, উপকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু গাড়োয়ানি ইয়ার্কির সময় এটা নয়। যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছি আমি।'

হাসতে লাগল শার্লক হোমস।

বললে, 'কর্নেল, আপনাকে খুনি ঠাউরেছি এটা কেন ভাবছেন? আসল খুনি দাঁড়িয়ে আপনার ঠিক পেছনে!'

বলে হাত বুলোতে লাগল সিলভার ব্লেজের চকচকে ঘাড়ে।

'সিলভার ব্লেজ!'

যুগপৎ চিৎকার করে উঠলাম আমি আর কর্নেল।

'হ্যাঁ, সিলভার ব্লেজ। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই ট্রেনারকে খুন করতে হয়েছে তাকে। জন স্ট্রেকার লোকটা পয়লা নম্বর নেমকহারাম। যাক গে, ঘণ্টা বেজে গেল। পরের ঘোড়াগুলির দৌড় আগে দেখি, ব্যাখ্যানা পরে হবে'খন।'

লন্ডন ফেরার পথে চলন্ত পুলম্যান গাড়ির[৮] কোনায় বসে হোমসের মুখে আমি আর কর্নেল শুনলাম রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিচিত্র কাহিনি। সময় যে কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেও পারলাম না।

'খবরের কাগজ পড়ে যা ভেবেছিলাম, এখানে পৌঁছোনোর পর দেখলাম, তা ভুল। ভেবেছিলাম, ফিজরয় সিম্পসন নাটের গুরু। পরে দেখলাম তার বিপক্ষে প্রমাণ নেই। জন স্ট্রেকারের বাড়ি যাওয়ার সময়ে হঠাৎ চোখ খুলে গেল আমার। মনে আছে নিশ্চয় এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে তোমরা সবাই নেমে পড়েছিলে গাড়ি থেকে— আমার একদম খেয়াল ছিল না— বসেই ছিলাম। আসলে কী হয়েছে জান, মাটনকারির অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, অথচ অত্যন্ত সহজ সূত্রটা কেন যে আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল অবাক হয়ে তাই ভাবছিলাম।'

কর্নেল সোৎসাহে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যেন কীরকম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাটনকারির সঙ্গে এ-ব্যাপারের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না তো।'

'আমার যুক্তি-শৃঙ্খলের পয়লা-নম্বর আংটা হল মাটনকারি। গুঁড়ো আফিম স্বাদহীন হয় না কখনোই। গন্ধটা যাচ্ছেতাই না-হলেও, ধরা যায়। মামুলি খাবারে মেশালে জিভে ধরা পড়বেই, যাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সে আর নাও খেতে পারে। কিন্তু মাটনকারিতে মেশালে ধরা যায় না, আফিম মেশানোর আদর্শ রান্না হল মাংসের ঝোল। স্বাদ একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়। স্ট্রেকার পরিবারে মাংসের ঝোল পরিবেশন করা ফিজরয় সিম্পসনের মতো আগন্তুকের পক্ষে সম্ভব নয় কোনোমতেই। ঠিক যে-রাতে মাংস রান্না হয়েছে, সেই রাতেই সে লন্ডন থেকে আফিমের গুঁড়ো পকেটে করে নিয়ে আসবে, এটা একটা অসম্ভব কাকতালীয়, হতেই পারে না। বাকি রইল তাহলে দুজন— স্ট্রেকার আর তার স্ত্রী ছাড়া মাটনকারির আয়োজন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আস্তাবলের ছেলেটার খাবারেই কেবল আফিম মেশানো হয়েছে, বাড়ির লোকের মাংসে নয়। এডিথ দেখেনি কে মিশিয়েছে। তাহলে সে কে?

'আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল কুকুরটার চুপ করে থাকাটা। রাতদুপুরে আস্তাবলে ঢুকে সিলভার ব্লেজকে বার করে আনা হয়েছে অথচ কুকুরের কাজ কুকুর করেনি, একদম হাঁকডাক করেনি। তার মানে কি এই নয় যে ঘোড়া নিয়ে গেছে, কুকুর তাকে চেনে?

'সেইজন্যেই অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, মাঝরাতের নিশিকুটুম্বটি আসলে জন স্ট্রেকার স্বয়ং। মাটনকারিতে আফিম সে-ই মিশিয়েছে। ঘোড়াও সে বার করেছে। কিন্তু কেন? অনেক সময়ে দেখা গেছে, ট্রেনাররা টাকার লোভে ভালো ঘোড়াকে খুব সূক্ষ্মভাবে খারাপ করে দেয়। কখনো কখনো জকির হাতও থাকে এই ষড়যন্ত্রে। এমনভাবে এই কাজ করা হয় যে ধরা মুশকিল। তাই কী-কী জিনিস পকেটে নিয়ে নিশীথ অভিযানে বেরিয়েছিল জন স্ট্রেকার, দেখতে চেয়েছিলাম।

'পকেটে পেলাম আশ্চর্য সেই ছুরি, যা ভাঁজ করে পকেটে রাখা যায় না, মারপিটের সম্ভাবনায় যে ছুরি পকেটে নিয়ে কেউ বেরোয় না। ওয়াটসন ডাক্তার মানুষ, সে বলল এ-ছুরি চোখের ছানিকাটার মতো সূক্ষ্ম কাজে লাগে[৯]। কর্নেল রস, আপনি নিশ্চয় জানেন, ঘোড়ার পেছনের

পায়ের টেন্ডন সামান্য একটু চিরে দিলে ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যায়। মনে হয় যেন বেশি প্র্যাকটিস করেছে বা বাত হয়েছে বলে খোঁড়াচ্ছে, কুকীর্তিটা কখনোই ধরা পড়ে না।

এই পর্যন্ত শুনেই 'স্কাউন্ড্রেল, ভিলেন' বলে চিৎকার করে উঠলেন কর্নেল।

হোমস বললে, 'এই কারণেই ঘোড়া নিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়েছিল স্ট্রেকার। আস্তাবলের ভেতরে খোঁচাখুঁচি করতে গেলে দাপাদাপির ঠেলায় ঘুম ভেঙে যেত প্রত্যেকের।'

'মোমবাতি আর দেশলাই সঙ্গে নিয়েছিল সেই কারণেই', রাগে আগুন হয়ে বললেন কর্নেল।

'হ্যাঁ। পকেটে পাওয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করেই বোঝা গেল যে কতখানি নীচে সে নেমেছে। অন্যের রসিদ কেউ পকেটে নিয়ে বেড়ায় না। একটা দামি মেয়েদের ড্রেসের রসিদ তার পকেটে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম, এর ভেতরে বাইরের মেয়ে আছে। তার পেছনে টাকা ওড়াতে হচ্ছে স্ট্রেকারকে। বিশ গিনির ড্রেস স্ট্রেকার-গৃহিণী পরে কি না, কায়দা করে জেনে নিলাম। সে বেচারি চোখেও কখনো দেখেনি এত দামি ড্রেস। অর্থাৎ মি. ডার্বিশায়ার নামক লোকটা স্ট্রেকারের বন্ধু নয়, সে নিজে। স্ট্রেকারের ছবি নিয়ে পোশাক যে-দোকানে বিক্রি হয়েছে গেলাম সেখানে, তারাও বললে এই হল মি. ডার্বিশায়ার।

'এবার সব স্পষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে পালাতে গিয়ে সিম্পসন বেচারি গলাবন্ধ ফেলে গিয়েছিল। সেইটা কুড়িয়ে পায় স্ট্রেকার। ভেবেছিল তাই দিয়ে সিলভার ব্লেজের পেছনের পা জোড়া বেঁধে ছুরি চালাবে। কিন্তু ঘোড়াদের অদ্ভুত সহজাত অনুভূতি থাকে— আসন্ন বিপদ ওরা আঁচ করতে পারে। অথবা হয়তো হঠাৎ আলোর ঝলক দেখে চমকে উঠে লাথি মারে জোড়া পায়ে—সজোরে লাগে স্ট্রেকারের কপালে— লোহার নাল লাগানো তেজিয়ান ঘোড়ার চাট বড়ো সোজা কথা নয়— গুঁড়িয়ে যায় স্ট্রেকারের খুলি। ওভারকোট খুলে ঝোপে রেখেছিল কাজের সুবিধের জন্যে— ফলে আচমকা চাট খেয়ে হাতের ছুরি গিয়ে লাগল নিজের উরুতে।

'তারপর একটু আন্দাজে ঢিল ছুড়ে সিদ্ধান্তটা যাচাই করে নিলাম। ঘোড়ার টেন্ডন চেরবার আগে নিশ্চয় হাত পাকিয়েছে স্ট্রেকার। ভেড়াগুলো দেখে মনে হল এদের ওপর প্র্যাকটিস করেনি তো? জিজ্ঞেস করতেই সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। সত্যিই হঠাৎ তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে।'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু সিলভার ব্লেজকে পেলেন কোত্থেকে?'

'আরে মশাই, ছিল কোনো প্রতিবেশীর কাছে। ভালোই ছিল।— এই তো ক্ল্যাপহ্যাম জংশন এসে গেল। ভিক্টোরিয়া পৌঁছোব[১০] দশ মিনিটেই। কর্নেল, গরিবের বাড়িতে যদি পায়ের ধুলো দেন, তাহলে চুরুট খেতে খেতে না হয় আরও কিছু শুনে যাবেন।'

টীকা

১. **ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ** : 'সিলভার ব্লেজ' লন্ডনের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯২ সংখ্যায়, নিউইয়র্কে মুদ্রিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়।

২. **ডার্টমুরে** : দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলন্ডের ডেভনশায়ারের অন্তর্গত ডার্টমুর প্রধানত গঠিত জলাভূমি এবং 'টর' নামে পরিচিত গ্রানাইট পাথরের ছোটো বড়ো বিস্তর টিলা নিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখানে লৌহযুগ এবং ব্রোঞ্জযুগে মানুষের

অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে। শার্লক হোমসের বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস'-এর পটভূমিও ডার্টমুরে। স্যাক্সনদের রাজত্বকালে ডার্টমুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে এখানে একটি কারাগার নির্মিত হয়। ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দিদের রাখা হত সেই কারাগারে।

৩. **ঘোড়ার দালাল :** এদের কাজ হল রেসের ঘোড়ার হালহকিকত সম্পর্কে আগাম খবর জোগাড় করে, তা অর্থের বিনিময়ে রেসুড়ে জুয়াড়িদের জানিয়ে বাজি ধরতে সাহায্য করা।

৪. **ট্যাভিসটক :** ডার্টমুরের পশ্চিমতম প্রান্তে ট্যাভিসটকের অবস্থান।

৫. **ল্যান্ডো :** চারটি চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা গাড়ি। এই গাড়ির ছাদ প্রয়োজনমতো বন্ধ করা বা খুলে রাখা যেত। আবার সওয়ারির ইচ্ছে হলে আধখোলাও রাখা যেত।

৬. **ক্যাভেন্ডিস তামাক :** ক্যাভেন্ডিস নামক কোম্পানি এই তামাক বিক্রি করত ডেলাকৃত টুকরো অবস্থায়।

৭. **বন্ড স্ট্রিটের :** দুটি বন্ড স্ট্রিটের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওল্ড বন্ড স্ট্রিট এবং নিউ বন্ড স্ট্রিট। হাল ফ্যাশনের পোশাক এবং ছবির গ্যালারির জন্য বিখ্যাত নিউ বন্ড স্ট্রিট।

৮. **পুলম্যান গাড়ি :** রাত্রে শুয়ে ভ্রমণ করবার উপযুক্ত রেল-কামরার নাম 'পুলম্যান কোচ' হয়েছিল যিনি এই গাড়ির নকশা করেন। সেই আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার জর্জ মর্টিমার পুলম্যানের (১৮৩১-১৮৯৭) নামে।

৯. **এ-ছুরি চোখের ছানি কাটার মতো সূক্ষ্ম কাজে লাগে :** বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ছানি কাটার ছুরি এতই পাতলা যে তা দিয়ে ঘোড়ার পায়ের টেন্ডন বা অন্য যেকোনো পেশিতে কোনো ক্ষত সৃষ্টি করা অসম্ভব।

১০. **ভিক্টোরিয়া পৌঁছোব :** এই গল্পর ঘটনার সময়ে কোনো ট্রেন উইনচেস্টার থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আসত না। আসত ওয়াটারলু স্টেশনে।

লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি[১]

[দ্য কার্ডবোর্ড বক্স]

শার্লক হোমসের কাহিনি নির্বাচন করতে গিয়ে একটা বিষয়ে সজাগ থেকেছি বরাবর। চাঞ্চল্যকর ঘটনা যথাসম্ভব পরিহার করেছি— এমন কীর্তিকাহিনি লিখেছি যার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে— আমার এই আশ্চর্য বন্ধুটির অসাধারণ প্রতিভা। সবসময়ে অবশ্য তা সম্ভব হয় না— নইলে সত্যের অপলাপ হয়। নীচের লোমহর্ষক অদ্ভুত ঘটনাটি এইরকমই একটি কাহিনি।

অগাস্টের এক তপ্ত দিবস।* বেকার স্ট্রিটে গা ঢেলে বসে আছি আমি আর হোমস। আফগানিস্তানে থাকার ফলে গরম আমার গা-সওয়া। হোমস কিন্তু সোফায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে সকালের ডাকে আসা একটা চিঠি— বার বার পড়ে চলেছে।

এই সময়ে হোমস আমাকে চমকে দিলে মনে মনে কী ভাবছি তার হুবহু বর্ণনা দিয়ে। পরে

---

* কন্যান ডয়ালও ভুল করলেন। 'মেমোয়্যার্স অফ শার্লক হোমস' গ্রন্থে 'রেসিডেন্ট পেশেন্ট' গল্পের শুরু করেছেন হুবহু এইভাবে। 'অগাস্টের এক তপ্ত দিবস' না-বলে আরম্ভ করেছেন 'অগাস্টের এক বাদলা দিন' বলে। তারপর হোমসের পর্যবেক্ষণ শক্তির নমুনা দেখাতে গিয়ে যে-ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, সেটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় বর্তমান কাহিনির সঙ্গে। খুবই আশ্চর্য ভুল। কী করে ডয়ালের চোখ এড়িয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে না। পুনরুক্তি করলাম না সেই কারণেই। অনুগ্রহ করে পাঠক রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পটিকে দেখে নেবেন। অনুবাদক

অবশ্য বুঝিয়ে দিলে কী করে তা বুঝল শুধু আমার মুখের ভাব আর চোখের চাউনি অনুধাবন করে। (রেসিডেন্ট পেশেন্ট কাহিনি দ্রষ্টব্য।[২])

তারপর বললে, 'এই তো গেল আমার চিন্তা পঠন বিদ্যার নমুনা। কিন্তু আজ সকালের খবরের কাগজে একটা আশ্চর্য কার্ডবোর্ড বাক্সর যে-খবরটা বেরিয়েছে, তা এত সহজে সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না। ক্রয়ডনের ক্রসস্ট্রিট নিবাসিনী মিস কাশিং ডাকে পেয়েছেন বাক্সটা। দেখেছ?'

'না তো।'

'এই নাও। জোরে পড়ো' বলে সেদিনের খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল হোমস। আমি পড়লাম :

লোমহর্ষক প্যাকেট

ক্রয়ডনের[৩] ক্রসস্ট্রিট নিবাসিনী মিস সুশান কাশিংয়ের সঙ্গে অত্যন্ত বিটকেল ধরনের একটা গাড়োয়ানি ইয়ার্কির খবর পাওয়া গেছে— নিছক রঙ্গ না হয়ে এর পেছনে কুটিল কোনো ষড়যন্ত্র থাকাও বিচিত্র নয়। গতকাল দুপুর দুটোয় ডাকপিয়োন ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট প্যাকেট দিয়ে যায় তাঁকে। মোটা দানার নুন ঠাসা একটা কার্ডবোর্ড বাক্স ছিল ভেতরে। বাক্স খুলে মিস কাশিং আঁতকে ওঠেন মানুষের সদ্যকাটা দুটি কান দেখে। তার আগের দিন সকাল নাগাদ বেলফাস্ট থেকে পাঠানো হয়েছে বাক্সটা। মিস কাশিং পঞ্চাশ বছরের অনূঢ় মহিলা, একা থাকেন, আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব বলতে গেলে কেউ নেই— বাক্সটাকে কে পাঠিয়েছে তাই ধরা যাচ্ছে না। বছর কয়েক আগে পেঞ্জেতে[৪] থাকবার সময়ে উনি তিনজন ডাক্তার ছাত্রকে ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বের করে দেন বাড়ি থেকে। পুলিশের সন্দেহ এই তিন ছোকরাই লাশ কাটা ঘর থেকে এই দুটি কান সংগ্রহ করে মিস কাশিংকে পাঠিয়েছে ধাত ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। এই অনুমানের খানিকটা সম্ভাবনা আছে একটা কারণে : তিন বিটলের মধ্যে একজন নাকি উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের মানুষ— মিস কাশিংয়ের যদ্দূর জানা আছে— বেলফাস্টে থাকে। ইত্যবসরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অন্যতম সুদক্ষ চৌকস ডিটেকটিভ— মি. লেসট্রেড তদন্তভার গ্রহণ করেছেন এবং তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।

পড়া শেষ হল। হোমস বললে, 'এই গেল গিয়ে ডেলি ক্রনিকল্‌-এর খবর। লেসট্রেডের কাছ থেকে আজ সকালে একটা চিরকুট পেয়েছি। ও লিখেছে : "কেসটা খুবই সহজ বলে মনে হয়, নিজেরাই ফয়সালা করে ফেলব এ-বিশ্বাস আছে— কিন্তু কোত্থেকে শুরু করব এই নিয়ে একটু ধাঁধায় পড়েছি। বেলফাস্টে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম পার্সেলটা পাঠিয়েছে কোন মহাপ্রভু— কিন্তু সারাদিন এত পার্সেল ওদের ওখানে জমা পড়ে যে বিশেষ এই পার্সেল কে এনেছে, তা তাদের মনে নেই। শনাক্ত করাও সম্ভব নয়। হানিডিউ তামাকের[৫] আধ পাউন্ড বাক্স এটা— দেখে কিছুই ধরা যাচ্ছে না। ডাক্তারি ছাত্রদের অনুমিতিটা আমার কাছে খুবই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি ঘণ্টাকয়েক সময় খরচ করতে পারেন— তাহলে আপনার সঙ্গে একটু বসা যেত। আমি সারাদিন হয় অফিস, নয় বাড়িতে থাকব।"

'কী হে ওয়াটসন, যাবে নাকি? না, গরমে বসে বসে ঝিমোবে?'

'কিছু একটা করার জন্যে উশখুশ করছি অনেকক্ষণ থেকে।'

'তাহলে ঘণ্টা বাজিয়ে বুট আনাও, গাড়ি ডাকতে বলো। আমি ড্রেসিং গাউন পালটে চুরুটের বাক্সটা ভরে এলাম বলে।'

ট্রেনে যাওয়ার সময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। ক্রয়ডন পৌঁছে দেখলাম লন্ডনের মতো অত ভ্যাপসা গরম নয় ওখানে। চির চটপটে লেসট্রেড হাজির ছিল স্টেশনে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে পৌঁছে গেলাম ক্রসস্ট্রিটে মিস কাশিংয়ের বাড়িতে।

দু-পাশে ইটের তৈরি দোতলা বাড়ির দীর্ঘ সারি। একটা দরজায় টোকা মারতেই কমবয়েসি ঝি এসে দরজা খুলে দিল— নিয়ে গেল সামনের ঘরে। মিস কাশিং কোলের ওপর কাজ করা চাদর বিছিয়ে বসে ছিল— পাশের টুলে বাস্কেট বোঝাই রঙিন সিল্ক। ভদ্রমহিলার মুখটি ধীর, শান্ত; চোখ দুটি নিস্তরঙ্গ, বিশাল মাথার দু-পাশ দিয়ে ঝুলছে তেল চকচকে চুলের রাশি।

লেসট্রেড ঘরে ঢুকতেই বললে, 'বিকট বাক্সটা বারবাড়িতে আছে। দয়া করে নিয়ে যাবেন।'

'নিশ্চয় নিয়ে যাব মিস কাশিং। এখানে রেখেছিলাম আপনার সাক্ষাতে মিস্টার শার্লক হোমসকে দেখাব বলে।'

'আমার সাক্ষাতে কেন?'

'প্রশ্ন যদি করতে চান, তাই।'

'বললাম তো কিছু জানি না। প্রশ্ন করে কী হবে?'

স্নিগ্ধকণ্ঠে হোমস বললে, 'ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। দেখতেই পাচ্ছি দারুণ বিচলিত হয়েছেন— তাই আর এ নিয়ে কথাবার্তা চাইছেন না।'

'দেখুন মশাই, আমি নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করি। কারো সাতেপাঁচে থাকি না। খবরের কাগজে আমার নাম বেরোক এ আমি চাই না। পুলিশের হাঙ্গামাও আমার দু-চোখের বিষ। মি. লেসট্রেড, আপনি বারবাড়িতে গিয়ে ওগুলো দেখুন।'

বাড়ির পেছনে ছোটো বাগানের শেষে একটা ছাউনিতে ঢুকল লেসট্রেড। বেরিয়ে এল একটা কার্ডবোর্ড বাক্স, খানিকটা ব্রাউন কাগজ, আর একটা সুতো নিয়ে। বাগানের বেঞ্চিতে বসে জিনিসগুলো একে একে পরীক্ষা করল হোমস।

আলোর দিকে সুতোটা তুলে গন্ধ শুঁকল। বলল, 'খুবই ইন্টারেস্টিং বস্তু। লেসট্রেড, কী বুঝলে?'

'আলকাতরা মাখানো হয়েছে সুতোটায়।'

'হ্যাঁ, আলকাতরায় ডোবানো টোয়াইন সুতো! কাঁচি দিয়ে কেটেছেন মিস কাশিং— দেখছ না একদিকে দু-বার শুঁয়ো উঠে রয়েছে।'

'গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।'

'কোনো গুরুত্বই চোখে পড়ছে না আমার', বললে লেসট্রেড।

'গিঁটটা খোলা হয়নি এবং সেইজন্যেই দেখা যাচ্ছে গিঁটের বিচিত্র চেহারা— পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণেই।'

নির্বিকারভাবে লেসট্রেড বললে, 'তাও দেখেছি। চমৎকারভাবে বাঁধা হয়েছে গিঁটটা।'

হাসল হোমস। বলল, 'সুতো পর্ব তাহলে এখানেই শেষ হল। এবার ব্রাউন কাগজ। কফির

গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে জাবড়াভাবে : 'মিস এস কাশিং, ক্রসস্ট্রিট, ক্রয়ডন।' খুব সম্ভব নিব বা ওই জাতীয় চওড়া মুখ নিব দিয়ে লেখা— কালিটা খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণির। ক্রয়ডন বানান লিখতে গিয়ে মাঝখানে আগে লিখে পরে কেটে লেখা হয়েছে। কাজেই পার্সেল যে পাঠিয়েছে সে একজন বেটাছেলে— পুরুষালি লেখাটাই তার প্রমাণ— পেটে বিদ্যে তেমন নেই, ক্রয়ডনে নতুন এসেছে বলেই শহরের বানানটা পর্যন্ত জানে না। বাক্সটা হলুদ রঙের, হানিডিউ তামাকের আধ পাউন্ড বাক্স, বাঁ-দিকের কোণে স্পষ্ট দুটো আঙুলের ছাপ। পশু চামড়া সংরক্ষণের জন্যে যে ধরনের মোটা দানার নুন ব্যবহার করা হয়, বাক্সের মধ্যেও সেই সস্তা নুন ঠাসা হয়েছে।'

বলতে বলতে বাক্স থেকে ভয়ংকর বস্তু দুটো বার করে কোলের ওপর রাখল হোমস। চেয়ে রইল নির্নিমেষে। দু-পাশ থেকে চেয়ে রইলাম আমি আর লেসট্রেড। কান কেটে উপহার পাঠানোর মতো বদ রসিকতা যে করতে পারে, সে যে কী ধরনের রসিক ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে কান দুটো বাক্সতে ভরে ধ্যানস্থ হয়ে চেয়ে রইল হোমস।

অবশেষে বলল, 'লক্ষ করেছ নিশ্চয় কান দুটো দুজন লোকের— একজনের নয়?'

'করেছি। লাশটাকে ঘর থেকে জোগাড় করা হয়েছে তো। দুজনের দুটো কান জোগাড় করা ওদের পক্ষেই সম্ভব।'

'লেসট্রেড এর মধ্যে ইয়ার্কি-টিয়ার্কি একদম নেই।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'ডিসেকটিং রুম[৬]-এ এ-কান যদি কাটা হত, তাহলে এর গায়ে আরক লেগে থাকত। যাতে পচে না-যায় তাই আরক ডুবিয়ে রাখার নিয়ম আছে ডিসেকটিং রুমে। তা যখন নেই, তখন কোনো ডাক্তারি ছাত্র এর মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া কান কাটা হয়েছে ভোঁতা ছুরি দিয়ে, ডাক্তারি ছাত্র হলে ধারালো ছুরি দিয়ে কাটত। তারপর কার্বলিক বা রেক্টিফায়েড স্পিরিটে ডুবিয়ে রেখে কান পাঠাত— নুনের মধ্যে করে পাঠাত না। না হে না, এর পেছনে ইয়ার্কি নেই— আছে একটা পৈশাচিক অপরাধ।'

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বন্ধুবরের চেয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে লক্ষ করলাম। লেসট্রেড কিন্তু পুরো বিশ্বাস করতে পারল না।

বলল, 'ঠাট্টা যদি কেউ না করে তো অপরাধই-বা করতে যাবে কেন? ভদ্রমহিলা পেঞ্জেতে নির্ঝঞ্ঝাটে থেকেছেন অনেক দিন। এখানেও আছেন বিশ বছর— একদিনের জন্যেও বাড়ি ছাড়া হননি। অন্যের কান কেটে তাঁকে পাঠিয়ে কার কী লাভ বলতে পারেন? মুখ দেখে বুঝছেন না আমাদের মতোই উনিও অন্ধকারে? বড়ো দরের অভিনেত্রী হলে অবশ্য আলাদা কথা।'

হোমস বললে, 'আমি কিন্তু তদন্ত শুরু করব ডবল মার্ডারের ভিত্তিতে। একজন পুরুষ আর একজন নারীকে খুন করা হয়েছে। একটা কান ছোটো, নিখুঁত। লতিতে দুল পরার ছ্যাঁদা— অর্থাৎ কোনো মেয়ের কান। আর একটা কানেও ছ্যাঁদা আছে রিং পরানোর জন্যে— কিন্তু রোদে পোড়া বেটাছেলের কান। দুজনেই এখন পরলোকে ধরে নিতে পারি— নইলে কান কাটাদের খবর অনেক আগেই কানে আসত। আজ হল শুক্রবার— প্যাকেট পাঠানো হয়েছে বেস্পতিবার সকালে। খুনটা হয়েছে বুধবার কি মঙ্গলবার— কি তারও আগে। খুন যে করেছে কান দুটো

সে-ই উপহার পাঠিয়েছে মিস কাশিংকে— সে ছাড়া অন্য কেউ পাঠাতে যাবে কেন বলতে পার? পার্সেল যে পাঠিয়েছে, খুনও সে-ই করেছে ধরে নিতে পার। কিন্তু মিস কাশিংকে এ-রকম উপহার পাঠানোর পেছনে জবরদস্ত কারণ একটা নিশ্চয় আছে। কী সেই কারণ? কাম ফতে— এইটাই কি জানতে চেয়েছে খুনি? না, শুধুই মানসিক যন্ত্রণা দিতে চেয়েছে? তাহলে তো মিস কাশিংয়ের জানা উচিত লোকটাকে। কিন্তু সত্যিই কি জানেন উনি? সন্দেহ আছে— আমার। জানলে কি পুলিশ ডেকে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে যেতেন? কান দুটো কোথাও পুঁতে ফেললেই ল্যাটা চুকে যেত— কাকপক্ষীও টের পেত না। ক্রিমিনালকে আড়াল করতে চাইলে ঠিক এমনটিই করতেন মিস কাশিং। আড়াল করতে যদি না-চাইতেন, লোকটার নামটা তাহলে বলতেন। এই জটটা আগে পরিষ্কার করা দরকার।' বাগানের বেড়ার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে এতক্ষণ উচ্চ দ্রুত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছিল হোমস। এবার তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

বললে, 'মিস কাশিংকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

লেসট্রেড বললে, 'আমি তাহলে ফাঁড়িতে চললাম। ওঁকে আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই আমার।'

'স্টেশনে যাওয়ার পথে দেখা করে যাব,' বলে হোমস ঢুকল সামনের ঘরে। উদাসীন ভদ্রমহিলার কোলের ওপর চাদর রেখে তখনও ছুঁচের কাজ করছিল তন্ময় হয়ে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সরল নীল চোখে জিজ্ঞাসা তুলে ধরে তাকাল আমাদের পানে।

বলল, 'পুলিশ ভদ্রলোককে বার বার বলেছি, নিশ্চয় কেউ ভুল করে পার্সেলটা পাঠিয়েছে আমাকে। উনি কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় আমার শত্রু বলে কেউ নেই— কাটা কান পাঠিয়ে রগড় করার মতো কাউকেই জানি না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলে ভদ্রমহিলার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল হোমস। এবং আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ওর কাণ্ড দেখে। তন্ময় হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল মিস কাশিংয়ের মুখশ্রী। যুগপৎ বিস্ময় আর সন্তোষ নৃত্য করে উঠল ওর তীক্ষ্ণ চোখে। হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ দেখার জন্যে মিস কাশিং ঘাড় ঘোরানোর সঙ্গেসঙ্গেই কিন্তু ফের নির্বিকার হয়ে গেল শার্লক হোমস। ভদ্রমহিলার শান্ত মুখশ্রী, তেল চকচকে পরিষ্কার আঁচড়ানো চুল, কানের লতিতে গিল্টি করা ছোটো ইয়ার-রিং দেখে আমি কিন্তু বুঝে উঠলাম না অকস্মাৎ এত উত্তেজিত হল কেন হোমস।

'দুটো প্রশ্ন আছে—'

'আবার প্রশ্ন!' খেঁকিয়ে উঠল মিস কাশিং।

'আপনার দুজন বোন আছে, তাই না?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'ঘরে ঢুকেই জেনেছি। ম্যান্টলপিসের ছবিতে তিন মহিলার একজন আপনি— বাকি দুজন নির্ঘাত আপনার আত্মীয়া— চেহারায় মিল রয়েছে।'

'ঠিক ধরেছেন। সারা আর মেরি আমার বোনই বটে।'

'আমার কনুইয়ের কাছে এই যে একটা ফটো দেখছি, এটি কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় আপনার ছোটো বোনের ছবি। স্টুয়ার্ডের ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আপনার চোখ তো দেখছি খুব ধারালো।'

'আমার ব্যাবসাই যে তাই।'

'ওই ছবি তোলার দিনকয়েক পরেই বিয়ে হয়ে যায় ওদের। মি. ব্রাউনার তখন সাউথ আমেরিকান জাহাজে কাজ করত। কিন্তু বউ অন্ত প্রাণ হওয়ায় সে চাকরি ছেড়ে লিভারপুল-লন্ডনে জাহাজে কাজ নেয়।'

'কনকারার জাহাজে নিশ্চয়?'

'না, মে-ডে জাহাজে[৭]। একবার এখানে এসেছিল জিম আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তারপর মদ ধরল। পেটে একটু মদ পড়লে আর রক্ষে থাকত না— খ্যাপা ষাঁড়ের মতো যা কাণ্ড করত যে বলবার নয়। ডাঙায় থাকলেই মদ খাওয়া চাই। আমার কাছে আসা বন্ধ হল সবার আগে, তারপর ঝগড়া করল সারার সঙ্গে, এখন তো মেরিও চিঠি লেখা বন্ধ করেছে— জানি না কীভাবে আছে ওরা।'

প্রসঙ্গটা যে খুবই নাড়া দিয়েছে মিস কাশিংকে, তা বোঝা গেল হঠাৎ তার মুখের আগল খুলে যাওয়ায়। একলা থাকলে মানুষমাত্রেই একটু কম কথা বলে— নিজের ঘরের কথা বলতে মুখে আটকায়। কিন্তু প্রাণের প্রসঙ্গ ওঠার মুখে যেন কথার ফোয়ারা ছোটাল মিস কাশিং। কত কথাই না বলল ভগ্নীপতি সম্পর্কে, তারপর বলল তিনি ডাক্তার ছাত্রের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনি— তাদের নাম-ঠিকানা, হাসপাতালের নাম পর্যন্ত বলে গেল গড়গড় করে। প্রত্যেকটা শব্দ খুব মন দিয়ে শুনল হোমস। মাঝে মাঝে টুকটাক শব্দ করে চালু রাখল বাক্যস্রোত।

তারপর বলল, 'আপনার মেজোবোন সারাও তো বিয়ে-থা করেননি। তা সত্ত্বেও আপনারা দু-বোন এক সংসারে থাকেন না দেখছি।'

'সারার মেজাজ তো আপনি জানেন না, জানলে এ-প্রশ্ন আর তুলতেন না। নিজের বোন সম্বন্ধে বেশি কথা বলতে চাই না— চিরকালই বড়ো ঝগড়াটে— কিছুতেই মন ওঠে না। ক্রয়ডনে এসে ওকে এনে রেখেছিলাম— দু-মাস আগেও ছিল ওখানে— কিন্তু একসঙ্গে থাকা গেল না।'

'লিভারপুলের আত্মীয়দের সঙ্গেও ঝগড়া করেছিল বুঝি?'

'ওরাই তো এককালে ওর সেরা বন্ধু ছিল বেশ কিছুদিন। এখন তো জিম ব্রাউনারের নামে গালাগাল না-দিয়ে জল গ্রহণ করে না। শেষ ছ-মাস এখানে থাকার সময়ে উঠতে বসতে শুনেছি জিমের নিন্দে। আসলে সারার কুঁদুলে স্বভাবটা ধরে ফেলেছিল বোধ হয় জিম— দিয়েছে আচ্ছা করে রগড়ে। যা বদমেজাজ— রেগে গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

উঠে দাঁড়াল হোমস, 'ধন্যবাদ মিস কাশিং। খামোখা এ-কেসে আপনাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সারার ঠিকানাটা কী বলুন তো? নিউ স্ট্রিটে, ওয়ালিংটন। গুড বাই।'

রাস্তায় বেরিয়েই একটা ছ্যাকড়াগাড়ি ডাকল হোমস। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানল ওয়ালিংটন এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। গাড়িতে উঠে বসে বললে, 'চলো তাহলে। যাওয়ার পথে টেলিগ্রাফ অফিস হয়ে যাব।'

'ওয়ালিংটন কত দূর?'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

কাকে যেন একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। বাকি পথটা রোদ থেকে মুখ বাঁচানোর জন্যে নাকের ওপর টুপি টেনে নামিয়ে বসে রইল চুপচাপ। সারা কাশিংয়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে কড়ায় হাত দিল হোমস— কিন্তু নাড়বার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল গম্ভীরবদন কৃষ্ণবসন একজন যুবা পুরুষ। মাথায় বেজায় চকচকে টুপি।

'মিস কাশিং বাড়ি আছেন?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'মিস কাশিং এখন শয্যাশায়ী। ভীষণ অসুস্থ। কাল থেকে মস্তিষ্ক প্রদাহে ভুগছেন। আমি তাঁর ডাক্তার। কারো সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। আপনি দশ দিন পরে আসবেন।' বলে হনহন করে রাস্তায় বেরিয়ে গেল যুবক চিকিৎসক।

প্রফুল্ল কণ্ঠে হোমস বললে, 'দেখা না হলে আর কী করা যায়! চলো যাই।'

'দেখা হলেও ভদ্রমহিলা কথা বলতে পারতেন কি?' বললাম আমি।

'কথা বলার জন্যে দরকার হত না— মুখখানা শুধু দেখলেই হত। যাকগে, তারও আর দরকার নেই— বুঝে ফেলেছি। ওহে, একটা হোটেলে নিয়ে চলো।' গাড়িতে উঠে বসে গাড়োয়ানকে হুকুম দিল হোমস।

হোটেলে পৌঁছে খেতে খেতে শার্লক হোমস গল্প জুড়ল ওর স্ট্রাডিভেরিয়াস[৮] বেহালা নিয়ে। বেহালাটার দাম হওয়া উচিত পঁচিশ গিনি— কিন্তু একজন ইহুদি বন্ধকি কারবারির কাছ থেকে কিনেছে মাত্র পঞ্চান্ন শিলিংয়ে। এই প্রসঙ্গ থেকে এল আশ্চর্য মানুষ পাগানিনির[৯] গল্প। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, তখন উঠল জায়গা ছেড়ে। থানায় গেলাম দুই বন্ধু।

একটা টেলিগ্রাম বাড়িয়ে ধরে লেসট্রেড বললে, 'আপনার টেলিগ্রাম।'

'জবাব এসে গেছে তাহলে।' খামের মুখ ছিঁড়ে চোখ বুলিয়ে দলা পাকিয়ে পকেটে পুরে হোমস বললে, 'ব্যস, আর কিছু চাই না।'

'জবর খবর পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'সব খবর পেয়েছি বলতে পার।'

'সেকী! ঠাট্টা করছেন নাকি?' ছানাবড়ার মতো চোখ বড়ো বড়ো করে বললে লেসট্রেড।

'ঠাট্টা কী হে! জীবনে এত সিরিয়াস হইনি। সাংঘাতিক একটা ক্রাইমের সব খবর এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

'কিন্তু ক্রিমিনালটাকে কি মুঠোয় আনতে পেরেছেন?'

হোমস নিজের ভিজিটিং কার্ডের পেছনে কয়েকটা শব্দ লিখে লেসট্রেডের হাতে নিয়ে বললে, 'এই হল তার নাম। কিন্তু কাল রাতের আগে তাকে ছুঁতে পারবে না। কেসটা জলের মতো সোজা— এর মধ্যে আমার নামগন্ধ যেন না-থাকে— তোমার নাম থাকলেই যথেষ্ট। জটিল কেস ছাড়া কোনো কেসের মধ্যে আমি জড়িত থাকা পছন্দ করি না! এসো ওয়াটসন।' বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল লেসট্রেড। দুই চোখ উল্লাসে নাচতে লাগল কার্ডে লেখা কথাগুলো পড়ে।

বেকার স্ট্রিটে বসে চুরুট টানতে টানতে শার্লক হোমস বললে, 'এই ঘরে বসে চুরুট খেতে খেতেই কেসটার সুরাহা করে ফেলেছিলাম। দু-একটা যা তথ্য এখনও হাতে আসেনি, তা লেসট্রেড বার করে ফেলবে লোকটাকে পাকড়াও করার পর। ওর ঘটে বুদ্ধি কম থাকলেও স্বভাবটা ডালকুত্তার মতো। এই গুণের জন্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এত উন্নতি ও করেছে।'

'কেস তাহলে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি?' বললাম আমি।

'প্রায় সম্পূর্ণ বলতে পার। তোমার কী মনে হয়?'

'জিম ব্রাউনার লোকটাকে তুমি সন্দেহ কর?'

'সন্দেহ কী হে, তার চাইতেও বেশি।'

'কিন্তু কেন?'

'খোলা মন দিয়ে কেসটাকে প্রথম থেকে দেখেছিলাম বলে— আগে থেকেই কাউকে সন্দেহ করে বসিনি বলে। মিস কাশিংকে দেখলাম নিরীহ সাদাসিধে শান্ত স্বভাবের মহিলা। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফে দেখলাম তিন বোনের ছবি। দেখেই আঁচ করলাম, বাক্সটা পাঠানো হয়েছে বাকি দুজনের একজনকে। সে জনটি কে, সেটা সঙ্গেসঙ্গে ঠিক করার চেষ্টা না-করে আশ্চর্য বাক্সর ভয়ংকর বস্তু দুটো দেখলাম বাগানে গিয়ে।

আলকাতরা মাখানো এ ধরনের সুতো জাহাজি নাবিকরা ব্যবহার করে, ওই ধরনের বিশেষ জাহাজি গিঁট দিতে জাহাজি নাবিকরাই অভ্যস্ত। দেখেই নাকে যেন সমুদ্রের হাওয়া লাগল।

বাক্সটাও পাঠানো হয়েছে একটা সমুদ্রবন্দর থেকে এবং পুরুষের কানের ছ্যাঁদা দেখে বুঝলাম বেচারা নিজেও জাহাজে জাহাজে নাবিকের কাজ করেছে— কান ছ্যাঁদা তারাই করে রিং পরার জন্যে— ডাঙার পুরুষরা করে না। বুঝলাম, বিকট এই নাটকের সব ক-জন অভিনেতাই সমুদ্রে যাতায়াতের জীবিকা বেছে নিয়েছে।

'ঠিকানা লেখা হয়েছে মিস এস কাশিং। বড়োবোনের নাম এস কাশিং ঠিকই। অন্য বোনের নামও 'এস' দিয়ে শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। এই খবরটা জানবার জন্যে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই থমকে গেলাম একটি জিনিস দেখে। তোমার মনে আছে বোধ হয় কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েই থেমে গিয়েছিলাম আমি।'

'ওয়াটসন, তুমি নিজে ডাক্তার। তুমি জান, মানুষের কানের মতো গড়ন বৈচিত্র্য অন্য কোনো প্রত্যঙ্গে বড়ো একটা দেখা যায় না। এক একটা কান এক-এক ধরনের— একটা কান আর একটা কানের সঙ্গে হুবহু মেলে না। গতবছর অ্যানথ্রোপলজিক্যাল[১০] জার্নালে এ সম্পর্কে দুটো প্রবন্ধ লিখেছি, পড়ে নিয়ো। মিস কাশিংয়ের কানের দিকে লক্ষ করে তাই অত চমকে উঠেছিলাম, অবাক হয়েছিলাম, খুশি হয়েছিলাম। কার্ডবোর্ডের বাক্সে যে মেয়েলি কান দেখে এসেছি— চোখের সামনে দেখলাম হুবহু সেই কান। ওপর দিকটা সেইরকম চওড়া, লতি সেইরকম ছোটো, ভেতরের তরুণাস্থি সেইরকম বাঁকা— সব দিক দিয়ে একই কান।

পয়েন্টটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তৎক্ষণাৎ তা বুঝেছিলাম বলে সঙ্গেসঙ্গে তাঁর বোনেদের নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। কেননা, কাটা কান যার, নিশ্চয় সে মিস কাশিংয়ের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়া এবং খুবই কাছের পরিজন।

'অনেক দরকারি খবর বেরিয়ে এল আলোচনার ফলে। জানা গেল, সারা কাশিংয়ের ঠিকানা দু-মাস আগেও একই বাড়িতে ছিল— ভুলটা হয়েছে সেই কারণে। পার্সেল-প্রেরক সারা কাশিংকেই পাঠিয়েছে কাটা কান— সে জানত না সারা আর ও-বাড়িতে নেই। অনেকদিন খবর রাখেনি বলেই সারার ঠিকানা পালটানোর খবর সে পায়নি। তারপর জানলাম, ছোটোবোনের সঙ্গে জিম ব্রাউনারের বিয়ে হওয়ার পর সারা ভগ্নীপতির বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঠেছিল— তারপর ঝগড়া করে চলে এসেছে— চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখালেখি হয়নি। এ-অবস্থায় যদি ব্রাউনারকে পার্সেল পাঠাতে হয় সারার নামে— পুরোনো ঠিকানাতেই তা পাঠাতে হবে।

'অদ্ভুতভাবে জট পরিষ্কার হয়ে এল এইখান থেকে। জিম ব্রাউনার জাহাজের স্টুয়ার্ড, দারুণ আবেগপ্রবণ, মাথায় ঝোঁক চেপে বসলে তা করা চাই— বউকে ভালোবাসে বলে ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সেই কারণেই। এর ওপর আছে মদ খেয়ে পাঁড় মাতাল হওয়ার অভ্যেস— তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ থেকেই ধরে নিলাম স্রেফ ঈর্ষার বশে নিশ্চয় এই জিম ব্রাউনারই খুন করেছে তার বউকে— সেইসঙ্গে জাহাজে কাজ করে এমন একজন পুরুষকে। মিস সারা কাশিংকে কাটা কান দেখতে পাঠানোর কারণ নিশ্চয় এই কুৎসিত ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল সারা নিজে— ভগ্নীপতির বাড়িতে থাকার সময়ে, সেই কারণেই ঝগড়া হয়েছে, আর টিঁকতে পারেনি। মে-ডে জাহাজ বেলফাস্ট, ডাবলিন, ওয়ারটারফোর্ড ছুঁয়ে যায়। ব্রাউনার তাই বেলফাস্ট থেকে বাক্স পাঠিয়েছে সারাকে।

'আর একটা সম্ভাবনাও অবশ্য ছিল। জিম ব্রাউনারকে আর তার প্রাণাধিক বউকে খুন করেছে

অন্য কোনো পুরুষ। সম্ভাবনাটা যাচাই করার জন্যে লিভারপুলে আমার বন্ধু আলগারকে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইলাম মিসেস ব্রাউনার বাড়ি আছে কি না, আর মিস্টার ব্রাউনার মে-ডে জাহাজে বেরিয়ে পড়েছে কি না। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেখা করতে গেলাম সারা কাশিংয়ের সঙ্গে।'

'আসলে আমি কিন্তু দেখতে গিয়েছিলাম তার কানের গড়নটা। একই বংশে তিন সহোদরার কানই হুবহু একরকম হয় কি না দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। দেখাসাক্ষাৎ হলে খবর-টবরও মিলত নিশ্চয়। কিন্তু শুনলাম, পার্সেল যেদিন এসেছে বড়দির কাছে, সেইদিন থেকেই মস্তিষ্ক প্রদাহে সে বিছানা নিয়েছে। খবরটা সারা ক্রয়ডন জেনে গিয়েছে— কাটা কান কাকে দেখতে পাঠানো হয়েছে, আর কেউ না-বুঝলেও সারা বুঝেছে বলেই প্রচণ্ড আঘাতে বিছানা নিয়েছে। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ না-গেলে তার মুখ থেকে আসল কাহিনি শোনা যাবে না।

'কিন্তু আলগারের টেলিগ্রাম পাওয়ার পর তারও আর দরকার নেই। আলগার জানিয়েছেন, মিসেস ব্রাউনারের বাড়িতে তিনদিন ধরে তালা ঝুলছে— প্রতিবেশীদের বিশ্বাস সে দক্ষিণে গেছে আত্মীয়দের কাছে। মিস্টার ব্রাউনার মে-ডে জাহাজে ডিউটিতে গেছে। হিসেব করে দেখলাম, আগামীকাল রাতে জাহাজ আসবে টেমস-এ। লেসট্রেড থাকবে সেখানে খুনিকে যোগ্য সমাদর করার জন্যে। সব খবর তখন পাওয়া যাবে।'

নিরাশ হতে হল না শার্লক হোমসকে। দু-দিন পরে একটা ভারী লেফাফা এল ওর নামে। ভেতরে লেসট্রেডের লেখা একটা ছোট্ট চিঠির সঙ্গে অনেকগুলো ফুলস্ক্যাপ কাগজে টাইপ করা সুদীর্ঘ একটা এজাহার। চোখ বুলিয়ে নিয়ে হোমস বললে, 'লেসট্রেড পাকড়াও করেছে আসল লোককে। শোনো কী লিখেছে।'

মাই ডিয়ার হোমস,

যে-থিয়োরিটা আমরা খাড়া করেছিলাম, তা যাচাই করার জন্য গতকাল সন্ধে ছ-টার সময়ে অ্যালবার্ট ডকে[১১] গিয়ে মে-ডে জাহাজে উঠেছিলাম। (ওয়াটসন, লক্ষ করেছ, থিয়োরিটা নাকি 'আমরা' খাড়া করেছি!) খোঁজ নিয়ে জানালাম, জেমস ব্রাউনার নামধারী স্টুয়ার্ড জাহাজ ছাড়ার পর থেকে এমন অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকে যে বাধ্য হয়ে ক্যাপ্টেন তাকে ঘরে বসিয়ে রেখেছে— ডিউটি দেয়নি। ঘরে গিয়ে দেখি লোকটা একটা কাঠের সিন্দুকের ওপর বসে দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সামনে পেছনে একনাগাড়ে দুলছে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, বিরাট চেহারা, দারুণ গাঁট্টাগোট্টা শরীর— জাল ধোপাকে ধরতে গিয়ে অ্যালড্রিজ আমাদের সাহায্য করেছিল মনে পড়ে?— অনেকটা সেইরকম দেখতে। আমাকে দেখেই এমন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল যে আর একটু হলে বাঁশি বাজিয়ে বসতাম— নদী-পুলিশ বাইরেই ছিল। কিন্তু তার আর দরকার হল না। লোকটা নিজেই দু-হাত বাড়িয়ে দিলে হাতকড়া পরার জন্যে। থানায় এসে ইনস্পেকটরের সামনে নিজে থেকেই এজাহার দিলে। তিন কপি টাইপ করেছিলাম। এক কপি আপনাকে পাঠালাম। গোড়া থেকেই বলেছি আপনাকে কেসটা জলের মতো সোজা। তবে তদন্তে আপনি সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাসহ,
আপনার একান্ত
জি. লেসট্রেড

'জলের মতো সোজা কেস!' টিপ্পনী কাটল হোমস। 'কেসটা হাতে আসার সময়ে তা মনে হয়নি। যাকগে ভায়া। জিম ব্রাউনার নিজের জবানিতে কী বলেছে, এবার তা শোনা যাক।'

'অনেক কথাই বলার আছে— সবই বলব। শোনবার পর ফাঁসি দিতে হয় দিন। থোড়াই কেয়ার করি। এ-কাজ করার পর থেকে চোখ মুদে ঘুমোতে আর পারছি না। জেগে থেকেই অষ্টপ্রহর দেখছি দুটো মুখ। হয় সেই বেটাচ্ছেলেকে, নইলে আমার প্রাণাধিকাকে। বেশির ভাগই দেখছি বউকে। তার নাগরটি ভুরু কুঁচকে মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মেরি তাকিয়ে আছে অবাক চোখে— মৃত্যুকে সামনে দেখে চমকে উঠেছে, অবাক হয়েছে।— যে-চোখে ভালোবাসা ছাড়া কিছু দেখিনি, সে-চোখে এখন দেখছি মৃত্যুভয়।

'দোষটা কিন্তু সবটা আমার নয়— সারার। মদ ধরেছিলাম ঠিকই। মদ আমাকে পশু করে তুলত, তাও মানছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরি আমাকে ক্ষমা করত আমাকে কাছে টেনে নিত— যদি ওই মেয়েছেলেটা অশুভ গ্রহের মতো আমাদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে না-আসত। সারা আমাকে ভালোবাসত— শেষকালে সে-ভালোবাসা বিষ হয়ে গেল দারুণ ঘৃণায়। কেননা, সারা জেনেছিল ওর দেহ আর মনের চাইতে স্ত্রীর পদযুগলও আমার কাছে অনেক প্রিয়।

'ওরা তিন বোন। বড়ো বোন সাধ্বী, মেজো একটা আস্ত ডাইনি, ছোটো সাক্ষাৎ দেবী। বিয়ে যখন করি, মেরির বয়স তখন উনত্রিশ, সারার তেত্রিশ। দিনসাতেকের জন্যে সারাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম লিভারপুলের নতুন সংসারে। সাত দিনের জায়গায় একমাস থাকার পর দেখা গেল সারা আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছে।

'তখন মদ স্পর্শ করতাম না।'

'একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিলাম। তখন কি ভেবেছিলাম শেষটা হবে এইরকম?

'হপ্তা শেষে প্রায় বাড়ি ফিরতাম। কখনো-সখনো জাহাজে মাল ওঠানো হত একটানা দিনসাতেক— আমি বাড়ি বসে থাকতাম। শ্যালিকাকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখনই। ছিপছিপে তন্বী চটপটে খর প্রকৃতি, দু-চোখে চকচকির ফুলকি, ঘাড় বেঁকিয়ে চলা দেখলেই বোঝা যেত কী ধরনের গরবিনি মেয়েছেলে সে। মেরি থাকলে কিন্তু সারার কথা মনেও পড়ত না। ঈশ্বর সাক্ষী।

'মাঝে মাঝে ও যেন আমার সঙ্গে একলা থাকতে চায়— আমার সঙ্গে একা বেড়াতে যেতে চায়। কিন্তু এর পেছনে যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ভাবিনি কোনোদিন। কিন্তু একদিন চোখ খুলল আমার। সন্ধে নাগাদ জাহাজ থেকে ফিরে দেখি মেরি বাড়ি নেই। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেছে? সারা বললে, দোকানে টাকা দিতে গেছে। অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম ঘরময়। সারা বললে, 'জিম, মেরিকে ছেড়ে পাঁচটা মিনিটও কি থাকতে পার না? লোকে আমাকে নিন্দে করবে না? আমার সঙ্গ কি তোমার একেবারেই ভালো লাগে না?' 'কী যে বল', বলে ওকে ভুলোনোর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সামনে। সারা সঙ্গেসঙ্গে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল আমার হাতখানা— সতৃষ্ণ নয়নে চাইল চোখে। আমার হাত যেন পুড়ে গেল ওর হাতের উত্তাপে— চোখের মধ্যে দিয়ে যেন ছুটে এল কামনার হলকা। নিমেষ মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল ওর অভিপ্রায়। হাত টেনে নিলাম আমি। সেকেন্ড কয়েক কোনো কথা না-বলে পাশে দাঁড়িয়ে রইল সারা। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে 'দুর, বোকা!' বলে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

'এরপর থেকেই মনেপ্রাণে আমাকে ঘৃণা করে চলল সারা। পাছে মেরি আঘাত পায়, তাই এ-ব্যাপার ওর কানে তুলিনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই লক্ষ করলাম, মেরি যেন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে। সন্দেহবাতিকে পেয়ে বসেছে। কোথায় যাই, কার কাছ থেকে চিঠিপত্র আসে, পকেটে কী থাকে— এইরকম ছোটোখাটো বাজে ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি লেগেই রইল দুজনের মধ্যে। একটু একটু করে দূরত্ব বেড়ে চলল আমার আর মেরির মধ্যে, কিন্তু নিকটত্ব বজায় রইল মেরি আর সারার মধ্যে। নির্বোধ আমি। তখনই বোঝা উচিত ছিল তিল তিল করে মেরির কানে বিষ ঢালছে ডাইনি সারা। একটু একটু করে ওর মন ভেঙে দিয়ে ওকে সরিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। মন আমারও ভাঙছিল। তাই মদ ধরলাম, মেরি যদি তখনও কাছে চলে আসত, মদকে দূরে সরিয়ে দিতাম। মেরি কিন্তু আরও দূরে সরে গেল— তারপর ধূমকেতুর মতো কোত্থেকে এসে জুটল আলেক ফেয়ারবার্ন— আরও ঘোরালো হল পরিস্থিতি।

'প্রথম প্রথম সারাকে দেখবার জন্যে বাড়ি বয়ে আসত ফেয়ারবার্ন— তারপর আসত আমাদের সবাইকে দেখতে। মানুষের মন জয় করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ওর। আধখানা পৃথিবী সে দেখেছে, আশ্চর্য অভিজ্ঞতার গল্প রসিয়ে বলবার ক্ষমতাও ছিল, দেখতে শুনতেও সুন্দর। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্টি— নাবিকদের মধ্যে যা একান্ত বিরল। মাসখানেক যাতায়াত চলল বাড়িতে। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এর ফলে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে পারে সংসারে। একদিন একটা ব্যাপারে সন্দেহ জাগল। সেইদিন থেকে মন থেকে শান্তি জিনিসটা একেবারেই বিদায় নিল।

'ব্যাপারটা ছোট্ট! হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরেছি— ফেরার কথা তখন নয়, বারান্দা পেরিয়ে দরজার কাছে আসতেই দেখলাম সাগ্রহ মুখে এগিয়ে আসছে মেরি। পরক্ষণেই কিন্তু মুখটা অন্যরকম হয়ে গেল আমাকে দেখে— মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল অন্যদিকে। বুঝলাম, পায়ের শব্দ ভুল করেছে মেরি। বুকভরা আশা নিয়ে যাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এসেছিল সে আমি নয় অন্য পুরুষ। এবং নিঃসন্দেহে ফেয়ারবার্ন। চক্ষের নিমেষে মাথায় খুন চাপল আমার। রেগে গেলে আমি আমার মধ্যে থাকি না। আমার মুখের চেহারা দেখেই দৌড়ে এসে মেরি কান্না জড়ানো গলায় বললে, "জিম, জিম, দোহাই তোমার!" আমি শুধু বললাম, "সারা কোথায়?" ও বললে, "রান্নাঘরে।" রান্নাঘরে গিয়ে আমি বললাম, "সারা, এই ফেয়ারবার্ন লোকটা যেন এ-বাড়ির চৌকাঠ আর না-মাড়ায়।" ও বললে, আমার বন্ধু যদি এ-বাড়িতে আদর না-পায়, তাহলে আমাকেও এ-বাড়ি ছাড়া হতে হবে। আমি বললাম, যা খুশি তুমি করতে পার, কিন্তু ফেয়ারবার্ন এ-বাড়িতে ফের এলে তার একখানা কান কেটে তোমাকে পাঠিয়ে দেব আলমারিতে তুলে রাখার জন্যে। আমার মুখ দেখে ভয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল সারা। মুখের ওপর আর কোনো কথা বলল না। সেই রাতেই চলে গেল বাড়ি ছেড়ে।

'কিন্তু এতবড়ো শয়তান মেয়েছেলে আমি আর দেখিনি। আমার মন যাতে মেরির ওপর আরও বিষিয়ে যায়, এই মতলবেই বোধ হয় একটু দূরেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে জাহাজি নাবিকদের ঘর ভাড়া দেওয়া শুরু করল সারা। ফেয়ারবার্ন সেখানেই থাকত। মেরি যেত দিদি আর নাগরের সঙ্গে চা খেতে। কতবার এইভাবে গেছে আমি জানি না। একদিন কিন্তু পেছন পেছন নিয়ে সদর দরজা দিয়ে যেই ঢুকছি, পেছনের বাগানের পাঁচিল টপকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেল ফেয়ারবার্ন। মেরিকে সেইখানেই শাসালাম, ফের যদি ফেয়ারবার্নের সঙ্গে তাকে দেখি, খুন

করব নির্ঘাত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল মেরি— দুজনের মধ্যে ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও আর রইল না। আরও বেশি মদ খেতে লাগলাম, আরও বেশি ঘৃণা করতে লাগল মেরি।

'লিভারপুলে থেকে পেট চালানো দায় হচ্ছে দেখেই বোধ হয় ক্রয়ডনে বড়দির কাছে ফিরে গেল সারা। তার পরেই গত হপ্তায় ঘটল সব সর্বনাশের শেষ সর্বনাশ।

'ঘটল এইভাবে। দিন সাতেকের মধ্যে মে-ডে জাহাজে ডিউটি দিতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ইঞ্জিনে সামান্য গোলমাল দেখা দেওয়ায় ফিরে আসতে হল জাহাজঘাটায়— ঘণ্টা বারো মতো নিশ্চিন্তি। তারপর জাহাজ ছাড়বে। বাড়ি ফিরছি আর ভাবছি হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে বউ নিশ্চিয় খুশি হবে। ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনের রাস্তায় যেই এসেছি, পাশ দিয়ে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি বেরিয়ে গেল উলটোদিকে। গাড়ির মধ্যে দেখলাম হাসতে হাসতে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে মেরি আর ফেয়ারবার্ন। ওরা আমাকে দেখেনি। আমি কিন্তু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম সেই দৃশ্য।

'বিশ্বাস করুন, সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। কে যেন আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়েছে। ইদানীং খুব বেশি মদ খাচ্ছিলাম, তার ওপর স্বচক্ষে দেখলাম ওই দৃশ্য। দুয়ে মিলে আমার মধ্যে সব কিছু উলটেপালটে দিল। তখন আমার ব্রেনের মধ্যে সমানে যেন দুরমুশ পড়ছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মগজের মধ্যে আস্ত নায়গারার বজ্রনাদ শুনেছিলাম।

আমার হাতে তখন ওক কাঠের একটা ভারী ছড়ি ছিল। খুন করার জন্যে সেই ছড়ি নিয়ে দৌড়োলাম গাড়ির পেছন পেছন। কিছুদূর দৌড়োনোর পরেই অবশ্য বুদ্ধি খুলে গেল। ওরা যেন দেখতে না-পায়, সেইভাবে ভিড়ের মধ্যে গা মিলিয়ে রেলস্টেশনে এলাম। ওরা নিউ ব্রাইটনের[১২] টিকিট কাটল। আমি উঠলাম তিনখানা কামরা পেছনে। ওরা নিউ ব্রাইটন পৌঁছে প্যারেডে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে জল বিহার করতে বেরোল খুব সম্ভব গরমে প্রাণটা আইঢাই করছিল বলে।

'কিন্তু এইভাবেই আমার মুঠোয় এসে পড়ল দুজনে। কুয়াশার মধ্যে কয়েকশো গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না। আমিও একটা নৌকো নিয়ে জলে ভাসলাম। ডাঙা থেকে মাইলখানেক দূরে এসে ওদের ধরে ফেললাম। কুয়াশার জন্যে দেখতে পায়নি আমি পেছন পেছন আসছি। হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল দুজনেই, দাঁড় তুলে আমাকে মারতে গেল ফেয়ারবার্ন। ওর আর দোষ কী— আমার চোখে নিজের মৃত্যু দেখেছিল বলেই বাঁচতে গিয়েছিল আমাকে মেরে। আমি পাশ কাটিয়ে মার বাঁচিয়ে ছড়ির এক ঘায়ে পিণ্ডি পাকিয়ে দিলাম মাথাটা। মেরিকে ছেড়ে দিতাম— কিন্তু মরা ফেয়ারবার্নকে জড়িয়ে ধরে "আলেক" বলে কেঁদে উঠতেই ছড়ি বসিয়ে দিলাম ওর মাথাতেও। শেষ হয়ে গেল দুজনে। আমার মাথায় তখন খুন নাচছে— সারাকে সামনে পেলে তারও ঘিলু বার করে ছাড়তাম। ছড়ি রেখে ছুরি বার করে দুজনের একটা করে কান কাটলাম সারাকে ভেট পাঠাব বলে— দারুণ আনন্দ হল কাটা কান দেখে সারার মুখের অবস্থাটা কল্পনা করে— তার নষ্টামির জন্যেই আজ খতম হয়ে গেল দু-দুটো মানুষ। তারপর লাশ দুটোকে একসঙ্গে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে, নৌকোর তক্তা ভেঙে জলে ডুবিয়ে দিলাম। জানি তো নৌকো ফেরত না-এলে মালিক ভাববে বুঝি কুয়াশায় দিকভ্রষ্ট হয়ে বারদরিয়ায় ভেসে গেছে নৌকো। গা থেকে রক্ত আর ঘিলু ধুয়ে ফিরে

এলাম ডাঙায়, উঠলাম নিজের জাহাজে। কাকপক্ষীও টের পেল না কী করে এলাম সমুদ্রে। সেই রাতেই সারার জন্যে প্যাকেট বেঁধে পরের দিন পাঠিয়ে দিলাম বেলফাস্ট থেকে।

'এই হল সব ব্যাপার— কিছু লুকোলাম না। এখন যা খুশি করতে পারেন আমাকে নিয়ে, ফাঁসিও দিতে পারেন— কিন্তু যে-শাস্তি পেয়ে গেছি, তার সমান শাস্তি আর দিতে পারবেন না। চোখ বন্ধ করতে পারি না। করলেই দেখি ওরা দুজনে আমার দিকে পালা করে তাকিয়ে আছে— কুয়াশার মধ্যে থেকে হঠাৎ আমার নৌকো বেরিয়ে আসতে দেখে যেভাবে তাকিয়েছিল— ঠিক সেইভাবে। ওদের আমি চোখের পলক ফেলবার আগে মেরেছিলাম, ওরা আমাকে মারছে তিলেতিলে। এভাবে আর একটা রাত কাটাতে হলে কাল সকালেই হয় পাগল হয়ে যেতাম, না হয় মারা যেতাম। আমাকে একলা রাখবেন না জেলখানায়— দোহাই আপনাদের।'

কাগজগুলো আস্তে করে নামিয়ে রেখে ধীর গম্ভীর স্বরে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, এই শোক দুঃখ খুনোখুনি আতঙ্কর শেষ কোথায় বলতে পার? চক্রবৎ এই পরিবর্তনের শেষ কি নেই? শেষ যদি না হয়, বিশ্বসংসারের শেষ পরিণতিটাও যে ভাবা যায় না। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি কোনোদিনই খেই খুঁজে পাবে না চিরন্তন এই রহস্যের।'

টীকা

১. **লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলির ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়। এটি মেমোয়্যার্স অব শার্লক হোমস সিরিজে 'সিলভার ব্লেজ' গল্পের ঠিক পরে এবং 'ইয়েলো ফেস' গল্পের আগে রচিত এবং প্রকাশিত হলেও কোনো কারণে স্যার আর্থার এটিকে 'মেমোয়্যার্স অব শার্লক হোমস' গ্রন্থে সংকলিত করেননি। অথচ বইটির প্রথম মার্কিন সংস্করণে এটিকে রাখা হলেও ওই প্রকাশনের পরবর্তী সংস্করণ এই গল্প বাদ দিয়ে প্রকাশিত হয়। গল্পটিকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না-করার কারণ হিসেবে অনেক গবেষক মনে করেন এই কাহিনিতে পরকীয়া প্রেম জাতীয় প্রাপ্তবয়স্ক উপাদানের উপস্থিতি।

২. **রেসিডেন্ট পেশেন্ট কাহিনি দ্রষ্টব্য :** এই গল্পটি গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ায় লেখক সজ্ঞানে এই অংশটিকে রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পে জুড়ে দেন।

৩. **ক্রয়ডন :** সাধারণভাবে বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত এই অঞ্চলে ১৯২০ সালে লন্ডনের প্রথম বিমানবন্দরটি স্থাপিত হয়।

৪. **পেঞ্জে :** শার্লক হোমসের সমকালে লন্ডনের মফস্সল এলাকা। বর্তমানে বৃহত্তর লন্ডনের অংশভুক্ত। শেরিং ক্রস থেকে দূরত্ব মাইল সাতেক।

৫. **হানিডিউ তামাক :** কৃত্রিমভাবে মিষ্টি যুক্ত করা তামাক। যেমনভাবে এদেশে গুড় দিয়ে তামাক মিষ্টি করা হয়ে থাকে।

৬. **ডিসেকটিং রুম :** শব ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ঊনবিংশ শতকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত ইংলন্ডে শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া অপরাধীদের দেহই ব্যবচ্ছেদ করতে পারতেন ডাক্তার বা ডাক্তারির ছাত্ররা। ফলে মৃতদেহের অভাবে চুরি করা মৃতদেহ কালোবাজারে বিক্রির ব্যাবসা ফেঁদেছিল একদল লোক।

৭. **মে-ডে জাহাজ :** কনকারার এবং মে-ডে, এই দুটি জাহাজই ছিল সেকালের লিভারপুল, ডাবলিন অ্যান্ড লন্ডন স্টিম প্যাকেট কোম্পানির মালিকানাধীন।

৮. **স্ট্রাডিভেরিয়াস :** প্রথম খণ্ডে 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯. **পাগানিনি :** ইতালির জেনোয়া শহরের বাসিন্দা নিকোলো পাগানিনি (১৭৮২-১৮৪০) অল্পবয়স থেকেই ছিলেন সংগীত জগতের বিস্ময়। ভায়োলিনবাদক হিসেবে বিশ্বখ্যাত হলেও তিনি গান গাইতেন এবং পারদর্শী ছিলেন গিটার এবং ভায়োলা বাদনেও।

১০. **অ্যানথ্রোপলিক্যাল জার্নাল :** এই জার্নাল বাস্তব হলেও এ-ধরনের কোনো লেখা এখানে প্রকাশিত হয়নি। বরং স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯৩-এর অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায় এই বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১১. **অ্যালবার্ট ডক :** রয়্যাল ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট ডক-এর চলতি নাম অ্যালবার্ট ডক।

১২. **নিউ ব্রাইটন :** আইরিশ সাগরের তীরে, উইরাল উপদ্বীপের উত্তরতম প্রান্তে ওয়ালসি শহরের অংশভুক্ত নিউ ব্রাইটন বিখ্যাত সাগরতীরের পর্যটন ক্ষেত্র বা সি-রিসর্ট হিসেবে। পূর্বতন ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দীঘার সঙ্গে ব্রাইটনের তুলনা করতেন।

হলদে মুখের কাহিনি[১]

[দি ইয়েলো ফেস]

শার্লক হোমসের সফল কীর্তির মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তি যতটা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে তার বিফল কীর্তির মধ্যে। যে-কেস সে সমাধান করতে পারেনি, তা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গেছে— কারো বুদ্ধিতে কুলোয়নি মীমাংসা করার।

হলদে মুখের কাহিনি সেই জাতীয় কাহিনি যার মধ্যে ওর আশ্চর্য বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়েছে— অথচ হালে পানি পায়নি।

অহেতুক শক্তিক্ষয় করা হোমসের ধাতে ছিল না। দেহে শক্তি ছিল যথেষ্ট। বক্সিংয়ে প্রথম শ্রেণির বক্সারদের মধ্যে ওর স্থান[২]। কিন্তু কাজের সময় ছাড়া বাজে শক্তিক্ষয়ে ছিল ভীষণ অরুচি— কোকেন নিয়ে পড়ে থাকত মামলা হাতে না-থাকলে। কিন্তু কর্মক্ষমতা মরে যেত না— নিয়মিত ব্যায়াম ছাড়াই কীভাবে যে নিজেকে কর্মপটু রাখত ভেবে পাইনি। খেত খুব সামান্য। কিন্তু হাতে কাজ এলে শক্তি যেন বিস্ফোরিত হত হাতে পায়ে। প্রচণ্ড পরিশ্রমেও ক্লান্ত হত না। বসন্তকাল। জোর করে ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম বাগানে[৩]। বাসায় ফিরলাম পাঁচটায়। আসতেই চাকরের মুখে শুনলাম, বসে থেকে থেকে একজন দর্শনার্থী চলে গেছে।

খুবই বিরক্ত হল হোমস। এমনিতে হাতে কাজ নেই। যাও-বা একজন মক্কেল এল, দেখাও হল না। বিকেলে বেড়াতে না-গেলেই হত। গজগজ করতে লাগল সমানে। এমন সময়ে টেবিলে দেখা গেল একটা পাইপ পড়ে রয়েছে।

লাফিয়ে উঠল হোমস, 'আরে! আরে! ওয়াটসন, এ তো তোমার পাইপ নয়। ভদ্রলোক ফেলে গেছেন নিশ্চয়। চমৎকার সেকেলে ব্রায়ার পাইপ— তামাকওয়ালা এ ধরনের তৈল-স্ফটিকের নলকে বলে অম্বর[৪]। লন্ডনে এমন নল খুব একটা পাওয়া যায় না। এ-রকম একটা জিনিস ভদ্রলোকের অত্যন্ত আদরের— কাছছাড়া করতে চান না। তবুও যখন ফেলে গেছেন, বুঝতে হবে তাঁর মানসিক উদ্‌বেগ নিশ্চয় চরমে পৌঁছেছে— পাইপ নিতেও ভুলে গেছেন।'

'আদরের জিনিস— কাছছাড়া করতে চান না, তুমি বুঝলে কী করে?'

'ভায়া, পাইপটার দামই তো সাত শিলিং। দু-বার মেরামত করা হয়েছে রুপোর পটি মেরে,

মানে, পাইপের যা দাম, তার চাইতেও বেশি খরচ করে। নতুন একটা কিনলেও পারতেন। কেনেননি, অত্যন্ত আদরের এই পাইপ কাছছাড়া করতে চান না বলে।'

'আর কী চোখে পড়ছে?'

হাড় ঠুকে প্রফেসর যেভাবে বক্তৃতা দেয়, তর্জনী দিয়ে পাইপ ঠুকে হোমস সেইভাবে বললে, 'পাইপ জিনিসটা চিরকালই কৌতূহলোদ্দীপক। ঘড়ি আর জুতোর মতো বৈশিষ্ট্যেরও দাবি রাখে। পাইপটার মালিক ল্যাটা, স্বাস্থ্যবান, ছন্নছাড়া। ভদ্রলোকের দাঁত বেশ সাজানো এবং পয়সাকড়ির ব্যাপারে হিসেব করে খরচ না-করলেও চলে যায়।'

'তার মানে বড়োলোক?'

পাইপ থেকে তামাকটা হাতের চেটোয় ঢেলে হোমস বললে, 'তামাকটা দেখছ? এ হল গ্রসভেনর মিক্সচার। বিলক্ষণ দামি। ব্যয়সংকোচে যে আগ্রহী, সে অনায়াসেই এর আধাদামের তামাক কিনে নেশা চরিতার্থ করতে পারত।'

'আর কী দেখছ?'

'ভদ্রলোক ল্যাম্প আর গ্যাসের শিখায় পাইপ জ্বালান[৫] বলে কাঠ পুড়েছে। দেশলাইয়ের আগুনে এভাবে কাঠ পোড়ে না। পুড়েছে কেবল ডান দিকটা, ল্যাটা বলে। তুমি ল্যাটা নও। তুমি ডান হাতে পাইপ ধরে ল্যাম্প বা গ্যাসের শিখায় পাইপ ধরালে দেখবে পুড়ছে বাঁ-দিকটা। অম্বর নলে দাঁতের দাগ যেভাবে বসেছে, তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের দন্তশোভা দেখবার মতোই। দাঁত সাজানো জোরালো না-হলে এভাবে পাইপ কামড়ানো যায় না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ভদ্রলোক স্বয়ং আসছেন মনে হচ্ছে।'

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকলেন বছর তিরিশ বছরের এক যুবক; হাতে টুপি, পরনে ধূসর পোশাক।

আমতা আমতা করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমার মাথার ঠিক নেই। দরজায় নক করে ঢোকা উচিত ছিল।' বলেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাত বুলোতে লাগলেন কপালে।

আপন করে নেওয়া সুরে হোমস বললে, 'দৈহিক মেহনত সওয়া যায়, রাত্রিজাগরণ সহ্য হয় না। আপনার দেখছি কয়েক রাত ঘুমই হয়নি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে আমার।' আতীক্ষ্ণ ভাঙা ভাঙা গলায় যেন স্রেফ মনের জোরে আবেগরুদ্ধ ভঙ্গিমায় কথা বলে গেলেন যুবক। 'ঘরের ব্যাপার নিয়ে পরের কাছে আলোচনা করার মতো কুৎসিত ব্যাপার আর নেই, বিশেষ করে ব্যাপারটা যদি নিজের ঘরণীকে নিয়ে হয়।'

'মি. গ্রান্ট মুনরো...'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন যুবক, 'আমার নামও জানেন দেখছি।'

হাসল হোমস। বলল, 'নামটা আপনার টুপির ভেতর লিখে রেখে আমার দিকেই ফিরিয়ে রেখেছেন। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার কাহিনি বলুন। এ-ঘরে এর আগে অনেক গোপন রহস্য আমরা এই দুই বন্ধু শুনেছি, সমাধানও করেছি, অনেকের হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে পেরেছি। বলুন।'

আবার ললাটে হস্তচালনা করলেন গ্রান্ট মুনরো। হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল কথা তিনি কম বলেন, মনের কথা মনে চেপে রাখতে পারেন, নিজেকে নিয়েই তন্ময় থাকেন, কিন্তু সেই অভ্যেসের অন্যথা হতে যাচ্ছে বলে নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না।

'মি. হোমস, আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। তিন-তিনটে বছর আমরা পরম সুখে কাটিয়েছি। কেউ কাউকে ভুল বুঝিনি, কখনো মতান্তর হয়নি। কিন্তু গত সোমবার থেকে মনে হচ্ছে স্ত্রী অনেক দূরে সরে গেছে। কারণটা আমি জানতে চাই।

'এফি কিন্তু আমাকে ভালোবাসে, তাতে একটুও চিড় ধরেনি। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু একটা গুপ্ত রহস্য অদৃশ্য প্রাচীরের মতো দুজনের মাঝে হঠাৎ মাথা তুলেছে।

'এফিকে বিয়ে করেছিলাম বিধবা অবস্থায়। নাম ছিল মিসেস হেব্রন। আলাপ যখন হয়, তখন তার বয়স পঁচিশ। অল্প বয়সে আমেরিকায় গিয়েছিল। আটলান্টায়[৬] থাকত। বিয়ে হয়েছিল উকিল হেব্রনের সঙ্গে। একটি বাচ্চাও হয়েছিল। তারপরে পীতজ্বরে[৭] স্বামী আর সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় ও দেশে ফিরে আসে। মি. হেব্রন ওর জন্যে যে-টাকা রেখে গেছিলেন তার সুদ পাওয়া যেত ভালোই। দেশে ফেরার ছ-মাস পরে আলাপ হয় আমাদের— তারপর বিয়ে।

'হেব্রন ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট[৮] আমি দেখেছি।

'আমার নিজের কারবার আছে। বিয়ের পর নর্বুরিতে একটা বাড়ি ভাড়া করলাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। পল্লিশ্রী আছে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের ওপারে একটা কটেজ। আর কোনো বাড়ি নেই। কটেজটার সদর দরজা আমাদের বাড়ির দিকে।

'আগেই একটা কথা বলে রাখি। বিয়ের পরেই স্ত্রী ওর সব টাকা আমাকে লিখে-পড়ে দিয়েছিল। আমার বারণ শোনেনি। ব্যাবসা করি, যদি টাকাটা জলে যায়, এই ভয় ছিল।

'যাই হোক, দেড় মাস আগে এফি হঠাৎ আমার কাছে এক-শো পাউন্ড চাইল। আমি তো অবাক। এত টাকা হঠাৎ কী দরকার পড়তে পারে, ভেবে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম। ও এড়িয়ে গেল। চপলভাবে শুধু বলল, "তুমি তো আমার ব্যাঙ্কার। ব্যাঙ্কার আবার অত কথা জিজ্ঞেস করে নাকি? তবে কী জন্যে টাকাটা নিচ্ছি, পরে বলব— এখন নয়।"

'চেক লিখে দিলাম এক-শো পাউন্ডের। কিন্তু সেই প্রথম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খোলাখুলি সম্পর্কে একটু ফাটল ধরল— কী যেন লুকিয়ে রাখা হল আমার কাছে।

'বাড়ির উলটোদিকে মাঠের ওপারে দোতলা কটেজটার পাশে আমি প্রায় বেড়াতে যেতাম স্করফার গাছের কুঞ্জে। গত সোমবার বেড়িয়ে ফেরবার সময়ে দেখলাম, বাড়িতে নিশ্চয় ভাড়াটে এসেছে। এতদিন খালি পড়ে ছিল। এখন একটা খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র সদর দরজার সামনে নামানো হচ্ছে।

'কৌতূহল হল। কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কে এল বাড়িতে, এমন সময়ে চমকে উঠলাম দোতলার জানলায় একটা মুখ দেখে। মি. হোমস, সে-মুখ দেখে বুকের রক্ত আমার ছলাৎ করে উঠল। কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে।

'মুখটা পুরুষের, কি নারীর দূর থেকে ঠাহর করতে পারলাম না। শুধু দেখলাম একটা বিষম বিকট হলদেটে রঙের মৃতবৎ মুখ স্থির চোখে দেখছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই সাঁৎ করে পেছনে সরে গেল মুখটা— যেন জোর করে টেনে নেওয়া হল ঘরের ভেতর থেকে।

'কৌতূহল আর বাগ মানল না। দেখতেই হবে কে এল আমার প্রতিবেশী হয়ে। এগিয়ে গেলাম সদর দরজার সামনে। কিন্তু ঢোকবার আগেই তালঢ্যাঙা একটা মেয়েছেলে বেরিয়ে এসে কড়া কড়া কথা বলে তাড়িয়ে দিলে আমাকে।

'বাড়ি ফিরে এলাম। মন থেকে কিন্তু হলদেটে মুখটার স্মৃতি মুছতে পারলাম না। স্ত্রীকেও কিছু বলব না ঠিক করলাম। যা ভীতু স্বভাবের, ভেবে ভেবে হয়তো আধখানা হয়ে যাবে। শোবার আগে কেবল বললাম, সামনের বাড়িতে নতুন প্রতিবেশী এসেছে।

'আমি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোই। এই নিয়ে আমাকে রাগানোও হয়। কিন্তু সেদিন ওই বীভৎস হলদে মুখটা দেখার পর ঘুম তেমন গাঢ় হল না। চমকে চমকে উঠতে লাগলাম। সেই কারণেই গভীর রাতে টের পেলাম চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে এফি বেরিয়ে গেল ঠিক চোরের মতো ভয়ে ভয়ে। ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। এত রাতে বাড়ির বউ বাইরে বেরোয় কেন? বাইরে বেরোনোর সময়ে ওর মুখের চেহারাও দেখেছি। মড়ার মতো ফ্যাকাশে। নিশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। ব্যাপার কী?

'কুড়ি মিনিট পর ফের সদর দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। চুপি চুপি ঘরে ঢুকল এফি। তৎক্ষণাৎ উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় গেছিলে?"

'আঁতকে উঠল এফি। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। কাঁপতে লাগল ঠক-ঠক করে। চিরকালই একটু নার্ভাস। তারপরেই ডুকরে কেঁদে বললে, "তুমি জেগে আছ?"

'কোথায় গেছিলে?'

'একটু হাওয়া খেতে। দম আটকে আসছিল বন্ধ ঘরে,' দেখলাম আঙুল কাঁপছে এফির। নির্ঘাত মিথ্যে বলছে। আমার দিকেও তাকাচ্ছে না।

'মনটা বিষিয়ে গেল। নিশীথ রাত্রে চোরের মতো বাইরে ঘুরে এসে যে-স্ত্রী কাঁচা মিথ্যে বলে স্বামীকে, তাকে আর জেরা না-করাই ভালো। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না।

'পরের দিন শহরে যাওয়ার কথা ছিল। বেরোলামও বাড়ি থেকে। কিন্তু মনমেজাজ ভালো না-থাকায় এদিক-ওদিক ঘুরে দুপুর একটা নাগাদ ফিরে এলাম। কটেজটার পাশ দিয়ে যখন আসছি, দেখলাম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আমার স্ত্রী।

'আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল এফি। ভাব দেখে মনে হল এখুনি পেছন ফিরে কটেজের মধ্যে ফের ঢুকে পড়বে। নিঃসীম আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে-মুখে।

'কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, "জ্যাক[১], নতুন প্রতিবেশী দেখতে এসেছিলাম।"

"কাল রাতেও এসেছিলে?"

"না, না। কী বলতে চাও?"

"ফের মিথ্যে? দেখি তো কার কাছে গেছিলে।"

'দু-হাতে আমার পথ আটকাল এফি। মিনতি করে বললে, ভেতরে যেন না-ঢুকি। এখন সে কিছু বলতে পারছে না শুধু আমার ভালোর জন্যেই। কিন্তু একদিন সব বলবে। কিন্তু এখন জোর করে ভেতরে ঢুকলে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটবে ওইখানেই।

'ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কথা আদায় করলাম— আর যেন এসব না হয়। ও কথা দিল।

'চলে আসার সময়ে লক্ষ করলাম, ওপরের ঘরের জানলা থেকে বিকট সেই হলদে মুখটা নির্নিমেষে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই সাঁৎ করে সরে গেল ভেতরে। কিছুতেই মাথায় এল না এ-রকম একটা বিচিত্র জীবের সঙ্গে আমার স্ত্রী-র এমন কী সম্পর্ক থাকতে পারে যে রাতবিরেতে অথবা দিনদুপুরে আমাকে লুকিয়ে তাকে আসতে হচ্ছে বার বার? ওই কর্কশ স্বভাবের মেয়েছেলেটাই-বা কে? এ কী রহস্য গড়ে উঠেছে সামনের বাড়িতে?

'দু-দিন ভালোই কাটল। তৃতীয় দিন শহরে কাজ পড়ল। যে-ট্রেনে ফেরবার কথা ফিরলাম তার আগের ট্রেনে। বাড়ি ঢুকতেই আমার ঝি চমকে উঠল আমাকে দেখে। গিন্নিমা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে আমতা আমতা করে বললে, এই গেছে একটু বাইরে।

'ঘোর সন্দেহ হল। ওপরে উঠলাম। এফিকে দেখতে পেলাম না। জানলা দিয়ে দেখলাম, মাঠের ওপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে ঝি। বুঝলাম সব। আমার অবর্তমানে ফের সামনের বাড়ি গিয়েছে এফি। ঝি যাচ্ছে আমার ফিরে আসার খবর দিতে।

'মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলাম, এর একটা হেস্তনেস্ত আজকেই করব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মতো দৌড়োলাম কুটিরের দিকে। মাঝপথে দেখা হল এফি আর ঝিয়ের সঙ্গে— হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে।

'আমি কিন্তু ওদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঢুকলাম কুটিরের মধ্যে। নীচের তলায় দেখলাম জল ফুটছে কেটলিতে। ওপরতলায় হলদে মুখ যে-ঘরে দেখেছিলাম, সেই ঘরটা কেবল সুন্দর ভাবে সাজানো— ম্যান্টলপিসে রাখা আমার স্ত্রী-র ফটো— তিন মাস আগে তুলেছিলাম। এ ছাড়া বাড়ি একদম ফাঁকা।

'নীচের হল ঘরে দেখা হয়ে গেল স্ত্রী-র সঙ্গে। ফটো কাকে দিয়েছে এবং কার কাছে সে এত লুকিয়ে চুরিয়ে আসে— এ-প্রশ্নের জবাব সে দিল না। করুণ স্বরে শুধু বললে, "বলতে পারব না জ্যাক। কিন্তু যেদিন সব জানবে ক্ষমাও করতে পারবে।"

'আমি বললাম, "তোমার আমার মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক কিন্তু আর রইল না।"

'মি. হোমস, সেই থেকে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছি। এ-ঘটনা ঘটেছে কালকে। আপনার কাছে ছুটে এসেছি পরামর্শ নিতে। এ-উৎকণ্ঠা আর সইতে পারছি না। বলুন এখন কী করি।'

তন্ময় হয়ে সব শুনল হোমস। গালে হাত দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপরে বললে, 'হলদে মুখটা পুরুষের কি?'

'বলা মুশকিল!'

'দেখে গা ঘিন ঘিন করেছে?'

'বিকট রং, আড়ষ্ট ভাব দেখে সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছে। দু-বারই চোখাচোখি হতেই লাফিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

'আপনার কাছে স্ত্রী টাকা নেওয়ার কদ্দিন পরের ঘটনা এটা?'

'মাস দুই।'

'ওঁর প্রথম স্বামীর ফটো দেখেছেন?'

'না। আটলান্টায় থাকার সময়ে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়।'

'কিন্তু ডেথ-সার্টিফিকেটটা দেখতে পেয়েছেন?'

'সেটাও পুড়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি একটা কপি।'

'আমেরিকায় আপনার স্ত্রীকে চিনত, এমন কাউকে জানেন?'

'না।'

'ওঁর নামে চিঠি আসে আমেরিকা থেকে?'

'মনে তো হয় না।'

'তাহলে এক কাজ করুন। বাড়ি ফিরে যান। কুটির থেকে যদি ওরা চম্পট দিয়ে থাকে এর মধ্যে, তাহলে কিছু করার নেই। আর যদি এর মধ্যে আবার ফিরে আসে— আপনি আড়াল থেকে তা দেখতে পেলেই আমাকে টেলিগ্রাম করে দেবেন— নিজে ঢুকতে যাবেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আপনার কাছে।'

বিদেয় হলেন গ্রান্ট মুনরো।

'ওয়াটসন', বলল হোমস, 'ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। ব্ল্যাকমেলিং চলছে মনে হচ্ছে।'

'ব্ল্যাকমেলারটি কে?'

'সাজানো ঘরে যে থাকে, মিসেস মুনরোর ছবি যে ম্যান্টলপিসে সাজিয়ে রাখে[১০], যার মুখ হলদে।'

'সে কে?'

'মিসেস মুনরোর প্রথম স্বামী বলেই আমার বিশ্বাস। সেইজন্যেই দ্বিতীয় স্বামীকে ঢুকতে দিতে চান না। আমেরিকায় যাকে বিয়ে করেছিলেন, নিশ্চয় সে মারা যায়নি। অত্যন্ত কুৎসিত কুষ্ঠ জাতীয় কোনো রোগে এমন কদাকার হয়ে যায় যে ইংলন্ডে পালিয়ে আসেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের খবর নিশ্চয় এমন কেউ পেয়েছে, যে প্রথম বিয়ের খবর ফাঁস করে দেওয়ায় হুমকি দেখিয়ে টাকা দোহন করছে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। নীচু ক্লাসের ছেলে-মেয়ের কীর্তি নিশ্চয়। প্রথম কিস্তির টাকা সে নিয়েছে, কদাকার অকর্মণ্য হেব্রনকে কটেজে এনে তুলেছে, ভয় দেখিয়ে মিসেস মুনরোর ছবি পর্যন্ত আদায় করেছে। গভীর রাতে মিসেস মুনরো গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, দু-দিন পরে ফের গিয়েছিলেন ওই উদ্দেশ্য নিয়েই— কিন্তু মি. মুনরো হঠাৎ ফিরে আসায় ঝিয়ের মুখে খবর পেয়ে প্রথম স্বামীকে সেই বদ চরিত্রের মেয়েছেলেটির সঙ্গে পাচার করে দেন পেছনের দরজা দিয়ে।'

'সবই তো আন্দাজে বলে গেলে।'

'এ ছাড়া আপাতত আর কিছু দরকার নেই।'

বিকেলে টেলিগ্রাম এল গ্রান্ট মুনরোর কাছ থেকে। বাড়িতে লোক দেখা গেছে। সাতটার গাড়িতে যেন হোমস রওনা হয়।

যথাসময়ে পৌঁছোলাম নর্বুরিতে। স্টেশনে দেখা হল গ্রান্ট মুনরোর সঙ্গে। উত্তেজনায় কাঁপছেন ভদ্রলোক। ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে, 'আপনার পাছে অমঙ্গল হয় তাই আপনার স্ত্রী আপনাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিতে নারাজ। তা সত্ত্বেও কি ঢুকবেন?'

'হ্যাঁ। এসপার কি ওসপার হয়ে যাক আজকে।'

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে পৌঁছোলাম কটেজটার সামনে। দোতলার একটা জানলায় আলো জ্বলছে। একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল জানলার সামনে দিয়ে।

'ওই... ওই... ওই সেই হলদে মুখ!' যেন ককিয়ে উঠলেন গ্রান্ট মুনরো।

আমরা সবেগে ধেয়ে গেলাম সদর দরজার সামনে। আচমকা খুলে গেল পাল্লা। পথ আটকে দাঁড়ালেন এক ভদ্রমহিলা।

'জ্যাক... জ্যাক... দোহাই তোমার... আমাকে বিশ্বাস করো... ভেতরে যেয়ো না।'

'না, এফি, বড্ড বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছি তোমাকে।' পাশ দিয়ে তেড়ে গেলাম তিন মূর্তি ভেতরে। একজন প্রৌঢ়া বেরিয়ে এসে পথ আটকাতে গিয়েও পারল না। ঝড়ের মতো উঠে গেলাম দোতলায়, সেই ঘরটিতে ঢুকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঘরটা সত্যিই সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। ঝুঁকে রয়েছে একটা ছোট্ট মেয়ে। পরনে লাল ফ্রক। হাতে লম্বা সাদা দস্তানা। মুখটা আমাদের দিকে ফেরাতেই ভয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। সে-মুখে প্রাণের কোনো সাড়া নেই, স্পন্দন নেই, রং নেই, অদ্ভুত হলদে। আড়ষ্টতা মুখের পরতে পরতে। ভাবলেশহীন বিষম বিকট।

পরমুহূর্তেই অবসান ঘটল রহস্যের। একলাফে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মুখ থেকে একটানে একটা মুখোশ খুলে আনল হোমস, মিশমিশে কালো একটা নিগ্রো মেয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে পরম কৌতুকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখচ্ছবি দেখে।

হেসে উঠলাম আমিও মেয়েটির কৌতুক-উজ্জ্বল সরল হাসি দেখে। আর গ্রান্ট মুনরো? চেয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে।

'এ আবার কী!'

'বলছি আমি,' ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন নীচতলার সেই মহিলা। 'আমার প্রথম স্বামী আটলান্টায় মারা গেছে ঠিকই— কিন্তু মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে!'

'তোমার মেয়ে!'

গলায় ঝোলানো রুপোর লকেটটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এর মধ্যে কী আছে এই তিন বছরে তুমি দেখনি।'

'আমি তো জানি ওটা খোলা যায় না।'

খুট করে একটা আওয়াজ হল। স্প্রিংয়ে চাপ পড়তেই ডালা খুলে গেল লকেটের। ভেতরে দেখা গেল বুদ্ধি-উজ্জ্বল সুদর্শন এক পুরুষের প্রতিমূর্তি— আফ্রিকার কৃষ্ণকায় পুরুষ।

'জ্যাক, এই আমার প্রথম স্বামী— জন হেব্রন। এর চাইতে উদার মহৎ মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। বে-জাতে বিয়ে করেও[১১] তাই কখনো পস্তাতে হয়নি। মেয়েটা কিন্তু দেখতে হল ওর মতো। বরং ওর চাইতেও কালো।[১২] তাহলেও সে আমার সোনা মেয়ে।'

এই পর্যন্ত শুনেই মেয়েটা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

'মেয়েটাকে আমেরিকায় রেখে এসেছিলাম শরীর খারাপ ছিল বলে— হঠাৎ জায়গা পালটানোর ধকল সইতে পারত না। একজন আয়া ঠিক করে এসেছিলাম— সে-ই ওকে দেখাশুনা করত। সংকোচবশত তোমাকে ওর কথা বলতে পারিনি, সেটাই ভুল করেছি। চিঠিপত্র নিয়মিত পেয়েছি। জানতাম ও ভালোই আছে। বিয়ের তিন বছর পরে কিন্তু বড্ড মন কেমন করতে লাগল মেয়েটার জন্যে। এক-শো পাউন্ড পাঠালাম ওকে নিয়ে এখানে আসবার জন্যে। তখনও যদি তোমার কাছে লুকোছাপা না-করতাম, এত কাণ্ড আর ঘটত না। ভেবেছিলাম, কয়েক

সপ্তাহ কাছে এনে রাখব। কটেজ ভাড়া করা হল। আয়াকে বলে দিয়েছিলাম দিনের আলোয় যেন কখনো মেয়েকে রাস্তায় বার না-করে। মুখ আর হাত মুখোশ আর দস্তানা দিয়ে ঢেকে রাখে, যাতে জানলায় যদি কেউ দেখেও ফেলে, পাড়ায় কালো মেয়ে এসেছে বলে প্রতিবেশীরা কানাকানি না আরম্ভ করে। এতটা আটঘাট না-বাঁধলেই দেখছি মঙ্গল হত। আমার মাথার ঠিক ছিল না পাছে তুমি সব জেনে ফেলো, এই ভয়ে।

'তোমার মুখেই শুনলাম, ওরা এসে গেছে। মায়ের মন তো, তাই তর সইল না। তোমার ঘুম খুব গাঢ় বলে ঠিক করলাম রাতেই মেয়েটাকে গিয়ে কোলে নিই। কিন্তু তুমি দেখে ফেললে। তিনদিন পর যখন জোর করে কটেজে ঢুকেছিলে, ঠিক তার আগেই ওরা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। জ্যাক, এই হল আমার গোপন কাহিনি। এখন বল কী করবে হতভাগিনী মা আর মেয়েকে নিয়ে।'

মিনিট দুই ঘর স্তব্ধ। তারপর গ্রান্ট মুনরো যা করে বসলেন, তাতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল উপস্থিত প্রত্যেকের।

'তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

মেয়েটাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। আর এক হাত বাড়িয়ে বউকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'আমি লোকটা ততটা ভালো না-হলেও খুব একটা খারাপ নই, এফি। চলো, বাড়ি গিয়ে কথা হবে।'

বাইরে এল হোমস। বোজা গলায় বললে, 'ওয়াটসন, চলো লন্ডন ফিরি।'

সারাদিন গুম হয়ে রইল বন্ধুবর। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বললে, 'যখন দেখবে অহংকারে মট মট করছি অথবা গুরুত্বপূর্ণ কেসে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি না, মন্ত্র পড়ার মতো "নর্বুরি" নামটা কানে কানে শুনিয়ে দেবে।'

টীকা

১. **হলদে মুখের কাহিনি :** 'দ্য ইয়েলো ফেস' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়। নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ তারিখের সংখ্যায়।

২. **প্রথম শ্রেণির বক্সারদের মধ্যে ওর স্থান :** 'দ্য সাইন অব ফোর' উপন্যাসের চরিত্র ম্যাকমুর্দোকেও এ-কথা বলতে শোনা গিয়েছে। ইংলন্ডে আধুনিক বক্সিং চালু হয় ১৮৬৭ সালে। কুইন্সবেরির অষ্টম মার্কুইস জন শোল্টো ডগলাস এবং জন গ্রাহাম চেম্বার্স প্রণীত কুইন্সবেরি রুলস মোতাবেক ইংলন্ডে বক্সিং পরিচালিত হত। স্যার আর্থার কন্যান ডয়ালের যে বক্সিং-এ বিশেষ উৎসাহ ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর 'রডনে স্টোন' (১৮৯৬) উপন্যাস থেকে।

৩. **বাগানে :** কোন বাগানে? বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে বাগান ছিল না। তবে কাছাকাছি অবস্থিত রিজেন্ট পার্ক হওয়া সম্ভব।

৪. **অম্বর :** Amber। কোটি-কোটি বছর আগে জমাট হয়ে যাওয়া গাছের আঠা। অনেক সময়ে এর ভেতরে ফুল, পাতা, পোকামাকড়ের জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

৫. **গ্যাসের শিখায় পাইপ জ্বালেন :** শার্লক হোমসকেও কখনো এভাবে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে। দ্রষ্টব্য : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন'।

৬. **আটলান্টায় :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর।

৭. **পীতজ্বর :** উনবিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, প্রায় প্রত্যেক গ্রীষ্মেই পীতজ্বর বা ইয়েলো ফিভার মহামারির আকার ধারণ করত। ১৮৫৩-তে নিউ অর্লিয়েন্স শহরে পীতজ্বরের প্রকোপে প্রায় ন-হাজার মানুষ মারা যান। তবে ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আটলান্টায় কোনো পীতজ্বরের মহামারি ঘটে বলে জানা যায় না। হাভানায় আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ দেখা দিলে বা ওয়ল্টার রীড সেখানে নানাবিধ পরীক্ষা চালিয়ে আবিষ্কার করেন এই রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী এডিস ইজিপ্টা নামে এক জাতের মশা। ১৯৩৭ সালে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়।

৮. **ডেথ সার্টিফিকেট :** আটলান্টা শহরে বা সমগ্র জর্জিয়া রাজ্যে ডেথ সার্টিফিকেটের প্রচলন হয় ১৯১৪ সালে। সেক্ষেত্রে হেব্রনের ডেথ সার্টিফিকেট কীভাবে দেখলেন হোমসের মক্কেল? সেটি কি জাল? নাকি লেখক ভুল করেছেন?

৯. **জ্যাক :** 'জ্যাক' আবার কোথা থেকে এল? হোমসের মক্কেলের প্রথম নাম তো গ্রান্ট!

১০. **ছবি যে ম্যান্টলপিসে সাজিয়ে রাখে :** যে এফি মুনরোকে ব্ল্যাকমেল করবে, তার পক্ষে ম্যান্টলপিসে এফির ছবি সাজিয়ে রাখা একটু কষ্টকল্পিত।

১১. **বে-জাতে বিয়ে করেও :** জর্জিয়া রাজ্যের তৎকালীন আইনে কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে নিগ্রোর বিবাহ আইনবহির্ভূত কাজ হিসেবে গণ্য হত। বিয়ে যদি অন্য রাজ্যেও হয়ে থাকে, জর্জিয়ায় আসামাত্র হেব্রন এবং এফির বিয়ে বেআইনি ঘোষিত হওয়ার কথা।

১২. **বরং ওর চাইতেও কালো :** নৃতত্ত্ববিদদের মতে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গের সন্তানের পক্ষে এমন হওয়া সম্ভব নয়। এফি-র মেয়ের গায়ের রং হওয়ার কথা সাদা এবং কালোর মাঝামাঝি। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের বলা হয় 'মুল্যাটো' (Mulatto)।

সোনা-দাঁতের রহস্য[১]

[দ্য স্টকব্রোকার্স ক্লার্ক]

বিয়ের পরেই আমি প্যাডিংটন জেলায় এক বুড়ো ডাক্তারের পড়ন্ত প্র্যাকটিস কিনেছিলাম[২]। বউকে নিয়ে থাকতামও সেখানে। বেকার স্ট্রিটে যাওয়া শিকেয় উঠেছিল পসার জমাতে গিয়ে। দীর্ঘদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি শার্লক হোমসের সঙ্গে।

জুন মাস। সকাল বেলা। প্রাতঃরাশ সবে শেষ হয়েছে। ব্রিটিশ জার্নাল[৩] পড়ছি। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল হোমস।

আমি তো অবাক ওর হঠাৎ আগমন দেখে। ও বলল, 'ওহে ওয়াটসন, ডাক্তারি করতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি তথ্যবিশ্লেষণী সমস্যায় আগ্রহ এখনও আছে তো?'

'বিলক্ষণ। কাল রাতেই পুরোনো কেসগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম।'

'আরও কেস চাও?'

'নিশ্চয়।'

'বার্মিংহামে যেতে হবে কিন্তু। রুগি কে দেখবে?'

'প্রতিবেশী ডাক্তার[৪]। তিনি ছুটি নিলে তাঁর রুগি আমি সামলাই, আমার রুগিও তিনি সামলাবেন।'

হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে অর্ধনিমীলিত চোখে আমাকে দেখতে দেখতে হোমস বললে, 'সর্দি লেগেছিল দেখছি।'

'তা লেগেছিল। কিন্তু এখন তো সেরে গেছে। তুমি জানলে কী করে?'

'তোমার চটি দেখে।'

পায়ের নতুন চটিজোড়ার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিন্তু বুঝলাম না চটির সঙ্গে সর্দির কী সম্পর্ক।

হোমস বললে, 'চটিজোড়া নতুন, কিন্তু শুকতলা আগুনে ঝলসানো। প্রথমে ভেবেছিলাম বৃষ্টিতে ভিজিয়েছ বলে আগুনের সামনে রেখে শুকিয়েছ। তারপর দেখলাম, ভেতরে সাঁটা দোকানের লেবেলটা এখনও রয়েছে— তার মানে জলে ভেজেনি। ভিজলে লেবেলও উঠে যেত। জুন মাসে বৃষ্টিবাদলা তো থাকেই। তা সত্ত্বেও শুকনো চটি পরে আগুনের সামনে শুকতলা এগিয়ে দিয়ে যখন বসে ছিলে, তখন বুঝে নিতে হবে সর্দি লেগেছিল তোমার। যাই হোক, চল বেরিয়ে পড়ি। মক্কেলকে গাড়িতে বসিয়ে এসেছি।'

প্রতিবেশী ডাক্তারকে চিঠি লিখেছিলাম। বউকে সব কথা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল হোমস।

বলল, 'তোমার প্রতিবেশী ডাক্তারের বাড়িতে যত রুগি এসেছে, তার চাইতে বেশি রুগি এসেছে কিন্তু তোমার এই বাড়িতে।'

'তা তো আসবেই। আমি যাঁর প্র্যাকটিস কিনেছি, তাঁর পসার অনেক বেশি ছিল যে। বুড়ো হয়ে নিজেই রুগি হয়ে গেলেন বলে প্র্যাকটিস বেচে দিলেন। কিন্তু তুমি তা জানলে কী করে?'

'সিঁড়ি দেখে। তোমার সিঁড়ি পাশের বাড়ির সিঁড়ির চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি ক্ষয়েছে। গাড়িতে

যিনি বসে আছেন, ওঁর নাম মি. হল পাইক্রফট। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। কোচোয়ান, জোরসে চালাও— ট্রেন ধরতে হবে।'

গাড়ির মধ্যে আসীন যুবাপুরুষটি বেশ চটপটে, সুদর্শন। চেহারা দেখে চালাকচতুর বলেই মনে হয়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে বিপদের অশনিসংকেত ঝুলছে। ট্রেনে ওঠার পর জানলাম বিপদটা কী।

হোমস বললে, 'মি. পাইক্রফট, সত্তর মিনিট ট্রেনে বসে থাকতে হবে। এই ফাঁকে বরং আপনার মজার ব্যাপারটা ডা. ওয়াটসনকে আর একবার বলুন, কিছু বাদ দেবেন না।'

হল পাইক্রফট বলতে শুরু করলেন।

'ব্যাপারটা মজারই বটে। যেন আমাকে নিয়ে কেউ দারুণ রগড় আরম্ভ করেছে।

'কক্সন অ্যান্ড উডহাউস কোম্পানিতে পাঁচ বছর চাকরি করেছি আমি। হঠাৎ তারা দেউলে হয়ে যাওয়ায় আমার চাকরিটি গেল। মালিক একটা ভালো সুপারিশপত্র দিলেন। তাই নিয়ে সমানে চাকরির দরখাস্ত করে চললাম। জমানো টাকা শেষকালে একদিন ফুরিয়ে এল। এই সময়ে লোম্বার্ড স্ট্রিটের মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস-এ একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম। কোম্পানিটি লন্ডন শহরের সবচেয়ে বড়ো শেয়ার-দালালের কোম্পানি। কী কপাল দেখুন, পত্রপাঠ জবাব চলে এল। সামনের সোমবার যেন হাজির হই। চেহারাটা খুবসুরত হলে চাকরি আমি পাবই। কাজকর্ম আগের কোম্পানিতে যা করেছিলাম— সেইরকমই। কিন্তু মাইনে বেশি। পাচ্ছিলাম সপ্তাহে তিন পাউন্ড— এখানে চার পাউন্ড।

'যেদিন চিঠিটা পেলাম, সেইদিনই সন্ধে নাগাদ বাড়ি এল একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক। চোখও কালো। মাঝবয়েসি। নাম, আর্থার পিনার। পেশায় ফিনান্সিয়াল এজেন্ট। ভিজিটিং কার্ড দেখে জানলাম।

'ভদ্রলোক বেশ চটপটে। বাজে কথায় সময় নষ্ট করার মানুষ নন। এসেই বললেন, ''আপনিই তো মি. হল পাইক্রফট?''

'চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, ''হ্যাঁ।''

''কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে আগে কাজ করতেন?''

''হ্যাঁ।''

''আপনার নাম শুনেছি। কক্সনের ম্যানেজার পার্কার আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।''

''তাই নাকি?''

''আপনার স্মৃতিশক্তি কীরকম?''

''খারাপ নয়।''

''শেয়ার মার্কেটের খবর রাখেন?''

''রোজ সকালে স্টক এক্সচেঞ্জ পড়ি[৫]।''

''চমৎকার! চমৎকার! একেই বলে কাজের লোক। বলুন তো, আয়ারশায়ারের[৬] কী দর যাচ্ছে?''

''এক-শো পাঁচ থেকে সওয়া পাঁচ।''

''নিউজিল্যান্ড কনসোলিডেটেড?''

''এক-শো চার।''

"ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলস?"

"সাত থেকে সাড়ে সাত।"

"শা-বাশ! শা-বাশ! দারুণ বলেছেন; সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দিলেন আমার। আপনার মতো ব্রেনের লোক মসনের খিদমত খাটবেন, এ কি হয়? আপনার স্থান আরও উঁচু জায়গায়। কবে যাচ্ছেন ওখানে?"

"সোমবার।"

"কক্ষনো যাবেন না। সোমবার থেকে আপনার চাকরি হয়ে গেল ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে; বিজনেস ম্যানেজার। শুধু ফ্রান্সেই এক-শো চৌত্রিশটা ব্রাঞ্চ আছে কোম্পানির, ব্রাসেলস আর সানরেমো-র ব্রাঞ্চ তো ধরলামই না।"

"সে কী! এ-রকম কোনো কোম্পানির তো নাম শুনিনি।"

"শুনবেন কী করে? বাজারে তো শেয়ার ছাড়া হয়নি। ভালো জাতের কোম্পানি বলেই নিজেদের মধ্যে থেকে মূলধন জোগাড় করা হয়েছে। কোম্পানির পত্তন ঘটিয়েছে আমার ভাই হ্যারি পিনার, এইবার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে। তার আগে চাই একজন চালাকচতুর কাজের লোক। পার্কারের কাছে আপনার নাম শুনেই দৌড়ে এসেছি। প্রথমটা অবশ্য বেশি দিতে পারব না, বছরে পাঁচ-শো পাউন্ড..."

"পাঁ-চ-শো পাউন্ড!"

"এ ছাড়াও শতকরা এক পাউন্ড কমিশন। মাইনে যা পাবেন, কমিশন পাবেন তার বেশি।"

"কিন্তু লোহালক্কড় সম্বন্ধে আমি তো কিস্সু জানি না।"

"বাজারদরটা তো জানেন।"

"কিন্তু আপনাদের কোম্পানি একেবারে নতুন..."

"বেশ তো, এই নিন এক-শো পাউন্ড আগাম।"

"কাজ শুরু করব কখন?" আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললাম আমি।

"কাল দুপুর একটায় বার্মিংহামে ১২৬বি কর্পোরেশন স্ট্রিটে গিয়ে দেখা করুন আমার ভাইয়ের সঙ্গে। চাকরি পাকা করবে সে-ই। দয়া করে এই কাগজটায় লিখে দিন, 'কম করে পাঁচ-শো' পাউন্ড মাইনেয় ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে বিজনেস ম্যানেজারের চাকরি নিতে আমার ইচ্ছা আছে।'... ঠিক আছে, ওতেই হবে। এবার বলুন, মসনের চাকরির কী হবে?"

"লিখে জানিয়ে দিচ্ছি চাকরি চাই না।"

"আরে না, না। ওটি করবেন না। মসনের ম্যানেজার আমাকে বলে কিনা আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে ভালো জায়গায় বসাচ্ছে— এর চাইতে ভালো চাকরি আপনাকে কেউ দেবে না। আমিও বাজি ধরে এসেছি, কাজের লোকের কখনো ভালো মাইনের অভাব ঘটবে না।"

"শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল— আচ্ছা বদমাশ লোক তো! জীবনে যার মুখও দেখিনি, তার এতবড়ো কথা? ঠিক আছে, যাব না, চিঠিও লিখব না।"

'বিদায় নিলেন আর্থার পিনার। আনন্দের চোটে অর্ধেক রাত ঘুমোতে পারলাম না। খাম পোস্টকার্ড কেনার পয়সা পর্যন্ত ছিল না— হঠাৎ ট্যাঁক গরম হয়ে গেল নগদ এক-শো পাউন্ডে।

'পরের দিন গেলাম বার্মিংহামে। হোটেলে উঠলাম। ঠিকানা খুঁজে একটু আগেই পৌঁছোলাম

বাড়িটায়[৭]। নীচের তলায় অনেক কোম্পানির নাম লেখা বোর্ড ঝুলছে, কিন্তু ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির নাম কোথাও দেখলাম না। তবে কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হল? হতভম্ব হয়ে ভাবছি কী করব, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক। চেহারা আর গলার স্বরের দিক দিয়ে আর্থার পিনারের মতো দেখতে, শুধু যা দাড়ি গোঁফ কামানো— চুলও অতটা কালো নয়।

'এসেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই মি. হল পাইক্রফট?"

"হ্যাঁ।"

"আমি হ্যারি পিনার। আজ সকালে ভাইয়ের চিঠি পেয়েছি। খুব তারিফ করেছে আপনার।"

"আপনাদের অফিসটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"পাবেন কী করে? এই তো দিন সাতেক একটা সাময়িক ডেরা জোগাড় করেছি। এখনও বোর্ড ঝোলানো হয়নি। চলুন।"

'সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় দু-ঘরের একটা ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে গেলেন হ্যারি পিনার। আসবাবপত্রের চেহারা দেখে বুক দমে গেল। ঝকঝকে তকতকে টেবিল চেয়ার আর সারি সারি কেরানি বসে-থাকা অফিসঘরে কাজ করে আমি অভ্যস্ত— এরকম ধূলিধূসরিত দু-খানা চেয়ারওলা একখানা টেবিল আর কিছু লেজার বই সমেত অফিসঘর কখনো দেখিনি।

'হ্যারি পিনার আমার হতভম্ব মুখ দেখে চিন্তাটা আঁচ করে নিয়ে বললেন, "অফিসটা সাজানোর পর্যন্ত সময় পাইনি। রাতারাতি কি সব হয়? কিন্তু টাকা যখন আছে, আস্তে আস্তে সব হবে। বসুন।"

'আমার কাগজপত্র দেখলেন হ্যারি পিনার। বললেন, "চাকরি আপনার পাকা হয়ে গেল। ভাইয়ের পছন্দ আছে দেখছি।"

"আমার কাজটা কী?"

"ফ্রান্সের বড়ো গুদামটার চার্জে থাকবেন। আপাতত দিন সাতেক বার্মিংহামে থাকুন— কেনাকাটা তদারক করুন।"

'কীভাবে?'

ড্রয়ার থেকে একটা মোটা লাল বই বার করে হ্যারি পিনার বললেন, 'এই বইটিতে যাদের পাশে দেখবেন লোহালক্কড়ের কারবারি বলে লেখা আছে, তাদের নাম আর ঠিকানার একটা আলাদা লিস্ট করুন।'

'কিন্তু এ-রকম লিস্ট তো পাওয়া যায়।'

'সে-লিস্ট সুবিধের নয়। আমাদের কাজে লাগবে না। সোমবার বারোটার মধ্যে লিস্টটা আমাকে এনে দিন। এখন আসুন।'

'সাত-পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে মোটা বইখানা বগলে করে হোটেলে ফিরলাম। অফিসের ছিরি দেখে মনটা দমে গিয়েছে ঠিকই, কোম্পানির নামও দেখলাম না— কিন্তু চাকরি তো পাকা হয়ে গিয়েছে, পকেটের আগাম এক-শো পাউন্ড গজগজ করছে। কাজেই রোববার সারাদিন খাটলাম। সোমবার গেলাম 'এইচ' পর্যন্ত নামের লিস্ট নিয়ে। ফাঁকা ঘরে দেখা হল হ্যারি পিনারের সঙ্গে। আমাকে আসতে বললেন বুধবার। বুধবারও কাজ শেষ হল না। শুক্রবার, মানে, গতকাল

আবার গেলাম ভদ্রলোকের কাছে। উনি বললেন, এবার বাসন-কোসন বিক্রি করে, তাদের নাম-ঠিকানার একটা লিস্ট যেন জানাই। আরও বললেন, আজকে সন্ধে সাতটার সময়ে যেতে। তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। সারাদিন খেটেখুটে ঘণ্টা দুয়েক নাচগানের আড্ডায় ফুর্তি করে যাওয়াই ভালো।

'ডা. ওয়াটসন, এই কথাটা বলেই তিনি হেসে উঠলেন। এবং আমি আঁতকে উঠলাম তাঁর দাঁত দেখে। বাঁ-দিকের ওপরের পাটির দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে।'

এই পর্যন্ত শুনে সোৎসাহে সানন্দে হাত ঘষল শার্লক হোমস। বিস্মিত চোখে হল পাইক্রফটের দিকে চাইলাম আমি।

উনি বললেন, 'ডা. ওয়াটসন, লন্ডনে আর্থার পিনার একবার হেসে উঠেছিলেন মসন কোম্পানির চৌকাঠ মাড়াব না শুনে। তখন সোনা দাঁতের ঝিকিমিকি দেখেছিলাম বাঁ-দিকের ওপরের পাটিতে। অবিকল সেই সোনা দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠল হ্যারি পিনারের বাঁ-দিকের ওপরের পাটিতে। এ কী করে হয়? চেহারা আর গলার স্বর একরকম, গোড়া থেকে ধরতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম সহোদর ভাই বলেই হয়তো মিলটা থেকে গিয়েছে। কিন্তু সোনার দাঁত পর্যন্ত দু-ভাইয়ের একরকম হতে পারে কি? খটকা লাগল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম পরচুলো পরে চেহারা পালটানো হয়েছিল। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পরচুলো ফেলে ভোল ফেরানো হয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই প্রহসন আমার মতো ছাপোষা মানুষের সঙ্গে? ভেবে ভেবে কূলকিনারা না-পেয়ে মি. শার্লক হোমসের কাছে দৌড়ে এসেছি।'

ঘর নিস্তব্ধ। অপাঙ্গে আমার পানে চাইল শার্লক হোমস।

বলল, 'মি. আর্থার হ্যারি পিনারের সঙ্গে আমরা দুই বন্ধু দেখা করতে চলেছি।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'চাকরি চাওয়ার অছিলায়,' বললেন হল পাইক্রফট।

'ভদ্রলোকের সুরতটা একবার না-দেখলে তাঁর চালাকিটার মানে ধরা যাবে না', বলে জানলা দিয়ে বাইরে শূন্যগর্ভ দৃষ্টি মেলে রইল হোমস— বাকি পথটা মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বার করতে পারলাম না।

সন্ধে হয়েছে। বার্মিংহামের পথ বেয়ে চলেছি ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি অভিমুখে।

হল পাইক্রফট বললেন, 'আগেভাগে গিয়ে লাভ নেই— ঘরে কেউ থাকবে না।'

'খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু', বললে হোমস।

'ওই তো উনি যাচ্ছেন' চাপা স্বরে বললেন হল পাইক্রফট।

দেখলাম, আমাদের সামনে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছে সুদর্শন, সুবেশ খর্বকায় এক ব্যক্তি। একটা সান্ধ্য দৈনিক কিনে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা বাড়ির মধ্যে।

'ওই হল কোম্পানির অফিস', বলে আমাদের নিয়ে হল পাইক্রফট ঢুকলেন ভেতরে। সোজা উঠে গেলাম পাঁচতলায়। আধখোলা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলেন পাইক্রফট। ভেতর থেকে গলা শোনা গেল, 'আসুন।'

'ঢুকলাম তিনজনে। আসবাবহীন ন্যাড়া একটা ঘর। একটিমাত্র টেবিলের ওপর সান্ধ্যদৈনিক মেলে বসে সেই ভদ্রলোক। আমরা ঢুকতেই মুখ তুলে চাইল। দেখলাম নিঃসীম আতঙ্ক, অপরিসীম দুঃখশোক মূর্ত হয়ে উঠেছে মুখের পরতে পরতে। গাল নীরক্ত মরামাছের পেটের মতো তলতলে ফ্যাকাশে। চোখ উদ্ভ্রান্ত— কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কল্পনাতীত ভয় যেন তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। হল পাইক্রফটের দিকে চেয়েও যেন তাঁকে চিনতে পারল না।

'মি. পিনার, আপনার শরীর খারাপ মনে হচ্ছে?' সবিস্ময়ে বললেন হল পাইক্রফট।

'এঁরা কে?' শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললে ভয়ার্ত ভদ্রলোক।

'চাকরির জন্যে এসেছেন। মি. হ্যারিস। মি. প্রাইস।'

'তাই নাকি? বেশ তো, চাকরি নিশ্চয় হবে,' ফ্যাকাশে হাসি হাসল মি. পিনার। 'কী কাজ জানেন বলুন।'

'আমি হিসেবপত্র রাখতে জানি,' বললে হোমস।

'আমি কেরানির কাজে পোক্ত,' বললাম আমি।

'বেশ, বেশ, আপনাদের মতো লোকই আমার দরকার। কিন্তু এখন আসুন। আমাকে একলা থাকতে দিন।'

চেষ্টা করেও ভদ্রলোক আর সামলাতে পারল না নিজেকে। শেষের দিকে চুরমার হয়ে গেল সংযম।

দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমরা তিনজনে।

হল পাইক্রফট বললে, 'কিন্তু আমাকে আসতে বলা হয়েছে এই সময়ে আরও কাজ দেবেন বলে।'

'ঠিক আছে,' অতি কষ্টে সহজ সুরে বলল পিনার। 'আপনারা তিনজনেই বসুন। আমি মিনিট তিনেকের মধ্যে আসছি।'

বলে পেছনের দরজা খুলে ঢুকল অন্য ঘরে এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল পেছন থেকে।

'পালাল নাকি?' চাপা গলায় বললে হোমস।

'সম্ভব নয়, ও-ঘর থেকে বেরোবার পথ নেই,' বললেন পাইক্রফট।

'ঘরে জিনিসপত্র আছে?'

'খালি ঘর।'

'তাহলে ওখানে গেল কী করতে? ভয়ের চোটে পাগল হয়ে গেল নাকি?'

'আমরা যে গোয়েন্দা, তা আঁচ করেছে', বললাম আমি।

'উঁহু', বললে হোমস। 'আমাদের দেখে ঘাবড়ায়নি। আগে থেকেই ভয়ে আধখানা হয়ে বসে ছিল। ও কী!'

আচমকা ঠক-ঠক-ঠক-ঠক আওয়াজ ভেসে এল দরজার ওদিক থেকে। ভয়ে পাগল হয়ে গিয়ে নিজেই দরজা নক করছে নাকি? কিছুক্ষণ পর আবার আওয়াজ হল— ঠক-ঠক-ঠক-ঠক।

সেইসঙ্গে একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ। আবার কাঠের ওপর খটাখট আওয়াজ। শক্ত হয়ে গিয়েছিল হোমসের মুখ। ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা শুনেই ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল দরজায়। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল বন্ধ পাল্লায়। শক্তি প্রয়োগ করলাম আমিও। নিমেষে কবজা থেকে উপড়ে ছিটকে গেল পাল্লা। হুড়মুড় করে ঢুকলাম ভেতরে।

ঘরে কেউ নেই।

পরক্ষণেই দেখলাম, পাশে আর একটা দরজা। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে ফেলল হোমস।

এবং দেখা গেল ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। দরজার হুক থেকে গলায় প্যান্ট আটকানোর ফিতে বেঁধে ঝুলছে— পায়ের কাছে পড়ে কোট আর ওয়েস্টকোট। গোড়ালি লাগছে কাঠের পাল্লায়— আওয়াজ হচ্ছে খট-খট-খট-খট।

কোমর ধরে শরীরটা ওপরে তুলে ধরলাম আমি। হোমস আর পাইক্রফট খুলে দিল গলার ফাঁস। ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ফ্যাকাশে মুখে শুয়ে রইল মিনিট পাঁচেক— থেকে থেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল রক্তহীন ঠোঁটজোড়া।

নাড়ি পরীক্ষা করলাম। খুব ক্ষীণ, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে নিশ্বাস নেওয়া বাড়ছে— চোখের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে।

বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। বিপদ কেটে গেছে।' কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মুখে ছিটিয়ে দিলাম, দু-হাত ধরে ওঠানামা করতে লাগলাম শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আরও স্বচ্ছন্দ করার জন্যে।

প্যান্টের পকেটে হাত পুরে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল হোমস।

এবার বললে, 'পুলিশ ডাকা দরকার এখন।'

'কিন্তু আমাকে এসবের মধ্যে টেনে আনা হল কেন বুঝলাম না তো,' আমতা আমতা করে বললেন হল পাইক্রফট।

'খুব সোজা কারণে। ওয়াটসন, বুঝেছ?'

'না।'

'আরে ভায়া, মি. পাইক্রফটকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েও খুশি হয়নি আর্থার পিনার— লিখিয়ে নিয়েছিল। কেন? না, তাঁর হাতের লেখা দরকার ছিল বলে। এই গেল এক নম্বর।'

'হাতের লেখা নেওয়ার দরকার হল কেন?'

'দু-নম্বর ব্যাপারটা শুনলেই বুঝবে, কেন। মি. হল পাইক্রফট কথা দিলেন মসন কোম্পানিতে যাবেন না। যেখানকার ম্যানেজার তাঁকে দেখেননি— তিনি জানলেনও না হল পাইক্রফট আসছেন না। কাজেই তাঁর নাম নিয়ে যদি একজনকে আসতে হয়— হাতের লেখাটা অন্তত ম্যানেজারের চেনা হওয়া চাই।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠলেন হল পাইক্রফট।

'আপনি দরখাস্ত লিখেছিলেন যে হাতের লেখায়, হুবহু সেই লেখাটি নকল না-করলে আপনার নাম নিয়ে চাকরিতে যোগ দেওয়া একটু মুশকিলের ব্যাপার বই কী। তাই আপনাকে দিয়ে দু-লাইন লিখিয়ে নেওয়া হল এবং সেইভাবে হাতের লেখা মকশো করে মি. হল পাইক্রফট সেজে এমন একটা অফিসে যাওয়া হল যেখানে মি. হল পাইক্রফটকে কেউ দেখেনি।'

'পাইক্রফট তাঁর জোড়া হাত দুটো হাওয়ায় ছুড়লেন।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'বলেন কী!'

'আপনি যেন আবার সেখানে গিয়ে না-পড়েন, এই ভয়ে এক-শো পাউন্ড আগাম দিয়ে উড়ো কোম্পানির অফিসে আটকে রাখা হল আপনাকে। বাজে কাজে ধরে রাখা হল যাতে লন্ডন আসতে না-পারেন।'

'কিন্তু একই লোক নিজের ভাই সাজতে গেল কেন?'

'কারণ এই বদমাশদের দলে দুজনের বেশি লোক নেই বলে। একজন গেল মসন কোম্পানিতে আর একজন ভোল পালটে আপনাকে লন্ডন থেকে টেনে এনে আটকে রাখল এখানে। কিন্তু তার সোনা বাঁধানো দাঁতটা দেখিয়ে করল বিপত্তি।— এই পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। কিন্তু বুঝতে পারছি না আমাদের দেখেই হঠাৎ গলায় দড়ি দেওয়ার শখ হল কেন লোকটার।'

'কাগজটা পড়লেই বুঝবেন। আচমকা ভাঙা-ভাঙা স্বর শুনলাম পেছনে। দেখি, মুমূর্ষু ব্যক্তি উঠে বসেছে। মুখের রং ফিরে আসছে। গলায় জড়ানো ফিতেতে উদ্ভ্রান্তের মতো হাত ঘষছে।

'ঠিকই তো!' লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস। 'এ-রহস্যের জবাব তো কাগজের মধ্যেই রয়েছে। আচ্ছা বোকা তো আমি। কাগজটা আগেই দেখা উচিত ছিল।'

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল হোমস।

বললে সোল্লাসে, 'লন্ডনের কাগজ! এই দেখ হেডলাইন। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কোম্পানিতে নরহত্যা। ডাকাতির চেষ্টা বানচাল। আততায়ী গ্রেপ্তার। ওয়াটসন, জোরে পড়ো, সবাই শুনি।'

ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি পড়লাম।

'আজ বিকেলে শহরে একটা বিরাট ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে— কিন্তু একজন নিহত হয়েছে। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কোম্পানির কাছে গচ্ছিত দশলক্ষ পাউন্ডের শেয়ারের কাগজপত্র লুঠের চেষ্টা হয়। কিছুদিন আগে মি. হল পাইক্রফট এই ছদ্মনামে কুখ্যাত জালিয়াত আর সিন্দুকে চোর বেডিংটন চাকরি নেয় ওই কোম্পানিতে। এরা দু-ভাই পাঁচ বছর জেল খেটে সবে খালাস পেয়েছে। বেডিংটন নাম ভাঁড়িয়ে চাকরিতে[৮] ঢোকার পর সিন্দুক আর স্ট্রংরুমের সবকটা তালার নকল চাবি বানিয়ে নেয়।

'রেওয়াজ মাফিক শনিবার বেলা বারোটায় ছুটি পায় কেরানিরা।

সেই কারণেই একটা বিশ মিনিটে কার্পেটের থলি হাতে এক ব্যক্তিকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে পেছন নেয় সার্জেন্ট টুসন এবং পথ আটকে এক-শো হাজার পাউন্ড মূল্যের কোম্পানির কাগজপত্র উদ্ধার করে ব্যাগের মধ্যে থেকে। অফিসে ঢুকে দেখা যায়, দ্বাররক্ষকের পিণ্ডি পাকানো দেহ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা সিন্দুকের মধ্যে। নিহত ব্যক্তির করোটির পেছন দিকটা একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। ছুটির পর কিছু ফেলে এসেছে এই অছিলায় অফিস ঘরে ঢুকেছিল বেডিংটন। পেছন থেকে ডান্ডা মেরে খুন করে প্রহরীকে এবং সবচেয়ে বড়ো সিন্দুকটা ভেঙে তাড়াতাড়িতে যা পেয়েছে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বেডিংটনের সহোদর ভাইটি তার সর্ব কুকর্মে থাকে— কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিরাট এই ডাকাতিতে[৯] সে অংশ নেয়নি। পুলিশ অবশ্য তাকে খুঁজছে। বেডিংটন গ্রেপ্তার হয়েছে।'

উদ্ভ্রান্ত মূর্তিটির পানে দৃক্‌পাত করে শার্লক হোমস বললে, 'পুলিশকে খবর দিন মি. পাইক্রফট। বেডিংটনের ভাইকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমরা না হয় একটু সাহায্যই করলাম। ওয়াটসন, মানবচরিত্র দেখেছ? মায়ের পেটের ভাই খুনের অপরাধে ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে বুঝতে পেরে মনের দুঃখে নিজেই আগেভাগে ঝুলে পড়ছে ফাঁসিতে!'

টীকা

১. **সোনা-দাঁতের রহস্য** : 'দ্য স্টক ব্রোকার্স ক্লার্ক' লন্ডনের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৩-এর মার্চ সংখ্যায়। আমেরিকায় এই গল্পের প্রথম প্রকাশ নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলি-র ১১ মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায়।

২. **প্র্যাকটিস কিনেছিলাম** : মেরি মার্সটনের সঙ্গে বিয়ের আগে ড. ওয়াটসনের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আসবার কোনো বাসনা ছিল বলে জানা যায় না। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে বেরোনোর পরই সৈন্যদলে নাম লেখানোয় আগেও কখনো প্র্যাকটিস করা হয়ে ওঠেনি তাঁর। বিয়ের পরে অর্থাভাবের কারণে হয়তো প্র্যাকটিস শুরু করেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, নামকরা ডাক্তারের প্র্যাকটিস কেনবার মতো পর্যাপ্ত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?

৩. **ব্রিটিশ জার্নাল** : সম্ভবত ১৮৩২-এ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল।

৪. **প্রতিবেশী ডাক্তার** : প্রতিবেশী ডাক্তারের হাতে নিজের পসারের দায়িত্ব দিয়েছেন অনেকবার। 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম', 'দ্য ক্রুকেড ম্যান' প্রভৃতি গল্পে এমন করেছেন ড. ওয়াটসন।

৫. **স্টক এক্সচেঞ্জ পড়ি** : চেঞ্জ অ্যালি নামক রাস্তায় অবস্থিত জেনাথন'স কফি হাউসে শেয়ারের লেনদেন করতেন একদল ব্রোকার। এঁরাই ১৭৭৩-এ স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। হল পাইক্রফট রোজ সকালে যা পড়তেন, তা সম্ভবত স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হওয়া শেয়ারের দামের তালিকা।

৬. **আয়ারশায়ারের** : এই নামে কোনো কোম্পানি না-থাকলেও কখনো 'গ্লাসগো অ্যান্ড সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে'-কে এই নামে বোঝানো হয়ে থাকত। গল্পে উল্লিখিত অন্য দুটি কোম্পানি, নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটেড এবং ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলস-এর ব্যাবসা ঊনবিংশ শতকের শেষে উঠে যায়।

৭. **বাড়িটায়** : কন্যান ডয়াল বর্ণিত ১২৬বি, কর্পোরেশন স্ট্রিটের বাড়িটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু হোমস-গবেষক ফিলিপ ওয়েলার জানিয়েছেন, বর্ণনার সঙ্গে বহুলাংশে খাপ খেয়ে যায় ৩, কর্পোরেশন স্ট্রিটের বাড়িটি।

৮. **নাম ভাঁড়িয়ে চাকরিতে** : হল পাইক্রফট শহুরে, কমবয়সি মানুষ। তার বদলে মাঝবয়সি, চেহারায় বিদেশি ছাপওয়ালা বেডিংটনকে দেখে মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসের ম্যানেজারের সন্দেহ হয়নি?

৯. **বিরাট এই ডাকাতিতে** : বেশ কয়েকজন হোমস-বিশেষজ্ঞ এই গল্পে অপরাধীর কার্যপদ্ধতি বা মোডাস-অপারেন্ডির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন 'দ্য রেড-হেডেড লিগ' এবং 'দ্য থ্রি গ্যারিডেবস' গল্পের অপরাধীর পরিকল্পনার।

কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট[১]

[দ্য 'গ্লোরিয়া স্কট']

শীতকাল। রাত হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গা তাতাচ্ছি আমি আর শার্লক হোমস।

এমন সময়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, এই কাগজগুলো পড়ে দেখো। অসাধারণ কেস "গ্লোরিয়া স্কট"-এর সব কথা লেখা আছে। আর এই খবরটা পড়েই আঁতকে উঠে মারা গিয়েছিলেন সমাজের মাথা ট্রেভর।'

ড্রয়ার খুলে একটা রংচটা ছোট্ট চোঙা বার করল বন্ধুবর। ভেতর থেকে বেরোল স্লেট পাথরের মতো ধূসর একটুকরো কাগজ।

কাগজটায় টানা হাতে লেখা একটা বিচিত্র সংবাদ :

'খেল মুরগি আবার খতম। মুরগিওলা বুড়ো হাডসন কাঁদছে। যত্তোসব গাধার দল। বলে

কিনা চালান দিয়েছে লন্ডনে। বলছে, প্রাণপ্রিয় মুরগি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাও। তোমার মুরগিও মরবে।'

এ কী গোলকধাঁধা! আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে খুক খুক করে শুষ্ক হাসি হাসল হোমস।

বললাম, 'এ তো দেখছি একটা আবোল-তাবোল ব্যাপার। আঁতকে ওঠার মতো তো কিছু না।'

'কিন্তু এই খবর পড়েই ধড়াস করে পড়ে মারা গেছেন একজন শক্তসমর্থ বুড়ো ভদ্রলোক।'

'কেসটা আমাকে পড়তে বলছ কেন?'

'কারণ এই হল আমার জীবনের প্রথম কেস।'

নিমেষে জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। শার্লক হোমসের প্রথম মামলা নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল বরাবর।

পাইপ টানতে টানতে ও বলল, 'কলেজে[২] থাকতে আমার বন্ধু বলতে ছিল একজনই— ভিক্টর ট্রেভর। কারো সঙ্গে মিশতাম না। ঘরে বসে নিজের পড়া নিয়ে থাকতাম, তরবারি যুদ্ধ আর মুষ্টিযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো ব্যায়ামে ঝোঁকও ছিল না।'

'ভিক্টরের বুলটেরিয়ার কুকুরটা[৩] একদিন আমার পায়ে কামড়ে দেয়। পা নিয়ে শুয়ে রইলাম দশদিন। খোঁজখবর নিতে আসত ভিক্টর। সেই থেকেই নিবিড় হল বন্ধুত্ব। ছুটি কাটানোর জন্যে নেমন্তন্ন করল ওর দেশের বাড়িতে— নরফোকের ডনিথর্পে[৪]।

'জায়গাটা ভালো। ছোট্ট গ্রাম হলেও বেশ ছিমছাম। মাছধরা আর বুনো হাঁস শিকার নিয়ে একটা মাস দিব্যি কাটিয়ে নেওয়া যায়। লাইব্রেরিতে বাছাই-করা বইয়ের সংগ্রহ। সব দিক দিয়ে ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা।

'ভিক্টরের বুড়ো বাবা মানুষটা চমৎকার। ও অঞ্চলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার তিনি। বিপত্নীক। ভিক্টর ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। এক মেয়ে ছিল— ডিপথেরিয়ায়[৫] মারা গেছে। বৃদ্ধ হলেও বেশ শক্তসমর্থ। নীল-নীল চোখে ভয়ংকরের ইশারা। রোদেপোড়া তামাটে রং। সারাজীবন তিনি প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়েছেন— যা কিছু শিখেছেন, সারাপৃথিবীতে টহল দিয়ে শিখেছেন— বই-পড়া-বিদ্যে বিশেষ নেই। গ্রামের লোক কিন্তু তাঁকে মাথায় করে রাখে দরাজ হৃদয়ের জন্যে।

'ডনিথর্পে যাওয়ার দিনকয়েক পরের ঘটনা। রাত্রে খাওয়ার পর টেবিলে বসে গল্পগুজব করছি। আমার বিশ্লেষণী শক্তি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার গল্প বলছিল ভিক্টর। তখনও অবশ্য জানতাম না এ-শক্তিকে ভবিষ্যতে কী কাজে লাগাব।

'ভিক্টরের বাবা সব শুনে মুচকি হেসে বললেন, "বেশ তো, আমার সম্বন্ধে দেখি কী বলতে পার।"

'আমি বললাম, "গত এক বছর ধরে মার খাবার ভয়ে আধখানা হয়ে আছেন আপনি।"

'হাসি মিলিয়ে গেল বুড়োর মুখ থেকে। চোখ বড়ো বড়ো করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর ঢোক গিলে বললেন, "খাঁটি কথা। গত বছর চোরাশিকারীদের দলটা তছনছ করার পর থেকেই আমাকে চোরাগোপ্তা করার ফিকিরে ঘুরছে ওরা। স্যার এডওয়ার্ড হবিকে[৬] তো ছুরিও মেরেছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয় সেই কারণেই। কিন্তু বাবা হোমস, তুমি জানলে কী করে?"

'আপনার লাঠি দেখে। লাঠির ওপর খোদাই করা তারিখটা একবছর আগেকার। একবছর আগে কেনা লাঠির মাথায় কিন্তু ছ্যাঁদা করে তরল সিসে ঢেলে সাংঘাতিক হাতিয়ার বানিয়েছেন। মারধরের ভয় না-থাকলে এ-রকম অস্ত্র অষ্টপ্রহর কেউ সঙ্গে রাখে না।'

'আর কী জান বল?'

'বয়সকালে খুব বক্সিং লড়েছেন।'

'নাক দেখে বললে বুঝি? ঘুসি খাওয়া থ্যাবড়া নাক নাকি?'

'কান দেখে বললাম। বক্সারদের কানের মতো আপনার কানও চেপটা আর পুরু।'

'আর কিছু?'

'খোঁড়াখুঁড়ি করে হাতে কড়া ফেলেছেন।'

'সোনার খনি থেকেই যে এত টাকা করেছি।'

'নিউজিল্যান্ডে ছিলেন এককালে।'

'এক্কেবারে ঠিক।'

'জাপানেও ছিলেন।'

'ঠিক, ঠিক।'

'এমন একজনকে আপনি চিনতেন যাকে আপনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করছেন। তার নামের প্রথম দুটো অক্ষর— জে. এ.।'

'চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন মি. ট্রেভর। বিশাল নীল চোখে ভয়ংকরভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপরেই দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লেন এঁটোকাঁটা ছড়ানো টেবিলের ওপর। দেখলাম, অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

'এ-রকম একটা কাণ্ড হবে ভাবতেই পারিনি। যাই হোক, চোখ-মুখে জল দেওয়ার পর তো উঠে বসলেন।

'কাষ্ঠ হেসে বললেন, ''বাইরেটা আমার শক্ত হলেও ভেতরটা খুবই কমজোরি। হোমস, কীভাবে এত অনুমান কর জানি না। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। এবং গোয়েন্দাগিরিই তোমার পেশা হওয়া উচিত। গল্পের বা বাস্তবের কোনো গোয়েন্দাই তোমার কাছে পাত্তা পাবে না।'

'ওয়াটসন, সেই প্রথম মনে হল, শখ করেও যদি এই বিশ্লেষণী শক্তিকে কাজে লাগাই, দু-পয়সা রোজগার করা অসম্ভব হবে না।

'মি. ট্রেভর বললেন— ''এত কথা জানলে কী করে, হোমস?'' দেখলাম, চোখের তারায় তখনও আতঙ্ক থিরথির করে কাঁপছে।

'বললাম, ''আপনি আস্তিন গুটোতেই দেখেছি কনুইয়ের ভাঁজে ''জে.এ.'' এই অক্ষর দুটো উল্কি দিয়ে লেখা। কিন্তু বেশ আবছা। ছাল তুলে লেখাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বললাম, এককালে নামটা আপনার প্রাণে গাঁথা ছিল, পরে ভুলতে চেয়েছেন।'

'শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মি. ট্রেভর। বললেন, ''আশ্চর্য ক্ষমতা বটে তোমার!''

'সেইদিন থেকে কিন্তু বুড়ো সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন আমাকে। সবসময় ভয়, যেন আরও অনেক জেনে ফেলেছি বা জেনে ফেলতে পারি। ভিক্টরসুদ্ধু ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল।

বলেছিল, ''বাবা দেখছি আর কোনোদিনই তোমাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।'' ভদ্রলোকের অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছে দেখে ঠিক করলাম চলে আসব। ডনিথর্প ছাড়ব বলে ঠিক করলাম। সেইদিনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

'বাগানে বসে ছিলাম তিনজনে। এমন সময়ে ঝি এসে বললে, একটা লোক মি. ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে চায়— এখুনি। মি. ট্রেভর তাকে আনতে বললেন।

'ঝি-য়ের পেছন পেছন এল একটা বেঁটে মতন শুকনো চেহারার কুটিল-মুখ লোক। চালচলনে চাকরবাকরের মতো ত্রস্ত। হাঁটছে খুঁড়িয়ে। পোশাক সস্তা। হলদে দাঁতে নোংরা কুচুকুরে হাসি। হাত দেখে মনে হয় নাবিক।

'হাডসন, ইনি স্যার' নাবিক বললেন।
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'লোকটাকে দেখেই হেঁচকি তুলে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন মি. ট্রেভর— ফিরে যখন এলেন, মুখে ব্র্যান্ডির গন্ধ পেলাম।

'বললেন, ''কী চাই?''

'চোখ কুঁচকে নোংরা হাসিতে এঁটো করা মুখে ঠায় চেয়ে রইল লোকটা। ক্রূর কণ্ঠে বললে, ''চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?''

''আরে, হাডসন[৭] নাকি!''

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিরিশ বছর পর দেখা। বেশ তো ঘরবাড়ি বানিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন দেখছি। শুকনো মাংস আর ক-দিন চিবোই বলুন তো?"

"তাই কি হয়? তাই কি হয়?" বলেই হেঁট করে লোকটার কানে কানে কী যেন বললেন মি. ট্রেভর। তারপর জোর গলায় বললেন, "পুরোনো দিনের কথা কি ভোলা যায়? যাও, রান্নাঘরে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নাও। তারপর এখানেই চাকরি নিয়ে থেকে যাও।"

"বাঁচালেন! জাহাজের চাকরিটা গিয়ে অবদি হাত খালি। তাই ভাবলাম আপনার বা মি. বেডোজের কাছে গেলে নিশ্চয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে।"

"মি. বেডোজের ঠিকানাও জানো?"

"সব জানি। পুরোনো দোস্তরা যে কোথায় আছে, সে-খবর রাখি," বলে কুটিল হাসি হাসতে হাসতে ঝি-য়ের পেছন পেছন বিদেয় হল লোকটা। বিড়বিড় করে মি. ট্রেভর বললেন, 'খনিতে যাওয়ার সময়ে জাহাজে আলাপ হয়েছিল।" তারপর উঠে গেলেন বাড়ির মধ্যে, কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখলাম মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। আমি থাকায় ভিক্টর খুব অস্বস্তিতে পড়েছে দেখলাম। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই কদর্য লাগল। পরের দিনই চলে এলাম লন্ডনে।

'ছুটির শেষের দিকে, মানে সাত সপ্তাহ পরে ভিক্টরের টেলিগ্রাম পেলাম। এখুনি যেতে হবে ডনিথর্পে।

'এক ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছিল ভিক্টর। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে, যেন প্রচণ্ড ধকল সয়েছে এই দুটি মাস। প্রাণোচ্ছলতা ওর বৈশিষ্ট্য— কিন্তু তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না— একেবারে ভেঙে পড়েছে।

'আমাকে দেখেই প্রথমে বললে, "হোমস, বাবা মরতে বসেছে।"

"সেকী!"

"স্নায়ুতে দারুণ চোট লেগেছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখব হয়তো আর নেই।"

"হঠাৎ চোট লাগল কেন?"

"সেই যে লোকটা বাড়িতে এসেছিল, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"আস্ত শয়তান যে, একটা দিনও শান্তি পাইনি সেদিন থেকে। তার জন্যেই বাবার আজ এই অবস্থা। চলো, যেতে যেতে বলছি।"

'গাড়িতে উঠে বসলাম। ভিক্টর বললে, "বাবা ওকে প্রথমে মালির কাজ দেয়, সে-কাজে ওর মন উঠল না, বাবা তখন খাসচাকরের কাজ দিল তাকে। তারপর থেকে বাড়ির চাকরবাকররা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওর ব্যবহারে। দিনরাত অশ্রাব্য গালিগালাজ, মাতলামি কাঁহাতক আর সওয়া যায়। পুরো বাড়িটাই যেন তার, এমনি একটা ভাব দেখাতে লাগল সবসময়। অপমানে গা রি-রি করত যখন দেখতাম বাবার সবচেয়ে ভালো বন্দুক নিয়ে বাবারই নৌকোয় চেপে শিকারে বেরোচ্ছে। এমন একটা ইতরামি একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটে বেরোত ওর প্রতিটি কথা আর কাজে যে কতবার ভেবেছি মেরে পাট করে দিই রাসকেলকে। দিলেই বরং ভালো করতাম— বাড়তে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।

'একদিন অপমান করে বসল আমার বাবাকেই— আমার সামনে! সেদিনই ঘাড় ধাক্কা দিলাম

ঘর থেকে। ভীষণ চোখে বেরিয়ে গেল সে। পরদিন বাবা এসে বললে, হাডসনের কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। বললে, "খুব ঝামেলায় পড়েছি, ভিক্টর। একদিন সব জানতে পারবি।" সারাদিন ঘর থেকে বেরোল না। দেখলাম, একনাগাড়ে লিখে চলেছে।

'সন্ধের দিকে হাডসন এল ঘরে। আমরা তখন খাওয়া সেরে বসে আছি। বাজখাঁই গলায় বললে, "এখানে আর নয়। এবার চললাম মি. বেডোজের কাছে। তিনিও আমাকে মাথায় তুলে রাখবেন।"

'বাবা যেন সিটিয়ে গেল কথাটা শুনে। বলল, "রাগ করে যাচ্ছ না তো?"

'বিষ-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাডসন বললে, "এখনও কিন্তু ক্ষমা চাওয়া হয়নি আমার কাছে।"

"ভিক্টর," বাবা হুকুম দিল আমাকে, "হাডসনের মতো লোক হয় না। ক্ষমাটা চেয়ে নাও।"

'আমি বেঁকে বসলাম। রক্ত চোখে তাকিয়ে "দেখে নেব" বলে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল হাডসন। আধঘণ্টা পর বিদেয় হল বাড়ি থেকে।

'সেইদিন থেকে বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়ল। সারারাত ঘুমোত না। ঘরে পায়চারি করত।

'গতকাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ফোডিব্রিজ পোস্টাপিসের ছাপ-মারা একটা খাম এল বাবার নামে। চিঠিটা পড়েই বাবা কপাল ঠুকতে ঠুকতে উন্মাদের মতো ঘরময় দৌড়োতে লাগল। জোর করে শুইয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম প্যারালিসিস আরম্ভ হয়েছে মুখের একপাশ থেকে— দারুণ আঘাতে স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার এল। পক্ষাঘাত ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। জানি না ফিরে গিয়ে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাব কি না।'

'কী সাংঘাতিক কথা! কী ছিল চিঠিতে?'

'বলতে বলতে গাড়ি পৌঁছে গেল বাড়িতে। পড়ন্ত আলোয় দেখলাম সব জানলা বন্ধ। কালো পোশাক পরা ডাক্তার বেরিয়ে এল বাইরে।

'বললেন, "ভিক্টর, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই উনি দেহ রেখেছেন। মৃত্যুর আগে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তোমাকে একটা কথা বলতে বলে গেছেন।"

'শোকে দুঃখে ভিক্টর তখন পাথর। কোনোমতে বলল, "কী?"

'ডাক্তার বললেন, "কাগজপত্র জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনে রইল।"

'ডাক্তারের সঙ্গে ভিক্টর গেল ভেতরে— বাবার মৃতদেহের কাছে।

'প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে মি. ট্রেভরের দুর্দান্ত অতীত এবং আমার মুখে "জে.এ." নামের আদ্যক্ষর বৃত্তান্ত শুনেই তাঁর জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম। কদাকার হাডসনের আবির্ভাবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন, হাডসন চলে যাওয়ার পর আরও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মি. বেডোজের কাছে গিয়ে এই হাডসন তাহলে ব্ল্যাকমেলিং শুরু করেছে এবং চিঠিখানায় সেই খবর পেয়েই নিশ্চয় আর সইতে পারেননি। চিঠিখানা দেখতে পেলে এ-রহস্যের কিনারা করা যেত।

'এমন সময় ঝি এল আলো হাতে— পেছনে ভিক্টর। ওর হাতে একরাশ কাগজপত্র আর একটা চিঠি— সবই তোমাকে এনে দিলাম। চিঠিখানা তখনই পড়লাম : "খেল মুরগি এবার

খতম। মুরগিওলা বুড়ো হাডসন কাঁদছে। যত্তো সব গাধার দল। বলে কিনা চালান দিয়েছে লন্ডনে। বলছে, প্রাণ প্রিয় মুরগি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাও। তোমার মুরগিও মরবে।”

‘প্রথমবার পড়ে তোমার মতোই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আবার পড়লাম। নিশ্চয় সংকেতে লেখা চিঠি। আগেই আঁচ করেছিলাম। শব্দগুলো আসলে বেড়াজাল— আসল মানেটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। “মুরগি” কথাটার বিশেষ কোনো অর্থ কি ঠিক করা ছিল আগে থেকে? “হাডসন” শব্দটা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পত্রলেখক মি. বেডোজ— হাডসন নয়। পেছন থেকে পড়লাম। একটা শব্দ ছেড়ে ছেড়ে পড়লাম। তার পরেই ফরসা হয়ে গেল। দেখলাম প্রথম শব্দের পর দুটো করে শব্দ ছাড়তে হবে।

‘ছোট্ট চিঠি। কিন্তু ভয়ংকর। বুড়ো ট্রেভর অকারণে ঘায়েল হননি।

‘চিঠিটা এই— “খেল খতম। হাডসন সব বলে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালাও। মরবে।”

‘ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, “মি. বেডোজ কে?”

‘ফি বছর শরৎকালে বাবা ওখানে যেত শিকার করতে।’

‘এ-চিঠি তিনিই লিখে তোমার বাবাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও বিপদে পড়েছেন। হাডসন কী এমন গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে যার জন্যে দুজন সম্ভ্রান্ত মানুষ এতটা ভয় পেয়েছেন, তা জানা দরকার।’

‘ভিক্টর বললে, “হোমস, সে-কাহিনি নিশ্চয় বড়ো মুখ করে বলার নয়, নিশ্চয় বিরাট কোনো অপরাধের ইতিহাস। জানি কলঙ্কের শেষ থাকবে না। হাডসন ‘দেখে নেব’ বলে শাসিয়ে যাওয়ার পর বাবা সব লিখেছিল। তুমি পড়ো, আমার সাহস নেই।”

‘ওয়াটসন, সেদিন যেভাবে এই কাগজ থেকে আশ্চর্য সেই কাহিনি ভিক্টরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, আজও তোমাকে সেইভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। শোনো। ওপরে লেখা : “১৮৮৫ সালের আটই অক্টোবর ফলমাউথ থেকে গ্লোরিয়া স্কট জাহাজ রওনা হওয়ার পর ১৫° ২৯' নর্থ ল্যাটিচিউডে ও ২৫° ১৪' ওয়েস্ট লঙ্গিচিউডে পৌঁছে ছয়ই নভেম্বর জাহাজ ধ্বংস হয় কীভাবে, তার বর্ণনা।’

‘প্রিয় ভিক্টর, যে-অপরাধ আমি করেছিলাম, তার শাস্তি পেতে চলেছি। মানসম্মান ধুলোয় লুটোতে চলেছে। সব তোমাকে জানিয়েছি। পড়বার পর পুড়িয়ে ফেলো।

‘হয় আমাকে গ্রেপ্তার হতে হবে অথবা আঘাতের আকস্মিকতায় মারা যেতে পারি। সেক্ষেত্রে এ-কাহিনি নিয়ে লুকোছাপার আর দরকার নেই।

‘আমার নাম ট্রেভর নয়... জেমস আর্মিটেজ। আদ্যক্ষর, “জে.এ.”। কনুইয়ের ভাঁজে উল্কি দিয়ে লেখা আদ্যক্ষর দুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করেও পারিনি, তোমার বন্ধু ধরে ফেলেছিল। ভয় হয়েছিল, হয়তো আমার গুপ্ত কাহিনি সে জানে।

‘জেমস আর্মিটেজ নামে আমি লন্ডনের এক ব্যাঙ্কে চাকরি করার সময়ে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করি। একটা দেনা শোধ করার জন্যেই এই কুকর্ম করেছিলাম। আর একটা টাকা পাওয়ার আশা ছিল, সেটা পেলেই ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দিতাম, কেউ জানতে পারত না।

‘কিন্তু সব ফাঁস হয়ে গেল... প্রত্যাশিত টাকা আর পেলাম না। চুরির দায়ে মাত্র তেইশ বছর

বয়সে সাঁইত্রিশ জন অপরাধীর সঙ্গে শেকলে বেঁধে আমাকে চালান করা হল অস্ট্রেলিয়ায়[৮], গ্লোরিয়া স্কট জাহাজে[৯]।

'জাহাজটা কাঠের। ভীষণ ভারী। সেকেলে জাহাজ বলে চীনদেশে চায়ের কারবারে কাজে লাগত। সবসুদ্ধু লোক ছিল এক-শো। আটত্রিশ জন কয়েদি... বাদবাকি নাবিক, সৈন্য আর জাহাজি অফিসার। সময়টা ১৮৫৫ সাল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ[১০] চলছে। কয়েদি জাহাজের অভাবে এই জাহাজটাই কাজে লাগাল সরকার।

'কয়েদি জাহাজ নয় বলেই ঘরের দেওয়ালগুলো হালকা কাঠ দিয়ে তৈরি, তেমন মজবুত নয়। আমার পাশের ঘরে সাড়ে ছ-ফুট লম্বা একজন কয়েদি থাকত। ভীষণ হুল্লোড়বাজ। সব সময়ে হইচই করত। দেমাকি। পরিষ্কার মুখ, পাতলা নাক, চওড়া চোয়াল। মনের জোর যে খুব বেশি, ওই অবস্থাতেই অত ফুর্তি দেখেই বোঝা যেত। একদিন রাতে কানের কাছে শুনলাম তার খাটো কণ্ঠস্বর।

'দেখি কি, মাঝের পাতলা দেওয়াল ফুটো করে ফেলে মুখ বাড়িয়ে আছে সে। পরিচয় হল তখনই। নাম তার জ্যাক প্রেন্ডারগাস্ট। বড়ো ঘরের ছেলে। কিন্তু অপকর্মে ওস্তাদ। লন্ডনের বেশ কয়েকটা কারবারি মানুষের পকেট হালকা করে দিয়েছিল অদ্ভুত কৌশলে।

'ওর মুখেই শুনলাম, ধরা পড়লেও সে নগদ আড়াই-লক্ষ পাউন্ড সে লুকিয়ে রেখেছে পরে ভোগ করবে বলে। ফিসফিস করে বললে, "ওহে, তুমি কি মনে কর এই পচা কাঠের চীনে জাহাজে আমি মরতে এসেছি? টাকা যখন আছে, তখন তা ভোগও করব। দেখ না কী করি, ঠিক পালাব। তোমারও একটা হিল্লে হবে।'

'তারপর জানলাম বারোজন কয়েদির সঙ্গে জাহাজ দখলের ষড়যন্ত্র করেছে জ্যাক প্রেন্ডারগাস্ট। আমার বাঁ-পাশের কেবিনের ইভান্স বলে কয়েদিও আছে সেই দলে। সে এখন দক্ষিণ ইংলন্ডে রাজার হালে থাকে, আমার মতোই নাম পালটেছে।

'ষড়যন্ত্রের মূল হোতা জাহাজের পুরুত-ঠাকুর স্বয়ং, জ্যাকের পুরোনো দোস্ত। জলের মতো টাকা ঢেলে সে হাত করেছে নাবিকদের। দুজন ওয়ার্ডার আর দুজন মেট-ও হাতে এসে গেছে। সৈন্য, ডাক্তার, ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্টদের নিয়ে পঁচিশজন জানে না এই চক্রান্ত-কাহিনি, তারাই আমাদের শত্রু। এই কয়েকজনকে খতম করে জাহাজ দখল করতে হবে।

'গুণধর পুরুত-ঠাকুর গোড়া থেকে নাবিক সাজিয়ে মারদাঙ্গা-স্যাঙাতদের জাহাজে তুলেছিল। এখন কয়েদিদের ঘরে ঘরে ব্যাগভরতি ধর্মের বইয়ের সঙ্গে দিয়ে গেল উকো পিস্তল, বারুদ আর গুলি। প্রত্যেকের বালিশের নীচে জমা হল অস্ত্রশস্ত্র।

'যেদিন জাহাজ দখল করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, তার আগেই কিন্তু লেগে গেল হাঙ্গামা। সমুদ্রে রওনা হওয়ার তিন হপ্তা পরে সন্ধের দিকে একজন অসুস্থ কয়েদিকে দেখতে এসেছিল ডাক্তার। বালিশের তলায় হাত ঠেকে যেতে পিস্তল দেখে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে সে। বেগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে বেঁধে ফেলা হয় বিছানায়। পিস্তল হাতে ছুটে বেরিয়ে যায় কয়েদিরা। দমাদম গুলি চালিয়ে জনা ছয়েককে খুন করে ফেলা হয় চক্ষের নিমেষে। ক্যাপ্টেনের খুলি উড়িয়ে দেয় পুরুত-ঠাকুর নিজে।

'ব্যস, জাহাজ দখলে এসে গেল ভেবে আনন্দে আত্মহারা সবাই। বড়ো কেবিনে মদের

বোতল খুলে সবাই যখন গলায় মদ ঢালছি, এমন সময়ে এক ঝাঁক গুলি উড়ে এল ঘরের মধ্যে। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল আমাদের ন-জন রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে মেঝের ওপর— টেবিলে রক্ত আর মদ গড়িয়ে যাচ্ছে।

'দেখেই প্রেন্ডারগাস্ট বিকট চেঁচিয়ে মূর্তিমান শয়তানের মতো ধেয়ে গেল বাইরে। অসীম সাহস তার। জাহাজের পেছনে ঘরের ঘুলঘুলি ভেঙে লেফটেন্যান্ট দশ জন সৈন্য নিয়ে গুলিবর্ষণ করেছিল আমাদের ওপর। বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার সময় পর্যন্ত দিল না প্রেন্ডারগাস্ট। আমাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেল।

'প্রেন্ডারগাস্টের কাঁধে তখন যেন শয়তান ভর করেছে। আহত সৈন্যদেরও তুলে ছুড়ে ফেলে দিল জলে। একজন জখম অবস্থাতেও সাঁতরে আসছে দেখে গুলি করে উড়িয়ে দিল খুলি। বেঁচে রইল কেবল কয়েকজন ওয়ার্ডার, মেট আর ডাক্তার— মোট পাঁচজন।

'এই পাঁচজনকে মেরে ফেলা হবে কি বাঁচিয়ে রাখা হবে— এই নিয়ে ঝগড়া লাগল আমাদের মধ্যে। নৃশংস প্রেন্ডারগ্রাস্ট আর তার পিশাচ স্যাঙাতরা পাঁচজনকেই খতম করে দিতে চাইল। কিন্তু আমরা পাঁচজন কয়েদি আর তিনজন নাবিক নিরস্ত্র কাউকে খুন করতে চাইলাম না। সশস্ত্র সৈন্যদের মারা যায়— এদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

'কথা কাটাকাটি চরমে পৌঁছোতে প্রেন্ডারগ্রাস্ট আমাদের একটা নৌকোয় চেপে বিদেয় হতে বললে। আমরা সেই ব্যবস্থাই মেনে নিলাম। চার্ট আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ভেসে পড়লাম নৌকোয়।

'ইভান্স আর আমি চার্ট দেখে নৌকো চালাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম প্রচণ্ড শব্দে গ্লোরিয়া স্কট ফেটে উড়ে গেল। মেঘগর্জনের মতো গুরু গুরু শব্দ ধেয়ে গেল দিকে দিকে— ব্যাঙের ছাতার মতো কালো ধোঁয়া ঠিকরে গেল আকাশের দিকে।

'তক্ষুনি নৌকো ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে চললাম সেইদিকে। গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, গ্লোরিয়া স্কট ততক্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

'হতাশ হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময়ে আর্ত চিৎকার শুনে ফিরে দেখি ভাঙা কাঠের ওপর শুয়ে আছে একজন ছোকরা নাবিক। নাম হাডসন। সারাশরীর পুড়ে গেছে। অপরিসীম ক্লান্ত।

'পরের দিন সকালে তার মুখে শুনলাম কী কাণ্ড ঘটেছিল গ্লোরিয়া স্কটে। পাঁচজনকে একে একে খুন করা হয়। ডাক্তারের টুঁটি কাটে প্রেন্ডারগাস্ট স্বয়ং। একজন মেট বাঁধন খুলে পালিয়ে যায় জাহাজের খোলে। সেখানে এক-শোটা বারুদভরতি পিপের পাশে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে সে হুমকি দিয়েছিল, কাছে এলেই বারুদে আগুন দেবে। তারপরেই ঘটে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ। হাডসনের বিশ্বাস, দেশলাইয়ের আগুন নয়... মারমুখো কয়েদিদের পিস্তলের গুলি ফসকে গিয়ে লেগেছিল একটা পিপেতে।

'যাই হোক, গ্লোরিয়া স্কট ধ্বংস হল এইভাবে। পরের দিন অস্ট্রেলিয়াগামী একটা জাহাজে ঠাঁই পেলাম আমরা। সিডনি পৌঁছে নাম পালটে নিলাম আমি আর ইভান্স। খনি অঞ্চলে গেলাম। বিদেশিদের মধ্যে মিশে গেলাম। নিজেদের আগের পরিচয় মুছে গেল। অনেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরলাম, জমিদার হলাম। কুড়ি বছর শান্তিতে কাটানোর পর মূর্তিমান উপদ্রব হয়ে এল সেই হাডসন— যাকে ভাঙা কাঠের ওপর থেকে তুলে এনে প্রাণে বাঁচিয়েছিলাম।

'সে জানে আমার দুর্বলতা কোথায়। কেন তাকে রাগাতে চাই না। তাই ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। ভিক্টর, তোমার সহানুভূতি যেন আমি পাই।'

'এর নীচে কাঁপা হাতে লেখা— সংকেতে খবর পাঠিয়েছে বেডোজ— হাডসন সব ফাঁস করে দিয়েছে!'

'ওয়াটসন, এই হল গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের অত্যাশ্চর্য কাহিনি। ভিক্টরের মন ভেঙে যায়। টেরাইতে[১১] চলে যায় চাষবাসের কাজ নিয়ে। বেডোজ আর হাডসন দুজনের আর খবর পাওয়া যায়নি। হয় হাডসন বেডোজকে খুন করেছে, অথবা বেডোজ হাডসনকে খুন করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। মি. ট্রেভর কিন্তু স্রেফ আতঙ্কে মারা গিয়েছিলেন— হাডসন আদৌ পুলিশে খবর দেয়নি— মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল।

'ওয়াটসন, যদি মনে কর, আমার এই প্রথম রহস্যভেদের কাহিনি কাজে লাগাতে পারো।'

টীকা

১. **কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট** : 'দ্য গ্লোরিয়া স্কট' প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলির ১৫ এপ্রিল ১৮৯৩ তারিখের সংখ্যায়।

২. **কলেজে** : কোন কলেজে পড়তেন শার্লক হোমস? তাঁর তলোয়ার খেলা এবং বক্সিং-এর প্রতি অনুরাগ থেকে গবেষকদের মতে, তাঁর কলেজ হল অক্সফোর্ড।

৩. **ভিক্টরের বুলটেরিয়ার কুকুরটা** : সেই সময়ে ইংলন্ডের বেশিরভাগ কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে কুকুর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়।

৪. **ডনিথর্প** : ইংলন্ডের মানচিত্রে এই নামে কোনো এলাকা, শহর বা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫. **ডিপথেরিয়ায়** : জীবাণু-ঘটিত ছোঁয়াচে অসুখ ডিপথেরিয়ায় বেশিরভাগ আক্রান্ত হত শিশুরা। গলায় একটি আস্তরণ তৈরি হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি হয় এই রোগে। উনবিংশ শতকে এই রোগের মহামারি প্রায়ই দেখা যেত। ১৯২৮-এ আলেকজান্ডার ফ্লেমিঙের আবিষ্কার পেনিসিলিন এই রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

৬. **স্যার এডোয়ার্ড হবি** : একই নামে একজন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা প্রথম জেমসের রাজসভার বিশিষ্ট সভাসদ। জীবৎকাল ১৫৬০ থেকে ১৬১৭।

৭. **হাডসন** : হাডসন নামের একাধিক চরিত্র শার্লক হোমসের বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা গিয়েছে। হোমসের হাউসকিপার মিসেস হাডসন ছাড়াও 'দ্য সিক্স নেপোলিয়ন' গল্পের মর্স হাডসন, 'দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস' গল্পের আমেরিকাপ্রবাসী হাডসন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

৮. **চালান করা হল অস্ট্রেলিয়া** : ইংলন্ডের কয়েদিদের প্রথম দিকে চালান করা হত আমেরিকায়। আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার পর ১৭৮৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় কয়েদি পাঠানো শুরু হয়। প্রথম খেপে এগারোটি জাহাজে প্রায় এক-শো মেয়ে-পুরুষকে পাঠানো হয়েছিল সিডনির নিকটবর্তী বটানি বে-তে। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভ্যান ডিয়েমেন ল্যান্ড বা আজকের টাসমানিয়ায় কয়েদি পাঠানো হয়েছে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত।

৯. **গ্লোরিয়া স্কট জাহাজে** : শার্লক হোমসের বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত প্রতিটি জাহাজের নাম কোনো মহিলার নামে; লক্ষ করেছেন রিচার্ড ডবলু. ক্লার্ক। গ্লোরিয়া ছাড়াও আছে নোরা এবং সোফি। 'দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট' গল্পের জাহাজ নোরা ক্রেইনা, 'দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস' গল্পের জাহাজ সোফি অ্যান্ডারসন।

১০. **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** : রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্ডিনিয়া এবং অটোমান তুর্কদের যৌথবাহিনীর এই যুদ্ধ চলেছিল ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত।

১১. **টেরাই** : বা তরাই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে এবং নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এলাকা। ইংরেজরা তরাই অঞ্চলে আসত প্রধানত চা চাষের কারণে।

মাসগ্রেভ-সংহিতা[১]

[দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল]

শার্লক হোমসের চিন্তায় শৃঙ্খল ছিল, পোশাকে পরিপাট্য ছিল, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ছিল না ব্যক্তিগত অভ্যাসে। পারস্য দেশের চটির মধ্যে তামাক, কয়লা রাখার জায়গায় চুরুট, কাঠের ম্যান্টলপিসে ছুরি দিয়ে গাঁথা জবাব-না-দেওয়া চিঠি, যেখানে সেখানে কাগজের স্তূপ আর যত্রতত্র রাসায়নিক বিশ্লেষণের সরঞ্জাম। গুছিয়ে রাখা ওর ধাতে নেই— কাউকে গুছোতেও দেবে না। কুঁড়ের বাদশার মতো দিনরাত হয় বেহালা, নয় বই নিয়ে বসে থাকত চেয়ারে। একদিন তো চেয়ারে বসেই এক-শো'টা কার্তুজ নিয়ে পিস্তল ছুড়তে লাগল দেওয়াল লক্ষ করে এবং গুলির দাগ দিয়ে চুনকাম খসিয়ে V.R.[২] অক্ষর দুটো ফুটিয়ে তুলল দেওয়ালে।

ন-মাসে ছ-মাসে একবার অমানুষিক পরিশ্রম করে পুরোনো কেসের কাগজপত্র সাজিয়ে রাখত একটা বাক্সে। ফিতে দিয়ে বাঁধত, ক্রমিক সংখ্যা দিত। দলিলগুলো ছিল ওর বুকের পাঁজর। কিন্তু ওই একবারই। তারপর আবার আলসেমিতে পেয়ে বসত। উদ্যম বিস্ফোরিত হয়েই মিলিয়ে যেত— আসত অপরিসীম নিষ্ক্রিয়তা।

একদিন বিরক্ত হয়েই বললাম ঘরের কোণে ছড়ানো কাগজের ডাঁইগুলো সাজিয়ে রাখতে। বিরস বদনে শোবার ঘরে উঠে গেল হোমস। হিড় হিড় করে একটা পেল্লায় বাক্স টানতে টানতে ফিরে এল একটু পরেই। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পাশে।

ডালা খুলে নষ্টামির সুরে বলল, 'ভায়া ওয়াটসন, এর মধ্যে এমন সব কেস আছে যা তুমি টেনে বার করতে চাইবে, নতুন কেস ভেতরে পুরতে চাইবে না।'

দেখলাম বাক্সটার তিন ভাগ ভরতি রাশি রাশি লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা কাগজের বান্ডিল।

'পুরোনো মামলার দলিল?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ। আমার জীবনীকারটি আমার জীবনে আসার আগে যেসব আশ্চর্য মামলার কিনারা করেছিলাম, এর মধ্যে আছে সেইসবের বৃত্তান্ত।'

বলতে বলতে নীচ থেকে একটা কাঠের বাক্স টেনে বার করল হোমস। বাচ্চাদের খেলনার বাক্সের মতো ডালাটা একপাশে টেনে খুলতে হয়। ভেতরে থেকে বেরোল অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস।

দলা পাকানো একটা কাগজ, মান্ধাতার আমলের একটা পেতলের চাবি, একটা কাঠের গোঁজের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা মরচে পড়া তিনটে ধাতুর টুকরো।

অবাক হয়ে বললাম, 'অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস জোগাড় করেছ দেখছি।'

'এর সঙ্গে যে-ইতিহাসটা জড়িয়ে আছে, সেটাও কম অদ্ভুত নয়।'

বলে, জিনিসগুলো একে একে সাজিয়ে রাখল টেবিলে। নিবিড় চোখে চেয়ে রইল সেইদিকে। দুই চোখে দেখলাম আত্মপ্রসাদের ঝিলিক।

বলল, 'মাসগ্রেভ-সংহিতা যাতে কখনো না-ভুলি, এ-সংগ্রহ সেই কারণেই।'

'মাসগ্রেভ-সংহিতা নামটা এর আগেও তোমার মুখে শুনেছি। ঘটনাটা শুনিনি। বলবে?'

দুই চোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে হোমস বললে, 'তাহলে কিন্তু কাগজের পাহাড় যেমন তেমনি পড়ে

থাকবে। কেসটা কিন্তু সত্যিই অসাধারণ। আমার কীর্তির তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ-ঘটনা না প্রকাশ পেলে।

'লন্ডনে প্রথমে এসে বাসা নিলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের[৩] কোণে মন্টেগু স্ট্রিটে[৪]। 'গ্লোরিয়া স্কট' কেসেই প্রথম বুঝি কোন পথে জীবিকা অর্জন করতে হবে আমাকে। মাসগ্রেভ সংহিতা আমার তৃতীয় কেস[৫]।

'প্রথম দিকে কেস আসত ছাত্রবন্ধু মারফত। বাকি সময়টা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বই পড়তাম, নিজেকে আরও তৈরি করতাম।

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ পড়ত একই কলেজে[৬]। খানদানি চেহারা। চেহারা দেখলেই চোখের সামনে যেন ভেসে উঠত সামন্তযুগের বিরাট খিলানওয়ালা পুরোনো প্রাসাদ। উত্তর অঞ্চলে সুপ্রাচীন মাসগ্রেভদের মূল অংশ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম সাসেক্সে হার্লস্টোনে[৭]।

'বছর চারেক ওকে দেখিনি। হঠাৎ একদিন হাজির হল মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায়। বলল, "হোমস, কলেজে যেসব ভেলকি দেখিয়ে অবাক করে দিতে সবাইকে, শুনলাম সেইসব কায়দায় অনেক সমস্যার সমাধান করছ ইদানীং?"

'সায় দিলাম আমি। ও তখন বললে, "হার্লস্টোনে অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ হালে পানি পাচ্ছে না।"

'শুনে মনটা নেচে উঠল আমার। পুলিশ যেখানে থই পায় না, আমি সেখানে কিছু করতে পারব, এ-বিশ্বাস আমার বরাবরের। আর এইরকম সমস্যার জন্যেই তো হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা।

'সাগ্রহে বললাম, "কী ব্যাপার বলো তো?"

'রেজিন্যাল্ড সিগারেট ধরিয়ে বললে, "বছর দুই হল বাবা মারা গেছে। আমি এখনও বিয়ে করিনি। পুরোনো আমলের বাড়ি। ফি বছরে শিকারের জন্যে[৮] অনেক লোককেও নেমন্তন্ন করতে হয়। কাজেই বেশ কিছু চাকরবাকর দরকার হয়। আটজন ঝি, রান্নার ঠাকুর, বাটলার, দুজন দারোয়ান, আর একটা বাচ্চা চাকর। এ ছাড়া বাগান আর আস্তাবল দেখাশুনোর জন্যেও লোক আছে।

'এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো লোক হল বাটলার ব্রানটন। আগে স্কুল মাস্টারি করত। চাকরি যাওয়ার পর বাবা খাসচাকরের কাজ দেয়। খুব সুন্দর চেহারা। স্বভাবও তেমনি। বছর চল্লিশ বছর বয়স। বেশ কয়েকটা ভাষা বলতে পারে, যেকোনো বাজনা বাজাতে পারে। কুড়ি বছর আমাদের বাড়িতে আছে।

'দোষ ওর একটিই... মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা।'

'যদ্দিন বউ ছিল, ব্রানটনও বেশ ছিল। বিপত্নীক হওয়ার পরেই আরম্ভ হল মেয়েদের নিয়ে খেলা। ঝি র‍্যাচেলকে তো বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়ে দিল— কিন্তু তারপরেই তাকে ছেড়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে এমন মাখামাখি আরম্ভ করল যে ব্রেন-ফিভার হয়ে গেল র‍্যাচেলের। শরীর আধখানা হয়ে গেল। মেয়েটি সত্যিই ভালো। কিন্তু ওয়েলসের মেয়ে তো, উত্তেজিত হয় পান থেকে চুন খসলে। ছায়ার মতো এখন বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়— আগেকার র‍্যাচেল আর নেই।

এই হল গিয়ে হার্লস্টোনের প্রথম নাটক। দ্বিতীয় নাটকের শুরুতে বদনাম নিয়ে চাকরি খোয়াল ব্রানটন।

'ব্রানটনের গুণ অনেক। বুদ্ধিও প্রখর। কিন্তু এই বুদ্ধিই ওর সর্বনাশ করে ছাড়ল। বেশি বুদ্ধি থাকার জন্যেই সব জিনিসই জানতে চাইত—সব ব্যাপারেই কৌতূহল থাকত— যা ওর জানার কথা নয়— সে-ব্যাপারও। ছোট্ট একটা ঘটনায় একদিন চোখ খুলে গেল আমার।

'গত বেস্পতিবার রাত্রে খাওয়ার পর কড়া পানীয় খাওয়ায় ঘুম আসছিল না। রাত দুটোর সময় ভাবলাম— ধুত্তোর, জেগে শুয়ে থাকার চাইতে বরং আধ-পড়া উপন্যাসখানা শেষ করি। বইটা বিলিয়ার্ড-ঘরে রেখে এসেছিলাম। ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে আনতে চললাম।

'লাইব্রেরি-ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয় বিলিয়ার্ড-রুমে। হঠাৎ দেখলাম আলো বেরুচ্ছে লাইব্রেরির খোলা দরজা দিয়ে। চমকে উঠলাম। নিশ্চয় চোর ঢুকেছে। কেননা, আলো নিভিয়ে গেছিলাম। বাড়িটা আমাদের পুরোনো। প্রায় সব বারান্দা আর করিডোরের দেওয়ালে হাতিয়ার টাঙানো থাকে। একটা টাঙি পেড়ে নিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালাম লাইব্রেরি-রুমের দরজায়।

'দেখলাম, ইজিচেয়ারে বসে ঘাড় হেঁট করে একমনে একখানা ম্যাপের মতো কাগজ দেখছে ব্রানটন। কোনোদিকে হুঁশ নেই। পরনে পূর্ণ পোশাক, রাতের পোশাক নয়। স্তম্ভিত হয়ে দেখছি এই দৃশ্য। ম্যাপখানা দেখা শেষ করে উঠে গেল ও দেরাজের কাছে। চাবি দিয়ে পাল্লা খুলে একটা কাগজ টেনে বার করল খুপরি থেকে। টেবিলের ছোটো আলোর পাশে মেলে ধরে পড়তে লাগল তন্ময় হয়ে।

'পারিবারিক কাগজপত্রে ওর এই গোপন কৌতূহল দেখে রাগে ঘেন্নায় গা জ্বলে গেল আমার। এক পা এগুতেই চেয়ার থেকে ছিটকে গেল ব্রানটন। দেখলাম ভয়ে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। ম্যাপের মতো কাগজখানা ঝট করে ভাঁজ করে রেখে দিল বুকপকেটে।

'ফেটে পড়লাম আমি। বলে দিলাম, সকাল হলেই যেন এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হয়। এত বড়ো স্পর্ধা!

'ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে গেল ব্রানটন। এত তন্ময় হয়ে কী পড়ছিল, দেখবার জন্যে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কাগজখানা খুব একটা দরকারি কিছু নয়[১]। মাসগ্রেভ-সংহিতা। ধর্মীয় নির্দেশের কায়দায় শ্লোকের মতো লেখা কতকগুলো বাণী। মাসগ্রেভ বংশে সাবালক হলেই প্রত্যেককে এটা একবার পড়তে হয়। এ ছাড়া এর আর কোনো দাম নেই।

'চাবি লাগানো ছিল দেরাজে। পাল্লা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম ব্রানটন আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

'কাকুতিমিনতি করে একমাস সময় চাইল। লোকে যদি জানে, গলা ধাক্কা খেয়ে রাতারাতি চাকরি গিয়েছে, মাথা কাটা যাবে। তাই যেন নিজেই চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে— এইভাবে এক মাসের নোটিশ দিতে চাইল।

'আমি বললাম, "তোমার মতো বদ চরিত্রের লোককে একমাস এ-বাড়িতে আর রাখা যায় না। যাই হোক, অনেকদিন নুন খেয়েছ, পাঁচজনের সামনে তাই তোমার মাথা হেঁট করব না। সাতদিন সময় দিলাম।"

'ও যেন ককিয়ে উঠল। কাতরভাবে পনেরোটা দিন সময় চাইল। আমি একদিনও বাড়ালাম না। বিধ্বস্ত মুখে মাথা নীচু করে ও চলে গেল।

'দু-দিন মুখ বুজে কাজ করে গেল ব্রানটন। আমিও কারো কাছে কিছু ভাঙলাম না। তৃতীয় দিন সকালে রোজকার মতো সারাদিনের নির্দেশ নিতে আমার টেবিলে এল না।

'ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে র‍্যাচেলকে দেখলাম। রোগভোগের জন্যেই মুখখানা বড্ড বেশি লম্বা আর ফ্যাকাশে ঠেকল। বললাম, এখন ওর কাজ করার দরকার নেই। গায়ে শক্তি আসুক। ডাক্তার যদি বলে, তাহলে কাজে লাগবে।

'বললাম, "নীচে গিয়ে ব্রানটনকে পাঠিয়ে দাও।"

'ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল র‍্যাচেল। আচমকা পাগলের মতো হাসতে আর কাঁদতে কাঁদতে বললে, "চলে গেছে ব্রানটন... চলে গেছে।"

'কোথায় গেছে?'

"জানি না... জানি না... ব্রানটন পালিয়েছে... পালিয়েছে... হাঃ হাঃ হাঃ..."— তারপরেই হাউ হাউ করে কান্না।

'দেখলাম হিস্টিরিয়ায় ধরেছে র‍্যাচেলকে। লোকজন ডেকে ওকে ঘরে নিয়ে যেতে হুকুম দিলাম। নিজে গেলাম ব্রানটনের ঘরে। বিছানায় শোয়নি রাতে, কিন্তু কালো সুট পরে বেরিয়েছে— অথচ জুতো রেখে গেছে, শুধু চটি পায়ে দিয়েছে। জানলা দরজা বন্ধ। টাকাপয়সা, ঘড়ি, জামাকাপড় সব রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো। তাহলে ও গেল কোথায়?

'বিরাট বাড়ির সর্বত্র খোঁজা হল— চিলেকোঠা থেকে পাতালঘর পর্যন্ত ওকে পাওয়া গেল না। পুলিশ ডাকলাম। আগের রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাগানের ভিজে মাটির রাস্তায় নিশ্চয় পায়ের ছাপ থাকত— তাও নেই। জিনিসপত্র না-নিয়েই উধাও হয়েছে ব্রানটন এবং অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।

'দু-দিন প্রলাপ বকে গেল র‍্যাচেল। নার্স মোতায়েন করলাম দিনে রাতে। তৃতীয় রাতে র‍্যাচেল ঘুমোচ্ছে দেখে নার্স চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে দেখলে সে নেই। জানলার নীচ থেকে তার পায়ের ছাপ গিয়ে শেষ হয়েছে জলার ধারে। হ্রদের জল মাত্র আট ফুট গভীর। জাল ফেলা হল জলে। র‍্যাচেলকে পাওয়া গেল না। কিন্তু জালে উঠে এল একটা কাপড়ের থলির মধ্যে অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস। জং-ধরা কতকগুলো বেরং ধাতব টুকরো আর কয়েকটা ম্যাটমেটে রঙের নুড়ি বা কাচ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ব্রানটন বা র‍্যাচেলের টিকি দেখা যায়নি। পুলিশ হালে পানি পাচ্ছে না। হোমস, তাই এসেছি তোমার কাছে।' ওয়াটসন, অদ্ভুত অন্তর্ধান কাহিনি শুনে মনটা আমার নেচে উঠল। সবগুলো ঘটনা দেখে মনে মনে পরপর সাজিয়ে নিলাম। ব্রানটন আর র‍্যাচেল দুজনেই নিখোঁজ। র‍্যাচেল প্রথমে ভালোবাসত ব্রানটনকে— পরে তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। সে উদ্দাম, উত্তাল, আবেগময়— ওয়েলসের মেয়েরা যা হয়। ব্রানটন পালিয়ে গেছে, এই ঘটনায় তার হিস্টিরিয়া হয়েছিল। তারপর লেকের জলে অদ্ভুত জিনিস বোঝাই থলি ফেলে উধাও হয়েছে।

'বললাম, "ম্যাসগ্রেভ, ব্রানটন যে-কাগজখানা দেখছিল, সেটা কোথায়?"

'এই নাও,' বলে এই কাগজটা বাড়িয়ে দিল মাসগ্রেভ। সেইসঙ্গে বললে, 'এটা কিন্তু এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।'

'ওয়াটসন, এই সেই কাগজ। মাসগ্রেভ-সংহিতা। অদ্ভুত ছড়া, বিচিত্র প্রশ্নোত্তর[১০]। সাবালক হলেই মাসগ্রেভ বংশধরদের পড়তে হত। শোনো পড়ছি :

'এটা কার?'

'যে গেছে, তার।'

'পাবে কে?'

'যে আসবে, সে।'

'মাস-টা তখন কী?'

'প্রথম থেকে ষষ্ঠ।'

'সূর্য তখন কোথায়?'

'ওক গাছের মাথায়।'

'ছায়া তখন কোথায়?'

'এলম গাছের তলায়।'

'পায়ের মাপ কেমন?'

'উত্তরে দশ আর দশ, পুবে পাঁচ আর পাঁচ, দক্ষিণে দুই আর দুই, পশ্চিমে এক আর এক, তার পরেতে নীচে।'

'বিনিময়ে দেব কী?'

'যা আছে সব— আবার কী?'

'দিতেই-বা যাব কেন?'

'বিশ্বাসের দাম যে তাই।'

'মাসগ্রেভ বললে, "তারিখ নেই। কিন্তু বানান দেখে মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা। আসল রহস্যের কিনারা এতে হবে না।"

'আমি বললাম, "আমার কিন্তু মনে হয় একটা রহস্যের সমাধান করলে আর একটারও হয়ে যাবে। একটা কথা বলে রাখি। কিছু মনে কোরো না। ব্রানটন তোমাদের বংশের দশ পুরুষের যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কাগজটা সে আগেও অনেকবার দেখেছে। শেষবার দেখছিল ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যে— সেই সময় তুমি ওকে ধরে ফেলেছিলে।"

'মাসগ্রেভ বললে, "হতে পারে। এমন কিছু দরকারি নয় বলেই কাগজখানা ওইভাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তবে এর কোনো বাস্তব দাম আছে বলে মনে হয় না।"

'ঠিক উলটো। এটা দারুণভাবে একটা বাস্তব ব্যাপার। ব্রানটন ঠিক সেই চোখেই এ-কাগজ দেখেছিল। ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিল ছড়ার কথা। ম্যাপটা পকেটে নিয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাপের সঙ্গে মাসগ্রেভ-সংহিতার কী সম্পর্ক বুঝছি না।'

'সেট বোঝবার জন্যেই প্রথম ট্রেনে সাসেক্স যাব।'

'বিকেল বেলা পৌঁছোলাম হার্লস্টোন। বাড়িটা প্রকাণ্ড। ইংরেজি "L" অক্ষরের মতো। একটা দিক বেজায় পুরোনো। দরজার মাথায় লেখা ১৬০৭। এদিকটা এখন গুদোমঘর আর মদ রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর একটা দিক পরে তৈরি হয়েছে। বাড়ির সামনে বাগান। বাগান ঘিরে পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড গাছ। লোকটা দু-শো গজ দূরে বড়োরাস্তার ধারে।

'আগে থেকেই কেসটা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত মাথার মধ্যে খাড়া করে নিয়েছিলাম। মাসগ্রেভ-সংহিতাই এই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। আজব ছড়াটা আবোল-তাবোল বকুনি মোটেই নয়।

কোনো এক বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষ হেঁয়ালি দিয়ে একটা পরম সত্যকে গোপন করেছেন, প্রতিটি বংশধরের সামনে সেই গুপ্ত সত্যকে মেলে ধরা হয়েছে— কেউ আসল অর্থ ধরতে পারেনি। পেরেছে ব্রানটন। ছড়ার মানে সে বুঝেছে। সেইমতো ম্যাপ এঁকেছে। নিশ্চয় কোনো একটা লুকোনো জায়গার হদিশ সেই ম্যাপে আর এই ছড়ার মধ্যে আছে। আমাকেও তা খুঁজে বার করতে হবে ওকগাছ আর এলম গাছের অবস্থান জেনে নিয়ে। আশ্চর্য সুন্দর একটা ওকগাছ দেখলাম বাড়ির ঠিক সামনেই রাস্তার ডান পাশে। গাছ তো নয়— মহীরুহ-সম্রাট বললেই চলে।

'পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। মাসগ্রেভকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, কাগজের ছড়া যখন লেখা হয়, এ-গাছ তার চাইতেও পুরোনো। নর্মানরা ইংলন্ড জয় করে যখন, তখনও ছিল। পরিধি তেইশ ফুট।

'আমার এক নম্বর অনুমান তাহলে সত্যি হল। ছড়ার মধ্যে ওকগাছের উল্লেখ করা হয়েছে কেন বোঝা গেল। এবার দেখা দরকার এলম গাছটা কোথায়। জিজ্ঞেস করলাম মাসগ্রেভকে। যখন লেখা হয়, সেই সময়কার কোনো এলম গাছের হদিশ সে জানে কি না।

'ও বললে, "নিশ্চয় জানি। কিন্তু দশ বছর আগে বাজ পড়ে পুড়ে গেছে। গুঁড়িটাও কেটে ফেলা হয়েছে।"

'কোথায় ছিল গাছটা, জিজ্ঞেস করলাম। নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখাল মাসগ্রেভ। বাড়ি থেকে ওকগাছ পর্যন্ত লাইন টানলে ঠিক মাঝখানে পড়ে সেই জায়গাটা। দু-নম্বর অনুমানও সত্যি হতে চলেছে বুঝলাম।

'জিজ্ঞেস করলাম, "এলম গাছটা কতখানি উঁচু ছিল, জানা আছে কি?" ঝট করে মাসগ্রেভ বললে, "চৌষট্টি ফুট।" আমি তো অবাক ওর ঝটপট জবাব শুনে। তারপর শুনলাম, ট্রিগোনোমেট্রির অঙ্ক শেখবার সময়ে মাস্টারমশায়ের পাল্লায় পড়ে বাগানের সবকটা গাছের উচ্চতা সে বার করেছে। এলম গাছের উচ্চতাও সে জানে।

'জিজ্ঞেস করলাম, "মাসগ্রেভ, কখনো এ-প্রশ্ন তোমাকে করেছে?"

'মাসগ্রেভ অবাক হয়ে বললে, "তুমি জানলে কী করে? মাস কয়েক আগে সহিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময়ে সত্যিই আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, কত উঁচু ছিল এলম গাছটা।"

'বুঝলাম, ঠিক পথে তদন্ত চলেছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওকগাছের মাথা ছোঁবে তপনদেব। আশ্চর্য-সংহিতার একটা কথা মিলে যাবে। এখন দেখতে হবে এলম গাছের শেষ প্রান্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে। কাজটা খুবই কঠিন, কেননা এলম গাছই নেই।

'কিন্তু ব্রানটন যা পেরেছে, আমি তা পারব না, তা কি হয়? মাসগ্রেভকে নিয়ে গেলাম ওর পড়ার ঘরে। কাঠের এই গোঁজটা বানিয়ে নিলাম, তাতে বাঁধলাম এই লম্বা দড়িটা, এক গজ অন্তর একটা গিঁট দিলাম। তারপর একটা ছিপ নিলাম, লম্বায় ছ-ফুট। মাসগ্রেভকে নিয়ে ফিরে এলাম এলম গাছ যেখানে ছিল, সেইখানে। ওকের মাথা ছুঁয়েছে সূর্য। ছিপটা খাড়া করে গেঁথে ছায়াটা মেপে দেখলাম লম্বায় ন-ফুট।

'হিসেবটা এখন জলের মতো সোজা। ছ-ফুট লম্বা ছিপের যদি ন-ফুট লম্বা ছায়া পড়ে চৌষট্টি ফুট লম্বা গাছের ছায়া হবে ছিয়ানব্বই ফুট লম্বা, একই লাইনে পড়বে সেই ছায়া। ছিয়ানব্বই ফুট মেপে পৌঁছে গেলাম বাড়ির দেওয়ালের কাছে। গোঁজটা পুঁতলাম সেখানে। দু-ইঞ্চি তফাতে দেখলাম শঙ্কুর মতো কাঠি দেবে গেছে। অর্থাৎ ব্রানটন এইখানে চিহ্ন দিয়েছিল। আমি এখন চলেছি তার মাপের পেছন পেছন।

'এই জায়গাটার কথাই নির্দেশ করা হয়েছে।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'এই পয়েন্ট থেকে পা ফেলে এগোতে হবে। আগে পকেট কম্পাস দিয়ে দেখে নিলাম উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ঠিক কোন কোন দিকে। বাড়ির সমান্তরাল লাইনে এগোলাম বাঁ-পায়ে দশ পা, আবার ডান পায়ে দশ পা। একটা খোঁটা পুঁতলাম সেখানে। ঠিক সেইভাবে হিসেব করে

পাঁচ পা ফেললাম পুবদিকে, দু-পা দক্ষিণ দিকে। সেকেলে দরজার সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেলাম। এখন দু-পা পশ্চিমে এগোনো মানে পাথর-বাঁধানো গলিপথে দু-পা ফেলা। সংহিতায় ঠিক এই জায়গার কথাই বলা হয়েছে।

'ওয়াটসন, জীবনে এ-রকম হতাশ হইনি। মুহূর্তের জন্যে মনে হল নিশ্চয় গোড়ায় গলদ করে বসেছি। হিসেবে ভুল হয়েছে। পড়ন্ত রোদ পড়েছে গলিপথের মেঝেতে। সর্বত্রই একইরকম নিরেট আওয়াজ শুনলাম, ফাটল বা চিড় কোথাও দেখলাম না। আমার কাজ দেখে মাসগ্রেভের টনক নড়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ও আঁচ করেছিল। হিসেবটা ঠিক আছে কি না দেখার জন্যে বার করল সংহিতা।

'বললে সোল্লাসে, "তার পরেতে নীচে"— হোমস, "তার পরেতে নীচে" কথাটা খেয়াল করছ না কেন?

'আগে ভেবেছিলাম, এ-কথার মানে পাথর খোঁড়া। এখন বুঝলাম ভুল করেছি। উত্তেজিত গলায় বললাম, "এর নীচে পাতাল-কুঠরি আছে নাকি?"

'আছে, আছে, সেকেলে বাড়ি তো![১১] একদম নীচে যেতে হবে, এই দরজা দিয়ে।'

'ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে পৌঁছোলাম, এক নজরেই বোঝা গেল, আগেও সেখানে লোক এসেছে। লণ্ঠনটা রাখলাম একটা পিপের ওপর।

'আগে এখানে কাঠ রাখা হত। মাঝখান থেকে কাঠ সরিয়ে মেঝে খালি করা হয়েছে। জংধরা লোহার আংটা লাগানো পাথরের চাঁই বসানো সেখানে। আংটায় জড়ানো একটা পুরু চেককাটা মাফলার।

'অবাক হয়ে মাসগ্রেভ বললে, "এ তো ব্রানটনের মাফলার দেখছি। এখানে মরতে এসেছিল কেন?"

'দুজন পুলিশের সামনে আংটা ধরে পাথরটা টেনে তোলা হল। একা পারলাম না। একপাশে পাথর রেখে অন্ধকার গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল লণ্ঠন।

'লম্বায় চওড়ায় চার ফুট আর সাত ফুট গভীর একটা কুঠরির মধ্যে এক কোণে পেতলের পাত দিয়ে মোড়া একটা কাঠের বাক্স দেখলাম। ডালাটা খোলা। গায়ে চাবি লাগানো— এই সেই চাবি, ওয়াটসন। ধুলো আর ছ্যাতলা লাগানো কাঠে পোকা লেগেছে। কতকগুলো গোলমতো ধাতুর চাকতি— মানে, সেকেলে মুদ্রা ছাড়া বাক্সর ভেতরে আর কিছু নেই। একটা মুদ্রা আমার কাছে রেখেছি— এই দেখ।

'সেই মুহূর্তে বাক্সর দিকে কারো নজর যায়নি। দেখছিলাম, বাক্সের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে থাকা একটা নিস্পন্দ মনুষ্য-মূর্তিকে। পরনে কালো সুট। মুখ নীরক্ত নীল। দেখেই চিনতে পারল মাসগ্রেভ। ব্রানটন।

'ব্রানটন অন্তর্ধান-রহস্যের সমাধান হল বটে, কিন্তু মাসগ্রেভ-সংহিতা যে-তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। বুঝলাম না, ব্রানটন মারা গেল কীভাবে, র‍্যাচেলের ভূমিকাই-বা কী।

'আমার যা পদ্ধতি, তাই করলাম। মনে মনে ব্রানটনের জায়গায় কল্পনা করে দেখলাম কী-কী ঘটতে পারে। ব্রানটন বুদ্ধিমান পুরুষ। পাতাল-কুঠরিতে নিশ্চয় দামি কিছু লুকোনো আছে জানতে পেরে সে একাই সব আত্মসাৎ করবে ঠিক করলে। কিন্তু অতবড়ো পাথর একা সরানো সম্ভব

নয়। দোসর চাই। বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করা যায় না— একমাত্র র‍্যাচেলকে ছাড়া। র‍্যাচেল তাকে ভালোবাসত। মেয়েদের প্রেম কখনো মরে না— সব পুরুষই তাই ভাবে। মিষ্টি কথায় বশ করে র‍্যাচেলকে নিয়ে সে এল পাতাল-কুঠুরিতে।

'কিন্তু একজন মেয়েছেলেকে নিয়ে পেল্লায় এই পাথর সরাতে নিশ্চয় হিমশিম খেয়েছে ব্রানটন। কাজটা সহজ করার জন্যে নিশ্চয় অন্য কায়দার কথা ভাবতে হয়েছে। মেঝের ওপর ছড়িয়ে থাকা কাঠগুলো পরীক্ষা করলাম। চেপটা-হয়ে-যাওয়া কতকগুলো ছোটো কাঠ পেলাম। তারপর একটা ফুট তিনেক লম্বা কাঠের একদিক চেপটে গেছে দেখেই বুঝলাম কী বুদ্ধি খাটিয়েছিল ব্রানটন। ভারী পাথরটা একটু একটু করে টেনে তুলছে আর ফাঁকের মধ্যে কুচো কাঠ ঠেসে ধরেছে। এইভাবে খানিকটা উঠে আসার পর গুঁড়ি মেরে ও ভেতরে ঢুকেছে, তারপর আংটার গায়ে বড়ো কাঠখানা ঢুকিয়ে পাথরে ঠেসে দিয়ে রেখেছে। অতবড়ো পাথরের সমস্ত ওজন ওই কাঠের ওপর পড়ায় একটা দিক ওইভাবে চেপটে গিয়েছে।

'ব্রানটন তো ভেতরে ঢুকল। র‍্যাচেল দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। বাক্স খুলে জিনিসপত্র বার করে র‍্যাচেলের হাতে দিল ব্রানটন। তারপর?

'অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে এরপরে। কেল্টের উদ্দাম রক্ত বইছে র‍্যাচেলের ধমনীতে। প্রতিশোধস্পৃহা তার অণু-পরমাণুতে। গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে হাতে মূল্যবান সম্পদ নিয়ে সে কি হঠাৎ প্রতিহিংসা কামনায় পাগল হয়ে গিয়েছিল? যে-লোকটির বিশ্বাসঘাতকতায় তার আজ এই অবস্থা, তাকে শায়েস্তা করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে আংটায় লাগানো কাঠটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল? না, আপনা থেকেই কাঠ সরে যাওয়ায় দমাস করে পাথর পড়ে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? জানি না কী ঘটেছিল। এইটুকু শুধু কল্পনা করতে পারি যে জীবন্ত কবর হয়ে গেল লোভী ব্রানটনের। কবরের ভেতর তার গোঙানি আর দমাদম লাথি ঘুসি মারার চাপা শব্দ বেরিয়ে এল বাইরে। আর সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মতো থলি হাতে দৌড়োতে লাগল র‍্যাচেল— পেছনে তখন দম বন্ধ মরতে বসেছে তার অভিশপ্ত প্রেমাস্পদ পুরুষ।

'এই কারণেই পরদিন সকালে অমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল র‍্যাচেল। হিস্টিরিয়া রুগির মতো কেঁদেছে আর হেসেছে। তারপর পালিয়েছে বাড়ি ছেড়ে। পাথরের নুড়ি আর ধাতুর টুকরো সমেত থলিটা ফেলে গেছে জলার জলে।

'পাতাল-কুঠরিতে কুড়ি মিনিট ধরে পুরো ঘটনাটা মনে মনে সাজিয়ে নিলাম। মুখ কালো করে পাশে বসে রইল মাসগ্রেভ।

'ব্রানটনের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গর্ত থেকে। লণ্ঠন নামিয়ে বাক্সের মুদ্রাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বললে, "হোমস, সংহিতার রচনাকাল সঠিক আঁচ করেছিলাম। মুদ্রাগুলো প্রথম চার্লসের[১২]।"

'সঙ্গেসঙ্গে সংহিতার প্রথম কথা দুটো বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল মাথার মধ্যে। চিৎকার করে বললাম, "প্রথম চার্লসের আরও সম্পদ এবার তাহলে পাওয়া যাবে। সেই থলিটা কোথায়?"

'পড়ার ঘরে গেলাম দুই বন্ধু। জল থেকে উদ্ধার করা থলি বার করে ভেতরের জঞ্জালের স্তূপ বার করে রাখল আমার সামনে। ওর ধারণায় ওগুলো জঞ্জালই— কোনো দাম নেই। দেখতে অবশ্য সেইরকমই। কালচে মেরে আছে ধাতুর টুকরো, পাথরগুলো ম্যাড়মেড়ে অনুজ্জ্বল। একটা নিয়ে

ঘষলাম জামার হাতায়— ভেতর থেকে রোশনাই ঠিকরে এল আগুনের ফুলকির মতো। ধাতুর টুকরোগুলো ডবল রিং-এর আকারে তৈরি। কিন্তু বেঁকিয়ে মূল আকার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

'বললাম, "মাসগ্রেভ, রাজার মৃত্যুর পরেও রাজার দল ইংলন্ডে আধিপত্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যখন দেশ ছেড়ে পালায়, দামি দামি জিনিসপত্র মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল ফিরে বসে ভোগ করার জন্যে।"

'লাফিয়ে উঠল মাসগ্রেভ, "আমার পূর্বপুরুষ র‍্যালফ মাসগ্রেভ দ্বিতীয় চার্লসের[১৩] ডান হাত ছিলেন কিন্তু।'

'আমি বললাম, "তাহলে তো হয়েই গেল— সব বোঝা গেল। এবার বুঝেছ তো এগুলো জঞ্জাল নয় মোটেই? এর অর্থমূল্য তো আছেই, তার চাইতেও বেশি হল এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।"

'অবাক হয়ে ও বললে, "জিনিসগুলো কী বলে মনে হয় তোমার?"

'ইংলন্ডের পুরোনো রাজমুকুট।'

'রাজমুকুট!'

'হ্যাঁ, রাজমুকুট। সংহিতার প্রথম আর দ্বিতীয় কথাটা মনে করে দেখো। 'এটা কার?' 'যে গিয়েছে তার।' 'পাবে কে?' 'যে আসবে, সে।' অর্থাৎ প্রথম চার্লস খুন হয়েছেন, মুকুটটা তাঁরই। কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস তো আসবেনই— মুকুট মাথায় দেবেন তখন।'

'কিন্তু পুকুরে গেল কীভাবে?'

'খুলে বললাম, কীভাবে। সব শুনে মাসগ্রেভ বললে, "দ্বিতীয় চার্লস ফিরে আসার পর রাজমুকুট তাঁর হাতে গেল না কেন?"

'জবাবটা কোনোদিনই পাবে না। তিনি জানতেন, দেহ রাখার আগে কাউকে বলে যাননি, অথবা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সংহিতার মাধ্যমে উত্তরাধিকারীকে জানিয়ে গেছেন কোথায় আছে সেই অমূল্য রাজমুকুট। সেই থেকে বংশপরম্পরায় খবরটা সবাই পড়েছেন— কিন্তু মানে ধরতে পারেননি। যে পেরেছে, সে এ-বংশের কেউ নয়। প্রাণ দিয়ে অন্যায় কৌতূহলের দাম দিতে হয়েছে।

'ওয়াটসন, মাসগ্রেভ-সংহিতার কাহিনি তো শুনলে। রাজমুকুটটা দেখে যদি চোখ সার্থক করতে চাও তো হার্লস্টোন প্রাসাদে চলে যাও। অনেক টাকার বিনিময়ে প্রাসাদেই সেটা রাখার অধিকার পেয়েছে মাসগ্রেভরা[১৪]। আমার নাম করলেই দেখাবে তোমাকে। র‍্যাচেল মেয়েটার আর খবর পাওয়া যায়নি। পাপের স্মৃতি নিয়ে বোধ হয় ভিনদেশে পালিয়েছে।'

টীকা

১. **মাসগ্রেভ-সংহিতা** : 'দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল' মে ১৮৯৩ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং ১৩ মে ১৮৯৩ তারিখের হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **V.R.** : ইংলন্ডের তৎকালীন রানি ভিক্টোরিয়ার নামের আদ্যক্ষর। Victoria Regina। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

৩. **ব্রিটিশ মিউজিয়ামের** : পূর্ববর্তী কাহিনির টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. **মন্টেগু স্ট্রিটে :** হোমস-গবেষক মাইকেল হ্যারিসন অনুমান করেছেন, হোমসের এই কাল্পনিক বাসাবাড়িটি ছিল রাসেল স্কোয়্যারের ২৬, মন্টেগু স্ট্রিটে। চারতলা বাড়িটি ১৯০০ সাল নাগাদ লম্পডেল হোটেল নিয়ে নেয়।

৫. **তৃতীয় কেস :** 'গ্লোরিয়া স্কট' যদি প্রথম কেস না হয়, তাহলে প্রথম দুটি কেসের বিবরণ লেখেননি ড. ওয়াটসন।

৬. **একই কলেজে :** রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভের মতো খানদানি পরিবারের সদস্যর সহপাঠী হওয়ার কারণেই বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করেন যে হোমস ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র।

৭. **হার্লস্টোনে :** হার্লস্টোনকে কল্পনা করা হয়েছে পশ্চিম সাসেক্সের 'ড্যানি'-র কথা মাথায় রেখে। মত প্রকাশ করেছেন একাধিক হোমস-গবেষক।

৮. **ফি বছর শিকারের জন্য :** ইংলন্ডে শিকারের মরসুম অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস। ওই সময়ে ফেজেন্ট শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে না।

৯. **কাগজখানা খুব একটা দরকারি কিছু নয় :** দিনের বেলা, যখন রেজিন্যাল্ড বাড়িতে থাকে না, তখন কেন ব্রানটন কাগজ আর ম্যাপ মিলিয়ে দেখতে গেল না?

১০. **অদ্ভুত ছড়া, বিচিত্র প্রশ্নোত্তর :** টি. এস. ইলিয়ট 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল'-এ প্রায় একইরকম একটি প্রশ্নোত্তর সংবলিত ছড়া সংযুক্ত করেন। তিনি পরে স্বীকার করেন সেটি মাসগ্রেভ রিচুয়ালের অনুকরণে রচিত।

১১. **আছে, আছে সেকেলে বাড়ি তো :** আশ্চর্যের বিষয় হল রেজিন্যাল্ড হোমসকে প্রথমেই জানিয়েছিল : 'বিরাট বাড়ির সর্বত্র খোঁজা হল— চিলেকোঠা থেকে, পাতালঘর পর্যন্ত ওকে পাওয়া গেল না।'

১২. **প্রথম চার্লস :** চার্লস দ্য ফার্স্ট (১৬০০-১৬৪৯) ছিলেন ১৬২৫ থেকে ১৬৪৯ পর্যন্ত ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের রাজা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের ফলে ইংলন্ডে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়।

১৩. **দ্বিতীয় চার্লস (১৬৩৫-১৬৮৫) :** প্রথম চার্লসের হত্যার পর অল্প সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু ১৬৫১-তে উর্স্টারের যুদ্ধে অলিভার ক্রমওয়েলের কাছে পরাস্ত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং ফ্রান্স, জার্মানি এবং হল্যান্ডে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হয়। ১৬৬০-এ অলিভার ক্রমওয়েলের ছেলে রিচার্ডের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় ব্রিটেনের সিংহাসন ফিরে পান।

১৪. **প্রাসাদেই সেটা রাখার অধিকার পেয়েছে মাসগ্রেভরা :** একাধিক গবেষকের মতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মুকুট থাকবার কথা টাওয়ার অব লন্ডনে। মাসগ্রেভদের প্রাসাদে নয়।

রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার[১]

[দ্য রেইগেট স্কোয়ারস]

১৮৮৭ সালের বসন্তকালে শরীর ভেঙে পড়ে শার্লক হোমসের। শরীরের আর দোষ কী! একটানা ছ-মাস অমানুষিক পরিশ্রম করেছে সে। রোজ পনেরো ঘণ্টা এবং বেশ কয়েকবার একনাগাড়ে পাঁচদিন পর্যন্ত তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। এত ধকল সইবার ক্ষমতা রক্তমাংসের শরীরে থাকে না— হোমসের লৌহকঠিন স্বাস্থ্যও টলে গেছে। যে জন্যে এত পরিশ্রম, সে-কেসে সফল হয়েছে ঠিকই। তিন-তিনটে দেশের পুলিশের ব্যর্থতার পর বিরাট সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে সারা ইউরোপে সাড়াও ফেলেছে; অজস্র টেলিগ্রাম-প্রশংসিকায় ঘরের মেঝে ভরে উঠেছে, নিজে কিন্তু বিছানা নিয়েছে ইউরোপের সবচেয়ে ধুরন্ধর জোচ্চোরকে হারিয়ে দেওয়ার বিপুল আনন্দ সত্ত্বেও।

১৪ এপ্রিল লিয়ঁ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে গেলাম। অসুস্থ হোমসকে তিনদিন পরে নিয়ে এলাম

বেকার স্ট্রিটের বাসায়। হাওয়া বদলের দরকার বুঝে ওকে নিয়ে সাতদিন পরে পৌঁছোলাম রেইগেটের আইবুড়ো কর্নেল হেটারের নতুন কেনা বাড়িতে। ভদ্রলোক আমার রুগি ছিলেন আফগানিস্তানে। অনেকদিনের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত রক্ষে করলাম হোমসকে নিয়ে গিয়ে। ভদ্রলোক আইবুড়ো জেনে হোমসও আপত্তি জানায়নি। পরে দেখা গেল, দুজনেই প্রায় একই ধাতে তৈরি।

যেদিন পৌঁছোলাম, সেইদিন সন্ধেবেলা খাওয়া সেরে কর্নেলের হাতিয়ার-সম্ভার[২] দেখছি আমি, এমন সময়ে কর্নেল বললেন, আজ একটা পিস্তল নিয়ে শুতে হবে দেখছি। বিপদ ঘটতে পারে।

'কীসের বিপদ?' শুধোই আমি।

'চোরের। গত সোমবার এখানকার বুড়ো মোড়ল অ্যাক্টনের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। চোর ভাগলবা— দামি জিনিস চুরি করতে পারেনি।'

হোমস এলিয়ে পড়েছিল সোফায়। এখন বললে, 'সূত্র পাওয়া গেছে?'

'না।'

'ইন্টারেস্টিং কোনো বৈশিষ্ট্য?'

'তেমন কিছুই নয়। লাইব্রেরি তছনছ করে ড্রয়ারগুলো টেনে নামিয়েছে চোরের দল। কিন্তু নিয়ে গেছে পোপের লেখা[৩] পুরোনো 'হোমার' বইখানা, এক বান্ডিল টোন সুতো, একটা ছোট্ট ওক কাঠের ব্যারোমিটার, একটা হাতির দাঁতের কাগজ-চাপা, দুটো বাতিদান। মানে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়েই চম্পট দিয়েছে।'

হোমস গজগজ করে বললে, 'গাঁয়ের পুলিশগুলোও হয়েছে তেমনি—'

'হোমস, এসেছ জিরোতে, নতুন সমস্যায় মাথা গলালে অনর্থ করব বলে দিলাম', হুঁশিয়ার করে দিলাম আমি।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, এত করেও আগলাতে পারলাম না বন্ধুবরকে। পরদিন সকাল বেলা প্রাতরাশ খেতে বসে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

ছুটতে ছুটতে চলল কর্নেলের বাটলার। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে খবর দিলে, কাল রাত বারোটায় চোর পড়েছিল গাঁয়ের জমিদার ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে। গুলি করে খুন করে গেছে কোচোয়ান উইলিয়ামকে।

খবর দিয়ে বাটলার বিদেয় হলে কর্নেল বললেন, 'বুড়ো ক্যানিংহ্যাম কিন্তু লোক ভালো। শেষকালে তাঁর বাড়িতেও চোর পড়ল।'

ফের গজগজ করে উঠল হোমস, 'অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে আজব জিনিসপত্র চুরি হবার পর একই গ্রামে ফের হানা দেওয়াটা চোরেদের পক্ষে কিন্তু বেশ অস্বাভাবিক আচরণ। ব্যাপারটা তাই ইন্টারেস্টিং।'

'এ-অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু পরিবার বলতে এই দুটি ফ্যামিলিকেই বোঝায়। তাই চোর হানা দিয়েছে দু-বাড়িতে', বললেন কর্নেল।

'টাকাপয়সাও আছে নিশ্চয়?' হোমসের প্রশ্ন।

'তা তো বটেই। বেশ কয়েক বছর মামলা চলছে দু-পরিবারে। ক্যানিংহ্যামের অর্ধেক সম্পত্তির ওপর দাবি রেখেছে অ্যাক্টন। ফলে পোয়াবারো উকিলদের, দোহন করছে দু-পক্ষকেই।'

হাই তুলে হোমস বললে, 'ভয় নেই ওয়াটসন, আমি নেই এর মধ্যে।'

বলতে-না-বলতেই বাটলার এসে খবর দিলে ইনস্পেকটর ফরেস্টার এসেছেন দেখা করতে। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন অল্পবয়সি বুদ্ধি-উজ্জ্বল এক পুলিশ অফিসার। ঢুকেই বললেন, 'সুপ্রভাত কর্নেল। শুনলাম, মি. শার্লক হোমস আপনার এখানে এসেছেন?'

হাত তুলে হোমসকে দেখিয়ে দিলেন কর্নেল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর ইনস্পেকটর বললেন, 'মি. হোমস, কেসটা হাতে নেবেন কি?'

আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল হোমস। বলল, 'ওয়াটসন, তোমার কপাল খারাপ!' বলে এমনভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল যে বেশ বুঝলাম সত্যিই আমার কপাল খারাপ। বলল, 'খুলে বলুন ইনস্পেকটর।'

ইনস্পেকটর বললেন, 'অ্যাক্টনের বাড়িতে সূত্র পাইনি। কিন্তু ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে পেয়েছি। একই লোকের কীর্তি। তাকে দেখাও গেছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত পৌনে বারোটার সময়ে ড্রেসিংগাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন মি. আলেক ক্যানিংহ্যাম, ছিলেন খিড়কির দরজার কাছে। হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন উইলিয়ামের সঙ্গে ঝটাপটি করছে একটা লোক। ওঁর সামনেই লোকটা উইলিয়ামের বুকে গুলি করে তিরের মতো ছুটে গিয়ে বাগান পেরিয়ে বেড়া টপকে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। শোবার ঘরের জানলা থেকে মি. ক্যানিংহ্যামও দেখেছেন তাকে নক্ষত্রবেগে পালিয়ে যেতে। মি. অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম তখন উইলিয়ামকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে খুনির পেছন নিতে পারেননি।'

'অত রাতে উইলিয়াম কী করতে গিয়েছিল ওখানে?'

'মরবার আগে তা বলে যেতে পারেনি। লোকটা কিন্তু খুব বিশ্বাসী। নিশ্চয় কোনো কাজ ছিল। ঠিক সেই সময়ে তালা ভেঙে দরজা খুলেছিল চোর।'

'বাড়িতে কিছু বলে এসেছিল উইলিয়াম?'

'ওর বুড়ি মা এমনিতে কালা, তার ওপর ছেলের শোকে ভেঙে পড়েছে, সে-রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু একটা দরকারি জিনিস পাওয়া গেছে। এই দেখুন।

বলে, নোটবইয়ের একটা ছেঁড়া পাতা হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরলেন ইনস্পেকটর, 'নিহত ব্যক্তির মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে। কোণটা ছিঁড়ে হাতের মুঠোয় থেকে গেছে। যে সময়ের কথা লেখা আছে, উইলিয়াম মারা গেছে ঠিক সেই সময়ে। মনে হয়, কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।'

কাগজটা হাতে নিল হোমস। হুবহু প্রতিলিপি দিচ্ছি নীচে :

পৌনে বারোটা নাগাদ
জানতে পারবে যা
হয়তো

ইনস্পেকটর বললেন, 'আর একটা সম্ভাবনা থাকছে। উইলিয়াম হয়তো চোর মহাপ্রভুর স্যাঙাৎ। যড় করে এসেছিল, দরজা ভাঙতে, হাতও লাগিয়েছিল। তারপর কোনো কারণে মারপিট লেগে যায় নিজেদের মধ্যে।'

হোমস কিন্তু তন্ময় হয়ে দেখছিল ছেঁড়া কাগজের কথাগুলো। বললে, 'যা ভেবেছিলাম, দেখছি তার চাইতেও জটিল ব্যাপার। লেখাটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং।'

বলে, দুই করতলে মুখ ঢেকে বসে রইল কিছুক্ষণ। বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞকে এইভাবে চিন্তিত হতে দেখে হাসি ফুটল ইনস্পেকটরের ঠোঁটে।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গেল হোমস। অবাক হয়ে গেলাম ওর মুখচ্ছবি দেখে। স্বাস্থ্যের আভায় ফের জ্বলজ্বল করছে গাল আর চোখ— প্রাণশক্তি আগের মতোই যেন ফেটে পড়ছে চোখে-মুখে।

বলল সহর্ষে, 'ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই। ওয়াটসন, কর্নেল— আপনারা একটু বসুন। আমি ইনস্পেকটরের সঙ্গে দেখে আসি ব্যাপারটা।'

দেড় ঘণ্টা পরে একা ফিরলেন ইনস্পেকটর। বললেন, 'মি. হোমস মাঠে বেড়াচ্ছেন। ওঁর ইচ্ছে আমরা চারজনেই যাই মি. ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে।'

'কেন বলুন তো?'

'বলতে পারব না। ওঁর শরীর এখনও ঠিক নেই বুঝতে পারছি। এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করছেন... একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন।'

আমি বললাম, 'ঘাবড়াবেন না। ওর এই খেপামির মধ্যেই জানবেন তদন্তকৌশল প্রচ্ছন্ন থাকে।'

'অথবা তদন্তকৌশলটার মধ্যেই খেপামি প্রচ্ছন্ন রয়েছে,' গজগজ করতে লাগলেন ইনস্পেকটর, 'যাবার জন্যে আর তর সইছে না। সমানে লাফাচ্ছেন। চলুন।'

বাইরে বেরিয়ে দেখি প্যান্টের পকেটে দু-হাত পুরে ঘাড় হেঁট করে মাঠে বেড়াচ্ছে হোমস।

'কী মশায়, ঘটনাস্থল দেখে এলেন?' শুধোলেন কর্নেল।

'লাশটা দেখলাম। ইন্টারেস্টিং।'

'কিছু আঁচ করেছেন মনে হচ্ছে?'

'যাচাই না-করে কিছু বলা মুশকিল। তবে কি জানেন চোর যে-বেড়া ভেঙে পালিয়েছে, সে-জায়গাটাও খুব ইন্টারেস্টিং। মি. ক্যানিংহ্যাম আর তার ছেলের সঙ্গেও আলাপ করে এলাম।'

'তদন্তের ফলটা কী হল?'

'ফল? খুবই অদ্ভুত। আসল রহস্য কিন্তু হাতের মুঠোয় পাওয়া ওই ছেঁড়া কাগজের মধ্যে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।'

'বাকি অংশটা কোথায়?'

'নিশ্চয় হত্যাকারীর পকেটে। খুন করে উইলিয়ামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে পালিয়েছে। পকেটটা খুঁজলেই কাগজ পাব— রহস্যও ফর্দাফাঁই হবে।'

'তা তো হবে। কিন্তু হত্যাকারীকে পাকড়াও না-করে পকেটে হাত ঢোকাবেন কী করে?'

'তাও তো বটে। খুবই চিন্তার বিষয়!— আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শুনবেন? পত্রলেখক চিঠিটা নিজে গিয়ে দেয়নি উইলিয়ামকে— নিজে গেলে চিঠি লেখার দরকার হত না। চিঠিটা তবে গেল কীভাবে?'

'ডাকে', জবাব দিলেন ইনস্পেকটর। 'পিয়োনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কাল বিকেলের দিকে একটা চিঠি পায় উইলিয়াম।'

'সাব্বাস!' সোল্লাসে ইনস্পেকটরের পিঠ চাপড়ে দিল হোমস। 'আপনার সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।— এসে গেছি, এই বাড়িটা।'

পুরোনো আমলের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। হোমস আমাদের নিয়ে গেল পেছন দিকে। সেখানে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে একজন চৌকিদার।

হোমস বললে, 'কর্নেল, এইখানে দাঁড়িয়ে মি. ক্যানিংহ্যামের ছেলে দেখেছিল মারপিট করছে দুজনে। ওই জানলাটায় দাঁড়িয়ে মি. ক্যানিংহ্যাম দেখেছেন ওই ঝোপটা ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে চোর— বাপ বেটা দুজনেই দেখেছে ঝোপটা, সুতরাং ভুল হবার জো নেই।'

বাড়ির কোণ ঘুরে দুই ব্যক্তি এগিয়ে এল আমাদের দিকে। একজন বয়স্ক। অপরজন তরুণ, আমুদে মুখচ্ছবি, ঝকমকে জামাকাপড়।

কাছে এসেই হোমসকে টিটকিরি দিয়ে ছোকরা বললে, 'এখনও হাল ছাড়েননি দেখছি। কিন্তু হালে পানি পাবেন বলে মনে হয় না, যা মিটমিটে আপনি। লন্ডনের ডিটেকটিভরা এমন হয় জানতাম না।'

'তা একটু সময় লাগবে বই কী,' বাঁকা সুরে বলল হোমস।

'সময় নিয়েও সূত্র পাবেন বলে তো মনে হয় না।'

জবাবটা দিলেন ইনস্পেকটর, 'সূত্র পাওয়া গেছে। হত্যাকারীর, ও কী, মি. হোমস কী হল আপনার?'

আচম্বিতে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ধড়াস করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল শার্লক হোমস। দারুণ ভয় পেলাম আমি। ধরাধরি করে তুলে এনে শুইয়ে দিলাম একটা বড়ো চেয়ারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিয়ে উঠে বসল বন্ধুবর।

লজ্জিত মুখে বললে, 'কিছু মনে করবেন না। ওয়াটসন মানে আমার শরীর কীরকম ভেঙে পড়েছে। স্নায়ুর জোর কমে গেছে। এমন এক-একটা ধাক্কা আচমকা আসে— সামলাতে পারি না।'

'গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব?' বললেন বুড়ো ক্যানিংহ্যাম।

'আরে, না, না। এসেছি যখন, একটা ব্যাপার যাচাই করে যাই।'

'কী ব্যাপার?'

'আমার বিশ্বাস, চোর চুরি করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, উইলিয়াম তখন এসে পড়ে— চুরির আগে নয়।'

ব্যঙ্গের স্বরে অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম বললে, 'অথচ আমরা জানি কিছু চুরি যায়নি।'

'চোর কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। মামুলি জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। যেমন, অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে নিয়েছে কাগজ-চাপা, বাতিদান, টোন সুতো আর বই। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও আমার খটকা লাগছে।'

'কী বলুন তো?'

'আপনারা দুজনেই তখন জেগে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ঘরে?'

'ওই যে পাশাপাশি দুটো ঘরের জানলা দেখছেন— ওই ঘরে।'

'দেখুন মি. ক্যানিংহ্যাম, বাড়িতে লোক জেগে আছে, চোখে দেখবার পরেও চোর কি চুরি করতে সে-বাড়িতে ঢোকে?'

'বুকের পাটা বেশি থাকলে ঢোকে বই কী।'

'যাই হোক, আপনি একটা পুরস্কার ঘোষণা করুন। তাতে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে উৎসাহ পাবে প্রত্যেকেই। পঞ্চাশ পাউন্ড দিলেই হবে।'

'আমি পাঁচশো পাউন্ড দিতে রাজি আছি।'

'তাহলে তো আরও ভালো। এই নিন, একটা খসড়া করে এনেছি আমি। আপনি দয়া করে একটা সই দিয়ে দিন,' কাগজ-পেনসিল বাড়িয়ে দিল হোমর্স।

বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম ঘোষণাপত্রের বয়ানে চোখ বুলিয়েই বললেন, 'ভুল লিখেছেন দেখছি। ''পৌনে এগারোটার সময়ে'' লিখেছেন কেন? ওটা তো হবে ''পৌনে বারোটার সময়ে''।'

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল শার্লক হোমস। মনটা আমারও খারাপ হয়ে গেল ওর এই ভুল দেখে। হোমস এত বড়ো ভুল কখনো করে না— কিন্তু স্নায়ুর অবস্থা এতই কাহিল যে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও গুলিয়ে ফেলছে। ইনস্পেকটরের ভুরু বেঁকে গেল বিষম বিরক্তিতে। আর বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল তরুণ ক্যানিংহ্যাম। যাই হোক, বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম তৎক্ষণাৎ ভুলটা শুধরে দিয়ে সই করে কাগজ তুলে দিলেন হোমসের হাতে।

পকেট-বুকে কাগজটা রাখতে রাখতে হোমস বললে, 'এবার চলুন বাড়ির ভেতরটা দেখা যাক। কিছু খোয়া গেছে কি না দেখি।'

ভেতরে ঢোকার আগে দরজাটা খুঁটিয়ে দেখল হোমস। উকো বা শক্ত ছুরি দিয়ে তালা ভাঙা হয়েছে— কাঠ পর্যন্ত খুবলে গেছে।

'দরজায় খিল লাগান না?' শুধোয় হোমস।

'দরকার হয় না।'

'কুকুর রাখেন না?'

'পেছনে বাঁধা থাকে।'

'চাকরবাকর শুতে যায় কখন?'

'দশটা নাগাদ।'

'উইলিয়ামও?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! ঠিক কালকেই ওকে অত রাতে বিছানা ছেড়ে আসতে হল! চলুন, মি. ক্যানিংহ্যাম, বাড়িটা দেখান।'

তন্ময় হয়ে বাড়ির স্থাপত্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল হোমস। কিছুদূর এইভাবে যাওয়ার

পর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম বললেন, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন। সিঁড়ির শেষে ওই দেখুন আমার আর ছেলের ঘর; আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতেই চোর বাড়ি ঢুকে চুরি করে বেরিয়ে গেল, তা কি হয়?'

শ্লেষতীক্ষ্ণ হাসি হেসে পুত্র বললে, 'নতুন সূত্র ধরুন মশায়, কেঁচে গণ্ডুষ করুন।'

ভ্রূক্ষেপ না-করে হোমস বললে, 'শোবার ঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির সামনেটা একটু দেখা দরকার। এইটা বুঝি আপনার ছেলের ঘর? পাশের ঘরের জানলা থেকে দেখি কদ্দুর দেখা যায়। পাইপ খাচ্ছিলেন এই ঘরে বুঝি?' বলতে বলতে নিজেই দরজা খুলে উঁকি মেরে সব দেখল হোমস।

বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম এবার রেগে গেলেন, 'আপনার দেখা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দেখা হয়ে গেছে। মানে, যা দেখতে চাইছিলাম দেখে নিয়েছি। এবার চলুন আপনার ঘরটা দেখা যাক।'

বৃদ্ধের পেছন পেছন সবাই ঢুকলাম পাশের ঘরে। জানলার দিকে এগোনোর সময়ে পেছিয়ে পড়ল হোমস, অগত্যা আমিও। আচমকা আমার চক্ষু স্থির করে দিয়ে হোমস ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে টেবিলে বসানো ডিশ ভরতি কমলা আর জলের কুঁজোটা উলটে ফেলে দিল মেঝের ওপর। ঝন ঝন করে ভেঙে গেল কাচের কুঁজো আর ডিশ— কমলা গড়িয়ে গেল ঘরময়।

'কী কাণ্ড করলে বল তো ওয়াটসন,' ঠান্ডা গলায় আমাকেই ধমকে উঠল হোমস। 'কার্পেটটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কমলা কুড়োতে লাগলাম আমি। বেশ বুঝলাম, বিশেষ মতলবে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে বন্ধুবর। আমার সঙ্গে প্রত্যেকেই হাত লাগালেন। কমলা কুড়িয়ে এনে টেবিলটাকে সোজা করে বসালেন। তারপরেই সবিস্ময়ে বললেন ইনস্পেকটর, 'একী! মি. হোমস কোথায়?'

শার্লক হোমস ঘরে নেই! বেমালুম উধাও!

'ভদ্রলোকের মাথায় পোকা আছে মনে হচ্ছে। দেখছি আমি। বাবা, এসো,' বাপ-বেটায় হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি, ইনস্পেকটর আর কর্নেল।

ইনস্পেকটর বললেন, 'মি. অ্যালেক ঠিকই বলেছেন। রোগে ভুগে মাথা বিগড়েছে মি. হোমসের—'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আচমকা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে কেঁপে উঠল সারাবাড়ি, 'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন করে ফেলল!'

সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সেই চিৎকার শুনে! এ যে হোমসের আর্তনাদ! হোমস চেঁচাচ্ছে! হোমসকে কেউ খুন করতে যাচ্ছে! উন্মত্তের মতো ধেয়ে গেলাম চাতালে। আর্তনাদ তখন বিষম গোঙানিতে এসে ঠেকেছে। চিৎকার লক্ষ করে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলাম ড্রেসিং রুমে। মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ে শার্লক হোমস। বুকের ওপর চেপে বসেছে ক্যানিংহ্যাম পিতা পুত্র। ছেলে সর্বশক্তি দিয়ে টুঁটি টিপছে, বাপ গায়ের জোরে কবজি মোচড়াচ্ছেন। চক্ষের নিমেষে

হোমসকে সরিয়ে নিলাম আসুরিক খপ্পর থেকে। টলতে টলতে বিবর্ণ, বেদম মুখে উঠে দাঁড়াল বন্ধুবর।

খাবি খেতে খেতে বললে, ‘গ্রেপ্তার করুন, ইনস্পেকটর, এঁদের গ্রেপ্তার করুন!’

‘কী অপরাধে?’

‘কোচোয়ান উইলিয়ামকে খুন করার অপরাধে।’

ইনস্পেকটর তো অবাক, ‘বলেন কী মি. হোমস!’

‘আরে মশাই, ওঁদের মুখের দিকে তাকান না!’

সত্যিই তো। মুখের রেখায় এভাবে অপরাধবোধ প্রকট হয়ে উঠতে কখনো তো দেখিনি! বাপ-বেটা দুজনের মুখই চক্ষের নিমেষে পালটে গিয়েছে। বৃদ্ধ যেন ভেঙে পড়েছেন। ক্ষোভে দুঃখে বিবশ হয়ে পড়েছেন। আর ছেলের স্পর্ধিত মুখচ্ছবি অকস্মাৎ ভয়ংকর বন্য জিঘাংসায় ছেয়ে গেছে— কালো চোখে ঝিলিক দিচ্ছে আদিম হিংস্রতা— বিকৃত বিকট হয়ে গেছে সুন্দর মুখখানা। ইনস্পেকটর একটা কথাও না-বলে বাইরে গিয়ে বাঁশি বাজাতেই ছুটে এল দুজন চৌকিদার।

বললেন, ‘মি. ক্যানিংহ্যাম, আমি নিরুপায়।— ওকী! ওকী! ফেলে দিন, ফেলে দিন।’ বলতে বলতেই এক ঝটকায় অ্যালেক ক্যানিংহ্যামের হাত থেকে সবে টেনে-আনা রিভলভারটা ছিটকে ফেলে দিলেন মেঝেতে।

সঙ্গেসঙ্গে পা দিয়ে রিভলভার চেপে ধরল হোমস।

বলল, ‘ভালো হল। মামলা চলার সময়ে কাজে লাগবে।— আর এই দেখুন, এর খোঁজেই এখানে আসা,’ বলে একটুকরো দলা পাকানো কাগজ নাড়তে লাগল আমাদের সামনে।

‘কোণ-ছেঁড়া চিঠির উধাও অংশটা না?’ লাফিয়ে উঠলেন ইনস্পেকটর।

‘হ্যাঁ।’

‘পেলেন কোথায়?’

‘যেখানে ছিল জানতাম, সেইখানে। কর্নেল, ওয়াটসনকে নিয়ে দয়া করে বাড়ি যান। একঘণ্টার মধ্যে খাবার টেবিলে দেখা হবে। আপাতত কয়েদিদের সঙ্গে দুটো কথা বলব!’

কথা রাখল হোমস। ঠিক একটার সময়ে খর্বকায় এক বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকল কর্নেলের ঘরে। ভদ্রলোকের নাম মি. অ্যাক্টন। পরিচয় করিয়ে দিল হোমস, এঁর বাড়িতেই চোর অত কষ্ট করে হানা দেওয়ার পর অদ্ভুত কয়েকটা জিনিস নিয়ে পগার পার হয়েছিল।

বলল, ‘কর্নেল, রহস্য ব্যাখ্যা করার সময়ে মি. অ্যাক্টনকে সামনে রাখতে চাই। তার আগে একটু ব্র্যান্ডি দিন, সাংঘাতিক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।’

‘স্নায়ু খুব চোট খেয়েছে দেখছি।’

অট্টহেসে হোমস বললে, ‘ও-ব্যাপারটা যথাসময়ে শুনবেন। একটা কথা আগেই বলে রাখি, সফল গোয়েন্দার উচিত এক ঝুড়ি বাজে আর কাজের তথ্য থেকে ঠিক কাজের তথ্যগুলো বেছে নিয়ে বাজে তথ্যকে ফেলে দেওয়া— এই ক্ষমতা যে-গোয়েন্দার নেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে উপর্যুপরি ঘটনাস্রোতে— চিন্তাধারা বয়ে যায় বিপথে। এই কেসে গোড়া থেকেই আমার মন আটকে গিয়েছিল নিহত ব্যক্তির হাতের মুঠোয় পাওয়া চিঠির কোণটার ওপর। বেশ বুঝেছিলাম, রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওর মধ্যেই।

'এটা একটা খুবই সহজ পয়েন্ট।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'বিশদ ব্যাখ্যার আগে অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম ছোকরার জবানবন্দির একটা বৈষম্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ছোকরা দেখেছে নাকি চোর ওর সামনেই উইলিয়ামকে বুকে গুলি করেই নক্ষত্রবেগে পালিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে ধরাশায়ী উইলিয়ামের হাতের মুঠো থেকে চিঠি খাবলে নিয়ে সে যায়নি। কে নিল তাহলে? নিশ্চয় অ্যালেক ছোকরা নিজে— কেননা তার বাবা চাকরবাকর নিয়ে নীচে নামার আগে বেশ খানিকটা সময় সে পেয়েছিল। এই বৈষম্যটুকু ইনস্পেকটরের মাথায় আসেনি। কেননা, উনি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে না— জমিদার কখনো খুনি হয় না। আমি কিন্তু ধরাবাঁধা সিদ্ধান্ত নিয়ে কখনো তদন্তে নামি না— আগে থেকেই অমুকটা অসম্ভব ভেবে বসি না, চোখ কান খোলা থাকে।

'যাক, চিঠির কোণটা পরীক্ষা করতে গিয়েই পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। সত্যিই অসাধারণ এই ছেঁড়া কোণটা। বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ করেছেন?'

'লেখার ধাঁচটা[৪] একটু অদ্ভুত বটে,' বললেন কর্নেল।

'আরে মশাই, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝবেন, লেখাটা দুজনের হাতে লেখা— একজনের হাতে নয়। ''বারোটা'', ''পারবে'' আর ''যা''— এই তিনটে শব্দ বাদবাকি সব শব্দের চেয়ে আলাদা। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করলেই তো রহস্যটা ধরা যায়।'

'সত্যিই তো!' কর্নেলের চোখ কপালে ওঠার দাখিল হল। 'কিন্তু কেন মি. হোমস? একই চিঠি দুজনে লিখতে গেল কেন?'

'উদ্দেশ্য শুভ নয় বলে। দুজনের একজন অপরজনকে বিশ্বাস করে না বলে। তাই সে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকেও জড়িয়ে রাখতে। ''পৌনে'', ''নাগাদ'', ''জানতে'' আর ''হয়তো'', এই শব্দগুলো যে লিখেছে, মূল চক্রী সে-ই। নাটের গুরু বলতে পারেন।'

'কী করে বুঝলেন?'

'হাতের লেখা থেকে চরিত্র ধরা যায়। এইমাত্র যে-শব্দগুলো বললাম, দেখুন সেগুলো কত শক্ত হাতে স্পষ্ট লেখা। আগে সে জোরালো হাতে লিখে গেছে— মাঝে দু-জায়গায় ফাঁক রেখে গেছে— ফলে জায়গা কম থাকায় ''বারোটা'' শব্দটাকে বেশ ঠেসেঠুসে লিখতে হয়েছে দু-নম্বর চক্রীকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রথম বয়ান রচনা করেছে যে, নাটের গুরু সে— খুনের পরিকল্পনা তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

'চমৎকার বললেন তো!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মি. অ্যাক্টন।

'তারপর দেখুন, হাতের লেখায় যারা বিশেষজ্ঞ, তারা লেখা দেখে লেখকের বয়স সঠিকভাবে আঁচ করতে পারে। বুড়ো হলে হাতের লেখা কাঁপা-কাঁপা হয় ঠিকই, আবার অসুস্থ শরীরে জোয়ান লোকে লিখলেও তাই হয়। এটা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখুন, একজনের হাতের লেখা স্পষ্ট, জোরদার। অপরজনের লেখা যেন মেরুদণ্ড-ভাঙা— অথচ স্পষ্ট। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রথমজন যুবাপুরুষ, দ্বিতীয়জন বৃদ্ধ কিন্তু অশক্ত নয়। ''ট''য়ের টিকিটা দেখছেন কত স্পষ্ট?'

'চমৎকার!' আবার চিৎকার করে উঠলেন মি. অ্যাক্টন।

'এবার আসছি আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। দুটো হাতের লেখায় বেশ মিল আছে। রক্তের সম্পর্ক থাকলে যা হয়— একই ফ্যামিলিতে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে মিল দেখা যায়— এই দুই ব্যক্তির হাতের লেখায় সেই মিল অতি সুস্পষ্ট। যেমন ''জ''। এ-রকম আরও তেইশটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে, কিন্তু সেসব বিশেষজ্ঞের শুনতে ভালো লাগবে, আপনাদের ভালো লাগবে না। যাই হোক, এইসব যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট বুঝলাম চিঠিটার যুগ্ম লেখক ক্যানিংহ্যাম পিতা পুত্র।

'ধারণাটা যাচাই করার জন্যে লাশ দেখতে গিয়ে সন্দেহটা আরও দূর হল। অ্যালেক ছোকরা বলেছে ধস্তাধস্তি করতে করতে উইলিয়ামের বুকে গুলি করে চোর। অত কাছ থেকে গুলি করলে পোশাকে বারুদের দাগ থাকত। কিন্তু নিহত ব্যক্তির বুকে সে-দাগ নেই। তার মানে, কম করে চার ফুট দূর থেকে গুলি করা হয়েছে। সুতরাং অ্যালেক ছোঁড়া কাঁচা মিথ্যে বলেছে। আর একটা ব্যাপারে আবার বাপ-বেটা দুজনেই মিথ্যে বলেছে। চোরকে নাকি দুজনেই দেখেছেন বিশেষ একটা ঝোপ পেরিয়ে পালাতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা তলা-ভিজে নালা রয়েছে— অথচ ভেজা কাদায় কারো পায়ের ছাপ নেই। এ থেকেই সন্দেহাতীতভাবে বুঝলাম, ঘটনাস্থলে বাইরের লোক কেউ আসেনি।

'এরপর অদ্ভুত এই কাণ্ডকারখানার কারণটা ভাবতে বসলাম। প্রথমেই খটকা লাগল মি. অ্যাক্টনের বাড়ির আজব জিনিসপত্র চুরি যাওয়ার ব্যাপারটায়। কর্নেলের মুখে যখনই শুনলাম মি. অ্যাক্টনের সঙ্গে মি. ক্যানিংহ্যামের মোকদ্দমা চলছে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে, সঙ্গেসঙ্গে বুঝে নিলাম আসল ব্যাপারটা কী। ক্যানিংহ্যামরা মি. অ্যাক্টনের লাইব্রেরিতে হানা দিয়েছিল দরকারি কোনো দলিল পাচার করার মতলবে।'

'ধরেছেন ঠিক,' সায় দিলেন মি. অ্যাক্টন। 'কাগজটা কিন্তু সলিসিটরের সিন্দুকে রেখেছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা। এ-কাগজ যতক্ষণ আমার কাছে, ততক্ষণ ওদের সম্পত্তির অর্ধেকের ওপর আমার দাবি নস্যাৎ করবার ক্ষমতা কারুর নেই।'

মুচকি হেসে হোমস বললে। 'দলিল না-পেয়ে বেচারিরা হতাশ হয়ে ঠিক করলে যা হয় কিছু চুরি করে নিয়ে যেতে হবে, লোকে যাতে ভাবে ছিঁচকে চোর পড়েছিল বাড়িতে। আমি কিন্তু তাতে ভুললাম না। তাই কোণ-ছেঁড়া চিঠিখানা উদ্ধার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম অ্যালেক ক্যানিংহ্যামেরই ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে, কেননা ড্রেসিংগাউন পরেই ছোকরা খুন করেছে বাটলারকে, মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিঠিটা, গুঁজে রেখেছে পকেটে। দল বেঁধে বাড়ি গিয়েছিলাম ওই মতলবেই।

বাড়ির বাইরে দেখা হয়ে গেল ক্যানিংহ্যাম বাপ-বেটার সঙ্গে। ঠিক এই সময়ে বোকার মতো মোক্ষম সূত্রটার কথা বলতে গেলেন ইনস্পেকটর। দেখলাম সর্বনাশ হতে চলেছে! ছেঁড়া চিঠির ব্যাপারটা যদি ওদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে ফেলবে, নয়তো নষ্ট করে ফেলবে। তাই ইনস্পেকটর কথা শেষ করবার আগেই আমি মূর্ছা গেলাম, কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলাম।'

'বলেন কী মশায়।' হাসতে হাসতে বললেন কর্নেল। 'মূর্ছাটা তাহলে অভিনয়?'

তাজ্জব হয়ে আমি বললাম, 'চমৎকার অভিনয় বলতে হবে। আমি ডাক্তার মানুষ, আমি সুদ্ধ বোকা বনে গেলাম!'

'অভিনয় জিনিসটা অনেক সময়ে কাজে লেগে যায়। যাই হোক, সুস্থ হয়ে উঠে বসে আবার একটা চাল চাললাম। কায়দা করে বুড়ো ক্যানিংহ্যামকে "বারোটা" শব্দ লিখিয়ে নিলাম যাতে চিঠির ছেঁড়া কোণে লেখা "বারোটা" শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি।'

'ইস, কী উজবুক আমি!' বললাম ক্ষোভের সঙ্গে।

মুচকি হাসল হোমস। বলল, 'ভায়া ওয়াটসন, আমার সাংঘাতিক ভুল দেখে তুমি যে মরমে মরে গিয়েছিলে, তা তোমার কালো মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। আমি দুঃখিত। যাই হোক, ওপরে গিয়ে ছুতোনাতা করে ঘরে ঢুকে দেখে নিলাম দরজার পাশে ঝুলছে যার খোঁজে আসা, সেই ড্রেসিংগাউন। আপনাদের অন্যমনস্ক করে দেওয়ার জন্যে টেবিল উলটে ফেলে দিয়ে গেলাম ড্রেসিংগাউনের পকেট হাতড়াতে।

'ঈপ্সিত বস্তু সবে উদ্ধার করেছি, এমন সময়ে বাঘের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপ-বেটা। আপনারা না-এসে পড়লে নির্ঘাত খুন করে ফেলত আমাকে। এখনও গলা টনটন করছে, কবজি টাটিয়ে রয়েছে। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় অতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল দুই মূর্তিমান।

'পরে বুড়ো ক্যানিংহ্যাম পেট থেকে সব কথা টেনে বার করলাম। ছেলেটা খোদ-শয়তান বললেই চলে। হাতে রিভলভার পেলে হয় আত্মহত্যা নয় আর একটা নরহত্যা পর্যন্ত করে বসতে পারে। বুড়োর মুখেই শুনলাম মি. অ্যাক্টনের বাড়িতে ওদের নৈশ অভিযান উইলিয়াম দেখে ফেলেছিল। পেছন পেছন গিয়েছিল এবং পরে এই নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। সব ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে। অ্যালেক ছোকরার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। সে দেখলে চোরের আতঙ্কে সারা গাঁ তটস্থ। এই সুযোগে আর একটা চুরির নাটক মঞ্চস্থ করে পথের কাঁটা সরানো যাক। তাই চিঠি লিখে বাটলারকে তাতিয়ে এনে খুন করে ফেলল জলজ্যান্ত মানুষটাকে। রাতের অন্ধকারে মুঠোর মধ্যে চিঠির কোণ যে রয়ে গেল, খেয়াল হয়নি। ড্রেসিংগাউনের পকেটটাও বোধ হয় আর দেখেনি। ও-ব্যাপারে আরও একটু হুঁশিয়ার হলে তিলমাত্র সন্দেহ করা যেত না এদের।'

'ভায়া, চিঠির রহস্য এবার ভাঙো,' বললাম আমি।

শার্লক হোমস তখন দুটো কাগজের টুকরো পাশাপাশি রাখল আমাদের সামনে।

> খিড়কির দরজায় এসো, এমন কিছু জানতে পারবে যা তোমাকে দারুণ অবাক করে দেবে এবং হয়তো তোমার আর অ্যানি মরিসনের অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না।

হোমস বললে, 'ফাঁদটা অতি চমৎকার। কিন্তু অ্যালেক, অ্যানি আর উইলিয়ামের মধ্যেকার সম্পর্কটা এখনও অস্পষ্টই রয়ে গেল। যাই হোক, ভায়া ওয়াটসন, ভাগ্যিস তুমি আমাকে গাঁয়ে টেনে এনেছিলে। কী সুন্দর বিশ্রাম হল বল তো? নতুন এনার্জি নিয়ে কালকেই বেকার স্ট্রিটে ফিরব ভাবছি।'

টীকা

১. **রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার :** 'দ্য রেইগেট স্কোয়ার্স' জুন ১৮৯৩-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য রেইগেট স্কোয়ার' নামে। 'স্কোয়ার' শব্দটি বহুবচনে পরিবর্তিত হয় 'মেমোয়্যার্স অব শার্লক হোমস' গ্রন্থে সংকলন হওয়ার সময়ে। ১৭ জুন ১৮৯৩-এর হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় এই গল্প প্রকাশিত হয় 'দ্য রেইগেট পাজ্‌ল' নামে।

২. **কর্নেলের হাতিয়ার সম্ভার :** কোনো গবেষক অনুমান করেছেন, কর্নেল যেহেতু আফগানিস্তানে ছিলেন, সেইহেতু তাঁর হাতিয়ার সম্ভারের মধ্যে একটি জিজেল বন্দুক থাকা সম্ভব।

৩. **পোপের লেখা :** আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) হলেন ইংরেজ কবি। ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখাতেও পোপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'দ্য রেপ অব দ্য লক', 'অ্যান এসে অন ম্যান', 'অ্যান এসে অন ক্রিটিসিজম' প্রভৃতি। হোমারের রচনা অনুবাদ করেছিলেন পোপ মোট এগারো খণ্ডে। 'ইলিয়াড' ছ-টি খণ্ডে এবং 'ওডিসি' পাঁচ খণ্ডে।

৪. **লেখার ধাঁচটা :** এই গল্পর ঘটনাকালে (১৮৮৭) ইউরোপে অন্যত্র হাতের লেখা ধরন বিচার সম্পর্কে কিছু গবেষণা শুরু হলেও, ইংলন্ডে তা হয়েছে অনেক পরে। এই বিষয়ে ফরাসি দেশের জাঁ হিপেলিট মিশোঁর দুই খণ্ডে প্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ। কিন্তু আরও বিখ্যাত রচনা ক্রেপো-জেমিঁর লেক্রেচার এ লা ক্যারাকটেরে প্রকাশিত ১৮৮৮ সালে। অর্থাৎ এই গল্পর ঘটনার পরবর্তী বছরে।

বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান[১]

[দ্য ক্রুকেড ম্যান]

আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে[২]। গরমকাল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গিয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর পাইপ খেতে খেতে উপন্যাস পড়ছি। স্ত্রী শুতে চলে গেছে। চাকরবাকররাও বিদেয় নিয়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম দরজার।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে বারো মিনিট বাকি। এত রাতে রুগি ছাড়া আর কেউ আসে না। মনটা খিঁচড়ে গেল। সারাদিন ধকলের পর রাতটুকুও কি জিরোতে পারব না?

কিন্তু কর্তব্য আরামের চাইতে বড়ো। তাই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস।

আমাকে দেখেই বলল সোল্লাসে, 'ঠিক জানতাম রাত হলেও তোমাকে পাওয়া যাবে।'

'কী সৌভাগ্য! ভেতরে এসো!'

'আইবুড়ো সময়ের অভ্যেস দেখছি এখনও ছাড়তে পারনি, আর্কেডিয়া মিক্সচার না হলে পাইপ খাওয়া হয় না। কোটের ছাইগুলোই অকাট্য প্রমাণ। আর মিলিটারি ধড়াচূড়াও এখনও ছাড়তে পারনি, তাই আস্তিনে রুমাল গুঁজে রাখ এখনও। ভায়া, রাতটা থাকা যাবে এখানে?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'টুপির আলনায় টুপি ঝুলছে না যখন পুরুষ-অতিথি বাড়িতে নেই।'

'হোমস, তুমি থাকলে আমি বর্তে যাব।'

'যাক, ঠাঁই তাহলে পাওয়া গেল। বাড়িতে মিস্ত্রি এসেছিল মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, গ্যাস বিগড়েছিল।'

'কার্পেটে বুটের ছাপ রেখে গেছে। এবার একটু পাইপ খাওয়া যাক।'

মুখোমুখি বসে নীরবে ধূমপান করতে লাগল বন্ধুবর। আমিও কথা বললাম না। জরুরি দরকার না-থাকলে এত রাতে বাড়িতে হানা দেওয়ার পাত্র সে নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরতে হবে, একটু পরেই সব বলবে।

আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে, 'পসার খুব জমেছে দেখছি।'

'কী করে বুঝলে?'

'তোমার জুতো দেখে। দিব্যি ঝকঝক করছে। তার মানে খুব ঘোড়ার গাড়িতে চাপছ। আমি তো জানি, কাছাকাছি যেতে হলে হাঁটা পছন্দ কর তুমি— গাড়িতে চাপো না।'

'চমৎকার!' প্রশংসামুখর হলাম আমি।

'কিন্তু খুবই সামান্য ব্যাপার। নজরটা ঠিকমতো দিতে পারলে শ্রোতাকে এইভাবে বক্তার পক্ষে চমকে দেওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। আসল জিনিসটা চোখ এড়িয়ে গেলে এইরকমই হয়। ভায়া, একই কথা প্রযোজ্য তোমার ওই গল্পগুলোর ক্ষেত্রেও। নিজের কায়দায় লিখতে গিয়ে সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত কর পাঠককে। এই মুহূর্তে আমার হাতে এমনি একটা কেস এসেছে। বড়ো অদ্ভুত কেস— মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। এখনও খেই পাচ্ছি না— কিন্তু পাবই, ওয়াটসন, অন্ধকারে আলো আমি দেখতে পাবই।' বলতে বলতে দু-চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল

বন্ধুবরের, পাতলা গালে দেখা দিল রক্তিম আভা। মুহূর্তের জন্যে যেন একটা আবরণ উঠে গেল ওর সুতীব্র, সুতীক্ষ্ণ প্রকৃতির ওপর থেকে। কিন্তু তা পলকের জন্যেই। পরের মুহূর্তেই ফের দেখলাম রেড ইন্ডিয়ানদের মতো ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখচ্ছবি— মুখের এই বিচিত্র বিকারবিহীন ভাবের জন্যেই অনেকে ওকে একটা নিছক যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না।

'ওয়াটসন, সমস্যাটা রীতিমতো ইন্টারেস্টিং— অত্যন্ত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ। ভেবেচিন্তে একটা সমাধান আঁচ করেছি। তোমাকে এর মধ্যে পেতে চাই।'

'সানন্দে যাব, হোমস।'

'কালকে অলডারশট যেতে হবে।'

'যাব।'

'ওয়াটারলু থেকে দশটা দশের গাড়ি?'

'ভালোই তো।'

'ঘুম পেয়েছে কি?'

'পেয়েছিল— এখন উড়ে গেছে।'

'তাহলে ঘটনাটা ছোটো করে বলছি, শোনো। অলডারশটে রয়্যাল ম্যালোজের প্রাক্তন কর্নেল বার্কলের খুন সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'না।'

'রয়্যাল ম্যালোজ হল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সুবিখ্যাত আইরিশ রেজিমেন্ট। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ[৩] আর সিপাই বিদ্রোহে[৪] এদের কৃতিত্ব ভোলবার নয়। জেমস বার্কলে গত সোমবার পর্যন্ত কম্যান্ডার ছিলেন এই রেজিমেন্টের। ঢুকেছিলেন গাদা বন্দুক বইতে— ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছেন— সিপাই বিদ্রোহের পর অফিসার হয়ে যান— পরে রেজিমেন্টের সর্বময় কর্তা।

'সার্জেন্ট থাকার সময়ে রেজিমেন্টের এক কৃষ্ণকায় সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি টিভয়কে উনি বিয়ে করেন। এসব বিয়ে সমাজ চট করে মেনে নেয় না। তাঁদেরও নেয়নি। পরে ঠিক হয়ে যায়। মেয়েটা সুন্দরী— তিরিশ বছর বিবাহিত জীবনের পরেও।

'বিয়ে করে সুখী হয়েছিলেন কর্নেল বার্কলে। প্রাণ দিয়ে ভালাবাসতেন স্ত্রীকে। স্ত্রী-ও ভালোবাসতেন তাঁকে— কিন্তু সে-ভালোবাসায় স্বামীর ভালোবাসার মতো আদিখ্যেতা ছিল না। কাজেই এ-রকম অপূর্ব জুটির এ-ধরনের পরিণতি কল্পনা করা যায় না।

'কর্নেল বার্কলে এমনিতে ফুর্তিবাজ, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ মুখ কালো করে বসে থাকতেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইচই করতে করতে আচমকা গুম হয়ে যেতেন। দিনকয়েক কাটত এইভাবে। মনে হত যেন ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছেন। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করেছেন। ওঁর অফিসার-বন্ধুদের কাছেই শুনেছি এই ব্যাপার।

'অলডারশটের ক্যাম্পে বিবাহিত অফিসাররা বাইরে রাত কাটান। আট মাইল দূরে ল্যাচেন বলে একটা বাড়িতে দুজন ঝি আর একজন কোচোয়ান নিয়ে সস্ত্রীক থাকতেন কর্নেল। বাড়িটা খালি জমি ঘেরা, পশ্চিমদিকে তিরিশ গজ দূরে বড়োরাস্তা।

'গত সোমবার রাত আটটায় গির্জেতে একটা মিটিংয়ে গিয়েছিলেন মিসেস বার্কলে। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। মিস মরিসন নামে একটি তরুণীর সঙ্গে মিটিংয়ে যান এবং সওয়া ন-টায় তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন।

'রাস্তার দিকে কাচের দরজাওলা এটা ঘর আছে ল্যাচেনে। সকালের দিকে ঘরে বসা হয়, সন্ধের পর খালি থাকে। কাচের দরজায় পর্দা নেই। দরজার সামনে তিরিশ গজ লম্বা সবুজ ঘাস-ছাওয়া লন, তারপর রেলিং-দেওয়া পাঁচিলের পর রাস্তা। মিসেস বার্কলে এই ঘরে এসে এক কাপ চা আনতে বললেন ঝি-কে, অথচ ও সময়ে কখনো তিনি চা খান না। স্ত্রী ফিরেছে শুনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে হল ঘর পেরিয়ে এই ঘরে ঢোকেন কর্নেল বার্কলে, দেখেছে কোচোয়ান। তারপর আর তাঁকে জীবিত দেখা যায়নি।

'দশ মিনিট পরে চা নিয়ে এসে ঝি দেখল দরজা ভেতর থেকে চাবিবন্ধ এবং অত্যন্ত চড়া গলায় গিন্নি ঝগড়া করছেন কর্তার সঙ্গে। কর্নেল বার্কলে এত আস্তে নরম গলায় জবাব দিচ্ছেন যে কথা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু গিন্নিমার কথাগুলো শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনে সে। মিসেস বার্কলের প্রত্যেকটা কথায় আতীব্র ঘৃণা ঠিকরে পড়ছিল। স্বামীকে তিনি বার বার 'কাপুরুষ' বলে গাল পাড়ছিলেন। 'তোমার সঙ্গে থাকতেও আমার গা রি-রি করছে! ফিরিয়ে দাও আমার জীবন! আর কি তা পাব? এখানে আর এক মুহূর্ত নয়! কাপুরুষ কোথাকার! কাপুরুষ! কাপুরুষ!' আচমকা পুরুষকণ্ঠে শোনা গেল একটা আর্ত চিৎকার! দড়াম করে আছড়ে পড়ার আওয়াজ এবং নারীকণ্ঠে মুহুর্মুহু বুকফাটা হাহাকার। দরজা খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কোচোয়ান লনের দিক থেকে একটা খোলা জানলা গলে ঢুকে পড়ে ভেতরে। দেখে, সোফায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে মিসেস বার্কলে। আর, চেয়ারের হাতলে দু-পা রেখে ফায়ার প্লেসের ঝাঁঝরির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে কর্নেল বার্কলে। প্রাণহীন। ঘরে রক্তগঙ্গা বইছে।

'ভেতর থেকে দরজা খুলতে গিয়ে মুশকিলে পড়ল কোচোয়ান— দরজার চাবি কোথাও পাওয়া গেল না[৫]। কাজেই জানলা গলে বাইরে এসে ডেকে আনল পুলিশ আর ডাক্তার। অজ্ঞান অবস্থায় মিসেস বার্কলেকে ঘরের বাইরে আনা হল। এ অবস্থায় সন্দেহটা তাঁর ওপরেই পড়ে এবং তার ব্যতিক্রম হল না। দেখা গেল, মাথার পেছনে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা মারাত্মক চোট পেয়ে মারা গেছেন কর্নেল, একটা ভোঁতা ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে খুলিতে। অস্ত্রটাও পাওয়া গেল দেহের পাশে। অদ্ভুত হাতিয়ার। একটা নিরেট গদা, হাতলটা হাড় দিয়ে বাঁধানো। কাঠের ওপর অদ্ভুত সব খোদাইয়ের কাজ। দেশবিদেশে লড়াই করে নানারকম বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করে এনেছিলেন কর্নেল, এই গদাটিও হয়তো তাঁরই সংগ্রহ, অথচ চাকরবাকরেরা এ-জিনিস এর আগে কখনো বাড়িতে দেখেনি। চাবিটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অলডারশট থেকে তালা-মিস্ত্রি আনিয়ে দরজা খুলতে হল।

'গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই হল ঘটনাপ্রবাহ। কর্নেলের বন্ধু মেজর মর্ফি আমাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে গেলেন অলডারশটে পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে। যে ঝি-টা কর্তাগিন্নির ঝগড়া বাইরে থেকে শুনেছিল, তাকে জেরা করতে গিয়ে একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম। গিন্নিমা নাকি রাগের মাথায় কর্তাকে 'ডেভিড' বলেছিলেন বার কয়েক, অথচ কর্তার নাম জেমস। ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য। রহস্য সমাধানের প্রথম ধাপ এইটাই হওয়া উচিত।

'আরও একটা ব্যাপারে তাক লেগে গেছে চাকরবাকর এবং পুলিশ মহলের। কর্নেলের মুখের পরতে পরতে প্রকট হয়েছে বিষম আতঙ্ক। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যেন ভূত দেখে চমকে উঠে সিঁটিয়ে

গিয়েছেন। পুলিশের বিশ্বাস, প্রাণাধিকা স্ত্রী গদা দিয়ে তাঁকে মারছে, ভয়ানক এই দৃশ্য দেখেই নাকি তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। ভদ্রমহিলা নিজে এখন ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত, কোনো কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে না।

'মিসেস বার্কলের সঙ্গে মিস মরিসন ফিরেছিলেন গির্জের মিটিং থেকে, হঠাৎ মিসেস বার্কলে কেন এত খাপ্পা হয়ে গেলেন, এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি মিস মরিসন।

'চাবি যখন কোথাও পাওয়া গেল না, ধরে নিলাম বাইরের কেউ ঘরে ঢুকে চাবি নিয়ে ভাগলবা হয়েছে। তাই জানলার বাইরে লন আর রাস্তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবসুদ্ধু পাঁচটা পায়ের ছাপ আমি পেলাম। আততায়ী রাস্তা থেকে পাঁচিল টপকে লনে ঢুকেছে, বেগে লন পেরিয়ে এসেছে, যে কারণে পায়ের পাতা পায়ের গোড়ালির চাইতে মাটিতে বেশি চেপে বসেছে, তারপর জানলা টপকে ঘরে ঢুকেছে। পাঁচটা ছাপের একটা পেলাম রাস্তায়, দুটো লনে, দুটো জানলার গোবরাটে। কিন্তু আততায়ীর সঙ্গে তার একজন যে-এসেছে, আমাকে বেশি তাজ্জব করেছে সে।'

'খুনের স্যাঙাত?'

পকেট থেকে একটা পাতলা ফিনফিনে কাগজ বার করে হাঁটুর ওপর সন্তর্পণে মেলে ধরল হোমস।

বলল, 'বলো তো ছাপগুলো কীসের?'

কাগজভরতি অনেকগুলো কিম্ভূতকিমাকার পদচিহ্ন দেখলাম। বড়ো বড়ো নখ আছে পায়ে এবং নখ-টখ মিলিয়ে পুরো পায়ের ছাপ আইসক্রিম চামচের চেয়ে বড়ো নয়।

'কুকুরের পায়ের ছাপ,' বললাম আমি।

'কুকুর কি পর্দা বেয়ে ওঠে? এ কিন্তু উঠেছিল, পর্দায় ছাপ পেয়েছি।'

'তাহলে বাঁদর?'

'বাঁদরের পায়ের ছাপ এ-রকম হয় না।'

'তবে?'

'কুকুর, বেড়াল, বাঁদর বা চেনাজানা কোনো জন্তুই নয়। এই দেখ এক জায়গায় ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের পা আর পেছনের পায়ের মধ্যে ব্যবধান পনেরো ইঞ্চি। এর সঙ্গে গলা আর মাথা জুড়লে লম্বায় সে কম করেও দু-ফুট। ল্যাজ থাকলে তো আরও বেশি। হেঁটেছে কিন্তু তিন ইঞ্চি দীর্ঘ পদক্ষেপে। অর্থাৎ জন্তুটার পা বেঁটে, কিন্তু দেহ লম্বা। লোম-টোম ফেলে গেলে আঁচ করতে সুবিধে হত। আপাতত শুধু বোঝা যাচ্ছে, বিচিত্র এই প্রাণীটা মাংসাশী, আর পর্দা বেয়ে সরসর করে উঠতে পারে।'

'মাংসাশী জানলে কী করে?'

'পর্দা বেয়ে উঠে জানলার ওপরে রাখা একটা পাখির খাঁচার দিকে গিয়েছিল বলে। এই সব দেখেই মনে হয় অদ্ভুত এই জীবকে দেখতে অনেকটা বেজির মতো, কিন্তু বেজিরা যত বড়ো হয়, তার চেয়ে অনেক বিরাট।'

'বেজির সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক?'

'এখনও তো ধোঁয়াটে। খবর পেলাম, কর্তাগিন্নির ঝগড়ার সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাকি একটা লোক রগড় দেখছিল। জানলা খোলা ছিল, পর্দা ছিল না, ঘরে আলো জ্বলছিল। তারপর এইসব পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পাঁচিল টপকে লন পেরিয়ে তার চার-পেয়ে সঙ্গীকে নিয়ে জানলা গলে ঘরে ঢুকেছিল। তারপর হয় সে কর্নেলের মাথা ফাটিয়েছে, অথবা কর্নেল তাকে দেখে আঁতকে উঠে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরিতে নিজের মাথা নিজেই ফাটিয়েছেন। রহস্যময় এই উটকো আততায়ী প্রস্থান করেছে কিন্তু ঘরের চাবিটা পকেটে নিয়ে।

'হোমস, রহস্য কিন্তু আরও জট পাকিয়ে গেল।'

'খাঁটি কথা। মিস মরিসন কিন্তু নিশ্চয় জানেন খোশমেজাজে সাড়ে সাতটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেন অত বদমেজাজে ন-টায় বাড়ি ফিরলেন মিসেস বার্কলে। এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা অঘটন ঘটেছে যে মিসেস বার্কলে বাড়ি ফিরেই নিরালা থাকবার জন্যে বাইরের ঘরে ঢুকেছিলেন। স্ত্রী বাড়ি ফিরেছে শুনে কর্নেল সেই ঘরে ঢুকতেই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। ফেটে পড়েছেন কর্নেল-গৃহিণী। কিন্তু কেন? নিশ্চয় জানেন মিস মরিসন।

'তাই মিস মরিসনকে সোজাসুজি বললাম, তিনি যা জানেন, যদি না বলেন, মিসেস বার্কলের ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।'

'ভদ্রমহিলা বেশ সেয়ানা। সব শুনে যা বললেন তা এই :

'গির্জের মিটিং থেকে বেরোনোর পর জনহীন হাডসন স্ট্রিটের মোড়ে একজন বাক্স কাঁধে বিকলাঙ্গ কুঁজো পা টেনে টেনে যেতে যেতে আচমকা মিসেস বার্কলকে দেখে "আরে, ন্যান্সি যে!" বলেই ভীষণ চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গেসঙ্গে মড়ার মতো সাদা হয়ে যায় মিসেস বার্কলের মুখ। এমনভাবে টলে ওঠেন যে মিস মরিসন ধরে না-ফেললে নির্ঘাত পড়ে যেতেন রাস্তায়।

'মিস মরিসন পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দেন মিসেস বার্কলে। মোলায়েম সুরে বিকৃতদর্শন লোকটিকে বলেন, "হেনরি, তুমি! আমি তো জানতাম তুমি মারা গেছ! তিরিশ বছর আমার কাছে তুমি বেঁচে নেই!"

'সত্যিই কি আমি বেঁচে আছি? আমি তো অতীতের প্রেত!' এমন সুরে এমন বিকট মুখভঙ্গি করে কথাগুলো বলল বীভৎস সেই নিশীথ পথচারী যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মিস মরিসনের। লোকটার চুল আর জুলপি হাঁসের পালকের মতো সাদা, মুখের চামড়া শুকনো আপেলের মতো অদ্ভুতভাবে কুঁচকানো। দু-চোখে যেন দু-টুকরো অঙ্গার জ্বলছে ধকধক করে— রাতে ঘুমের মধ্যেও এই চোখে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন মিস মরিসন।

'মিসেস বার্কলে কিন্তু নীরক্ত মুখে কাঁপা ঠোঁটে মিস মরিসনকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। ভয়ানক সেই মানুষটার সঙ্গে নাকি তাঁর কথা আছে। কাজেই এগিয়ে গেলেন মিস মরিসন। একটু পরেই পাশে চলে এলেন মিসেস বার্কলে। পেছন ফিরে মিস মরিসন দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো শূন্যে মুষ্টি নিক্ষেপ করছে বিকলাঙ্গ কুব্জ।

'মিসেস বার্কলে নীরবে বাড়ি পর্যন্ত এসে মিস মরিসনকে দিয়ে কথা আদায় করে নিলেন, এই ব্যাপার যেন কাকপক্ষীও না-জানে। লোকটা নাকি তাঁর পূর্ব-পরিচিত, এখন গোল্লায় গেছে।

'সব শুনে বুঝলাম মূল রহস্য নিহিত ওই বিকলাঙ্গ লোকটার মধ্যে। বদখত চেহারার লোককে খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। হলও না। অলডারশটে মিলিটারি আদমিই বেশি

থাকে। বাইরের লোক কম— তার মধ্যে বিকলাঙ্গ একজনই আছে। নাম হেনরি উড। দিন পাঁচেক হল এসেছে— উঠেছে হাডসন স্ট্রিটেরই একটা ভাড়াটে কোঠায়। বাড়িউলি তটস্থ থাকেন লোকটার সঙ্গী-সাথি জন্তুগুলোর জন্যে। এদেরকে নিয়ে সে ভেলকি দেখিয়ে বেড়ায় মিলিটারি ক্যাম্পে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভাষায় নিজের সঙ্গেই কথা বলে। দিন দুয়েক নাকি ঘরের মধ্যে থেকে গুঙিয়ে গুঙিয়ে একটানা একঘেয়েমি কান্না কেঁদে চলেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাড়িউলি। টাকাকড়ির ব্যাপারে লোকটা পরিষ্কার হলে কী হবে— জমা বাবদ একটা অদ্ভুত মুদ্রা রেখেছে বাড়িউলির কাছে। আমি দেখলাম মুদ্রাটা। ভারতবর্ষের টাকা।

'ভায়া ওয়াটসন, আমার বিশ্বাস এই লোকটাই সেদিন ঘরে ঢুকেছিল। তারপর কী ঘটেছিল, ওর মুখেই শুনতে চাই। তোমাকে রাখতে চাই সাক্ষী হিসেবে। বেকার স্ট্রিটের উঞ্ছ-বাহিনীর[৬] একটা ছোকরাকে বিকট লোকটার ওপর নজর রাখতে বলে এসেছি। বাড়ি ছেড়ে চম্পট দিলেও রেহাই নেই, পেছন নেবে আমার চর।'

অলডারশট পৌঁছানোর পরদিন দুপুরে। হাডসন স্ট্রিটে যেতেই একটা উঞ্ছ ছোকরা এসে ফিসফিস করে হোমসকে বলে গেল সব ঠিক আছে।

ছোকড়াকে বিদেয় করে আমাকে নিয়ে বিশেষ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল হোমস। কার্ড পাঠাল ভেতরে। একটু পরেই ডাক এল ভেতরে।

ঢুকলাম একটা বদ্ধ উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে। একে তো গরমকাল, তার ওপরে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে ঘরে। ঘরটা তেতে উঠেছে উনুনের মতো। আগুনের সামনে গুটিসুটি মেরে বসে কিম্ভূতকিমাকার একটা লোক। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে দুমড়ে ভাঁজ করে বসে আছে যে এক নজরেই বোঝা যায় সাংঘাতিকভাবে বিকৃত তার প্রতিটি অঙ্গ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কিন্তু ময়লা কুচ্ছিত মুখটার মধ্যে কোথায় যেন একটা হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যের ছোঁয়াচ দেখলাম। এককালে এ-মুখে রূপ ছিল, আকর্ষণ ছিল, এখন বিতৃষ্ণা জাগায় মলিনতা আর শ্রীহীনতার জন্যে।

লোকটা সন্দিগ্ধ আবিল চোখে আমাদের নিরীক্ষণ করে ইঙ্গিতে বসতে বলল দুটো চেয়ারে।

হোমস প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'মি. হেনরি উড, আপনি এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে। কর্নেল বার্কলের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কিন্তু আমি তার কী জানি?

'ব্যাপারটা যদি স্পষ্ট না হয়, আপনার বান্ধবী মিসেস বার্কলের ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।'

চমকে উঠল বিকলাঙ্গ হেনরি উড, 'কে আপনি? এত খবর আপনি জানলেন কী করে? যা বললেন, তা সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। জ্ঞান ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন মিসেস বার্কলে।'

'আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না।'

'তবে আপনি এ-ব্যাপারে এসেছেন কেন?'

'সত্যকে জানতে চাই বলে।'

'মিসেস বার্কলে নিরপরাধ।'

'তাহলে কি অপরাধটা আপনার?'

'না।'

'তাহলে কে খুন করল কর্নেলকে?'

'নিয়তি। আমি নিজের হাতে খুন করলে প্রাণটা ঠান্ডা হত ঠিকই, বুকজোড়া ধিকিধিকি আগুন কিন্তু নিভত না— যা হারিয়েছে, তা আর ফিরে আসত না। তবে শুনুন আমার অবিশ্বাস্য কাহিনি।

'আজকে আমার এই বাঁকাচোরা চেহারা দেখে আপনাদের হাসি পাচ্ছে জানি। পিঠজোড়া কুঁজ আর তেউড়োনো পাঁজরা দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন এ-রকম চেহারা নিয়ে আছি কী করে। কিন্তু একদিন ১১৭ নং পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে স্মার্ট মানুষ ছিলাম আমি— কর্পোর‍্যাল হেনরি উড। ভারতবর্ষের ভুর্তি[৭] অঞ্চলের ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম আমি। সার্জেন্ট বার্কলেও ছিল সেখানে। আর ছিল ন্যান্সি টিভয়— কৃষ্ণকায় সার্জেন্ট টিভয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা।

'ন্যান্সির প্রেমে পাগল হয়েছিল দুটি পুরুষ— বার্কলে আর উড। ন্যান্সি কিন্তু পাগল হয়েছিল আমার জন্যে, কারণ আমার রূপ ছিল। কিন্তু ন্যান্সির বাবার পছন্দ বার্কলেকে— কারণ তার ভবিষ্যৎ ছিল। আমি নাকি একটা মাকাল ফল— হইচই করেই দিন কাটাই, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না।

'ঠিক এই সময়ে শুরু হল সিপাই বিদ্রোহ। দেশজোড়া অরাজকতার মাঝে নির্বিচারে তুঙ্গে পৌঁছোল আমাদের প্রেম। তারপরেই দশ হাজার বিদ্রোহী ঘিরে ধরল আমাদের। বাচ্চাকাচ্চা মেয়েদের নিয়ে আমরা তখন হাজার জন। জেনারেল নীল[৮] এসে যদি উদ্ধার করেন, তাহলেই প্রাণে বাঁচব। নইলে কচুকাটা হতে হবে।

'ন্যান্সির মুখ চেয়ে এবং হাজার জনের কথা ভেবে আমি একা গিয়ে জেনারেল নীলকে খবর দিতে চাইলাম। বার্কলে পথঘাটের হদিশ জানত। সে ছক এঁকে দেখিয়ে দিলে কোন পথে যেতে হবে। রাত দশটা নাগাদ সেই পথে যেতে গিয়ে ধরা পড়লাম ছ-জন বিদ্রোহীর হাতে। আগে থেকেই খবর পেয়ে ওরা ওখানে ওত পেতে ছিল আমাকে ধরবার জন্যে। মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর খবরটা কে দিয়েছে কানে এল। মন ভেঙে গেল কথাটা শুনে, সার্জেন্ট বার্কলে রাস্তার ছক এঁকে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েই চাকর মারফত গোপনে জানিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের।

'এই ঘটনা থেকেই বুঝবেন, জেমস বার্কলের অসাধ্য কিছু ছিল না এ-সংসারে। যাই হোক, জেনারেল নীল পরের দিন উদ্ধার করেন আটক শিবিরবাসীদের। বিদ্রোহীরা আমাকে নিয়ে পিছু হটে গেল। দীর্ঘদিন কাটল ওদের সঙ্গে। ইংরেজের মুখ দেখিনি— শুধু যন্ত্রণা পেয়েছি। অকথ্য কষ্ট দিত। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছি, নিগ্রহ আরও বেড়েছে। বিকলাঙ্গ হয়েছি অবর্ণনীয় অত্যাচারে। তারপর কয়েকজন আমাকে নিয়ে গেল নেপালে[৯]। সেখান থেকে দার্জিলিংয়ে[১০]। পাহাড়িদের আক্রমণে প্রাণ হারাল পলাতক বিদ্রোহীরা, আমাকে গোলাম বানিয়ে রাখল বেশ কিছুদিন। এবার পালিয়ে উত্তরে গিয়ে পড়লাম আফগানদের হাতে। সেখান থেকে পাঞ্জাবে এসে অনেক রকম লাগ-ভেলকি ম্যাজিক শিখলাম। ইংলন্ডে ফিরে পুরোনো বন্ধুদের কাছে বিকট এই চেহারা দেখাতে মন চাইল না। ঠিক করলাম, ন্যান্সি আর বন্ধুদের কাছে আমি

বরং মৃত থাকি। ন্যান্সি যে বার্কলেকে বিয়ে করেছে, সুখে ঘরকন্না করছে, সে-খবর পেয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও অতীতকে খুঁচিয়ে জাগাতে চাইনি। ইংলন্ডে ফিরতে চাইনি।'

'কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে দেশের মাটির প্রতি টানও বাড়ে। তাই একদিন ফিরলাম ইংলন্ডে। সৈন্য-শিবিরে ভেলকি দেখিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান করতে লাগলাম।'

শার্লক হোমস বলল, 'সত্যিই ইন্টারেস্টিং আপনার কাহিনি। মিসেস বার্কলের সঙ্গে দেখা হল কীভাবে শুনেছি। তারপর নিশ্চয় ওঁর পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত এসে বাইরের থেকে স্বামী-স্ত্রীর দারুণ ঝগড়া শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি— ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমাকে দেখামাত্র মুখচোখের চেহারা যেন কীরকম হয়ে গেল বার্কলের। আসলে আচমকা দেখেই নিদারুণ মানসিক আঘাতে মারা গিয়েছিল সঙ্গেসঙ্গে— আমার চেহারাটাই যেন বন্দুকের বুলেট হয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল ওর পাপজীর্ণ হৃৎপিণ্ড। মৃতদেহটা আছড়ে পড়ে মেঝেতে— মাথা ফেটে যায় ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরিতে লেগে। আর্তনাদ করে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায় ন্যান্সি। চাবিটা নিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে ভাবলাম, কাজটা ঠিক হবে না। আমাকেই খুনি বলে সাব্যস্ত করা হতে পারে। তাই চাবি পকেটে নিয়ে টেডিকে পর্দার ওপরে ধরতে গিয়ে হাতের লাঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল। পালিয়ে এলাম জানলা গলে।'

'টেডি কে?'

হেনরি উড হেঁট হয়ে একটা খাঁচার ঢাকনি খুলে দিতেই ভেতর থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে এল হিলহিলে চেহারার একটা লালচে-বাদামি লোমশ জীব। শক্ত বেঁটে পা, সরু লম্বা নাক, ঝিলমিলে টুকটুকে চোখ।

সবিস্ময়ে বললাম, 'আরে, এ যে বেজি দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একে দিয়ে সাপ ধরি আমি। আমার কাছেই বিষদাঁত ভাঙা একটা সাপ আছে। ক্যান্টনমেন্টে রাত্তিরে যাই টেডিকে দিয়ে সাপ ধরার খেলা দেখাতে। আর কিছু জানবার থাকলে বলুন।'

'মি. হেনরি উড, অতীতকে বর্তমানে টেনে আনতে চাই না। মিসেস বার্কলে বিপদগ্রস্ত না হলে আপনাকে নিয়ে আর টানাটানি করব না। মহাপাপী জেমস বার্কলে ত্রিশ বছর ধরে অনুশোচনায় দগ্ধে মরেছেন তিল তিল করে— শেষ মৃত্যু হল নাটকীয়ভাবে আপনার দর্শনের ফলে। চললাম।' উঠে পড়ল হোমস।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেল মেজর মর্ফির সঙ্গে। হোমসকে দেখেই ভদ্রলোক সোল্লাসে বললেন, 'এই যে! খবর শুনেছেন? সবই তো পণ্ডশ্রম হল।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'ডাক্তারের রিপোর্ট এসেছে। জেমস বার্কলে সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। খুবই সোজা কেস।'

'সোজাই বটে। ওয়াটসন, চলো, অলডারশটে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একজনের নাম জেমস, আর একজনের হেনরি— ডেভিড তাহলে কে? মিসেস বার্কলে কাকে ডেভিড বলছিলেন?'

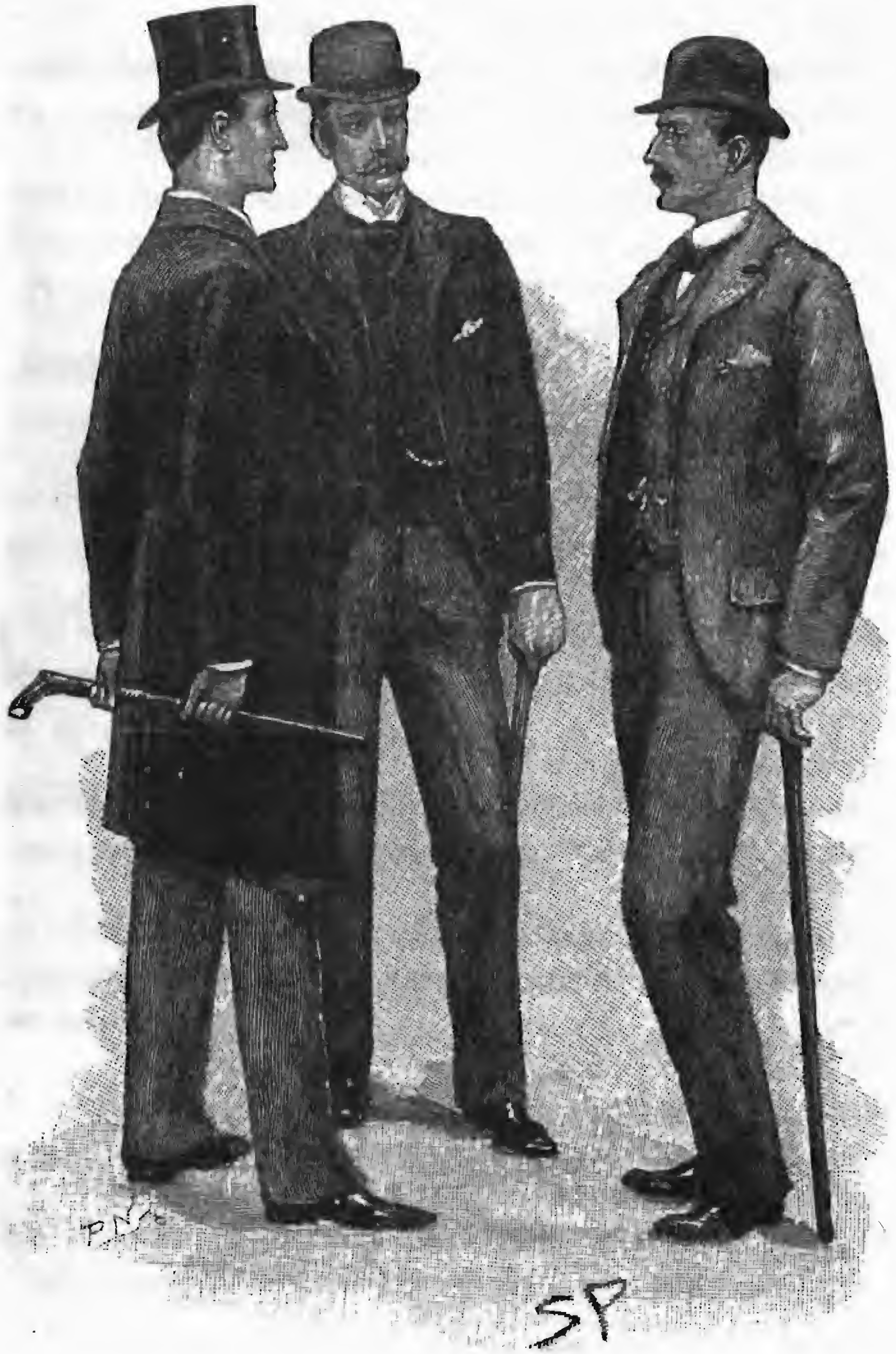

'এটা একটা খুবই সহজ কেস ছিল, যা হোক।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'ভায়া ওয়াটসন, তুমি আমাকে যুক্তিবাদী বলে প্রচার করো। সত্যিই যদি তাই হতাম, যুক্তিযুদ্ধি সত্যিই যদি মগজে থাকত— শুধু ডেভিড নামটা শুনেই রহস্য সমাধান করতে পারতাম। ডেভিড বলে কাউকে ডাকা হয়নি, গালাগাল দেওয়া হয়েছে।'

'গালাগাল দেওয়া হয়েছে?'

'ইউরিয়া আর বাথসেবার গল্পটা[১১] মনে পড়ছে? বাইবেলের কাহিনি? আমার জ্ঞান অতটা স্পষ্ট নয়, প্রথম কি দ্বিতীয় স্যামুয়েল খুলে ঝালিয়ে নিয়ো। সার্জেন্ট জেমস বার্কলের মতোই গর্হিত কাজ করেছিলেন ডেভিড।'

টীকা

১. **বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান :** 'দ্য ক্রুকেড ম্যান' জুলাই ১৮৯৩-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলিতে প্রকাশিত হয় ৮ জুলাই ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে অগাস্ট ১৮৯৩ সংখ্যায়।

২. **সবে বিয়ে হয়েছে :** হোমস-গবেষকদের মতে ওয়াটসন মেরি মার্স্টনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ১৮৮৮-র অগাস্ট মাসে।

৩. **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ :** পূর্ববর্তী কাহিনির টিকা দ্রষ্টব্য।

৪. **সিপাই বিদ্রোহে :** ভারতীয় সিপাই এবং রাজন্যবর্গের একাংশের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের সময়কাল ১৮৫৭-৫৮ সালে। অর্থাৎ গল্পের ঘটনার ঠিক ত্রিশ বা একত্রিশ বছর আগে।

৫. **দরজার চাবি কোথাও পাওয়া গেল না :** এই ধরনের ঘটনা, বিশেষত্ব হত্যা, সংবলিত কাহিনির সাহিত্যের ভাষায় পোশাকি নাম 'ক্লোজড বা লকড রুম মিস্ট্রি'। এখানে অপরাধ যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আসা বা সেখান থেকে বাইরে যাওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না। গোয়েন্দাকে খুঁজে বার করতে অপরাধীর আসা-যাওয়ার পথ। এডগার অ্যালান পো-র 'মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ' এই ধরনের গল্পের প্রাচীনতম উদাহরণ।

৬. **বেকার স্ট্রিটের উঞ্ছ বাহিনীর :** বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে এই ছেলেদের ব্যবহার করেছেন হোমস। এদের নেতা হিসেবে উইগিন্স-এর নাম শোনা গিয়েছে। এই দলের আর এক সদস্যর নাম সিম্পসন।

৭. **ভুর্তি :** ভুর্তি কল্পিত অঞ্চল। তবে জেনারেল নীলের কীর্তির বিচারে এটি 'আগ্রা' হওয়া সম্ভব।

৮. **জেনারেল নীল :** জেনারেল জেমস জর্জ নীল (১৮১০-১৮৫৭) ব্রিটিশ সৈন্যদলকে নিয়ে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছোন। লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের হাতে নীলের মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে মরণোত্তর নাইটহুড লাভ করেন জেনারেল নীল।

৯. **নিয়ে গেল নেপালে :** সিপাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবীদের একাংশ নেপালে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা নানাসাহেব।

১০. **দার্জিলিংয়ে :** নেপাল লাগোয়া দার্জিলিং ১৮৩৫ পর্যন্ত ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। ওই বছর সিকিম ব্রিটিশদের দার্জিলিং হস্তান্তর করে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এই পার্বত্য অঞ্চল।

১১. **ইউরিয়া আর বাথসেবার গল্পটা :** ইউরিয়ার স্ত্রী বাথসেবা ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি নজরে পড়েন ইজরায়েলের রাজা ডেভিডের। ডেভিড বাথসেবাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে বাথসেবাকে উপভোগ করলে বাথসেবা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। ইউরিয়া ফিরে এসে আবার যুদ্ধে যান এবং সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। তখন বাথসেবাকে বিবাহ করে রানির মর্যাদা দেন ডেভিড। দ্বিতীয় স্যামুয়েলে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি[১]

[দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট]

বন্ধুবর শার্লক হোমসের সব কেসই যে কাহিনি-বৈচিত্র্যে জমজমাট, তা নয়। কিছু কেস স্মরণীয় তার নিজস্ব বিশ্লেষণী বৈচিত্র্যের জন্যে— কিছু স্রেফ কাহিনি বৈচিত্র্যের প্রসাদে, হোমসের অবদান সেখানে অকিঞ্চিৎকর[২], তবুও ঘটনা-পরম্পরার দৌলতে তা মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখবার মতো। বর্তমান কেসটি শেষোক্ত শ্রেণির।

অগাস্ট মাস। বর্ষাকাল। গুটিসুটি মেরে সকালের ডাকে আসা একটা চিঠি বার বার পড়ছে হোমস। আমি পড়ছি খবরের কাগজ। কিন্তু ভালো লাগছে না। খবর তো নেই। পার্লামেন্ট মুলতুবি। ছুটি কাটাতে সবাই এখন শহরের বাইরে। আমারও মন উড়ু উড়ু— কিন্তু পকেটে পাথেয় নাস্তি বলেই বেরোতে পারছি না। তা ছাড়া আমার এই সৃষ্টিছাড়া বন্ধুটির গ্রাম্য শোভার দিকে কোনো আকর্ষণই নেই যদি না সেখানে কোনো রহস্যের আকর্ষণ থাকে।

হোমস আত্মনিমগ্ন। কথাবার্তা সম্ভব নয় বুঝে খবরহীন খবরের কাগজখানা নিক্ষেপ করে বিভোর হলাম আকাশপাতাল ভাবনায়। এমন সময়ে ভাবনার ঘুড়ি ভোকাট্টা হয়ে গেল হোমসের গায়ে-পড়া আচমকা মন্তব্যে।

'ওয়াটসন, ধরেছ ঠিক। বোকারাই এভাবে ঝগড়া মিটোয়। পন্থাটা খুবই অসংগত।'

'অত্যন্ত অসংগত! অত্যন্ত ভ্রান্ত!' বললাম সোচ্ছ্বাসে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল, আরে! আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি হোমসের কণ্ঠে কেন? সোজা হয়ে বসে বিষম বিস্মিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে চাইলাম ওর পানে।

বললাম, 'ব্যাপার কী হোমস? এ যে কল্পনারও অতীত।'

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখচ্ছবি দেখে অট্টহাসি হাসল হোমস।

বললে, 'বন্ধু হে, কিছুদিন আগে এডগার অ্যালান পো[৩]-র রচনাবলি থেকে লেখা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। একজন যুক্তিবিশারদ তার সঙ্গী ভদ্রলোকের মনের অব্যক্ত ভাবনাগুলো হুবহু বলে গিয়েছিল। শুনে তুমি বলেছিলে, এ হল লেখকের কল্পনার লাগাম-ছাড়া দৌড়। আমি বলেছিলাম, ঠিক ওইরকমটি কিন্তু আমিও করি। তোমার বিশ্বাস হয়নি।'

'না তো!'

'অবিশ্বাসটা মুখে প্রকাশ করনি— চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলিয়েছিলে, তাই এখন কাগজ ফেলে দিয়ে যখন সাত পাঁচ ভাবতে বসলে— তোমার প্রত্যেকটা চিন্তার চেহারা বাইরে থেকে দেখছিলাম।'

'কিন্তু আমি তো চুপ করে বসে আছি। পো যার কথা লিখেছেন, মানে, যার ভাবনার চেহারা বাইরে থেকে আঁচ করা গিয়েছে, সে এক জায়গায় এভাবে বসে থাকেনি! কখনো আকাশের তারা দেখেছে, কখনো পাথরে হোঁচট খেয়েছে।'

'মানুষের মুখ হল মনের আয়না। অবয়ব তার নিত্যসঙ্গী।'

'তার মানে? অবয়ব দেখে মনের কথা বুঝতে পার?'

'অবয়ব আর চোখের ভাষা— দুটোর মধ্যে মনের চিন্তা ফুটে ওঠে। চিন্তার শুরু কখন খেয়াল আছে?'

'না।'

'আমি বলছি, শোনো। খবরের কাগজখানা ছুড়ে ফেলতেই আমার চোখ পড়ে তোমার ওপর। দেখলাম, তিরিশ সেকেন্ড শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলে। অর্থাৎ মনও চিন্তাশূন্য। তারপরই চোখ পড়ল জেনারেল গর্ডনের[৪] বাঁধানো ছবিটার ওপর। মুখ-চোখের চেহারা একটু পালটাল। অর্থাৎ, ভাবনার আনাগোনা শুরু হল। এরপরেই হেনরি ওয়ার্ড বীচারের[৫] না-বাঁধানো ছবিখানার দিকে তাকিয়ে যা ভাবলে— তা মুখেই প্রকট হল। ভাবলে, আহারে! এ-ছবি বাঁধালে ফাঁকা জায়গাটা তো ভরাট হবেই, গর্ডনের ছবির পাশে মানাবেও ভালো।'

'অপূর্ব! ঠিক ধরেছ দেখছি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি আমি।

'আবার তাকালে বীচারের ছবির দিকে। এবার নিবিড়ভাবে বীচারের চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করলে। আস্তে আস্তে তোমার মুখ থেকে আলোড়ন মিলিয়ে গেল— মুখ নিস্তরঙ্গ, অর্থাৎ মন স্মৃতির রোমন্থনে ব্যাপৃত। অথচ তাকিয়ে আছ ছবির দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলে মানুষটার মহান কীর্তির কথা, গৃহযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা। তখন কিন্তু আমাদের অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছিল, অবিচার করেছিল তাঁর প্রতি। আমার মনে আছে, তখন তুমি ঘৃণায় ফেটে পড়েছিলে। আস্তে আস্তে তোমার চাহনি ছবির ওপর থেকে সরে এল— কিন্তু ভাবনা তখনও অব্যাহত রইল। অর্থাৎ ছবির মানুষকে নিয়ে আর ভাবছ না, ভাবছ এবার সেই ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের কথা। কেননা, তোমার চোখ জ্বলে উঠল, ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল, হাত মুঠো করে ফেললে। তারপরেই মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আপন মনে মাথা নাড়লে। যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কথা ভেবে মুখটা তোমার ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তোমার নিজের ক্ষতচিহ্নটায় হাত বুলোলে, ফিকে হাসি হাসলে, এ-হাসি আমি চিনি, দেশে দেশে ঝগড়া মিটোনোর জন্যে রক্তক্ষয়ী এ-পন্থাটা যে কতখানি নির্বুদ্ধিতা আর অসংগত, তা ভেবে তুমি নিজের মনেই হেসে উঠলে। চিন্তার এই পর্যায়ে একমত হলাম তোমার সঙ্গে এবং তা ব্যক্ত করলাম সরবে।'

'এক্কেবারে ঠিক!'

'সেদিনকার সন্দেহ তাহলে মিটল তো? চলো এবার রাস্তার হাওয়া খেয়ে আসা যাক।'

ঘণ্টা তিনেক টো-টো করে বেকার স্ট্রিটে ফিরে দেখলাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাড়ি।

'ডাক্তারের গাড়ি দেখছি,' বললে হোমস। 'নতুন পসার শুরু করেছেন। জেনারেল প্র্যাকটিশনার, বিশেষজ্ঞ নন। তবে খাটিয়ে ডাক্তার। এসেছেন পরামর্শ করতে, কপাল ভালো ঠিক সময়ে ফিরেছি!'

হোমসের পদ্ধতি আমি জানি। ব্রুহাম গাড়ির আলোর পাশে ঝোলানো বেতের বাস্কেটে কী-কী ডাক্তারি যন্ত্রপাতি রয়েছে এবং তাদের অবস্থা দেখেই বুঝলাম ঝট করে এত কথা কী করে বলল সে। ঘরের জানলায় আলো জ্বলছে। রাত দশটায় এসেছেন নিশ্চয় সমস্যা নিয়ে। কৌতূহলী হয়ে ঢুকলাম ঘরে।

বালি রঙের জুলপিওলা পাণ্ডুবর্ণ বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের একজন অস্থিচর্মসার ভদ্রলোক অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিলেন। বিগতযৌবন শক্তিহীন চেহারা, একটু নার্ভাস আর লাজুক। শিল্পীসুলভ সরু হাত, ডাক্তার বলে মনে হয় না।

হোমস খুশি উজ্জ্বল কণ্ঠে বললে, 'গুড ইভনিং ডক্টর, মিনিট কয়েক হল এসেছেন দেখছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কোচোয়ান বলল বুঝি?'

'আপনার পাশের মোমবাতিটা এইমাত্র জ্বালানো হয়েছে দেখে বললাম। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ান, থাকি ৪০৩ নম্বর ব্রুক স্ট্রিটে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্নায়ুরোগ সম্বন্ধে বিরল গ্রন্থটি তাহলে আপনার লেখা?'

খুশি হলেন ভদ্রলোক। রক্তিম মুখে বললেন, 'যাক, বইটা পড়েছেন তাহলে। প্রকাশকের হিসেব অনুযায়ী নাকি বিক্রিই হয় না। আপনি ডাক্তার?'

'যুদ্ধে ছিলাম— অবসর নিয়েছি।'

'স্নায়ুরোগে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে আমার আছে। মি. হোমস। আমার বাড়িতে পর-পর এমন সব ঘটনা ঘটছে যে আপনার কাছে ছুটে না-এসে আর পারলাম না।'

বসল হোমস। পাইপ ধরিয়ে বললে, 'খুলে বলুন।'

ডক্টর ট্রেভেলিয়ানও বসলেন, 'কতকগুলো কথা এতই তুচ্ছ যে শুনলে আপনার হাসি পাবে। কিন্তু না-বললেও রহস্যটা স্পষ্ট হবে না। তাই সব বলব, বাদসাদ আপনি দেবেন।'

'প্রথমেই বলি, ছাত্র হিসেবে আমি ভালো ছিলাম। ডিগ্রি নেওয়ার পর মূর্ছারোগ সম্পর্কে কৌতূহল জাগানো কিছু গবেষণা করেছিলাম। তারপর স্নায়ুরোগের ওপর ওই বইখানা লিখে ব্রুস পিনকারটন পদক আর পুরস্কার দুটোই পাই।

'কিন্তু জমিয়ে প্র্যাকটিস করার মতো আমার পয়সা ছিল না। ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ারের[৬] ধারে কাছে ঘরভাড়া আকাশছোঁয়া, ডাক্তারি সরঞ্জামের খরচও অনেক। পসার না-জমা পর্যন্ত হাতে টাকাও দরকার। এত রেস্ত আমার ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ল। আশ্চর্য একটা সুযোগ পেলাম।

'বছর কয়েক আগে ব্লেসিংটন নামে এক অচেনা ভদ্রলোক সকালে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং গায়ে পড়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। ছাত্রজীবনে আমার সুনাম তিনি শুনেছেন, আমি যে পদক আর পুরস্কার পেয়েছি, সে-খবরও রাখেন। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন, আমি মদ খাই না, বদ নেশায় আসক্ত নই, অথচ পকেটে রেস্ত নেই বলে পসার জমাতে পারছি না। উনি তখন বললেন, "দেখুন মশায়, আমার বেশ কিছু টাকা এমনিই পড়ে আছে। আমি তা খাটাতে চাই। তাতে আপনার লাভ, আমারও লাভ।"

'শুনে তো আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আর কি! এ যে মেঘ না-চাইতেই জল! উনি তখন খুলে বললেন প্রস্তাবটা। ঘরভাড়া, সাজসরঞ্জাম কেনা, লোকজনের মাইনে, সব খরচ ওঁর। আমার কাজ হবে কেবল রুগি দেখা। রোজগার যা হবে, যার তিন ভাগ উনি নেবেন, এক ভাগ আমি পাব।

'আমি রাজি হয়ে গেলাম। লেডি ডে[৭]-তে প্র্যাকটিস শুরু করলাম। দোতলার সবচেয়ে ভালো ঘর দুটোয় উনি নিজে রইলেন, হার্ট খারাপ বলেই সবসময়ে ডাক্তারের সান্নিধ্যে থাকতেন। ঘর থেকে খুব একটা বেরোতেন না, কারো সঙ্গে মিশতেন না, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধে হলেই নীচে এসে আমার খাতাপত্র দেখে গিনি পিছু পাঁচ শিলিং তিন পেনি আমাকে দিয়ে বাকিটা নিজের ঘরে নিয়ে বাক্সে মজুত করতেন। রোজগারও ভালো হচ্ছিল। দেখতে দেখতে আমার পসার জমে গিয়েছিল। এই কয়েক বছরেই ভদ্রলোক বড়োলোক হয়ে গেলেন আমার দৌলতে।

'কয়েক সপ্তাহ আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্লেসিংটন বললেন, দরজা জানলায় মজবুত খিল লাগানো দরকার। ওয়েস্টএন্ডে নাকি সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। ভীষণ উত্তেজিত দেখলাম ভদ্রলোককে। কয়েক সপ্তাহ কাটল অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে— সবসময়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতেন বাইরে। রাত্তিরে ডিনারের পর একটু বেড়ানোর অভ্যেস ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল এরপর। দেখে শুনে মনে হল ভয়ে সিটিয়ে আছেন অষ্টপ্রহর। কাকে বা কীসের জন্যে এত আতঙ্ক, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হল বিপত্তি। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কাজেই আমি আর ও নিয়ে কথা বলিনি। আস্তে আস্তে সুস্থির হলেন। আগের মতো ডিনারের পর আবার বেড়ানো শুরু করলেন। তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে একেবারে বিছানা নিলেন।

'দু-দিন আগে একটি চিঠি পাই আমি। চিঠিতে তারিখ নেই, ঠিকানা নেই। শুনুন, পড়ছি।

'একজন খানদানি রুশ ভদ্রলোক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে দিয়ে তাঁর মূর্ছারোগের চিকিৎসা করাতে চান। কাল সন্ধে ছ-টা পনেরো মিনিটে তিনি আসবেন ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তারবাবু যেন হাজির থাকেন।'

'মূর্ছারোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল রুগি পাওয়া। তাই খুব উৎসাহ পেলাম চিঠি পেয়ে। পরের দিন চেম্বারে এলেন দুই ব্যক্তি। একজন রোগা লম্বা, গম্ভীর, বয়স্ক— অতি মামুলি চেহারা— আভিজাত্যহীন। আর একজন কান্তিমান যুবক, চওড়া বুক, ধারালো নাক মুখ।

'ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যুবকটি পরিচয় দিলেন নিজেদের। বয়স্ক পুরুষ তাঁর বাবা। মূর্ছারোগের প্রকোপে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। চোখে দেখা যায় না। কানে শোনা যায় না। বাবাকে আমার কাছে রেখে তাই তিনি পাশের ঘরে থাকবেন।

'বয়স্ক ভদ্রলোককে পরীক্ষা শুরু করলাম। জবাব দিলেন উলটোপালটা। বোধ হয় ভাষাটা ভালো জানা নেই বলেই। কিছুক্ষণ পরে কোনো জবাব না-দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন সামনে। চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে দেখে বুঝলাম রোগের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। নাড়ি, জ্বর, মাংসপেশি, প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে অবাক হলাম— সব স্বাভাবিক। তাই অ্যামাইল নাইট্রেট শুঁকিয়ে ঘোর কাটানো দরকার ভেবে ল্যাবরেটরিতে গেলাম ওষুধটা আনতে। মিনিট পাঁচেক পরে এসে দেখলাম ঘর খালি। তিনি নেই। পাশের ঘরে তাঁর ছেলেও নেই। চাকরটা নতুন, তেমন চটপটে নয়। রুগি কোথায়, সে বলতে পারল না। আওয়াজ-টাওয়াজও নাকি পায়নি। দরজাটা ভেজানো, বন্ধ নয়। পুরো ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য রয়ে গেল আমার কাছে।

'ব্লেসিংটন বেড়ানো শেষ করে ফিরে এলেন একটু পরে। ইদানীং ওঁর সঙ্গে খুব কম কথা বলি। তাই এ-প্রসঙ্গে কোনো কথা বললাম না।

'রুশ ভদ্রলোকরা আবার আসবেন ভাবিনি। পরের দিন ব্লেসিংটন বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই তাই ওঁদের ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কাঁচুমাচু মুখে ওঁরা বললেন কালকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। রোগের আক্রমণ কেটে যাওয়ার পর ভদ্রলোকের মনে হল একটা নতুন জায়গায় বসে আছেন। কেন এসেছেন, কোথায় এসেছেন— কিছু মনে করতে পারলেন না। প্রতিবার ঘোর কেটে যাওয়ার পর এইরকমই হয়— আগের কথা খেয়াল থাকে না। তাই সোজা বেরিয়ে যান ঘর থেকে। বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ছেলে ভাবেন, ডাক্তারের সঙ্গে কাজ শেষ হয়েছে বলেই বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছেন। পেছন পেছন তিনিও বেরিয়ে যান। বাড়ি যাওয়ার পর জানা যায় আসল ব্যাপারটা।

'শুনে একচোট হেসে নিয়ে নতুন করে রুগির সঙ্গে আলোচনা করতে বসলাম। ছেলে গেলেন পাশের ঘরে।

'আধ ঘণ্টা পরে প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়ার পর ছেলে এসে বাবাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন বাইরে।

'একটু পরেই বেড়িয়ে ফিরলেন ব্লেসিংটন। সটান গেলেন ওপরের ঘরে। পরমুহূর্তেই দুমদাম করে বললেন, "কে ঢুকেছিল আমার ঘরে?"

'উন্মত্ত চেহারা দেখে মাথার ঠিক নেই বুঝে রুক্ষতাটা গায়ে মাখলাম না। সবিনয়ে বললাম, 'কেউ তো ঢোকেনি।'

'শুনে ঠান্ডা হওয়া দূরে থাকুক, তুড়ুক নাচ নাচতে নাচতে সটান আমাকে মিথ্যেবাদী বলে বসলেন ব্লেসিংটন। ওপরের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, সত্যিই কার্পেটের ওপর কতকগুলো বড়ো আকারের পায়ের ছাপ— যা তাঁর নয় মোটেই।

'কালকে বিকেলে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল মনে আছে নিশ্চয় আপনার। বেশ বুঝলাম, রুশ রুগির ছেলেটি ভিজে জুতো নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিলেন। জিনিসপত্রে হাত দেননি। কিন্তু বসবার ঘরে বসে না-থেকে ওপরের ঘরে ঢুকে পায়চারি করে গিয়েছেন কার্পেটে।

'ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয় যে ভেঙে পড়তে হবে। কিন্তু মি. ব্লেসিংটন দেখলাম আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আর্মচেয়ারে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কান্নাটা কেন, সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারলাম না— আমিও কথা বলতে পারলাম না। তাই আপনার কাছে এলাম। খামোকা ভয় পাচ্ছেন মি. ব্লেসিংটন। আপনি গিয়ে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন তো ভালো হয়।'

নিমীলিত চোখে পাইপ টানতে টানতে প্রত্যেকটা শব্দ কান খাড়া করে শুনল হোমস! ডাক্তারের কাহিনি যে তার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, পাইপ থেকে ধুম উদ্‌গিরণের ধরন দেখেই তা বুঝলাম। কাহিনি শেষ হতেই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে গেলাম ব্রুক স্ট্রিটে ডাক্তারের চেম্বারে। কার্পেট-মোড়া চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, এমন সময়ে—

ফস করে নিভে গেল ওপরের আলো। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল কম্পিত কণ্ঠে ব্রজনাদ : 'খবরদার! হাতে পিস্তল আছে। ওপরে উঠলেই খতম করে দেব!'

ডাক্তার বললেন, 'কী হচ্ছে মি. ব্লেসিংটন? মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দেখছি।'

'আরে ডাক্তার নাকি! সঙ্গে কারা?' অন্ধকারেই টের পেলাম আমার এবং হোমসের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে কে যেন পরীক্ষা করছে। তারপরেই জ্বলে উঠল গ্যাসবাতি। 'আসতে পারেন। আসতে পারেন। ঠিক আছে। কিছু মনে করবেন না— একটু হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

আলোয় দেখলাম বিচিত্র ভদ্রলোককে। এককালে খুব মোটা ছিলেন। এখনও মোটা রয়েছেন— কিন্তু আগের মতো নয়। বুলডগের মতো শিথিল চামড়া ঝুলছে মুখময়। ভীষণ ঘাবড়ে যাওয়ায় থির থির করে কাঁপছে গালের চামড়া। বালি রঙের পাতলা চুল যেন ভয়ের চোটে খাড়া হতে চাইছে। আমরা এগিয়ে যেতেই হাতের পিস্তলটা পকেটে রেখে বললেন— 'আসুন মি. হোমস। ডাক্তারের কাছে শুনেছেন তো ঘরে কারা যেন ঢুকেছিল?'

'তারা কারা মি. ব্লেসিংটন? আপনাকে খুন করতেই-বা চাইছে কেন?' প্রশ্ন করল হোমস।

ঘাবড়ে গেলেন ব্লেসিংটন। আমতা আমতা করে বললেন, 'তা তো জানি না। আপনাকে তলব করলাম আপনার মুখেই শুনব বলে।'

'আপনি জানেন না?'

'আসুন, আসুন, ওপরে আসুন।'

গেলাম ওপরের ঘরে ভদ্রলোকের পেছন পেছন। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরের এককোণে রাখা একটা পেল্লায় কালো বাক্সের দিকে আঙুল তুলে ব্লেসিংটন বললেন, 'আমার সারাজীবনের টাকা ওর মধ্যে আছে। ব্যাঙ্ক-কে আমি ভরসা পাই না। জীবনে একবারই টাকা খাটিয়েছি ডাক্তারের মারফত। ঘরে লোক ঢুকেছে দেখে সেই কারণেই এত ঘাবড়ে গেছি।'

'মি. ব্লেসিংটন, আমাকে ঠকালে কিন্তু সাহায্য পাবেন না।'

'সবই তো বললাম।'

বিরক্ত মুখে পেছন ফিরল হোমস, 'তাহলে চললাম।'

'সে কী! কী করা উচিত বলে যান!' ভাঙা গলায় বললেন ব্লেসিংটন।

'প্রাণ খুলে কথা বলা উচিত— যা সত্যি তা বলা উচিত,' বলে আর দাঁড়াল না হোমস। আমাকে নিয়ে নেমে এল রাস্তায়।

হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'অযথা ঝামেলায় তোমাকে টেনে আনার জন্যে আমি দুঃখিত, ওয়াটসন। তবে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মাথায় তো কিছু ঢুকছে না।'

'দুজন অথবা তিনজন লোক রয়েছে এর মধ্যে। ব্লেসিংটনের ওপর তারা খেপে আছে। এদের একজন রুগির ছদ্মবেশে ডাক্তারকে আটকে রাখে— আর একজন সেই ফাঁকে ব্লেসিংটনের ঘরে ঢোকে।'

'রোগটা?'

'স্রেফ অভিনয়। কিন্তু কপালক্রমে দু-বারই ঘরের বাইরে রইল ব্লেসিংটন। তার মানে ওই সময়টা যে তার বেড়ানোর সময়, আততায়ীরা তা জানে। চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকলে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করত। তা ছাড়া প্রাণের ভয় থাকলে চোখ দেখলেই তা বোঝা যায়— ব্লেসিংটনের চোখে আমি মৃত্যুভয় দেখেছি। ও জানে কারা ঘরে এসেছিল— কিন্তু চেপে যাচ্ছে।'

'অথবা হয়তো ঘরের মধ্যে লোক ঢোকার ব্যাপারটা মনগড়া। ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বানিয়ে বলেছেন। নিজেই হয়তো ঘরে ঢুকেছিলেন কোনো বদ মতলবে।'

মুচকি হাসল হোমস আমার কল্পনার দৌড় দেখে।

বলল, 'ও-সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছি সিঁড়ির কার্পেটে সেই জোয়ান লোকটার পায়ের ছাপ দেখে। মাপটা ডাক্তারের জুতোর মাপের চেয়ে বড়ো। তা ছাড়া, ডাক্তার ছুঁচোলো জুতো পরেন— সে পরে এসেছিল চৌকোনা জুতো। যাকগে, আশা করছি, কালকেই নতুন খবর পাব ব্রুক স্ট্রিট থেকে।'

সত্যিই খবর এল, অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে। সাতসকালে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম হোমসের ধাক্কায়। চিরকুট এসেছে ডা. ট্রেভেলিয়ানের কাছ থেকে। নোটবুক থেকে ছেঁড়া কাগজে

দ্রুত লিখেছেন, 'ভগবানের নামে বলছি। এক্ষুনি আসুন, পি. টি.।' চিরকুট পাঠিয়েছেন কোচোয়ানের হাতে— গাড়ি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে নীচে।

পনেরো মিনিট লাগল ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছোতে। আমাদের দেখেই মাথায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, 'সর্বনাশ হয়ে গেল। মি. ব্লেসিংটন সুইসাইড করেছেন। গলায় দড়ি দিয়েছেন কাল রাতে।'

শিস দিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

কাতর কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, 'কী করি বলুন তো? সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। পুলিশ অবশ্য এসে গেছে, ওপরে আছে।'

'জানলেন কখন?'

'সকাল সাতটা নাগাদ রোজকার মতো চা নিয়ে গিয়েছিল ঝি। দেখল, ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছেন। ল্যাম্পের হুকে দড়ি বেঁধে কালো বাক্সটা থেকে লাফিয়ে ঝুলে পড়েছেন।'

চিন্তামগ্নভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হোমস। তারপর ডাক্তারের পেছন পেছন উঠল ওপরের ঘরে, সঙ্গে আমি। ঢুকেই দেখলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য। স্থূলকায় ব্লেসিংটন ঝুলন্ত অবস্থায় যেন আরও মোটা হয়ে গেছেন। ছাল-ছাড়ানো মুরগির গলার মতো লম্বা হয়ে বেরিয়ে রয়েছে গলা, বাদবাকি দেহটা নরদেহ বলে মনে হচ্ছে না। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত বেমানান লাগছে সব কিছু। গোড়ালি ফুলে উঠেছে। পাশে দাঁড়িয়ে চটপটে চেহারার একজন পুলিশ ইনস্পেকটর নোটবই খুলে কী যেন লিখছে।

হোমসকে দেখেই স্বাগত জানাল ইনস্পেকটর। হোমস বললে, 'আরে, ল্যানার[৮] যে। কী সিদ্ধান্তে পৌঁছোলে?'

'ভয়ের চোটে মাথার ঠিক রাখতে পারেননি ভদ্রলোক। ওই দেখুন না শোয়ার ফলে বিছানা দেবে রয়েছে— তারপর ভোর পাঁচটা নাগাদ উঠে ঝুলে পড়েছেন। জানেন তো বেশির ভাগ লোক ওই সময়ে আত্মহত্যা করে।'

লাশ পরীক্ষা করে আমি বললাম, 'মাসল যে-রকম শক্ত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ঘণ্টা তিনেক আগে মারা গেছেন ইনি।'

'অস্বাভাবিক কিছু পেয়েছ ঘরে?' হোমস শুধোয়।

'হাত ধোবার জায়গায় পেয়েছি একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর কয়েকটা স্ক্রু। কাল রাতে চারটে চুরুট খেয়েছিলেন ভদ্রলোক— পোড়া অংশগুলো পেয়েছি ফায়ারপ্লেসে। এই দেখুন।'

'চুরুটের হোল্ডার?'

'না।'

'চুরুটের বাক্স?'

'এই তো— কোটের পকেটে ছিল।'

বাক্স খুলে একটা চুরুট বার করে শুঁকল হোমস।

বলল, 'হাভানার চুরুট। কিন্তু এই পোড়া চুরুটগুলো ওলন্দাজরা আমদানি করেছে তাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। এসব চুরুট খড়ে মোড়া থাকে, একটু বেশি লম্বাটে আর সরু হয়।'

বলতে বলতে পকেট-ল্যাম্পের আলোয় পোড়া চুরুট চারটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললে হোমস, 'দুটো চুরুট ছুরি নিয়ে কাটা, বাকি দুটো সাজানো দাঁত দিয়ে কাটা। ল্যানার, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। ঠান্ডা মাথায় মার্ডার।'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'এত ঝামেলা পাকিয়ে কেউ খুন করে না।'

'সেটাই তো দেখতে হবে হে।'

'খুনিরা বাড়িতে ঢুকল কীভাবে?'

'সামনের দরজা দিয়ে।'

'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।'

'চলে যাওয়ার পর বন্ধ করা হয়েছিল।'

'জানলেন কী করে?'

'চিহ্ন দেখে। আরও খবর দিচ্ছি,' বলে হোমস দরজার কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে চুলচেরা চোখে উলটেপালটে দেখল চাবিটা। দেখল চাবির ফোকর। তারপর বিছানা, কার্পেট, চেয়ার, ম্যান্টলপিস, মৃতদেহ আর দড়ি পরীক্ষা করল। সবশেষে দড়ি কেটে ডেডবডি শোয়ানো হল চাদরের ওপর।

'হোমস ওটা খুলল আর তার মধ্যে একমাত্র যে চুরুটটা ছিল সেটা শুঁকল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

বললে, 'দড়িটা কোত্থেকে এল?'

ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বিছানার তলা থেকে এক বান্ডিল দড়ি বার করে বললেন, 'এখান থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। পুড়ে মরার ভয়ে দড়ি রাখতেন খাটের তলায়— সিঁড়িতে আগুন লাগলে জানলা গলে যাতে পালাতে পারেন।'

'ফলে ওদের ঝামেলাও কমে গেল।— ম্যান্টলপিস থেকে ব্লেসিংটনের এই ছবিখানা নিয়ে চললাম— কাজে লাগবে।'

'কিন্তু কিছু তো বলে গেলেন না?'

'তিনজন এসেছিল এঁকে খুন করতে। রুশ রুগির ছদ্মবেশে বয়স্ক ব্যক্তিটিকে মাঝে রেখে সারি দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিল তিনজনে। সবার আগে ছিল সেই জোয়ান ছোকরা— ছদ্মবেশী রুগির সাজানো ছেলে। দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল যে তার হদিশ এখনও পেলাম না। ল্যানার, চাকরটাকে গ্রেপ্তার করো। ডাক্তারের মুখে শুনেছি সে নতুন এসেছে কাজে।'

'পালিয়েছে ছোঁড়া!' গজ গজ করে বললেন ডাক্তার।

হোমস বললে, 'সে ছিল সবার পেছনে।'

অভিভূত কণ্ঠে বললাম, 'হোমস! এত কথা তুমি বলছ কী করে?'

'ভায়া, পায়ের ছাপ যে পর পর পড়েছে। ভুল হবার জো টি নেই। কোন ছাপটা কোন শ্রীমানের, সেটা তো কাল রাতেই জেনে গেছি! ওরা দরজার সামনে পৌঁছে তার দিয়ে খুঁচিয়ে খুলে ফেলল তালা— খালি চোখেই আঁচড়গুলো দেখা যায়। আতশকাচের দরকার হয় না। তারপর কাবু করল ব্লেসিংটনকে— খুব সম্ভব বিছানায় বসিয়ে নিজেরা বসল বিচারসভার মতো একটা পরামর্শসভায়। বুড়ো হোল্ডারে চুরুট লাগিয়ে বসল চেয়ারে। জোয়ান শাগরেদ এইখানে বসে চুরুট খেয়ে ছাই ঝাড়ল ড্রয়ার-আলমারিতে। তেসরা আদমি পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। বিচারে সাব্যস্ত হল ফাঁসি দেওয়া হবে ব্লেসিংটনকে। ফাঁসি দেবে বলেই কাঠ বা পুলির মতো কপিকল জাতীয় কিছু একটা সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয়। ফাঁসিকাঠ বানিয়ে নিত নিজেরাই— স্ক্রু ড্রাইভার আর স্ক্রু পর্যন্ত এনেছিল কড়িকাঠে সেটা লাগাবে বলে। কিন্তু ল্যাম্পের হুকটা দেখে সে হাঙ্গামা করতে হল না। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে বিদেয় হল জল্লাদরা, ভেতর থেকে স্যাঙাত বন্ধ করে দিল দরজা।'

যেন প্রত্যক্ষ করে বলছে, এমনিভাবে প্রতিটি ব্যাপারে বিশদভাবে বলে গেল হোমস। ছোটো ছোটো চিহ্ন থেকে এইভাবে সাজানো খুনের দৃশ্য শুনে তাজ্জব হলাম প্রত্যেকেই। ইনস্পেকটর তক্ষুনি বেরিয়ে গেল চাকরের খোঁজে।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল হোমস। বেলা তিনটের সময়ে এলেন ডাক্তার আর ইনস্পেকটর। হোমস ফিরল আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। মুখ প্রসন্ন— খবর শুভ নিশ্চয়।

'কী খবর ইনস্পেকটর?' শুধোল ল্যানারকে।

'শাবাশ! আর আমি পাকড়াও করেছি বাকি দুজনকে।'

'সে কী!' একযোগে চেঁচিয়ে উঠলাম তিনজনেই।

'পাকড়াও করেছি মানে তাদের ঠিকুজি কুষ্ঠি জেনে ফেলেছি। ব্লেসিং... টনকে পুলিশমহল চেনে। যারা খুন করে গেল, তাদেরকেও চেনে। এদের নাম বিডল, হেওয়ার্ড আর মোফাট।'

'ওয়াশিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাত!' আঁতকে উঠল ইনস্পেকটর।

'এক্কেবারে ঠিক!'

'তাহলে ব্লেসিংটনের আসল নাম সাটন?'

'তা আর বলতে।'

আমি আর ডক্টর ট্রেভেলিয়ান মূঢ়ের মতো দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

হোমস বুঝিয়ে দিল— পাঁচজনে মিলে ডাকাতি করেছিল ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্কে। চারজনের নাম এইমাত্র বললাম— পঞ্চমজন হল কার্টরাইট। গার্ড টোবিনকে খুন করে সাত হাজার পাউন্ড নিয়ে চম্পট দেয় এরা। ঘটনাটা ঘটে ১৮৭৫ সালে। পুলিশ পাঁচজনকেই ধরে। রাজসাক্ষী হয় এই ব্লেসিংটন বা সাটন। অথচ এদের মধ্যে সবচেয়ে বদমাশ ছিল এই সাটন। ফাঁসি হয়ে যায় কার্টরাইটের। বাকি তিনজন জেলে যায়। পনেরো বছরের মেয়াদ ফুরোনোর বছর কয়েক আগেই ছাড়া পেয়ে[৯] এরা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে সাটনকে। দু-বার খুন করতে এসে ফিরে যায়— ভাগ্যক্রমে বাড়ি থাকেনি সাটন। তৃতীয়বারে কাজ হাসিল করেছে।'

ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বললেন, 'খবরের কাগজে তিনজনের খালাস পাওয়ার খবরটা পড়েই বোধ হয় অত ভয় পেয়েছিল ব্লেসিংটন?'

'হ্যাঁ। ডাকাতির গল্প যা বলেছিল, সেটা গল্পই।'

'কিন্তু আমার কাছে খুলে বললেই তো হত!'

'খুলে বলা কি যায়? পুরোনো দোস্তদের হিংস্র প্রকৃতি সে যতটা জানে, আর কেউ তা জানে না। জিঘাংসা যাদের রক্তে, তারা জেল থেকে বেরিয়ে কী করবে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল বলেই আতঙ্কে আটখানা হয়ে গিয়েছিল পাপিষ্ঠ সাটন। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে বলতে পারেনি। তাই চেয়েছিল ব্রিটিশ কানুনের সাহায্য নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু বিচার কানুনের চেয়ে বড়ো।'

ব্রুক স্ট্রিটের রহস্যকাহিনির পরিসমাপ্তি এইখানেই। কেননা, তিন বিচারক-জল্লাদের টিকি ধরা আর যায়নি। বছর কয়েক আগে পর্তুগিজ উপকূলে একটা জাহাজ নিখোঁজ হয়! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশ্বাস খুনি তিনজন আরোহীদের মধ্যে ছিল।

টীকা

১. **আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি** : 'দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট' প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অগাস্ট ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলি-র ১২ অগাস্ট ১৮৯৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায়।

২. **হোমসের অবদান সেখানে অকিঞ্চিৎকর** : যেমন বলা যেতে পারে এ স্টাডি ইন স্কারলেটের কথা। সেখানে হোমস অপরাধীকে চিহ্নিত করলেও আসল রহস্যের সমাধান হয় অপরাধীর জবানবন্দিতে। খুনি মুখ না-খুললে হত্যার কারণ জানা সম্ভব নাও হতে পারত।

৩. **এডগার অ্যালান পো** : প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. **জেনারেল গর্ডন** : মেজর জেনারেল চার্লস জর্জ গর্ডন (১৮৩৩-১৮৮৫)। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স কোর-এর হয়ে ক্রিমিয়া, তাইপে, আফিং যুদ্ধ প্রভৃতি যুদ্ধে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

৫. **হেনরি ওয়ার্ড বীচার** : আমেরিকার কনগ্রেগেশনাল পাদরি হেনরি ওয়ার্ড বীচার (১৮১৩-১৮৮৭) ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, বক্তা, সমাজসেবী এবং দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বন্ধুপত্নী এলিজাবেথ টিলটনের সঙ্গে ব্যভিচারের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অপরাধে জর্জরিত হলেও তাঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

৬. **ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার** : ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার লন্ডনের একটি অংশ। এখানকার লাগোয়া হার্লে স্ট্রিট এবং উইমপোল স্ট্রিটে শহরের বিশিষ্ট ডাক্তারদের চেম্বার অবস্থিত। ১৮৯১-এর মার্চ থেকে মে মাস ২, আপার উইমপোল স্ট্রিটে ছিল আর্থার কন্যান ডয়ালের চেম্বার।

৭. **লেডি ডে :** পঁচিশে মার্চ খ্রিস্টধর্মে ফিস্ট অব অ্যানানসিয়েশন পালিত হয়। ধর্মবিশ্বাসে মনে করা হয় এইদিন অ্যাঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল মেরি মাতাকে জানান যে তিনি যিশুর জন্ম দেবেন।

৮. **ল্যানার :** ইনস্পেকটর ল্যানারকে হোমসের এই একটি গল্পেই দেখা গিয়েছে।

৯. **মেয়াদ ফুরোনোর বছর কয়েক আগেই ছাড়া পেয়ে :** ইংলন্ডের আইনে কোনো কয়েদি তার মোট মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত ছাড় পেতে পারত জেলখানায় তার ভালো ব্যবহারের ভিত্তিতে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিদের এমন ছাড়ের ব্যবস্থা নেই, তবে তাদের মেয়াদের বিশ বছর পার হলে কখনো এ-বিষয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন কর্তৃপক্ষ।

গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা[১]

[দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রিটার]

শার্লক হোমসের তিন কুলে কেউ আছে জানা ছিল না। এতদিনের মেলামেশায় কক্ষনো বলেনি ছেলেবেলার কাহিনি অথবা আদৌ কোনো আত্মীয়স্বজন আছে কি না। সেই কারণেই আমার ধারণা হয়েছিল ও একটা হৃদয়হীন মস্তিষ্কময় যুক্তিসর্বস্ব যন্ত্রবিশেষ। মেয়েদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। আবেগ-টাবেগের ধার ধারে না এবং নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। বাপ-মা ছেলেবেলাতেই মায়া কাটিয়েছেন, এ-সংসারে সে এক্কেবারে একা।

তাই একদিন ওর মুখেই যখন শুনলাম ওর একজন ভাই আছে, পিলে চমকে উঠল আমার।

কথাটা উঠল একদিন বিকেলের দিকে চা খাওয়ার পর। এলোমেলো হাজারো বিষয় আলোচনা করতে করতে মানুষ রক্তসূত্রে কতটা শেখে এবং নিজের চেষ্টায় কতটা শেখে, এই নিয়ে আরম্ভ হল কথাবার্তা।

আমি বললাম, 'তুমি নিজেই নিজেকে গড়েছ! অদ্ভুত এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর পর্যবেক্ষণ শক্তি তোমার নিজস্ব ব্যাপার।'

আনমনা হয়ে হোমস বললে, কিছুটা তাই। গাঁইয়া জমিদারের বংশে[২] জন্মেছি আমি, সেই জীবনধারার কিছুটা আমার রক্তেও এসেছে। ঠাকুমা ছিলেন ফরাসি শিল্পী ভের্নের[৩] বোন। শিল্পীয় তন্ময়তা আর পর্যবেক্ষণ শক্তি নাতির রক্তেও তাই রয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ-তন্ময়তা যে রক্তসূত্রে পেয়েছ, তার কী প্রমাণ?'

'আমার ভাই মাইক্রফটের মধ্যেও এ-গুণ আছে; বেশিমাত্রায়।'

শুনে হাঁ হয়ে গেলাম আমি। এ যে এক্কেবারে নতুন খবর; কিন্তু তা কী করে হয়? হোমসের চাইতেও তুখোড় যুক্তিবাদীর সংবাদ লন্ডনের কাকপক্ষীও জানতে পারল না, এ কি সম্ভব? নিশ্চয় বিনয় করে নিজেকে ছোটো করছে হোমস। কথাটা বলতে গেলাম, কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিল হোমস। বলল, 'বিনয় জিনিসটা আর যাই হোক একটা সৎ গুণ নয়। সত্যের অপলাপ করাটা কি ভালো? কট্টর যুক্তিবাদী কখনো সত্যকে খামোকা ছোটো করে বা অযথা বড়ো করে জাহির করে না, যা দেখে, তাই বলে! আমি যখন বলছি মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার চেয়ে ঢের বেশি, তুমি ধরে নিতে পার কথাটা সত্যি, এর মধ্যে বিনয়ের মিথ্যে প্রলেপ নেই।'

'তোমার ছোটো ভাই?'

'বড়ো দাদা— সাত বছরের ব্যবধান।'

'তবে তাঁকে কেউ চেনে না কেন?'

'নিজের মহলে সবাই তাকে চেনে।'

'সে-মহলটা কোথায়?'

'ডায়োজিনিস ক্লাবে।'

নামটা নতুন আমার কাছে। হোমস তা বুঝে ঘড়ি দেখে বলল, 'ডায়োজিনিস ক্লাব হল লন্ডনের কিছু আশ্চর্য লোকের আড্ডাখানা। মাইক্রফট নিজেও একজন আশ্চর্য মানুষ। প্রত্যেকদিন পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা কুড়ি পর্যন্ত ক্লাবে থাকে সে। এখন ছ-টা বাজে, ইচ্ছে থাকলে আশ্চর্য একটা ক্লাব আর তার চাইতেও আশ্চর্য একটি মানুষের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পার।'

মিনিট পাঁচেক পরে রিজেন্ট সার্কাসের[৪] দিকে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শার্লক হোমস বললে, 'ভাবছ আশ্চর্য এই ক্ষমতাকে কাজে লাগায় না কেন দাদা? কারণ আর কিছুই না, সে-ক্ষমতা তার নেই।'

'কিন্তু এক্ষুনি যে বললে—'

'মাইক্রফট হোমস'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

'বলেছি, চোখ দিয়ে আর মন দিয়ে বিচার করার ব্যাপারে আমি তার কাছে ছেলেমানুষ। শুধু চেয়ারে বসেই যদি এ-কাজ করা যেত তাহলে এই পৃথিবীতে তার চাইতে বড়ো সত্যান্বেষী আর থাকত না— কিন্তু সে-রকম কোনো উচ্চাশা বা বাসনাই তার মধ্যে নেই। যুক্তি দিয়ে বিচার করার পর হাতেনাতে যাচাই করা দরকার, আদালতে পেশ করার উপযুক্ত করে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মামলা সাজানো দরকার— কিন্তু সে-ব্যাপারে ওর কোনো উৎসাহ নেই। ও শুধু চেয়ারে বসেই বলে

দেবে কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক। পরে আমি মিলিয়ে দেখেছি— সত্যিই ঠিক বলেছে দাদা। বহুবার বহু গোলমেলে ব্যাপারে ওর পরামর্শ নিয়েছি— কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে মামলা সাজানোর কোনো ক্ষমতাই নেই মাইক্রফটের।

'বিশেষ এই ক্ষমতা খাটিয়ে রুটি রোজগারের ধান্দায় উনি নেই বলছ?'

'একেবারে নেই। আমার কাছে যা জীবিকা— ওর কাছে তা শখ ছাড়া কিছুই নয়। অঙ্কে তুখোড়। সরকারি দপ্তরে হিসেবের খাতা দেখে[৫]। থাকে পলমল[৬]-এ। ব্যায়াম বলতে সকাল-সন্ধে রাস্তার মোড় পর্যন্ত পায়চারি। বাড়তি সময় কাটায় আশ্চর্য এই ডায়োজিনিস ক্লাবে— আর কোথাও নয়।

'এই প্রথম শুনলাম ডায়োজিনিস ক্লাবের নাম।'

'তুমি কেন, অনেকেই এ-ক্লাবের নাম শোনেনি। তার কারণ, ক্লাবের সদস্যরা নিজেরাই মুখ-টেপা, লাজুক এবং মিশুকে মোটেই নয়। মনুষ্য-সংসর্গ এদের ভালো লাগে না— কিন্তু চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে নতুন নতুন ম্যাগাজিন পড়তে পেলে আর কিছু চায় না। সাধারণ ক্লাবের গুলতানি এদের দু-চোখের বিষ। তাই ডায়োজিনিস ক্লাবের পত্তন ঘটেছে শুধু এদের জন্যেই। এখানে প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন থাকে— পাশের লোক সম্বন্ধে কৌতূহল দেখায় না— গায়ে পড়ে আলাপ করতে যায় না— দর্শনার্থীদের ঘর ছাড়া ক্লাবঘরের মধ্যে বকবক করে না। পরপর তিনবার এর অন্যথা ঘটলে সভ্য-পদ থেকে নাম পর্যন্ত খারিজ হয়ে যেতে পারে। আমার দাদাটি বিচিত্র এই ডায়োজিনিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ওয়াটসন, এ-ক্লাবের পরিবেশটা আমারও খুব ভালো লাগে।'

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম ডায়োজিনিস ক্লাবে। ভেতরে ঢোকার আগেই আমাকে মুখে চাবি দিয়ে থাকতে বলল হোমস। বসবার ঘরের দিকে যাওয়ার পথে দেখলাম বিস্তর লোক হল ঘরে খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসে আছে— কেউ কারো সাথে বাক্যবিনিময় করছে না। বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল হোমস। একটু পরেই ফিরে এল যাঁকে নিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি তার সহোদর ভাই— মুখচ্ছবিতেই[৭] তার স্পষ্ট স্বাক্ষর। সেইরকম তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনি চলতে ফিরতেও যেন ধ্যান করছেন নিজের মনে। অথচ এই ধ্যানস্থ আত্মনিমগ্ন সুদূরের চাহনি শার্লক হোমসের চোখে কেবল কূট সমস্যা সমাধানের সময়েই দেখেছি— সবসময়ে নয়। চোখ দুটো অদ্ভুত হালকা রঙের— পিচ্ছিল পারার মতো তরল ধূসর আভায় সমুজ্জ্বল। তফাতের মধ্যে শার্লক হোমসের চাইতে ইনি অনেক বেশি দোহারা চেহারা এবং বেজায় মোটা। পেটাই গড়ন, মুখ ভারী হলেও ছোটো ভাইয়ের মতোই ধারালো।

আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনার কলমের দৌলতে শার্লকের কীর্তিকাহিনি তো এখন লোকের মুখে মুখে। ভালো কথা, শার্লক, আমি ভেবেছিলাম ম্যানর হাউসের সেই কেস নিয়ে গত সপ্তাহে আসবি। হালে পানি পাসনি বোধ হয়?'

অট্টহেসে শার্লক হোমস বললে, 'ঠিক উলটো। কিনারা করে ফেলেছি।'

'অ্যাডামসই নিশ্চয় নাটের গুরু?'

'তা আর বলতে।'

'গোড়াতেই আঁচ করেছিলাম', বলে ভাইকে নিয়ে জানলার ধারে বসলেন মাইক্রফট হোমস— 'মানুষের চরিত্র নিয়ে কত গবেষণাই-না করা যায় এই জানলা থেকে। মিনিটে মিনিটে হরেক রকমের নমুনা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। যেমন ধর, ওই লোক দুটো।'

'একজন তো দেখছি বিলিয়ার্ড[৮] খেলার হিসেব রাখে।'

'ধরেছিস ঠিক। অপর জন?'

লোক দুজন ততক্ষণে জানলার সামনে এসে গেছে। বিলিয়ার্ড খেলার হিসেব রাখে যাকে বলা হল, তার ওয়েস্টকোটের পকেটে কয়েকটি খড়ির দাগ ছাড়া বিলিয়ার্ড খেলার কোনো চিহ্ন সর্বাঙ্গে দেখলাম না। দ্বিতীয় ব্যক্তি খর্বকায়, গাঢ় রঙের মানুষ। টুপি পেছনে হেলানো, বগলে খানকয়েক পুলিন্দা। শার্লক হোমস বিনা বাধায় বললে, 'এককালে সৈন্য ছিল।'

'সম্প্রতি রিটায়ার করেছে,' ততোধিক ঝটিতি ধুয়ো ধরলেন মাইক্রফট হোমস।

'ভারতবর্ষে ডিউটি দিয়েছে।'

'সনন্দ-বিহীন অফিসার।'

'খুব সম্ভব গোলন্দাজ বাহিনীর।'

'বিপত্নীক।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা আছে।'

'একটা নয় রে, অনেকগুলো,' বললেন মাইক্রফট।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'থামুন! থামুন! মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দেখছি।'

শার্লক হোমস বললে, 'ভায়া, যার চেহারা রোদে পুড়ে কালচে মেরে গেছে, চালচলন যার বেশ ভারিক্কি,— সে যে কর্তৃত্বব্যঞ্জক, উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষ এবং সদ্য ভারতবর্ষ থেকে এসেছে, তা আঁচ করা কি খুব কঠিন?'

মাইক্রফট হোমস সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'পায়ের গোলাগুলি-মার্কা বুট[৯] দেখেও তো বোঝা যায় সবে মিলিটারির কাজ ছেড়েছে।'

'ঘোড়সওয়ার সৈন্য নয়, অথচ ভুরুর একদিকের হালকা রং দেখে বোঝা যাচ্ছে কাত করে টুপি পরত। ওইরকম ওজনের লোক মাটি কাটার কাজও করে না। তাই বললাম, গোলন্দাজ বাহিনীতে থেকেছে এতদিন।'

মাইক্রফট বললেন, 'আপাদমস্তক অশৌচের বেশ দেখে বুঝলাম নিশ্চয় অত্যন্ত প্রিয়জন কাউকে হারিয়েছে। বাজার-হাট নিজেই যখন করছে, প্রিয়জনটি নিশ্চয় স্ত্রী। জিনিস কিনছে বাচ্চাদের জন্যে। ঝুমঝুমি দেখে বুঝলাম, একটি বাচ্চা নেহাত শিশু। সম্ভবত আঁতুড়েই মারা গেছে স্ত্রী। বগলে ছবির বই নেওয়ার কারণ শিশু ছাড়াও আর একটা বড়ো বাচ্চা ঘরে আছে।'

শার্লক হোমস বলেছিল, 'দাদার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নাকি অনেক বেশি।' এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কচ্ছপের খোলের নস্যিদানি বার করে নস্যি দিলেন মাইক্রফট। বিরাট একটা লাল সিল্কের রুমাল দিয়ে বাড়তি গুঁড়ো ঝেড়ে ফেললেন।

বললেন, 'শার্লক, একটি আশ্চর্য রহস্য হাতে এসেছে। শুনবি?'

'বলো, বলো, বলে ফেলো,' লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

নোটবই বার করে পাতা ছিঁড়ে কী লিখলেন মাইক্রফট। বেয়ারাকে ডেকে চিরকুটটা দিলেন তার হাতে।

বললেন, 'মি. মেলাসকে ডাকতে বললাম। ভদ্রলোক জাতে গ্রিক, পেশায় দোভাষী, নিবাস আমার ওপরতলায়। হোটেলে যেসব টাকার কুমিররা আসে, তাদের সেবা করে পেট চালান। গাইডের কাজ আর কি। কখনো-সখনো আইন-আদালতে দোভাষীর কাজ করেন।'

মিনিট কয়েক পরেই ঘরে ঢুকলেন খর্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি। আঁটসাঁট মজবুত চেহারা। জলপাই রঙের মুখ আর কয়লা-কালো চুল দেখেই মালুম হয় মাতৃভূমি দক্ষিণাঞ্চলে— কথাবার্তা কিন্তু শিক্ষিত ইংরেজের মতো। সাগ্রহে করমর্দন করলেন শার্লক হোমসের সঙ্গে— বিখ্যাত বিশেষজ্ঞটির সমীপে নিজের বিচিত্র কাহিনি নিবেদন করার সুযোগ পাওয়ায় খুশির রোশনাই ঝিলমিলিয়ে উঠল তাঁর দুই চোখে।

বললেন কাঁচুমাচু মুখে, 'পুলিশ তো আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করছে না। কিন্তু মুখে পট্টিওয়ালা লোকটার কী হাল হল না-জানা পর্যন্তও যে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

'আমাকে বলুন,' বলল শার্লক হোমস।

'ঘটনাটা ঘটে দু-দিন আগে— সোমবার। আমার মাতৃভাষা গ্রিক— তাই বেশির ভাগ ওই ভাষাতেই দোভাষীর কাজ করি। কিন্তু প্রায় সব ভাষাই আমি জানি। লন্ডনের সব হোটেলেই আমাকে চেনে।

'বিদেশি পর্যটকরা ফাঁপরে পড়লেই আমাকে তলব করে। তাই অনেক সময়ে গভীর রাতেও আমার ডাক পড়ে। সোমবার রাতে মি. ল্যাটিমারকে দেখে তাই অবাক হইনি।

'ভদ্রলোক নীচে গাড়ি রেখে ওপরে এলেন। তাঁর এক গ্রিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না— গ্রিক ছাড়া তিনি কিছু জানেন না। বাড়ি তাঁর কেনসিংটনে— কাছেই।

'তাড়াহুড়ো করে আমায় নামিয়ে এনে গাড়িতে তুললেন মি. ল্যাটিমার। কিন্তু সোজা পথে না-গিয়ে গাড়ি চলল ঘুরপথে। কারণটা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যে হাঁ হয়ে গেলাম আমি।

'উনি বসে ছিলেন আমার মুখোমুখি। হঠাৎ সিসে দিয়ে ভারী করা একটা সাংঘাতিক লাঠি পকেট থেকে বার করে সামনে পেছনে দুলিয়ে হাতে বাড়ি মেরে ওজনটা পরখ করলেন, রাখলেন পাশে সিটের ওপর! তারপর ঝপাঝপ করে বন্ধ করে দিলেন জানলাগুলো। তখনই দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটা জানলা কাগজ দিয়ে ঢাকা— যাতে বাইরে দেখতে না-পাই।

'বললেন, "মি. মেলাস, বুঝতেই পারছেন, কোথায় যাচ্ছেন আপনাকে তা জানাতে চাই না।"

'ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে আমার তখন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। লাঠি বাদ দিলেও মি. ল্যাটিমার শক্তিমান পুরুষ। ইয়া চওড়া কাঁধ। হাতাহাতি করেও সুবিধে করতে পারব না।

'তাই তো-তো তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "এটা কীরকম হল, মি. ল্যাটিমার?"

'মি. মেলাস, চেঁচামেচি করবেন না— বিপদে পড়বেন। মনে রাখবেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন— কেউ জানেন না।'

'কথাগুলো খুব ঠান্ডাভাবে বলা হলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বেশ বুঝলাম, পড়েছি যবনের হাত— খানা খেতে হবে সাথে। বাধা দিতে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

'তাই বসে রইলাম মুখে চাবি এঁটে। ঝাড়া দু-ঘণ্টা নানা পথঘাট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। ঝট করে দরজা খুলে চট করে আমাকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হল নীচু খিলেন দেওয়া একটা দরজার ভেতরে। পলকের জন্যে দেখলাম দু-পাশের গাছের সারিওলা একটা লন।

'ভেতরে একটা ম্যাড়মেড়ে রঙিন আলো জ্বলছে। দেওয়ালে ছবি ঝুলছে। বেশ বড়ো ঘর। দরজা খুলছে ইতর চেহারার চোয়াড়ে টাইপের গোল কাঁধওলা একটা মর্কটাকৃতি বেঁটে লোক। চোখে চশমা। মধ্যবয়স্ক। নোংরা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মি. মেলাস নাকি? এই ভাবে জামাই আদরের জন্যে রাগ করবেন না। কিন্তু চালাকিও করতে যাবেন না। তাহলেই—"

'বলে, আবার খি-খি করে এমন একটা রক্ত-জল-করা হাসি হাসল যে লোম-টোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

'একজন গ্রিক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবেন। আমাদের প্রশ্ন তাঁকে শোনাবেন— তাঁর জবাব আমাদের বলবেন। যা জিজ্ঞেস করতে বলব তার বেশি একটা কথাও বলতে যাবেন না। কৌতূহল দেখাতে যাবেন না। যদি দেখান—' আবার সেই রক্ত-জল-করা খি-খি হাসি হেসে মর্কট বাঁটুল বললে— 'এমন টাইট দেব যে অনুশোচনার আর অন্ত থাকবে না— তখন ভাববেন, আহা রে! কেন মরতে জন্মাতে গেলাম পৃথিবীতে!'

'কথার মাঝেই খুলে গেল একটা দরজা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের ঘরে। দামি দামি ফার্নিচার আর পা-ডুবে-যাওয়া কার্পেট দিয়ে সাজানো ঘর। একটু পরেই প্রায় ধরে ধরে এক ব্যক্তিকে আনা হল সেই ঘরে। কাছে আসতেই ক্ষীণ আলোয় দেখলাম তাঁর মুখের চেহারা। আঁতকে উঠলাম সেই মুখ দেখে। মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা অব্যক্ত বেদনায়। সারামুখে তাঁর অজস্র পটি— প্লাস্টার আর প্লাস্টার। একটা বিরাট প্লাস্টার দিয়ে মুখটা বন্ধ— কথা বলার জো নেই। দেহে শক্তি এক বিন্দুও নেই, কিন্তু মন এখনও নুয়ে পড়েনি। অপরিসীম আত্মবল ধক ধক করে জ্বলছে বিশাল দুই চোখে।

'লোকটাকে একটা চেয়ারে বসানো হল বটে, কিন্তু তা না-বসারই শামিল। যেকোনো মুহূর্তে ঘাড় মুচকে ধড়াস পড়ে যাবেন মনে হল।

'মাঝবয়েসি লোকটা বলল, "হ্যারল্ড, ওঁর হাত খোলা আছে। পেনসিলটা হাতে দাও। মি. মেলাস, আপনি জিজ্ঞেস করবেন, উনি লিখে জবাব দেবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করুন, কাগজপত্রে সই দেবেন কি না?"

'মুমূর্ষু গ্রিকের বিশাল চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল এই প্রশ্নে। গ্রিক ভাষায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে স্লেটে জবাব লিখলেন, "কখনোই না।"

'কোনো শর্তেই নয়?' ইতর লোকটার প্রশ্ন তরজমা করলাম আমি।

'একটাই শর্ত, গ্রিক পুরুতের সামনে ওর বিয়ে দিতে হবে।'

'কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখছি।'

'পরোয়া করি না।'

'এইভাবে চলল কথাবার্তা। আমি জিজ্ঞেস করছি, উনি লিখে জবাব দিচ্ছেন। একই প্রশ্ন আর জবাব ঘুরে ফিরে এল প্রশ্নোত্তরের মধ্যে। কাগজপত্তর সই করবেন কি না, এই কথার একটাই

জবাব দিয়ে গেলেন উনি, ‘‘কখনোই না।’’ সীমাহীন ঘৃণা যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরুল জবাব লেখার ধরনে। এই সময়ে মতলব এল মাথায়। সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিলাম। যেটুকু জিজ্ঞেস করতে বলা হল আমাকে, তার চেয়ে একটু বেশিই জিজ্ঞেস করলাম এবং জবাবটা নিজের মনেই জমিয়ে রাখলাম— শয়তানদের কাছে চেপে গেলাম।

‘কীরকমভাবে চালাকিটা খেললাম শুনুন :

‘‘কেন গোঁয়ারতুমি করছেন? কে আপনি?’’

‘‘বেশ করছি। লন্ডনে আমি নবাগত।’’

‘‘অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যু। কদ্দিন এসেছেন?’’

‘‘হোক না মৃত্যু। তিন সপ্তাহ।’’

‘‘এ-সম্পত্তি এ-জীবনে আপনি পাবেন না। কী হয়েছে আপনার?’’

‘‘আমি না-পাই, শয়তানের বাচ্চাদেরও দোব না। না-খাইয়ে রেখেছে আমাকে।’’

‘‘সইটা করলেই ছেড়ে দেব। এ-বাড়িটা কোথায়?’’

‘‘সই করব না। জানি না।’’

‘‘তাতে ওর কোনো লাভ হচ্ছে কি? কী নাম আপনার?’’

‘‘সেটা ওর মুখেই শুনব। ক্রাতাইদিস।’’

‘‘সই করলেই দেখা হবে। কোত্থেকে এসেছেন?’’

‘‘তাহলে চাই না দেখা করতে। এথেন্স থেকে।’’

‘মি. হোমস, আর একটা প্রশ্ন করলেই কুচুক্কুরে লোক দুটোর সামনেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আচম্বিতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন পরমাসুন্দরী লাবণ্যময়ী মহিলা। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী এবং কৃষ্ণকেশী।

‘ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ‘‘হ্যারল্ড, কতক্ষণ আর একা থাকব? আরে পল যে!’’

শেষ বিস্ময়ধ্বনিটা বেরোল গ্রিকভাষায়। চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন নিগ্রহ-বিধ্বস্ত গ্রিকপুরুষ, একটানে খুলে ফেললেন মুখের প্লাস্টার এবং ‘সোফি! সোফি!’ বলে আকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন সুন্দরীকে।

‘পলকের মধ্যে ঘটল পরবর্তী ঘটনাগুলো। বয়স যার কম সেই লোকটা মহিলাটিকে জাপটে ধরে বেরিয়ে গেলেন এক দরজা দিয়ে। আর এক দরজা দিয়ে অত্যাচারে আধমরা গ্রিক ভদ্রলোককে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল মাঝবয়সি লোকটা।

‘ঘর ফাঁকা। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করব কি না ভাবছি, এমন সময়ে দেখি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ইতর চেহারার মাঝবয়সি সেই লোকটা।

‘আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘‘মি. মেলাস, আমাদের নিজস্ব দোভাষী হঠাৎ অন্যত্র যাওয়ায় এই গোপন ব্যাপারে আপনাকে ডাকতে হয়েছে। জেনেও ফেলেছেন অনেক কিছু। এই নিন। আপনার পারিশ্রমিক।’ হাত বাড়িয়ে নিলাম পাঁচ পাউন্ড পারিশ্রমিক। কাছে আসায় দেখতে পেলাম বেঁটে বামনের বিকট মুখখানা। হলদেটে মুখ, ছুঁচোলো সুতলি দাড়ি, ভয়ংকর ধূসর ইস্পাতকঠিন নির্মম একজোড়া চোখ— নরকের সমস্ত শয়তানি

পুঞ্জীভূত হয়েছে কুতকুতে সেই চোখে। থেমে গেলাম আমি, একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

'আমার বুকে টোকা মেরে বিশ্রী হেসে ঠোঁট আর চোখের পাতা অদ্ভুতভাবে কাঁপিয়ে মূর্তিমান শয়তানটা বললে, "একটা কথাও যদি প্রকাশ পায়, আমাদের কানে তা আসবেই। আপনার কপালেও তাহলে অনেক দুর্গতি আছে জানবেন। যান, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

'আবার আমাকে ঠেলেঠুলে তুলে দেওয়া হল গাড়ির মধ্যে। মি. ল্যাটিমার বসলেন গাড়ির মধ্যে আমার সামনে। আগের মতোই অনেকক্ষণ ছুটল গাড়ি। থামল মাঝরাত নাগাদ একটা বিজন অঞ্চলে। আমাকে নামিয়ে দেওয়ার আগে মি. ল্যাটিমার বললেন, "পেছন নিতে চেষ্টা করবেন না বলে দিলাম।" গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামতেই কোচোয়ানের ছিপটি খেয়ে তিড়বিড়িয়ে ঘোড়া ছুটল সামনে— দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

'জায়গাটা একটা রেললাইনের পাশে, ক্ল্যাপহ্যাম জংশন থেকে মাইলখানেক দূরে; হেঁটে গেলাম স্টেশনে। শেষ ট্রেন ধরে পৌঁছালাম ভিক্টোরিয়ায়। পরের দিন মি. মাইক্রফট হোমসকে আশ্চর্য অভিযানের রোমাঞ্চ কাহিনি বললাম এবং পুলিশে খবর দিলাম।'

কাহিনি শেষ হল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

তারপর শার্লক হোমস দাদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যবস্থা কিছু হয়েছে?'

টেবিল থেকে 'ডেলি নিউজ' কাগজটা তুলে নিয়ে মাইক্রফট হোমস বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনটা ছেড়েছি[১০] সব কাগজেই— কিন্তু জবাব আসেনি।'

বিজ্ঞাপনটা এই :

'পল ক্র্যাতাইদিস নামক এক ইংরেজি-অজ্ঞ গ্রিক ভদ্রলোক সম্বন্ধে খবর চাই। এসেছেন এথেন্স থেকে। সোফি নাম্নী এক গ্রিক মহিলার সম্বন্ধেও খবর চাই। পুরস্কার দেওয়া হবে।'

শার্লক বললে, 'গ্রিক দূতাবাসে খবর নিলে হয় না?'

'নিয়েছি। ওরা কোনো খবরই রাখে না।'

'বেশ তো, কেসটা তুই নে না।'

'নিলাম', উঠে পড়ল শার্লক হোমস। 'মি. মেলাস, আপনি কিন্তু হুঁশিয়ার। কাগজে বিজ্ঞাপন যখন বেরিয়েছে, শত্রুপক্ষও জেনে গেছে আপনি সব ফাঁস করে দিয়েছেন।'

বাসায় ফেরার পথে পোস্টাপিস থেকে খানকয়েক টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস।

তারপর বললে, 'ভায়া, সন্ধেটা দেখছি কাজে লেগে গেল। এইভাবেই অনেক চিত্তাকর্ষক কেস মাইক্রফটের মারফত আমার হাতে এসেছে। মি. মেলাসের কাহিনি শুনে তোমার কী মনে হল বলো।'

'ইংরেজ নওজোয়ান হ্যারল্ড ল্যাটিমার গ্রিক সুন্দরী সোফিকে এথেন্স থেকে ইলোপ করে এনেছে।'

'তোমার মাথা। শুনলে না, ল্যাটিমার গ্রিক ভাষা একদম জানে না? এথেন্সে সে যায়নি।'

'তাহলে সোফি লন্ডনে এসেছিল, তখন মেয়েটাকে পটিয়েছে ল্যাটিমার।'

'তা সম্ভব।'

'তারপর মেয়েটির দাদা, গ্রিক ভদ্রলোক নিশ্চয় তার সহোদর ভাই, খবর পেয়ে লন্ডনে আসে

এবং শয়তানদের খপ্পরে পড়ে। সোফি কিন্তু জানত না দাদা এসেছে লন্ডনে। খুব সম্ভব ভাইবোনের সম্পত্তির অছি এই ভদ্রলোক। ওঁকে দিয়ে বোনের সম্পত্তিটা লিখিয়ে নিতে চাইছে দুই শয়তান। সোফি হঠাৎ দেখে ফেলেছে দাদাকে।'

'চমৎকার বলছ, ওয়াটসন! ভয় পাচ্ছি এই সোফিকে নিয়েই— এবার তার ওপরেই-না মারধর শুরু হয়।'

'কিন্তু বাড়িটা খুঁজে পাবে কী করে?'

'খুব মুশকিল হবে বলে মনে হয় না। সোফিকে নিয়ে ল্যাটিমার বেশ কিছুদিন থেকেছে কোথাও, ভাই খবর পেয়েছে অনেক পরে। মেয়েটির নাম যদি সোফি ক্র্যাতাইদিস হয়, আর লন্ডনের কোনো পাড়ায় যদি একনাগাড়ে কিছুদিন তাকে দেখা যায়, প্রতিবেশীরা খবর রাখবেই। বিজ্ঞাপনেরও জবাব আসবে।'

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রিটে। ঘরে ঢুকেই দুজনেই চমকে উঠলাম মাইক্রফট হোমসকে দেখে। চেয়ারে মৌজ করে বসে তোফা ধূমপান করছেন।

আমাদের চমৎকৃত মুখচ্ছবি দেখে অট্টহেসে বললেন, 'আমার এত উদ্যম দেখে অবাক হয়ে গেছিস দেখছি।'

'এলে কী করে?' শার্লকের প্রশ্ন।

'গাড়িতে, তোদের পেরিয়ে।'

'কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?'

'বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে, তোরা চলে যাওয়ার পরেই।'

'কী লিখেছে?'

'এই দেখ। রয়্যাল ক্রিম কাগজে "জে" মার্কা[১১] নিয়ে ক্ষীণজীবী মাঝবয়েসি মানুষের হাতে লেখা।

'মহাশয়,

আপনার বিজ্ঞাপনের জবাবে জানাই যে মেয়েটিকে আমি চিনি এবং তার দুঃখের কাহিনিও জানি। কষ্ট করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো খুলে বলতে পারি। "দি মার্টলস বেকেনহ্যাম", এই ঠিকানায় মেয়েটি এখন আছে।

আপনার বিশ্বস্ত
জে. ডেভেনপোর্ট

মাইক্রফট বললেন, 'চিঠি এসেছে লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। চল, মেয়েটার দুঃখের কাহিনি শুনে আসা যাক।'

'তুমি খেপেছ? বললে শার্লক হোমস। মেয়েটার দুঃখের কাহিনির চেয়ে বেশি দামি তার ভাইয়ের জীবন। দেরি হলে খুন হয়ে যেতে পারেন ভদ্রলোক। স্কটল্যান্ডে গিয়ে ইনস্পেকটর গ্রেগসনকে নিয়ে এখুনি হানা দেওয়া দরকার শয়তানদের আস্তানায়।'

আমি বললাম, 'যাওয়ার পথে মি. মেলাসকেও নিয়ে যেতে হবে। দোভাষীর দরকার হতে পারে।'

'ঠিক কথা', বলে ড্রয়ার খুলে রিভলভার নিয়ে পকেটে পুরল হোমস।

'কিন্তু মি. মেলাসের বাড়ি গিয়ে শুনলাম একটু আগেই নাকি হাসিখুশি বেঁটেখাটো চশমাওলা একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন মি. মেলাস!

শুনেই আর তর সইল না হোমসের, 'সর্বনাশ! আবার ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে মি. মেলাস। ভদ্রলোক যে রামভীতু, তা এক রাতেই ওরা বুঝতে পেরেছে বলেই বাড়ি বয়ে এসে হুমকি দেখিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এবার বোধ হয় জ্যান্ত ফিরতে হবে না। চলো, আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, তারপর শয়তানদের বিবরে।'

কিন্তু সময়মতো গাড়ি পাওয়া গেল না। গাড়ি পাওয়া গেল তো, সরকারি নিয়ম রক্ষে করে বাড়ি তল্লাশির অনুমতি বার করতে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হল। ট্রেনে চেপে বেকেনহ্যাম পৌঁছে আধমাইলটাক গাড়ি চেপে 'মার্টলস'-এর সামনে যখন গেলাম, তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে অন্ধকারের মধ্যে খাড়া নিঝুম বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ইনস্পেকটর বললে, 'জানলা অন্ধকার। লোকজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'পাখি উড়েছে।' বলল শার্লক হোমস।

'কীভাবে বললেন?'

'মালপত্র বোঝাই একটা গাড়ি এক ঘণ্টার মধ্যে গেছে এখান থেকে।'

হেসে ফেলল ইনস্পেকটর, 'ফটকের আলোয় গাড়ির চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মালপত্র বোঝাই কি না বুঝছেন কী করে?'

'একই চাকার দাগ ওদিক থেকে এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আসার সময়ে চাকার দাগ গভীর নয়, যাওয়ার সময়ে মাটি কেটে বসে গেছে। তার মানে, খালি গাড়ি এনে মালপত্র চাপিয়ে লম্বা হয়েছে।'

'হেরে গেলাম,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ইনস্পেকটর। 'যা মজবুত দরজা, ভাঙা চাট্টিখানি কথা নয়। ঠেঙিয়ে দেখা যাক জবাব পাওয়া যায় কি না।'

কিন্তু লাথি ঘুসি মেরে, ঘণ্টা বাজিয়েও কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

সুট করে সরে পড়ল শার্লক হোমস। ফিরে এল মিনিট কয়েক পরে।

বলল, 'একটা জানলা খুলে ফেলেছি।'

জানলা খোলার কায়দা দেখে চোখ কপালে উঠল ইনস্পেকটরের। বাইরে থেকে অদ্ভুত কৌশলে ভেতরের ছিটকিনি সরিয়ে দিয়েছে শার্লক।

তাজ্জব কণ্ঠে বললেন ইনস্পেকটর, 'পুলিশের কপাল ভালো আপনি চোর বদমাশের খাতায় নাম লেখাননি। চলুন, পরিস্থিতি যেরকম ঘোরালো, বিনা নেমন্তন্নে বাড়িতে ঢুকলে অপরাধ হবে না।'

ভেতরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিলেন ইনস্পেকটর। শূন্য কক্ষ। টেবিলের ওপর খালি ব্র্যান্ডির বোতল, দুটো খালি গেলাস আর এঁটো খাবার পড়ে।

আচমকা কাঠ হয়ে গেল শার্লক, 'ওকী!'

একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে এল মাথার ওপর থেকে। কে যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে অব্যক্ত

বেদনায় কাঁদছে। ঝড়ের মতো ঘর থেকে ঠিকরে গিয়ে হল ঘরে ঢুকল শার্লক, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে— পেছনে আমরা। ভারী শরীর নিয়ে যদ্দুর সম্ভব বেগে পেছনে লেগে রইলেন শার্লক-অগ্রজ মাইক্রফট হোমস।

তিনতলায় পর পর তিনটে দরজার একটার ভেতর থেকেই যেন আসছে চাপা গোঙানি। কখনো উচ্চগ্রামে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ছে একই কণ্ঠস্বর। দরজা বাইরে থেকে চাবি দেওয়া। এক ধাক্কায় দরজা খুলে সবেগে ভেতরে ঢুকেই পরমুহূর্তেই গলা খামচে ধরে ছিটকে বেরিয়ে এসে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল শার্লক হোমস, 'কাঠকয়লার দম বন্ধ করা গ্যাস, বেরিয়ে যেতে দিন!'

খোলা দরজা দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ দম আটকানো বিষাক্ত ধোঁয়া। উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের ভেতরে চাপ চাপ ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা অস্পষ্ট নীল শিখা। একটা পেতলের তেপায়ার ওপরে দেখা যাচ্ছে সেই নীলাভ দ্যুতি।— দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লুটিয়ে আছে দুটো মনুষ্য মূর্তি। ওইটুকু দেখতে গিয়েই বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে চলে গেল, শুরু হল প্রচণ্ড কাশি। দম আটকে আসে আর কি! সিঁড়ির কাছে দৌড়ে গিয়ে বুক ভরে টাটকা বাতাস নিয়ে তিরবেগে ঘরে ঢুকল শার্লক হোমস এবং এক ঝটকায় পেতলের তেপায়া তুলে নিয়ে গিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল বাইরের বাগানে।

বেরিয়ে এল পর মুহূর্তেই। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মিনিট খানেক না-গেলে ঢোকা যাবে না— নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না।— মোমবাতি কোথায়? বন্ধ ঘরে মোমবাতি বোধ হয় জ্বলবে না। মাইক্রফট, দরজার কাছে ধরো তো বাতি। আমি ওদের টেনে নিয়ে আসি ভেতর থেকে।'

দুজনে মিলে ধরাধরি করে একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দুটি নরদেহ তুলে নিয়ে এলাম বাইরে। দুজনেই অজ্ঞান। চোখ-মুখ ফুলে ঢোল— চেনা দায়। ঠোঁট নীল। কোটর থেকে অক্ষিগোলক ঠিকরে আসছে। দোভাষী ভদ্রলোকের কালো দাড়ি আর মজবুত চেহারাটা দেখে চিনতে পারলাম। কপালে চোখের ঠিক ওপরেই একটা ভয়ংকর আঘাতের চিহ্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সারামুখে প্লাস্টারের পটি— কঙ্কালসার লম্বা চেহারা। ধুঁকছে এবং গোঙাচ্ছে। বাইরে আনার পর গোঙানিটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। মানে, সব শেষ হয়ে গেল। দুজনের একজন মায়া কাটাল পৃথিবীর।

দোভাষী কিন্তু বেঁচে গেলেন। অ্যামোনিয়া শুকিয়ে ব্র্যান্ডি খাইয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চাঙ্গা করে তোলার পর শুনলাম তাঁর মর্মন্তুদ কাহিনি। ইতর শ্রেণির লোকটা হাসি হাসি মুখে বাড়ি ঢুকে পকেট থেকে মারাত্মক হাতিয়ার বার করে কেবল বলেছিল— চেঁচালেই খুন করে ফেলব। চুপচাপ সঙ্গে এসো হে মি. মেলাস। তাইতেই ঘেমে যান ভদ্রলোক। গুটি গুটি চলে আসেন এইভাবে। শুরু হয় প্রশ্নোত্তর। আবার গ্রিক ভদ্রলোককে হুমকি দেওয়া হয় কাগজে সই করার জন্যে। কিন্তু মরতে হবে জেনেও যখন কাগজে সই দিলেন না তখন শয়তানের দল তাঁকে নিয়ে যায় বাইরে এবং বারণ করা সত্ত্বেও গোপন কথা ফাঁস করার অপরাধে মাথায় লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলা হয় মি. মেলাসকে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই ওরা আঁচ করেছিল খবরটা কার মুখ থেকে বেরিয়েছে।

গ্রিক দোভাষীর বিচিত্র মামলার কিনারা কিন্তু আর হয়নি। বিজ্ঞাপনের জবাবে মেয়েটির দুঃখের কাহিনি যিনি বলবেন লিখেছিলেন, তাঁর মুখে আমরা শুনলাম, সোফি মেয়েটা গ্রিকদেশের এক বিরাট বড়োলোকের মেয়ে। ইংলন্ডে এসেছিল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। হ্যারল্ড ল্যাটিমার তার সঙ্গে ভাব করে এবং এমন পটিয়ে ফেলে যে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে তার গলায় মালা দেবে ঠিক করে সোফি। জল অনেক দূর গড়াচ্ছে দেখে বন্ধুরা আঁতকে উঠে খবর দেয় এথেন্সে তার দাদাকে। খবর দেওয়ার পর কী হল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

দাদাটি ইংরেজি জানত না। বোনের সর্বনাশ হতে যাচ্ছে শুনে বোকার মতো এসে ল্যাটিমার আর তার উক্ত সঙ্গীর খপ্পরে পড়ে। একই বাড়িতে ভাইবোনকে আটকে রেখেছিল এই দুই কুচক্রী। ইতর সঙ্গীটির নাম উইলসন কেম্প। এককালের দাগি আসামি। বহু জঘন্য কাজের জন্যে মার্কামারা।

ওরা চেয়েছিল দাদাকে নিয়ে বোনের সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নিতে। অত্যাচার চলছিল সেই কারণেই। পাছে বোন দেখে চিনে ফেলে দাদাকে, তাই দাদার মুখময় প্লাস্টারের পটি লাগিয়ে রাখা হত। কিন্তু মেয়েদের মন তো, পটির আবরণ ফুঁড়েও চিনতে পেরেছে মায়ের পেটের ভাইকে।

মেয়েটি নিজেও বন্দিনী ছিল বাড়িতে। কোচোয়ান আর তার বউ ছাড়া বাড়িতে লোকজন আর কেউ ছিল না। দুজনেই ছিল শয়তানের হাতের পুতুল।

না-খাইয়ে রেখে মারধর করেও যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তখন ওরা দু-ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। অবাধ্য দাদা আর বিশ্বাসঘাতক দোভাষীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করে[১২] যায় বদ্ধ ঘরে কাঠকয়লার ধোঁয়ায়।

মাস কয়েক পরে বুদাপেস্ত থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর বেরোয়। দুজন ইংরেজ একজন গ্রিক সুন্দরীর সঙ্গে যেতে যেতে ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছে। পুলিশের ধারণা, নিজেরাই ছুরি মারামারি করে মরেছে। শার্লক হোমসের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। ভাইবোনের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ কীভাবে নিল সোফি, তা তার মুখ থেকেই শুনবে শার্লক, যদি কোনোদিন দেখা হয়।

টীকা

১. **গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা :** দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর হার্পার্স উইকলিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **গাঁইয়া জমিদার বংশে :** শার্লক হোমসের বাবা বা মা-র কথা কখনো জানা যায়নি।

৩. **ফরাসি শিল্পী ভের্নের :** ফ্রান্সের শাসক পঞ্চদশ লুইয়ের সমসাময়িক ক্লদ যোসেফ ভের্নে (১৭১৪-১৭৮৯) ছিলেন নিসর্গ দৃশ্য আঁকার জন্য বিখ্যাত। তাঁর ছেলে শার্ল হোরেস ভের্নে (১৭৫৮-১৮৩৫) বিখ্যাত ছিলেন যুদ্ধের দৃশ্য আঁকিয়ে হিসেবে। শার্ল-এর ছেলে এমিল জাঁ হোরেস ভের্নেও (১৭৮৯-১৮৬৩) পারদর্শী ছিলেন যুদ্ধের দৃশ্য আঁকায়।

৪. **রিজেন্ট সার্কাস :** পিকাডিলি সার্কাস এবং অক্সফোর্ড সার্কাস, দুই অঞ্চলই কোনো সময়ে রিজেন্ট সার্কাস নামে পরিচিত ছিল।

৫. **সরকারি দপ্তরে হিসেবের খাতা দেখে :** শার্লক হোমসের গল্প 'দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস'-এ জানা যায় মাইক্রফটের কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সে ব্রিটিশ সরকারের এক বিশেষ অংশ।

৬. **পলমল :** লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অঞ্চলে সেন্ট জেমস স্ট্রিট থেকে ওয়াটার্লু প্লেস হয়ে হে-মার্কেট পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা।

৭. **মুখচ্ছবিতেই :** ১৯৬৫-তে এ স্টাডি ইন টেরর ছায়াছবি নির্মিত হয় শার্লক হোমসের কাহিনি অবলম্বনে। তাতে মাইক্রফটের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবার্ট মর্লে। রবার্ট মর্লের চেহারা বা মুখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সিডনি প্যাগেটের আঁকা ছবিতে মাইক্রফটের চেহারা এবং মুখের।

৮. **বিলিয়ার্ড :** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের উঁচু সমাজে বিলিয়ার্ড খেলা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিলিয়ার্ডের ভক্ত ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া এবং পোপ নবম পায়াস। 'দ্য ডান্সিং মেন' গল্পে দেখা যায় ডা. ওয়াটসনও নিয়মিত বিলিয়ার্ড খেলতেন।

৯. **গোলাগুলি-মার্কা বুট :** সাধারণ সৈনিকদের জন্য দেওয়া অ্যামুনিশন বুট।

১০. **বিজ্ঞাপনটা ছেড়েছি :** হোমসের সঙ্গে পরামর্শ না-করেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন মাইক্রফট। তাতে মি. মেলাস কিন্তু বিপদে পড়ে যান।

১১. **'জে' মার্কা :** এক ধরনের মোটা নিব-যুক্ত কলম। কলমের গায়ে 'জে' লেখা থাকত। 'জে' ছাড়া 'জি' এবং 'আর' মার্কা কলমও তৈরি করতেন বহু ইংরেজ কলম তৈরির সংস্থা।

১২. **মৃত্যুর ব্যবস্থা করে :** ক্র্যাতাইদিস এবং মেলাসকে মারবার জন্য কয়লার ধোঁয়ার মতো এমন ঝামেলার পথ কেন বাছল অপরাধীরা? আরও সহজ এবং নিশ্চিত পদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে পারত।

নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র[১]

[দ্য নেভ্যাল ট্রিটি]

আমার বিয়ের পরের জুলাই মাসটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে শার্লক হোমসের সান্নিধ্যে থেকে পর পর তিনটে চাঞ্চল্যকর কেসে তার অপূর্ব বিশ্লেষণী তদন্ত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়ার জন্যে। এর মধ্যে প্রথম কেসটির গুরুত্ব বেশি হলেও জনসমক্ষে প্রকাশ করার সময় এখনও হয়নি। তাই শুরু করছি কেসের চমকপ্রদ বিবরণ। বিবিধ চিত্তাকর্ষক ঘটনার দৌলতে মামলাটি বাস্তবিকই অভিনব।

স্কুলে পড়বার সময়ে পার্সি ফেল্পস নামে একটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে আমার হরিহর আত্মা সম্পর্ক ছিল। বয়স সমান হলেও সে আমার চাইতে দু-ক্লাস এগিয়ে ছিল। পড়াশুনায় অত্যন্ত ভালো, মেধাবী, এককথায় যাকে বলে হিরের টুকরো, তাই শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে, বছর বছর গাদাগাদা প্রাইজ পেয়েছে। লর্ড হোল্ডহার্স্ট ছিলেন ওর মামা।

স্কুল থেকে বেরোনোর পর পার্সির সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। তবে শুনেছিলাম নিজের মেধা, কর্মদক্ষতা আর মামার সুপারিশের জোরে বৈদেশিক দপ্তরে এখন সে কেউকেটা।

এই পার্সি ফেল্পসের কাছ থেকেই হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম একদিন।

'প্রিয় ওয়াটসন, ব্রায়ারব্রে, ওকিং

"বেঙাচি" ফেল্পসকে নিশ্চয় মনে আছে? তুমি ক্লাস থ্রি-তে পড়তে, আমি ক্লাস ফাইভে। মামার মুরুব্বিয়ানার জোরে বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পাওয়ার খবরও নিশ্চয় শুনেছ। নামডাক যশ খ্যাতি যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়ে একটা ভয়াবহ ঘটনার ফলে আমার সর্বনাশ হতে বসেছে।

ঘটনাটা কী, চিঠির মধ্যে তা লিখব না। শুধু শুনে রাখো, এর ফলে আমি বিছানা নিয়েছি। কয়েক হপ্তা এক নাগাড়ে ব্রেনফিভারে ভুগে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। এখনও এত কাহিল যে চিঠিটা পর্যন্ত নিজের হাতে লিখতে পারছি না।

ওপরওলা মনে করেন, এ-ব্যাপারে আর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। শেষ চেষ্টা করতে চাই। তোমার বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে পারিনি রোগের প্রকোপে অস্থির ছিলাম বলে। তাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? তাঁর পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি পার, তাঁকে নিয়ে এস।

তোমার অনেকদিনের দোস্ত
পার্সি ফেল্পস

হোমসকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা প্রকট হয়েছে যে আমার স্ত্রীও বললে এখুনি বন্ধুবরের কাছে যাওয়া উচিত। ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটের বাসায়।

হোমস তখন ড্রেসিংগাউন পরেই রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে তন্ময়। আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ফের ডুবে গেল বুনসেন বার্নারের[২] নীলচে শিখায় ফুটন্ত বকযন্ত্র মধ্যস্থ তরল পদার্থটা নিয়ে। কয়েকটা ফোঁটা একটা কাচনলের মধ্যে তুলে নিয়ে বোতলে রেখে বানাল একটা সলিউশন। একহাতে একটা লিটমাস কাগজ নিয়ে বললে, 'ভায়া, বড়ো অসময়ে এসেছ। কাগজটা নীল থাকলে শুভ, আর যদি লাল হয়ে যায়— একজনের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।'

বলে, লিটমাস ভেজাল সলিউশনে। সঙ্গেসঙ্গে টকটকে লাল হয়ে গেল কাগজটা। 'যাচ্চলে! যা ভেবেছিলাম শেষকালে তাই হল।' বলে ডেস্কে বসে খানকয়েক টেলিগ্রাম ফর্ম টেনে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখে ছোকরা চাকরকে ডেকে পোস্টাপিসে পাঠিয়ে দিল হোমস।

তারপর আমার সামনের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে বললে, 'খুবই মামুলি মার্ডার কেস। এর চাইতে ভালো কেস তোমার মুখে শোনার আশা করছি। ভায়া, তুমি হলে গিয়ে অপরাধের ঝড়ো পেট্রোল পক্ষী[৩]— ক্রাইম সংবাদ ল্যাজে বেঁধে উড়ে আসো। বল, কী করতে পারি।'

চিঠিটা এগিয়ে দিলাম। মন দিয়ে পড়ল হোমস।

বলল, 'চিঠি লিখেছেন একজন মহিলা।'

'মোটেই না। পুরুষের হাতের লেখা।'

'না। অত্যন্ত বিরল চরিত্রের এক মহিলা তোমার বন্ধুর হয়ে এই চিঠি লিখেছেন। সূত্রপাতেই বিষয়টা খুবই চিত্তাকর্ষক। ওয়াটসন, কেসটা আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। কালবিলম্ব না-করে তোমার কূটনীতিবিদ বন্ধু এবং তাঁর শ্রুতি লেখিকার সন্দর্শনে রওনা হতে চাই।'

'ওয়াটার্লু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ওকিংয়ে[৪]। ব্রায়ারব্রে বাড়িটা স্টেশন থেকে মিনিট কয়েকের পথ। কার্ড পাঠানোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে— চল্লিশের কাছাকাছি। আমুদে দুই চোখে আনন্দ নৃত্য করছে অষ্টপ্রহর। গোলগাল দুষ্টু ছেলের মতোই টুকটুকে লাল দু-গাল।

হইহই করে আমাদের করমর্দন করলেন ভদ্রলোক। খুশি উপচে উঠল চোখে-মুখে কথায় বার্তায়, 'আঃ বাঁচালেন আপনারা! সকাল থেকে পার্সি বেচারা হাপিত্যেশ করে বসে আছে আপনাদের পথ চেয়ে।'

'আপনাকে এ-ফ্যামিলির কেউ বলে তো মনে হচ্ছে না?' হোমসের প্রশ্ন।

অবাক হয়ে চাইলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নীচের দিকে চেয়ে অট্টহেসে বললেন, 'দারুণ চমকে দিয়েছিলেন। বুদ্ধি বটে আপনার। লকেটে J. H. অক্ষর দেখেই ধরেছেন আমি ফেল্পস ফ্যামিলির মানুষ নই। কিন্তু কুটুম হতে চলেছি শিগ্‌গিরই। আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন। আমার বোন পার্সির হবু বউ। দু-মাস পার্সিকে ও-ই তো সেবা করছে। চলুন, চলুন, ওর ঘরে যাওয়া যাক।'

ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো একটা ঘরে ঢুকলাম। খোলা জানলা দিয়ে বাগানের মিষ্টি হাওয়া আসছে। জানলার ধারে পাশাপাশি বসে একজন যুবক আর একজন যুবতী। যুবক কঙ্কালসার, শীর্ণ এবং বিলক্ষণ উদ্‌বিগ্ন।

আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল যুবতী মেয়েটি, 'পার্সি, আমি আসি।'

হাত ধরে মেয়েটিকে টেনে বসাল পার্সি। খুশি উচ্ছল কণ্ঠে বললে, 'ওয়াটসন, তোমাকে যে চেনা মুশকিল! গোঁফখানা[৫] যা বাগিয়েছ। ইনি নিশ্চয় মি. শার্লক হোমস?'

পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলে চেয়ার টেনে বসলাম। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সহোদরা পার্সির হাত ধরে বসে রইলেন। মেয়েটি শ্যামা, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এবং খর্বকায়া। কিন্তু কৃষ্ণ কেশ, চামড়ার লাবণ্য আর ইতালীয় চক্ষুপল্লবের দরুন নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়া। পাশেই ঝরা পাতার মতো শুকনো লাগছে পার্সি ফেল্পসকে।

পার্সি বললে, 'মি. হোমস অযথা সময় নষ্ট না-করে কাজের কথায় আসছি। ওয়াটসনের মুখে শুনেছেন নিশ্চয় মামার সুপারিশে বৈদেশিক দপ্তরে ভালো কাজ পাই। মামা, মানে লর্ড হোল্ডহার্স্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার পর বিশ্বাস করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিতেন, নিজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করায় আমার ওপর তাঁর অবিচল আস্থা জন্মেছিল। ঠিক এই সময়ে, আমার বিয়ের ঠিক মুখেই, এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে আমার ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।

'আড়াই মাস আগে তেইশে মে মামা আমাকে ওঁর প্রাইভেট রুমে ডেকে দেরাজ থেকে ধূসর রঙের একটা পাকানো কাগজ বার করে বললেন— তোমাকে এবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চাই। ইংলন্ড আর ইতালির মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছে[৬], এই হল সেই সন্ধিপত্র। খবরটা এতই গোপনীয় যে রাশিয়া বা ফ্রান্সের দূতাবাস এর বিষয়বস্তু জানবার জন্যে মোটা টাকা ছাড়তে রাজি আছে। এর মধ্যেই এ নিয়ে কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেছে, এগুলো তাই সাবধানে রেখো। তোমার ঘরে দেরাজ আছে তো?'

'আছে!'

'নকল করবার দরকার হয়েছে বলেই দেরাজ থেকে বার করলাম— নইলে করতাম না। তুমি এর কপি করবে নিজের হাতে[৭]— অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও থাকবে। কাজ শেষ হলে, নকল আর আসল দুটোই দেরাজে চাবি দিয়ে রাখবে। কাল সকালে আমার হাতে দিয়ে যাবে।'

'কাগজটা হাতে নিয়ে—'

'এক সেকেন্ড।' বাধা দিল হোমস। 'এই কথার সময়ে ঘরে আর কে ছিল?'

'আমি আর মামা ছাড়া কেউ না।'

'ঘরটা কত বড়ো?'

'লম্বায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় তিরিশ ফুট। বেশ বড়ো ঘর।'

'আপনারা ছিলেন ঠিক মাঝখানে?'

'প্রায় তাই।'

'কথা বলছিলেন খাটো গলায়?'

'মামা খাটো গলাতেই কথা বলেন! আমি কিছু বলিনি।'

'তারপর?' চোখ মুদে বললে হোমস।

'মামা হুকুমমতো অফিস ছুটি না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম! কেরানি চার্লস গোরোর একটু কাজ বাকি ছিল— সেই ফাঁকে আমি খেয়ে এলাম। এসে দেখলাম সে চলে গেছে। ঝটপট কাজ শেষ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম। কেননা, আমার হবু শ্যালক জোসেফ হ্যারিসন তখন শহরেই রয়েছে। এগারোটার ট্রেনে তার ওকিং যাওয়ার কথা। পারলে আমিও একই ট্রেনে ওকিং ফিরব ঠিক করলাম।

'দলিল নিয়ে প্রথমেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম, সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। মামা একটুও বাড়িয়ে বলেননি। বিষয়বস্তু ত্রিশক্তির মিত্রতার[৮] ব্যাপারে নৌ বিভাগ সংক্রান্ত।

'পড়া শেষ করে কপি করতে বসলাম। বিরাট ডকুমেন্ট। মোট ছাব্বিশটা ভাগে ফরাসি ভাষায় লেখা[৯]। ঝড়ের মতো হাত চালিয়েও ন-টা ভাগ লিখতেই রাত ন-টা বেজে গেল। মাথা ঝিম ঝিম করছিল সারাদিন পরিশ্রমের দরুন। ঘুম ঘুম পাচ্ছিল এক পেট খাওয়ার ফলে। তাই ভাবলাম কফি খেয়ে চাঙা হওয়া যাক। সিঁড়ির নীচে একজন দারোয়ান থাকে, আমাদের জন্যে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে কফি বানিয়ে দেয়। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম তাকে।

'ঘণ্টার জবাবে ঘরে ঢুকল অ্যাপ্রন পরা বিরাট চেহারার এক স্ত্রীলোক। মুখটা রুক্ষ। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। শুনলাম সে দারোয়ানের স্ত্রী। কফি আনতে বললাম তাকে।

'বলে, ফের নকল করতে বসলাম। দুটো ভাগ কপি করা হয়ে গেল। অথচ কফি এল না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এদিকে ঢুলছি বললেই চলে। ঘুম তাড়াবার জন্যে উঠে পায়চারি করতে করতে ভাবলাম নিজে গিয়ে তাড়া দিই দারোয়ানকে। দরজা খুলে প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। একটা ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছিল প্যাসেজে। সেখান থেকে সিঁড়ি ঘুরে চাতালে পৌঁছেছে। চাতাল থেকে একটা ছোটো সিঁড়ি ডান দিকে ঘুরে পাশের গলিতে গেছে। এ-সিঁড়ি দিয়ে চাকরবাকর বা তাড়াতাড়ি থাকলে কেরানিরা যাতায়াত করে। মূল সিঁড়িটা চাতাল থেকে

সোজা নেমে হল ঘরে পৌঁছেছে। বাঁ-দিকে থাকে দারোয়ান— তারপরে সদর আর রাস্তা। এই নকশাটা দেখলেই বুঝবেন।'

'ভালোই বুঝছি,' বললে হোমস।

'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে নেমে সিঁড়ি বেয়ে হল ঘরে পৌঁছোলাম। দেখলাম, মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে দারোয়ান। জ্বলন্ত স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর টগবগ করে ফুটছে জলের কেটলি। ধাক্কা মেরে তুলব বলে হাত বাড়াতে-না-বাড়াতেই ঝনঝন করে বেজে উঠল মাথার কাছেই ঘণ্টাটা। ধড়মড় করে উঠে বসল দারোয়ান।

'আমাকে দেখেই থতোমতো খেয়ে বললে, ''মি. ফেল্পস! দেখুন দিকি কী কাণ্ড! জল গরম করতে দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েছি।'' বলেই বিমূঢ় চোখে ঘণ্টা আর আমার দিকে চাইতে লাগল। ঘণ্টা তখনও কাঁপছে। হতভম্ব মুখে বললে, ''আশ্চর্য ব্যাপার তো! আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে অথচ ঘণ্টা বাজল কী করে?''

'কোন ঘণ্টা?'

'আপনি যে-ঘরে কাজ করেছিলেন, এ-ঘণ্টা সেই ঘরের ঘণ্টা।'

'শুনেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ঘর খোলা, টেবিলে গোপন দলিল ফেলে এসেছি কফির তাগাদা দিতে। নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকেছে। পাগলের মতো বেরিয়ে এলাম হল ঘরে— লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঢুকলাম ঘরে। দেখলাম ঘর শূন্য, নকল দলিল যেমন তেমনি পড়ে— উধাও হয়েছে আসল দলিল।'

দু-হাত ঘষে উঠে বসল হোমস। সমস্যাটা নিশ্চয় মনোমতো হয়েছে।

মৃদুকণ্ঠে বললে, 'তখন কী করলেন?'

'আমি ধরে নিলাম পাশের সিঁড়ি দিয়ে চোর ঢুকেছিল ঘরে— নইলে আমার চোখে পড়ত।'

'ঘরের মধ্যে বা প্যাসেজে কোথাও লুকিয়ে ছিল না তো? আপনি তো বললেন ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছিল প্যাসেজে।'

'অসম্ভব। লুকোনোর জায়গা ওখানে নেই।'

'তারপর?'

'ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাকে ছুটতে দেখে দারোয়ান আমার পেছন পেছন ওপরে এসেছিল। আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখে বুঝলে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। দুজনে মিলে ছোটো সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম পাশের গলিতে। এদিকের দরজা বন্ধ— কিন্তু তালা দেওয়া নেই। ঠিক এই সময়ে কাছেই একটা গির্জেতে[১০] পরপর তিনবার ঘণ্টা বাজল। রাত তখন ঠিক সোয়া দশটা।'

'গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট' আস্তিনে সময়টা লিখে নিল হোমস।

'অন্ধকার রাত। ঝুপঝাপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার অন্যদিকে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। গাড়িঘোড়া স্রোত বয়ে চলেছে হোয়াইট হলের দিকে। লোকজন কিন্তু নেই।'

'হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে তাকে বললাম, ''ভীষণ কাণ্ড! পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি হয়ে গেল এক্ষুনি। কাউকে যেতে দেখেছ এদিক দিয়ে?''

'পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে আছি। এর মধ্যে গায়ে শাল জড়ানো ঢ্যাঙামতো একজন স্ত্রীলোক ছাড়া কেউ যায়নি[১১]।'

'দারোয়ান ঝটিতি বললে, "আরে সে তো আমার স্ত্রী। আর কেউ গেছে?"

'না।'

'আমার হাত ধরে টেনে দারোয়ান বললে, "তাহলে সে অন্যদিকে পালিয়েছে।"

'আমার কিন্তু খটকা লাগল। অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতলব মনে হল। কনস্টেবলকে জিজ্ঞেস করলাম "কোনদিকে গেছে স্ত্রী-লোকটা?"

'অত দেখিনি। তবে খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাঁটছিল দেখেছি।'

'কতক্ষণ আগে?'

'মিনিট পাঁচেক তো বটেই।'

'চিৎকার করে দারোয়ান বলে উঠল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি. ফেল্পস। এ-ব্যাপারে আমার স্ত্রী নেই। তার চেয়ে রাস্তার ওদিকটা খুঁজে দেখলে কাজ দিত। আপনি যখন যাবেন না, আমিই যাচ্ছি।'-

'বলে যেই ছুটতে যাবে, আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, "থাকা হয় কোথায়?" .

'ব্রিক্সটনের ষোলো নম্বর আইভি লেনে। কিন্তু কেন বাজে চিন্তা করছেন মি. ফেল্পস? এখনও সময় আছে, ওইদিকটা দেখে আসতে দিন।'

'ভেবে দেখলাম, তাতে ক্ষতি নেই। পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হনহন করে গিয়ে দেখে এলাম রাস্তার অন্যদিক। কিন্তু গাড়িঘোড়া আর লোকজন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।'

'অফিসে ফিরে এসে প্যাসেজ পরীক্ষা করলাম। লিনোলিয়াম দিয়ে ঢাকা মেঝেতে পায়ের চিহ্ন থাকা উচিত— কিন্তু সে-রকম কিছুই পেলাম না।'

'সন্ধে থেকে বৃষ্টি পড়ছিল?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'সাতটা থেকে।'

'কিন্তু মেয়েটা আপনার ঘরে ঢুকেছে ন-টা নাগাদ। জলকাদায় ভিজে বুটের ছাপ পড়া উচিত ছিল লিনোলিয়ামে।'

'দারোয়ানের ঘরে ঢুকে বুট খুলে চটি পরে এসেছিল।'

'ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

'ঘরটা পরীক্ষা করলাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা আছে, তাই চোরা দরজা নেই। দেওয়ালেও লুকোনো পথ নেই। তিরিশ ফুট উঁচু দুটো জানলাই ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। চুনকাম করা কড়িকাঠ। দরজা ছাড়া ঢোকার আর পথ নেই— চোর দরজা দিয়েই এসেছিল।'

'ফায়ার-প্লেস দেখেছিলেন?'

'ফায়ার-প্লেসের বালাই নেই ঘরে। একটা স্টোভ আছে। তারে বাঁধা ঘণ্টার দড়ি ঝোলে আমার টেবিলের ডান দিকে। তার মানে ঘণ্টা বাজানোর জন্যে তাকে টেবিলের ডান দিকে আসতে হয়েছে। কিন্তু চোরটা কি ঘণ্টা বাজিয়ে চুরি করে? এ কী বিষম সমস্যায় পড়লাম বলুন তো?'

'অসাধারণ ঘটনা নিঃসন্দেহে। পোড়া চুরুট, ফেলে-যাওয়া দস্তানা, চুলের কাঁটা বা ওই জাতীয় কিছু ঘরে পাওয়া গেছে?'

'না।'

'গন্ধ?'

'গন্ধর কথা তো আগে ভাবিনি!'

'তামাকের গন্ধ-টন্ধ পাওয়া গেলে তদন্ত করতে সুবিধে হত।'

'দেখুন, আমি তামাক খাই না। কাজেই সে-রকম গন্ধ থাকলে নিশ্চয় টের পেতাম। দারোয়ানের স্ত্রী-র হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরাটা আমার ভালো মনে হয়নি। দারোয়ান অবশ্য বললে, রাত হয়ে গেছে বলেই হয়তো তাড়াতাড়ি করেছে স্ত্রী, জবাবটা সন্তোষজনক— নিছক অজুহাত বলেই মনে হয়েছে। তাই দলিলটা বাড়ি থেকে হাওয়া হওয়ার আগেই হানা দেব ঠিক করলাম।

'আধঘণ্টার মধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ মি. ফোর্বসকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম দারোয়ানের বাড়ি। দারোয়ানের বড়ো মেয়ে দরজা খুলে বললে, মা এখনও বাড়ি ফেরেনি। আমরা সামনের ঘরে বসলাম।

'মিনিট দশেক পরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠতেই মেয়েটি গিয়ে দরজা খুলে বললে,"মা, দুজন ভদ্রলোক তোমার জন্যে বসে রয়েছেন।" কথা শেষ হতে-না-হতেই ছুটে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। মি. ফোর্বস লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেলেন। আমিও পেছন পেছন ছুটলাম। দারোয়ানের স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে পেছনের রান্নাঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আমরাও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল দারোয়ানের স্ত্রী। বললে, 'আরে? মি. ফেল্পস যে!'

মি. ফোর্বস বললেন, 'পালানোর আগে আমরা কে বলে মনে করেছিলে?'

'আমি তো ভাবলাম দালালরা এসেছে। একটা দোকানদারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।'

মি. ফোর্বস বললেন, 'ওটা কি একটা জবাব হল নাকি? পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটু আগেই একটা ডকুমেন্ট লোপাট করে এসেছ বলেই আমরা তোমার পেছনে পেছনে এসেছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলো— সার্চ করা হবে তোমাকে।'

'রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। উনুনের মধ্যে দলিলটা যদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে, এই ভেবে উনুনটাই আগে দেখলাম, কিন্তু আধপোড়া কাগজ বা ছাই কিছুই চোখে পড়ল না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেয়ে-পুলিশ দিয়ে দারোয়ানের স্ত্রীর দেহ তল্লাশ করেও ডকুমেন্ট পাওয়া গেল না।'

'তখনই বুঝলাম কী সর্বনাশ হতে চলেছে। আমার ভবিষ্যৎ তো ঝরঝরে হয়ে গেলই, মুখে চুনকালি পড়ল আমার মামার। চোখের সামনে ভেসে উঠল কীভাবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাছে অপদস্থ হচ্ছেন মামা আমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে। মাথা ঘুরে গেল আমার। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, বহু লোক যেন 'আহা, আহা' করে সহানুভূতি জানাচ্ছিল আমাকে। ওরাই ধরে এনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। একই কামরায় ডক্টর ফেরিয়ার বাড়ি ফিরছিলেন— তিনি আমার ভার নিয়েছিলেন। স্টেশনে পৌঁছে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার সময়ে পাগলের মতো চেঁচামেচি কান্নাকাটি করেছিলাম।

'ডা. ফেরিয়ারই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেন। বেশ বোঝা গেল বেশ কিছুদিনের জন্যে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে আমাকে। আমার অবস্থা দেখে জোসেফ তৎক্ষণাৎ এই খোলামেলা শোয়ার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যায় এবং ঝটপট বিছানা সাজিয়ে ফেলে। সেই থেকে এই ঘরে ন-সপ্তাহ শুয়ে আছি। দিনরাত সেবা করেছে মিস হ্যারিসন আর একজন নার্স। মাত্র তিনদিন হল স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে এসেছে। মি. ফোর্বসকে টেলিগ্রাম করে জানলাম, সবরকমভাবে তদন্ত করেও দলিল উদ্ধার করা যায়নি। দলিল চুরি যাওয়ার দিন অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর গোরো বলে একজন অল্পবয়েসি কেরানি বাড়তি কাজ করেছিল— আপনাকে বলেছি আগেই। তার ফরাসি নাম এবং বিশেষ ওই দিনেই বাড়তি কাজ করা— এই দুই কারণে পুলিশ তাকেও সন্দেহ করে। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, সে চলে যাওয়ার পর আমি দলিল নকলে হাত দিয়েছিলাম। মি. হোমস, এই অবস্থায় আপনিই আমার শেষ ভরসা। দলিল উদ্ধার করতে আপনিও যদি ব্যর্থ হন, আমার মানসম্মান চাকরিও ইতি হয়ে গেল জানবেন।'

দীর্ঘ বক্তিমে শেষ করে এলিয়ে পড়ল পার্সি ফেল্পস। গেলাসে করে ওষুধ খাইয়ে দিলেন মিস হ্যারিসন সম্ভবত চাঙা করার জন্যে। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে এমনভাবে রইল হোমস যেন কোনো ব্যাপারেই তার আগ্রহ নেই। নতুন লোকের কাছে সেইরকম মনে হলেও এ-লক্ষণ আমি চিনি। অন্তরের অন্দরে ডুব দিয়েছে শার্লক হোমস।

হঠাৎ বললে, 'কয়েকটা প্রশ্ন করব। আপনার এই গুরু দায়িত্বর কথা কাউকে বলেছিলেন?'

'না।'

'মিস হ্যারিসনকে?'

'দায়িত্ব কাঁধে চাপবার একটু পরেই কাজ শুরু করেছিলাম— ওকিং এলাম তো দলিল চুরি যাওয়ার পর।'

'আপনার বাড়ির লোকেরা কেউ আপনাকে দৈবাৎ দেখে ফেলেনি তো?'

'না।'

'ওঁরা আপনার অফিস চেনেন?'

'নিশ্চয়। সবাইকে দেখিয়েছি।'

'দারোয়ান লোকটা কীরকম?'

'আগে সৈন্য ছিল শুনেছি।'

'কোন রেজিমেন্টের?'

'কোল্ডস্ট্রিম গার্ডস[১২]— যদ্দুর জানি।'

'ধন্যবাদ।— মি. ফোর্বসের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেব'খন, বাঃ, গোলাপটা ভারি সুন্দর তো!'

অকস্মাৎ জানলার ধারে গিয়ে বোঁটাসমেত একটা গোলাপ নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে যেন আবিষ্ট হয়ে গেল শার্লক হোমস। প্রকৃতি সৌন্দর্যে এভাবে কখনো ওকে বিহ্বল হতে দেখিনি। বন্ধুবরের চরিত্রের আর একটা দিক খুলে গেল সেই মুহূর্তে। দু-আঙুলে গোলাপ ধরে স্বপ্নালু চোখে সেদিকে তাকিয়ে আবেশভরা কণ্ঠে ফুল সম্পর্কে কত কথাই-না বলে গেল। বেঁচে

'গোলাপটা কী দারুণ।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

থাকার জন্যে রোজ আমাদের অনেক জিনিস দরকার হয় ঠিকই, কিন্তু ফুলের দরকার হয় তার চেয়েও বেশি কারণে। ফুলের গন্ধ, ফুলের রং জীবনকে সাজিয়ে তোলে, জীবনে আশা আনে।

স্তম্ভিত হয়ে বক্তৃতা শুনছিল পার্সি আর তার প্রণয়িনী। নিঃসীম নৈরাশ্য প্রকট হয়ে উঠল দুজনেরই চোখে-মুখে, পরমুহূর্তেই মিস হ্যারিসনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিলিয়ে গেল হোমসের দিবাস্বপ্ন— ফিরে এল মাটির পৃথিবীতে।

রুক্ষ কণ্ঠে বললেন মিস হ্যারিসন, 'মি. হোমস, রহস্য সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখছেন?'

স্বর্গ থেকে বুঝি পতন ঘটল শার্লক হোমস। বলল, 'রহস্য? কেস বড়ো জটিল, বুঝলেন কিনা, তবে কথা দিচ্ছি, মনের মতো সূত্র হাতে এলেই আপনাদের জানাব।'

'সূত্র কি আদৌ পেয়েছেন?'

'মোট সাতটা সূত্র[১৩] পাওয়া গেছে— তবে তা যাচাই সাপেক্ষ।'

'কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'নিজেকে সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি।'

'তাহলে লন্ডনে ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত যাচাই করুন।'

'তাই করব ভাবছি,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে হোমস বললে, 'অপূর্ব উপদেশ দিয়েছেন। মি. ফেল্পস, ব্যাপারটা সাংঘাতিক প্যাঁচালো— মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখবেন না!'

'কিন্তু আপনাকে আবার না-দেখলে যে প্রাণে শান্তি পাব না,' সত্যিই ককিয়ে ওঠে পার্সি।

'আমি তো আসছি কালকেই। তবে কী জানেন, ফলাফলটা না-বাচকই হবে।'

'হোকগে। আপনাকে তো দেখতে পাব। তবুও জানব, তদন্ত তো চলছে। ভালো কথা, হোল্ডহার্স্ট একটা চিঠি লিখেছেন।'

'কী লিখেছেন?'

'মোদ্দা কথা হল, আমি সুস্থ না-হয়ে-ওঠা পর্যন্ত আমার চাকরি থাকবে কি যাবে— তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে না। মোলায়েমভাবেই ইঙ্গিত করেছেন— পাছে ফের ধাক্কা খাই অসুস্থ অবস্থায়।'

'ভালোই করেছেন। চলো, ওয়াটসন।'

জোসেফ হ্যারিসন স্টেশন পর্যন্ত এলেন আমাদের সঙ্গে, ট্রেনে চাপবার পর ক্ল্যাপহ্যাম জংশন ছাড়িয়ে না-আসা পর্যন্ত গুম হয়ে বসে রইল হোমস। তারপর আচম্বিতে বলল, 'নীচের ওই বাড়িগুলো দেখেছ? ঠিক যেন সিসে রঙের সমুদ্রে ইটের তৈরি দ্বীপ।'

'ওগুলো ছেলেদের বোর্ডিং স্কুল।'

'উঁহু, ওই হল আগামীকালের ইংলন্ড! উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর, বিজ্ঞতর ইংলন্ডের বীজ রয়েছে ওইসব ইটের দ্বীপে। ওয়াটসন, ফেল্পস নিশ্চয় মদ্যপ নন?'

'মনে তো হয় না।'

'আমারও তাই মনে হয়। বদমাশটা ওকে এমন গাড্ডায় ফেলেছে যে টেনে তোলা মুশকিল। মিস হ্যারিসনকে কেমন লাগল?'

'শক্ত ধাতের মেয়ে।'

'চরিত্রে একদম ভেজাল নেই। নর্দাম্বারল্যান্ডের[১৪] লোহার কারবারির একমাত্র মেয়ে। গত শীতে ফেল্পসের সঙ্গে আলাপ এবং প্রণয়। বিয়ের আগে বাড়ি এনে রেখেছিল সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলে— দাদাও এসেছে সঙ্গে। তারপরেই দেখ এই বিপত্তি। ভাইবোন দুজনেই আটকে গেল বাড়িতে। আজ সারাদিন তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকব।'

'আমার ডাক্তারি—'

খেঁকিয়ে উঠল হোমস, 'তোমার ডাক্তারি আমার কেসের চেয়ে যদি বড়ো বলে মনে হয়—'

'আরে গেল যা! আমি বলতে যাচ্ছি ডাক্তারিটা আপাতত মুলতুবি রাখতে পারব। রুগির ভিড় এ সময়ে তেমন থাকে না।'

মুহূর্তে সহজ হয়ে উঠল হোমস। বললে, 'তাহলে তো ভালোই হল। একসঙ্গে চলো ঝাঁপ দিই তদন্তে।'

'কী সূত্র পেয়েছ বলছিলে?'

'পেয়েছি ঠিক। কিন্তু বাজিয়ে না-দেখা পর্যন্ত বলতে চাই না। যে-অপরাধের মোটিভ থাকে না, সে-অপরাধের অপরাধীকে পাকড়াও করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে লাভটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে-লাভ কার? ফরাসি রাজদূতের? যে তাদের দলিলটা বিক্রি করবে, তার? না, লর্ড হোল্ডহার্স্টের?'

'লর্ড হোল্ডহার্স্টের কী লাভ?'

'অনেক লাভ। কূটনৈতিক কারণে মূল্যবান একটা দলিল কায়দা করে লোপাট করিয়ে দিতে পারলে লাভ কি কম?'

'তিনি কিন্তু সে-রকম চরিত্রের মানুষ নন। অতীত অত্যন্ত উজ্জ্বল।'

'জানি, জানি, সেইজন্যেই তো তাঁর সঙ্গে আজ একবার মোলাকাত হবে আমার। ভালো কথা, আমি কিন্তু তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছি। ওকিং স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সবকটা সান্ধ্য দৈনিকে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপতে বলেছি।'

নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতায় লেখা একটা বিজ্ঞাপনের কপি এগিয়ে দিল হোমস। বিজ্ঞাপনটা এই— 'দশ পাউন্ড পুরস্কার।— গত তেইশে মে পররাষ্ট্র দপ্তরের সামনে অথবা কাছাকাছি রাত দশটা পনেরো মিনিট নাগাদ একজন যাত্রীকে যে ঘোড়ার গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তার নম্বর চাই। ২২১বি, বেকার স্ট্রিটে জবাব পাঠান।'

'তার মানে তোমার বিশ্বাস চোর ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল?'

'নইলে লিনোলিয়ামে বৃষ্টিতে ভেজা জুতোর ছাপ পড়ত— কাদামাটির দাগ থাকত। বৃষ্টিঝরা রাতে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল বলেই সে-ছাপ পড়েনি।'

'তাও তো বটে।'

'আমি কিন্তু ধাঁধায় পড়েছি ঘণ্টা রহস্য নিয়ে। চোর কেন ঘণ্টা বাজাল? নাকি, চুরিতে বাধা দেওয়ার জন্যে কেউ বাজিয়েছিল? এমনও হতে পারে—'

'বলেছ চুপ মেরে গেল বন্ধুবর। বুঝলাম, নতুন সম্ভাবনা মাথায় উঁকি দিয়েছে।

যাই হোক, লন্ডন পৌঁছে হোটেলে খানাপিনা করে সোজা গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। হোমস ডিটেকটিভ ফোর্বসকে আগেই খবর দিয়েছিল। খর্বকায় ধূর্ত চেহারার তীক্ষ্ণ-প্রকৃতি কাঠখোট্টা মানুষটা হোমসকে দেখেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। তিরিক্ষে গলায় বললে, 'দেখুন মশায়, আপনি লোকটা সুবিধের নন। পুলিশের কাছ থেকে খবর-টবর বার করে নিয়ে মামলা সমাধান করে পুলিশের ঘাড়েই বদনামটা চাপান।'

'ঠিক উলটো বললেন,' সবিনয়ে বললে হোমস, 'গত তিপ্পান্নটা মামলায় নাম কিনেছেন পুলিশ— মাত্র চারটে মামলায় লোকে জেনেছে এই অধমের কীর্তি। সব খবর রাখেন না আপনার বয়স আর অভিজ্ঞতা কম বলে। কিন্তু ঝগড়া না-করে যদি হাত মেলান আপনার কর্তব্যটা ভালোভাবেই করতে পারবেন বলে আশা করি।'

তৎক্ষণাৎ সুর পালটে ফোর্বস বললে, 'কিছুই তো বুঝছি না। দু-একটা পয়েন্ট যদি ধরিয়ে দেন তো সুবিধে হয়।'

'কদ্দূর এগিয়েছেন আগে বলুন।'

'কিছুই এগোইনি। দারোয়ানকে নিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তার চরিত্র ভালো। ওর বউটা মদ খায়। সন্দেহ তাকেই। তাই মেয়ে-পুলিশ লাগিয়েছিলাম মদের ঘোরে পেট থেকে কথা বার করানোর জন্যে। কিন্তু লাভ হয়নি। বাড়িতে যে-দালালরা হানা দিত তাদের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'টাকাটা এল কোত্থেকে?'

'দারোয়ানের পেনশনের পাওনা টাকা থেকে।'

'মি. ফেল্পস কফির জন্যে ঘণ্টা বাজালেন। কিন্তু ঘরে ঢুকল দারোয়ানের স্ত্রী। কেন?'

'স্বামী দেবতা নাকি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে বিরক্ত করতে চায়নি।'

'চেয়ারে বসে দারোয়ানের ঘুমটাই অবশ্য তার প্রমাণ। স্বামী স্ত্রী কারোর বিরুদ্ধেই দেখছি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না— স্ত্রীর সন্দেহজনক চরিত্রটা ছাড়া। হন্তদন্ত হয়ে ওই রাতে বাড়ি ফেরার কারণটা জিজ্ঞেস করেছিলেন? পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত লক্ষ করেছিল ওর তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরা? কেন?'

'অন্যদিনের চেয়ে বেশি দেরি করে ফেলেছিল বলে।'

'সে বেরিয়ে যাওয়ার অন্তত পক্ষে মিনিট কুড়ি পরে আপনি পুলিশ ডিটেকটিভকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন অথচ বাড়ি পৌঁছেছিলেন তার আগে। ব্যাপারটা বলেছিলেন তাকে?'

'ও বললে, এক ঘোড়ায় টানা একাগাড়ি বাসের চাইতে আগেই তো পৌঁছোবে।'

'বাড়ি পৌঁছেই বাড়িতে লোক আছে শুনে রান্নাঘরে ভোঁ দৌড় দিল কেন?'

'দালালদের পাওনা মেটানোর টাকা নাকি রান্নাঘরেই ছিল।'

'সব প্রশ্নেরই জবাব দেখছি তৈরি। পাশের গলি চার্লস স্ট্রিটে বেরিয়ে কাউকে দেখেছিল কি?'

'কনস্টেবল ছাড়া কাউকে নয়।'

'এ ছাড়া আর কী করেছেন?'

'কেরানি গেরোর পেছনে এই ন-টা সপ্তাহ হাল্লাক করে ঘুরে লাভ হয়েছে কত্তা।'

'ঘণ্টা বাজার রহস্য উদ্ধার করেছেন?'

'একদম না। কারণটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল হোমস। সোজা গেল ডাউনিং স্ট্রিটে ইংলন্ডের আগামী প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে ক্যাবিনেট মন্ত্রী লর্ড হোল্ডহার্স্টের অফিসে। হোমস কার্ড পাঠাল। তলব এল তৎক্ষণাৎ। ফায়ার প্লেসের দু-ধারে দুটো চেয়ারে বসলাম আমি আর হোমস। মাঝখানে অভিজাত চেহারা নিয়ে ভাবনা-আঁকা মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বিখ্যাত পুরুষটি। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে, দীর্ঘ আকৃতির প্রতিটি প্রত্যঙ্গে শান দেওয়া তীক্ষ্ণতা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বনেদিয়ানা যে তাঁর রক্তে— ধার করা নয়— তা এক নজরেই মালুম হয়।

মৃদু হেসে বললেন, 'মি. হোমস আপনার সুনাম আমি শুনেছি। আপনার এখানে আসার একটা কারণই আমার অফিসে ঘটেছে। কে কাজে লাগিয়েছে আপনাকে?'

'মি. পার্সি ফেল্পস।' বললে হোমস।

'বেচারা ভাগনে। রক্তের সম্পর্ক আছে বলেই ওকে বাঁচানো যাবে না।'

'আর যদি ডকুমেন্ট উদ্ধার হয়?'

'তাহলে ফলাফল শুভ হবে।'

'দলিলটা নকল করার কথা কি এই ঘরে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।

'বাইরে থেকে কেউ শুনেছিল কি?'

'অসম্ভব।'.

'কাউকে জানিয়েছিলেন কি যে দলিল নকল করতে যাচ্ছেন?'

'না।'

'তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হয় চোর কিছুই না-জেনে হঠাৎ ঘরে ঢুকে দলিলটা দেখতে পেয়ে পকেটে করে নিয়ে গেছে।'

'আমি এর জবাব দিতে অক্ষম।'

'সন্ধিপত্রের বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে কি সত্যিই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে?'

মুখ কালো হয়ে গেল লর্ড হোল্ডহার্স্টের, 'তা হবে।'

'সে-রকম প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছে কি?'

'এখনও টের পাইনি।'

'সন্ধিপত্র ফরাসি বা রুশ দূতাবাসে পৌঁছে গেলে টের পেতেন কি?'

'পেতাম।'

'আড়াই মাসেও যখন পাননি, তখন কি ধরে নিতে পারি না যে সন্ধিপত্র কোনো দূতাবাসেই পৌঁছোয়নি?'

'চোর কি তাহলে দলিলটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবে বলে নিয়েছে?'

'বেশি দামের তালে আছে হয়তো।'

'আর দেরি করলে এক পয়সাও পাবে না। মাস কয়েকের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু সবাইকে জানানো হবে।'

'পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। চোর হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়—'

চোখ জ্বলে উঠল লর্ড মশায়ের, 'ব্রেন-ফিভার, কেমন?'

শান্ত কণ্ঠে হোমস বলে, 'সে-রকম ইঙ্গিত আমি করিনি। যাক গে, অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। এখন আসি।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে লর্ড হোল্ডহার্স্ট বললেন, 'মি. হোমস, চোর যেই হোক না কেন, আমি চাই তাকে আপনি পাকড়াও করুন।'

বাইরে এসে হোমস বললে, 'ভদ্রলোক খাসা লোক, গরিব হলেও আত্মমর্যাদা সচেতন। বুটে নতুন সুখতলা লাগিয়েছেন দেখেছিলে? যাক ভায়া, তোমাকে আর আটকে রাখব না। কালকে একই ট্রেনে আবার ওকিং যেতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।'

পরদিন সকালে দেখা করলাম বন্ধুবরের সঙ্গে। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নির্বিকার[১৫] হয়ে রইল হোমস। ইচ্ছে করলেই এ-রকমভাবে মুখটা ভাবলেশহীন করতে পারে ও। শুধু শুনলাম, যে-তিমিরে ছিল গতকাল, আজও রয়েছে সেই তিমিরে। গাড়ির নম্বর চেয়ে বিজ্ঞাপনের জবাব আসেনি।

ওকিং পৌঁছে দেখলাম গতকালের মতোই প্রণয়িনীকে পাশে নিয়ে বসে আছে পার্সি। তবে চেহারা অনেকটা সতেজ।

আমাদের দেখেই অভ্যর্থনা জানাল সোল্লাসে। মি. ফোর্বস আর লর্ড হোল্ডহার্স্টের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেছে এবং ভেঙে পড়ার মতো কিছুই ঘটেনি এখনও— হোমসের মুখে এই খবর শুনে খুশি হলেন মিস হ্যারিসন।

ফেল্পস বললে, 'এর চাইতে জোরালো খবর আপনাকে দেবার জন্যে বসে রয়েছি।'

উৎসুক হোমস।

ফেল্পস বললে, 'একটা নারকীয় ষড়যন্ত্র চলছে আমাকে ঘিরে। কাল রাতের সাংঘাতিক ঘটনাটাই তার প্রমাণ। আমি অজাতশত্রু, অথচ শুধু আমার সম্মান নয়, আমার জীবন নিয়েও টানাটানি চলছে।'

'খুলে বলুন।'

'আড়াই মাস পর এই প্রথম গতকাল রাতে একা শুয়েছিলাম ঘরে। নার্স রাখিনি, অনেকটা সুস্থ বোধ করছিলাম বলে। অল্প আলো জ্বলছিল ঘরে। রাত দুটোর সময়ে খুটখাট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক যেন ইঁদুরে খুটুর খুটুর করে গর্ত খুঁড়ছে। একটু একটু করে আওয়াজটা বেড়েই চলল। তারপর ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির চড়া আওয়াজ পেলাম। পর পর দুটো আওয়াজ। ঠিক যেন কাচের শার্সির পাল্লার ফাঁকে সরু মতো কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েই টেনে বার করে নেওয়া হল।

'তারপর দশ মিনিট চুপচাপ— কোনো শব্দ নেই। লোকটা বোধ হয় খুলতে লাগল জানলার পাল্লা। আমার দুর্বল স্নায়ু আর সইতে পারল না। লাফ দিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললাম পাল্লা দুটো। চকিতের জন্যে দেখলাম গোবরাটের নীচে গুটি মেরে বসে একটা লোক— আলখাল্লায় ঢাকা মুখের নীচের অংশ। এর বেশি আর দেখতে পেলাম না— বিদ্যুতের মতো লাফ দিয়ে উধাও হল সে। আমার এই দুর্বল শরীর নিয়ে পেছন নেওয়া সম্ভব নয় বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি মাথায় করলাম। সবার আগে ছুটে এল জোসেফ। তারপর সবাই মিলে দেখল, জানলার ঠিক নীচেই পায়ের ছাপ আছে বটে, কিন্তু দিনটা শুকনো থাকার ফলে সে-ছাপ কোনদিকে গেছে— তা ধরা যাচ্ছে না। তবে বাগানের বেড়া এক জায়গায় ভেঙে গেছে— খুব সম্ভব টপকে পালানোর সময়ে ভেঙে পেরিয়ে গেছে। পুলিশকে এখনও কিছু বলিনি। ভাবলাম আপনার মতামত আগে শোনা যাক।

মক্কেলের এই কাহিনি অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল শার্লক হোমসের ওপর। বসে থাকতে প্যরল না চেয়ারে। পায়চারি করতে লাগল ঘরময়।

বলল, 'চলুন মি. ফেল্পস, আপনাকে নিয়ে বাড়িটা একপাক ঘুরে আসি।'

'নিশ্চয়। জোসেফও চলুক সঙ্গে,' বলল পার্সি।

'আমি যাব,' বায়না ধরলেন মিস হ্যারিসন।

বাধা দিল হোমস, 'না। আপনি চেয়ার ছেড়ে নড়বেন না।'

অপ্রসন্ন হলেন মিস হ্যারিসন। চেয়ারে বসে রইলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর দাদা জোসেফ হ্যারিসন। চারজনে মিলে লন পেরিয়ে গেলাম পার্সির জানলার তলায়। মাটিতে সত্যিই পায়ের ছাপ রয়েছে— কিন্তু তা এতই আবছা যে কিছু বোঝা যায় না।

হতাশ হয়ে হোমস বললে, 'এত ঘর থাকতে চোরের এই ঘরটাই-বা পছন্দ হল কেন বুঝছি না। বসবার ঘর বা খাবার ঘরে ঢুকলেই তো পোয়াবারো ছিল।'

'রাস্তার দিক থেকে এই জানলাটাই আগে চোখে পড়ে,' বললেন জোসেফ হ্যারিসন।

'বেশ তো, তাহলে এই দরজাটা দিয়ে এলেই তো হত। কীসের দরজা এটা?'

'বাইরের কিছু লোক বেসাতি করতে এলে এই দরজা দিয়ে আসে। রাত্তিরে তালা ঝোলে।'

'আগে কখনো চোর পড়েছিল এ-বাড়িতে?'

'কক্ষনো না।'

'সিঁধ দিয়ে লাভ হতে পারে, এমনি কিছু কি আছে বাড়িতে?'

'সে-রকম মূল্যবান তো কিছু নেই।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পকেটে হাত পুরে এদিক-ওদিক দেখল হোমস— এ-রকম গা-ঢালা ভাব কিন্তু ওর মধ্যে এর আগে কখনো দেখিনি।

একবার বললে, 'বেড়া ভেঙে চোর পালিয়েছে শুনছিলাম। কোনখানটা?'

পার্সি দেখালে জায়গাটা। ভাঙা টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হোমস বললে, 'মনে হয় না কাল রাতে এখান দিয়ে কেউ গেছে। কেননা, টুকরোটা পুরোনো। চলুন, আর কিছু দেখবার নেই।'

ভাবী শ্যালকের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলল পার্সি। হোমস লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল অনেক আগেই— পেছনে আমি!

খোলা জানলার ধারে গিয়ে মিস হ্যারিসনকে ডেকে সিরিয়াস গলায় হোমস বললে, 'আজ সারাদিন এ-ঘরে থাকবেন— একদম বেরোবেন না— কোনো অজুহাতেই নয়। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

অবাক হয়ে গেলেন মিস হ্যারিসন, 'বেশ, তাই হবে।'

'কথা দিন রাতে শোবার আগে দরজায় তালা দিয়ে নিজের কাছে চাবি রাখবেন।'

'পার্সি কোথায় থাকবে তাহলে?'

'উনি আমার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন।'

'আমি একা থাকব এখানে?'

'তাঁর ভালোর জন্যেই থাকবেন। কথা দিন— তাড়াতাড়ি।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিস হ্যারিসন। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে পেছনে শোনা গেল জোসেফ হ্যারিসনের গলা, 'হাঁ করে কী বসে আছিস ওখানে? আয়, রোদে এক চক্কর দিয়ে যা।'

'না, দাদা। বড্ড মাথা ধরেছে।'

হোমস বললে, 'মি. ফেল্পস, সিঁধেল চোরের চেয়ে বড়ো হল দলিল চোর। আমার সঙ্গে আপনি লন্ডনে এলে চোর ধরতে সুবিধে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন।'

'রাতটা?'

'শহরেই কাটাবেন।'

'ছুরি হাতে রাতের কুটুম যদি আবার আসে, হতাশ হবে আমাকে না-দেখলে। জোসেফ যাবে তো আমার দেখাশোনা করতে?'

'তার কী দরকার? ওয়াটসন, ডাক্তার মানুষ, আপনার ভালোমন্দ ওর ওপর ছেড়ে দিন।'

দুপুরে লাঞ্চ খেলাম খাবার ঘরে। মিস হ্যারিসন অক্ষরে অক্ষরে তামিল করলেন হোমসের নির্দেশ। পার্সির শোবার ঘরে বসে রইলেন— একসঙ্গে খেতেও এলেন না। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার জন্যেই হোক কি ঘটনাপ্রবাহ তরতরিয়ে নতুন খাতে বয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক, আনন্দে আটখানা হয়ে খাবার ঘরে একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খেল পার্সি। আমি কিন্তু হোমসের আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারলাম না। কী চায় ও? পার্সিকে মিস হ্যারিসনের কাছ থেকে তফাতে রাখাই কি ওর আসল মতলব?

চমক সৃষ্টিতে জুড়ি নেই শার্লক হোমসের। স্টেশনে গেলাম তিনজনে— কিন্তু আমাকে আর পার্সিকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর আচমকা হোমস বললে, তার নাকি এখন লন্ডনে গেলে চলবে না। ওকিংয়ে এখনও কিছু কাজ বাকি। কাল সকালে বেকার স্ট্রিটে ব্রেকফাস্টের টেবিলে ফের দেখা হবে।

পার্সি তো হতভম্ব। ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'বাড়িতে খবর দিয়ে দেবেন— কাল রাতে ফিরব।' প্রসন্ন কণ্ঠে হোমস পালটা চিৎকার জানিয়ে দিলে, বাড়িতে সে যাচ্ছে না।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল ট্রেন। হোমসের অকস্মাৎ থেকে যাওয়া নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করলাম দুই বন্ধু।

ফেল্পস বললে, 'কাল রাতের চোরকে নিয়ে নিশ্চয় তদন্ত করতে চান মি. হোমস। লোকটাকে মামুলি চোর বলতে আমি অন্তত রাজি নই।'

'তবে কী?'

'রাজনৈতিক খুনে। ঘোর চক্রান্ত চলছে আমাকে ঘিরে। ছুরি হাতে এসেছিল আমাকে খুন করতে। চোর কখনো ছোরা নিয়ে আসে? যে-ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই, সে-ঘরে কেন আসতে চেয়েছিল বুঝতে পারছ না?'

'সেটা যে ছুরি, বুঝেছ কী করে? সিঁধকাঠিও তো হতে পারে।'

'না, না, না। স্পষ্ট দেখেছি চকচকে ফলাটা ঝকঝক করছে।'

'তুমি যা বললে, হোমস যদি তাই মনে করে থাকে, তাহলে ওর ওকিংয়ে থেকে যাওয়ার কারণটা অন্তত বোঝা যায়। সিঁধেল চোরকে পাকড়াও করে ও হয়তো দলিল চুরির ফয়সালা করতে চায়।'

'কিন্তু উনি তো বললেন বাড়িতে যাবেন না।'

'হোমসকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। অকারণে কিছু করা ওর ধাতে নেই।'

ট্রেনে এ-প্রসঙ্গে আর কথা হল না। সাত পাঁচ কথায় ভুলিয়ে রাখলাম পার্সিকে। একে অসুস্থ, তার ওপর দলিল হারানোর উদ্‌বেগ। তাই হাজার গল্পের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাইলাম ওর মনের উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। কিন্তু মন বড়ো বিচিত্র বস্তু। বাগে আনা মুশকিল। পার্সি বেচারাও দেখলাম কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। বেকার স্ট্রিটে এসেও সেই একই কথায় ফিরে এল বার বার। হোমস কি পারবে দলিল উদ্ধার করতে? কেন সে চুপচাপ রয়েছে? রহস্য সমাধান অসম্ভব জেনেই কি নীরব?

আমি ওকে পইপই করে বোঝালাম, শার্লক হোমস যখনই মুখে চাবি দেয়, তখনই বরং বুঝতে হবে লক্ষণ শুভ— রহস্য সমাধান হতে আর দেরি নেই। সমাধানের সংকেত যে পেয়ে গেছে, বাজিয়ে না-দেখা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে চাইছে।

যাই হোক, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তো শুতে পাঠালাম ওকে— কিন্তু মনে বুঝলাম এত উদ্‌বেগ নিয়ে কখনোই ঘুমোতে পারবে না। আমিও কি ছাই ঘুমোতে পারলাম? আদ্ধেক রাত কেবল এপাশ-ওপাশ করেই কাটিয়ে দিলাম। দুম করে হোমস ওকিং থেকে গেল কেন? কেন সে কথাটা পার্সির পরিবারের কাউকে বলল না? কেন পার্সিকে তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে সরিয়ে আনল? কেন ভদ্রমহিলাকে সারাদিন পার্সির ঘরে বসে থাকতে বলল? এক-একটা 'কেন' এক-একটা দুরমুশের মতো মাথার মধ্যে পিটুনি আরম্ভ করলে কি ঘুম হয়?

সক্কালবেলা পার্সির ঘরে গিয়ে দেখি তারও এক অবস্থা। চেহারা আধখানা— অনিদ্রায় মুখ আমসি।

ওর প্রথম প্রশ্নই হল, 'মি. হোমস ফিরেছেন?'

'ফিরবে, ফিরবে, হোমসের কথার নড়চড় হয় না।'

হলও না। ঘড়িতে আটটা বাজার একটু পরেই এক ঘোড়ায় টানা একটা এক্কাবাড়ি এসে দাঁড়াল সদর দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নামল শার্লক হোমস। জানলা থেকে দেখলাম বাঁ-হাতে বিরাট ব্যান্ডেজ। মুখ শুকনো আর গম্ভীর।

ফেল্পস বললে, 'হেরে এলেন মনে হচ্ছে।'

সত্যি সত্যিই পরাজয়ের চিহ্ন প্রকট হয়েছে শার্লক হোমসের চেহারার মধ্যে।

বললাম, 'গোলকধাঁধার চাবিকাঠি তাহলে ওকিংয়ে নেই— লন্ডনে রয়েছে।'

'কিন্তু হাতে ব্যান্ডেজ কেন?' ফেল্পস যেন ককিয়ে উঠল।

হোমস ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'হোমস, জখম হয়েছ মনে হচ্ছে?'

'সামান্যই— দোষটা আমার। হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। গুড মর্নিং মি. ফেল্পস। আপনার এই কেসের মতো জটপাকানো মামলা খুব বেশি হাতে আসেনি আমার।'

'জট ছাড়ানো শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। তাই না?'

'অভিজ্ঞতাটাই-বা কম কী।'

আমি বললাম, 'ব্যান্ডেজটা কীসের? রোমাঞ্চকর কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?'

'আগে খাওয়া, তারপর কথা। তিরিশ মাইল টাটকা হাওয়া খেতে খেতে এসেছি— পেটে আগুন জ্বলছে। গাড়ির নম্বর চেয়ে বিজ্ঞাপনের আর জবাব এল না দেখছি। যাকগে, সব চেষ্টাই কি আর ফলপ্রসূ হয়।'

খাবার আনার জন্যে ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে চা আর কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস হাডসন। মিনিট কয়েক পরে নিয়ে এল ঢাকনা দেওয়া খাবারের ডিশ, রাখল টেবিলে। আমরা বসলাম টেবিলের ধারে। হোমস চনমনে খিদে নিয়ে ঝলমলে, আমি উৎসুক, ফেল্পস ম্রিয়মাণ।

চিকেন-কারির ঢাকনা খুলতে খুলতে হোমস বললে, 'মিসেস হাডসন রাঁধেন খাসা। ওয়াটসন, তুমি কী নিলে?'

'ডিম আর শূকর মাংস।'

'অপূর্ব! মি. ফেল্পস, আপনি? কী নেবেন? মুরগি না ডিম?'

'ধন্যবাদ। আমার খিদে নেই।'

'আরে মশাই, এই পদটা একটু চেখেই দেখুন না।'

'ধন্যবাদ। খেতে রুচি নেই।'

দুষ্টুমি নৃত্য করে উঠল হোমসের হীরক উজ্জ্বল দুই চোখে।

বলল, 'বেশ, বেশ। তাহলে আমাকে বাড়িয়ে দিন প্লেটটা।'

ঢাকা খুলে প্লেটটা বাড়াতে গিয়ে থ হয়ে গেল পার্সি। ধবধবে সাদা প্লেটের মতোই সাদা মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল প্লেটের ঠিক মাঝখানে নীলাভ-ধূসর রঙের পাকানো কাগজটার দিকে। পরক্ষণেই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বিস্ফারিত দুই চোখ দিয়ে যেন গিলে নিল কাগজের চেহারাটা। তারপরেই বিকট চেঁচিয়ে উঠে চেয়ার থেকে ছিটকে গিয়ে মাথার ওপর কাগজ তুলে ধরে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে লাগল ঘরময়। সে কী তাণ্ডব নৃত্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ শরীরে বেদম হয়ে পড়ল অকস্মাৎ উত্তেজনার বিস্ফোরণে। আমরা ধরাধরি করে ওকে টেনে বসিয়ে দিলাম সোফায়— গলায় ঢেলে দিলাম ব্র্যান্ডি।

কাঁধ চাপড়ে হোমস বললে, 'আস্তে! আস্তে! আপনাকে চমকে দেওয়াটা নিশ্চয় ঠিক হয়নি। তবে ওয়াটসন জানে, নাটক দেখানোর লোভ আমি সামলাতে পারি না।'

'হোমসের হাত জড়িয়ে ধরে চুমু-টুমু খেয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল ফেল্পস, 'ভগবান আপনার ভালো করবেন। আমার মান রাখলেন আপনি।'

'সেইসঙ্গে আমার নিজেরটাও রাখলাম। দায়িত্বপূর্ণ কাজে আপনার গাফিলতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ জানবেন রহস্য সমাধানের ব্যাপারে আমার ব্যর্থতা।'

কোটের সবচেয়ে ভেতরের পকেটে দলিলটা গুঁজে রাখতে রাখতে ফেল্পস বললে, 'কিন্তু পেলেন কী করে?'

হোমস তখন মাংস, ডিম, কফি খেয়ে নিয়ে আড় হয়ে বসে পাইপ ধরিয়ে যা বললে তা এই :

'আপনারা তো চলে গেলেন, আমি ফ্লাস্কে চা আর পকেটে স্যান্ডউইচ নিয়ে সন্ধে নাগাদ গিয়ে দাঁড়ালাম আপনার বাড়ির পাশের রাস্তায়।

'রাস্তা ফাঁকা হয়ে-না-যাওয়া পর্যন্ত সবুর করলাম। তারপর বেড়া টপকে ঢুকলাম বাগানে। ফটক দিয়ে এলাম না পাছে কেউ দেখে ফেলে। গাছের আড়ালে গা ঢেকে পৌঁছোলাম আপনার জানলার সামনে রডোডেনড্রন ঝোপের মধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়েছে বলে প্যান্টের হাঁটুর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

'জানলা খোলা— খড়খড়ি তোলা। দেখলাম টেবিলে বসে বই পড়ছেন মিস হ্যারিসন। রাত সাড়ে দশটায় উঠে পড়লেন। দরজায় চাবি দিয়ে শুতে গেলেন।'

'দরজায় চাবি দিল কেন?' ফেল্পসের প্রশ্ন।

'আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম বলে। আরে মশাই, আপনার পকেটের ওই কাগজটা কোনো কালেই আপনার পকেটে ফিরে আসত না তাঁর সাহায্য না-পেলে। যাক, বসে রইলাম তো রইলামই। পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজতে লাগল দূরের গির্জেতে। দুটো নাগাদ খিল খোলার আর চাবি ঘোরানোর কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ কানে এল। চাকরদের যাতায়াতের দরজা খুলে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়ালেন মি. জোসেফ হ্যারিসন।'

'জোসেফ!' যেন দম আটকে এল ফেল্পসের।

'মাথায় টুপি নেই, কালো আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা মুখের নীচের অংশ— যাতে হঠাৎ দেখলে চেনা না-যায়। দেওয়ালের ছায়া গা ঢেকে পা টিপে টিপে আপনার জানলার সামনে গিয়ে একটা লম্বা ছোরা বার করে ঢুকিয়ে দিলেন খড়খড়ির পাল্লায় ফাঁকে। চাড় মারতেই সরে গেল ছিটকিনি— খুলে গেল পাল্লা।

'খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম, শামাদানে মোমবাতি জ্বেলে দরজার কাছের কার্পেটের খানিকটা তুলে ফেললেন মি. হ্যারিসন। পাইপ মিস্ত্রি গ্যাসপাইপের জোড় ঢাকবার জন্যে কাঠের ব্লক চাপা দেয়। ঠিক সেইরকম একটা চৌকোনা কাঠ তুললেন কার্পেটের তলা থেকে। নীচের রান্নাঘরে গ্যাসের চালান যায় যে T জয়েন্টের মধ্যে দিয়ে, কাঠের টুকরো দিয়ে ঢাকা ছিল সেই জয়েন্টটা। পাকানো কাগজটা খুপরি থেকে তুলে নিয়ে ফের কাঠ-চাপা দিয়ে কার্পেট টেনে দিলেন মি. হ্যারিসন। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে জানলা গলে এসে পড়লেন আমার দু-বাহুর মধ্যে— স্বাগতম জানানোর জন্যে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

'কিন্তু জোসেফ লোকটা যে এতটা খারাপ হবে ভাবতে পারিনি। সাংঘাতিক বদমাশ। ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। দু-বার আছড়ে ফেললাম ঘাসের ওপর— আমার আঙুলের গাঁট কেটে গেল ছোরার ঘায়ে— তারপর ঘুসি মেরে একটা চোখ প্রায় কানা করে দেওয়ার পর মক্কেল বুঝল এ বড়ো শক্ত ঠাঁই। তাতেও কি হার মানে। একটা চোখেই দেখলাম খুনির চেহারা— পারলে তখনই খুন করে দেয় আমাকে। যাই হোক, বেগতিক বুঝে দলিলটা আমার হাতে দিতে আমিও ছেড়ে দিলাম। অবশ্য আজ সকালে ফোর্বসকে টেলিগ্রামে সব জানিয়েছি। যদি তাড়াতাড়ি যেতে পারে, পাবে জোসেফকে। নইল দেখবে পিঞ্জর শূন্য— পাখি ভাগলবা। তাতে অবশ্য সরকারের লাভ। এ-নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হোক, আপনারা মামা-ভাগনে নিশ্চয় তা চান না।'

ফেল্পস খাবি খেতে খেতে বললে, 'আপনি বলছেন কী? আড়াই মাস যে দলিলের চিন্তায় শয্যাশায়ী, একই ঘরে তা পড়েছিল অ্যাদ্দিন?

'হ্যাঁ।'

'জোসেফ! শেষকালে জোসেফ! চোর, বদমাশ, শয়তান!'

'চেহারা দেখে কি মানুষ ধরা যায়? জোসেফের বাইরে এক, ভেতরে আর এক। কালকে রাতেই শুনলাম জুয়ো খেলে দেনায় ডুবতে বসেছে। তাই বোনের সর্বনাশ হবে জেনেও এক ঝকমারির মধ্যে নাক গলিয়েছে। স্বার্থ ছাড়া তার কাছে কিছুই বড়ো নয়।'

চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ফেল্পস, 'আমার মাথা ঘুরছে! সব গুলিয়ে দিলেন আপনি।'

হোমস তখন বিশ্লেষণী ভঙ্গিমায় বললে, 'কেসটায় গোড়া থেকেই মূল সূত্রগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছিল অবান্তর সূত্রের বাড়াবাড়িতে। আমি বাজে সূত্র বাদ দিলাম, কাজের সূত্রগুলোকে পর-পর সাজালাম। জোসেফকে সন্দেহ করলাম প্রথম থেকেই— কেননা তার সঙ্গেই আপনার এক ট্রেনে ওকিং ফেরার কথা হয়েছিল। সেই রাতে খুবই স্বাভাবিক আপনাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরে সে গেছিল, আপনার অফিস সে চেনে। বিনা নোটিশে তাকে ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে আপনার ওই অবস্থার জন্যে। তারপর যখন শুনলাম, প্রথম যে-রাতে নার্স রইল না ঘরে, সেই রাতেই চোর ঢুকতে চেয়েছিল সেই ঘরেই— তখনই বুঝলাম চোর মহাপ্রভু বাড়ির কেউ হবে— কেননা সব খবর সে রাখে।'

'ইস। কী অন্ধ আমি!'

'ব্যাপারটা কী হয়েছিল শুনুন। আপনি যখন দারোয়ানের কাছে কফির তাগাদা দিতে ঘরের বাইরে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে পাশের গলি চার্লস স্ট্রিট দিয়ে অভ্যেসমতো আপনার অফিসে ঢুকেছিল জোসেফ হ্যারিসন আপনাকে নিয়ে স্টেশনে যাবে বলে। ঘরে ঢুকেই আপনাকে না-দেখে ঘণ্টা বাজিয়েছে— পরমুহূর্তেই চোখ পড়েছে টেবিলের ওপর মহামূল্যবান দলিলটার ওপর। পাকা বদমাশ হলেও পলকের মধ্যে বুঝতে পেরেছে এ-জিনিস হাতাতে পারলে লাভ বিস্তর। তাই নকল দলিল ফেলে আসলটা পকেটে নিয়ে তরতরিয়ে নেমে গিয়েছে ছোটো সিঁড়ি দিয়ে চার্লস স্ট্রিটে। দারোয়ান যখন অবাক হয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কে ঘণ্টা বাজাল, তার মধ্যেই ঘটে গেছে এতগুলো ঘটনা।

'ট্রেনে ওকিং ফিরে এল জোসেফ। দলিল পরীক্ষা করে বুঝলে দু-একদিনের মধ্যে কোনো দূতাবাসে পাচার করতে পারলে দু-পয়সা পকেটে আসবে। তাই লুকিয়ে রাখল নিজের ঘরের

কার্পেটের তলায়। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। রাত্রে উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন আপনি— ওরই ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল আপনার, দলিলটা সেই থেকে সরানোর সময় সে পায়নি ঘরে অষ্টপ্রহর লোক থাকায়। নার্স না-থাকায় প্রথম সুযোগেই এল দলিল সরাতে। কিন্তু আপনি জেগে থাকায় তাও হল না। সে-রাতে নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাননি?'

'না।'

'জোসেফ কিন্তু ভেবেছিল আপনি খেয়েছেন এবং ঘুমোচ্ছেন। তাই ঠিক করলাম ওকে আর একটা সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু যাতে সন্দেহ না হয়, তাই সারাদিন মিস হ্যারিসনকে দিয়ে পাহারা দেওয়ালাম। দলিল ওই ঘরেই আছে আঁচ করেছিলাম, কিন্তু কোথায় আছে জানতাম না। সব লাটঘাট করার চেয়ে ওকে দিয়েই খুঁজে বার করতে চেয়েছিলাম। আর কিছু জানবার থাকলে বলুন।'

'কিন্তু অত ঝামেলা করে জানলা খোলার চেষ্টা না-করে দরজা দিয়ে এলেই তো হত?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সাতজনের শোবার ঘর পেরিয়ে তবে দরজার সামনে পৌঁছোতে হত। খামোখা ঝুঁকি না-নিয়ে লন পেরিয়ে জানলায় গিয়েছিল সেই কারণেই।'

'ছোরা নিয়েছিল কেন? মানুষ খুনের জন্যে নিশ্চয় নয়। জানলা খোলার জন্যে, তাই না?' উৎসুক কণ্ঠে শুধোয় পার্সি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'হলেও হতে পারে। তবে জোসেফ হ্যারিসনের হৃদয় যে খুব একটা দরাজ নয়— আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

টীকা

১. **নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র** : 'দ্য নেভাল ট্রিটি' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯৩-এর অক্টোবর এবং নভেম্বর সংখ্যায়, দুই কিস্তিতে। নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলিতেও প্রকাশিত হয় দুই কিস্তিতে ১৪ এবং ২১ অক্টোবর ১৮৯৩ সংখ্যায়।

২. **বুনসেন বার্নার** : জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট বুনসেন প্রবর্তিত যন্ত্র। প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. **ঝড়ো পেট্রোল পক্ষী** : দ্য রেইগেট স্কোয়ারস গল্পে হোমস নিজের সম্পর্কে এই উপমা ব্যবহার করেছিলেন।

৪. **ওকিং** : সারে কাউন্টির অন্তর্গত একটি লোকালয়। ব্রিটেনের প্রাচীনতম মসজিদটি এখানে অবস্থিত।

৫. **গোঁফখানা** : ড. ওয়াটসনের গোঁফের উল্লেখ আরও পাওয়া যায় 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন' এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কল' গল্পে।

৬. **ইংলন্ড আর ইতালির মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছে** : এই দুই দেশের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে।

৭. **তুমি এর কপি করবে নিজের হাতে** : জেমস ওয়াট কপি-প্রেস তৈরি করেন ১৮৭০ সালে। তারপর একে একে নানা ধরনের লেটার কপিইং প্রেস, রোলার কপিয়ার, কপিইং বাথ প্রভৃতি তৈরি হতে শুরু হয়। 'দ্য নেভাল ট্রিটি'-র ঘটনাকালে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরে এই ধরনের কোনো যন্ত্র ছিল না— এ-কথা যথেষ্টই কষ্টকল্পিত।

৮. **ত্রিশক্তির মিত্রতা** : ত্রিশক্তি হল ১৮৭৯-তে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গারি এবং ১৮৮২-তে তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ ইতালি। এই জোট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ ১৯১৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

৯. **ফরাসি ভাষায় লেখা** : সেই সময়ের কূটনীতিতে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ফরাসি প্রচলিত থাকলেও ব্রিটেন এবং ইতালির মধ্যের চুক্তিতে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হওয়া কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।

১০. **একটা গির্জেতে :** চার্লস স্ট্রিটে ফেল্পসের অফিসের কাছাকাছি সেন্ট মার্গারেট চার্চ এবং ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি অবস্থিত। এখানকার ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ ফেল্পস শুনে থাকবে।

১১. **একজন স্ত্রীলোক ছাড়া কেউ যায়নি :** ফেল্পস কফি আনতে বলা থেকে এত দেরি পর্যন্ত দারোয়ানের বউ কী করছিল অফিসে?

১২. **কোল্ডস্ট্রিম গার্ডস :** রিচার্ড ক্রমওয়েলের সরকারের পতনের পর জেনারেল জর্জ মঙ্ক-এর নেতৃত্বে লন্ডন শহরে প্রবেশ করে এই বাহিনি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এই বাহিনির সদস্যদের কোয়ালিস বলা হত।

১৩. **সাতটা সূত্র :** 'দ্য কপার বীচেস' গল্পেও সাতটা সূত্র পেয়েছিলেন শার্লক হোমস। গবেষকরা সাত সংখ্যাটির প্রতি তাঁর অহেতুক প্রীতি লক্ষ করেছেন এই দুটি বক্তব্যে।

১৪. **নর্দাম্বারল্যান্ড :** ইংলন্ডের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত ঠান্ডা এবং জংলা পরিবেশ-সংবলিত কাউন্টি।

১৫. **রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নির্বিকার :** ইংলন্ডের অনেক তামাকের দোকানে রেড ইন্ডিয়ানদের কাঠের মূর্তি সাজানো থাকত। কিছু গবেষক মনে করেন, সেই ঋজু এবং নির্বিকার মূর্তিগুলির কথাই ড. ওয়াটসন বোঝাতে চেয়েছেন।

শার্লক হোমস বিদায় নিলেন[১]

[দ্য ফাইনাল প্রবলেম]

আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে শার্লক হোমসের এই শেষের কাহিনি লিখতে। বিধাতা তাকে অনেক প্রতিভা দিয়ে এ-সংসারে পাঠিয়েছিলেন। তার সেই অসাধারণ ক্ষমতার কিছু কিছু অসংলগ্ন এবং অপর্যাপ্তভাবে এর আগে লিখেছি। কাহিনিমালা শুরু হয়েছিল 'স্টাডি ইন স্কারলেট' মামলায়— 'নেভাল ট্রীটি' কেসে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। এরপর আর কিছুই লিখব না ঠিক করেছিলাম। যে-ঘটনার ফলে আজ আমার জীবন শূন্য হয়ে পড়েছে, দীর্ঘ দু-বছরেও তা নিয়ে এক লাইন লেখারও আর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কর্নেল জেমস মরিয়ার্টি[২] পত্র-মারফত যেভাবে তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিচারণ শুরু করেছেন এবং তাঁর পক্ষ নিয়ে কথার জাল বুনে চলেছেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে। ঠিক কী ঘটেছিল, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। দেখছি, তা গোপন রেখেও আর লাভ হচ্ছে না। যদ্দুর জানি, এ-সম্পর্কে তিনটে বিবরণ বেরিয়েছিল আজ পর্যন্ত। ১৮৯১ সালের ৬ মে তারিখে 'জার্নাল দ্য জেনেভ'য়ের খবর, ৭ মে তারিখে ইংরেজি কাগজে রয়টার[৩] পরিবেশিত সংবাদ, এবং কর্নেল জেমস মরিয়ার্টি লিখিত পত্রাবলি— যার কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। প্রথম দুটো নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তৃতীয়টি সত্যের অপলাপ— ঘটনার বিকৃতিকরণ। তাই ঠিক করেছি এই প্রথম দেশের লোককে জানাব প্রফেসর মরিয়ার্টি এবং শার্লক হোমসের মধ্যে ঠিক কী ধরনের সংঘাত লেগেছিল শেষের সেই দিনগুলিতে এবং শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল।

বিয়ের পর হোমসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমে এসেছিল বটে, কিন্তু গোলমেলে কেসে সঙ্গীর দরকার হলেই ও আমাকে টেনে নিয়ে যেত বাড়ি থেকে। তারপর তাও কমে এল। ১৮৯০ সালে মাত্র তিনটি কেসে তার সান্নিধ্য পেলাম। ওই বছরের শীতকালে ফরাসি সরকার নিয়োজিত দুটি মামলায় সে এমন জড়িয়ে পড়ল যে খবরের কাগজের খবর থেকে বুঝলাম খুব তাড়াতাড়ি তার

দর্শন আর পাব না এবং দীর্ঘকাল তাকে ফ্রান্সেই থাকতে হবে। তাই ২৪ এপ্রিল সন্ধের পর আমার চেম্বারে তাকে লম্বা পা ফেলে ঢুকতে দেখে সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। দেখলাম, দারুণ ফ্যাকাশে মেরে গেছে আগের চেয়ে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও বুঝে নিলে আমার মনের কথা। বললে, 'আরে হ্যাঁ, কাজের চাপে নাওয়াখাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। ভায়া, জানলার খড়খড়িটা নামিয়ে দিলে অসুবিধে হবে?'

বলে, দেওয়ালে পিঠ ঘষটে এগিয়ে গিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল হোমস।

'খুব আতঙ্কে আছ দেখছি?' বললাম আমি।

'তা আছি।'

'কীসের আতঙ্ক?'

'এয়ার গানের[৪]।'

'মাই ডিয়ার হোমস, কী আবোল-তাবোল বকছ!'

'ভায়া ওয়াটসন, ছায়া দেখে চমকে ওঠা আমার কোষ্ঠিতে লেখেনি— তা তুমি জানো। কিন্তু আসন্ন বিপদকে অবহেলা করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই। যাক গে, দেশলাইটা ধার দেবে?' সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দু-চার টান মেরে যেন অনেকটা সহজ হল হোমস।

বললে, 'এক্ষুনি কিন্তু তোমার বাগানের পেছনের পাঁচিল টপকে পালাব।'

'কী ব্যাপার বল তো?'

উত্তরে আলোর সামনে হাত বাড়িয়ে ধরল হোমস। দেখলাম দুটো আঙুলের গাঁট ফেটে গেছে এবং রক্ত ঝরছে।

'কী বুঝলে? খুব একটা হালকা ব্যাপার তাহলে নয়? বউ কোথায়?'

'বাড়ি নেই! দিনকয়েকের জন্যে বাইরে গেছে।'

'তাই নাকি! তাহলে চলো আমার সঙ্গে হপ্তাখানেক ইউরোপ বেড়িয়ে আসবে।'

'কোথায়?'

'যেদিকে দু-চোখ যায়।'

এ তে বড়ো রহস্যজনক ব্যাপার! লক্ষ্যহীনভাবে ছুটি কাটানোর ধাত শার্লক হোমসের নেই। ফ্যাকাশে মুখ, শুকনো আকৃতি দেখেও মনে হচ্ছে মানসিক উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছেছে, নার্ভ টান-টান হয়ে রয়েছে। আমার নীরব প্রশ্ন চোখের ভাষায় পড়ে নিয়ে হাঁটুতে কনুই রেখে বসল ও, আঙুলের ডগাগুলো এক করে বুঝিয়ে বলল, কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে কাটছে তার দিবস-নিশির প্রতিটি মুহূর্ত।

বলল, 'প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম কখনো শুনেছ?'

'জন্মেও না[৫]।'

'এ-ব্যাপারেরও মজাই তো সেখানে। একেই বলে প্রতিভা! সারালন্ডন ছেয়ে আছে সে, অথচ কেউ তার নাম শোনেনি। অপরাধ ইতিহাসের তুঙ্গে পৌঁছেছে সে শুধু এই কারণেই। ওয়াটসন, এই দুষ্ট ব্রণটিকে যদি সমাজ থেকে নির্মূল করতে পারি, তাহলেই বুঝব আমার কর্মজীবনে চূড়ান্ত সাফল্য এসেছে। অবসর নিয়ে তখন বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতেও আপত্তি

নেই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারের মামলা আর ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সমস্যা সমাধান করে যে-অবস্থায় পৌঁছেছি, তাতে বাকি জীবনটা রাসায়নিক গবেষণা নিয়ে পরম শান্তিতে মনের সুখে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শান্তি আমি পাব না, সুখে দিন আমার কাটবে না— যদ্দিন জানব প্রফেসর মরিয়ার্টির মতো একটা দুরাত্মা বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে লন্ডনের পথেঘাটে— তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতোও কেউ নেই এ-শহরে।'

'কিন্তু সে করেছে কী?'

'অসাধারণ তার কর্মজীবন। সদ্বংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাবান। অঙ্কে অমন মাথা কোটিতে গুটি পাওয়া যায়। একুশ বছর বয়েসে বীজগণিতের 'বাইনোমিয়াল থিয়োরেম[৬]' নিয়ে আশ্চর্য এক প্রবন্ধ লিখে টনক নড়িয়েছে পাকা গণিতবিদদের— প্রবন্ধটা স্বীকৃতি পেয়েছে সারাইউরোপে। এই প্রবন্ধের জোরেই ছোটোখাটো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছিল। কিন্তু পৈশাচিক কাজ করার ঝোঁক পেয়েছিল সে জন্মসূত্রে, রক্তে লুকিয়েছিল একটা ক্রূর অপরাধী, একটা শয়তানি প্রবৃত্তি। গাণিতিক প্রতিভায় তা বিলুপ্ত না হয়ে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে ওঠে। অসাধারণ মানসিক শক্তির দৌলতে কুটিল কাজ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেল সীমাহীনভাবে। অনেক রকম ভয়ংকর কথা শোনা যেতে লাগল তার সম্পর্কে। শেষকালে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে চলে এল লন্ডনে। সেনাবাহিনীর শিক্ষণ উপদেষ্টা হয়ে জাঁকিয়ে বসল শহরে। সাধারণ মানুষ তার চাইতে এর বেশি খবর রাখে না। কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব, তা আমি নিজে খুঁজে পেতে জানতে পেরেছি।

'ওয়াটসন, বিরাট এই শহরের অপরাধী মহলের নাড়িনক্ষত্রের খবর আমি রাখি। আমার চাইতে উঁচু মহলের অপরাধীদের খবর আর কেউ রাখে না। অনেকদিন ধরেই আঁচ করছিলাম, একটা অদৃশ্য শক্তি প্রচ্ছন্ন থেকে যেন সুতো ধরে নাচিয়ে চলেছে লন্ডনের বাঘা বাঘা অপরাধীদের। সে ধরাছোঁয়ার বাইরে— কিন্তু তার পরিকল্পনা মতোই সব হচ্ছে। খুন, ডাকাতি, জালিয়াতি ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধের পেছনে বার বার এই প্রচণ্ড শক্তির অস্তিত্ব আমি টের পেয়েছি। দেখেছি, আইনের খপ্পর থেকে বার বার এই শক্তি অপরাধীদের রক্ষে করে এসেছে। যেসব মামলা আমার হাতে আসেনি, সেসবের মধ্যে এই প্রাণশক্তির খেলা আমি টের পেয়েছি। অনেক চেষ্টা, অনেক কষ্টের পর বিপদকে পদে পদে অতিক্রম করে আমি এই নাটের গুরুটির সন্ধান পেয়েছি। এই সেই বিখ্যাত প্রফেসর মরিয়ার্টি।

'ওয়াটসন, অপরাধ দুনিয়ার সম্রাট নেপোলিয়ন বলতে গেলে প্রফেসর মরিয়ার্টিকেই বোঝায়। মাকড়সার মতো জাল পেতে সে ঠিক মাঝখানটিতে বসে থাকে। নিজে নড়ে না, কিস্সু করে না— শুধু পরিকল্পনা করে। বিশাল সংগঠনের অগুনতি অপরাধী তার চক্রান্ত অনুসারে একটার পর একটা অপরাধ করে বেড়ায়। যদি ধরা পড়ে, এই প্রফেসরই টাকা ছড়িয়ে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারে না নাটের গুরুটি আসলে কে। তার বিরাট সংগঠনের অসাধ্য কিছু নেই। যেকোনো কুকাজ করতে তারা পোক্ত। কাউকে খুন করার দরকার হলে, কারো ঘর তল্লাশির প্রয়োজন হলে বা মূল্যবান দলিলপত্র উধাও করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে শুধু প্রফেসরকে খবর দিলেই হল। নিজের লোক দিয়ে সুচারুভাবে কুকর্মটি করিয়ে দেবে সে। ধরা পড়লে খালাস করেও আনবে। ওয়াটসন, আমার

নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে তিল তিল করে এগিয়ে দুস্তর বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে শয়তান শিরোমণি এই প্রফেসরের নাগাল আমি ধরেছি— এখন উঠে-পড়ে লেগেছি দেশের লোকের সামনে এর মুখোশ খুলে সংগঠনটা সমূলে উৎপাটন করতে।

'কিন্তু মহাধড়িবাজ এই প্রফেসর নিজেকে হাজার গণ্ডির মধ্যে এমন আগলে রেখে দিয়েছে, কাছে যায় কার সাধ্য। আইনের চোখে সে নির্দোষ। কোনোরকমভাবেই তার অপরাধ আদালতে প্রতিপন্ন করা যায় না। তিন মাস একনাগাড়ে আমি সাক্ষ্য আর প্রমাণ খুঁজেছি যাতে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে দায়রা সোপর্দ করতে পারি। এই তিন মাসে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, বুদ্ধির যুদ্ধে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যদি কেউ দুনিয়ায় থাকে, তবে সে এই প্রফেসর মরিয়ার্টি। আমার অসাধ্যসাধনের ক্ষমতার কথা তুমি তো জান ভায়া, কিন্তু আমাকেও বারে বারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে মহা-ধুরন্ধর পিশাচ-শ্রেষ্ঠ কুটিল-সম্রাট প্রফেসর মরিয়ার্টি। কিন্তু মানুষমাত্রই ভুল করে, তা সে যত বড়ো প্রতিভাবানই হোক না কেন। প্রফেসরও ছোট্ট একটা ভুল করে বসল একদিন। সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে আমি তার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছি, চারধারে জাল গুটিয়ে এনেছি, ছোট্ট কিন্তু মারাত্মক ভুলের দৌলতেই আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার দলের সবকটা রাঘব বোয়ালকে একসঙ্গে টেনে তুলব— ধর সামনের সোমবারেই দলবল সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়বে প্রফেসর মরিয়ার্টি এবং শুরু হবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ফৌজদারি মামলা— পরিষ্কার হয়ে যাবে চল্লিশটা জটিল রহস্য এবং গলায় দড়ি পড়বে সবকটা বাছাধনের। কিন্তু সামান্য তাড়াহুড়ো করলেই ওরা হাত ফসকে পালাতে পারে শেষ মুহূর্তেও।

'সব ভালো হত যদি এত কাণ্ড প্রফেসরের অজ্ঞাতসারে করতে পারতাম। কিন্তু লোকটা এত ধড়িবাজ যে বলবার নয়। তাকে জালে ফেলবার জন্যে আমি যা-যা করেছি, তার প্রতিটি সে লক্ষ করেছে এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে— কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো আমি অন্য দিক দিয়ে তাকে ধরেছি। নীরব এই দ্বন্দ্বের কাহিনি যদি কোনোদিন লেখা হয়, দেখবে গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে এ-রকম গৌরবময় বুদ্ধিসমুজ্জ্বল ঘটনা আর দ্বিতীয়টি নেই। বুদ্ধির খেলায় এত চমক আমি কখনো দেখাতে পারিনি— বারে বারে এভাবে পর্যুদস্তও কখনো হইনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর হতে এ-রকম নাকানিচোবানি কখনো খাইনি। সে যত গভীরে তলিয়েছে, আমি তার চাইতেও গভীরে ডুব দিয়েছি। আজ সকালেই শেষ ব্যবস্থা সাঙ্গ হয়েছে— আর মাত্র তিন দিনের মধ্যেই লীলাখেলা শেষ হবে প্রফেসরের। ঘরে বসে এইসব ভাবছি, এমন সময়ে দরজা খুলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল স্বয়ং প্রফেসর মরিয়ার্টি।

'ওয়াটসন, আমার স্নায়ু পলকা নয়। কিন্তু যে আমার দিবানিশির চিন্তা জুড়ে রয়েছে হঠাৎ তাকে সামনে দেখে বেশ চমকে উঠলাম। এ-মূর্তির প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি আমার মুখস্থ! অত্যন্ত রোগা এবং লম্বা কপালটা সাদা গম্বুজের মতো ঠেলে বার করা। কোটরে ঢোকানো দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, দাড়িগোঁফ কামানো, মুখ পাণ্ডুর, তাপসিক সৌম্যতাসমৃদ্ধ অধ্যাপক জীবনের আমেজ যেন এখনও আকৃতিতে লেগে রয়েছে। অতিরিক্ত পড়াশুনা করার দরুন দু-কাঁধ গোল, মাথা সামনে ঝুঁকে রয়েছে— একটু কোলকুঁজো ভাব। অদ্ভুত সর্পিল ভঙ্গিমায় মাথাটা একনাগাড়ে দুলছে ডাইনে আর বাঁয়ে— সাপ যেভাবে ফণা দোলায়— ঠিক সেইভাবে। দুই চোখে নিঃসীম কৌতূহল জাগিয়ে ভুরু কুঁচকে আমাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রফেসর।

বললে, 'মাথার সামনের দিকটা ভেবেছিলাম আরও পরিণত হবে'— ড্রেসিং গাউনের পকেটে গুলিভরা রিভলভারের ঘোড়ায় আঙুল রাখা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক অভ্যেস।'

'ব্যাপারটা হয়েছে কী, প্রফেসরের অকস্মাৎ আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই বুঝেছি আমার প্রাণহানি ঘটতে পারে এবার। তাই চক্ষের নিমেষে ড্রয়ার থেকে রিভলভার নিয়ে ড্রেসিং গাউনের পকেটে রেখে বাগিয়ে ধরেছিলাম তার দিকে। এখন তা বার করে রাখলাম টেবিলের ওপর। প্রফেসরের চোখে যে-দৃষ্টি দেখেছিলাম, মিটিমিটি হাসির ছটাতেও তার ভয়াবহতা ঢাকা পড়েনি। হাতের কাছে রিভলভার দেখে তাই স্বস্তি বোধ করছিলাম।

'প্রফেসর বলল— আমাকে দেখছি চেনেন না।'

'ঠিক উলটো। আপনাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, যা বলবার বলুন।'

'যা বলব বলে এসেছি, তা আপনি জানেন।'

'তাহলে আমার জবাবটাও আপনি জানেন,' বললাম আমি।

'এই কি শেষ কথা?'

'এক্কেবারে।'

'পকেটে হাত দিল প্রফেসর। তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে পিস্তল তুলে নিলাম। কিন্তু পকেট থেকে একটা স্মারক-পত্রিকা বার করল প্রফেসর— তাতে লেখা অনেকগুলো তারিখ।

'বললে, চৌঠা জানুয়ারি আমার পথ মাড়িয়েছেন আপনি, তেইশে উত্ত্যক্ত করেছেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সাংঘাতিকরকম ঝামেলায় ফেলেছেন, মার্চের শেষে আমার সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে ছেড়েছেন, আর এখন— এই এপ্রিলের শেষে এমন জাল বিস্তার করেছেন যে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। আপনার বিরামবিহীন উৎপাতের জন্যেই এই বিপদে পড়েছি আজ। অসম্ভব এই পরিস্থিতি আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'আমি বললাম কিছু প্রস্তাব থাকলে ঝেড়ে কাশুন মশাই।'

'আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান।'

'সোমবারের পর,' বললাম আমি।

'ছিঃ, ছিঃ মি. হোমস। আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষের মুখে এ-কথা শোভা পায় না। এর পরিণাম ভালো হবে না। হাসছেন, বেশ বেশ হেসে নিন। কিন্তু আমার কথার নড়চড় হয় না জানবেন। এবার যে-রাস্তা ধরব, তাতে আপনার সর্বনাশ করে ছাড়ব।'

'বিপদ আমার নিত্যসঙ্গী।'

'দুর মশায়, বিপদের কথা বলছে কে? একেবারে শেষ হয়ে যাবেন যে। আপনার যত বুদ্ধিই থাক না কেন, আমার এই সংস্থার শক্তি এখনও আঁচ করতে পারেননি। একেবারে চিঁড়েচেপটা করে ছেড়ে দেব।'

'উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমায় যে এখুনি বেরোতে হবে।"

'প্রফেসরও উঠে দাঁড়াল। নীরবে চেয়ে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললে, "মি. হোমস, আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। আপনি কী-কী চাল চেলেছেন, সব আমি জানি। সোমবারের আগে আপনি আমাদের গায়ে হাত দিতে পারবেন না। আপনি ভেবেছেন, আপনার সঙ্গে আমার

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে হারাবেন, কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন, শেষ পর্যন্ত খতম করবেন। ভুল, মি. হোমস। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আমাকে শেষ করতে গিয়ে নিজেই শেষ হয়ে যাবেন।”

‘আমি বললাম, মি. মরিয়ার্টি, আপনাকে শেষ করার পর যদি আমাকে শেষ হয়ে যেতে হয়— তাতে দুঃখ নেই।’

‘হিংস্র হায়নার মতো গর্জে উঠল প্রফেসর, “প্রথম সম্ভাবনাটা ঘটবে কি না জানি না— কিন্তু দ্বিতীয়টা অবধারিত।” বলে চোখ মিটমিটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

‘ওয়াটসন, সেই থেকে আমি অস্বস্তির মধ্যে রয়েছি। প্রফেসর কখনো ফাঁকা ভয় দেখায় না।’

‘এর মধ্যে চড়াও হয়েছে তোমার ওপর?’

‘মাই ডিয়ার ওয়াটসন, প্রফেসর মরিয়ার্টি কখনো পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না। আজ দুপুরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে কাজে গিয়েছিলাম। মোড়ের মুখে একটা ঘোড়ার গাড়ি আর একটু হলে চাপা দিত— লাফিয়ে উঠলাম ফুটপাথে। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে একটা থান ইট পায়ের কাছে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ নিয়ে পাশের বাড়িতে উঠলাম। কেউ নেই। জড়ো করা ইট আর টালি ছাড়া কিছু নেই ছাদে। পুলিশ বললে, হাওয়ায় একটা ইট খসে পড়েছে। ঘোড়ার গাড়ি চেপে ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে তোমার এখানে আসবার সময়ে একজন লাঠি নিয়ে তাড়া করল। ঘুসি মেরে তার দাঁত কপাটি উড়িয়ে দিলাম বটে, থানাতেও পাঠালাম— কিন্তু দশ মাইল দূরে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষছে যে-গণিতবিদটি তার গায়ে আঁচড় কাটতে পারলাম না। ভায়া, সেইজন্যেই তোমার ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করেছি— কথা শেষ হলে পালাব বাগানের পাঁচিল টপকে।’

শার্লক হোমস চিরকালই দুঃসাহসী। কিন্তু মাথার ওপর মরণের খাঁড়া নিয়ে সেদিন যেরকম নিশ্চিত নির্বিকারভাবে বিপদের বিবরণ দিতে শুনলাম, তেমনটি কখনো দেখিনি।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বললাম, ‘রাতটা এখানে থাকবে তো?’

‘পাগল! তাতে তুমি বিপদে পড়বে। পরিকল্পনা মতো পুলিশ এখন ওদের পেছনে লেগে থাকুক, আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। তোমাকে চাই। তোমাকে ডাকছি সেইজন্যে— চলো ইউরোপ ঘুরে আসি।’

‘আমার অসুবিধে হবে না। রুগির ভার প্রতিবেশী ডাক্তারের হাতে দিয়ে যাব।’

‘কাল সকালে বেরোতে পারবে?’

‘নিশ্চয়।’

‘তাহলে ঠিক যা বলব, তাই হবে। মনে রেখো, ইউরোপের সবচেয়ে জাঁহাবাজ, সবচেয়ে ধড়িবাজ, সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নেমেছি আমি। আজকে রাতেই তোমার মালপত্র লোক মারফত ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। কাল সকালে যাকে গাড়ি ডাকতে পাঠাবে, সে যেন প্রথম দুটো গাড়ি যেচে আসতে চাইলেও ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় গাড়িটা নেয়। গাড়ি এলেই তুমি তাতে লাফিয়ে উঠে ‘লাউডার আর্কেড’[৮]-এর এই ঠিকানায় গাড়ি হাঁকাতে বলবে। আর্কেড-এ পৌঁছেই দৌড়ে ওপারে পৌঁছাবে ঠিক ন-টা পনেরো মিনিটে। দেখবে, ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ব্রুহাম গাড়ি— কোচোয়ানের গায়ে লাল কলারওলা কালো

কোট। এই গাড়িতে চেপে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছোবে কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস যখন ছাড়ে— ঠিক তখন।'

'তুমি?'

'স্টেশনে থাকব। ইঞ্জিনের পেছনে ফার্স্ট ক্লাস বগির সেকেন্ড কামরাটা আমার জন্যে রিজার্ভ করা আছে।'

এই বলে হোমস পেছনের বাগানে গিয়ে পাঁচিল টপকে লম্বা দিল সে-রাতের মতো— পাছে আমার ক্ষতি হয়, তাই হাজার অনুরোধ ও উপরোধে রাতটা কাটিয়ে গেল না আমার ডেরায়।

পরের দিন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললাম ওর নির্দেশ। স্টেশনে পৌঁছে রিজার্ভড কামরায় উঠে বসলাম বটে, কিন্তু যার জন্যে আসা সেই হোমসেরই টিকি দেখতে পেলাম না। ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র সাত মিনিট বাকি— অথচ সে নিপাত্তা। ভীষণ উদ্‌বেগে পড়লাম। এর মধ্যে নতুন বিপত্তি উপস্থিত হল এক থুত্থুরে বুড়ো ইতালিয়ান পাদরিকে নিয়ে। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, আমিও ইতালি ভাষা জানি না। তিনি মুটের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ঝগড়া-টগড়া করার কোন ফাঁকে যে আমাদের রিজার্ভড কামরায় উঠে বসেছেন জানতাম না। যখন দেখতে পেলাম, তখন ট্রেনের বাঁশি পড়ে গেছে— ভদ্রলোককেও বোঝাতে পারলাম না যে এটা রিজার্ভড কামরা। তা ছাড়া হোমস শেষ পর্যন্ত না-আসায় এবং নিশ্চয় মারাত্মক কোনো বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে আমার তখন মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল হওয়া অবস্থা। ট্রেন নড়ে উঠতেই কিন্তু শার্লক হোমসের সকৌতুক বাণী শুনলাম ঠিক কানের কাছটিতে, 'ভায়া ওয়াটসন, এখনও পর্যন্ত গুড মর্নিং বলনি কিন্তু আমাকে।'

সচমকে ফিরে তাকালাম থুত্থুরে বুড়ো তালের নুড়ো সেই পাদরিটার দিকে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তাঁর মুখের অজস্র চামড়ার ভাঁজ আর বলিরেখা। চিবুকে ঠেকা নাকটা উঠে এল স্বাভাবিক অবস্থায়, নীচের ঠোঁটটা আর ঝুলে রইল না বিশ্রীভাবে, উধাও হল অস্ফুট বকুনি, নিষ্প্রভ চোখে জাগ্রত হল স্ফুলিঙ্গ এবং শিরদাঁড়া ভাঙা কুঁজো চেহারাটা সিধে হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। বুড়ো পাদরির নড়বড়ে চেহারার মধ্যে থেকে যেন জাদুমন্ত্র বলে বেরিয়ে এল শার্লক হোমস।

'কী সর্বনাশ! দারুণ চমকে দিয়েছ!'

চাপা গলায় হোমস বললে, 'হুঁশিয়ার! ওই দেখো মরিয়ার্টি এসে গেছে!'

ট্রেন তখন গড়াচ্ছে। ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল লম্বা মতো এক ব্যক্তি— পাগলের মতো হাত নেড়ে ট্রেন থামাতে চাইল বটে— কিন্তু তখন আর কোনো উপায় নেই। দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল ট্রেন।

হাসতে লাগল হোমস, 'দেখলে তো, এত সাবধান হয়েও ঠিক খবর পেয়েছে ও। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পেরেছি,' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ছদ্মবেশের সরঞ্জাম প্যাক করে ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগের মধ্যে।

বলল, 'ওয়াটসন, সকালের কাগজ দেখেছ?'

'না।'

'বেকার স্ট্রিটের খবর তাহলে শোননি?'

'বেকার স্ট্রিটের আবার কী খবর?'

'কাল রাতে আমাদের ওই দু-খানা ঘরে আগুন লাগানো হয়েছিল। খুব একটা লোকসান অবশ্য হয়নি।'

'বল কী!'

'ওদের লেঠেল পুলিশে ধরা পড়ার পর ভেবেছিল বেকার স্ট্রিটে ফিরে গিয়েছি— তাই আগুন লাগিয়েছিল ঘরে। এখানে এসেছে তোমার পেছন নিয়ে— আমাকে ওরা হারিয়ে ফেলেছিল। যা-যা বলেছিলাম, করেছিলে তো?'

'আরে হ্যাঁ।'

'কালো কোট গায়ে কোচোয়ানটি আমার ভাই মাইক্রফট। এ বিপদে পড়লে ভাড়াটে লোকের চেয়ে নিজের লোক বেশি কাজ দেয়। যাক, এবার মরিয়ার্টিকে নিয়ে ভাবা যাক।'

'মরিয়ার্টি আর আমাদের নাগাল পাবে না।'

'ভুল, বন্ধু, ভুল। মরিয়ার্টিকে কখনো এত ছোটো করে দেখো না— আমার চেয়ে বুদ্ধি তার মোটেই কম নয়। আমি হলে কী করতাম বলো তো?'

'কী?'

'স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করতাম।'

'তাতেও নাগাল পেতে না।'

'ঠিক উলটো। এই ট্রেন ক্যান্টারবেরিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। স্টিমার ছাড়তেও মিনিট পনেরো সময় লাগে। তার মধ্যে ও আমাদের ধরে ফেলবে।'

'খুনি আসামি নাকি আমরা? ওকেই বরং পৌঁছোনোর সঙ্গেসঙ্গে ধরিয়ে দিলে হয় না?'

'তাতে আমার তিন মাসের হাড়ভাঙা খাটনি জলে যাবে। পালের গোদাটিকে ধরতে গিয়ে দলের অন্য রাঘব বোয়ালগুলো জাল কেটে ভাগলবা হবে। কিন্তু যদি সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করি, সব মিঞাকে একসঙ্গে জাল টেনে তোলা যাবে। না হে না, এখন নয়। সবুর করতে হবে।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'ক্যান্টারবেরিতে নেমে যাব। মালপত্র নিয়ে ট্রেন চলে যাক। আমরা নিউহ্যাভেনের ট্রেন ধরে বেরিয়ে পড়ব দেশভ্রমণে। নানাদেশ ঘুরে পৌঁছোব সুইজারল্যান্ডে।'

চোরের মতো এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। কিন্তু তর্ক করলাম না। ক্যান্টারবেরিতে নেমে ট্রেন ছেড়ে দিলাম। নিউহ্যাভেনের ট্রেন তখনও একঘণ্টা পরে। এমন সময়ে চাপা গলায় হোমস বলে উঠল, 'ওয়াটসন, ওয়াটসন, ওই দেখো!'

দেখলাম, দূরের কেন্ট বনানি থেকে উল্কাবেগে ধোঁয়ার পেছনে উড়িয়ে বেরিয়ে আসছে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন। একখানা বগি নিয়ে ছুটছে একটা ইঞ্জিন। তাড়াতাড়ি মালপত্রের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম দুই বন্ধু— মুখের ওপর ধোঁয়া আর বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্পেশ্যাল।

দিগন্তে মিলিয়ে গেল গাড়ি। হোমস বললে, 'তার মানে ঘটে বুদ্ধি একটু কম আছে।'

'তোমার লাইনে ভেবে নিয়ে যদি এখানে থামত প্রফেসর, তাহলে কী হত?'

'আমাকে খুন করত, সে যা বলে গেছে, তাই করত।'

দু-দিন পরে স্ট্রাসবুর্গে[৯] পৌঁছে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে খবর নিল হোমস। ভীষণ রেগে গেল যখন শুনল, প্রফেসর মরিয়ার্টি বাদে সব্বাই ধরা পড়েছে[১০]।

রাগে গরগর করতে করতে টেলিগ্রামখানা ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়ে বললে, 'ওয়াটসন, আমি জানতাম ও পালাবে। আমি থাকলে এমনটা হত না। যাকগে ভায়া, তুমি এবার লন্ডনে গিয়ে রুগি সামলাও। আমাকে একা লড়তে দাও প্রফেসরের সঙ্গে। জীবন মরণের এ-খেলায় তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই না।'

কিন্তু অত সহজে যুদ্ধফেরত একজন প্রাণের বন্ধুকে বিপদের সময়ে ঝেড়ে ফেলা যায় না। শার্লক হোমসও পারল না। ঝাড়া একঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর সেই রাতেই দুই বন্ধু জেনেভার পথে পাড়ি জমালাম।

একদেশ থেকে আর একদেশে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, গ্রাম থেকে গ্রামে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গাড়ি নিয়ে টো-টো করলাম দুই বন্ধু। প্রকৃতির লীলা নিকেতনের সৌন্দর্য কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও শার্লক হোমসের মন থেকে প্রফেসরের চিন্তা দূর করতে পারেনি। বিপদ যে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তা ওর চকিত চাহনি দেখে বুঝেছি। দূর গ্রামাঞ্চলেও প্রতিটি লোকের দিকে সজাগ চাহনি নিক্ষেপ দেখে উপলব্ধি করেছি— কাউকেও বিশ্বাস করছে না। একবার পাহাড়ি পথে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা মস্ত আলগা পাথর গড়িয়ে গিয়ে সশব্দে পড়ল লেকের জলে। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে চারপাশ দেখল হোমস, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। গাইড বললে— ও কিছু নয়। এ-অঞ্চলে ওভাবে পাথরের চাঙড় হামেশা পড়ে। শার্লক হোমস মুখে কিছু বলল না। শুধু হাসল। বিচিত্র সেই হাসি দেখেই বুঝলাম কালান্তক যমদূতের মতো কার করাল ছায়া আঠার মতো লেগে রয়েছে তার সামনে— সে যা ভয় করেছিল তাই সত্যি হতে চলেছে।

মৃত্যু যেকোনো মুহূর্তে আসতে পারে জেনেও বন্ধুবরের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিনি। বরং জীবনে ওকে এমন ফুর্তিবাজ অবস্থাতেও দেখিনি। ঘৃণ্যকীট প্রফেসর মরিয়ার্টির কবল থেকে সমাজকে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করার স্বপ্নে মশগুল থেকেছে অহোরাত্র।

আমাকে বুঝিয়েছে, 'ওয়াটসন, দুঃখ কীসের? জীবনটা তো বাজে নষ্ট করিনি। আমার জন্যেই লন্ডনের লোক এখন থেকে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। আমার সব কীর্তির শেষে যেন একটা কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে— ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ানক চালাক কুচক্রী লোকটাকে আমিই যমালয়ে পাঠিয়েছি অথবা শ্রীঘরে পুরেছি।'

এর পরের ঘটনা সংক্ষেপে সারছি। বিস্তারিত বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। তবে কিছুই বাদ দেব না— খুঁটিয়েই বলব।

তেসরা মে মেরিনজেন[১১] গ্রামে একটা সরাইখানায় উঠলাম। বৃদ্ধ মালিক বললেন, রাইখেনবাক জলপ্রপাতটা যেন দেখে যাই।

চৌঠা মে বিকেল নাগাদ রওনা হলাম রোজেনলাউ[১২] গ্রামের দিকে— যাবার পথে দেখতে গেলাম রাইখেনবাক জলপ্রপাত[১৩]।

সে কী ভয়াবহ দৃশ্য! বুক কেঁপে ওঠে, কানের পর্দা ফেটে যায়, স্মৃতির পর্দায় আতঙ্কের শিহর চিরকালের মতো লেগে থাকে। বরফ মেশানো সবজে জলস্রোত ভীমবেগে বজ্রনাদে ধেয়ে পড়ছে বহু নীচে দু-পাশের কুচকুচে কালো খোঁচা খোঁচা ধারালো বল্লমাকৃতি পাথরের মধ্য দিয়ে।

বাড়িতে আগুন লাগলে যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে, সেইভাবে জলবাষ্প উঠছে তো উঠছেই— সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে বিরাম নেই এক মুহূর্তের জন্যেও— বিরাম নেই বিপুল বেগে বিকট শব্দে ফুটন্ত জলধারার আছড়ে পড়ার মধ্যেও। চাপা গুম গুম সেই বীভৎস শব্দ শুনলে মনে হয় যেন অমানুষিক অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানুষের রক্ত-জল-করা আকাশফাটা বিকট হাহাকার। কিনারায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকলেও মাথা ঘুরে যায়।

পথ মাঝখানে শেষ হয়েছে— প্রপাতের একদম ধার পর্যন্ত না যাওয়া গেলেও প্রপাত দেখতে অসুবিধে হয় না। আমরাও শেষ পর্যন্ত আর গেলাম না। ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে এল একটা সুইস ছোকরা। চিঠি পাঠিয়েছে মেরিনজেন গ্রামে সরাইখানার বুড়ো মালিক। ডাক্তার ওয়াটসন এখুনি এলে বড়ো উপকার হয়। একজন ইংরেজ মহিলা দেশ দেখতে এসে হঠাৎ সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ ডাক্তার ছাড়া সুইস ডাক্তার দেখাতে তিনি রাজি নন। হয়তো আর একটা ঘণ্টা বাঁচবেন। তাহলেও শেষ মুহূর্তে একজন ইংরেজ ডাক্তারকে পাশে চাইছেন।

শার্লক হোমসকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না। কিন্তু মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর শেষ অনুরোধ ঠেলে ফেলাও সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল। হোমস রোজেনলাউ গ্রামে একা চলে যাবে— আমি মেরিনজেনে রুগি দেখে রাতে ওর কাছে যাব।

আসবার সময়ে দেখে এলাম, বুকের ওপর দু-হাত রেখে পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিমেষহীন চোখে দুরন্ত জলস্রোত দেখছে শার্লক হোমস। হায় রে! তখন যদি বুঝতাম এই দেখাই আমার শেষ দেখা!

শেষ ধাপে পৌঁছে আবার ফিরে তাকালাম। জলপ্রপাত আর দেখতে পেলাম না বটে, তবে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দ্রুত পদক্ষেপে উঠে যেতে দেখলাম ওপর দিকে। সতেজ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তার যাওয়াটুকুই কেবল আমি দেখেছি, সবুজের পটভূমিকায় কালো ছায়ার মতো দেহরেখার সবটুকু চোখে পড়েনি। একটু পরে রুগির চিন্তায় লোকটিকে একদম ভুলে গেলাম।

সরাইখানার সামনে পৌঁছোলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ মালিক। আমাকে দেখে সে তো অবাক। চিঠি দেখে আরও অবাক! এ-চিঠি তো তার লেখা নয়! কোনো ইংরেজ মহিলা তো অসুস্থ হয়নি সরাইখানায়!

বললে, 'চিঠিতে সরাইখানার ছাপ রয়েছে দেখছি। বুঝেছি! আপনারা চলে যাওয়ার পরেই লম্বা মতো একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন। নিশ্চয় তিনিই লিখেছেন। বলছিলেন—

আর বলছিলেন! বাকি কথা শোনবার আর সময় নেই তখন। ঝড়ের মতো ছুটলাম যে-পথে এসেছি সেই পথেই। নামতে লেগেছিল এক ঘণ্টা, উঠতে লাগল দু-ঘণ্টা[১৪]। হোমসকে শেষবারের মতো যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেছিলাম, সেখানে গিয়ে শুধু তার ছড়িটা দেখলাম ঠেস দেওয়া অবস্থায় রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সে নেই!

সে নেই! আশেপাশে কোথাও নেই! তিন ফুট চওড়া এই সংকীর্ণ পথের একদিকে মৃত্যুকূপের মতো গভীর খাদ, আর একদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়, দুইয়ের মাঝে কার পথ চেয়ে সে দাঁড়িয়েছিল? প্রফেসর মরিয়ার্টির? সুইস ছোকরা তাহলে চতুর-চূড়ামণি প্রফেসরের চর?

শার্লক হোমস এখন কোথায়?

প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়লেও আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছি নিজেকে। বন্ধুবরের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের। সেই পদ্ধতি অনুসারে দেখলাম পায়ের ছাপ কোথাও আছে কি না।

পেলামও না। দুজন লোকের পায়ের ছাপ পাথুরে রাস্তার পরেই ভিজে কাদার ওপর দিয়ে কিনারা পর্যন্ত গেছে, কিন্তু কোনো ছাপই আর ফিরে আসেনি। দুজনের কেউই কাদা মাড়িয়ে ফেরেনি, অথচ কাদা এত নরম যে পাখি হেঁটে গেলেও দাগ পড়বেই।

গেলাম কিনারা পর্যন্ত। সেখানকার কাঁটাঝোপ আর ফার্ন ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে— কাদায় পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে, যেন প্রকাণ্ড ধস্তাধস্তি করেছে দুই ব্যক্তি। তারপর—

তারপর? মুখ বাড়ালাম সুগভীর খাদের অতল গহ্বর পানে। উত্থিত জলবাষ্প ফোয়ারার মতো ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল আমার মুখ, অর্ধ-মানবিক বিকট হাহাকারে ফেটে গেল যেন কানের পর্দা—

ফাঁকে-ফোকরে দৃষ্টিসঞ্চালন করেও চিহ্ন দেখতে পেলাম না কারো। বার বার বুকফাটা চিৎকার করেও সাড়া পেলাম না কারো। হোমস সাড়া দিল না আমার ডাকে। শুধু বাতাস গুঙিয়ে উঠল। প্রপাত কেঁদে চলল। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ দূরে মিলিয়ে গেল।

ফিরে এলাম। কী অবস্থায় ফিরলাম, তা শুধু আমিই জানি, আর ভগবান জানেন। হোমসের ফেলে যাওয়া ছড়ির কাছে ওর চকচকে সিগারেট কেসটাও রয়েছে দেখলাম। তলায় একটা চৌকোনা কাগজে মুক্তাক্ষরে লেখা আমার নামে একটা চিঠি। খুব যত্ন করে যেন বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে বসে গুছিয়ে শেষ চিঠি লিখে গেছে শার্লক হোমস।

ভায়া ওয়াটসন,

হিসেব-নিকেশ করার জন্যে মরিয়ার্টি বসে রয়েছে, এই চিঠিখানা লেখবার সুযোগ সে-ই দিয়েছে। ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে আমার গতিবিধির খবর সে রেখেছিল এখুনি তা বুঝিয়ে দিল। প্রফেসরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে চিরকালই আমার ধারণা ভালো। এই কাহিনি শুনে তা দৃঢ়তর হল। এই শেষ মুহূর্তেও একটা কথা ভেবে খুশি না হয়ে পারছি না। এইরকম একটা দুর্দান্ত কুশলী ব্যক্তির করাল ছায়া থেকে অবশেষে সমাজকে আমি চিরতরে রেহাই দিতে যাচ্ছি— যদিও তার জন্যে খেসারত দিতে হবে বড্ড বেশি এবং আমার বন্ধুবান্ধবরা[১৫] প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাবে— বিশেষ করে দুঃখে ভেঙে পড়বে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তুমি। আগেই তোমাকে বলেছি, এ-জীবনের সবচেয়ে বড়ো সংকটে এসে ঠেকেছে আমার কর্মজীবন এবং এইটাই এর একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি, আমার কীর্তিময় জীবনের পরিসমাপ্তিও সূচিত হবে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এবং তার চাইতে আনন্দময় ব্যাপার আমার কাছে আর কিছুই নেই। তোমার কাছে আর লুকোব না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম মেরিনজেন থেকে আসা চিঠিটা স্রেফ ভাঁওতা। তা সত্ত্বেও তোমাকে যেতে দিয়েছিলাম শেষ লড়াই লড়ব বলে। ইনস্পেকটর প্যাটারসনকে বলবে পুরো দলটাকে দায়রা সোপর্দ করার উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ একটা নীল খামে ভরে 'এম' চিহ্নিত খুপরিতে রেখেছি, খামের ওপর মরিয়ার্টির নাম লেখা আছে। ইংলন্ড ত্যাগের আগেই আমার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি উইল[১৬] করে আমার দাদা মাইক্রফটকে দিয়ে এসেছি। মিসেস ওয়াটসনকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো এবং তুমি নিজে জেনো জনমে মরণে আমি তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে রইলাম।

তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ— শার্লক হোমস

এর পরের কাহিনি অল্প কথাতেই শেষ করে দিচ্ছি। বিশেষজ্ঞরা লণ্ডভণ্ড কাদামাটি পরীক্ষা করে একবাক্যে বললেন, সত্যিই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট চলেছিল সেখানে। ওই

'শার্লক হোমসের মৃত্যু।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৮৯৩

অবস্থাতে মারপিট ছাড়া আর পথও ছিল না। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে গড়াতে একসঙ্গে ঠিকরে গেছে খাদের মধ্যে। নশ্বর দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব নয়[১৭]। ঘুরপাক খাওয়া জল আর উত্তাল ফেনায় ভরা ভয়ংকর ওই কটাহের অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে থাকবে এ-শতাব্দীর সবচেয়ে বিপজ্জনক অপরাধী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। সেই সুইস তরুণটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ছোকরা যে প্রফেসর মরিয়ার্টির অগুনতি মাইনে করা স্যাঙাতের অন্যতম, তাতে আর সন্দেহ নেই। কুখ্যাত দলটির পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল জনগণ তা ভালো করেই জানেন। দেশের লোক কোনোদিন ভুলতে পারবে না লোকান্তরিত মহাপুরুষ শার্লক হোমস সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণের দৌলতে কীভাবে সংগঠনের সমস্ত দুষ্কর্ম ফাঁস হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে কড়া সাজা পায়। মৃত্যুর পরেও এইভাবে বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে গেল আমার আশ্চর্য বন্ধুটি— দেখিয়ে দিল মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে ফুরিয়ে যায়নি তার ক্ষমতার প্রভাব। মহাপাপিষ্ঠ দলপতিটি সম্বন্ধে খুব একটা সংবাদ মামলা চলার সময়ে প্রকাশ পায়নি। তাই কিছু অবিবেচক সমর্থক উঠে পড়ে লেগেছিল যাতে তার স্মৃতি চিরউজ্জ্বল থাকে জনগণ মানসে। কিন্তু এই করতে গিয়ে এমন একজনকে তারা আক্রমণ করে চলেছে যার চাইতে জ্ঞানী আর সেরা পুরুষ আমার জীবনে আর আসেনি। প্রফেসর মরিয়ার্টির স্বরূপ আর শেষ দ্বন্দ্বের মর্মন্তুদ এই কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলাম শুধু সেই কারণেই।

টীকা

১. **শার্লক হোমস বিদায় নিলেন :** 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ডের ১৮৯৩-এর ক্রিসমাস সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **কর্নেল জেমস মরিয়ার্টি :** প্রেফেসর মরিয়ার্টির প্রথম নাম এই গল্পে কোথাও বলা হয়নি। হয়েছে পরবর্তী গল্প 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এম্‌টি হাউস' গল্পে। সেখানে ভাইয়ের মতো প্রেফেসর মরিয়ার্টিকেও 'জেমস' বলা হয়েছে।

৩. **রয়টার :** জার্মান ব্যাঙ্ক কেরানি পল জুলিয়াস রয়টার ১৮৫১-র অক্টোবরে রয়টার্স টেলিগ্রাম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিকভাবে এই কোম্পানি বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এবং জার্মানির আখেন শহরের মধ্যে শেয়ারের দর জানাত। পরে এই সংস্থা আরও বড়ো হয় এবং সংবাদ সংস্থা হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে।

৪. **এয়ারগান :** ১৫৩০ সালে নুরেমবার্গের 'গুটের' সংস্থা প্রথম এয়ারগান তৈরি করে। ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজরা হাঁটতে বেরোনোর ছড়ির মধ্যে এয়ারগান লুকিয়ে রাখতেন।

৫. **জন্মেও না :** 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' উপন্যাসের ঘটনা 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম'-এর আগের সময়কার বলে গবেষকরা মনে করেন। তাই যদি হয়, তাহলে হোমস এবং ওয়াটসনের কথোপকথনের এই অংশ সম্পূর্ণ অবান্তর এবং অযৌক্তিক। কিংবা সম্পূর্ণ ভুল ওই অনুমান।

৬. **বাইনোমিয়াল থিয়োরেম :** স্যার আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক ১৬৭৬ সালে প্রণীত বীজগণিতের সূত্র।

৭. **মাথার সামনের দিকটা ভেবেছিলাম আরও পরিণত হবে :** ভিক্টোরীয় যুগের ইংলন্ডে প্রচলিত, ফ্রান্‌জ জোসেফ গল প্রচলিত, মগজের আকৃতি এবং মাথার খুলির আকার বা আয়তন থেকে মানুষের বুদ্ধি, সম্মানজ্ঞান, বা অন্যান্য বিষয় বিচারের বিজ্ঞান ফ্রেনোলজির (Phrenology) বিচারে শার্লক হোমসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সম্ভবত মরিয়ার্টির উক্তি।

৮. **লাউডার আর্কেড :** স্ট্র্যান্ড-এ অবস্থিত লন্ডন শহরের একটি বাজার এলাকা।

৯. **স্ট্রাসবুর্গ :** ফ্রান্সের লোয়ার অ্যালসেশিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন শহর। ইল নদীর তীরবর্তী এই শহরের ইতিহাস বহু শতাব্দীর পুরোনো এবং এখানে ছয় লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১০. **সব্বাই ধরা পড়েছে :** 'সব্বাই' নয়। কর্নেল সিবাস্টিয়ান মোরান এবং পার্কার ধরা পড়েনি। হোমস-সিরিজের পরবর্তী কাহিনি 'দ্য এম্‌টি হাউস' দ্রষ্টব্য।

১১. **মেরিনজেন :** রাইখেনবাক প্রপাতের নিকটবর্তী এই শহর ইন্টারলাকেন-মেরিনজেনবাহ্‌ন ন্যারো গেজ শাখা রেলপথের প্রান্তিক স্টেশন। এই শহর সুইজারল্যান্ডের বার্ন এলাকার অন্তর্গত।

১২. **রোজেনলাউ :** আল্পস পাহাড়ে রাইখেনব্যাশাল উপত্যকার সর্বোচ্চ জনপদ রোজেনলাউ।

১৩. **রাইখেনবাক জলপ্রপাত :** সুইজারল্যান্ডের এই প্রপাতে 'আর' (Aar) নদী ঝাঁপিয়ে পড়েছে আড়াইশো মিটার উঁচু থেকে। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হওয়ায় কখনো জলের তোড় কমে আসে। শার্লক হোমসের কাহিনি আরও বিখ্যাত করেছে এই পর্যটনক্ষেত্রকে।

১৪. **উঠতে লাগল দু-ঘণ্টা :** হোমস-গবেষক লেসলি এস. ক্লিংগার জানিয়েছেন মেরিনজেন-এ অবস্থিত হোটেল রাইখেনবাক থেকে রাইখেনবাকের লোয়ার ফলস হেঁটে পৌঁছোতে পনেরো মিনিট লাগে। আর আপার ফলস পৌঁছোতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

১৫. **বন্ধুবান্ধবরা :** 'দ্য পাইপ অরেঞ্জ পিপস' গল্পে হোমস নিজের মুখে বলেছিলেন যে ওয়াটসন ছাড়া তাঁর আর কোনো বন্ধু নেই।

১৬. **উইল :** জুন ১৯৫৫ সংখ্যার লন্ডন মিস্ট্রি ম্যাগাজিনে শার্লক হোমসের শেষ উইল প্রকাশিত হয়। দেখা যায় তাতে ওয়াটসনকে পাঁচ হাজার পাউন্ড এবং হোমসের কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।

১৭. **দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব নয় :** রাইখেনবাক জলপ্রপাত যথেষ্ট উত্তাল হয়ে থাকলেও ওই জলধারা শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে ব্রিন্‌জ লেক-এ। যেখানে জল বদ্ধ এবং শান্ত। রাইখেনবাক-এ কেউ পড়ে গেলে তা শেষ পর্যন্ত ব্রিন্‌জ লেক-এ এসে পড়বে এবং সেখানে সেই দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস

মোর‍্যানের মারাত্মক হাতিয়ার[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এম্পটি হাউস]

১৮৯৪ সালের বসন্তকাল।

অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডোয়ারের হত্যায় দুনিয়ার সমস্ত শৌখিন সমাজে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল, সাড়া পড়ে গেছিল লন্ডনের আপামর জনসাধারণের মধ্যে। যেরকম অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে তিনি খুন হয়েছিলেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না।

দীর্ঘ দশ বছর বাদে আজ আমি অনুমতি পেয়েছি সারি সারি পরস্পরনির্ভর আশ্চর্য ঘটনাগুলোর হারিয়ে যাওয়া অংশগুলো লেখবার।

প্রথমেই সবাইকে জানিয়ে রাখি, দীর্ঘদিন ধরে এই চাঞ্চল্যকর কাহিনি চেপে রাখার জন্যে আমার কোনো দোষ নেই। অতীতে যে অতি আশ্চর্য পুরুষটির অনন্যসাধারণ চিন্তাধারা আর কার্যকলাপের একটু আধটু খবর জানিয়ে সবার চিত্তবিনোদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এ-কাহিনি না-লেখার সুকঠিন নির্দেশ পেয়েছিলাম তার নিজের মুখ থেকেই। আজ তা লিখতে বসেছি, কেননা গত মাসের তিন তারিখে সে নিজেই এ-নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে আমার লেখনীর ওপর থেকে।

অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার আর্ল অফ মেনুথের দ্বিতীয় পুত্র। আর্ল অফ মেনুথ সে সময়ে অস্ট্রেলিয়ার একটা কলোনির গভর্নর ছিলেন। অ্যাডেয়ারের মা অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে এসেছিলেন চোখের ছানি অপারেশন করাতে। ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে[২] ছেলে রোন্যাল্ড আর মেয়ে হিলডাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। সমাজের সেরা মহলে ঘোরাফেরা করত রোন্যাল্ড। এবং যতদূর জানা যায়, তাঁর কোনো বিশেষ বদঅভ্যাস ছিল না, কোনো শত্রুও ছিল না। কারস্টেয়ার্সের মিস এডিথ উডলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে-সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় মাস কয়েক আগে উভয়পক্ষের সম্মতি নিয়ে। এবং এর ফলে রোন্যাল্ডের মনে যে কোনো দাগ পড়ছে তারও কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। সবাই জানত, রোন্যাল্ড খুব সীমিত এবং সনাতন পরিধির মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে ভালোবাসেন— কেননা আবেগের কোনো বালাই ছিল না তাঁর প্রকৃতিতে। স্বভাবটিও ছিল বেশ শান্ত। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট তরুণ অভিজাতের শিরে নেমে এল মৃত্যুর পরোয়ানা— এল অত্যন্ত আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ১৮৯৪ সালের তিরিশে মার্চ রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে।

তাস খেলতে ভালোবাসতেন রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ার। একটানা খেলে যেতেন, কিন্তু চোট খাওয়ার মতো ঝুঁকি কখনো নিতেন না। বল্ডউইন, ক্যাভেন্ডিস আর বাগাটেলী ক্লাবের[৩] সভ্য ছিলেন তিনি। জানা গেছে, মৃত্যুর দিন বাগাটেলী কার্ড ক্লাবের ডিনারের পর রাবার অফ হুইস্ট খেলেছিলেন রোন্যাল্ড। বিকেলেও তাঁকে খেলতে দেখা গেছে সেখানে। খেলার সাথি ছিলেন মি. মারে, স্যার জন হার্ডি এবং কর্নেল মোর‍্যান। এঁদের কথা থেকেই জানা যায় যে হুইস্ট খেলেছিলেন

রোন্যাল্ড এবং খেলাতে মোটামুটি সমানভাবে পড়েছিল সবার তাস। অ্যাডেয়ার খুব জোর পাঁচ পাউন্ড হেরে থাকতে পারেন— তার বেশি নয়। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল এবং এ সামান্য ক্ষতিতে মুষড়ে যাবার মতো মানুষ তিনি নন। প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা ক্লাবে তাস খেলতেন রোন্যাল্ড। কিন্তু এমনই সাবধানী খেলোয়াড় তিনি যে বড়ো-একটা হারতেন না— পকেট ভারী করে তবে টেবিল ছাড়তেন। আরও জানা গেল যে, হপ্তাখানেক আগে কর্নেল মোর্য়ানকে পার্টনার নিয়ে এক হাত থেকেই গডফ্রে মিলনার এবং লর্ড ব্যালমোরালের[8] কাছ থেকে প্রায় চারশো কুড়ি পাউন্ড জিতেছিলেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলতে তদন্তের ফলে এই সবই জানা গেছিল তাঁর সম্বন্ধে।

খুনের রাতে ক্লাব থেকে ঠিক দশটায় বাড়ি ফিরে আসেন অ্যাডেয়ার। মা আর বোন বেরিয়েছেন কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে। তিনতলায় সামনের ঘরটা সাধারণত তাঁর বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়— পরিচারিকা এই ঘরেই ঢোকবার শব্দ শুনেছে। আগেই ঘরে চুল্লি জ্বেলে দিয়েছিল সে, ধোঁয়া হচ্ছিল বলে জানলাটাও খুলে এসেছিল। রাত এগারোটা কুড়ি মিনিটে লেডি মেনুথ আর তাঁর মেয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো শব্দ শোনা গেল না ঘর থেকে। শুভরাত্রি জানাবার জন্যে লেডি মেনুথ ছেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়া। চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়ে কোনো সাড়াশব্দ যখন পাওয়া গেল না, তখন লোকজন ডেকে জোর করে খোলা হল দরজা। টেবিলের কাছে পড়ে ছিলেন হতভাগ্য রোন্যাল্ড। রিভলভারের বুলেটে বীভৎসভাবে বিকৃত হয়ে গেছিল তাঁর মাথার খুলি। ঘরের মধ্যে কিন্তু ও-জাতীয় কোনো হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেবিলের ওপর দশ পাউন্ডের দুটো নোট পড়ে ছিল— আর ছিল ছোটো ছোটো থাকে সাজানো সোনা রুপোয় মিশানো সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং। একটা কাগজে কতকগুলো সংখ্যা বসানো ছিল— পাশে পাশে লেখা কয়েকজন ক্লাবের বন্ধুর নাম। কাজেই ধরে নেওয়া হল, মৃত্যুর আগে তাসের জুয়োর হারজিতের একটা মোটামুটি খসড়া করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

মিনিটখানেক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল কেসটা। প্রথমত ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব এ-কাজ খুনির। খুনের পর খোলা জানলা দিয়ে উধাও হয়েছে সে দরজায় চাবি যেমন ছিল তেমনি রেখে। মাটি থেকে কম করে বিশ ফুট উঁচুতে জানলাটা। অবশ্য জানলার ঠিক নীচেই ফুলে ফুলে ঢাকা ক্রোকাসের একটি ঝোপ ছিল। বিশ ফুট উঁচু থেকে সেখানে কেউ লাফিয়ে পড়লে ফুল-টুল ছিঁড়ে ঝোপ তো লন্ডভন্ড হতই, মাটিতেও গভীর পায়ের ছাপ পাওয়া যেত। কিন্তু সে-রকম কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। ঝোপের মধ্যে দিয়ে ইদানীং কেউ হেঁটেছে বলেও মনে হল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, অ্যাডেয়ার নিজেই দরজায় চাবি দিয়েছিলেন ভেতর থেকে। তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যু এল কোন পথে? কোনোরকম চিহ্ন না-রেখে কারো পক্ষেই কিছু বেয়ে জানলায় উঠে আসা সম্ভব নয়। ধরা যাক জানলা দিয়ে কেউ গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর খুলি। তাহলে তো হত্যাকারীর হাতের টিপ অসাধারণ বলতে হবে! কেননা, রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ে এ-রকম মরণ ঘা দেওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে জনবহুল পার্ক লেনে কেউ-না-কেউ গুলির আওয়াজ নিশ্চয় শুনতে পেত। বাড়ি

থেকে শ-খানেক গজের মধ্যে ভাড়াটে গাড়ির একটা আড্ডা আছে। সেখান থেকেও ফায়ারিং-এর কোনো শব্দ শোনা যায়নি। সব ঠিক। কিন্তু তবুও রিভলভারের বুলেটেই মারা গেছেন অ্যাডেয়ার। মারা গেছেন নিতান্ত আচম্বিতে খুদে কালান্তকের চকিত চুম্বন পলকের মধ্যেই অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারের দেহ থেকে মুছে নিয়ে গেছে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন।

এই হল পার্ক লেন রহস্য। খুনের পেছনে কোনো মোটিভ পাওয়া যায়নি, কেননা আমি আগেই বলেছি রোন্যাল্ডের কোনো শত্রু ছিল না। তা ছাড়া তাঁর ঘরের টাকাপয়সা সরানোরও কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। কাজেই, মোটিভের কোনো নামগন্ধ না-থাকায় আরও জটিল হয়ে উঠেছে এই আশ্চর্য রহস্য।

সারাদিন ধরে শুধু এই সবই ভাবলাম বার বার[৫]। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, যে-পরিমাণে মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোকে কষ্ট দিলাম, সে-অনুপাতে সমস্যার সুরাহা বলতে গেলে কিছুই হল না।

সন্ধের দিকে বেড়াতে বেড়াতে পার্কের দিকে এসেছিলাম। ছ-টা নাগাদ এসে পৌঁছোলাম পার্ক সেন আর অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে। ফুটপাথের ওপর এক দঙ্গল উঞ্ছ প্রকৃতির লোককে দেখলাম ভিড় করে একদৃষ্টে ওপরতলার বিশেষ একটা জানলার পানে তাকিয়ে থাকতে। বুঝলাম যে-বাড়ির সন্ধানে আসা এ সেই বাড়ি। পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা লেগে গেল আধবুড়ো এক কুঁজোর সঙ্গে। আমার ঠিক পেছনেই একগাদা বই হাতে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ধাক্কা লেগে কয়েকটা বই ছত্রাকার হয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে দেখলাম আমার কাছে বইগুলোর যে-দামই থাকুক না কেন এবং তাদের সঙ্গে আমি যত খারাপ ব্যবহারই করি না কেন, আধবুড়ো গ্রন্থকীট ভদ্রলোকের কাছে তাদের দাম অপরিসীম। কেননা, আমার কথা শুরু হতে-না-হতেই দাঁত খিঁচিয়ে দারুণ ঘৃণায় এক হুংকার ছেড়ে পেছন ফিরে পা চালালেন ভদ্রলোক ভিড়ের দিকে। পেছন থেকে ভিড়ের মধ্যে আমি শুধু দেখতে পেলাম তাঁর সাদাকালো কোঁকড়ানো জুলপি জোড়া।

পার্ক লেনের ৪২৭ নম্বর বাড়ি দেখে আমার আসল সমস্যার কোনো সুরাহাই হল না। রাস্তা আর বাড়ির মাঝে রেলিং লাগানো একটা নীচু পাঁচিল দেখলাম। তাও সব মিলিয়ে পাঁচ ফুটের উঁচু নয়। কাজেই রেলিং টপকে যে কেউ অনায়াসেই ঢুকতে পারে বাগানে, কিন্তু জানলার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কেননা, জলের পাইপ কি ওই জাতীয় কিছুই দেখতে পেলাম না ধারেকাছে। আগের চেয়ে আরও বেশি হতভম্ব হয়ে ফিরে এলাম কেনসিংটনে। পাঁচ মিনিটও হয়নি আমার স্টাডিতে বসেছি আমি, এমন সময়ে পরিচারিকা এসে খবর দিলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আমার সঙ্গে।

ঘরে ঢুকলেন যিনি তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পার্ক লেনের সেই অদ্ভুত প্রকৃতির আধবুড়ো গ্রন্থকীট। লম্বা লম্বা পাকা চুলের মাঝে ধারালো কঠিন মুখ। ডান বগলে ডজনখানেক তাঁর সেই মহামূল্যবান কেতাব।

কীরকম যেন অদ্ভুত কর্কশ স্বরে শুধোলেন, 'আমাকে দেখে বেজায় অবাক হয়ে গেলেন দেখছি?'

'যে বইগুলো তিনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ধাক্কা লেগে তার কয়েকটা পড়ে গেল।'
চার্লস রেমন্ড ম্যাকলে, রিটার্ন অফ শার্লক হোমস (ম্যাক ক্লিওর, ফিলিপস, ১৯০৫)

স্বীকার করলাম যে কিছুটা হয়েছি বই কী।

'কিছু মনে করবেন না স্যার, বিবেকের কামড় সইতে না-পেরে আসতে হল আমায়। আপনার পিছু পিছু আসছিলাম আমি। আপনাকে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়তে দেখে ভাবলাম বলে যাই আমার রুক্ষ ব্যবহারে যেন কিছু মনে না-করেন। আপনার ওপর মোটেই রাগ করিনি আমি, বরং বইগুলো তুলে দেওয়ার জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞ।

'আমি আপনার প্রতিবেশী। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে আমার বইয়ের দোকানটা হয়তো দেখে থাকবেন আপনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই খুব খুশি হলাম, স্যার। আপনারও হয়তো বই কেনার বাতিক থাকতে পারে। এই দেখুন 'ব্রিটিশ বার্ড', 'ক্যাটাল্লাস', আর 'হোলি ওয়ার'— প্রতিখানা বাড়িতে রাখার মতো। পাঁচখানা বই দিয়ে আপনার দ্বিতীয় সেল্‌ফের ওই ফাঁকটা ভরাট করে ফেলতে পারেন। বড়ো নোংরা লাগছে, কি বলেন স্যার?'

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের ক্যাবিনেটটা দেখে আবার যখন সামনে তাকালাম দেখলাম আমার পানে হাসিমুখে তাকিয়ে স্টাডি-টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শার্লক হোমস।

দাঁড়িয়ে উঠে সেকেন্ড কয়েক রীতিমতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। তারপরেই বোধ হয় জীবনে সেই প্রথম এবং শেষবারের মতো অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। ধোঁয়াটে রঙের খানিকটা কুয়াশা ঘুরপাক খেয়ে উঠল চোখের সামনে! কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে

যেতে দেখলাম আমার কলারের বোতাম খোলা এবং ঠোঁটের ওপর ব্র্যান্ডির চনচনে স্বাদ। ফ্লাস্ক হাতে ঝুঁকে পড়ে আমার চেয়ারে বসে ছিল হোমস।

শুনলাম সেই পরিচিত স্বর যা কোনোদিনই ভোলা যায় না, 'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আমার ঘাট হয়েছে, ক্ষমা করো আমায়। তুমি যে এ-রকম শক পাবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।'

সজোরে আঁকড়ে ধরলাম তার হাত।

'হোমস! সত্যিই তুমি তো? বাস্তবিকই কি তুমি বেঁচে আছ? শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর খাদ বেয়ে উঠে আসতে পেরেছিলে তুমি?'

'সবুর! সবুর! এসব কথা আলোচনা করার মতো অবস্থায় আছ তো? আবির্ভাবটা এতটা নাটকীয় করার কোনো দরকার ছিল না। বড়ো জোরালো শক দিয়ে ফেলেছি তোমায়।'

'কিস্সু হয়নি আমার। কিন্তু, হোমস, আমি যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না ভাই। গুড হেভেনস আমি ভাবতেও পারিনি কোনোদিন যে তুমি... তুমি আবার এসে দাঁড়াবে আমার স্টাডিতে', সজোরে আবার তার বাহু আঁকড়ে ধরে শিরাবহুল সরু পাকানো হাতে হাত বুলিয়ে বললাম, 'না, তুমি আর যাই হও, প্রেত নয়। বলো কীভাবে সেই ভয়াবহ খাদের ভেতর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলে।'

আমার উলটোদিকে বসে হোমস তার পুরোনো কায়দায় যেন কিছুই হয়নি এমনি উদাসীন ভাবে একটা সিগারেট ধরালে। পরনে তার বইয়ের দোকানির জীর্ণ ফ্রক কোট। বাকিটুকু, অর্থাৎ চুলের রাশি আর পুরোনো বইয়ের গাদা, পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। হোমসকে আগের চাইতেও রোগা এবং সজাগ মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাক, ধারালো চিবুক আর শুকনো মুখে মৃতের মুখের মতো পাণ্ডাশপানা রক্তহীনতা লক্ষ করে বুঝলাম ইদানীং খুব স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

সিগারেটা ধরিয়ে বলল হোমস, 'গা এলিয়ে বসে বাঁচলাম, ওয়াটসন। লম্বা মানুষের পক্ষে পুরো এক ফুট ছেঁটে ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয় করে যাওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। যাক, ভাই, তোমার সাহায্য আমার এখন দরকার। আজ রাতেই অত্যন্ত কঠিন আর বিপজ্জনক অভিযানে তোমাকে পাশে না-পেলে আমার চলবে না। কাজটা শেষ হলে, সমস্ত কিছু খুলে বলাই ভালো, কি বল?'

'কৌতূহলের চাপে ফেটে মরে যাব আমি। যা বলবার এখনই বলো।'

'আজ রাতে আমার সঙ্গে আসছ তো?'

'এক-শোবার। যখনই বলবে, যেখানেই বলবে— আমার অমত নেই।'

'বাস্তবিকই পুরোনো দিনগুলো যেন আবার ফিরে এল। যাবার আগে চটপট হাত চালিয়ে ডিনারটাও খেয়ে যেতে হবে। বেশ, তাহলে শুরু হোক খাদ-প্রসঙ্গ। খাদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে আমায় খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ওয়াটসন। কারণ জলের মতো সরল। খাদের ভেতর আমি কোনোদিনই পড়িনি।'

'খাদের মধ্যে পড়ইনি?'

'না, ওয়াটসন, কোনোদিনই না। তোমাকে যে-চিরকুটা লিখে গেছিলাম, তাতেও কোনো মিথ্যা ছিল না। যে সরু পথটা বেয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোনো যায়, ঠিক তার মুখটাতে যখন

পরলোকগত প্রফেসর মরিয়ার্টির শয়তান মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখন অবশ্য আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে আমার লীলাখেলা শেষ হয়ে এসেছে। লোকটার গ্র্যানাইট কঠিন ধূসর চোখে দেখলাম চাপা ফন্দির ঝিলিক। দু-চারটে কথা বলার পর প্রফেসরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছোট্ট চিরকুটটা লিখে ফেললাম— এই চিরকুটটাই তোমার হাতে পৌঁছেছিল। সিগারেটের বাক্স আর বেড়াবার ছড়িসমেত চিরকুটটা রেখে সরু পথ বরাবর এগিয়ে গেলাম— পিছু পিছু এলেন মরিয়ার্টি। পথের শেষে একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালাম হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে। কোনো হাতিয়ার না-নিয়ে সিধে আমার দিকে দৌড়ে এসে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে আমায় জাপটে ধরলেন তিনি। তাঁর খেল যে খতম হয়েছে, তা মরিয়ার্টি ভালোভাবেই জানতেন, তাই যেনতেনপ্রকারেণ প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। পড়ো পড়ো হয়ে সেই সরু কিনারায় দাঁড়িয়ে কোনোরকমে তাঁর ধাক্কা সামলে নিলাম। তুমি তো জানই আমি একটু-আধটু বারিৎসু[৬] জানি। জাপানি পদ্ধতিতে কুস্তির এই বিশেষ কায়দা বহুবার আমি কাজে লাগিয়েছি অনেক সঙ্গিন পরিস্থিতিতে। আমাকে জাপটে ধরার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই পড়ো পড়ো হয়েও চট করে পিছলে বেরিয়ে গেলাম তাঁর আলিঙ্গন থেকে। বিকট চিৎকার করে প্রফেসর কয়েক সেকেন্ড পাগলের মতো হাত ছুড়লেন, দু-হাতের আঙুল বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরলেন বাতাসকে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও দেহের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তিনি, তলিয়ে গেলেন নীচে! কিনারা থেকে মুখ বাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে পড়তে দেখলাম। তারপর একটা পাথরে লেগে ঠিকরে গিয়ে ঝপাস করে তলিয়ে গেলেন জলের তলায়।'

বড়ো বড়ো চোখ করে হতবাক হয়ে শুনছিলাম হোমসের যমালয় থেকে জীবন্ত ফিরে আসার কাহিনি। সিগারেট টানার ফাঁকে রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেছিল সে।

থামতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কিন্তু পায়ের ছাপ! আমি নিজের চোখে দেখেছি দু-জোড়া পায়ের ছাপ কিনারা পর্যন্ত গেছে— কোনোটাই কিন্তু ফেরেনি।'

'ফিরেছিল অন্য পথে। প্রফেসর অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতোই বুঝলাম দৈবের কৃপায় কী অসাধারণ সুযোগ এসে গেছে আমার হাতের মুঠোয়। আমাকে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখানোর শপথ যে মরিয়ার্টি একা করেননি, তা আমি জানতাম। নেতার মৃত্যুতে অন্তত পক্ষে তিনজনের প্রতিশোধ-স্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে! তিনজনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির মানুষ। এদের মধ্যে একজন-না-একজন আমাকে শেষ করবেই আর যদি উলটো দিক থেকে ভাবা যায়, অর্থাৎ দুনিয়ার সবাই যদি জানতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে, আমিও পরলোকের পথে রওনা হয়েছি, তাহলে এই লোকগুলোও আরও বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করবে। ফলে, একদিন-না-একদিন আমি তাদের সাবাড় করবই। এবং তিনজনকে খতম করতে পারলেই দুনিয়াকে আবার জানিয়ে দেওয়া যাবে যে, আমি মরিনি, এই সুন্দর ভুবনেই দিব্যি বেঁচে আছি আর পাঁচজনের মতো। মস্তিষ্কের কাজ যে কত দ্রুত হতে পারে তা বুঝলাম সেদিন, কেননা আমার বিশ্বাস প্রফেসর মরিয়ার্টি 'রাইখেনবাক্ ফল'-এর তলা পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই এতগুলো জিনিস ভাবা আমার শেষ হয়ে গেল।

'দাঁড়িয়ে উঠে পেছনের পাথুরে দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখলাম। মাস কয়েক পরে এই দুর্ঘটনার ছবির মতো বিবরণ তোমার রচনায় পড়ে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। তুমি লিখেছিলে

যে, পাথুরে দেওয়ালটা খাড়া উঠে গেছে। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। কেননা পা রাখবার ছোটো ছোটো জায়গা তো ছিলই, তাকের মতো খানিকটা পাথরও বেরিয়ে এসেছিল। পাহাড়টা এমনই খাড়াই যে, আগাগোড়া বেয়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব, ঠিক তেমনই অসম্ভব ভিজে পথে পায়ের ছাপ না-রেখে বেরিয়ে পড়া। এ-রকম ক্ষেত্রে এর আগে আমি যে-চালাকি করেছি, তা করতে পারতাম। অর্থাৎ স্রেফ পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু একইদিকে তিনজোড়া পায়ের ছাপ এগিয়ে যাওয়া দেখলেই চালাকি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কাজেই সব দিক ভেবে, দেখলাম পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠাই সবচেয়ে ভালো। ভাই ওয়াটসন, কাজটা খুব মজার নয়। নীচ থেকে জলপ্রপাতের গর্জন এসে আছড়ে পড়ছিল কানের পর্দায়। বাজে কল্পনা আমার মাথায় কোনোদিন আসে না কিন্তু বিশ্বাস কর, সেদিন যেন শুনলাম খাদের গহ্বর থেকে আর্তনাদ করে আমায় ডাকছে মরিয়ার্টির কণ্ঠ। একটু সামান্য ভুল মানেই মৃত্যু। একাধিকবার ঘাসের চাপড়া উপড়ে এসেছে হাতের মুঠোয় অথবা পাহাড়ের ভিজে খাঁজে হড়কে গেছে বুটের ডগা— প্রতিবারই ভেবেছি এই বুঝি সব শেষ। কিন্তু কিছুতেই না-দমে অতিকষ্টে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরে উঠে শেষকালে পৌঁছোলাম সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা কয়েক ফুট গভীর একটা পাথরের তাকে। দিব্যি আরামে সবার চোখের আড়ালে থেকে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম এইখানে। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এইখানেই শুয়ে শুয়ে দেখলাম কী গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অথচ কী বিশ্রী আনাড়িভাবে আমার মৃত্যুর তদন্ত শেষ করলে তুমি।

'অনেকক্ষণ পরে শেষকালে তোমার অকাট্য কিন্তু আগাগোড়া ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলে। একলা শুয়ে শুয়ে তোমায় যেতে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে। ভেবেছিলাম আমার অ্যাডভেঞ্চারের ইতি বোধ হয় এইখানেই। কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে বুঝলাম বিস্ময়ের এখনও অনেক বাকি। ওপর থেকে বিরাট একটা পাথরের চাঁই গড় গড় করে গড়িয়ে এসে সাঁৎ করে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দমাস করে পড়ল নীচের পথে এবং পর মুহূর্তেই ছিটকে গিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। মুহূর্তের জন্য ভাবলাম বুঝি নিছক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওপরে তাকিয়ে দেখলাম কালো হয়ে আসা আকাশের পটে একজন পুরুষের মাথা, সঙ্গেসঙ্গে গড়িয়ে এল আর একটা পাথর, এসে পড়ল যে-তাকটায় শুয়ে ছিলাম ঠিক তার ওপরেই মাথার এক ফুট দূরে। চকিতে বুঝলাম সব। মরিয়ার্টি একা আসেননি। তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল তাঁরই একজন স্যাঙাত। একনজরেই চিনেছিলাম লোকটাকে। কী ভীষণ প্রকৃতির লোক সে, তা ওই একবার দেখেই বুঝেছিলাম। আমার চোখের আড়ালে থেকে দূর থেকে সে দেখেছে তার বন্ধুর মৃত্যু এবং আমার পলায়ন। হুট করে কিছু না-করে অপেক্ষা করছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। তারপর খাড়াই পাহাড়ের একেবারে ওপরে উঠে কমরেডের অসমাপ্ত কাজটাই সম্পূর্ণ করতে শুরু করেছে।

'ওয়াটসন, এসব কথা ভাবতে আমার বেশি সময় যায়নি। পাহাড়ের চুড়োয় ভয়ংকর মুখটাকে আবার দেখতে পেলাম— বুঝলাম আর একটা পাথর নেমে আসতে আর দেরি নেই। হাঁকপাঁক করে খামচে নামতে লাগলাম নীচের পথের ওপর। ঠান্ডা মাথায় এ-কাজ করতে পারতাম না আমি। ওপরে ওঠার চেয়ে এক-শো গুণ বেশি কঠিন নীচে নামা। কিন্তু বিপদের কথা ভাববার আর সময় নেই তখন। পাথরের তাক ধরে ঝুলে পড়তেই আর একটা পাথর পাশ দিয়ে গুম

করে নেমে গেল নীচে। মাঝামাঝি আসতেই পিছলে গেলাম আমি— হড়হড় করে নেমে এলাম নীচে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কাটাছেঁড়া রক্তাক্ত দেহে এসে পড়লাম রাস্তার ওপরেই— খাদের মধ্যে নয়। নেমেই টেনে দৌড়। অন্ধকারে গা ঢেকে পাহাড়ের সারির মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে গেলাম দশ মাইল। এক হপ্তা পরে পৌঁছোলাম ফ্লোরেন্সে। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুনিয়ার কেউই জানেনি আমি কোথায় আছি এবং কীভাবে আছি।

'আমার অজ্ঞাতবাসের খবর জানত শুধু একজনই— আমার ভাই মাইক্রফট। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, জানি না এজন্যে আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি না। কিন্তু ভাই, এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেকেই জানুক এবং বিশ্বাস করুক যে, আমি মারা গেছি। এবং এও ঠিক যে আমি মৃত এ-কথা তুমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস না-করলে কি আমার অক্কালাভের অমন রোমাঞ্চকর বিবরণ লিখতে পারতে? ও-লেখা যে একবার পড়েছে, তারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি আর নেই। গত তিন বছরে বারকয়েক কলম নিয়ে বসেছিলাম তোমাকে দু-এক লাইন লিখতে, কিন্তু প্রতিবারেই নিজেকে সামলে নিয়েছি আমার প্রতি তোমার গভীর অনুরাগের কথা ভেবে। কেননা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে এমন কিছু অশোভন কাণ্ড করে বসতে যে, আমার গোপন রহস্য আর গোপন থাকত না। ঠিক এই কারণেই আজ সন্ধ্যাবেলাতেও যখন আমার বইগুলো রাস্তায় ফেলে দিলে তুমি, আমাকে সরে পড়তে হয়েছে। সে সময়ে খুবই বিপদের মধ্যে ছিলাম আমি। অবাক হয়ে যদি তাকিয়ে থাকতে তুমি অথবা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠতে, তাহলেই ছদ্মবেশ ফুঁড়ে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত সন্ধানীদের চোখে। পরিণাম হত অত্যন্ত শোচনীয় এবং এবার যা হারাতে তা আর ফিরে পেতে না। মাইক্রফটের কাছে আমার গুপ্ত কথা ফাঁস করতে হয়েছে শুধু প্রয়োজনমতো টাকা পাওয়ার জন্যে।

'ইতিমধ্যে শুরু হল মরিয়ার্টি মামলা। শেষও হল। কিন্তু ফলাফল খুব সুখের হল না। আশা করছিলাম অনেক কিছুই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দলের দুজন সবচেয়ে ভীষণ প্রকৃতির লোকই রইল জেলের বাইরে। আমার ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে এই দুজনেই মরণপণ করেছিল। দুজনেই আমার পরম শত্রু।

'কাজেই, দু-বছর ঘুরে বেড়ালাম তিব্বতে[৭] লামা দেখে এবং প্রধান লামার[৮] কাছে থেকে বেশ কিছুদিন মজায় কাটিয়ে দিলাম। এরপর গেলাম পারস্যে, মক্কা দেখলাম[৯] এবং খারটুমে[১০] খলিফের[১১] সঙ্গে সাক্ষাৎও করলাম। সে ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সব কথা আমি যথাসময়ে ফরেন অফিসে জানিয়ে দিয়েছি। ফ্রান্সে ফিরে এসে আলকাতরা থেকে পাওয়া যৌগিক পদার্থ নিয়ে কয়েক মাস গবেষণা করলাম দক্ষিণ ফ্রান্সের মঁপেলিয়ারের একটা ল্যাবরেটরিতে[১২]। ফলাফল হল খুবই সন্তোষজনক। ইতিমধ্যে জানলাম আমার দুজন শত্রুর মধ্যে বাকি রয়েছে শুধু একজন। কাজেই লন্ডনে ফিরে আসার আয়োজন করছি, এমন সময়ে শুনলাম পার্ক লেনের রহস্যের চাঞ্চল্যকর খবর। শুনেই আর দেরি করলাম না। কেসটার বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট সম্পর্কে আমার আগ্রহ তো জেগেছিলই, কিন্তু শুধু এই কারণেই অত তাড়াতাড়ি ফিরিনি। খবরটা পড়েই বুঝেছিলাম আবার দৈব আমার সহায়। অদ্ভুত কতকগুলো ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধে হাতের মুঠোয় এসে পড়বে এই সময়ে যদি ফিরে আসতে পারি লন্ডনে। লন্ডনে পৌঁছেই হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটে। মিসেস হাডসন তো আমাকে দেখেই আঁতকে উঠে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন।'

একটু থেমে আবার বললে হোমস, 'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, দুঃখের সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই হল কাজ। আজ রাতের কাজটাও যদি দুজনে মিলে শেষ করতে পারি এবং সফল হতে পারি— তাহলে জানব এ-গ্রহে অন্তত একটা পুরুষের বেঁচে থাকার যথেষ্ট অধিকার আছে।'

বৃথাই আমি হাতজোড় করলাম, কাকুতিমিনতি করলাম আরও কিছু বলার জন্যে। কিন্তু অটল, অনড়ভাবে সে শুধু বললে, 'সকাল হওয়ার আগেই অনেক কিছু দেখতে শুনতে পাবে তুমি। অতীতের পুরো তিনটে বছর নিয়ে এখনও বকবক করা বাকি আছে। সাড়ে ন-টা পর্যন্ত তাই চলুক, বেশি নয়। ঠিক সাড়ে ন-টার সময় বেরিয়ে পড়ব আমরা, তারপর শুরু হবে খালি বাড়িতে আমাদের মনে রাখবার মতো অ্যাডভেঞ্চার।'

ভাড়াটে গাড়িতে পকেটে রিভলভার নিয়ে ঠিক তার পাশটিতে বসে মনে পড়ে গেল পুরোনো দিনের কথা। ওস্তাদ শিকারির ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম, বেশ গুরুতর রকমের অ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়িয়েছি আমরা। মাঝে মাঝে তার তাপসিক গাম্ভীর্য ভেদ করে ফুটে উঠছিল ব্যঙ্গবঙ্কিম মৃদু হাসি— তাতে আমার কৌতূহল কমা দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল।

ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রিটে চলেছে, কিন্তু ক্যাভেন্ডিস স্কোয়ারের কোণে গাড়ি দাঁড় করাল হোমস। লক্ষ করলাম, গাড়ি থেকে নামার সময়ে ডাইনে-বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে তন্নতন্ন করে সে দেখে নিল। অনেকক্ষণ পরে পৌঁছোলাম ব্ল্যান্ড ফোর্ড স্ট্রিটে। পৌঁছেই বোঁ করে একটা সরু গলিতে ঢুকে গেল হোমস! ওদিককার কাঠের ফটক পেরিয়ে পৌঁছাল একটা পরিত্যক্ত চত্বরে। পকেট থেকে চাবি বার করে[১৩] একটা বাড়ির পেছনের দরজা খুলে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ভেতরে। ভালোমন্দ কিছু ভাববার সময় ছিল না। হোমসের পিছু পিছু আমিও ঢোকামাত্র তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেতরে। বেশ বুঝলাম বাড়িটা একদম খালি। হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে বিরাট চারকোনা একটা খালি ঘরে ঢুকল সে। ঘরের কোণগুলো ঘন আঁধারে ঢাকা, রাস্তার আলোয় মাঝখানের অন্ধকার একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। কাছাকাছি কোনো বাতি দেখতে পেলাম না, জানলার কাচে প্রচুর ধুলো জমে থাকায় শুধু দুজন দুজনকে দেখতে পাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকেই চোখ চলল না। কাঁধে হাত রেখে কানের গোড়ায় মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল হোমস, 'কোথায় এসেছি জান?'

ধুলোজমা জানলার ভেতর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বেকার স্ট্রিটে, তাই না?'

'শাবাশ। আমাদের পুরোনো আস্তানার ঠিক উলটো দিকের বাড়ি এটা— নাম, ক্যামডেন হাউস।'

'কিন্তু এখানে মরতে এলাম কেন তাই তো বুঝছি না।'

'এলাম এই কারণে যে এখান থেকে চমৎকার দেখা যায় ওই ছবির মতো জিনিসটাকে। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, খুব সাবধানে জানলার আরও কাছে এগিয়ে যাও, খুব সাবধানে, কেউ যেন বাইরে থেকে দেখতে না-পায়। এগিয়ে গিয়ে যে-ঘর থেকে আমাদের ছোটোবড়ো সবরকম অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত, সেই পুরোনো ঘরটার মধ্যেই একবার ভালো করে উঁকি মেরে দেখ! দেখা যাক, তিন বছর তোমার কাছ ছাড়া হয়েও তোমাকে চমকে দেবার মতো ক্ষমতা এখনও আমার আছে কি না।'

পা টিপে টিপে এগিয়ে তাকালাম পরিচিত জানলাটার পানে। তাকিয়েই এমন চমকে উঠলাম যে মুখ দিয়ে অজান্তে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল।

জানলার পর্দা নামানো ছিল, আর খুব জোরালো একটা আলো জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। জোর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল জানলার পর্দা, আর ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠেছিল একটা স্পষ্ট, কালো ছায়ামূর্তি। মূর্তিটি একটি পুরুষের। চেয়ারে বসে ছিল লোকটি, তার মাথা হেলানোর কায়দা, চৌকো কাঁধ আর ধারালো মুখের আদল আমার চেনা— অনেক দিনের চেনা। মুখটা অর্ধেক ঘুরিয়ে বসে ছিল সে— এ-রকম কালো কুচকুচে সিলুয়েট মূর্তি আমাদের বাপঠাকুরদার চোখে পড়লে হয়তো সঙ্গেসঙ্গে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

ছায়ামূর্তিটি হোমসের অথবা অবিকল হোমসের মতো কোনো পুরুষের। এমনই আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে হাত বাড়িয়ে হোমসের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিলাম সত্যিই সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কি না।

অবরুদ্ধ হাসিতে হাসছিল হোমস। বলল, 'কী হল?'

'গুড হেভেনস! করেছ কী?'

'অবিকল আমার মতোই দেখতে হয়েছে, তাই না ওয়াটসন?'

'আমি তো দিব্যি করে বলতে রাজি আছি যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

'কৃতিত্বটুকু গ্রিনোবল-এর মঁসিয়ে অস্কার মনিয়ারের প্রাপ্য। ছাঁচটা তৈরি করতে বেশ কিছুদিন গেছে ভদ্রলোকের। মোমের তৈরি শার্লক হোমসের আবক্ষ মূর্তি[১৪]। বাকি যা দেখছ সেটুকু আজ বিকেলে বেকার স্ট্রিটে গিয়ে আমায় করে আসতে হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, কারণ শুধু একটি। আমি যখন বাড়িতে নেই, তখন কয়েকজন লোক বিশ্বাস করুক যে আমি বাড়িতেই আছি! এবং এই অদ্ভুত বিশ্বাস তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি।'

'অর্থাৎ, তোমার বিশ্বাস ঘরের ওপর চোখ রেখে কেউ বসে ছিল বা এখনও আছে।'

'ছিল এবং আমি তা জানি।'

'কারা?'

'আমার পুরোনো শত্রুরা ওয়াটসন। যে কুখ্যাত সমাজের নেতা এখনও 'রাইখেনবাক্ ফল'-এ শুয়ে— তারা। তুমি তো জানই আমি যে বেঁচে আছি, তা একমাত্র তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং বিশ্বাস করে যে, একদিন-না-একদিন, দু-দিন আগে হোক, আর পরে হোক, আমার ঘরে আমি ফিরে আসবই। সমানে এই তিন বছর তারা পাহারা দিয়ে এসেছে, আজ সকালে সার্থক হয়েছে তাদের প্রতীক্ষা— স্বচক্ষে তারা দেখেছে আমায় ফিরে আসতে।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'খুব সহজে। জানলা দিয়ে তাকাতেই ওদের চৌকিদারকে আমি চিনেছি। লোকটার নাম— পার্কার, স্বভাবটি খুব নিরীহ, পেশা হল ফাঁস দিয়ে খুন করে রাহাজানি করা, ইহুদিদের হার্প[১৫] বাজানোয় জুড়ি মেলা ভার। পার্কারকে আমি ডরাই না, ডরাই তার পেছনে যে আরও ভয়ংকর লোকটা আছে তাকে। যে ছিল মরিয়ার্টির হরিহর-আত্মা বন্ধু; যে 'রাইখেনবাক্ ফল'-এর

পাহাড়ের চুড়ো থেকে পাথর গড়িয়ে আমাকেও মরিয়ার্টির পাশে পাঠাতে চেয়েছিল, যে লন্ডনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, ধুরন্ধর আর পয়লা নম্বরের বদমাশ— এ হচ্ছে সেই-ই! ওয়াটসন, আজ রাতে আমার পিছু নিয়েছে সে নিজেই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি তার্য পিছু নিয়েছি আমরা।'

ধীরে ধীরে বন্ধুবরের মতলব স্বচ্ছ হয়ে এল আমার কাছে। এ-বাড়িতে আমরা এসেছি হোমসের ডামি দেখতে নয়, ডামিকে যারা চোখে চোখে রেখেছে তাদের দেখতে, লুকোনো জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। জানলার পর্দায় ডামির কালো ছায়াটা টোপ আর আমরা হলাম শিকারি। অন্ধকারের মাঝে, ছুঁচ পড়লে শোনা যায় এমনি স্তব্ধতার মধ্যে আমরা দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম রাস্তা দিয়ে হনহন করে যাওয়া মূর্তিগুলোকে। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে রাত যখন আরও গভীর হল, ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা— উত্তেজনা আর সে চেপে রাখতে পারলে না। অস্থিরভাবে ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত শুরু হল অশান্ত অবিরাম পায়চারি। ভাবলাম, এই সময় আমার কিছু বলা দরকার। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে চোখ তুলে আলোকিত জানলার পানে তাকাতেই আবার আগের মতো বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সজোরে হোমসের হাত আঁকড়ে ধরে আঙুল তুলে চিৎকার করে উঠলাম—

'হোমস দেখেছ? ছায়াটা সরে গেছে!'

প্রথমবারে দেখেছিলাম পাশ ফিরে বসা অবস্থায় ডামির ছায়া। এবার দেখলাম পিছন ফিরে বসা অবস্থায়। তিন বছরেরও যে হোমসের রুক্ষ মেজাজ মোলায়েম হয়নি— তার প্রমাণ পেলাম তখনই। তার মতো বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এ-রকম তিরিক্ষে মেজাজ এবং এত অল্পতেই এভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা মোটেই মানায় না। আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই খ্যাঁক করে উঠল সে, 'নড়েছে তো হয়েছে কী? তুমি কি আমাকে এমনই নিরেট গাধা ভেবেছ যে একটা নিছক ডামি খাড়া করে ইউরোপের সবচেয়ে জাঁহাবাজ সবচেয়ে ধড়িবাজ কয়েকজনের চোখে ধুলো দিতে পারব? তুমি আমায় ভাব কী ওয়াটসন? ঘণ্টা দুয়েক হল এ-ঘরে এসেছি আমরা। এই দু-ঘণ্টার মধ্যে মিসেস হাডসন ডামিটাকে নড়িয়ে-চড়িয়ে বসিয়েছেন সবসুদ্ধ আটবার অর্থাৎ প্রতি পনেরো মিনিটে একবার। সামনের দিকে থাকার ফলে তার ছায়া কোনোমতেই জানলার পর্দায় পড়ছে না। চুপ!' হঠাৎ দারুণ উত্তেজনায় যেন দম আটকে গেল হোমসের। ফিকে আলোয় দেখলাম— সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গে সজাগ প্রতীক্ষা ফুটিয়ে তুলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে। চারিদিক নিস্তব্ধ এবং ঘন আঁধারের মাঝে দেখলাম শুধু জ্বলজ্বলে ঝলমলে হলুদ পর্দার ওপর ফুটে রয়েছে কালো কুচকুচে ছায়াছবির দেহ-রেখা। থমথমে স্তব্ধতার মাঝে আবার শুনলাম জিব আর তালুর মধ্যেকার অতি-পরিচিত মৃদু সতর্কধ্বনি— বুঝলাম কী নিদারুণ চাপা উত্তেজনায় আচম্বিতে টানটান হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অংশ। মুহূর্তকাল পরেই এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে ঘরের কালির মতো কালো অন্ধকারে ঢাকা একটা কোণে টেনে নিয়ে গেল হোমস— অনুভব করলাম আমার উৎসুক ঠোঁটের ওপর তার সাবধানী আঙুলের স্পর্শ। বুঝলাম তার অর্থ হুঁশিয়ার! যে-আঙুল দিয়ে হোমস আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, স্পষ্ট অনুভব করলাম থরথর করে তা কাঁপছে। কোনোদিন বন্ধুবরকে এতখানি বিচলিত হতে দেখিনি। আমি কিন্তু যতদূর পারলাম চোখ চালিয়ে নিথর নিস্তব্ধ রাস্তায় ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আচমকা আমিও সজাগ হয়ে উঠলাম। তীক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে আমার আগেই হোমস যার সাড়া পেয়েছে— এবার আমার স্থূল অনুভূতিতেও সে সাড়া জাগালে। খুব মৃদু চাপা একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। শব্দটা এল বেকার স্ট্রিটের দিক থেকে নয়, যে-বাড়িতে আমরা ঘাপটি মেরে বসে, তারই পেছন দিক থেকে। একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তেই প্যাসেজে শুনলাম পায়ের শব্দ— কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। অতি কষ্টে চেষ্টা করছে সে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে, কিন্তু খাঁ খাঁ বাড়ির মধ্যে ওইটুকু শব্দই হাহাকার শব্দে কর্কশ প্রতিধ্বনি তুলে আসন্ন বিপদের ডমরুধ্বনি বাজিয়ে চলেছে। দেওয়ালের সঙ্গে সাপটে রইল হোমস। আমিও রিভলভারের ওপর হাত রেখে যতটা পারলাম দেওয়ালের সঙ্গে মিশে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম খোলা দরজার দিকে অন্ধকারের পটভূমিকায় মিশমিশে কালো একটা ছায়ামূর্তির আবছা দেহরেখা। এক মুহূর্ত দাঁড়াল ছায়ামূর্তি— তারপরেই আবার হিংস্র নিশাচর শ্বাপদের মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল ঘরের মাঝে। ঠিক তিন গজ দূরে যখন তার ক্রূর মূর্তি এসে পৌঁছোল, আমি দেহের প্রতিটি পেশি টান টান করে তৈরি হলাম লাফাবার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম সে জানেই না যে আমরা হাজির আছি ঘরের মধ্যে। গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। জানলার ধারে পৌঁছে খুব আলতোভাবে কিন্তু নিঃশব্দে আধ ফুট তুলে ধরলেন জানলার শার্সি। খোলা জানলার ঠিক পাশটিতে সে গুঁড়ি মেরে বসে পড়তেই রাস্তার আলো সোজাসুজি এসে পড়ল তার মুখের ওপর। আলোর প্রতিফলনে আকাশের বুকে চিকমিকে তারার মতোই জ্বলছিল তার চোখ দুটো। উত্তেজনায় থির থির করে কেঁপে উঠছিল তার মুখের মাংসপেশি। বয়স হয়েছে তার, নাকটা সরু, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কপালটা উঁচু, সামনের দিকে টাক পড়ে যাওয়ায় অনেকটা চওড়া। ধোঁয়াটে রঙের মস্ত একজোড়া গোঁফ, মাথার পেছনের দিকে বসানো ছিল অপেরা হ্যাট, খোলা ওভারকোটের মধ্যে দিয়ে চকচক করছিল ইভনিং ড্রেস-শার্টটা। ভারী কিন্তু মলিন মুখ অসংখ্য রুক্ষগভীর রেখায় কলঙ্কিত। একহাতে একটা লাঠির মতো জিনিস দেখলাম, কিন্তু মেঝের ওপর রাখতেই কঠিন ধাতব শব্দ হওয়ায় বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়। ওভারকোটের পকেট থেকে বড়ো আকারের একটা জিনিস বার করে তৎপর হয়ে উঠল সে, কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম জোরালো তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ। যেন ক্লিক শব্দে ঘাঁটিতে আটকে গেল স্প্রিং বা ওই জাতীয় কিছু। তখনও শেষ হয়নি তার তৎপরতা। হাঁটু গেড়ে বসে এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেহের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগল বোধ হয় কোনো লিভারের ওপর— ফলে অনেকক্ষণ ধরে জাঁতা ঘোরার পর ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শুনলাম— শেষ হল আবার একটা জোরালো ক্লিক শব্দে। এবার সে সিধে হতেই তার হাতে দেখলাম বন্দুকের মতো একটা জিনিস— বাঁটটা কিন্তু বিদঘুটে রকমের। ব্রিচের দিকটা খুলে ফেলে কী-একটা ঢুকিয়ে খটাস করে বন্ধ করে দিল ব্রিচব্লক[১৬]। তারপর গুঁড়ি মেরে বসে নলচের প্রান্তটা রাখল জানলার কিনারায়, লম্বা গোঁফ ঝুলে পড়ল কুঁদোর ওপর— মাছি বরাবর জ্বলজ্বলে চোখ রেখে টিপ ঠিক করতে লাগল সে তন্ময় হয়ে। তারপর শুনলাম স্বস্তির ছোট্ট শ্বাস ফেলার শব্দ— বন্দুকের কিম্ভূতকিমাকার বাঁটটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তৈরি হল সে লক্ষ্যভেদের জন্য। মাছি বরাবর দৃষ্টিরেখার অপর প্রান্তে জ্বলজ্বলে হলদে পটভূমিকায় কালো ছায়ামূর্তি তার নিশানা— চোখ তুলে একবার দেখে নিলাম এই আজব টার্গেটকে। তারপর চোখ নামিয়ে আনতে দেখলাম মুহূর্তের

জন্যে আড়ষ্ট হয়ে নিথর হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তেই ঘোড়ার ওপর শক্ত হয়ে বসল তার আঙুল। অদ্ভুত শন শন শব্দ শুনলাম। বাতাস কেটে কী যেন উড়ে গেল তিরবেগে, সঙ্গেসঙ্গে জানলার কাচভাঙার মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো আওয়াজ। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল হোমস— এক লাফেই বন্দুকবাজের পিঠে পড়ে চিত করে আছড়ে ফেলল মেঝের ওপর। পরমুহূর্তেই ছিটকে গেল লোকটা এবং পলক ফেলার আগেই সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলে হোমসের টুঁটি। এবার আমি তৎপর হলাম, রিভলভারের বাঁট দিয়ে মাথায় এক ঘা মারতেই শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চেপে ধরতেই হোমস তীব্র শব্দে হুইসল বাজিয়ে দিল। ফুটপাথে শুনলাম ধাবমান পায়ের খটাখট শব্দ, পরক্ষণেই ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল আর সাদা পোশাক পরা একজন ডিটেকটিভ তিরবেগে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

'লেসট্রেড তো?' শুধোল হোমস।

'ইয়েস, মি. হোমস। আমি নিজেই এলাম। আপনাকে আবার লন্ডনে দেখে খুবই খুশি হলাম, স্যার।'

দু-দিক থেকে জোয়ান কনস্টেবল দুজন লোকটাকে চেপে ধরায় আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল সে। হোমস এগিয়ে গিয়ে শার্সিটা টেনে নামিয়ে পর্দা ফেলে দিলে। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলল। কনস্টেবল দুজনও তাদের চোরা লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে ফেলতে লোকটার দিকে ভালো করে তাকালাম।

মুখখানা তার পুরুষের মতোই বটে। চোখে-মুখে অফুরন্ত তেজের দীপ্তি, ধারালো বুদ্ধির প্রখরতা, অথচ কেমন জানি নিষ্ঠুর, নির্মম, শয়তানি মাখানো। দার্শনিকের মতো চওড়া উন্নত কপাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগী পুরুষের মতো চোয়াল! জীবনের শুরু হয়েছিল তার অসীম কর্মক্ষমতা নিয়ে— কিন্তু কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ে তা ভাবেনি। তার ক্রূর নীল চোখের দিকে তাকানো যায় না; ঝুলে-পড়া দুই পাতায় ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষজাতির প্রতি অসীম ঘৃণা। তাকানো যায় না তার ভয়ংকর রকমের বেপরোয়া নাক এবং শিহরন জাগানো গভীর বলি-আঁকা কপালের পানে— সেখানে অনায়াসেই পড়া যায় প্রকৃতির সহজতম ভাষায় লেখা বিপদের সংকেত। আমাদের কোনোরকম আমল দিলে না সে, অপলকে তাকিয়ে রইল হোমসের পানে— সে-দৃষ্টিতে পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল ঘৃণা আর বিস্ময়।

দুমড়ে-যাওয়া কলারটা ঠিক করতে করতে হোমস বললে, 'কর্নেল, পুরোনো একটা নাটকে পড়েছিলাম, সব যাত্রার শেষ হয় প্রেমিকদের মিলনে। 'রাইখেনবাক্ ফল'-এ পাথরের তাকটায় শুয়ে থাকার সময়ে আপনার সুনজরে পড়ে অসীম দয়ার যে একটু নমুনা পেয়েছিলাম, তা মনে করেই আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা খুব সুখময় হবে বলে মনে করিনি।'

সম্মোহিতের মতো কর্নেল কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন হোমসের পানে। উত্তরে দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বললেন, 'ফিচেল শয়তান কোথাকার।'

হোমস বলল, 'ভালো কথা, এখনও আলাপ করানো হয়নি। জেন্টলমেন, ইনিই হলেন কর্নেল সিবাসটিয়ান মোর‍্যান। হার ম্যাজেস্টিস-এর ইন্ডিয়ান আর্মিতে এঁর সুনাম আছে এবং আজ

পর্যন্ত আমাদের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যে দূরপাল্লার বন্দুকবাজ যত আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ইনি। কর্নেল, আপনার বাঘের ঝুলির জুড়ি আজও পাওয়া যায়নি... তাই না?'

কোনো উত্তর এল না ভীষণ চেহারার বুড়ো কর্নেলের দিক থেকে। জ্বলন্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি বন্ধুবর হোমসের পানে। জ্বলন্ত ক্ষুধিত চোখে ভয়ংকর চাহনি আর ঝাঁটার মতো বড়ো বড়ো গোঁফ— সব মিলিয়ে তাঁকে খাঁচায় বন্দি বাঘের মতোই মনে হচ্ছিল।

হোমস বললে, 'আমার এই অতি সরল ধোঁকাবাজিতে আপনার মতো এমন একজন বুড়ো শিকারি যে এত সহজে বোকা বনে যাবেন, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে।'

নিদারুণ রাগে চাপা গর্জন করে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়লেন কর্নেল, কিন্তু কনস্টেবল দুজনের হ্যাঁচকা টানে আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর চোখ-মুখের তখনকার সে-জিঘাংসা বেশিক্ষণ দেখলেও শিউরে উঠতে হয়।

হোমস বললে, 'আমি স্বীকার করছি আমাকেও আপনি একটু অবাক করে দিয়েছিলেন। আপনি নিজেই যে খালি বাড়ির এমন পছন্দসই জানলার সামনে বসে তাগ করবেন, তা আমি ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম রাস্তা থেকেই হুকুম দেবেন আপনি তাই লেসট্রেড সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আপনার প্রতীক্ষাই করছিল বাইরে। শুধু এইটুকু ছাড়া সবটুকু আমার হিসেবমতোই হয়েছে।'

লেসট্রেডের পানে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল মোর‍্যান।

বললেন, 'আমাকে গ্রেপ্তার করার কোনো কারণ থাকুক আর না-থাকুক, এই লোকটাকে দিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করানোর অধিকার কি আপনার আছে? আইনের হাতেই যদি আমি এসে থাকি, সব কিছু আইনসম্মতভাবেই হওয়া উচিত।'

লেসট্রেড বলল, 'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। মি. হোমস, আর কিছু বলবেন কি?'

মেঝে থেকে শক্তিশালী এয়ারগানটা তুলে নিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে করতে বললে হোমস, 'তুলনা হয় না এমন অস্ত্রের, শব্দহীন কিন্তু অসাধারণ এর ক্ষমতা— বাস্তবিকই তারিফ করতে হয় এমন হাতিয়ারের। প্রফেসর মরিয়ার্টির অর্ডার অনুযায়ী অন্ধ জার্মান মেকানিক ভন হার্ডার তৈরি করেছিল এটা। ভন হার্ডারকে আমি চিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে জানতাম এই অস্ত্রের কথা, কিন্তু কোনোদিন নাড়াচাড়া করার সৌভাগ্য হয়নি। লেসট্রেড, মন দিয়ে জিনিসটা দেখে রাখ এবং যে-বুলেট এর মধ্যে আঁটে— সেগুলোকে ভুলো না— এ আমার বিশেষ অনুরোধ।'

দরজার দিকে সবাইকে নিয়ে এগোতে এগোতে লেসট্রেড বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মি. হোমস। আর কিছু বলবেন নাকি?'

'শুধু একটি প্রশ্ন। কী চার্জ আনছ কর্নেলের বিরুদ্ধে?'

'কেন, মি. শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টা?'

'না, না, লেসট্রেড। যাকে সমস্ত পুলিশবাহিনী বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, ইনিই সেই কর্নেল সিবাসটিয়ান মোর‍্যান— যিনি গত মাসের তিরিশ তারিখে ৪২৭ নং পার্ক লেনের উলটোদিকের বাড়ির দোতলার[১৭] খোলা জানলা দিয়ে এয়ারগান থেকে বুলেট ছুড়ে অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারকে খুন করেছিলেন। লেসট্রেড, এই হল তোমার চার্জ। ওয়াটসন, ভাঙা জানলার ঠান্ডা বাতাস যদি কিছুক্ষণ সহ্য করতে পার, তাহলে সিগার টেনে আধঘণ্টা সময় আমার স্টাডিতে কাটিয়ে যাও, সময়টা যে বাজে খরচ হবে না, সে-গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি।'

মাইক্রফট হোমসের তত্ত্বাবধানে আর মিসেস হাডসনের নিয়মিত যত্নে আমাদের পুরোনো ঘরগুলিতে দেখলাম কোনো পরিবর্তনই আসেনি। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবশ্য একটু অস্বস্তি লাগছিল, তবে যে-জিনিসটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দেখলাম আছে। কেমিক্যাল কর্নারে আগের মতোই অ্যাসিডের দাগ লাগা দেবদারু কাঠের টেবিলটাকে দেখলাম। সেলফের ওপর সারি সারি সাজানো স্ক্র্যাপ-বুক আর রেফারেন্স বুক। বইগুলোর বিকট চেহারা দেখে অবশ্য আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে অনেকেই সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই পরম খুশি হত। রেখাচিত্র, বেহালার বাক্স, পাইপের র‍্যাক— এমনকী তামাক ভরতি পারস্যের চটিটাও চোখে পড়ল চারদিক তাকাতে গিয়ে। ঘরের মধ্যে হাজির ছিল দুজন। প্রথম জন মিসেস হাডসন, আমরা ঘরে ঢুকতেই চোখে-মুখে উপচে-পড়া খুশি নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। দ্বিতীয় জন হোমসের অদ্ভুত ডামিটা— আজ রাতের অ্যাডভেঞ্চারের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু অভিনয়ের ফলে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। মডেলটা মোমের, দেহের মিল তো বটেই, রংসুদ্ধ এমনই নিখুঁত যে দেখলে পরে হোমস বলেই মনে হয়। ফুলের টব রাখার সরু লম্বামতো একটা টেবিলের ওপর বসানো ছিল মূর্তিটা, গায়ে এমন কায়দায় হোমসের একটা পুরোনো ড্রেসিং গাউন জড়ানো যে রাস্তা থেকে দেখলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

হোমস বলল, 'মিসেস হাডসন, যেরকম বলেছিলাম, ঠিক সেইরকম করেছিলেন তো?'

'প্রতিবারই হাঁটু দিয়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়েছে আমায়।'

'চমৎকার। বাস্তবিকই আপনার সাহায্য না-পেলে এত নিখুঁতভাবে ধোঁকা দেওয়া যেত না ওদের। বুলেটটা কোথায় লেগেছে তা দেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ। আপনার অমন চমৎকার মূর্তিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। বুলেটটা মাথার ভেতর দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে চেপটা হয়ে পড়ে ছিল মেঝেতে। এই দেখুন!'

আমার হাতে বুলেটটা তুলে দিয়ে বলল হোমস, 'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন। রিভলভারের নরম বুলেট না হলে এ-অবস্থা হয় না। একেই বলে প্রতিভা— কেননা এ-জিনিস যে এয়ারগান থেকে ফায়ার করা হয়েছে— তা কারোর মাথাতেও আসবে না। ঠিক আছে, মিসেস হাডসন, সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

জরাজীর্ণ ফ্রককোটটা খুলে ফেলেছিল সে, এবার ডামির ওপর থেকে ইঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতেই ফিরে এল পুরোনো হোমস— মাঝখানে যে সুদীর্ঘ তিনটে বছরের ব্যবধান আছে, তা আর মনেই রইল না।

মূর্তিটার কপাল চুরমার হয়ে গেছিল বুলেটের ঘায়ে। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাসিমুখে বলল হোমস, 'বুড়ো শিকারির স্নায়ু দেখছি এখনও আগের মতোই ঠিক তেমনই ধীরস্থির। চোখের ধারও দেখছি এতটুকু কমেনি। বুলেটটা মাথার পেছনে ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে ঢুকে ব্রেনটা লন্ডভন্ড করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে সামনে দিয়ে। অব্যর্থ বন্দুক চালানোয় এঁর জুড়িদার ইন্ডিয়াতে ছিল না। আমার তো মনে হয়, লন্ডনে এঁকে টেক্কা দেওয়ার মতো বন্দুকবাজ অল্প কয়েকজনই আছে। ভদ্রলোকের নাম কি এর আগে শুনেছিলে?'

'না।'

'বটে, বটে, নামযশের কী করুণ পরিণতি! অবশ্য প্রফেসর জেমস মরিয়ার্টির[১৮] নামও তুমি

কোনোদিন জানতে না, অথচ তাঁকে শতাব্দীর সূর্য বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, আগামী শতাব্দীতেও এ-রকম প্রতিভা আর দেখা যাবে বলে মনে হয় না। সেলফ থেকে জীবনচরিতের স্ক্র্যাপ বইখানা নামাও, একটু চোখ বুলানো যাক।'

সিগার থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল হোমস। তারপর বইটা আমার হাতে তুলে দিল। মোর‍্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দেখলাম বেশ গুছিয়ে লিখে রেখেছে।

মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরে হোমসের হাতে লেখা : 'লন্ডনের দ্বিতীয় সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি।'

হোমসের হাতে বইটা তুলে দিয়ে বললাম, 'আশ্চর্য, সৈনিক জীবনে লোকটা দেখছি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন।'

'সত্যিই তাই ওয়াটসন। সৈনিক জীবনের অনেকদূর পর্যন্ত তাঁর সুনামের অন্ত ছিল না। হঠাৎ বিগড়ে গেলেন কর্নেল মোর‍্যান, শুরু হল তাঁর বিপথে কুপথে যাওয়া। প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি অবশ্য কোনোদিনই হয়নি, কিন্তু পাঁচ কান হওয়াও বাকি থাকেনি, তবে তাঁর পক্ষে ইন্ডিয়ায় বেশিদিন থাকা সম্ভব হল না। অবসর নিলেন কর্নেল, এলেন লন্ডনে, আসতে-না-আসতেই আবার শুরু হল তাঁর দুর্নাম কুড়ানোর পালা। এই সময়ে প্রফেসর মরিয়ার্টির সুনজরে পড়লেন তিনি— মরিয়ার্টি কিছুদিনের জন্যে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের পাণ্ডা করে দিয়েছিলেন কর্নেলকে। যাই হোক, কর্নেলকে এন্তার টাকা দিতে লাগলেন মরিয়ার্টি। যেসব উঁচু ধরনের কাজ সাধারণ অপরাধী সমাজ কোনোদিন ভাবতেও সাহস করত না, এইরকম দু-একটা কাজেও লাগালেন কর্নেলকে। ১৮৮৭ সালে লডারে মিসেস স্টুয়ার্টের মৃত্যুকাহিনি মনে পড়ছে তোমার? পড়ছে না? মোর‍্যান যে এর মূলে ছিলেন, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রমাণ করা যায়নি কিছুই। কর্নেলকে এমনই চালাকি করে আড়ালে রাখা হয়েছিল যে মরিয়ার্টির দল ভেঙে যাওয়ার পরেও কোনোমতেই মোর‍্যানকে জালে জড়ানো যায়নি। মনে পড়ে তোমার, তোমাকে তোমার বাড়িতে ডাকতে গিয়ে এয়ারগানের ভয়ে কীভাবে জানলার খড়খড়ি টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলাম? তখনও তুমি ভেবেছিলে কল্পনার মাত্রা আমার ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমার এত সাবধান হওয়া অকারণ নয়, কেননা এই অসাধারণ এয়ারগানের অস্তিত্ব আমি তখনই জানতাম এবং এও জানতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বন্দুকবাজের একজনের হাতেই থাকতে পারে হাতিয়ারটা। সুইজারল্যান্ডে মরিয়ার্টির সাথে ইনিই আমার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। রাইখেনবাকের পাথরের তাকে শুয়ে থাকার সময়ে সেই ভয়ংকর পাঁচটা মিনিটের জন্যও দায়ী ইনিই।

'ফ্রান্সে অজ্ঞাতবাসের সময় মন দিয়ে কাগজ পড়তাম কবে আবার তাঁকে আমার পাছু নেওয়াতে পারব ওই সুযোগের প্রতীক্ষায়। তাই অপরাধ-সংক্রান্ত খবর নিয়মিত শুধু দেখে যেতাম। জানতাম একদিন-না-একদিন তাকে আমি বাগে পাবই। তার পরেই মৃত্যু হল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারের। যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে হাপিত্যেশ করে বসে থাকা, শেষ পর্যন্ত পেলাম সেই সুযোগ! এ-কাজ যে কর্নেল মোর‍্যানের সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। রোন্যাল্ডের সাথে তাস খেলার পর ক্লাব থেকে পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপর গুলি চালিয়েছিলেন খোলা জানলা দিয়ে। সঙ্গেসঙ্গে ফিরে এলাম লন্ডনে। পাহারাদার আমায় নজরে রেখেছেন দেখলাম এবং বুঝলাম তার মনিবের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে আমার ধূমকেতুর মতো উদয় হওয়ার

খবর। রোন্যাল্ডকে খুন করার সঙ্গেসঙ্গে আমার ফিরে আসার উদ্দেশ্য যে কী, তাও আবিষ্কার করা কঠিন হবে না তাঁর পক্ষে। তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার হয়ে গিয়ে আমাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে তৎপর হয়ে উঠবেন কর্নেল। সঙ্গে আনবেন তাঁর বহু অপরাধের সঙ্গী রক্তখেকো হাতিয়ারকে। তাঁর সুবিধার জন্যে জানলায় চমৎকার ছায়াবাজি দেখিয়ে পুলিশকে সাবধান করে দিলাম, হয়তো তাদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার। যাই হোক, আমি যেখানে ঘাপটি মেরে কর্নেলের ওপর নজর রাখব ভেবেছিলাম, কর্নেল যে শেষ পর্যন্ত সেইখান থেকেই আক্রমণ শুরু করবেন, তা ভাবিনি। তাহলে মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আর কিছু বুঝতে বাকি রইল কি?'

'আছে বই কী। অনারেবল রোন্যাল্ড অ্যাডেয়ারকে খুন করার পেছনে কর্নেলের কী মোটিভ থাকতে পারে, সে-বিষয়ে কিছুই বলনি তুমি।'

'আমার তো মনে হয় সব জটিলতাই সরল হয়ে আসবে আমার অনুমান দিয়ে। সওয়ালের সময়ে জানা যায় যে মোর‍্যান আর অ্যাডেয়ার দুজনে মিলে প্রচুর টাকা জিতেছিলেন। মোর‍্যান যে শেষ পর্যন্ত ল্যাজে খেলতে শুরু করে তা মোর‍্যান-চরিত্র যে জানে সে-ই বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস খুনের দিনই অ্যাডেয়ার জানতে পারেন যে মোর‍্যান তাকে ঠকাচ্ছেন। তখনই হয়তো আড়ালে ডেকে কর্নেলকে তিনি ভয় দেখিয়েছিলেন যে ক্লাবের সভ্যতালিকা থেকে নিজে থেকে নাম না-কাটিয়ে নিলে এবং চিরকালের মতো তাস খেলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না-দিলে তিনি সব কিছু ফাঁস করে দিতে বাধ্য হবেন। কর্নেলকে শুধু ভয় দেখিয়েই কাজ সারতে চেয়েছিলেন রোন্যাল্ড। ক্লাব থেকে বিতাড়িত হওয়া মানেই মোর‍্যানের নিকেশ হওয়া, কেননা তাস খেলে অসাধু উপায়ে টাকা নিয়েই ইদানীং তাঁর দিন কেটেছে। কাজেই বিনা দ্বিধায় রোন্যাল্ডকে খুন করলেন তিনি। খুন হওয়ার সময়ে হিসেব করতে বসেছিলেন রোন্যাল্ড। অসৎ পার্টনারের সঙ্গে খেলে যে-টাকা জিতেছিলেন, তা হজম করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই হিসেব করতে বসেছিলেন কাদেরকে কত টাকা ফেরত দিতে হবে। দরজা বন্ধ করেছিলেন তিনিই। কেননা মা আর বোন এসে একসাথে অত নাম আর খুচরো টাকাপয়সা দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেই ফ্যাসাদে পড়তে হত— তাই ওই সাবধানতা। কেমন, ঠিক আছে তো?'

'নিঃসন্দেহে। বিলকুল সত্যকেই অনুমান করে বসেছ তুমি।'

'মামলা চলার সময় বোঝা যাবে সত্যি কি মিথ্যে। আপাতত আমি স্বাধীন। কর্নেল মোর‍্যান আর আসবেন না আমার দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিতে, ভন হার্ডারের বিখ্যাত এয়ারগানও শান্তি পাবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামে, আর আবার শুরু হবে শার্লক হোমসের পুরোনো জীবন, শুরু হবে লন্ডনের জটিল জীবনের বিস্তর সমস্যার সমাধানে তার সর্বশক্তির বিনিয়োগ।'

টীকা

১. **মোর‍্যানের মারাত্মক হাতিয়ার** : 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এমটি হাউস' কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অক্টোবর ১৯০৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পাঠকদের কাছে শার্লক হোমসের সমস্ত কাহিনির মধ্যে, প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে এই গল্পটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল শার্লক হোমস ফিরে আসবার কারণে।

২. **৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে :** হাইড পার্কের পূর্ব প্রান্তের লাগোয়া পার্ক লেন অভিজাত উচ্চবিত্ত মানুষদের বসবাসের এলাকা।

৩. **ক্যাভেন্ডিস আর ব্যাগাটেলী ক্লাব :** ১৮৯১ সাল নাগাদ লন্ডন শহরের ওয়েস্ট এন্ড অঞ্চলে জুয়া খেলার বেশ কয়েকটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. **লর্ড ব্যালমোরাল :** 'দ্য নোবল ব্যাচেলর' এবং 'দ্য সিলভার ব্লেজ' গল্পে লর্ড ব্যালমোরালের উল্লেখ পাওয়া গেছে। ব্যালমোরাল ক্যাসল রানি ভিক্টোরিয়া লিজ নিয়েছিলেন। পরে প্রিন্স অ্যালবার্ট রানির জন্য এটি কিনে নেন। জানা যায়, রানি ভিক্টোরিয়া গোপনীয়তার কারণে অনেক সময় নিজেকে 'ডাচেস অব ব্যালমোরাল' ছদ্ম-উপাধিতে পরিচয় দিতেন।

৫. **এই সবই ভাবলাম বার বার :** হোমস-গবেষক ক্রিস্টোফার মর্লে প্রশ্ন তুলেছেন, নিজের ডাক্তারির পেশা ছেড়ে ওয়াটসন গোয়েন্দাগিরি করতেন কেন? এবং কখন?

৬. **বারিৎসু :** একপ্রকার জাপানি কায়দায় কুস্তি। বারিৎসু ইউরোপে জনপ্রিয় হয় ১৮৯৯-এ পিয়ার্সন'স ম্যাগাজিনে এই বিষয়ে ই. ডবলু বার্টন রাইটের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়।

৭. **তিব্বত :** ওই বিশেষ সময়ে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার শাসনকাল চললেও, তিব্বত ছিল চিনের কিঙ বা মাঞ্চু বংশীয় রাজাদের ছত্রছায়ায় শাসিত।

৮. **প্রধান লামা :** ১৮৯৩-এ ত্রয়োদশ দালাই লামা যুবতেন গিয়োৎসোর বয়স ছিল পনেরো বছর; এবং নবম পাঞ্চেন লামা চোকেই নিমার বয়স ছিল নয় বছর। শার্লক হোমস মজায় কাটিয়েছিলেন কার সঙ্গে?

৯. **মক্কা দেখলাম :** স্যার রিচার্ড বার্টন ছদ্মবেশে মক্কা দর্শন করেন ১৮৫৩-তে। হোমস মুসলমান না হয়ে কোন ছদ্মবেশে মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম করলেন?

১০. **খারটুম :** আফ্রিকার দেশ সুদানের রাজধানী খারটুম ১৮৮৫ সালে অল মাহেদীর নেতৃত্বে তার অনুগামীরা দখল করে নেয় এবং তারা খারটুমকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অমদুরখানে নতুন রাজধানী পত্তন করে। ১৮৯৮-এ ইংরেজরা খারটুম পুনর্দখল করলে গভর্নর জেনারেল লর্ড কীচেনার-এর পরিচালনায় এই শহর পুনর্নির্মিত হয়। ১৮৯১-এ হোমস কোন খারটুম চেয়েছিলেন?

১১. **খলিফ :** ওই সময়ে খলিফা ছিলেন আবদুল্লাহি (১৮৪৬-১৮৯৯)। ইনি আবদআল্লা নামেও পরিচিত ছিলেন।

১২. **মঁপেলিয়ারের একটা ল্যাবরেটরিতে :** ১২২০-তে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব মঁপেলিয়ারের কোনো ল্যাবরেটরি হওয়া সম্ভব।

১৩. **পকেট থেকে চাবি বার করে :** হোমস ওই বাড়ির চাবি কোথা থেকে পেলেন, সেই রহস্য কিন্তু পরিষ্কার হয়নি।

১৪. **মোমের তৈরি... আবক্ষ মূর্তি :** বেকার স্ট্রিটের অদূরে, মেরিলিবোন রোডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মাদাম ত্যুসো-র মোমের মূর্তির সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন মেরি গ্রেজহোল্ডট ত্যুসো (১৭৬০-১৮৫০)। অচিরে বিশ্বখ্যাত সেই মিউজিয়ামের কোনো কারিগর হোমসের এই মূর্তি বানাতে সাহায্য করে থাকতে পারেন বলে অনুমান করেন বহু হোমস-গবেষক।

১৫. **হার্প :** ধাতু বা কাঠের ফ্রেমে বাঁধা তারের বাদ্যযন্ত্র। এশিয়া এবং ইউরোপে এই বাজনা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত।

১৬. **ব্রিচব্লক :** বন্দুকের গুলির খোপ বন্ধ করবার ধাতব অংশ।

১৭. **পার্ক লেনের উলটোদিকের বাড়ির :** পার্ক লেনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে একদিকে বাড়ির সারি, অপরদিকে হাইড পার্ক। অর্থাৎ এই রাস্তায় কোনো বাড়ির 'উলটোদিকের বাড়ি' বলে কিছু থাকতে পারে না।

১৮. **জেমস মরিয়ার্টি :** প্রফেসরের প্রথম নাম এই প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে জানা যায় প্রফেসরের ভাইয়ের নামও জেমস।

কুটিল বুড়োর কুচক্র[1]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য উড বিল্ডার]

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মাত্র কয়েক মাস হল অজ্ঞাতবাস সাঙ্গ করে ঘরে ফিরেছে হোমস। আমিও তার অনুরোধে প্র্যাকটিস বেচে দিয়ে ফিরে এসেছি[2] বেকার স্ট্রিটের পুরোনো বাড়িতে। চেয়ারে কাত হয়ে বসে হোমস অসলভাবে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে সকালের কাগজে। এমন সময়ে দুজনেই সজাগ হয়ে উঠলাম সদর দরজায় দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজানোর শব্দে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে দুমদাম ঢাক পিটোনোর মতো শব্দ— কেউ যেন আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াতে না-পেরে দমাদম ঘুসি মেরে চলেছে দরজার পাল্লার ওপর। দরজা খোলার সঙ্গেসঙ্গে তিরবেগে সে ছুটে গেল হল ঘরের মধ্যে দিয়ে, তার পরেই সিঁড়ির ওপর খটাখট জুতোর আওয়াজ— একসঙ্গে কয়েকটা ধাপ টপকে লাফিয়ে উঠলে যেমন হয় এবং পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্তের মতো ঘরে ঢুকল একটি তরুণ। বিস্ফারিত চোখ, পাঙাশপানা মুখের রং, উশকোখুশকো মাথার চুল। হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দুজনের মুখের ওপর বারকয়েক চোখ বুলিয়েই তরুণটি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিদেখে। এ-রকম অশোভনভাবে ঘরে ঢোকাটা খুবই অন্যায় এবং এজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত মনে করেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি দুঃখিত, মি. হোমস। পাগল হতে আমার আর বাকি নেই। মি. হোমস, আমিই হতভাগ্য হেক্টর ম্যাকফারলেন। এই মুহূর্তে লন্ডনের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোক আমিই। দোহাই মি. হোমস, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না! আমার গল্প শেষ করার আগেই যদি ওরা এসে পড়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে, ওদের কিছুক্ষণ আটকে রেখে আমাকে অকপটে যা সত্য তা বলবার সুযোগ দিন। আপনি যে আমার হয়ে তদন্তে নেমেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমি খুশিমনে হাজতে যেতে রাজি আছি।'

'গ্রেপ্তার করতে আসছে আপনাকে? শুনে খুবই সুখী— দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। কী চার্জে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলুন তো?'

'লোয়ার নরউড-এর মি. জোনাস ওলডাকারকে খুন করার চার্জে।'

কাঁপা হাতে হোমসের হাঁটু থেকে ডেলি টেলিগ্রাফটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল ম্যাকফারলেন।

'এই জায়গাটায় চোখ পড়লেই আপনি বুঝতে পারতেন স্যার কী জন্যে সকাল বেলাই এসে পৌঁছেছি আপনার কাছটিতে। লোকের মুখে মুখে এখন ঘুরছে আমার নাম আর আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনি।' মাঝখানের পাতাটা খুলে ধরল ম্যাকফারলেন। 'এই যে, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমিই পড়ে শোনাচ্ছি। হেডলাইন দিয়েছে : "লোয়ার নরউডে রহস্যজনক ব্যাপার। প্রখ্যাত স্থপতির অন্তর্ধান। হত্যা এবং গৃহদাহের সন্দেহ। কে হত্যাকারী? একটি সূত্র।" মি. হোমস এই সূত্র ধরেই ওরা এগিয়ে আসছে এবং আমি জানি শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হতে হবে আমাকেই। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে ওরা পিছু নিয়েছে আমার— আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধু গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটা বার করার জন্যই ওরা যা সময় নিচ্ছে। ওঃ, মি. হোমস, এ-খবর শুনলে আমার মা... আমার মায়ের মন একেবারেই ভেঙে যাবে— কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না উনি।' ভয়ে বেদনায় দু-হাত কচলাতে কচলাতে সামনে পেছনে দুলতে লাগল ম্যাকফারলেন।

ভালো করে তাকালাম তার দিকে। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত সে। কিন্তু তার সোনালি চুলে

সুন্দর চেহারায়, নীল নীল ভয়ার্ত চোখে এবং পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো মুখে দুর্বল ভাবাবেগের চিহ্ন। বয়স তার খুব জোর বছর সাতাশ, জামাকাপড় হাবভাব বেশ ভদ্রলোকের মতোই।

হোমস বললে, 'যেটুকু সময় এখন আছে তার সদ্ব্যবহার করা যাক। ওয়াটসন, কাগজটা তুলে প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ে শোনাও তো ভাই।'

জমকালো শিরোনামার নীচেই পড়লাম ইঙ্গিতময় সুদীর্ঘ খবর:

গতকাল গভীর রাতে[৩] লোয়ার নরউড-এ এক গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। মি. জোনাস ওলডাকার শহরতলির এই অঞ্চলের বহু দিনের বাসিন্দা এবং সকলকেই তাঁহাকে চেনে। বহু বছর ধরিয়া স্থপতি ব্যাবসা করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। মি. ওলডাকার চিরকুমার। তাঁহার বয়স বাহান্ন বছর। সিডেনহামের প্রান্তে ডীপ হাউসে তাঁহার নিবাস। রাস্তার নামকরণও তাঁহার বাড়ির নাম অনুসারে হইয়াছে। উৎকট খামখেয়াল স্বভাবের জন্য ওলডাকারের কিঞ্চিৎ নামডাক আছে। প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অবসর জীবনযাপনেই তিনি অভ্যস্ত। সারাজীবন তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। এবং সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বছর হইল ব্যাবসা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তিনি সরাইয়া আনিয়াছিলেন। বাড়ির পিছনে কাঠের বরগার ক্ষুদ্র একটি স্তূপ কিন্তু আর সরানো হয় নাই। তাঁহার এই কাঠের স্তূপেই নাকি আগুন লাগিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দমকল আসিয়া পৌঁছাইলেও কিন্তু আগুন বন্ধ করা গেল না। কাঠের বরগাগুলি এমনিই শুষ্ক ছিল যে, দমকল বাহিনীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্তূপটি পুড়িয়া একেবারেই ছাই হইয়া যায়। এই পর্যন্ত সকলেই অগ্নিকাণ্ডটিকে নিছক দুর্ঘটনা ভাবিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই গুরুতর অপরাধ সংঘটনের চিহ্ন পাওয়া গেল। আগুন জ্বলার সময়ে বাড়ির মালিককে ধারেকাছে কোথাও দেখিতে না-পাওয়ায় সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। এখন দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার বাড়ি হইতে বেমালুম উধাও হইয়াছেন। ঘর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, রাত্রে তিনি শয্যা স্পর্শ করেন নাই। শয়নকক্ষের আয়রনসেফটি খোলা এবং ঘরময় বহু মূল্যবান কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত। আরও চিহ্ন পাওয়া গেল— ঘরে যেন একটি মরণ-যুদ্ধ, একটি খণ্ড-প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। সামান্য রক্তের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। একটি ওক কাঠের বেড়াইবার ছড়ির হাতলে রক্তের দাগ দেখা গিয়াছে। প্রকাশ, সেদিন বেশি রাত্রে শয়নকক্ষে মি. ওলডাকার এক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ছড়িটি তাঁহারই। ইনি লন্ডনের একজন তরুণ সলিসিটর, গ্রেহাম য়্যান্ড ম্যাকফারলেন, ৪২৬ গ্রেস্যাম'স বিল্ডিংস[৪], ই. সি.র জুনিয়র পার্টনার, নাম— জন হেক্টর ম্যাকফারেলন। পুলিশের বিশ্বাস, প্রমাণাদি যা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া অনায়াসেই অপরাধের একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসংগত মোটিভ খাড়া করা চলে। পরিণামে, অত্যন্ত শিহরনমূলক তথ্যাদি প্রকাশ পাইবে।

পরের খবর।— প্রেসে আসিবার সময়ে জোর গুজব শুনিলাম যে মি. জোনাস ওলডাকারকে হত্যার অভিযোগে মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। অন্ততপক্ষে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যে বাহির হইয়াছে, এ-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নরউড-তদন্তের ফলে আরও কুটিল তথ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতির রুমে ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছাড়াও এখন জানা গিয়াছে যে, একতলার ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলিও উন্মুক্ত ছিল। হিঁচড়াইয়া জানলার মধ্য দিয়া কাঠের স্তূপ পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং কাঠকয়লা ও ছাইগাদার মধ্যে পোড়া দেহাবশেষ দেখা গিয়াছে। পুলিশের ধারণা যে, অতি চাঞ্চল্যকর একটি অপরাধ সংঘটিত

হইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতিকে তাঁহার শয়নকক্ষে পিটাইয়া হত্যা করার পর কাগজপত্র লুঠ করা হইয়াছে এবং হত্যার সব চিহ্ন মুছিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার মৃতদেহকে টানিয়া কাঠের স্তূপে ফেলিয়া আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্বনামধন্য ইনস্পেকটর লেসট্রেডের হাতে তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতা ও উৎসাহ সহকারে সূত্র অনুসরণ করিয়া কাজ প্রায় সারিয়া আনিয়াছেন।

দু-চোখ মুদে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হোমস একমনে শুনছিল এই বিচিত্র কাহিনি!

আমি থামলে পর অভ্যাসমতো অলস সুরে বললে, 'বাস্তবিকই বড়ো আজব কেস হে, বেশ কয়েকটা ভাববার মতো পয়েন্ট আছে। ভালো কথা মি. ম্যাকফারলেন, যা শুনলাম তাতে তো দেখছি যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার বলেই আপনার এতক্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখনও ধরা পড়েননি কেন বুঝলাম না তো?'

'মি. হোমস, আমার বাড়ি ব্ল্যাকহিদের টরিংটন লজে। আমার বাবা মা-ও থাকেন সেখানে। কিন্তু গতরাতে মি. জোনাস ওলডাকারের সঙ্গে আমার কিছু কাজ থাকায় নরউডের একটা হোটেলে আমায় রাত কাটাতে হয়েছিল। আজ সকালে ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। ট্রেনে উঠেই কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে জানতে পারলাম সব। তখুনি বুঝলাম কী বিষম বিপদে পড়েছি সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে। কাজেই, আর এক সেকেন্ডও দেরি না-করে সিধে চলে এলাম আপনার কাছে আপনার সাহায্যের জন্যে! বেশ জানতাম, বাড়ি অথবা অফিস— এই দু-জায়গার কোনোটিতে গেলে গ্রেপ্তার হতাম আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে আমার পিছু নিয়েছে একটা লোক! বেশ বুঝছি— গ্রেট হেভেন, ও কী?'

সদর দরজায় ঘটাং করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সিঁড়ির ওপর শুনলাম ভারী জুতোর শব্দ। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকল বন্ধুবর লেসট্রেড। কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলাম পেছনে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ।

ঘরে ঢুকেই পুলিশি হুংকার ছাড়ল লেসট্রেড, 'মি. জন হেক্টর ম্যাকফারলেন!'

আমাদের ক্লায়েন্ট বেচারি রক্তশূন্য মুখে উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে।

'লোয়ার নরউডের মি. জোনাস ওলডাকারকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকাল ম্যাকফারলেন। তারপর ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে এমনভাবে গা এলিয়ে দিলে যেন এইমাত্র গিলোটিনের নীচে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার।

হোমস বলল, 'এক সেকেন্ড, লেসট্রেড! আধ ঘণ্টার এদিক-ওদিক হলে তোমার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ভদ্রলোক সব আদ্যোপান্ত বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হলে তুমি। এঁর মুখে ঘটনাটা আগাগোড়া শুনলে আমার তো মনে হয় লেসট্রেড তোমার আমার দুজনেরই উপকার হবে তাতে।'

গুম হয়ে বলল লেসট্রেড, 'শুনলেই-বা কী, না-শুনলেই-বা কী। জট ছাড়ানোর কোনো অসুবিধেই আমার হবে না।'

'তাহলেও লেসট্রেড, তোমার অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোকের মুখেই আমি এ-ঘটনার পুরো বিবরণটা শুনতে চাই।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন আর না বলব না। অতীতে বারদুয়েক ফোর্সকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আপনি। আপনার ঋণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তবু মি. ম্যাকফারলেন যা বলবেন, আমার সামনেই বলতে হবে এবং এ-ও জানিয়ে দিচ্ছি, তিনি যা কিছু বলবেন, সবই প্রমাণ হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগাব আমরা।'

ম্যাকফারলেন বলল, 'আমিও তাই চাই। আমার একান্ত অনুরোধ, ধৈর্য ধরে আমি যা বলতে চাই তা শুনুন এবং বিশ্বাস করুন আমার বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষরই খাঁটি সত্য।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেসট্রেড বললে, 'ঠিক আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি আপনাকে।'

ম্যাকফারলেন বলল, "প্রথমেই বলে রাখি, মি. জোনাস ওলডাকার সম্বন্ধে আমি কিছু জানতাম না। পরিচয় ছিল শুধু নামের সঙ্গে। কেননা, বহু বছর আগে আমাদের বাবা মা-র খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তারপর কে যে কোনদিকে ছিটকে গেছে, তার কোনো হদিশ ছিল না। সেই কারণেই গতকাল বেলা প্রায় তিনটার সময়ে তাঁকে আমার সিটি অফিসে ঢুকতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছিলাম। আর অবাক হলাম যখন শুনলাম তাঁর আসার উদ্দেশ্য। হাতে করে নোটবইয়ের কয়েকটা ছেঁড়া পাতায় অনেক কিছু লিখে এনেছিলেন তিনি। এই দেখুন সেই কাগজগুলো।"

টেবিলের ওপর ছেঁড়া পাতাগুলো রেখে বললেন মি. ওলডাকার, 'এই আমার উইল। মি. ম্যাকফারলেন, কানুনমাফিক যা কিছু করতে হয় করুন— পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে রইলাম আমি!'

"কপি করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল আমার। আমার তখনকার অবস্থাটা আপনিও খানিকটা অনুমান করতে পারবেন সব শুনলে। দেখলাম, সামান্য একটু রাখাঢাকা ছাড়া তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই আমায় দিয়ে গেছেন তিনি। ভদ্রলোকের চেহারাটা অদ্ভুত। ছোটোখাটো মানুষ— অনেকটা নেউলের মতো খড়বড়ে! চোখের পাতাগুলো সমস্ত সাদা। চোখ তুলতেই দেখি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে সকৌতুক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন উনি। উইলের শর্ত পড়তে পড়তে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু তিনিই বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তো চিরকুমার, বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু জীবিত আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই। আমি যখন নাবালক, তখন থেকেই আমার বাবা-মাকে চেনেন তিনি। অনেকদিন ধরেই শুনেছেন যে ছেলে হিসেবে আমি নাকি হিরের টুকরো। সেইজন্যেই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আমার হাতে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ মুদতে পারবেন। আমি তো সব শুনে এমন তোতলা হয়ে গেলাম যে, সামান্য ধন্যবাদটুকুও দিতে পারলাম না। যথাবিধি শেষ হল উইল, ওঁর সই হবার পর সাক্ষী হিসাবে সই করল আমার কেরানি[৫]। উইলটা লেখা হয়েছে নীল কাগজে। আর এই কাগজগুলো তো বললামই তাঁর নিজের হাতের লেখা উইলের খসড়া। উইলের পালা চুকে গেলে মি. ওলডাকার বললেন যে, বাড়ির লিজ, মর্টগেজ, রসিদ, টাইটেল-ডিড ইত্যাদি অনেকরকম দলিল আমার একবার দেখে এবং বুঝে নেওয়া দরকার। এসব কাজ একেবারে চুকেবুকে না-যাওয়া পর্যন্ত নাকি কিছুতেই শান্তি পাবেন না উনি। তাই অনেক করে অনুরোধ করলেন, গতরাতেই যেন উইলটা নিয়ে তাঁর নরউডের বাড়িতে যাই সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্যে। যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'তুমি কিন্তু বাবা একটা কথাও এখন তোমার বাবা মা-কে জানিয়ো না। সব শেষ করে তারপর তাঁদের

চমকে দেওয়া যাবে, কি বল? এ নিয়ে বেশ জেদাজেদি শুরু করলেন উনি এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে তবে বিদায় নিলেন।

'ঝুঝতেই পারছেন মি. হোমস তাঁর এই সামান্য অনুরোধ না-শোনার মতো মনের অবস্থা আমার তখন নেই। তিনি যা বলতেন, তাই শুনতে রাজি ছিলাম তখন। আমার যা উপকার তিনি করলেন, তা ভোলার নয় এবং তাঁর যেকোনো ইচ্ছাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেয়েছিলাম আমি। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। জানিয়ে দিলাম যে জরুরি কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় কত রাতে যে বাড়ি ফিরব তার কোনো ঠিক নেই। মি. ওলডাকার বলে গেছিলেন ন-টার আগে তিনি বাড়িতে না-ও থাকতে পারেন। কাজেই ন-টার সময়ে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে সাপার খাওয়ার নিমন্ত্রণও জানিয়ে গেলেন। বাড়ি খুঁজে বের করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল আমায়। কাজেই সাড়ে ন-টা নাগাদ পৌঁছোলাম আমি। তাঁকে দেখলাম—'

'এক সেকেন্ড!' হোমস বলল, 'দরজা খুলেছিল কে?'

'একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক। আমার তো মনে হল ঘরকন্নার বন্দোবস্ত তিনিই করেন।'

'আর আপনার নাম উল্লেখ করেছিলেন এই স্ত্রীলোকটিই, তাই না?'

'এগজ্যাক্টলি।' বলল ম্যাকফারলেন।

'তারপর বলে যান।'

ঘামে-ভেজা কপাল মুছে নিয়ে বলে চলল ম্যাকফারলেন, 'পিছু পিছু এলাম বসবার ঘরে। পরিমিত সাপার আগে থেকেই সাজানো ছিল যেখানে। খাওয়ার পরে মি. জোনাস ওলডাকার আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা আয়রন-সেফ দেখলাম। মি. ওলডাকার সেফটা খুলে ফেলে একগাদা দলিল বার করে আমাকে দেখাতে বসলেন। দলিলের পাহাড় থেকে যখন চোখ তুললাম তখন রাত হয়েছে অনেক। এগারোটা কি বারোটা অথবা তার মাঝামাঝি হবে। মি. ওলডাকার আর স্ত্রীলোকটিকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো আগাগোড়া খোলাই ছিল— আমাকে তার মধ্যে দিয়েই বিদায় দিলেন তিনি।'

'পর্দা ফেলা ছিল কি?' শুধোলেন হোমস।

'ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় অর্ধেক ফেলা ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জানলাটা পুরোপুরি খুলে নেওয়ার জন্যে পর্দাটা তুলে ধরেছিলেন উনি। ছড়িটা খুঁজে পেলাম না। মি. ওলডাকার বললেন, "ঘাবড়াও মাত বাবা, মাঝে মাঝে এখন তো দেখা হবেই। আবার না-আসা পর্যন্ত ওটা আমার কাছেই গচ্ছিত থাকুক, কেমন?" চলে এলাম আমি। আসবার সময় দেখে এলাম আয়রন-সেফ খোলা, দলিলপত্র বান্ডিল বাঁধা অবস্থায় টেবিলের উপর রাখা। এত রাত হয়ে গেছিল যে ব্ল্যাকহিদে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি[৬] গতরাত্রে। তাই 'অ্যানারলি আর্মস'-এ রাত কাটিয়ে আজ সকালে ট্রেনে উঠে কাগজে চোখ পড়তেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। এর আগে কী হয়েছে না-হয়েছে, কিছুই জানি না আমি।'

চমকদার এই ব্যাখ্যানা বলার সময়ে বারদুয়েক ভুরু তুলেছিল লেসট্রেড। এখন বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, মি. হোমস?'

'ব্ল্যাকহিদে পৌঁছোনোর আগে নয়।'

'নরউডে বলুন।' বলল লেসট্রেড।

'ও হ্যাঁ, নরউডেই বটে।' বলল হোমস— মুখে তার অতি-পরিচিত পেটেন্ট দুর্বোধ্য হাসি।

বিচিত্র কৌতূহল চোখে নিয়ে বলল লেসট্রেড, 'মি. শার্লক হোমস, দেখছি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা দরকার। মি. ম্যাকফারলেন,, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে নীচে। দুজন কনস্টেবল অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে বাইরে।' শেষবারের মতো করুণ মিনতি-মাখানো চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকফারলেন। অফিসার দুজন দু-পাশে থেকে তাকে নিয়ে গেল অপেক্ষমাণ গাড়িতে। লেসট্রেড কিন্তু নড়ল না।

উইলের খসড়া করা নোটবইয়ের ছোঁড়া কাগজগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল হোমস— তার সারামুখে আগ্রহের নিবিড় রোশনাই।

কাগজগুলো লেসট্রেডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল সে, 'দলিলটায় কতকগুলো বিদঘুটে পয়েন্ট রয়েছে, তাই না লেসট্রেড?'

এমনভাবে কাগজগুলো দেখতে লাগল লেসট্রেড যেন সব কিছুই গুলিয়ে গেল তার। একটু পরে বললে, 'লেখাটা পড়াও তো দেখছি বেশ মুশকিল। প্রথম কয়েকটা লাইন বেশ পড়া যাচ্ছে, তারপর আবার দ্বিতীয় পাতার মাঝের লাইনগুলোও বেশ স্পষ্ট। আর বোঝা যাচ্ছে সবশেষের দু-একটা লাইন। এগুলো ঠিক যেন ছাপার অক্ষরে লেখা। কিন্তু মাঝেরগুলো, বিশেষ করে তিন জায়গায় লেখা এমনই যাচ্ছেতাই যে একদম পড়তে পারছি না আমি।'

'এর মানে কী?' শুধোল হোমস।

'আপনি বলুন না এর মানে কী? পালটা প্রশ্ন করল লেসট্রেড।

'মানে অতি সোজা। এটা লেখা হয়েছে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। স্পষ্ট লেখা মানে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, খারাপ লেখা মানে ট্রেন চলছিল, আর একদম যাচ্ছেতাই লেখা মানে ট্রেন কোনো পয়েন্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। যেকোনো সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট এক নজরেই বলবেন যে খসড়া করা হয়েছে শহরতলির লাইনে কেননা কোনো বিরাট শহরের একেবারে কাছটিতে আর কোথাও পর পর এত পয়েন্ট দেখতে পাওয়া যায় না। ধরে নেওয়া যাক, ট্রেন চলার সময়ে সারাপথটুকুই খসড়া করতে গেছে। ট্রেনটা তাহলে এক্সপ্রেস; নরউড আর লন্ডন ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু থেমেছে একবারই।'

হাসতে লাগল লেসট্রেড।

'মি. হোমস, আপনি যখন আপনার থিয়োরি নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন, তখন আর আপনার নাগাল পাওয়া এ-শর্মার কর্ম নয়। বর্তমান কেসের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক তাই তো বুঝলাম না!'

'সম্পর্ক এইটুকু যে, জোনাস ওলডাকার যে গতকাল নরউড থেকে লন্ডন ব্রিজ আসার সময়ে উইলটা লিখেছিলেন— ম্যাকফারলেনের এই কাহিনির অন্তত এই অংশটুকুর সত্যতা প্রমাণিত হল। এ-রকম দরকারি একটা দলিল এমন যা-তা ভাবে লেখা হয়েছে ভাবলেও অদ্ভুত লাগে— তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়াতে পারে যে, ওলডাকার উইলটায় কোনোরকম গুরুত্বই আরোপ করেননি। উইলমতোই যে সব কিছু হবে, এ-রকম ধারণা একেবারেই তাঁর মনে ছিল না। কার্যকর করার ইচ্ছে না-নিয়ে কোনো উইল যদি কেউ লেখে, তাহলে তা এইভাবেই লেখা স্বাভাবিক।

লেসট্রেড বলল, 'ভুলবেন না, নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাও লেখা হয়েছে এইসঙ্গে।'

'ওহো, তুমি বুঝি তাই মনে কর?'

'আপনি মনে করেন না?'

'হতেও পারে। কেসটা কিন্তু এখনও তেমন পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে।'

'এখনও হয়নি? এমন জলবৎ তরলং জিনিসটা যদি এখনও অপরিষ্কার থেকে যায় আপনার কাছে, তাহলে তো আমি নাচার। এমন কী আর কঠিন ব্যাপার! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যদি একটা জোয়ান ছেলে একদিন শোনে যে বিশেষ একটা বুড়ো অক্কা পেলেই বিরাট একটা সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে, তখন সে করবে কী? খবরটা পাঁচকান না-করে চুপিসারে বুড়োর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়ে সেই রাতেই তাঁর বাড়িতে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করবে সবার আগে। দেখা করার অছিলা খুঁজে বার করাটা বিশেষ কিছু কঠিন নয়। তারপর বাড়ির বাইরে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কোথাও যতক্ষণ-না বুড়োর একমাত্র সঙ্গী চাকরটার নাক ডাকতে শুরু করেছে। এরপর তো খুবই সহজ। নিরালায় নিশুতি রাতে বুড়োর ঘরে ঢুকে তাঁকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেওয়ার পর লাশটাকে কাঠের গাদায় ঢুকিয়ে সবসুদ্ধ আগুন লাগিয়ে দিয়ে খোশমেজাজে বাকি রাতটা কাছাকাছি কোনো হোটেলে কাটিয়ে দেওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক, মি. হোমস? ঘরের মধ্যে আর ছড়িটার ওপর রক্তের দাগ যা পাওয়া গেছে তা খুবই সামান্য। অর্থাৎ আগে থেকেই খুনির মতলব ছিল রক্তারক্তি না-করেই কাজ সারা। লাশ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার মূলেও সেই কারণ— সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কীরকম লাগল মি. হোমস? সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কি?'

'একটু বেশি রকমের সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। মাই গড লেসট্রেড, তোমার মস্ত মস্ত গুণগুলোয় কল্পনায় খাদ একেবারেই নেই। কিন্তু একটু যদি থাকত, এক মুহূর্তের জন্যেও যদি বেচারা ম্যাকফারলেনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে— তাহলে তুমি যত বড়ো দুঃসাহসীই হও না কেন, দিনে উইল করার প্রায় সঙ্গেসঙ্গে সেই রাতেই বুড়ো ওলডাকারকে কি খুন করার প্ল্যান করতে? দু-দুটো অসাধারণ ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়াটা তোমার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত না? আর দেখ, খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে— অথচ সাক্ষী রেখে যাচ্ছে চাকরকে। এ কেমনতরো প্ল্যান? সবশেষে, এত কষ্টে লাশটাকে সরিয়ে এনে কাঠের গাদায় আগুন দিলে খুনের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে— অথচ, রক্তমাখা ছড়িটা রেখে এল বুড়োর ঘরেই— তুমি হলে তাই করতে কি? কী হে, কীরকম বুঝছ? এসব সম্ভব বলে মনে হয়?'

'ছড়ি সম্বন্ধে বলা যায় যে, অবশ্য আপনিও তা জানেন, খুনের সময়ে এবং পরে খুনি বেসামাল হয়ে পড়ে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে, যা ঠান্ডা মাথায় কারোর পক্ষেই সম্ভব হয় না। আবার ঘরে ফিরে গিয়ে ছড়ি আনার সাহস বোধ হয় তার ছিল না। না, মি. হোমস, এতে চলবে না। অন্য কোনো থিয়োরি যদি থাকে তো দিন।'

'কম করে আধ ডজন থিয়োরি এই মুহূর্তে দিতে পারি তোমায়!'

'একটা পয়েন্ট শুধু মনে রাখবেন মি. হোমস, মৃতের ঘর থেকে যতদূর জানি কোনো কাগজপত্র খোয়া যায়নি। আর, কাগজপত্র খোয়া না-গেলে সমূহ লাভ যার— এমন লোক শুধু একজনই আছে পৃথিবীতে। আইনানুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন মি. ম্যাকফারলেন, কাগজপত্র তো যথাসময়ে তার হাতে আসছেই, কাজেই সে তা সরাতে যাবে কেন?'

কথাটা শুনে মনে হল হোমসের মনে খটকা লেগেছে।

'অস্বীকার করে লাভ নেই যে প্রমাণগুলো সবই তোমার থিয়োরির অনুকূলে। তা সত্ত্বেও একটা কথাই শুধু বলে রাখতে চাই তোমায় লেসট্রেড— অন্যান্য থিয়োরি থাকা খুব বিচিত্র নয়। যাক, তোমার কথামতোই দেখা যাক, কার দৌড় কতদূর। গুড মর্নিং। নরউডে আজকে এলেও আসতে পারি। গেলে দেখতে পাব কীরকম কাজকর্ম চলছে তোমার।'

লেসট্রেড চোখের আড়াল হতেই তৎপর হয়ে উঠল হোমস। এমনভাবে গোছগাছ শুরু করে দিলে না-জানি কী হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজই তাকে করতে হবে সারাদিন ধরে।

ফ্রক কোটটার মধ্যে হাত লাগাতে লাগাতে বলল হোমস, 'ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হচ্ছে, ব্ল্যাকহিদ।'

'ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হচ্ছে ব্ল্যাকহিদ।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৩

'নরউড নয় কেন?'

'কেননা, কেসটার পয়লা নম্বর বৈচিত্র্য হচ্ছে একই দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো আশ্চর্য ঘটনা। পুলিশ মনোযোগ দিয়েছে দ্বিতীয় ঘটনায় কেননা খুনি সরাসরি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কিন্তু আমার মতে যুক্তির পথ ধরেই যদি চলতে হয়, তাহলে প্রথম ঘটনা থেকেই তদন্ত শুরু করা উচিত।'

অনেক বেলায় ফিরল হোমস। শুকনো মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যর্থ হয়েছে সে।

'ব্ল্যাকহিদ গেছিলে?'

'গেছিলাম এবং গিয়েই জেনেছি যে বুড়ো ওলডাকার-এর মতো পাজির পা-ঝাড়া দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। মা বাড়িতেই ছিলেন। ছোটোখাটো হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রমহিলা, নীল নীল চোখ। ভয়ে আর ঘৃণায় তাঁর সে-কাঁপুনি যদি দেখতে তুমি। ম্যাকফারলেনের অপরাধ স্বীকার করা তো দূরের কথা, এ-রকম কোনো সম্ভাবনাও তিনি মানতে রাজি নন। ভেবেছিলাম, ওলডাকারের শোচনীয় পরিণতি শুনে বিস্মিত হবেন ভদ্রমহিলা, নিদেনপক্ষে একটু দুঃখও প্রকাশ করবেন। কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেলেন না উনি। ওলডাকারের নাম শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে গিয়ে প্রথমেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'মানুষ তো নয়, যেন একটা বড়ো সাইজের বাঁদর। শুধু আজ বলে নয়, ওর জোয়ান বয়স থেকেই এইরকম— যেমন ধড়িবাজ, তেমনি বদমাশ।'

'শুধোলাম— আপনি তাহলে সে সময় ওঁকে চিনতেন বলুন?'

'শুধু চিনতাম নয়, হাড়ে হাড়ে চিনতাম। লোকটা একসময়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মি. হোমস। কিন্তু আমার কপাল ভালো, সেই সময়ে আমার একটু সুমতি হওয়ায় এনগেজমেন্ট ভেঙে দিয়ে বিয়ে করি ওর চাইতে গরিব একজনকে।'

'ওলডাকার তাহলে এখন আপনাকে ক্ষমা করেছেন বলতে হবে। তা না-হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলেকে দিয়ে যেতেন?'

'আগুনে যেন ঘি পড়ল। দপ করে জ্বলে উঠে চিৎকার করে উঠলেন ম্যাকফারলেনের মা— "জীবিত অথবা মৃত জোনাস ওলডাকারের কাছ থেকে কানাকড়িও চাই না আমার ছেলে অথবা আমি।"

'বৃথাই চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু আমাদের অনুমানের অনুকূলে তো দূরের কথা, প্রতিকূলেও কোনো পয়েন্ট পেলাম না ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে গেলাম নরউডে।

'প্রকাণ্ড হালফ্যাশনের ভিলা এই ডিপ ডেন হাউস। ইট বার-করা দেওয়াল, পলেস্তারার কোনো বালাই নেই। অনেকটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটা, সামনের লনটা লরেল লতায় ঢেকে গেছে। রাস্তা থেকে একটু পেছনে ডান দিকে কাঠের স্তূপ রাখার উঠোন— আগুন লেগেছিল এইখানেই। নোটবইয়ের পাতায় মোটমুটি একটা স্কেচ করে এনেছি জায়গাটার। বাঁ-দিকে জানলাটা মি. ওলডাকারের ঘরের। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যায়। আজকের অভিযানে এইটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। লেসট্রেডকে দেখতে পেলাম না ওখানে, কিন্তু হেড কনস্টেবল বেশ খাতির করে সব দেখালে। আমি যাওয়ার ঠিক আগেই ওরা নাকি হিরে-জহরত পাওয়ার মতো বিরাট একটা আবিষ্কার করেছে শুনলাম। ছাইগাদা ঘাঁটতে

ঘাঁটতে পোড়া দেহাবশেষ ছাড়াও কতকগুলো বিরং ধাতুর চাকতি পেয়েছে। খুব যত্ন করে চাকতি পরীক্ষা করে দেখলাম ওগুলো ট্রাউজার্সের বোতাম না হয়ে যায় না। একটা বোতামের ওপর 'হিয়ামস' লেখা দেখে চিনতে পারলাম বুড়ো ওলডাকারের দর্জিকে। এরপর লনটা তন্নতন্ন করে দেখলাম যদি কিছু চিহ্ন-টিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে জমি শুকিয়ে এমনই লোহার মতো হয়ে গেছিল যে শুধু পণ্ডশ্রমই হল। কাঠের গাদার সঙ্গে এক রেখায় নীচু একটা ঝোপ ছিল। এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভারী একটা বস্তু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— এ ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। অর্থাৎ যা কিছু পেলাম, সবই পুলিশের থিয়োরির স্বপক্ষে। অগাস্টের সূর্য পিঠে নিয়ে লনের ওপর হামাগুড়ি দিলাম ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু যে-তিমিরে ছিলাম, রইলাম সেই তিমিরেই। যখন এত করেও এক কণা আলোকপাত করতে পারলাম না, তখন ধুত্তোর বলে উঠে দাঁড়ালাম ধুলো ঝেড়ে।

'যাই হোক, এইসব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার পর গেলাম শোয়ার ঘরে। যথারীতি পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ দেখলাম খুবই সামান্য, তাও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও চিহ্নটা যে তাজা রক্তের সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। ছড়িটাকে ওরা নিয়ে গেছিল, কিন্তু তাতেও শুনেছি রক্তের দাগ খুবই সামান্য। ছড়িটা যে আমাদের মক্কেলের, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ম্যাকফারলেন নিজেই তো স্বীকার করেছে। কার্পেটের ওপর দুজন পুরুষের পায়ের ছাপ পেলাম— কিন্তু কোনো তৃতীয় জনের নয় অর্থাৎ আর একবার টেক্কা মারল লেসট্রেড। প্রতিটি প্রমাণ, প্রতিটি খুঁটিনাটি একে একে জোরালো করে তুলছে ওর থিয়োরিকে, আর আমরাই শুধু ন যযৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে লম্বা থিয়োরিই আউড়ে যাচ্ছি।

'আশার সামান্য একটু আলো দেখেছিলাম, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত টিকল না। আয়রন-সেফের জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখলাম। বেশির ভাগ কাগজপত্রই অবশ্য লেসট্রেড রেখে গেছিল বাইরে টেবিলের ওপর। সিল-করা কতকগুলো খামে ছিল কাগজগুলো। পুলিশ দু-একটা খুলেছে দেখলাম। দেখেশুনে দলিলগুলো খুব বিশেষ দরকারি বলে মনে হল না। ব্যাঙ্কের পাশ-বই দেখে মি. ওলডাকারের আর্থিক প্রাচুর্যেরও বিশেষ কোনো প্রমাণ পেলাম না। এইটুকু বুঝলাম যে সবগুলো কাগজ সেখানে নেই। কতকগুলো দলিলের বার বার উল্লেখ দেখে মনে হল আসল দলিল বোধ হয় সেগুলোই। কিন্তু খুঁজে পেলাম না একটাও। শুধু এইটুকুই যদি আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তো এক হাত নেওয়া যায় লেসট্রেডের ওপর। লেসট্রেড খুব বড়াই করে গেল না, যে লোক সব কিছুরই মালিক হতে চলেছে দু-দিন পরেই, তাঁর পক্ষে কাগজপত্র সরানো কোনোমতেই সম্ভব নয়? কাজেই, কাগজপত্র যে কিছু হারিয়েছে তা প্রমাণ করতে পারলে অন্তত কিছুটা কাজ হয়।

'বাড়ির প্রতিটি মিলিমিটার তন্নতন্ন করে দেখে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়লাম ঘরকন্নার কাজ যিনি দেখাশোনা করেন, তাঁকে নিয়ে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস লেক্সিংটন। মাথায় খাটো, গায়ের রং ময়লা, কথাবার্তা খুবই অল্প বলেন, আর তেরচা চোখে সবসময়ে সন্দেহের ছায়া। ইচ্ছে করলে লেক্সিংটন আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারতেন। কিন্তু অনেক কিছু তো দূরের কথা, সামান্য কিছুও বার করতে পারলাম না তাঁর মোম-আঁটা মুখ থেকে। সাড়ে ন-টার সময় মি. ম্যাকফারলেনকে তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার আগেই নাকি তাঁর হাত দুটো খসে

যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে তো আর এত বড়ো কাণ্ডটা ঘটত না। সাড়ে দশটার সময় শুতে গেছিলেন তিনি। শোয়ার ঘর বাড়ির আর এক প্রান্তে, কাজেই এরপর কী হয়েছে-না-হয়েছে তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় মি. ম্যাকফারলেন তাঁর টুপি আর ছড়িটা হল ঘরে রেখে গেছিলেন। হঠাৎ "আগুন, আগুন", চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। মি. ওলডাকারকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তাঁর কোনো শত্রু ছিল কি না? শত্রু কার নেই? কিন্তু মি. ওলডাকার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা এবং ব্যাবসা-সংক্রান্ত কথা না-থাকলে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন না। বোতামগুলো দেখেছেন মিসেস লেক্সিংটন। গত রাতে মি. ওলডাকার যে-ট্রাউজার্স পরেছিলেন বোতামগুলো তারই। মাসখানেক বৃষ্টি না-হওয়ায় কাঠের গাদা শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল। কাজেই খড়ের গাদার মতো দাউ দাউ করে সব জ্বলতে থাকে। মিসেস লেক্সিংটন যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আগুনের লকলকে শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়েছিলেন তিনি এবং দমকল বাহিনীর লোকেরা। মি. ওলডাকারের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা দলিলপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না মিসেস লেক্সিংটন।

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এই হল আমার আজকের ব্যর্থতার রিপোর্ট। কিন্তু তবুও— তবুও'— প্রবল প্রত্যয় যেন ঠিকরে পড়ে তার সরু সরু শিরাবহুল হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে দিয়ে— 'তবুও আমি জানি সব ভুল, সমস্ত মিথ্যে। কোথায় যেন কী-একটা লুকিয়ে আছে। কিছুতেই আড়াল থেকে তা সামনে আসছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসেস লেক্সিংটন ভালোভাবেই জানেন তা কী। ভদ্রমহিলার দু-চোখে আমি এমন এক চাপা বেপরোয়া ভাব দেখেছি যা শুধু জেনেশুনে অপরাধ যারা করে বা লুকিয়ে রাখে তাদের চোখেই দেখা যায়। যাক, এ নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই, ওয়াটসন। দৈব যদি সহায় হয়, কপালজোরে আকাশ ফুঁড়ে কোনো প্রমাণ-টমান যদি হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তবেই জেনো এ-রহস্যের আসল সমাধান আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারব জনসাধারণকে। তা না-হলে আমাদের সাফল্যের ইতিহাসে চিরকাল ব্যর্থতার কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে নরউড অন্তর্ধানের এই বিচিত্র মামলা।'

আমি বললাম, 'অত ভেঙে পড়ছ কেন, ম্যাকফারলেনের চেহারা দেখেও তো জুরিদের মন টলতে পারে?'

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বড়ো বিপজ্জনক যুক্তি এনে ফেললে তুমি। পয়লা নম্বরের খুনে গুন্ডা বার্ট স্টিভেন্স-এর কথা তোমার মনে আছে? '৮৭ সালে আমাদেরও তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? মনে পড়েছে? তার চেয়ে গোবেচারা, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ কি আর তুমি দেখেছ?'

'তা অবশ্য সত্যি।'

'দু-নম্বর থিয়োরি না-পেলে ত্রিলোকের কারো ক্ষমতা নেই ম্যাকফারলেনকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। ওর বিরুদ্ধে যে-মামলা দাঁড় করানো হবে, তার মধ্যে একরতি ভুলও খুঁজে পাবে না তুমি— উলটে যত দিন যাচ্ছে, ততই নিত্যনতুন প্রমাণ বার করে কেসটা জোরালো করে তুলছে লেসট্রেড। ভালো কথা, কাগজপত্র দেখে মনে হল তদন্ত চালানোর মতো অন্তত একটা সূত্র পেয়েছি আমি। পাশবইতে অত কম জমা দেখে সন্দেহ হওয়ায় একটু ভালো করে খুঁজতেই দেখলাম গত এক বছর এন্তার চেক কাটা হয়েছে মি. কর্নিলিয়াস নামে এক ভদ্রলোকের

নামে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কমে যাওয়ার মূল কারণ হল এইটাই। কে এই মি. কর্নিলিয়াস? অবসর নেওয়ার পরেও মি. ওলডাকারের সঙ্গে তার এত টাকা লেনদেনের কারণ কী, তা আমাকে জানতেই হবে। এ-ব্যাপারে লোকটার কোনো হাত আছে কি? এও হতে পারে আসলে কর্নিলিয়াস একজন দালাল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো কাঁচা অথবা পাকা যা হয় একটা রসিদ থাকা দরকার। কিন্তু সে-রকম কিছুই নেই— অথচ বিপুল অর্থের বিস্তর চেক কাটা হয়েছে তার নামে। আর কিছু যদি না-পারি তাহলে অন্তত এই খাতেই শুরু করতে হবে আমার গবেষণা। ব্যাঙ্কে গিয়ে তদন্ত করে জানতে হবে, যে-ভদ্রলোক এতগুলো চেক নিয়মিত ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে কী তার পরিচয়। কিন্তু সত্যিই কি শেষই পর্যন্ত কোনো সুরাহা হবে ওয়াটসন? আমার মন বলছে, হবে না। বুক ফুলিয়ে বেচারা ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবে লেসট্রেড। আর কাগজ কাগজে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিজয়গাথা লেখা হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের।'

সে-রাতে শার্লক হোমস ঘুমোতে পেরেছিল কি না জানি না। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নেমে দেখলাম উশকোখুশকো অবস্থায় আগে থেকেই বসে রয়েছে সে। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রাম।

আমাকে দেখেই টেলিগ্রামটা আমার দিকে টোকা মেরে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'ওয়াটসন এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?'

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে:

গুরুত্বপূর্ণ তাজা প্রমাণ হাতে এসেছে। ম্যাকফারলেনের অপরাধ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হল। আমার উপদেশ— এ-কেস ছেড়ে দিন।— লেসট্রেড।

'ব্যাপার বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।'

'আমার ওপর এক হাত নেওয়ার আনন্দে এবার বক দেখাতে শুরু করেছে লেসট্রেড', তিক্ত হেসে বলল হোমস। 'আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না, সে-সময় আসেনি এখনও। খুব দরকারি, দারুণ গুরুত্বপূর্ণ টাটকা প্রমাণের দু-দিকে ধার থাকে, জান তো। শাঁখের করাতের মতো যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। লেসট্রেড যেদিক দিয়ে আমায় কুপোকাত করতে চাইছে, ওরই শিলনোড়া দিয়ে উলটোদিক থেকে হয়তো আমিও ওকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও ওয়াটসন। আজ আমরা একসঙ্গেই বেরোব। বেশ বুঝছি, তোমার সঙ্গ, তোমার উপদেশ, তোমার সাহায্য ছাড়া এক পা-ও আজ আমি চলতে পারব না।'

হোমস নিজে কিন্তু মুখে একটা দানাও দিলে না। না-দেওয়ার কারণও আমি জানি। তার অদ্ভুত খামখেয়াল স্বভাবের এও একটা দিক। চিন্তাভাবনা উদ্‌বেগের চরমে পৌঁছোলেই খাওয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে সে। কাজেই সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট স্পর্শ না-করে সে যখন আমাকে নিয়ে রওনা হল নরউডের দিকে, তখন খুব বেশি অবাক হইনি। ডিপডেন হাউসের চারদিকে তখনও এখানে-সেখানে বহু লোক দাঁড়িয়ে জল্পনাকল্পনা করছিল। মনে মনে বাড়িটা সম্বন্ধে যে-ছবি এঁকেছিলাম, বাস্তবেও দেখলাম প্রায় তাই। ফটকের মধ্যে মোলাকাত হয়ে গেল লেসট্রেডের সঙ্গে। জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছিল তার চোখ-মুখের হাবভাবে।

আমাদের দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড, 'হ্যালো, মি. হোমস কতদূর এগোলেন? আমার থিয়োরি যে ভুল তা প্রমাণ করতে পারলেন নাকি? হাতের তাসে তুরুপ মিলল?'

হোমস বলল, 'এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোইনি আমি।'

'কিন্তু আমরা পৌঁছেছি। গতকালই পৌঁছেছিলাম, আপনাকে তা বলেওছি। আর, আজ তা প্রমাণিত হল এবং এখন আপনাকে দেখাব। যাক, এবার তাহলে আপনার আগে আগেই চলেছি আমরা, কি বলেন মি. হোমস?'

হোমস বলল, 'মনে হচ্ছে দারুণ অস্বাভাবিক একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছ? ব্যাপার কী!'

অট্টহাস্য করে উঠল লেসট্রেড।

'আপনি দেখছি কিছুতেই আমাদের মতো হার স্বীকার করতে রাজি নন। প্রতিবারেই ঠিক পথে চলব, এমনটি আশা করা উচিত নয়— কী বলেন, ডা. ওয়াটসন? দয়া করে এদিকে আসুন, ম্যাকফারলেন যে খুনি, এ-সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহ এখনও থাকে, তবে তা ভঞ্জন করে যান।'

লেসট্রেডের পিছু পিছু প্যাসেজ পেরিয়ে অন্ধকার একটা হল ঘরে পৌঁছোলাম আমি আর হোমস।

লেসট্রেড বলল, 'খুন করার পর টুপি নেওয়ার জেন্য এ-ঘরেই এসেছিল ম্যাকফারলেন ছোকরা। এদিকে দেখুন।' বলেই আচম্বিতে নাটকীয়ভাবে ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়ালের সামনে ধরল সে।

সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে দেখলাম সাদা রক্তের দাগ। জ্বলন্ত কাঠিটা আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে যা দেখলাম তা নিছক রক্তের দাগ নয়, আরও কিছু। বুড়ো-আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে সাদা দেওয়ালের ওপর।

'মি. হোমস, আপনার আতশকাচ দিয়ে দেখুন দাগটা।'

'হ্যাঁ দেখেছি!'

'জানেন তো দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনো এক হয় না?'

'এ-রকম কথা শুনেছি বটে।'

'বেশ, তাহলে এই নিন মোমের ওপর তোলা ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ। এ-ছাপ নেওয়া হয়েছে আজ সকালেই। এবার দয়া করে ছাপ দুটো পাশাপাশি রেখে একটু মিলিয়ে দেখবেন কি?'

দেওয়ালের রক্তের ছাপের পাশে মোমের ছাপটা ধরতেই আর আতশকাচের দরকার হল না। শুধু চোখেই পরিষ্কার দেখলাম দুটো ছাপই উঠেছে একই বুড়ো আঙুল থেকে। এবং চকিতে বুঝলাম, ম্যাকফারলেনের ফাঁসির দড়ি আলগা করার ক্ষমতা হোমসের কেন, ত্রিভুবনের কারো নেই।

লেসট্রেড বললে, 'এইখানেই তদন্তের শেষ।'

'হ্যাঁ, সব শেষ।' প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

'সব শেষ।' বলল হোমস।

হোমসের সুরটা যেন কীরকম! কানে লাগতেই ফিরে তাকালাম ওর পানে।

দেখি আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর চোখে-মুখে সর্বদেহে। চাপা উল্লাসে যেন ময়ূরের মতো নৃত্য জুড়েছে ওর দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু। আকাশের তারার মতো ঝকঝক করছিল

ওর চোখ দুটো। মনে হল যেন দেহের মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে অদম্য অট্টহাসিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে সে।

'কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! ছোকরার পেটে পেটে এত শয়তানি? আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি। দেখতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট— যেন সাত চড়ে রা বেরোয় না। আর তলে তলে কিনা... নাঃ লেসট্রেড, খুব শিক্ষা হল আমার। নিজের বিচারবুদ্ধিকে দেখছি আর বিশ্বাস করা চলে না।'

'তা ঠিকই বলেছেন মি. হোমস। আমাদের মধ্যে কারো কারো আত্মবিশ্বাসের বড়ো বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অতটা ঠিক নয়।' লোকটার স্পর্ধা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। হোমস কিন্তু গায়ে মাখল না কিছু।

বলল, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য আলনা থেকে টুপি নেওয়ার সময়ে দেওয়ালের উপর আঙুল টিপে ছাপটা রেখে গেল ম্যাকরফারলেন। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে কী নিরেট গাধা আমি। এমন স্বাভাবিক জিনিস।... ভালো কথা লেসট্রেড, এতবড়ো আবিষ্কারটা কার শুনি?' হোমসের স্বর অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু কথা বলার সময় যেন চাপা উত্তেজনা ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল তার ভাবে ভঙ্গিতে।

'মিসেস লেক্সিংটনের। রাতের পাহারাদারকে ডেকে দাগটা দেখান উনি।'

'রাতের পাহারাদার তখন ছিল কোথায়?'

'যে-ঘরে খুনটা হয়েছে সেই ঘরেই ডিউটি ছিল তার। ঘরের জিনিসপত্র যাতে খোয়া না-যায়, তাই তাকে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু গতকাল এ-দাগ পুলিশের চোখে পড়েনি কেন?'

'হল ঘরের দেওয়াল পরীক্ষা করার মতো বিশেষ কোনো কারণ তখন ছিল না বলে। তা ছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘরটা এমন জায়গায় যে সবার চোখ এড়িয়ে যায়। আমরাও তাই বিশেষ নজর দিইনি।'

'ঠিক, ঠিক। দাগটা গতকাল তাহলে ছিল, কেমন?'

লেসট্রেড এমনভাবে হোমসের পানে তাকালে যে আমার মনে হল তার ধারণা মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে তার। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমিও হোমসের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। চোখ-মুখে দেহে খুশির রোশনাই, অথচ কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ এলোমেলো, উদ্দাম।

লেসট্রেড বললে, 'মাঝরাতে ম্যাকফারলেন হাজত থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের ওপর আঙুলের ছাপ রেখে গেছে ফাঁসির পথ সুগম করতে— এই যদি আপনি ভেবে থাকেন, তাহলে আমার আর কোনো জবাব নেই। পৃথিবীতে যেকোনো বিশেষজ্ঞকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি— প্রমাণ করুন তিনি যে এ-ছাপ ম্যাকফারলেনের আঙুলের ছাপ নয়।'

'এ যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'তবে আর কী? মি. হোমস, আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রমাণ যখন পাই, সিদ্ধান্ত তৈরি করি তখন। বসবার ঘরে চললাম আমি রিপোর্ট লিখতে। যদি আপনার আর কিছু বলবার থাকে এ-সম্বন্ধে— চলে আসুন সেখানে।'

আবার নির্বিকার হয়ে গেছিল হোমস। যদিও তখনও তার হাবেভাবে কৌতুকের ছটা আমার চোখ এড়াল না।

'ওয়াটসন, ম্যাকফারলেনের তো ভারি বিপদ হল দেখছি। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। এমন কতকগুলো আশ্চর্য পয়েন্ট এসেছে হাতে যে হাল ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না।'

আন্তরিকভাবেই বললাম, 'শুনে আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছে, হোমস। আমি তো ভাবলাম দফারফা হয়ে গেল বেচারির।'

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? আসল ব্যাপার কি জান? লেসট্রেড খেটেখুটে যেসব প্রমাণ জড়ো করে খাড়া করেছে কেসটাকে, তাদের মধ্যে মারাত্মক গলদ থেকে গেছে একটায়। লেসট্রেড কিন্তু সেই ভুল প্রমাণ নিয়েই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি! কোনটা শুনি?'

'গতকাল হল ঘরটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং আঙুলের কোনো ছাপ আমি তখন দেখিনি। এ-প্রসঙ্গ এখন থাকুক ওয়াটসন। চলো, খোলা রোদ্দুরে এক পাক ঘুরে আসা যাক।'

বাড়ির প্রতিটা দিক নতুন আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোমস। তারপর ভেতরে এসে একতলা থেকে শুরু করে চিলেকোঠা পর্যন্ত কিছুই দেখতে বাকি রাখল না। বেশির ভাগ ঘরেই আসবাবপত্রের কোনো বালাই নেই, তবুও তন্নতন্ন করে দেখতে ছাড়ল না হোমস। ওপরের শোবার ঘর মোট তিনটে, কিন্তু ফাঁকা পড়ে থাকে বারোমাস, কেউই থাকে না সেখানে। চারিদিক ঘিরে চওড়া একটা করিডোর। এইখানে এসেই আবার নতুন করে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল হোমস।

ওয়াটসন, বাস্তবিকই কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেসটায়। আমার তো মনে হয় এবার লেসট্রেডকেও আমাদের দলে টেনে নেওয়া উচিত। আমাদের ওপর টেক্কা দেওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করেছে লোকটা। আমার অনুমান যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তার খানিকটা শোধ নেওয়া যেতে পারে। ঠিক, ঠিক, খাসা মতলব এসেছে মাথায়।'

বাইরের ঘরে বসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-প্রবর পরম উৎসাহে রিপোর্ট লিখে চলেছিল। হোমস এসে বাধা দিয়ে বললে, 'কেসটার রিপোর্ট লিখছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'শেষ না-দেখেই?'

'মানে?'

'মানে এই যে, আমার বিশ্বাস সব প্রমাণ এখনও তোমার হাতে আসেনি।'

হোমসকে হাড়ে হাড়ে চেনে লেসট্রেড এবং বেশ জানে তার এ ধরনের কথাবার্তাকে আমল না-দেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কলম রেখে অদ্ভুতভাবে হোমসের পানে তাকাল সে।

বলল, 'কী বলতে চান মি. হোমস?'

'শুধু একটি কথা— যে-সাক্ষীকে আমাদের দারুণ দরকার, তাকে তুমি এখনও দেখতেই পাওনি।'

'আপনি দেখাতে পারেন?'

'মনে হচ্ছে পারি।'

'তাহলে দেখান।'

'আমার যথাসাধ্য আমি করব লেসট্রেড। কতজন কনস্টেবল আছেন এখানে?'

'তিনজন।'

'চমৎকার! প্রত্যেকে ষণ্ডামার্কা শক্তসমর্থ পুরুষ তো! তারস্বরে চেঁচাতে পারে সবাই?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকেই ষণ্ডামার্কা গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান। কিন্তু তারস্বরে চেঁচানোর সঙ্গে এ-কেসের কী সম্পর্ক তা বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে দেব একটু পরেই— শুধু এই সম্পর্কে নয়, আরও অনেক কিছু। তোমাদের পালোয়ানদের তাহলে হাঁক দাও— আর দেরি করে কী লাভ!'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনজন এসে জমায়েত হল হল ঘরে।

হোমস বললে, 'আউটহাউসে প্রচুর খড় আছে। দুটো আঁটি সেখান থেকে নিয়ে এসো তোমরা। খড়টা থাকলে চট করে সাক্ষী বেরিয়ে আসবে সবার সামনে— অন্তত আমার তো তাই বিশ্বাস। ধন্যবাদ। ওয়াটসনের পকেটে দেশলাই আছে। মি. লেসট্রেড, এবার সবাই মিলে আমার পিছু পিছু চলে এসো ওপরতলায়।'

আগেই বলেছি, ওপরতলায় তিনটে শোবার ঘর ঘিরে ছিল এক চওড়া করিডোর। করিডোরের এক প্রান্তে সদলবলে এসে পৌঁছাল হোমস। কনস্টেবলরা দাঁত বার করে হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। লেসট্রেড বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়েছিল বন্ধুবরের পানে। হোমসের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন ঐন্দ্রজালিক এসে দাঁড়িয়েছে ভেলকি দেখিয়ে আমাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'একজন কনস্টেবলকে দু-বালতি জল আনতে পাঠাও তো লেসট্রেড। খড়ের বান্ডিল দুটো এখানে রাখো মেঝের ওপর— দু-দিকের দেওয়াল থেকে যেন তফাতে থাকে। ঠিক আছে, আমরা তৈরি।'

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ।

মি. শার্লক হোমস, এ কি ছেলেখেলা হচ্ছে? আপনি যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকেন, তবে তা এভাবে লোকহাসানো ভড়ং না-দেখিয়ে খুলে বলা উচিত আপনার।'

'মাই গড লেসট্রেড, তুমি তো জানই, জবরদস্ত কারণ না-থাকলে আমি কিছুই করি না। ঘণ্টা কয়েক আগে সাফল্যের সূর্য যখন প্রায় তোমার দিকেই ঢলে পড়েছিল, তখন আমাকে নিয়ে যে একটু ঠাট্টা-তামাশা জুড়েছিলে তা নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি। কাজেই আমি যদি একটু ধুমধাম করি, একটু উৎসব করি, তাহলে তো তোমার গায়ের জ্বালা হওয়া উচিত নয়। ওয়াটসন, এদিকের জানলাটা খুলে দিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগাও।'

করলাম তাই। জানলা দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসায় পট পট শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল শুকনো খড়ের গাদা, পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে ভরে উঠল সমস্ত করিডোরটা।

'লেসট্রেড, এবার দেখা যাক পাওয়া যায় কি না আমার সাক্ষীকে! সবাই মিলে একসঙ্গে গলা চিরে "আগুন" বলে চিৎকার করে উঠবে। সবাই তৈরি তো? আচ্ছা: এক, দুই, তিন—'

'আগুন!' একসঙ্গে সবাই বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠলাম।

'ধন্যবাদ। আর একবার কষ্ট দেব তোমাদের।'

'আগুন!'

'আর একবার— সবাই মিলে।'

'আগুন!' নরউডের প্রত্যেকেই বোধ হয় আঁতকে উঠেছিল সে বাজখাঁই চেঁচানি শুনে!

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল আশ্চর্য ব্যাপারটা। করিডোরের যে-অংশটা চুনকাম করা নিরেট দেওয়াল ভেবেছিলাম, আচম্বিতে দড়াম করে সেখানকার খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল দরজার মতো এবং গর্তের মধ্যে থেকে খরগোশ যেমন তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে ছিটকে দরজার ওপাশ থেকে এপাশে এসে পড়ল শুকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ।

শান্তস্বরে বলল হোমস, 'ক্যাপিটাল! ওয়াটসন, এক বালতি জল ঢেলে দাও খড়ের গাদায়। ঠিক আছে, ওতেই হবে! লেসট্রেড, এই হল তোমার পয়লা নম্বরের অদৃশ্য সাক্ষী, মি. জোনাস ওলডাকার।'

ফ্যালফ্যাল করে নবাগতের দিকে তাকিয়েছিল লেসট্রেড। আর হঠাৎ করিডোরের জোরালো আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ পিট পিট করে ধূমায়িত খড়ের গাদা আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল ভোজবাজির মতো বেরিয়ে আসা নবাগত লোকটা। জঘন্য মুখ তার— যেমন ধূর্ত, তেমনি কুটিল, মুখের পরতে পরতে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো। হালকা, ধূসর দুটি চঞ্চল চোখ আর ধবধবে সাদা চোখের পাতা দেখলেই কেমন যেন মনে হয় ফিচেল বুদ্ধিতে জুড়ি নেই এ-বুড়োর।

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে লেসট্রেড, 'এসবের মানে কী? এতদিন ওর ভেতরে কী করছিলেন শুনি!'

রাগে গনগনে হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ। কুঁচকে ছোটো হয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করল ওলডাকার। বলল, 'কারো কোনো ক্ষতি করিনি আমি।'

'করেননি? নিরপরাধ একটি ছেলেকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে হলে যা যা দরকার সবই করছেন আপনি। এই ভদ্রলোক না-থাকলে তো আপনার টিকি ধরা যেত না।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল ওলডাকারের কুৎসিত জানোয়ারের মতো মুখখানা। প্যানপেনে নাকি সুরে বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক তামাশা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার।'

'অ্যাঁ, তামাশা? তামাশা বার করে দিচ্ছি আপনার— কয়েক বছরের জন্য রামগরুড়ের ছানা বানিয়ে ছাড়ব আপনাকে। নীচে নিয়ে যাও একে— আমি না-আসা পর্যন্ত বসবার ঘরে আটকে রাখো।'

'ওয়াটসন! চলো এবার দেখা যাক ইঁদুরটা ঘাপটি মেরে বসে ছিল কোথায়।'

কাঠের ওপর পলেস্তারা করা পার্টিশনের ঘায়ে সুকৌশলে লুকোনো দরজাটা। দেখলে মনে হয়, প্যাসেজের শেষ বুঝি এইখানে, কিন্তু দরজা খুললে বোঝা যায় আরও ছ-ফুট পরে নিরেট দেওয়ালের ধারে এসে তার শেষ। বরগার কাছে সরু সরু ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসছিল ঘরটায়। দু-একটা আসবাবপত্র, খাবার আর জল ছাড়াও প্রচুর বই আর দৈনিক পড়ে থাকতে দেখলাম কুঠরির মধ্যে।

বেরিয়ে এসে হোমস বলল, 'স্থপতি হওয়ার সুবিধে তো এইখানেই। কাকপক্ষীকে না-জানিয়ে নিজেই বানিয়ে রেখেছে খাসা চোরাকুঠরিটা—বিটলেমোর সাক্ষী রেখেছে শুধু একজনকে, মিসেস লেক্সিংটন। লেসট্রেড, এ-ভদ্রমহিলাকেও ঝোলায় পুরতে ভুলো না যেন।'

'ভুলব না মি. হোমস। কিন্তু এ-জায়গার হদিশ কী করে পেলেন বলুন তো?'

'প্রথম থেকেই আমার স্থির বিশ্বাস ছিল বিটলে বুড়োটা বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। দুটো করিডোরেই পা মেপে মেপে হেঁটে দেখলাম, ওপরেরটা নীচেরটার চাইতে ছ-ফুট কম লম্বা। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে অমূলক নয় প্রমাণ পেলাম এবং তার গোপন জায়গারও হদিশ পেলাম। আগুন আগুন চিৎকার শুনলে প্রাণের ভয়ে কোটর ছেড়ে সে বেরোবেই— তাই ওই ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন। অবশ্য ওসব কিছু না-করেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেত, কিন্তু তার নিজে বেরিয়ে আসাটা বেশ একটা মজার দৃশ্য হবে মনে করেই এ-নাটকের অবতারণা করেছি। এ ছাড়াও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আজ সকালে তোমার মশকরার প্রতিফল এইভাবে তোমার পাওয়া উচিত।'

'সেদিক দিয়ে আপনি আমার উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন, স্যার। কিন্তু লোকটি যে বাড়িতেই ঘাপটি মেরে আছে— এ-খবর আপনি পেলেন কার কাছ থেকে?'

'বুড়ো আঙুলের ছাপের কাছ থেকে। তুমি বললে, সব শেষ। আমিও বললাম তাই— কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি জানতাম গতকাল এ-ছাপ ছিল না ওখানে। সব জিনিস আমি একটু বেশি খুঁটিয়ে দেখি, আড়ালে-আবডালে দু-চার কথা বলতেও ছাড় না তোমরা। গতকাল হল ঘরটাও আমি এইভাবে দেখেছিলাম বলে ভালো করেই জানতাম দেওয়ালে কোনো দাগ ছিল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছাপটা ফেলা হয়েছে রাত্রেই।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'খুব সহজে। প্যাকেটগুলো গালামোহর করার সময়ে জোনাস ওলডাকার একবার ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলটা নরম মোমের ওপর চেপে ধরে গালার ওপর টিপে ধরেন। জিনিসটা এমনই স্বাভাবিক এবং এতই তাড়াতাড়ি হয়েছে যে খুব সম্ভব ম্যাকফারলেনের নিজেরও তা মনে নেই। ওলডাকার অবশ্য মনে কোনো প্যাঁচ না-নিয়েই এ-কাজ করেছেন। পরে, চোরাকুঠরির মধ্যে একলা বসে সমস্ত কেসটা মনে মনে তোলাপাড় করার সময়ে ওঁর মাথায় আসে যে, ছাপটাকেই কাজে লাগিয়ে অকাট্য প্রমাণ খাড়া করে আরও জোরালো করে তোলা যাবে বেচারি ম্যাকফারলেনের মামলাকে। গালামোহর থেকে বুড়ো আঙুলের ছাপটা মোমের ছাঁচে তুলে নেওয়া খুবই সোজা। তারপরে আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে রক্ত বার করে, সেই রক্ত দিয়ে মোমের ছাঁচটাকে ভিজিয়ে নিয়ে দেওয়ালে টিপেছেন হয় তিনি নিজেই, আর না হয় মিসেস লেক্সিংটন। দলিলপত্রগুলো যদি একবার নেড়েচেড়ে দেখ লেসট্রেড, আমি বাজি রেখে বলতে পারি অন্তত একটা গালামোহরে ম্যাকফারলেনের ছাপ তুমি পাবেই।'

'ওয়ান্ডারফুল।' সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড। 'ওয়ান্ডারফুল! আপনার কথা শুনে সব কিছুই ক্রিস্টালের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন মি. হোমস, এই সাংঘাতিক শঠতার উদ্দেশ্য কী?'

আমার খুব মজা লাগছিল লেসট্রেডের ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করা দেখে, অশিষ্ট আচরণের খোলস চকিতে খসিয়ে ফেলে শিষ্যর মতো গুরুর কাছে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখে।

'উদ্দেশ্য অনুমান করা খুব কঠিন নয়, লেসট্রেড। জোনাস ওলডাকারের মতো দারুণ ঈর্ষাকাতর, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক তুমি দুটি দেখতে পাবে কি না সন্দেহ। জান কি, ম্যাকফারলেনের মা তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি? জান না? তখনই আমি তোমায় বললাম শুরু কর ব্ল্যাকহিদে, শেষ কর, নরউডে। যাক, ম্যাকফারলেনের মায়ের এই প্রত্যাখ্যান ওলডাকারের বুকে যে-প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছিল, তা জ্বলেছে সারাজীবন। বয়সের ভারে ক্ষমার বারিসিঞ্চনে তা স্তিমিত হয়ে আসার

বদলে আরও লেলিহান হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষ-বিষে জর্জর কুটিল মস্তিষ্কে সারাজীবন ধরে শুধু প্ল্যান এঁটেছেন আর প্রতীক্ষা করেছেন, সুযোগ কিন্তু আসেনি। গত দু-এক বছর ধরে কপাল বড়ো মন্দ গেছে তাঁর। লুকিয়ে-চুরিয়ে শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে খুব সম্ভব বেকায়দায় পড়েছিলেন। পাওনাদারদের বুড়ো আঙুল দেখানোর মতলব এঁটে মি. কর্নিলিয়াসের নামে মোটা টাকার চেক কাটতে শুরু করেন। আমার বিশ্বাস, জোনাস ওলডাকারের ছদ্মনাম কর্নিলিয়াস। চেকগুলো সম্পর্কে এখনও কোনো তদন্ত করিনি বটে, তবে আমার ধারণা, ছোটোখাটো কোনো টাউনে কর্নিলিয়াসের নামেই ভাঙানো হয়েছে চেকগুলো। মাঝে মাঝে হয়তো সেখানে গিয়ে ওলডাকার কর্নিলিয়াস সেজে থেকেও এসেছেন। তাঁর আসল মতলব ছিল সমস্ত টাকা তুলে নেওয়ার পর একেবারে নাম-ধাম পালটে নতুন পরিবেশে নতুনভাবে নতুন জীবন শুরু করার।'

'আপনার অনুমান সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক, মি. হোমস।'

'এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পড়ার আগে তাঁর একদা প্রিয়তমার বুকে শেল হেনে যাওয়ার চমৎকার পরিকল্পনার জন্যে তুমি তাঁর তারিফ না-করে পারবে না, লেসট্রেড। এক ঢিলে দু-পাখি মারার আয়োজন করেন ভদ্রলোক। পুলিশ যাতে তার পিছু নিতে না-পারে, তাই বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়া, সঙ্গেসঙ্গে ম্যাকফারলেনের মায়ের মন ভেঙে দেওয়া তার ছেলেকে খুনি প্রমাণ করে। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্ল্যান। দক্ষ শিল্পীর মতোই ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন প্ল্যানটা। পাকাপোক্ত মোটিভ হিসাবে উইলের আইডিয়া, চুপিসারে মা-বাপকে না-জানিয়ে ম্যাকফারলেনের ব্ল্যাকহিদে আসা, ছড়ি রেখে দেওয়া, রক্তের দাগ, ছাইয়ের গাদায় বোতাম আর জানোয়ারের দেহাবশেষ— সবই হয়েছিল অপূর্ব। কয়েক ঘণ্টা আগেও আমিও হালে পানি পাইনি, ভেবেছিলাম, এ মরণ-জাল থেকে আর উদ্ধার নেই বেচারি ম্যাকফারলেনের। কিন্তু প্রত্যেক দক্ষ শিল্পীর একটা ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা থাকে। তা হচ্ছে, ঠিক কখন আর না-এগিয়ে থামা উচিত— সে-জ্ঞান। কেসটায় কোনো গলদই ছিল না, তবুও শিকারের গলায় দড়ির ফাঁস আরও একটু আঁট করে দেওয়ার বিকৃত কল্পনায় উল্লসিত হয়ে একটু এগোতেই গেল সব মাটি হয়ে। চলো হে লেসট্রেড, নীচে যাওয়া যাক। লোকটাকে দু-একটা প্রশ্ন করার আছে।'

বৈঠকখানার দু-পাশে পুলিশম্যান নিয়ে বসে ছিলেন ধুরন্ধর শিরোমণি কুটিলমতি জোনাস ওলডাকার।

আমরা ঢুকতেই আবার শুরু হল নাকিসুরে একঘেয়ে প্যানপ্যানানি, 'বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক রগড় করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার। নিজেকে লুকিয়েছিলাম শুধু আমার অন্তর্ধানের ফলে কী হয় না হয় তাই দেখার জন্যে। বেচারি মি. ম্যাকফারলেনের কোনোরকম ক্ষতি করার মতলব নিয়ে আমি কিছু করিনি স্যার।'

লেসট্রেড বললে, 'সে-বিচার করবে জুরিরা। আমরা আপনার নামে ষড়যন্ত্র করার মামলা দায়ের করব। খুন করার প্রচেষ্টার চার্জ আনতে পারলে তো কথাই নেই।'

হোমস বললে, 'খুব সম্ভব এও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদারেরা আইনসংগতভাবেই মি. কর্নিলিয়াসের ব্যাঙ্ক তহবিল আটক করে বসেছে।'

চমকে উঠে খরখরে বিষাক্ত চোখে বন্ধুবরের পানে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন খর্বকায় বুড়ো। তারপর বললেন, 'ধন্যবাদ আপনাকে। আমার দেনা আমি শিগ্‌গিরই শোধ করে দেব।'

অল্প হেসে বলল হোমস, 'আমার তো মনে হয় আগামী কয়েক বছর অনেক ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে। ভালো কথা, আপনার পুরোনো ট্রাউজার্সের সঙ্গে কাঠের গাদায় আর কী ফেলেছিলেন বলুন তো? মরা কুকুর? খরগোশ[৭]? তবে কী? বলবেন না? কী বিপদ! এত নিষ্ঠুর হলে চলে কী করে? বেশ, বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি পোড়া হাড়, ছাই আর রক্তের চাহিদা মেটাতে গোটা দুয়েক খরগোশই যথেষ্ট? এ-কাহিনি যদি কোনোদিন লেখ, ওয়াটসন, তবে খরগোশ দিয়েই তা শেষ কোরো।'

টীকা

১. **কুটিল বুড়োর কুচক্র** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নরউড বিল্ডার' ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং আমেরিকার কলিয়ার্স উইকলির ৩১ নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পের পাণ্ডুলিপি নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরির ব্রেগ সংগ্রহে এখনও সযত্নে রাখা আছে।

২. **প্র্যাকটিস বেচে দিয়ে ফিরে এসেছি** : বহু গবেষক এই বক্তব্য থেকে এবং আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা থেকে অনুমান করেন 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এম্পটি হাউস'-এর ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াটসনের স্ত্রী মেরি মর্সটান পরলোকগমন করেন।

৩. **গতকাল গভীর রাতে** : গতকাল গভীর রাতের ঘটনা এত বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সকালের সংবাদপত্রে প্রকাশ করা ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিকের নিশ্চয় অতিমানবিক কৃতিত্ব।

৪. **গ্রেস্যাম'স বিল্ডিংস** : বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং রয়্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার টমাস গ্রেস্যাম-এর নামে অফিসবাড়ি অবস্থিত ছিল থ্রমটর্ন স্ট্রিট-এ।

৫. **সাক্ষী হিসাবে সই করল আমার কেরানি** : ইংলন্ডে এবং ভারতবর্ষের আইনে উইলে মাত্র একজন সাক্ষীর সই যথেষ্ট নয়। দরকার অন্তত দুজন সাক্ষী, সেক্ষেত্রে এই উইলটি আইনের চোখে অগ্রাহ্য।

৬. **ব্ল্যাকহিদে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি** : লোয়ার নরউড থেকে ব্ল্যাকহিদের দূরত্ব কিন্তু মাত্র চার মাইল।

৭. **মরা কুকুর? খরগোশ?** : সামান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই কিন্তু লেসট্রেড বা হোমস বুঝতে পারতেন পোড়া দেহাবশেষ মানুষের নাকি পশুর।

নাচিয়েদের নষ্টামি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ড্যান্সিং মেন]

'এই নাও একটা হেঁয়ালি। বলো দিকি এর মাথামুণ্ডু কিছু ধরতে পারছ কি না'— একটা কাগজ টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে ঘুরে বসল হোমস তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে।

কাগজটার ওপর আঁকা কিম্ভূতকিমাকার চিত্রাক্ষরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, 'আরে, এ তো দেখছি ছেলেমানুষের আঁকিবুকি।'

'ওহো, তাই বুঝি!'

'তা ছাড়া আর কী শুনি?'

'মি. হিলটন কিউবিটও তো তাই জানতে চান। মি. কিউবিট নরফোকে রিডলিং থর্প ম্যানরে[২] থাকেন। ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনছি, ওয়াটসন। ভদ্রলোক বোধ হয় এলেন।'

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক। করমর্দনের পালা সাঙ্গ হলে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা কিম্ভূতকিমাকার ছবি-আঁকা কাগজের টুকরোটা।

উৎসুক কণ্ঠে শুধোন মি. কিউবিট, 'কীরকম বুঝলেন মি. হোমস? এ-রকম বিদঘুটে ধাঁধা আর দুটি দেখেননি, তাই না মি. হোমস?'

হোমস বললে, 'বিদঘুটে তো বটেই। কিন্তু এই কিম্ভূতকিমাকার জিনিস নিয়ে আপনি এত ভাবিত হয়ে পড়েছেন কেন, তাই তো বুঝছি না।'

'আমি হইনি মি. হোমস, হয়েছে আমার স্ত্রী। নিদারুণ ভয় পেয়েছে বেচারি। মুখে কিন্তু কোনো কথা নাই। তাই ভাবলাম হেঁয়ালিটার তলা পর্যন্ত না-দেখে আমি ছাড়ছি না।'

সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল হোমস। নোটবই থেকে ছেঁড়া একটা পাতা। মূর্তিগুলো পেনসিলে আঁকা:—

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের পকেট বইয়ের মধ্যে রাখল হোমস।

মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা হাত দুটো কচলাতে কচলাতে নার্ভাসভাবে বললেন মি. কিউবিট, 'দেখুন, আমি আবার জমিয়ে গল্প বলতে পারি না। কাজেই, বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করে নেবেন। গত বছরে আমার বিয়ের সময় থেকেই শুরু করছি। তার আগে বলে রাখি, আমি ধনবান না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করেছেন রিডলিং থর্প-এ। নরফোকে আমাদের বংশের নাম জানে না এমন কেউ নেই; গত বছর জুবিলি উপলক্ষ্যে[৩] এসেছিলাম লন্ডনে। গ্রামের যাজক পার্কার রাসেল স্কোয়ারের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল, তাই আমিও ডেরা নিলাম সেখানে। একটি আমেরিকান মেয়ে থাকতেন বোর্ডিং হাউসে। মেয়েটি সুন্দরী এবং যুবতী। নাম, প্যাট্রিক— এলসি প্যাট্রিক। ক্রমে ক্রমে আমাদের মেলামেশা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছোয়। আমার এক মাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই, গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম তাকে। রেজিস্ট্রি অফিসে বিনা ধুমধামে শেষ হল আমাদের বিয়ে, দু-দিন পর নরফোকে ফিরে এলাম তাকে নিয়ে— শুরু হল আমাদের বিবাহিত জীবন। ভাবছেন ডাহা পাগলামি। আমার মতো বংশমর্যাদাসম্পন্ন একজন পুরুষের পক্ষে পাত্রীর অতীত অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনোরকম খবর না-নিয়েই দুম করে বিয়ে সেরে ফেলা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন মি. হোমস আর দু-দিন মেলামেশা করতেন, তাহলেই বুঝতেন কেন আমি কিছু না-জেনে, কিছু না-ভেবে সারাজীবনের সঙ্গী করে নিলাম তাকে।

'এ-সম্বন্ধে এলসিও কোনো লুকোছাপা করেনি। আমার সঙ্গে কোনোরকম ছলাকলা করা

দূরে থাকুক, সরল মনেই বলেছে সে আমাকে তার কথা। সুতরাং ইচ্ছে করলে বিয়ে না-করলেও পারতাম আমি। বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমায় বললে, "অতীতে কতকগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। সব কিছুই আমি এখন ভুলে যেতে চাই। অতীত আমার কাছে বড়ো বেদনাদায়ক, তাই সে-সম্বন্ধে আমি কোনোদিনই কোনো কথা বলব না। কিন্তু, হিলটন, আমাকে বিয়ে করলে তুমি জানবে তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তোমায়। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সে-সম্বন্ধে কোনোরকম কৌতূহল তুমি প্রকাশ করবে না, আমাকেও কোনো কথা বলতে দেবে না। এ-শর্ত যদি খুব কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে ফিরে যাও নরফোকে। দুঃখ কোরো না আমার জন্যে— আবার শুরু হোক আমার নিঃসঙ্গ জীবন।" সেদিন মেনে নিয়েছিলাম তার শর্ত এবং আজ পর্যন্ত আমার কথা আমি রেখেছি।

'যাই হোক, বিয়ের পর একবছর কেটে গেছে। সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু মাসখানেক আগে জুন মাসের শেষাশেষি সেই প্রথম চোখে পড়ল অশান্তির সূচনা। আমেরিকা থেকে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছোল আমার স্ত্রীর নামে। আমেরিকান ডাকটিকিটগুলো চোখে পড়েছিল আমার। চিঠি পেয়েই কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ। পড়া শেষ হতেই চিঠিখানা সে ছুড়ে ফেলে দিলে আগুনের চুল্লিতে। পরেও এ-সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না এলসি। আমিও না। কথা যখন দিয়েছি, তখন তার নড়চড় হবে না। কিন্তু লক্ষ করলাম, সেইদিন থেকেই পুরো একটা ঘণ্টাও সহজভাবে কাটাতে পারেনি বেচারি। সবসময় তার চোখে-মুখে দেখেছি আতঙ্কের ছায়া— সে-আতঙ্ক কীসের তা বুঝিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে, যেন দুরু দুরু বুকে সে প্রতীক্ষা করে চলেছে কী-এক আসন্ন বিভীষিকার। কীসের জন্যে এ সভয় পথ-চাওয়া তা জানি না। আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে হয়তো ভালোই করত এলসি। তার সবচেয়ে দরদি বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় তার দিবানিদ্রার অশান্তি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম আমি। কিন্তু সে আগে না-বললে শর্ত অনুযায়ী আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। মি. হোমস, এলসির সততায় আমার কোনো সন্দেহ নেই। অতীতে যাই ঘটুক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেজন্যে তাকে দায়ী করা চলে না কোনোমতেই। নরফোকের সামান্য লোক আমি। কিন্তু বংশমর্যাদার দিক দিয়ে আমাকে টেক্কা দেওয়ার মতো মানুষ সারাইংল্যান্ডে আর দুটি নেই। এলসি তা ভালো করেই জানে এবং সব জেনে তবে বিয়ে করে আমায়। এ-বংশে কলঙ্কের কালো দাগ লাগে, এমন কিছুই যে সে করবে না— তা আমি জানি।

'এবার বলছি আমার কাহিনির সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে গোলমেলে অংশটা। হপ্তাখানেক আগে— গত হপ্তার মঙ্গলবারে— একটা জানলার চৌকাঠে আশ্চর্য কতকগুলো নাচিয়ে-মূর্তি দেখলাম। খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলো। ভাবলাম আস্তাবলের ছোকরাটার কাজ। কিন্তু সে-ছোকরা দিব্য গেলে বললে যে, এ-রকম বদখেয়াল কোনোদিনই আসেনি তার মাথায়। যে-ই করুক, মূর্তিগুলো যে রাত্রে আঁকা হয়েছিল, তা বুঝলাম। জল দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলে পরে স্ত্রীর কাছে গল্প করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই সামান্য ব্যাপারে তার বিরাট পরিবর্তন দেখে। দারুণ সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বার বার মিনতি করতে লাগল এলসি, যেন আবার এ ধরনের মূর্তি চোখে পড়লে তাকে দেখাই আমি। হপ্তাখানেকের মধ্যে নাচিয়েদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

তারপরেই গতকাল সকালে বাগানে সূর্যঘড়ির[৪] ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম এই কাগজটাকে। এলসিকে দেখাতেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর থেকেই যেন তাকে ভূতে পেয়েছে, চেতনা আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। সবসময়ে আচ্ছন্নের মতো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে— চোখের তারায় নিঃসীম নিষ্ঠুর আতঙ্কের কালো প্রতিচ্ছবি। তখনই মরিয়া হয়ে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে মি. হোমস। এ-জিনিস নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া মানে তাদের হাসির খোরাক জোগানো। কিন্তু আপনার কাছে আমি নির্ভয়ে আসতে পারি। মি. হোমস, আমার কুলমর্যাদা থাকতে পারে, কিন্তু সে-অনুপাতে টাকা নেই। তবে আমার এলসির জীবনে সত্যিই যদি কোনো বিপদের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসে থাকে এই কিম্ভূতকিমাকার নাচিয়েরা, তাহলে আমার শেষ কপর্দকটিও তাকে বিপদমুক্ত করার জন্যে খরচ করতে প্রস্তুত আমি।'

তন্ময় হয়ে শুনছিল হোমস। কাহিনি শেষ হলে পর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাকুটিল মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

তারপর বললে, 'মি. কিউবিট, এ-রকম পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় না স্ত্রীর কাছে সরাসরি সব কথা জিজ্ঞেস করা উচিত? তাঁকে জানান না কেন যে তাঁর গোপন রহস্যের ভাগীদার হতে চান আপনিও?'

মস্তবড়ো মাথা দুলিয়ে বললেন মি. কিউবিট, 'মি. হোমস, প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। এলসির যদি সে-ইচ্ছে হয় তবে সে নিজে থেকেই বলবে! না-বললে আমি নিজে থেকে তার গোপন কথা কোনোদিনই জানতে চাইব না। তবে আপনার কাছে আসা আমার অভিরুচি, তাতে তো আর কথার খেলাপ হচ্ছে না।'

'বেশ তাহলে আমার আন্তরিক সাহায্য পাবেন আপনি। প্রথমেই একটি প্রশ্ন— আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনো আগন্তুককে ঘোরাফেরা করতে কেউ দেখেছে কি?'

'না।'

'জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব নিরিবিলি। নতুন মুখ দেখলেই কথা উঠত, তাই নয় কি?'

'বাড়ির একেবারে কাছাকাছি হলে সে-কথা খাটে কিন্তু একটু দূরেই কয়েকটা জলসত্র আছে। বহিরাগতদের থাকার ব্যবস্থাও সেখানে রেখেছে স্থানীয় চাষিরা।'

'ছবি-অক্ষরগুলোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, মি. কিউবিট। প্রত্যেকটা নাচুনের একটা-না-একটা মানে আছে। যদি এলোপাতাড়ি খেয়ালমাফিক আঁকিবুকি হয়, তাহলে অবশ্য এ-প্রহেলিকার জট ছাড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আর যদি নিয়মমাফিক হয়, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ-ব্যাপারের শেষ না-দেখে আমরা ছাড়ছি না। কিন্তু আপনার আনা নমুনাটা এতই পুঁচকে যে এ থেকে বিশেষ কিছু আলো আমি পাচ্ছি না। তা ছাড়া, আপনার কাহিনি শুনেও বলিষ্ঠ কোনো ইঙ্গিত পেলাম না— কাজেই তদন্ত আরম্ভ করার মতো মালমশলাই নেই হাতে। এই কারণেই আমার অনুরোধ, আপনি নরফোকে ফিরে যান, মি. কিউবিট। কড়া নজর রাখুন চারিদিকে। নতুন কোনো নাচনেওয়ালার ছবি দেখলেই হুবহু কপি পাঠিয়ে দিন আমাকে। জানলার চৌকাঠে খড়ি দিয়ে আঁকা যে-মূর্তিগুলো দেখেছিলেন তার কপি না-পাওয়ার জন্যে যে কী আফশোস হচ্ছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। তন্নতন্ন করে খুঁজে

দেখবেন বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো আগন্তুকদের আগমন ঘটেছে কি না। টাটকা কোনো প্রমাণ-টমান পেলে বিনা দ্বিধায় চলে আসুন আমার কাছে। এ ছাড়া আপাতত আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই। পরিস্থিতি যদি গুরুতর হয়ে ওঠে, তাহলে আমাকে আপনার নরফোকের বাড়িতেই দেখতে পাবেন।

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে ক-টা দিন সবসময়ে গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতে দেখলাম শার্লক হোমসকে। মাঝে মাঝে পকেট বই থেকে ছবি আঁকা কাগজের টুকরোটা বার করে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে দেখলাম আশ্চর্য নাচুনেদের। কিন্তু চিন্তা ছাড়া এ-প্রসঙ্গে একটা কথাও শুনলাম না তার মুখে।

দিন পনেরো কি তারও পরে মি. কিউবিট ফের এলেন।

আর্ম-চেয়ারে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন মি. কিউবিট, 'মি. হোমস, আমার নার্ভ আর সহ্য করতে পারছে না। আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিন সকালে প্রথমেই যে-জিনিসটা দেখলাম, তা আর একদল নতুন নাচিয়েদের ছবি। টুল-হাউসের কালো কাঠের দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল মূর্তিগুলো। টুল-হাউসটা লনের পাশেই, সামনের জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হাউসটা। যাই হোক, অবিকল একটা কপি তুলে এনেছি। এই নিন ছবি।' বলে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন মি. কিউবিট। ছবি-অক্ষরগুলোর হুবহু প্রতিলিপি দিলাম পরের পাতায়:

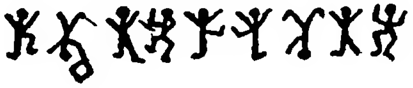

'এক্সেলেন্ট!' খুশি ঝরে পড়ে হোমসের কণ্ঠে। 'এক্সেলেন্ট! তারপর?'

'কপি করে নেওয়ার পর মূর্তিগুলো মুছে ফেললাম আমি। কিন্তু ঠিক দু-দিন পরেই সকালে উঠে দেখলাম আর একদল নাচিয়েদের। এই দেখুন তার কপি।'

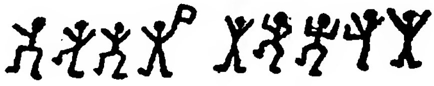

হাত ঘষতে ঘষতে খুশির চোটে নিঃশব্দে হাসতে থাকে হোমস।

বলে, 'মালমশলাগুলো বেশ চটপট পাওয়া যাচ্ছে দেখছি।'

'তিন দিন পরে সূর্যঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া আর এক সারি কাগজে আঁকা মূর্তিদের পাওয়া গেল। এই সেই কাগজ। দেখতেই পাচ্ছেন নাচের ঢংগুলো ঠিক আগের মতো। এরপর ঠিক করলাম ওত পেতে বসে থাকতে হবে। রিভলভার নিয়ে বসলাম স্টাডিতে— এখান থেকে লন আর বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায়। রাত প্রায় দুটোর সময়ে জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি, বাইরে চাঁদের ফুটফুটে আলো ছাড়া সব অন্ধকার, এমন সময়ে ঠিক পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী। শোয়ার ঘরে ফিরে আসার জন্যে কাকুতিমিনতি করতে লাগল এলসি। আমি খোলাখুলি বললাম, যে-হতভাগা এ-জাতীয় বাঁদরামো করছে

আমাদের সঙ্গে, তার শ্রীমুখটি আমার একবার দেখবার দরকার। এলসি বললে, নিছক রসিকতা ছাড়া যখন কিছুই নয়, তখন আমার এ সামান্য বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

'হিলটন, সত্যিই যদি ছবিগুলোর জন্যে উত্ত্যক্ত মনে কর, তাহলে চল তুমি আর আমি বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'কী, কোথাকার এক ফাজিলের জন্যে নিজের বাড়িঘরদোর ছেড়ে পালাব? লোকে দেখলে টিটকিরি দেবে যে!' বললাম আমি।

'যাকগে ওসব কথা। আপাতত তো ঘুমোও, কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কী করা যায়।' বলল এলসি।

'কথা বলতে বলতে আচম্বিতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ। মনে হল চাঁদের আলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখের কাছে। শক্ত মুঠিতে আমার কাঁধ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে ছিল বাইরে। টুল-হাউসের ছায়ায় কী যেন একটা নড়তে দেখলাম। গুড়িমারা কালো একটা মূর্তি। হামাগুড়ি দিয়ে মূর্তিটা কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে বসল দরজার সামনে। পিস্তল বার করে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি, কিন্তু বাধা পেলাম স্ত্রীর কাছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমাকে জাপটে ধরে আটকে রাখল এলসি। ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম,— কিন্তু মরিয়া হয়ে আমাকে জাপটে ধরে রইল সে। অনেক কষ্টে ছাড়ান পাওয়ার পর দরজা খুলে টুল-হাউসে পৌঁছে আর দেখতে পেলাম না কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীটাকে। উধাও হওয়ার আগে সে তার চিহ্ন রেখে গেছিল দরজার ওপর। আগের দু-বারের মতোই দেখলাম বিভিন্ন ঢঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একদল মূর্তি। তখুনি কাগজটার হুবহু কপি করে নিলাম ছবিটার। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করেও রাসকেলটার আর টিকি দেখতে পেলাম না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোকটা পালায়নি মোটেই— কোথাও-না-কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল। কেননা, পরের দিন সকালে কালো কাঠের দরজার ওপর দেখলাম আরও কয়েকটা নতুন মূর্তি আঁকা হয়েছে গত রাত্রে দেখা মূর্তিগুলোর নীচে।'

'নতুন মূর্তিগুলোও কপি করেছেন?'

'হ্যাঁ। যদিও মাত্র কয়েকটি মূর্তি, তবুও কপি করতে ভুলিনি। এই দেখুন।'

আবার একটা কাগজ বার করলেন মি. কিউবিট। নতুন নাচের ধরনটা এইরকম :

হোমসের চোখ দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। কাগজটা নামিয়ে রেখে শুধোল, 'এ-মূর্তিগুলো প্রথম সারির মূর্তিগুলোর অংশ হিসাবে আঁকা হয়েছিল, না একেবারে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছিল, তা লক্ষ করেছিলেন কি?'

'দরজার অন্য পাল্লায় ছিল ছবিগুলি।'

'এক্সেলেন্ট! এতক্ষণে দারুণ একটা পয়েন্ট পাওয়া গেছে। শুনে আমার আশা জাগছে, মি. কিউবিট। তারপর? থামবেন না, আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং রিপোর্টের বাকিটুকুও বলে ফেলুন।'

'আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই, মি. হোমস। সে-রাত্রে আমি স্ত্রীর ওপর বাস্তবিকই

রেগে গেছিলাম আমাকে এ-রকম বেমক্কাভাবে আটকে রেখে রাসকেলটাকে পগার পার হতে দেওয়ার জন্যে! আমাকে ওভাবে জাপটে না-ধরলে আমি স্কাউন্ড্রেলটাকে জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দিতাম। এলসি শুধু কাঁদো কাঁদো ভাবে বললে, পাছে আমি বিপদে পড়ি, তাই আমাকে সে আটকেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো। আমি নয়, এলসির ভয়, লোকটা পাছে বিপদে পড়ে। কেননা, এলসি যে নিশাচর মূর্তিটাকে চেনে আর বিদঘুটে নিশানগুলোর মানে জানে সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর স্বরে এমন এক সুর আছে, ওর চোখে এমন এক দৃষ্টি আছে যে, এ-রকম সন্দেহ মনে এলেও তা টেঁকে না! আমার বিশ্বাস, এলসি সত্য কথাই বলেছে। আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে ওভাবে আটকে রেখেছিল বেচারি। আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, মি. হোমস। এখন প্রয়োজন আপনার পরামর্শের। আমার ইচ্ছে, খামারের জনা ছয়েক ছোকরাকে পাহারা বসাই। রাসকেলটাকে ধরে বেশ করে, উত্তম-মধ্যম দিলেই স্বপ্নেও আর এমুখো হবে না হতভাগা।'

'অত সোজা দাওয়াইয়ে এ-কেসের কোনো সুরাহা হবে না, মি. কিউবিট।' বলল হোমস। কাগজগুলো রেখে যান। খুব শিগ্‌গিরই আসছি আপনার ওখানে। তখনই আপনার কৌতূহল খানিকটা মেটাতে পারব বলে মনে হয় আমার।'

মি. হিলটনের চওড়া পিঠ দরজার আড়ালে যাওয়ামাত্র হোমস ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে টেবিলের সামনে বসে মেলে ধরল কাগজগুলো। তারপর শুরু হল অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম গণনার পালা।

পুরো দু-ঘণ্টা ধরে রাশি রাশি অঙ্ক আর অক্ষর নিয়ে তন্ময় হয়ে কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে চলল হোমস। তারপর খস খস করে লেখা হল সুদীর্ঘ একটা টেলিগ্রাম। আমার দিকে ফিরে বলল, 'ওয়াটসন, টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমার আশানুরূপ হয়, তাহলে একটা তোফা কেসের বিবরণ লেখার জন্য তৈরি থেকো।

কিন্তু দুটো দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায়— টেলিগ্রামের উত্তর এসে পৌঁছোল না। এই দু-দিন দরজায় সামান্য শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে বসে থাকত হোমস। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা চিঠি এসে পৌঁছোল হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে। খবর সব ভালো। সেদিনই সকালে সূর্যঘড়ির নীচে মস্ত লম্বা একটা নাচিয়েদের সারি পাওয়া গেছে। কপিটা চিঠির সঙ্গেই এসেছিল :

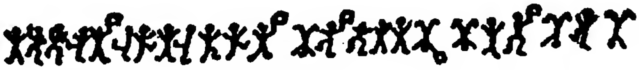

বেশ কয়েক মিনিট আবোল-তাবোল বিদকুটে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে রইল হোমস, তারপরেই আচম্বিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই এক চিৎকার। শুনেই বুঝলুম, যেমন অবাক হয়েছে, তেমনই হতাশ হয়েছে সে। দারুণ উদ্‌বেগে চোখ-মুখের ভাবও পালটে গেল নিমেষের মধ্যে।

'ওয়াটসন, খামোখা দেরি করে অনেক দূর গড়িয়ে এনেছি ব্যাপারটাকে। আজ রাতেই নর্থ ওয়ালস্যামের দিকে কোনো ট্রেন আছে?'

টাইমটেবিল উলটে দেখলাম লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গেল এইমাত্র।

হোমস বললে, 'তাহলে কাল ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটতে হবে স্টেশনের দিকে। যেভাবেই হোক প্রথম ট্রেন ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি নরফোকে পৌঁছাতে হবে আমাদের,

ওয়াটসন। এই তো এসে গেছে টেলিগ্রামটা। এক সেকেন্ড, মিসেস হাডসন— উত্তর থাকলে নিয়ে যাবেন। না, ঠিকই আছে দেখছি, যা ভেবেছিলাম তাই। খবরটা পাওয়ার পর উদ্‌বেগ আরও বাড়ল। আমাদের উচিত, এখন আর একটু দেরি না-করে মি. হিলটন কিউবিটকে সব জানানো। ব্যাপারটা উনি যতটা সহজ ভেবেছেন ততটা সহজ নয়। অত্যন্ত সাংঘাতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।'

নর্থ ওয়ালস্যামে সবে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে শুধোলেন স্টেশন মাস্টার— 'আপনারা নিশ্চয় ডিটেকটিভ? লন্ডন থেকে আসছেন, তাই না?'

'আমার মনে হয় আপনারা লন্ডনের গোয়েন্দা?'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৩

বিরক্তির ছায়া ভেসে যায় হোমসের মুখের ওপর দিয়ে।

'এ-রকম ধারণা কী করে হল আপনার?'

'কেননা, নরউইচ থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছোলেন ইনস্পেকটর মার্টিন। আপনারা সার্জনও হতে পারেন। মেয়েটি মরেনি— মানে, একটু আগে পর্যন্ত শুনলাম সে বেঁচে আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো প্রাণটা রক্ষা পাবে! কিন্তু তাতে লাভই-বা কী— শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে তো ঝুলতে হবেই।'

উদ্‌বেগে কালো হয়ে উঠল হোমসের মুখ।

'আমরা রিডলিং থর্প ম্যানরে যাব বলেই এসেছি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ব্যাপার শুধু সিরিয়াস নয়, অতি ভয়ানক। একই রিভলভার দিয়ে পর পর গুলি করা হয়েছে দুজনকে। গুলি চালিয়েছেন মিসেস কিউবিট নিজে। প্রথমে স্বামীর ওপর, পরে নিজের ওপর। মি. কিউবিট মারা গেছেন। মিসেসের অবস্থা খুবই খারাপ! কী সর্বনাশ। নরফোকের এত বড়ো একটা নামকরা বনেদি বংশের এ কী হাল হল!'

আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না-করে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসল হোমস। দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলতে দেখলাম না তাকে। অনেকক্ষণ পর জেগে উঠল নরফোক উপকূলের সবুজ কিনারার ওপর জার্মান সমুদ্রের[৫] বেগুনি বলয়-রেখা। একধারে গাছপালার মাথার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল পুরোনো আমলের ইটকাঠে তৈরি দুটো বড়ো বড়ো খিলেন। চাবুক তুলে খিলেন দুটি দেখিয়ে হেঁকে উঠল গাড়োয়ান, 'রিডলিং থর্প ম্যানর—।'

গাড়িবারান্দার দিকে যেতে টেনিস-লনের পাশে লক্ষ করলাম অদ্ভুত এই কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত কালো রঙের টুল-হাউস আর বেদিওলা সূর্যঘড়িটা! দু-চাকার একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ি থেকে সবেমাত্র চালাকচতুর চেহারার চটপটে খর্বকায় একটি পুরুষ নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। মোম দিয়ে পাকানো গোঁপ নেড়ে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক— নরফোক কন্সট্যাবুলারির ইনস্পেকটর মার্টিন। বন্ধুবরের নাম শুনে কিন্তু রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইনস্পেকটর?

'অবাক কাণ্ড দেখছি! খুনটা হয়েছে রাত প্রায় তিনটের সময়ে। কিন্তু লন্ডনে বসে এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে আমার সঙ্গেসঙ্গেই এসে পৌঁছোলেন কেমন করে, তা বুঝলাম না তো মি. হোমস?'

'আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম খুন-জখম যা হয় একটা কিছু হবে। এবং তা রোধ করতেই আমার নরফোকে আসা।'

'তাহলে আমার চাইতে অনেক খবরই রাখেন আপনি। আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না কী করে শুরু করা যায় তদন্ত— মি. এবং মিসেস কিউবিটের দাম্পত্য-প্রেমের কথা কে-না জানে বলুন?'

হোমস বললে, 'প্রমাণ শুধু একটাই পেয়েছি আমি এবং তা হচ্ছে নাচিয়েদের মূর্তি। সব কথা আমি পরে খুলে বলব'খন।'

ইনস্পেকটর মার্টিন বুদ্ধিমান পুরুষ। হোমসকে তার খুশিমতো কাজ করতে দিয়ে নিজে শুধু ফলাফলগুলো সযত্নে নোট করে নিতে লাগলেন। মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর থেকে একজন

সাদা চুল প্রবীণ ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন, ভদ্রমহিলার আঘাত সিরিয়াস তো বটেই, কিন্তু মারাত্মক নয়। শুনলাম, ভদ্রলোক এ-অঞ্চলের সার্জন। আরও বললেন, বুলেটটা গেছে মগজের সামনের দিক দিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই! মিসেস কিউবিট নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন, না, অন্য কেউ তাঁকে গুলি করেছে এ-প্রশ্নের উত্তরে কোনো মতামত প্রকাশ করতে রাজি হলেন না ভদ্রলোক। বুলেটটি অবশ্য ছোড়া হয়েছে খুবই কাছ থেকে। ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা পিস্তল— দুটো ব্যারেল তার খালি। মি. হিলটন কিউবিটের হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলিতে। এমনও হতে পারে যে, আগে মি. কিউবিট মিসেসকে গুলি করার পর আত্মহত্যা করেছেন। অথবা, মিসেস কিউবিট স্বামীকে খুন করার পর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন। রিভলভারটা দুজনের মাঝখানেই মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাই সন্দেহ দুজনের ওপরেই পড়েছে।

'আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুরুষ ডক্টর। আপনাকে খবর পাঠিয়েছিল কে?' শুধোল হোমস।

'সন্ডার্স— এ-বাড়ির ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করে সে।'

'সে-ই কি সবাইকে ডেকে তোলে?'

'সে আর রাঁধুনি— মিসেস কিং।'

'কোথায় তারা?'

'খুব সম্ভব রান্নাঘরে।'

'তাহলে এখুনি তাদের ডেকে আনা যাক। আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা ওদের মুখেই শুনতে চাই আমি।'

জেরার উত্তরে দুজন স্ত্রীলোকই একই কথা বলে গেল গড়গড় করে। ফায়ারিংয়ের দারুণ শব্দে একই সাথে ঘুম ভেঙে যায় দুজনের এবং এক মিনিট যেতে-না-যেতেই শোনা যায় আর একবার গুলি ছোড়ার আওয়াজ। পাশাপাশি ঘরে ঘুমোয় দুজন। তাই ঘুম ভাঙতেই আগে মিসেস কিং ছুটে যায় সন্ডার্সের ঘরে। তারপর দুজন মিলে দুড় দুড় করে নীচে নেমে এসে দেখে দু-হাট করে খোলা স্টাডির দরজা; আর টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন মি. কিউবিট।

খুব সম্ভব দেহে তখন প্রাণ ছিল না। জানলার সামনের দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে গুড়ি দিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট। বীভৎসভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি; কেননা মুখের একটা পাশ রক্তে একেবারে ভেসে গেছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। জানলার ছিটকিনি তোলা ছিল ভেতর থেকে। এ-বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল না। দেরি না-করে তখুনি দুজনে ডাক্তার আর কনস্টেবল ডাকতে লোক পাঠায়। তারপর, সহিস আর আস্তাবলের ছোকরাটাকে ডেকে এনে ধরাধরি করে মিসেস কিউবিটকে তুলে নিয়ে যায় তাঁর শোবার ঘরে। কর্তা-গিন্নি দুজনেই শুয়ে ছিলেন শয্যায়। সাধারণ পোশাক পরেছিলেন মিসেস, কিন্তু মিস্টার কিউবিট রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিয়েছিলেন। স্টাডির আর কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া হয়নি। যতদূর তারা জানে, স্বামী-স্ত্রীতে কোনোদিন ঝগড়া করতে দেখা যায়নি। দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং বাস্তবিকই বড়ো সুখী দম্পতি ছিলেন।

চাকরবাকরদের জেরা করার ফলে প্রধান পয়েন্ট পাওয়া গেল এই ক-টাই। ইনস্পেকটর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল প্রত্যেকটা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় কারো পক্ষেই বাড়ি থেকে সরে পড়া সম্ভব নয়। হোমসের প্রশ্নের জবাবে বললে, ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনে ওপরের তলার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবামাত্র বারুদের বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে দুইজনের নাকেই। শুনে হোমস ইনস্পেকটর মার্টিনকে বললে, 'এ-পয়েন্টটা একটু ভালো করে ভেবে দেখবেন ইনস্পেকটর। আচ্ছা, এবার তো মনে হয় অনায়াসেই আমরা ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।'

স্টাডি-রুমটা বিশেষ বড়ো নয়। তিনদিকে সাজানো বই, আর বাগানের দিকে মুখ করা সাদাসিদে জানলার সামনে লেখবার টেবিল। ঘরের মাঝেই লম্বা হয়ে পড়ে ছিল হতভাগ্য মি. কিউবিটের বিশাল দেহ। প্রথমেই আমরা ঝুঁকে পড়লাম তাঁর ওপর। বিস্রস্ত জামাকাপড় দেখে মনে হল ঘুম ভাঙতেই খুব চটপট বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। গুলিটা ছোড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করেও তখনও দেহের মধ্যে থেকে গেছে বুলেটটা। মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং যন্ত্রণাবিহীন। হাতে অথবা ড্রেসিং গাউনে বারুদের কোনো দাগ দেখা গেল না। ডাক্তার বললেন, 'মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন পাওয়া গেছে— কিন্তু দুটো হাতই একদম পরিষ্কার।'

হোমস বললে, 'হাতে বারুদের দাগ নেই অর্থাৎ কোনো ঘোরপ্যাঁচ মানেও নেই। থাকলেই কিন্তু যত গোলমেলে সম্ভাবনার কথা এসে পড়ে। খারাপভাবে লাগানো কার্তুজ থেকে পেছন দিকে বারুদ না-ছিটকোলে হাতে কোনো দাগ না-ফেলে এন্তার ফায়ার করা চলে। তাহলে, ইনস্পেকটর, এবার মি. কিউবিটের লাশ সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভালো কথা, ডক্টর, মিসেস কিউবিটের দেহ থেকে বুলেটটা বার করেছেন নাকি?

'বুলেট বার করতে গেলে এখন বড়ো রকমের অপারেশনের দরকার। কিন্তু রিভলভারে তো এখনও চারটে কার্তুজ রয়েছে দেখছি। ছোড়া হয়েছে মাত্র দুটো এবং হতাহতের সংখ্যাও দুজন। সুতরাং—'

'সেইরকমই মনে হয় বটে। জানলার ধারে যে-বুলেটটা লেগেছিল, আমার তো মনে হয় তার হিসেবটাও আপনি দিয়ে দিতে পারবেন।'

বলেই, আচম্বিতে সবাইকে চমকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হোমস। দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল তুলে দেখাল জানলার পাল্লায় নীচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো।

'বাই জর্জ! এ-জিনিস আপনার চোখে পড়ল কী করে?' সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন ইনস্পেকটর মার্টিন!

'কেননা, আমি এ-ঘরে ঢুকে খুঁজছিলাম ফুটোটাকে।'

'ওয়ান্ডারফুল।' এবার ডাক্তারের উচ্ছ্বসিত হওয়ার পালা। 'আপনার অনুমান নির্ভুল, স্যার। দু-বার নয়, ফায়ার করা হয়েছে মোট তিনবার এবং দুজন নয়, সবসুদ্ধ তিনজন হাজির ছিল খুনের দৃশ্যে। কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি? আর কী করেই-বা উধাও হল দরজা-জানলা বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে?'

'সেই সমস্যাই এবার আমাদের সমাধান করতে হবে', বললে শার্লক হোমস! ইনস্পেকটর

মার্টিন, আপনাকে একটা পয়েন্ট বিশেষ করে স্মরণে রাখতে বলেছিলাম, আশা করি তা ভুলে যাননি। মনে পড়ছে না? চাকরবাকদের জবানবন্দিতে শুনলেন না, ওপরতলার ঘর থেকে বেরোনোমাত্র বারুদের গন্ধ ভেসে এসেছিল তাদের নাকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু, স্যার, বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি— এ-পয়েন্ট মনে রেখে আমার লাভটা কী, তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।'

'আশা করি এবার পারবেন। ওপরতলায় বারুদের গন্ধ পাওয়ার অর্থ শুধু একটাই— গুলি ছোড়ার সময়ে ঘরের দরজা জানলা দুটোই খোলা ছিল। তা না-হলে পোড়া বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে পারত না। দমকা হাওয়ার ঝাপটা থাকায় ধোঁয়া একেবারে ওপরতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যই খোলা ছিল দরজা জানলা দুটো।'

'এ-ধারণার প্রমাণ?'

'তা না-হলে মোমবাতিটা নিভে যেত।'

'ক্যাপিটাল?' রীতিমতো চেঁচিয়ে ওঠেন ইনস্পেকটর। 'ক্যাপিটাল!'

''খুনের সময়ে জানলা খোলা ছিল। এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভাবলাম তাহলে নিশ্চয় কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হাজির ছিল সে সময়ে। খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে সে-ই। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে তার ওপর গুলি চালালে জানলার পাল্লায় তা লাগলেও লাগতে পারে। তাই খুঁজছিলাম যদি কোনো ফুটো-টুটো পাই এবং দেখতেই তো পাচ্ছেন— আমার খোঁজা বৃথা যায়নি— এই সেই বুলেটের দাগ!'

'কিন্তু জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধই-বা হল কি কেমন করে, ছিটকিনিই-বা পড়ল কেমন করে?'

'গুলি ছোড়াছুড়ির সঙ্গেসঙ্গে ছুটে এসে জানলা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়াই তো মিসেস কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই নয় কি? আরে, এ কী দেখছি?'

জিনিসটা একটা লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ। কুমিরের চামড়ার ওপর রুপোর কারুকার্য করা রুচি-সুন্দর ছোট্ট ব্যাগটা পড়ে ছিল স্টাডির টেবিলের ওপর। হোমস ব্যাগটা উপুড় করে ধরলে টেবিলের ওপর; রবার-ব্যান্ড লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

নোট সমেত ব্যাগটা ইনস্পেকটরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস বললে, 'জিনিসটা সাবধানে রেখে দিন— মোকদ্দমা চলার সময়ে কাজে আসবে। এবার তিন নম্বর বুলেটের রহস্য নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। কাঠের টুকরোটা যেভাবে উড়ে গেছে আর চোঁচগুলো যেদিকে মুখ করে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুলিটা ছোড়া হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। এ-সম্পর্কে মিসেস কিংয়ের সঙ্গে আর এক প্রস্থ আলোচনা দরকার।... এই যে মিসেস কিং, তখন বলছিলে ফায়ারিংয়ের দারুণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছিল তোমার? এ-কথা বলার মানে কী? তোমার কি মনে হয়, দ্বিতীয় শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছিল প্রথমটা?'

'শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিকই, কিন্তু কোন আওয়াজটা বেশি আর কোনটা কম, তা বলা কঠিন। তবে স্যার, আওয়াজটা খুব জোরে বলেই মনে হয়েছিল।'

'দুটো রিভলভার থেকে একসঙ্গে গুলি ছোড়া হয়েছিল মনে হয়?'

'আজ্ঞে, তা তো বলা মুশকিল।'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইনস্পেকটর মার্টিন, আমার তো মনে হচ্ছে— এ-ঘরে আর কিছু করার নেই আমাদের। এবার চলুন, বাগানটা ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কিছু প্রমাণ-টমান পাওয়া যায়।'

স্টাডির জানলার ঠিক নীচেই ফুলের চওড়া ঝোপটার কাছাকাছি এসেই আমরা প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠলাম মহা উল্লাসে। ঝরাফুলগুলোকে কে যেন নির্দয়ভাবে মাড়িয়েছে, নরম মাটির ওপর তারই অগুনতি পায়ের ছাপ। ছাপগুলো পুরুষের পায়ের। অদ্ভুত রকমের লম্বা, আঙুলগুলো ছুঁচলো। ঘাসপাতা নেড়ে উলটে ফুঁ দিয়ে এমন কাণ্ড জুড়ে দিলে হোমস যেন মুখ দিয়ে লালা ঝরিয়ে শিকারি-কুকুর হয়ে খুঁজছে গুলি-খাওয়া পাখিকে। তারপরেই দারুণ খুশির চিৎকার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল সে— হাতে তার পেতলের তৈরি ছোট্ট একটা সিলিন্ডার।

'যা ভেবেছিলাম, তাই। রিভলভারটায় "ইজেক্টর" ছিল, তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছে এখানে। ইনস্পেকটর মার্টিন, এই হল আপনার তিন নম্বর কার্তুজ এবং আমার কেসও প্রায় সম্পূর্ণ।'

হোমসের তদন্ত ধারার দ্রুত কর্তৃত্বময় অথচ নির্ভুল কার্যপরম্পরা দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছিলেন বেচারি ইনস্পেকটর মার্টিন। প্রথম প্রথম দু-একটা কথা বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না-করে হোমসের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বোধ হয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলে মনে করলেন তিনি।

শুধোলেন, 'কাকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথম থেকেই তো কেসটার অনেক পয়েন্ট অপরিষ্কার থেকে গেছে আপনার কাছে, এটাও না হয় থাকুক। পরে একসাথে সব কিছু খোলসা করা যাবে, কি বলেন?'

'যা অভিরুচি আপনার। আমার শুধু খুনিটাকে পেলেই হল।'

'মিছিমিছি সাসপেন্স বানাবার কোনো অভিলাষ আমার নেই, ইনস্পেকটর মার্টিন! কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা-চওড়া জটিল বক্তৃতা দিয়ে রহস্য কী করে সমাধান করলাম, তা বলবার সময়ও নেই। এ-ব্যাপারের সবকটি গুটি আমার হাতে। এখন যদি মিসেস কিউবিটের জ্ঞান নাও ফিরে আসে, তাহলেও জানবেন, গত রাতে এ-বাড়িতে যেসব কাণ্ড ঘটেছে, তার প্রতিটি আপনাদের শোনাবার মতো ক্ষমতা আমার আছে। আমার লক্ষ্য শুধু একটি এবং তা যেনতেনপ্রকারেণ অপরাধীর সমুচিত শাস্তি-বিধান। প্রথমেই আমি জানতে চাই, এ-অঞ্চলে "এলরিজ়ি" নামে কোনো সরাইখানা আছে কি না?'

চাকরবাকরেরা সবাই একবাক্যে জানালে যে এ-নামের কোনো সরাইখানা ধারেকাছে কোথাও আছে বলে তাদের জানা নেই। তবে আস্তাবলের ছোকরাটা একটু কিন্তু কিন্তু করে বললে, সরাইখানা নেই বটে, তবে এলরিজি নামে এক চাষা মাইল কয়েক দূরে ইস্ট রাস্টনের দিকে থাকে।

'খামারবাড়িটা খুব নিরালা নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দারুণ নিরালা।'

'এ-বাড়িতে রাত্রে যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, নিশ্চয় এখনও পর্যন্ত সেসব খবর ওদের কানে পৌঁছোয়নি।'

'আজ্ঞে, খুব সম্ভব না।'

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চিন্তা করল হোমস, তারপর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি।

বললে, 'চটপট একটা ঘোড়ার জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও। একটা চিঠি দিচ্ছি— এক্ষুনি দিয়ে এসো এলরিজির খামারবাড়িতে।'

পকেট থেকে নাচিয়েদের ছবি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো বার করল হোমস। তারপর স্টাডির টেবিলে বসে, কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল। ইতিমধ্যে ছোকরাটা তৈরি হয়ে আসতে ছোট্ট একটা চিরকুট তার হাতে দিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে দিলে হোমস, ওপরে যার নাম লেখা, শুধু তারই হাতে চিরকুটটা দিয়ে এবং কোনো প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে যেন সিধে ফিরে আসে সে এখানে। হোমসের হাতের লেখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুক্তোর মতো গোটা গোটা। কিন্তু চিরকুটের ওপর দেখলাম আঁকাবাঁকা হোঁচট-খাওয়া কায়দায় লেখা : মি. অ্যাবি স্ল্যানে, এলরিজির খামারবাড়ি, ইস্ট, নরফোক।

ইনস্পেকটর মার্টিনকে হোমস বললে, 'আমার অনুমানই যদি সত্য হয়, আমার গণনা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা লোককে আপনাকে হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং, আমার মনে হয় আপনি এখুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন আরও পাহারাদারের জন্যে। এই ছোকরাই আগে টেলিগ্রামটা পৌঁছে দিয়ে তারপর চিঠি নিয়ে রওনা হবে এলরিজির খামারবাড়িতে। ওয়াটসন, বিকেলের দিকে লন্ডনের কোনো ট্রেন থাকলে আমরা তাতেই ফিরে যাব। কেননা, এখানকার ঝামেলা তো প্রায় চুকে গেল। তা ছাড়া, আমাকে আবার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিস আজকেই শেষ করতে হবে।'

চিরকুট নিয়ে ছোকরাটা রওনা হয়ে যাওয়ার পর, হোমস চাকরবাকরদের ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিলে, যদি আগন্তুক এসে মিসেস কিউবিট-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে তাকে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খবর না-জানিয়ে যেন সিধে নিয়ে আসা হয় ড্রয়িং রুমে। বার বার এই ক-টা পয়েন্টেই এমনভাবে জোর দিয়ে বোঝাতে লাগল হোমস যে, দেখেশুনে মনে হল অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর উপর। তালিম দেওয়া শেষ হলে পর হোমস এবার পড়ল আমাদের নিয়ে। হাতের তির যতক্ষণ-না লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধছে ততক্ষণ ড্রয়িং রুমে বসে নির্ভেজাল গুলতানি দেওয়া যাক— এই বলে সবাইকে নিয়ে এসে বসল বসবার ঘরে। রোগী দেখার দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আগেই ডাক্তার বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই আসর জমিয়ে বসলাম আমি, হোমস আর ইনস্পেকটর মার্টিন।

টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পকেট হাতড়ে নাচুনেদের বিদঘুটে মূর্তি আঁকা কাগজগুলো বার করল হোমস। তারপর, টেবিলের ওপর মেলে ধরে বললে, 'ঘণ্টাখানেক সময় যাতে ভালোভাবেই কাটে, সে-ব্যবস্থা করছি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ-জাতীয় হেঁয়ালি আমার কাছে একেবারে নতুন। এ-পদ্ধতির আবিষ্কর্তা যে-ই হোক না, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূর্তিগুলো যে আসলে ছদ্মবেশী অক্ষর, তা যেন কেউ ধরতে না-পারে এবং বাচ্চাকাচ্চার এলোপাতাড়ি নকশা ভেবে উড়িয়ে দেয়।

'মূর্তিগুলো যে আসলে অক্ষরের প্রতীক, তা জানার পর সব সাংকেতিক লিপির মূল নিয়মটি

খাটাতেই জলের মতো সরল হয়ে এল হেঁয়ালির অর্থ। প্রথম বার্তাটি আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোটো। যদিও এত ছোটো খবর থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব নয়। তবুও ওদের মধ্যে একটা প্রতীকের অর্থ যে E, সে-সম্বন্ধে আমার খুব বেশি সন্দেহ ছিল না। জানেন তো, ইংলিশ বর্ণমালার E-র ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এমনকী একটা ছোটো বাক্যের মধ্যেও বেশ কয়েকবার দেখতে হয় E-র শ্রীমুখ। প্রথম খবরটায় পনেরোটা প্রতীকের মধ্যে চারটে প্রতীক হুবহু এক। সুতরাং এ-প্রতীকের অর্থ যে E, তা ধরে নিলে খুব বেশি অযৌক্তিক হয় না। অবশ্য মাঝে মাঝে প্রতীকটার হাতে নিশান দেখা গেছে। কিন্তু নিশানওলা মূর্তিগুলো পাশাপাশি নেই— ছড়িয়ে আছে সমস্ত খবরটার মধ্যে। সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি, নিশানমূর্তি দিয়ে আসলে এক একটা বাক্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে না। মাথায় অনুমানটা আসার পরেই দেখলাম, E অক্ষরের প্রতীক হল এই মূর্তিটা।

এ পর্যন্ত হল বেশ। কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হল এর পরেই। E-র পরেই কোন ইংলিশ অক্ষরটির জোর বেশি এ-সম্বন্ধে কেউই কোনো পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আপনি হয়তো দেখলেন, একটা পাতার মধ্যে E-র পরেই অমুক অক্ষর গড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। তারপরেই আবার দেখলেন, একটা ছোটো বাক্যের মধ্যেই সে-অক্ষরটিকে দাবিয়ে দিয়েছে আরও কয়েকটা অক্ষর ঘন ঘন তাদের শ্রীমুখ দেখিয়ে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে T, A, O, I, N, S, H, R, D আর L-কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে এইভাবে পর পর সাজানো যায়। এদের মধ্যে আবার T, A, O আর I এত ঘেঁষাঘেঁষি যে কে বেশি পাওয়ারফুল তা বলা বড়ো মুশকিল। তাই নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম। মি. হিলটন কিউবিটের সাথে আমার দ্বিতীয়বার মোলাকাত হওয়ার পর পেলাম দুটো ছোটো সেনটেন্স আর একটা খবর। খবরটায় কোনো নিশান না-থাকায় একটা গোটা শব্দ বলেই মনে হল। এই দেখুন প্রতীকগুলো। যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হয়েছে, তার মধ্যে E এসেছে দু-বার— দ্বিতীয় স্থানে আর চতুর্থ স্থানে— শব্দটার মোট অক্ষর সংখ্যা পাঁচ। ফলে SEVER, LEVER অথবা NEVER শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে কোনো কাকুতিমিনতির উত্তরে। এবং এক্ষেত্রে এই অনুমানটাই স্বাভাবিক এই কারণে, এর আগে মি. কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি, তাতে মনে হয়, মিসেস কিউবিটের কোনো চিঠির উত্তরে NEVER শব্দটা লিখে গেছে আততায়ী। ধরে নিলাম এইটাই ঠিক, তাহলে N, V আর R প্রতীক দাঁড়াচ্ছে, যথাক্রমে :

'তখনও কিন্তু আমার মুশকিল আসান হয়নি, কাটেনি অন্ধকারের ঘোর। ঠিক এমনি সময় একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আলোর মুখ দেখলাম। হাতে তখন বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে। ভাবলাম, আততায়ী যদি মিসেস কিউবিটের পূর্বপরিচিত হয় এবং অতীত-জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে, তাহলে যে পাঁচ অক্ষরওলা শব্দের মধ্যে দুটো অক্ষরই E, সেগুলো

দিয়ে নিশ্চয় লেখা হয়েছে ELSIE নামটাকে। পরীক্ষা করে দেখলাম, তিন তিনবার খবরের উপসংহারে এমন প্রতীক-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই, খবরগুলো যে ELSIE-র উদ্দেশে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ না-থাকাই ভালো। এমনি করে পেলাম L, S আর I-কে। কিন্তু এ কী ধরনের খবর? এ কি আকুতি, না শুধুই আদেশ? ELSIE-র ঠিক আগেই চার অক্ষরওলা শব্দটার শেষে দেখলাম E। মনে হল, শব্দটা COME হওয়াই উচিত। যতগুলো চার-অক্ষরওলা শব্দের শেষে E আছে, সবকটাতেই চোখ বুলোলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। কাজেই, C, O, M হাতের মুঠোয় আসায় আবার পড়লাম প্রথম খবরটাকে নিয়ে। ছোটো ছোটো শব্দে ভাগ করে ফেললাম খবরটাকে, যে যে অক্ষর বুঝিনি, তাদের জায়গায় ফুটকি বসালাম। এইভাবে পেলাম :

. M. ERF. .ESL. NE.

'এখন প্রথম অক্ষরটা A না-হয়ে যায় না, এইটুকু বাক্যের মধ্যেই তিন তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে একই প্রতীককে। দ্বিতীয় শব্দে H-কে অনুমান করে নেওয়া চলে। তাহলে বাক্যটা দাঁড়াল এই রকম :

AM HERE A. E SLANE

নামের ফাঁকটায় Y বসাই স্বাভাবিক। তাহলে পাচ্ছি

AM HERE A. E SLANEY

'হাতে অনেকগুলো অক্ষর এসে যাওয়ায় অকুতোভয়ে এবার পড়লাম দু-নম্বর খবরটাকে নিয়ে। প্রতীক-ছদ্মবেশে খসিয়ে দেখা গেল খবরটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম :

A ELRI. ES.

ভেবেচিন্তে দেখলাম, ফাঁকগুলোয় T আর G বসানো যায়, তাহলেই মোটামুটি একটা মানে পাওয়া যায় খবরটার। ELRIGES নামটা নিশ্চয় কোনো বাড়ি বা সরাইখানার নাম— লোকটা আস্তানা গেড়েছে এইখানেই।'

প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম বন্ধুবর হোমসের হেঁয়ালি উদ্ধারের তাক লাগানো গল্প। জলের মতো পরিষ্কার করে এতবড়ো কঠিন সমস্যাকে বুঝিয়ে দিলে হোমস। সামান্য কতকগুলি নাচুনে মূর্তি, কিন্তু তাদের অঙ্গভঙ্গিরও এত অর্থ?

'তারপর, স্যার, কী করলেন তাই বলুন।' বললেন ইনস্পেকটর।

'ABE SLANEY যে আমেরিকান সে-সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল না দুটি কারণে। প্রথমত ABE নামটার চলন আমেরিকাতেই আছে। দ্বিতীয়ত আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউবিটের হাতে পড়তেই যত গোলমালের সূত্রপাত। তা ছাড়া এ-ব্যাপারে গোপন-রহস্যটাও যে আইনানুগ নয় এবং অপরাধ-সংক্রান্ত, আমার এমন বিশ্বাস হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। অতীতের উল্লেখ এবং স্বামীর কাছে সব কথা চেপে যাওয়া শুধু এই দুটো প্রমাণই কি এজন্যে যথেষ্ট নয়? কাজেই টেলিগ্রাম পাঠালাম উইলসন হারগ্রিয়েভকে। উইলসন আমার বন্ধু। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ব্যুরোর[৬] একজন হোমরাচোমরা[৭]। লন্ডনের অপরাধজীবন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানকে বহুবার উইলসন কাজে লাগিয়েছে। উইলসনকে জিজ্ঞেস করলাম, অ্যাবি স্ল্যানি নামটা ওর চেনা কি না। উত্তরে উইলসন লিখেছে : 'শিকাগোর[৮] সবচেয়ে বিপজ্জনক খুনে বদমাশ।' এ-খবর যেদিন পেলাম, সেদিন সন্ধ্যায় হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম তাঁর শেষ বার্তা। অক্ষর-পরিচয় আগেই ঘটেছে, তাই ধাঁধার জট ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়াল এইরকম :

ELSIE. RE. ARE. TO MEET THY CO.

P আর D বসাতেই সম্পূর্ণ হল খবরটা। পড়ে আঁতকে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমত, এইটুকু বুঝলাম যে কাকুতিমিনতি ছেড়ে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমাদের নিশাচর আততায়ী। দ্বিতীয়ত শিকাগোর নীচুতলায় জাঁহাবাজদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি একটু আধটু খবর রাখি। তাই, লোকটা যে আর অনর্থক দেরি না-করে চটপট কথামতো কাজ শুরু করে দেবে— তা বুঝলাম। তৎক্ষণাৎ সহকর্মী-বন্ধু ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলাম নরফোকে। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না— প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই শুনলাম যা হবার তা হয়ে গেছে গত রাতেই।'

জানলা দিয়ে দেখলাম, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে আসছেন এক দীর্ঘকায় পুরুষ। গায়ের রং ময়লা হলেও ভদ্রলোক সুদর্শন, পরনে ধোঁয়াটে ফ্ল্যানেলের সুট, মাথায় পানামা হ্যাট। মস্তবড়ো উদ্ধত নাকটা সামনের দিকে একটু বেঁকানো, গালে-চিবুকে চাপদাড়ি, হাতে চকচকে ছড়ি। স্বচ্ছন্দভাবে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে তাঁর হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন এ-বাড়ির মালিক সে-ই। তারপরেই শুনলাম জোর ঘণ্টাধ্বনি— যেন এক মুহূর্তও আর দেরি সইছে না তার।

শান্তভাবে বলল হোমস, 'এবার আমাদের দরজার পেছনে দাঁড়াবার সময় হয়েছে। এই ধরনের বিপজ্জনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়া ভালো। ইনস্পেকটর হাতকড়া বার করে রাখুন। কথা যা বলার আমিই বলব।'

পুরো একটা মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজনে। তুচ্ছ একটা মিনিট, কিন্তু তবুও তো কোনোদিনই ভোলা যায় না। তারপরেই খুলে গেল দরজা— ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙা লোকটা। পলকের মধ্যে হোমস পিস্তল ঠেকালে তার মাথায়। আর মার্টিন কবজিতে এঁটে দিলেন হাতকড়া। সমস্ত জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি, এত নিপুণভাবে শেষ হয়ে গেল যে, আক্রান্ত হয়েছে এ-কথা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল তার অবস্থা। জ্বলন্ত কালো চোখে একে একে আমাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে। তারপরেই এক অট্টহাসি। তিক্ত হাসিতে ব্যর্থতার জ্বালা।

'শাবাশ, জেন্টলমেন। এবার দেখছি আপনারাই একহাত নিলেন আমার ওপর। বড়ো কঠিন ঠাঁই মনে হচ্ছে। যাইহোক, মিসেস হিলটন কিউবিটের একটা চিঠি পেয়ে আমি এসেছি। উনি বাড়ি নেই, এ-কথা যেন আবার বলে বসবেন না। ফাঁদটা যে তারই পাতা, এ-খবরও নিশ্চয় শুনতে হবে না আপনাদের কাছে।'

'মিসেস হিলটন কিউবিট মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন, বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

ভাঙা গলায় বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা— সমস্ত বাড়ি গম গম করে উঠল সে চিৎকারে!

'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি।' তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে। 'ওর গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগেনি— লেগেছে ওই লোকটার বুকে। এলসিকে কেন জখম করতে যাব আমি? ভয় দেখাতে পারি। কিন্তু ওর ওই রেশম-হালকা চুলের একটা গাছিও স্পর্শ করার দুঃসাহস আমার নেই। ফিরিয়ে নিন— ফিরিয়ে নিন এসব বাজে কথা। বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি।'

'মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখা গেছে মিসেস কিউবিটকে।'

গুঙিয়ে উঠে হাতকড়া লাগানো দু-হাতে মুখ ঢেকে সেটির ওপর এলিয়ে পড়ল সে। পুরো পাঁচ মিনিট সব চুপ। এতটুকু স্পন্দন শব্দ শুনতে পেলাম না তার দিক থেকে। তারপর, মুখ থেকে হাত নামিয়ে চোখ তুলল সে। মুখ দেখে মনে হল যেন চকিতে কোনো অমিতবিক্রমশালী

প্রভঞ্জনের বিপুল ফুৎকারে নিমেষে নিভে গেছে তার যত কিছু সাহস, শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের দীপশিখা, হারিয়ে গেছে নিশ্ছিদ্র নিরাশার তমিস্রায়।

নিরুত্তাপ স্বরে কথা বলল সে, 'জেন্টলমেন, কিছুই আর লুকোব না। আমি যদি তাকে গুলি করে থাকি, তবে সে-ও পালটা গুলি করেছিল আমাকে। সুতরাং এতে খুন-টুন কিছু নেই। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন এলসিকেও জখম করেছি আমি, তাহলে বলব আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আপনারা। এ-দুনিয়ায় আমার চাইতে তাকে বেশি ভালোবেসেছে, এমন কোনো পুরুষ কোনোদিনই ছিল না, এখনও নেই। তার ওপর আমার দাবি অসীম। অনেক বছর আগে আমার বাগদত্তা হয়েছিল সে। আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই ইংলিশম্যানটার আসার কি অধিকার আছে? আবার বলছি, সে আমার। আমি এসেছিলাম আমার সেই দাবিকেই আবার তুলতে।'

'আপনার স্বরূপ প্রকাশ পেতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন আপনার বাগদত্তা', কঠিন কণ্ঠে বললে হোমস। 'আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংলন্ডে এসে একজন অনারেবল ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন তিনি। আপনার সঙ্গে উধাও হতে রাজি হননি তিনি— তাই শেষ পর্যন্ত হিলটন কিউবিটের মতো অভিজাত পুরুষকে বিদায় নিতে হয়েছে এ-দুনিয়া থেকে। আর স্ত্রীকে করতে হয়েছে আত্মহত্যা। মি. অ্যাবি স্ল্যানি, আপনার হাত এসব কিছুর পেছনেই আছে এবং এ-রেকর্ডের উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের কর্তাদের কাছে।'

'এলসি যদি মারা যায়, আমি জাহান্নামে যেতেও আর পরোয়া করি না,' হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা চিরকুটে চোখ পড়তেই বাঘের মতো ধারালো চোখে সন্দেহের ঝিলিক হেনে বললে অ্যাবি স্ল্যানি— 'মিস্টার, এ-সম্পর্কেও গালগল্প ছাড়বেন নাকি? এদিকে তো বলছেন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এলসি, তাই যদি হয় তবে এ-চিরকুট কার লেখা শুনি?' কাগজের দলাটাকে টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে দিল সে।

'আপনাকে আনার জন্যে আমিই লিখেছি।'

'আপনি লিখেছেন? জয়েন্টের বাইরে তামাম আশমান দুনিয়ার আর কারো পক্ষেই নাচিয়ে মূর্তিদের রহস্য জানা সম্ভব নয়। আপনি লিখলেন কী করে?'

হোমস বললে, 'আজকের যা প্রথম আবিষ্কার কালকে তা পুনরাবিষ্কার— পৃথিবীর ইতিহাসে এ-নজিরের তো অভাব নেই, মি. স্ল্যানি। যাই হোক, আপনার এখন করণীয় শুধু একটি। সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দিন যে কোনোমতেই কোনো দিক দিয়েই কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে মিসেস হিলটন কিউবিটকে দায়ী করা চলে না।'

'খুব ভালো কথা বলেছেন। আমার এখন উচিত বিনা দ্বিধায় নগ্ন সত্যকে স্বীকার করা এবং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার, আমি তা করব।'

'হুঁশিয়ার কিন্তু, আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার প্রতিটি কথা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করব আমরা।' ঝটিতি চেঁচিয়ে ওঠেন ইনস্পেকটর মার্টিন। ব্রিটিশ ক্রিমিন্যাল ল-র চমকদার সরলতার যেন একটি মূর্ত প্রতীক।

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে স্ল্যানি, 'সেটুকু ঝুঁকি না হয় নিলামই! জেন্টলম্যান, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, এলসি যখন শিশু, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। শিকাগোর একটা দলে সবসুদ্ধ সাতজন ছিলাম আমরা। এলসির বাবা ছিল 'জয়েন্ট'-এর মাথা। ধুরন্ধর লোক এই বুড়ো প্যাট্রিক। নাচিয়েদের বিদঘুটে মূর্তি দিয়ে চিঠি লেখার কায়দা আবিষ্কার করে সে-ই! হেঁয়ালির

চাবিকাঠিটা জানা না-থাকলে ছেলেমানুষি আঁকিবুঁকি বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এতদিন তাই হয়েছেও। যাক, এলসি আমাদের কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল। কিন্তু এসব সহ্য না-হওয়ায় নিজের সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে একদিন সে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল লন্ডনে। এলসি আমার বাগদত্তা : যদি এ-পেশা ছেড়ে সৎপথে রোজগার করতাম, তাহলে নিশ্চয় সে বিয়ে করত আমায়। ইংলিশম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ঠিকানা পৌঁছোল আমার হাতে। চিঠি লিখলাম— কিন্তু উত্তর এল না। বাধ্য হয়ে আসতে হল নিজেকে। চিঠি লিখে কোনো ফল হত না— তাই যাতে তার চোখে পড়ে এমনি জায়গায় সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাতে শুরু করলাম।

'প্রায় মাসখানেক হল এসেছি এখানে। এলরিজির খামারবাড়িতে ডেরা নিয়েছিলাম প্রথম থেকেই। নীচের ঘরে থাকতাম, রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে যখন খুশি বেরোতাম— কাকপক্ষীও কোনোদিন টের পায়নি। এলসিকে বার করে আনার সবরকম চেষ্টাই করেছিলাম আমি। খবরগুলো যে তার নজর এড়াচ্ছে না, তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নীচেই দেখলাম তার হাতে লেখা একটা লাইন। তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার— শুরু হল ভয় দেখানোর পালা। এবার একটা চিঠি পেলাম ওর কাছ থেকে। চিঠিতে এলসি কাকুতিমিনতি করে তার আশা ছেড়ে আমায় চলে যেতে বলেছে। কেননা, স্বামীর মানসম্মানের হানিকর এমন কোনো কেলেঙ্কারি ঘটলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হতে হবে তাকে। আরও লিখলে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময়ে জানলার কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে। কিন্তু শর্ত রইল— তারপর আর অশান্তি না-করে এদেশ ছেড়ে চলে যাব আমি অনেক টাকা[৯] নিয়ে। নেমে এল এলসি— ঘুস দিয়ে চেষ্টা করলে হটিয়ে দেওয়ার! এইতেই খেপে গেলাম আমি। খপ করে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে জানলা দিয়ে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করতেই হাতে রিভলভার নিয়ে তিরবেগে ঘরে ঢুকল তার স্বামী। এলসি মেঝেতে বসে পড়েছিল— মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে। আমার উদ্দেশ্য ছিল রিভলভার বার করে ভয় দেখিয়ে সরে পড়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে গুলি চালাল লোকটা, আমিও পলক ফেলার আগেই ঘোড়া টিপে পেড়ে ফেললাম তাকে মেঝেতে। বাগানের ওপর দিয়ে সরে পড়ার সময় পেছন থেকে জানলা বন্ধ করার শব্দ[১০] শুনলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি জেন্টলমেন, যা বললাম, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য। ছোকরাটার হাতে চিরকুটটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। খুশিতে ডগমগ হয়ে এসেছিলাম এলসির সাথে দেখা করতে। কিন্তু বদলে পেলাম আপনাদের, আর একজোড়া হাতকড়া।'

জানলায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়িটাকে কয়েদিসহ টগবগিয়ে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম। তারপর, ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলে রাখা তালগোল পাকানো চিরকুটটাকে। সামান্য এই কাগজটা দিয়ে হোমস অতবড়ো দুর্ধর্ষ লোকটাকে ভুলিয়ে এনেছে নিজের খপ্পরে।

মুচকে হেসে হোমস বললে, 'দেখ হে ওয়াটসন, যদি পঙ্কোদ্ধার করতে পার লেখাটার।'

বিচিত্র চিঠি। অক্ষরের বালাই নেই, শুধু নেচে-কুঁদে এগিয়ে যাওয়া এক সারি মূর্তি :

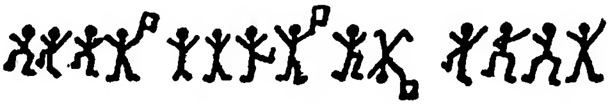

হোমস বললে, 'এইমাত্র যে-পদ্ধতি বোঝালাম[১১], তাই দিয়ে চিঠিটার সাদা অর্থ দাঁড়ায় এই— "এখুনি চলে এস।" আমি জানতাম, এ-আমন্ত্রণ এড়ানোর সাধ্য তার নেই, কেননা এ-সাংকেতিক লিপি যে মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসতে পারে, তা সে কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এতদিন ধরে যে নাচিয়েদের ছবি অশুভ বার্তাই বহন করে এনেছে, নতুন অপরাধ সৃষ্টি করেছে, নির্মম পরিণতির সূচনা করেছে— এই প্রথম সেই নাচিয়েদের শুভ কাজে লাগালাম আমি, কল্যাণ এবং মঙ্গলময় পরিণতির মধ্য দিয়ে মহা কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে আনলাম পতিব্রতা মিসেস হিলটন কিউবিটের নামকে। আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম, নতুন লেখার চাঞ্চল্যের উপকরণ দেব। সে-প্রতিশ্রুতিও রইল।'

টীকা

১. **নাচিয়েদের নষ্টামি** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডান্সিং মেন' ডিসেম্বর ১৯০৩ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং ৫ ডিসেম্বর ১৯০৩-এর কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **রিডলিং থর্প ম্যানর** : স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পে নাম ছিল রিডিং বা রাইডিং (Riding) থর্প ম্যানর। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বানান ভুল মনে করেন।

৩. **গত বছর জুবিলি উপলক্ষ্যে** : রানি ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮৩৭-এ। ১৮৮৭ তাঁর রানি হওয়ার স্বর্ণজয়ন্তী বা গোল্ডেন জুবিলি এবং ১৮৯৭-এ হীরক জয়ন্তী বা ডায়মন্ড জুবিলি উৎসব পালিত হয়। জানা যায়, ওই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রানির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পঞ্চাশ হাজার গোর্খা, ক্যানাডিয়ান এবং জ্যামাইকান সৈনিক কুচকাওয়াজ করে। তা ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

৪. **সূর্যঘড়ি** : প্রথম খণ্ডর টীকা দ্রষ্টব্য।

৫. **জার্মান সমুদ্র** : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নর্থ সি বা উত্তর সাগরকে জার্মান সমুদ্রও বলা হত।

৬. **নিউ ইয়র্ক পুলিশ ব্যুরো** : সঠিক নাম 'নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কিংবা 'নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিটেকটিভ ব্যুরো'।

৭. **হোমরাচোমরা** : কাছাকাছি সময়ে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন টমাস বায়ার্নস। ১৮৮২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত তিনি ওই পদে কাজ করেন। কিন্তু তারপর দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি ছাড়তে হয়। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো অভিযোগ কেউ তোলেনি। পুলিশ চাকরি চলে যেতে একটি বিমা কোম্পানির চাকরিতে যোগ দেন বায়ার্নস।

৮. **শিকাগো** : গুন্ডামি এবং নানা অসামাজিক কাজে শিকাগোর বদনামের জন্য আল কাপোনেকে দায়ী করা হলেও, কাপোনের সংঘবদ্ধ অপরাধ শুরুর দুই দশক আগে থাকতেই এই শিল্প শহর অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে।

৯. **অনেক টাকা** : এলসির ব্যাগে পঞ্চাশ পাউন্ডের কুড়িখানা নোট পাওয়া গিয়েছিল। এই হাজার পাউন্ড সে কোথা থেকে পেল, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

১০. **জানলা বন্ধ করার শব্দ** : এলসি আত্মহত্যা করার আগে জানলা বন্ধ করতে গেল কেন? তার কোনো দরকার ছিল না।

১১. **যে-পদ্ধতি বোঝালাম** : বিখ্যাত হোমস-গবেষক উইলিয়ম এস. বেরিং গোল্ড দেখিয়েছেন যে সংকেতে লেখা NEVER-এর V এবং PREPARE-এর 'P'-তে একই মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার হোমসের সংকেতের 'C' এবং অন্য লেখার 'M'-ও একইভাবে লেখা হয়েছে। অবশ্য এই ভুল ওয়াটসনের কপি করার সময়ে হয়েছে নাকি নিছক ছাপাখানার ভুল সে-সম্পর্কে মন্তব্য করেননি বেরিং-গোল্ড।

সুন্দরীর শতেক জ্বালা![1]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট]

তীক্ষ্ণ চোখে মিস ভায়োলেট স্মিথের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হোমস বললে, 'এটুকু বুঝছি স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আপনার নেই এবং সে-রকম কোনো কারণ নিয়ে আপনার আগমন নয়। এ-রকম উৎসাহী বাইসাইক্লিস্টের তো অফুরন্ত এনার্জি থাকাই স্বাভাবিক, না, কী বলেন আপনি?'

আশ্চর্য হয়ে নিজের পায়ের দিকে মিস স্মিথ তাকাতে আমারও চোখ পড়ল পেডালের ঘষা লেগে পাশের দিকে সামান্য ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর সোল দুটো।

'আপনি ধরেছেন ঠিকই, মি. হোমস। সাইকেল চালানোয় আমার উৎসাহ একটু বেশি এবং আজকে আপনার কাছে এসেছি বলতে গেলে এই কারণেই।'

'আমার বন্ধু মহিলার গ্লাভশূন্য হাতটা ধরল এবং পরীক্ষা করল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৩

হোমস মিস স্মিথের দস্তানাহীন অনাবৃত হাতটা তুলে নিয়ে এমন নির্বিকারভাবে অনন্যমনা হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিল যেন কোনো নমুনা পরীক্ষা করতে বসেছে আত্মভোলা বিজ্ঞানী।

'কিছু মনে করবেন না, এই আমার ব্যাবসা,' হাতটা নামিয়ে রেখে বললে বন্ধুবর। আর একটু হলেই ভুল করে ফেলেছিলাম আর কি। আপনাকে টাইপিস্ট মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন আর কোনো ভুল নেই— পেশাটা গান-বাজনার। সামনের দিকে চেপটা বর্শার ফলার মতো আঙুলগুলো লক্ষ করেছ ওয়াটসন? টাইপিস্ট আর বাজনাদারদের আঙুলই এ-রকম হয়ে থাকে। কিন্তু মুখেতে দেখছি পরমার্থ-নিষ্ঠার হালকা প্রতিচ্ছবি,' বলে আলতোভাবে আলোর দিকে মিস স্মিথের মুখটি ঘুরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'টাইপিস্টের চোখে-মুখে এ-রকম অমূর্ততার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইনি মিউজিশিয়ান!'

'হ্যাঁ মি. হোমস, আমি গানের মাস্টারি করি।'

'গ্রামাঞ্চলে, আপনার গায়ের রং দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ফার্নহ্যামের কাছে, সারের সীমানায়।'

'বড়ো সুন্দর পরিবেশ। এখন বলুন দিকি, সারের সীমানায় ফার্নহ্যামের কাছে কী ঝামেলায় পড়েছেন আপনি?'

'মি. হোমস, বেশ কিছুদিন হল, আমার বাবা আমাদের মায়া কাটিয়েছেন। বাবার নাম জেমস স্মিথ। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে[২] অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন। বাবা মারা গেলে একেবারে জলে পড়লাম বললেই চলে। সংসারে আত্মীয় বলতে ছিল এক কাকা, রাল্‌ফ স্মিথ। পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় অ্যাডভেঞ্চার করতে গেছিলেন কাকা এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে আর সাড়াশব্দ পাইনি। বাবার মৃত্যুর পরে অভাব-অনটনের সংসার নিয়ে যখন জ্বলে-পুড়ে মরছি আমি আর মা, ঠিক এই সময়ে শুনলাম আমরা কোথায় আছি তা জানার জন্যে 'দ্য টাইমস'-এ কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। খবরটা কানে আসার পর আমাদের আনন্দ-উত্তেজনা খানিকটা অনুমান করতে পারেন আপনি। ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত বুঝি বরাত খুলল, কারো সম্পত্তি-টম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে বসেছি আমরা দুই হতভাগিনী। কাগজে আইনজ্ঞের নাম ছিল— কাজেই সিধে হাজির হলাম তাঁর অফিসে। সেখানে গিয়ে আলাপ হল মি. ক্যারুথার্স আর মি. উডলি নামে দুই ভদ্রলোকের সাথে। সাউথ আফ্রিকা দেশ থেকে বেড়াতে এসেছিলেন ওঁরা। শুনলাম কাকা এঁদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কয়েকমাস আগে জোহানেসবার্গে[৩] চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা গেছেন উনি। মৃত্যুশয্যায় এঁদেরকে মিনতি করে যান যেন দেশে ফিরে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বার করে তাদের যাতে কোনো অভাব না-থাকে তার ব্যবস্থা তাঁরা করেন। শুনে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল এই কারণে যে, যে-কাকা জীবিতকালে আমরা বেঁচে আছি কি মরে আছি সে খোঁজটুকুও নেওয়া দরকার মনে করেননি, মৃত্যুর পর যাতে আমাদের গায়ে আঁচড়টি না-লাগে সে-ব্যবস্থা করার জন্যে এত মাথাব্যথা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে। কিন্তু মি. ক্যারুথার্স সব বুঝিয়ে বললেন। বললেন, বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই নাকি খুব মুষড়ে পড়েছেন কাকা। আমাদের এ দুর্গতির জন্যে নিজেকে দায়ী করেন এবং উঠে-পড়ে লাগলেন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে।'

'মাপ করবেন,' বাধা দিয়ে বলল হোমস, 'এসব কথাবার্তা কবে হয়েছিল?'

'গত ডিসেম্বরে— মাস চারেক আগে।'

'তারপর?'

'মি. উডলি লোকটা অতি যাচ্ছেতাই। যখন-তখন আমার পানে তাকিয়ে তার চোখ টেপার বহরটা যদি দেখতেন তো আপনারও আপাদমস্তক জ্বলে যেত। চেহারাটা রুক্ষ, ফুলো ফুলো মুখ, লাল গোঁফ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল কপালের দু-পাশে লেপটানো। ছোকরা বয়স। কিন্তু অতি কদর্য প্রকৃতির লোক এবং রীতিমতো ন্যক্কারজনক। এ-রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে শুনলেও খুশি হবে না সিরিল।'

'ওহো, তার নাম বুঝি সিরিল!' হাসিমুখে বলল হোমস।

একটু লাল হয়ে ওঠে মিস ভায়োলেট স্মিথ, তারপরেই ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'হ্যাঁ মি. হোমস, সিরিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার— গ্রীষ্মের শেষাশেষি বিয়ে করার ইচ্ছে আমাদের। কী মুশকিল, ওর কথা আবার শুরু করলাম কখন? আমি যা বলতে চাইছিলাম তা এই— মি. উডলি লোকটা ন্যক্কারজনক হলেও মি. ক্যারুথার্স কিন্তু অতটা নয়। ভদ্রলোকের বয়সও বেশি, গায়ের রং ময়লা পাঙাশ-পানা, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো, কথাবার্তা খুব অল্প বলেন। স্বল্পভাষী হলেও ভদ্রলোকের ব্যবহার খুব মার্জিত এবং ভদ্র, হাসিটাও মিষ্টি। মোটের ওপর মি. ক্যারুথার্সকে অনায়াসেই বরদাস্ত করা চলে। একান্ত শুভানুধ্যায়ীর মতো আমাদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন ভদ্রলোক। আমরা বড়ো গরিব শুনে উনি প্রস্তাব করলেন তাঁর বাড়িতে থেকে তাঁর দশ বছরের মেয়েকে গান শেখানোর। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে রাজি নই। শুনে উনি বললেন প্রত্যেক শনিবার আমি না হয় মা-র কাছে আসব। বছরে এক-শো পাউন্ড দিতে রাজি হলেন উনি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটা খুব খারাপ নয়, বিশেষ করে তখন আমাদের যা অবস্থা— এ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। আমতা আমতা না-করে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে আস্তানা গাড়লাম ফার্নহ্যাম থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে শিলটার্ন গ্র্যাঞ্জ-এ। মি. ক্যারুথার্স বিপত্নীক। তাই ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্যে মিসেস ডিক্সন নামে একজন বর্ষীয়সী লেডি-হাউসকিপারকে এনেছিলেন সংসারে। মিসেস ডিক্সনকে দেখলেই বোঝা যায়, বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরে তাঁর জন্ম। আমার ছাত্রীটিও বড়ো ভালো। মোটের ওপর সব দেখেশুনে খারাপ লাগল না এবং রাতারাতি নসিব খুলে যাওয়ার জন্যে অবাক হলাম খুবই। মি. ক্যারুথার্সের চমৎকার ব্যবহারের কথা আর কী বলব। এ ছাড়া গান-বাজনার ওপর তাঁর অনুরাগও বড়ো কম ছিল না। প্রতিটি সন্ধে তাই ফুরফুরে প্রজাপতির মতো হাসিখুশি ডানা মেলে উড়ে যেতে লাগল আমার মনকে আনন্দের আভায় উজ্জ্বল করে দিয়ে। প্রত্যেক শনিবার শহরে আসতাম মাকে দেখবার জন্যে।

'আমার এ সুখের জীবনে প্রথম অশান্তির সূত্রপাত হল লাল-গুঁফো মি. উডলির ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবে। লোকটা এসেছিল মাত্র মাসখানেক থাকার জন্যে। কিন্তু আমার কাছে এই একটি মাসই তিনমাসের মতো লম্বা মনে হয়েছে। শুধু পয়লা নম্বরের বজ্জাত বললে অল্প বলা হয়, অতি ভয়ংকর চরিত্রের লোক এই মি. উডলি। ইতরের মতো প্রত্যেকের সাথেই ব্যবহার— কিন্তু, আমার কাছে সে ইতরের চাইতেও অধম। তার গা-ঘিনঘিনে প্রেম নিবেদন, টাকাপয়সার দম্ভ এবং তাকে বিয়ে করলে লন্ডনের সবচেয়ে সেরা হিরের উপহারের লোভনীয় প্রস্তাবেও যখন

কাজ হল না, তখন একদিন ডিনারের পর আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে দিব্যি করে সে বললে তাকে চুমু না-খাওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই আমার। কী আসুরিক শক্তি লোকটার গায়ে, ঠিক এই সময় মি. ক্যারুথার্স এসে না-পড়লে শেষ পর্যন্ত কী যে হত ভগবান জনেন। উনি এসেই আগে আমায় মুক্ত করলেন লোকটার ক্লেদাক্ত সাপের মতো বাহুপাশ থেকে, তারপর এক ঘুসিতে তাকে শুইয়ে দিলেন মেঝের ওপর। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। কিন্তু এই আসাই লোকটার যে শেষ আসা, তা নিশ্চয় বুঝেছেন। পরের দিন মাপ চাইলেন মি. ক্যারুথার্স। আর কোনোদিন যে এভাবে আমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে না, সে-আশ্বাসও দিলেন। সেইদিন থেকে আর মি. উডলির শ্রীমুখ দেখিনি আমি।

'মি. হোমস, এবার আসা যাক আসল ব্যাপারে। অর্থাৎ যে-কারণে আপনার কাছে আসা পরামর্শের জন্যে। প্রথমেই বলি, প্রতি শনিবার দুপুর বারোটার আগেই সাইকেলে করে আমায় ফার্নহ্যাম স্টেশন আসতে হয়, বারোটা বাইশের ট্রেন ধরে আসার জন্যে। শিলটার্ন গ্র্যাঞ্জ থেকে স্টেশনে আসার পথটা বড়ো নির্জন। বিশেষ করে এক জায়গায় তো বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই খাঁ খাঁ রাস্তাটা। শার্লিংটন হলের চারিদিক ঘিরে একটা জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলের কিনারা থেকে শার্লিংটন হিথ পর্যন্ত মাঝের মাইলখানেক রাস্তায় দিনদুপুরেও জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যায় না— এত নির্জন। 'ক্রুকসবেরি হিল'-এর কাছে হাইরোডে না-পৌঁছানো পর্যন্ত দু-একটা গাড়িঘোড়া কি চাষি-মজুরের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়— এ-রকম ফাঁকা রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। হপ্তা দুয়েক আগে এই জায়গাটা দিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ পেছনে তাকাতে দেখলাম প্রায় দু-শো গজ দূরে একটি লোককে— তারও বাহন একটা দু-চাকার সাইকেল। লোকটার গালে কুচকুচে কালো ছোটো দাড়ি। বয়সের দিক দিয়ে না বুড়ো না জোয়ান বলেই মনে হল। ফার্নহ্যাম পৌঁছানোর আগে আর একবার পেছনে তাকিয়ে তাকে আর দেখতে পেলাম না, কাজেই এ-সম্বন্ধে আর কিছু ভাবিনি! কিন্তু মি. হোমস, আশ্চর্য হলাম তখনই যখন সোমবার ফেরার পথে একই লোককে দেখলাম একই রাস্তায় একই দ্বি-চক্রযানে। বিস্ময় আরও বাড়ল যখন একই ব্যাপারটা ঠিক আগের মতোই ঘটল পরের শনিবারে আর সোমবারে। তার আর আমার মধ্যেকার ব্যবধানটা রেখে দিলে লোকটা। আমার উপর নির্যাতনেরও কোনো চেষ্টা করলে না, তবুও জানি কীরকম বেয়াড়া লাগল সমস্ত ঘটনাটা। মি. ক্যারুথার্সকে বললাম সব। আদ্যোপান্ত শুনে ভদ্রলোকের খুব আগ্রহ জেগেছে মনে হল। আমায় বললেন আমার কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। কেননা, এ-রাস্তা দিয়ে যাতে আমাকে আর সঙ্গীহীন অবস্থায় না যেতে হয়, এজন্যে তিনি ইতিমধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ির অর্ডার দিয়েছেন।

'এই হপ্তাতেই ঘোড়ার গাড়ি এসে পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু কী কারণে জানি না, তা এল না। কাজেই, আবার সাইকেলে করে রওনা দিতে হল স্টেশনের দিকে। আমি কিন্তু আজ সকালের কথাই বলছি। শার্লিংটন হিথের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। তাকাতেই চোখে পড়ল সেই লোকটাকে— গত দুটো হপ্তায় যেভাবে তাকে দেখেছি, ঠিক সেইভাবে শ-দুয়েক গজের ব্যবধানে সাইকেল চালিয়ে পিছু নিয়েছে সে। দূরত্বটা সমান রেখেছিল যাতে ভালো করে তার মুখ না দেখতে পাই। কিন্তু লোকটা যে আমার চেনাজানা নয়, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। পরনে গাঢ় রঙের সুট, মাথায় কাপড়ের টুপি। কুচকুচে কালো দাড়িটা ছাড়া মুখের আর

কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। আজকে আর তেমন ভয় পাইনি, উলটে কৌতূহল হল খুবই। ঠিক করলাম, লোকটা কে এবং কী তার অভিপ্রায়, তা আমায় জানতেই হবে যেনতেনপ্রকারেণ। গতি কমিয়ে আনলাম সাইকেলে, দেখলাম তার গতিও কমে এসেছে। থেমে গেলাম, সে-ও পেডাল ঘোরানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার ওপর। ফাঁদটা পাতলাম তখনই। রাস্তাটা এক জায়গায় আচমকা মোড় নিয়েছে জানতাম। তিরবেগে সাইকেল চালিয়ে মোড়টা ঘুরেই থেমে গেলাম— প্রতীক্ষায় রইলাম দাড়িওয়ালা লোকটার। জানতাম, সে-ও তিরবেগে মোড় ঘুরেই আমাকে পেরিয়ে যাবে, থামবার অবসর পাবে না। কিন্তু আর টিকি দেখতে পেলাম না লোকটার। আবার ফিরে এলাম মোড় ঘুরে, মাইলখানেকের মতো রাস্তার মধ্যে লোকটার ছায়াও দেখতে পেলাম না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, আমি যে-জায়গাটার কথা বলছি, সেখানে রাস্তাটা দু-পাশে কোনো শাখাপ্রশাখা না-রেখে লম্বালম্বি এসে মোড় নিয়েছে। কাজেই, তার ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাওয়া দেখে আমার তখনকার অবস্থাটা আপনি খানিকটা অনুমান করতে পারবেন মি. হোমস।'

নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বলল হোমস, 'কেসটায় বেশ কিছু ভাবনার খোরাক আছে দেখছি। প্রথমবার মোড় ঘোরার পর থেকে, লোকটা উধাও হয়ে গেছে দেখার আগে পর্যন্ত ব্যবধানটা কত মিনিটের বলুন তো?'

'মিনিট দু-তিন তো বটেই।'

'মিনিট দু-তিনের মধ্যে তো লোকটার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া সড়কটার দু-পাশে অন্য কোনো রাস্তাও নেই, তাই না?'

'না।'

'তাহলে যেকোনো একদিকের পায়ে-চলা রাস্তায় নেমে পড়াই স্বাভাবিক।'

'না তা সম্ভব নয়। 'শার্লিংটন হিথ'-এর পাশে সে যেখানেই ঘাপটি মেরে থাকুক না কেন, আমার চোখ এড়াত না।'

'তাহলে, বাদসাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত রইল শুধু একটাই এবং তা হচ্ছে এই— ''শার্লিংটন হল'' যদি রাস্তার আর এক প্রান্তে হয়, তাহলে সেদিকেই সটকেছে লোকটা। আর কিছু বলবেন নাকি?'

'না, মি. হোমস। দিনদুপুরে ওই কাণ্ড দেখে আমি এমনই ঘাবড়ে গেলাম যে মনে হল সিধে আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ না-নেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাব না মনে। তাই—।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল হোমস।

তারপর শুধাল, 'যে-ভদ্রলোকের সাথে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে রয়েছে, তিনি থাকেন কোথায়?'

'কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে[৪] কাজ করে ও।'

'আচমকা দেখা দিয়ে আপনাকে চমকে দেওয়ার মতলব নেই তো তাঁর?'

'মি. হোমস, আপনি তাঁকে চেনেন না!'

'আপনার আর কোনো স্তাবক আছে নাকি?'

'সিরিলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে কয়েকজন ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর ধরুন, এই উডলি নামধারী বিকট লোকটা— অবশ্য ওকে স্তাবক শ্রেণিতে ফেলবে কি না, সে-বিচার আপনার।'

'আর কেউ?'

আমতা আমতা করতে থাকে মিস স্মিথ।

'কে সে?' শুধাল হোমস।

'আমার মনের ভুল হতে পারে মি. হোমস, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন জানি মনে হয়েছে মি. ক্যারুথার্স আমার সম্বন্ধে একটু বেশি রকমের সচেতন। একই বাড়িতে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বাজনা-টাজনাগুলো আমিই বাজাই। মুখ ফুটে কোনোদিনই কিছু বলেননি। সেদিক দিয়ে উনি নিখুঁত ভদ্রলোক। কিন্তু মেয়েদের মন তো, ধুলো দেওয়া বড়ো কঠিন।'

'হ্যাঁ!' গম্ভীর হয়ে উঠল হোমস। 'ভদ্রলোকের কাজ কারবার কী?'

'খুব বড়োলোক বলেই জানি।'

'গাড়িঘোড়া তো নেই?'

'না-থাকলেও খুব সচ্ছল অবস্থা। হপ্তায় দু-দিন উনি শহরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার শেয়ার নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন বললেই চলে।'

'মিস স্মিথ, নতুন কিছু ঘটলেই আমাকে জানাবেন। আপাতত আমি খুবই ব্যস্ত, তবুও কথা দিচ্ছি আপনার কেসটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমার হবে। ইতিমধ্যে আমাকে না-জানিয়ে হট করে কিছু করে বসবেন না যেন। গুড বাই, সুখবর শোনার আশায় রইলাম।'

মিস স্মিথের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলোনোর আগেই হারিয়ে যাওয়া চিন্তার খেই ধরতেই যেন পাইপটার দিকে হাত বাড়িয়ে হোমস বললে, 'কেসটার কতকগুলো পয়েন্ট আর ইঙ্গিত লক্ষ করার মতো।'

'একটা পয়েন্ট আমিও লক্ষ করেছি। একই জায়গায় বার বার রোডসাইড রোমিয়ো দেখা দিচ্ছে কেন, এই তো?'

'এগজ্যাক্টলি। যাক, প্রথমেই আমাদের জানা দরকার, ''শার্লিংটন হল''-এর বাসিন্দারা কারা, তারপর মি. ক্যারুথার্স আর উডলির আচারব্যবহার দেখে বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দুজনে। তাই যদি হয় তাহলে ওদের মধ্যকার আসল সম্পর্কটাই-বা কী, আর রাল্‌ফ স্মিথের আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়ার বেলায় ওদের দুজনেরই-বা এত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে কেন? আর একটা পয়েন্ট। দ্বিগুণ বেতন দিয়ে[৫] যিনি গভর্নেস নিয়ে আসেন বাড়িতে, বাড়ি থেকে দু-মাইল দূরের স্টেশনে যাতায়াত করার জন্যে তিনি গাড়িঘোড়া রাখেন না এ কেমনতরো ব্যবস্থা, ওয়াটসন? সত্যিই, কীরকম খাপছাড়া লাগছে, তাই না?'

'তুমি যাবে নাকি?'

'না হে না, গেলে তোমাকেই যেতে হবে। এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি আমার মূল্যবান গবেষণার ব্যাঘাত করতে চাই না। সোমবার সকাল সকাল ফার্নহ্যামে পৌঁছে ''শার্লিংটন হিথ''-এর কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।'

সোমবার সকালে ফার্নহ্যাম স্টেশনে নেমে 'শার্লিংটন হিথ' খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ

পেতে হল না। মিস স্মিথের শনি-সোমবারের অ্যাডভেঞ্চারের সিনটি দেখলে ভুল হওয়া অসম্ভব।

এমন জায়গায় দাঁড়ালাম, যাতে হলের দু-দিকের তোরণ ছাড়াও দু-পাশে প্রসারিত রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এতক্ষণ জনপ্রাণীর সাড়া ছিল না রাস্তায়। আমি ঝোপের আড়ালে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই যেদিক দিয়ে এসেছি, তার উলটো দিকের রাস্তায় দেখলাম একটা চলন্ত সাইকেল। সাইকেলটা আসছে আমার দিকেই। চালকের পরনে কুচকুচে কালো সুট, একগাল কালো দাড়িও চোখে পড়ল। শার্লিংটন জমির শেষাশেষি এসে লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কৃষ্ণবেশ সাইক্লিস্ট। সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে ঝোপের একটা ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মিনিট পনেরো চুপচাপ। তারপরেই দেখা গেল আর একটা সাইকেল। স্টেশনের দিক থেকে আসছে মিস স্মিথ।

এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে 'শার্লিংটন ঝোপ'-এর কাছাকাছি আসতেই লুকোনো জায়গা থেকে কৃষ্ণবেশ লোকটা চট করে বাইরে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে উঠল সাইকেলের ওপর এবং শুরু হল মিস স্মিথের পিছু নেওয়া। ধু-ধু মাঠের মধ্যে ফিতের মতো রাস্তার ওপর চোখে পড়ল শুধু এই দৃশ্যই। ধাবমান দুটি মূর্তি। রানির মতো মাথা তুলে সিটের ওপর সিধে হয়ে বসে[৬] মিস স্মিথ, আর তার পেছনে হ্যান্ডেল-বারের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে কালো সুট পরা রহস্যময় লোকটা— হাবভাব তার বিচিত্র, ঠিক যেন চোরের মতো। পেছন ফিরে একবার তাকাল মিস স্মিথ, তাকিয়ে স্পিড কমিয়ে দিল। সঙ্গেসঙ্গে পেছনের সাইকেলেরও স্পিড কমল। দাঁড়িয়ে গেল মিস স্মিথ। কালোদাড়িও ব্রেক কষে দাঁড়াল— মাঝখানে রইল অন্ততপক্ষে শ-দুই গজের ব্যবধান। এরপরেই মিস স্মিথ যা করল তা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই চমকপ্রদ। সাহসের বলিহারি যাই মেয়েটার। আচমকা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে তিরবেগে লোকটার দিকে ছুটে এল সে। কালোদাড়িও কম চটপটে নয়। চোখের পলক ফেলার আগেই সে-ও সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে বোঁ বোঁ করে ছুটল যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে। পড়ি কি মরি করে সে পালানোর দৃশ্য দেখার মতোই বটে। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য আবার ফিরে এল মিস স্মিথ। এবার পেছনকার নীরব সঙ্গীকে উপেক্ষা করে সিধে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। তার সিধে হয়ে সামনের দিকে তাকানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল, দম্ভ ওই মেয়েকেই মানায় বটে। লোকটাও ছিনেজোঁকের মতো আবার পিছু পিছু আসছিল— মাঝখানের ব্যবধান সেই দু-শো গজ! তারপর পথের বাঁকে দুজনেই হারিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে না-পড়ে তখনও ঘাপটি মেরে রইলাম আমার লুকোনো জায়গায়। থেকে ভালোই করেছিলাম। কেননা, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম আস্তে আস্তে ফিরে আসছে লোকটা। 'হল'-এর তোরণের দিকে মোড় নিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে। গাছপালার ফাঁকে তাকে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দু-হাত তুলে বোধ হয় নেকটাই ঠিক করছিল। তারপর আবার সাইকেল চালিয়ে হলের দিকে চলে গেল সে। আমি গাছগাছড়া গুল্মের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম সেদিকে। অনেক দূরে দেখতে পেলাম ধোঁয়া ধোঁয়া রঙের অনেক পুরোনো বাড়ি, অনেক উঁচু পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল টিউডর চিমনিগুলো; কিন্তু রাস্তাটা এমন একটা ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে যে গেছে লোকটার টিকিও আর দেখতে পেলাম না।

না পেলাম, কিন্তু বলতে নেই কাজটা আমার বৃথা যায়নি। কাজ হয়েছে যথেষ্ট, সুতরাং বেশ খুশি খুশি মনে হাঁটা দিলাম ফার্নহ্যামের দিকে। লোক্যাল হাউস-এজেন্ট 'শার্লিংটন হল' সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ খবর দিতে পারল না আমায়, তবে পল-মলের একটা নাম করা ফার্মের রেফারেন্স দিলে। বাড়ি আসার পথে সেখানে টুঁ মেরে এলাম। রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে শুনলাম, এ-গরমে আর 'শার্লিংটন হল' পাওয়া সম্ভব নয়। বড়ো দেরি হয়ে গেছে। মাসখানেক আগে মি. উইলিয়ামসন নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন বাড়িটা। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে এবং চেহারা দেখলে হেঁজিপেঁজি বলেও মনে হয় না। এজেন্ট-ভদ্রলোকের বিনয় মাটি স্পর্শ করে বটে, কিন্তু এর বেশি আর কিছু সে বলতে রাজি হল না। কেননা, মি. উইলিয়ামসনের সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা তার শোভা পায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সুদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করলাম মি. শার্লক হোমসের কাছে। কান খাড়া করে সব শুনল হোমস। আশা করেছিলাম, ছোটোখাটো দু-একটা শাবাশ কি বাহবা, অথবা 'ব্র্যাভো, মাই ডিয়ার ওয়াটসন'— এ-রকম জাতীয় কিছু কিছু প্রশংসা শুনতে পাব ওর মুখ থেকে। কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেল না হোমস। উলটে ওর রসকষহীন মুখ আরও বেশি কঠোর হয়ে উঠতে লাগল আমার বর্ণনার তালে তালে এবং আমি যা করেছি আর যা করিনি, তার ওপর এমন চোখা চোখা মন্তব্য ছাড়তে শুরু করলে যে কহতব্য নয়।

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, তোমার লুকোনো জায়গা নির্বাচনই ভুল হয়েছে। ঝোপের পেছনে থাকা উচিত ছিল না তোমার; তাতে লোকটাকে কাছ থেকে ভালো করে দেখতে পেতে। বেশ কয়েকশো গজ দূর থেকে যা দেখছ, মিস স্মিথ দেখেছে তার থেকেও অনেক বেশি— সুতরাং তোমার রিপোর্টে বেশি তথ্যের আশা করা অন্যায়। মিস স্মিথের ধারণা লোকটাকে সে চেনে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে চেনে। তা না হলে লোকটা অমন মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করবে কেন? পাছে, মেয়েটা তার কাছাকাছি এসে তাকে চিনে ফেলে, ভয় সেটাই, তাই না? লোকটা হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল বললে। তাহলেই দেখ, এখানেও নিজের মুখ আড়াল করবার প্রচেষ্টা। বাস্তবিকই ওয়াটসন, যাচ্ছেতাই রকমের বাজে কাজ করে এসেছ তুমি। লোকটা বাড়ির দিকে ফিরে যেতেই তোমার খেয়াল হল লোকটার পরিচয় জানার। আর, তাই তুমি এলে লন্ডন হাউস-এজেন্টের কাছে!'

একটু গরম হয়ে উঠি আমি, 'তা ছাড়া আমার কী করার ছিল শুনি?'

'কাছাকাছি কোনো পাবলিক-হাউসে যাওয়া। গাঁ অঞ্চলে সবরকম মুখরোচক আলোচনার কেন্দ্র হল পাবলিক হাউস।'

পরের দিন সকালে মিস স্মিথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমি যা যা দেখেছি তারই সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভুল বর্ণনা ছিল চিঠিতে! কিন্তু রিপোর্টের সারাংশ তাতে নেই, ছিল তলাকার ছোট্ট পুনশ্চতে :

'মি. হোমস, অকপটে সব কথা আপনাকে খুলে লিখছি এবং আমার বিশ্বাস এদিক দিয়ে আপনার ওপর আমার অগাধ আস্থা কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হবে না। এখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। মি. ক্যারুথার্স বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। আমার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা যে সত্যই নিখাদ সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি যে বাগদত্তা। আমার

প্রত্যাখ্যান খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছেন মি. ক্যারুথার্স, কিন্তু কোনোরকম উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা দেখাননি। খুব ভদ্রভাবে শুনেছেন আমার বক্তব্য। বুঝতেই পারছেন, এরপর থেকে পরিস্থিতি বড়ো জটিল হয়ে উঠেছে।'

চিঠি পড়া শেষ হলে চিন্তাঘন চোখে হোমস বললে, 'আমাদের ইয়ং ফ্রেন্ড দেখছি ক্রমশই গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে। না হে, আমার একটু গাঁয়ে যাওয়া দরকার। আজই বিকেলে রওনা হয়ে ছায়াঢাকা পাখিডাকা সুনিবিড় শান্তির নীড় গাঁয়ের হাওয়া খাওয়ার সাথে সাথে আগে থেকেই ভেবে রাখা দু-একটা থিয়োরিও পরখ করে দেখতে হবে।'

ছায়াঢাকা পাখিডাকা সুনিবিড় শান্তির নীড়ে হোমসের অভিযান যে শান্তিময় হয়নি, তা ওকে দেখামাত্র বুঝলাম। রাত করে বাড়ি ফিরল ও। এক ঠোঁট কাটা, কপালের ওপর একটা বিরাট ঢিপি। তা ছাড়া, চেহারাময় এমন একটা উঞ্জু উঞ্জু ভাব যে ওকে দেখামাত্র স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড উল্লসিত হয়ে উঠত একটা তদন্তের সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে। হোমস কিন্তু এই আজব অ্যাডভেঞ্চারে বিলক্ষণ পুলকিত। সব কথা বলতে বলতে কতবার যে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল তার আর ইয়ত্তা নেই।

তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পাড়া-গাঁ অঞ্চলে পাঁচজনে বসে আড্ডা মারে এমন জায়গা খুঁজে বার করতে। ফার্নহ্যামে নেমে এ-রকম জায়গা বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। মদের আড্ডায় গিয়ে বসতে যে-লোকটার সঙ্গে আলাপ হল তার আবার কিছু নিজস্ব জায়গাজমি বাড়ি ঘরদোর আছে। একটু বেশি বকা স্বভাব লোকটার। কাজেই যা চাইছিলাম, সবই শুনলাম তার কাছে। উইলিয়ামসন লোকটার সাদারঙের একগাল দাড়ি আছে, সামান্য কয়েকটা চাকরবাকর নিয়ে 'শার্লিংটন হল'-এ একলাই থাকেন ভদ্রলোক। গুজব, ভদ্রলোক এককালে পাদরি ছিলেন অথবা এখনও আছেন। কিন্তু 'হল'-এ থাকতে থাকতে তাঁর কীর্তিকলাপের দু-একটা নমুনা যা শুনলাম, তা জপতপ ধর্মকর্ম যাঁর কাজ, তাঁর পক্ষে শোভা পায় না। ক্লারিক্যাল এজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম এ-রকম একটা নাম তাদের অর্ডারেও এককালে ছিল। কিন্তু লোকটার কাজকর্মের রেকর্ড অতি জঘন্য, শোনার মতো নয়। বাচাল লোকটার পেট থেকে আরও কথা বার করে নিলাম। প্রতি হপ্তায় শনি রোববার নাগাদ অনেকের আগমন ঘটে 'শার্লিংটন হল'-এ। বিশেষ করে একজনের কথাই বললেন ভদ্রলোক। লোকটার নাম মি. উডলি, লাল লাল গোঁফ— অনেকদিন পর্যন্ত তাকে, একনাগাড়ে 'হল'-এ থাকতে দেখা গেছে। ঠিক এই সময়ে হল বিপত্তি। যার সম্বন্ধে এত কথা, সেই মি. উডলি যে স্বয়ং পাশের ঘরে পিপে থেকে গড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছিল, তা কি আর আমি জানি ছাই। শুধু মদ্যপানই করেনি, আড়ি পেতে আমাদের সব কথাই শুনেছে। কথার মাঝেই গট গট করে ঢুকেই শুরু হল অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে অজস্র প্রশ্নবাণ! কে আমি? কী আমার অভিপ্রায়? এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করার মানে কী? কথাবার্তা বেশ বলে লোকটা। সে কী বচনের তোড়! বিশেষণগুলোও বড়ো চোখাচোখা। বৃষ্টির মতো গালিবর্ষণ শেষ হল মোক্ষম একটা ঘুসি ঝেড়ে। পেছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে তার মারখানা দেখার মতো। বরাত মন্দ, ঘুসিটা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। তার পরের মিনিট ক-টা কিন্তু অতি উপাদেয়। বাঁ-হাতের সিধে মার, ওই একবারই। পাকা বদমাশ হলে কী হবে, মি. উডলিকে বাড়ি যেতে হল গাড়িতে! আর আমার অবস্থাটা তো দেখছই! গাঁয়ের অভিযান শেষ হল বটে, তবে

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সময়টা ভালো কাটালেও লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। সারে বর্ডার থেকে তুমি যা জেনেছ, তার থেকে এমন কিছু বেশি জানিনি আমি।'

বেস্পতিবার আর একটা চিঠি পেলাম মিস স্মিথের কাছ থেকে।

'মি. হোমস, শুনে নিশ্চয় খুব বেশি অবাক হবেন না— আমি মি. ক্যারুথার্সের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। মুঠো মুঠো টাকা মাইনে দিলেও এ-রকম অস্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যে এত আড়ষ্টভাবে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। শনিবার শহরে আসছি এবং আর ফেরার ইচ্ছে নেই। মি. ক্যারুথার্স গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই ফাঁকা রাস্তায় বিপদের আশঙ্কা আর নেই। সত্যিকারের বিপদ-আপদ কোনোকালে ছিল কি না তা অবিশ্যি আমার জানা নেই।

'শুধু মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়ার জন্যেই চাকরি আমি ছাড়ছি না, আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। মি. উডলি নামে ন্যক্কারজনক লোকটা আবার দেখছি এসে জুটেছে। জন্ম থেকেই লোকটাকে দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়ংকর। কিন্তু ইদানীং দেখছি ওর এই বীভৎস রূপ আরও খোলতাই হয়েছে। নিশ্চয় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল লোকটার, মুখের আদলটাই পালটে গেছে মনে হল, চেনা মুশকিল। জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে খুবই উত্তেজিতভাবে হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে সে। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল দুজনের, শেষকালে যেন মি. ক্যারুথার্সও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মনে হল।'

গম্ভীরভাবে হোমস বলল, 'ওয়াটসন, যা ভয় করেছিলাম তাই। মেয়েটাকে ঘিরে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে— আমাদের কর্তব্য এখন শেষবারের মতো স্টেশন আসার সময়ে বেচারির ওপর কেউ যেন উৎপাত না-করে তা দেখা। ভায়া, আগামী শনিবার সকালে আমরা দুজনেই রওনা হচ্ছি। এ-রকম একটা আশ্চর্য অথচ অসম্পূর্ণ তদন্তের পরিশেষটা আর যাই হোক, অবাঞ্ছিত যাতে না হয়, তা তো আমাদের দেখা দরকার।'

বালি ঢাকা চওড়া রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি আর হোমস বুক ভরে সকালের তাজা বাতাস নিয়ে পাখি পাখালির মিষ্টি গান শুনতে শুনতে বসন্তের ছোঁয়া অনুভব করলাম দেহের অণু-পরমাণুতে। 'ক্রুকসবেরি হিল'-এর কাছের রাস্তাটা একটু ওপরদিকে উঠে গেছিল, এইখান থেকে চোখে পড়ল লম্বা লম্বা পুরোনো ওকগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে কালো কুটিল চেহারার 'শার্লিংটন হল'। ওক গাছগুলো তো পুরোনো বটেই, কিন্তু তাদের থেকেও আরও বেশি স্থবির মনে হচ্ছিল 'হল'টাকে, যার প্রতিটি ইটে প্রতিটি পাথরে অগুনতি বছরের অনেক ইতিহাস লেখা! সবুজ গাছপালা আর বাদামি রঙের ঝোপঝাড়ের মাঝখানকার লালচে হলদে ফিতের মতো সুদীর্ঘ পথটা আঙুল দিয়ে দেখাল হোমস। অনেক দূরে দেখলাম ছোট্ট একটা কালো ফুটকি— একটা গাড়ি। আসছে আমাদের দিকেই। দেখেই অসহিষ্ণুভাবে 'এই যা' বলে চিৎকার করে উঠল হোমস।

'আধঘণ্টার মতো সময় হাতে রেখেছিলাম। কিন্তু ও-গাড়ি যদি মিস স্মিথের হয়, তাহলে তো দেখছি অনেক সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছে সে আগের ট্রেনটা ধরার আশায়। ওয়াটসন, 'শার্লিংটনে ওর সঙ্গে দেখা হবে বলে মনে হয় না আমার— আমরা পৌঁছোনোর আগেই 'শার্লিংটন' পেরিয়ে যাবে ওর গাড়ি।'

চড়াইটা পেরিয়ে আসার পর থেকেই গাড়িটা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু গতিবেগ আমাদের এমনই বেড়ে গেল যে আমার মতো কুঁড়ে মানুষের, চব্বিশ ঘণ্টাই যার হাত পা গুটিয়ে

ঘরে বসে থাকা কাজ, আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। বলাবাহুল্য, পিছিয়ে পড়লাম[৭] আমি। হোমসের কথা আলাদা। প্রথমত এ-রকম দৌড়ঝাঁপ করার ঝামেলা তো তাকে বলতে গেলে বারোমাসই পোহাতে হয়, তা ছাড়া ওর ওই অফুরন্ত নার্ভাস এনার্জির ভাণ্ডার ভাঙিয়ে যেভাবে খুশি যতক্ষণ খুশি নিজের উদ্যমশক্তিকে জিইয়ে রাখতে পারে ও। কাজেই তার ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে চলার এতটুকু মন্দগতি দেখা গেল না। আমাদের মধ্যকার ব্যবধান তখন প্রায় শ-খানেক গজ, আচমকা স্তব্ধ হল ওর ক্যাঙারু লাফ। মুহূর্তেই দু-হাত শূন্যে ছুড়ে এমন ভাব করলে যেন নিরাশায় দুঃখে নিঃশেষ হয়ে গেল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে পথের বাঁকে দেখা গেল দু-চাকার একটা ঘোড়ার গাড়ি। কদম চালে মোড় ঘুরেই গড় গড় ঝন ঝন শব্দে তির বেগে গাড়িটা ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

দৌড়োতে দৌড়োতে চিৎকার করে উঠল হোমস, 'ইস, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে, ওয়াটসন, দারুণ দেরি করে ফেলেছি আমরা। আমিও ততক্ষণে হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়োচ্ছি ওর পাশে পাশে। 'গাধা, বোকা গাধা আমি, আগের ট্রেনের জন্যে তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল আমার। মেয়েটাকে ওরা গুম করল, ওয়াটসন— গুম করল! খুনও করতে পারে! ভগবান জানেন কী ওদের মর্জি! রাস্তা জুড়ে দাঁড়াও! থামিয়ে দাও ঘোড়াটাকে। ঠিক আছে, উঠে পড়ো, চটপট! দেখা যাক এবার আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কি না।'

লাফ মেরে গাড়িটায় দুজনে উঠে পড়ার পর হোমস লাগাম ধরে মুখ ঘুরিয়ে দিলে ঘোড়ার— তারপরেই শন করে বাতাস কেটে চাবুকের এক ঘা। যেন উড়ে চললাম আমরা। বাঁকটা ফেরার সঙ্গেসঙ্গে 'শার্লিংটন হল' আর ঝোপের মধ্যেকার সুদীর্ঘ রাস্তাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

সজোরে হোমসের হাত আঁকড়ে ফিসফিসিয়ে উঠলাম, 'হোমস, এই সেই লোক।'

'থামুন!' সাইকেলটা টেনে এনে আমাদের রাস্তা বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

আমার কোলে লাগামটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল হোমস।

'আপনাকেই খুঁজছিলাম। মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায়?' দ্রুত অথচ পরিষ্কার গলায় বলে গেল হোমস।

'আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। তারই গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন আর জানেন না সে কোথায়?'

'এদিকে আসতে আসতে রাস্তায় চোখে পড়ল গাড়িটা— ফাঁকা, কাউকে ভেতরে দেখিনি। মিস স্মিথ বিপদে পড়েছেন ভেবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এলাম এদিকে।'

'হে ভগবান! হে ভগবান, এ কী হল, কী করি আমি এখন?' হতাশায় একেবারে যেন গুঁড়িয়ে ভেঙে গেল দাড়িওলা আগন্তুক। 'শেষ পর্যন্ত ওই কুত্তা উডলি আর পাজির পাঝাড়া গাঁইয়া পাদরিটার খপ্পরেই পড়ল মেয়েটা। আসুন, আসুন, সত্যিই যদি ওর বন্ধু হয়ে থাকেন আপনারা তাহলে চলে আসুন আমার পেছনে পেছনে। আমার পাশটিতে শুধু থাকুন, যেভাবেই হোক, বাঁচাব ওকে। তাতে যদি 'শার্লিংটন'-এর বনে লাশও পড়ে থাকে, এ-শর্মা পেছোবে না।'

উদ্ভ্রান্তের মতো এক হাতে পিস্তল নিয়ে ঝোপের মাঝে একটা ফাঁকের দিকে দৌড়াল লোকটা। হোমস তার পিছু নিল, আমিও ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ে লেগে রইলাম তার পেছনে।

কাদা-চটচটে রাস্তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে হোমস বললে, 'এই তো, এই পথেই ওরা এসেছে দেখছি। আরে আরে এ কী! দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান! ঝোপের মধ্যে এ কে?' বছর সতেরো বয়সের একটা ছোকরা রক্তাক্ত মুখে পড়েছিল ঝোপের মাঝে।

আগন্তুক উত্তেজিতভাবে বললেন, 'এ যে দেখছি পিটার! এই ছোকরাই তো মিস স্মিথের গাড়ি চালিয়ে আনল এইমাত্র। জানোয়ারগুলো ওকে শুধু টেনেই নামায়নি, ডান্ডার ঘায়ে সাংঘাতিক জখমও করেছে দেখছি। বেচারি, কিন্তু ওকে এখন এইভাবেই ফেলে রেখে যেতে হবে। আমরা ওর পাশে থেকেও তো এখন কিছু করতে পারছি না। মেয়েটাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে, নারীজীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে যেভাবেই হোক তাকে রক্ষা করতে হবে।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে ক্ষিপ্তের মতো দৌড়াতে লাগলাম আমরা। চারদিক ঘেরা বাগানের কাছাকাছি গিয়ে হোমস দাঁড়িয়ে গেল।

'বাড়ির দিকে ওরা যায়নি। এই তো বাঁ-দিকে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে— এই যে এদিকে, লরেল ঝোপের পাশে। ওই শোন, ওই শোন, যা ভয় করেছিলাম! আচম্বিতে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে গেল এক আতীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারে, নিঃসীম বিভীষিকায় যেন রিনঝিন করে উঠল সে-চিৎকার। শব্দটা এল আমাদের সামনেই ফুলে ফুলে ঢাকা ঘন সবুজ ঝোপের ভেতর থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছিল চিৎকারটা। তারপরেই আচমকা সব চুপ হয়ে গেল, শুধু শুনলাম গলার মধ্যকার চাপা ঘড় ঘড় শব্দ, যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার।

'এদিকে! এদিকে! খেলার মাঠে আছে ওরা!' চেঁচাতে চেঁচাতে ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাগলা হাতির মতো ছুটে গেল আগন্তুক। 'কাপুরুষ কুকুর কোথাকার! পেছনে আসুন, আপনারা আমার পেছনেই থাকুন! ওঃ, বড়ো দেরি হয়ে গেছে, বড়ো দেরি হয়ে গেছে! হায়, এ কী হল!'

আচম্বিতে শেষ হয়ে গেল ঝোপঝাড়ের বাধা, এসে পড়লাম ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছানো একটুকরো খোলা জমির ওপর। সবুজ আয়নার মতো টুকরো জমিটার চারপাশে বড়ো বড়ো বহু পুরোনো ওক গাছের সারি। জমির ওদিকের প্রান্তে দৈত্যের মতো বিরাট একটা ওকগাছের ছায়ায় তিনজন লোকের ছোট্ট একটি দল দাঁড়িয়ে। তিনজনের মধ্যে একটা মেয়ে— মিস স্মিথ, সামনের দিকে মাথা ঝুলে পড়েছিল তার এবং মনে হল জ্ঞান নেই। রুমাল দিয়ে মুখটাও বাঁধা দেখলাম। উলটোদিকে দাঁড়িয়ে পাশবিক চেহারার হোঁতকামুখো লাল-গুঁফো একজন জোয়ান। বোতাম লাগানো চামড়ার গেইটার পরা, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে, এক হাত কোমরে, আর এক হাতে দুলছে একটা ঘোড়ার চাবুক। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তার দেহের প্রতিটি অংশে ভাবে ভঙ্গিমায় নিষ্ঠুর বিজয়োল্লাস, অপরিসীম ঔদ্ধত্য যেন লিকলিকে চাবুকের মতোই হিল হিল করে উঠছিল। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে আর একজন পুরুষ। লোকটার বয়স হয়েছে। ধোঁয়াটে রঙের একগাল দাড়ি, হালকা টুইড সুটের ওপর ধবধবে সাদা খাটো আলখাল্লা। মাঠের কিনারায় আমরা দেখা দিতেই প্রার্থনার বইটা এমনভাবে সে পকেটে পুরল যেন এইমাত্র বরকনের বিয়ে সাঙ্গ হল। তারপর মহাফুর্তিতে ক্রূর-প্রকৃতি বর-বাবাজির পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাতেও ভুল করল না।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি, 'বিয়ে হয়ে গেল ওদের!'

আমাদের গাইড শুধু বললে, 'চলে আসুন! চলে আসুন!'

বলতে বলতে সবুজ ঘাসজমির ওপর দিয়ে উল্কা বেগে সে ধেয়ে গেল সামনের দিকে। পেছনে আঠার মতো লেগে রইলাম হোমস আর আমি। ছুটতে ছুটতে দেখলাম মিস স্মিথ টলমলিয়ে উঠে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। ততক্ষণে আর আমার বুঝতে বাকি নেই যে সাদা আলখাল্লা পরা ধোঁয়াটে দাড়ি আধবুড়ো লোকটাই উইলিয়ামসন— এককালে কিছু সময়ের জন্যে পাদরিগিরিও সে করেছে। আমাদের দেখেই শ্লেষভরে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাল সে বাতাসে মাথা ঠুকে 'বো' করে। ইতর চেহারার উডলি লোকটাও মাঠবন কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল জানোয়ারের মতো। এ-হাসি শুধু বিদ্রূপের নয়, বিজয়োল্লাসের। হাসতে হাসতে চাবুক দোলাতে দোলাতে সে এগিয়ে এল আমাদের পানে।

বলল, 'ওহে বব, তোমার দাড়িটা এবার সরিয়ে নাও। তোমাকে যখন আমি হাড়েহাড়েই চিনি, তখন ও-জিনিসটা রেখে আর হাসিয়ো না আমাকে। যাই হোক, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। এসো, মিসেস উডলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমাদের।' এ-কথার উত্তর আমাদের গাইড যেভাবে দিলে তাতে তাক লেগে গেল আমার। পলক ফেলার আগেই ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলল সে। এক হ্যাঁচকা টানে কয়লা-কালো কুচকুচে দাড়ির বোঝা সরিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়ল পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো পাঙাশপানা লম্বাটে ধরনের একটি মুখ। দাড়িটা মাঠের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভার তুলে এবার লক্ষ করলে গোঁয়ার জাহাঁবাজকে— কেউটে সাপের মতো হাতের ঘোড়ার চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বিপজ্জনকভাবে যে তখনও এগিয়ে আসছিল আমাদের পানে।

আমাদের দোস্ত বলল, 'হ্যাঁ, আমিই বব ক্যারুথার্স। আর মেয়েটিকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করব আমি। সেজন্যে এমন কিছুই নেই এ-দুনিয়ায় যা আমি করতে প্রস্তুত নই। আমি তোমায় আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম— ওর গায়ে হাত দিলে কিন্তু ভগবানের দিব্যি, আমার কথার নড়চড় হবে না জেনে রেখো!'

'উঁহু, বড়ো দেরি করে ফেলেছ তুমি, ভায়োলেট এখন আমার বউ।'

'না, তোমার বিধবা।'

চকিতে খানিকটা আগুন ঝলসে উঠল তার রিভলভারের নলটাতে। ফায়ারিংয়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই উডলির ওয়েস্টকোটের সামনেটা ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্তে দেখতে দেখতে ভিজে গেল। আর্ত চিৎকার করে এক পাক ঘুরে গেল সে, তারপরেই চিৎপাত হয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাঠের ওপর— কদর্য মুখের রক্তাভা চকিতে মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল বিচিত্র ফ্যাকাশে ভয়াবহতা। আধবুড়ো লোকটা তখনও তার সাদা ধড়াচুড়ো নামায়নি। নিমেষের মধ্যে এ-কাণ্ড হয়ে যেতে এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিলে যা শোনার দুর্ভাগ্য সারাজীবনে আমার হয়নি। পরক্ষণেই টেনে বার করলে নিজের রিভলভার, কিন্তু তা তুলে ধরার আগেই তার চোখ পড়ল হোমসের উদ্যত রিভলভারের ব্যারেলের ওপর।

কঠিন স্বরে বললে হোমস, 'যথেষ্ট হয়েছে। পিস্তল ফেলুন। ওয়াটসন, তুলে নাও! ওরই মাথা লক্ষ করে দাঁড়াও! ধন্যবাদ। ক্যারুথার্স, আপনার রিভলভারটাও দিন আমাকে। মারপিটের আর দরকার নেই। এগিয়ে আসুন, দিয়ে যান রিভলভার।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম শার্লক হোমস।'

'গুড লর্ড!'

'আমার নাম শুনেছেন দেখছি। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত তাদের কর্তব্যই করতে হবে আমায়। এই, এদিকে এসো!' ঝোপঝাড় ঠেলে ফাঁকা মাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল ভয়ার্ত গাড়োয়ানটা। তাকেই চিৎকার করে ডাকল হোমস। 'এদিকে এসো। যত তাড়াতাড়ি পার এই চিরকুটটা নিয়ে যাও ফার্নহ্যামে।' নোটবুকের পাতা ছিঁড়ে খস খস করে কয়েক লাইন লিখল হোমস। 'পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্টকে দেবে চিঠিটা। উনি এসে না-পৌঁছানো পর্যন্ত আপনাদের প্রত্যেককেই আমার হেফাজতে থাকতে হবে।'

অত্যন্ত কড়া আর প্রভুত্বময় ব্যক্তিত্ব হোমসের। স্বল্প কথার খবরদারিতে চকিতের মধ্যে অমন একটি খুনখারাপির দৃশ্যও এসে গেল তার হাতের মুঠোয়। আমরা প্রত্যেকেই যেন তার হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। উইলিয়ামসন আর ক্যারুথার্স আহত উডলিকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। আমি নিয়ে এলাম মিস স্মিথকে— বেচারি দারুণ ঘাবড়ে গেছিল কাণ্ডকারখানা দেখে। আহত উডলিকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। হোমসের অনুরোধে তাকে পরীক্ষা করে রিপোর্টটা দিতে এলাম। মান্ধাতা আমলের পর্দা ঝোলানো ডাইনিং রুমে দুই বন্দিকে সামনে বসিয়ে সিধে হয়ে বসে ছিল হোমস।

বললাম, 'বেঁচে যাবে লোকটা।'

'কী!' তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল ক্যারুথার্স। 'ওপরে গিয়ে ওকে শেষ করি আগে— তারপর অন্য কথা। আপনি কি বলতে চান ডানাকাটা পরির মতো অমন সুন্দরী মেয়েটির সারাজীবন ওই জানোয়ার রোরিং জ্যাক উডলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে?'

হোমস বললে, 'এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো দরকার নেই। মস্ত দুটো কারণে কোনোমতেই উডলির বউ হওয়া সম্ভব নয় মিস স্মিথের পক্ষে। প্রথমেই আমরা অনায়াসেই মি. উইলিয়ামসনকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে আদপে বিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা তাঁর আছে কি না।'

চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো রাসকেল উইলিয়ামসন, 'আলবত আছে।'

'ছিল এবং পরে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

'একবার যে পুরুত হয়, চিরকাল সে পুরুতই থাকে।'[৮]

'আমার তা মনে হয় না। লাইসেন্স আছে?'

'বিয়ের জন্যে একটা লাইসেন্স আনিয়েছি। আমার পকেটেই আছে।'

'তাহলে তা চালাকি করেই আনানো হয়েছে বলব। সে যাই হোক, জোর করে দেওয়া বিয়েকে বিয়ে তো বলেই না, উলটে এ মহাপাতকের কাজ যারা করতে যায়, তাদের অপরাধের গুরুত্ব যে কতখানি, তা টের পাবেন শিগ্‌গিরিই। এ-ব্যাপার নিয়ে ভাববার জন্যে কম করে বছর দশেক সময় তো পাবেনই, অন্তত আমার তো তাই বিশ্বাস। মি. ক্যারুথার্স, পিস্তলটা পকেটে রেখে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন আপনি।'

'এখন তা বুঝেছি, মি. হোমস। জীবনে আমি একবারই ভালোবেসেছি এবং আমার এ

ভালোবাসা, বুঝতেই পারছেন, মিস স্মিথকে ঘিরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে এতদিন ধরে। তাই সবরকমভাবে তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছি। সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় বিপদের ধাক্কা থেকে। কিন্তু এত করেও যখন দেখলাম যার সংস্পর্শে এসে ভালোবাসা কাকে বলে জেনেছি, সে পড়েছে এমন একজনের খপ্পরে, যার নামে কিমবারলি[৯] থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা শিউরে ওঠে, সারা আফ্রিকায় যার জুড়িদার হওয়ার মতোও মানুষ-পশু আর খুনে গুন্ডা আর দুটি নেই, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, চিন্তাবুদ্ধিবোধে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল উন্মাদ-রাগে। মি. হোমস, বেশি কথা কী, আমার চাকরিতে মিস স্মিথকে বহাল করার পর থেকে একটি দিনের জন্যেও ওঁকে আমি বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে বেরোতে দিইনি— কেননা, এই রাসকেলগুলো যে অষ্টপ্রহর ওত পেতে রয়েছে তার জন্যে, তা আর কেউ না-জানলেও আমি তো জানি। এমনকী বাড়ি ছেড়ে যেখানেই সে একলা রওনা হয়েছে, আমিও সাইকেলে তার পাছু নিয়েছি, পাছে কেউ তার ওপর হামলা করে বসে এই ভয়ে। অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? বেশ কিছুটা তফাতে থেকে সাইকেল চালিয়েছি এবং পাছে চিনে ফেলে তাই নকল দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশও ধারণ করতে হয়েছে। হয়তো এসবের দরকার হত না যদি আর পাঁচটা মেয়ের মতো হত মিস স্মিথ। কিন্তু তার মতো তেজি মেয়ে বড়ো একটা দেখা যায় না, কাজেই রাস্তাঘাটে বেরোলেই আমি তার পাছু নিই জানলে আর এক মুহূর্তও আমার চাকরিতে সে থাকত না।

'টেলিগ্রামটা আসার পরেই বুঝলাম আর সবুর করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, এসপার কি ওসপার, যা হয় একটা কিছু ওরা এবার করবেই।'

'কীসের টেলিগ্রাম?'

পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করল ক্যারুথার্স।

'এই দেখুন!'

খুবই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম।

'বুড়ো অক্কা পেয়েছে।'

হোমস বললে, 'হুম। বুঝছি, এবার জলের মতোই সব বুঝছি। এবং এ-টেলিগ্রাম পাওয়ার পর কেন তারা উঠে পড়ে লেগেছে, তাও আর অস্পষ্ট নেই আমার কাছে। দয়া করে উৎকর্ণ হয়ে শুনুন— তারপর বলুন আর কিছু গোপন রইল কি না। প্রথমেই বলি, আপনারা তিনজনেই— মানে, আপনি উইলিয়ামসন, আপনি ক্যারুথার্স আর উডলি— এসেছেন সাউথ আফ্রিকা থেকে।'

'পয়লা নম্বরের কাঁচা মিথ্যে'— বুড়ো ঘুঘু বলে উঠল সঙ্গেসঙ্গে, 'মাসকয়েক হল এদের আমি দেখেছি, তার আগে এদের চন্দ্রবদন দেখার সৌভাগ্য আমার কোনোদিনই হয়নি। তা ছাড়া আফ্রিকায় আমি জীবনে যাইনি। কাজেই, মি. ব্যস্তবাগীশ হোমস, আপনার মূল্যবান তদন্তফল পাইপে ভরে কিছুক্ষণ ধূমপান করলে বিলক্ষণ খুশি হব!'

ক্যারুথার্স বললে, 'মিথ্যে বলেনি উইলিয়ামসন।'

'বেশ, বেশ, না হয় আপনারা দুজনেই এসেছেন আফ্রিকা থেকে। প্রভুপাদকে তাহলে আমাদের স্বদেশি মালই বলব। সাউথ আফ্রিকায় রাল্‌ফ স্মিথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল

আপনাদের। আপনারা জানতেন বেশিদিন বাঁচবে না সে। আর জানতেন, বুড়ো অক্কা পেলে তার সব সম্পত্তিই পাবে তার ভাইঝি! কীরকম— ঠিক হচ্ছে তো?'

ক্যারুথার্স মাথা হেলিয়ে সায় দিলে আর শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে আর এক পশলা গালিগালাজ সৃষ্টি করলে বুড়ো উইলিয়ামসন।

'এই ভাইঝিই তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আরও একটা জিনিস আপনারা জানতেন— বুড়ো কোনো উইলই করবে না।'

ক্যারুথার্স বললে, 'লিখতে পড়তেই জানত না।'

'কাজে কাজেই আপনারা দুজনে কষ্ট করে সাগর লঙ্ঘন করে এলেন এদেশে, উদ্দেশ্য মেয়েটাকে খুঁজে বার করা। আপনার মতলব ছিল অভিনব। একজন বিয়ে করতেন মেয়েকে আর একজন বখরা নিতেন লুটের সম্পত্তির। যেকোনো কারণেই হোক, উডলিকে স্বামী নির্বাচন করা হয়। কেমন, ঠিক হচ্ছে তো?'

'জাহাজে আসার সময়ে বাজি ফেলে তাস খেলেছিলাম— উডলিই জিতে নিলে মিস স্মিথকে।'

'বটে। এখানে এসে কায়দা করে চাকরিতে বহাল করলেন মিস স্মিথকে, ঠিক হল এই সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করা শুরু করবে উডলি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনাদের, মাতাল উডলিকে চিনতে বেশি দেরি হল না মিস স্মিথের এবং এ-রকম একটা গোঁয়ার জানোয়ারের সঙ্গে প্রেম তো দূরের কথা, কথা বলাও যে সম্ভব নয় তার পক্ষে, তাও বোঝা গেল শিগ্‌গিরই। ইতিমধ্যে আপনার সব বন্দোবস্তই ভণ্ডুল হয়ে গেল একটি কারণে— আপনি নিজেই মিস স্মিথের প্রেমে পড়ে গেলেন। কাজেই একটা ইতর লোক আপনার ওপর টেক্কা মেরে তাকে জিতে নিয়ে যাবে, এ-চিন্তাও আপনার কাছে বিছের কামড়ের মতো যন্ত্রণাময় হয়ে উঠল।'

'না, না, কিছুতেই হতে পারে না!'

'তাই একদিন ঝগড়ঝাঁটি হল দুজনের মধ্যে। আপনার ওপর গনগনে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে এবং শুরু হল আপনাকে বাদ দিয়েই ভায়োলেট হরণের আয়োজন।'

শুকনো হেসে ক্যারুথার্স বলল, 'উইলিয়ামসন, এ-ভদ্রলোকের কাছে আর কিছু চেপে রেখে লাভ আছে কি? হ্যাঁ, দারুণ ঝগড়া হয়ে গেছিল আমাদের মধ্যে। আমাকে ঘুসি মেরে পেড়ে ফেললে উডলি। এদিক দিয়ে আমিও কম যাই না। কাজেই শোধ নিলাম তখনই। তারপর থেকে যেন উবে গেল উডলি। এই পাদরি হতভাগার সঙ্গে তখনই যোগসাজশ হয় ওর। লক্ষ করলাম, মিস স্মিথ যে-পথ দিয়ে স্টেশনে যায়, তারই ধারে দুজনে ঘাঁটি পেতেছে একসাথে। তখন থেকেই মিস স্মিথের ওপর নজর রাখা শুরু করলাম আমি, কেননা হাওয়া সুবিধের মনে হল না। ওদেরকেও চোখে চোখে রাখলাম, কেননা ওদের আসল ফন্দিটা যে কী, তা ঠিক বুঝে উঠছিলাম না। দিনদুয়েক আগে বাড়ি বয়ে এসে এই টেলিগ্রামটা দেখাল উডলি। বুড়োর মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার পরেই ও জিজ্ঞেস করলে, এর পরেও চুক্তি অনুসারে আমি কাজ করব কি না। আমি সোজা না বলে দিলাম। ও আবার জিজ্ঞেস করলে, মেয়েটাকে আমি বিয়ে করে তাকে টাকার বখরা দেব কি না। আমি বললাম, বিয়ে করতে পারলে তো খুশিই হতাম, কিন্তু সে রাজি হবে না। ও

বললে, 'আগে ওর বিয়েটা লাগিয়ে দাও তো, তারপর হপ্তাখানেক কি দুয়েক পরে দাওয়াই দিলে সব সিধে হয়ে যাবে।' আমি বলে দিলাম, ওসব জোর জবরদস্তির কথা শুনতে আমি রাজি নই। রাগে আগুন হয়ে কদর্য গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল উডলি। ওর মতো ছোটোলোক ইতরের মুখে অবশ্য ও ধরনের গালাগালি বেমানান নয় মোটেই। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেল যে ছলে বলে কৌশলে মেয়েটাকে সে নিজের কোটরে পুরবেই। এই হপ্তার শেষের দিকেই তার এ-চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। স্টেশন পর্যন্ত একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করেছিলাম আমি। কিন্তু মন মানল না, তাই নিজেই সাইকেলে পাছু নিয়েছিলাম তার। সবে রওনা হয়েছিল সে। আমিও নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখে পাছু নেওয়া শুরু করেছি, কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। যখনই দেখলাম দুজন ভদ্রলোক তার গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসছে, বুঝতে আর কিছুই বাকি রইল না আমার।'

উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টুকরোটা আগুনের চুল্লিতে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে হোমস বললে, 'ইদানীং মাথাটা আমার বড়োই মোটা হয়ে গেছে, ওয়াটসন! যখনই তোমার রিপোর্ট পেশ করার সময়ে বললে দাড়িওলা সাইক্লিস্ট তোমার দিকে পিছন করে বাগানের ঝোপের মধ্যে দু-হাত তুলে বোধ হয় নেকটাই ঠিক করছিল, তখনই আমার সব বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।'

কেসটার পাণ্ডুলিপির তলায় দেখছি অনেকদিন পরে নিজেই আরও দু-একটি কথা লিখে রেখেছিলাম। মিস ভায়োলেট স্মিথ বিপুল সম্পত্তি পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। এবং এখন সে ওয়েস্টমিনস্টারের নামকরা ফার্ম মর্টন অ্যান্ড কেনেডির পার্টনার সিরিল মর্টনের বধূ।

অপহরণ আর লাঞ্ছনার অভিযোগে উইলিয়ামসন আর উডলি দুজনেই শাস্তি পেয়েছে ধর্মাধিকরণ থেকে। উইলিয়ামসন সাত বছরের আর উডলি দশ বছরের।

টীকা

১. **সুন্দরীর শতেক জ্বালা :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট' আমেরিকায় কলিয়ার্স উইকলির ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং ইংলন্ডে জানুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **ইম্পিরিয়াল থিয়েটার :** ওয়েস্টমিনস্টারের রয়্যাল অ্যাকোয়ারিয়ামের অংশ, ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের হল-এ গান-বাজনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। ১৮৯৯-এ এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অভিনেত্রী লিলি ল্যাংট্রি এটি আবার খোলবার ব্যবস্থা করেন ১৯০১-এ। এখানে অভিনীত মঞ্চ-সফল প্রযোজনাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল আর্থার কন্যান ডয়ালের লেখা 'ব্রিগেডিয়ার জেরার্দ' (১৯০৬)।

৩. **জোহানেসবার্গ :** দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটার্সর‍্যান্ড অঞ্চলের স্বর্ণখনি এলাকার প্রশাসন-কেন্দ্র হিসেবে জোহানেসবার্গ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ সালে। বর্তমানে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার এক গুরুত্বপূর্ণ শহর।

৪. **কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে :** কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিকাল ফ্যাকটর্স লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

৫. **দ্বিগুণ বেতন দিয়ে :** ১৮৯৫-এ গভর্নেসের চলতি বেতন পঞ্চাশ পাউন্ড, আজকের বাজারে ৩২০০ পাউন্ডেরও বেশি। তা ছাড়া থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকত এর সঙ্গে। জানিয়েছেন হোমস-গবেষক লেসলি ক্লিংগার।

৬. **সিটের ওপর সিধে হয়ে বসে :** ভিক্টোরীয় যুগের ইংলন্ডে মেয়েদের সাইকেল চালাতে হত গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের স্কার্ট, পেটিকোট, ঊর্ধ্বাঙ্গে জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি পরে। মনে হয় না যে তাঁরা খুব সাবলীল থাকতে পারতেন।

৭. **পিছিয়ে পড়লাম :** 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস' উপন্যাসে ওয়াটসনকে একবার বেশ জোরেই দৌড়োতে দেখা

গিয়েছিল, স্যার হেনরির সঙ্গে। অনেক সমালোচকের মতে ওয়াটসনের পায়ে আফগানিস্তানের লাগা আঘাতের ব্যথা চাগাড় দেওয়াতেই তিনি দৌড়োতে পারেননি এইবার।

৮. **'একবার যে পুরুত হয়, চিরকাল সে পুরুত থাকে'** : বুড়ো বজ্জাত উইলিয়ামসন কিন্তু এই কথাটা ঠিকই বলেছে। চার্চ অব ইংলন্ডের নিয়মে এমন পুরুত শাস্তির যোগ্য, কিন্তু তাতে বিয়ে ভাঙে না। অবশ্য, এক্ষেত্রে মিস স্মিথ-এর এ-বিয়েতে মত না -থাকায় বিয়ে ভাঙতে বাধ্য।

৯. **কিমবারলি** : ১৮৭০-এ এক বিশাল হিরের খনি আবিষ্কার হলে ১৮৭১-এ কিমবার্লি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার খনি অঞ্চলে। কিমবার্লির হিরের খনি কৃষিজীবী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একে একটি খনিপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করে।

গোরুর খুরের রহস্য[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য প্রায়রি স্কুল]

বেকার স্ট্রিটে আমাদের ছোট্ট রঙ্গমঞ্চে অনেকরকম নাটকীয় আসা যাওয়াই দেখেছি, কিন্তু ড. থর্নিক্রফট হাক্সটেবল, এম. এ., পি. এইচডি. ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের মতো চমকপ্রদ ও আকস্মিক আর কিছু মনে পড়ছে না। রাশি রাশি ডিগ্রির অনুপাতে অত্যন্ত পুঁচকে একটা কার্ড আসার কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। চেহারাখানা যেমন বিপুল তেমনি জমকালো। সব মিলিয়ে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, মনে হয় এমন দশাসই বপু যাঁর, তিনি আর যাই হোক অন্তঃসারশূন্য নন এবং আত্মবিশ্বাসেরও অভাব নেই তাঁর। কিন্তু আশ্চর্য এমন চেহারা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে প্রথমেই সামনের টেবিলটা ধরে টলমল করে উঠলেন ভদ্রলোক, তারপরেই গিয়ে দড়াম করে পড়লেন মেঝের ওপর। আগুনের চুল্লির পাশে বিছানো ভালুকের চামড়ার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল তাঁর জ্ঞানহীন বিশাল বনেদি বপু।

হোমস ব্যস্ত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি একটা কুশন এনে গুঁজে দিল তাঁর মাথার নীচে। আমি ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যান্ডি ঢালতে লাগলাম দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

নাড়ি দেখলাম। জীবনের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ধুকধুক করে বয়ে চলেছে সুতোর মতো সরু এতটুকু অংশ দিয়ে। বললাম, 'খুব সম্ভব খিদে আর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন— শেষ শক্তিবিন্দুটুকু ব্যয় করেছেন এখানে আসার জন্যে।'

ঘড়ির পকেট থেকে রেলের টিকিট বার করে হোমস বললে, 'উত্তর ইংলন্ডের ম্যাকলটন[২] থেকে এসেছেন দেখছি— রিটার্ন টিকিট। এখনও তো বারোটা বাজেনি। অর্থাৎ ভদ্রলোককে খুব সকাল সকালই রওনা দিতে হয়েছে বাড়ি থেকে।'

কুঁচকোনো চোখের পাতা অল্প অল্প কেঁপে উঠল, তারপরেই একজোড়া শূন্য-দৃষ্টি ধূসর চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকালে আমাদের পানে। পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, লজ্জায় অরুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ।

'আমার এ-দুর্বলতা মাপ করবেন, মি. হোমস, ভেতরে ভেতরে একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছি

চিন্তায় ভাবনায়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, এক গেলাস দুধ আর আর একটা বিস্কুট পেলেই আবার চাঙা হয়ে উঠব বলে মনে হয়।'

দুধ বিস্কুট খাওয়া শেষ ডা. হাক্সটেবলের। ধীরে ধীরে লালাভ হয়ে উঠল তাঁর গাল; আলো ফিরে এল তাঁর চোখে। চেয়ারে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিমায় গড়গড় করে বলে চললেন তাঁর কাহিনি। উচ্চারণ আর বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রাণশক্তি।

'জেন্টলমেন, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি যে প্রায়রি একটা প্রিপেরেটরি স্কুল অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হয় এইখানেই, তিন হপ্তা আগে যখন ডিউক অফ হোল্ডারনেস তাঁর সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডারকে পাঠালেন তাঁর একমাত্র ছেলে এবং উত্তরাধিকারী দশ বছরের লর্ড স্যালটায়ারকে আমার স্কুলে ভরতি করার জন্যে, তখন আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে সত্যসত্যই আমার স্কুলের সুনাম তাহলে চরমে পৌঁছোবে! তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে আমার জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের সূচনা আঁকা হয়েছিল সেদিনই।

'মে মাসের প্রথম তারিখে পৌঁছোলো ছেলেটি। গ্রীষ্মের পাঠক্রম শুরু হল সেদিনই। ভারি মিষ্টি স্বভাব তার— দু-দিনেই আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল সে। অবিবেচক নই, মি. হোমস এবং এ-কেসে আধাআধি বিশ্বাস করাটাও সমীচীন নয়। তাই অকপটে সব খুলে বলছি। ছেলেটি বাড়িতে খুব সুখে ছিল না। ডিউকের বিবাহিত জীবন যে মোটেই শান্তিময় হয়নি, এ গুপ্ত কথা জানে না এমন কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি অনুসারে বিচ্ছেদ হয় দুজনের মধ্যে— ডাচেস চলে যান দক্ষিণ ফ্রান্সে। এসব ব্যাপার তো এই সেদিনকার। মাকে খুবই ভালোবাসত ছেলে এবং ডিউক-ডাচেসের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আগাগোড়া মা পেয়ে এসেছে ছেলের গভীর সহানুভূতি। এসব কথা সবাই জানে। এবং শুধু এই কারণেই ডিউক তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিন পনেরোর মধ্যেই আমাদেরই একজন হয়ে উঠল ছোট্ট লর্ড স্যালটায়ার এবং বাইরে থেকে দেখে যতটা বোঝা যায়, মনেপ্রাণে সুখী হয়েছিল সে।

'তেরোই মে রাত্রে অর্থাৎ গত সোমবার রাত্রে তাকে শেষবারের মতো দেখা যায় প্রায়রিতে। ওর ঘর তিনতলায়। সে-ঘরে ঢুকতে হলে আরও একটা বড়ো ঘরের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। দুজন ছেলে এই ঘরটায় সে-রাতে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে দিয়ে কাউকে যেতে দেখেনি তারা, কোনো শব্দও শোনেনি। কাজেই, স্যালটায়ার যে এ-ঘর দিয়ে যায়নি এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না। তার নিজের ঘরের জানলা খোলা ছিল। জানলা থেকে মাটি পর্যন্ত মোটা আইভি লতা থাকায় আমরা পায়ের ছাপ খুঁজেছিলাম মাটিতে— কিন্তু কিছু পাইনি। না-পেলেও বেরোবার সম্ভাব্য পথ শুধু এইটাই এবং এ-সম্পর্কে দ্বিমত থাকারও কোনো কারণ নেই।

'মঙ্গলবার সকাল সাতটায় আমরা জানতে পারলাম যে রাতারাতি ঘর থেকে উধাও হয়েছে লর্ড স্যালটায়ার। বিছানা নিভাঁজ নয় দেখে বুঝলাম সে ঘুমোচ্ছিল। যাওয়ার আগে স্কুলের যা পোশাক, কালো ইটন জ্যাকেট[৩] আর গাঢ় ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে নিয়েছে। ঘরে যে কেউ ঢুকেছিল সে-রকম কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। ধস্তাধস্তি বা চেঁচামেচির শব্দও কান এড়াত না কনটারের। মাঝের বড়ো ঘরটায় শুয়েছিল কনটার। ওর ঘুম খুব পাতলা, বয়সও এদের চাইতে একটু বেশি।

'লর্ড স্যালটায়ারের অন্তর্ধানের খবর কানে আসবামাত্র আমি স্কুলের প্রত্যেককে ডেকে আনলাম নাম ডেকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে— ছাত্র, শিক্ষক, চাকরবাকর — কেউ বাদ গেল না। তখনই জানা গেল যে লর্ড স্যালটায়ার একলা পালায়নি।

'জার্মান মাস্টার হেইডেগারও নিপাত্তা। তাঁর ঘরও তিনতলায়, বাড়ির একদম শেষপ্রান্তে, লর্ড স্যালটায়ারের ঘরের মুখোমুখি। বিছানা দেখে বুঝলাম হেইডেগারও ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু মেঝের ওপর পড়ে থাকা শার্ট আর মোজা দেখে মনে হল ধরাচুড়ো অর্ধেক চাপিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। হেইডেগার কিন্তু আইভি লতা বেয়ে নেমেছেন। কেননা, লনের ওপর যেখানে উনি নেমেছেন সেখানে তাঁর পায়ের ছাপ পেয়েছি আমরা। লনের পাশে ছোট্ট একটা শেডে তাঁর বাইসাইকেল থাকত। শেড খুলে দেখলাম হেইডেগারের সঙ্গে তাঁর সাইকেলও উধাও হয়েছে।

'বছর দুয়েকের মতো আমার স্কুলে রয়েছেন হেইডেগার। খুব নির্ভরযোগ্য সুপারিশ দেখে তাঁকে কাজে বহাল করেছিলাম আমি কিন্তু সবসময়ে বড়ো মুষড়ে পড়তেন ভদ্রলোক, কথাবার্তাও বড়ো একটা বলতেন না। ছাত্র বা শিক্ষক সবার কাছ থেকেই দূরে দূরে থাকার ফলে কেউই তাঁকে আপন বলে ভাবতে পারত না। যাই হোক, আজ পর্যন্ত ওঁদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার আমরা যে-তিমিরে ছিলাম আজ বেস্পতিবার সকালেও সে-তিমির থেকে একচুলও এগোতে পারিনি। 'হোলডারনেস হল'-এ খোঁজ নিয়েছিলাম তখুনি। প্রায়রি স্কুল থেকে হোলডারনেস হলের দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। ভেবেছিলাম হঠাৎ হয়তো বাড়ির জন্যে মন কেমন করায় বাবার কাছেই ফিরে গেছে লর্ড স্যালটায়ার। কিন্তু সেখানেও কোনো খবর পাওয়া গেল না তার। উদ্‌বেগ-উত্তেজনায় ডিউকের অবস্থা কী হয়েছে, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন। আর নিজের চোখেই দেখলেন আপনারা, এই তিনদিনের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর দায়িত্ববোধ কুরে কুরে শেষ করে এনেছে আমার নার্ভের শক্তি।'

নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিল হোমস। তারপর কড়া সুরে বললে, 'এত দেরিতে আমার কাছে এসে খুবই অন্যায় করেছেন আপনি। অত্যন্ত গুরুতর অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমায় এখন তদন্ত করতে হবে। যেমন ধরুন না কেন, তিনদিন্ পর আইভি বা লন দেখে কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষেই কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।'

'মি. হোমস, আমার কোনো দোষ নেই। হিজ গ্রেস নিজেই প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্যে এ-খবর পাঁচ কান হতে দেননি। পারিবারিক অশান্তি দুনিয়ার লোকে জানুক, এ তাঁর ইচ্ছা নয়। শুধু ইচ্ছা নয় বললে অল্প বলা হবে, এ ধরনের কিছু ভাবতেও শিউরে ওঠেন উনি।'

'পুরো তিনটে দিন বিলকুল বাজে নষ্ট হয়েছে। বাস্তবিক ড. হাক্সটেবল, প্রথম থেকেই এ-কেস নিয়ে যা করেছেন আপনারা, তা অতি যাচ্ছেতাই, ক্ষমার অযোগ্য।'

'আমিও তা বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু তবুও এ-সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কেসটা আমি নিলাম, ড. হাক্সটেবল। ভালো কথা, লর্ড স্যালটায়ার আর জার্মান মাস্টারের মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন কি?'

'একেবারেই না।'

'ছেলেটি কি মাস্টারের ক্লাসেই ছিল?'

'না। যতদূর জানি দুজনের মধ্যে কোনোরকম কথাবার্তাই হয়নি।'

'ভারি আশ্চর্য তো! ছেলেটারও বাইসাইকেল আছে নাকি?'

'না।'

'আর কোনো সাইকেল উধাও হয়েছে?'

'না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ!'

'ভালো কথা। আপনি কি তাহলে মনে করেন মাঝরাতে জার্মান মাস্টার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন?'

'নিশ্চয় না।'

'তাহলে আপনার থিয়োরিটা কী শুনি?'

'বাইসাইকেলটা নিছক ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। সাইকেলটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনেই হাঁটা দিয়েছে কোনো গোপন জায়গার দিকে।'

'ঠিক। কিন্তু ধোঁকাটা একটু বিদঘুটে রকমের মনে হচ্ছে, তাই না? শেডে অন্য কোনো সাইকেল ছিল নাকি?'

'কয়েকটা ছিল।'

'আপনার থিয়োরি অনুসারে দুজনেই যে সাইকেলে চড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, এ-ধারণাই যদি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে হেইডেগারের, তাহলে তাঁর পক্ষে একটা না-লুকিয়ে একজোড়া সাইকেল লুকোনোই স্বাভাবিক নয় কি?'

'মনে তো হয় তাই।'

'আমার শুধু মনে হয় না, আমার বিশ্বাস যে এইটাই স্বাভাবিক। আপনাকে ধোঁকা দেওয়ার থিয়োরি এখানে খাটবে না, ডক্টর। তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটির গুরুত্ব কিন্তু অনেকখানি। আস্ত একটা সাইকেল বেমালুম লোপাট করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করে ফেলাটাও খুব সোজা কাজ নয়। আর একটা প্রশ্ন। অদৃশ্য হওয়ার আগের দিন কেউ কি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'না।'

'কোনো চিঠিপত্র এসেছিল তার নামে?'

'একটা এসেছিল বটে।'

'কার কাছ থেকে?'

'বাবার কাছ থেকে।'

'ছেলেদের চিঠি আপনি খোলেন নাকি?'

'না।'

'কী করে জানলেন চিঠিটা তার বাবার কাছ থেকে?'

'খামের ওপর হোলডারনেস বংশের প্রতীক-চিহ্ন ছিল। তা ছাড়া, ডিউক নিজের হাতে ঠিকানা লিখেছিলেন— ও-রকম অদ্ভুত আড়ষ্ট হাতের লেখা ডিউক ছাড়া যে আর কারো নয়, তা আমি জানি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ-চিঠির কথা ডিউকেরও মনে আছে।'

'এ-চিঠি পাওয়ার আগে আবার কবে সে চিঠি পেয়েছে?'

'বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তো নয়ই।'

'ফ্রান্স থেকে কোনো চিঠি এসেছিল তার নামে?'

'না। কোনোদিনই না।'

'এসব প্রশ্নের পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আপনি। হয় লর্ড স্যালটায়ারকে জোরজবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নইলে সে নিজেই গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তার মতো ছেলেমানুষের পক্ষে বাইরের জগৎ থেকে কোনোরকম উৎসাহ বা প্রেরণা না-পেলে এ ধরনের ডানপিটের মতো কাজ করাও সম্ভব নয়। কেউ যদি দেখা করতে না-এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয় চিঠিপত্রের ভেতর দিয়েই এ-উৎসাহ সে পেয়েছে। সেই কারণেই আমি জানতে চাইছি কে কে তাকে চিঠি লিখেছিলেন।'

'এ-সম্পর্কে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না মি. হোমস। যতদূর জানি, বাবা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রায়রিতে চিঠি লেখেননি।'

'এবং যেদিন ছেলে উধাও হয়ে গেল, সেদিনই এল তাঁর চিঠি। বাপছেলের মধ্যে সম্পর্ক কীরকম ছিল, ডক্টর? বন্ধুর মতো কি?'

'হিজ গ্রেস কারোর সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন না। দেশের এবং দশের কাজ নিয়েই অহরহ তাঁকে ডুবে থাকতে হয়— কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে যেসব আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখি, তার নামগন্ধও পাওয়া যায় না তাঁর মধ্যে। তবে ওরই মাঝে ছেলের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তাঁর কড়া স্বভাবের নমুনাও কোনোদিন পায়নি লর্ড স্যালটায়ার।'

'কিন্তু লর্ড স্যালটায়ার বেশি ভালোবাসত তার মাকে?'

'তা সত্যি।'

'কোনোদিন সে-কথা তার নিজের মুখে শুনেছেন?'

'না।'

'ডিউকের মুখে?'

'সর্বনাশ! না, মশাই না!'

'তাহলে জানলেন কী করে?'

'হিজ গ্রেসের সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডারের সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথাবার্তা হয়েছিল। মায়ের ওপর লর্ড স্যালটায়ারের দুর্বলতার খবর তাঁর মুখেই আমি শুনেছি।'

'বটে। লর্ড স্যালটায়ার নিখোঁজ হওয়ার পর তার নামে আসা ডিউকের শেষ চিঠিটা ঘরে পেয়েছেন কি?'

'না, যাবার সময়ে চিঠিটা নিয়ে গেছে সে। মি. হোমস, আর তো দেরি করা যায় না, এবার রওনা হওয়া যাক।'

'ঘোড়ার গাড়ি আনতে বলে দিই। মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমরা। ড. হাক্সটেবল, রওনা হওয়ার আগে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানোর ইচ্ছে থাকলে আপনার প্রতিবেশী মহলে বেশ করে এই কথাটা ছড়িয়ে দিন যে পুলিশ এখনও লিভারপুল বা অন্য কোথাও তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ধীরেসুস্থে আমরা কিছু কাজ সেরে নেব অকুস্থলে পৌঁছে। গন্ধ এখনও এমন

ফিকে হয়ে যায়নি যে ওয়াটসন আর আমার মতো দু-দুটো বাঘা হাউন্ডের[৪] নাকে তা ধরা পড়বে না।'

সেদিন সন্ধ্যায় পীক কাউন্ট্রির শীত-শীত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এসে পৌঁছোলাম আমরা। ড. হাক্সটেবলের বিখ্যাত স্কুল এই অঞ্চলেই। স্কুলে পৌঁছোতেই আঁধার ঘন হয়ে এল চারদিকে। টেবিলের ওপর একটা কার্ড পড়ে ছিল। ড. হাক্সটেবল ঘরে ঢুকতেই বাটলার এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁর কানে কী বললে। শুনেই রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন ডক্টর।

বললেন, 'ডিউক এসেছেন। সেক্রেটারি মি. ওয়াইল্ডারকে নিয়ে উনি স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আপনারা আসুন, আলাপ করিয়ে দিই ওঁর সাথে।'

অতি বিখ্যাত এই রাজনীতিবিদের ছবির সঙ্গে অবশ্য আমি আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু ছবিতে শুধু মুখের আদলই দেখেছি— আসল মানুষটির সঙ্গে ছবির মানুষের আকাশ-পাতাল তফাত। দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারায় উগ্র আভিজাত্যের ছাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত এবং সুরুচির পরিচয় বহন করে, পাতলা মুখ, কিন্তু বেশ গম্ভীর, দীর্ঘ নাক— সামনের দিকে অদ্ভুতভাবে বাঁকা। মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে মুখের ওপর লাল টকটকে দাড়িটা কীরকম জানি বেমানান লাগে। সুদীর্ঘ দাড়ি সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপরেও ঝুলে পড়েছিল ঝালরের মতো— ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করছিল ঘড়ির চকচকে চেনটা। রাজপুরুষের মতোই জমকালো চেহারা ভদ্রলোকের। আগুনের চুল্লির সামনে বিছানো পশুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি। ঘরে ঢুকতেই পাথরের মতো কঠিন চোখে তাকালেন আমাদের পানে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন খুবই অল্প বয়সের একজন তরুণ— তিনিই যে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ওয়াইল্ডার তা কেউ না-বললেও বুঝে নিলাম। ছোটোখাটো চেহারা ভদ্রলোকের, নার্ভাস, কিন্তু আকাশের মতো হালকা নীল-নীল চোখ আর চটপটে হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় আকারে খাটো হলেও সতর্কতায় আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অনেককেই হার মানিয়ে দিতে পারেন তিনি। আমরা ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ইনিই অনাড়ষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

'ড. হাক্সটেবল, আজ সকালেই আমি এসেছিলাম আপনার লন্ডনে যাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। শুনলাম আপনার লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্য মি. শার্লক হোমসকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁকে এ-কেসের তদন্তভার দেওয়া। হিজ গ্রেস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন, ড. হাক্সটেবল— এ ধরনের কিছু করার আগে তাঁর সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল।'

'যখনই শুনলাম যে পুলিশও ব্যর্থ হয়েছে—'

'পুলিশ যে ব্যর্থ হয়েছে এ-কথা হিজ গ্রেস মোটেই বিশ্বাস করেন না।'

'কিন্তু মি. ওয়াইল্ডার—'

'আপনি তো ভালো করেই জানেন, ড. হাক্সটেবল, প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্যে কতখানি উদ্‌বিগ্ন হিজ গ্রেস। এই কারণেই তিনি মনে করেন এ-ব্যাপার যত অল্প লোকে জানে ততই মঙ্গল।'

ভ্রূকুটি করে ডক্টর বললেন, 'যাক, যা হবার তা হয়েছে। এবার প্রতিকারের কথা ভাবা যাক। কাল ভোরের ট্রেনে মি. শার্লক হোমস লন্ডনে ফিরে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যায়।'

নির্বিকার নিরুত্তাপ সুরে হোমস বলে উঠল, 'উঁহু, ডক্টর, এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। উত্তর দেশের এই তাজা ফুরফুরে হাওয়ায় মনটা এত হালকা লেগেছে যে কয়েকটা দিন আপনার জলাভূমিতে কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার। আপনার ছাদের তলায় মাথা গুঁজতে না-পারি গাঁয়ের সরাইখানা তো আছেই। অবশ্য সে-ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

মহা ফাঁপরে পড়লেন ড. হাক্সটেবল। বেচারির দোনামোনা ভাব দেখে বড়ো মায়া হল আমার। কিন্তু এই শাঁখের করাতের মতো অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন ডিউক নিজেই। ডিনার-ঘণ্টার মতো গুরুগম্ভীর গমগমে গলায় কথা বলে উঠলেন উনি।

'ড. হাক্সটেবল, মি. ওয়াইল্ডারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু মি. শার্লক হোমসকে যখন সব জানানোই হয়েছে, তখন তাঁর সাহায্য না-নেওয়ার কোনো মানেই হয় না। মি. হোমস, সরাইখানায় না-গিয়ে আমার "হোলডারনেস হল"-এ ক-দিন গেলে আমি খুবই খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর গ্রেস। তদন্তের সুবিধার জন্যে লর্ড স্যালটায়ার যে-জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়েছেন, সেখানে থাকাটাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে।'

'যা ভালো বোঝেন। আমার বা মি. ওয়াইল্ডারের কাছে যদি কোনো খবর আশা করেন তো জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

হোমস বললে, 'আপনার সঙ্গে হয়তো "হল"-এ দেখা করার দরকার হবে আমার। এখন স্যার শুধু একটা প্রশ্নই করব আপনাকে। আপনার ছেলের এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের কোনো কারণ কি আপনি ভেবেছেন?'

'না মশাই, কোনো কারণই পাইনি!'

'মাপ করবেন, আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক দু-একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখছি না। আপনার কি ধারণা এ-ব্যাপারে ডাচেসের কোনো হাত আছে?'

রীতিমতো দ্বিধায় পড়লেন মন্ত্রীমশায়।

অবশেষে বললেন, 'আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে বাকি থাকে আর একটি সম্ভাবনা। মোটা টাকা দাঁও মারার জন্যে কেউ হয়তো আপনার ছেলেকে গুম করেছে। এ ধরনের দাবিদাওয়া নিয়ে লেখা কোনো চিঠি আপনি পেয়েছেন?'

'না।'

'আর একটি প্রশ্ন ইয়োর গ্রেস। শুনলাম, যেদিন লর্ড স্যালটায়ার উধাও হয়, সেইদিনই আপনি তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।'

'না, তার আগের দিন লিখেছিলাম।'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু চিঠিটা তার হাতে সেদিনই পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠিতে এমন কিছু ছিল কি যা পড়ার পর বেসামাল হয়ে পড়তে পারে সে অথবা এই ধরনের কাজ করার মতো প্রবৃত্তি মনে জাগতে পারে?'

'না, না, সে-রকম কিছুই ছিল না।'

'চিঠিটা কি আপনি নিজেই ডাকে দিয়েছিলেন?'

ডিউক উত্তর দেওয়ার আগেই বেশ একটু গরম হয়ে কথা বলে উঠলেন তাঁর সেক্রেটারি, 'নিজের হাতে চিঠি ডাকে দেওয়ার মতো অভ্যাস হিজ গ্রেসের এখনও হয়নি, অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এ-চিঠিও স্টাডি টেবিলে রেখেছিলেন উনি— আমি নিজে পোস্ট ব্যাগে ফেলে দিয়ে আসি চিঠিগুলো।'

'এ-চিঠিটাও সেসবের মধ্যে যে ছিল সে-বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ নেই তো?'

'নিশ্চয় না, চিঠিটা আমি লক্ষ করেছিলাম।'

'সেদিন হিজ গ্রেস ক-টি চিঠি লিখেছিলেন?'

'বিশ থেকে তিরিশটা। চিঠিপত্র আমাকে একটু বেশিই লিখতে হয়। কিন্তু এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না?'

'পুরোপুরি নয়,' বলল হোমস।

এবার ডিউক বলে উঠলেন, 'আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি দক্ষিণ ফ্রান্সে তদন্ত চালানোর জন্যে। আগেই বলেছি আপনাকে, এ-রকম নোংরা কাজ ডাচেস কোনোদিনই প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু ছেলেটার মাথাটাকে উদ্ভট খেয়ালের একটা কারখানা বললেই চলে। হয়তো জার্মান মাস্টারের সাহায্য নিয়ে সে মায়ের কাছে পালিয়েছে। ড. হাক্সটেবল, আমরা এবার "হল"-এ ফিরব।'

হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু মন্ত্রীমশাই এমনই আচম্বিতে কথাবার্তার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন যে তারপর প্রশ্ন তো দূরের কথা, সাধারণ আলাপ-আলোচনাও আর সম্ভব নয়। তাঁর মতো উগ্র অভিজাত পুরুষের পক্ষে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে একজন আগন্তুকের সাথে আলোচনা করা যে একেবারেই অসহ্য, তা বুঝতে কারোরই বাকি রইল না। আরও একটা ভয় তিনি করেছিলেন। হোমসের নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হয়তো তাঁর ডিউক-জীবনের ইতিহাস-প্রসঙ্গও এসে যাবে, আর, অতি সংগোপনে যেসব অন্ধকারময় কোণগুলো এতদিন ধরে ঢেকে রেখেছেন ফ্যামিলির চৌহদ্দির মধ্যে, তা আর গুহ্য থাকবে না— সাধারণ লোকের মুখরোচক আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

সেক্রেটারিকে নিয়ে ডিউক চোখের আড়ালে যেতেই হোমস আর একটুও দেরি করলে না, স্বভাবমতো সঙ্গেসঙ্গে পরম আগ্রহে শুরু করে দিলে।

লর্ড স্যালটায়ারের ঘর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেও কোনো সুরাহা হল না।

জানলা ছাড়া যাওয়ার যে রাস্তা আর নেই, এ-বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল সব কিছু দেখার পর। জার্মান মাস্টারের ঘর থেকেও নতুন কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের দেহের ভারে আইভি লতাগুচ্ছের গোড়ায় মাটির ওপর তাঁর গোড়ালির ছাপও পেলাম। ছোটো ছোটো সবুজ ঘাসের ওপর শুধু ওই একটি খাঁজ— গভীর রাতে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধানের পার্থিব সাক্ষী শুধু ওইটুকুই— আর কোনো ছিদ্র লনের ওপর পাওয়া গেল না।

শার্লক হোমস একলাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোথায়, ফিরল রাত এগারোটার পর। দেখলাম কার কাছ থেকে এ-অঞ্চলের মস্ত বড়ো একটা সামরিক মানচিত্র জোগাড় করে এনেছে সে। আবার ঘরে এসে বিছানার ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে ঠিক মাঝখানে ল্যাম্পটা রাখল ও। তারপর

শুরু হল ধূমপান। মাঝে মাঝে পাইপের ধূমায়িত অঙ্গারের দিকটা দিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে এমনি জায়গাগুলো দেখিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কায়দায় কথা বলে চলল সে।

'কেসটা আমায় পেয়ে বসেছে, ওয়াটসন। সত্যিই কয়েকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে এ-ব্যাপারে। প্রথমেই কিছু ভূগোল-তত্ত্ব বুঝে রাখ, তদন্তের সময় খুবই কাজে আসবে এসব খুঁটিনাটি।

'ম্যাপটা দেখছ তো। এই কালো রঙের চৌকোনা জায়গাটা হল প্রায়রি স্কুল। আলপিন গেঁথে রাখলাম এখানে। আচ্ছা, এই যে লাইনটা দেখছ, এটা প্রধান সড়ক[৫]। দেখতেই পাচ্ছ, সড়কটা স্কুলের পাশ দিয়ে পুব আর পশ্চিমে চলে গেছে। দু-দিকেই মাইলখানেকের মধ্যে রাস্তাটা থেকে কোনো শাখাপ্রশাখা বেরোয়নি। জার্মান মাস্টার ছেলেটিকে নিয়ে যদি রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটাই সে-রাস্তা।'

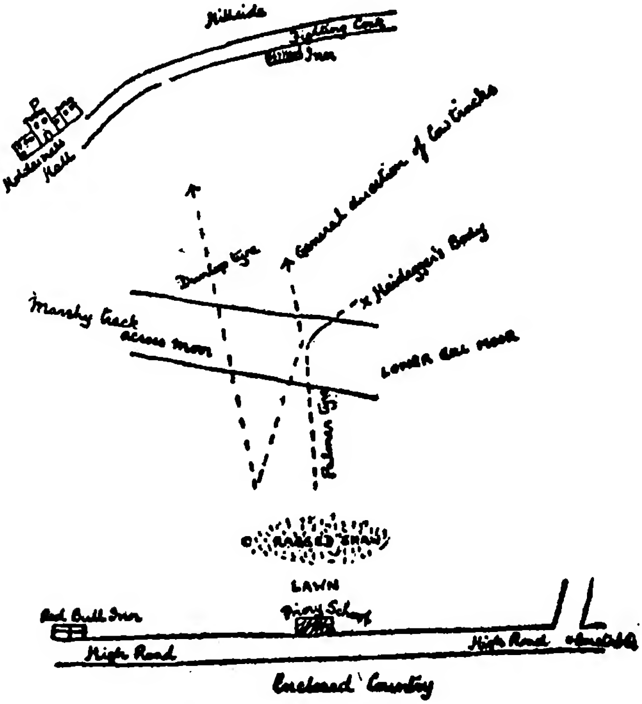

অঞ্চলটির একটি খসড়া মানচিত্র

'ঠিকই বলেছ।'

'সৌভাগ্যক্রমে, সেদিন রাতে এই রাস্তা দিয়ে যা কিছু গেছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব আমি পেয়েছি। আমার পাইপটা যেখানে রয়েছে এইখানে রাত বারোটা থেকে ভোর ছ-টা পর্যন্ত একজন চৌকিদার পাহারায় ছিল। দেখতেই পাচ্ছ, পুবদিকের প্রথম শাখা-রাস্তা এইটাই। চৌকিদারটা দিব্যি গেলে বলছে যে এক মুহূর্তের জন্যেও চৌকি ছেড়ে এদিকে-ওদিকে যায়নি সে এবং তার চোখে ধুলো দিয়ে কোনো ছেলে বা লোকই এ-রাস্তা দিয়ে সেরাত্রে যায়নি। কনস্টেবলটার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম তাকে অনায়াসেই বিশ্বাস করা চলে। কাজেই, পুবদিকের

তদন্তে এইখানেই ইতি। এবার আসা যাক অন্যদিকে। দেখছ, এদিকে 'রেড বুল' নামে একটা সরাইখানা রয়েছে, 'রেড বুল'-এর ল্যান্ডলেডির শরীর অসুস্থ ছিল সেরাতে। ম্যাকলটন থেকে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু অন্য কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ডাক্তার এলেন পরের দিন সকালে। কাজেই সারারাত সজাগ থাকতে হয়েছে সরাইখানার লোকেদের। শুধু সজাগ নয়, ডাক্তারের প্রতীক্ষায় রাস্তার ওপরও নজর রাখতে হয়েছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত। সেরাতে রাস্তা দিয়ে কোনো প্রাণীই যে যায়নি, এ-খবর বেশ জোর দিয়েই জানালে ওরা। সুতরাং ওদের সাক্ষ্য সত্য বলেই মেনে নিয়ে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চিমদিকের তদন্তে দাঁড়ি টেনে দিলাম। তাহলে সংক্ষেপে আমরা পাচ্ছি কী? না, চম্পট দেওয়ার সময়ে পলাতকেরা প্রধান সড়ক একেবারেই ব্যবহার করেনি।'

'কিন্তু সাইকেলটা?' প্রতিবাদ জানালাম আমি।

'ঠিক ঠিক। সাইকেল প্রসঙ্গেও আসছি এখুনি। আপাতত শুধু যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা যাক। এরা যদি রাস্তা দিয়ে না-গিয়ে থাকে, তাহলে বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণ দিক বরাবর এদের রওনা হতে হয়েছে রাতারাতি এ-অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। আচ্ছা, এবার এই দুটো সম্ভাবনা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। বুঝতেই পারছ, বাড়ির দক্ষিণ দিকে এই বিরাট অঞ্চলটা আসলে মস্তবড়ো একটা আবাদি জমি ছাড়া আর কিছু নয়। চাষের সুবিধের জন্যে চাষিরা পাথরের দেওয়াল দিয়ে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো জমিতে ভাগ করে নিয়েছে অতবড়ো জমিটা। এ-পথ দিয়ে সাইকেল যাওয়া অসম্ভব, কাজেই নাকচ হয়ে গেল এদিককার সম্ভাবনা। এবার এসো উত্তর দিকে। এদিকে দেখছি লম্বা লম্বা গাছের ছোটোখাটো একটা কুঞ্জবন— নাম লেখা রয়েছে 'এবড়ো-খেবড়ো উপবন'। আরও উত্তরে দেখছি ধু-ধু জলাভূমি, 'লোয়ার গিল মূর!' মস্তবড়ো জলাভূমি। বিস্তারে কম করে মাইল দশেক তো বটেই, আস্তে আস্তে ঢাল পথে উঠে গেছে ওপরদিকে। এই ধু-ধু তেপান্তরের একধারে 'হোলডারনেস হল', রাস্তা বরাবর গেলে পুরো দশ মাইল, জলাভূমির মধ্যে দিয়ে গেলে মাত্র ছ-মাইল। বড়ো অদ্ভুত জায়গা, এ-রকম জনবসতিবিরল জায়গা সাধারণত দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কয়েকটা মাথা গুঁজবার মতো ঠাঁই, জলাভূমির চাষিরা গোরু ছাগল চরাবার জন্যে এ-রকম চালা বানিয়ে রেখেছে এদিকে-সেদিকে। এ ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরলে শুধু প্লোভার আর কারলু পাখির দঙ্গল ছাড়া আর কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। চেস্টারফিল্ড হাই রোডে আসার পর আবার শুরু হল জনবসতি। একটা গির্জে, কয়েকটা কুঁড়েঘর আর একটা সরাইখানা। এর পরেই আচমকা খাড়াই হয়ে উঠেছে পাহাড়ের শ্রেণি। কাজেই বুঝতে পারছ ওয়াটসন, আমাদের তদন্ত শুরু করতে হবে উত্তর দিক থেকেই।'

'কিন্তু সাইকেলটা?' আমি লেগে থাকি নাছোড়বান্দার মতো।

অসহিষ্ণুস্বরে হোমস বললে, 'আরে গেল যা! ওস্তাদ সাইক্লিস্ট কখনো রাস্তার বাছবিচার করে না এবং বড়োরাস্তাকে সে বাদ দিয়ে গলিঘুঁজির ভেতর দিয়েও অনায়াসেই চালাতে পারে তার দ্বি-চক্রযান। জলাভূমিতেও অজস্র সরু সরু রাস্তার অভাব নেই, তা ছাড়া সেরাত্রে আবার জোছনার ফুটফুটে আলোয় স্পষ্ট ছিল না কিছু। আরে, আরে, একী!'

কে যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে খটাখট শব্দে টোকা দিলে দরজায়। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন ড. হাক্সটেবল স্বয়ং। হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের টুপি। টুপির ওপরের অংশে সাদা জমির ওপর সোনালি জরি দিয়ে আঁকা উলটোনো 'V' মার্কা মর্যাদাসূচক অলংকরণ।

'পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আমরা পেয়েছি! জয় ভগবান, এবার পাওয়া গেছে ছেলেটার হদিশ। এ-টুপি লর্ড স্যালটায়ারের।'

'কোথায় পেলেন?'

'জলায় একদল জিপসি আস্তানা গেড়েছিল, তাদের ভ্যানে। মঙ্গলবার পাততাড়ি গুটোয় ওরা। আজকে পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে ক্যারাভান তল্লাশ করতেই এ-টুপি পাওয়া যায়।'

'ওরা কী বলছে?'

ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে ছাড়া কী আর বলবে! মঙ্গলবার সকালে ওরা নাকি টুপিটাকে জলাভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেছিল। রাসকেল কোথাকার! সব জানে ওরা, ছেলেটাকে কোথায় গুম করে রাখা হয়েছে, সে-খবর ওরা ছাড়া কেউই দিতে পারবে না। আপাতত তো হাজতে পচুক হতভাগারা। তারপর, আইনের চোখরাঙানি তো আছেই। তাতেও না হলে ডিউকের টাকার জোরে মুখ খুলবে ওদের।'

আনন্দে আটখানা হয়ে ডক্টর বেরিয়ে যাওয়ার পরেই হোমস বললে, 'খবরটা মোটামুটি খুব খারাপ নয়, ওয়াটসন। সূত্র হিসেবে এর মূল্য কতখানি জানি না, কিন্তু এ থেকে যে থিয়োরি পাওয়া যাচ্ছে, তার মূল্য অনেক। সমস্ত তৎপরতা লোয়ার গিল মূরেই সীমিত রাখতে হবে— আর কোথাও নয়। জিপসিদের গ্রেপ্তার ছাড়া পুলিশ এ অঞ্চলে সত্যিকারের কোনো কাজই করতে পারেনি। ওয়াটসন, দেখেছ? জলার ওপর দিয়ে একটা জলের ধারা বয়ে গেছে। ম্যাপেতেই তো দাগ দিয়ে রাখা হয়েছে দেখছি। মাঝে মাঝে ধারাটা চওড়া হয়ে গিয়ে মিশেছে নীচু জলা জায়গায়। ধারাটা বিশেষ করে দাগানো হয়েছে স্কুল আর 'হোলডারনেস হল'-এর মাঝামাঝি জায়গায়। এখন আবহাওয়া যা শুকনো, তাতে জলাভূমির অন্যদিকের মাথা খুঁড়লেও পায়ের দাগ-টাগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না আমার। চিহ্ন-টিহ্ন পাওয়া যেতে পারে শুধু এই জলে স্যাঁৎস্যাতে জায়গাটাতেই। কাল ভোরেই তোমায় ডাক দেব, ওয়াটসন। দুজনে মিলে দেখা যাক এ-রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারি কি না।

সবে পাখির ডাক শুরু হয়েছে, রক্তরাগের আভা দেখা দিয়েছে পুবে, হোমস এসে টেনে তুলল আমায়। চোখ মেলেই দেখলাম শয্যার পাশে ওর দীর্ঘ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অত ভোরেও সেজেগুজে তৈরি হয়ে নিয়েছে ও। মনে হল, ইতিমধ্যে এক চক্কর ঘোরাও হয়ে গেছে।

আমি চোখ খুলতেই ও বলল, 'লন আর সাইকেল রাখার শেডটা দেখে এলাম, ওয়াটসন। 'এবড়ো-খেবড়ো উপবন'-এর মধ্যে দিয়েও এক পাক ঘুরে এলাম। পাশের ঘরে তোমার কোকো তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। চটপট তৈরি হয়ে নাও, বিস্তর কাজ সারতে হবে আজকে।'

দু-টুকরো হিরের মতো ঝকঝক করছিল ওর চোখ দুটো। কাজে হাত দেওয়ার আগে ওস্তাদ কারিগরের চোখ যেমন নিবিড় উৎসাহের রোশনাইতে জ্বলে ওঠে, এ যেন ঠিক তেমনি। এ যেন আর এক হোমস। বেকার স্ট্রিটের আত্মসমাহিত হোমস, দু-চোখে যার বিরং স্বপ্নালু তন্ময়তা; আর আজকের চটপটে, তৎপর হোমস, চোখে-মুখে দেহে মনে যার শুধু কাজের দীপ্তি— চেনা যায় না, যেন দু-রকমের ধাতুতে তৈরি দুজনে। মানসিক শক্তিতে ভরপুর সেই দীর্ঘ নমনীয় মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হল, বাস্তবিকই আজ বড়ো কঠোর পরিশ্রমের দিন।

কিন্তু তবু চরম নিরাশার মধ্যে দিয়েই শুরু হল আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব। বুকভরা আশা নিয়ে গেছিলাম জলাভূমিতে। গাছপালার পচা শিকড়ে বোঝাই রাঙামাটির ওপর দিয়ে ব্লাড

হাউন্ডের মতোই এগিয়ে গেলাম, ভেড়া যাতায়াতের অজস্র পথে শতধা বিভক্ত জলাভূমির গোলকধাঁধার মতো গলিঘুঁজিতে বৃথাই ঘুরে বেড়ালাম, তারপর এসে পড়লাম জলাভূমির আর হোলডারনেসের মধ্যেকার চওড়া হালকা সবুজ রঙের বৃত্তাকার নীচু জলা জায়গায়। ছেলেটা যদি বাড়ির দিকেই গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এ-পথ মাড়িয়েই যেতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কোনো রকম চিহ্ন না-রেখে তার পক্ষে যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সে তো নয়ই, এমনকী জার্মান মাস্টারও যে কস্মিনকালে এ-পথ দিয়ে গেছিল, তার কোনো নিশানা দেখলাম না। মুখ কালো করে হোমস সবুজ জলাভূমির কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগল— প্যাচপেচে জমির ওপর কোনোরকম কাদা-চটচটে চিহ্ন দেখার প্রবল আশা তার আকুল চোখে। ভেড়া যাতায়াতের চিহ্ন দেখতে পেলাম বিস্তর কয়েক মাইল ধরে এক জায়গায়, গোরুর পায়ের ছাপও পেলাম। কিন্তু ওই পর্যন্ত— নতুন কিছুই ধরা পড়ল না আমাদের ব্যগ্র সন্ধানী চোখে।

খুবই মুষড়ে পড়ল হোমস। শূন্য চোখে জলাভূমির ধু-ধু বিস্তারের পানে তাকিয়ে বললে, 'এদিকটা তো কোনোরকমের হল, এখন ওদিকে রয়েছে আর একটা নীচু জলা জায়গা, মাঝামাঝি এক ফালি জমিও দেখতে পাচ্ছি। আরে! আরে! একী দেখছি, একী দেখছি এখানে!'

কালো ফিতের মতো সরু একটা রাস্তার ওপর এসে পড়েছিলাম আমরা। ঠিক মাঝখানে ভিজে মাটির উপর দেখলাম সুস্পষ্ট সাইকেলের চাকার দাগ।

'হুররে। পেয়েছি। পেয়েছি!' এবার উল্লসিত হওয়ার পালা আমার।

কিন্তু হোমস যেন হতভম্ব হয়ে গিয়ে মাথা নাড়তে লাগল আপন মনে, চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাসের বদলে দেখলাম নতুন কিছু পাওয়ার আশা।

বলল, 'সাইকেল তো বটেই, কিন্তু "সেই" সাইকেলটা নয়। টায়ারের বিয়াল্লিশ রকমের বিভিন্ন ছাপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেখতে পাচ্ছ। এ-ছাপটা ডানলপ টায়ারের[৬], বাইরের কভারের ওপর একটা দাগও আছে। কিন্তু হেইডেগারের পামার টায়ার লাগানো আছে। ভিজে মাটির ওপর লম্বালম্বি স্ট্রাইপের ছাপ পড়ে তার সাইকেলের টায়ারে। এ-বিষয়ে গণিতের পণ্ডিত র‍্যাভেলিংয়ের অগাধ বিশ্বাস। কাজে কাজেই, এ-সাইকেল হেইডেগারের সাইকেল নয়।'

'তাহলে নিশ্চয় ছেলেটার?'

'তা হত যদি প্রমাণ করতে পারতাম যে তারও দখলে ছিল আরও একটি সাইকেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আমরা পারিনি। এই দাগটার সৃষ্টি যার সাইকেল, সে কিন্তু স্কুলের দিক থেকেই এসেছে।'

'স্কুলের দিকেও তো যেতে পারে?'

'আরে না, না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। যে-ছাপটা গভীর হয়ে ফুটে ওঠে মাটির ওপর, সেইটাই কিন্তু পেছনকার চাকার, কেননা ভারটা তো বেশির ভাগ পেছনের চাকার ওপরেই পড়ে। কয়েক জায়গায় লক্ষ করলেই দেখবে পেছনের চাকাটা অনেক বার সামনের চাকার হালকা অগভীর ছাপের ওপর দিয়ে গেছে। সুতরাং স্কুলের দিক থেকেই আসছিল সাইকেলটা। আমাদের বর্তমান তদন্তের সঙ্গে এ-ব্যাপারের সম্পর্ক থাকুক আর না-থাকুক, আমরা দাগ বরাবর গিয়ে দেখব কোথা থেকে এসেছে সাইকেলটা।'

করলাম তাই। কয়েকশো গজ যাওয়ার পরেই জলাভূমির ভিজে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই টায়ারের দাগও গেল মিলিয়ে। আবার পিছিয়ে এলাম খানিকটা। এক জায়গার দাগের ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছিল ঝরনা। এখানে পেলাম আবার সাইকেলের দাগ। কিন্তু গোরুর

খুরের অজস্র ছাপে দাগ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে বললেই চলে। এরপর আর কোনো ছাপ নেই। রাস্তাটা কিন্তু সিধে চলে গেছে স্কুলের পেছন দিককার এবড়োখেবড়ো উপবনের ভেতরে। বুঝলাম, সাইকেলের আবির্ভাব ঘটেছে এই উপবনের ভেতর থেকেই। হাতের ওপর চিবুক রেখে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে পড়ল হোমস। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললাম[৭], কিন্তু পাথরের খোদাই করা মূর্তির মতো ওর মধ্যে এতটুকু স্পন্দন দেখলাম না।

দু-দুটো সিগারেট ছাই হয়ে যাওয়ার পর হোমস বললে, 'এমনও তো হতে পারে যে, অচেনা ছাপ ফেলার উদ্দেশ্যে কোনো চতুরচূড়ামণি সাইক্লিস্ট রওনা হওয়ার আগে টায়ার দুটো পালটে নিয়েছে? এ ধরনের বুদ্ধি যে-ক্রিমিনালের মাথায় আসে, তার সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা কষেও আনন্দ আছে। আপাতত এ-প্রশ্নের সমাধান না-করে জলাভূমির দিকেই ফিরে যাই চলো। এখনও অনেক কাজ বাকি ওদিকে।'

ভিজে ভিজে জমির ওপর আবার শুরু হল আমাদের অভিযান, চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে ধুলো থেকে সোনা খোঁজার মতোই তন্নতন্ন করে অতি নগণ্য জিনিসও খুঁটিয়ে দেখতে কসুর করলাম না। অচিরেই আমাদের এত পরিশ্রম হল সার্থক, ফলাফল পেলাম হাতে হাতে।

জলাভূমির নীচের অংশে আড়াআড়ি একটা পাঁকাল রাস্তা চোখে পড়ায় সেদিকে এগুচ্ছি, এমন সময় খানিকটা তফাত থেকেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল হোমস। পথটার ঠিক মাঝখানেই একগোছা টেলিগ্রাফের সূক্ষ্ম তারের মতো একটা লম্বা ছাপ। পামার টায়ার।

মহা খুশিতে রীতিমতো চেঁচামেচি জুড়ে দিল হোমস, 'এই হল হের হেইডেগারের সাইকেল! এবার আর ভুল হবার জো নেই। কী হে ওয়াটসন আমার যুক্তি-টুক্তিগুলো খাঁটি মনে হচ্ছে না?'

'আমার অভিনন্দন রইল।'

'কিন্তু এখনও যে অনেক দূর যেতে হবে, বন্ধু। দয়া করে রাস্তা ছেড়ে হাঁটো। এবার শুরু হোক পামার টায়ার অনুসরণ পর্ব। বেশি দূর যেতে হবে বলে তো মনে হয় না।

কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, জলাভূমির একদিককার অংশে নরম মাটির টুকরো টুকরো জমির সংখ্যা বড়ো কম নয়। কাজেই মাঝে মাঝে পামার টায়ার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে, কিন্তু একেবারে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।

হোমস বললে, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ ওয়াটসন? লোকটা সাইকেলের গতিবেগ কিন্তু এবার বাড়িয়ে দিয়েছে। না, কোনো সন্দেহই নেই সে-বিষয়ে। এই ছাপটা দেখ, দুটো টায়ারের দাগই পরিষ্কার উঠেছে এখানে। লক্ষ করেছ, দুটো ছাপই সমান গভীর। তার মানে কী? হেইডেগার হ্যান্ডেলবারের ওপর দেহের ভর দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। তিরবেগে সাইকেল চালাতে গেলে সামনের দিকে এইভাবেই ঝুঁকে পড়তে হয়। সর্বনাশ একবার আছাড়ও খেয়েছে দেখছি।'

বেশ কয়েক গজ পর্যন্ত টায়ারের সুস্পষ্ট ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা জুড়ে একটা ধ্যাবড়া দাগে। এরপর কতকগুলো পায়ের ছাপ। ঠিক তার পরেই আবার দেখা দিয়েছে পামার টায়ার।

'পাঁকের ওপর চাকা পিছলে গেছে মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

দোমড়ানো-মোচড়ানো কাঁটা-ফুলের একটা শাখা তুলে ধরলে হোমস। সভয়ে দেখলাম টুকটুকে লাল রঙের ছাপ লেগেছে হলুদ কুঁড়িগুলোয়। এমনকী রাস্তার ওপরে আর ছোপের মধ্যেও দেখলাম চাপ চাপ জমাট রক্তের কালো দাগ।

'খারাপ। ভারি খারাপ!' বিড়বিড় করতে থাকে হোমস। 'সরে দাঁড়াও ওয়াটসন। এলোমেলো পায়ের ছাপ আর একটিও নয়! কী দেখছি জান? আহত হয়ে পড়ে গেলেন হেইডেগার, তবুও দাঁড়িয়ে উঠলেন রক্তাক্ত দেহে, বসলেন সাইকেলের সিটে, শুরু হল যাত্রা। কিন্তু নতুন দাগ তো আর দেখছি না। পাশের সরু পথটায় গোরু ঘোড়া মোষ ভেড়া চলার চিহ্ন তো দেখছি অনেক। ষাঁড়ের গুতো-টুঁতো খাননি তো? অসম্ভব! কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীর চিহ্নও তো দেখছি না হে। ওয়াটসন, চল এগিয়ে যাই, যা থাকে কপালে। রক্তের দাগ আর চাকার ছাপ এই আমাদের সম্বল, চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এবার আর সম্ভব নয় বাছাধনের পক্ষে।'

এবারের অনুসন্ধান পর্ব হল খুবই সংক্ষিপ্ত। ভিজে ভিজে চকচকে পাথরের ওপর দিয়ে হঠাৎ মাতালের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল পামার টায়ার। তার পরেই সামনের দিকে তাকাতে আচম্বিতে আমার চোখে পড়ল ঘন কাঁটাঝোপের মধ্যে ঝকঝকে ধাতুর মতো কী-একটা জিনিস। ভেতর থেকে টেনে বার করলাম পামার টায়ার লাগানো একটা সাইকেল। একটা প্যাডেল দুমড়ে গেছে। সামনের দিকটা আগাগোড়া ভিজে গেছে টস টস করে ঝরে পড়া রক্তে। বীভৎস! ঝোপের অন্যদিকে আকাশমুখো একটা জুতো দেখে ঘুরে দৌড়োলাম আমরা। সাক্ষাৎ মিলল হতভাগ্য সাইক্লিস্টের। বেশ লম্বা চেহারা ভদ্রলোকের, একমুখ ঘন দাড়ি, চোখের চশমার একটা

'ওই যে ওখানে পড়ে হতভাগ্য যাত্রী।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

কাচের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। মাথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর— খুলির সামনে দিকটা একেবারেই চুরমার হয়ে গেছে সেই সাংঘাতিক ঘায়ে। এ-রকম মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পরেও যে-পুরুষ এতটা পথ আবার সাইকেল চালিয়ে আসতে পারে তার প্রাণশক্তি আর সাহসের প্রশংসা করতে হয় সহস্রমুখে। ভদ্রলোকের পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু মোজা নেই, বুক খোলা কোটের নীচে দেখলাম রাত্রে পরার একটা নাইট-শার্ট। না, কোনো সন্দেহই নেই, এ-লাশ পলাতক জার্মান মাস্টার হেইডেগারেরই।

সশ্রদ্ধভাবে মোলায়েম হাতে দেহটা উলটে ফেলে অনন্যমনা হয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল হোমস। তারপর কিছুক্ষণ ডুবে রইল গভীর চিন্তায়। কুঁচকানো কপালের অজস্র রেখা দেখে বেশ বুঝলাম, এই শোচনীয় আবিষ্কারে আমাদের সত্যিকারের সমস্যার সুরাহা হয়নি কিছুই এবং আমরা যে-তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও বললে, 'কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, ওয়াটসন। আমার নিজের অভিমত হচ্ছে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই পামার টায়ার রহস্য নিয়ে এত সময় নষ্ট করে ফেলেছি যে আর একটা ঘণ্টাও বাজেভাবে কাটাতে রাজি নই আমি। পক্ষান্তরে পুলিশের কানেও এখনকার খবর পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্য আমাদেরই। হতভাগ্য মাস্টারের দেহটার গতি যাতে হয় সে-ব্যবস্থাও তো করা দরকার।'

'খবর নিয়ে আমিই ফিরে যেতে পারি।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গ আর সাহায্য আমার এখন বিশেষ দরকার। সবুর। ওদিকে ওই যে লোকটা পচা শেকড় মেশানো মাটি কাটছে— ডাকো ওকে, ওকে দিয়েই— খবর পাঠানো যাক।'

চাষি লোকটাকে ডেকে আনলাম। খুনখারাপি দেখে তো ভয়ের চোটে তার ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। হোমস একটা চিরকুট লিখে তার হাতে দিল ডা. হাক্সটেবলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

লোকটা বিদেয় হলে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, আজ সকালে তাহলে মোট দুটো সূত্র পেলাম। এক নম্বর হচ্ছে পামার টায়ার লাগানো বাইসাইকেল। তদন্ত শুরু করার আগে একবার ভেবে নেওয়া যাক আমাদের হাতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কী কী তথ্য এসেছে। যে-তথ্য নিছক দৈবাৎ, তা বাদ দেব, হাতে রাখব শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো।

'সবার আগে একটা বিষয় তোমায় বলে রাখি,ওয়াটসন। ছেলেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় পালিয়েছে স্কুল ছেড়ে। নিজেই জানলা গলে আইভিলতা বেয়ে নীচে নেমেছে সে, যাবার সময়ে হয় একলা গেছে, আর না হয় সঙ্গে কাউকে নিয়েছে। এ-বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহ আমার নেই।'

আমিও একমত হলাম হোমসের সাথে।

'বেশ, এবার তাহলে আসা যাক হতভাগ্য জার্মান মাস্টারের প্রসঙ্গে। যাওয়ার সময়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছে ছেলেটি। তার মানে, সে জানত কী করতে চলেছে সে। কিন্তু হেইডেগার মোজা না-পরেই বেরিয়ে পড়লেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে তৈরি হয়ে নিতে হয়েছে— মোজা পরার সময় বা সুযোগ হয়নি সেই কারণেই।'

'নিঃসন্দেহে।'

'কিন্তু হেইডেগার গেলেন কেন? কারণ শোবার ঘরের জানলা থেকে ছেলেটার পলায়ন-দৃশ্য উনি দেখতে পেয়েছিলেন। সাইকেলে পিছু নিয়ে ওকে ধরে ফেলে ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায় নিয়েই শুরু হয়েছে ওঁর নিশা-অভিযান। তাই তাড়াতাড়ি সাইকেল বার করে বেরিয়েছিলেন উনি। কিন্তু ওই বেরোনোই হল ওঁর কাল।'

'আমার তাই মনে হয়।'

'এবার আসছি বিতর্কের সবচেয়ে গোলমেলে অংশে। একটা ছেলের পিছু নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে যেকোনো পুরুষের পক্ষে পেছন পেছন দৌড়ানোই স্বাভাবিক। কেননা, দৌড়ে তাকে টেক্কা দেওয়া তো আর ছোটো ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জার্মান মাস্টার এই সহজ পথ না-নিয়ে শরণ নিলেন সাইকেলের। শুনেছি, ভদ্রলোক ওস্তাদ সাইক্লিস্ট ছিলেন এবং উনি কখনোই তাঁর দ্বি-চক্রযানের সাহায্য নিতেন না যদি-না উনি দেখতেন যে ছেলেটি চম্পট দেওয়ার জন্যে শরণ নিয়েছে কোনো বেগবান বাহনের।'

'আর একটা বাইসাইকেলের সম্ভাবনা এসে গেল কিন্তু।'

'দেখাই যাক না যুক্তির পথে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্কুল থেকে পাঁচ মাইল দূরে খুন হলেন হেইডেগার। মনে রেখো, মৃত্যু কিন্তু বুলেটের চুম্বনে নয়। শক্তিশালী হাতের অত্যন্ত বর্বরোচিত আঘাতে। বুলেট ছুড়ে মানুষ খুন করা যেকোনো ছেলেমানুষের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু মাথার খুলি গুঁড়ো করার মতো পাশবিক আঘাত হানার ক্ষমতা তার হাতে নেই। কাজেই, ছেলেটির নৈশ-পলায়নের সঙ্গী ছিল একজন। এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই পাঁচ মাইল পেরিয়ে এসেছে তারা— কেননা, এই সুদীর্ঘ পথেও হেইডেগারের মতো পাকা সাইক্লিস্ট তাদের পেরিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করে, আশেপাশের জায়গা-জমি তন্নতন্ন তরে দেখেও আমরা পাচ্ছি কী? গোরু, মোষ, ভেড়ার আনাগোনার চিহ্ন— ব্যস, আর কিছুই নয়। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘুরে এসেও পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোনো পথঘাটের সন্ধান পেলাম না। খুনের সঙ্গে আর একজন সাইক্লিস্টের কোনো সম্পর্কই নেই। এমনকী, কোনো মানুষের পায়ের ছাপও নজরে এল না।'

'হোমস, কী বলছ তুমি, এ যে অসম্ভব!'

'শাবাশ! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য! অসম্ভব বটে, হয় আমার বলার ভঙ্গিমাই ভুল, আর না হয় ভুল লুকিয়ে আছে যা বলেছি তার মধ্যে। কিন্তু নিজের চোখেই তো তুমি সব দেখলে, যুক্তিতর্কের কোনো কারচুপি নিয়ে তোমার খটকা লাগছে?'

'আছাড় খাওয়ার সময় মাথার খুলি ভেঙে যায়নি তো?'

'এইরকম একটা জলা জায়গায়, ওয়াটসন?'

'ভাই, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'আরে ছ্যাঃ, কী বলছ। অনেকগুলো ঘোরালো সমস্যার সমাধান করলাম আমরা। মালমশলা পেয়েছি বিস্তর— এখন শুধু তাদের কাজে লাগানোই বাকি। পামার-পর্ব তো শেষ হল, এবার এসো ডানলপের পিছু নিয়ে দেখা যাক কোথায় পৌঁছোই আমরা।'

শুরু হল ডানলপের চিহ্নিত পথে শিকারী কুকুরের মতো আমাদের অভিযান। কিছু দূরে যাওয়ার পরেই জলাভূমি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে উঠে গেল ওপর দিকে, জলের ধারা পেছনে

ফেলে এসে পড়লাম গুল্মসমাকীর্ণ বৃত্তাকার সুদীর্ঘ একটা অংশের ওপর। এ-রকম জায়গায় কোনো চিহ্নই পাওয়া আর সম্ভব নয়। শেষবারের মতো যেখানে ডানলপের চিহ্ন দেখলাম, সেখান থেকে হোলডারনেস হলের দিকে যাওয়া যায়। কয়েক মাইল দূরে বাঁ-দিকে 'হল'-এর আকাশছোঁয়া জমকালো চূড়াগুলো চোখে পড়ছিল। আবার সামনের দিকে চেস্টারফিল্ডের হাইরোডের পাশে ধূসর গ্রামটার দিকে যাওয়াও সম্ভব।

শ্রীহীন, অপরিচ্ছন্ন সরাইখানার দিকে এগুচ্ছি দুজনে, দূর থেকেই দরজার ওপর লড়ায়ে-মোরগের প্রতীকটা দেখা যাচ্ছিল, এমন সময়ে আচমকা গুঙিয়ে উঠে আমার কাঁধ চেপে ধরে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলে হোমস। বেকায়দায় গোড়ালি মচকে গেলে যেমন অসহায় হয়ে পড়ে মানুষ, তারও অবস্থা হল তাই। অতি কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার সামনে পৌঁছোল ও। ময়লা রঙের স্থূল চেহারার একজন প্রৌঢ় কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।

'কেমন আছেন, মি. রিউবেন হেইজ?' জিজ্ঞেস করে হোমস।

'কে আপনি? আমার নামটাই-বা জানলেন কোত্থেকে?' একজোড়া ধূর্ত চোখে সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

'আপনার মাথার ওপর বোর্ডেই তো লেখা রয়েছে নামটা! আর, বাড়ির মালিককে দেখলে তো চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। আপনার আস্তাবলে ঘোড়ার গাড়ি বা এ-জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

'না নেই।'

'যন্ত্রণায় মাটির ওপর পা-টাও রাখতে পারছি না আমি।'

'তাহলে রাখবেন না।'

'হাঁটতেও পারছি না।'

'তাহলে লাফান।'

মি. রিউবেন হেইজের হাবভাব আর যাই হোক বরদাস্ত করার মতো নয়। কিন্তু বলিহারি যাই হোমসের, যেন নিছক রঙ্গ-পরিহাস করছে অভদ্র লোকটা, এমনিভাবে দিব্যি কথাবার্তা চালিয়ে গেল ও।

বলল, 'আরে মশাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন কীরকম বেকায়দায় পড়েছি আমি। যানবাহন না হয় একটা পেলেই হল, ও নিয়ে আমি অত ভাবি না।'

'আমিও না', গম্ভীর মুখে বলে সরাইখানার মালিক।

'এত হালকাভাবে নেবেন না, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণে এখুনি আমার একটা সাইকেল দরকার এবং ভাড়া হিসাবে একটা গিনি দিতে রাজি আছে আমি।'

কান খাড়া করে মি. রিউবেন হেইজ, 'কোথায় যেতে চান?'

'হোলডারনেস হলে।'

'ডিউকের চ্যালাচামুণ্ডা মনে হচ্ছে?' আমাদের কাদামাখা পোশাকের ওপর সবিদ্রূপ চাহনি বুলিয়ে নেয় লোকটা।

হো হো করে হেসে ওঠে হোমস। বলে, 'ডিউকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলে তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।'

'কেন শুনি?'

'তাঁর হারানো ছেলের খবর এনেছি বলে।'

দস্তুরমতো চমকে ওঠে মি. রিউবেন হেইজ।

'ছেলেটার পিছু পিছু এখানে এসে পৌঁছেছেন নাকি?'

'খবর এসেছে, লিভারপুলে রয়েছে সে। যেকোনো মুহূর্তে পুলিশ তাকে পাকড়াও করার আশা রাখছে।'

চকিতে মুখচোখের ভাব পালটে যায় লোকটার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফভরা ভারী মুখে আচম্বিতে ফুটে ওঠে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

বলে, 'ডিউককে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছে মোটেই নেই আমার এবং তার কারণ আছে। এক সময়ে তাঁর প্রধান কোচোয়ান ছিলাম আমি। কিন্তু বড়ো জঘন্য ব্যবহার করেছিলেন আমার সাথে। একটা মিথ্যেবাদী ভুট্টাওলার কথা বিশ্বাস করে আমায় বরখাস্ত করেছিলেন উনি। কিন্তু লিভারপুলে লর্ড স্যালটায়ারের খোঁজ পাওয়া গেছে শুনে খুশি হলাম। আমি দেখছি যাতে আপনি এ-খবর 'হল'-এ নিয়ে যেতে পারেন।'

হোমস বললে, 'ধন্যবাদ। প্রথমেই পেটে কিছু দানাপানি পড়া দরকার। সাইকেলটা তার পরে আনবেন।'

'আমার কোনো সাইকেল নেই।'

একটা গিনি বার করে হোমস।

'আরে মশাই, বললাম তো আমার সাইকেল নেই। ''হল'' পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে দুটো ঘোড়া আমি দিচ্ছি আপনাদের।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে কিছু খেয়ে নিই, তারপর হবে'খন এসব কথা।'

এবড়োখেবড়ো পাথরে বাঁধানো রান্নাঘরে বসিয়ে মি. রিউবেন হেইজ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পলক ফেলার আগেই বেমালুম সেরে গেল হোমসের গোড়ালির মচকানি।

দিনের আলো নিভে আসতে বিশেষ দেরি নেই। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি দুজনে, সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটবার সময় বা সুবিধে হয়নি। তাই, প্রথমেই কিছুটা সময় ব্যয় করলাম খাওয়ার জন্যে। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে হোমস বার কয়েক জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে তাকালে বাইরে। নোংরা উঠানটার খানিকটা নজরে পড়ছিল খোলা জানলা দিয়ে। দূরে এককোণে কামারশালার কাজ করছিল কালিঝুলিমাখা একটা ছোকরা। আর একদিকে রয়েছে আস্তাবল। দ্বিতীয়বার জানলা থেকে ঘুরে এসে আবার বসে পড়েছিল হোমস, তারপরেই আচমকা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল ও।

'ওয়াটসন, ওয়াটসন, পেয়েছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা ভেবেছি, তাই। ওয়াটসন আজকে গোরুর খুরের ছাপ দেখেছ বলে মনে পড়ে তোমার?'

'এন্তার দেখেছি।'

'কোথায়?'

'কোথায় নয়? জলা জায়গায় দেখেছি, দেখেছি রাস্তার উপর, বেচারা হেইডেগার যেখানে শেষ ঘুমে শুয়েছেন সেখানেও দেখেছি বলে মনে পড়ছে।'

'এগজ্যাক্টলি। আচ্ছা, ওয়াটসন, জলাভূমিতে আজ ক-টা গোরু দেখেছ বলো তো?'

'আদৌ দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আশ্চর্য, ওয়াটসন, সত্যি আশ্চর্য! যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে গেছি, দেখেছি এন্তার গোরুর পদাঙ্ক, কিন্তু সারাজলাভূমিতেও দেখিনি একটাও গোরু। আশ্চর্য! অদ্ভুত! কি বল, ওয়াটসন?'

'আশ্চর্যই বটে।'

'এবার একটু মাথা খাটাও দিকি ব্রাদার। মনটাকে পাঠিয়ে দাও জলাভূমিতে! রাস্তার ওপর দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ তো?'

'তা পাচ্ছি।'

'তোমার মনে পড়ে কি খুরের ছাপগুলো একবার ছিল এক রকম', বলে অনেকগুলো টুকরো রুটি এইভাবে সাজালে সে— ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ— 'আর একবার ছিল এইরকম— ঃ ° ঃ ° ঃ ° ঃ °— এবং মাঝে মাঝে ছিল এইরকম— ₒ ° ₒ °ₒ ° কি, মনে পড়ছে তোমার?'

'না, ভাই।'

'কিন্তু আমার মনে আছে। দিব্যি গেলে বলতে পারি ভুল হয়নি আমার। যাই হোক, অবসরমতো ফিরে গিয়ে যাচাই করে দেখলেই হবে'খন। আমি একটা অন্ধ গর্দভ, ওয়াটসন। তখনই আমার সমাধানে পৌঁছোনো উচিত ছিল।'

'সমাধানটা কী, তাই শুনি?'

'সমাধান শুধু একটাই— এবং তা হচ্ছে একটা পরমাশ্চর্য গোরুর পদাঙ্কদর্শন! এ-গোরু দিব্যি হাঁটে, কদম চালে চলে, আবার দরকার হলে, লম্বা লম্বা লাফ মেরে ছুটতেও কসুর করে না। ওয়াটসন, আমি শপথ করে বলতে রাজি আছি, এ-জাতীয় ধোঁকাবাজি যার মগজে আছে, তাকে আর যাই হোক, গাঁইয়া বলা চলে না। কামারশালার ওই ছোকরাটা ছাড়া পথ পরিষ্কার হবে বলে মনে হচ্ছে না। চলো হে, টুক করে বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসি কী ব্যাপার।'

আস্তাবলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল দুটি ঘোড়া। কর্কট চুল উশকোখুশকো— যেন দলাইমলাই হয়নি কতদিন। একটা ঘোড়ার পেছনের পা তুলে ধরে সজোরে হেসে উঠল হোমস।

'পুরোনো খুর, কিন্তু লাগানো হয়েছে নতুন— পুরোনো নাল, কিন্তু পেরেকগুলো নতুন। ক্লাসিক কেসের পর্যায়ে ফেলা যায় এ-কেসটাকে। চলো, কামারশালায় একবার ঢুঁ মেরে আসি।'

আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে একমনে কাজ করে চলল ছোকরাটা। মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ছিল লোহা আর কাঠের বিস্তর টুকরো। দেখলাম ডাইনে-বাঁয়ে সামনে ঘুরছে হোমসের সন্ধানী দৃষ্টি এইসব আবর্জনার মধ্যে। আচম্বিতে পেছনে পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ফিরে তাকিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেলাম স্বয়ং রিউবেন হেইজের সাথে; ঝোপের মতো পুরু কালো কুচকুচে ভুরুজোড়া নেমে এসেছিল শ্বাপদের মতো জ্বলন্ত চোখ দুটোর ওপর, সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠেছিল অবরুদ্ধ ক্রোধে।

ধাতুর টুপি লাগানো একটা খাটো লাঠি হাতে সাক্ষাৎ কালান্তকের মতো এমন ভঙ্গিমায় সে এগিয়ে এল আমাদের পানে যে তৎক্ষণাৎ পকেটের মধ্যে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে স্বস্তিবোধ করলাম আমি।

'শয়তান স্পাই কোথাকার! কী করছেন এখানে?' বাজের মতো চিৎকার করে ওঠে লোকটা।

নিরীহ স্বরে হোমস বললে, 'আরে মশাই, আপনার রকম-সকম দেখে তো লোকে ভাববে না-জানি কী গোপন কথাই ফাঁস হয়ে গেল আপনার।'

প্রবল প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করে নিলে মি. রিউবেন হেইজ। ভ্রূকুটির চাইতেও ভয়ংকর হয়ে উঠল তার মুখের দেঁতো হাসি।

'কামারশালায় কিছু দেখার ইচ্ছে থাকলে দেখতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই আমার। কিন্তু মিস্টার আমার চোখের আড়ালে আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করাটা একবারেই পছন্দ করি না আমি। চটপট পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সরে পড়ুন এখান থেকে, তাহলেই খুশি হই আমি।'

হোমস বললে, 'ঠিক আছে, মি. হেইজ আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই। আপনার ঘোড়াগুলো একটু দেখছিলাম। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে হেঁটেই যেতে পারব আমরা— খুব দূর নয়, কী বলেন?'

'হলের ফটক এখান থেকে দু-মাইলের বেশি নয়। বাঁ-দিকের ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে যান।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে না-আসা পর্যন্ত কুতকুতে চোখে আমাদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বর্বর লোকটা।

রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর মোড় ঘুরে মি. রিউবেন হেইজের চোখের আড়ালে আসতেই দাঁড়িয়ে গেল হোমস।

বলল, 'বেশ গরম ছিলাম সরাইখানার ভেতর। যতই দূরে যাচ্ছি, ততই যেন ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে বসছে আমার ওপর। না, না, ও-জায়গা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।' আমি বললাম, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস রিউবেন হেইজ এ-রহস্যের সব খবর রাখে। এ-রকম ধরনের মূর্তিমান যমের মতো বদমাশ খুব অল্পই দেখেছি আমি— ওর চেহারাই ওর মনের ছবি।'

'আহা! লোকটার মধ্যে শুধু ওইটুকুই দেখলে তুমি? ঘোড়াগুলো রয়েছে কামারশালাটা রয়েছে— এসব কিছুই নয়? না, হে, না, লড়ায়ে মোরগওলা এমন খাসা সরাইখানা ছেড়ে যেতে মন সরছে না আমার— ভারি ইন্টারেস্টিং জায়গা কিন্তু। চলো, গায়ে পড়ে আর একবার দেখে আসি ভেতরটা।'

ঢালু হয়ে পাহাড়টা উঠে গেছিল ওপরদিকে, বড়ো বড়ো চুনাপাথরের ধূসর রঙের চাঁই পড়ে ছিল বিস্তর। রাস্তা ছেড়ে এই পাহাড় বেয়ে সবে উঠতে শুরু করেছি ওপরে, এমন সময় 'হোলডারনেস হল'-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের পানে বেগে ছুটে আসছে একটা সাইকেল।

'বসে পড়ো, ওয়াটসন, বসে পড়ো!' সজোরে আমার কাঁধে চাপ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হোমস। পাথরের আড়ালে লুকোতে-না-লুকোতেই ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে সাঁ করে আমাদের পেরিয়ে গেল লোকটা। কুণ্ডলীপাকানো রাশিরাশি ধুলোর মেঘের মতো এগিয়ে এসে সাঁ করে লহমার জন্যে চোখে পড়ল উদ্‌বেগ থর থর ফ্যাকাশে একটা মুখ– মুখের পরতে পরতে প্রকট হয়ে উঠেছে অপরিসীম আতঙ্ক; হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখ দুটো যেন উন্মাদ আবেগ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। গতরাতে চটপটে চালাকচতুর যে জেমস ওয়াইল্ডারকে আমরা দেখেছি, এ যেন তাঁর এক কিম্ভূতকিমাকার প্রতিচ্ছবি, বিকট রূপ দেখিয়ে সঙের মতো লোক হাসানোর প্রচেষ্টা।

'ডিউকের সেক্রেটারি?' চেঁচিয়ে ওঠে হোমস। 'নেমে এসো ওয়াটসন, দেখা যাক ভদ্রলোক যান কোথায়।'

পাথরের চাঁই ধরে ধরে খানিকটা নেমে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সরাইখানার সামনের দরজাটা। দেওয়ালে হেলান রাখা ওয়াইল্ডারের বাইসাইকেলটা চোখে পড়ল। বাড়ির মধ্যে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখলাম না, জানলাতেও দেখতে পেলাম না কারো মুখ। 'হোল্ডারনেস হল'-এর সুউচ্চ চুড়োগুলোর ওপাশে সূর্য হেলে পড়তেই নেমে এল গোধূলির ম্লান বিষাদাভা। তারপর, আলো আঁধারির মাঝে আস্তাবলের সামনে উঠোনে একটা ঘোড়ার গাড়ির দু-পাশের আলো দুটো জ্বলে উঠতে দেখলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শুনলাম অশ্বখুরধ্বনি। খটাখট শব্দে রাস্তার ওপর বেরিয়ে এল গাড়িটা এবং প্রচণ্ড বেগে যেন উড়ে গেল চেস্টারফিল্ডের দিকে।

'কী মনে হয়, ওয়াটসন,' ফিসফিস করে ওঠে হোমস।

'সরে পড়ল মনে হচ্ছে?'

'দু-চাকার গাড়িতে শুধু একজনকেই বসে থাকতে দেখেছি আমি এবং তিনি জেমস ওয়াইল্ডার নন এই কারণেই যে, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক।'

একটা লাল চৌকো আলো ভেসে উঠেছিল অন্ধকারের সমুদ্রে। ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো লালের পটভূমিকায় দেখলাম সেক্রেটারির কালো মূর্তি— সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে অন্ধকারের বুকে উঁকি মেরে কী যেন খুঁজছেন। হাবভাব দেখে মনে হল, কারো প্রতীক্ষায় রয়েছেন মি. ওয়াইল্ডার। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাস্তার ওপর শোনা গেল কার পদশব্দ। আলোর পটভূমিকায় মুহূর্তের জন্যে আবির্ভূত হল দ্বিতীয় একটি মূর্তি, বন্ধ হয়ে গেল দরজা এবং সঙ্গেসঙ্গে নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় হারিয়ে গেল সব কিছু। পাঁচ মিনিট পরে দোতলার ঘরে একটা বাতি জ্বলে উঠল।

হোমস বললে, 'লড়ায়ে মোরগের আস্তানায় দেখছি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে রাতের অন্ধকারে?'

'মদ খাওয়ার জায়গাটা কিন্তু বাড়ির অন্যদিকে।'

'ঠিক বলেছ। এখন যাঁদের দেখছি, তাঁদের তাহলে প্রাইভেট অতিথি বলা উচিত। কিন্তু ভায়া, এত রাত্রে এ-রকম একটা নোংরা সরাইখানায় মি. জেমস ওয়াইল্ডারের কী হেতু আগমন এবং চুপিসারে তাঁর সাথে ওই যে লোকটা দেখা করতে এল, সে-ই বা কে তা না-জানা পর্যন্ত তো আমি শান্তি পাব না। চল, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। সাহস করে কাছে গিয়ে দেখে আসতে হবে কী ব্যাপার।'

কসরত করে দুজনে রাস্তার ওপর নেমে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম সরাইখানার দিকে। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ছিল বাইসাইকেলটা। ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পেছনের চাকার কাছে ধরল হোমস। আলো এসে পড়ল ডানলপ টায়ারের ওপর। নিঃশব্দে হেসে ওঠে ও।

মাথার ওপরেই আলোকিত জানলাটা দেখিয়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন ঘরের ভেতরে উঁকি না-দিয়ে আমি নড়ছি না এখান থেকে। দেওয়াল ধরে পিঠ পেতে দাঁড়াও তুমি, তারপর যা করবার আমি করছি!'

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে আমার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল হোমস এবং দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল নীচে।

'বন্ধু এবার যাওয়া যাক। সারাদিন বড়ো খাটাখাটুনি গেছে বটে, কিন্তু সবরকমের পয়েন্ট জোগাড় করতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস। স্কুল এখান থেকে অনেকটা দূরে— কাজেই চল, আর অযথা দেরি না-করে রওনা হওয়া যাক।'

সুদীর্ঘ পথে আর বিশেষ কোনো কথা বলল না হোমস। কাদা-প্যাচপেচে জলাভূমি পেরিয়ে এলাম, শ্রান্ত অবসন্ন দেহ, কিন্তু সারাপথে প্রায় বোবা হয়ে রইল ও। স্কুলে পৌঁছে ভেতরে না-ঢুকে গেল ম্যাকলিটন স্টেশনে। সেখান থেকে কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এল স্কুলে। আরও রাত গভীর হলে শুনলাম বেচারি ড. হাক্সটেবলকে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছে সে। মাস্টারের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকে ভদ্রলোক শয্যা নিয়েছিলেন। এবং এরপরেও যখন সে আমার ঘরে ঢুকল তখন তাকে দেখে অবাক না-হয়ে পারলাম না। ভোরবেলা চোখ মেলে শয্যার পাশে সতর্ক-চক্ষু প্রাণরসে ভরপুর যে-মানুষটিকে দেখেছিলাম, সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও দেখলাম অবিকল সেই মানুষটিকে। এতটুকু বিরক্ত হয়নি, অফুরন্ত প্রাণরসে টলমল তার মুখচ্ছবি। ঘরে ঢুকেই খুশি খুশি গলায় ও বললে, বন্ধু হে, হাওয়া অনুকূলে। কাল সন্ধে হওয়ার আগেই এ-রহস্যের সমাধান সম্পূর্ণ করে ফেলব— কথা দিচ্ছি তোমায়।'

পরের দিন সকাল বেলা এগারোটা নাগাদ শার্লক হোমস আর আমি 'হোলডারনেস হল'-এর সুবিখ্যাত 'ইউ' বীথিকার মাঝ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলাম রানি এলিজাবেথ আমলের জমকালো তোরণের সামনে। সেখান থেকে পৌঁছোলাম হিজ গ্রেসের স্টাডিতে। মি. জেমস ঘরে ছিলেন। আমাদের দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে থেকে দেখে ভদ্রলোককে একটু গম্ভীর মনে হলেও গতরাতের বুনো আতঙ্কের ফিকে রেশ যেন তখনও লেগে ছিল তাঁর চোরা নজর আর থেকে থেকে কেঁপে ওঠা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

'হিজ গ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? দুঃখিত, ডিউক এখন অত্যন্ত অসুস্থ। খারাপ খবরটা শোনার পর থেকেই উনি খুবই উতলা হয়ে পড়েছেন। গতকাল বিকেলে ড. হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে আপনার আবিষ্কারের কাহিনি জেনেছি আমরা।'

'মি. ওয়াইল্ডার, ডিউকের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।'

'উনি এখন ওঁর ঘরে...'

'তাহলে তাঁর ঘরেই যাব আমরা।'

'খুব সম্ভব শুয়ে আছেন এখন।'

'সেই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।'

হোমসের নিরুত্তাপ কিন্তু অটল ভাবভঙ্গি দেখে সেক্রেটারি বুঝলেন যে তার সঙ্গে তর্ক করে লাভই হবে না।

'ভালো কথা। আপনারা এসেছেন, এ-খবর আমি নিজেই দিচ্ছি ওঁকে।'

আধঘণ্টা পর ঘরে ঢুকলেন, অভিজাত মহলের মুকুট-মণি ডিউক স্বয়ং। আগের চাইতেও বিরং, বিবর্ণ, হতশ্রী মনে হচ্ছিল তাঁকে, যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে এই অল্প

সময়ের মধ্যে। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে— আগের দিন যাঁকে দেখেছিলাম, তিনি যেন ইনি নন। এক লাফে যেন বেশ কয়েকটা বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। রাজকীয় সৌজন্য আর শিষ্টাচার শেষ হলে পর লাল দাড়ি টেবিলের উপর লুটিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন উনি।

'তারপর? কী খবর, মি. হোমস?' গুরুগম্ভীর গলায় শুধোলেন ডিউক।

কিন্তু শার্লক হোমস দেখি একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে সেক্রেটারির পানে, ডিউকের চেয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক।

ওইভাবে তাকিয়েই বলল ও, 'ইয়োর গ্রেস, আমার মনে হয় মি. ওয়াইল্ডার না-থাকলেই বরং আমি খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব।'

যেন আর এক পোঁচ ছাই রং চড়ল মি. ওয়াইল্ডারের মুখের ওপর। বিষাক্ত চোখে হোমসের পানে তাকালেন উনি।

'ইয়োর গ্রেস যদি ইচ্ছে করেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখন এস। এবার বলুন, মি. হোমস, কী বলার আছে আপনার?'

সেক্রেটারি বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল বন্ধুবর।

তারপর বলল, 'ইয়োর গ্রেস, ড. হাক্সটেবল আমাকে এবং আমার সহকর্মী ড. ওয়াটসনকে একটা খবর দিয়েছিলেন। আপনি নাকি একটা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন এ-ব্যাপারে। খবরটা আপনার মুখ দিয়েই আমি যাচাই করে নিতে চাই।'

'তা করেছিলাম বই কী, মি. হোমস।'

'শুনেছি, আপনার ছেলে কোথায় আছে, এ-খবর যে দিতে পারবে, তাকে আপনি দেবেন পাঁচ হাজার পাউন্ড?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'আর এক হাজার দেবেন যে বলতে পারবে আপনার ছেলেকে কে বা কারা লুকিয়ে রেখেছে, তাকে?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তাকে যারা গুম করেছে তাদের নাম ছাড়াও তার এই অবস্থার জন্যে ষড়যন্ত্রে যাঁরা লিপ্ত, তাঁদেরকেও নিশ্চয় ধরেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' অধীরভাবে চিৎকার করে ওঠেন। মি. শার্লক হোমস, আপনার কাজ যদি সন্তোষজনক হয়, তাহলে কৃপণতা করেছি, এ ধরনের অভিযোগ করার কোনো কারণ আপনার থাকবে না।'

এমন লোভাতুরভাবে দু-হাত ঘষতে লাগল হোমস যে দেখেশুনে তাজ্জব বনে গেলাম আমি। ওর পরিমিতি রুচির খবর আর কেউ না-জানলেও আমি তো জানি।

চকচকে চোখে হোমস বললে, 'ইয়োর গ্রেসের চেকবইটা টেবিলের ওপরে রয়েছে মনে হচ্ছে। ছ-হাজার পাউন্ডের চেক আমার নামে লিখে দিলে খুবই খুশি হব আমি। ক্রস করে দেওয়াই ভালো। দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাঙ্কের[৮] অক্সফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ আমার এজেন্ট।'

ঋজু দেহে অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গিমায় বসে পাথরের মতো চোখে বন্ধুবরের পানে তাকালেন হিজ গ্রেস।

'তামাশা করছেন নাকি, মি. হোমস? রসিকতা করার মতো বিষয় এটা নয়।'

'নিশ্চয় নয়, ইয়োর গ্রেস। জীবনে এতখানি উৎসুক আর আমি হইনি।'

'আমি বলতে চাই যে, পুরস্কারটা আমারই প্রাপ্য। আপনার ছেলে কোথায় আছে, তা আমি জানি। যাঁরা তাকে আটকে রেখেছেন, তাঁদের অন্তত কয়েকজনকেও আমি চিনি।'

কাগজের মতো অস্বাভাবিক সাদা মুখের পটভূমিকার ডিউকের উগ্র লাল দাড়ি যেন আরও টকটকে হয়ে ওঠে।

'কোথায় সে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেন উনি।

'আপনার পার্ক-গেট থেকে মাইল দুয়েক দূরে লড়ায়ে-মোরগের প্রতীক লাগানো সরাইখানার কাছে, সে অন্তত গতকাল রাত পর্যন্ত ছিল সেখানে।'

চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন ডিউক।

'অপরাধী সাব্যস্ত করছেন কাকে?'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম শার্লক হোমসের উত্তর শুনে। চট করে এগিয়ে এসে ডিউকের কাঁধ স্পর্শ করে ও বললে, 'আপনাকে। ইয়োর গ্রেস, চেকটার জন্যে এবার একটু কষ্ট দেব আপনাকে।'

ডিউকের সে-মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না। হোমসের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এমনভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন যেন পাতালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন উনি কুটো আশ্রয় করার মতোও অবলম্বন না-পেয়ে। পরক্ষণেই অসাধারণ সংযমবলে নিজেকে সামলে নিলেন। এ-রকম আতীব্র আবেগকে চকিতে দমন করে ফেলে সহজ হয়ে ওঠার মতো আশ্চর্য ক্ষমতা বোধ হয় শুধু তাঁর মতো অভিজাত পুরুষেরই থাকে। চেয়ারের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ লুকোলেন উনি। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতার মধ্যে দিয়ে।

তারপর, হাত থেকে মুখ না-তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কতখানি জানেন আপনি?'

'গত রাতে আপনাদের সবাইকে আমি দেখেছি।'

'আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে এ-কথা?'

'না, কাউকে আমি বলিনি।'

কাঁপা আঙুলে কলম তুলে নিয়ে চেকবই খুললেন ডিউক।

'আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না মি. হোমস। আপনার আনা সংবাদ আমার কাছে যতই অপ্রীতিকর আর অবাঞ্ছিত হোক না কেন, চেক আমি লিখে দিচ্ছি। পুরস্কার ঘোষণা করার সময়ে আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে আমায়। আপনি আর আপনার বন্ধু, দুজনেই তো স্বাধীন, কারো অধীন নন, তাই না মি. হোমস?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না, ইয়োর গ্রেস।'

'আরও সরল করেই তাহলে বলি, এ-ঘটনা যদি কেবলমাত্র আপনারা দুজনেই জেনে থাকেন, তাহলে তা শুধু আপনাদের মধ্যেই সীমিত থাকুক। আপনারা যখন কারো অধীন নন, তখন তা তৃতীয় ব্যক্তির কানে যাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। তাহলে, বারো হাজার পাউন্ড[৯] আপনাকে আমায় দিতে হবে, কী বলেন মি. হোমস?'

কিন্তু হোমস শুধু হাসল। মাথা নেড়ে বললে, 'ইয়োর গ্রেস, এত সহজে এ কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না আমার। স্কুলমাস্টারের মৃত্যুর কারণ আমাদের দর্শাতেই হবে।'

'কিন্তু জেমস সে-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে না। এজন্যে তো আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। এ-কাজ ওই জানোয়ার বদমাশটার। অবশ্য জেমসই তাকে কাজে লাগিয়েছিল ছেলেটাকে রাতারাতি পাচার করার জন্যে।'

'ইয়োর গ্রেস, একবার যদি কোনো অপরাধের পথে কেউ আগুয়ান হয়, তাহলে পথ চলতে গিয়ে আরও পাঁচটা অপরাধের উদ্ভব হলে ন্যায়ত তাকেই সব কিছুর জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাই নয় কি?'

'ন্যায়ত, মি. হোমস। ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু আইনত নিশ্চয় নয়। খুনের দৃশ্যে হাজির না-থাকলে আপনি কোনো মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। বিশেষ করে, আপনার আমার মতোই খুনকে যে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, খুনের কথা শুনলেও যে শিউরে ওঠে, তাকে তো নয়ই। এ-খবর তার কানে আসামাত্র আতঙ্কে, অনুতাপে ভেঙে পড়ে সেই মুহূর্তে অকপটে সমস্ত আমার কাছে স্বীকার করেছে সে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুনেটার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরকালের মতো চুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। মি. হোমস ওকে বাঁচান— ওকে আপনি বাঁচান! আমার একান্ত অনুরোধ, ওকে আপনি এ-বিপদ থেকে বাঁচান।'

ভেঙে পড়ে তাঁর সংযমের বাঁধ। মুখের পরতে পরতে আকুল আকুঞ্চনের মধ্যে দিয়ে আতীব্র আকিঞ্চন ফুটিয়ে তুলে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত শূন্যে ছুড়ে অস্থিরভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকেন উনি। কিছুক্ষণ পরে আবার সংযমের নিগড়ে বেঁধে ফেললেন নিজেকে। টেবিলের সামনে বসে পড়ে বললেন, 'আর কারো কাছে না-গিয়ে আমার কাছে আসার জন্যে আপনার বিবেচনা আর বুদ্ধির তারিফ করছি আমি। এ জঘন্য কেলেঙ্কারি যাতে আর পাঁচ কান না হয়, সে-সম্বন্ধে আসুন সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যাক।'

'ইয়োর গ্রেস, আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পরের কাছে অসংকোচে এবং অকপটে যদি সরল না হতে পারি, তাহলে আপনি যা বললেন, তা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না আমার। আমার ক্ষমতা যতদূর কুলোয়, ইয়োর গ্রেসকে সাহায্য করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো কিছুই গোপন না-থাকা উচিত এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি শুনে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেও আমার ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। আপনার কথা শুনে এটুকু বুঝলাম যে আপনার সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডার খুনি নন।'

'না, খুনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে।'

গম্ভীরভাবে একটু হাসল শার্লক হোমস।

'ইয়োর গ্রেস আমার সামান্য নাম-যশের বিশেষ কিছু শুনেছেন বলে মনে হয় না। শুনলে পরে এমন কথা বলতেন না। আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এত সহজ নয়। গতকাল রাত এগারোটায় আমার নির্দেশমতো চেস্টারফিল্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে মি. রিউবেন হেইজ। আজ সকালে স্কুল থেকে রওনা হওয়ার আগেই এ-সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি ওখানকার পুলিশের বড়োকর্তার কাছ থেকে।'

চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে বন্ধুবরের পানে তাকালেন ডিউক।

'আশ্চর্য! আপনি তো দেখছি অমানবিক ক্ষমতার অধিকারী। রিউবেন হেইজ তাহলে এখন হাজতে? শুনে সত্যিই সুখী হলাম আমি। অবশ্য জানি না এর ফলাফল জেমসকে স্পর্শ করবে কি না।'

'আপনার সেক্রেটারি?'

'না মশায়, না। আমার ছেলে।'

এবার অবাক হওয়ার পালা হোমসের।

'ইয়োর গ্রেস, আমি স্বীকার করছি এ-খবর আমার কাছে একেবারেই নতুন। আর একটু খুলে বলবেন কি?'

'কিছুই লুকোব না আপনার কাছে। এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। জেমসের বোকামো আর ঈর্ষার পরিণামস্বরূপ যে-সংকটে আমরা পড়েছি, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় অকপটে সব কথা খুলে বলা। যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, তবু আমি কিছু গোপন করব না। মি. হোমস, যৌবনে আমি একজনকে ভালোবেসেছিলাম। যে-ভালোবাসা জীবনে কেবল একবারই আসে মনের কোণে চির-বসন্তের ফুল ফোটাতে এ সেই ভালোবাসা। ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু তিনি রাজি হননি পাছে এ-বিয়ের ফলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বেঁচে থাকলে জীবনে আমি আর কাউকে বিয়ে করতাম না। মারা গেলেন তিনি, আমার হাতে সঁপে গেলেন শিশু জেমসকে। ওকে আমি মানুষ করেছি শুধু ওর মায়ের কথা ভেবে। দুনিয়ার সামনে ওর পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারিনি বটে, কিন্তু ওকে আমি উচ্চশিক্ষা দিয়েছি, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সবসময়ে রেখেছি একান্ত কাছটিতে। কী কৌশলে জানি না, আমার গুপ্ত কথা জেনে ফেলে ও। তারপর থেকেই তার অনেক আবদার আমি মেনে নিয়েছি। আমার ওপর ওর প্রকৃত অধিকার কী, তা তার অজানা নয়। এ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যে তার আছে, এবং তাহলে সমাজে যে আমার মাথা তোলার উপায় থাকবে না, তাও সে জানে ভালো করেই। বিবাহিত জীবনে আমি সুখী হইনি— সেজন্য জেমসই কতকাংশে দায়ী। সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানেন, প্রথম থেকেই আমার একমাত্র আইন-অনুজ্ঞাত উত্তরাধিকারীকে ও সমানে ঘৃণা করে এসেছে। অনুক্ষণ এই ঘৃণায় এতটুকু বিরাম দেখিনি আমি। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত কাণ্ডর পরও কেন জেমসকে আমারই কাছে কাছে আমি রেখেছি। উত্তরে আমি বলব, এ দীর্ঘ যন্ত্রণা সহ্য করছি শুধু ওর মায়ের জন্যে। ওর মুখের মধ্যে আমি ওর মায়ের মুখ দেখি, আমার প্রথম যৌবনের প্রথম ভালোবাসার ছবি দেখি; ওর প্রতিটি হাবভাব, চালচলন ঠিক ওর মায়ের মতোই— এতটুকু অমিল এতদিনেও দেখিনি আমি। তাই ওর মধ্যে দিয়ে অতীতকে দেখি চোখের সামনে। এই কারণেই, ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারিনি। কিন্তু পাছে আর্থারের মানে, লর্ড স্যালটায়ারের কোনো ক্ষতি করে বসে ও, তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ড. হাক্সটেবলের স্কুলে— নিছক নিরাপত্তার খাতিরে।

'হেইজ লোকটা আমার প্রজা ছিল এককালে। জেমস তখন আমার এজেন্ট হিসাবে কাজ

করত, তখনই ওদের আলাপ হয়। চিরকালই লোকটা পয়লা নম্বরের পাকা বদমাশ। কিন্তু কী বিচিত্র কারণে জেমসের সঙ্গে ওর নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে। বার বার লক্ষ করেছি, নীচ সঙ্গের দিকে ওর কেমন জানি ঝোঁক আছে। লর্ড স্যালটায়ারকে গুম করার পরিকল্পনা ওর মাথায় আসার পর এই লোকটাকেই কাজে লাগাল জেমস। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আগের দিন আর্থারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি। জেমস খামটা খুলে একটা চিরকুট ভরে দেয় ভেতরে। চিরকুটে লেখা ছিল, আর্থার যেন অমুক দিনে অমুক সময়ে স্কুলের কাছে "এবড়োখেবড়ো উপবন"-এ দেখা করে তার সঙ্গে। চিরকুটে ডাচেসের নাম থাকায় আর্থার আর দ্বিধা করেনি। সেদিন সন্ধ্যায় জেমস সাইকেল চালিয়ে গেল সেখানে— আমাকে ও যেমনটি বলেছে, ঠিক সেইরকমভাবে বলছি আপনাকে— বনের মধ্যে নিরালায় আর্থারকে বললে যে তার জন্যে তার মায়ের মন কেমন করছে বলে তার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। জলাভূমিতে আর্থারের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। মাঝরাতে বনে এলে ঘোড়া নিয়ে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে সে। সে-ই তাকে পৌঁছে দেবে তার মায়ের কাছে। আর্থার বেচারা ফাঁদে পা দিলে। নির্দিষ্ট সময়ে উপবনে এসে হেইজকে দেখলে একটা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। দুজনেই সওয়ার হল একই ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু জার্মান মাস্টার যে তাদের পিছু নিয়েছিলেন, এ-খবর জেমস শুনলে মাত্র গতকাল। হাতের লাঠি দিয়ে হেইজ তাঁর মাথায় মারতে পথের ওপরেই মারা যান ভদ্রলোক। সরাইখানায় আর্থারকে আনার পর দোতলার একটা ঘরে নজরবন্দি রাখা হয় মিসেস হেইজের তত্ত্বাবধানে। ভদ্রমহিলার মনটি বড়ো ভালো, কিন্তু জানোয়ার স্বামীর কোনো আদেশ ঠেলে ফেলবার মতো ক্ষমতা তার নেই।

'মি. হোমস, দু-দিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ে আপনি যা জানতেন, তার থেকে একতিলও বেশি জানতাম না আমি। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, এ ধরনের অপকর্ম করার পেছনে জেমসের মোটিভ কী! উত্তরে আমি বলব, আমার আইনত উত্তরাধিকারীর প্রতি ওর উন্মাদ ঘৃণার মধ্যে যুক্তির কোনো বালাই ছিল না। ওর ধারণায়, আমার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ নাকি সে-ই হতে পারে। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুনের জন্যে তা সম্ভব নয়। তাই এদিক দিয়েও সীমা নেই তার বিদ্বেষের। এসব ছাড়াও তার একটা বিশেষ মোটিভ ছিল। তার প্রবল ইচ্ছে ছিল যে, আমি ওয়ারিশ পরিবর্তন করি এবং তার মতে আমার নাকি সে-ক্ষমতা আছে। এই সম্পর্কেই আমার সঙ্গে দরাদরি করতে চেয়েছিল ও। আর্থারকে যদি সে উদ্ধার করতে পারে, তাহলে আমি পুরস্কারস্বরূপ আর্থারের নাম খারিজ করে ওয়ারিশ হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেব তাকে! ও বেশ জানে, স্বেচ্ছায় আমি তাকে কোনোদিনই পুলিশের হাতে তুলে দেব না। কিন্তু দরাদরি করার আর সময় পেল না জেমস। এ-প্রস্তাব আমার কাছে আসার আগেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতা ওকে দিশেহারা করে তুললে। ফলে, পরিকল্পনামতো কাজ করার সুযোগই পেল না ও।

'ওর সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল আপনার আবিষ্কারে। জলায় হেইডেগারের মৃতদেহ পেয়েছেন আপনারা— এ-খবর শোনামাত্র আতঙ্কে নীল হয়ে গেল জেমস। গতকাল এই ঘরে আমরা বসে রয়েছি, এমন সময়ে ড. হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে খবরটা পেলাম। শোকে উদ্‌বেগে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল জেমস যে দেখেই খটকা লাগল আমার। সত্য কথা বলতে কী, প্রথম

থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। ওর ওইরকম মুহ্যমান অবস্থা দেখামাত্র সন্দেহ পরিণত হল স্থির বিশ্বাসে এবং তখনই ওকে চাপ দিলাম আমি। কাজ হল তৎক্ষণাৎ। স্বেচ্ছায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল জেমস। করার পর আমাকে অনুনয় করলে যে, দিন তিনেকের জন্যে আমি যেন মুখ বন্ধ করে থাকি, ইতিমধ্যে তার দুষ্কর্মের সঙ্গী গা-ঢাকা দিক। রাজি হলাম আমি। এইভাবেই চিরকাল ওর কাকুতিমিনতির কাছে সঁপে দিয়েছি নিজেকে। সঙ্গেসঙ্গে ও ছুটল সরাইখানায় হেইজকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে রাতারাতি তাকে এ-অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে আমি যেতে পারলাম না, কিন্তু অন্ধকার হতে-না-হতেই রওনা হলাম মাই ডিয়ার আর্থারকে দেখতে। দেখলাম নিরাপদেই আছে সে। শরীরও সুস্থ। তবে চোখের সামনে ওই বীভৎস খুন দেখার পর থেকে আতঙ্ক যেন ওর অণু-পরমাণুতেও শেকড় গেড়েছে— কী পরিমাণে যে ভয় পেয়েছে ও, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, মি. হোমস। প্রতিশ্রুতি অনুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিন দিনের জন্যে মিসেস হেইজের হেপাজতে রেখে এলাম ওকে। কেননা, পুলিশকে সংবাদ দিতে গেলেই তাদেরকে প্রথমে জানাতে হবে এতদিন তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সঙ্গেসঙ্গে তারাই জানতে চাইবে, হত্যাকারী কে। হত্যাকারীর সমুচিত শাস্তির আয়োজন করতে গেলে হতভাগ্য জেমসের সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইসব ভেবেই তিন দিন চুপচাপ থাকাই বিধেয় বলে মনে করলাম। আপনি অকপটে সরল হতে বলেছিলেন, মি. হোমস। তাই কোনোরকম বাগাড়ম্বর বা কোনো কিছু লুকোবার চেষ্টা না-করে অসংকোচে সব খুলে বললাম। আপনার কথায় নির্ভর করে আমার কথা রেখেছি। এবার আপনার পালা আমাকে সাহায্য করার।'

'এবং আমি তা করব,' বলল হোমস। 'ইয়োর গ্রেস, প্রথমেই একটা কথা না-বলে পারছি না। আইনের চোখে নিজেকে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন আপনি। একটা মহাপাতককে আপনি সহ্য করেছেন এবং একজন খুনে গুন্ডাকে গা-ঢাকা দেওয়ার সহায়তা করছেন। এ-কথা বললাম এই কারণে যে, রাতারাতি এ-অঞ্চল থেকে শাকরেদকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে জেমস ওয়াইল্ডারের যত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তা যে আপনার পকেট থেকেই গেছে, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন ডিউক।

'বাস্তবিক ব্যাপারটা বড়োই সিরিয়াস। ইয়োর গ্রেস, তার চেয়েও নিন্দনীয় হচ্ছে আপনার ছোটো ছেলের প্রতি আপনার অসংগত আচরণ। তিন দিনের জন্যে একটা নোংরা আস্তানায় তাকে আপনি ফেলে এসেছেন।'

'কিন্তু প্রতিশ্রুতি রয়েছে—'

'এ ধরনের লোকদের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু? জেমস ওয়াইল্ডার যে আবার নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে না, এ-রকম কোনো গ্যারান্টি কি কেউ কাউকে দিতে পারে? অপরাধী বড়ো ছেলেকে খুশি করার জন্যে নিরপরাধ ছোটো ছেলেকে অনাবশ্যক অথচ আসন্ন বিপদের মধ্যে আপনি ফেলে এসেছেন, আপনার এই আচরণ অত্যন্ত অসংগত এবং অন্যায়।'

নিজের হলে দাঁড়িয়ে এভাবে ধমকধামক খাওয়ার মতো দুর্দিন হোলডারনেসের দর্পিত লর্ডের

জীবনে কোনোদিন আসেনি। উন্নত ললাট রাঙা হয়ে উঠল রক্তোচ্ছ্বাসে, কিন্তু তবুও উনি মূক হয়ে রইলেন বিবেকবুদ্ধির তর্জনী হেলনে।

'একটিমাত্র শর্তে আপনাকে সাহায্য করব আমি। শর্তটা এই— ঘণ্টা বাজিয়ে আপনারা পেয়াদাকে ডেকে পাঠান এবং আমার খুশিমতো তাকে আদেশ দেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন।'

একটি কথাও না-বলে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেন ডিউক। ঘরে ঢুকল একজন পরিচারক।

হোমস বললে, 'সুখবর আছে তোমাদের জন্যে— লর্ড স্যালটায়ারকে পাওয়া গেছে। ডিউকের ইচ্ছে এই মুহূর্তে যেন একটা গাড়ি লড়ায়ে মোরগওলা সরাইখানায় গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসে।'

আনন্দে আটখানা হয়ে পেয়াদা বেরিয়ে যেতেই হোমস বলল, 'ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়ার পর এবার অতীত নিয়ে পড়া যাক। আমি সরকারি কাজ করি না এবং যতক্ষণ সুবিচারের সম্ভাবনা রয়েছে, আমি যা জানি তা প্রকাশ করারও কোনো কারণ দেখি না। হেইজ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। ফাঁসি তার হবেই এবং তা থেকে তাকে বাঁচানোর কোনো প্রচেষ্টা আমি করব না। সে কী ফাঁস করবে-না-করবে, তা আমি জানি না। তবে ইয়োর গ্রেস তাকে অনায়াসেই সমঝে দিতে পারেন যে, বোবা হয়ে থাকাটাই তার স্বার্থের অনুকূল হবে। পুলিশ জানবে মোটা দাঁওয়ের লোভেই লর্ড স্যালটায়ারকে গুম করেছিল সে। আসল তথ্য যদি তারা নিজেরাই খুঁজে না-পায়, তাহলে যেচে তাদেরকে সব কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না আমি। ইয়োর গ্রেস, এক বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পরেও যদি মি. জেমস ওয়াইল্ডার আপনার কাছে থাকেন, তাহলে আরও অনেক নতুন সংকটের সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।'

'আমিও তা বুঝেছি, মি. হোমস। এ-বিষয়ে আমাদের কথা হয়ে গেলে জেমস অস্ট্রেলিয়ায় যাবে ভাগ্যান্বেষণে।'

'তাই যদি হয়, ইয়োর গ্রেস, তাহলে আরও একটা কথা বলব। আপনি নিজেই বলেছিলেন আপনার বিবাহিত জীবনের অশান্তির জন্যে জেমস ওয়াইল্ডারই কতকাংশে দায়ী। আমার মতে, এতদিন ডাচেসের প্রতি যে-অবিচার করা হয়েছে, তা সুরাহা করার ব্যবস্থা এবার আপনি করুন এবং চরম অশান্তির ভেতর দিয়ে যে-সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল নিতান্ত আকস্মিকভাবে, আবার তা নতুন করে স্থাপন করার আয়োজন আপনার দ্বারাই হোক!'

'সে-ব্যবস্থাও আমি করেছি হোমস। আজ সকালেই ডাচেসকে চিঠি লিখেছি আমি।'

হোমস উঠতে উঠতে বললে, 'তাহলে আমি এবং আমার বন্ধু নিজেদেরকেই অভিনন্দন জানাতে পারি এই কারণে যে, উত্তর দেশে এত অল্প সময়ের জন্যে বেড়াতে এসেও অনেকগুলো অত্যন্ত সুখময় পরিণতির সূচনা করে যেতে পারলাম। ছোট্ট একটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমার খটকা কিন্তু এখনও যায়নি। হেইজ ঘোড়ার খুরে কতকগুলো আশ্চর্য নাল লাগিয়েছিল। ফলে হয়েছে কী, মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের ছাপ না-পড়ে পড়েছে গোরুর খুরের ছাপ। এ ধরনের অসাধারণ পদ্ধতি কি জেমস ওয়াইল্ডারই শিখিয়েছিলেন তাকে?'

ক্ষণকাল চিন্তাচ্ছন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডিউক। তারপরেই চোখের তারায় নিবিড় হয়ে উঠল বিস্ময়। দরজা খুলে মিউজিয়ামের মতো সাজানো মস্ত একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের।

কোণের দিকে মাথা রাখা একটা কাচের আলমারির কাছে গিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন ভেতরে পাথরের ওপর খোদাইকরা কয়েক ছত্র বিবরণের দিকে।

বিবরণটা এই : 'হোলডারনেসের হলের পরিখা খনন করে এই নালগুলি পাওয়া গেছে[১০], নালগুলি ঘোড়ার পায়ে লাগানোর জন্যে। কিন্তু অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্যে তলার লোহা বিশেষভাবে খণ্ডিত। অনুমান, মধ্যযুগে হোলডারনেসের কয়েকজন লুঠেরা ব্যারনের আমলে এদের সৃষ্টি।'

কেসটা খুলে ফেলল হোমস, তারপর থুথু দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে আলগোছে বুলিয়ে নিলে একটা নালের ওপর দিয়ে। টাটকা কাদার একাট পাতলা স্তর উঠে এল আঙুলে।

কাচের ডালাটা বন্ধ করতে করতে ও বলল, 'ধন্যবাদ। উত্তর দেশে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু যা দেখলাম, তার মধ্যে এইটাই হল দ্বিতীয়।'

'আর প্রথমটা?'

চেকটা ভাঁজ করে সন্তর্পণে নোটবইয়ের মধ্যে রেখে দিলে হোমস। তারপর সস্নেহে বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিয়ে 'আমি বড়ো গরিব' বলে ভেতরকার পকেটের কোনায় বইটা চালান করে দিলে ও।

টীকা

১. **গোরুর খুরের রহস্য** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য প্রায়রি স্কুল' ইংলন্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায় এবং আমেরিকায় কলিয়ার্স উইকলির ৩০ জানুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায়।

২. **ম্যাকলটন** : লেসলি ক্লিংগার জানিয়েছেন, এই গল্পের পাণ্ডুলিপিতে ম্যাকলটন-এর বদলে ডার্বিশায়ারের ক্যাসলটন-এর নাম লিখেছিলেন কন্যান ডয়্যাল। পরে তা বদলে দেন।

৩. **ইটন জ্যাকেট** : কোমরের ওপর পর্যন্ত খাটো ঝুলের এই জ্যাকেট প্রথম ব্যবহার করত ইটন স্কুলের ছাত্ররা। পরে অন্যান্য স্কুলের ইউনিফর্মে এই ধরনের জ্যাকেট ব্যবহৃত হতে থাকে।

৪. **ওয়াটসন আর আমার মতো দু-দুটো বাঘা হাউন্ডের** : শার্লক হোমস কি সত্যিই এ-কথা বলেছিলেন, নাকি ওয়াটসন নিজেকে জাহির করতে লিখেছেন এই কথা।

৫. **এটা প্রধান সড়ক** : পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় প্রথমে লেখা হয়েছিল, 'ম্যাঞ্চেস্টার থেকে বাক্সটন যাওয়ার প্রধান সড়ক।

৬. **ডানলপ টায়ার** : ইংলন্ডে হাওয়া ভরা টায়ারের প্রথম পেটেন্ট ১৮৪৫ সালে রবার্ট উইলিয়ম থমসন নিয়ে থাকলেও, হাওয়া ভরা বা নিউম্যাটিক সাইকেল টায়ারের পেটেন্ট নেন জন বয়েড ডানলপ ১৮৮৮ সালে। পরের বছর তাঁর কোম্পানি বায়ার্ন ব্রাদার্স ইন্ডিয়া রাবার কোম্পানি লিমিটেড এই টায়ার প্রস্তুত করতে শুরু করে এবং তা প্রবল জনপ্রিয় হয়। ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডানলপ রাবার কোম্পানি লিমিটেড। গাড়ির টায়ার এই কোম্পানি বাজারে আনে ১৯০৬ সালে।

৭. **পরপর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললাম** : ওয়াটসন কি নিয়মিত সিগারেট খেতেন? প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন হোমস-গবেষক। কারণ, এই গল্প ছাড়া শুধুমাত্র 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস' উপন্যাসে তাঁকে সিগারেট খেতে দেখা গিয়েছে।

৮. **দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাঙ্ক** : এই ব্যাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায় 'দ্য ম্যান উইদ দ্য টুইস্টেড লিপস' এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস' গল্পে। আর্থার কন্যান ডয়্যাল নিজেও ছিলেন এই ব্যাঙ্কের গ্রাহক। এই ব্যাঙ্ক ১৯১৮-তে লয়েডস ব্যাঙ্কের সঙ্গে একত্রিত হয়। লয়েডস ব্যাঙ্কের এখনকার নাম লয়েডস টি. এস. বি. ব্যাঙ্ক।

৯. **বারো হাজার পাউন্ড :** ওয়াটসনের মুখ বন্ধ রাখতে আরও ছয় হাজার?

১০. **নালগুলি পাওয়া গেছে :** সিভিল ওয়ারের সমসাময়িক ঠিক এই ধরনের নাল, যাতে ঘোড়ার খুরের ছাপকে গোরুর খুরের বা শিশুদের পায়ের ছাপ মনে হবে, কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে টিউকসবেরির কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত বার্টসমর্টন কোর্টে। (দ্রষ্টব্য : মে ১৯০৩-এ স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন)

তিমি শিকারির বুকে হারপুন[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্ল্যাক পিটার]

১৮৯৫ সালের জুলাইয়ের প্রথম হপ্তায় বন্ধুবরকে ঘন ঘন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমাদের আড্ডা থেকে উধাও হতে দেখে অনুমান করেছিলাম একটা কিছু নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে শুরু করেছে ও। এই সময় আবার রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল[২] সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ায় আমি বুঝেছিলাম আবার ছদ্মবেশে কোথাও-না-কোথাও তৎপর হয়ে উঠেছে হোমস। অপরাধী মহলে ও ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। তাই অসংখ্যবার ওকে ভোল পালটাতে দেখছি অগণিত নামের আর রূপের খোলসে। লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে ওর অন্তত পক্ষে গোটা পাঁচেক খুদে আস্তানা[৩] — সংক্ষেপে যাদের বলা যায় বহুরূপী হোমসের মেক-আপ রুম। কিন্তু কী কাজ নিয়ে যে তার এত ব্যস্ততা, সে-সম্বন্ধে আমার কাছে কোনোরকম উল্লেখ না-করায় আমিও তার গোপন কথা জানবার চেষ্টা করিনি। সে-রকম স্বভাবই নয় আমার। ওর তদন্তধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে ছোট্ট একটু ইঙ্গিত প্রথম যেদিন পেলাম, সেইদিন বুঝলাম, কাজটা অসাধারণ। প্রাতরাশের আগেই বেরিয়েছিল ও। আমি টেবিলে একলা। এমন সময়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকল হোমস। মাথায় টুপি, ছাতার বাঁটের মতো মুখের দিকে বেঁকানো মস্ত একটা হারপুন হাতে ঝুলছে।

'কী সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠি আমি। 'লন্ডনের রাস্তাঘাটে এই জিনিসটা নিয়ে তুমি হাওয়া খেয়ে এলে নাকি হে?'

'কসাইয়ের কাছ থেকে আসছি। গেছি গাড়িতে, এসেছি গাড়িতে।'

'কসাই?'

'খিদেয় পেট জ্বলছে মাই ডিয়ার ওয়াটসন, ব্রেকফাস্টের আগে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার আর কোনোরকম সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজি ফেলে বলতে পারি যে কী ধরনের ব্যায়াম করে এখন ফিরছি, তা তুমি অনুমান করতে পারবে না কোনোমতেই।'

'সে-চেষ্টাও আমি করব না।'

কফি ঢালতে ঢালতে নিঃশব্দে এক চোট হেসে নিলে ও। তারপর বলতে আরম্ভ করলে, 'অ্যাল্লারডাইসের দোকানের পেছনের ঘরে হাজির থাকলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হত তোমার। কড়িকাঠে আংটা থেকে ঝুলছিল একটা মরা শুয়োর। আর, শার্টের হাতা গুটিয়ে এক ভদ্রলোক এই হাতিয়ারটা দিয়ে বীরবিক্রমে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাতের পর আঘাত হানছিল

বেচারির গতায়ু দেহটার ওপর। জানো, এই শর্মাই সেই উৎসাহী ভদ্রলোক! হাজার কায়দা করেও গোটা শুয়োরটাকে এক ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'হাজার টাকা দিলেও না। কিন্তু হঠাৎ এ-খেয়াল হল কেন তোমার?'

'আমার ধারণা, উডম্যানস লী-র কেসের সঙ্গে এ-ব্যাপারের একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে, — তাই। এই যে হপকিনস, তোমার টেলিগ্রাম কাল রাত্রে পেয়েছি। এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।'

হপকিনসের বয়স তিরিশ হবে। অত্যন্ত সজাগ সতর্ক পুরুষ। পরনে সাদাসিধে একটা টুইডের সুট! কিন্তু খাপখোলা তলোয়ারের মতো সিধে চেহারাটি দেখলেই বোঝা যায় অফিশিয়াল ইউনিফর্ম পরাই তার বারোমাসের অভ্যাস। ভদ্রলোকের পুরো নাম স্ট্যানলি হপকিনস। এই তরুণ ইনস্পেকটরটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করে হোমস। হপকিনসও গুণমুগ্ধ শিষ্যের মতো প্রখ্যাত শখের গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলো একবার প্রশংসা করতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। আমার বন্ধুটির ওপর তার শ্রদ্ধা অসীম। হপকিনসের কুঞ্চিত ললাটে আজ কিন্তু চিন্তার আবিলতা। চোখে-মুখে অপরিসীম তিক্ততা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে।

'ধন্যবাদ, স্যার। বেরোবার আগেই প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি আমি। গতকাল রিপোর্ট দিতে এসেছিলাম। শহরেই কাটিয়েছি রাতটা।'

'কীসের রিপোর্ট?'

'ব্যর্থতার, স্যার— চরম ব্যর্থতার।'

'সেকী, তাহলে এক পা-ও এগোতে পারোনি বল?'

'একদম না।'

'সর্বনাশ! তাহলে তো দেখছি আমাকেই দেখতে হয় কী ব্যাপার।'

'মি. হোমস, আমারও তাই একান্ত ইচ্ছা। এত বড়ো সুযোগ হাতের মুঠোতে পেয়েও কিছু করতে পারছি না আমি— সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে আমার। দয়া করে আপনি একবার গা ঝাড়া দিন— একটু সাহায্য করুন আমাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তদন্তের রিপোর্ট এবং কেস সম্পর্কে যা কিছু আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সবই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। মন দিয়েই পড়েছি। ভালো কথা, তামাক রাখার যে-থলিটা পাওয়া গেছে, সে-বিষয়ে তোমার মতামত কী শুনি? কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?'

অবাক হয়ে যায় হপকিনস।

'থলিটা লোকটারই, স্যার। ভেতরে তার নামের আদ্যক্ষর পাওয়া গেছে। সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি— লোকটা নিজেও এককালে সীল শিকারি ছিল।'

'কিন্তু তার নিজের কাছে তো কোনো পাইপ নেই।'

'না স্যার, পাইপ আমরা পাইনি। লোকটা খুব বেশি ধূমপান করত বলে মনে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করার জন্যেই হয়তো খানিকটা তামাক রেখে দিয়েছিল।'

'কোনো সন্দেহই নেই তাতে! এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম না এইজন্যে যে, আমি যদি এ-

কেসটা হাতে নিতাম, তাহলে হয়তো এই পয়েন্ট থেকেই তদন্ত শুরু হত। সে-কথা এখন থাকুক। ড. ওয়াটসন এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও শোনেনি! আমিও সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনতে পেলে খুশি হতাম। যেসব পয়েন্টগুলো নিতান্তই প্রয়োজন, সেইগুলো দিয়ে সংক্ষেপে কেসটা শুনিয়ে দাও দিকি।'

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে শুরু করল স্ট্যানলি হপকিনস। 'নিহত ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির কর্মজীবন সংক্রান্ত কয়েকটা তারিখ লেখা আছে এই কাগজটায়। পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৪৫ সালে তাঁর জন্ম। সীল আর তিমি মাছ শিকারে তাঁর মতো দুর্দান্ত অথচ পাকা শিকারি সচরাচর দেখা যায় না। ১৮৮৩ সালে ডানডীর সীল শিকারের জাহাজ 'সী ইউনিকর্ন'-এর কম্যান্ডার ছিলেন তিনি। এর পর থেকেই কয়েকবার সমুদ্রযাত্রায় বেরোন। প্রতিবারেই সফল হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি। অবসর নিয়ে কয়েক বছর শুধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু শেষে, সাসেক্স ফরেস্ট রো-র কাছে উডম্যান'স লী নামে একটা জায়গা কিনে শুরু করেন বসবাস। বছর কয়েক এইখানেই কেটে যায়। তারপর আজ থেকে মাত্র সাত দিন আগে উডম্যান'স লীতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

'বিচিত্র চরিত্র ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির। দু-একটা নমুনা শুনলেই বুঝবেন কেন এ-কথা বললাম।

'সাধারণ জীবনে উনি ছিলেন কড়া পিউরিটান। ধর্ম আর আচার সম্বন্ধে তাঁর অতি-নিষ্ঠা লক্ষ করার মতো। স্বল্পভাষী, সদাই বিষণ্ণ তাঁর প্রকৃতি। সংসারে থাকবার মধ্যে আছেন স্ত্রী, বছর বিশ বয়সের এক মেয়ে আর দুজন পরিচারিকা। পরিচারিকারা কেউই বেশিদিন টিকতে পারত না। নতুন নতুন মুখ দেখা যেত এ-সংসারে। বেচারিদের চাকরিতে সুখ ছিল না কোনোদিনই। মাঝে মাঝে অবস্থা এতদূরে গড়াত যে ওদের সহ্যশক্তি হার মানত। ক্যাপ্টেন লোকটা কিছুদিন অন্তর মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরতেন। এবং যতক্ষণ সুরার রং থাকত তাঁর চোখে, ততক্ষণ তাঁকে একটা আস্ত পিশাচ ছাড়া আর কিছু বলা যেত না। একবার নাকি বউ আর মেয়েকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বার করে পার্কের মধ্যে দিয়ে চাবকাতে চাবকাতে নিয়ে চলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের আর্ত চিৎকারে গ্রামসুদ্ধ লোক উঠে এসে বাঁচায়।

'একবার তাঁর নামে আদলতের শমনও এসেছিল গ্রামের বুড়ো পাদরির ওপর বর্বরের মতো হামলা করার জন্যে। ভদ্রলোক ক্যাপ্টেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন তার আচরণের প্রতিবাদ জানাতে। মি. হোমস, সংক্ষেপে, পিটার ক্যারির কীর্তিকলাপকে ম্লান করার মতো বিপজ্জনক লোক আপনি আর দুটি দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ। শুনেছি জাহাজের কম্যান্ডার থাকার সময়েও নাকি তাঁর চরিত্র ছিল এইরকম। ও-মহলে লোকে তাঁকে ব্ল্যাক পিটার বলে ডাকত। শুধু ষণ্ডামার্কা ক্রূর চেহারার সঙ্গে মানানসই কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড দাড়ি থাকায় তাঁর এমনতরো নামকরণ হয়নি, হয়েছে উৎকট রঙ্গপরিহাসের জন্যে যা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে নিছক আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রতিবেশীদের কেউই তাঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। তাঁর ছায়া মাড়াতেও যেন সবাইয়ের ঘৃণা। সেই কারণেই, এমন কোনো লোক পাইনি যে তার এহেন নিষ্করুণ ভয়ংকর মৃত্যুতে শোক পেয়েছে, অন্তত সহানুভূতির একটি শব্দও উচ্চারণ করেছে।

'মি. হোমস, লোকটার "কেবিন" সম্পর্কে তদন্তের বিবরণ নিশ্চয় পড়েছেন আপনি। আপনার

বন্ধু হয়তো শোনেননি, তাই বলছি। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা কাঠের আউট হাউস তৈরি করেছিলেন ক্যাপ্টেন। নাম দিয়েছিলেন 'কেবিন'। এই কেবিনেই প্রতি রাতে ঘুমোতে আসতেন তিনি। কেবিনটা আসলে ছোট্ট এক কামরার একটা কুঁড়ে, লম্বায় ষোলো ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। কেবিনের চাবি থাকত তাঁরই পকেটে। নিজের বিছানা নিজেই পাততেন। ধুলোময়লা সাফ করতেন নিজেই। দ্বিতীয় কোনো প্রাণীকে চৌকাঠ পেরোতে দিতেন না। চারদিক পর্দায় ঢাকা ছোটো চারটে জানলা আছে কেবিনে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেও সে-জানলা কেউ খোলে না। একটা জানলা আছে বড়োরাস্তার দিকে। রাতের অন্ধকারে ঘরের মধ্যে আলো জ্বললে পথচারীরা পরস্পরকে তা দেখিয়ে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করত— 'না-জানি কী কাণ্ডই করছে ব্ল্যাক পিটার।' মি. হোমস, তদন্তের ফলে আমরা যে ক-টা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম এই জানলাটা।

'আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে হত্যার দু-দিন আগে রাত একটার সময়ে ফরেস্ট রো-র দিক থেকে একজন পাথরের কারিগর আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে চৌকোনা আলোর ঝিকিমিকি দেখে। আলোকিত পর্দার ওপর ফুটে উঠেছিল একটা মুখের কালো ছায়া। পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল লোকটা। ক্যাপ্টেন ক্যারির সঙ্গে তার অনেকদিনের পরিচয় এবং এ-মুখ যে তাঁর মুখ নয়, এ-কথা হলফ করেও বলতে রাজি আছে সে। ছায়া-মুখের দাড়ি ছিল বটে কিন্তু সে-দাড়ি আকারেও ছোটো এবং সামনের দিকে ঠেলে বার করা— ক্যাপ্টেনের মতো মোটেই নয়। এ-দৃশ্য দেখবার আগে ঘণ্টা দুয়েক ভাটিখানায় কাটিয়ে এসেছিল সে, পথ থেকে জানলার দূরত্বও ছিল অনেকখানি। আর কি জানেন, এ-দৃশ্য সে দেখেছে সোমবার, কিন্তু খুন হয়েছে বুধবার।

'মঙ্গলবার পিটার ক্যারিকে তাঁর জঘন্যতম মেজাজে দেখা গিয়েছে। মদ্যপানের ফলে আরক্ত মুখ আর বুনো জন্তুর মতো দুর্দান্ত হাবভাব দেখে ভয় পেয়েছে সবাই। বাড়িময় দুমদাম করে বেড়িয়েছেন তিনি। যতবার তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেছে ততবারই অন্যদিকে দৌড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা। রাত গভীর হয়ে এলে নিজের কেবিনে গেছেন পিটার ক্যারি।

'রাত দুটোর সময়ে বিকট একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসে কেবিনের দিক থেকে। শব্দটা শোনে ক্যাপ্টেনের মেয়ে— প্রতিরাত্রে জানলা খুলে ঘুমোনোর অভ্যাস তার। মদের নেশায় এ ধরনের চিৎকার বা অনর্থক হট্টগোল করা ক্যাপ্টেনের চিরকালের স্বভাব— তাই এ-বিষয়ে কেউ আর মাথা ঘামায়নি। সকাল সাতটায় উঠে একজন ঝি লক্ষ করে কেবিনের দরজা খোলা। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ওরা এমনই যমের মতো ভয় করত যে দুপুর বারোটার আগে কারোরই সাহসে কুলোয়নি একবার উঁকি মেরে দেখে ব্যাপারটা কী। ভরদুপুরে ওরা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরকার দৃশ্য একবার উঁকি মেরে দেখেই রক্তশূন্য সাদা মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে গাঁয়ের দিকে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে কেসটা হাতে নিই আমি।

'মি. হোমস, আপনি তো জানেন আমার স্নায়ু দুর্বল নয়। কিন্তু সেদিন সত্যি কথা বলতে কী ওই ছোট্ট আউট হাউসের ভেতরে মাথা গলানোর পরে আমার মতো লোকেরও আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিল। ছোটো বড়ো হরেকরকম মাছির ভনভনানিতে যেন হারমোনিয়ামের বাজনা বাজছিল ঘরের মধ্যে। মেঝে আর দেওয়াল দেখে মনে হল যেন কসাইখানায় এসে পড়েছি। ব্ল্যাক পিটার ঘরটার নাম দিয়েছিলেন কেবিন এবং নামটা অযৌক্তিক নয় মোটেই। বাস্তবিকই একটা কেবিনের মতো সাজানো ঘর। ঢুকলেই মনে হবে যেন জাহাজের মধ্যে এসে পড়েছেন

আপনি। এক প্রান্তে একটি বাক্স, জাহাজি সিন্দুক, অনেকগুলো ম্যাপ আর চার্ট, 'সী ইউনিকর্ন'-এর একটা ছবি, তাকের ওপর জাহাজের গতি হিসেব রাখার একসারি কেতাব। যেকোনো ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে পড়লে ঠিক যেমনটি আশা করা যায়, তেমনিভাবে সাজানো ঘরটা। এসবের মাঝখানে পড়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি স্বয়ং। অনেক অত্যাচারে বীভৎসভাবে যেন দুমড়ে মুচড়ে গেছে তাঁর মুখ। মস্তবড়ো কালো দাড়িটা যেন অসীম যন্ত্রণায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। ইস্পাতের একটা হারপুন চওড়া বুক ভেদ করে গভীরভাবে গেঁথে গেছে পেছন দিককার দেওয়ালে। কার্ডের ওপর গুবরে-পোকাকে পিন দিয়ে যেভাবে লাগিয়ে রাখা হয়, ঠিক তেমনিভাবে হারপুন দিয়ে তাকে গেঁথে রাখা হয়েছিল কাঠের দেওয়ালে। ভদ্রলোকের প্রাণবায়ু যে অনেক আগেই শূন্যে মিলিয়েছে, তা আর না-বললেও চলে। অপরিসীম যন্ত্রণায় শেষ মরণ-চিৎকার দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সাঙ্গ হয়েছে তাঁর ইহলীলা।

'আপনার পদ্ধতি আমি জানি, স্যার। কাজ শুরু করলাম সেইমতো। কোনো কিছু স্থানচ্যুত হওয়ার আগে ঘরের মেঝে এবং বাইরের জমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। আশ্চর্য, ঘরে বাইরে কোথাও কোনোরকম পায়ের ছাপ নেই।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে তুমি দেখতে পাওনি?'

'বিশ্বাস করুন, স্যার, কোনোরকম ছাপ নেই।'

'হপকিনস, বহু রহস্য গ্রন্থি মোচন করেছি আমি। কিন্তু ডানা মেলে উড়ে এসে কেউ অপরাধ করে সরে পড়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত শুনিনি বা দেখিনি। অপরাধী যতক্ষণ দু-পায়ে হাঁটছে, ততক্ষণ কিছু ছাপ, কিছু ঘষা, কিছু অতি তুচ্ছ নাড়াচাড়ার চিহ্ন সন্ধানীর বৈজ্ঞানিক চোখে ধরা পড়বেই। রক্ত ছড়ানো এ-রকম একটা ঘরে আমাদের পথ দেখানোর মতো কোনো নিশানা যে নেই, তা হতেই পারে না। যাক, তোমার রিপোর্ট শুনে মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে অন্তত কতকগুলো জিনিস তোমার নজর এড়াতে পারেনি, তাই তো?'

শ্লেষের সূক্ষ্ম খোঁচাটুকু গায়ে না-মেখে চোখ মিটমিট করে হপকিনস বলে, 'সে সময়ে আপনাকে না-ডেকে খুবই বোকামো করেছি মি. হোমস। যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন বর্তমান নিয়ে পড়া যাক। আপনার অনুমানই ঠিক, ঘরের মধ্যে এমন কয়েকটা জিনিস আমি পেয়েছি যা উপেক্ষা করা চলে না কোনোমতেই। একটা হচ্ছে খুনির হাতিয়ার—হারপুন। অস্ত্রটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনা হয়েছে দেওয়ালের তাক থেকে। পাশাপাশি রাখা দুটি হারপুনের পাশে তৃতীয়টির স্থান শূন্য। 'এস. এস. সী ইউনিকর্ন, ডানডী'— এই শব্দ ক-টা প্রত্যেকটার হাতলেই খোদাই করা। দেখে শুনে মনে হয়, খুনটা হয়েছে নিছক রাগের ঝোঁকে। হত্যাকারী প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে আচম্বিতে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই টেনে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাক পিটারের বুকে। খুনটা হয়েছে রাত দুটোর সময়ে। অথচ ব্ল্যাক পিটারের পরনে দেখা গেছে বাইরে বেরোনোর জন্যে সম্পূর্ণ সাজসজ্জা। এসব দেখে মনে হয় আগে থেকেই কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্থির হয়ে ছিল তার। এ ধারণার আর একটা কারণ হচ্ছে টেবিলের ওপর রাখা দুটো নোংরা গেলাসের পাশে এক বোতল র‍্যম।'

হোমস বললে, 'মন্দ বলনি, তোমার দুটো সিদ্ধান্তই দেখছি বরদাস্ত করা চলে। র‍্যম ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনো মদ ছিল কি?'

'ছিল। জাহাজি সিন্দুকের মধ্যে মদ রাখার উপযুক্ত তালা লাগানো একটা আধারে পেয়েছি

হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি। এ-পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের বিশেষ কোনো কাজে আসবে না। কেননা, মদ রাখার পাত্রগুলো ভরতি থাকায় সিন্দুকের বোতলে কেউই হাত দেয়নি।'

'কাজে লাগবে কি না বলতে পারি না, তবে ঘরের মধ্যে হুইস্কি আর ব্র্যান্ডির উপস্থিতিটাই ভাববার বিষয়। সে-কথা এখন থাকুক, কেসটা সম্পর্কে আর কিছু দরকারি তথ্য যদি জানা থাকে তো বলে ফেল।'

'টেবিলের ওপর তামাক রাখার থলিটা পাওয়া গেছে।'

'টেবিলের কোন দিকে?'

'ঠিক মাঝখানে। সীলমাছের খসখসে পুরু চামড়ার ব্যাগ— মুখ চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। 'P.C.' অক্ষর দুটো ভেতর দিকে লেখা। প্রায় আধ আউন্সের মতো কড়া জাহাজি তামাক পাওয়া গেছে ভেতরে।'

'চমৎকার! আর কিছু?'

পকেট থেকে ছাইরঙের পুরু পশমি কাপড়ে ঢাকা একটা নোটবই বার করল স্ট্যানলি হপকিনস। বাইরের দিকটা কর্কশ, বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে কোনাগুলো, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে পাতাগুলো। প্রথম পাতায় লেখা আছে 'J.H.N.' আর '১৮৩'। টেবিলের ওপর নোটবইটা রেখে

'হোমস গভীর মনোযোগ সহকারে ওটা পরীক্ষা করল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

তন্ময় হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল হোমস আর চোখে অসীম প্রত্যাশা নিয়ে তার দু-কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়লাম আমি আর হপকিনস। দ্বিতীয় পাতায় 'C.P.R.',— এই ছাপা অক্ষর তিনটের পর কয়েক পাতা জুড়ে লেখা অজস্র সংখ্যা। এ-রকম শিরোনামা আরও তিনটে দেখলাম। আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা আর স্যান পাওলো[৪]। প্রত্যেকটা শিরোনামার পর কয়েক পাতা জুড়ে কেবল দুর্বোধ্য চিহ্ন আর সংখ্যার সারি।

হোমস জিজ্ঞেস করলে, 'এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, তাই আগে শুনি।'

'আমার তো মনে হয় স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটির ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয় ওগুলো। দালালটার নাম বোধ হয় 'J.H.N.'। 'C.P.R.' তারই মক্কেলের নামের আদ্যক্ষর।'

হোমস বললে, 'আমি যদি বলি ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে[৫]?'

উরুর ওপর একটা ঘুসি মেরে দাঁতে দাঁত পিষে চেঁচিয়ে ওঠে হপকিনস, 'ওঃ, কী বোকা আমি। আপনার ধারণাই সত্য, মি. হোমস। বাকি রইল তাহলে 'J.H.N.'-এর রহস্য মোচন। ১৮৮৩ সালের পুরোনো স্টক এক্সচেঞ্জ খুলে দালালদের লিস্ট আমি দেখেছি। কিন্তু 'হাউস'-এর ভেতরে অথবা বাইরের এমন কোনো নাম আমি পাইনি 'J.H.N.' যার আদ্যক্ষর। না-পেলেও আমার বিশ্বাস, এই মুহূর্ত পর্যন্ত যত সূত্র আমার হাতে এসেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে দরকারি হচ্ছে এই নোটবইটা। একটা বিষয়ে আপনিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, মি. হোমস। নামের আদ্যক্ষরগুলো ব্ল্যাক পিটারের সংগ্রহ নয়, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির এবং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বলতে এখানে হত্যাকারীকেই বোঝাচ্ছে। আরও বলব এ-কেসে রাশি রাশি মূল্যবান সিকিউরিটি সংক্রান্ত একটা দলিলের আবির্ভাব ঘটায় এই প্রথম খুনের একটা যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য আমরা পাচ্ছি।'

খবরটা শার্লক হোমসের কাছে একেবারেই নতুন, তা তার দারুণভাবে চমকে ওঠা দেখেই বুঝলাম।

'তোমার দুটো পয়েন্টই মেনে না-নিয়ে পারছি না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তদন্ত চলার সময়ে নোটবইটা রঙ্গমঞ্চে না-পৌঁছোনোয়, আমার মতামতেও একটু আধটু রদবদল করা দরকার হয়ে পড়েছে। এই খুন সম্বন্ধে আমি একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলাম। সে-থিয়োরিতে নোটবইয়ের কোনোরকম স্থান তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। সিকিউরিটি সম্বন্ধে এইমাত্র যা বলছিলে, তা বাস্তবিকই কৌতূহল জাগায়। এ-রকম এক-আধটা সিকিউরিটি হাতে এসেছে নাকি?'

'অফিসগুলোর তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ভয় কী জানেন, দক্ষিণ আমেরিকার এই কোম্পানিগুলোর স্টক-হোল্ডারদের নামধামের রেজিস্টার দক্ষিণ আমেরিকায় থাকায় কয়েক হপ্তার আগে শেয়ারগুলোর কোনো হদিশ পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

আতশকাচ দিয়ে নোটবইয়ের মলাটটা পরীক্ষা করছিল হোমস। 'এই জায়গার রংটা দেখছি অন্যরকম হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ স্যার, ওটা রক্তের দাগ। আপনাকে তো বললাম মেঝে থেকে নোটবইটা কুড়িয়ে পেয়েছি আমি।'

'রক্তের দাগলাগা মলাটটা নীচে ছিল, না ওপরে ছিল?'

'নীচে ছিল।'

'তার মানে এই বোঝাচ্ছে, ব্ল্যাক পিটার খুন হয়ে যাওয়ার পর নোটবইটা পড়েছে মাটিতে।'

'এগজ্যাক্টলি, মি. হোমস। বড়ো সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন। আমার অনুমান, তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময়ে নোটবইটা ফেলে যায় হত্যাকারী। দরজার কাছেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম বইটা।'

'নিহত ব্ল্যাক পিটারের সম্পত্তির মধ্যে কোনো সিকিউরিটির হদিশ নিশ্চয় পাওয়া যায়নি?'

'না, স্যার।'

'চুরি গেছে বলে মনে হয়?'

'না, স্যার। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং কেস তো! ছুরিও তো পাওয়া গেছে, তাই না?'

'খাপওলা একটা ছুরি। খাপসমেত পড়ে ছিল ব্ল্যাক পিটারের পায়ের কাছে। মিসেস ক্যারি শনাক্ত করেছেন ছুরিটা তাঁর স্বামীরই।'

মুহূর্তের জন্যে চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় হোমস। তারপর শুধোয়, 'হপকিনস, নিজের চোখে জায়গাটা একবার আমার না-দেখলেই নয়!'

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে হপকিনস।

'ধন্যবাদ, স্যার। মনের ওপর থেকে আমার একটা মস্ত বোঝা নেমে যাবে আপনার পায়ের ধুলো পড়লে।'

আঙুল নাড়তে নাড়তে হোমস বলে, 'হপ্তাখানেক আগে হলে কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠত, ইনস্পেকটর। এখনও এক চক্কর ঘুরে এলে খুব বিফল হবে বলে মনে হয় না। ওয়াটসন, হাতে যদি সময় থাকে, আমার জন্যে একটু নষ্ট করো। তোমার সঙ্গ আমায় আনন্দ দেবে প্রচুর। হপকিনস, একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকো তো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফরেস্ট রো-র দিকে রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

ছোট্ট স্টেশনটায় নেমে একটা গাড়ি নিয়ে কয়েক মাইল পেরিয়ে এলাম বহুদূর বিস্তৃত বনভূমির মধ্য দিয়ে, কোনো এক সময়ে এ-বনভূমি ছিল এক বিরাট অরণ্যের অংশ— যার সুকঠিন বর্মে সুদীর্ঘকালের জন্যে বারে বারে মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে স্যাক্সন যোদ্ধারা। বনভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে অনতিউচ্চ বাড়িটার দিকে। রাস্তার তিন দিকে ঝোপে ঢাকা ছোট্ট একটা আউট হাউস। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে তার দরজা এবং জানলা। ব্ল্যাক পিটার খুন হয়েছে এখানেই।

হপকিনস প্রথমেই আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলে নিহত ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। আলুথালু অবস্থা ভদ্রমহিলার। চুলগুলো ধবধবে সাদা। চওড়া, ভারী মুখে অজস্র বলিরেখা আর দু-চোখের লাল-লাল আভার আড়ালে আতঙ্কের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠেছিল বহু বছরের দুর্ব্যবহার আর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের স্বাক্ষর। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর মেয়েও ছিলেন। ফ্যাকাশে ফর্সা রং মেয়েটির। বাবা মারা যাওয়াতে এতটুকু দুঃখ নেই, বরং বেশ খুশিই হয়েছে সে। বাপকে শেষ করে গেছে যে তার কাছে সে যেন সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ব্ল্যাক পিটারের নিজের হাতে গড়া এই ভয়াবহ পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমি। নিহত ক্যাপ্টেনের যাতায়াতের ফলে ঘাসজমির ওপর একটা সরু পথ ফুটে

উঠেছিল আউট হাউস পর্যন্ত। এই পথ ধরেই আমরা আবার এগিয়ে চললাম তাঁর পরম প্রিয় কেবিনের দিকে।

খুবই সাদাসিধে গঠনের আউট হাউস। কাঠের দেওয়াল, কাঠের ছাদ, দরজার পাশে একটা মাত্র জানলা, আর একটা শেষ প্রান্তে। পকেট থেকে চাবি বার করে তালার ওপর ঝুঁকে পড়ল হপকিনস। সবিস্ময়ে বলে, 'তালাটা কেউ খোলার চেষ্টা করেছে।'

কোনো সন্দেহই ছিল না এ-বিষয়ে। কাঠের নকশার জায়গায় জায়গায় আঁচড় পড়েছে। রঙের ওপরেও আঁচড় পড়ায় তলাকার সাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। জানলাটা পরীক্ষা করতে থাকে হোমস।

বলে, 'জানলাটাও দেখছি কেউ খুলতে চেষ্টা করেছে। যাই হোক, ঢুকতে কিন্তু পারেনি। বেজায় আনাড়ি চোর।'

ইনস্পেকটর বললে, 'ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সামান্য নয়, মি. হোমস। আমি হলফ করে বলতে পারি কাল সন্ধ্যায় এ-রকম কোনো দাগ এখানে ছিল না।'

আমি বললাম, 'কোনো অতি উৎসাহী গ্রামবাসীর কীর্তি নয় তো?'

'না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা, ব্ল্যাক পিটারের এক্তিয়ারে পা দেওয়ার মতো সাহস কারোরই নেই। ঘরের ভেতরে মাথা গলানোর কথা তো ওঠেই না। আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?'

'আমার মনে হয় ভাগ্য আমাদের ওপর খুবই সদয়।'

'আপনি বলতে চান, লোকটা আবার আসবে, এই তো?'

'ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি। দরজা খোলা পাবে, এই আশাতেই এসেছিল লোকটা। দরজা বন্ধ দেখে পেনসিলকাটা ছোট্ট একটা ছুরির ফলা দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই ভেবে দেখ— এরপর তার কী করা উচিত?'

'পরের রাতেই উপযুক্ত যন্ত্র নিয়ে ফিরে আসা।'

'আমিও ঠিক তাই বলি। সে সময় তাকে আপ্যায়ন জানানোর জন্যে আমাদের হাজির না-থাকাটা হবে চরম গাফিলতি। তার আগে চল কেবিনের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে আসি।'

খুনের চিহ্ন সব মুছে ফেলা হলেও আসবাবপত্র সরানো হয়নি। খুনের রাতে যেটি যেখানে ছিল ঘরে ঢুকে সব কিছু তেমনিভাবেই সাজানো পেলাম। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিকারি কুকুরের মতো পরীক্ষা করল হোমস। ঘরের প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসও উলটেপালটে দেখতে ছাড়ল না। তবু তার মুখ দেখে বুঝলাম সব পরিশ্রম বৃথাই গেল। রহস্যের কালো অন্ধকারে এতটুকু আলোর নিশানা দেখা গেল না। কিন্তু অসীম তার সহিষ্ণুতা। একবার শুধু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করল হোমস, 'তাকের এইখানটা থেকে কিছু নিয়েছ নাকি হপকিনস?'

'না তো।'

'এই জায়গাটায় কিছু একটা সরানো হয়েছে। দেখছ না, অন্যান্য জায়গার চেয়ে এই কোণে ধুলো একটু কম জমেছে। বই হতে পারে বাক্সও হতে পারে। যাকগে, কল্পনায় এত দৌড়ে লাভ নেই— আপাতত এর বেশি আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। চলো হে ওয়াটসন, কুঞ্জবনের গন্ধবায়ু

সেবন করতে করতে ফুল লতা পাতা আর পাখি দেখে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসা যাক। তোমার সঙ্গে এইখানেই পরে দেখা হবে হপকিনস। তারপর ধারেকাছে কোথাও নিশাচর ভদ্রলোকটির প্রতীক্ষায় বসে থাকা যাবে'খন।'

রাত এগারোটার সময় আবার আমরা জমা হই কেবিনের সামনে। হপকিনস চায় দরজা খোলা থাকুক, কিন্তু হোমসের যুক্তি— দরজা খোলা থাকলে আততায়ীর সন্দেহ জাগতে পারে। তা ছাড়া, তালাটা এমনই মামুলি যে একটা বড়ো সাইজের ছুরির মজবুত ফলা ঢুকিয়ে চাড় দিলেই তা খোলা যায় অনায়াসে। হোমসের প্রস্তাব অনুযায়ী ঘরের মধ্যে না-থেকে বাইরে ঝোপঝাড়ের মধ্যেই ওত পাতা স্থির করলাম। দূরের জানলাটা থেকেই ঝোপের শুরু। এখানে ওত পেতে থাকার সুবিধে হচ্ছে এই যে লোকটা যদি আলো জ্বালায়, তাহলে তার নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যটা খুব কাছ থেকে দেখা যাবে স্পষ্টভাবে।

শুরু হয় রাত জাগার পালা। সেই অসহ্য অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিনিটে মিনিটে পেরিয়ে গেল একটার পর একটা ঘণ্টা।

ছমছমে নীরবতা আবার সচকিত হয়ে ওঠে আড়াইটে বাজার মেঘমন্দ্র ঘণ্টা-সংকেতে। ঠিক এমনি সময়ে ফটকের দিক থেকে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ 'ক্লিক' শব্দ শুনে চমকে উঠলাম সবাই। গেট পেরিয়ে কে যেন ভেতরে এসেছে। কিন্তু তারপর আর কোনো শব্দ নেই। কতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে হাল ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, নিশ্চয় অন্য কোনো শব্দ শুনে ভুল করেছি। এবার শোনা গেল পা টিপে টিপে চলার শব্দ। শব্দটা এল ঘরের এক পাশ থেকে। পর মুহূর্তেই আবার পেলাম ধাতুতে ধাতু আঁচড়ানোর আওয়াজ এবং আরও খুটখাট শব্দ। শুরু হয়েছে তালাখোলার চেষ্টা। এবারে লোকটা নিশ্চয় ভালো রকমের যন্ত্রপাতি এনেছে। একটু পরেই কড়াৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসে। এর পরেই শুনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ। আর ঠিক তারপরেই জ্বলে ওঠে একটা দেশলাইয়ের কাঠি এবং পরক্ষণেই মোমবাতির স্থির আলোয় উদ্ভাসিত হয় সারাঘরখানা। জালি পর্দার মধ্যে দিয়ে আমাদের তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি আঠার মতো লেগে থাকে ভেতরকার দৃশ্যে।

নিশাচর আগন্তুকের বয়স এমন কিছু বেশি নয়।

বিশ বছরও হবে কি না সন্দেহ। রুগ্ণ, শীর্ণ চেহারা। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কুচকুচে কালো গোঁফটার জন্যে। কোনো মানুষকে এ-রকম ভয় পেতে আমি দেখিনি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে তার। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। বাস্তবিকই, তার অবস্থা দেখে অনুকম্পা জাগে। বেশবাস ভদ্রলোকের মতোই। কোমরের কাছে ফিতে লাগানো ঢিলেঢালা জ্যাকেট, হাঁটুর কাছে জড়ো করা ঢিলে ট্রাউজার, 'নিকারবোকার[৬]' আর মাথার ওপর একটা কাপড়ের টুপি। ভয়ার্ত চোখে জুল জুল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সে। তারপর মোমবাতিটাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল জাহাজের গতির হিসেব রাখার মোটা একটা বই নিয়ে। ঘরের তাকের ওপর এ-রকম বইয়ের একটা সারি দেখেছিলাম প্রথমবার ঘরে ঢুকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুতহাতে পাতার পর পাতা উলটে চলল, তারপর হঠাৎ থেমে যেতেই বুঝলাম ইঙ্গিত হিসেব সে পেয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে মুঠি পাকিয়ে শূন্যে হাত ছুড়তে বুঝতে পারি বেজায়

রেগে গেছে সে। দুম করে বই বন্ধ করে রেখে দেয় ঘরের কোণে। এবার নিভে যায় মোমবাতিটা। ঘর ছেড়ে সবে সে বেরোতে যাচ্ছে এমন সময়ে হপকিনসের হাত তার কলারের ওপর পড়তেই দম আটকানো আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে তার গলা দিয়ে। আবার জ্বলে ওঠে মোমবাতিটা। দেখি, ডিটেকটিভ বন্ধুর সাঁড়াশি মুষ্টিতে আটকা পড়ে বেচারা বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। হপকিনস মুঠি আলগা করতেই জাহাজি সিন্দুকের ওপর ধপ করে বসে পড়ে সে। অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হপকিনস বলে, 'কী হে ছোকরা, তোমার নাম কী? বলো তো, কী করতে এসেছিলে এখানে?'

ছেলেটি নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কোনোরকমে সোজা হয়ে বসে বলে, 'আপনাদের গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে, তাই না? আপনাদের ধারণা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মৃত্যুর পেছনে আমারও হাত আছে। কেমন? বিশ্বাস করুন, এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

হপকিনস বলে, 'সেটা আমরা ভাবব'খন। আপাতত বলো, কী নাম তোমার?'

'জন হপলি নেলিগ্যান।'

লক্ষ করলাম, চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলে হোমস আর হপকিনস।

'এখানে কী করছিলে?'

'যা বলব তা কি কেবল আমাদের মধ্যেই সীমিত থাকবে?'

'নিশ্চয় না।'

'তবে আমি বলব কেন?'

'প্রশ্নের উত্তর না-দিলে মামলা চলার সময়ে মজা টের পাবে'খন।'

চোখ মিটমিট করে উঠল তরুণটি।

বলল, 'ঠিক আছে, আমি বলছি। বলবই-বা না কেন? যদিও আমি চাই না পুরানো কেলেঙ্কারি নতুন করে ছড়িয়ে পড়ুক, তবুও কিছু গোপন করব না আপনাদের কাছে। ডসন অ্যান্ড নেলিগ্যানের নাম শুনেছেন আপনারা?'

হপকিনস যে কস্মিনকালেও শোনেনি, তা ওর মুখ দেখেই বুঝলাম। হোমস কিন্তু বেশ সচকিত হয়ে উঠেছে মনে হল।

সাগ্রহে শুধোল ও, 'পশ্চিম দেশের ব্যাঙ্কার ছিল "ডসন অ্যান্ড নেলিগ্যান" তাই না? প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড নিয়ে ফেল করল তাদের ব্যাঙ্ক। কর্নয়ালের অর্ধেক পরিবারকে পথে বসিয়ে উধাও হয়ে গেল নেলিগ্যান।'

'এগজ্যাক্টলি। নেলিগ্যান আমারই বাবা।'

এতক্ষণে অকূলপাথারে একটা কুটোর সন্ধান পাওয়া গেল! যদিও পলাতক ব্যাঙ্কার আর দেওয়ালের সঙ্গে হারপুন দিয়ে গাঁথা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মধ্যেকার ব্যবধানটা এতই দীর্ঘ যে কোনো দিশে খুঁজে পেলাম না। তরুণ জন হপলি নেলিগ্যানের আশ্চর্য বর্ণনা কানখাড়া করে শুনতে বসলাম সবাই মিলে।

'এ-ব্যাপারের মূল আমার বাবা। ডসন আগেই অবসর নিয়েছিলেন। সে সময় আমি মাত্র দশ বছরের হলেও এই ঘটনার বিভীষিকা উপলব্ধি করার মতো বয়স আমার হয়েছিল। টি টি পড়ে

গেছিল চারিদিকে। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায় সকলের সামনে। প্রথম থেকেই সবাই জেনেছে, বলাবলি করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে আমার বাবাই সিকিউরিটিগুলো আত্মসাৎ করে গা-ঢাকা দেন। এ-কথা সত্য নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যথেষ্ট সময় যদি তাঁকে দেওয়া হয়, তাহলে সিকিউরিটিগুলো পুনরুদ্ধার করে পাওনাদারদের পাওনাগণ্ডা, কড়ায় ক্রান্তিতে চুকিয়ে দিতে পারতেন তিনি! গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোনোর একটু আগেই ছোট্ট বজরাটা নিয়ে নরওয়ের দিকে রওনা হন তিনি। আগের রাতে মায়ের কাছে বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটা এখনও মনে আছে আমার। সিকিউরিটিগুলোর একটা তালিকা রেখে যান বাবা। যাবার সময় বলে যান মানসম্মান উদ্ধার না-করে তিনি ফিরবেন না। যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস যাতে অটুট থাকে, সে-বন্দোবস্ত করে তবে ঘরমুখো হবেন তিনি। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বজরা সমেত উনি যেন কর্পূরের মতো উবে গেলেন কোনোরকম চিহ্ন না-রেখেই। মা আর আমি ভাবলাম নিশ্চয় বজরাডুবি হয়েছে। সিকিউরিটিগুলো নিয়েই সমুদ্রের তলায় শেষ ঘুম ঘুমিয়েছেন বাবা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমাদের অনুগত এক ব্যবসায়ী বন্ধু মারফত একটা খবর শোনার পর। যাবার সময়ে যে সিকিউরিটিগুলো বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কয়েকটা কিছুদিন আগে আবার দেখা গেছে লন্ডনের বাজারে। খবরটা শোনার পর আমরা যে কী পরিমাণে হতবুদ্ধি হয়ে যাই, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন আপনারা। মাসের পর মাস লেগে রইলাম সিকিউরিটিগুলোর অনুসন্ধানে। অনেক দুর্ভোগ, বিস্তর ঝামেলা কাটিয়ে ওঠার পর আবিষ্কার করলাম যে সিকিউরিটিগুলো বাজারে বিক্রি করেছেন এই বাড়ির মালিক— ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি।

'লোকটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, যে সময়ে আমার বাবা নরওয়ে রওনা হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে সুমেরু সাগর দিয়ে ফিরে আসছিল একটা তিমি শিকারের জাহাজ। ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি এই জাহাজের কম্যান্ডার ছিলেন। সে বছরের শরৎকালে ঝড় হয়েছে প্রচুর। প্রবল দক্ষিণে ঝড়ের উৎপাত দেখেছি একনাগাড়ে অনেক দিন ধরে। বাবার বজরা হয়তো এই ঝড়ের মুখে পড়ে ভেসে গিয়েছিল উত্তর দিকে। ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির জাহাজের সঙ্গে দেখা হয় সেইখানেই। তাই যদি হয়, তাহলে বাবা গেলেন কোথায়? পিটার ক্যারিকে সাক্ষী মেনে যদি প্রমাণ করতে পারি সিকিউরিটিগুলো বাজারে এসেছে কীভাবে, তাহলেই প্রমাণ করা হবে যে বাবা ওগুলো বিক্রি করেননি এবং ওগুলো নেওয়ার পেছনেও তাঁর কোনো ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্য ছিল না।

'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম সাসেক্সে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন হলেন তিনি। তদন্তের বিবরণে তাঁর এই কেবিনের বর্ণনাও পড়েছিলাম এবং জাহাজের হিসাব রাখার বইগুলো যে এইখানেই উনি রেখে দিয়েছেন তা জেনেছিলাম। মতলবটা মাথায় আসে তখনই। ১৮৮৩ সালের অগাস্ট মাসে 'সী ইউনিকর্ন' জাহাজের দিনপঞ্জিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই তো জানা যায় বাবার পরিণতি রহস্য। গতরাতে বইগুলো দেখবার মতলবে এসে ব্যর্থ হয়েছি দরজা বন্ধ থাকায়। আজকে এসে দরজা খুলেছি। তারপরেই বইটা নামিয়ে পাতা উলটোতে গিয়ে দেখি আমি যা চাইছি, তা নেই। বইটা রেখে সবে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আপনারা এসে পাকড়াও করলেন আমাকে।'

'আর কিছু বলার আছে, না, এই-ই সব?' জিজ্ঞেস করে হপকিনস।

'না, আর কিছু বলবার নেই,' চোখ নামিয়ে নেয় তরুণটি।

'তাহলে আর কিছু বলার নেই তোমার?'

আমতা আমতা করতে থাকে নেলিগ্যান, 'না কিছুই আর বলার নেই।'

'গতরাতের আগে এখানে তুমি আসনি?'

'না।'

'তাহলে এ-জিনিসটা এল কোত্থেকে?' চিৎকার করে উঠে হপকিনস বহু ব্যবহারে জীর্ণ নোটবইটা বাড়িয়ে ধরে। রক্তের দাগ লাগা মলাটটা ওলটাতেই প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করতে থাকে বন্দি হপলি নেলিগ্যানের প্রথম অক্ষর তিনটে।

আত্মসংযমের শেষ শক্তিটুকু ব্যর্থ হয়। একেবারে ভেঙে পড়ে ছেলেটি। দু-হাতের তালুতে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু মনে হল তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহ ঘন ঘন কেঁপে উঠছে ভয়ে— উত্তেজনায়— শিহরনে।

গুঙিয়ে উঠল নেলিগ্যান, 'কোথায় পেলেন আপনি? আমি জানি না। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেছিলাম হোটেলে হারিয়েছি নোটবইটা।'

ইস্পাত-কঠিন স্বরে হপকিনস বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে। আর যা কিছু বক্তব্য তোমার আছে আদালতেই বলবে। আপাতত আমার সঙ্গে চলো পুলিশ-ফাঁড়ি পর্যন্ত। মি. হোমস, আপনাদের দুজনকেই আমার ধন্যবাদ জানাই এতদূর এসে আমায় সাহায্য করার জন্যে।'

'ওয়াটসন, গতিক বুঝছ কেমন?' পরের দিন সকালে লন্ডনে ফেরার পথে হোমস জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তো দেখছি— মোটেই সন্তুষ্ট হওনি তুমি।'

'আরে না, না, খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। তবে হপকিনসের পদ্ধতি-টদ্ধতিগুলো ঠিক মানতে পারছি না। হপকিনস আমায় হতাশ করেছে, ওয়াটসন। ওর কাছ থেকে আমি আরও ভালো জিনিস আশা করেছিলাম। অপরাধ সম্পর্কিত তদন্তের সর্বপ্রথম নিয়ম হচ্ছে— সবসময়ে বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা এবং তাকে কাজে লাগানো।'

'সেই বিকল্প সম্ভাবনাটা কী শুনি?'

'যে তদন্ত ধারা আমি নিজেই প্রথম থেকে ভেবে এসেছি— এক্ষেত্রে বিকল্প সম্ভাবনা একমাত্র সেইটাই। আমারও ভুল হতে পারে এবং তদন্ত শেষে হয়তো বৃহৎ শূন্য ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। কী হবে তা জানি না। তবু শেষ না-দেখে ছাড়ছি না আমি।'

বেকার স্ট্রিটে হোমস নামে কয়েকটা চিঠি এসে পড়ে ছিল। একটা চিঠি তুলে খুলেই বিজয়োল্লাসে হোমস তার চিরকেলে নিঃশব্দ হাসি হাসতে শুরু করে দিলে।

'চমৎকার, ওয়াটসন, চমৎকার। বিকল্প সম্ভাবনাই ঠিক হতে চলেছে। টেলিগ্রাম ফর্ম আছে নাকি? গোটা দুয়েক খবর বলছি, লিখে ফেল তো 'সামনার, শিপিং এজেন্ট র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে[৭]। কাল সকাল দশটায় তিনজন লোককে পাঠিয়ে দিন— বেসিল।' ও-অঞ্চলে আমার নাম বেসিল। আরেকটা লেখ : ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস ৪৬ লর্ড স্ট্রিট, ব্রিক্সটন। কাল সকাল সাড়ে ন-টায় ব্রেকফাস্টের সময়ে এসো। দরকারি। আসা সম্ভব না হলে টেলিগ্রাম পাঠাও— শার্লক হোমস।'

টেলিগ্রামের সময় অনুসারে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন-টায় ইনস্পেকটর হপকিনস এসে পৌঁছোল আমাদের টেবিলে। তোফা খানা বানিয়েছেন মিসেস হাডসন। খোশমেজাজে টেবিল সরগরম করে রাখল তরুণ গোয়েন্দা। বুঝলাম, সাফল্যের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে ওর অন্তর।

হোমস জিজ্ঞেস করে, 'হপকিনস, সত্যিই কি তুমি মনে কর যে তোমার সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই?'

'নিশ্চয় নেই, মি. হোমস। এর চাইতে নিখুঁত কেস আর দেখিনি।'

'আমার তা মনে হয় না। আসল সমাধানে এখনও তুমি পৌঁছোতে পারনি।'

'অবাক করলেন মি. হোমস। আর কী আশা করেন আপনি?'

'তোমার ব্যাখ্যা দিয়ে সবকটা জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া কি সম্ভব?'

'আলবাত সম্ভব। যেদিন ব্ল্যাক পিটার খুন হন, ঠিক সেদিন হোটেলে এসে ওঠে এই নেলিগ্যান ছোকরা। আরও খবর পেয়েছি, গল্‌ফ খেলার অছিলায় এ-অঞ্চলে কার আগমন। তার ঘরটা ছিল একতলায়, কাজেই যখন খুশি বাইরে বেরোতে পারত সে। সেই রাতেই ও উডম্যান'স লী-তে গিয়ে ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে দেখা করে আসে। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। হারপুনটা টেনে নামিয়ে ক্যাপ্টেনকে খুন করে সে। রক্ত দেখেই কিন্তু মাথা ঘুরে যায় তার। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘর ছেড়ে পালানোর সময়ে নোটবইটা ফেলে আসে ভেতরে। সিকিউরিটি তালিকা লেখা নোটবইটা সে এনেছিল পিটার ক্যারিকে জেরা করার জন্যে। আপনি হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, সংখ্যার ওপর টিক চিহ্ন দেওয়া আছে, কিন্তু বেশিরভাগ সংখ্যার পাশে কোনো চিহ্ন নেই। টিক চিহ্ন দেওয়া সিকিউরিটিগুলোই লন্ডনের বাজারে পিটার ক্যারি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বাকিগুলো নিশ্চয় তাঁর দখলে এখনও আছে, এই আশাতেই নেলিগ্যান এসেছিল তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। তার উদ্দেশ্য ছিল সিকিউরিটি পুনরুদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে বাবার পাওনাগণ্ডা যতদূর সম্ভব মিটিয়ে ফেলা। সেরাতে চম্পট দেওয়ার পর কয়েকদিন এমুখো হওয়ার সাহস তার হয়নি, তারপর ফিরে এসেছিল আরব্ধ কর্মের বাকিটুকু শেষ করতে। এর মধ্যে জটিলতাটা কোথায় বলুন, মি. হোমস? ঠিক এইরকম না হলেই বরং আশ্চর্য হতাম।'

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে হোমস বলে, 'হপকিনস, তোমার ব্যাখ্যায় কেবল একটা অসংগতি আমার চোখে লাগছে এবং তা হচ্ছে, তুমি যা বললে, তা অসম্ভব, একদম অসম্ভব। কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না-রেখে, বিলকুল অসম্ভব। হারপুন দিয়ে কোনো দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করার চেষ্টা কোনোদিন করেছ? করনি? ছিঃ ছিঃ এইসব খুঁটিনাটি জিনিসগুলো নিয়ে তোমার একটু মাথা ঘামানো উচিত। বন্ধুবর ওয়াটসনকেই জিজ্ঞেস কর না কেন পুরো একটা সকাল আমি ব্যয় করেছি হারপুন দিয়ে দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করার ব্যায়ামে। ব্যায়ামটা বড়ো সহজ নয় হে হপকিনস। খুব বলিষ্ঠ আর পাকা হাত ছাড়া এ-কাজ কারো পক্ষে সম্ভব? গভীর রাতে ব্ল্যাক পিটারের খুনি এমন জোরে হারপুন চালিয়েছে যে হাতিয়ারের মাথাটা দেওয়ালের মধ্যেও গেঁথে গেছে অনেকখানি। তোমার কি মনে হয় এই রক্তহীন ছেলেটার দেহে এ-রকম আসুরিক শক্তি থাকা সম্ভব? গভীর রাতে ব্ল্যাক পিটারের সাথে এক টেবিলে রাম আর জল খাওয়ার মতো সাহস কি তার আছে? তুমি বলতে চাও দু-রাত আগে জানলার পর্দায় এরই মুখের ছায়া ফুটে উঠেছিল?

না, হপকিনস, না, নেলিগ্যান নয়। আমাদের উচিত আরও ভয়ংকর কোনো লোকের সন্ধানে জাল ছড়ানো।'

হোমসের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্রমশ ভারী হয়ে ঝুলে পড়ছিল গোয়েন্দাপ্রবরের চোয়ালখানা। তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে বাস্তবিকই বড়ো অনুকম্পা হল আমার। বেশ বুঝলাম, একটু একটু করে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে তার আশা-উচ্চাশার অনেক কষ্টে গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধ। কিন্তু ভাঙবে, তবু মচকাবার পাত্র সে নয়। তাই আশ্রয় নেয় তর্কের।

'কিন্তু সেরাতে নেলিগ্যান ছোকরা যে খুনের দৃশ্যে হাজির ছিল, তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না, পারেন কি মি. হোমস? নোটবইটাই তার প্রমাণ। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আমার হাতে যেসব প্রমাণ এসেছে, তা জুরিদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। শেষ মুহূর্তে দু-একটা ছিদ্র আপনার চেষ্টায় বেরিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না তাতে। তা ছাড়া মি. হোমস, আমার থিয়োরি অনুযায়ী আসামিকে আমি পাকড়াও করেছি। কিন্তু আরও ভয়ংকর যার কথা বলছেন, সে কোথায়?'

'আমার তো মনে হচ্ছে সিঁড়ির ওপর তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' কঠোর স্বরে বলল হোমস। 'ওয়াটসন, রিভলভারটা এমন জায়গায় রাখ যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়।' বলে, উঠে গিয়ে কয়েক পঙ্‌ক্তি লেখা এক টুকরো কাগজ একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর রেখে ফিরে এল। 'সব ঠিক আছে, আমরা তৈরি।'

দরজার বাইরে কর্কশ গলায় কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দরজা খুলে গেল। মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকে জানালেন তিনজন লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'একে একে তাদের নিয়ে আসুন এ-ঘরে,' বললে হোমস।

প্রথমে যে-লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখলে আচারের আপেলের কথা মনে পড়ে। খর্বকায়। রক্ত ফেটে-পড়া লাল লাল গালের ওপর পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে সাদা একজোড়া জুলপি।

পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস শুধোল, 'কী নাম?'

'জেমস ল্যাঙ্কাস্টার।'

'ল্যাঙ্কাস্টার, আমি দুঃখিত। আর জায়গা নেই জাহাজে। মিছিমিছি কষ্ট দিলাম, তাই রইল এই আধ-গিনিটা। পাশের ঘরে মিনিট কয়েকের জন্যে অপেক্ষা করো।'

দ্বিতীয় দর্শনপ্রার্থী একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। শরীরের মধ্যে মেদ-মাংসের বালাই নেই। শুকনো চেহারা। মাথায় অল্প অল্প চুল। তোবড়ানো গাল। লোকটার নাম হিউ প্যাটিনস। তাকেও আধ গিনি দিয়ে বরখাস্ত করে অপেক্ষা করতে বলা হল পাশের ঘরে।

তৃতীয় জনের চেহারাখানা দেখার মতো। এক কথায়, অসাধারণ মূর্তি তার। রাশি রাশি চুল আর দাড়ির ফ্রেমে আঁটা বুল-ডগের মতো ভয়ংকর মুখ। ঝোপের মতো পুরু, কার্নিশের মতো বেরিয়ে আসা গুচ্ছ গুচ্ছ একজোড়া ভুরুর নীচে ঘন কালো গ্র্যানাইটের মতো কঠিন, জ্বলন্ত চোখের দীপ্তি। স্যালুট করে নাবিক-সুলভ কায়দায় দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে লাগল সে।

'তোমার নাম?' জিজ্ঞেস করে হোমস।

'প্যাট্রিক কেয়ার্নস।'

'হারপুনওয়ালা?'

'ইয়েস, স্যার, ছাব্বিশবার পাড়ি দিয়েছি সাগরে।'

'ডানডি,তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'অভিযান দলের জাহাজের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছ তো?'

'মাইনে কত?'

'মাসে আট পাউণ্ড।'

'আমি রাজি।'

'এই মুহূর্তে রওনা হতে পারবে?'

'আমার জিনিসপত্র পাওয়ামাত্র তৈরি হব আমি।'

'কাগজপত্র এনেছ?'

'ইয়েস, স্যার।' পকেট থেকে তেলতেলে জীর্ণ কতকগুলো ফর্ম বার করলে সে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল হোমস।

'তোমার মতো লোককেই চাইছিলাম আমি। ছোট্ট টেবিলটার ওপর শর্তলেখা কাগজটা আছে। তোমার সইটা হয়ে গেলে এদিককার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে যায়।'

ভারী ভারী পা ফেলে ঘরের ওদিকে গিয়ে কলমটা তুলে নিলে হারপুনওয়ালা প্যাট্রিক কেয়ার্নস।

তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এইখানেই সই করব তো?'

হোমস তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে দু-হাত গলিয়ে বললে, 'এইতেই হবে।'

কানে ভেসে এল ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকির কড়াৎ শব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গে বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল যেন এক খেপা ষাঁড়। পরমুহূর্তেই হোমস আর হারপুনওয়ালা দুজনে একসাথে গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়ে লোকটাকে দানব বললেও চলে। চোখের পলক ফেলার আগেই নিপুণ হাতে তার কবজিজোড়া হাতকড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল হোমস। তবুও ওই অবস্থাতেই সে ঘায়েল করে ফেলত হোমসকে যদি-না আমি আর হপকিনস দুজনেই ছুটে যেতাম তার সাহায্যে। মাথার ওপর রিভলভারের ঠান্ডা নলচেটা ঠেসে ধরতেই লোকটা বুঝলে ধস্তাধস্তি করে কোনো লাভই হবে না। দড়ি দিয়ে তার গোড়ালি দুটো বেঁধে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়ালাম তিনজন।

প্রসন্নস্বরে হোমস বলে, 'হপকিনস, আজকের অভিজ্ঞতা থেকে তুমিও একটা মস্ত জিনিস শিখলে। সেটা কী জানো? বিকল্প সিদ্ধান্তকে কখনো অবহেলা করবে না। তরুণ নেলিগ্যানকে নিয়ে তুমি এত মেতে উঠেছিলে পিটার ক্যারির আসল হত্যাকারী প্যাট্রিক কেয়ার্নস সম্পর্কে ভাববারও অবসর পাওনি।'

কথার মাঝেই হঠাৎ গমগম করে ওঠে হারপুনওয়ালার কর্কশ কণ্ঠ, 'এই যে, মিস্টার! আমাকে এভাবে নাজেহাল করার জন্যে কোনো অভিযোগ আমি জানাচ্ছি না। কিন্তু আপনি উলটোপালটা

কথা বলছেন বলে বাধা না-দিয়ে পারলাম না। আপনি বলছেন পিটার ক্যারিকে মেরে ফেলেছি আমি। কিন্তু আমি বলি তাকে ইচ্ছা করেই বধ করেছি আমি। তফাত শুধু এইটুকু। বিশ্বাস হওয়া-না-হওয়া আপনার অভিরুচি। কিন্তু এটুকু জেনে রাখুন আপনারা, আমি ধোঁকা দিচ্ছি না।'

'নিশ্চয় না, নিশ্চয় না'। বলে হোমস। 'বল না— এ-সম্পর্কে কী বলার আছে তোমার।'

'বলব তো বটেই এবং ঈশ্বরের দিব্যি— একটা অক্ষরও মিথ্যা বলব না। ব্ল্যাক পিটারকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তাই যে-মুহূর্তে ছুরি বার করেছে সে, আমিও পলক ফেলার আগেই হারপুনটাকে নামিয়ে এনে চালিয়ে দিয়েছি ওর বুকের মধ্যে দিয়ে। কেননা, এক মুহূর্ত দেরি করলে আমার অবস্থা যে কী হত, তা শুধু আমিই জানি। আপনি একে এবার খুন বলতে চান তো বলুন! ব্ল্যাক পিটারের ছুরি বুকে নিয়ে মরতাম, আপনাদের পাল্লায় পড়ে না হয় গলায় ফাঁস দিয়েই মরতে হবে।'

হোমস জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কী করে এলে তুমি?'

'তাহলে প্রথম থেকেই শুনুন। একটু তুলে বসিয়ে দিন আমায়— কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। এ-ঘটনাটা ঘটে ১৮৮৩ সালে, — অগাস্ট মাসে। "সী ইউনিকর্ন" জাহাজের কর্তা ছিলেন পিটার ক্যারি, আর আমি ছিলাম হারপুনওয়ালা। বরফের এলাকা পেরিয়ে এসে প্রবল ঝড় ঠেলে দেশে ফিরছিলাম আমরা। এমন সময় চোখে পড়ল ছোটো একটা জাহাজ। ঝড়ের দাপটে জাহাজটা ভেসে এসেছিল উত্তর দিকে। লোকজন বলতে শুধু একজনই ছিল জাহাজে— তাও সে নাবিক নয়। পাইলট নাকি জাহাজডুবি হওয়ার ভয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ডিঙি করে নরওয়ে উপকূলের দিকে সটকান দিয়েছিল। সমুদ্রের যা অবস্থা তখন, আমার তো বিশ্বাস ডিঙিসমেত সবাই ডুবে মরেছে— নরওয়ে পৌঁছোনো আর হয়নি। যাই হোক, পরিত্যক্ত ক্যাপ্টেনকে আমরা "সী ইউনিকর্ন"-এ তুলে নিলাম। কেবিনের ভেতরে তার সঙ্গে ব্ল্যাক পিটারের অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। ক্যাপ্টেনের মালপত্রের মধ্যে একটা টিনের বাক্সও ছিল। ভদ্রলোকের কী নাম, তা আমরা জানতাম না অর্থাৎ জানানো হয়নি। তবে, পরের দিন তাকে "সী ইউনিকর্ন"-এ দেখা গেল না। ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল সে। শোনা গেল ভদ্রলোক হয়তো নিজেই সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, আর না হয় ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে রেলিং টপকে ডেক থেকে পড়ে গেছে জলে। কিন্তু একজন জানত ক্যাপ্টেনের পরিণাম। সেই লোক আমি, নিজের চোখে দেখেছিলাম গভীর রাতে ক্যাপ্টেনের গোড়ালি বেঁধে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের বুকে। এ-কাণ্ড ঘটেছিল শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের আলো দেখতে পাওয়ার ঠিক দু-দিন আগে।

'এ-খবর কিন্তু আমি কাউকেই জানালাম না। ধৈর্য ধরে রইলাম কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় দেখার জন্যে। এ-ব্যাপার নিয়ে যা একটু কানাঘুসো হয়েছিল— স্কটল্যান্ডে এসে তাও ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হল অনায়াসেই। দুর্ঘটনায় যদি কোনো আগন্তুক মারা গিয়ে থাকে, তা নিয়ে খোঁজখবর করার কাজ আমাদের নয়। এর কিছুদিন পরেই সমুদ্রযাত্রা ছেড়ে দিল পিটার ক্যারি। তারও অনেক বছর পরে ঠিকানা পেলাম তার। আমার বিশ্বাস ওই টিনের বাক্সের মধ্যেকার জিনিসের জন্যই ক্যাপ্টেনকে খুন করেছিল পিটার ক্যারি। আর আমার মুখ বন্ধ রাখার মতো পয়সার তার অভাব হবে না বলেই হঠাৎ মনে হল আমার।

'ব্ল্যাক পিটারের এখানকার ঠিকানা পেয়েছিলাম একজন খালাসির খাছে। লন্ডনে দেখা হয়েছিল দুজনের। ঠিকানা অনুযায়ী এলাম তার কাছ থেকে কিছু দুয়ে নিতে। প্রথম রাতে তার কথাবার্তা শুনে আশা হয়েছিল আমাকে বাকি জীবনের মতো সমুদ্রযাত্রা যাতে আর না-করতে হয় তার জন্যে সে উপযুক্ত টাকা আমায় দেবে। স্থির হল, দু-রাত পর এ-বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হবে। এসে দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে। মেজাজও তিরিক্ষে। টেবিলে দুজনে বসে একসঙ্গে মদ খেলাম। পুরানো দিনের অনেক কথা হল। কিন্তু গেলাসের পর গেলাস খালি হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ওর চোখের দৃষ্টিটা আমার ভালো লাগল না। দেওয়ালের তাকে হারপুনটাকে দেখে রাখলাম তখনই। লড়তেই যদি হয়, খালি হাতে লড়ব না। যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। আচমকা থুতু ছিটিয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে মস্ত একটা ছুরি হাতে আমার দিকে তেড়ে এল ব্ল্যাক পিটার। কিন্তু খাপ থেকে ছুরিটা বার করারও সময় দিলাম না। হারপুন দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেললাম তাকে। উঃ সে কী বিকট চিৎকার। আজও ঘুমোলে লোকটার মুখ আমি ভুলতে পারি না। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে— তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ দেখে সাহস ফিরে পেলাম। এদিক-ওদিক তাকাতেই তাকের ওপর টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল। বাক্সটার ওপর পিটার ক্যারির অধিকার যতটা, আমারও অধিকার ততখানি। কাজেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়ার আগে তা নিতে ভুললাম না। কিন্তু আহাম্মক আমি, যাওয়ার সময়ে তামাকের থলিটা ফেলে গেলাম টেবিলের ওপর।

'এবার বলি শুনুন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ঘর থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম আমি। চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল একটা লোক। তারপরেই ভূত দেখলে মানুষ যেমন চিৎকার করে, তেমনি বিকট চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে নিমেষের মধ্যে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল সে। লোকটা কে এবং কীসের জন্যে চোরের মতো ও-রকমভাবে এল, তা আমি জানি না। সেই রাতেই দশ মাইল হেঁটে লন্ডনে পৌঁছোই আমি। পরে কী হয়েছে-না-হয়েছে, আর আমি জানি না।

'বাক্সটা খুলে তাজ্জব বনে গেলাম। টাকাকড়ির চিহ্ন নেই। শুধু একখানা কাগজ এবং যেসব কাগজ বিক্রি করার মতো সাহস আমার নেই। ব্ল্যাক পিটার খতম, আমার পকেটও খালি। একটা শিলিং নেই যে লন্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। এক সময়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম মোটা মাইনায় হারপুনার প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ শিপিং এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে তারা আমাকে পাঠিয়ে দিলে এখানে। এ ছাড়া আর আমি কিছু জানি না। কিন্তু আবার আমি বলছি, ব্ল্যাক পিটারকে যদি আমি বধ করে থাকি তবে আইনের কর্তাদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া। কেননা ওর জন্যে তাঁদের শণের দড়ির খরচটা আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'খাসা বিবৃতি, নিটোল রিপোর্ট' উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাতে ধরাতে বললে হোমস। 'হপকিনস, তোমার আসামিকে চটপট নিরাপদ জায়গায় সরানোর ব্যবস্থা কর। হাজত হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই এ-ঘরের। তা ছাড়া কার্পেটের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে রয়েছেন মি. প্যাট্রিক কেয়ার্নস।'

হপকিনস বলে, 'মি. হোমস, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।

আপনার ভেলকি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি আমি। বুঝতেই পারছি না কী কৌশলে এমন কাণ্ড করলেন!'

'শুরু থেকেই ঠিক সূত্রটি ধরে এগোনোর সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই এত সহজে সমাধান করতে পারলাম এই রহস্যের। নোটবইটার সূত্র যদি আগে শুনতাম, তাহলে তোমার মতো বিপথে চালিত হত আমার চিন্তাধারা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি যেটুকু শুনেছি, সেটুকু থেকেই নির্দেশ পেয়েছি শুধু একদিকেই এগোনোর। বিপুল শক্তি, হারপুন চালানোর নৈপুণ্য, র‍্যম আর জল, সীলমাছের চামড়া দিয়ে তৈরি তামাকের থলি আর তার ভেতর কড়া তামাক— প্রত্যেকটা পয়েন্টই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এমন একজন লোককে যার পেশা হারপুন চালানো আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো। তামাকের থলির ভেতরে লেখা 'PC' অক্ষর দুটো যে পিটার ক্যারির নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে দৈবাৎ মিলে গেছে, সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ, তার অভ্যাস ছিল না নিয়মিত ধূমপানের এবং তার কেবিনেও কোনো পাইপ পাওয়া যায়নি। তোমার মনে আছে কি একবার তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম কেবিনের মধ্যে হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি ছিল কি না? তুমি বলেছিলে— হ্যাঁ, ছিল। হুইস্কি-ব্র্যান্ডি থাকা সত্ত্বেও তা স্পর্শ না-করে র‍্যম আর জল খাওয়ার মতো রুচি ক-জন ডাঙার অধিবাসীর আছে বলতে পার? সমুদ্রের ওপর যাদের ঘরবাড়ি, এমন নেশা থাকে শুধু তাদেরই। সেইজন্যেই লোকটা যে জাহাজি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম আমি।

'কিন্তু তাকে খুঁজে বার করলেন কেমন করে?'

'মাই ডিয়ার স্যার, এ ক-টি তথ্য পাওয়ার পর তো খুবই সরল হয়ে এসেছিল আসল রহস্যটা। লোকটা যদি জাহাজি হয় তাহলে সে "সী ইউনিকর্ন"-এর খালাসি না হয়ে যায় না। "সী ইউনিকর্ন" ছাড়া আর কোনো জাহাজে সে সমুদ্র যাত্রা করেনি, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর ডানডীতে গত তিনদিন ধরে সমানে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলাম[৮]। তিনদিন পর জানতে পারলাম "সী ইউনিকর্ন" জাহাজে ১৮৮৩ সালে যেসব লোকলশকর ছিল তাদের প্রত্যেকের নামের লিস্ট। এই লিস্টে চোখ বুলোতে গিয়ে হারপুনওয়ালা প্যাট্রিক কেয়ার্নস-এর নাম দেখেই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল আমার গবেষণা। নিজের মনের সঙ্গেই তর্কবিতর্ক করে দেখলাম, লোকটা নিশ্চয় এখন লন্ডনেই আছে এবং এদেশ ছেড়ে পালাবার সুযোগ পেলে সে ছাড়বে না। তাই কয়েকটা দিন 'ইস্ট এন্ড'-এ কাটিয়ে উত্তর মেরু অভিযানের একটা গল্প ছড়িয়ে দিলাম ও-অঞ্চলে। তারপর ক্যাপ্টেন বেসিলের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্যে লোভনীয় বেতনে হারপুনওয়ালার বিজ্ঞাপন দিলাম দৈনিকে। দেখতেই তো পাচ্ছ, তার ফলাফল।'

'ওয়ান্ডারফুল।' সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে হপকিনস, 'ওয়ান্ডারফুল!'

হোমস বলে, 'যত তাড়াতাড়ি পার নেলিগ্যানকে খালাস করার ব্যবস্থা করো তুমি। ছেলেটার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়াও উচিত। টিনের বাক্সও তাকে ফিরিয়ে দেবে অবিলম্বে। অবশ্য যে সিকিউরিটিগুলো ব্ল্যাক পিটারের ভোগে লেগেছে, সেগুলো আর ফিরে পাওয়ার আশা না-করাই ভালো। গাড়ি এসে গেছে, হপকিনস। লোকটাকে এবার নামানোর ব্যবস্থা করো। মামলা চলার সময়ে আমাকে দরকার হলে নরওয়েতে[৯] চিঠি লিখো— আমি আর ওয়াটসন দুজনেই থাকব সেখানে— পুরো ঠিকানা পাঠাব ফিরে।'

টীকা

১. **তিমি শিকারির বুকে হারপুন :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্ল্যাক পিটার' ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যার কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় এবং মার্চ ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **ক্যাপ্টেন বেসিল :** এই নাম ছাড়া শার্লক হোমসের আরও কয়েকটি ছদ্মনাম হল কল মিস্তিরি অ্যাসকট (চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন), অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিস্টার হ্যারিস (স্টক ব্রোকার্স ক্লার্ক), গুপ্তচর অ্যালটামন্ট (হিজ লাস্ট বাও), নরউইজিয় পর্যটক সিগারসন (দ্য এম্পটি হাউস)। এ ছাড়া নামহীন বহু ছদ্মবেশ শার্লক হোমস ধারণ করেছেন অন্য অনেক কাহিনিতে।

৩. **গোটা পাঁচেক খুদে আস্তানা :** কিছু গবেষক অনুমান করেন, এগুলির মধ্যে একটি হল শার্লকের দাদা মাইক্রফটের বাড়ি।

৪. **স্যান পাওলো :** যেহেতু এই নামে বাস্তব কোনো দেশ বা শহর না-থাকায় আর্জেন্টিনা এবং কোস্টারিকার সঙ্গে উচ্চারিত এই নামটি ব্রেজিলের শহর সাও পাওলো হওয়া সম্ভব বলে মনে করেছেন কোনো কোনো গবেষক। ১৮৮০-তে কফি চাষের উন্নতির পর থেকে এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন বাড়তে শুরু করে।

৫. **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে :** আমেরিকার প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ। মন্ট্রিল থেকে ভ্যাঙ্কুভারের পোর্ট মুডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথের মূল লাইন নির্মাণ শেষ হয়েছিল ১৮৮৫ সালে।

৬. **নিকারবোকার :** হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের 'ব্রিচেস' জাতীয় পাতলুন। ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর গ্রন্থ 'আ হিস্ট্রি অব নিউইয়র্ক ফ্রম দ্য বিগিনিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড টু দি এন্ড অব দ্য ডাচ ডাইনেস্টি' গ্রন্থের কাল্পনিক চরিত্র ডিডরিশ নিকারবোকার-এর নাম থেকে এর উদ্ভব। ১৮০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থের ইলাসট্রেটর জর্জ ক্রুকশ্যাঙ্ক-এর আঁকা ছবিতে ডাচদের দেখা গিয়েছিল এই ধরনের পোশাক পরিহিত অবস্থায়। এক সময়ে ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত সকলকেই 'নিকারবোকার' নামে অভিহিত করা হত।

৭. **র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে :** লন্ডনে টেমস নদীর সমান্তরালে অবস্থিত, দোকানপাট, অফিস প্রভৃতিতে ভরতি ব্যস্ত রাস্তা র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ের উল্লেখ শার্লক হোমস করেছিলেন 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসে।

৮. **সমানে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলাম :** হোমস টেলিফোন করলে সময় বাঁচত, মনে করেন অনেক গবেষক। হয়তো হোমসের নিজের ফোন ছিল না, কিন্তু 'দ্য সাইন অব ফোর' উপন্যাসে জানা যায়, বেকার স্ট্রিটের বাড়ির উলটোদিকে একটি ব্যবহারযোগ্য টেলিফোন ছিল।

৯. **নরওয়েতে :** এত জায়গা ছেড়ে হোমস হঠাৎ নরওয়েতে কেন গেলেন? নেলিগ্যানও নরওয়ে অভিমুখে রওনা হয়েছিল— সেই বিষয়ে তদন্ত করতে?

ভাংচি দেওয়ার ভয়ংকর কাহিনি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন]

অভ্যাসমতো উদ্দেশ্যবিহীন সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম হোমস আর আমি। কুয়াশা-ঘন, হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধ্যা। ছ-টা নাগাদ ঘরে ফিরে হোমস বাতিটা জ্বালতেই আলো গিয়ে পড়ল টেবিলের উপর রাখা একটা ভিজিটিং কার্ডের ওপর। একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে কার্ডটাকে সে পরম ঘৃণাভরে কণ্ঠে বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে ফেলে দিলে দূরে মেঝের ওপর। কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে :

চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন,
অ্যাপেলডোর টাওয়ারস,
হ্যাম্পস্টেড।[২]

এজেন্ট।

'লোকটা কে হে?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'লন্ডনের জঘন্যতম লোক।' আগুনের সামনে বসে পড়ে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল হোমস। 'কার্ডের পেছনে কিছু লেখা আছে নাকি?'

উলটে ধরে পড়লাম, 'সন্ধ্যা ছ-টায় আসছি— সি. এ. এম.।'

'হুম! আসার সময়ও হয়ে এল দেখছি। চিড়িয়াখানার[৩] সাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিলবিলে, হড়হড়ে, পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত প্রাণীগুলোর কালো মৃত্যুর মতো চকচকে চোখ আর কুটিল, চেপটা মুখের দিকে তাকালে তোমার গা শিরশির করে না? আপাদমস্তক রি-রি করে ওঠে না অপরিসীম ঘৃণায়? সারাজীবনে পঞ্চাশজন খুনির সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা লড়েছি আমি, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বদ লোকটার নাম শুনলেও আমার এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগে না, যতটা হয় এই লোকটার নাম শুনলে। ওর ছায়া মাড়াবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। তবুও ব্যাবসার খাতিরে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না-করে আমার উপায় নেই— কেননা, সত্যি বলতে কী, আমার আমন্ত্রণ রাখতেই আজকে সে আসছে এখানে।'

'কিন্তু লোকটা কে, তা তো বললে না?'

'বলছি ওয়াটসন বলছি। দুনিয়ার যত ব্ল্যাকমেলারের নাম শুনেছি, তাদের সম্রাট বলা যায় চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনকে। যে-পুরুষ এবং যে-নারীর গূঢ় খবর আর সামাজিক মানসম্মান মিলভারটনের হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, ভগবান তাঁদের রক্ষে করুন। ঠোঁটের কোণে অম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে অথচ মার্বেল পাথরের মতো কঠিন হৃদয় নিয়ে শোষণ শুরু হয়, যতক্ষণ-না শুধু ছিবড়েটুকু অবশিষ্ট থাকে। লোকটার প্রতিভা আছে এবং শোষণ-বিদ্যায় তার একটা পাণ্ডিত্য থাকার ফলে এ-জাতীয় অন্য যেকোনো ব্যাবসায় সে প্রথিতযশা হতে পারত। ওর পদ্ধতি এইরকম : সুকৌশলে সে সবাইকে জানিয়ে দেয়, বিত্ত বা খ্যাতির জীবনে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের জীবনের গূঢ় তথ্য লেখা কোনো চিঠি অতি উচ্চ মূল্যে কিনতে সে প্রস্তুত। খাসকামরার বিশ্বাসঘাতক চাকর বা ঝি-রাই শুধু এ ধরনের চিঠি তার কাছে পাঠায় না, স্নেহ-ভালোবাসার আস্থা অর্জন করে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এমন ভদ্র-বদমাশরাও অর্থের লোভে ভরিয়ে তোলে মিলভারটনের চিঠির ঝাঁপি। এদিক দিয়ে মোটেই ব্যয়কুণ্ঠ নয় সে। আমি জানি, দু-লাইনে লেখা একটা চিরকুটের জন্যে একজন পেয়াদাকে সে সাতশো পাউন্ড দাম দিয়েছিল, আর তার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছিল একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাজারে হেন খবর নেই যা মিলভারটনের কাছে যায় না, তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরও জমা পড়ে তার দপ্তরের খাতায়— তাই এ-শহরের শত শত লোক তার নাম শুনলেও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কবে কোথায় কীভাবে যে তার মরণ-টিপুনি শুরু হবে, তা কেউ জানে না। কেননা দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা তার নয়, অর্থের যেমন তার অভাব নেই, তেমন অভাব নেই কূটবুদ্ধিরও। ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে হাতের তাস হাতেই রেখে বছরের পর বছর শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে সে। তারপর যখন বোঝে চড়া বাজি জেতার সময় এসেছে, তখন

ছাড়ে তার হাতের তাস। তোমাকে তো বললামই, লন্ডনের জঘন্যতম লোক হল এই মিলভারটন। সাধারণ দুর্বৃত্তের সঙ্গে এর তুলনা হয় না, কেন জানো? রক্ত গরম হয়ে গেলে মারপিট, খুন-জখম করা এক জিনিস, আর ধীরেসুস্থে হিসেবমতো অবসর সময়ে মানুষের দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলে বিপর্যয় ডেকে এনে পরিপুষ্ট টাকার থলিকে আরও পুষ্ট করার প্রচেষ্টা আর এক জিনিস।'

বন্ধুবরকে এ-রকম তীব্র আবেগ-থর-থর ভাষায় কথা বলতে আমি খুব অল্পই দেখেছি।

বললাম, 'কিন্তু আইনের আওতায় কি সে পড়ে না?'

'পড়ে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো মূল্যই নেই। ধর, এক মহিলার সর্বনাশ আসন্ন। সে সময়ে মিলভারটনকে কয়েক মাসের জন্যে শ্রী-ঘরে পাঠিয়ে তাঁর কোনো লাভ তো হচ্ছেই না, বরং মিলভারটন জেলে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তাঁরও সর্বনাশ হচ্ছে সম্পূর্ণ। এইজন্যেই তার শিকাররা পালটা ঘা দিতে সাহস পায় না। নির্দোষ লোককে দোহন করার চেষ্টা করলে অবশ্য ফলাফল হত অন্যরকম। কিন্তু এদিক দিয়ে পাকা শয়তানের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি তার। না হে, না, ওর সঙ্গে লড়তে গেলে অন্য পন্থা ভাবতে হবে আমাদের।

'এমন লোককে এখানে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

'কারণ, এক স্বনামধন্য মহিলা মক্কেল তাঁর কেস দিয়েছেন আমার হাতে। কেসটা শুনলে সত্যিই করুণা হয়, ওয়াটসন। গত মরসুমে প্রথম আবির্ভাবেই সেরা সুন্দরী হিসাবে যিনি নাম করেছেন, ইনিই সেই লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েল। দিন পনেরোর মধ্যেই আর্ল অফ ডোভারকোর্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। ভদ্রমহিলার অবিবেচকের মতো লেখা কয়েকটি চিঠি এসে পড়েছে এই পিশাচটার খপ্পরে। অবিবেচক ছাড়া কী আর বলব, ওয়াটসন। চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের এক বিত্তহীন সম্ভ্রান্ত যুবককে। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পক্ষে চিঠিগুলো যথেষ্ট। মোটা টাকা না-পেলে মিলভারটন ওগুলো পাঠিয়ে দেবে আর্লের কাছে। আমার ওপর ভার পড়েছে তার সঙ্গে দেখা করে যতদূর সম্ভব ভালো শর্তের ভিত্তিতে বিষয়টার ফয়সালা করার।'

ঠিক সেই মুহূর্তে খটাখট শব্দের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনলাম নীচে রাস্তার ওপর। তাকিয়ে দেখি, জমকালো একটা জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়ে নীচে। জোরালো বাতি দুটোর আলো ঠিকরে পড়ছিল ঘোড়া দুটোর অপূর্ব-সুন্দর গাঢ় লালচে বাদামি রঙের পালিশ-করা কাঁধের ওপর থেকে। একজন পেয়াদা দরজা খুলে ধরলে এবং খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট এক পুরুষ নেমে এল নীচে। লোকটার গায়ে রাশিয়ান অ্যাসট্রাখান অঞ্চলের লোমশ চামড়ার ওভারকোট। এক মিনিট পরেই ঘরে ঢুকল সে।

চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। ধীমান পুরুষের মতো মস্তবড়ো সুগঠিত মাথা। গোলগাল, মাংসল, শ্মশ্রুবিহীন মুখ। ঠোঁটের কোণে যেন ফ্রেমে-বাঁধানো অষ্টপ্রহরের হিমশীতল হাসি। আর চওড়া সোনার চশমার পেছনে একজোড়া তীক্ষ্ণ ধূসর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি। লোকটার হাবভাবে মি. পিকউইক[৪]-সুলভ হিতৈষণার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন ছদ্মবেশেও সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে— ফ্রেমে-আঁটা নকল হাসি আর অশান্ত, অন্তর্ভেদী চোখের সুকঠিন ঝিকিমিকির জন্যে। কণ্ঠস্বর মুখের মতোই মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঢুকেই হৃষ্টপুষ্ট হাত বাড়িয়ে বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ এগিয়ে এল সে।

হাতটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গ্র্যানাইট কঠিন মুখে হোমস তাকালে তার দিকে। ছড়িয়ে

পড়ল মিলভারটনের হাসি। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিমায় দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে। তারপর পরম যত্নে ভাঁজ করে চেয়ারের পেছনে রেখে আসন গ্রহণ করে।

'এ-ভদ্রলোকের সামনে কথাবার্তা বলা যাবে তো?' আমার দিকে ইঙ্গিত করে বসে সে।

'ডাক্তার ওয়াটসন আমার বন্ধু এবং পার্টনার।'

'বেশ, বেশ, মিস্টার হোমস। আপনার মক্কেলের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই বললাম এ-কথা। একটা দুরূহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা—'

'ডাক্তার ওয়াটসন এ-সম্বন্ধে আগেই সব শুনেছেন।'

'তাহলে সরাসরি কাজের কথাই হোক। আপনি বলছেন, লেডি ইভার তরফে আলোচনা করবেন আপনি। আমার শর্ত মেনে নেওয়ার অধিকারও নিশ্চয় তিনি আপনাকে দিয়েছেন?'

'আপনার শর্ত কী, তাই বলুন।'

'সাত হাজার পাউন্ড!'

'আর, যদি তা না-দেওয়া যায়?'

'মাই ডিয়ার স্যার, আমার পক্ষে সে-আলোচনা বড়োই বেদনাদায়ক। কিন্তু ১৪ তারিখে টাকা না-দিলে ১৮ তারিখে যে বিয়ে হবে না এ-বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।' লোকটার অসহ্য হাসি আগের চাইতেও খুশিখুশি হয়ে ওঠে। ক্ষণকাল চিন্তা করে হোমস।

তারপর বলে, 'এমন অসম্ভব শর্ত আরোপ করছেন আপনি যে, তা মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবশ্য আমিও ওয়াকিবহাল। আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেও দ্বিধা করবেন না লেডি ইভা। কাজেই আমি তাঁকে বলব ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলে তাঁর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল মিলভারটন।

'আপনি দেখছি, আর্লকে একেবারেই চেনেন না।'

হোমসের মুখে পরাজয়ের চিহ্ন দেখে পরিষ্কার বুঝলাম, আর্লকে চিনতে তারও বাকি নেই। শুধোয় ও, 'চিঠিগুলোয় এমন কী ক্ষতিকর কথা আছে?'

মিলভারটন জবাব দেয়, 'বেজায় চনমনে চিঠিগুলো— প্রাণরসে ভরপুর। আপনি যদি মনে করেন, এ-পত্রগুচ্ছ আর্লের হাতে সমর্পণ করলেই আপনার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা পাবে, তখন না হয়, তাই করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে এই সামান্য লিপিকা ক-টা ফিরিয়ে আনার জন্যে এতগুলো টাকা জলে দেওয়াও আপনাদের পক্ষে বোকামো।' বলে দাঁড়িয়ে উঠে ভেড়ার চামড়ার লোমশ কোটে হাত দিল সে।

রাগে অপমানে ছাইয়ের মতো পাঙাশ হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

'সবুর। ধীরেসুস্থে কাজ করা দেখছি আপনার ধাতে নেই। এ-রকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কোনোরকম কেলেঙ্কারি যাতে না-ছড়ায়, সে-বন্দোবস্ত যেভাবেই হোক আজ আমাদের করতে হবে।'

আবার আসন গ্রহণ করে মিলভারটন। বলে, 'আমি জানতাম, এদিকটাও ভাবেন আপনি।'

হোমস বলে চলে, 'লেডি ইভা খুব ধনবতী নন। দু-হাজার পাউন্ড দেওয়া মানেই তাঁর স্বল্প বিত্তের প্রায় সবটুকুই দিয়ে দেওয়া— আপনার দাবিমতো সাত হাজার পাউন্ড দেওয়ার ক্ষমতা

তো তাঁর একেবারেই নেই। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি অত চড়া দাম না-হেঁকে ওই দু-হাজারেই চিঠিগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বিশ্বাস করুন, দু-হাজারের বেশি একটা কপর্দক দেওয়ার ক্ষমতাও লেডি ইভার নেই।'

আর একটু ছড়িয়ে পড়ে মিলভারটনের হাসি— দুই চোখে ঝিকমিক করে ওঠে কৌতূহলের আলো।

'লেডি ইভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা বললেন, তা আমার অজানা নয়। তবে কী জানেন, একটা বিষয় আপনি স্বীকার করবেন যে, যেকোনো মহিলার জীবনে তাঁর বিয়ের লগ্নটিই হল সর্বোত্তম ক্ষণ। এ সময়ে তাঁর প্রতিটি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তাঁর জন্যে কিছু-না-কিছু করার আগ্রহ রাখে। মামুলি উপহার দেওয়াটা অনেকেরই মনঃপূত হয় না। তাই বলছিলাম, লন্ডনের সেরা শামাদান আর মাখন-ভরা ডিশ উপহার দিয়ে যতটা আনন্দ পাওয়া যাবে, তার চাইতেও বহুগুণ তৃপ্তি পাওয়া যাবে সামান্য এই পত্রগুচ্ছটি দিলে।'

হোমস উত্তর দিলে, 'যা বললাম, তা সত্য। আপনার দাবিমতো অত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তই বলছিলাম, ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আপনার যখন কোনো লাভই হবে না, তখন যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'ভুল করলেন, মিস্টার হোমস, ভুল করলেন। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে, আমার লাভ বই লোকসান হবে না। এক্ষেত্রে লাভটা অবশ্য হবে পরোক্ষভাবে এবং তা নিতান্ত সামান্য নয়। বর্তমানে আট-দশটা এই ধরনের কেস হাতে রেখে পাকাচ্ছি— শুধু সুযোগ বুঝে কোপ মারার জন্যে! একগুঁয়েমির কী কঠোর শাস্তি লেডি ইভাকে আমি দিয়েছি, এ-খবর তাদের মধ্যে একবার ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। এ-নজির যে একবার শুনবে, বেয়াড়াপনা করার কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারবে না সে। আমার পয়েন্টটা বুঝেছেন তো?' পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে দেখতে দেখতে বললে মিলভারটন।

বিদ্যুতের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গেল হোমস।

'ওর পেছনে যাও, ওয়াটসন। বেরোতে দিয়ো না ঘর থেকে। ঠিক আছে। এবার, মশাই, দেখান তো আপনার ওই নোটবইতে আর কী কী আছে?' ইঁদুরের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের ধারে পিছলে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল মিলভারটন।

'মিস্টার হোমস! মিস্টার হোমস!' বলতে বলতে কোটের সামনের দিকটা আমাদের দিকে ফেরাতেই চোখে পড়ল ভেতরের পকেট থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা বড়ো রিভলভারের কুঁদো। 'আমিও আশা করেছিলাম, এইরকম ধরনের মৌলিক একটা কিছু না-করে ছাড়বেন না। এ-রকম কাণ্ড প্রায়ই হয় তো, কিন্তু করে কিছু লাভ হয় কি? আরে মশাই, আপনার বোঝা উচিত ছিল সশস্ত্র না-হয়ে কোথাও যাই না আমি। এবং দরকার হলে, গুলি চালাতেও মোটেই দ্বিধা করব না। আইনের সমর্থন যে আমি পাব, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তা ছাড়া চিঠিসমেত নোটবই এখানে আনব, এ-রকম ভ্রান্ত ধারণা আপনার কী করে হল বুঝছি না। এ-রকম নিরেট মূর্খের মতো কাজ আমি কখনো করি না। যাই হোক, এবার তো আমায় যেতে হয়, জেন্টলমেন। আজ রাতেই আরও দু-একটা ছোটোখাটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। হ্যাম্পস্টেডে ফিরে যেতেও অনেকটা সময় লাগবে।' এক-পা এগিয়ে এসে কোটটা তুলে নিল

'ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে থাকা রিভলভারের কুঁদোটা পরীক্ষা করছে।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

মিলভারটন। তারপর রিভলভারের ওপর হাত রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আমি একটা চেয়ার তুললাম, কিন্তু হোমস মাথা নাড়তে রেখে দিলাম যথাস্থানে। বাতাসে মাথা ঠুকে মৃদু হাসল মিলভারটন, দুই চোখ নেচে উঠল কৌতুকে। তারপরেই বিদায় হল সে। কয়েকমুহূর্তে পরেই দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম এবং পরক্ষণেই গড় গড় শব্দে দূর হতে দূরে উধাও হয়ে গেল তার জুড়ি।

ট্রাউজারের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে, বুকের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে, অপলক চোখে জ্বলন্ত অঙ্গারের পানে তাকিয়ে অনড় দেহে বসে রইল হোমস। পুরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নীরব, নিশ্চল হয়ে ডুব দিয়ে রইল ও চিন্তার অতলে। তারপরেই, যেন উপায় স্থির হয়ে গেছে, এমনিভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেল শোয়ার ঘরে। একটু পরেই ছোকরা বয়েসের এক

লম্পট মজুর হেলে-দুলে ফতোবাবুর মতো ঘরে ঢুকল। ছাগল-দাড়ি নেড়ে বাতির শিখায় মাটির পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। যাবার আগে বলে গেল, 'ওয়াটসন, আমার ফিরতে দেরি হবে।' রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার কৃশ মূর্তি। বুঝলাম, চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের বিরুদ্ধে শুরু হল তার অভিযান। কিন্তু তখন আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি অভিযানের অন্তে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে আমাদের।

বেশ কয়েকদিন ধরে এই বেশেই আসা যাওয়া করল হোমস। সে হ্যাম্পস্টেডে যায় এবং সময়টা ভালোই কাটছে সেখানে— এ ছাড়া আর কোনো মন্তব্য শুনলাম না তার মুখে। কাজেই, কী যে করছে ও, তা জানতাম না। তারপর, একদিন এক দুরন্ত ঝড়ের রাতে বাড়িতে ফিরে এল হোমস। হাহাকার শব্দে দরজা-জানলায় মাথা খুঁড়ে ফিরে যাচ্ছিল দুরন্ত হাওয়া। এই তার শেষ অভিযান। ছদ্মবেশ খসিয়ে আগুনের ধারে পা ছড়িয়ে বসে, অভ্যাসমতো আপন মনে নিঃশব্দে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল বন্ধুবর।

'ওয়াটসন, যদি বলি আমি বিয়ে করতে চলেছি, তাহলে নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না?'

'নিশ্চয় না।'

'শুনে চমকে যাবে ভায়া! আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে।'

'মাই ডিয়ার হোমস! অভিনন্দন...'

'মিলভারটনের বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে।'

'সর্বনাশ! কী বলছ হোমস?'

'আরে ভাই, আমার খবরের দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু সেজন্যে তো অনেক দূর গড়িয়েছ দেখছি!'

'এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার নাম এসকট। জলের পাইপ, সিসটার্ন ইত্যাদি বসানো এবং মেরামত করাই আমার ব্যাবসা এবং তা দিন-দিন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে আমি হাওয়া খেয়েছি আর কথা বলেছি এন্তার। কী মুশকিল, সেসব কথা তো বলাও যায় না। যাকগে, আমার যা যা দরকার, সবই পেয়ে গেছি। আমার হাতের তালুর সঙ্গে আমার যতখানি পরিচয়, ঠিক ততখানি জেনে গেছি মিলভারটনের বাড়ির খুঁটিনাটি।'

'কিন্তু হোমস, মেয়েটা?'

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বললে, 'মাই ডিয়ার ওয়টসন, অত ভাবতে গেলে কি চলে? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বাজি যেরকম থাকবে, হাতের তাসও ফেলবে সেইভাবে, তাই নয় কি? ভালো কথা, আরও একটা আনন্দের খবর আছে। অভিসার-পর্ব করতে গিয়ে আমার এক প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়ে ফেলেছি। পেছন থেকে আমায় পেলেই লোকটা নির্ঘাত গলা কেটে ছাড়বে। ওঃ, কী চমৎকার রাত্রি।

'আজকের আবহাওয়া তোমার ভালো লাগছে?'

'আমার কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী আজকের আবহাওয়া। ওয়াটসন, আজ রাতেই মিলভারটনের বাড়িতে সিঁদ দিতে চাই আমি!'

সান্ধ্য-পোশাক পরলাম হোমস আর আমি। দেখলে মনে হবে যেন থিয়েটার দর্শনান্তে গৃহে ফিরছেন দুই ভদ্রলোক। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে হ্যাম্পস্টেডের একটা ঠিকানায়

এসে পৌঁছোলাম। গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলাম এখানে। দারুণ ঠান্ডা পড়েছিল, কনকনে হাওয়ার ঝাপটায় মনে হচ্ছিল যেন বরফের ছুরি কেটে কেটে বসে যাচ্ছে মাংসের মধ্যে। ওভারকোটের বোতাম এঁটে নিলাম! তারপর ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম গন্তব্যস্থানের দিকে।

হোমস বললে, 'আজকের কাজটা একটু বিশেষ রকমের দুরূহ। হিসেবি বা হুঁশিয়ার না হলে সাফল্য অসম্ভব। মিলভারটনের পড়ার ঘরে একটা সিন্দুকের মধ্যে থাকে এই দলিল-দস্তাবেজগুলো। পড়ার ঘরটা আবার তার শোবার ঘরের লাগোয়া একটা ঘর। কিন্তু আমাদের একটা সুবিধে আছে। নাদুসনুদুস খর্বকায় লোকেরা যখন টাকার কুমির হয়, তখন তাদের যে অসুস্থ অভ্যাসটি থাকে, মিলভারটনেরও তা আছে। অর্থাৎ বেজায় ঘুমকাতুরে লোকটা। আমার প্রেমিকা আগাথার কাছে শুনলাম, চাকর মহলে সবাই নাকি এ নিয়ে হাসাহাসি করে। একবার ঘুমোলে হল, সে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর ক্ষমতা আর কারো নেই। মিলভারটনের কাজকর্ম দেখবার জন্যে একান্ত অনুগত একজন সেক্রেটারি আছেন। সে ভদ্রলোকও সারাদিন পড়ার ঘর ছেড়ে এক পাও নড়েন না। আমাদের নৈশ অভিযান সেই কারণেই। এরপর লোকটার একটা বাঘা কুকুর আছে— সারারাত বাগানে টহল দেওয়া তার কাজ। গত দু-রাতে আগাথার সঙ্গে দেখা করার সময়ে সে চাবি দিয়ে রেখেছিল কুকুরটাকে— কাজেই নির্বিঘ্নে যেতে আসতে পারছি আমি। এই যে, এই বাড়িটা, বাগানওলা এই বড়ো বাড়িটা। ফটক দিয়ে ঢুকে পড়— এবার ডাইনে মোড় নিয়ে দাঁড়ানো যাক লরেল ঝোপের মধ্যে। মুখোশগুলো এখানেই লাগিয়ে নেওয়া যাক, কি বল? লক্ষ করেছ, কোনো জানলা দিয়েই আলোর এতটুকু রশ্মি দেখা যাচ্ছে না। চমৎকার প্ল্যান, যেমনটি আশা করা গেছিল, ঠিক তেমনটিই হচ্ছে দেখছি।'

কালো সিল্ক দিয়ে মুখ ঢাকার পর আমাদের দেখতে হল দু-দুটো অতি-ভয়ংকর নিশাচর প্রাণীর মতো। মার্জারের মতো নিঃশব্দ চরণে নিস্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝিমিয়ে পড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম দুজনে। একদিকে দেখলাম, টালির ছাউনি দেওয়া একটা বারান্দায় সারি সারি অনেকগুলো জানলা আর দুটো দরজা।

ফিসফিস করে ওঠে হোমস, 'ওইটাই ওর শোবার ঘর। দরজা খুলতেই পড়ার ঘর। সবচেয়ে ভালো হত এই দরজাটা খুলতে পারলে, কিন্তু দরজার ওদিকে শুধু ছিটকিনি নয়, তালাও লাগানো আছে। কাজেই এদিক দিয়ে ঢুকতে গেলে শব্দ-টব্দ একটু বেশিই হবে! এসো ঘুরে যাওয়া যাক। ওদিকে একটা কাচের তৈরি গাছপালা রাখার গ্রিন-হাউস আছে। তার ভেতর দিয়ে বসার ঘরে যাওয়া যায়।'

সেখানেও তালা লাগানো। কিন্তু কাচের একটা গোল চাকতি কেটে ফেলে হাত গলিয়ে ভেতর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দিলে হোমস। পরমুহূর্তে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে সে এবং ঠিক তখন থেকেই আইনের চোখে গুরু অপরাধ করা শুরু হল আমাদের। সংরক্ষণশালার ভারি উষ্ণ বাতাসে আর বিদেশ থেকে আনা রকমারি চারাগাছের দম-আটকানো সৌরভে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমাদের। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাত চেপে ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল হোমস। গুল্মের কিনারা দিয়ে যাওয়ার সময় পাতাগুলো ঘষটে যেতে লাগল মুখের ওপর। বহুদিনের সযত্ন অভ্যাসে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখবার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল হোমস। একহাতে আমার হাত আঁকড়ে, অপর হাতে একটা দরজা খুললে সে। মনে হল, যেন একটা মস্ত ঘরে

ঢুকেছি; এবং একটু আগেই কেউ সেখানে সিগার খেয়ে গেছে। আসবাবপত্রের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গেল হোমস, আর একটা দরজা খুলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদিকে। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর আমি হাত বাড়াতেই দেওয়াল থেকে ঝোলানো কতকগুলো কোটে হাত ঠেকল। বুঝলাম, যাতায়াতের পথে অর্থাৎ প্যাসেজে এসে পড়েছি। প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হোমস অতি সন্তর্পণে ডান দিকের একটা দরজা খুলে ধরলে। সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎবেগে একটা প্রাণী ধেয়ে এল আমাদের পানে, আর আমার হৃৎপিণ্ডটাও ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝলাম, প্রাণীটা চতুষ্পদ এবং একটা নিরীহ বেড়াল, তখন ইচ্ছে হল জোরে হেসে উঠি। এ-ঘরে আগুন জ্বলছিল চুল্লিতে এবং এখানেও মন্থর বাতাসে ভাসছিল তামাকের ঘন ধোঁয়া। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল হোমস। আমি ভেতরে এলে পরে, খুব আলতোভাবে বন্ধ করে দিলে দরজাটা। এইটাই মিলভারটনের পড়ার ঘর। অপর প্রান্তে একটা পর্দা ঝুলতে দেখে বুঝতে কষ্ট হল না যে শোবার ঘরের প্রবেশপথ সেটা।

জোরালো আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত ঘরটা। দরজার কাছে চক চক করছিল একটা বৈদ্যুতিক সুইচ। আগুনের আলো থাকায় সুইচ টেপার আর দরকার হল না। আগুনের চুল্লির একপাশে দেখলাম একটা ভারী পর্দা, বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে বাইরের দিকে ঠেলে বেরোনো যে-জানলাটা দেখেছিলাম, এ-পর্দা যে সেই জানলাকেই ঢেকে রেখেছে, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। চুল্লির আর একদিকে ছিল একটা দরজা। বাইরে থেকেই দেখেছি, এ-দরজা খুলেই বারান্দায় পা দিতে হয়। ঘরের ঠিক কেন্দ্রে একটা ডেস্ক আর চকচকে লাল চামড়া-মোড়া ঘুরন্ত চেয়ার। বিপরীত দিকে দেখলাম, মস্তবড়ো একটা বুককেস। ওপরে রয়েছে জ্ঞানের দেবী এনেথের মার্বেল পাথরের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। কোণের দিকে বইয়ের আলমারি আর দেওয়ালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একটা লম্বা, সবুজ রঙের সিন্দুক। আগুনের আলো ঠিকরে পড়ছিল তার পালিশ করা তামার হাতলের ওপর থেকে। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে একবার দেখে নিলে হোমস। তারপর পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় কাত করে কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। কোনোরকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। ইতিমধ্যে আমি ভাবলাম, বাইরের দিকে দরজা দিয়ে উধাও হওয়ার ব্যবস্থাটাও আগে থেকে সম্পূর্ণ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই দরজাটা পরীক্ষা করতে গেলাম আমি। গিয়ে তো অবাক। দরজায় তালাও নেই— বাইরে থেকে একটু ঠেলা মারলেই খুলে যায়! হোমসের বাহু স্পর্শ করতেই সে মুখোশপরা মুখ ফিরিয়ে তাকালে দরজার দিকে। তাকিয়ে চমকে উঠল, দেখলাম, আমার মতো আশ্চর্য হয়ে গেছে সে।

কানের গোড়ায় মুখ এনে ফিসফিস করে ওঠে হোমস, 'গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার, চুলোয় যাক, নষ্ট করার মতো সময় আর নেই।'

'আমার কিছু করার আছে?'

'আছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তুমি। কাউকে আসতে শুনলেই ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিয়ো। তখন যে-পথে এসেছি, সেই পথেই সটকান দেব আমরা। যদি উলটো দিক থেকে কেউ আসে, তাহলে কাজ শেষ হয়ে গেলে বারান্দার দরজা দিয়ে সরে পড়ব, আর না হলে, এই পর্দাটার আড়ালে লুকোব। বুঝছ তো?'

ঘাড় কাত করে জানালাম, বুঝেছি। তারপর দাঁড়ালাম দরজার সামনে। প্রথম প্রথম একটু ভয়-ভয় করছিল সত্যি, কিন্তু এখন সে-ভয় কেটে গেছিল। বরং সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত তীব্র উল্লাসে। যতদিন আইনের রক্ষক ছিলাম, কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারিনি, এ-জাতীয় আনন্দ-শিহরন, সেরাতে সেই প্রথম আইনের ভক্ষক হওয়ার পর আস্বাদ পেলাম তার। অভিযানের মহান উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের ক্রূর চরিত এবং এ-কাজে যে নিঃস্বার্থ আর রমণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে বিরচিত, এই টানটান জ্ঞানের সঙ্গে এসে মিশেছিল অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় স্পোর্টসম্যানসুলভ তীব্র আগ্রহ। অপরাধ-সচেতন হওয়া দূরে থাকুক, বিপদের সম্ভাবনা যতই ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, ততই অসহ্য আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠেছিল আমার প্রতিটি লোমকূপ। যন্ত্রপাতির চামড়ার কেসটা খুলে ফেলল হোমস। তারপর দুরূহ অপারেশন করার আগে সার্জেন যেমন ধীর শান্ত, বিজ্ঞানীসুলভ নিপুণ হাতে একটার পর একটা যন্ত্র বেছে তুলে নেয়, ঠিক তেমনি অভ্যস্ত সতর্কতায় তৎপর হয়ে উঠল সে। সিন্দুক খোলা যে তার বিশেষ শখ, তা জানতাম। তাই এ-রকম একটা দানব-সিন্দুকের সামনাসামনি হয়ে সে যে আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্য কী; সিন্দুক তো নয়; যেন সোনালি আর সবুজ রঙের একটা ড্রাগন, যার জঠরে সঞ্চিত রয়েছে কত সুন্দরী মহিলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার উপাদান। কোটের হাতা গুটিয়ে নিয়েছিল হোমস— ওভারকোটটাকে খুলে রেখেছিল চেয়ারের ওপর। পূর্ণোদ্যমে শুরু হল কাজ। দুটো ছ্যাঁদা করার ড্রিল, একটা সিঁধকাঠি আর কয়েকটা খাঁজহীন চাবি বার করে রাখল সে। অতর্কিত বিপদের জন্যে তৈরি থেকে মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি তাকাতে লাগলাম, একবার এদিকে আর একবার ওদিকে। অবশ্য কেউ এসে পড়লে আমাদের করণীয় কী, সে-বিষয়ে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রায় আধঘণ্টা তন্ময় হয়ে রইল হোমস, নিবিড় উৎসাহ নিয়ে একটার পর একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে ট্রেনিং পাওয়া কারিগরের মতো বেশ শক্ত আর নিপুণ হাতে কাজ করে চলল সে। অবশেষে শুনলাম, একটা ক্লিক শব্দ, চওড়া সবুজ দরজা ঘুরে গেল কবজার ওপর, ভেতরে দেখতে পেলাম অনেকগুলি কাগজের প্যাকেট। প্রত্যেকটা প্যাকেট সুতো দিয়ে বাঁধা, সিলমোহর করা এবং ওপরে নাম-ধাম সংখ্যা লেখা। একটা প্যাকেট হোমস তুলে নিলে, কিন্তু আগুনের চঞ্চল আলোয় ওপরের লেখা পড়া সম্ভব হল না। ইলেকট্রিক আলো জ্বালাও বিপজ্জনক, কেননা পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে মিলভারটন স্বয়ং। তাই, চোরা-লণ্ঠনটা ঢেকে আনল সে। তারপরেই আচম্বিতে থমকে গেল। উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনল এবং পরমুহূর্তেই সিন্দুকের পাল্লা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়ে কেসটা তুলে নিলে। দ্রুতহাতে যন্ত্রপাতি কোটের পকেটে ঠেসে নিয়ে তিরবেগে লুকিয়ে পড়ল জানলার পর্দার পেছনে। যাবার সময়ে আমাকেও সরে আসতে বললে ইঙ্গিতে।

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পরেই শব্দ শুনতে পেলাম। তীব্র অনুভূতি দিয়ে অনেক আগেই এ-শব্দ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে গেছিল হোমস। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল। অনেক দূরে যেন দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা। তারপর শুনলাম অস্পষ্ট, চাপা গজগজানির পরেই থপ থপ— কে যেন অতি দ্রুত কিন্তু মেপে মেপে পা ফেলে এগিয়ে আসছে এদিকে। ঘরের বাইরের প্যাসেজে এসে গেল থপ থপ শব্দটা।... তারপর থমকে গেল দরজার সামনে। খুলে গেল দরজা। সুইচ টেপার খটাস শব্দ— দপ করে জ্বলে ওঠে ইলেকট্রিক আলো।

আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কড়া সিগারেটের কটু গন্ধ ভেসে এল নাসারন্ধ্রে। তারপর আমরা, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার কয়েক গজের মধ্যেই পায়ের শব্দ ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে লাগল ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। এরপর থেমে গেল পদশব্দ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ শুনলাম চেয়ারে। তালাতে চাবি লাগানোর ক্লিক শব্দ এবং কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার খস খস আওয়াজ। এতক্ষণে উঁকি মারার সাহস আমার হয়নি। এবার বুক ঠুকে পর্দাজোড়া সামান্য ফাঁক করে তাকালাম বাইরে। কাঁধের ওপর হোমসের কাঁধের চাপ পড়ায় বুঝলাম, হোমসও উঁকি মারার লোভ সামলাতে পারেনি। ঠিক সামনে আমাদের নাগালের মধ্যেই একটা চওড়া, গোলাকার পিঠ— আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে স্বয়ং মিলভারটন। বুঝলাম, আগাগোড়া তার গতিবিধির হিসেব করতে ভুল করেছি আমরা। শোবার ঘরে একেবারেই আসেনি সে। ধূমপান করার বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এতক্ষণ বসে ছিল, ঘরটা বাড়ির দূরপ্রান্তে হওয়ায় আলোকিত জানলাগুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। চোখের একেবারে সামনেই দেখছিলাম ওর চ্যাটালো, ধূসর মাথা আর চকচকে টাক। দু-পা টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে লাল-চামড়ামোড়া চেয়ারের পেছনে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল ও— মুখ থেকে কোণ করে বেরিয়ে ছিল লম্বা কালো একটা সিগার। পরনে ধূমপান করার সময়ে পরার উপযুক্ত কারুকার্য করা আধা-সামরিক স্মোকিং-জ্যাকেট; জ্যাকেটের রং ফরাসি দেশের ক্ল্যারেট মদের মতো লাল, কিন্তু কলারটা কুচকুচে কালো। মখমলের। একহাতে আইন-সংক্রান্ত একটা দীর্ঘ দলিল নিয়ে অলসভাবে পড়ছিল সে, আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটার পর একটা ধোঁয়ার বলয় ছুড়ে দিচ্ছিল শূন্যে। আয়েশ করে জাঁকিয়ে বসার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল না, খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করার ইচ্ছে আছে তার।

অন্ধকারের মাঝে অনুভব করলাম, আলতো করে আমার হাত ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিলে হোমস। পরিস্থিতি যে এখনও তার আয়ত্তের বাইরে যায়নি এবং এখনও নিরুদ্‌বেগ তার অন্তর, সুতরাং আমারও উচিত সাহসে বুক বাঁধা— এই কথাগুলোই যেন হাত ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইল ও। কিন্তু আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, তা নিশ্চয় সে দেখতে পায়নি। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে তা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করায়, সিন্দুকের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এবং যেকোনো মুহূর্তে তা মিলভারটনের চোখে পড়তে পারে। কাজেই মনে মনে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। যে-মুহূর্তে বুঝব মিলভারটন দেখতে পেয়েছে আধ-বন্ধ দরজাটা এবং শক্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ, সেই মুহূর্তেই গোপন স্থান থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে আমার ওভারকোটটা ওর মাথার ওপর ছুড়ে দিয়ে জাপটে ধরে কাবু করে ফেলব তাকে, তারপর যা করার সে হোমসই করবে। কিন্তু একবারও চোখ তুলে তাকালে না মিলভারটন। অলস মন্থর ভঙ্গিমায় পাতার পর পাতা উলটে চলল। বুঝলাম, নিবিড় আগ্রহে আইনবিদের যুক্তিস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ও। ভেবেছিলাম, দলিলটা পড়া শেষ এবং হাতের সিগার পুড়ে ছাই হলে শোয়ার আয়োজন করবে সে। কিন্তু এ দুটোর একটারও অন্তে পৌঁছোনো হল না। তার আগেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা এবং আমাদের চিন্তাধারাও আচমকা গতি পরিবর্তন করে ছুটল সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক খাতে!

বেশ কয়েকবার মিলভারটনকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছিলাম আমি। একবার তো

অধীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। রাতদুপুরে যে তার সঙ্গে কারো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে, এ-ধারণা একেবারেই মাথায় আসেনি আমার। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা মৃদু শব্দ ভেসে এল আমার কানে। কাগজপত্র ডেস্কের ওপর ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল মিলভারটন। আবার শোনা গেল শব্দটা, তারপরেই দরজার ওপর আলতোভাবে টোকা মারার আওয়াজ। দাঁড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলে মিলভারটন।

কেন, আমাদের তা দেখার দরকার নেই। নিয়তির দণ্ড নেমে এসেছে।

তারপর ত্বরিত স্বরে বললে, 'প্রায় আধঘণ্টার মতো দেরি হয়েছে তোমার।'

অর্গল-মুক্ত দরজা আর মিলভারটনের রাত্রি জাগরণের অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। স্ত্রীলোকের বেশভূষার মৃদু খসখস শব্দ শোনা গেল! মিলভারটন আমাদের দিকে ফিরতে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। এবার সাহস করে আবার ফাঁক করে উঁকি মারলাম বাইরে।

আবার আসন গ্রহণ করেছিল মিলভারটন। আগের মতোই সিগারটাকে আলগোছে ধরে রেখেছিল ঠোঁটের কোণে— ডগাটা মুখ থেকে কোণ করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। তার ঠিক সামনে, বিদ্যুৎ-বাতির প্রখর আলোয়, দাঁড়িয়ে ছিল ছিপছিপে লম্বা চেহারার একটি কালোবরণ স্ত্রীলোক। অবগুণ্ঠনে ঢাকা তার মুখ, চিবুক থেকে ঝুলছিল বৈধব্য-সূচক আলখাল্লা। ঘন ঘন এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বইছিল তার এবং নমনীয় বরতনুর প্রতিটি ইঞ্চি কেঁপে কেঁপে উঠছিল প্রবল আবেগে।

মিলভারটন বললে, 'মাই ডিয়ার, রাতের বিশ্রাম তো আমার নষ্ট করে দিলে। যাই হোক, ঘুম না-হওয়ার উপযুক্ত মূল্য আশা করি তুমি দিতে পারবে। অন্য কোনো সময়ে তোমার আসা সম্ভব হয় না বুঝি?'

ঘাড় নাড়ল স্ত্রীলোকটি।

'বেশ বেশ, না আসতে পারলে এসো না। কাউন্টেসের শাসন যদি এতই কড়া বলে মনে কর তো তাঁকে শায়েস্তা করার এই হল সুযোগ। কী মুশকিল, আরে মেয়েটা, এত কাঁপছে কেন? ঠিক আছে, এই তো চাই। সামলে নাও নিজেকে! এবার এসো কাজের কথা কিছু হোক।' ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা চিরকুট বার করল মিলভারটন, 'তুমি লিখেছ এমন পাঁচখানা চিঠি তোমার হাতে এসেছে যা কাউন্টেস দ্য আলবার্টকে সংকটে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। চিঠিগুলো বিক্রি করতে চাও তুমি! আর আমি চাই কিনতে! এ পর্যন্ত কোনো ঝামেলা নেই। এখন শুধু দামটা করে নেওয়া। চিঠিগুলো আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। নমুনা যদি সত্যি সত্যিই ভালো হয়, —কী সর্বনাশ, আপনি?'

একটি কথাও না-বলে অবগুণ্ঠন তুলে ফেলেছিল স্ত্রীলোকটি, চিবুকের ওপর থেকে আলখাল্লাও খসে পড়েছিল বুকের ওপর। মিলভারটনের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম যাঁকে, তাঁর বর্ণ মলিন হলেও তিনি সুশ্রী; সুগঠিত মুখে হুকের মতো বেঁকানো নাক, ঘন কালো ধারালো ভুরু-যুগল, ঝকমকে কিন্তু সুকঠিন একজোড়া চোখ, আর অবঙ্কিম পাতলা অধরোষ্ঠে সর্বনাশা হাসি।

চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা, 'হ্যাঁ, আমি। যার জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জ্বেলেছেন, আমিই সেই মেয়েটি।'

বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলাটি— পাতলা অধরোষ্ঠে খেলা করতে লাগল সেই ভয়ানক বিষাক্ত হাসি।

'আমার জীবন যেভাবে ধ্বংস করেছেন, সেভাবে আর কোনো জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে পারবেন না। আমার বুক যেভাবে ভেঙেছেন, সেভাবে আর কারো বুকে আপনি আপনার শেল হানতে পারবেন না। পৃথিবীর বুক থেকে আমি মুছে দেব একটা অতি বিষাক্ত বস্তুর অস্তিত্ব। এই নাও কুকুর কোথাকার, আর একটা! — আর একটা!— আর একটা!'

বুকের মধ্যে থেকে একটা চকচকে খুদে রিভলভার বার করে মিলভারটনের দেহের ওপর একটার পর একটা ঘর খালি করে চললেন মহিলাটি— নলচেটা রইল মিলভারটনের শার্ট থেকে দু-ফুটের মধ্যেই। কুঁচকে সরে এল সে, উপুড় হয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, আর ভীষণভাবে কাশতে লাগল কাগজগুলো আঁকড়ে ধরে। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েই আর একটা গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। 'শেষ করে ফেলল আমায়!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে— পরক্ষণেই নিস্পন্দ হয়ে গেল তার দেহ। নিবিষ্ট চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলাটি, তারপর চিত হওয়া মুখের ওপর রগড়ালেন জুতোর হিল। আবার তাকালেন, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। জোরালো খস খস শব্দ শুনলাম, হুহু করে রাতের হাওয়া ঢুকে পড়ল উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে, আর উধাও হয়ে গেলেন প্রতিহন্তা বাইরে অন্ধকারে[৬]।

আমরা চেষ্টা করলেও লোকটার অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাতে পারতাম না। কিন্তু যখন মহিলাটি গুলির পর গুলি ছুড়ে যাচ্ছিলেন মিলভারটনের কুঁচকানো দেহের মধ্যে তখন আমি লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে গেছিলাম, কিন্তু হোমস হিমশীতল কঠিন হাতে আমার কবজি চেপে ধরে আটকে রাখলে। ওর ওই দৃঢ় মুঠির অর্থ বুঝলাম আমাকে সংযত রাখার পেছনে তার যুক্তিনির্ভর বিতর্ক। যে অবস্থাই হোক না কুচক্রী শয়তানের, আমাদের আসার উদ্দেশ্য অন্য এবং চোখের সামনে যাই হোক না কেন, কর্তব্য ভুললে চলবে না। মহিলাটি ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেগে বেরোতে, হোমস দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে পৌঁছোল অন্য দরজায়। চাবি ঘুরিয়ে তালা এঁটে দিলে সে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে কণ্ঠস্বর আর ধাবমান পায়ের শব্দ শুনলাম। গুলি ছোড়ার আওয়াজে জেগে উঠেছে বাড়ির প্রত্যেকে। ধীর শান্ত অবিচল হাতে সিন্দুকটা খুলে ফেললে হোমস, দু-হাতে একবোঝা চিঠির তাড়া নিয়ে ফেলে দিলে আগুনে। আবার ফিরে এল সে। আবার নিলে একটা বোঝা— ফেলে দিলে আগুনে। কয়েকবারের চেষ্টাতেই শূন্য হয়ে গেল সিন্দুকের উদর। বাইরে থেকে কে দরজার হাতল ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল। চকিত চোখে চারিদিকে দেখে নিলে হোমস। মিলভারটনের মৃত্যুদূত চিঠিটা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিল টেবিলের উপর। সেটাও দাউ দাউ আগুনে ফেলে দিয়ে এল হোমস। তারপরেই বাইরের দরজা থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে আমার সাথে বেরিয়ে এসে, বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে তালা এঁটে দিলে। 'এদিকে গেলেই বাগানের দেওয়াল টপকাতে পারব।'

এত তাড়াতাড়ি যে সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠবে, তা নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আলোয় আলোয় ঝলমল করছে এতবড়ো বাড়িটা। সামনের দরজা খোলা— কয়েকজন লোক ছুটছিল বাগানের পথে। বহু লোকের হাঁকডাকে সাড়া পড়ে গেছিল বাগানে। আমরা যেই বারান্দা থেকে বেরিয়েছি, একজন তো

'পাকড়াও, পাকড়াও' করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল পিছু পিছু। সমস্ত বাগানটা যেন হোমসের নখদর্পণে। একটা ছোটো চারাগাছের খেতের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে তিরবেগে এগিয়ে চলল সে, আমি আঠার মতো লেগে রইলাম তার পেছনে, আর পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে সমানে ছুটতে লাগল আমাদের অনুসন্ধানকারী। তারপরেই গতি রুদ্ধ হয়ে গেল ছ-ফুট উঁচু একটা পাঁচিলের সামনে। হোমস কিন্তু অবলীলাক্রমে লাফিয়ে উঠে পড়ল ওপরে এবং পরক্ষণেই নেমে পড়ল ওপাশে, আমিও লাফিয়ে উঠে পড়লাম ওপরে এবং পরক্ষণেই নেমে পড়ল ওপাশে, আমিও লাফিয়ে উঠে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে পেছন থেকে ছিনেজোঁকের মতো লোকটা সজোরে আঁকড়ে ধরলে আমার গোড়ালি। লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁকপাঁক করে কোনোরকমে উঠে পড়লাম ঘাসে-ঢাকা ওপরের অংশে, পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে পড়লাম ওদিকে একটা ঝোপের মধ্যে। পলকের মধ্যে আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে হোমস এবং দুজনে টেনে দৌড়োলাম 'হ্যাম্পস্টেড হীথ'-এর বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। প্রায় মাইল দুয়েক ছোটার পর হোমস দাঁড়িয়ে গিয়ে কানখানা খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। নিথর নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে ছিল পেছনকার পথ। ছিনেজোঁকের মতো পিছু নেওয়া লোকটার চোখে শেষ পর্যন্ত ধুলো দেওয়া গেছে এবং আবার আমরা নিরাপদ।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভের পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সমাপনান্তে প্রাভাতিক পাইপে ধূমপান করছি, এমন সময়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড খুব গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন মুখে আমাদের বসার ঘরে ঢুকল।

'সুপ্রভাত, মিস্টার হোমস, সুপ্রভাত। খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?'

'তোমার কথা শোনার মতো সময় আছে।'

'হাতে যদি বিশেষ কোনো কাজ না-থাকে, তাহলে একটা অত্যন্ত আশ্চর্য তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন, এই আশায় এসেছিলাম। গত রাতে হ্যাম্পস্টেডে ঘটেছে এই ঘটনাটা।'

'সর্বনাশ! কী ব্যাপার শুনি?' বলে হোমস।

'খুন— অত্যন্ত নাটকীয় এবং আশ্চর্য রকমের খুন। আমি জানি এসব ব্যাপারে কতখানি উৎসুক আপনি। তাই বলছিলাম, দয়া করে যদি অ্যাপলডোর টাওয়ারে আপনার পায়ের ধুলো দিয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শের সুযোগ নিতে দিতেন আমাদের, তাহলে বাস্তবিকই অনুগৃহীত হতাম। খুনটা মোটেই সাধারণ নয়। এই মিলভারটন লোকটার ওপর বেশ কিছুদিন নজর রেখেছিলাম আমরা। আপনাকেই শুধু বলছি, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে অনেক কাগজপত্র নাকি ও রেখে দিত নিজের কাছে। এই ধরনের সব কাগজই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। মূল্যবান কোনো জিনিসই খোয়া যায়নি। সুতরাং আমাদের অনুমান, আততায়ীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ এবং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এ ধরনের সামাজিক কেলেঙ্কারি বন্ধ করা।'

'আততায়ীরা!' চেঁচিয়ে ওঠে হোমস, 'বহুবচন!'

'হ্যাঁ। দুজন এসেছিল। আর একটু হলেই হাতেনাতে ধরাও পড়ত। পায়ের ছাপ পেয়েছি, চেহারার বর্ণনা পেয়েছি এবং পিছু নিয়ে তাদের পাকড়াও করাও খুব অসম্ভব হবে না। প্রথম

লোকটা একটু বেশি রকমের চটপটে। দ্বিতীয় লোকটার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরেছিল বাগানের মালি— সামান্য ধস্তাধস্তি করেই পগার পার হয়ে যায় সে। মাঝারি আকারের, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা লোকটার— চৌকো চোয়াল, পুরু ঘাড়, গোঁফ আছে এবং চোখ দুটো ঢাকা ছিল কালো মুখোশে।'

শার্লক হোমস বলে ওঠে, 'খুবই অস্পষ্ট বর্ণনা। আরে, ওয়াটসনের চেহারাও তো ওইরকম!'

বেশ কৌতুক অনুভব করে ইনস্পেকটর। বলে, 'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। বর্ণনার সঙ্গে ডক্টর ওয়াটসনের চেহারাই খাপ খেয়ে যাচ্চে।'

হোমস বললে, 'লেসট্রেড এযাত্রা তোমাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না আমার। ব্যাপার কি জান, মিলভারটন লোকটাকে আমিও জানতাম। লন্ডনের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকদের মধ্যেই তাকে স্থান দিয়েছিলাম আমি এবং আমি মনে করি, এমন কতকগুলো অপরাধ আছে সংসারে আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই, প্রকারান্তরে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অনুমোদন করা যায় এসব ক্ষেত্রে। না, না তর্ক করে লাভ নেই। আমার মন স্থির হয়ে গেছে। নিহতের জন্যে নয়, হত্যাকারীদের জন্যে রইল আমার সহানুভূতি এবং এ-কেসে আমি নাক গলাব না।'

যে শোচনীয় দৃশ্য চোখের সামনে দেখলাম, সে-সম্বন্ধে হোমস আমাকে একটা কথা বলেনি। কিন্তু সারাটা সকাল তাকে খুবই চিন্তামগ্ন দেখলাম। শূন্যগর্ভ দৃষ্টি আর নিবিড় তন্ময়তা দেখে মনে হল সে যেন একাগ্র মনে হারিয়ে যাওয়া কিছুকে স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করছে। লাঞ্চ খেতে বসে অর্ধেক এগিয়েছি, এমন সময়ে আচমকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। তারপরই চিৎকার, 'সর্বনাশ! পেয়েছি! টুপি নাও! এসো আমার সঙ্গে।' লম্বা লম্বা পা ফেলে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ও বেকার স্ট্রিট পেরিয়ে এসে অক্সফোর্ড বরাবর গিয়ে পড়ল রিজেন্ট সার্কাসে। এখানে বাঁ-দিকের একটা দোকানের জানলায় সাজানো ছিল ওই সময়কার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি আর সুন্দরীদের ফটোগ্রাফ। হোমসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একটা ছবির ওপর। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখলাম রানির মতো গরবিনি এক মহিলার ফটোগ্রাফ। পরনে রাজসভার পরিচ্ছদ, সুগঠিত মাথায় মস্ত বড়ো হিরের টায়রা। আভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়ছিল তার সর্ব অঙ্গে, হুকের মতো সুচারু বঙ্কিম নাকে, ধারালো ভুরুযুগলে, পাতলা অধরোষ্ঠে, আর ছোটো কিন্তু দৃঢ় থুতনিতে। তারপরেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল আমার। যুগ যুগ ধরে সম্মানিত সুপ্রাচীন উপাধিটা দেখেই বুঝলাম কার স্ত্রী ছিলেন ইনি। অভিজাতমহলে কুলে-মানে শ্রেষ্ঠ এই সম্ভ্রান্ত রাজনীতিবিদের নাম কে-না জানে। হোমসের চোখে চোখ রাখতেই ও ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে আমাকে নিয়ে সরে এল জানলার সামনে থেকে।

টীকা

১. **ভাংচি দেওয়ার ভয়ঙ্কর কাহিনি** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন' ২৬ মার্চ ১৯০৪ সংখ্যার কলিয়ার্স ম্যাগাজিনে এবং এপ্রিল ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১০-এ রচিত 'দ্য স্পেকলড ব্যান্ড' নাটকে আর্থার কন্যান ডয়াল এই ব্ল্যাকমেলার চরিত্রটিকে রেখেছিলেন।

২. **হ্যাম্পস্টেড :** বর্তমানে ক্যামডেনের অন্তর্গত বসবাসের এলাকা। এখানকার বিখ্যাত বাসিন্দাদের মধ্যে জন কিটস, কার্ল মার্কস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৩. **চিড়িয়াখানা :** বেকার স্ট্রিটের টিউব রেলস্টেশনের এক মাইলের কম দূরত্বে রিজেন্ট পার্কের একাংশে লন্ডনের চিড়িয়াখানা অবস্থিত। জিয়োলজিকাল সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৮ সালে এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. **মি. পিকউইক :** চার্লস ডিকেন্স রচিত উপন্যাস, ১৮৩৭-এ প্রকাশিত, 'দ্য পিকউইক পেপার্স'-এর প্রধান চরিত্র, সরল, সাদাসিধে, ধর্মভীরু মানুষ, মি. পিকউইক।

৫. **অনেক দূর গড়িয়েছে :** কত দূর? একেবারে গভীরতম শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত? আশঙ্কা করেছেন ডেভিড গেলারস্টিন, রিচার্ড আশার, ডি. মার্টিন ডেকিন প্রমুখ গবেষক।

৬. **উধাও হয়ে গেলেন প্রতিহন্তা বাইরে অন্ধকারে :** বাইরের ওই পথে পালাতে গিয়ে হোমস এবং ওয়াটসনকে পার হতে হয়েছিল ছয় ফুট পাঁচিল। ভিক্টোরীয় যুগের বেশবাসে ওই মহিলা নিশ্চয়ই সে-পথে যাননি। তাহলে কোন পথে পালালেন তিনি? প্রশ্ন তুলেছিলেন হোমস গবেষক ডি. মার্টিন ডেকিন।

কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয়[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়ন্স]

প্রায় সন্ধ্যাতেই আমাদের ঘরে আসতেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড।

সেদিন সন্ধ্যাতেও খবরের কাগজ আর আবহাওয়া সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার পর চুপচাপ বসে ছিল লেসট্রেড। আনমনা ও চিন্তামগ্ন মুখে সিগার টানছিল অনেকক্ষণ ধরে। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে হোমস জিজ্ঞাসা করে, 'জবর খবর আছে মনে হচ্ছে?'

লেসট্রেড বলল, 'ধরেছেন ঠিকই মি. হোমস, বাস্তবিকই বড়ো চিন্তায় পড়েছি। আমার মনে হয়, এটা আমাদের আওতায় না-এসে ডক্টর ওয়াটসনের এক্তিয়ারেই আসা উচিত।'

'অসুখবিসুখ নাকি?' শুধোলাম আমি।

'উন্মত্ততাই বলতে পারেন। তাও আশ্চর্য রকমের খেপামো। আপনি কি মনে করেন আজও আমাদের সমাজে প্রথম নেপোলিয়নের ওপর তীব্র ঘৃণা নিয়ে লোকে বেঁচে আছে এবং তাঁর যা প্রতিমূর্তি পাচ্ছে, তাই ভেঙে চুরমার করে ফেলছে?'

হেলান দিয়ে বসল হোমস। বলল, 'এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

'যা বলেছেন। আমার মতও তাই। এ নিয়ে আমিও মোটেই মাথা ঘামাতাম না যদি না লোকটা পরের মূর্তি চুরি করে ভাঙা শুরু করত। চুরিচামারি শুরু হতেই পুলিশের টনক নড়েছে, মানে নড়াতে বাধ্য করেছে।'

'চুরিচামারি?' আবার সিধে হয়ে বসে হোমস। 'বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে তো! তাহলে সব খুলেই বলো লেসট্রেড।'

নোটবুক বার করে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিলে লেসট্রেড।

তারপর বলল, 'প্রথম ঘটনাটা ঘটে আজ থেকে ঠিক চারদিন আগে মর্স হাডসনের দোকানে। দোকানটা কেনিংটন রোডে। মূর্তি আর ছবি ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি হয় না সেখানে। সেদিন

সামান্যক্ষণের জন্যে সামনের দরজা ছেড়ে ভেতর দিকে গেছল কাউন্টারের কর্মচারী— হঠাৎ দমাস শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে কি নেপোলিয়নের একটা মূর্তি চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। কাউন্টারের ওপর আরও অনেকগুলো মূর্তির সাথে এ-মূর্তিটাও সাজানো ছিল।

'সময় নষ্ট না-করে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না। কয়েকজন অবশ্য বললে যে একটা লোককে তিরবেগে দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে যেতে দেখেছে তারা, সে-লোকটাকে যে কী করে চিনে বার করা যাবে, সে-রকম নিশানা তারা দিতে পারল না।

'সবাই ভাবলে নিশ্চয় কোনো নচ্ছার লোকের বিটলেমো। এ-রকম বদমাইশি তো হামেশাই হচ্ছে এ-শহরে। কাজেই এই সামান্য বিষয় নিয়ে আর মাথা না-ঘামিয়ে বীটের কনস্টেবলকে জানানো হল খবরটা। তাদের কর্তব্য শেষ হল ওইখানেই। কেননা, মাত্র কয়েক শিলিং দামের সস্তা একটা প্লাস্টারের ছাঁচ ভাঙা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু না। কাজেই, এ নিয়ে আর জোরালো তদন্তের প্রয়োজন কেউ মনে করেনি।

'দ্বিতীয় ঘটনাটা কিন্তু আরও আশ্চর্য রকমের এবং এত সহজে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কাল রাতের ব্যাপার।

'কেনিংটন রোডে মর্স হাডসনের দোকানের শ-খানেক গজের মধ্যে ডা. বার্নিকট থাকেন।

'ডা. বার্নিকট নেপোলিয়নের দারুণ ভক্ত এবং চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়িতেও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন রাশি রাশি বই, ছবি আর দুষ্প্রাপ্য জিনিস, বলা বাহুল্য সবই সম্রাট নেপোলিয়ন সংক্রান্ত। কিছুদিন আগে মর্স হাডসনের দোকান থেকে তিনি দুটি প্লাস্টারের ছাঁচ কেনেন। একই ছাঁচ থেকে তৈরি দুটি মূর্তিতে শিল্পী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল নেপোলিয়নের বিখ্যাত আবক্ষ রূপটুকু। ভাস্কর একজন ফরাসি। নাম— ডিভাইন[২]।

'ডা. বার্নিকট একটি মূর্তিকে রেখেছিলেন তাঁর কেনিংটন রোডের হল ঘরে। আর একটি লোয়ার ব্রিক্সটনের সার্জারিতে ম্যান্টলপিসের ওপর।

'আজ সকালে নীচের হল ঘরে নেমে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন ডা. বার্নিকট।

'দেখলেন, অদ্ভুত এক চোর গত রাতে তার অনধিকার প্রবেশের চিহ্ন রেখে গেছে হল ঘরে।

'অদ্ভুত এই কারণে যে রাশি রাশি মূর্তির মধ্যে থেকে চোর শুধু বেছে নিয়েছে নেপোলিয়নের মূর্তিটাই এবং তাও বাগানের দেওয়ালে দারুণ আক্রোশে আছড়ে ভেঙে রেণু রেণু করে রেখে গেছে। সবকটা টুকরোই পাওয়া গেছে দেওয়ালের নীচে।'

হাত রগড়াতে রগড়াতে হোমস শুধু বললে, 'বেশ অভিনবত্ব আছে দেখছি।'

'আমি জানতাম খুশি হবেন আপনি। কিন্তু এখনও শেষ হয়নি আমার কাহিনি। সেদিন দুপুর বারোটায় সার্জারিতে আসার পর চক্ষুস্থির হয়ে গেল ডা. বার্নিকটের।

'দেখলেন, সেখানেও চোর ঢুকেছিল গত রাত্রে। জানলা খোলা। আর, ঘরময় ছত্রাকার হয়ে পড়ে তাঁর অতিপ্রিয় নেপোলিয়নের অগুনতি ভাঙা টুকরো। এক্ষেত্রে অবশ্য ম্যান্টলপিসের ওপরই আছড়ে গুঁড়ো করা হয়েছে মূর্তিটাকে।

'কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এমন কোনো সূত্র পড়ে নেই যাকে নিয়ে এই পাগলই বলুন, বদমাইশই

বলুন, লোকটার কোনো হদিশ খুঁজে বের করতে পারি। এখন বলুন, মি. হোমস, কী করা উচিত আমার!'

'বাস্তবিকই লেসট্রেড, সবকটা ঘটনাই শুধু অদ্ভুত নয়— কিম্ভূত। যাই হোক, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। মর্স হাডসনের দোকানে যে-মূর্তিটা গুঁড়ো হয়েছে, আর ডা. বার্নিকটের যে-মূর্তি দুটো চুরমার হয়েছে, সবগুলোই কি একই ছাঁচ থেকে তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো তোমার থিয়োরিটাই নাকচ হয়ে যাচ্ছে। তোমার ধারণা, নেপোলিয়নের ওপর তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে কেউ সমানে মূর্তি ভেঙে চলেছে। এ-ধারণা ভুল এই কারণে যে, এ-শহরে শক্তিমান সম্রাট নেপোলিয়নের শত শত মূর্তির মধ্যে এই আধখেপা কালাপাহাড়ের[৩] পক্ষে একই ছাঁচে তৈরি তিনটি মূর্তি পর পর ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়। এ-রকম ধরনের কাকতালীয় কল্পনাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।'

লেসট্রেড বললে, 'আপনার মতো আমিও ভেবেছিলাম মি. হোমস। কিন্তু ভাববার আর একটা দিকও আছে। লন্ডনের ওই অঞ্চলে আবক্ষ মূর্তি কেনাবেচা করে শুধু একজনই এবং মর্স হাডসন। আর শুধু এই তিনটে মূর্তিই বেশ কয়েক বছর ধরে পড়ে ছিল তার দোকানে। সুতরাং আপনার কথামতো শহরে শত শত মূর্তি থাকলেও শুধু এই তিনটে মূর্তিই ছিল এ-অঞ্চলে। কাজেই কোনো স্থানীয় অতি-উৎসাহীর পক্ষে ওই তিনটে দিয়ে কাজ শুরু করা অসম্ভব নয়। আপনি কি বলেন ডা. ওয়াটসন?'

আমি বললাম, 'Monomaniac বা বাতিকগ্রস্ত মানুষ যে কত কী করতে পারে, তার কোনো শেষ নেই। এই মানসিক অবস্থাকে আধুনিক ফরাসি মনোবিজ্ঞানীরা idee fixe[৩] নাম দিয়েছেন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, 'মাই ডিয়ার ওয়াটসন! তা হতে পারে না এই কারণে যে idee fixe তে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও কোনো বাতিকগ্রস্তের পক্ষেই মূর্তিগুলোর ঠিকানা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।'

'বেশ তাই যদি হয়, তবে তোমার বক্তব্যটা শুনি।'

'আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি শুধু দেখছি যে ভদ্রলোকের খাপছাড়া কার্যকলাপের মধ্যেও বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে। যেমন ধর না কেন ডা. বার্নিকটের হল ঘরে। সেখানে সামান্য শব্দ হলেই বাড়ির লোক জেগে উঠতে পারে, কাজেই মূর্তিটাকে না-ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাগানে— সেখানে দেওয়ালের ওপর আছাড় মারা সত্ত্বেও কারো ঘুম ভঙেনি। আবার সার্জারিতেও যেখানে এত সাবধান না-হলেও চলবে, সেখানে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারা হয়েছে যেখানে সেটা ছিল সেই ম্যান্টলপিসের ওপরেই। সেই কারণেই তিনটে মূর্তি ভাঙা গল্প শুনে আমি হাসাহাসি করতে চাই না। এই আশ্চর্য ঘটনাগুলোর পর নতুন কিছু যদি আবার ঘটে আমাকে জানতে ভুলো না লেসট্রেড। আমি তাতে সত্যিই খুব খুশিই হব।'

পরের দিন সকালে তখনও আমি শোবার ঘরে সাজগোজ করছি। এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল হোমস। হাতে তার একটা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটা সে-ই পড়ে শোনাল : 'এখুনি চলে আসুন, ১৩১ পিট স্ট্রিট, কেনসিংটন— লেসট্রেড।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পিট স্ট্রিটে। লন্ডনের একটি অতিচঞ্চল জীবনধারার ঠিক পাশেই যেন একটি স্থির জলাশয়। ছোট্ট অথচ শান্ত!

১৩১ নম্বর বাড়িটাকে পেলাম একসারি বাড়ির মাঝখানে। সারির প্রতিটি বাড়িই সাদাসিধে গঠনের। সুন্দর না-হলেও সৌম্য। গাড়ির মধ্যে থেকেই দেখলাম, বাড়ির সামনের রেলিংয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ছোটোখাটো একটা উৎসুক জনতা।

লেসট্রেড খুব গম্ভীরমুখে আমাদের এগিয়ে নিতে এল। ওর পিছু পিছু বসবার ঘরে এসে দেখলাম, ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন এক প্রৌঢ়। চুল উশকোখুশকো, পরনে ফ্লানেলের ড্রেসিং গাউন।

আলাপ পরিচয় হল। শুনলাম ইনিই সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের[৪] মি. হোরেস হার্কার— এ-বাড়ির মালিক। সাংবাদিক।

লেসট্রেড বলল, 'আবার নেপোলিয়নের মূর্তি, মি. হোমস! গতরাত্রে আপনার খুব আগ্রহ দেখেছিলাম এ-ব্যাপারে, তাই ভাবলাম আপনাকে একবার খবর দিই। কেসটা আর তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়, খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'যথা?'

'খুন। মি. হার্কার এঁদের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি? কিছুই বাদ দেবেন না।'

বিষণ্ণ মুখে আমাদের পানে তাকালেন মি. হার্কার। বললেন, 'রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছি আমি। মাস চারেক আগে নেপোলিয়নের একটা আবক্ষ মূর্তি কিনেছিলাম এই ঘরে রাখব বলে। যত গণ্ডগোল মনে হচ্ছে ওই মূর্তিকে নিয়েই। স্টেশন থেকে দু-পা গেলেই হার্ডিং ব্রাদার্সের[৫] দোকান। মূর্তিটা তাদের দোকান থেকেই কিনেছিলাম।

'আমার সাংবাদিকতার বেশির ভাগ কাজই সারতে হয় রাত্রে। লিখতে লিখতে রাত দুটো তিনটে তো হামেশাই বাজে। কাল রাতেও হয়েছে তাই। ওপরতলায় পেছনের দিকে আমার ঘরে একটানা লিখে চলেছি— রাত তখন প্রায় তিনটে।

'হঠাৎ মনে হল নীচের তলায় সিঁড়িতে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কান খাড়া করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ— কিন্তু কিছুই আর শুনতে পেলাম না। শব্দটা যে বাইরের— সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

'ঠিক তার মিনিট পাঁচেক পরেই, আচমকা এক ভয়াবহ আর্তনাদ ভেসে এল কানে। মি. হোমস, অনেকরকম চিৎকার সারাজীবনে শুনেছি, কিন্তু এ-রকম রক্ত-হিম-করা শব্দ আর শুনিনি। যতদিন বেঁচে থাকব এ-চিৎকার আমি ভুলব না।

'মিনিট খানেক কি দুয়েক পাথরের মতো বসে ছিলাম। তারপরেই চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা নিয়ে গেলাম নীচে।

'ঘরে ঢুকে দেখলাম জানলা দু-হাট করে খোলা এবং পর মুহূর্তেই বুঝলাম ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে উধাও হয়েছে নেপোলিয়নের মূর্তিটা। কিন্তু কিছুতেই আমি বুঝে উঠছি না এ-রকম একটা জিনিস চুরি করে কী লাভ! সামান্য একটা প্লাস্টারের ছাঁচ! কতই-বা আর তার দাম!

'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন মি. হোমস, লম্বা একটা লাফ মেরে জানলা থেকে সামনের দরজার ধাপেতে পৌঁছোনো এমন কিছু কঠিন নয়। চোর মহাপ্রভুও নিশ্চয় সেই পথেই উধাও

হয়েছেন মনে করে তৎক্ষণাৎ ঘুরে গিয়ে খুলে ফেললাম সামনের দরজা। অন্ধকারের মাঝে পা বাড়িয়েই হোঁচট খেলাম একটা মৃতদেহের ওপর। চৌকাঠের ঠিক সামনেই পড়ে ছিল লাশটা।

'দৌড়ে গিয়ে আলো এনে দেখলাম শুধু রক্ত আর রক্ত। রক্তের পুকুরের মধ্যে যেন সাঁতার কাটছে লোকটা। গলাটা ধারালো অস্ত্রের কোপে হাঁ হয়ে রয়েছে। চিত হয়ে পড়ে ছিল দেহটা, হাঁটু দুটো গুটোনো, মুখটা বীভৎসভাবে হাঁ করা। স্বপ্নের মধ্যেও সে-দৃশ্যকে আমি ভুলতে পারব না। আমার কাছেই পুলিশ হুইসেল ছিল। কিন্তু বাজানোর পরেই বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা, এরপর কী হয়েছে আর মনে নেই। চোখ খুলে দেখলাম হল ঘরে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশের লোক।'

হোমস জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে খুন হল কে?'

জবাব দেয় লেসট্রেড, 'চেনার কোনো উপায় নেই। মর্গে গেলেই লাশটা দেখতে পাবেন। কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এক ইঞ্চিও এগোতে পারিনি। লোকটা বেশ লম্বা, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, রীতিমতো শক্তিমান, বয়স তিরিশের ওদিকে নয়। জামাকাপড় সস্তা দামের। অথচ তাকে দেখলে শ্রমিক বলে মনে হয় না। পাশেই থইথই রক্তের মাঝে শিংয়ের হাতলওলা একটা ছুরি পড়ে ছিল। এই ছুরি দিয়েই কাজ সারা হয়েছে কি না অথবা তা মৃত লোকটার কিনা তা আমি জানি না। জামাকাপড়ের কোনো নাম পাইনি। পকেটে একটা আপেল, কিছু সরু দড়ি, এক শিলিং দামের লন্ডনের একটা ম্যাপ আর একটা ফটোগ্রাফ ছাড়া কিছু ছিল না। এই দেখুন সেই ফটোগ্রাফ।'

ছবিটা যে একটা ছোটো ক্যামেরা থেকে নেওয়া স্ন্যাপশট, তা দেখলেই বোঝা যায়। লোকটার চেহারা চোখা-চোখা, বানরের মতো চনমনে, মোটা মোটা ভুরু আর অনেকটা বেবুনের চোয়ালের মতো মুখের তলার অংশ খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

সতর্ক চোখে ছবিটা দেখে জিজ্ঞেস করে হোমস, 'মূর্তিটা কী হল?'

'আপনি আসার ঠিক আগেই খবর পেলাম। ক্যাম্পডেন হাউস রোডে একটা খালি বাড়ির সামনের বাগানে পাওয়া গেছে মূর্তিটাকে। আস্ত অবশ্য নয়, টুকরো টুকরো অবস্থায়। ওইদিকেই যাচ্ছি এখন, আসবেন নাকি?'

'সে-কথা আর বলতে। তার আগে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।' কার্পেট আর জানলা পরীক্ষা করে বলল হোমস, 'হয় লোকটার বেশ লম্বা লম্বা ঠ্যাং আছে, আর না হয় বেশ করিতকর্মা পুরুষ সে। এতখানি জায়গা টপকে জানলার কিনারায় পৌঁছে জানলা খোলাটা কম বাহাদুরি নয়। ফিরে আসা বরং অনেক সোজা। মি. হার্কার, আমাদের সাথে আসছেন নাকি? গেলে আপনার মূর্তির চরম পরিণতিটা দেখতে পেতেন।'

লেখবার টেবিলে শুকনো মুখে বসে ছিলেন মি. হার্কার। বললেন, 'না মশাই, যা হয় একটা কিছু খাড়া করার চেষ্টা করতে হবে এখন। সবকটা ইভনিং পেপারের প্রথম সংস্করণেই যে আদ্যোপান্ত খবরটা বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ভীষণ দেরি করে ফেলেছি। দোরগোড়ায় দারুণ খুন, আর আমি কিনা—।'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে শুনলাম ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর জার্নালিস্টের কলম আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে।

চূর্ণবিচূর্ণ মূর্তিটাকে পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। মহাপরাক্রমশীল সম্রাটের এমন শোচনীয় পরিণতি দেখলাম এই প্রথম। আততায়ীর অন্তরে তাঁর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা যে কতটা তা রেণু রেণু অংশগুলো দেখলে খানিকটা বুঝতে পারা যায়। ঘরের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল শতধা চূর্ণ টুকরোগুলো। হোমস কয়েকটা পরীক্ষা করল। তার নিবিষ্ট চোখ আর হাবভাব দেখে বুঝলাম শেষ পর্যন্ত একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছে সে।

'হল?' শুধোল লেসট্রেড।

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'তুড়ি মেরে কি আর কুয়াশা কাটানো যায়? এখনও অনেক— অনেক পথ মাড়িয়ে যেতে হবে। তবু কি জানো, দু-একটা ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু ইশারা পাচ্ছি। আমাদের উচিত এখন এই নিয়েই কাজ শুরু করা। তুচ্ছ মূর্তি দখল করাই মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করে আমাদের অজ্ঞাত এই ক্রিমিনাল ভদ্রলোকটি। এই হল গিয়ে প্রথম পয়েন্ট। তারপরে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে মূর্তি চুরমার করাই যদি লোকটার মুখ্য উদ্দেশ্য হত, তাহলে প্রতিবারেই দেখা যাচ্ছে মূর্তিটাকে হাতে পেয়েও সে তক্ষুনি বাড়ির বাইরে গিয়ে ভাঙছে না।'

'আর এক স্যাঙাতের চোখে পড়ে যাওয়ায় নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল সে। তা ছাড়া ধস্তাধস্তিও তো কম হয়নি।'

'তা খুবই সম্ভব। তবুও আর একটা জিনিসের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মূর্তিটা চুরমার করা হয়েছে এইখানেই— এই বাগানের মধ্যে। আচ্ছা, ওই বাড়িটার অবস্থানটা লক্ষ করেছ?'

চারপাশে দেখে নিল লেসট্রেড।

'বাড়িটা খালি দেখেই সে বুঝেছিল বাগানে মূর্তি আছড়ালে কারো ছুটে আসার সম্ভাবনা নেই।'

'ভালো কথা। কিন্তু মূর্তিটা চুরি করে এই বাগানে আসার পথেই তো আর একটা বাগান পড়ছে। তার পক্ষে সেইটাতেই ঢোকা উচিত ছিল। নয় কি? বিশেষ করে চোরাই মাল হাতে কারো সাথে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যখন রয়েছে?'

'আমি হার মানলাম,' বলল লেসট্রেড।

মাথার ওপর রাস্তার বাতিটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল হোমস।

'সে যা করতে চেয়েছিল, তা সে এখানে দেখতে পাবে বলেই এসেছিল। ওদিককার বাগানে সে-সম্ভাবনা ছিল না। এই হল কারণ।'

'বাইজোভ? ঠিকই তো,' লাফিয়ে ওঠে গোয়েন্দা-প্রবর, 'এখন আমার মনে পড়ছে সব। মি. বার্নিকটের মূর্তিটাও তার লাল আলো থেকে বেশি দূরে ভাঙা হয়নি। মি. হোমস, তা না হয় হল, কিন্তু এ নিয়ে আমরা করব কী?'

'মনে রাখবে। নোট করে রাখবে। ঘটনাচক্রে কাজে লেগে যেতে পারে। যাই হোক, এখন তুমিই বলো, কীভাবে এগোতে চাও তুমি।'

'আমার মতো মৃত লোকটাকে শনাক্ত করলেই অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। আসল কাজ

তো এইটাই। খুব কঠিন অবশ্য নয়। লোকটার ঠিকুজি জানা গেলেই আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হদিশ পাওয়া গেলেই গতরাতে পিট স্ট্রিটে সে কী করতে গিয়েছিল এবং মি. হোরেস হার্কারের বাড়িতে কার সাথে দেখা হওয়ামাত্র অক্কা পেয়েছে— তাও জানা যাবে। আপনি কী মনে করেন?'

'নিঃসন্দেহে তাই। তবে কি জানো, আমার কার্যপদ্ধতি ঠিক তোমার মতো হবে না?'

'কী করতে চান তবে?'

'তা বললে তুমি আর নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করতে পারবে না। আমি বলি কি আমরা যে যার নিজের নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই। আমি থাকি আমার লাইনে, তুমি থাক তোমার লাইনে। পরে আমরা একসাথে বসে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।'

'বেশ, তাই হোক।' বলল লেসট্রেড।

'পিট স্ট্রিট যদি যাও এখন মি. হোরেস হার্কারের সাথে তোমার দেখা হতে পারে। তাঁকে বল, আমার মন স্থির হয়ে গেছে। গতরাত্রে তাঁর বাড়িতে যে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা খুনে পাগল নেপোলিয়ন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হয়ে খুনখারাপি করে গেছে— সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। এ-খবরটা জানলে তার অনেকটা সুবিধে হবে।'

বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রইল লেসট্রেড।

'আপনি কি সত্যি সত্যি তাই বিশ্বাস করেন নাকি?'

মুচকি হাসল হোমস।

'করি না? বেশ, হয়তো করি না। কিন্তু এ-খবর শুনলে মি. হোরেস হার্কার তো খুশি হবেনই, সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের গ্রাহকেরাও হবেন। লেসট্রেড, আজ সন্ধে ছ-টায় বেকার স্ট্রিটে আমার সাথে তুমি দেখা করলে খুশি হব। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পকেটে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটা রইল আমার কাছে।'

হাঁটতে হাঁটতে আমি আর শার্লক হোমস চলে এলাম হাই স্ট্রিটে হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানের সামনে। মূর্তিটা কেনা হয়েছিল এখান থেকেই।

একজন ছোকরা কর্মচারী ছিল দোকানে। হোমসের প্রশ্ন শুনে বললে যে সে নিজেই নতুন এসেছে দোকানে। মি. হার্ডিংও বিকেলের আগে আসেন না, কাজেই কোনো খবর দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। শুনে হোমসের মুখে ফুটে উঠল যুগপৎ হতাশা আর বিরক্তি।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বলল, 'সব কিছুই যে আমাদের অনুকূল হবে এ-রকম আশা করাই উচিত নয়, কি বল ওয়াটসন? মি. হার্ডিং ফিরে এলে পর বিকেলেই আসতে হবে আমাদের। কীভাবে কাজ শুরু করছি, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছ তুমি। মূর্তিগুলো এসেছে যেখান থেকে আমি পৌঁছোতে চাই সেখানেই। বেচারিদের এ-রকম দুরবস্থার মূলে যদি কোনো অদ্ভুত কারণ থাকে, তা জানা যাবে উৎপত্তি স্থানে পৌঁছোতে পারলে। চলো, কেনিংটন রোডে মি. মর্স হাডসনের কাছে যাওয়া যাক। তাঁকে দিয়েও সমস্যার জট খানিকটা খুলতে পারে।'

একটা গাড়ি নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছবিওলার দোকানে পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোকের চেহারা ছোটোখাটো হলেও বেশ মজবুত, লাল মুখ, হাবভাব একটু ঝাঁঝাল।

'হোমস আমাদের মাথার ওপরে রাস্তার আলোটার দিকে দেখাল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

তড়বড় করে কথা বলে চললেন ভদ্রলোক, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, আমারই কাউন্টারে। ট্যাক্স-ফ্যাক্সগুলো কেন দিই তা বুঝি না— বদমাশরা এসে আমার জিনিসপত্র যদি ভেঙে তছনছ করেই গেল, তাহলে এসব দিয়ে লাভ কী আমার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ড. বার্নিকটকে মূর্তি দুটো আমিই বিক্রি করে ছিলাম। কী লজ্জার কথা, ছিঃ ছিঃ। আমি তো বলব, রীতিমতো একটা নিহিলিস্ট[৬] প্লট। অ্যানার্কিস্ট ছাড়া আর কেউ এমন করে মূর্তি চুরমার করতে পারে না। — আমি তো ওদের রেড রিপাবলিকান[৭] বলি। কোত্থেকে পেয়েছি মূর্তিগুলো? তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের কী সম্বন্ধ বুঝছি না। বেশ আপনি যদি একান্তই জানতে চান তো শুনুন। স্টেপনিয় চার্চ স্ট্রিটে গেলডার অ্যান্ড

কোম্পানি থেকে কিনেছিলাম। বিশ বছর ধরে তারা এই ব্যাবসা করে আসছে এবং নামও খুব। ক-টা কিনেছিলাম? তিনটে— দুটো আর একটা, মোট তিনটে। দুটো ড. বার্নিকট নিয়েছিলেন, আর একটা তো দিনেদুপুরেই গুঁড়ো হল আমার কাউন্টারে। ফটোগ্রাফটা কার? না, না, আমি চিনি না। হ্যাঁ, একটু একটু চিনি মনে হচ্ছে। আরে, আরে, এ তো দেখছি বেপ্পো। লোকটা ইটালিয়ান। ঠিক কাজ করত। আমার অনেক কাজ করে দিত বেপ্পো। খোদাইয়ের কাজ একটু-আধটু জানত, সোনালি রং ধরাতে পারত— আরও টুকিটাকি কাজ করত অনেকরকম। গত হপ্তায় শেষবারের মতো এসেছিল লোকটা। তারপর আর কোনো খোঁজখবর পাইনি ওর। না, কোত্থেকে এসেছে আর কোথায় গেছে— অত খবর আমি রাখি না। ওইখানে থাকার সময় ওর সঙ্গে আমার কোনো খিটিমিটি লাগেনি। ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। মূর্তি চুরমার হওয়ার দিন দুয়েক আগে বেপ্পো শেষবারের মতো এসেছিল।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হোমস বলল, 'মন্দ কী, মর্স হাডসনের কাছ থেকে যা যা আশা করেছিলাম, সবই পেয়েছি। কেনিংটন আর কেনসিংটন— দু-জায়গাতেই পাচ্ছি বেপ্পোর অস্তিত্ব। দশ মাইল গাড়িতে আসা বৃথা যায়নি দেখছি। ওয়াটসন, এবার যাওয়া যাক স্টেপনিতে গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে। মূর্তিগুলোর উৎপত্তি এইখান থেকেই যখন, তখন ওখান থেকে কিছু-না-কিছু সাহায্য আমরা পাবই।'

দ্রুতবেগে আমরা একে একে পেরিয়ে গেলাম[৮] বিলাসী লন্ডন, হোটেল লন্ডন, থিয়েটার লন্ডন, সাহিত্যিক লন্ডন, ব্যবসায়ী লন্ডন এবং সব শেষে সমুদ্রতীরের লন্ডন।

যা খুঁজছিলাম, তা পেলাম এখানেই। খোলামেলা একটা জায়গা। এক সময়ে বোধ হয় এখানে ধনী লন্ডন ব্যবসায়ীদের আস্তানা ছিল। কিন্তু আজ গড়ে উঠেছে হরেকরকম মূর্তি তৈরির কারখানা।

বাইরে বিরাট উঠোনটায় অগুনতি পাথরের স্মৃতিফলক। ভেতরের মস্ত বড়ো ঘরটায় জনা পঞ্চাশেক কারিগর খুটখাট কাজ করে চলেছে। কেউ খোদাই করছে, কেউ-বা ছাঁচে ঢেলে মূর্তি তৈরি করছে।

ম্যানেজার একজন জার্মান ভদ্রলোক। চেহারাটি বিরাট। আমাদের বেশ খাতির করে বসিয়ে হোমসের সব প্রশ্নেরই পরিষ্কার উত্তর দিলেন।

খাতাপত্র ঘেঁটে দেখা গেল, ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের মার্বেল পাথরের আবক্ষ মূর্তি থেকে এ পর্যন্ত কয়েকশো ছাঁচ নেওয়া হয়েছে। বছরখানেক আগে ছ-টা মূর্তি একসাথে তৈরি করা হয়েছিল। তিনটে পাঠানো হয়েছিল মর্স হাডসনকে, বাকি তিনটে কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানে। অন্যান্য ছাঁচের সঙ্গে এই বিশেষ ছ-টির পার্থক্য থাকার কোনো কারণ নেই। কেনই-বা মূর্তিগুলোকে চুরমার করা হচ্ছে তাও তিনি ভেবে পেলেন না। সব কথা শুনে তো ভদ্রলোক হেসেই অস্থির। মূর্তিগুলোর পাইকারি দাম ছ-শিলিং। খুচরো কিনতে গেলে বারো শিলিংয়ের মতো দাম পড়বে। মুখের দু-পাশ থেকে দুটো ছাঁচ নেওয়া হয়, তারপর প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচ বেমালুম জুড়ে দিলেই সম্পূর্ণ হয় মূর্তিটা। আমরা যে-ঘরে বসেছিলাম, মূর্তিগুলো সাধারণত ওইখানেই হয়। করে ইটালিয়ান কারিগররা। কারিগরদের কাজ শেষ হলেই প্যাসেজের ওপর মূর্তিগুলো রাখা হয় শুকোবার জন্যে। তারপর যায় গুদোমে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না জার্মান ভদ্রলোক।

কিন্তু ফটোগ্রাফটা বার করামাত্র দারুণ পরিবর্তন এল ম্যানেজারের চোখে-মুখে। রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ, নীল নীল চোখের ওপর দড়ির মতো ফুটে উঠল কপালের শিরাগুলো।

'রাসকেল কোথাকার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি, বেশ ভালোভাবেই চিনি। এ-প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়েছিল একদিনই। আর তা এই রাসকেলটার জন্যে যেদিন ওর পেছনে পুলিশ এসে হানা দিয়েছিল এখানে। এক বছরের ওপর হল। রাস্তার একজন ইটালিয়ানকে ছুরি মেরে কারখানায় এসে বসেছিল। পিছু পিছু পুলিশও এসে হাজির। বেপ্পো নামেই ওকে জানতাম, পদবি জানি না[৯]। এ-রকম লোককে কাজ দেওয়ার ফলে ভোগান্তি কম হয়নি আমার। অবশ্য কারিগর হিসাবে লোকটা ভালোই ছিল— প্রথম শ্রেণির কারিগরই বলব।'

'কী শাস্তি পেয়েছিল বেপ্পো?'

'কপালজোরে লোকটা বেঁচে গিয়েছিল মশাই। এক বছর শ্রীঘর বাসের ওপর দিয়েই রেহাই পায় বেপ্পো। আমার তো বিশ্বাস এতদিনে খালাস পেয়েছে সে। অবশ্য এখানে মুখ দেখানোর সাহস আর তার হয়নি। বেপ্পোর এক খুড়তুতো ভাই কাজ করে এখানে। তাকে জিজ্ঞেস করলে ও এখানে আছে কোথায়, তা জানা যেতে পারে।'

'না, না,' চেঁচিয়ে ওঠে হোমস, 'কোনো কথা নয়, তার সঙ্গে বেপ্পো সম্পর্কে কোনো কথা নয়— আমার একান্ত অনুরোধ। ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতখানি, তা হয়তো আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না। কিন্তু আমি যতই দেখছি, শুনছি, ততই বুঝছি কমা তো দূরের কথা, ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে এর গুরুত্ব। ভালো কথা,খাতাপত্র ঘেঁটে মূর্তিগুলোর বিক্রির খবর দেওয়ার সময় তারিখটা গত বছরের তেসরা জুন বললেন শুনলাম। আচ্ছা, বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়েছে সে-তারিখটা দিতে পারেন?'

ম্যানেজার বললেন, 'মাইনের খাতা থেকে মোটামুটি বলতে পারব।' কয়েকটা পাতা উলটে আবার বলেন, 'গত মাসের বিশ তারিখে তাকে শেষবারের মতো মাইনে দিয়েছি আমি।'

হোমস বললে, 'ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

কাকপক্ষীও যেন আমাদের গোপন তদন্তের কথা জানতে না পারে, শেষবারের মতো এই অনুরোধ জানিয়ে আবার রওনা হলাম পশ্চিম দিকে।

দুপুর তখন গড়িয়ে এসেছে। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে নাকেমুখে গুঁজে কোনোরকমে লাঞ্চ শেষ করলাম দুজন। ঢোকবার পথেই খবরের কাগজে দেখি বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কেনসিংটনে খুনখারাপি। খুনে পাগলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।' খানিকটা পড়তেই বুঝলাম, মি. হোরেস হার্কার শেষ পর্যন্ত তাঁর সাংবাদিকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। ছ-কলম ঠেসে লিখেছেন ভদ্রলোক। চাঞ্চল্যকর হত্যার শাখাপ্রশাখা ছড়ানো বর্ণনা পড়তে পড়তে সত্যি শিহরন জাগে। ভিনিগার, মরিচ, নুন ইত্যাদি রাখার স্ট্যান্ডে কাগজটা ঠেস দিয়ে রেখে দিয়ে খেতে খেতেই আগাগোড়া পড়ে ফেলল হোমস। বার দুয়েক আপন মনে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে নিল।

তারপর পড়তে পড়তে বললে, 'ঠিকই আছে ওয়াটসন। শোনো, সবাই শুনে খুশি হবেন যে মি. লেসট্রেড, বিপুল অভিজ্ঞতাবলে পুলিশমহলে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ইনি তাঁদের অন্যতম, আর মি. শার্লক হোমস অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরূপে তিনি সর্বসাধারণের কাছে সুপরিচিত— এঁরা

দুজনেই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই শোচনীয় পরিণতির মূলে পূর্ব পরিকল্পিত হত্যার প্রবৃত্তি নেই। নিছক উন্মত্ততা থেকেই নাকি এই বিচিত্র এবং আশ্চর্য ঘটনাবলির উদ্ভব হয়েছে। মানসিক গোলযোগ ছাড়া আর কিছু দিয়ে এই ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ওয়াটসন, সংবাদপত্র হচ্ছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র। নাড়াচাড়া করার কৌশলটুকু শুধু জানলেই হল। তোমার উদরদেব যদি শান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এবার দৌড়ানো যাক কেনসিংটন রোডে। হার্ডিং ব্রাদার্সের ম্যানেজারের বক্তব্য এখনও শোনা হয়নি।

এম্পোরিয়ামটি বিরাট হলেও প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক দেখতে খুবই ছোটোখাটো। বেশ চটপটে, চনমনে, চালাকচতুর। কথাবার্তায় হাবেভাবে অফুরন্ত প্রাণ-রস যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ে। মাথাটি কিন্তু বেশ সাফ।

'ইয়েস, স্যার, আজকের ইভনিং পেপারে সব পড়লাম। মি. হোরেস হার্কার আমার খদ্দের। মাস কয়েক আগে একটা মূর্তি তাঁকে বিক্রি করেছিলাম আমি। স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে ও-রকম তিনটে মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবকটাই বেচে ফেলেছি। কাদেরকে? সেলস বই ঘেঁটে তা না হয় বলে দিচ্ছি। এই যে পেয়েছি। একটা তো জানেনই মি. হার্কারকে, আর একটা যোশিয়া ব্রাউনকে। মি. ব্রাউনের ঠিকানা, লেবারনাম লজ, লেবারনাম ভেল, চিজউইক। আর একটা মি. স্যান্ডি ফোর্ডকে। ঠিকানা, লোয়ার গ্রোভ রোড। না, না, ফটোগ্রাফ তো দূরের কথা, এ-রকম ধরনের লোককে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। এ-রকম কদাকার লোককে একবার দেখলে কি আর ভোলা যায় স্যার? আপনি কী বলেন? কর্মচারীদের মধ্যে ইটালিয়ান আছে কি না? তা, হ্যাঁ, আছে বই কী। টুকটাক কাজ আর ঝাড়ামোছা করার জন্য কয়েকজন আছে। ইচ্ছে করলে সেলস বুক খুলে তারা দেখতে পারে বই কী। খাতা খুলে দেখলেই-বা ক্ষতি কী? অত আর কে নজর রাখতে যায় বলুন। বাস্তবিকই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা বটে! চালিয়ে যান তদন্ত। কোনো জবর খবর পেলে জানাতে ভুলবেন না আশা করি।'

মি. হার্ডিংয়ের কথা শুনতে শুনতে কিছু কিছু পয়েন্ট লিখে নিচ্ছিল হোমস। দেখলাম, বেশ খুশি হয়ে উঠেছে ও। ঘটনার স্রোত ভালোর দিকেই চলেছে বলতে হবে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে কোনো মতামত প্রকাশ করলে না সে। শুধু বললে যে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি না-ফিরলে লেসট্রেডকে হয়তো বসে থাকতে হবে।

তাড়াতাড়ি করে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছেও অবশ্য দেখলাম লেসট্রেডকে রীতিমতো অসহিষ্ণুভাবে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে পায়চারি করতে। চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, সারাদিনের কাজ তার একেবারে বৃথা যায়নি।

আমাদের দেখেই থমকে গেল সে, 'কী খবর, মি. হোমস? বরাত খুলেছে নাকি?'

ধীরেসুস্থে বলল হোমস, 'সারাদিন বড়ো খাটাখাটুনি গেছে। আর, দিনটা একেবারে বাজে যায়নি। খুচরো দোকানদার থেকে শুরু করে পাইকারি হারে মূর্তি তৈরির কারখানা পর্যন্ত— সবই ঘুরে এলাম। এখন আমি গোড়া থেকে শুরু করে সবকটা মূর্তিই খুঁজে বের করতে পারি।'

'মূর্তি!' চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার কাজ করার পদ্ধতি একেবারেই আপনার নিজস্ব এবং আমিও তা নিয়ে আপনাকে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে সারাদিনে আপনার চাইতে খাঁটি কাজ কিছু করতে পেরেছি আমি। মৃত লোকটাকে আমি শনাক্ত করেছি।'

'বল কী হে!'

'আর পেয়েছি তার খুন করার আসল কারণ।'

'চমৎকার।'

'আমাদের একজন ইনস্পেকটর স্যাফ্রন হিল[১০] আবার ইটালিয়ান কোয়ার্টার সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান রাখে। নিহত লোকটার গলায় ক্যাথলিক প্রতীক আর তার গায়ের রং দেখে আমার মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় দক্ষিণ দেশের। দেখামাত্র এক পলকেই ইনস্পেকটর হিল তাকে চিনে ফেললে। লোকটার নাম পিয়েত্রো ভিনাসসি। জন্ম, নেপলস[১১]-এ। লন্ডনের কুখ্যাত গলাকাটাদের অন্যতম সে। মাফিয়ার[১২] সাথে জড়িত আছে পিয়েত্রো। মাফিয়া যে গুপ্ত রাজনৈতিক সংঘ তা তো আপনি জানেনই। ডিক্রি জারি করে খুনের পর খুন করে যায় এরা।

'এখন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা দেখুন কীরকম পরিষ্কার হয়ে আসছে। খুন করে ফেরার লোকটাও ইটাললিয়ান এবং মাফিয়ার সভ্য। যেকোনো রকমেই হোক, নিশ্চয় সংঘের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল সে। পিয়েত্রোকে লাগানো হল তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। পকেটে ফটোগ্রাফটা দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে যে ভুল করে অন্য কাউকে না ছুরি মেরে বসে সে। লোকটার পিছু নিয়ে পিয়েত্রো দেখলে তাকে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। কাজেই বাইরে ওত পেতে রইল সে। বেরোনোমাত্র শুরু হল ঝটাপটি। ফলাফল তো দেখতেই পেয়েছি। নিজেই কাবু হয়ে পড়ায় মরণ-ঘা তাকেই খেতে হয়েছে। শুনতে কীরকম লাগছে, মি. হোমস?'

তালি বাজিয়ে উৎসাহ দিয়ে সোল্লাসে বলল হোমস, 'শাবাশ, লেসট্রেড, শাবাশ কিন্তু তোমার ওই মূর্তি চুরমারের ব্যাখ্যাটা তো ঠিক ধরতে পারলাম না।'

'মূর্তি আর মূর্তি! মাথা থেকে কিছুতেই মূর্তিগুলোকে তাড়াতে পারছেন না। আরে, আসলে ওগুলো কিচ্ছু না। ছিঁচকে চুরি— খুব জোর হয়তো হবে ছ-মাসের জেল। খুনের মামলা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছি— ছিঁচকে চুরি নিয়ে নয়। আবার বলি শুনুন, মি. হোমস, সবকটা সূত্রই আমি জড়ো করে এনেছি আমার মুঠোর ভেতর।'

'তাহলে তোমার প্রোগ্রাম?'

'খুব সোজা। হিলকে নিয়ে সোজা যাব ইটালিয়ান কোয়ার্টারে। ফটোগ্রাফের সাথে মিলিয়ে লোকটাকে বার করে গ্রেপ্তার করব খুনের অপরাধে। আপনি আসছেন নাকি?'

'উঁহু, আমার আসা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, আরও সোজা পথে আমরা পৌঁছোতে পারি আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে। সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কেননা, সব কিছুই নির্ভর করছে এমন একটি বিষয়ের ওপর যা তোমার ইচ্ছার বাইরে। কিন্তু গভীর আশা আছে এবং তা এতই গভীর যে, তোমার সঙ্গেই বাজিও ফেলছি আমি। আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে আসো লেসট্রেড, খুনিকে তুমি হাতেনাতে ধরতে পারবে বলেই আমি মনে করি।'

'ইটালিয়ান কোয়ার্টারে?'

'না। আমার ধারণা, চিজউইকের একটা ঠিকানায় তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে চিজউইক আসো তুমি, কথা দিচ্ছি কাল তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান কোয়ার্টারে আমি যাবই। ওয়াটসন, ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করো। একটা জরুরি চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। ঘণ্টা বাজাও। চটপট কাউকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো! এখুনি।'

বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই কয়েকটি ঘর ছিল আমাদের। হোমস এইখানেই ঢুকে কাগজ ঘাঁটতে বসল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে যখন সে নেমে এল তার দু-চোখে দেখলাম বিজয় উচ্ছ্বাস। মুখে কিন্তু সে নিজের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কোনো কথাই বললে না। আগাগোড়া ওর তদন্ত পদ্ধতি দেখে এইটুকু বুঝেছিলাম যে হোমসের বিশ্বাস, বাকি দুজনে যাঁরা নেপোলিয়ানের ওই একই ছাঁচের মূর্তি কিনে নিশ্চিন্ত মনে বসে রয়েছেন নিজের বাড়িতে, এবার জড়িয়ে পড়বেন রহস্যজালে। এঁদের মধ্যে একজনের বাড়ি চিজউইকে। বিদঘুটে খুনের আবির্ভাব ঘটবে এবার তাঁরই বাড়িতে।

আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু কৌশলে খবরের কাগজ মারফত একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করার পেছনে হোমস-এর মূল উদ্দেশ্যটুকু অনুমান করে তার চাতুরির তারিফ না-করে পারলাম না। এসব পাগলের কাণ্ডকারখানা ভেবে আমরা যে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি— এই ধারণা নিয়ে নির্ভয়ে আমাদের শিকার বেরিয়ে পড়বে তার নৈশ অভিযানে। কাজেই হোমস যখন আমাকে রিভলভার নিতে বললে, মোটেই অবাক হলাম না। সে নিজেও তার প্রিয় হাতিয়ার[১৩] গুলিভরা হান্টিং ক্রপ তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিলে।

ঠিক রাত এগারোটার সময় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হ্যামারস্মিথ ব্রিজের[১৪] অপর পাশে। গাড়োয়ানকে এখানেই দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম জনবিরল একটা রাস্তায়। নির্জন রাস্তা। কিন্তু দু-পাশের সারি সারি বাড়িগুলো ছবির মতো সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা জমি।

রাস্তার বাতির আলোয় একটা বাড়ির সামনে দেখলাম লেখা রয়েছে, 'লেবারনাম ভিলা।' বাড়ির লোকে নিশ্চয় শুয়ে পড়েছিল, কেননা হলের দরজার সামনে একটা ফ্যানলাইট ছাড়া আর কোনো আলো কোথাও দেখলাম না। আলোটার নিস্তেজ গোলাকার ছটা এসে পড়েছিল বাগানের রাস্তায়। রাস্তা আর লনের মাঝখানে কাঠের বেড়া। ঘন কালো ছায়া পড়েছিল ভেতরের দিকে। এইখানেই গা ঢাকা দিয়ে বসলাম সবাই।

ফিসফিস করে বললে হোমস, 'আমার তো মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। কপাল ভালো। বৃষ্টি হচ্ছে না এখন। তাহলে তো দুর্ভোগের শেষ থাকত না। দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। আমার তো ধারণা, এত কষ্ট আমাদের বৃথা যাবে না।'

হোমসের কথা শুনে ভেবেছিলাম, না-জানি কতক্ষণ এভাবে কষ্টেসৃষ্টে গুঁড়ি মেরে বসে থাকতে হবে। কার্যকালে দেখা গেল কিন্তু এ-ভয় একেবারেই অমূলক। কেননা, আচম্বিতে এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে শেষ হল আমাদের প্রতীক্ষা।

চক্ষের পলকে, আমরা কিছু বোঝবার এবং সাবধান হবার আগেই নিঃশব্দে দু-হাট হয়ে খুলে গেল বাগানের দরজা। খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ একটা মূর্তি বানরের মতো দ্রুত আর ক্ষিপ্র পদক্ষেপে তিরবেগে ছুটে গেল বাগানের পথে। হলের দরজার ওপর থেকে যেটুকু আলো পড়ছিল তারই আবছা আভায় দেখলাম সাঁ করে মূর্তিটাকে সরে যেতে। পর মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল বাড়ির অন্ধকার ছায়ায়।

দীর্ঘ বিরতি। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম আমরা। তারপরেই খুব মৃদু একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ভেসে এল আমাদের কানে।

জানলার পাল্লা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

তারপরেই থেমে গেল শব্দটা। আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। বুঝলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে লোকটা। ঘরের মধ্যে হঠাৎ চোরা লণ্ঠনের ঝলক দেখলাম। ঈপ্সিত বস্তু নিশ্চয় পাওয়া গেল না সে-ঘরে, তাই আলোর চমক সরে গেল পাশের খড়খড়ির পেছনে, সেখান থেকে পরেরটায়।

ফিসফিস করে বললে লেসট্রেড, 'খোলা জানলাটার নীচে গিয়ে বসা যাক। নীচে নামলেই কাবু করে ফেলব।'

কিন্তু আমরা ওঠবার আগেই আবার বেরিয়ে এল লোকটা। নিস্তেজ আলোটার তলায় আসতেই দেখলাম বগলের ফাঁকে সাদা মতো একটা জিনিস। জুলজুল করে চারপাশে দেখতে দেখতে সাবধানে এগিয়ে এল সে। জনহীন রাস্তার শব্দহীনতায় যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে পড়ে বোঝাটা নামালে মাটিতে। পরমুহূর্তেই শুনলাম দমাস শব্দ, আর যেন অসংখ্য টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

নিজের কাজে এমন তন্ময় হয়ে ছিল সে যে পা টিপে টিপে ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল হোমস তার পিঠের ওপর এবং পর মুহূর্তেই আমি আর লেসট্রেড তার কবজি দুটো চেপে ধরে এঁটে দিলাম হাতকড়া।

হেঁচকা টানে ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম তার মুখ। কুৎসিত, পানসে হলদেটে রং। জিঘাংসা ভরা জ্বলন্ত দৃষ্টি আমাদের ওপর মেলে ধরে ছটফট করছিল সে কঠিন বন্ধনের মধ্যে। এক নজরেই চিনতে পারলাম তাকে। ফটোগ্রাফে দেখা মুখের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এ-মুখ।

হোমস কিন্তু এত কষ্টে ধরা লোকটার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না-দিয়ে দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সতর্ক চোখে যা পরীক্ষা করছিল, তা একটু আগেই এই কুৎসিত লোকটা বয়ে নিয়ে এসেছে বাড়ির মধ্যে থেকে। এটাও নেপোলিয়নের মূর্তি। সকালে যেমনি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল চারিদিকে। তন্ময় হয়ে একটার পর একটা টুকরো আলোর সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল হোমস। কিন্তু প্লাস্টারের কোনো টুকরোটাই বোধ হয় তার মনে ধরল না। পরীক্ষা তার সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় হল ঘরের আলো জ্বলে উঠল, খুলে গেল দরজা। শার্ট আর ট্রাউজার্স পরনে হাসিখুশি গোলগাল চেহারার বাড়ির মালিক বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'মি. যোশিয়া ব্রাউন?' শুধোল হোমস।

'ইয়েস স্যার। আপনি তাহলে মি. শার্লক হোমস? আপনার জরুরি চিঠি আমি পেয়েছিলাম, মি. হোমস। যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনটি করেছি। ভেতর থেকে প্রতিটি দরজা তালা এঁটে অপেক্ষা করছিলাম কী হয় তা দেখবার জন্যে।'

লেসট্রেড কিন্তু রাসকেলটিকে নিরাপদ জায়গায় চালান করবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি এসে পৌঁছোনোর পর চারজনে মিলে রওনা হলাম লন্ডনের দিকে।

মুখ টিপে সমস্ত পথ গেল লোকটা, একটা কথাও বার করা গেল না তার পেট থেকে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের তলা থেকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখ মেলে আগাগোড়া তাকিয়ে রইল আমাদের পানে। একবার শুধু আমার হাতটা নাগালের মধ্যে আসতেই খ্যাঁক করে কামড় বসাতে চেষ্টা করলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো। পুলিশ স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর জানলাম, লোকটার জামাকাপড় তল্লাশি করে কয়েকটা শিলিং আর দু-মুখো ধারালো একটা ছোরা ছাড়া আর অন্য কিছুই পাওয়া যায়নি। ছোরাটার হাতলে রক্তের চিহ্ন দেখা গেছে এবং সে বেশি পুরোনো নয়।

যাবার সময়ে লেসট্রেড বললে, 'আর কোনো গোলমাল নেই, মি. হোমস। হিল এদের সম্বন্ধে খবরাখবর কিছু রাখে, কাজেই ওর নামটা তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে'খন। আমার মাফিয়া থিয়োরি যে নির্ভুল, তার প্রমাণ আপনি পাবেন। কিন্তু আপনার কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ মি. হোমস। বেশ কায়দা করে পাকড়াও করলেন বটে হতভাগাটাকে। কী করে যে করলেন, তা অবশ্য এখনও বুঝে উঠলাম না।'

হোমস বললে, 'এত রাতে সেসব আলোচনা আর নাই-বা করলাম। তা ছাড়া, এখনও দু-একটা ছোটো জিনিস বাকি রয়েছে। তুমি তো জানই লেসট্রেড, কতকগুলো কেসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ না-করলে মোটেই আনন্দ পাওয়া যায় না— এ-কেসটি সেই ধরনের। তুমি যদি কাল ছ-টায় আর একবার বেড়াতে বেড়াতে চলে আস আমার ওখানে, তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব যে এখনও পর্যন্ত এ-ব্যাপারটা আগাগোড়া কোনো অর্থই ধরতে পারনি তুমি।'

পরের দিন সন্ধ্যায় লেসট্রেডের কাছে শুনলাম বেপ্পো সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে ফেলেছে সে। লোকটার পুরো নাম অবশ্য জনা যায়নি। বেপ্পো নামেই পরিচিত সে। ইটালিয়ান কলোনিতে এক ডাকে সবাই চেনে এবং জানে যে, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন সে কোনোদিনই কাটায়নি। এক সময়ে কুশলী ভাস্কর হিসেবে সুনাম ছিল তার । সৎপথে রোজগারও করেছে বহুদিন। তারপর এল সে পাপের পথে। ফলে দু-দুবার দাঁড়াতে হল কাঠগড়ায়। একবার ছিঁচকে চুরির জন্যে। দ্বিতীয়বারের কারণটা আমরা আগেই শুনেছি— জাতভাইকে ছুরি মারার অপরাধে। ইংরেজি চমৎকার বলতে পারে সে। কিন্তু বেধড়ক মূর্তি ধ্বংস করার কারণটা কিছুতেই বার করা গেল না তার পেট থেকে। কোনোদিক থেকেই এ-সম্পর্কে শেষ খবর জানা যায়নি এখনও। পুলিশ অবশ্য জেনেছে যে মূর্তিগুলোর সৃষ্টি খুব সম্ভব বেপ্পোর হাতেই। কেননা গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে এই জাতীয় কাজ তাকেই করতে হলো।

অবশেষে শেষ হল লেসট্রেডের বক্তিমে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে হোমস। চিক চিক করে উঠল তার চোখের মণি সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনির শব্দ শুনে। এক মিনিট পরেই পায়ের শব্দ শুনলাম সিঁড়িতে। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়। লাল মুখ। কাঁচাপাকা ধোঁয়াটে জুলপি। ডান হাতে পুরানো আমলের কার্পেটের ব্যাগটাকে টেবিলে রেখে শুধোলেন ভদ্রলোক, 'মি. শার্লক হোমস। এখানে আছেন কি?'

মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বললে হোমস, 'মি. স্যান্ডিফোর্ড? রিডিং থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ, আপনার চিঠি আমি এনেছি। লিখছেন, "ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের একটা মূর্তি

আমার দরকার। আপনার কাছে যেটা আছে, তার জন্য দশ পাউন্ড দিতে রাজি আমি।" ঠিক আছে তো?'

'নিঃসন্দেহে।'

'আপনার চিঠি পেয়ে বাস্তবিকই অবাক হয়ে গেলাম। দেখুন, আমি খুবই গরিব হতে পারি, কিন্তু অসাধু নই। আপনার কাছ থেকে দশ পাউন্ড নেওয়ার আগে তাই আমার মনে হয় আপনার জানা দরকার যে মাত্র পনেরো শিলিং দিয়ে মূর্তিটা কিনেছিলাম আমি।'

'আপনার মতো সৎ লোকের পক্ষেই এমন সংকোচ মানায়, মি. স্যান্ডিফোর্ড। কিন্তু যখন আমি দশ পাউন্ড দেব বলে কথা দিয়েছি, তখন আর তার নড়চড় হবে না।'

'আপনার উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন, মি. হোমস। চিঠিতে লেখা মূর্তি আমি সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন।'

ব্যাগ খোলার পর শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত নেপোলিয়নের মূর্তি দেখতে পেলাম চোখের সামনে। এর আগে বার বার দেখেছি রাশি রাশি ভাঙা টুকরো। আভাঙা নমুনা দেখার সৌভাগ্য হল এই প্রথম।

হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলে। তারপর দশ পাউন্ডের নোট টেবিলে রেখে বললে, 'মি. স্যান্ডিফোর্ড, কিছু মনে করবেন না। এঁরা সাক্ষী রইলেন, এই কাগজটায় একটা সই দিয়ে দিন। মূর্তির সর্বস্বত্ব যে আমি কিনে নিলাম, এইটুকুই শুধু লেখা আছে কাগজটায়। আমি একটু আটঘাট বেঁধে কাজ করি, মি. স্যান্ডিফোর্ড। সই দিতে বলছি সেই কারণেই। পরে কী ঘটবে-না-ঘটবে তা তো আপনি জানেন না। ধন্যবাদ মি. স্যান্ডিফোর্ড। টাকাটা নিয়ে নিন। আচ্ছা, গুড ইভনিং।'

মি. স্যান্ডিফোর্ড অদৃশ্য হওয়ামাত্র হোমসের কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। ড্রয়ারের ভেতর থেকে এক টুকরো সাদা কাপড় বার করে প্রথমে সে বিছিয়ে নিলে টেবিলের ওপর। তারপর সযত্নে সদ্য পাওয়া নেপোলিয়নের মূর্তিটাকে বসালে কাপড়ের ঠিক মাঝখানে। সবশেষে হান্টিং ক্রপটা দিয়ে মোক্ষম একটা ঘা মারলে নেপোলিয়নের ঠিক মাথার ওপর।

চুরমার হয়ে গেল মূর্তিটা। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাপড়টার মধ্যে। হোমস সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ল এই ধ্বংসাবশেষের ওপর।

পরমুহূর্তেই, জয়ের আনন্দে তীব্র চিৎকার করে একটা টুকরো তুলে ধরল আমাদের দিকে—পুডিংয়ের মধ্যে কিশমিশের মতো কালো একটা গোলাকার বস্তু আটকে ছিল তাতে।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আসুন, আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই বর্জিয়ার[১৩] বিখ্যাত কালো মুক্তোর সাথে।'

মুহূর্তের জন্য আমি আর লেসট্রেড বসে রইলাম নিশ্চুপ হয়ে। তারপরেই ঠিক রসঘন নাটকের চরম মুহূর্তের ধাপে ধাপে পৌঁছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভেঙে পড়লাম ঘন ঘন হাততালিতে। লাল হয়ে উঠল হোমসের পাণ্ডুর গাল। মাথা নীচু করে আমাদের অভিবাদন জানালে সে।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে শুরু করল হোমস, 'পৃথিবীতে যত নামকরা মুক্তো বর্তমান আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল বর্জিয়ার মুক্তো। অনেকদিন আগে ডেকার

হোটেলে কোলোন্নার যুবরাজের[১৪] শোবার ঘরে হারিয়ে গিয়েছিল মুক্তোটা। আমার পরম সৌভাগ্য, সেই হারানো মুক্তোটাই আজ খুঁজে পেলাম স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি ছ-টি নেপোলিয়নের মূর্তির সর্বশেষটির মধ্যে।

'লেসট্রেড, তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে কীরকম সাড়া পড়ে গেছিল এই মূল্যবান রত্নটি অদৃশ্য হওয়ার পর। লন্ডন পুলিশ বৃথাই চেষ্টা করেছিল এর হদিশ পাওয়ার। আমার কাছ থেকেও পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনোরকম আলোকপাত করতে পারিনি আমি। যুবরানির একজন ইটালিয়ান পরিচারিকা ছিল। সন্দেহ এসে পড়ল তার ওপর। লন্ডনে একজন ভাই ছিল বটে, কিন্তু ভাইবোনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বার করা সম্ভব হয়নি। পরিচারিকার নাম ছিল লুক্রেতিয়া ভেনাসসি। এই লুক্রেতিয়ার ভাই পিয়েত্রোই যে দু-দিন আগে খুন হয়েছে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। পুরানো কাগজ ঘেঁটে দেখলাম, ছুরি মারার অপরাধে বেপ্পো গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক দু-দিন আগে উধাও হয়েছে মুক্তোটা। বেপ্পো গ্রেপ্তার হয়েছে ঠিক তখনই যখন গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে নেপোলিয়নের ছ-টা মূর্তি তৈরি হচ্ছিল। বুঝতেই পারছ তারপর যা ঘটেছে। আমাকে অবশ্য উলটো দিক থেকেই সব বুঝতে হয়েছে। মুক্তোটা বেপ্পোর কাছেই ছিল। কী করে তার কাছে এসেছে, তা অবশ্য জানি না। পিয়েত্রোর কাছ থেকে চুরি করতে পারে সে, পিয়েত্রোর সঙ্গী হতে পারে সে, অথবা পিয়েত্রো আর লুক্রেতিয়ার মধ্যে সূত্রও হতে পারে। সে যাই হোক না কেন, তা জেনে আসল সমস্যার এতটুকু সমাধান করতে পারব না।

'আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে মুক্তটা তার কাছেই ছিল। এবং ঠিক সেই সময় পুলিশ পিছু নেয় তার। যে-কারখানায় সে কাজ করত, তাড়া খেয়ে সেখানে পৌঁছে ঝটপট একটা কিছু ভাবতে বসল বেপ্পো। কয়েক মিনিট মাত্র সময়। এই সময়ের মধ্যে মহা মূল্যবান পাথরটাকে কোথাও লুকোতে না-পারলে চিরকালের মতো তা হারাতে হবে। একবার দেহ তল্লাশ করলেই পুলিশের হাতে চলে যাবে কষ্টে পাওয়া জিনিসটা। ছ-টা নেপোলিয়নের মূর্তি শুকোচ্ছিল। একটা তখনও শক্ত হয়ে যায়নি। চকিতে কুশলী কারিগর বেপ্পো একটা মূর্তির ভিজে প্লাস্টারের মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটো করে মুক্তোটাকে চালান করে দিল ভেতরে। হাতের দু-এক টানেই গর্ত বুজে গেল— আর পাঁচটা থেকে কোনো পার্থক্যই রইল না। এত অল্প সময়ে এমন চমৎকার লুকোনোর জায়গা বার করার জন্য তার তারিফ করি আমি। মূর্তি ভেঙে মুক্তো বার করার কল্পনা কারো মাথাতেও আসবে না। কিন্তু বিচারে এক বছরের জেল হয়ে গেল বেপ্পোর। ইতিমধ্যে লন্ডনে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল মূর্তি ছ-টা। ঠিক কোনটার মধ্যে যে মুক্তোটা আছে, তা সে নিজে জানত না। প্রত্যেকটা মূর্তি ভেঙে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঝাঁকানি দিলেও বোঝা সম্ভব নয়, কেননা ভিজে প্লাস্টারের গায়ে মুক্তোটা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, হয়েছেও তাই।

'যাই হোক, দমে যাওয়ার পাত্র নয় বেপ্পো। অধ্যবসায় আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়ে শুরু হল তার তল্লাশ পর্ব। গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে তার এক খুড়তুতো ভাই কাজ করত। তার মারফত সে জানতে পারলে কোন কোন দোকান মূর্তিগুলো কিনে নিয়ে গেছে। মর্স হাডসনের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হল না তার পক্ষে। ফলে তিনটে মূর্তির হদিশ বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুক্তো পাওয়া গেল না। তারপর কোন ইটালিয়ান কর্মচারীর সাথে যোগসাজশ করে বাকি তিনটে মূর্তির ঠিকানাও নিলে সে। প্রথমটা ছিল হার্কারের কাছে। সেখানে পিছু নিলে তার

কুকাজের সঙ্গী পিয়েত্রো। মুক্তো হারানোর জন্যে বেপ্পোকে দায়ী করতেই বচসা শুরু হল। তারপর হাতাহাতি। সব শেষে বেপ্পোর ছুরিতে পিয়েত্রোর জীবন লীলা সাঙ্গ হল।'

প্রশ্ন করলাম, 'পিয়েত্রো যদি বেপ্পোর কুকাজের সঙ্গীই হয়, তাহলে তার ফটোগ্রাফ নিয়ে ঘুরবে কেন?'

'তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে বেপ্পোকে খুঁজে বার করার জন্যই ফটোটা রেখেছিল সে। এ ছাড়া আর কোনো কারণই নেই। সে যাই হোক, ভেবেচিন্তে দেখলাম, খুনের পর আর অযথা দেরি না-করে চটপট কাজ সারার চেষ্টা করবে বেপ্পো। পুলিশ গোপন কথা জেনে ফেলতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার প্ল্যান করলে সে। পুলিশ কিছু জেনে ওঠার আগেই কাজ শেষ করে যাতে গা ঢাকা দিতে পারে। অবশ্য হার্কারের মূর্তির মধ্যে মুক্তোটা পাওয়া গেছে কি না তা জানতাম না আমি। জিনিসটা মুক্তো কিনা সে-বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত হতে পারিনি। সে যে মূর্তি চুরমার করছে মূর্তির মধ্যে লুকানো অন্য কিছুর জন্য, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। মূর্তিটাকে অতটা বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের মধ্যে বাতির তলায় চুরমার করেছে দেখেই তা বুঝেছিলাম। বাকি তিনটে মূর্তির মধ্যে হার্কারের মূর্তিটা অন্যতম ছিল বলেই সাহস করে বাজি রাখতে পেরেছিলাম তোমার সাথে। দুটো মূর্তি তখনও বাকি। লন্ডনে যেটা আছে, প্রথমেই সেটা চুরমার হবে, তা বুঝেই বাড়ির লোকদের আমি আগে থাকতেই সাবধান করে দিলাম যাতে আবার খুনখারাপির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তারপর গেলাম। ফলে লেসট্রেড পেল পিয়েত্রোর খুনিকে। আমি কিন্তু ততক্ষণে জেনে গেছি যে বর্জিয়ার মুক্তোর পেছনেই ধাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের। নিহত লোকটার নাম জানার ফলেই দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ পেয়ে গেলাম। বাকি রইল শুধু একটা মূর্তি— রিডিং-এর মি. স্যান্ডিফোর্ডের মুক্তো সেখানেই আছে জেনে আনবার ব্যবস্থা করলাম। তোমাদের সামনেই তো পৌঁছেছে আমার টেবিলে এবং এই সেই বর্জিয়ার মুক্তো।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম সবাই।

টীকা

১. **কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয়** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়ন্স' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের মে ১৯০৪ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ৩০ এপ্রিল ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **ডিভাইন** : গবেষকরা মনে করেন ফ্রান্সে বসবাসকারী বেলজিয়ান ভাস্কর পল ডি ভিন (১৮৪৩-১৯০১) অথবা ইংরেজ ভাস্কর জেমস এস. ডি. ভিল (১৭৭৬-১৮৪৬)-এর আদলে এই নামটি লেখক গল্পে ব্যবহার করেছেন।

৩. **idee fixe** : কোনো ভাবনা বা চিন্তাধারা মনে গেঁথে যাওয়ার ফরাসি প্রতিশব্দ। মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সংজ্ঞা।

৪. **সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেট** : কাল্পনিক নাম। বাস্তবে একটি সংবাদ সংস্থা ছিল 'সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি' নামে।

৫. **হার্ডিং ব্রাদার্স** : মেট্রোপলিটান অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে স্টেশনের লাগোয়া ১২৩-১২৭, কেনসিংটন হাই স্ট্রিটে এই ধরনের একটি দোকান ছিল, যার নাম পন্টিং ব্রাদার্স।

৬. **নিহিলিস্ট** : 'নিহিল' শব্দের অর্থ 'নাই'। শব্দটির প্রচলন মধ্যযুগ থেকে, কিন্তু জনপ্রিয় হয় ১৮৬২-তে প্রকাশিত আইভ্যান তুর্গেনিভের উপন্যাস 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স'-এ আলোচিত হওয়ার পর। তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল নিহিলিস্টদের। কোনো সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্কে এদের বিশ্বাস ছিল না।

৭. **বেরড রিপাবলিকান :** ফরাসি বিপ্লবের র‍্যাডিক্যাল নেতাদের ব্যবহৃত লাল রঙের জন্য তাদের এই নামে অভিহিত করা হত।

৮. **একে একে পেরিয়ে গেলাম :** হোমস-গবেষক জেমস এডওয়ার্ড হলরয়েড জানিয়েছেন কেনসিংটন থেকে স্টেপনি যেতে হলে লন্ডনের এই অঞ্চলগুলি পার হওয়ার দরকার পড়ে না। এই জায়গাগুলি টেমস নদীর উত্তরে অবস্থিত। আর হোমসের গন্তব্যের সোজা পথ গিয়েছে নদীর দক্ষিণ দিক ধরে। প্রাচীন লন্ডন শহরের বা হোমসের সমসাময়িক লন্ডন শহরের যে রোড-ম্যাপ পাওয়া যায়, তা থেকে এই যাত্রাপথ বা অন্যান্য কাহিনিতে হোমসের বিচরণ-পথ সামান্য হলেও বোঝানো যেতে পারত। কিন্তু লন্ডন শহরের রাস্তাঘাট স্বচক্ষে দেখা না-থাকলে বর্তমানের সঙ্গে সেই মানচিত্রের যোগাযোগ সাধন করা দুষ্কর।

৯. **পদবি জানি না :** ম্যানেজার কর্মচারীর পদবী জানে না, অথচ মাইনের খাতায় বেপ্পোর নাম আছে। সেখানে পদবী লেখা নেই, তা অবিশ্বাস্য।

১০. **স্যাফ্রন হিল :** লন্ডন শহরের প্রধান দুটি ইতালিয়ান অধ্যুষিত এলাকা হল হলবর্ন এবং সোহো। এদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম হলবর্নকে স্যাফ্রন হিল বলা হত।

১১. **মাফিয়া :** শেষ মধ্যযুগে ইতালির সিসিলিতে বিদেশি আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে স্থানীয় জমিদারদের গড়ে তোলা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনি পরবর্তীকালে পরিণত হয় সংঘবদ্ধ অপরাধীদের জোট হিসেবে। 'মাফিয়া' শব্দের অর্থ 'আশ্রয়'।

১২. **প্রিয় হাতিয়ার :** এই গল্প ছাড়া 'রেড-হেডেড লীগ' এবং 'আ কেস অব আইডেন্টিটি' গল্পে হোমসকে এই হাতিয়ার সঙ্গে রাখতে দেখা গিয়েছে।

১৩. **বর্জিয়া :** বর্জিয়া বংশ মূলত স্পেন দেশীয় হলেও এরা বহুকাল ইতালি শাসন করেছে। ভ্যালেন্সিয়ার কার্ডিনাল আর্চবিশপ আলফোঁসো ডি বোর্জা (১৩৭৮-১৪৫৮) পোপ নির্বাচিত হন ১৪৫৫ সালে। তিনি ছিলেন পোপ তৃতীয় কালিক্সটাস। ১৪৯২-এ তাঁর ভাইপো রডরিগো হন পোপ চতুর্থ আলোকজান্ডার। তাঁর একাধিক অবৈধ সন্তানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিজার এবং লুক্রেজিয়া। সিজার প্রথম দিকে চার্চে যোগদান করলেও পরে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং ফ্রান্সের দ্বাদশ লুইয়ের সঙ্গে যোগসাজশে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসন করায়ত্ত করেন। সিজারের মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার ভাই লুক্রেজিয়া-ও।

১৪. **কোলোন্নার যুবরাজ :** এই কাহিনির ঘটনাকালে কোলোন্নার দুজন যুবরাজ জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন ফ্যাব্রিজিও অব আভেলা এবং প্রসপেরো অব সন্নিনো।

প্রশ্নপত্রের পলায়ন[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি স্টুডেন্টস]

১৮৯৫ সাল। একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনার চাপে পড়ে মি. শার্লক হোমস এবং আমাকে কয়েক হপ্তা একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে[২] থাকতে হয়েছিল। এইখানেই এক সন্ধ্যায় এক পরিচিত ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম মি. হিলটন সোমস, কলেজ অফ সেন্ট লিউকস-এর শিক্ষক এবং লেকচারার। রোগাটে লম্বা। নার্ভাস প্রকৃতির এবং একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেদিন তাঁর মধ্যে এমনই অদম্য উত্তেজনার লক্ষণ দেখলাম যে, বুঝতে অসুবিধে হল না বেজায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে।

'মি. হোমস, আমার বিশ্বাস আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েকটি ঘণ্টা আমার জন্য ব্যয় করবেন। সেন্ট লিউকস-এ একটা বড়ো বিশ্রী কাণ্ড ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে এ-শহরে আপনি

এখন উপস্থিত রয়েছেন। তা না হলে আমি তো ভেবেই পেতাম না যে, এ-পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আমার।

'আগেই একটা জিনিস খোলসা করে রাখি আপনার কাছে। আগামীকালই ফর্টেস্ক স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রথম দিন। পরীক্ষকদের মধ্যে আমিও আছি। আমার বিষয় গ্রিক। ফার্স্ট পেপারে ছাত্রদের অদেখা একটি মস্তবড়ো প্যাসেজ থাকে গ্রিক থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য। পরীক্ষার খাতাতেই ছাপা থাকে এই প্যাসেজটা। কাজেই কোনো পরীক্ষার্থী যদি আগে থেকেই প্যাসেজটা তৈরি করে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে স্বভাবতই বিলক্ষণ সুবিধে হয় তার। এই কারণেই কাগজটাকে গোপন রাখার জন্য দারুণ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

'আজকে প্রায় তিনটের সময়ে কাগজটার প্রুফ এসে পৌঁছোয় ছাপাখানা থেকে। থিউসিডাইডিজ[৩]-এর আধখানা পরিচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয়েছে তরজমার জন্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্যাসেজটা পড়তে হয় আমায়, কেননা তা অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল থাকা দরকার। সাড়ে চারটার সময়েও শেষ হল না আমার কাজ। এক বন্ধুর বাড়িতে চা-পানের কথা ছিল। তাই প্রুফটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেলাম আমি। ঘন্টাখানেকেরও বেশি হবে বাইরে ছিলাম। আপনি তো জানেন, মি. হোমস, আমদের কলেজের দরজাগুলো ভেতর বাইরে দু-রকম হয়। ভেতর দিকে থাকে সবুজ রঙের পুরু পশমি কাপড়ের আবরণ। আর বাইরের দিকে ভারী ওক কাঠের পাল্লা। বাইরের দরজার দিকে এগুতেই অবাক হয়ে গেলাম চাবির গর্ত থেকে একটা চাবি ঝুলতে দেখে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো-বা ভুলে ফেলে গেছি আমি। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখি, তা তো নয়। যতদূর আমি জানি, ঘরের দোসরা চাবি থাকে শুধু একজনের কাছেই এবং সে আমার পরিচারক ব্যানিস্টার। আজ দশ বছর হল ব্যানিস্টার আমার সব কিছু দেখাশুনা করে আসছে এবং তার সততা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার জাগে না। দেখলাম, চাবিটা তারই বটে। আমি চা পান করব কি না, তা জিজ্ঞেস করার জন্যেই ঘরে ঢুকেছিল ও। তারপর বেরিয়ে আসার সময়ে ভুল করে চাবিটা রেখে এসেছে দরজায়। অত্যন্ত অসাবধানীর মতো কাজ। আমি বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চয় এসেছিল ও ঘরের মধ্যে। চাবি সম্বন্ধে ওর এতটা ভুল হওয়াটা অন্য সময় হলে কোনোরকম ক্ষতিকর ছিল না এবং তাতে এমন কিছু যেত আসত না। কিন্তু আজকের দিনে এই সামান্য ভুলের পরিণাম কী নিদারুণ শোচনীয়, তা কহতব্য নয়।

'টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলাম কে যেন আমার কাগজপত্র হাতড়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে। লম্বা লম্বা তিনটে স্লিপ কাগজে প্রুফটা এসেছিল[৪]। তিনটে কাগজই একসঙ্গে রেখে গেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখলাম, একটা কাগজ পড়ে মেঝের ওপর, একটা জানলার পাশে রাখা সাইড-টেবিলের ওপর, আর তৃতীয়টা আমি যেখানে রেখে গেছিলাম ঠিক সেখানেই!"

এই প্রথম নড়েচড়ে বসল হোমস।

'প্রথম পাতাটা মেঝের ওপর, দ্বিতীয়টা জানলার কাছে, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখে গেছিলেন সেখানেই?' বলল সে।

'এগজ্যাক্টলি, মি. হোমস। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি কী করে জানলেন?'

'দয়া করে আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং কাহিনির বাকিটুকু বলে ফেলুন।'

'ক্ষণিকের জন্য ভেবেছিলাম, বুঝি-বা ব্যানিস্টারই এই ক্ষমাহীন অপরাধটি করেছে। আমার অবর্তমানে খুশিমতো নাড়াচাড়া করে দেখেছে আমার কাগজপত্র। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলে।

তার সুগভীর ঐকান্তিকতা দেখে বুঝলাম, সত্য বই মিথ্যে বলেনি সে। তাহলে বিকল্প অনুমান দাঁড়াচ্ছে এই— এদিক দিয়ে কেউ যেতে যেতে দরজায় চাবি ঝুলতে দেখেছিল। সে জানত আমি ঘরে নেই। তাই ভেতরে ঢুকেছিল আমার কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিতে। বিপুল অঙ্কের অর্থ জলে যেতে বসেছে মি. হোমস। স্কলারশিপটা বাস্তবিকই ভারি মূল্যবান। কাজে কাজেই, ন্যায় অন্যায় যে বোঝে না, অধর্ম-ভয়ে যে ঘাবড়ায় না, সে যদি অন্যান্য ছাত্রদের ওপর টেক্কা মারার বদ মতলবে এ-ঝুঁকি নেয় তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'এ-ঘটনায় দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছে ব্যানিস্টার। যখন দেখলাম সত্যি সত্যিই আমার কাগজপত্র সে ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে এবং এ-সম্বন্ধে যখন কোনো সন্দেহই আর রইল না, তখন তো ব্যানিস্টার প্রায় অজ্ঞান হয় হয় এমনি অবস্থা। খানিকটা ব্র্যান্ডি দিলাম ওকে। আধমরার মতো ও জবুথবু হয়ে বসে রইল একটা চেয়ারে। আর আমি আবার বেশ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটাকে। তখনই দেখলাম, এদিকে সেদিকে ছড়ানো কাগজ ছাড়াও আগন্তুক তার অনধিকার প্রবেশের আরও কিছু চিহ্ন রেখে গেছে ঘরের মধ্যে। জানলার কাছে টেবিলের ওপর পেনসিলের কাটা কাঠের কুটো দেখে বুঝলাম একটা পেনসিল ছুঁচোলো করা হয়েছিল সেখানে। একটা ভাঙা শিসও পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। অর্থাৎ, রাসকেলটা বেজায় তাড়াহুড়ো করে কাগজটাকে নকল করতে গিয়ে পেনসিলের শিস ভেঙে ফেলে। কাজেই বাধ্য হয়ে পেনসিল ছুলে আবার নতুন শিস বার করে নিতে হয় তাকে।'

'এক্সেলেন্ট।' বলে ওঠে হোমস। কেসটার বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে যতই তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল ও, ততই শরিফ হয়ে উঠেছিল বিগড়োনো মেজাজ। 'ভাগ্য আপনার সহায়।'

'এ-ই সব নয়, মি. হোমস, আরও আছে। আমার লেখার টেবিলটা নতুন। পাতলা মসৃণ লাল চামড়া দিয়ে ঢাকা ওপরটা। শুধু আমি নয়। ব্যানিস্টারও আমার সুরে সুর মিলিয়ে শপথ করে বলতে রাজি আছে যে মোলায়েম চামড়ার ওপরে এতটুকু আঁচড় বা দাগ কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখনও দেখলাম, প্রায় ইঞ্চি তিনেকের মতো লম্বা একটা পরিষ্কার কাটা। নিছক আঁচড়ের দাগ নয়, সত্যিকারের কাটা। শুধু তাই নয়। টেবিলের ওপর কাদা মাটি, খমির বা অন্য কোনো নরম পদার্থের একটা ছোট্ট বলও পেলাম। বলটার গায়ে ফুটকি দাগ দেখে করাতচেরা কাঠের গুঁড়ো বলে মনে হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-লোকটা আমার কাগজপত্র ঘেঁটে গেছে, এসব চিহ্ন তারই। পায়ের ছাপ বা লোকটাকে শনাক্তকরণের অন্য কোনো প্রমাণাদি পেলাম না ঘরে। দেখেশুনে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি তো বেবাক গুলিয়ে গেল। কিন্তু আপনি যে এই শহরেই এখন রয়েছেন, তা আচমকা মনে পড়তেই আশার আলো দেখলাম। তাই সিধে চলে এসেছি এ-কেস আপনার হাতে তুলে দিতে।'

দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে হোমস বললে, 'এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে সত্যিই খুশি হব আমি। আমার সাধ্যমতো পরামর্শও আমি দেব আপনাকে। কেসটা একেবারেই নিরেস নয়। ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কিছু আছে। পেপারগুলো আপনার হাতে আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আপনার ঘরে কেউ এসেছিল কি?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। ওই একই তলায় তরুণ ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম থাকে। পরীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি খুঁটিনাটি খবরাখবর জানতে এসেছিল ও।'

'পরীক্ষায় সে-ও বসছে?'

'হ্যাঁ।'

'পেপারগুলো টেবিলের ওপরেই ছিল, তাই না?'

'আমার যতদূর বিশ্বাস, গোল করে পাকানো ছিল কাগজগুলো।'

'কিন্তু প্রুফ বলে চেনা তো যেত?'

'খুব সম্ভব।'

'আর কেউ আসেনি?'

'না।'

'আর কেউ জানত কি যে আপনার ঘরে প্রুফগুলো আসবে?'

'ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ না।'

'ব্যানিস্টার জানত কি?'

'না, না, নিশ্চয় না। কেউ জানত না। বেচারি! খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল! চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ার পর ওই অবস্থাতেই তাকে রেখে পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

'দরজা খোলা রেখে এসেছেন?'

'দরজা খোলা রেখে এসেছেন?'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

'পেপারগুলো আগে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি ভেতরে।'

'তাহলে মি. হোমস ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই— ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম যদি পাকানো কাগজগুলোকে প্রুফ বলে চিনে না-থাকে, তাহলে যে-লোকটা কাগজগুলো ঘেঁটেছে সে কিন্তু কাগজগুলো যে ওখানে আছে তা না-জেনেই দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

প্রহেলিকা-আবিল দুর্বোধ্য হাসি হাসল হোমস।

বলল, 'চলুন, ঘুরে আসা যাক এক চক্কর। এ কিন্তু তোমার কেস নয়, ওয়াটসন— মানসিক ব্যাপার, শরীর ঘটিত নয়। বেশ, বেশ, ইচ্ছে হলে চলে এসো। মি. সোমস— আমরা প্রস্তুত!'

আমাদের মক্কেল ভদ্রলোকের বসার ঘরের লম্বা, কিন্তু নীচু জাফরিকাটা জানলার পরেই প্রবীণ কলেজের গাছ-শ্যাওলার ছোপ ছোপ দাগ কলঙ্কিত সুপ্রাচীন প্রাঙ্গণটা। গথিক প্যাটার্নের খিলানওলা দরজার পরেই ক্ষয়ে আসা পাথরের সিঁড়ির সারি। একতলায় মি. সোমসের ঘর। আর ওপরের তিনতলায় এক এক তলায় এক একজন ছাত্রের ঘর। এহেন হেঁয়ালি-দৃশ্যে যখন পৌঁছোলাম, তখন গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধরিত্রীর বুকে। তারপর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সারস পাখির মতো গলা লম্বা করে তাকাল ঘরের ভেতর।

আমাদের পণ্ডিত পথপ্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল লোকটা। কেননা কাচের শার্সিতে একটিমাত্র কাচ, তা ছাড়া আর প্রবেশপথ নেই।'

'কী বিপদ?' বলে ওঠে হোমস। তারপর মি. সোমসের পানে তাকিয়ে কীরকম যেন আশ্চর্যভাবে হেসে ওঠে। 'বেশ, বেশ, এখানে যদি কিছু না পাওয়া যায় তো চলুন, আমরা বরং ভেতরে যাই।'

চাবি ঘুরিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে ফেললেন লেকচারার, তারপর সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ভেতরে। প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। আর কার্পেটটা পরীক্ষা করতে শুরু করলে হোমস।

বললে, 'উঁহু, এখানে কোনো চিহ্ন দেখছি না। এ-রকম শুকনো খটখটে দিনে আশা করাও অন্যায়। আপনার পরিচারক মনে হচ্ছে বেশ সামলে নিয়েছে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বললেন। কোন চেয়ারটা বলুন তো?'

'জানলার পাশেরটা।'

'বটে। ছোট্ট এই টেবিলের কাছে, এখন ভেতরে আসতে পারেন আপনারা। কার্পেট দেখা সাঙ্গ হয়েছে আমার। এবার সবার আগে এই ছোটো টেবিলটা নিয়ে পড়া যাক। ঘটনা পরম্পরাগুলো কিন্তু জলের মতোই দিব্যি পরিষ্কার। লোকটা ঘরে ঢুকে মাঝখানের টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নেয়। একেবারেই সবগুলো নয়— প্রতিবারে একটি তাড়া। কাগজগুলো নিয়ে যায় সে জানলার ধারে টেবিলটার কাছে এই উদ্দেশ্যে যে, উঠোনের মাঝ দিয়ে আপনাকে আসতে দেখলেই সে সটকান দিতে পারবে অনায়াসে।'

সোমস বললেন, 'প্রকৃতপক্ষে সে তা পারত না। কেননা, আমি পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম।'

'আ, তা বেশ! সে যাই হোক, এই অভিসন্ধিই ছিল তার মনে। এবার দেখা যাক স্লিপ কাগজগুলো। আঙুলের ছাপ নেই—নাঃ! আচ্ছা, এইটাই সে প্রথমে নিয়ে যায় জানলার কাছে, নকলও করে ফেলে। সবরকমের সম্ভাবনা অল্পীকরণ পন্থা কাজে লাগিয়েও এটা কপি করতে তার কতক্ষণ লাগা উচিত? মিনিট পনেরো তো বটেই, তার কম নয় কিছুতেই। প্রথমটা হয়ে যেতেই ছুড়ে ফেলে দিয়ে তুলে নিলে পরেরটা। এই নিয়েই যখন সে ব্যস্ত, ঠিক তখনই এসে পড়লেন আপনি। বেজায় ত্বরিতগতিতে বিদ্যুতের মতো গা ঢাকা দিতে হল তাকে। মনে রাখবেন, খুব তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুতবেগে তাকে অন্তর্হিত হতে হয়েছে। কেননা, কাগজগুলো ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকা মানেই যে তার উপস্থিতি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া— তা সত্ত্বেও সে পেপারগুলো টেবিলের ওপর যথাস্থানে রেখে যেতে পারেনি, রাখার সময় পায়নি। দরজার সামনে পৌঁছে সিঁড়ির ওপর খুব দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'না। এ-বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলাম না আমি।'

'যাই হোক, ঝড়ের মতো লিখতে গিয়ে পেনসিলের শিস ভেঙে ফেলে সে। আপনি তো লক্ষ করেছেন, আবার পেনসিল ছুলে ছুঁচোলো করতে হয়েছে তাকে। পয়েন্টটা কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক, ওয়াটসন। পেনসিলটা সাধারণ পেনসিল নয়। আর পাঁচটা পেনসিলের মতোই এর সাইজ। নরম শিস। বাইরের রংটা গাঢ় নীল। রুপোলি অক্ষরে লেখা নির্মাতার নাম। অনেক ব্যবহারের পর, তার এখনকার দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে দেড় ইঞ্চি। মি. সোমস, এইরকম একটা পেনসিলের সন্ধানে থাকুন, তাহলেই যাকে খুঁজছেন তার হদিশ আপনি পেয়ে যাবেন। এইসঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিই— বড়ো সাইজের বেজায় ভোঁতা, একটা ছুরিও পাবেন লোকটার কাছে। আপনার আরও সুবিধে হয়ে গেল, মি. সোমস।'

মি. সোমস তখন তথ্যের এহেন বন্যায় বেশ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। 'অন্যান্য পয়েন্টগুলো না হয় বুঝলাম। কিন্তু দৈর্ঘ্য সম্পর্কে যা বললেন—'

ছোট্ট একটা কুচো তুলে নিলে হোমস। কুচোটার ওপর NN অক্ষর দুটি লেখা এবং তারপরে খানিকটা কাঠ একদম ফাঁকা।

'দেখছেন তো?

'না, দেখছি না, এখনও আমি বুঝতে পারছি না—'

'ওয়াটসন, চিরকালই তোমার ওপর অবিচার করে এসেছি আমি। এদিক দিয়ে তুমি একলা নও, আরও অনেকে আছেন। এই NN অক্ষর দুটো কী হতে পারে বলো তো? একটা শব্দের শেষের দুটো অক্ষর। তুমি তো জান JOHANN FABER[৫] হচ্ছে সবচেয়ে নামকরা পেনসিলনির্মাতার নাম। JOHANN শব্দটার পর সাধারণত পেনসিলের কতখানি অংশ অবশিষ্ট থাকে, তা অনুমান করা কি খুব কঠিন?' ছোটো টেবিলটাকে কাত করে বৈদ্যুতিক বাতির দিকে ফিরিয়ে ধরলে হোমস। 'ভেবেছিলাম, যে-কাগজে সে লিখেছে, তা যদি পাতলা হত, তাহলে পেনসিলের চাপে কিছু কিছু চিহ্ন ফুটে উঠত পালিশ করা চকচকে টেবিলের ওপর। নাঃ, তেমন কিছুই দেখছি না। এখানে আর কিছু জানা যাবে বলে তো মনে হয় না আমার। এবারে মাঝখানের টেবিলটা। কাদামাটি বা নরম পদার্থের এই ছিটে গুলির মতো বলটার কথাই আপনি বলছিলেন, তাই না? আকারে মোটামুটি পিরামিডের মতো। হুঁ, ভেতরটা প্রায় ফাঁপা। ঠিকই বলছেন, মি.

সোমস, করাত চেরা কাঠের গুঁড়োর মতোই কয়েকটা কণা দেখা যাচ্ছে বটে। সর্বনাশ এ তো দেখছি দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস। আর এই কাটাটা— বটে, দেখছি সত্যি সত্যিই ছিঁড়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে চামড়াটা। শুরু হয়েছে পাতলা আঁচড় দিয়ে, শেষ হয়েছে খাঁজকাটা গর্তে। এ-কেসে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, মি. সোমস। এ-দরজা দিয়ে যাওয়া যায় কোথায়?'

'আমার শোবার ঘরে।'

'আপনার অ্যাডভেঞ্চারের পর ও-ঘরে আর গিয়েছিলেন?'

'না। সিধে চলে গেছি আপনার কাছে।'

'ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। বাঃ, ভারি সুন্দর ঘর তো! দিব্যি সেকেলে কায়দায় সাজানো! মেঝে পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মিনিটখানেকের জন্য সবুর করবেন নিশ্চয়। এ-পর্দাটা কীসের? পেছনে পোশাক-টোশাক বুঝি? এ-ঘরে যদি কেউ লুকোতে চায়, তাহলে তার আদর্শ স্থান হল এইখানটা। কেননা বিছানাটা দারুণ নীচু, পোশাক রাখার আলমারিটাও বেজায় পাতলা। কেউ নেই বলেই তো মনে হয়, তাই না?'

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলে হোমস। আমি কিন্তু ওর সামান্য শক্ত হয়ে ওঠা আর ভাবভঙ্গির সজাগ সতর্কতা দেখেই বুঝেছিলাম আচমকা কারো বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তবে পর্দায় হাত দিয়েছে ও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পর্দা সরানোর পর আলনা থেকে ঝোলানো তিন-চারটে সুট ছাড়া আর কারো টিকিটিও দেখা গেল না ওই স্বল্প পরিসরের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়াল হোমস। তার পরেই হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর।

'আরে! আরে! এটা কী?' বলে ওঠে ও।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পিরামিড। কালো রঙের পুটিন জাতীয় উপাদানে তৈরি। পড়াশুনা করার ঘরে টেবিলের ওপর যে পিরামিডটি পাওয়া গেছে, হুবহু সেইরকম। হাতের তালুর ওপর জিনিসটা রেখে প্রখর বিদ্যুৎ-বাতির নীচে ধরল হোমস।

আগন্তুক শুধু আপনার বসবার ঘরেই নয়, মি. সোমস, শোবার ঘরেও তার আগমনের চিহ্ন রেখে গেছে দেখছি।'

'কিন্তু এখানে তার কী দরকার?'

'আমার তো মনে হয় তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। অপ্রত্যাশিত পথে দুম করে ফিরে এলেন আপনি। কাজে কাজেই আপনি একেবারে দোরগোড়ায় না-এসে পৌঁছানো পর্যন্ত হুঁশিয়ার হওয়ার মতো কোনো নিশানাই পেল না সে। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তার? যে যে জিনিসগুলো তাকে ধরিয়ে দেবে, সেইগুলোই দু-হাতে তুলে নিয়ে তিরবেগে ঢুকে পড়ল সে আপনার শোবার ঘরে গা-ঢাকা দেওয়ার অভিপ্রায়ে।'

'হে ভগবান! মি. হোমস, আপনি কি তাহলে বলেন, যতক্ষণ ব্যানিস্টারের সঙ্গে ও-ঘরে আমি কথা বলছিলাম, ততক্ষণ আসল লোকটা ঘাপটি মেরে ছিল এ-ঘরে, আর আমি তার কিছুই জানতে পারিনি?'

'তাই তো দেখছি।'

'নিশ্চয় আর একটা বিকল্প আছে, মি. হোমস? আমার শোবার ঘরের জানলাটা লক্ষ করেছেন কি?'

'জাফরি-কাটা, কাচের শার্সিওলা, সিসের ফ্রেম, তিনটে আলাদা আলাদা জানলা, একটায় কবজা লাগানো এবং এত বড়ো যে অনায়াসেই একজন মানুষ ঢুকতে পারে।'

'এগজ্যাক্টলি। উঠোনের দিকে কোণ করে থাকায় জানলার খানিকটা প্রায় অদৃশ্য থাকে বললেই চলে। ওই দিক দিয়েই লোকটা ঢুকেছিল ভেতরে। শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে যায় ঘরের মধ্যে। সবশেষে, দরজাটা খোলা পেয়ে লম্বা দেয় সেই পথেই।'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস।

বললে, 'এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া যাক। আপনি তো বললেন না, তিনজন ছাত্রই এ-সিঁড়ি ব্যবহার করে বলে প্রায় তাদের যাতায়াত করতে হয় আপনাদের দরজার সামনে দিয়ে, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তিনজনেই পরীক্ষায় বসছে?'

'হ্যাঁ।'

'তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাউকে সন্দেহ করার কোনো কারণ আপনার আছে কি?'

ইতস্তত করতে লাগল সোমস।

তারপর বললে, 'এ বড়ো জবর প্রশ্ন করলেন, মি. হোমস মহা ফাঁপরে ফেললেন আমায়। প্রমাণাদির বালাই যেখানে নেই, সেখানে চট করে কেউ কি কাউকে সন্দেহ করতে চায়?'

'সন্দেহই শোনা যাক। প্রমাণ খোঁজার ভার আমার।'

'তাই যদি হয় তো সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় তিন ঘরের তিন বাসিন্দার চরিত্র বর্ণনা করেছি। নীচের তলায় থাকে গিলক্রাইস্ট, ছাত্র হিসাবে ভালো। খেলোয়াড় হিসাবেও সুনাম আছে। কলেজের রাগবি আর ক্রিকেট টিমে খেলে। হার্ডলস অর লং জাম্পে ব্লু হয়েছে[৬]। চমৎকার ছেলে সে, সব দিক দিয়ে পুরুষের মতো। রেসকোর্সে যিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, সেই কুখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রাইস্ট ওর বাবা। ছেলে কিন্তু খুবই গরিব। তাহলেও সে কঠোর পরিশ্রমী আর অধ্যবসায়ী। পরীক্ষায় ওর ফলাফল ভালোই হবে।

'দোতলায় থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম। ছেলেটি শান্তশিষ্ট দুর্বোধ্য এবং আগাগোড়া রহস্যময়। সব ভারতীয়ই যা হয়, তাই আর কি। পড়াশুনায় সে ভালোই, যদিও সব সাবজেক্টের মধ্যে গ্রিকেই সে কাঁচা। অটল তার চরিত্র এবং কাজকর্মও বেশ পদ্ধতিমাফিক।

'ওপরের তলাটা মাইলস ম্যাকলারেনের। কোনো কাজ যদি করবে বলে মনে করে তো ধীশক্তির দিক দিয়ে তার জুড়ি মেলা ভার। এই ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বলতম প্রতিভাদের অন্যতম সে। কিন্তু সে চঞ্চলচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল আর নীতিহীন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে তাস খেলা নিয়ে একটি কেলেঙ্কারি হওয়ায় কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এবারের পুরো পাঠক্রমটা সে ফাঁকি দিয়েছে। কাজেই নিশ্চয় এ-পরীক্ষা একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।'

'তাহলে একেই আপনি সন্দেহ করেন বলুন?'

'অতদূর যাওয়ার সাহস আমার নেই! তবে তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কম সন্দেহ যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে সে হয়তো মাইলস ম্যাকলারেন নয়।'

'এগজ্যাক্টলি। মি. সোমস এবার আপনার পরিচারক ব্যানিস্টারকে একটু দেখতে চাই।'

লোকটা আকারে ছোটোখাটো। সাদাটে, পরিষ্কার কামানো মুখ। ধোঁয়াটে রঙের কাঁচাপাকা চুল। বছর পঞ্চাশ বয়স। রোজকার অচঞ্চল জীবনধারায় এই আকস্মিক উৎপাতের যন্ত্রণায় তখনও কষ্ট পাচ্ছিল সে। স্নায়বীয় দুর্বলতার জন্যে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার গোলগাল মুখ। হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত স্থির রাখতে পারছিল না বেচারি।

মি. সোমস বললেন, 'এই যাচ্ছেতাই ব্যাপারটার একটা বিহিত করা দরকার, তাই আমরা তদন্ত শুরু করেছি, ব্যানিস্টার।'

'ইয়েস, স্যার।'

হোমস বললে, 'শুনলাম দরজায় চাবি ফেলে গেছিলে তুমি?'

'ইয়েস, স্যার।'

'যেদিন পেপারগুলো ঘরের মধ্যে এল, ঠিক সেইদিনই চাবি খুলে নিতে ভুলে গেলে তুমি— যোগাযোগটা কি খুব অসাধারণ ঠেকছে না?'

'আমার কপাল মন্দ, স্যার। কিন্তু এর আগেও মাঝে মাঝে এমন ভুল আমার হয়েছে।'

'ঘরে ঢুকেছিলে কখন?'

'সাড়ে চারটা নাগাদ। মি. সোমসের চা-পানের সময় তখন।'

'কতক্ষণ ছিলে ঘরের ভেতর?'

'উনি ঘরে নেই দেখে তখুনি বেরিয়ে যাই আমি।'

'টেবিলের ওপর রাখা পেপারগুলো লক্ষ করেছিলে?'

'না, স্যার, মোটেই করিনি।'

'দরজা থেকে চাবি খুলে নিতে ভুলে গেলে কেমন করে?'

'আমার হাতে চায়ের ট্রে ছিল। ভাবলাম, ফিরে এসে নিয়ে যাব চাবিটা। তারপর ভুলে গেছি।'

'বাইরের দরজায় কি স্প্রিংয়ের তালা লাগানো আছে?'

'না, স্যার।'

'তাহলে সর্বক্ষণই খোলা ছিল দরজাটা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'মি. সোমস ফিরে এসে তোমাকে যখন ডেকে পাঠান, তখন তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলে?'

'ইয়েস, স্যার। এত বছর এখানে আছি। কিন্তু এ-রকম ঘটনা তো কোনোদিন ঘটেনি। প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছিল আমার।'

'তা তো বটেই। যখন বুঝলে শরীর খারাপ লাগছে, তখন কোনখানটায় ছিলে তুমি?'

'কোনখানে ছিলাম স্যার? কেন এইখানে দরজার পাশেই।'

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! এতটা পথ গিয়ে দূরের কোণে ওই চেয়ারটায় বসেছিলে কিনা, তাই বললাম। মাঝের এ-চেয়ারে বসলে না কেন শুনি?'

'জানি না স্যার। বসার জায়গা নিয়ে তখন আমি এত ভাবিনি।'

'এ-ব্যাপারে ও যে বিশেষ কিছু জানে, তা আমার সত্যি সত্যিই মনে হয় না, মি. হোমস। খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল ওকে— ছাইয়ের মতো একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল।'

'মি. সোমস চলে যাওয়ার পর এ-ঘরে ছিলে তুমি?'

'মিনিটখানেকের জন্যে ছিলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই আমি।'

'কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'কারো নাম করার আমার সাহস হয় না স্যার। এ ধরনের নোংরা কাজ করে লাভবান হওয়ার মতো প্রবৃত্তি এ-ইউনিভার্সিটিতে কোনো ভদ্রলোকের আছে বলে মনে হয় না আমার। না, স্যার, আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

'ধন্যবাদ। ওতেই হবে।' বললে হোমস। 'ওহো, আরও একটা কথা। এই যে তিনজন ভদ্রলোকের দেখাশুনা কর তুমি, ওদের কাউকে বলনি তো এখান থেকে কিছু খোয়া গেছে?'

'না, স্যার, একটা অক্ষরও বলিনি।'

'ওদের কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না, স্যার।'

'বেশ, বেশ। এবার অনুমতি করেন তো চত্বরটা এক পাক ঘুরে আসা যাক।'

সন্ধ্যার বিষণ্ণ আঁধার গাঢ় হয়ে আসছিল। তারই মাঝে তিনটে হলুদ রঙের চৌকোনা আলো ঝকমক করছিল আমাদের মাথার ওপরে।

ওপরে তাকিয়ে হোমস বললে, 'আপনার তিনটে পাখিই দেখছি নিজের নিজের বাসায় রয়েছে। আরে! আরে! ও কী! ওদের একজন তো দারুণ অশান্তিতে ছটফট করছে মনে হচ্ছে!'

পর্দার ওপর আচমকা ভেসে উঠল ভারতীয় ছাত্রের কুচকুচে কালো ছায়া। দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি জুড়েছিল সে।

হোমস বললে, 'ওদের প্রত্যেকের ঘরে একবার ঝাঁকি দর্শন দিয়ে আসতে চাই! সম্ভব হবে কি?'

সোমস জবাব দিলেন, 'কোনো অসুবিধে নেই। এ ঘর তিনটে কলেজের সবচেয়ে পুরানো ঘর বলে দর্শনেচ্ছুর আগমনটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আসুন, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।'

গিলক্রাইস্টের দরজায় টোকা মারার সঙ্গেসঙ্গে হোমস বলে উঠল, 'নাম বলবেন না, প্লিজ!' ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘতনু একটি যুবাপুরুষ দরজা খুলে দিলে। সোনালি রেশমের মতো একমাথা হালকা চুল। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে ভেতরে। মধ্যযুগীয় গার্হস্থ্য স্থাপত্যের কতকগুলি বিচিত্র নিদর্শন ছিল ঘরের মধ্যে। সত্যি সত্যি দেখবার মতো! একটা দেখে হোমস তো এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গেল যে তা আঁকতে শুরু করে দিলে নিজের নোটবইয়ের পাতায়। পেনসিলের শিস ভেঙে যাওয়ায় গিলক্রাইস্টের কাছ থেকে একটা পেনসিল ধার চেয়ে নিলে; সবশেষে, একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে শানিয়ে নিলে নিজের পেনসিলটা! এই আশ্চর্য দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ভারতীয়ের ঘরেও। ছেলেটি স্বল্পভাষী, খর্বকায়। হুকের মতো বেঁকানো নাক। আড়চোখে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করতে লাগল সে। হোমসের স্থাপত্য সম্পর্কিত অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! বেশ বুঝলাম, আমাদের বিদায় দিয়ে খুশি হল সে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই হোমস যে তার অভীপ্সিত সূত্রের সন্ধান পায়নি, তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ওর মুখ দেখে। তৃতীয়বার নিষ্ফল হল আমাদের অভিযান। টোকা মারা সত্ত্বেও দরজা খোলা দূরে

থাকুক, ভেতর থেকে এমন এক পশলা কদর্য ভাষার বর্ষণ ভেসে এল যে কহতব্য নয়। 'তুমি যে-ই হও না কেন, পরোয়া করি না। গোল্লায় যাও!' গর্জে ওঠে ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। 'কাল আমার পরীক্ষা। আজকে কারো ক্ষমতা নেই আমায় বাইরে বার করে।'

'অত্যন্ত রুক্ষ ছোকরা', সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগের চোটে লাল হয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন আমাদের পথপ্রদর্শক। 'ও অবশ্য জানত না যে আমিই টোকা মেরেছি দরজায়। তাহলে ওর স্বভাবটাই ওইরকম অভব্য, অভদ্র আর এ-রকম অবস্থায় তো বাস্তবিকই সন্দেহজনক।'

প্রত্যুত্তরে হোমস যা শুধাল, তা সত্যিই বিচিত্র।

'ওর সঠিক উচ্চতাটা বলতে পারেন?'

'মি. হোমস, তা বলা মুশকিল। ভারতীয় ছাত্রের চেয়ে ও লম্বা বটে, তবে গিলক্রাইস্টের মতো অতটা নয়। আমার তো মনে হয় পাঁচ ফুট ছ-ইঞ্চির ধারেকাছে হবে।'

'দারুণ দরকারি পয়েন্ট', বললে হোমস। 'গুড নাইট, মি. সোমস।'

বিস্ময়ে হতাশায় সজোরে চেঁচিয়ে ওঠেন আমাদের পথপ্রদর্শক।

'হায় ভগবান, মি. হোমস, এভাবে আমাকে অকূল পাথারে ফেলে সত্যি সত্যিই কি আপনি দুম করে চললেন? পরিস্থিতিটা এখনও উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। আগামীকাল পরীক্ষা। আজ রাতেই পাকাপাকি কিছু ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে তো পরীক্ষায় বসতে দিতে পারি না। যেভাবেই হোক এ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমায়।'

'যেমন আছে, তেমনি চলুক। কিছু রদবদল করবেন না। কাল ভোরের দিকে এখানে আসছি। তখনই এ-প্রসঙ্গে কথা বলব'খন। আমার তো মনে হয়, তখনই কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, সে-সম্পর্কে কিছু শলাপরামর্শ দিতে পারব।' ইতিমধ্যে কোনো কিছুরই পরিবর্তন করবেন না— সামান্য পরিবর্তনও নয়।'

'বেশ, তাই হবে, মি. হোমস।'

'আপনি নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন। এ উটকো উৎপাত থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা-না-একটা পথ নিশ্চয় আবিষ্কার করতে পারব আমরা। কালো কাদামাটির পিরামিড আর পেনসিলের কুচোগুলো নিয়ে চললাম। গুড বাই।'

চত্বরে অন্ধকারে বেরিয়ে এসে আবার ওপরদিকে তাকালাম জানলাগুলোর পানে। ভারতীয় ছাত্রটি তখনও পায়চারি করছিল ঘরময়! বাকি দুজনে ছিল দৃষ্টির অন্তরালে।

বড়োরাস্তায় এসে পড়ার পর হোমস শুধোলে, 'কীহে ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার? এ যেন একটা ছোটোখাটো টেবিলে-বসা খেলা— অনেকটা তিন তাসের হাত সাফাইয়ের মতো— তাই নয় কি? তিনজন লোক রয়েছে এ-হেঁয়ালিতে। এদের মধ্যেই একজন করেছে এ-কাজ। তোমার পছন্দসই লোকটি কে শুনি?'

'ওপরের তলার আঁস্তাকুড়-মুখো ছোকরাটা। ওরই রেকর্ড সব চাইতে খারাপ। ইন্ডিয়ান ছোকরাটাও কিন্তু ভারি ধড়িবাজ। সারাক্ষণ ঘরময় পায়চারি করার মানেটা কী শুনি?'

'তাতে কোনো দোষ নেই। প্রাণপণে কিছু মুখস্থ করার চেষ্টা করলে অনেকেই এ-রকম করে থাকে।'

'কীরকম অদ্ভুতভাবে বাঁকাচোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, তা দেখেছ তো?'

'তুমিও অমনিভাবে তাকাতে যদি পরীক্ষার আগের রাতের প্রস্তুতির মাঝে অনাহূত এক দঙ্গল লোক এসে ঢুকত তোমার ঘরে। না, না, ওতে কোনো গলতি দেখি না আমি। পেনসিল, ছুরি— সবই সন্তোষজনক। কিন্তু তবুও ওই লোকটাই যে গোলমাল করে দিচ্ছে সব।'

'কে?'

'কেন, ব্যানিস্টার, সোমসের পরিচারক? এ-ব্যাপারে তার ভূমিকাটা কী বলো তো?'

'রকমসকম দেখে তাকে বিলকুল খাঁটি মানুষ বলেই বিশ্বাস হয় আমার।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। গোলমাল করে দিচ্ছে এই জায়গাটাই। কীসের জন্য একজন বিলকুল খাঁটি মানুষ— বেশ, বেশ, এই তো দেখছি একটা বড়োসড়ো মনিহারি দোকান। এসো, আমাদের গবেষণা শুরু হোক এখান থেকেই।'

মাত্র চারটে মনিহারি দোকান ছিল শহরে। বৃথাই সবকটায় ঢুঁ মারলাম। প্রতিবারই পেনসিলের কুচোগুলো বার করে চড়া দাম দিতে চাইলে হোমস। কিন্তু সবাই একবাক্যে জানালে যে সাধারণ পেনসিল নয় বলে এ-জিনিস স্টকে রাখা হয় না বললেই চলে, তবে অর্ডার দিলে আনিয়ে দেওয়া যাবে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও বন্ধুবর খুব দমে গেছে বলে মনে হল না। কৌতুকছলে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিলে সে। তবে সে-কৌতুক পুরোপুরি নয়, আধাআধি।

'লাভ নেই মাই ডিয়ার ওয়াটসন। সবচেয়ে জোরালো আর চূড়ান্ত সূত্র ছিল এইটাই— কিন্তু ফলাফল তো দেখছি ফক্কা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এ-সূত্র ছাড়াই যে কেসটা খাড়া করতে পারি আমি, সে-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। সর্বনাশ! আরে ভায়া, ন-টা বাজতে চলল যে! আসবার সময়ে আধো-আধো গলায় ল্যান্ডলেডি বলে দিয়েছিল কড়াইশুঁটি তৈরি থাকবে সাড়ে সাতটায়। আরে ভাই ওয়াটসন, তোমার এই বারোমেসে তামাক আর অসময়ে খাওয়াদাওয়ার জন্যে আশা করছি শিগ্‌গিরই বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাবে। আর, তোমার অধঃপতনের অংশ আমাকেও নিতে হবে। কিন্তু নার্ভাস শিক্ষক, অসাবধানী পরিচারক আর তিনজন সমুৎবাহী ছাত্রের রহস্যভেদ করার আগে তো তা করা যাবে না।'

সেদিন আর এ-প্রসঙ্গ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না হোমস। যদিও দেরি করে ডিনার খাওয়ার পর বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইল ও। সকাল আটটায় সবে প্রাতঃকৃত্য শেষ করেছি, এমন সময়ে আমার ঘরে ঢুকল ও।

বলল, 'ওহে ওয়াটসন, সেন্ট লিউকস-এ যাওয়ার সময় হয়েছে। প্রাতরাশ না-সেরে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়।'

'আমরা গিয়ে নিশ্চিত কিছু না-বলা পর্যন্ত তো হাঁকপাঁক করে মরবেন সোমস। আর, ভয়ংকর সে ছটফটানি, নাকি বল?'

'ওঁকে নিশ্চিত কিছু বলার মতো উপাদান পেয়েছ?'

'মনে তো হয় পেয়েছি।'

'সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছ?'

'পেরেছি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। এ-রহস্যের সমাধান আমি করেছি।'

'কিন্তু টাটকা সাক্ষ্যপ্রমাণ তুমি পেলে কী করে শুনি? আর পেলেই-বা কী?'

'আহা! ভোর ছ-টার মতো অসময়ে তো আর স্রেফ হাওয়া খাওয়ার জন্যে শয্যাত্যাগ করিনি আমি। ঝাড়া দুটো ঘণ্টা বেদম খাটতে হয়েছে আমাকে। আর কম করে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়েছে। তবেই না কিছু দেখাতে পারছি। এই দেখ।'

হাত বাড়িয়ে ধরল ও। হাতের তালুতে দেখলাম কালো রঙের মণ্ডের মতো কাদামাটির তৈরি ছোটো ছোটো তিনটে পিরামিড।

'আরে, হোমস, কাল তো মোটে দুটো পেয়েছিলে!'

'আর একটা পেয়েছি আজ সকালে। খুব সাধাসিধে বিতর্কের ব্যাপার হে। তিন নম্বরটার আগমন যে-অঞ্চল থেকে, এক নম্বর আর দু-নম্বরের উৎপত্তিও সেইখানে। তাই, না, ওয়াটসন? বেশ, বেশ, চলে এসো চটপট। বন্ধুবর সোমসের যন্ত্রণা লাঘব করে আসা যাক এবার।'

বাস্তবিকই রীতিমতো উত্তেজিত অবস্থায় দেখলাম দুর্ভাগা শিক্ষক বেচারিকে তাঁর চেম্বারে পৌঁছোনোর পর। সে-উত্তেজনা দেখলে সত্যিই বড়ো করুণা হয়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হবে পরীক্ষা। অথচ তখনও তাঁর উভয় সংকটের যন্ত্রণা ঘোচেনি। তখনও ভাবছেন, এ-কাণ্ড সর্বসমক্ষে হাজির করবেন, না বদমাশ নচ্ছারটাকেও মূল্যবান স্কলারশিপের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে দেবেন! এমনই উদগ্র তাঁর মানসিক উদ্‌বেগ যে চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলেন না উনি। হোমসকে দেখেই দু-হাত সামনে প্রসারিত করে ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলেন তার পানে।

'জয় ভগবান, আপনি তাহলে এসেছেন! আমার ভয় হয়েছিল হয়তো নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি। কী করি বলুন তো? পরীক্ষা শুরু করব?'

'হ্যাঁ। শুরু করুন— কোনো বাধা দেবেন না পরীক্ষায়।'

'কিন্তু বদমাশটা—'

'সে পরীক্ষা দেবে না।'

'তার নাম জানতে পেরেছেন?'

'মনে হয় পেরেছি। এ-ব্যাপারে যদি পাঁচ-কান না করতে চান তো আমাদের নিজের নিজের কিছু ক্ষমতা লাভ করা দরকার। সামরিক বিচারালয়ের মতো ছোটোখাটো একটা কোর্ট মার্শালের আয়োজন করে[৭] আমরাই নিষ্পত্তি করে ফেলব এ-ব্যাপারের। সোমস, আপনি থাকুন ওইখানে— যদি কিছু মনে না করেন। ওয়াটসন, তুমি এখানে। আর্মচেয়ার নিয়ে মাঝখানে বসব আমি। অপরাধবোধে দুরু দুরু যার হৃৎপিণ্ড, তার বুকে আতঙ্কের শেল হানবার মতো পোজ আমরা নিতে পেরেছি বলেই তো মনে হয় আমার। দয়া করে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিন।'

ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। বেশ বুঝলাম, আমাদের ধর্মাবতারসুলভ ভাবভঙ্গিমা আর ধর্মাধিকরণ দৃশ্য দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছে ওর বুক।

হোমস বললে, 'দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। ব্যানিস্টার, গতকালের ঘটনায় যে-সত্যটুকু লুকানো আছে, তা কি এবার বলবে?'

লোকটার চুলের গোড়া পর্যন্ত বোধ হয় ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আমি তো আপনাকে সবই বলেছি স্যার!'

'আর কিছু বলার নেই?'

'আর কিছুই নেই, স্যার।'

'বেশ, তাহলে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা শোনাই তোমায়। গতকাল চেয়ারটায় গিয়ে যখন বসেছিলে, তখন কি তুমি কোনো জিনিস গোপন করার অভিপ্রায় নিয়েই গেছিলে ওখানে? যে জিনিসটা দেখামাত্র বোঝা যেত যে ঘরের মধ্যে কারো আবির্ভাব ঘটেছিল?'

পাঙাশপানা বীভৎস হয়ে ওঠে ব্যানিস্টারের মুখ।

'না, স্যার, নিশ্চয় না।'

'এটা কিন্তু একটা নিছক সম্ভাবনা', মোলায়েম মিষ্টি গলায় বললে হোমস। 'আমি অকপটে স্বীকার করছি, এ-সম্ভাবনা প্রমাণ করতে আমি অপারগ। তবে আর একটি জিনিস খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে আমার। মি. সোমস পিছু ফেরামাত্র সেই মুহূর্তে শোবার ঘরে যে-লোকটা লুকিয়ে ছিল তাকে তুমিই ছেড়ে দিয়েছিলে।'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলে ব্যানিস্টার।

'ওখানে কেউ ছিল না, স্যার।'

'আহা, সেইটাই তো পরিতাপের বিষয়, ব্যানিস্টার। এতক্ষণ পর্যন্ত সত্য বললেও বলে থাকতে পার। কিন্তু এবার তো আমি জানি যে ডাহা মিথ্যে বলছ তুমি।'

'ওখানে কেউ ছিল না, স্যার।'

'ধীরে, ব্যানিস্টার, ধীরে।'

'না, স্যার, কেউ ছিল না।'

'তাই যদি হয় তো আর কোনো খবরাখবর তুমি আমাদের দিতে পারবে না। দয়া করে এ-ঘরেই থাকবে কি তুমি? শোবার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। সোমস, একটা অনুরোধ আছে। অনুগ্রহ করে গিলক্রাইস্টের ঘরে গিয়ে তাকে একবার এখানে আসতে বলবেন কি?'

ক্ষণেক পরেই গিলক্রাইস্টকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন সোমস। ভারি চমৎকার চেহারা ছেলেটির। ছিপছিপে লম্বা নমনীয় তনু। লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরার ধরন দেখলেই বোঝা যায় কতখানি বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে তার প্রতি পদক্ষেপের মধ্যে। চটপটে ক্ষিপ্রতায় মজবুত দেহখানি। মুখশ্রী সুন্দর আর অকপট! উদ্‌বেগঘন নীল নীল দুই চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে আমাদের প্রত্যেকের ওপর। তারপর তা স্থির হয়ে গেল দূরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যানিস্টারের মুখের ওপর। এবার তার চোখের তারায় দেখলাম নিরাবয়ব নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি।

হোমস বললে, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন। মি. গিলক্রাইস্ট, এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের কথোপকথনের একটি অক্ষরও বাইরে কেউ কোনোদিনই জানতে পারবে না। কাজে কাজেই, অনায়াসেই মনের অর্গল খুলে দিয়ে অকপট কথা কইতে পারি আমরা। মি. গিলক্রাইস্ট, আমরা জানতে চাই আপনার মতো এ-রকম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ গতকালের এই গর্হিত কাজটা করলেন কী করে?'

টলমলিয়ে উঠে পিছু হটে গেল দুর্ভাগা তরুণ গিলক্রাইস্ট। তারপরেই বড়ো বড়ো চোখে তাকালে ব্যানিস্টারের পানে। সে-চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠল আতঙ্ক আর তিরস্কার।

'না, না, মি. গিলক্রাইস্ট! একটা কথাও আমি বলিনি— একটা কথাও না।' আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ব্যানিস্টার!

হোমস বললে, 'না বলনি। কিন্তু এবার তা বললে। মি. গিলক্রাইস্ট, এবার বুঝতে পেরেছেন তো ব্যানিস্টারের এ ক-টি কথার পর আর কোনো আশা নেই আপনার। এখন আপনার একমাত্র পথ হচ্ছে অকপটে সব কিছু স্বীকার করা।'

মুহূর্তের জন্যে দু-হাত তুলে দারুণ আক্ষেপে থর থর করে কেঁপে ওঠা দেহটাকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেলে গিলক্রাইস্ট। পরের মুহূর্তেই সে জানু পেতে বসে পড়ল টেবিলের পাশে এবং দুই করতলে মুখ ঢেকে নিঃশেষে ভেঙে পড়ল আবেগঘন কান্নায়। ওঃ, সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

নরম গলায় হোমস বললে, 'আস্তে, আস্তে। মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। আর, তা ছাড়া আপনাকে দাগি ক্রিমিনাল হওয়ার অপবাদ তো কেউ দিচ্ছে না। আপনার বদলে যদি সমস্ত ঘটনাটা বলি মি. সোমসকে তাহলে হয়তো আমার ভুল-টুল হলে শুধরে দেওয়াটাই সহজতর হবে আপনার পক্ষে। তাই করব নাকি? বেশ, বেশ, কষ্ট করে আর উত্তর দিতে হবে না! শুধু শুনে যান। লক্ষ রাখুন যাতে আপনার ওপর কোনোরকম অবিচার না করে বসি।'

মি. সোমস, যে-মুহূর্তে আপনি আমায় বললেন যে আর কেউ তো নয়ই, এমনকী ব্যানিস্টারের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না আপনার ঘরে পেপারগুলোর আবির্ভাব-তত্ত্ব, ঠিক তখন থেকেই কেসটা একটা স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করলে আমার মনের মধ্যে। অবশ্য ছাপাখানার লোকে জানত— কিন্তু সে-সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। কেননা, সে তো অফিসেই পরীক্ষা করতে পারত কাগজগুলো। ভারতীয় ছাত্রের সম্বন্ধেও কিছু ভাবিনি আমি। প্রুফগুলো পাকানো অবস্থায় থাকলে কাগজগুলো আসলে কীসের, তা তো আর তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং তাও বাদ দিলাম। ঘরে যে ঢুকেছিল সে জানত পেপারগুলো টেবিলের ওপর আছে। কিন্তু কী করে জানল সে?

'আপনার ঘরে আসার সময়ে জানলাটা পরীক্ষা করেছিলাম! তখন আপনার একটা একটা মজাদার ধারণা শুনে হাসি পেয়েছিল আমার। খটখটে দিনের আলোয় বিপরীত দিকের ঘরগুলোর বাসিন্দাদের চোখের ওপর দিয়ে আগন্তুক মহাপ্রভু ঠেলেঠুলে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে— এমনি একটা সম্ভাবনা আমি নাকি চিন্তা করছিলাম। রীতিমতো উদ্ভট এই ধারণা। আসলে আমি মেপে দেখছিলাম, কতখানি লম্বা হলে তবে একজনের পক্ষে জানলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো দেখতে পাওয়া সম্ভব। আমি ছ-ফুট লম্বা। কিন্তু আপনাকেও কসরত করে তবে দেখতে হয়েছে মাঝখানের টেবিলটা। ওই উচ্চতার কমে কারো পক্ষেই এ-সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। আপনি তো জানেন, তিনজন ছাত্রের মধ্যে যে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা ত্রয়ীর মধ্যে তার ওপরেই নজর রাখলে লাভ হবে সবচেয়ে বেশি— এমন কথা ভাববার মতো যুক্তি এসে গেছিল আমার মাথার মধ্যে।

'ঘরে ঢুকলাম। সাইড-টেবিল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি আপনাকেও জানালাম। গিলক্রাইস্ট যে লং-জাম্পে দক্ষ, এ-তথ্য আপনি আমায় না-বলা পর্যন্ত মাঝখানের টেবিল সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে

পারিনি আমি। তখনই সমস্ত জিনিসটা চকিতের মধ্যে ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। বাকি রইল শুধু থিয়োরিকে বলবৎ করার জন্যে কয়েকটি প্রামাণ সংগ্রহের। এবং তা-ও আমি পেলাম অচিরেই।

'যা ঘটেছিল, তা শুনুন। সারাবিকেলটা খেলার মাঠে লং-জাম্প প্র্যাকটিস করে কাটিয়েছে এই তরুণটি। লাফাবার জুতো কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে আসে সে। জানেন তো, এ ধরনের জুতার তলায় প্রচুর কাঁটা লাগানো থাকে। জানলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বেজায় লম্বা হওয়ার দরুন টেবিলের ওপর রাখা প্রুফগুলো সে দেখতে পায়। সঙ্গেসঙ্গে বুঝে নেয় জিনিসগুলো কী। কোনো ক্ষতিই হত না যদি-না দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে আপনার অসাবধানী পরিচারকের ফেলে যাওয়া চাবিটা দেখতে পেত সে। আচম্বিতে একটা ঝোঁক চেপে বসে ওর মনে। ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে কাগজগুলো সত্যিই প্রুফ কিনা। কাজটা দুঃসাহসের। কিন্তু বিপজ্জনক নয়। কেননা, ধরা পড়ে গেলেই সাফাই গেয়ে দিত সে যে নিছক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যেই তার এহেন প্রবেশ।

'কিন্তু যখনই দেখলে যে কাগজগুলো বাস্তবিকই প্রশ্নপত্রের প্রুফ, তখন আর প্রলোভনের খপ্পর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলে না সে। জুতো দুটো নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর। জানলার কাছে ওই চেয়ারটায় কী রেখেছিলেন বলুন তো?'

'দস্তানা।' বললে তরুণ গিলক্রাইস্ট।'

বিজয়গৌরবে ব্যানিস্টারের পানে তাকাল হোমস।

'দস্তানাগুলো চেয়ারের ওপর রেখে প্রুফগুলো তুলে নিলে সে। একসঙ্গে সবগুলো নয়। এক একটা করে নিলে নকল করার জন্যে। ও ভেবেছিল মাস্টারমশাই নিশ্চয় প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকবেন এবং জানলা থেকেই আপনাকে দেখতে পাবে সে। কিন্তু আমরা তো জানি, মাস্টারমশাই ফিরে এলেন পাশের ফটক দিয়ে। হঠাৎ তাঁরা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার সামনেই। পালানোর সম্ভাব্য পথ আর নেই। দস্তানার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে তিরবেগে সে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, টেবিলের ওপর ওই আঁচড়টা একদিকে খুব ক্ষীণ, কিন্তু শোবার ঘরের দরজার দিকে যতই গেছে দাগটা, ততই তা গভীরভাবে কেটে গিয়ে দু-ভাগ করে দিয়েছে চামড়া। শুধু এই দেখলেই তো বোঝা যায় জুতোগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওইদিকেই এবং আসামি আশ্রয় নিয়েছে ওই ঘরে। কাঁটার চারপাশে লেগে থাকা মাটি পড়ে রইল টেবিলের ওপর। দ্বিতীয় নমুনা আলগা হয়ে পড়ল শোবার ঘরে। আরও বলি, আজ সকালেই হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠে গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখতে পেলাম এই কালো রঙের আঠালো কাদামাটির উৎস। লাফাবার গর্তে এ ধরনের মাটির ব্যবহার দেখা যায়। তা ছাড়াও করাত চেরা কাঠের গুঁড়ো বা গাছের সূক্ষ্ম ছালচূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওপরে যাতে করে লাফাবার পর অ্যাথলিট পিছলে না যায়। গুঁড়ো সমেত কাদামাটির নমুনা খানিকটা নিয়ে এসেছি সাথে। যা বললাম,তা সত্য, মি. গিলক্রাইস্ট?'

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তরুণ ছাত্র গিলক্রাইস্ট।

এখন বললে, 'হ্যাঁ, স্যার, সত্য।'

'হায় ভগবান, এ ছাড়া আর কিছুই কি তোমার বলার নেই?' চেঁচিয়ে ওঠেন হোমস।

'আছে, স্যার। কিন্তু এই লজ্জাকর ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ার আঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি

আমি। সারারাত ছটফটিয়ে কাটানোর পর ভোরের দিকে এ-চিঠি লিখেছিলাম আপনার কাছে। আমার পাপকাজ যে আর ঢাকা নেই, এ-খবর জানার আগেই লিখেছিলাম চিঠিটা। নিন, স্যার। চিঠিখানা খুললেই দেখবেন আমি লিখেছি, আমি মনস্থ করেছি এ-পরীক্ষা দেব না এবং এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "রোডেশিয়ান[৮] পুলিশ" একটি অফিসারের পদ অফার করেছে আমায় এবং আমি অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হচ্ছি।'

সোমস বললেন, 'বাস্তবিকই খুব খুশি হলাম যে শেষ পর্যন্ত তুমি অসৎ পথে পাওয়া সুযোগ নিয়ে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছ। কিন্তু মত পরিবর্তন করলে কেন শুনি?'

আঙুল তুলে ব্যানিস্টারকে দেখালে গিলক্রাইস্ট।

বলল, 'ওই সেই মানুষটি, যে আমায় ঠিক পথে চালনা করেছে।'

হোমস বললে, 'এবার পথে এসো ব্যানিস্টার। আমি যা বললাম, তা থেকে নিশ্চয় একটু পরিষ্কার বুঝেছ যে একমাত্র তুমিই এই তরুণ ছাত্রটিকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে পারতে। কেননা, ঘরে ছিলে তুমি এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয় তালা দিয়ে গেছিলে দরজায়। জানলা দিয়ে পালানোর সম্ভাবনা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আচ্ছা, এ-রহস্যের শেষ পয়েন্টটা খোলসা করে বলবে কি? তোমার এ-রকম আচরণের অর্থটা কী, তা তো বুঝলাম না?'

'আপনি যদি আগাগোড়া সব জানতেন, স্যার, তাহলে দেখতেন জলের মতোই পরিষ্কার আমার আচরণের অর্থটুকু। কিন্তু আপনি যতই চতুর হন না কেন, শত চেষ্টা করলেও এ-তথ্য জানা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক সময়ে আমি এই তরুণ ভদ্রলোকটির বাবা বুড়ো স্যার জ্যাবেজ গিলক্রাইস্টের বাটলার ছিলাম। উনি সর্বস্বান্ত হলে পরে এ-কলেজের পরিচারক হিসাবে এলাম এখানে। কিন্তু ভুলতে পারলাম না আমার পুরোনো মনিবকে— ভুলতে পারলাম না দুনিয়ার চোখে তাঁর এ পতনের জন্যে, তাঁর দুর্দৈবের জন্যে। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে তাঁর ছেলেকে যতখানি পারলাম চোখে চোখে রাখলাম আমি। গতকাল চেঁচামেচি শুনে এ-ঘরে আসামাত্র প্রথমেই যে জিনিসগুলি দেখলাম , তা হল ওদিককার চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা মি. গিলক্রাইস্টের দস্তানা দুটি। এ-দস্তানা আমি ভালোভাবেই চিনি এবং তাই চকিতে বুঝলাম এখানে তাদের আগমনের রহস্যটুকু। মি. সোমসের চোখে পড়লেই ফাঁস হয়ে পড়বে সব কিছু। তাই ঝপ করে বসে পড়লাম চেয়ারটায়। আপনাকে ডেকে আনার জন্যে মি. সোমস ঘরের বাইরে না-যাওয়া পর্যন্ত আর চেয়ার ছেড়ে একচুলও নড়লাম না। তারপরেই আমার তরুণ মনিব, যাকে আমি হাঁটুতে শুইয়ে দোলনা দিয়েছি, বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে এবং তখুনি সব স্বীকার করলে আমার কাছে। স্যার, এরপর কি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়? স্বাভাবিক নয় কি তার বাবা যা করতেন ঠিক সেইভাবে ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যে এ-পথে তার কোনো লাভই হবে না? এজন্যে কি আমায় আপনি দোষ দেন, স্যার?'

'নিশ্চয় না।' জ্যামুক্ত ধনুকের মতো টক করে দাঁড়িয়ে উঠে আন্তরিক সুরে বলল হোমস, 'সোমস, আপনার ছোট্ট সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি বলেই তো মনে হচ্ছে। এদিকে বাড়িতে ঠান্ডা হচ্ছে আমাদের প্রাতরাশ। এসো হে, ওয়াটসন। মি. গিলক্রাইস্ট, আমার বিশ্বাস, রোডেশিয়ায় আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। জীবনে শুধু একবার আপনি নীচে নামলেন। এবার দেখা যাক, ভবিষ্যতে কত উঁচুতে আপনি উঠতে পারেন।'

টীকা

১. **প্রশ্নপত্রের পলায়ন :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি স্টুডেন্টস' জুন ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং কলিয়ার্স উইকলির ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে :** ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শহর বলতে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজকেই বোঝানো হয়। হোমসের গল্প বা উপন্যাস থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য বা বক্তব্য সাপেক্ষে গবেষকরা মনে করেন হোমস অক্সফোর্ডেরই ছাত্র ছিলেন। এই গল্পের শহরটির সঙ্গে হোমসের পরিচয় দেখে তাঁরা অনুমান করেন এখানেও অক্সফোর্ডের কথা বলা হয়েছে।

৩. **থিউসিডাইডিজ :** আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের গ্রিক ইতিহাসবিদ, থিউসিডাইডিজ ছিলেন এথেন্সের বাসিন্দা। পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধে অংশ নেন কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে অ্যাম্ফিপোলিস শহরকে রক্ষা করতে না-পারায় এথেন্স থেকে নির্বাসিত হন। এর পরবর্তী কুড়ি বছরে তিনি এথেন্স এবং স্পার্টার রাজনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব দ্য পলিপোনেসিয়ান ওয়ার' রচনা করেন।

৪. **তিনটে স্লিপ কাগজে প্রুফটা এসেছিল :** অ্যান্ড্রু ল্যাং এবং অন্যান্য কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন, থিউসিডাইডিজের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদের প্রুফের জন্যও তিনটি স্লিপ লাগতে পারে না।

৫. **JOHANNFABER :** জার্মানির নুরেমবার্গ শহরে কাসপার ফ্যাবার-এর প্রতিষ্ঠা করা পেনসিল তৈরির ব্যাবসা তাঁর প্রণাতি জোহান লুথার ভন ফ্যাবার (১৮১৭-১৮৯৬) এবং জন এবারহার্ড ফ্যাবার (১৮২২-১৮৭৯) বড়ো করে ছড়িয়ে দেন প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায়।

৬. **ব্লু হয়েছে :** অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের ছাত্রদের ক্রীড়ায় পারদর্শিতার শংসাপত্র হত ব্লু হলে। লেখাপড়ায় 'লেটার' পাওয়ার সমকক্ষ 'ব্লু' নামটির উদ্ভব অক্সফোর্ডে সফল ক্রীড়াবিদদের দেওয়া গাঢ় নীল এবং কেমব্রিজে হালকা নীল রঙের টুপির থেকে।

৭. **ছোটোখাটো একটা কোর্ট মার্শালের আয়োজন করে :** 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ' গল্পে ঠিক এই ধরনের একটি দৃশ্য দেখা যায়।

৮. **রোডেশিয়ান :** আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে রোডেশিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সিসিল রোডস-এর উদ্যোগে ১৮৮৯-এর সনদের ভিত্তিতে। রোডস পরে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী হন। রোডেশিয়ার বর্তমান পরিচিতি জিম্বাবুয়ে নামে।

প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে]

১৮৯৪ সাল। বিচার করে দেখতে গেলে আমার মনে হয়, ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের উপসংহারের মতো কোনো কেসটিতেই এতগুলি অসাধারণ পয়েন্টের একত্র সমাবেশ ঘটেনি। এই কেসেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে তরুণ উইলোবি স্মিথ। শুধু তাই নয়, এরপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা থেকেই প্রকাশ পায় খুনের কারণ। সে-তথ্য যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক।

নভেম্বরের শেষাশেষি সেরাতে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। সন্ধে থেকেই চুপচাপ বসে ছিলাম আমি আর হোমস। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের প্রান্ত থেকে জল ছিটিয়ে পথ করে নিচ্ছিল একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি।

বাতাসের গোঙানির মধ্যে থেকেই ভেসে এল খটাখট খটাখট অশ্ব-খুরধ্বনি এবং পাথুরে রাস্তার ওপর গড়ানো চাকার একটানা কর্কশ ঘড় ঘড় শব্দ। যে-গাড়িটা আমি দেখেছিলাম দূরে, সেইটাই এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সরকারি গোয়েন্দা স্ট্যানলি হপকিনস। চকচকে বর্ষাতি জ্বলজ্বল করতে লাগল বাতির আলোয়। ভিজে বর্ষাতিটা খুলে ফেলতে সাহায্য করলাম আমি। হোমস চুল্লি খুঁচিয়ে গনগনে করে তুলল আগুনটাকে।

তারপর বললে, 'মাই ডিয়ার হপকিনস, এবার জুতো-টুতো খুলে ফেলে পায়ের আঙুলগুলো গরম করে নাও। এই নাও একটা সিগার। এ-রকম রাতে ডাক্তারের একটা প্রেসক্রিপশন আছে— গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস। খুবই কাজ দেয় ওষুধটা এ ধরনের আবহাওয়ায়। এই ঝড়-তুফান মাথায় করে যখন এসেছ, তখন কাজটা দরকারি না হয়ে যায় না, কি বল?'

'বাস্তবিকই তাই মি. হোমস। সারাবিকেলটা দম ফেলবার ফুরসত পাইনি। যেকোনো দৈনিকের শেষ সংস্করণে ''ইয়ক্সলে'' কেস সম্পর্কে কিছু দেখেছেন?'

'পঞ্চদশ.শতাব্দীর পরের কিছুই আজ আমি দেখিনি।'

'খুব ছোটো খবর— একটা মাত্র প্যারাগ্রাফ। তাও আগাগোড়াই ভুল— কাজেই চোখ এড়ায়নি আপনার। আমিও উঠেপড়ে লেগেছি এ-ব্যাপার নিয়ে, কাজে ফাঁক রাখিনি কোথাও। ঘটনাটা ঘটেছে কেন্টে, চ্যাথাম থেকে সাত মাইল দূরে আর রেল স্টেশন থেকে তিন মাইল ভেতরে একটা জায়গায়। সওয়া তিনটেতে টেলিগ্রাম পাই আমি। পাঁচটায় পৌঁছোই ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে। সরেজমিন তদন্ত শেষ করে শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি শেরিং ক্রসে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে সিধে আসছি আপনার কাছে।'

'তার মানে, আমার বিশ্বাস, কেসটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা এখনও পরিষ্কার হয়নি?'

'ব্যাপারটার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি আমি। দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে, এ ধরনের বিদকুটে জটিল কেস নিয়ে কোনোদিনই আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন, প্রথমে কেসটাকে দারুণ সহজ মনে হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, এত সোজা ব্যাপারে কেউই ভুল করতে পারে না। মি. হোমস, মোটিভের নামগন্ধ নেই এ-কেসে। কিন্তু অনেক ভেবেও তো আমি দিশে পাচ্ছি না যে লোকটার ক্ষতি করবার চেষ্টাই-বা কেউ করবে কেন?'

সিগারটা ধরিয়ে নিলে হোমস। তারপর, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললে, 'ব্যাপারটা শোনাও দিকি।'

'জলের মতোই পরিষ্কার ঘটনাগুলো,' বললে স্ট্যানলি হপকিনস। 'এখন শুধু জানতে চাই যে এসবের আসল মানেটা কী। গল্পটা যতদূর খাড়া করতে পেরেছি, তা এই। কয়েক বছর আগে পল্লি অঞ্চলের এই বাড়িটা কেনেন এক ভদ্রলোক। বাড়িটার নাম ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেস। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। বাড়ি কেনার সময়ে তাঁর নাম বলেন, প্রফেসর কোরাম। প্রফেসর কোরাম রুগ্ণ এবং চলাফেরার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্ধেক সময় থাকেন শয্যায়। বাকি সময়টা হয় বাড়িময় পা টেনে টেনে লাঠি ঠুক ঠুক করে বেড়ান, আর না হয়, বাথ-চেয়ারে বসে হাওয়া খান বাড়ির সামনের জমিতে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাগানের মালী। প্রতিবেশীদের কয়েকজন খুবই পছন্দ করত তাঁকে এবং কয়েকবার দেখাও করে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। মস্ত পণ্ডিত

হিসেবে ও-অঞ্চলে তাঁর খুব সুনামও আছে। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্যে সংসারে আছে মিসেস মার্কার আর সুসান টার্লটন নামে এক পরিচারিকা। উনি এখানে এসে পৌঁছানোর পর থেকেই এই দুজনে রয়েছে তাঁর সঙ্গে। দুজনের স্বভাবচরিত্র অতি চমৎকার। পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা গ্রন্থ লিখেছেন প্রফেসর। তাই বছরখানেক আগে তাঁর একজন সেক্রেটারির দরকার হয়। প্রথম দুজনকে নিয়ে সুবিধে করে উঠতে পারেননি প্রফেসর। কিন্তু তৃতীয় জন আসার পর যারপরনাই খুশি হলেন উনি। মি. উইলোবি স্মিথ বয়সে একদম তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিধে আসে প্রফেসরের চাকরিতে। কাজকর্ম দেখিয়ে দু-দিনেই কর্মকর্তার মনোমতো হয়ে উঠল সে। সারাসকাল প্রফেসরের ডিকটেশন নেওয়াই তার কাজ। রেফারেন্স আর উদ্ধৃতির জন্যে কেতাব হাতড়াতেই কেটে যেত সন্ধেটা। পরের দিন সকালে দরকার হত এইসব তথ্য। ছেলেবেলায় আপিংহ্যামে থাকার সময়ে বা যৌবনে কেম্ব্রিজে পড়বার সময়ে কোনোদিনই কোনো সময়েই প্রফেসর কোরামের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগেনি উইলোবি স্মিথের এবং তাঁর বিরুদ্ধে তার কোনো বিদ্বেষও নেই। আমি তার সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম, প্রথম থেকেই ভদ্র শান্তশিষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে সুনাম কিনেছে সে। কোনোরকম দুর্বলতা দেখা যায়নি তার চরিত্রে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আজ সকালে এই ছেলেটিই মারা গেছে প্রফেসরের পড়ার ঘরে— মারা গেছে এমন পরিস্থিতির মধ্যে যে যার ফলে এ-মৃত্যুকে খুন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

গোঁ গোঁ করে গজরে উঠল বাতাস— ককিয়ে কেঁদে উঠল জানলায় জানলায়। আগুনের কাছে সরে বসলাম আমি আর হোমস। আর, একটির পর একটি পয়েন্ট তুলে ধরে— ধীরেসুস্থে এই অতি আশ্চর্য কাহিনি বলে চলল তরুণ ইনস্পেকটর হপকিনস।

'সারাইংলন্ড তন্নতন্ন করে তল্লাশ করলেও এর চাইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা বাইরের প্রভাব-বিমুক্ত বাড়ি আর পাবেন না আপনি। সারাহপ্তা কেটে গেলেও অতগুলি লোকের মধ্যে একজনও বাগানের ফটক পেরোয় না। প্রফেসর তো নিজের কাজেই ডুবে থাকেন এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখেন না। প্রতিবেশীদের কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না স্মিথ ছেলেটির। কাজেই, প্রফেসরের মতোই জীবনযাপন করতে হত তাকে। কোনোমতেই বাড়ির বাইরে আনা যেত না স্ত্রীলোক দুজনকে। মালীর নাম মর্টিমার। মর্টিমারই বাথ চেয়ার[২] ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আগে আর্মিতে ছিল, এখন পেনশন ভোগ করছে। মর্টিমারের বয়স হয়েছে। ক্রিমিয়া তার মাতৃভূমি এবং স্বভাব চমৎকার। বাড়ির মধ্যে সে থাকে না; থাকে বাগানের একদম শেষে তিন ঘরওয়ালা একটা কটেজে। ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ বলতে শুধু এই ক-জনকেই আপনি পাবেন। আরও একটা কথা। বাগানের গেট থেকে মাত্র এক-শো গজ দূরেই আছে লন্ডন থেকে চ্যাথাম যাওয়ার প্রধান সড়কটা। ছোটো হুড়কো দিয়ে আটকানো থাকে ফটকটা। কাজেই, যেকোনো বহিরাগতই ভেতরে আসতে পারে বিনা বাধায়।

''এবার শুনুন সুসান টার্লটনের সাক্ষ্য। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো খবর যদি দিতে কেউ পারে, তবে সে এই সুসান টার্লটন। ঘটনাটা ঘটে দুপুরের আগে, এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। ওপরের তলায় সামনের শোবার ঘরে— কতকগুলো পর্দা টাঙানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুসান। প্রফেসর কোরাম বিছানা ছেড়ে ওঠেননি তখনও। আবহাওয়া খারাপ থাকলে কচিৎ বারোটার আগে শয্যাত্যাগ করেন উনি। বাড়ির পেছনদিকে কতকগুলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল মিসেস

মার্কার। উইলোবি স্মিথ ছিল তার শোবার ঘরে। শোবার ঘরটাই সে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করত। সুসান যে-ঘরে ছিল, পড়ার ঘরটা ঠিক তার নীচেই। ঠিক সেই মুহূর্তে সুসান শুনতে পেল প্যাসেজ বরাবর গিয়ে নীচের পড়ার ঘরে নেমে গেল স্মিথ। স্মিথকে সে দেখেনি বটে, তবে ও-রকম চটপটে জোরালো পায়ে চলার শব্দ শুনে নাকি কিছুতেই ভুল হতে পারে না তার। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দও সে শোনেনি। তবে মিনিটখানেক পরেই একটা ভয়াবহ চিৎকার ভেসে আসে নীচের ঘর থেকে। ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার এমনই বিকট, অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক যে চেঁচানিটা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের, তা বোঝা মুশকিল। সঙ্গেসঙ্গে শোনা যায় ধপ করে একটা গুরুভার বস্তু পতনের শব্দ— সমস্ত বাড়ি কেঁপে ওঠে তাতে। তারপরেই, সব নিস্তব্ধ। মুহূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুসান। পরক্ষণেই, সাহস ফিরে আসে তার। এক দৌড়ে নেমে আসে সে নীচে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল— সুসানই গিয়ে তা খোলে। ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর পড়ে ছিল তরুণ মি. উইলোবি স্মিথের দেহ। প্রথমে সুসান আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। কিন্তু দেহটা তুলতে গিয়েই সে দেখতে পায় ঘাড়ের নীচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দরদর করে। সামান্য একটু চোট লাগলেও ক্ষতস্থান খুবই গভীর এবং ওই এক আঘাতেই দু-টুকরো হয়ে গেছিল ক্যারোটিড ধমনী। যে হাতিয়ারে এ-আঘাতের সৃষ্টি, তা পড়ে ছিল তার পাশেই কার্পেটের ওপর। হাতিয়ারটা গালা সিলমোহর করার একটা ছোট্ট ছুরি। পুরোনো কায়দায় সাজানো লেখবার টেবিলে এ ধরনের ছুরি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। ছুরির হাতলটা হাতির দাঁতের এবং ফলাটা বেশ শক্ত। প্রফেসরের নিজের টেবিলেই অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে এ-ছুরিটাও ছিল।

'প্রথমে সুসান ভেবেছিল, স্মিথ বুঝি মারা গেছে। কিন্তু কাচের জলপাত্র ক্যারাফে থেকে জল নিয়ে কপালে ছিটিয়ে দিতেই মুহূর্তের জন্য চোখ খুললে ও। বিড়বিড় করে বললে, "প্রফেসর— সেই মেয়েটা।" সুসান তো দিব্যি করে বলতে রাজি আছে যে ঠিক এই শব্দ ক-টাই উচ্চারণ করেছিল স্মিথ। প্রাণপণে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিল ও— ডান হাতটা শূন্যেও তুলেছিল। তারপরেই, নিস্পন্দ হয়ে যায় তার প্রাণহীন দেহ।

'ইতিমধ্যে মিসেস মার্কারও পৌঁছেছিল ঘরে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় ছেলেটির অন্তিম কথা আর শুনতে পায়নি। সুসানকে মৃতদেহের পাশে রেখে ও দৌড়ে যায় প্রফেসরের ঘরে। বিছানায় উঠে বসেছিলেন উনি। নিদারুণ আতঙ্ক আর উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। রক্ত জমানো ওই চিৎকার শুনেই বোধ হয় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে, ভয়াবহ একটা কিছু ঘটেছে। মিসেস মার্কারের বেশ মনে আছে, তখনও রাত্রিবাস ছিল প্রফেসরের পরনে। বাস্তবিকই, মর্টিমারের সাহায্য ছাড়া তো পোশাক পরিবর্তন করা সম্ভবও নয় তাঁর পক্ষে। মর্টিমারের ওপর আদেশ ছিল দুপুর বারোটার সময়ে আসার। প্রফেসর বলছেন, দূর থেকে ভেসে আসে একটা চিৎকার। উনি শুনেছেন বটে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই উনি জানেন না। স্মিথ ছেলেটির শেষ কথা ক-টিরও কোনো অর্থ উনি বলতে পারলেন না। তাঁর মতে 'প্রফেসর— সেই মেয়েটা' কথাটা আসলে নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর বিশ্বাস, দুনিয়ায় কোনো শত্রু নেই উইলোবি স্মিথের এবং হত্যার কোনো কারণ দর্শানোও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। প্রথমেই উনি

মালী মর্টিমারকে পাঠিয়েছিলেন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আনতে। একটু পরেই প্রধান কনস্টেবল খবর পাঠায় আমাকে। আমি না-যাওয়া পর্যন্ত কোনো জিনিসের নড়চড় হয়নি এবং কড়া হুকুম জারি করা ছিল যেন কেউ ফটক থেকে বাড়িতে আসার পথটার ওপর চলাফেরা না-করে। মি. শার্লক হোমস, আপনার থিয়োরি কাজে লাগার এই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিছুরই অভাব ছিল না অকুস্থানে।'

'কেবল মি. শার্লক হোমস ছাড়া।' তিক্ত হেসে বললে আমার বন্ধুটি। 'যাক, অকুস্থানে পৌঁছে কাজকর্ম কীরকম করলে তাই এবার শোনা যাক।'

'মি হোমস, প্রথমেই আপনাকে নকশাটা দেখতে বলি। নকশাটা মোটামুটি হলেও প্রফেসরের পড়ার ঘরের অবস্থান এবং এ-কেসের অন্যান্য পয়েন্টগুলো সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আপনি পাবেন এ থেকে। তাতে আমার তদন্তধারা বুঝতে সুবিধে হবে আপনার।'

চার্টটা ভাঁজ খুলে মেলে ধরল হপকিনস। নকশাটার অবিকল প্রতিলিপি দিলাম নীচে। হোমসের হাঁটুর ওপর কাগজটা বিছিয়ে দিল হপকিনস। আমি উঠে গিয়ে হোমসের পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ছকটা।

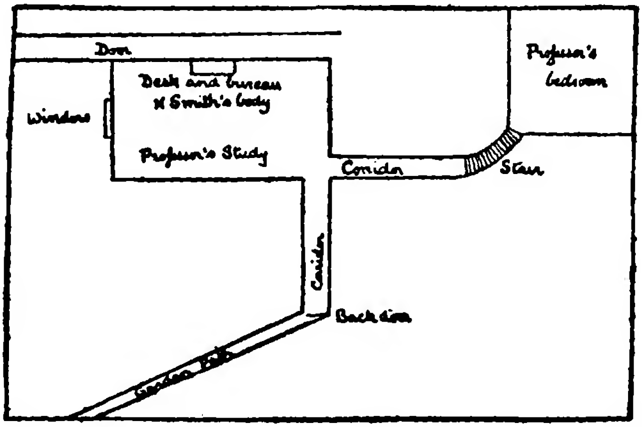

'নকশাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যে-পয়েন্টগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমার কাছে, শুধু সেইগুলোই ধরে রেখেছি নকশাটায়। বাকি যা কিছু, তা নিজের চোখেই পরে দেখবেন'খন। আচ্ছা, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। যদি ধরে নিই হত্যাকারী বাইরে থেকে এসেছিল বাড়ির মধ্যে, তাহলে প্রশ্ন উঠছে কীভাবে সে ঢুকল ভেতরে? "সে" বলতে আমি কিন্তু পুরুষ অথবা নারী উভয়কেই বোঝাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সে ঢুকেছে পেছনকার দরজা আর বাগানের পথ দিয়ে। কেননা, এই দিক দিয়েই সোজাসুজি আসা যায় পড়ার ঘরে। অন্য কোনো পথ দিয়ে আসা মানে জটিলতা রীতিমতো বৃদ্ধি পাওয়া— কেননা সেক্ষেত্রে অনেক ঘুরে তবে তাকে আসতে হত। খুনিকে পালাতেও হয়েছে নিশ্চয় ওই পথ দিয়ে। কেননা, ঘর থেকে বেরোবার আর দুটি পথের একটি বন্ধ করেছিল সুসান সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে। আর একটি পথ তো গেছে সিধে প্রফেসরের শোবার ঘরে। কাজে কাজেই সময় নষ্ট না-করে তৎক্ষণাৎ আমি বাগানের

পথটা নিয়ে পড়লাম। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় জলে প্যাচপেচে হয়ে ছিল পথটা। সুতরাং সেখানে পায়ের ছাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

'পরীক্ষাশেষে দেখলাম, খুব হুঁশিয়ার আর পাকা ক্রিমিনালের সঙ্গেই কাজে নামতে হয়েছে আমায়। পথের ওপর কোনোরকম পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের বর্ডারের ওপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে, সে-বিষয়ে অবশ্য কোনোরকম সংশয় আমার নেই। পাছে পায়ের ছাপ থেকে যায়, তাই তার এত সতর্কতা। সুস্পষ্ট ছাপ বা ওই জাতীয় কিছুই আমি পাইনি। না-পেলেও মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসগুলোর অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম কেউ-না-কেউ হেঁটে গেছে সেখান দিয়ে। সে-ই যে হত্যাকারী তা বুঝলাম এই কারণে যে, বৃষ্টি হয়েছে রাতে। আর সকালে মালী বা অন্য কেউ হেঁটে যায়নি ও-পথ দিয়ে।'

'এক সেকেন্ড', বলে হোমস। 'বাগানের ও-পথটা গেছে কোথায়?'

'বড়োরাস্তায়।'

'কত লম্বা এই পথটা?'

'শ-খানেক গজের মতো।'.

'পথটা যেখানে ফটকের মাঝ দিয়ে গেছে, সেখানেই তো পায়ের ছাপ পেতে?'

'দুর্ভাগ্যবশত পথের ঠিক ওই জায়গাটাই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে টালি দিয়ে।'

'বড়োরাস্তায়?'

'না। জলে-কাদায় জলাভূমি তৈরি হয়ে গেছে যেখানে।'

'কী বিপদ! আচ্ছা, ঘাসের ওপর ছাপটা দেখে কী মনে হল? লোকটা বাড়ির দিকে আসছিল, না বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল?'

'তা বলা মুশকিল। পরিষ্কার ছাপ কোথাও পাইনি।'

'বড়ো পা না ছোটো পা?'

'সে-পার্থক্য আপনিও ধরতে পারবেন না।'

অধীরভাবে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল হোমস। 'তারপর থেকেই তো মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে আর হ্যারিকেনের মতো তুমুল ঝড় বইতে শুরু হয়েছে। পার্চমেন্টের ওই পাণ্ডুলিপির চাইতেও এখন কঠিন হবে ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের প্রভেদ বার করা। যাক, কী আর করা যায়। তারপর, হপকিনস, তুমি যে কিছুই করতে পারনি, এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কী করলে শুনি?'

'আমার তো মনে হয়ে নিশ্চিতভাবে অনেক কিছুই আমি করেছি মি. হোমস। বাইরে থেকে কেউ অতি সাবধানে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, তা আমি জেনেছি। এরপর, করিডোরটা পরীক্ষা করলাম। নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো সেখানে এবং কোনোরকম ছাপ তার ওপর পড়েনি। এখান থেকেই এসে পড়লাম ঘরে। অল্প কয়েকটি আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর। প্রধান সামগ্রী হল একটা মস্তবড়ো খেলবার টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বিউরো। বিউরোর দু-পাশে দু-সারি ড্রয়ার— মাঝখানে একটা ছোট্ট কাবার্ড। ড্রয়ারগুলো খোলা ছিল বটে, কিন্তু তালাচাবি দেওয়া ছিল কাবার্ডে। দেখে মনে হল ড্রয়ারগুলো সবসময়েই খোলা থাকে ওইভাবে এবং মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হয় না সেখানে। কাবার্ডের মধ্যে কতকগুলো দরকারি কাগজপত্র আছে

বটে, তার এমন কোনো চিহ্ন দেখলাম না যা থেকে অনুমান করা যায় যে, কেউ কাবার্ডটা খোলার চেষ্টা করেছিল। প্রফেসরও জানালেন যে কিছুই চুরি যায়নি। কাজেই, চুরিচামারি যে একেবারেই হয়নি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।'

'আচ্ছা, এবার আসা যাক ছেলেটির দেহ-প্রসঙ্গে। লাশটা পাওয়া গেছিল বিউরোর কাছেই, একটু বাঁ-দিকে চার্টে যেখানে দাগ দিয়েছি, ঠিক ওই জায়গায়। ছুরি-মারা হয়েছে ঘাড়ের ডান দিকে। এবং পেছন থেকে সামনের দিকে। কাজেই, সে যে নিজেই নিজেকে ছুরি মারেনি, সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকছে না।'

'ছুরির ওপরে তো পড়েও যেতে পারে,' বলল হোমস।

'এগজ্যাক্টলি। এ-ধারণা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ছুরিটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম দেহের কাছ থেকে বেশ কয়েকফুট দূরে। সুতরাং ও-ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তারপরেও ধরুন, ছেলেটির অন্তিম কথাটা। এবং সবশেষে রয়েছে মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠিতে পাওয়া এই অত্যন্ত দরকারি প্রমাণটা।'

পকেট থেকে একটা কাগজের ছোটো প্যাকেট বার করল স্ট্যানলি হপকিনস। প্যাকেটটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা সোনার প্যাঁসনে চশমা। কালো সিল্কের ছেঁড়া সুতোটা ঝুলছিল চশমার দু-পাশ থেকে। তারপর বললে, 'উইলোবি স্মিথের দৃষ্টিশক্তি বরাবরই খুব ভালো। কাজেই এ-জিনিসটি যে খুনির চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।"

চশমাটা নিজের হাতে তুলে নিলে শার্লক হোমস। তারপর অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে তন্ময় হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাকের ওপর লাগিয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করল ও। তারপর উঠে গেল জানলার কাছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। ফিরে এসে বাতির নীচে জোরালো একটা আলোয় উলটেপালটে অতি সূক্ষ্মভাবে কী যেন দেখল। সবশেষে, নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ে একটা কাগজে খসখস করে কয়েকটা লাইন লিখে টোকা মেরে কাগজটা এগিয়ে দিলে স্ট্যানলি হপকিনসের পানে।

বললে, 'তোমার জন্যে এর বেশি আর কিছু করতে পারছি না আমি। কাগজটা তোমার কাজে লাগতে পারে।'

কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল গোয়েন্দাপ্রবর। এখন কাগজটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলে। এই কথাগুলো লেখা ছিল কাগজটায় :

'অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের একজন স্ত্রীলোককে আমাদের প্রয়োজন। তার বেশভূষা ভদ্রমহিলার মতো, নাক অসাধারণ রকমের মোটা এবং নাকের দু-পাশের দুই চোখ খুবই ঘেঁষাঘেঁষি। তার কপাল কুঁচকোনো, চোখ কুঁচকে তাকানোর অভ্যাস আছে এবং সম্ভবত কাঁধ দুটোও গোল। দেখা যাচ্ছে গত কয়েক মাসের মধ্যে অন্তত পক্ষে দু-বার চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে তাকে যেতে হয়েছে। যেহেতু তার চশমার লেন্সের শক্তি খুবই বেশি এবং যেহেতু চক্ষু-পরীক্ষকের সংখ্যা খুব বেশি নেই, সুতরাং তাকে খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন হবে না।'

হপকিনসের অবাক চাহনি দেখে মুচকে হেসে ওঠে হোমস। আমারও চোখে-মুখে নিশ্চয় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দাপ্রবরের বিস্ময়।

'আরে খুবই সোজা আমার অনুমান-সিদ্ধান্ত', বলে হোমস। 'চশমা ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা থেকে এত ভূরি ভূরি অথচ নিখুঁত সিদ্ধান্ত আদায় করা যায়। এমন কোনো বস্তুর নাম করাই কঠিন হবে তোমার পক্ষে। এ-চশমাটা তো দেখছি আরও অসাধারণ। প্যাঁসনেটা যে স্ত্রীলোকের তা বুঝেছি এর হালকা আর সূক্ষ্ম গড়ন দেখে এবং বিশেষ করে, মরবার আগে স্মিথের শেষ ক-টি শব্দ থেকে। তার স্বভাব মার্জিত কিনা এবং বেশভূষা ভদ্রোচিত কিনা, তা বুঝেছি সোনার চশমা দেখে। চশমাটা নিরেট সোনার এবং সুন্দরভাবে বাঁধানো। এমন রুচিসুন্দর প্যাঁসনে যিনি চোখে লাগান, তিনি যে অন্যান্য দিক দিয়ে অপরিচ্ছন্ন হবেন, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। চশমাটা চোখে লাগালেই দেখবে, ক্লিপটা তোমার নাকের পক্ষে খুবই চওড়া। তার মানে এই— ভদ্রমহিলার নাকটি গোড়ার দিকে খুবই মোটা। এ ধরনের নাক সাধারণত ছোটো আর পুরু হয়। কিন্তু এর অনেক ব্যতিক্রম আছে বলেই বর্ণনার এ-পয়েন্ট নিয়ে জোর দিইনি অথবা আমার অনুমানই যে নির্ভুল, এমন কথাও বলিনি। আমার নিজের মুখ সরু। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাকের ওপর চশমা লাগালে কিছুতেই দুই চোখের তারাকে কাচ দুটোর মাঝামাঝি বা তার কাছাকাছি আনতে পারছি না। সুতরাং ভদ্রমহিলার চোখ দুটি যে নাকের একদম গা ঘেঁষে তা বুঝতে দেরি হল না। ওয়াটসন, প্যাঁসনেটা হাতে নিলেই বুঝবে, কাচ দুটো কনকেভ অর্থাৎ অবতল এবং তার পাওয়ারও অস্বাভাবিক রকমের বেশি। সারাজীবন ধরে যে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি এতখানি সংকুচিত, তার দেহতেও যে এমন চাহনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কী! কপাল, চোখের পাতা আর কাঁধ— এই তিন জায়গাতেই দেখা যায় কুঁচকে তাকানোর এইসব চিহ্ন।'

আমি বললাম, 'তোমার যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম। কিন্তু ভাই, একটা জিনিস তো বুঝলাম না। চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে গত কয়েক মাসের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে দু-বার যেতে হয়েছে— এ-কথাটি কী করে আবিষ্কার করলে, তা তো বোধগম্য হল না।'

চশমাটা তুলে নিলে হোমস।

বললে, 'হাত দিলেই বুঝবে ক্লিপের ওপর খুদে খুদে শোলার ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকের ওপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে। একটা ফিতের রং জ্বলে গেছে। ব্যবহারের ফলে একটু ক্ষয়েও গেছে। অপরদিকটা আনকোরা। কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা ফিতে পড়ে যাচ্ছে, একটা ফিতে পড়ে যাওয়ার পর নতুন করে লাগানো হয়েছে এই ফিতেটাকে। পুরোনো শোলাটাকে কিন্তু লাগানো হয়েছে মাস কয়েকের মধ্যেই। দুটো ফিতে দেখতে হুবহু একরকম। তাই বললাম, একই দোকানে দু-দুবার যেতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে।'

'শাবাশ! তাক লাগিয়ে দিলেন দেখছি!' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে হপকিনস। 'ভাবুন তো একবার সবকটা প্রমাণ হাতের মুঠোয় নিয়েও এত খবরের ছিটেফোঁটাও জানতে পারিনি আমি। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল লন্ডন শহরের সবগুলো চোখের ডাক্তারখানায় একবার করে ঢুঁ মেরে আসি।'

'তা তো করবেই। ইতিমধ্যে কেসটা সম্পর্কে আমাদের আর কিছু বলার আছে তোমায়?'

'আর কিছুই নেই মি. হোমস। আমার তো মনে হয়, আমি যা জানি, আপনিও তা জানেন— হয়তো বেশি জানেন। গ্রামের পথে রেলস্টেশনে কোনো আগন্তুককে দেখা গেছিল কি না

এ-সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম। কাউকে দেখা গেছে বলে কোনো খবর এখনও শুনিনি। খুনটার পেছনে কোনো রকমের উদ্দেশ্যের নামগন্ধ নেই এবং এই না-থাকাটাই বার বার ঘুলিয়ে দিচ্ছে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি। যা হয় একটা মোটিভের ছায়াটুকু পর্যন্ত কেউ ধরে উঠতে পারল না?'

'আ! এদিক দিয়ে অবশ্য তোমায় সাহায্য করতে পারব না আমি। তুমি কি চাও আমরা কালকে আসি তোমার সঙ্গে?'

'চাওয়াটা যদি আমার পক্ষে অতিরিক্ত না হয়, মি. হোমস, তাহলে সত্যিই খুব খুশি হই আপনি এলে।'

পরের দিন পৌঁছোলাম ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে। বাগানের ফটকে দেখা হল একজন কনস্টেবলের সাথে।

'কিছু খবর আছে, উইলসন?'

'না, স্যার, কিছুই নেই।'

'কোনো আগন্তুককে দেখা গেছে এ-অঞ্চলে?'

'না, স্যার, স্টেশনের কাছে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলছে, গতকাল কোনো অচেনা লোকই আসেনি বা যায়নি ও-পথ দিয়ে।'

'সরাইখানা আর হোটেলগুলোয় খোঁজ নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, স্যার। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।'

'এখান থেকে তো হেঁটেই যাওয়া যায় চ্যাথাম। যেকোনো লোকের পক্ষেই ওখানে থাকা বা সবার অগোচরে ট্রেনে চড়া সম্ভব। মি. হোমস এই সেই বাগানের পথ। আবার আমি বলছি, গতকাল কোনো চিহ্ন এখানে ছিল না।'

'দাগগুলো কোন দিকের ঘাসের ওপর দেখেছিলে?'

'এইদিকে, স্যার। ফুলের ঝোপ আর রাস্তার মাঝে এই সরু ঘাসের বর্ডারের ওপর। দাগগুলো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু গতকাল বেশ পরিষ্কার ছিল চিহ্নগুলো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখান দিয়ে কেউ-না-কেউ গেছে।' ঘাসের বর্ডারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল হোমস। 'খুবই হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। কেননা, বেসামাল হলেই পায়ের ছাপ থেকে যেত একদিকে রাস্তার ওপর। অপর দিকে পায়ের ছাপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত ফুলের ঝোপের নরম মাটির ওপর।'

'হ্যাঁ, স্যার, মেয়েটির মাথা খুবই ঠান্ডা।'

অভিসন্ধি-লুকোনো চকিত চাহনি ভেসে যেতে দেখলাম হোমসের ওপর দিয়ে।

'ভদ্রমহিলা এই পথ দিয়ে এসেছেন বলছিলে, না?'

'হ্যাঁ, স্যার। আর কোনো পথ ছিল না।'

'ঘাসের এই বর্ডারটার ওপর দিয়ে?'

'নিশ্চয় তাই, মি. হোমস!'

'হুম! কাজটা খুবই অসাধারণ হে— খুবই অসাধারণ। বেশ, বেশ, আমার তো মনে হয়, পথ দেখা সাঙ্গ হয়েছে। এবার চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক। বাগানের এই ফটকটা সাধারণত খোলা হয়, তাই না? তাহলে গটগট করে ঢুকে পড়া মেয়েটিকে আর কিছুই করতে হয়নি দেখছি। খুন

করার অভিপ্রায় তাঁর মনে ছিল না। থাকলে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়েই আসতেন তিনি। লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিতেন না নিশ্চয়। এই করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। নারকেল দড়ির মাদুরের ওপর কোনো ছাপই রেখে যাননি। তারপরই এসে পড়লেন পড়ার ঘরে। এখানে কতক্ষণ ছিলেন তিনি? তা ধরবার কোনো উপায় আমাদের নেই।'

'কয়েক মিনিটের বেশি নয়, স্যার। আপনাকে বলতে ভুলে গেছিলাম, ওই কাণ্ডের একটু আগেই ঘর পরিষ্কার করার জন্যে মিসেস মার্কার এসেছিল । মিনিট পনেরো ছিল সে এ-ঘরে।'

'বেশ, তাহলে খানিকটা দিশে পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলা এ-ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপর করলেন কী? না, এগিয়ে গেলেন লেখবার টেবিলের কাছে। কী জন্যে? ড্রয়ারে রাখা কিছুর জন্যে নয়। তাঁর নেওয়ার মতো যদি কিছু থাকে এ-ঘরে, তবে তা তালাচাবি দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক। না হে, না, কাঠের ওই বিউরোটার মধ্যেই ছিল কিছু। হুররে! বিউরোর সামনের দিকে এ-আঁচড়টা কীসের হে? দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে ধরো তো, ওয়াটসন। এ-আঁচড়ের কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন হপকিনস?'

যে-দাগ নিয়ে তার এত অভিনিবেশ, তা শুরু হয়েছে চাবির গর্তর ডান দিকে তামার পাতের ওপর। প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা আঁচড়টা— কাঠের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বার্নিশটাও তুলে ফেলেছে।

'আমিও ওটা দেখেছি, মি. হোমস। কিন্তু চাবির গর্তের আশপাশে এ ধরনের আঁচড় তো হামেশাই দেখা যায়।'

'কিন্তু এ-দাগটা যে আনকোরা— একদম নতুন। দেখছ না, কাটার জায়গায় তামাটা কীরকম চকচক করছে। আঁচড়টা পুরোনো হলেও সমস্ত তামার পাতটার যা রং, আঁচড়টার রংও হত তাই। আমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখো। পরিখার দু-পাশে যেমন মাটি জমে থাকে উঁচু হয়ে, ঠিক তেমনি জমে আছে আঁচড়টার দু-পাশে। মিসেস মার্কার আছে নাকি?'

ঘরে ঢুকল একজন বিষণ্ণ বদন বৃদ্ধা।

'আজ সকালে এই বিউরোর ধুলো ঝেড়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'এই আঁচড়টা লক্ষ করেছিলে?'

'না, স্যার করিনি।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, তুমি করনি। কেননা ধুলো ঝাড়ার পর বার্নিশের এই কুচোগুলো নিশ্চয় এখানে থাকত না। এ বিউরোর চাবি কার কাছে থাকে?'

'সাধারণ চাবি?'

'না, স্যার। ''চাব'' কোম্পানির চাবি।'

'বেশ, বেশ। মিসেস মার্কার তুমি এবার আসতে পার। একটু এগোতে পেরেছি আমরা। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, বিউরোর কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর হয় খুলে ফেললেন কাবার্ডটা, অথবা খোলবার চেষ্টা করলেন। এই নিয়ে যখন ব্যস্ত উনি, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ। তাড়াহুড়ো করে চাবিটা বার করতে গিয়ে পাল্লার খানিকটা আঁচড়ে ফেললেন চাবি দিয়ে। উইলোবি স্মিথ চেপে ধরল তাঁকে। মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যা পেলেন, তাই তুলে নিলেন

তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, হাতে উঠে এল এই ছুরিটা এবং সঙ্গেসঙ্গে তাই দিয়ে আঘাত হানলেন তিনি স্মিথের ওপর— উদ্দেশ্য ছিল কোনোমতে ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। মারাত্মক সে-আঘাত। পড়ে গেল স্মিথ। আর, সটকান দিলেন ভদ্রমহিলা। যা নিতে তাঁর আগমন, যাবার সময়ে তা নিয়েও যেতে পারেন, নাও নিয়ে যেতে পারেন। সুসান আছে নাকি? আচ্ছা সুসান, চিৎকারটা শোনার পর ওই দরজা দিয়ে কারো পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?'

'না, স্যার। তা অসম্ভব! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই প্যাসেজে তাহলে কাউকে-না-কাউকে দেখতে পেতাম আমি। তা ছাড়া, দরজাটা তো একেবারেই খোলেনি। খুললে শব্দ শুনতে পেতাম।'

'তাহলে পলায়ন-পথ সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। যে-পথে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা, সেই পথেই প্রস্থান করেছিলেন তিনি। এ-সম্বন্ধে তাহলে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আচ্ছা এই দ্বিতীয় প্যাসেজটা প্রফেসরের ঘরে গেছে, তাই না? এদিক দিয়ে বেরোবার পথ আছে নাকি?'

'না, স্যার।'

'আমরা বরং প্রফেসরের ঘরে গিয়ে আলাপ করে আসি তাঁর সঙ্গে। আরে, আরে, হপকিনস! দারুণ দরকারি এই পয়েন্টটা। প্রফেসরের করিডোরেও দেখছি নারকেল দড়ির মাদুর বিছোনো।'

'কিন্তু স্যার, তাতে হয়েছে কী?'

'কেসটার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছ না? বেশ, বেশ, এর ওপর জোর দিতে চাই না আমি। নিঃসন্দেহে, আমারই ভুল। তবুও কিন্তু পয়েন্টটা খুবই ইঙ্গিতময়। চলে এসো আমার সঙ্গে— আলাপ করিয়ে দাও প্রফেসরের সঙ্গে।'

প্যাসেজ বরাবর এগিয়ে গেলাম আমরা। বাগানের পথের দিকে যে-প্যাসেজটা গেছে, তার যা দৈর্ঘ্য, এটারও তাই। করিডোরের প্রান্তে এক সারি সিঁড়ি উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। পথপ্রদর্শক হপকিনস টোকা দিলে দরজায়। তারপর আমাদের নিয়ে ঢুকল প্রফেসরের শোবার ঘরে।

ঘরটা বেজায় বড়ো। চারিদিকে অগণিত কেতাবের সারি। শেলফ উপচে বইয়ের পাহাড় জমে উঠেছে ঘরের কোণে কোণে এবং আলমারিগুলোর পায়ার কাছে মেঝের ওপর। বিছানাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। চারিদিকে বালিশ সাজিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে বসে ছিলেন বাড়ির মালিক। এ-রকম ধরনের অসাধারণ চেহারার লোক আমি কদাচিৎ দেখেছি। হাড়সর্বস্ব রোগা মুখ, টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক। গুচ্ছ গুচ্ছ ঝোপের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুরুর নীচে গভীর গহ্বরের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল একজোড়া কুচকুচে কালো চোখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিলেন প্রফেসর। ভদ্রলোকের চুল দাড়ি সবই ধবধবে সাদা। কিন্তু মুখের চারপাশের দাড়িতে হলদে রঙের ছোপ লেগেছিল অদ্ভুতভাবে! সাদা চুলের ঝোপের মধ্যে জ্বলছিল একটা সিগারেটের আগুন। বাসি তামাকের ধোঁয়ার দুর্গন্ধ ভাসছিল ঘরের বাতাসে। হোমসের পানে ভদ্রলোককে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখলাম, নিকোটিনের হলদে রঙের ছোপ তাঁর হাতেও লেগেছে।

'ধূমপান করেন, মি. হোমস?' বাছাই করা ইংলিশ বলেন প্রফেসর, কিন্তু উচ্চারণটা অদ্ভুত।

হোমস একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মসৃণ দৃষ্টি-শর নিক্ষেপ করে চলেছিল ঘরের সব কিছুর ওপর।

'তামাক আর আমার কাজ, কিন্তু এখন শুধু তামাক,' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। 'খাসা ছেলেটি! আরে মশাই, আর কয়েক মাস ট্রেনিং দিলেই চমৎকার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারত সে! কেসটা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?'

'এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি।'

'আমরা তো প্রত্যেকে এখনও অন্ধকারে রয়েছি। এ-অন্ধকারের মধ্যে যদি কিছু আলো নিক্ষেপ করতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।'

বৃদ্ধ প্রফেসরের কথা শুনতে শুনতে ঘরের একদিকে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমাগত পায়চারি করছিল হোমস। লক্ষ করলাম, অসাধারণ দ্রুতবেগে ধূমপান করে চলেছে ও। দেখেই বোঝা যায়, আলেকজান্দ্রিয়ান সিগারেটের[৩] প্রতি গৃহস্বামীর অনুরাগে ভাগ বসাচ্ছে হোমস নিজেও।

বৃদ্ধ বললেন, 'এমনিতেই আমি রুগ্‌ণ, স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল, তার ওপর আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকেও সরিয়ে নেওয়া হল কাছ থেকে। কাজেই জানি না এত কাজ আমি সমাপ্ত করতে পারব কি না। আরে, মি. হোমস! আপনি তো দেখছি আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি ধূমপান করেন।'

মৃদু হাসল হোমস।

'এ-বিষয়ে আমি বিজ্ঞ পরীক্ষক', বলতে বলতে সে আর একটি সিগারেট তুলে নিল বাক্স থেকে— এই তার চতুর্থ— তার সদ্য-শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশ দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে বললে, 'সুদীর্ঘ সওয়াল-জবাবের ঝামেলায় ফেলে আপনাকে আর বিব্রত করব না, প্রফেসর কোরাম। কেননা, আমি আগেই শুনেছি খুনের সময় আপনি শয্যায় ছিলেন এবং এ-সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। বেচারা ছেলেটি মরবার সময় বলে গেছিল, "প্রফেসর— সেই মেয়েটা"— এ-সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন কি?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, 'সুসান পল্লি-অঞ্চলের মেয়ে। এ-শ্রেণির মেয়েদের অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতার কথা তো আপনার জানা নয়। আমার মনে হয়, অন্তিম সময়ে বেচারা স্মিথ প্রলাপের ঘোরে বিড়বিড় করে অবোধ্য অস্পষ্ট কিছু বলে গেছে— আর এই মেয়েটা তাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা অর্থহীন খবর তৈরি করে নিয়েছে।'

'বটে। ট্র্যাজেডিটা সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনো ব্যাখ্যা?'

'খুব সম্ভব দুর্ঘটনা। সম্ভবত— শুধু নিজেদের মধ্যেই বলতে সাহস পাচ্ছি— আত্মহত্যা। অনেকরকম লুকোনো কষ্ট থাকে তো তরুণদের মনে, হৃদয়সম্পর্কিত অনেক ব্যাপার, কোনোদিনই সেসব আমরা জানতে পারিনি। খুনের চাইতে বরং এ-ধারণাটার খানিকটা মানে আছে।'

'কিন্তু প্যাঁসনে চশমাটা?'

'আ! নেহাতই ছাত্র আমি— শুধু স্বপ্নই দেখি। বাস্তব জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা করার মতো

যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তবুও, মাই ফ্রেন্ড, আমরা জানি, ভালোবাসার পরিণতি মাঝে মাঝে বড়ো বিচিত্র আকার ধারণ করে। সে যাই হোক, আর একটা সিগারেট নিন। এ-জিনিস এ-রকম সমাদর পাচ্ছে দেখলেও আনন্দ। হাতপাখা, দস্তানা, চশমা— জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়ার সময়ে প্রতীক হিসেবে বা সম্পদ হিসেবে কে যে কোন জিনিসটা নিয়ে যাবে, তা কি কেউ বলতে পারে? এই ভদ্রলোক ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের কথা বলছিলেন। কিন্তু যাই বলুন, ও-বিষয়ে ভুল হওয়াটাই খুব সহজ! আর ছুরিটা? পড়ে যাওয়ার সময়ে অনায়াসেই তা দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে হতভাগা স্মিথ। খুব সম্ভব, ছেলেমানুষের মতো কথা বলছি আমি। কিন্তু আমার মতে নিজের হাতেই নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছে উইলোবি স্মিথ।'

থিয়োরিটা হোমসের মনে ধরেছে মনে হল। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চিন্তামগ্ন মুখে তন্ময় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল ও।

তারপর বললে, 'প্রফেসর কোরাম, বিউরোর মধ্যে কাবার্ডে কী ছিল বলুন তো?'

'চোরের উপকারে আসার মতো কিছু ছিল না। পারিবারিক কাগজপত্র, স্ত্রীর চিঠি, ইউনিভার্সিটির দেওয়া সম্মানপত্র, ডিপ্লোমার গাদা— এইসব। এই নিন চাবি। নিজেই দেখে আসুন।'

'হোমস চাবিটা তুলে নিল এবং একঝলক সেটার দিকে দেখল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

চাবিটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে একবার দেখে নিলে হোমস। তারপরেই ফেরত দিয়ে দিলে প্রফেসরের হাতে।

'না। বিউরো ঘেঁটে কিছু কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। আমি বরং বাগানে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ধীরেসুস্থে ভেবে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা। আপনার ওই আত্মহত্যা-থিয়োরি নিয়ে কিছু বলা দরকার। অনেক উৎপাত করে গেলাম, ক্ষমা করবেন, প্রফেসর কোরাম। লাঞ্চের আগে আর বিরক্ত করব না আপনাকে। ঠিক দুটোর সময়ে আবার আসব আমি। ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটে তো রিপোর্ট দিয়ে যাব।'

আশ্চর্যরকম অন্যমনস্ক দেখলাম হোমসকে। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা পায়চারি করতে লাগলাম বাগানের পথের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত।

অবশেষে আমি শুধাই, 'সূত্র পেয়েছ নাকি?'

'তা নির্ভর করছে আমি যে-সিগারেটগুলো খেয়ে এলাম তার ওপর। এমনও হতে পারে যে আগাগোড়াই ভুল করছি আমি। ওই সিগারেটগুলোই আমায় তা দেখিয়ে দেবে।'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি, 'মাই ডিয়ার হোমস, তুমি জানছ কী করে যে—'

'বেশ, বেশ, নিজের চোখেই দেখবে সব। না হলে, কোনো ক্ষতি নেই। চোখের ডাক্তারের ক্লু তো হাতেই রয়েছে, ফিরে এসে তাই নিয়ে কাজ চালানো যাবে'খন। কিন্তু সোজা পথ যখন দেখতে পেয়েছি, তখন তার সুযোগ আমি নেবই। এই যে মিসেস মার্কার! চলো হে, মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা বলে খবর-টবর কিছু জানা যাক ওর কাছ থেকে।'

এর আগে আমি হয়তো বলে থাকতে পারি যে ইচ্ছে করলে, আশ্চর্য উপায়ে মেয়েদের চিত্ত জয় করতে পারত হোমস এবং অনায়াসে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠত সে। এক্ষেত্রেও, পাঁচ মিনিট বললেও দেখলাম তার অর্ধেক সময়ের মধ্যে মিসেস মার্কারের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে ও এবং এমনভাবে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে যেন কত বছর ধরেই তার সঙ্গে পরিচয় হোমসের।

'হ্যাঁ, মি. হোমস, আপনি যা বললেন, তা সত্যি। দারুণ সিগারেট খান উনি। সারাদিন তো বটেই। এমনকী কখনো কখনো রাত্রেও। একদিন সকালে ওঁর ঘরটা আমি দেখেছিলাম, স্যার। কী বলব, দেখলে পরে আপনার মনে হত যেন লন্ডনের কুয়াশা দেখছেন। বেচারি মি. স্মিথও সিগারেট খেতেন। তবে প্রফেসরের মতো একটা খারাপ স্মোকার ছিলেন না উনি। ওঁর স্বাস্থ্য— এত সিগারেট খেয়ে জানি না ওঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে।'

'আ!' বলে হোমস। 'কিন্তু এতে খিদে নষ্ট হয়ে যায় যে।'

'তা হবে, আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, স্যার।'

'আমার তো মনে হয়, খাওয়ার সময়ে নামমাত্র খান প্রফেসর, তাই নয় কি?'

'ঠিক নেই, কখনো বেশি, কখনো কম। ওঁর হয়েই বলছি আমি।'

'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাননি উনি! তা ছাড়া, যে পরিমাণে সিগারেট খেতে দেখলাম, ওর পরে লাঞ্চও ছোঁবেন না।'

'উঁহু, সবই ভুল বললেন, স্যার। আজ সকালেই তো আশ্চর্যরকমের বেশি ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন উনি। এ-রকম খাওয়া খেতে আগে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লাঞ্চের জন্যে

একটা পুরো ডিশ ভরতি কাটলেটের অর্ডারও দিয়েছেন উনি। আমি তো নিজেই অবাক হয়ে গেছি ওঁর খাওয়া দেখে। গতকাল এ-ঘরে এসে মেঝের ওপর মি. স্মিথের দেহ দেখার পর থেকে খাবারের দিকে তাকাতেও পারছি না আমি। যাকগে, সবরকম মিশিয়েই তো এই সংসার। তাই বুঝি এত কাণ্ডের পরেও খিদে মরতে দেননি প্রফেসর।'

সারাসকালটা বাগানে হাওয়া খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। স্ট্যানলি হপকিনস গ্রামে গেছিল। আগের দিন সকালে চ্যাথাম রোডে একজন অজ্ঞাত স্ত্রীলোককে কয়েকজন ছেলে-মেয়ে দেখেছিল— এমনি একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় খোঁজ করতে গেছিল ও। আর, আমার বন্ধুটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনাই এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেছে শূন্যে। এ-রকমভাবে মনমরা হয়ে কোনো কেস নাড়াচাড়া করতে ওকে আমি দেখিনি। এমনকী হপকিনস এসে যখন খবর দিলে যে, হোমসের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমনি একজন চশমাপরা বা প্যাঁসনে চোখে স্ত্রীলোককে আগের দিন সকালে বাচ্চারা সত্যি সত্যিই দেখেছে চ্যাথাম রোডে— তখনও তার মনে কোনোরকম নিবিড় আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তার অধিকতর মনোযোগ দেখা গেল সুসানের আনা খবরে। লাঞ্চের সময়ে সুসানই পরিবেশন করছিল আমাদের। নিজে থেকেই খবরটা দিল সে। গতকাল মি. স্মিথ বোধ হয় বেরিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। খুন হওয়ার আধ ঘণ্টাটাক আগে ফিরে আসে সে। এ-খবরের সঙ্গে আসল ঘটনার কী সম্পর্ক, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বেশ বুঝলাম আগে থেকেই মস্তিকের মধ্যে গড়ে নেওয়া অসাধারণ ছকের মধ্যে এ-খবরটাকেও বেমালুম জোড়া লাগিয়ে দিলে হোমস। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে তাকালে ও— 'জেন্টলমেন, দুটো বাজে। এবার ওপরে গিয়ে আমাদের প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে বসে এ-ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলা যাক।'

সবে লাঞ্চ শেষ করেছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। খালি ডিশগুলো দেখেই বুঝলাম মিসেস মার্কার তাঁর চমৎকার ক্ষুধা সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা সত্য। ধবধবে সাদা কেশর দুলিয়ে ঝকঝকে চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমাদের ওপর রাখতেই তাঁকে দেখে মনে হল যেন বাস্তবিকই কোনো ঐন্দ্রজালিকের মূর্তি দেখছি। চিরন্তন সিগারেটটা তখনও ধূমোদ্গিরণ করছিল তাঁর মুখে। পোশাক পরিবর্তন করে আগুনের পাশে হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে ছিলেন উনি।

'তারপর, মি. হোমস, রহস্যের সমাধান করতে পারলেন?' বলে পাশের টেবিলে রাখা সিগারেটের মস্ত বড়ো টিনটা এগিয়ে দিলেন হোমসের পানে। সঙ্গেসঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলে হোমস এবং হাতে ঠোকাঠুকি লেগে টেবিলের কিনারায় উলটে গেল বাক্সটা। মিনিটখানেক কি দুয়েকের জন্য প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিতে লাগলাম কার্পেটের ওপর এবং ছড়ানো সিগারেটগুলো উদ্ধার করে আনতে লাগলাম অসম্ভব সব কোণ থেকে। উঠে দেখলাম চকচক করছে হোমসের দুই চোখ এবং রঙের ছোঁয়া লেগেছে গালে। একমাত্র সংকটকালেই উড়তে দেখেছি লড়াইয়ের এসব নিশানদিহি।

'হ্যাঁ', বললে হোমস। 'এ-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করেছি আমি।'

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমি আর স্ট্যানলি হপকিনস। জিঘাংসা নিষ্ঠুর দাঁতখিঁচুনির মতোই একটা ছায়া দুলে উঠল বৃদ্ধ প্রফেসরের রুগ্ণ মুখের রেখায় রেখায়।

'সত্যি! বাগানের মধ্যে নাকি?'

'না, এখানে।'

'এখানে! কখন?'

'এই মুহূর্তে।'

'নিশ্চয় তামাশা করছেন, মি. শার্লক হোমস। বলতে বাধ্য করলেন আমায়— এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এভাবে কথা বলা শোভা পায় না।'

'আমার যুক্তি-শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশ আমি নিজে জোড়া লাগিয়েছি এবং প্রতিটি জোড় আমি পরখ করে দেখেছি। প্রফেসর কোরাম, আমার হিসেব নির্ভুল। আপনার মোটিভ কী, অথবা এই অদ্ভুত ব্যাপারে কী কী চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন, তা এখনও বলতে পারছি না আমি। খুব সম্ভব মিনিট কয়েকের মধ্যে আপনার মুখেই তা শুনতে পাব। ইতিমধ্যে অতীতের ঘটনাগুলোই জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করছি আপনার সামনে এবং করছি আপনারই ভালোর জন্যে। সব শোনার পর ধরতে পারবেন কোন কোন তথ্যগুলো এখনও আমার দরকার।

'গতকাল আপনার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এক ভদ্রমহিলা। আপনার বিউরোতে রাখা বিশেষ কতকগুলো দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করার অভিপ্রায় নিয়েই এসেছিলেন তিনি। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর নিজের চাবি। আপনার চাবি পরীক্ষা করে দেখলাম বার্নিশের ওপর আঁচড় কাটার যে সামান্য বিবর্ণতা ফুটে ওঠা উচিত, আপনার চাবিতে তা নেই। কাজেই, এ-কাজে আপনি কোনো সাহায্য করেননি। প্রমাণ যা পাচ্ছি, দেখে বুঝছি উনি এসেছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার কোনো জিনিস সরিয়ে নিয়ে যেতে।'

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, 'ভারি ইন্টারেস্টিং আর শিক্ষামূলক তো! আর কিছু বলার নেই আপনার? ভদ্রমহিলার অস্তিত্ব যখন আবিষ্কার করেছেন, তখন তিনি গেলেন কোথায়, তাও নিশ্চয় বলতে পারবেন?'

'চেষ্টা করব। প্রথমেই বলি আপনার সেক্রেটারি তাঁকে পাকড়াও করে। করতেই উনি তার কবলমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছুরি মারেন তাকে। এ-বিপর্যয়কে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নই আমি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-রকম মারাত্মক চোট দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে ছুরি চালাননি ভদ্রমহিলা। গুপ্তহত্যা যে করতে আসে, সে কখনো নিরস্ত্র হয়ে আসে না। খুনখারাপি দেখেই দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন উনি। ক্ষিপ্তের মতো এই শোচনীয় দৃশ্যস্থল ছেড়ে তিরবেগে বেরিয়ে যান বাইরে। দুর্ভাগ্যবশত ঝটাপটি করার সময়ে ওঁর প্যাঁসনেটা খোয়া যায়। দৃষ্টিশক্তি তাঁর অতি ক্ষীণ এবং দূরের জিনিস একেবারেই দেখতে পান না বললেই চলে। কাজেই চশমা হারিয়ে সত্যি সত্যিই অসহায় হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। করিডোর দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন উনি। ভেবেছিলেন, এই পথ দিয়েই ঘরে ঢুকেছিলেন আসবার সময়ে। একইরকম দেখতে নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো ছিল দুটো করিডোরেই। যখন বুঝলেন যে ভুলপথে এসেছেন, তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে এবং পিছিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ। এ-রকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তাঁর? যে-পথে এসেছিলেন, সে-পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। এগিয়ে যেতে হবে— যা-ই থাকুক সামনে। এগিয়ে গেলেন উনি! কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে একটা দরজা ঠেলে খুলে ফেলতেই এসে পড়লেন আপনার ঘরে।'

হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে বিহ্বলভাবে হোমসের পানে তাকিয়ে ছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। বিস্ময় আর ভয় যেন পাশাপাশি কেটে বসে গেছিল তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের রেখায়। হোমসের কথা ফুরোতেই জোর করে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লেন উনি।

'চমৎকার মি. হোমস, আগাগোড়া সুন্দর বলে গেলেন। কিন্তু আপনার এই অতি আশ্চর্য থিয়োরিতে ছোট্ট একটা কাঁটা থেকে গেছে। আমি নিজে হাজির ছিলাম এ-ঘরে। সারাদিনের মধ্যে একবারও বাইরে যাইনি।'

'আমার তা অজানা নয়, প্রফেসর কোরাম।'

'তাই বুঝি আপনি বলতে চান যে বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘরে একটা স্ত্রীলোক ঢুকেছিল কি না, আমি জানতে পারিনি?'

'আমি কখনো তা বলিনি। আপনি জানতেন, তিনি ঘরে ঢুকেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁকে গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিলেন।

আবার উচ্চ-গ্রামে অট্টহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর। শয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন উনি। অঙ্গারের মতো জ্বলছিল তাঁর দু-চোখ।

'আপনি উন্মাদ।' চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মতো কথা বলছেন আপনি। আমি তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছি? কোথায় তিনি?'

'ওইখানে', বলে ঘরের কোণে একটা উঁচু বুককেসের দিকে আঙুল তুলে দেখালে হোমস।

ভয়াবহ একটা আকুঞ্চন ভেসে গেল প্রফেসরের ভয়ংকর মুখের ওপর দিয়ে। দুই হাত শূন্যে ছুড়ে ধপ করে উনি বসে পড়লেন চেয়ারে। ঠিক সেই মুহূর্তে বোঁ করে একটা কবজার ওপর ঘুরে গেল বুককেসটা এবং তিরবেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন একজন স্ত্রীলোক।

'আপনি ঠিক বলেছেন।' অদ্ভুত বিদেশি গলায় চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'আপনি ঠিক বলেছেন! এই যে আমি।'

ধুলোয় বাদামি হয়ে উঠেছিলেন উনি। গোপন-স্থানের দেওয়ালের মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল আপাদমস্তক। কালিঝুলির ছাপ তাঁর মুখেও লেগেছিল। কোনোমতেই সুশ্রী বলা চলে না তাকে। হোমস যে রকমটি বর্ণনা দিয়েছিল তাঁর চেহারার, হুবহু সেসব বৈশিষ্ট্য দেখলাম তাঁর দেহে-চোখে-মুখে। বাড়তির মধ্যে ছিল আরও একটি বৈশিষ্ট্য—দীর্ঘ আর জেদি থুতনি। খানিকটা স্বাভাবিক প্রায়-অন্ধতার জন্যে আর খানিকটা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার জন্যে চোখ মিটমিট করে আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন উনি। দেখতে চেষ্টা করছিলেন, আমরা কে এবং কোথায় রয়েছি। এসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু একটা বনেদিয়ানার ছাপ ফুটে উঠেছিল ভদ্রমহিলার চেহারায়, উদ্ধত চিবুকের সাহসিকতায় আর উন্নত শিরে। দেখলেই সম্ভ্রমবোধ জাগে। যেন বাধ্য করে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে। স্ট্যানলি হপকিনস তাঁর বাহুর ওপর হাত রেখে বন্দি হিসেবে দাবি করল তাঁকে। কিন্তু আলতোভাবে ওকে সরিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক মর্যাদার সঙ্গে সরিয়ে দিলেন যে অবাধ্য হতে সাহস করল না হপকিনস। চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। দারুণ আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল, আকুঞ্চিত হয়ে উঠছিল তাঁর মুখের প্রতিটি মাংসপেশি। উদ্‌বিগ্ন চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন উনি ভদ্রমহিলার পানে।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি আপনার বন্দি', বললেন ভদ্রমহিলা। 'ঘুপসির মধ্যে থেকে সব শুনেছি।

আপনারা যা জেনেছেন, তা সত্য। সব স্বীকার করছি আমি। আমিই মেরে ফেলেছি যুবকটিকে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি বললেন, এ-হত্যা নিছক দুর্ঘটনা, তাঁর ভুল হয়নি। আমি জানতামও না, যে-জিনিসটা বাগিয়ে ধরেছিলাম আমি তা একটা ছুরি, মরিয়া হয়ে টেবিলের উপর থেকে যা হয় একটা তুলে নিয়ে ছেলেটিকে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি। যা বললাম, তা সত্যি।'

হোমস বললে, 'ম্যাডাম, জানি আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনাকে কিন্তু মোটেই সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

বীভৎস হয়ে উঠেছিল ভদ্রমহিলার মুখের রং। মুখের কালো ধুলোর স্তরের চেয়েও ভয়াবহ সে-বর্ণ। শয্যার একপাশে বসে পড়ে বলে চললেন উনি।

'বেশিক্ষণ এখানে আমি থাকছি না। কিন্তু পুরো সত্যটা আপনাদের জানাতে চাই আমি। আমি এই লোকটার স্ত্রী। এ কিন্তু ইংরেজ নয়। রাশিয়ান। ওর নাম আমি বলব না।'

এই প্রথম নড়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'ভগবান তোমার ভালো করবেন, অ্যান। ভগবান তোমার ভালো করবেন!'

দুই চোখে গভীর অবজ্ঞা নিয়ে প্রফেসরের পানে তাকালেন ভদ্রমহিলা। 'সারজিয়াস, তোমার এই জঘন্য ঘৃণিত জীবনটাকে কেন এমনভাবে আঁকড়ে ধরতে চাও বল তো? এ-জীবনে ক্ষতি করেছ অনেকের, কিন্তু ভালো করনি কারোরই— এমনকী তোমার নিজেরও নয়। যাই হোক, বিধাতার নির্ধারিত সময়ের আগে তোমার ওই অপলকা জীবনসূত্র ছিঁড়ে দেওয়ার কারণ হতে চাই না আমি। অভিশপ্ত এই বাড়ির চৌকাঠ পেরোনোর পর থেকে যথেষ্ট নির্যাতন গেছে আমার আত্মার ওপর। কিন্তু তবুও আমায় সব বলতে হবে, তা না হলে দেরি হয়ে যাবে খুবই।

'জেন্টলমেন, আমি তো বললামই, এ-লোকটার স্ত্রী আমি। ওর বয়স তখনও পঞ্চাশ। আর আমি ছিলাম কুড়ি বছরের একটা মূর্খ মেয়ে। তখনই বিয়ে হয় আমাদের। রাশিয়ার একটা শহরে, একটা ইউনিভার্সিটিতে— জায়গাটার নাম আমি বলব না।'

'ঈশ্বর তোমর মঙ্গল করুন, অ্যানা!' আবার বিড়বিড় করে ওঠেন বৃদ্ধ।

'আমরা ছিলাম সংস্কারক— বিপ্লবী— নিহিলিস্ট[৪]। ও ছিল, আমি ছিলাম, আরও অনেকে ছিল। তারপর একটা সময় এল যখন আমরা প্রত্যেকেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। একজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছিল। গ্রেপ্তার হল অনেকে। সাক্ষী-সাবুদের দরকার হয়ে পড়ল। তখনই নিজের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে এবং বিস্তর পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী তার নিজের স্ত্রী এবং সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। হ্যাঁ, ওরই স্বীকারোক্তির পর আমরা সবাই গ্রেপ্তার হলাম। কয়েকজন উঠল ফাঁসিকাঠের মঞ্চে, আর কয়েকজন গেল সাইবেরিয়ায়। শেষের দলে আমি ছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবন মেয়াদ ছিল না আমার। নোংরা পথে পাওয়া সমস্ত অর্থ নিয়ে ইংলন্ডে চলে এল আমার স্বামী। সেই থেকেই পরম শান্তিতে এখানে আছে সে। ও অবশ্য ভালো করে জানে, যেদিন ব্রাদারহুড জানতে পারবে তার ঠিকানা, সেদিন থেকে সাতটা দিনও যাবে না ন্যায়বিচারের দণ্ড ওর শিরে নেমে আসতে।'

কাঁপা হাত বাড়িয়ে কোনোমতে একটা সিগারেট তুলে নিলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'আমি তোমার হাতের মুঠোয়, অ্যানা। আর, চিরকালই আমার ভালো বই খারাপ করনি তুমি।'

'এখনও কিন্তু ওর শয়তানির চূড়ান্ত দিকটা আপনাদের আমি বলিনি! অর্ডারের কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রাণের বন্ধু! মহান, নিঃস্বার্থ আর প্রেমময় তার চরিত্র— এর কোনোটিই কিন্তু অ্যানার স্বামীর নেই। জোরজবরদস্তি জুলুমবাজিকে ঘৃণা করত সে, ভালোবাসত অহিংসাকে। অপরাধী ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই— অবশ্য যদি একে অপরাধ বলা যায়— কিন্তু সে নয়। এ-পথ থেকে ফেরানোর জন্যে চিঠি লিখত সে আমায়। এই চিঠিগুলোই বাঁচাতে পারত ওকে। আর পারত আমার ডায়েরিটা। তার প্রতি আমার মনোভাব, আমার আবেগ অনুভূতি প্রতিদিন লিখে রাখতাম এই ডায়েরিতে। আর লিখতাম আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত। ডায়েরি আর চিঠির তাড়া— দুটোই খুঁজে বার করে নিজের কাছে রেখে দেয় আমার পতিদেবতা। শুধু রেখে দেওয়া নয়, একদম লুকিয়ে ফেলে এই দুটি জিনিস এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে ওই যুবাপুরুষটির জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে। প্রাণে বেঁচে গেলেও মুক্তি পেল না অ্যালেক্সিস। তাকে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায়। সেইখানেই এখনও, এই মুহূর্তে, সে কাজ করে চলেছে একটা নুনের খনিতে। ভাবো দিকি তার অবস্থাটা, শয়তান কোথাকার! এখন, এই মুহূর্তে— যার নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতাও তোমার নেই, সেই অ্যালেক্সিস ক্রীতদাসের মতো গতর খাটিয়ে কোনোরকমে রয়েছে বেঁচে। আর তবুও কিনা তোমার জীবন আমার হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তোমায় রেহাই দিচ্ছি আমি!'

সিগারেটে টান মেরে বললেন বৃদ্ধ, 'তুমি তো চিরকালই এমনই মহীয়সী, অ্যানা।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রমহিলা! কিন্তু পরক্ষণেই যাতনা-করুণ ছোট্ট চিৎকার জেগে ওঠে ওর কণ্ঠে— ধপ করে আবার বসে পড়েন শয্যায়।

বলেন, 'শেষ আমায় করতেই হবে। আমার মেয়াদ ফুরোলে উঠে পড়ে লাগলাম ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধারের কাজে। রাশিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে এ দুটো জিনিস পাঠালেই হল, তাহলেই খালাস পাবে আমার বন্ধুটি। আমার স্বামী যে ইংলন্ডে এসেছে, তা জানতাম। মাসের পর মাস তল্লাশি চালালাম— শেষকালে আবিষ্কার করলাম তার ঠিকানা। ডায়েরিটা যে এখনও তার কাছে আছে, তা জেনেছিলাম সাইবেরিয়াতে থাকার সময়ে ওর একটা চিঠি পেয়ে। ডায়েরির পাতা থেকে কয়েকটা অংশ তুলে তিরস্কার করে চিঠিটা লিখেছিল আমায়। কিন্তু প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রবৃত্তি যার এতখানি, সে যে নিজে থেকেই সুড়সুড় করে কোনোদিনই ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দেবে না, তা আমি জানতাম। নিজেকেই তৎপর হয়ে সংগ্রহ করতে হবে তা। এই উদ্দেশ্যেই একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান থেকে একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করেছিলাম এ-কাজের জন্যে। সেক্রেটারি হয়ে সে এল আমার স্বামীর বাড়িতে। সারজিয়াস, সে হল তোমার দ্বিতীয় সেক্রেটারি। খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিয়েছিল সে। কাগজপত্র যে-কাবার্ডে থাকে এ-খবর সে সংগ্রহ করলে এবং চাবিটারও একটা ছাপ এনে দিলে আমায়। এর বেশি এক পা-ও যেতে রাজি হল না সে। বাড়ির একটা নকশাও আমায় দিয়েছিল। আর বলেছিল, দুপুরের আগে সবসময়ে ফাঁকা থাকে পড়ার ঘরটা। সে সময়ে সেক্রেটারি ব্যস্ত থাকে ওপরে। তাই শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে নিজেই এসেছিলাম কাগজগুলো উদ্ধার করতে। সফলও হয়েছি, কিন্তু হায়-রে, কী চরম মূল্যই দিতে হল তার প্রতিদানে!

'কাগজগুলো সবে নিয়েছি, চাবি ঘুরিয়ে কাবার্ডটা বন্ধ করছি, এমন সময়ে ছেলেটি এসে

চেপে ধরলে আমায়। সেদিন সকালেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রফেসর কোরাম থাকেন কোথায়। তখন জানতাম না যে এ-বাড়িরই কর্মচারী সে।'

'এগজ্যাক্টলি! এগজ্যাক্টলি!' বলে ওঠে হোমস। 'বাড়ি ফিরে এসে সেক্রেটারি প্রফেসর কোরামকে জানালে রাস্তায় দেখা স্ত্রীলোকটার কথা। তারপর, শেষ নিশ্বাস ফেলার সময়ে এই খবরটি পাঠাতে চেয়েছিল তাঁকে যে এই সেই মেয়েটি— যে-মেয়েটির কথা, এইমাত্র সে আলোচনা করে এসেছে তাঁর সঙ্গে।'

'আমাকে কথা বলতে দিন,' আদেশের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে ভদ্রমহিলার কণ্ঠে। যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে তাঁর মুখ। 'ও পড়ে যেতেই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ভুল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীর ঘরে। ও চেয়েছিল আমাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ও-কাজটি করতে যাওয়ার আগে তার মনে রাখা উচিত যে তারও জীবন আমার হাতে। আমাকে আইনের খপ্পরে দিলে, আমিও তাকে সঁপে দেব ব্রাদারহুডের কবলে। আমি যে শুধু আমার জীবনের জন্যেই বাঁচতে চেয়েছিলাম, তা নয়। আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। ও বুঝল, আমার যে কথা, সেই কাজ— বুঝল যে, ওর অদৃষ্টও নির্ভর করছে আমার অদৃষ্টের ওপর। শুধু এই কারণেই আমায় আড়াল করতে চেয়েছিল ও— আর কোনো কারণের জন্যে নয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা লুকোনোর জায়গায় আমাকেও ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। পুরোনো যুগের চিহ্ন এই ঘুপসি জায়গাটার হদিশ জানত শুধু সে নিজে। নিজের ঘরে খাবার আনিয়ে খেত ও। তাই, ওর খাবারের অংশ আমাকেও দিতে পেরেছিল ও। ঠিক ছিল যে পুলিশ বাড়ি ছেড়ে বিদায় হলে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেব আমি এবং আর কোনোদিন ফিরে আসব না এ-অঞ্চলে। কিন্তু কেন জানি না আমাদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেল আপনার কাছে।' পোশাকের ভেতর থেকে বুকের কাছে লুকোনো ছোটো একটা প্যাকেট টেনে বার করলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'এই আমার শেষ কথা। এই প্যাকেটের বিনিময়ে মুক্তি পাবে অ্যালেক্সিস। ন্যায়বিচারের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আর অনুরাগের বিশ্বাসেই এ-জিনিস গচ্ছিত রাখলাম আপনার হাতে। নিন! রাশিয়ান এমব্যাসিতে আপনি পৌঁছে দেবেন এই প্যাকেটটা। আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে আর—'

'থামাও ওঁকে!' চেঁচিয়ে উঠল হোমস। ঝড়ের মতো ঘরের মাঝ দিয়ে ছুটে গিয়ে ভদ্রমহিলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে ছোটো একটা শিশি।

'বড়ো দেরি হয়ে গেছে!' শয্যার ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললেন উনি। 'বড়ো দেরি হয়ে গেছে! গোপন স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই বিষ খেয়েছি আমি। মাথা ঘুরছে! চললাম! প্যাকেটটার কথা স্মরণে রাখবেন স্যার— এ-দায়িত্ব আপনার।'

শহরে ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে বলল হোমস, 'খুবই সোজা কেসটা। কিন্তু কয়েক দিক দিয়ে বেশ শিক্ষামূলক। প্রথম থেকেই পুরোপুরিভাবে কেসটা নির্ভর করছিল ওই প্যাঁসনেটার ওপর। কপাল ভালো তাই মরার আগে চশমাটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল স্মিথ। তা না হলে এ-রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন কোনোদিন সম্ভব হত বলে মনে হয় না আমার। কাচ দুটোর শক্তি লক্ষ করেই বুঝেছিলাম, এ-চশমা যিনি ব্যবহার করেন, তাঁকে প্রায় অন্ধ বললেই চলে এবং চশমা-বিনা তিনি নিতান্তই অসহায়। তাই তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করতে বললে যে আততায়ী সরু একফালি

ঘাসের ওপর দিয়ে গেছে অথচ একবারও ভুল পা ফেলেনি, তোমার মনে থাকতে পারে, তখন আমি বলেছিলাম কাজটা বাস্তবিকই বড়ো অসাধারণ। মনে মনে কিন্তু আমি নিশ্চিত জানতাম, এ-কাজ একেবারে অসম্ভব। তার আর একটা চশমা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কাজেই ভদ্রমহিলা যে বাড়ির মধ্যেই আছেন এমন একটা প্রকল্প বা hypothesis বেশ গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে বাধ্য হলাম আমি। দুটো করিডোরে একই রকমের দেখতে নারিকেল দড়ির মাদুর পাতা দেখে বুঝলাম, পথ ভুল করা খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। সেক্ষেত্রে তিনি যে প্রফেসরের ঘরে ঢুকেছেন, তা আর না-বললেও চলে। তাই প্রথম থেকেই রীতিমতো সজাগ হয়ে রইলাম। আমার ধারণা যাতে সত্য প্রমাণিত হয়, এমনি কোনো কিছু যাতে চোখ না-এড়ায়, সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে চোখে দেখতে লাগলাম সব কিছু। তন্নতন্ন করে ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম লুকোবার মতো কোনো জায়গা দেখার আশায়। কার্পেটটা একটানা পাতা এবং মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা। তাই, মেঝের ওপর চোরা-দরজার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। বইগুলোর পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থাকতে পারে। জানেন তো, সেকেলে লাইব্রেরিতে এ ধরনের কায়দা হামেশাই দেখা যায়। লক্ষ করলাম, মেঝের সর্বত্র পর্বতপ্রমাণ বই, কিন্তু একটা বুককেসের সামনেটা একদম ফাঁকা। গোপন-স্থানের দরজা হয়তো এইটাই। কিন্তু আমার সাহায্য হতে পারে, এমনি কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। তবে কার্পেটটার রং ম্যাটমেটে ধূসর-বাদামি— এ-রকম রঙের কার্পেট পরীক্ষা করা খুব সহজ। তাই, অমন চিৎকার সিগারেটগুলোর অনেকগুলো শেষ করে ফেললাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। আর ছাই ফেলতে লাগলাম সন্দেহজনক বুককেসটার সামনে সমস্ত জায়গাটার ওপর। কৌশলটা ভারি সহজ কিন্তু দারুণ কাজে লাগে। তারপর নীচে নেমে গেলাম। ওয়াটসন, তোমার সামনেই তো প্রমাণ করলাম, আমার ধারণা সত্য। প্রমাণ করলাম যে প্রফেসর কোরামের খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, তাই নয় কি? তুমি অবশ্য আমার কথার এলোমেলো ধরন থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারনি। আবার গেলাম ওপরতলায়। সিগারেটের বাক্স উলটে দিয়ে খুব কাছ থেকে ভালো করে দেখে নিলাম মেঝের অবস্থাটা। সিগারেটের ছাইয়ের চিহ্ন থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝলাম, আমাদের অবর্তমানে গোপন-স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। ওহে হপকিনস, শেরিং ক্রস তো এসে গেল। কেসটার এ-রকম সার্থক সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাই তোমায়। নিশ্চয় এখন হেড কোয়ার্টারে চলেছ তুমি। ওয়াটসন, একটা গাড়ি নিয়ে চলো তুমি, আর আমি যাই রাশিয়ান এমব্যাসিতে।'

টীকা

১. **প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে' ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের জুলাই ১৯০৪ সংখ্যায় এবং আমেরিকায় কলিয়ার্স উইকলির ২৯ অক্টোবর ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

২. **বাথ চেয়ার** : হুইল চেয়ার আনুমানিক ১৭৫০-এ বাথ শহরে এই ধরনের চেয়ার প্রথম নির্মাণ করেন জেমস হিথ। সেই সময়ে, বা পরেও, চাকা লাগানো এই চেয়ারের প্রচলিত নাম ছিল 'বাথ চেয়ার'।

৩. **আলেকজান্দ্রিয়ান সিগারেট :** মিশরীয়দের হুকায় ধূমপানের জন্য গুড় দিয়ে মিষ্টি করা বিশেষ জাতের তামাকে তৈরি সিগারেটের কথা বলা হয়ে থাকা সম্ভব।

৪. **বিপ্লবী— নিহিলিস্ট :** 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়নস' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ১৮৮১ সালে হত্যা করে নিহিলিস্টরা। তার ফল হিসেবে কয়েকশো নিহিলিস্টকে মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন দেওয়া হয়।

খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মিসিং থ্রি-কোয়ার্টার]

বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় দুর্বোধ্য বিদঘুটে টেলিগ্রাম পাওয়ায় মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কিন্তু একটা কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। বছর সাত-আট আগে ফেব্রুয়ারির এক বিষণ্ণ সকালে টেলিগ্রামটা এসে পৌঁছোয় আমাদের হাতে। এবং তা পাওয়ার পর ঝাড়া পনেরো মিনিট রীতিমতো হকচকিয়ে বসে রইল মি. শার্লক হোমস। টেলিগ্রামটা এসেছিল তারই নামে :

'দয়া করে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন, ভয়ানক দুর্দৈব। "রাইট উইং[২] থ্রি-কোয়ার্টার" * নিরুদ্দেশ। আগামীকাল অপরিহার্য। —ওভারটন।'

'পোস্টমার্ক স্ট্র্যান্ডের, ছাড়া হয়েছে সাড়ে দশটায়', টেলিগ্রামটা বার বার পড়তে পড়তে বলল হোমস। 'পাঠাবার সময়ে মি. ওভারটন বাস্তবিকই বিলক্ষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই অসংলগ্ন তার-বার্তার। বেশ, বেশ, আমার তো মনে হয় "টাইমস" পড়া শেষ হওয়ার আগেই এসে পড়বেন ভদ্রলোক। তখনই না হয় জানা যাবে এ-ব্যাপারে আদ্যোপান্ত। এই আকালের দিনে হাত-পা গুটিয়ে জড় হয়ে থাকার চাইতে অতি তুচ্ছ সমস্যাকে স্বাগতম জানাব আমি।'

যেমনটি আশা করেছিলাম, টেলিগ্রাম আসার একটু পরেই পৌঁছে গেলেন তারপ্রেরক স্বয়ং। কার্ডে নাম দেখলাম, মি. সিরিল ওভারটন, ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজ। আর তারপরেই দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলেন নিরেট হাড় আর মাংসপেশি দিয়ে গড়া পাক্কা ষোলো টন ওজনের এক অতিকায় যুবাপুরুষ। দুই বিশাল কাঁধ মেলে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে আমাদের দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। সুশ্রী সুন্দর মুখে দেখলাম উদ্‌বেগজনিত বিভ্রান্তি আর বিহ্বল শীর্ণতা।

'মি. শার্লক হোমস?'

মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল আমার বন্ধু।

'আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গেছিলাম, মি. হোমস। ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনসের সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি আমায় পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে। তাঁর মতে কেসটা সরকারি পুলিশবাহিনীর আওতায় যতটা না পড়ুক, তার চেয়ে বেশি পড়ে আপনার এক্তিয়ারে।'

'দয়া করে বসুন, তারপর বলুন কী ব্যাপারে আপনার আগমন।'

'ব্যাপার অতি ভয়ংকর, মি. হোমস, এক কথায় বলতে গেলে অতি ভয়ংকর! আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভাবনার চোটে আমার চুলগুলো এখনও সাদা হয়ে যায়নি কেন! গডফ্রে স্টনটন— নিশ্চয় তার নাম শুনেছেন আপনি? আমাদের টিমের মেরুদণ্ড সে— গোটা টিমটার খেলা নির্ভর করে তার উপর।

'ঘটনাটা এইভাবে ঘটে, মি. হোমস। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির রাগবি টিমের[৩] ক্যাপ্টেন আমি। আমার দলের সেরা খেলোয়াড় হল গডফ্রে স্টনটন। আগামীকাল অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের খেলা[৪]। গতকাল দলবল সমেত এসে উঠলাম বেন্টলির এক প্রাইভেট হোটেলে। দশটা নাগাদ এক চক্কর ঘুরে দেখে নিলাম প্রত্যেকেই যে যার কোটরে সেঁধিয়েছে কি না। আমার বিশ্বাস, একটা টিমকে চটপটে রাখতে হলে দরকার কড়া ট্রেনিং আর প্রচুর ঘুম। গডফ্রে শুতে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে দু-একটি কথা বললাম। ওকে একটু ফ্যাকাশে আর উদ্‌বিগ্ন মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার! ও বললে, সামান্য একটু মাথা রয়েছে। তা ছাড়া দিব্যি সুস্থ ওর শরীর। গুডনাইট জানিয়ে আধঘণ্টাটাক বাদে দারোয়ান এসে জানালেন একজন রুক্ষ চেহারার দাড়িওয়ালা লোক একটা চিরকুট নিয়ে আসে গডফ্রের জন্যে। তখনও শুতে যায়নি গডফ্রে। তাই চিরকুটটা নিয়ে যায় ওর ঘরে। গডফ্রে তা পড়ামাত্র এমনভাবে ধপাস করে চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে যেন মোক্ষম কোনো চোট পাওয়ায় নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে ওর। দারোয়ান তো দারুণ ঘাবড়ে যায় ওর রকম-সকম দেখে। আমাকে ডাকতে আসছিল, কিন্তু গডফ্রে বাধা দেয় ওকে। এক গ্লাস জল খেয়ে সামলে নেয় নিজেকে। তারপর নীচে যায় ও। লোকটা হল ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলার পর দুজনেই বেরিয়ে যায় বাইরে। শেষবারের মতো ওদের সম্বন্ধে দারোয়ান যা দেখে তা এই— যে-রাস্তাটা স্ট্র্যান্ডের দিকে গেছে, সেই রাস্তাটা ধরে প্রায় ছুটে চলেছিল ওরা দুজন। আজ সকালে দেখলাম গডফ্রের ঘর শূন্য। বিছানা পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। ওর জিনিসপত্র আগের রাতে যেমন দেখে গেছিলাম, ঠিক সেইরকমই আছে, এতটুকু নড়চড় হয়নি। দাড়িওয়ালা আগন্তুক আসার সঙ্গেসঙ্গে এক মুহূর্তের নোটিশেই উধাও হয়েছে সে— এবং এখনও পর্যন্ত ওর তরফ থেকে একটা শব্দও এসে পৌঁছোয়নি আমার কাছে। ও যে আর ফিরে আসবে, তা আমার মনে হয় না। গডফ্রে স্টনটন মনে প্রাণে স্পোর্টসম্যান। কাজেই খুব জবরদস্ত কারণ না-থাকলে ট্রেনিং ফাঁকি দেওয়া, ক্যাপ্টেনকে না হোক ভোগান্তিতে ফেলার পাত্র সে নয়। না, না, বেশ বুঝেছি, এই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া। আর কোনোদিনই তাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না।'

চোখে-মুখে নিবিড়তম তন্ময়তা নিয়ে এই আশ্চর্য কাহিনি শুনল শার্লক হোমস।

তারপর শুধোলে, 'এরপর আপনি কী করলেন?'

'কেম্ব্রিজে টেলিগ্রাম পাঠালাম যদি খবর পাওয়া যায় এই আশায়। উত্তর পেয়েছি। কেউ তাকে দেখেনি।'

'কেম্ব্রিজে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব ছিল তার পক্ষে?'

'ছিল। রাত সওয়া এগারোটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে।'

'কিন্তু আপনি খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছেন, নিশ্চয় সে ট্রেনে রওনা হয়নি?'

'না, কেউ তাকে দেখেনি।'

'তারপর কী করলেন?'

'লর্ড মাউন্ট-জেমসকে টেলিগ্রাম করলাম।'

'লর্ড মাউন্ট-জেমসকে কেন?'

'গডফ্রে মা-বাপ মরা ছেলে। লর্ড মাউন্ট-জেমস তার নিকটতম আত্মীয়— খুব সম্ভব কাকা।'

'সত্যি? তাহলে তো এ-ব্যাপারে নতুন আলোর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। ইংলন্ডের সেরা ধনীদের অন্যতম লর্ড মাউন্ট-জেমস।'

'গডফ্রেকেও তাই বলতে শুনেছি।'

'আপনার বন্ধু তাঁর নিকট আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, তাঁর উত্তরাধিকারী। বুড়োর বয়স প্রায় আশি— গেঁটে বাতের হদ্দ রুগি। শোনা যায়, উনি নাকি আঙুলের গাঁট দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার ছড়ি "কিউ"য়ের ডগা ঘষলেই খড়ি লাগানোর কাজ হয়ে যায়। সারাজীবনে একটা শিলিং দেননি গডফ্রেকে— এমনই হাড়কিপটে। অথচ বুড়ো চোখ বুজলে কানাকড়িটিরও মালিক হয়ে বসবে গডফ্রে।'

'লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না।'

'লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছে আপনার বন্ধু কী মোটিভ নিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার?'

'আগের রাতে জানি না কী-এক দুশ্চিন্তায় ছটফট করছিল ও। এ-দুশ্চিন্তা যদি অর্থ সম্পর্কিত হয়, তাহলে নিকটতম আত্মীয়ের কাছেই এ-সমস্যা নিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব— বিশেষ করে তার যখন অর্থের অভাব নেই। কিন্তু বুড়ো সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, খুড়োর একটা পেনিও খসিয়ে আনতে পারবে না গডফ্রে। তা ছাড়া বুড়োকে একদম দেখতে পারত না ও। উনি সাহায্য করতে চাইলেও যেত না বলেই মনে হয় আমার।'

'বেশ, বেশ, সে সমস্যার মীমাংসা শিগ্‌গিরই করে ফেলব'খন। খুড়োমশাই লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছে যাওয়ারই মতলব যদি আপনার বন্ধুবরের থেকে থাকে তাহলে তো আর একটা জিনিসের ব্যাখ্যা শোনাতে হয় আপনাকে। অত রাতে ওই রুক্ষ লোকটাই-বা এল কেন এবং তার আসার ফলে আপনার বন্ধুটিই-বা এত উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন?'

দুই হাত মাথা চেপে ধরে সিরিল ওভারটন বললেন, 'আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

হোমস বললে, 'বেশ, বেশ, কাজকর্মের ঝামেলা আজ আর কিছু নেই, কাজেই আপনার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে বিলক্ষণ সুখী হব আমি। একটা কথা বিশেষ করে বলে রাখি। এই তরুণ ভদ্রলোকটির জন্যে আর অপেক্ষা না-করে ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আপনি যা বললেন, নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কোনো দরকারে এইভাবে তাঁকে উধাও হতে হয়েছে এবং এই দরকারটুকুর জন্যেই এখনও তার আটক থাকা সম্ভব। চলুন, সবাই মিলে একবার হোটেলটা দেখে আসি। এ-ব্যাপারে দারোয়ানটা হয়তো নতুন কিছুর হদিশ দিতে পারে।'

দীনহীন নগণ্য সাক্ষীদের ভয় ভাঙিয়ে তাদের সহজ করে তোলার আর্টে মহাওস্তাদ শার্লক হোমস। দেখতে দেখতে গডফ্রে স্টনটনের পরিত্যক্ত ঘরের গোপন পরিবেশে দারোয়ানের পেট

থেকে সব কথাই সে নিপুণ কায়দায় বার করে নিলে একে একে। গতরাতে যে-লোকটি দেখা করতে এসেছিল গডফ্রে স্টনটনের সাথে, সে তো ভদ্রলোক ছিলই না, শ্রমিকশ্রেণির লোকও নয়। দারোয়ানের ভাষায় সে একজন নিছক 'মাঝামাঝি' লোক। বছর পঞ্চাশ বয়স। কাঁচাপাকা চুল মেশানো ধূসর দাড়ি। সাদাসিদে পোশাক। খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল লোকটাকে। চিরকুটটা বাড়িয়ে ধরার সময় থর থর করে লোকটার হাতটা কাঁপতে দেখেছিল দারোয়ান। হল ঘরে নেমে এসে স্টনটন লোকটার সঙ্গে করমর্দন করেনি। শুধু কয়েকটি কথার আদানপ্রদান হয় ওঁদের মধ্যে। তার মধ্যে একটি শব্দ ধরতে পেরেছিল দারোয়ান। তা হল 'সময়'। তার পরেই হন্তদন্ত হয়ে কীভাবে উধাও হন তাঁরা, তা তো আগেই বলা হয়েছে। হল ঘরের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বেজেছিল।

স্টনটনের বিছানায় বসে হোমস বললে, 'আচ্ছা, তুমি তো দিনের বেলায় ডিউটি দাও, তাই না?'

'ইয়েস স্যার। এগারোটায় শেষ হয় আমার ডিউটি।'

'রাতের দারোয়ান কিছু দেখেনি, কেমন?'

'না, স্যার। অনেক রাতে একটা থিয়েটার-পার্টি এসেছিল। আর কেউ না।'

'কালকে সারাদিনই তুমি ডিউটিতে ছিলে?'

'ইয়েস স্যার!'

'মি. স্টনটনের কাছে কোনো খবর নিয়ে যেতে হয়েছিল তোমায়?'

'ইয়েস স্যার। একটা টেলিগ্রাম।'

'আ! ইন্টারেস্টিং! তখন ক-টা বেজেছিল?'

'প্রায় ছ-টা।'

'টেলিগ্রামটা নেওয়ার সময় কোথায় ছিলেন মি. স্টনটন?'

'এইখানে, তাঁর ঘরে।'

'উনি যখন টেলিগ্রামটা খোলেন, তখন ছিলে এখানে?'

'ইয়েস স্যার। যদি কোনো উত্তর নিয়ে যাওয়ার দরকার থাকে তাই অপেক্ষা করছিলাম।'

'বেশ, বেশ, উত্তর কিছু—?'

'ইয়েস স্যার। উনি তা তখুনি লিখে ফেলেন।'

'তুমি নিয়ে গিয়েছিলে।'

'না, উনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু তোমার সামনেই লিখেছিলেন বললে না?'

'ইয়েস, স্যার। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর উনি বসে ছিলেন ওই গাঁটরিটার দিকে পেছন করে। ওনার লেখা হলে বললেন, ঠিক আছে, দারোয়ান, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

'কী দিয়ে লিখেছিলেন?'

'কলম দিয়ে, স্যার।'

'টেবিলের ওপর ওই যে টেলিগ্রামের ফর্মগুলো রয়েছে, সেটাও কি ওদের মধ্যেই ছিল?'

'ইয়েস, স্যার। সবার ওপরে ছিল।'

উঠে দাঁড়াল হোমস। ফর্মগুলো নিয়ে গেল জানলার সামনে। তারপর খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে লাগল একদম ওপরের ফর্মটা।

'কপাল খারাপ তাই ফর্মটা পেনসিলে লেখেননি মি. স্টনটন,' নিরাশ হয়ে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফর্মগুলো টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল হোমস। 'নিশ্চয় লক্ষ করেছ ওয়াটসন, পেনসিলে লিখলে কাগজ ফুঁড়ে ছাপাটা গিয়ে পড়ে পরের পাতায়। যার ফলে বহুবার বহু সুখময় বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নিতান্ত দুঃখজনকভাবে। সে যাই হোক, এখানে তো চিহ্ন-টিহ্নর বালাই দেখছি না। তবুও আনন্দ হচ্ছে কেন জান? ভদ্রলোক চওড়া-মুখ পালকের কলম দিয়ে লিখেছিলেন ফর্মটা। সুতরাং ব্লটিং প্যাডের ওপর কোনো ছাপ পাব না, এ-রকম সন্দেহ যে আমি করতেই পারছি না। আ, হ্যাঁ, এই যে, যা খুঁজছি তাই!'

ব্লটিং পেপারের একটা ফালি ছিঁড়ে নিলে হোমস। তারপর তা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরতেই চোখ পড়ল নীচের বিদঘুটে চিত্র-অক্ষরগুলো :

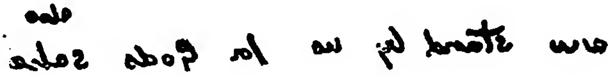

দারুণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সিরিল ওভারটন, 'আয়নার সামনে ধরুন ফালিটা।'

হোমস বললে, 'তার দরকার হবে না। কাগজটা খুবই পাতলা । কাজেই উলটো দিকেই পাওয়া যাবে টেলিগ্রামে পাঠানোর খবরটা। এই দেখুন।' কাগজটা উলটে ধরতেই আমরা পড়লাম :

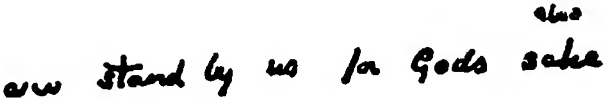

[ভগবানের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান]

উধাও হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গডফ্রে স্টনটন যে-তারবার্তা পাঠিয়েছে, এইটাই তাহলে সে-খবরের শেষের অংশটা। গোটা খবরটার অন্ততপক্ষে গোটা ছয়েক শব্দ রয়ে গেল আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ— 'ভগবানের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান!'— তা থেকে অন্তত একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। তা হচ্ছে এই— একটা আসন্ন ভয়াবহ বিপদের করাল ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন, এই তরুণ খেলোয়াড়টি। এ-বিপদ থেকে একজন তাঁকে বাঁচাতে পারতেন। 'আমাদের', লক্ষ করেছ তো! আর একজন জড়িয়ে পড়েছে এ-ব্যাপারে। যাকে কিনা অমন দারুণ নার্ভাস অবস্থায় দেখা গেছে, সেই ফ্যাকাশে-মুখ, দাড়িওয়ালা লোকটিই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে বলে মনে হয় কি! তাই যদি হয়, গডফ্রে স্টনটনের সঙ্গে দাড়িওয়ালার কী সম্পর্ক শুনি? এবং সেই তৃতীয় মানুষটিই-বা কে যার কাছ থেকে কিনা দুজনের প্রত্যেকেই এগিয়ে আসা বিপদের খপ্পর থেকে রেহাই পাবার জন্যে সাহায্যের প্রত্যাশা করেছেন? আমাদের তদন্ত কিন্তু ইতিমধ্যেই সীমিত হয়ে এসেছে এইটুকু পরিধির মধ্যে।'

'টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল কার কাছে আমাদের এখন শুধু সেই খবরটা জানা দরকার।' মত প্রকাশ করি আমি।

'এগজ্যাক্টলি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। তোমার চিন্তাশক্তির মধ্যে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর থাকলেও আগেই তা আমার মাথায় খেলে গেছে। কিন্তু একটা কথা না-বলে পারছি না। যেকোনো পোস্ট অফিসে হনহন করে সটান ঢুকে গিয়ে তুমি যদি অন্য কারো পাঠানো তারবার্তার প্রতিলিপি দেখতে চাও, তাহলে হয়তো কর্মচারীরা বিলক্ষণ গররাজি হতে পারে তোমাকে অনুগৃহীত করার ব্যাপারে। আশা করি, এ-পয়েন্টটা তুমিও ভেবে দেখেছ। এসব ব্যাপারে লাল ফিতের দাপট এত বেশি যে কহতব্য নয়। যাই হোক, সামান্য একটু সূক্ষ্মবুদ্ধি ঘষামাজা কথাবার্তা দিয়েই কাজ হাসিল করা যাবে বলে মনে হয়। মি. ওভারটন, ইতিমধ্যে আপনার সামনেই আমি টেবিলের ওপর ফেলে যাওয়া এই কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।'

অনেকগুলো চিঠি, বিল আর নোটবই পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। চটপট কিন্তু কাঁপা-কাঁপা আঙুল দিয়ে সব কিছু উলটেপালটে চকিত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিল হোমস। তারপর বললে, 'কিছুই নেই এখানে। ভালো কথা, আপনার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয় খুবই ভালো ছিল— মানে কোনোরকম গণ্ডগোল ছিল না দেহযন্ত্রে— তাই তো?'

'লোহার মতো মজবুত আর সুস্থ ওর শরীর।'

'কোনোদিন উনি অসুস্থ হয়েছেন বলে জানেন আপনি?'

'একদিনের জন্যেও নয়। বুটের ডগা দিয়ে শট করার ফলে একবার বিছানা নিতে হয়েছিল। আর একবার মালাইচাকি সরে গিয়েছিল। ব্যস, আর কিছু না।'

'আপনি যতটা মনে করেন, হয়তো ততটা মজবুত উনি ছিলেন না। আমার মনে হয় কোনো গোপন অসুখ তাঁর থাকলেও থাকতে পারে। তাই আপনার সম্মতি নিয়ে দু-একটা কাগজ পকেটস্থ করছি। বলা যায় না, ভবিষ্যৎ তদন্তে কাজে লেগে যেতে পারে।'

ঠিক এই সময়ে খিটখিটে গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুর! সবুর!' তাকিয়ে দেখি আজব চেহারার একজন খর্বকায় বুড়ো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত বেঁকিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি জুড়েছেন। লোকটার পরনে কুচকুচে কালো পরিচ্ছদ। চিমটি কাটলে ধুলো উঠে আসে এমন ময়লা। মাথায় বেজায় চওড়া কিনারাওলা সিল্কের লম্বা টুপি। গলায় ঢিলেঢালা সাদা নেকটাই। সব মিলিয়ে মিশিয়ে বাহার যা খুলেছে যে দেখলে পরে মনে হয় নিশ্চয় কোনো অভব্য অমার্জিত গাঁইয়া। অথবা সমাধির ব্যবস্থা যারা করে তাদের ভাড়া করা কান্নাওয়ালা। কিন্তু এ-রকম নোংরা বিদঘুটে চেহারার লোকটার স্বরে এমন একটা আতীক্ষ্ণ টংকার ছিল, হাবভাবের এমন একটা চকিত তীব্রতা ছিল যে তা জোর করে মানুষের মনোযোগ আদায় করে তবে ছাড়ে।

'আরে, মশাই, আপনি কে শুনি? আর কীসের অধিকারেই-বা এই ভদ্রলোকের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন?' শুধোলেন বৃদ্ধ।

'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এই ভদ্রলোকের অদৃশ্য হওয়ার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বার করছি মাত্র।'

'ওহো, তাই নাকি? কার নির্দেশে চেষ্টা করছেন শুনি?'

'এই ভদ্রলোকের নির্দেশে। ইনি স্টনটনের বন্ধু। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এঁকে সুপারিশ করেছিলেন আমার সাহায্য নেবার জন্যে।'

'আপনি কে, মশাই?'

'আমি সিরিল ওভারটন।'

'তাহলে আপনিই আমায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। আমার নাম লর্ড মাউন্ট-জেমস। খবর পেয়েই চটপট চলে এসেছি। বেইজওয়াটারের বাসে[৫] আসতে যতটা সময় লাগে, ঠিক ততটুকু সময় গেছে আমার এসে পৌঁছোতে। আপনিই তাহলে ডিটেকটিভ নিয়োগ করেছেন?'

'খরচ বহন করতে আপনি প্রস্তুত তো?'

'আমার বন্ধু গডফ্রেকে খুঁজে বার করার পর সে-ই সে-খরচটা দিয়ে দেবে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই, স্যার।'

'কিন্তু যদি কস্মিনকালেও খুঁজে না পাওয়া যায়, অ্যাঁ? উত্তর দিন এ-প্রশ্নের?'

'সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তার পরিবারই—'

'ওসব কিস্সু হবে না মশাই, কিস্সু হবে না!" গলা চিরে চিলের মতো চিৎকার করে ওঠেন খর্বকায় বৃদ্ধ। 'একটা কানাকড়িও আমার কাছে পাবেন না— ভুলেও সে-প্রত্যাশা করবেন না আপনি— একটা কানাকড়ির জন্যেও নয়! বুঝেছেন তো, মি. ডিটেকটিভ! ওই ছোকরার আত্মীয়স্বজন বলতে শুধু আছি আমি। এবং পরিষ্কার বলে রাখছি এজন্যে আমি কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না। আমি কখনো পয়সার অপব্যয় করি না[৬]। সেইজন্যেই হয়তো তার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকতে পারে। কিন্তু এখন আর নতুন করে অপব্যয় শুরু করার অভিপ্রায় আমার নেই। আর ওই যে কাগজগুলো নিয়ে স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করছেন, ওর মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থাকে তো বলে রাখছি আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে সেসবের জন্যে।'

শার্লক হোমস বললে, 'ভেরি গুড, স্যার। ইতিমধ্যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? এই তরুণটির অন্তর্ধান সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোনো থিয়োরি আছে কি?'

'না মশাই, নেই। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া হয়েছে সে এবং নিজের ভালোমন্দ বোঝবার মতো বয়েসও হয়েছে। এখন যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো মহামূর্খ হয়ে থাকে সে, তো আমি তাকে গোরুখোঁজা করার কোনোরকম দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই।'

'আপনার অবস্থাটা বেশ বুঝছি আমি,' বলে হোমস। দুষ্টু বুদ্ধি মিটমিট করে ওঠে ওর দুই চোখে। 'আপনিও হয়তো আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। গডফ্রে স্টনটনকে গরিব মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কাজেই তাঁকে যদি গুম করাই হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয় তার নিজস্ব সম্পত্তির জন্যে করা হয়নি। আপনার ধন-বিভবের সুখ্যাতি সাগরপারেও পৌঁছেছে, লর্ড মাউন্ট-জেমস এবং সেইজন্যেই হয়তো আপনার ভাইপোকে একদল চোর-ডাকাত নিজেদের খপ্পরে এনে ফেলেছে আপনার বাড়ি, আপনার রোজকার অভ্যাস আর আপনার দৌলতের খবরাখবর আদায় করার জন্যে। আমার বিশ্বাস, এমনটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

দেখতে দেখতে নেকটাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল খর্বকায় বুড়োর ত্রাসকম্পিত মুখখানা।

'হায় ভগবান, এ কী ধারণা! এ-রকম শয়তানির কথা যে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি আমি! দুনিয়ায় এ-রকম অমানুষিক বদমাশের দলও আছে! কিন্তু গডফ্রে ছেলেটি খাসা— ভারি দুঁদে আর শক্ত ছেলে। কাকাকে পথে বসানোর মতো কাজ শত প্রলোভন দেখালেও তাকে দিয়ে করানো

যাবে না। আজই সন্ধ্যায় মালকড়ি ব্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে আপনি চেষ্টার কসুর করবেন না, মি. ডিটেকটিভ! আমার অনুরোধ, ছেলেটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছুই করতে বাকি রাখবেন না আপনি। আর টাকা? বেশ, পাঁচ পাউন্ড, এমনকী দশ পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত রইলাম আমি।'

বেকায়দায় পড়ে বেশ দমে গেছিলেন বুড়ো লর্ড মাউন্ট-জেমস। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিজাত কৃপণের কাছ থেকে আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো তথ্যই বার করা গেল না। ভাইপোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবরাখবর রাখতেন না উনি। দ্বিখণ্ডিত টেলিগ্রামের সূত্র ছাড়া যখন আর কিছুই এল না হাতে, তখন কাগজটার এক কপি নিয়ে হোমস রওনা হল যুক্তি-শৃঙ্খলের দ্বিতীয় গ্রন্থিটির প্রত্যাশায়। লর্ড মাউন্ট-জেমসকে বিদায় দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমরা। সিরিল ওভারটন গেছিলেন টিমের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই আকস্মিক দুর্দৈব সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে। হোটেল থেকে একটু এগিয়েই একটা টেলিগ্রাফ অফিস দেখতে পেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল হোমস।

বলল, 'কপাল ঠুকে দেখা যাক, সফল হলেও হতে পারি। অবশ্য সময় থাকলে অনায়াসেই কাউন্টারফয়েলগুলো দেখে নিতে পারতাম— কিন্তু সে-পর্যায়ে এখনও আমরা পৌঁছোইনি। এ-রকম ব্যস্তসমস্ত জায়গায় মুখ চিনে রেখে দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তো মনে হয়। সাহসে বুক বেঁধে দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।'

রেলিংয়ের ওদিকে বসে থাকা তরুণীটিকে মধুক্ষরিত কণ্ঠে শুধোল হোমস, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল যে-টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম তাতে কয়েকটা ছোট্ট ভুল রয়ে গেছে। এখনও কোনো উত্তর না-পাওয়ায় আমার মনে হচ্ছে তলায় হয়তো আমার নামটাই লিখতে ভুলে গেছি। সত্যিই তাই কিনা বলতে পারেন আমায়?'

এক তাড়া কাউন্টারফয়েলের ওপর ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি।

'ক-টায়?' শুধোয় সে!

'ছ-টার একটু পরেই।'

'কার নামে?'

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চকিতে আমার পানে তাকালে হোমস। তারপর, যেন বেজায় গোপনীয় কথা, এমনি সুরে ফিসফিস করে ওঠে, 'শেষ পঙ্ক্তিতে লেখা ছিল "ভগবানের দোহাই"। উত্তর না-পাওয়ায় বড়ো উদ্‌বিগ্ন রয়েছি।'

একটা ফর্ম আলাদা করে ফেললে মেয়েটি।

'এইটা। নাম নেই।' বলে ফর্মটা কাউন্টারের ওপর পরিষ্কার করে বিছিয়ে ধরে।

হোমস বলে উঠল, 'তাহলেই দেখুন, এইজন্যেই কোনো উত্তর পাইনি এখনও পর্যন্ত। কী বিপদ! বাস্তবিকই কী নিরেট বোকা আমি। গুডমর্নিং মিস। মন থেকে খামোখা চিন্তার বোঝা নামিয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ!' রাস্তায় বেরিয়ে এসে দু-হাত ঘষতে ঘষতে নিঃশব্দে একচোট হেসে নিলে হোমস।

'হল?' শুধোলাম আমি।

'এগিয়ে চলেছি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, দিব্যি এগিয়ে চলেছি আমরা। টেলিগ্রামখানায় এক ঝলক চোখ বোলাবার জন্যে মোটমাট সাতটা বিভিন্ন পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিলাম। কিন্তু একেবারে প্রথমটাতেই যে এইভাবে কেল্লা ফতে করে দেব, তা আশাই করতে পারিনি।'

'লাভটা কী হল শুনি?'

'তদন্ত শুরু করার পয়লা নম্বর পয়েন্ট।' একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডাকল ও। দুজনে চড়ে বসার পর বললে, 'কিংস ক্রস স্টেশন।'

'রেলপথে ভ্রমণ আছে মনে হচ্ছে?'

'আমার মনে হয়, এখুনি দুজনের কেম্ব্রিজে যাওয়া দরকার। সবকটা পয়েন্ট থেকেই ওই একটি দিকেরই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।'

সুপ্রাচীন ইউনিভার্সিটি শহরে যখন পৌঁছোলাম, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আশেপাশে। স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিলে হোমস। গাড়োয়ানকে হুকুম করল ড. লেসলি আর্মস্ট্রংয়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে। মিনিট কয়েক পরেই শহরের জমজমাট অঞ্চলে রাস্তার ওপরেই একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। পথ দেখিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল বাটলার এবং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রবেশ করলাম কনসালটিং রুমে। টেবিলের সামনে বসে ছিলেন ড. আর্মস্ট্রং।

'আপনার নাম আমি শুনেছি, মি. শার্লক হোমস। আপনার বৃত্তিও আমার অজানা নয়। যেসব বৃত্তিকে আমি কোনোমতেই বরদাস্ত করি না, আপনারটিও পড়ে তাদের মধ্যে।'

'একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, ডক্টর, এদেশের প্রতিটি ক্রিমিনালের সঙ্গে এই বিষয়ে আপনি একমত,' শান্ত স্বরে বললে বন্ধুবর।

'আরে মশায়, আপনার বুদ্ধি শক্তি-প্রচেষ্টা যতক্ষণ কেবল অপরাধ নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের যেকোনো ব্যক্তিই তা সমর্থন করবে, প্রতিটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অনুমোদন জানাবে আপনার উদ্‌যোগ আয়োজনের। যদিও আমার বিশ্বাস এজন্যে সরকারি পুলিশবাহিনীই যথেষ্ট এবং এ-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই আমার মনে। কিন্তু যখনই আপনি কিনা ব্যক্তিবিশেষের গোপন কন্দরে চুপিসারে নাক গলান, যেসব পারিবারিক তত্ত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেই মঙ্গল, সেগুলিকে খুঁচিয়ে তোলেন এবং আপনার চাইতে বেশি ব্যস্তবাগীশ যেসব পুরুষ, প্রসঙ্গক্রমে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আসেন, তখনই জানবেন আপনার আবির্ভাবকে উটকো উৎপাত হিসেবেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে আলাপ করার চাইতে একটা গ্রন্থ রচনা করাই শ্রেয় মনে করি আমি।'

'নিঃসন্দেহে, ডক্টর। কিন্তু তবুও কি জানেন, গ্রন্থ রচনার থেকে এই আলাপটাই হয়তো দেখবেন বেশি প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখি। আপনি যে-অভিযোগে এইমাত্র অভিযুক্ত করলেন আমাদের, আমরা কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাই করছি। যেমন ধরুন না কেন, ব্যক্তিগত বিষয় সর্বজনসমক্ষে যাতে প্রকাশ না-পায়, সেই চেষ্টাই করতে এসেছি আমরা— যা হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না, যদি এ-কেস সরকারি পুলিশের হাতে যেত। কেননা

তাদের হাতে পৌঁছোনোর পরিণতিই হল সব কিছুই পাবলিকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়া। আপনি আমায় একজন নিছক অনিয়ত পথ পরিষ্কারক সৈনিক হিসাবেই দেখতে পারেন। এদেশের বৈধ পুলিশ ফোর্সের আগেভাগেই চলে আমার অভিযান। আমি এসেছি মি. গডফ্রে স্টনটন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।'

'কী হয়েছে তার?'

'আপনি তো তাঁকে চেনেন, তাই না?'

'সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আপনি জানেন উনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন?'

'আ, সত্যি!' ডক্টরের সুকঠোর মুখের অমসৃণ রেখার বিন্দুমাত্র ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না।

'কাল রাতে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান উনি। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর।'

'ফিরে আসবে নিশ্চয়।'

'আগামীকাল ভার্সিটি ফুটবল ম্যাচ।'

'এসব ছেলেমানুষি খেলাধুলা সম্বন্ধে এতটুকু সমবেদনা নেই আমার। তরুণ গডফ্রের এহেন দূরদৃষ্টি শুনে খুবই আগ্রহ জাগছে সন্দেহ নেই, কেননা ওকে শুধু আমি চিনিই না, পছন্দও করি। কিন্তু ফুটবল ম্যাচ কোনোমতেই আমার এক্তিয়ারে আসে না।'

'তাই যদি হয় তো মি. স্টনটনের এহেন অন্তর্ধানের তদন্তকার্যে আপনার সমবেদনা আমি দাবি করছি। উনি কোথায়, তা আপনি জানেন?'

'নিশ্চয় না।'

'গতকাল থেকে ওঁকে আপনি দেখেননি?'

'না, দেখিনি।'

'মি. স্টনটন কি স্বাস্থ্যবান পুরুষ?'

'নিরেট স্বাস্থ্য তার।'

'ওঁকে কোনোদিন অসুস্থ হতে দেখেছেন আপনি?'

'না।'

ফট করে ডক্টরের চোখের সামনে এক তাড়া কাগজ মেলে ধরলে হোমস।

'তাহলে তেরো গিনির এই রসিদটার একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে আপনার কাছে। গত মাসে মি. গডফ্রে স্টনটন এ-টাকাটা দিয়েছেন কেম্ব্রিজের ড. লেসলি আর্মস্ট্রিংকে। ওঁর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে থেকে এ-রসিদটা তুলে এনেছি আমি।'

রাগে লাল হয়ে ওঠে ডক্টরের মুখ।

'মি. হোমস, আপনার কাছে এ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা শোনাবার কারণ আছে বলে মনে হয় না আমার।'

রসিদটা আবার নোটবইয়ের মাঝে রেখে দিলে হোমস।

বলল, 'এ-সম্বন্ধে জনসাধারণের সামনে আপনার ব্যাখ্যা হাজির করা যদি ভালো মনে করেন তা, দু-দিন আগে হোক আর পরে হোক, তাই হবে'খন। আগেই বলেছি আপনাকে, যে-খবর

অন্য কেউ দৈনিক কাগজে ছেপে দিতে বাধ্য, আমি তা ধামাচাপা দিয়ে দিতে পারি অক্লেশে। এক্ষেত্রে, আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সব কথা খুলে বললেই সত্যি সত্যি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।'

'এ-সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।'

'লন্ডন থেকে মি. স্টনটন আপনাকে কোনো খবর পাঠিয়েছিলেন কি?'

'নিশ্চয় না।'

'কী মুশকিল! কী মুশকিল!— আবার পোস্ট অফিস!' অবসন্নভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হোমস। 'গতকাল সন্ধ্যা ছ-টা বেজে পনেরো মিনিটে লন্ডন থেকে মি. গডফ্রে স্টনটন একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আপনাকে। তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে এ-টেলিগ্রামের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক যে আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। আর, তবুও কিনা এখনও পর্যন্ত সে-টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোয়নি আপনার হাতে? ছিঃ ছিঃ, অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধজনক গাফিলতি। আমি এখুনি স্থানীয় অফিসে গিয়ে একটা অভিযোগ লিখিয়ে রাখছি।'

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো তড়াক করে টেবিলের সামনে লাফিয়ে উঠলেন, ড. লেসলি আর্মস্ট্রং। নিদারুণ ক্রোধে উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর মলিন মুখ।

বললেন, 'আপনাকে মশাই, একটু কষ্ট দেব। লম্বা লম্বা পা ফেলে চটপট বাড়ির বাইরে সরে পড়ুন। আপনার নিয়োগকর্তা লর্ড মাউন্ট-জেমসকে বলে দেবেন তাঁর সাথে বা তাঁর এজেন্টের সাথে কোনোরকম বাক্যালাপ করার বাসনা আমার নেই। না, না, মশায়, আর একটা কথাও নয়।' খেপে গিয়ে ঢং ঢং করে দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন ডক্টর। 'জন, এই ভদ্রলোকদের বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও।' জমকালো চেহারার বাটলার এসে নির্দয়ভাবে দরজা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের এবং তার পরেই এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়।

অট্টহাস্য করে উঠল হোমস।

বলল, 'ড. লেসলি আর্মস্ট্রং বাস্তবিকই জীবনীশক্তিতে ভরপুর কড়াধাতের মানুষ। স্বনামধন্য মরিয়ার্টির তিরোধানের পর তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করার পক্ষে ডক্টরের চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর আমি দেখিনি। অবশ্য ওই পথেই যদি ওঁর প্রতিভা পরিচালনা করতেন, তবেই পাওয়া যেত মরিয়ার্টির উপযুক্ত উত্তরসূরি। যাই হোক, বেচারি ওয়াটসন, আতিথেয়তাশূন্য নির্বান্ধব এই শহরে আমরা এখন আটকে পড়লাম। হাতের কেস পরিত্যাগ না-করে এ-শহর ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পারি না। আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির উলটোদিকে ওই ছোট্ট সরাইখানাটা আমাদের চাহিদা মেটানোর পক্ষে আশ্চর্যরকমের উপযুক্ত। সামনের দিকের একটা ঘর দখল করে রাত কাটানোর মতো দরকারি জিনিসপত্র সওদা করার ব্যবস্থা যদি করতে পারি তো সেই অবসরে টুকটাক কয়েকটা তদন্ত করার সময় পাই আমি।'

হোমস যা ভেবেছিল, তার চাইতেও যে বিলক্ষণ দীর্ঘ এই কয়েকটি টুকটাক তদন্ত, তা প্রমাণিত হল ন-টা পর্যন্ত সরাইখানায় তারা না ফিরে আসায়। ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল বেচারি। বিমর্ষ মুখ হতাশায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছিল। সর্বাঙ্গে ধুলোকাদার বিস্তর দাগ। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আর ক্লান্তিতে অবসন্ন। রাতের খাওয়া ঠান্ডা হিম হয়ে পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। জঠরানল শান্ত করে পাইপ ধরিয়ে বসার পর আবার ফিরে এল ওর অর্ধকৌতুকময় কিন্তু পুরোপুরি

দার্শনিক ভাবভঙ্গি। কাজ করবার সিধে পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরলেই আচার আচরণের মধ্যে ঠিক এমনই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলাই ওর স্বভাব। ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শুনে উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ঝকঝকে গ্যাসবাতির আলোয় দেখলাম, একজোড়া ধূসর রঙের ঘোড়ায় টানা একটা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে ডক্টরের দরজার সামনে।

হোমস বললে, 'তিন ঘণ্টা লাগল। যাত্রা শুরু হয়েছিল সাড়ে ছ-টায়। ফিরে এলেন এখন। তার মানে এই যে দশ থেকে বারো মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা বৃত্ত অঞ্চলের মধ্যেই যাতায়াত করলেন উনি। প্রতিদিন এমনি যাত্রা দিনে একবার তো বটেই, মাঝে মাঝে দু-বারও উনি করেন।'

'যে ডক্টর প্র্যাকটিস করেন, তাঁর পক্ষে তা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'কিন্তু আর্মস্ট্রং তো আর সত্যি সত্যি প্র্যাকটিসের ডক্টর নন। উনি কলেজের লেকচারার এবং কনসালট্যান্ট অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ। জেনারেল প্র্যাকটিস করাকে থোড়াই পরোয়া করেন উনি। কেননা, এতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, ফলে ক্ষতি হয় তাঁর লেখাপড়ার। সেক্ষেত্রে এত লম্বা লম্বা পাড়ি দেওয়া তাঁর পক্ষে রীতিমতো বিরক্তিজনক। তা সত্ত্বেও কেন তাঁর এত তৎপরতা! এবং রোজ রোজ কাকেই-বা দেখতে যান উনি?'

'ওঁর কোচোয়ান—'

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, তার কাছেই আমি প্রথম আগুয়ান হয়েছিলাম কি না, সে-বিষয়ে কি তোমার সংশয় আছে? বদখত স্বভাবচরিত্রের জন্যেই হোক বা মনিবের প্ররোচনাতেই হোক, আমি যাওয়ামাত্র লোকটা একটা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল আমার পেছনে। ভারি চোয়াড়ে লোক। কিন্তু আমার ছড়িটার চেহারা কারোরই পছন্দ হল না, কুকুরটারও নয়, এবং ওই নচ্ছার লোকটারও নয়। কাজে কাজেই, এ-প্রসঙ্গে যবনিকা পড়ল ওইখানেই। এ-ব্যাপারের পর কোচোয়ানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমনই আড়ষ্ট হয়ে উঠল যে আরও কিছু খোঁজখবর নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যা কিছু জেনেছি তা আমাদের এই সরাইখানার উঠোনে একজন বন্ধুভাবাপন্ন স্থানীয় লোকের কাছ থেকে। ডক্টরের রোজকার অভ্যাস-টভ্যাস সম্বন্ধে অনেক খবর তার মুখেই শুনলাম। প্রতিদিন ব্রুহাম হাঁকিয়ে যাবার খবর পেলাম তার কাছে। ঠিক এই সময়ে তার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্যেই গাড়িটা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।'

'অনুসরণ করলে না কেন?'

'চমৎকার, ওয়াটসন! আজকের সন্ধ্যায় দেখছি বুদ্ধির আভায় দিব্যি ঝলমল করছ তুমি! মতলবটা আমারও মাথায় এল। লক্ষ করেছ, হয়তো, সরাইখানার ঠিক পাশেই সাইকেলের একটা দোকান আছে। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে গিয়ে ঝটিতি একটা সাইকেল দখল করলাম সেখানে। তারপর ব্রুহাম গাড়িখানা চোখের আড়ালে পুরোপুরি যাওয়ার আগেই শুরু করলাম অনুসরণ-পর্ব। দ্রুতগতিতে চালিয়ে নাগাল পেলাম গাড়িখানার। তারপর বুদ্ধিমানের মতো শ-খানেক গজ কি ওইরকম দূর থেকে গাড়ির আলো দেখে আঠার মতো লেগে রইলাম পেছনে। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম শহরের বাইরে। গাঁয়ের রাস্তার ওপর দিব্যি চলেছে ডক্টরের গাড়ি, ঠিক এই সময়ে একটা নিতান্ত অপমানজনক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সামনের ব্রুহাম। বেরিয়ে এলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং। দ্রুত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ঠিক যেখানে আমি সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেঁতো হাসি হেসে ভারি চমৎকার অবজ্ঞা ছড়ানো ভঙ্গিমায় বললেন যে, রাস্তাটা যেহেতু

বেজায় সরু, সুতরাং তাঁর মনে হয় না আমার সাইকেলকে এগিয়ে যেতে দেওয়ার মতো জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হবে তাঁর গাড়ির পক্ষে। এমনভাবে কথাটা বললেন যে, তার চাইতে প্রশংসনীয় আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার মনে হল না। ততক্ষণাৎ গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। বড়োরাস্তা ধরে বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর সুবিধামতো একটা জায়গায় থেমে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইলাম গাড়িটার আসার প্রতীক্ষায়। কিন্তু তাঁর টিকিটিও যখন দেখতে পাওয়া গেল না, তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে বড়োরাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা যে কয়টি শাখা-পথ আছে, তাদেরই একটি ধরে উধাও হয়েছে ব্রুহাম গাড়ি। আবার বড়োরাস্তা ধরে ফিরে এলাম আমি কিন্তু গাড়ির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। কিন্তু এখন তো তুমিও দেখলে, আমি ফিরে আসার পরেই ফিরে এল গাড়িটা। প্রথম প্রথম, এসব লম্বা গাড়ির সঙ্গে গডফ্রে স্টনটনের অদৃশ্য হওয়ার যে কোনোরকম সম্পর্ক থাকতে পারে, তা ভাববার মতো বিশেষ কারণ আমার মাথায় আসেনি সত্যি। মোটামুটি তদন্ত করতে গেলে যা যা দরকার, শুধু তারই ভিত্তিতে ড. আর্মস্ট্রং সম্পর্কিত সব কিছুরই খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি যে কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কি না, সে-বিষয়ে বেশ প্রখর চোখ রেখেছেন উনি, তখন ঘটনাটা বিলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। এবং এ-রহস্য ভেদ না-করা পর্যন্ত আমি খুশি হব না কোনোমতেই।'

'কালকে অনুসরণ করতে পারি তাঁকে।'

'পারি কি? যা ভাবছ অত সোজা নয় হে। কেম্ব্রিজ জেলার মাঠপ্রান্তরের সঙ্গে মোটেই পরিচয় নেই তোমার, গা ঢাকা দেওয়ার এতটুকু অবকাশ দেয় না এ-অঞ্চল। হাতের তেলোর মতো মসৃণ, চ্যাটালো, পরিষ্কার শুধু জমির পর জমি। তা ছাড়া যে-মানুষটার অনুসরণ করেছিলাম; তিনি তো আর হাঁদারাম নন। আজ রাতেই আমায় তা আচ্ছা করে সমঝে দিয়েছেন উনি। আমি ওভারটনকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। লন্ডনে টাটকা যদি কিছু ঘটে, উনি যেন চটপট সে-খবর পাঠিয়ে দেন আমায়। ইতিমধ্যে আমরা শুধু একটি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি, তা হল ড. আর্মস্ট্রংয়ের গতিবিধির ওপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। পোস্ট অফিসের ভালোমানুষ মেয়েটির কৃপায় স্টনটনের পাঠানো জরুরি খবরের প্রতিলিপি দেখেই ড. লেসলি আর্মস্ট্রংয়ের নাম জেনেছিলাম। আমি শপথ করে বলতে রাজি আছি, গডফ্রে স্টনটন এখন কোথায় আছেন, তা ড. আর্মস্ট্রং জানেন। আর উনি যদি সে-খবর রাখেন, আর কায়দা করে আমরা যদি তা না জানতে পারি, তাহলে সে-দোষ আমাদেরই। বর্তমানে স্বীকার না-করে উপায় নেই যে এ-রহস্যের গোলমেলে অংশের চাবিকাঠিটি উনি নিয়ে বসে রয়েছেন। আর আমার স্বভাব তো তুমি জানই, ওয়াটসন এ-রকম অবস্থায় এ-খেলা ছেড়ে আমি সটকান দেওয়ার পক্ষপাতী নই।"

কিন্তু পরের দিনও রহস্যের মূল সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছোতে পারলাম না আমরা। প্রাতরাশের পর এসে পৌঁছোল একটা চিরকুট। মুচকি হেসে আমার দিকে কাগজটা সরিয়ে দিলে হোমস।

চিরকুটটায় লেখা ছিল :

মহাশয়,

একটা বিষয়ে আপনাদের নিশ্চিন্ত রাখতে চাই আমি। আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার চেষ্টা করে শুধু সময়ের অপব্যয় করছেন আপনি। গতরাতে নিশ্চয় আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে

আমার ব্রুহামের পেছনে একটা জানলা আছে। কাজেই, না হোক কুড়ি মাইল সাইকেল চালানোর পর যাত্রাশুরুর জায়গাতেই যদি খালি হাতে ফিরে আসা মনস্থ করে থাকেন তো আমায় অনুসরণ করতে পারেন। এই অবসরে আপনাকে জানিয়ে রাখি, গোয়েন্দাগিরি করে গুপ্তচরের মতো দিনরাত আমার ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেও স্টনটনকে কোনোমতেই সাহায্য করতে পারবেন না আপনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মি. স্টনটনের সবচেয়ে বড়ো উপকার করতে পারেন যদি আপনারা লন্ডনে গিয়ে আপনার কর্মকর্তাকে রিপোর্ট পেশ করেন যে তাঁর ভাইপোর হদিশ বার করতে আপনারা অক্ষম। কেম্ব্রিজে থাকলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না আপনাদের।

—ভবদীয়

লেসলি আর্মস্ট্রং

'ভারি স্পষ্টবাদী আর সাচ্চা প্রতিপক্ষ এই ডক্টর ভদ্রলোক', বলে হোমস। 'বেশ, বেশ, আমার কৌতূহলকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন উনি। সুতরাং ওঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করার আগে সত্যিকারের আরও কিছু খবর আমায় জানতেই হবে।'

আমি বললাম, 'দরজায় গাড়ি পৌঁছে গেছে দেখছি। গাড়ির ভেতর উঠেছেন উনি। ওঠবার সময় লক্ষ করলাম আমাদের জানলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ডক্টর। সাইকেল নিয়ে আমি একবার কপাল ঠুকে দেখব নাকি?'

'না, না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। তোমার বুদ্ধিশক্তির সহজাত তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে যদিও আমার শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ফিকে হয়নি, তবুও ওই ধড়িবাজ ডক্টরটার তুমি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে বলে মনে হয় না আমার। তার চেয়ে বরং আমি গিয়ে আমার নিজস্ব পদ্ধতিমাফিক স্বনির্ভর কয়েকটা অভিযান চালিয়ে কিছু কিছু আবিষ্কার করে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করলেও করতে পারি। তাই তোমাকে রেখে যাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই, ভায়া। নিরালা নির্জন গাঁয়ের ধারে, যেখানে শহরের হট্টগোল নেই, সেখানে দু-দুজন সন্ধানী আগন্তুককে ঘুরঘুর করতে দেখলে কানঘুসোটা কী পরিমাণে প্রবল হয়ে উঠবে বুঝতেই পারছ। হাটেবাজারে এ নিয়ে আলোচনা হোক, তা আমি চাই না। অনেক কিছু দেখবার জিনিস আছে এ পবিত্র শহরে। তুমি না হয় তারই কিছু কিছু দেখে ফেল, নিঃসন্দেহে বিস্তর আনন্দ পাবে তাতে। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব। সঙ্গে আনব এমন রিপোর্ট যাতে আরও সরল হয়ে উঠবে আমাদের অনুসন্ধান পর্ব।'

কিন্তু আরও একবার নিরাশ হওয়া লেখা ছিল বন্ধুবরের ললাটে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল রাতের অন্ধকারে।

'সারাদিনটা বিলকুল বরবাদ গেল, ওয়াটসন। ডক্টর মোটামুটি যেদিকে গেলেন, সেই দিক বরাবর গিয়ে সারাদিন ধরে কেম্ব্রিজ শহরের ওইদিকের সবকটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখেছি। যেসব আড্ডাখানায় গাঁয়ের লোকেরা আসে, বসে পাঁচটা কথা বলে, এইরকম শুঁড়ির দোকানে গিয়ে এন্তার পয়েন্ট লিখেছি আর মিলিয়েছি। খবর সংগ্রহ করার আরও যে কয়েকটা আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে, কোথাও ঢুঁ মারতে বাকি রাখিনি। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে চক্কর দিতে হয়েছে আমায়। চেস্টারটন, হিসটন, ওয়াটারবীচ আর ওকিংটন— প্রত্যেকটিতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। এবং প্রতিবারই হতাশ হয়েছি। এ-রকম খোলামেলা ফাঁকা জায়গা শহরের মতো যানবাহন পথচারীর

ভিড় যেখানে মোটেই নেই, সেখানে অতবড়ো একটা ব্রুহাম আর গাড়িতে জোতা দু-দুটো ঘোড়া সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া তো উচিত নয়। আরও একবার টেক্কা মারলেন ডক্টর। আমার নামে টেলিগ্রাম আছে?'

'আছে। আমি খুলেছি। এই যে ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সনের কাছ থেকে পমপিকে চেয়ে নিন। মানে বুঝলাম না।'

'আরে এ তো জলের মতো পরিষ্কার। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুবর ওভারটনের টেলিগ্রাম এটা। এখুনি একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিচ্ছি' মি. জেরেমি ডিক্সনকে। তারপরেই যে আমাদের কপাল ফিরে যাবে সে-বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। ভালো কথা ম্যাচ সম্বন্ধে কোনো খবর আছে নাকি?'

'আছে। এখানকার সান্ধ্য দৈনিকের শেষ সংস্করণে বড়ো চমৎকার বিবরণ বেরিয়েছে ম্যাচটার। অক্সফোর্ড এক গোলে জিতেছে আর দু-বার প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের কাছে সবার আগে বল স্পর্শ করেছে। সবসুদ্ধ এক গোল দু-ট্রাইজে কেম্ব্রিজকে হারিয়েছে। বর্ণনার শেষ ক-টি লাইনে লেখা ছিল : 'লাইট ব্লু-দের হেরে যাওয়ার মূল কারণই হল তুখোড় ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় গডফ্রে স্টনটনের আকস্মিক অনুপস্থিতি। কেমব্রিজের বাস্তবিকই মন্দ ভাগ্য বলতে হবে, কেননা খেলার প্রতিটি মুহূর্তে পদে পদে উপলব্ধি করতে হয়েছে তার অভাব। থ্রি-কোয়ার্টার লাইনে সহযোগিতা না-থাকায় এবং আক্রমণ চালানো আর আক্রমণ ঠেকানো— এই দুয়ের মধ্যেই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় দুর্মদ পরিশ্রমী দলটার সমস্ত প্রচেষ্টাই শুধু ব্যর্থ হয়নি, সূচনা করেছে আরও অনেক বিপর্যয়ের।'

হোমস বললে, 'তাহলে বন্ধুবর ওভারটনের আশঙ্কাই সত্য হল। ব্যক্তিগতভাবে ড. আর্মস্ট্রংয়ের সাথে আমিও একমত। ফুটবল আমারও এক্তিয়ারে পড়ে না। আজ সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করা যাক, ওয়াটসন। কেননা, এখনই দেখতে পাচ্ছি কালকের দিনটায়, অনেকরকম ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে!'

পরের দিন সকালে হোমসের ওপর চোখ পড়তেই রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আগুনের ধারে ওর ছোটো হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে বসে ছিল ও। ওর প্রকৃতির একটিমাত্র দুর্বলতার সঙ্গে সিরিঞ্জটার যোগাযোগ ভাবতেই ভয় পেলাম। তারপর যখন ওর হাতের মধ্যে, ঝকমক করে উঠতে দেখলাম জিনিসটাকে, তখন যেন নিঃসীম বিভীষিকা দেখলাম দুই চোখে। আমার মুষড়ে পড়া ভাব দেখে অট্টহাস্য করে উঠল হোমস। তারপর সিরিঞ্জটা নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর।

'আরে না না মাই ডিয়ার, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এবারে এ-যন্ত্রের ব্যবহার অশুভ উদ্দেশ্যে নয়। বরং রহস্যমোচনের চাবিকাঠি হিসেবে এ-বস্তুটির প্রয়োজন যে কতখানি, শিগগিরিই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই সিরিঞ্জের ওপরই রয়েছে আমার যাবতীয় আশা ভরসা। এইমাত্র ছোটোখাটো একটা অভিযান শেষ করে ফিরছি আমি। অভিযানটা গুপ্তচরগিরির। হাওয়া অনুকূল। জবরদস্ত ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও, ওয়াটসন। কেননা, আজ ড. আর্মস্ট্রংকে অনুসরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করছি আমি এবং একবার যদি ওঁর পেছনে ধাওয়া শুরু হয় আমাদের, তাহলে

জেনে রেখো ভদ্রলোকের কোটর পর্যন্ত না-গিয়ে বিশ্রাম বা খাওয়ার জন্যে এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারব না।'

আমি বললাম, 'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা ব্রেকফাস্ট সঙ্গে নিয়ে যাই। কেননা, আজ সকালে রওনা হচ্ছেন উনি। দরজার সামনে ওঁর গাড়ি এসে গেছে।'

'ঘাবড়াও মাৎ! যেতে দাও ওঁকে। উনি যদি চালাক হন তো এমন জায়গায় গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে তাঁকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খাওয়া শেষ হলে নীচে নেমে এসো। একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। যে-কাজ এখন করতে চলেছি, সে-কাজে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।'

নীচে এসে হোমসের পেছনে পেছনে গেলাম আস্তাবলের ভেতরে। একটা আলগা বাক্সের দরজা খুলে ভেতর থেকে ও বার করে আনল একটা মোটাসোটা লটপটে-কান, সাদা আর খয়েরি মিশানো কুকুর। দেখতে বিগ্‌ল আর ফক্সহাউন্ডের মাঝামাঝি বলে মনে হয়।

হোমস বলল, 'এসো, পমপির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। এ-অঞ্চলে গন্ধ শুঁকে অনুসন্ধানপটু ওস্তাদ হাউন্ডের গর্ব এই পমপি। হাওয়ার বেগে দৌড়োতে পারে না বটে, গড়ন দেখলে তা মালুম হয়, কিন্তু একবার গন্ধের ওপর নাক রাখলেই হল। তারপর গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক জায়গায় হাজির হতে মোটেই বিলম্ব হয় না। এ-রকম দুঁদে ব্লাডহাউন্ড আর নেই বললেই হয়। ওহে পমপি, তুমি বেগবান না হলেও, লন্ডন শহরের মাঝবয়েসি একজোড়া ভদ্রলোকের পক্ষে যে তুমি যথেষ্ট বেগবান, এমনটি আশা করতেই পারি আমি। কাজে কাজেই, তোমার গলাবন্ধে চামড়ার এই ফিতেটি আটকে দেওয়ার স্বাধীনতাটুকু নিচ্ছি। এখন বাপু চলে এসো দিকি সুড় সুড় করে। দেখাও তোমার কেরামতি।' ডক্টরের দরজার সামনে পমপিকে নিয়ে গেল হোমস। মুহূর্তের জন্যে চারিদিকের গন্ধ শুঁকে নিলে পমপি। তারপরেই উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ শব্দে গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠে এগিয়ে চলল রাস্তা বরাবর। আরও তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে ঘন ঘন হ্যাঁচকা টান পড়তে লাগল চামড়ার ফিতেতে। আধঘন্টা যেতে-না-যেতে শহর ছাড়িয়ে বাইরে পড়ে দ্রুতগতিতে ধেয়ে চললাম গাঁয়ের রাস্তা ধরে।

'হোমস, কী কাণ্ডটা করেছ শুনি?' শুধোই আমি।

'একটা বস্তাপচা সস্তা কৌশল, কিন্তু শ্রদ্ধা করার মতো। বিশেষ করে এসব ব্যাপারে তো দারুণ কাজে লেগে যায় পদ্ধতিটা। আজ কাল ডক্টরের উঠোনে ঢুকে সিরিঞ্জ ভরতি মৌরির তেল ছড়িয়ে এসেছি ব্রুহামের পেছনের চাকায়। জানই তো, শুধু গন্ধ অনুসরণে পটু হাউন্ডের নাক একবার মৌরির তেলের ওপর পড়লে এখান থেকে শুরু করে সারা গ্রেট ব্রিটেন পেরিয়ে স্কটল্যান্ডের একদম উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জন ও গ্রোটসয়ের[৭] আটকোনা ঘরে পৌঁছোতেও মোটেই বেগ পেতে হবে না তাকে। এ-রকম অবস্থায় পমপিকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যাম নদীর[৮] মধ্যে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া ছাড়া বন্ধুবর আর্মস্ট্রংয়ের আর কোনো উপায় নেই। ধুরন্ধর রাসকেল। সেরাতে এইভাবেই আমার চোখে ধুলো দিয়েছিল লোকটা!'

আচম্বিতে বড়োরাস্তা ছেড়ে ঘাসে ঢাকা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল কুকুরটা। আধ মাইলটাক যাওয়ার পরেই গলি শেষ হল আর একটা চওড়া রাস্তার ওপর। তার পরেই, আমাদের গতিপথ চট করে বেঁকে গেল ডাইনের শহরের দিকে— যে-শহর এইমাত্র ছেড়ে এসেছি আমরা।

'আমরা শহর ছেড়ে এসেছি এবং তড়িঘড়ি গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছি।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বেঁকে গেল রাস্তাটা; শহরের দক্ষিণ দিকে পৌঁছোনোর পর যেদিকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, তার ঠিক বিপরীত দিকে এগিয়ে গেল পথটা।

হোমস বললে, 'ঘুরপথে চক্কর দিয়ে আমাদের তাহলে বিলক্ষণ উপকার হল বল? গ্রামগুলোর কাদা ঘাঁটাই সারা হয়েছে কেন, তা এখন বুঝেছি। এ-রকম ধড়িবাজি করে থাকলে পণ্ডশ্রম আর আশ্চর্য কী? এতখানি লুকোচুরি খেলার পেছনে ডক্টরের নিশ্চয় কোনো জবরদস্ত কারণ আছে এবং আমি জানতে চাই আটঘাট বেঁধে এই বিরাট প্রতারণার আসল মানেটা কী? ডাইনের গ্রামটাই বোধ হয় ট্রামপিংটন। আরে সর্বনাশ! দেখো, মোড় ঘুরে এগিয়ে আসছে ব্রুহাম গাড়িটা! তাড়াতাড়ি ওয়াটসন তাড়াতাড়ি, নইলে আমরা গেছি!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হোমস। পাশের একটা খেতের ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল

ভেতরে। অনিচ্ছুক পমপিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে-না-লুকোতেই রাস্তা কাঁপিয়ে ঘড় ঘড় করে বেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পলকের জন্যে ভেতরে ডক্টর আর্মস্ট্রিংয়ের ওপর চোখ পড়ল আমার। দুই কাঁধ তাঁর গোল হয়ে নেমে পড়েছে, মাথা এলিয়ে পড়েছে দু-হাতের মধ্যে। দুঃখ দুর্দশা আর যন্ত্রণা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসে ছিল গাড়ির মধ্যে। বন্ধুবরের গম্ভীর হয়ে-ওঠা মুখ দেখে বুঝলাম, দৃশ্যটি সে-ও লক্ষ করেছে।

'আমার কী ভয় হচ্ছে জান, ওয়াটসন। খুবই নিরানন্দ ফলাফলের মধ্যে শেষ হবে আমাদের এই অভিযান', বলল হোমস। 'যাক, সে-ফলাফল যে কী, তা জানতে আর বিশেষ দেরি হবে না। এসো হে পমপি! খেতের মাঝে এই কাজটাই তাহলে আমাদের লক্ষ্য।'

আমাদের বিচিত্র তদন্ত-পর্ব যে অন্তে পৌঁছেছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। ফটকের বাইরের এদিকে সেদিকে দৌড়ে মহা উৎসাহে রীতিমতো চেঁচামেচি জুড়ে দিল পমপি। ব্রুহামের চাকার দাগ তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল মাটির ওপর। একটা পায়ে-চলা-পথ গিয়ে শেষ হয়েছিল নিরালা কটেজটার সামনে। ঝোপের মধ্যে কুকুরটাকে বেঁধে রেখে হোমস, আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ধুলোকাদায় ছোট্ট জীর্ণ দরজাটায় টোকা দিল হোমস। আবার টোকা দিলে, কিন্তু তবুও কোনো সাড়া এল না ভেতর থেকে। সাড়া না-এলেও কটেজটা যে পরিত্যক্ত নয়, তা বুঝলাম ভেতর থেকে ভেসে আসা একটা মৃদু শব্দ পেয়ে। অবর্ণনীয় বিষাদমাখা সেই একঘেয়ে করুণ গোঙানির মতো শব্দটায় ওতপ্রোতভাবে ফুটে উঠেছিল নৈরাশ্য আর দুর্গতির অভিব্যক্তি। দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল হোমস। তারপর পেছন ফিরে যে-পথ দিয়ে এইমাত্র আমরা এসেছি, সেইদিকে তাকালে। একটা ব্রুহাম গাড়ি আসছিল এদিকে। ধূসর ঘোড়া দুটি দেখে ভুল হবার জো-টি ছিল না।

'সর্বনাশ, ডক্টর আবার ফিরে আসছেন দেখছি।' চেঁচিয়ে ওঠে হোমস। 'আর দ্বিধা নয়। উনি আসার আগেই আমাদের দেখতে হবে এসবের মানে কী।'

বলে দরজাটা খুলে ফেলল ও। দুজনে ঢুকলাম হল ঘরের মধ্যে। গোঙানির শব্দটা আরও জোরে আছড়ে পড়ল আমাদের কানের ওপর। কে যেন করুণ সুরে টেনে টেনে কাঁদছে, অপরিসীম বেদনা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে সেই গুঙিয়ে ওঠার মধ্যে। শব্দটা আসছিল ওপরের তলা থেকে। তিরবেগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল হোমস, আমি লেগে রইলাম ওর পেছনে। একটা ভেজানো দরজায় ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল ও; সঙ্গেসঙ্গে ভয়-অবশ দেহে দুজনে দাঁড়িয়ে গেলাম সামনের দৃশ্যটি দেখে।

শয্যার ওপর শুয়ে ছিল একটি তরুণীর প্রাণহীন দেহ। স্তবকে স্তবকে ছড়ানো সোনালি চুলের মধ্যে থেকে ওপরের পানে তাকিয়ে ছিল একটি শান্ত সুন্দর বিবর্ণ মুখ, নিষ্প্রভ আধখোলা দুটি-নীল চোখ। শয্যাপ্রান্তে আধ-বসা আধ-নতজানু একটি যুবক কাপড়চোপড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন। প্রতিবার ফুঁপিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছিল তাঁর সর্বদেহ! নিঃসীম শোকে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে হোমস তাঁর কাঁধের ওপর হাত রাখা সত্ত্বেও মুখ তুলে তাকালেন না উনি।

'আপনিই কি মি. গডফ্রে স্টনটন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই— কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ও আর নেই।'

এমন শোকাচ্ছন্ন মানুষকে বোঝানো মুশকিল যে আমরা ডক্টর নই এবং তাঁর সাহায্যের জন্যেও আমাদের পাঠানো হয়নি। দু-চারটে সান্ত্বনার কথা বলার চেষ্টা করছিল হোমস। তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে বন্ধুবরের মধ্যে যে কী ধরনের সাড়া পড়ে গেছে, তা বোঝাবার চেষ্টা করতে-না-করতেই সিঁড়ি ওপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই দরজার সামনে আবির্ভূত হল ড. আর্মস্ট্রংয়ের ইস্পাত কঠিন ভারী মুখ আর কটমটে জিজ্ঞাসু চাহনি।

বললেন উনি, 'জেন্টলমেন, শেষ পর্যন্ত দেখছি পৌঁছে গেছেন আসল জায়গায়। রবাহূতের মতো না বলে-কয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ার পক্ষে বিশেষ রকমের জটিল একটি মুহূর্তও নির্বাচন করেছেন দেখা যাচ্ছে। মৃত্যুকে সামনে রেখে আর হট্টগোল করব না। কিন্তু আমার বয়স যদি কিছু কম হত জেনে রাখুন, আপনাদের এই অত্যন্ত জঘন্য নোংরা আচরণের সমুচিত দণ্ডবিধান না-করে রেহাই দিতাম না।'

বেশ মর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিলে বন্ধুবর হোমস, 'মাপ করবেন ড. আর্মস্ট্রং। আমার মনে হয়, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে। আপনি যদি আমাদের সাথে নীচে আসেন তো আমার বিশ্বাস আমরা প্রত্যেকেই এ-ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করতে পারি।'

মিনিটখানেক পরেই নীচের তলায় বসবার ঘরে থমথমে মুখ ডক্টরের সাথে জমায়েত হলাম আমরা।

'তারপর?' শুধোলেন উনি।

'আমি চাই প্রথমেই একটা জিনিস আপনি বুঝুন। লর্ড মাউন্ট-জেমস আমার নিয়োগকর্তা নন। এবং এ-ব্যাপার সম্পর্কে আমার অন্তরের সবটুকু সমবেদনাই কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে। কেউ হারিয়ে গেলে তার পরিণতিটা কী হল, তা জানার কর্তব্য আমার। কিন্তু কর্তব্য শেষ হলে সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে সেখানেই— অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই। তারপর ধরুন, অপরাধ আখ্যা দেওয়া যায় এমনি কোনো কিছুরই যখন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন পারিবারিক কেলেঙ্কারিকে সমাজের মাঝে প্রচার করার চাইতে বরং ধামাচাপা দিয়ে দিতেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠি আমি। আমি যদি বুঝি যে এ-ব্যাপারে বেআইনি কিছুই নেই, তাহলে আমার বুদ্ধিবিবেচনা আর স্বাধীনতার ওপর আপনি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। তা ছাড়া, কাগজে যাতে এসব ঘটনা প্রকাশ না-পায়, সে-বিষয়েও আমার সহযোগিতা আপনি পাবেন।'

চট করে এক পা এগিয়ে এসে দু-হাতে হোমসকে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন ড. আর্মস্ট্রং।

বললেন, 'আপনি লোক ভালো। আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি। আমার বরাত ভালো, স্টনটন বেচারাকে এ-রকম দুরবস্থায় একলা ফেলে রেখে গিয়ে বিবেক-দংশন সহ্য করতে না-পেরে ফিরে এসেছিলাম গাড়ি নিয়ে, তাই দেখা হয়ে গেল আপনার সাথে। আপনি যা দেখলেন শুনলেন, তা থেকে অনায়াসেই বুঝে নিয়েছেন আসল ব্যাপারটা। বছরখানেক আগে লন্ডনে কিছুদিনের জন্য ভাড়াবাড়িতে থাকার সময়ে ল্যান্ডলেডির মেয়েকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে গডফ্রে স্টনটন এবং তাকে শেষে বিয়ে করে সে। মেয়েটি যেমন ভালো তেমনি সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। এ-রকম বউ পেলে কোনো পুরুষেরই লজ্জিত হওয়ার কারণ থাকে না। কিন্তু তিরিক্ষে মেজাজের এই খিটখিটে বুড়োর উত্তরাধিকারী গডফ্রে। এবং তার বিয়ের খবর বুড়োর কানে যাওয়া মানেই যে ওয়ারিশি স্বত্বেরও বিলোপ হওয়া, সে-বিষয়ে আমাদের কারোরই

সন্দেহ ছিল না। ছেলেটিকে আমি ভালো করেই জানি এবং তাকে ভালোবাসি অনেকগুলি চমৎকার গুণের জন্যে। ওকে যাতে কোনো ঝামেলায় না পড়তে হয়, তাই যথাসাধ্য সাহায্য করলাম আমি। এ-খবর যাতে আর কেউ না জানতে পারে, তাই চেষ্টার ক্রটি করলাম না। কেননা, কানাঘুসো একবার শুরু হলেই হল, দেখতে দেখতে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু আঁচ করে নেবে! সাধুবাদ জানাই গডফ্রের স্বাধীন বিচার-বিবেচনার জন্যে। এই নির্জন কটেজটা নির্বাচন করার ফলে আজ পর্যন্ত কাকপক্ষীও কিছু টের পায়নি এবং আমরা সফল হয়েছি আমাদের প্রচেষ্টায়। এদের গোপন রহস্য আমি আর একজন অনুগত পরিচারক ছাড়া আর কেউ জানে না। পরিচারকটি এখন গেছে ট্রামপিংটনে সাহায্যের জন্যে। আচম্বিতে একদিন নেমে এল বিধাতার প্রচণ্ড আঘাত। বিপজ্জনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হল ওর স্ত্রী। রোগটা অত্যন্ত বিষময় প্রকৃতির এক ধরনের ক্ষয়রোগ। শোকে দুঃখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল বেচারি যে প্রায় অর্ধোন্মাদের মতো অবস্থা হল ওর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে লন্ডনে আসতে হল এই ম্যাচটা খেলার জন্যে। ম্যাচ না-খেলে আসার উপায় ছিল না। কেননা তাহলে তো একটা কারণ দর্শাতে হবে ওকে। তখনই ফাঁস হয়ে যাবে সব রহস্য। একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওকে উৎফুল্ল রাখবার চেষ্টা করলাম আমি। প্রত্যুত্তরে আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালে ও। মিনতি করলে, আমার যথাসাধ্য যেন আমি করি। এই টেলিগ্রামই দেখেছিলেন আপনি। কিন্তু কী উপায়ে যে দেখেছিলেন তা অনেক বুদ্ধি খরচ করেও ভেবে পাইনি আমি। বিপদ যে আসন্ন তা আমি ওকে বলিনি। কেননা, এখানে সে থাকলেও তো কোনো লাভ হত না। কিন্তু মেয়েটির বাবার কাছে সত্য গোপন করলাম না—খবর পাঠালাম তাঁকে। তিনি অত্যন্ত অবিবেচকের মতো খবরটি জানিয়ে দিলে গডফ্রেকে। ফলে হল কী, প্রায় উন্মাদের মতো অবস্থায় সিধে এসে ও পৌঁছোল এখানে। তারপর থেকে সেই একই অবস্থায় শয্যাপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে ও। আজ সকালে মৃত্যু এসে মেয়েটির সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিলে। মি. হোমস, আর কিছুই নেই। আপনি এবং আপনার বন্ধু অবিবেচক নয়, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের ওপর ভরসা রাখছি আমি।'

দু-হাতে ডক্টরের হাত জড়িয়ে ধরলে হোমস।

তারপর বললে, 'এসো, ওয়াটসন।' শোক-ভবন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম শীতার্ত দিনের মরা সূর্যের আলোয়।

টীকা

১. **খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মিসিং থ্রি কোয়ার্টার্স' অগাস্ট ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ২৬ নভেম্বর ১৯০৪-এর কলিয়ার্স উইকলিতে প্রথম প্রকাশিত। এই গল্পের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রাখা আছে।

২. **রাইট উইং** : রাগবি দলের ফরোয়ার্ড লাইনে মাঝে থাকে সেন্টার ফরোয়ার্ড। তার ডাইনে রাইট উইং, বাঁয়ে লেফট উইং।

৩. **কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির রাগবি টিম** : কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি রাগবি ইউনিয়ন ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২-এ। তার তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠা করা হয় অক্সফোর্ডের রাগবি ক্লাব। কিন্তু কেম্ব্রিজে রাগবি খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৯ সালে।

৪. **অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের খেলা :** অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ রাগবি খেলা প্রথম হয়েছিল ১৮৭২-এ। অক্সফোর্ডের মাঠে অনুষ্ঠিত সেই খেলায় জয়ী হয় অক্সফোর্ড। পরে, প্রথমত কেনিংটন ওভালে, আরও পরে ব্ল্যাকহিদে এবং শেষ পর্যন্ত কুইনস ক্লাবে এই বাৎসরিক খেলা অনুষ্ঠিত হত। খেলা হত প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার। বর্তমানে এই খেলা হয় টিউকেনহ্যাম স্টেডিয়ামে।

৫. **বেইজওয়াটারের বাসে :** বার্ডেট রোড থেকে শেফার্ডস বাস গ্রিন পর্যন্ত চলাচলকারী বেইজওয়াটার বাস ছাড়ত প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর।

৬. **পয়সার অপব্যয় করি না :** লর্ডের বাসে চড়া থেকেই তা বোঝা যায়। দূরত্বের অনুপাতে বাসের ভাড়া নির্ধারিত হত ১ থেকে ৬ পেনির মধ্যে।

৭. **জন ও গ্রোটস :** ওলন্দাজ জান ডে গ্রোট ইংলন্ডের মূল ভূখণ্ডের উত্তরপ্রান্তে বসতি স্থাপন করেন তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে। তিনি একটি আটটি আলাদা প্রবেশপথ সংবলিত আটকোণাকৃতি বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাঁর ওয়ারিশদের থাকবার জন্য। এই ঘটনা ইংলন্ডেশ্বর চতুর্থ জেমসের রাজত্বকালে (১৪৮৮-১৫১৩) ঘটেছিল।

৮. **ক্যাম নদী :** এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কেম্ব্রিজ শহর।

তিন গেলাসের রহস্য[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ]

১৮৯৭ সালের শীতকাল। তুষার পড়ছিল সেরাত্রে। কনকনে ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। ভোররাতের দিকে কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে কে আমায় ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। দেখি হোমস। হাতের মোমবাতির আলো ঝিকমিকিয়ে উঠছিল তার মুখের ওপর। সতর্ক ব্যগ্র মুখে আগ্রহের দীপ্তি আর তার ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গিমা দেখে এক নজরেই বুঝলাম, শুরু হয়েছে নতুন কোনো ঝামেলা।

আমি চোখ মেলতেই চেঁচিয়ে উঠল ও, 'উঠে পড়ো, ওয়াটসন, উঠে পড়ো। ডাক এসে গেছে, খেলা শুরু হল বলে! একটা কথাও নয়! ধড়াচুড়ো এঁটে নিয়ে চলে এসো চটপট!'

দশ মিনিট পরেই আমাদের নিয়ে নিস্তব্ধ পথ কাঁপিয়ে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলল শেরিং ক্রস স্টেশনের দিকে। ভোরের প্রথম আলো তখন সবে দেখা দিচ্ছে পুব দিগন্তে। মাঝে মাঝে দু-একজন শ্রমিকের আবিল আবছা মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লন্ডনের শ্বেতপাথরের মতো অস্বচ্ছ ধোঁয়ার মধ্যে। ভারী কোট জড়িয়ে চুপচাপ বসে ছিল হোমস। আমারও সেই অবস্থা। প্রথমত, হাড়কাঁপানো হিমেল হাওয়া। তার ওপর পেটে কিছু না-দিয়েই রওনা হতে হয়েছে দুজনকে। কাজেই মুখ বুজে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। স্টেশনে পৌঁছে কিছু গরম চা পেটে পড়বার পর কেন্ট-অভিমুখী একটা ট্রেনে জাঁকিয়ে বসে বেশ আরাম বোধ করলাম। আর তখনই কথা ফুটল হোমসের মুখে। পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল বন্ধুবর :

'অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ, মার্শহ্যাম[২], কেন্ট, রাত সাড়ে তিনটে।

মাই ডিয়ার মি. হোমস, আপনার সাহায্য এখুনি দরকার এবং তা পেলে খুবই খুশি হব।

কেসটা অত্যন্ত আশ্চর্য রকমের। আপনার এক্তিয়ারেই পড়ছে। শুধু লেডিকে রেহাই দেওয়া ছাড়া আপনি না-আসা পর্যন্ত কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হবে না। তাঁকে মুক্তি না-দিলেই নয়। কিন্তু দোহাই আপনার, একটা মুহূর্তও আপনি অযথা নষ্ট করবেন না। কেননা, স্যার অস্টেসকে এভাবে ফেলে রাখা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

আপনার বিশ্বস্ত
স্ট্যানলি হপকিনস।'

হোমস বললে, 'একটা কথা কিন্তু না-বলে পারছি না, ওয়াটসন। কেস নির্বাচন তোমার ঠিকই হয় না। এর যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। সব কিছুই তুমি গল্প লেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখ। এই মারাত্মক অভ্যাসেই মাটি করেছে কেসগুলো। তা না-করে যদি বৈজ্ঞানিক চোখ নিয়ে দেখতে, তাহলে বোধ হয় এ-রকম সর্বনাশ হত না ঘটনাগুলোর।'

'নিজে লিখলেই তো পার?' তিক্ত স্বরে বলি আমি।

'লিখব মাই ডিয়ার ওয়াটসন, লিখব[৩]। ইচ্ছে আছে, জীবনের শেষ বছরগুলোয় এমন একটা বই লিখে যাব যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় আর্ট। বর্তমান কেসটা মনে হচ্ছে খুনের ব্যাপারে।'

'তুমি কি তাহলে মনে কর স্যার অস্টেস মারা গেছেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। হপকিনসের লেখার মধ্যে রয়েছে প্রচুর উদ্‌বেগ। কিন্তু জানই তো, আবেগপ্রবণ মানুষ নয় সে। খুনখারাপি নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে। লাশটাকেও রেখে দিয়েছে আমাদের পরীক্ষার জন্যে। নিছক আত্মহত্যার কেস হলে আমার কাছে আসার পাত্র সে নয়। শোচনীয় দৃশ্য দেখে পাছে আঘাত পান লেডি, তাই বোধ হয় তাঁকে তালাচাবি দিয়ে রেখেছে ঘরে। ওয়াটসন, খুবই অভিজাত মহলে চলেছি আমরা। খড়মড়ে কাগজে, "E.B." মনোগ্রাম, বংশের প্রতীক চিহ্ন আর ছবির মতো সুন্দর ঠিকানা— সবগুলিরই মানে এক। আমার তো মনে হয় বন্ধুবর হপকিনসের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে এযাত্রা এবং আমাদেরও সকালটা মন্দ কাটবে না। খুনটা হয়েছে গতরাত্রে বারোটার আগে।'

'কী করে বুঝলে তুমি?'

'ট্রেনগুলোর গতিবিধি লক্ষ করে আর সময়ের দিকে নজর রেখে। স্থানীয় পুলিশ ডাকতে হয়েছে, তারা এসে খবর দিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, হপকিনসকে বেরোতে হয়েছে, তারপর সে খবর পাঠিয়েছে আমাকে। রাত ভোর হয়ে যায় এত কাজ করতে গেলে। যাক, চিশলহার্স্ট স্টেশন এসে গেছে। সব সন্দেহ ভঞ্জন করা যাবে এবার।'

গ্রামাঞ্চলের অলিগলির মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক পেরিয়ে এলাম ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর পৌঁছোলাম একটা পার্কের ফটকে। খোলা দরজায় আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস। যৌবনরসে টলমল তার দেহে আর সতর্ক চোখে-মুখে লক্ষ করলাম নিবিড় আগ্রহের দ্যুতি।

'মি. হোমস, আপনি এসেছেন দেখে সত্যিই বড়ো খুশি হলাম! ড. ওয়াটসন, আপনিও এসেছেন দেখছি। হাতে সময় থাকলে আপনাদের আর কষ্ট দিতাম না। ভদ্রমহিলার জ্ঞান ফিরে আসার পর তাঁর মুখেই ঘটনার এমন পরিষ্কার একটা বিবরণ শুনলাম যে আপনাদের আর কিছু

করণীয় আছে বলে মনে হয় না আমার। লুইহ্যামের সিঁধেল চোরেদের দলটার কথা মনে আছে আপনার?'

'বল কী! আবার সেই তিন র‍্যান্ড্যাল?'

'ধরেছেন ঠিক। বাপ আর দুই ছেলে। এ-কাজ তাদেরই। এ-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। দিন পনেরো আগে সিডেনহ্যামে একটা গোলমাল করেছে এই তিনজনে। সেই সময়ে যারা ওদের দেখেছে, তারাই বর্ণনা দিয়েছে ওদের চেহারার। এত তাড়াতাড়ি এবং কাছাকাছি আবার যে ওরা তৎপর হয়ে উঠবে, তা কি আর ভাবতে পেরেছিলাম আমি। আশ্চর্য বুকের পাটা! বাহাদুর বটে! কিন্তু যাই বলুন, এ-কাজ তাদেরই। এবার ওদের বরাতে জানবেন ফাঁসির দড়ি ঝুলছে।'

'স্যার অস্টেস তাহলে মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডান্ডায় চুরমার হয়ে গেছে তাঁর মাথার খুলি।'

'স্যার অস্টেস ব্র্যাকেনস্টল? কোচোয়ানের মুখে শুনলাম।' ওঁর স্ত্রী এখন শোকে ভেঙে পড়ছেন। বেচারি। বড়ো ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে ওঁকে। প্রথমে এসে তো প্রায় আধমরা দেখেছিলাম ভদ্রমহিলাকে। আমার মনে হয় আপনার উচিত প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত শুনে নেওয়া। তারপর, সবাই মিলে খাওয়ার ঘরটা পরীক্ষা করা যাবে।'

লেডি ব্র্যাকেনস্টল সাধারণ মহিলা নন। এ-রকম আভিজাত্যপূর্ণ তনু, রমণীয় কান্তি আর এত সুন্দর মুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বরবর্ণিনী যুবতী। বড়ো মিষ্টি, ফুরফুরে চেহারা তাঁর। সোনা-সোনা চুল। নীল-নীল চোখ! চুল-চোখের সাথে গায়ের রংও নিশ্চয় মানানসই ছিল কাল রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আগে পর্যন্ত। তাঁর আতঙ্ক-বিহ্বল উদ্ভ্রান্ত মুখের সঙ্গে যেন আঁখি-কেশ-তনুর সৌন্দর্য খাপ খাচ্ছিল না মোটেই। উপদ্রব শুধু মনের ওপর নয়, দেহের ওপরেও গেছে। চোখের ঠিক ওপরে কিশমিশ রঙের বীভৎস একটা ফুলো দেখলাম। অতি যত্নে ভিনিগার আর জল দিয়ে একনাগাড়ে ফুলোটা ধুয়ে দিচ্ছিল পরিচারিকা। মুখে তার তপঃকৃশ রুক্ষতার ছাপ। মাথায় বেশ লম্বা। কোচের ওপর শ্রান্তদেহে আড় হয়ে শুয়ে ছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র তাঁর চকিত সন্ধানী চাহনি আর সুন্দর চোখে সতর্কতার প্রতিচ্ছবি থেকে বুঝলাম, এমন ভয়ানক অভিজ্ঞতার পরেও সাহস বা উপস্থিত বুদ্ধি বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি। নীলচে রুপালি রঙের ঢিলে ড্রেসিং গাউনে আবৃত ছিল তার বরতনু। কিন্তু পাশের কোচের ওপর ঝুলছিল রুপোর চাকতি দিয়ে সেলাই করা কালো রঙের একটা ডিনারের পরিচ্ছদ।

শ্রান্তকণ্ঠে বললেন উনি, 'মি. হপকিনস, সবই তো বললাম আপনাকে। আমার হয়ে এঁদের আপনি বললেই তো পারতেন? বেশ, যদি দরকার মনে করেন, আবার না হয় বলছি। খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলেন এঁরা?'

'বন্দোবস্ত যা করার তাড়াতাড়ি করুন। ওভাবে ওঁকে ওখানে ফেলে রাখতে চাই না আমি। ও-দৃশ্য ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। বলতে বলতে সত্যি সত্যিই থর থর করে কেঁপে উঠে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। সঙ্গেসঙ্গে হাতের ওপর থেকে গাউনের ঢিলে হাতা খসে পড়তেই বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল হোমস।

'ম্যাডাম, শুধু চোখের ওপর নয়, হাতেও আঘাত পেয়েছেন দেখছি। এটা কী?' দুটো সুস্পষ্ট

লাল বিন্দু পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল শুভ্র, পেলব হাতে। ঝটিতি গাউনের হাতা দিয়ে বিন্দু দুটো ঢেকে ফেললেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল।

'ও কিছু না। গতরাতের বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা বসুন। আমি বলছি আমার কাহিনি :

'আমি স্যার অস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের স্ত্রী। বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। গোপন করে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না, তাই বলছি, মোটেই সুখের হয়নি আমাদের বিয়ে। এ-রকম মাতালের সঙ্গে এক ঘণ্টা থাকাও খুব সুখকর নয়। আর, যে-মেয়ের অনুভূতি আছে, অন্তরে তেজ আছে, আছে অফুরন্ত প্রাণরস, তাকে যদি এ-রকম একটা লোকের সঙ্গে দিনের পর দিন রাতের পর রাত বিয়ের বাঁধনে বাঁধা থাকতে হয়[৪], তখন তার অবস্থাটা কী হতে পারে কল্পনা করতে পারেন আপনি।

'গতরাতের কথাই বলি আপনাদের। জানেন বোধ হয়, এ-বাড়ির চাকরবাকরেরা নতুন তৈরি অংশটায় ঘুমোয়। মাঝখানের ব্লকটায় থাকি আমরা। পেছনদিকে রান্নাঘর। ওপরে শোয়ার ঘর। আমার ঘরের ওপরেই ঘুমোয় আমার এই পরিচারিকা— থেরেসা। আর কেউ থাকে না এদিকটায়। এখানকার কোনো শব্দই দূরের ব্লকে পৌঁছোয় না, কাজেই কারো ঘুম ভাঙাও সম্ভব নয় সেখানে। এসব খবর নিশ্চয় জানত ডাকাতগুলো। তা না হলে ওভাবে ওরা কাজ সারতে পারত না।

'রাত প্রায় সাড়ে দশটায় শুতে যান স্যার অস্টেস। চাকরেরা আগেই চলে গেছিল তাদের কোয়ার্টারে। পাছে আমার কোনো দরকার পড়ে, তাই থেরেসা ঘুমোয়নি। বাড়ির একদম ওপরে জেগে বসে ছিল সে। এই ঘরেই বসে বই পড়ছিলাম আমি। রাত এগারোটা বাজার পর উঠে পড়লাম। ওপরতলায় ওঠার আগে সব ঠিক আছে কি না দেখে নেওয়ার জন্যে এক পাক ঘুরতে বেরোলাম। এ-কাজ আমিই করি। কারণ তো বললাম। স্যার অস্টেসকে সবসময়ে বিশ্বাস করা চলে না। প্রথমে গেলাম রান্নাঘরে। সেখান থেকে প্যান্ট্রিতে। তারপর গানরুম, বিলিয়ার্ড রুম। ড্রয়িং রুম। সবশেষে খাওয়ার ঘরে। ঘরের জানলাটা সবসময়ে পুরু পর্দায় ঢাকা থাকে। ঘরে ঢুকে এই জানলার কাছেই এগুচ্ছি, এমন সময়ে মুখের ওপর বাতাসের ঝাপটা অনুভব করায় বুঝলাম, জানলাটা বন্ধ নেই, খোলা রয়েছে। একটানে পর্দাটা সরিয়ে ফেলতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম একটা চওড়া-কাঁধ লোকের সঙ্গে। বয়স হয়েছে লোকটার। সবে ঘরের মধ্যে পা দিয়েছিল সে। জানলাটা লম্বা আকারের ফ্রেঞ্চ উইনডো, নামে জানলা হলেও দরজার মতোই তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায় লনের ওপর। আমার হাতে ছিল শোয়ার ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতি। বাতিটা তুলে ধরতেই প্রথম লোকটার পেছনে আরও দুজনকে দেখলাম। তারাও ঢোকার উদ্যোগ করছিল। দেখেই, কয়েক পা পিছিয়ে এলাম আমি। কিন্তু চকিতে প্রৌঢ় লোকটা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রথমে আমার কবজি ধরেছিল সে। তারপর ধরল গলা। আমি হাঁ করলাম চিৎকার করবার জন্যে। তখন লোকটা জানোয়ারের মতো প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল আমার চোখের ওপর। এক ঘুসিতেই ছিটকে পড়লাম আমি। নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কয়েক মিনিটের জন্যে। কেননা, জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম, ঘণ্টাটানার দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে একটা ওক-কাঠের চেয়ারের সঙ্গে বেশ শক্ত করে ওরা আমায় বেঁধে ফেলেছে। ডাইনিং রুমে টেবিলের

মাথার দিকে থাকে এই চেয়ারটা। এমন আঁট করে বেঁধেছিল যে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও ছিল না। পাছে চিৎকার করি, তাই একটা রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল মুখটা। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন আমার দুর্ভাগা স্বামী। নিশ্চয় সন্দেহজনক কোনো শব্দ উনি শুনতে পেয়েছিলেন, তাই এ ধরনের দৃশ্যের জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার্স। একহাতে তাঁর প্রিয় ব্ল্যাকথর্ন কাঠের ছড়ি। তিরবেগে একজনের দিকে ছুটে যেতেই, আধবুড়ো লোকটা চুল্লির ভেতর থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে দিলে তাঁর মাথার ওপর। ওঃ সে কী মার! এতটুকু গোঙানি শুনলাম না তাঁর কণ্ঠে। ধপ করে পড়ে গেলেন মেঝেতে এবং সঙ্গেসঙ্গে নিস্পন্দ হয়ে গেল দেহ। আর একবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম আমি। এবারও নিশ্চয় কয়েক মিনিটের জন্যে চেতনা ছিল না আমার। চোখ মেলার পর দেখলাম সাইডবোর্ড থেকে রুপোর বাসনপত্রগুলো নামিয়ে জড়ো করে রেখেছে ওরা। এক বোতল মদ ছিল, তাও নামিয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটা গেলাস দেখলাম। একটু আগেই আপনাদের বললাম না, তিনজনের একজনের বয়স হয়েছে? তার আবার একগাল দাড়িও আছে। বাকি দুজন ছেলেমানুষ— মুখে গোঁফ দাড়ির বালাই নেই। দেখে মনে হল, বাপ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে রাতের শিকারে। ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা হল তিন মূর্তিতে। তারপর আমার কাছে এসে দেখাল বাঁধন শক্ত আছে কি না। এরপর, একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে গেল জানলার পাল্লাটা। মিনিট পনেরো ধস্তাধস্তি করার পর মুখের বাঁধন খসিয়ে ফেললাম আমি। কয়েকবার সজোরে চিৎকার করে উঠতেই থেরসা নেমে এসে বাঁধন খুলে দিল আমার। অন্যান্য চাকরবাকরদেরও ঘুম ভাঙানো হল তখুনি। লোক্যাল পুলিশকেও খবর পাঠালাম। খবর পেয়ে ওরা তৎক্ষণাৎ সরাসরি যোগাযোগ করলে লন্ডনের সঙ্গে। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। আমার বিশ্বাস, এ বুকফাটা কাহিনির পুনরাবৃত্তি করারও আর প্রয়োজন হবে না।'

'কোনো প্রশ্ন করবেন মি. হোমস?' হপকিনস জিজ্ঞেস করলে।

'না, এঁকে আর বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই আমার। ধৈর্যের সীমা আছে, সময়েরও মূল্য আছে।' বললে হোমস। তারপর ফিরল থেরেসার দিকে, 'খাওয়ার ঘরে যাওয়ার আগে তোমার মুখেই শুনে যেতে চাই কাল রাতের ঘটনার বিবরণ।'

শুরু করে থেরসা, 'এ-বাড়িতে লোকগুলো ঢোকার আগেই ওদের আমি দেখেছিলাম। জানলার সামনে বসে ছিলাম। বাইরের ফুটফুটে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম দূরে লজের ফটকের সামনে তিনজন লোককে। কিন্তু তখন ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। তারপর ঘণ্টাখানেক গেছে। হঠাৎ শুনলাম গিন্নিমার আর্ত চিৎকার। শুনেই এক দৌড়ে নেমে এসে যা দেখলাম, ওক কাঠের চেয়ারটায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বেচারি। আর, ঘরময় ছড়িয়ে রক্ত আর টুকরো টুকরো মগজ। রক্তের ছোপ ছোপ দাগ হতভাগিনীর পোশাকেও লেগে ছিল। ওইরকম বাঁধা অবস্থায় চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখলে যেকোনো মেয়েরই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া স্বাভাবিক। এমনকী পাগল হতেও বিশেষ দেরি লাগে না। কিন্তু অ্যাডেলেড-এর মিস ফ্রেজারের এবং অধুনা অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর লেডি ব্র্যাকেনস্টলের সাহসের অভাব কোনোদিনই হয়নি। ওকে অনেক সওয়াল করেছেন আপনারা। এবার রেহাই দিন। নিজের ঘরে গিয়ে এবার একটু বিশ্রাম নিক বেচারি।'

মায়ের মতো স্নেহ কোমল হাতে আলগোছে গৃহকর্ত্রীর কোমর জড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল থেরেসা।

হপকিনস বললে, 'জন্মাবধি এক মুহূর্তের জন্যেও লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাছছাড়া হয়নি থেরেসা। শিশু অবস্থায় ধাইমার কাজ করেছে। তারপর, আঠারো মাস আগে ওঁরা যখন সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ইংলন্ডে আসেন, থেরেসাও এসেছিল সঙ্গে। ওর পুরোনাম থেরেসা রাইড। এ ধরনের পরিচারিকা আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না মি. হোমস।'

সুনিবিড় আগ্রহের দীপ্তি মুছে গেছিল হোমসের ভাবব্যঞ্জক মুখ থেকে। রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়েছিল কেসটার যাবতীয় আকর্ষণ। এখন বাকি শুধু একটা গ্রেপ্তার করার। কিন্তু এই জাতীয় অতি সাধারণ বদমাশ ঘেঁটে সে কি তার হাত কলঙ্কিত করতে চাইবে? বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গম্ভীর প্রকৃতির মহাপণ্ডিত কোনো চিকিৎসাবিদকে সামান্য হাম জ্বরের জন্যে ডেকে আনলে তাঁর মুখে যেমন অপরিসীম বিরক্তি ফুটে ওঠে, আমার বন্ধুটির মুখেও সেদিন অবিকল সেইরকম প্রতিচ্ছবিই দেখলাম। কিন্তু তবুও, অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর খাওয়ার ঘরে ঢুকে ওই বিচিত্র দৃশ্য দেখার পর আবার জাগ্রত হয় তার ক্ষীয়মাণ আগ্রহ, একাগ্র হয়ে ওঠে তার অন্তর।

বিশাল ঘর। আর ঠিক সেই অনুপাতে অনেকটা উঁচু। ওক কাঠের কারুকার্য করা সিলিং, ওক কাঠের প্যানেল এবং দেওয়াল জুড়ে সারি সারি হরিণের মাথা আর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদির সমাবেশ। লম্বা আকারের ফ্রেঞ্চ-উইনডোটা দেখলাম দরজার অপর প্রান্তে। ডান দিকের ছোটো সাইজের তিনটি জানলা দিয়ে শীতের হিমেল রোদ্দুর এসে আলোকিত করে তুলেছিল ঘরটা। বাঁ-দিকে খুব গভীর আর মস্তবড়ো একটা ফায়ার প্লেস। ওক কাঠের তৈরি অতিকায় ম্যান্টলপিসের কিনারাটা বেরিয়ে এসেছিল ফায়ার প্লেসের ওপরে। চুল্লির বাঁ-দিকে ওক কাঠের একটা হাতলওলা ভারী চেয়ার— তলার কাঠ দুটো ক্রস করা। লাল টকটকে একটা দড়ি জড়ানো চেয়ারের চারদিকে। দড়ির দুই প্রান্ত নীচের ক্রস করা কাঠ দুটোয় বাঁধা। লেডি ব্র্যাকেনস্টল বন্ধনমুক্ত হওয়ার পর ঢিলে হয়ে পড়েছিল দড়িটা, কিন্তু যেমন তেমন বাঁধা ছিল গিঁটগুলো। এসব খুঁটিনাটি আমরা পরে দেখেছিলাম। কেননা, ঘরে ঢোকামাত্র আমাদের চিন্তাধারা একমুখী হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ফায়ার-প্লেসের সামনের বিছানো বাঘের চামড়ার ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা ভয়াবহ বস্তুটির দিকে।

দেহটি এক দীর্ঘকায়, সুগঠিত পুরুষের। বছর চল্লিশ বয়স তাঁর। সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে চিত হয়ে পড়ে ছিল তাঁর দেহ। কুচকুচে কালো ছোটো দাড়ির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে ছিল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি, যেন মুখ খিঁচিয়ে রয়েছেন বিকটভাবে। মুঠো করা হাত ছিল মাথার ওপরদিকে— ব্ল্যাকথর্ন কাঠের একটা ছড়ি আড়াআড়িভাবে পড়ে ছিল দু-হাতের মধ্যে। প্রতিহননের ইচ্ছায় আর প্রবল ঘৃণায় দুমড়ে মুচড়ে গেছিল তাঁর মলিন কিন্তু সুশ্রী মুখের ধারালো নাক, চোখ আর প্রতিটি রেখা। নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে জমাট বেঁধে ছিল একটা পৈশাচিক বিভীষিকা। নীচের আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত শয্যায় ছিলেন উনি। কেননা, পরনে দেখলাম এমব্রয়ডারি করা একটা সূচীসুন্দর শৌখিন রাত্রিবাস, আর ট্রাউজার্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা পা দুটো সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথার আঘাত অতি ভয়াবহ। এক আঘাতেই প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়েছিল। সে-আঘাত যে কতখানি মারাত্মক, পাশবিক আর প্রচণ্ড— তার প্রমাণ ঘরের

চারিদিকে চোখ বুলোলেই পাওয়া যায়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় বেঁকে যাওয়া লোহার ভারী ডান্ডাটা পড়ে ছিল পাশেই। ডান্ডা আর ডান্ডা-রচিত ধ্বংসাবশেষ— দুটোই পরীক্ষা করল হোমস।

'র‍্যান্ডালদের দলপতি আধবুড়ো হলেও গায়ে বেশ শক্তি রাখে দেখছি', মন্তব্য করল ও।

হপকিনস বললে, 'হ্যাঁ, তা রাখে। লোকটা সম্বন্ধে কিছু রেকর্ড তো আমার দপ্তরেই আছে। বেজায় চোয়াড়ে লোক।'

'তাহলে তাকে পাকড়াও করতে মোটেই বেগ পাওয়া উচিত নয় তোমার।'

'নিশ্চয় নয়। এ-কাণ্ড হওয়ার আগে থেকেই ওর খোঁজখবর নিচ্ছিলাম আমরা। অনেকের ধারণা ছিল, ও নাকি আমেরিকায় পালিয়েছে। এখন তো দেখছি পুরো দলটাই রয়েছে এখানে। এবার তো বাছাধনেরা চোখে সর্ষেফুল দেখবে আমাদের চোখে ধুলো দিতে। বন্দরে বন্দরে খবর চলে গেছে। আজ সন্ধের আগেই একটা পুরস্কারও ঘোষণা হবে। আমার খটকা লাগছে শুধু একটা কথা ভেবে। ওরা জানত, ওদের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা যথাসময়ে লেডি ব্র্যাকেনস্টলের মুখে শুনতে পাবে পুলিশ এবং সে-বর্ণনা শুনলে তিনজনকে শনাক্ত করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। এসব জেনেও এ-রকম উন্মাদের মতো কাণ্ডটা ওরা কেন করল?'

'এগজ্যাক্টলি। এ-ঘটনা শুনলেই মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে যায় যে ভদ্রমহিলাকে শেষ করে ফেললেই তো গোল চুকে যেত।'

আমি বললাম, 'ওরা হয়তো ধারণাও করতে পারেনি যে আবার জ্ঞান ফিরে পেতে পারেন উনি।'

'তা হলেও হতে পারে। অজ্ঞান অবস্থায় দেখে ভদ্রমহিলাকে হত্যার চেষ্টা করেনি ওরা। ভালো কথা, হপকিনস, স্যার অস্টেস সম্বন্ধে খবর-টবর কিছু রাখ? ওঁর সম্বন্ধে আশ্চর্য কিছু কিছু গল্প আমার কানে এসেছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

'মেজাজ ঠান্ডা থাকলে বিলক্ষণ মায়া দয়া থাকত তাঁর অন্তরে। কিন্তু নেশা জমলে আর রক্ষে নেই— পুরোপুরি পিশাচের পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন উনি। একদিন মদ রাখার ডিক্যান্টার ছুড়ে মেরেছিলেন থেরেসাকে। এ নিয়েও কম গণ্ডগোল হয়নি। আপনাকেই শুধু বলে রাখি, স্যার অস্টেস-এর অবর্তমানে সুখেই থাকবেন এ-বাড়ির সবাই। কী দেখছেন?'

জানু পেতে বসে পড়ে চেয়ারের চারিদিকে জড়ানো লাল দড়ির গিঁটগুলো পরীক্ষা করছিল হোমস! মুখের প্রতিটি রেখায় নিবিড় তন্ময়তার নিখুঁত অভিব্যক্তি। টান মেরে দড়িটাকে ছিঁড়েছিল চোরের দল। গিঁটগুলো দেখা শেষ হবার পর শুঁয়ো বার করা ছেঁড়া প্রান্তটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করল ও।

তারপর বলল, 'দড়িটা ছেঁড়ার সময়ে বেশ জোরেই টানতে হয়েছিল। ফলে, রান্নাঘরের ঘণ্টাটাও নিশ্চয় বেজে উঠেছিল দারুণ শব্দে।'

'বাজলেও কেউ তা শুনতে পায়নি। রান্নাঘরটা এ-বাড়ির একদম পেছনদিকে।'

'কিন্তু চোরেরা জানলে কী করে যে কেউ শুনতে পাবে না? এ-রকম বেপরোয়াভাবে ঘণ্টার দড়ি টানার সাহস ওরা পেল কোত্থেকে?'

'ঠিক বলেছেন, মি. হোমস, ঠিক বলেছেন। আমি নিজেও এ-প্রশ্ন বার বার করেছি নিজেকে। লোকটা যে বাড়ির সব খবরই রাখত, সে-বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহরই অবকাশ থাকতে পারে

না। খুব ভালো করেই সে জানে যে বাড়ির প্রতিটি চাকর সে সময়ে শুতে চলে যায় দূরের কোয়ার্টারে। রান্নাঘরের ঘণ্টার আওয়াজ কারো কানে পৌঁছোনোই সম্ভব নয়। চাকরবাকরদের কারো সঙ্গে নিশ্চয় যোগসাজশ ছিল ওর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বাড়ির আটজন চাকরের প্রত্যেকেরই স্বভাবচরিত্র ভালো।'

হোমস বললে, 'আর কারো কথা জানি না, কিন্তু একজনের ওপর আপনা হতেই সন্দেহ এসে পড়ছে। সে হল থেরেসা— যার মাথা লক্ষ করে ডিক্যান্টার ছুড়ে মেরেছিলেন স্যার অস্টেস। কিন্তু সে আবার লেডির একান্ত অনুগত এবং প্রতিহিংসা নিতে যাওয়া মানেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। খুবই তুচ্ছ পয়েন্ট এটা। র‍্যান্ড্যালকে হাজতে পোরার পর তার দুষ্কর্মের সঙ্গীদের খুঁজে বার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে তোমায়। লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনি একেবারে সত্যি। ঘরের প্রতিটি জিনিসই তার চাক্ষুষ প্রমাণ।' বলতে বলতে ফ্রেঞ্চ-উইনডোর সামনে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে সে। 'এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। জমি লোহার মতো শক্ত, পায়ের ছাপ পাওয়ার আশা দুরাশা। ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখা মোমবাতিগুলো জ্বালানো হয়েছিল দেখছি।'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। ওই আলোয় আর লেডির শোয়ার ঘরের মোমবাতির আলোয় পথ চিনে চম্পট দিয়েছে চোরেরা।'

'যাওয়ার সময়ে কী কী নিয়ে গেছে?'

'বেশি কিছু নয়। সাইডবোর্ডে রাখা মাত্র আধডজন প্লেট। লেডির মতে, স্যার অস্টেসের মৃত্যুতে ওরা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে সারাবাড়ি লুঠ করা আর হয়ে ওঠেনি। অন্য সময় হলে অবশ্য এত অল্পের ওপর রেহাই দিত না।

'খাঁটি কথাই বলেছেন। ওরা তো মদও খেয়েছে, তাই না?'

'নার্ভ শক্ত রাখার জন্যে।'

'ঠিক। সাইডবোর্ডের ওই গেলাস তিনটেতে কেউ হাত দেয়নি তো?'

'না। বোতলটা ওরা যেভাবে ফেলে গেছে, সেইভাবেই রেখেছি আমি।'

'তাহলে ওইগুলোই দেখা যাক। আরে, আরে! এ কী?'

পাশাপাশি তিনটে গেলাস সাজানো ছিল সাইডবোর্ডে। মদের দাগ লেগে ছিল প্রত্যেকটার ভেতরে। অনেকদিন রেখে দেওয়ার ফলে বহু পুরোনো মদে দ্বিতীয়বারের মতো যে সর পড়ে[৫], তারই খানিকটা তলানি দেখলাম একটা গেলাসের নীচে। তিন ভাগের দু-ভাগ ভরতি বোতলটা ছিল পাশেই। সুরার রঙে গভীরভাবে রাঙানো লম্বা আকারের একটা ছিপি পড়ে ছিল একদিকে। ছিপি আর বোতলের গায়ে ধুলোর পুরু স্তর দেখেই বুঝলাম, দ্রাক্ষারসটি সাধারণ মদিরা নয় এবং সেরা জিনিসটিই চেখে গেছে খুনিরা।

আকস্মিক পরিবর্তন এসেছিল হোমসের আচরণে। নিরুদ্যম ভাব অন্তর্হিত হয়েছিল নিমেষের মধ্যে। কোটরাগত সজাগ দুই চোখে আবার জেগে উঠেছিল আগ্রহ আর সতর্কতা। ছিপিটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে লাগল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ছিপিটা খুলল কেমন করে?'

আধখোলা একটা ড্রয়ার দেখিয়ে দিলে হপকিনস। টেবিল মোছার খানিকটা কাপড় আর ছিপি খোলার বড়ো সাইজের একটা প্যাঁচানো স্ক্রু ছিল ভেতরে।

'কিন্তু এই স্ক্রু দিয়েই ছিপিটা খোলা হয়েছিল কি না, তা কি লেডি স্বচক্ষে দেখেছেন?'

'না, বোতলটা খোলার সময়ে তাঁর জ্ঞান ছিল না।'

'ঠিক বলেছ। সত্যি কথা বলতে কী, কোনো কাজেই লাগানো হয়নি এই স্ক্রুটিকে। ছিপিটা খোলা হয়েছে একটা পকেট স্ক্রু দিয়ে। যতদূর মনে হয় ছুরির সঙ্গে লাগানো ছিল স্ক্রুটা এবং তা লম্বায় দেড় ইঞ্চির বেশি নয়। ছিপির ওপরটা লক্ষ করলেই দেখতে পাবে, তিন-তিনবার স্ক্রুটাকে ভেতরে ঢোকানোর পর তবে খোলা গেছে ছিপিটা। তিনবার ঢুকিয়েও কিন্তু কোনোবারই এফোঁড়-ওফোঁড় করতে পারেনি। কিন্তু এই বড়ো স্ক্রু দিয়ে তা করা যেত এবং এক টানেই ছিপিটাকে খুলে আনা যেত বাইরে। হপকিনস, লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তার পকেটে একটা ছুরি পাবে। ছুরিটার ফলা একটা নয়— অনেকগুলো এবং অনেক রকমের।'

'চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে হপকিনস।

'কিন্তু, হপকিনস, ওই গেলাস দুটোই যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে দিচ্ছে! লেডি সত্যিই তিনজনকে সুরা পান করতে দেখেছিলেন, তাই না?' 'দেখেছিলেন' শব্দটার ওপর সামান্য জোর দেয় হোমস।

'নিশ্চয়। এ-সম্পর্কে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই তাঁর জবানবন্দিতে।'

'তাহলে যবনিকা পড়ুক এ-প্রসঙ্গে। তা ছাড়া কী আর করা যায় বল? কিন্তু গেলাস তিনটে যে রীতিমতো অসাধারণ, তা তোমায় মেনে নিতেই হবে, হপকিনস। কী বললে? আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই দেখতে পাচ্ছ না? বেশ, বেশ, ইতি করে দাও এ-আলোচনার। আমার মতো কেউ যদি কোনো বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ ক্ষমতাকে বিশেষভাবে রপ্ত করে থাকে, তখন হয় কি, সোজা জিনিসকে ঠিক চোখে সে দেখে উঠতে পারে না। হাতের কাছে থাকা সহজ সমাধান উপেক্ষা করে। জটিল আর দুর্বোধ্য উত্তরের পেছনেই ধাওয়া করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে তার মনে। আমার হয়তো সেই দশাই হয়েছে। এমনও হতে পারে, গেলাসগুলো নিশ্চয় দৈবের দেওয়া নিছক একটা সুযোগ। গুড মর্নিং, হপকিনস। এ-ব্যাপারে তোমায় বিশেষ সাহায্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, কেসটা সম্পর্কে তোমার নিজের মনেও কোনো অস্বচ্ছতা, আবিলতা দেখছি না। র‍্যান্ডালকে গ্রেপ্তার করতে পারলে অথবা নতুন কিছু ঘটলে খবর পাঠিয়ো আমাকে। আমার তো বিশ্বাস, শিগ্‌গিরই এ-কেসের সফল সমাপ্তির জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আসতে হবে। এসো হে ওয়াটসন, আমরা বরং ঘরে বসে অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করি। তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না।'

ফেরার পথে হোমসের চোখ-মুখ দেখে মনে হল রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এ এমন কিছু দেখে এসেছে ও, যা ভাবতে গিয়ে বারে বারে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে ওর যুক্তিতর্কের ইমারত। বার বার দেখছিলাম, জোর করে এই হতবুদ্ধি ভাবটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল সে। ঘটনাটা যেন জলের মতোই নির্মল, এমনিভাবেই আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবারেই মনের ওপর চেপে বসছিল প্রচ্ছন্ন সন্দেহটা। ওর ললাটরেখা আর তন্ময় দৃষ্টি

'হোমসের চোখ-মুখ দেখে মনে হল রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

দেখেই বুঝতে পারছিলাম, মনে মনে হোমস আবার ফিরে গেছে অ্যাবি গ্রাঞ্জ-এর সুবিশাল খাওয়ার ঘরে— মধ্যরাতের ট্র্যাজেডি যে ঘরের মন্থর আবহাওয়াকে শিহরিত করে তুলেছে আপন ভয়াবহতায়। শহরতলির একটা স্টেশন থেকে ধীরগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেনটা। ঠিক এমনি সময়ে আচম্বিত আবেগের আচমকা কশাঘাতে ও তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। আমাকেও টেনে আনল কামরার ভেতর থেকে।

'ক্ষমা করো আমায়', বাঁকের আড়ালে, অপস্রিয়মাণ শেষ কামরাটার দিকে তাকিয়ে বলল ও। 'ভাবছ, নিছক খেয়ালের ঝোঁকে কষ্ট দিচ্ছি তোমায়। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি ওয়াটসন, কেসটা আমি এ-অবস্থায় রেখে যেতে পারছি না, কিছুতেই না। আমার সমস্ত সত্তা, প্রতিটি অনুভূতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। ওয়াটসন, ভুল— আগাগোড়া ভুল— আমি শপথ করে বলছি— সমস্ত ভুল। তুমি হয়তো বলবে, কী করে তা সম্ভব? লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনিতে কোনো খুঁত নেই। থেরেসার রিপোর্টে রয়েছে সে-কাহিনির পূর্ণ সমর্থন। খুঁটিনাটিগুলো মোটামুটি নির্ভুল। এসবের বিরুদ্ধে খাড়া করার মতো মালমশলা কী? না, তিনটে মদের গেলাস। ব্যস, আর কিছু না। কিন্তু কারো ওপর নির্ভর না-করে যদি সরাসরি কেসটা হাতে নিতাম আমরা, কারো কাটছাঁট গল্প শুনে নিজের মনকে আবৃত না-করতাম, সরেজমিন তদন্তে এসে প্রথম থেকেই সব কিছু মেনে না-নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতাম সব কিছু— তাহলে কি তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার মতো— এর চাইতেও জোরালো কোনো পয়েন্ট আমি আবিষ্কার করতে পারতাম না? নিশ্চয় পারতাম। বেঞ্চটায়

বসে পড়ো ওয়াটসন। আমাদের ট্রেন না-আসা পর্যন্ত বসে বসে শোনো। তার আগে একটা আবেদন আছে। লেডি অথবা তাঁর পরিচারিকার কাহিনির যে নির্ভেজাল সত্যি হতেই হবে, এ-রকম ধরনের কোনো ধারণা যদি তোমার মাথায় থেকে থাকে, তবে অবিলম্বে বিনা দ্বিধায় তাকে নির্বাসন দাও। ভদ্রমহিলার মন ভোলানো ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে।

'এমন কতকগুলো পয়েন্ট রয়েছে লেডির কাহিনিতে যা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভাবলেই সন্দেহ হয়। মাত্র দিন পনেরো আগে সিডেনহ্যামে বেশ বড়ো রকমের একটা কাণ্ড করে এসেছে র‍্যান্ডাল-বাহিনী। এদের কীর্তিকলাপের বিবরণ এবং দৈহিক বর্ণনা কাগজে বেরিয়েছিল। কাজেই, কেউ যদি মনগড়া গল্পের মধ্যে ওই চোরদের দিয়ে কোনো দৃশ্য অভিনীত করাতে চায়, তাহলে সহজেই এরা এসে পড়বে সেইসব চরিত্রে। কিন্তু আসলে কী হয় জান, চোরেরা যদি বেশ কিছুদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনোর মতো মোটা দাঁও পিটতে পারে, তাহলে নতুন কোনো বিপদের মধ্যে নাক না-গলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিরুপদ্রবে চোরাই অর্থ নিজেদের ভোগে লাগিয়ে নিতে চায় পরম শান্তিতে। এইটাই নিয়ম। আবার দেখ, রাত গভীর হতে-না-হতেই এত সকাল সকাল তৎপর হয়ে ওঠাটা চোরেদের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। স্ত্রীলোকের চেঁচানি বন্ধ করার জন্যে ঘুসি মারাও চোরদের পক্ষে অস্বাভাবিক! কেননা, সবাই জানে চিৎকারটা তাতেই বরং বেশি হওয়া স্বাভাবিক। খুন করাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। বিশেষ করে ওরা যখন সংখ্যায় বেশি। একজনকে কাবু করে ফেলা এমন কিছু কঠিন নয় তিন তিনটে পুরুষের পক্ষে। নাগালের মধ্যে প্রচুর লোভনীয় জিনিস থাকা সত্ত্বেও এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। সবশেষে, দামি দুষ্প্রাপ্য মদের অর্ধেকও না-খেয়ে ফেলে রেখে যাওয়াটা তাদের মতো লোকদের পক্ষে রীতিমতো অস্বাভাবিক। ওয়াটসন, এবার বল এতগুলো অস্বাভাবিকতা। শুনে কী মনে হয় তোমার?'

'অস্বাভাবিকতাগুলোর সম্মিলিত ফলাফল নিশ্চয় ভাববার মতো। তা ছাড়া, আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে গেলে আবার প্রতিটাই সম্ভব। সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার অন্তত আমার কাছে যা মনে হয়, তা হল ভদ্রমহিলাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাওয়া।'

'এ-সম্পর্কে অবশ্য আমি নিশ্চিত নই, ওয়াটসন। কেননা, দুটি পথ খোলা ছিল দুর্বৃত্তদের সামনে। হয় ওঁকে খতম করে দেওয়া, না হয় এমনভাবে বেঁধে রেখে যাওয়া যাতে ওদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উনি শোরগোল তুলতে না-পারেন। সে যাই হোক, লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনিতে কোথাও-না-কোথাও অবিশ্বাসের একটা কণিকা যে লুকিয়ে আছে, তা আমি দেখতে পেয়েছি। তাই নয় কি? আর এখন এসব কিছুর ওপরে আসছে তিনটে মদের গেলাসের রহস্য।'

'মদের গেলাসের রহস্য?'

'মনের চোখ দিয়ে গেলাসগুলো দেখতে পাচ্ছ তো?'

'ছবির মতো।'

'লেডি ব্র্যাকেনস্টল বলেছেন, গেলাসগুলো নিয়ে মদ খেয়েছে তিনজন পুরুষ। জবানবন্দির এই অংশটুকুর সম্ভবপরতা সম্বন্ধে তোমার মনে কি কোনো খটকা জাগছে?'

'সম্ভবই-বা নয় কেন শুনি? প্রত্যেকটা গেলাসেই তো মদ ছিল।'

'মোটেই না। সরে ভরতি ছিল বোতলটা। কাজেই প্রথম দুটো গেলাসে কোনো সর পড়ল না, কিন্তু তৃতীয়টায় পড়ল প্রচুর পরিমাণে— এ-রকম উদ্ভট ধারণা মনে আনতেও কষ্ট হয়। দুটি— মাত্র

দুটি ব্যাখ্যা আছে এ-রহস্যের। একটা হল, দ্বিতীয় গেলাসটা ভরবার পর বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে নেওয়া হয়েছিল বোতলটা। তাই সরগুলো পড়েছে শেষের গেলাসে। কিন্তু এ-সম্ভাবনা কষ্টকল্পিত এবং মোটেই সম্ভব বলে মনে হয় না। না, না, ওয়াটসন আমার অনুমানই সত্য। কোনো ভুল নেই তাতে।'

'তোমার অনুমান কী শুনি।'

'মদ খাওয়া হয়েছে মাত্র দুটি গেলাস থেকে। ঘটনাস্থলে যে তিনজন হাজির ছিল, এমনি একটা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুটি গেলাসের তলানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় গেলাসে। তাহলেই, সমস্ত সর এসে পড়েছে শেষের গেলাসে। তাই নয় কি? হ্যাঁ, তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। কিন্তু এই ছোট্ট কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটার সত্য ব্যাখ্যা যদি আবিষ্কার করতে পেরে থাকি তাহলেই কেসটা এক লাফে সাধারণ থেকে উঠে আসছে রীতিমতো অসাধারণের পর্যায়ে। কেননা, এসব কিছুর একমাত্র সহজ সরল ব্যাখ্যা হল এই যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং তাঁর পরিচারিকা থেরেসা স্বেচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে একটা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছেন আমাদের এবং এ-গল্পের একটা বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল অপরাধীকে এভাবে আড়াল করে রাখার পেছনে নিশ্চয় কোনো বড়ো রকমের কারণ আছে ওঁদের। এ-রহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছোতে হলে তাঁদের কোনোরকম সাহায্য না-নিয়ে নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে তদন্তের বনিয়াদ। বর্তমানে এইটাই হল আমাদের একমাত্র কর্তব্য। ওয়াটসন, আমাদের ট্রেন এসে গেছে।'

আমাদের আবার ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর অধিবাসীরা। কিন্তু শার্লক হোমস যখনই শুনলে লেসট্রেড হেড কোয়ার্টারে গেছে রিপোর্ট পেশ করতে, সঙ্গেসঙ্গে কাল বিলম্ব না-করে দখল করে বসল খাওয়ার ঘরটা। ভেতর থেকে তালা এঁটে দিয়ে শুরু হল ঝাড়া দু-ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর শ্রমসাধ্য তদন্ত পর্ব। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, ঠিক এমনি ধরনের মজবুত বনিয়াদের ওপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে পাওয়া শার্লক হোমসের অতি উজ্জ্বল অনুমান-ইমারত। জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য হাতেনাতে প্রমাণ করার সময়ে অনুগত ছাত্র যেমন অধ্যাপকের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আমিও ঘরের কোণে বসে নিঃশব্দে তার তাক-লাগানো গবেষণার প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করতে লাগলাম একাগ্র মনে। জানলা, পর্দা, কার্পেট, চেয়ার, দড়ি— পরপর প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হোমস। প্রতিবার পরীক্ষা শেষে তন্ময় হয়ে রইল চিন্তায়। ব্যারনেটের দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঘর থেকে। এ ছাড়া ঘরের আর কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হয়নি। তারপর হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে অতিকায় ম্যান্টলপিস বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল হোমস। ওপরে ওঠার পরেও মাথা থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে ঝুলতে লাগল লাল দড়ি এতটুকু একটা প্রান্তভাগ। তারের সঙ্গে তখনও দড়িটুকু লেগে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে দড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল হোমস। তারপর আরও কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টায় হাঁটু ঠেস দিলে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা কাঠের ব্র্যাকেটের ওপর। ফলে হাতের নাগালের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই পৌঁছে গেল দড়ির ছেঁড়া টুকরোটা। কিন্তু শুধু দড়ি নয়, ব্র্যাকেটটাও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হল। সবশেষে, একটা পরিতৃপ্তির শব্দ শুনলাম ওর কণ্ঠে এবং পরমুহূর্তেই লাফিয়ে নেমে পড়ল হোমস মেঝের ওপর।

'সব ঠিক আছে, ওয়াটসন। হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি কেসটাকে। যতগুলো চমক লাগানো কেস আছে আমাদের সংগ্রহে, তাদের মধ্যে অন্যতম হবে অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর রহস্য। কিন্তু কী মুশকিল বল তো? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে এত মন্থর হয়ে এসেছে তা কে জানত! আর একটু হলেই মস্ত ভুল করে ফেলেছিলাম আর কি! সারাজীবনেও সে-ভুল শোধরানোর সুযোগ পেতাম না। কিন্তু এখন আর কোনো কুয়াশা নেই আমার চোখের সামনে। আর কয়েকটা হারিয়ে যাওয়া অংশ পেলেই সম্পূর্ণ হয়ে যায় আমার যুক্তি বিচার ও বক্তব্য।'

'লোকগুলোর হদিশ পেলে?'

'লোক, ওয়াটসন, লোক। মাত্র একজন কিন্তু অতি ভয়ংকর লোক। সিংহের মতো শক্তিমান সে। দেখছ না, এক আঘাতেই কতখানি দুমড়ে গেছে লোহার ডান্ডাটা। মাথায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চি, কাঠবেড়ালের মতো চটপটে, আঙুলের কাজেও রীতিমতো পটু। আরও আছে— উপস্থিত বুদ্ধি তার অসাধারণ। কেননা, সমস্ত আষাঢ়ে গল্পটা তারই মগজ থেকে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, ওয়াটসন, হ্যাঁ। একজন অতি আশ্চর্য লোকের চাতুর্যের প্রদর্শনীর মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। কিন্তু ঘণ্টা টানার ওই দড়িটার মধ্যে এমন একটা সূত্র রেখে গেছে সে, যা দেখলে আর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।'

'সূত্রটা পেলে কোথায়?'

'ওয়াটসন, ঘণ্টা টানার দড়ি ছেঁড়ার জন্যে যদি নীচে থেকে টান মার, তাহলে দড়িটা কোথায় ছেঁড়া উচিত? না, তারের সঙ্গে যেখানে লাগানো আছে, ঠিক সেইখানে। ওপর থেকে তিন ইঞ্চি নীচুতে ছেঁড়া কি সম্ভব? কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে তাই।'

'তার কারণ ওই জায়গায় শুঁয়ো উঠে যাওয়ায় নিশ্চয় পলকা হয়ে গেছিল দড়িটা।'

'ঠিক বলেছ। দেখতেই তো পাচ্ছ, হাতের প্রান্তটায় শুঁয়ো উঠে উঠে রয়েছে। মহা ধড়িবাজ লোক। ছুরি দিয়ে শুঁয়ো তুলে এই অবস্থা করে রেখে গেছে সে। কিন্তু অপর প্রান্তটা শুঁয়ো-ওঠা নয়। এখান থেকে তা দেখতে পাবে না। ম্যান্টলপিসের ওপর দাঁড়ালেই দেখবে ছুরি দিয়ে পরিষ্কারভাবে কাটা হয়েছে দড়িটাকে। শুঁয়োর কোনো চিহ্নই দেখতে পাবে না। আচ্ছা, এবার অনায়াসেই সমস্ত ঘটনাটিকে নতুন করে ঢেলে গড়ে নিতে পার তুমি। দড়ির দরকার হয়েছিল লোকটার। ছিঁড়ে নামানো সম্ভব নয়— ঘণ্টা বাজার শব্দে লোকজন সচকিত হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তার? ম্যান্টলপিসের ওপর লাফিয়ে উঠেও দড়ির নাগাল পেল না সে। তখন হাঁটু ঠেস দিলে দেওয়ালের কাঠের ব্র্যাকেটের ওপর। ফলে, ছাপ পড়ল ধুলোর ওপর। ব্র্যাকেটটায় একবার চোখ বুলিয়ে এলেই দাগটা দেখতে পাবে তুমি। তারপর সে ছুরি বার করলে দড়িটা কাটার জন্যে। দেখতেই তো পেলে, কম করে ইঞ্চি তিনেকের জন্যে দড়িটার নাগাল পেলাম না আমি। সেই কারণেই বললাম, লোকটা আমার থেকে অন্তত পক্ষে তিন ইঞ্চি লম্বা। ওক কাঠের চেয়ারে বসবার জায়গাটা লক্ষ করেছ? কী দেখছ?'

'রক্ত।'

'নিঃসন্দেহে রক্ত এবং শুধু এই রক্তের দাগ দিয়েই আদালতে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, ভদ্রমহিলা যা বলেছেন আমাদের সামনে, তা নিছক একটা বানানো গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। ওঁর কথামতো খুনের সময়ে উনি যদি চেয়ারেই বসা থাকতেন, তাহলে রক্তের দাগ ও জায়গায় এল

কী করে শুনি? না, না, আগে নয়— স্বামী মারা যাওয়ার পরেই চেয়ারে বসেছিলেন উনি। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, কালো পোশাকটা যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে এই দাগের সঙ্গে মিলে যায় এমনি একটা রক্তের দাগ তাতে তুমি পাবে। ওয়াটসন, ওয়াটসন, ওয়াটারলু'তে এখনও পৌঁছোতে পারিনি বটে, কিন্তু এই হল আমাদের 'মারেনগো'[৬], কেননা, পরাজয় দিয়ে শুরু করে বিজয় গৌরবের মধ্যে শেষ হল আমাদের তদন্ত-পর্ব। এবার দু-একটা কথা বলা দরকার থেরেসার সঙ্গে। যে-সংবাদের প্রয়োজন এখন, তা পেতে হলে আরও কিছুক্ষণ একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

কঠোর মূর্তি অস্ট্রেলিয়ান নার্স থেরেসা মানুষ হিসেবে কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং। স্বল্পভাষী, অনুদার সন্দিগ্ধমনা হলেও শেষ পর্যন্ত হোমসের মিষ্টি ব্যবহার আর কথাবার্তায় কাজ হল। বিনা প্রতিবাদে সরলভাবে সবই শুনে যাচ্ছিল হোমস। বেশ কিছুক্ষণ পর এহেন থেরেসার চিত্তও নরম হয়ে এল। হোমসের স্বভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন মধুর হয়ে উঠল তার আচরণ। ঠিক তখনই লোকান্তরিত অন্নদাতার বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সে।

'হ্যাঁ, স্যার, সত্যিই আমার দিকে ডিক্যান্টার ছুড়ে মেরেছিলেন উনি। লেডিকে একটা বিশ্রী গালি দিতেই তা আমার কানে যায়। আমি তখন বলেছিলাম ওর ভাই হাজির থাকলে এ-শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতাও হত না তাঁর। তাইতেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডিক্যান্টারটা উনি ছুড়ে মারেন আমার দিকে। আরও ডজনখানেক ডিক্যান্টার হাতের কাছে হাজির থাকলে সবকটাই ছুড়তে দ্বিধা করতেন না উনি। বিয়ের শুরু থেকেই ভদ্রলোক অতি জঘন্য ব্যবহার করে আছেন লেডির সাথে। মেয়েটিরও স্বভাব এমন যে মরে গেলেও এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইত না। এমনকী, আমার কাছেও সব কথা বলত না। আজ সকালেই ওর হাতে ওই দাগ দুটো দেখলেন, ও-সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলেনি। কিন্তু আমি জানি ও-দাগ হয়েছে হ্যাট-পিনের খোঁচায়। শয়তান কুকুর কোথাকার। মরে গেছে লোকটা, তাই তাকে এভাবে গালাগাল দেওয়ার জন্যে ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমায়। সারাদুনিয়ায় কিন্তু ওর মতো শয়তান আর দুটি দেখা গেছে কি না সন্দেহ। আঠারো মাস আগে ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমাদের। তখন কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর ছিল ওঁর স্বভাব। চমৎকার মানুষ ছিলেন উনি। তারপর, এই আঠারো মাস যেন আঠারোটা দীর্ঘ বছরের মতোই মনে হয়েছে আমাদের কাছে। সবে লন্ডনে পৌঁছেছিল লেডি। হ্যাঁ, এই তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। বাড়ি থেকে আগে কখনো বেরোয়নি। খেতাব, টাকা আর লন্ডনের ভুয়ো আদবকায়দার চমক দেখিয়ে বেচারির চিত্ত জয় করে ফেললেন উনি। ভুল যদি সে করে থাকে তবে খেসারতও দিয়েছে। বড়ো বেশি দিয়েছে। কোনো স্ত্রীলোক এভাবে আর দিয়েছে কি না জানি না। কোন মাসে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের? এখানে পৌঁছোনোর ঠিক পরেই। জুন মাসে পৌঁছেছিলাম আমরা। দেখা হয়েছিল জুলাইয়ে। গত বছরের জানুয়ারিতে বিয়ে হয় ওদের। হ্যাঁ, হ্যাঁ শোকে এখন ডুবে আছে ও। আপনারা গেলে তবুও দেখা করবে নিশ্চয়। কিন্তু একটা কথা, ওকে বেশি প্রশ্ন করবেন না। রক্তমাংসের মানুষ তো! নির্যাতনও বড়ো কম যায়নি কাল রাত থেকে।'

কোচে আড় হয়ে শুয়ে ছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আগের থেকে বেশ সপ্রতিভ মনে হল তাঁকে। চোখ-মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন অনেকটা ফিরে এসেছে। থেরেসা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিল। ভিনিগার আর জল দিয়ে আবার সে ধুইয়ে দিতে বসল লেডির কালশিটে পড়া ফুলোটা।

আমরা ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলেন, 'আশা করি, আবার জেরা করতে আসেননি?'

'না।' খুব নরম সুরে উত্তর দিলে হোমস। 'আপনি যে পরিশ্রান্ত, তা আমি জানি, লেডি ব্র্যাকেনস্টল। তাই আপনাকে বিব্রত করার কোনো অভিপ্রায় নেই। আমি শুধু একটি জিনিস চাই এবং তা হল আপনি যাতে কোনো বিড়ম্বনায় না পড়েন। তাই, সব জটিলতার জট খুলে ধরে সমস্ত ঘটনাকে সরল করে তুলে ধরায় আমার এত আগ্রহ। আমাকে বন্ধু হিসেবে নিন। আমাকে বিশ্বাস করুন। পরিণামে হয়তো দেখবেন সত্যিই আপনার আস্থাভাজন হতে পেরেছি আমি।'

'কী করতে বলেন আমাকে?'

'যা সত্য, তাই বলুন।'

'মি. হোমস!'

'না, না লেডি ব্র্যাকেনস্টল, ওতে কোনো সুবিধে হবে না। আমার যৎসামান্য নামযশের কিছু কিছু হয়তো শুনে থাকবেন। এই সামান্য ক্ষমতার সবটুকু দিয়ে আমি প্রমাণ করে দেব, যে-কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তা আগাগোড়া বানানো।'

বিবর্ণ মুখে এবং ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং থেরেসা দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন হোমসের পানে।

তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে থেরেসা, 'আপনার ধৃষ্টতা তো দেখছি কম নয়। আপনি কি বলতে চান, লেডি মিথ্যে বলেছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'কিছু বলার নেই আপনার?'

'সবই তো বলেছি আপনাকে।'

'আর একবার ভাবুন লেডি ব্র্যাকেনস্টল! অকপটে সমস্ত খুলে বললে ভালো হত না কি?'

মুহূর্তের দ্বিধার ছায়া দুলে ওঠে লেডির ছবির মতো সুন্দর মুখে। পরক্ষণেই তার চাইতেও এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তা। মুখোশের মতোই স্থির হয়ে আসে মুখের প্রতিটি রেখা।

'যা জানি, সবই বলেছি আপনাকে।'

টুপি তুলে নিলে হোমস। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, 'আমি দুঃখিত।' আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না-করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। পার্কে একটা পুকুর দেখেছিলাম। হোমস এই পুকুরটার দিকেই নিয়ে গেল আমায়। ওপরের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। তবু একটিমাত্র ছিদ্র দেখলাম তার মাঝে। ঠিক যেন একটা রাজহাঁস ডুব দিয়েছে বরফের স্তর ভেদ করে। ছিদ্রটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে হোমস। তারপর গেল বাড়ির ফটকে। সেখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যানলি হপকিনসের জন্যে ছোটো একটা চিরকুট লিখে বৃদ্ধ পাহারাদারকে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

চলতে চলতে বললে, 'অন্ধকারে ঢিল ছুড়লাম ওয়াটসন। লাগলেও লেগে যেতে পারে। কিন্তু বন্ধুবর হপকিনসের জন্যেও তো কিছু করা দরকার। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর। এখনও কিন্তু ওকে আমি দলে টানতে রাজি নই। যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা গোপন থাকুক আমাদের দুজনের মধ্যেই। আমার তো মনে হয়, এরপর আমাদের তৎপর হওয়া দরকার একটি বিশেষ যাত্রাপথের জাহাজ অফিসে। ওখানে একটু খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। যতদূর মনে হয়, অফিসটা পলমলের একদম শেষের দিকে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া আর ইংলন্ডের মধ্যে আরও একটা লাইনে স্টিমার যাতায়াত করে। কিন্তু আপাতত অনেকখানি জায়গা জুড়ে আরম্ভ করা যাক অনুসন্ধান আর তদন্ত।'

হোমসের কার্ড ম্যানেজারের কাছে পৌঁছোনোমাত্র ডাক পড়ল। প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে স্বদেশের বন্দরে পৌঁছেছে মাত্র একটি স্টিমার। জাহাজের নাম, 'রক অব দি জিব্রাল্টার'— এ-কোম্পানির সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে ভালো জলপোত এইটাই। যাত্রীতালিকায় চোখ বুলোতেই পাওয়া গেল অ্যাডিলেডের মিস ফ্রেজার আর তাঁর পরিচারিকার নাম। দুজনেই সাগর পাড়ি দিয়েছে 'রক অব দি জিব্রাল্টার'-এ। জাহাজটা এখন অস্ট্রেলিয়ার পথে। সুয়েজ খালের দক্ষিণে কোথাও তাকে পাওয়া যেতে পারে। ১৮৯৫ সালে যে যে অফিসারেরা জাহাজে ছিলেন, এখনও তাঁরাই আছেন শুধু একজন ছাড়া। ফার্স্ট অফিসার মি. জ্যাক ক্রোকার এখন ক্যাপ্টেন হয়েছেন। দিন দুয়েকের মধ্যেই সাদাম্পটন থেকে তাদের নতুন জাহাজ 'বাস রক' পাড়ি জমাবে সাগরের বুকে। এই জাহাজেরই চার্জ বুঝে নেবেন মি. ক্রোকার। উনি থাকেন সিডেনহ্যামে। কিন্তু ওইদিন সকালে তাঁর আসার কথা আছে নির্দেশ বুঝে নেওয়ার জন্যে। দরকার মনে করলে আমরা অপেক্ষা করতে পারি তাঁর জন্যে।

না, তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো অভিপ্রায় হোমসের নেই! তবে ভদ্রলোকের কাজের রেকর্ড আর চরিত্র সম্বন্ধে আরও বিশদ খবর পেলে বিলক্ষণ খুশি হবে সে।

অতি চমৎকার তাঁর কাজের রেকর্ড। যোগ্যতার দিক দিয়ে ক্যাপ্টেন ক্রোকারের ধারেকাছে আসার মতো অফিসার কোম্পানির অতগুলি জাহাজের মধ্যে একজনও নেই।

আর চরিত্র? ডিউটিতে বহাল থাকার সময়ে ওঁর মতো বিশ্বস্ত কর্মচারী আর দুটি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কিন্তু জাহাজের ডেকের বাইরে গেলেই উনি অন্য পুরুষ। দুরন্ত দুর্বার বেপরোয়া। তখন একটুতেই মাথা গরম হয়ে যায়। অতি সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চকিতে লোপ পায় কাণ্ডজ্ঞান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উনি অনুগত এবং সৎ। অন্তরে মায়াদয়ার অভাব হয় না কখনো। সব খবরের সার-খবর এই তথ্যটি জোগাড় করে অ্যাডিলেড-সাদাম্পটন কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল হোমস। একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সামনে। ভেতরে কিন্তু ঢুকল না! গাড়ির মধ্যেই বসে রইল তন্ময় হয়ে। কুঞ্চিত ভ্রূ যুগল আর ললাট রেখায় দেখলাম নিবিড় চিন্তার ছায়া। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছোল সে শেরিং ক্রস টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে। কার নামে একটা খবর পাঠালে সেখান থেকে। সব শেষে, সোজা ফিরে এল বেকার স্ট্রিটের বাসায়।

'না হে ওয়াটসন, পারলাম না,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল হোমস। 'শমন একবার বেরিয়ে গেলে দুনিয়ার আর কারো ক্ষমতা থাকবে না ওকে বাঁচানোর। আমার এ-কর্মজীবনেই আমি দেখেছি, দু-একবার অপরাধী অপরাধ করে যত না ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সত্যিকারের ক্ষতি করেছি ক্রিমিনালকে আবিষ্কার করে। কিন্তু এখন আমি সাবধান হয়ে গেছি। শিখেছি এসব পরিস্থিতিতে কীভাবে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। বিবেককে ছলনার চাইতে বরং ইংলন্ডের আইনকানুনের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলা যাক। চরম ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু জানা দরকার।'

সন্ধে হওয়ার আগেই এসে গেল ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, মোটেই সুবিধা করতে পারছে না বেচারি।

'মি. হোমস, আমার বিশ্বাস নিশ্চয় ভেলকি-টেলকি কিছু জানেন আপনি। মাঝে মাঝে সত্যিই আমি ভাবি, ভোজবাজির যেসব নমুনা দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দেন, তা কখনো মাটির মানুষের থাকতে পারে না। চোরাই রুপোর বাসন যে পুকুরের নীচে আছে তা, আপনি কী করে জানলেন বলুন তো।'

'আমি জানতাম না।'

'কিন্তু আপনিই তো আমায় লিখে পাঠালেন পুকুরের তলাটা পরীক্ষা করে দেখতে?'

'পেয়েছ তাহলে?'

'নিশ্চয়!'

'তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছি জেনে সত্যিই খুব খুশি হলাম।'

'সাহায্য আর করলেন কোথায়! উলটে আরও জটিল করে তুললেন সমস্ত ব্যাপারটাকে। কী ধরনের চোর এরা? এত কাঠ খড় পুড়িয়ে রুপোর বাসন চুরি করার পর চোরাই মাল ফেলে যায় সবচেয়ে কাছের একটা পুকুরের জলে?'

'বাস্তবিকই, বড়ো উৎকট কাণ্ড! দেখে শুনে এদের মাথা-পাগলের দল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। রুপোগুলো যদি নেহাতই ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়ে থাকে এবং বাসনগুলো নেওয়ার কোনো দরকারই থাকে না লোকগুলোর, তাহলে স্বভাবতই চোরাই মাল ঝটপট পাচার করে ফেলে ঝাড়া হাত-পা হওয়ার জন্যেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক তাদের পক্ষে।'

'কিন্তু এ ধরনের ভাবনাই-বা আপনার মাথায় আসছে কেন, তাই তো বুঝলাম না?'

'মনে হল, তাই বললাম। এমনটা হলেও তো হতে পারে। খোলা জানলা গলে বেরিয়ে আসার পরেই সামনে পড়ল পুকুরটা। বরফের মধ্যে ছোট্ট ছ্যাঁদাটি লুব্ধ করে তুলল ওদের। এর চাইতে লুকোনোর ভালো জায়গা পাওয়া কি আর সম্ভব ছিল তখন?'

'লুকোনোর জায়গা— ঠিক বলছেন।' সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে হপকিনস, 'ঠিক, ঠিক! এখন বুঝছি সব! ভোর হয়ে আসছিল, লোকজন বেরিয়ে পড়েছিল পথে! সে সময়ে অত বাসন-কোসন নিয়ে রাস্তায় বেরোনো মানেই লোকের চোখে পড়া। তাই, পুকুরের তলায় গচ্ছিত রেখে গেল ওদের চোরাই মাল। ইচ্ছে ছিল, পরে, সুযোগমতো সরিয়ে নিয়ে যাবে মালগুলো। এক্সেলেন্ট মি. হোমস। আপনার ওই ধোঁকা দেওয়ার থিয়োরির চাইতে আমার থিয়োরি কিন্তু অনেক ভালো।'

'হ্যাঁ, বাস্তবিকই, প্রশংসা করার মতো থিয়োরি তোমার। আমার চিন্তাধারা যে একটু বল্গাছাড়া বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, সে-বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ কিন্তু যতই বিশৃঙ্খল হোক না কেন, ভেবেচিন্তেই যে রুপোগুলো আবিষ্কার করেছি, তা তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না হপকিনস।'

'তা সত্যি, স্যার। সবই তো আপনি করলেন। আমাকে কিন্তু হোঁচট খেতে হয়েছে।'

'হোঁচট খেতে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মি. হোমস। আজ সকালে পুরো র‍্যান্ডাল দলটা ধরা পড়েছে নিউইয়র্কে।'

'সর্বনাশ। তাহলে তোমার থিয়োরিটাই যে বানচাল হয়ে গেল, হপকিনস। ওরাই যে কাল রাতে কেন্টে খুন করে গেছে, এ-ধারণা তবে নস্যাৎ হয়ে গেল।'

'মারাত্মক, মি. হোমস, ওদের এই গ্রেপ্তার সংবাদ মারাত্মক আমার থিয়োরির পক্ষে। খবরটা

পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে আমার থিয়োরি। কিন্তু আশা ছাড়িনি। র‍্যান্ডালরা ছাড়াও তিনজনের দল তো আরও থাকতে পারে। অথবা পুলিশ নাম শোনেনি, এমন কোনো নতুন দলও হতে পারে এরা।'

'ঠিক বলেছ। খুবই সম্ভব তাই। কিন্তু, একী, চললে নাকি?'

'হ্যাঁ, মি. হোমস। এ-ব্যাপারের কিনারা না-করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। দেওয়ার মতো আর কোনো খোঁজখবর আছে নাকি আপনার?'

'একটা তো দিয়েছি।'

'কোনটা?'

'ওই যে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা।'

'কিন্তু কেন, মি. হোমস, কেন?'

'হ্যাঁ, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু এ-সমস্যা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম এবারের মতো। মাথা ঘামিয়ে এই ধোঁয়ার আড়ালে একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলা নিশ্চয় কঠিন কাজ হবে না তোমার পক্ষে। ডিনারের জন্যে থেকে যাবে না? বেশ, গুড-বাই। কাজ কীরকম চলছে জানাতে ভুলো না কিন্তু।'

ডিনার শেষ হল। টেবিলও পরিষ্কার হল। তারপর আবার এই প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করল হোমস। পাইপটা ধরিয়ে নিয়েছিল ও। চটি পরা পা দুটো এগিয়ে দিয়েছিল আগুনের চুল্লির দিকে। আগুনের মিষ্টি তাতের আমেজটুকু মনপ্রাণ দিয়ে আমিও উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালে ও, 'ওয়াটসন, নতুন কিছুর আশা করছি আমি।'

'কখন?'

'এখুনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কী ভাবছ? স্ট্যানলি হপকিনসের সঙ্গে বড়ো খারাপ ব্যবহার করলাম?'

'তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা আছে আমার।'

'খুবই সংগত উত্তর, ওয়াটসন। দেখ আমি যা জানি, তা বেসরকারি। আর ও যা জানে, তা সরকারি। ব্যক্তিগত ন্যায়বিচারের অধিকার আমার আছে, কিন্তু তার নেই। সে যা জানে, তার প্রতিটি অক্ষর প্রকাশ করতে সে বাধ্য, তা না হলে কর্মকর্তার কাছে সে বিশ্বাসঘাতক। এ ধরনের দ্বিধাযুক্ত ব্যাপারে তাকে আমি অযথা কষ্ট দিতে চাই না। তাই, কেসটা সম্পর্কে আমার নিজের মন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমার তথ্য আমার কাছেই রেখে দিতে চাই।'

'কিন্তু কতক্ষণ? কেসটা পরিষ্কার হবে কখন?'

'সময় হয়ে গেছে। ছোটোখাটো কিন্তু আশ্চর্য একটা নাটকের দৃশ্যে এবার তোমায় হাজির থাকতে হবে ওয়াটসন।'

সিঁড়ির ওপর কীসের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই, দরজা খুলে ধরলেন মিসেস হাডসন এবং খোলা দরজার ভিতর দিয়ে যিনি ঢুকলেন, তাঁর মতো ব্যক্তিত্বময় নিখুঁত পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তি এ-ঘরের চৌকাঠ আর কোনোদিন পেরোয়নি। ভদ্রলোকের চেহারা বেজায় লম্বা। বয়সে যুবক। সোনালি রঙের গোঁফ। নীল নীল চোখ। নিরক্ষীয় অঞ্চলের কড়া রোদে গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। হালকা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, অতবড়ো দেহটা শুধু বলশালীই নয়, রীতিমতো ক্ষিপ্র। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন উনি। তারপর

ফিরে দাঁড়ালেন আমাদের দিকে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত আর ঘন নিশ্বাসে উথালিপাথালি বুক দেখে মনে হল যে কোনো এক প্রবল আবেগ অভিভূত করে ফেলার চেষ্টা করছে ওঁকে। কিন্তু উনি তা দাবিয়ে রাখছেন প্রাণপণ শক্তিতে।

'বসুন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?'

হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। তারপর জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আমাদের দুজনের পানে।

'টেলিগ্রাম পেয়েছি। যে সময়ে আসতে বলেছিলেন, সেই সময়তেই এসেছি। শুনলাম, অফিসেও গিয়েছিলেন আপনি। দেখছি, রেহাই নেই আপনার হাত থেকে। খারাপ খবর যদি কিছু থাকে, বলুন! আমি সব শুনছি। কী করতে চান আপনি আমায় নিয়ে? গ্রেপ্তার? বলুন, বলুন! চুপচাপ বসে আপনি যে আমার সঙ্গে ইঁদুর-বেড়ালের খেলা খেলবেন, তা আমি হতে দেব না।'

হোমস বললে, 'ওঁকে একটা সিগার দাও, ওয়াটসন। কামড়ে নিন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। নার্ভাস হয়ে যাবেন না। একটা কথা শুনে রাখুন— আপনাকে যদি সাধারণ ক্রিমিনাল বলে ভাবতাম, তাহলে একসঙ্গে বসে কখনো ধূমপান করতাম না। খোলাখুলি কথা বলুন। আপনার ভালো করব। চালাকি করতে গেলেই শেষ করে ফেলব।'

'কী করতে বলেন আমাকে?'

'সত্যি বলতে বলি। গতরাতে অ্যাবি-গ্র্যাঞ্জ-এ যা যা ঘটেছে, তার অবিকল বিবরণ শোনাতে বলি। মনে রাখবেন, যা বলবেন, তা সত্য হওয়া চাই। একটা অক্ষরও নড়চড় হলে চলবে না। একটা শব্দও জুড়তে পারবেন না, বাদ দিতে পারবেন না। এ-ব্যাপারে আমি এত বেশি জেনে ফেলেছি যে, আপনি যদি সোজা পথ ছেড়ে এক ইঞ্চিও বেঁকে যান, তাহলেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাজাব এই পুলিশ হুইসল এবং চিরকালের মতো আমার আওতার বাইরে চলে যাবে এ-কেস।'

মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন। তারপরে, রোদে পোড়া ভারী হাতে সশব্দে সজোরে পায়ের ওপর এক ঘুসি মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন জোর গলায়, 'দেখা যাক কপাল ঠুকে। আশা করি, আপনার কথার দাম আছে। তার ওপরে, আপনি সাদা চামড়ার মানুষ। সমস্ত কাহিনিটা আপনাকে আমি বলছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি, কথাটা আমার প্রসঙ্গে। নিজের সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না, কারো পরোয়াও করি না। কৃতকর্মের জন্যে তিলমাত্র অনুশোচনা আমার নেই। যা করেছি, তার জন্যে আমি গর্বিত। সুযোগ পেলে আবার তা করতে মুহূর্তের জন্যেও কুণ্ঠাবোধ করব না। অভিসম্পাত দিন ওই জানোয়ারটাকে। বেড়ালের মতো মরেও যদি সে না মরে— তবে প্রতিবার ওকে নিকেশ করতে পেছপা হব না। আমার কিন্তু যত ভাবনা লেডির জন্যে। মেরি— মেরি ফ্রেজার। ওর ওই অভিশপ্ত নাম ধরে কোনোদিনই ওকে আমি ডাকতে পারব না। অথচ ওর ওই মিষ্টি মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। তাই যখনই ভাবি, কতকগুলো অবাঞ্ছিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চলেছে ও— বুক ভেঙে যায় আমার। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু— কিন্তু এ ছাড়া আর কীই-বা করার ছিল আমার? আগে আপনাদের শোনাই আমার কাহিনি। সব শোনার পর আপনারাই বলবেন, এর চাইতে নির্দোষ আর কিছু করণীয় আমার ছিল কি না।

'একটু পিছিয়ে যেতে হবে আমায়। আপনি তো সবই জানেন বলেই মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা রক অব জিব্রাল্টারে। আশা করি, এ-খবরও রাখেন। সে-জাহাজে মেরি ছিল প্যাসেঞ্জার। আর আমি ফার্স্ট অফিসার। প্রথম আলাপেই ভালোবেসেছিলাম। সেই দিনটি থেকে আমার মনের আকাশ জুড়ে ওকে ছাড়া আর কোনো নারীকে আমি দেখিনি। ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে প্রতিদিন তাকে দেখেছি। যতবার দেখেছি, ততবারই যেন আরও গভীরভাবে ভালোবেসেছি। তার ফুল-কোমল চরণ ডেকের যে যে অংশ মাড়িয়ে যেত দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে ডিউটিতে থাকার সময়ে কতবার হাঁটু গেড়ে বসে চুম্বন করেছি ডেকের সেইসব বিশেষ অংশ। বিয়ের প্রসঙ্গ কোনোদিনই ওঠেনি। পুরুষ হিসেবে নারীর কাছ থেকে যেরকমটি মার্জিত ব্যবহার আশা করা যায়, তার কাছ থেকে তাই পেয়েছিলাম। এ-সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই আমার। প্রেম ছিল শুধু আমার দিকেই। আর, তার দিকে ছিল শুধু নিকষিত নির্মল বন্ধুত্ব আর মধুর সাহচর্য। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর, আগের মতোই ও রইল স্বাধীন, বন্ধনহীন। আমি কিন্তু পারলাম না, পারলাম না মনের দিগন্তকে মুক্তির রঙে রাঙিয়ে নিতে।

'পরের বার সাগর থেকে ফিরে আসার পর পেলাম তার বিয়ের সংবাদ। মনের মতো মানুষকে বিয়ে করেছে সে। আর কেনই-বা করবে না? তার মতো মেয়েকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে উপাধি আর অর্থের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বাহন আর আছে কি? যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম, তাদের জন্যেই তো ওর জন্ম। তাই ওর বিয়ের খবর শুনে অযথা কষ্ট দিলাম না মনকে। ও-রকম স্বার্থপর আমি নই। সৌভাগ্যের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে ওর জীবনে। তাই তো সে কপর্দকহীন নাবিকের জীবনে নিজেকে জড়িয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করেনি। এইসব ভেবে আনন্দে ভরে উঠল আমার অন্তর। এমনিভাবেই ভালোবেসেছিলাম আমি মেরি ফ্রেজারকে।

'তার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, তা কিন্তু ভাবিনি। গতবার সাগর পাড়ি দেওয়ার পর পদোন্নতি হল আমার। নতুন জাহাজ তখনও পর্যন্ত না-পৌঁছোনোয় সিডেনহ্যামে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে কয়েক মাসের জন্যে রইলাম আমি। একদিন একটা গলির মধ্যে দেখা হয়ে গেল মেরির বুড়ি পরিচারিকা থেরেসার সঙ্গে। সব কথাই বলল সে। মেরির কথা, তার স্বামীর কথা। কিছুই বাদ গেল না। সব শোনার পর আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মাতাল কুকুর কোথাকার! যে নারীর জুতোর ফিতে বাঁধার যোগ্যতা তার নেই, তারই গায়ে কিনা যখন-তখন সে হাত তোলে! আবার দেখা হল থেরেসার সঙ্গে। তারপর, দেখা করলাম স্বয়ং মেরির সাথে— একবার নয়, পরপর দু-বার। অবশ্য তারপর আর দেখা করতে চাইলে না মেরি। সেদিন নোটিশ পেলাম কোম্পানির, হপ্তাখানেকের মধ্যে আবার পাড়ি দিতে হবে সাগরের বুকে। নোটিশ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেনতেনপ্রকারেণ রওনা হওয়ার আগে তাকে অন্তত একবার দেখা দিয়ে যেতে হবে। প্রথম থেকেই থেরেসার সঙ্গে আমার সদ্ভাব। মেরিকে ও ভালোবাসত। আর, আমার মতোই মনেপ্রাণে ঘৃণা করত ওই পিশাচটাকে। বাড়ির কোথায় কী আছে জেনেছিলাম ওরই মুখে। নীচের তলায় ছোট্ট ঘরটায় বসে পড়াশুনা করত মেরি। গতরাতে গুঁড়ি মেরে গিয়ে আঁচড় কাটলাম জানলায়। প্রথম তো জানলাই খুলতে চাইল না ও। কিন্তু আমি জানতাম, মুখে যাই বলুক না কেন, অন্তরে সে সত্যিই ভালোবাসতে শুরু করেছে আমায়। তাই, ওই তুষারঝরা রাতে আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফিসফিস করে আমাকে সামনের বড়ো জানলাটার

নীচে আসতে বলল ও। জানলা খোলা পেয়ে ঢুকলাম খাওয়ার ঘরে। আবার ওর মুখে শুনলাম সেই কাহিনি। আবার ফুটে উঠল আমার রক্ত। যে-পশু আমার প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে এতখানি দুর্ব্যবহার করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে শাপশাপান্ত বর্ষণ করলাম প্রচুর। জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনে— ঈশ্বর সাক্ষী আছেন, কোনোরকম অশোভন আচরণ আমরা করিনি। ঠিক এমনি সময়ে উন্মত্তের মতো তিরবেগে ঘরে ঢুকল ওর স্বামী। ঢুকেই এমন একটা কুৎসিত গালি দিলে মেরিকে, যা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। পরমুহূর্তেই হাতের লাঠিটা দিয়ে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে ওর মুখের ওপর। এক লাফে চুল্লির সামনে গিয়ে তুলে নিলাম চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা। শুরু হল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। হাতটা দেখুন, এইখানেই আমায় প্রথম চোট দেয় ও। তারপর এল আমার পালা। ডান্ডাটা মনে হল যেন পচা লাউয়ের মধ্যে বসে গেল। ভাবছেন বুঝি আমি দুঃখিত? না, মশাই, না! মরণ-বাঁচন যুদ্ধ তখন, দুজনের একজনকে মরতে হতই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা কি জানেন, এ মরণ-বাঁচন শুধু আমাদের দুজনের নয়। ওদের দুজনের বেলাও প্রযোজ্য। কেননা ওই উন্মাদ লোকটার খপ্পরে মেরিকে ফেলে আসা আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল কি? তাই, ওকে খুন করেছি আমি। ভুল হয়েছে আমার? এ-রকম পরিস্থিতিতে আপনাদের দুজনের একজনও যদি থাকতেন তাহলে এ ছাড়া আর কী করতেন বলতে পারেন?

'ছড়ি দিয়ে মারার সময়ে আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মেরি, তাই শুনেই ওপরের ঘর থেকে বুড়ি থেরেসা নেমে এসেছিল। এক বোতল মদ ছিল সাইডবোর্ডে। বোতল খুলে একটু ঢেলে দিলাম মেরির ঠোঁটে। শক পেয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল বেচারি। নিজেও এক ঢোক খেলাম। থেরেসা কিন্তু আগাগোড়া বরফের মতো ঠান্ডা। প্লটটা শুধু আমার নয়, তারও বটে। ঠিক করলাম, এমনভাবে দৃশ্যটাকে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে দেখলে মনে হয় একদল চোরের কাজ। গল্পটা বার বার মেরিকে শোনাতে লাগল থেরেসা। ইতিমধ্যে, আমি ফায়ার প্লেসের ওপর উঠে দড়িটা কেটে নামিয়ে আনলাম। তারপর ওকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দড়ির কাটা দিকটায় শুঁয়ো বার করে দিলাম ছুরি দিয়ে। এ না-করলে ছুরি দিয়ে কাটা দড়ি দেখলেই টনক নড়বে পুলিশের। এত কসরত করে ওপরে উঠে দড়ি কেটে আনে, না-জানি সে কী ধরনের চোর। তারপর জড়ো করলাম কতকগুলো রুপোর বাসনপত্র। লোকে দেখলে যেন ভাবে নিছক চুরি করতেই এসেছিল খুনিরা। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলাম মিনিট পনেরো বাদে যেন শোরগোল তোলে ওরা। ততক্ষণে নাগালের বাইরে চলে যাব আমি। রুপোর বাসনগুলো জলে ফেলে দিয়ে রওনা হলাম সিডেনহ্যামের দিকে। মনে আমার এতটুকু গ্লানি ছিল না। শুধু অনাবিল আনন্দ। জীবনের অন্তত একটা রাতকে সত্যিকারের সৎ কাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পেরেছি। মি. হোমস, সত্য শুনতে চেয়েছিলেন, সত্যই বললাম। এক বর্ণ মিথ্যে নেই, খাদ নেই, অতিরঞ্জন নেই। জানি না, এ-সত্যের মূল্য আমার গর্দান দিয়ে দিতে হবে কি না। কপালে যাই থাকুক, অকপটে সবই বললাম আপনাকে।'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করল হোমস। তারপর উঠে দাঁড়াল। ঘরের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে করমর্দন করল ক্যাপ্টেন ক্রোকারের সাথে।

বলল, 'এইরকমটাই ভেবেছিলাম আমি। জানি, আপনার কাহিনির প্রতিটি বর্ণ সত্য। কেননা, আমি যা জানি না, সে-রকম কথা আপনি বিশেষ কিছু বলেননি। ব্যায়ামবিদ বা নাবিক ছাড়া

ব্র্যাকেটের ওপর উঠে ঘণ্টার দড়িতে যে-গিঁট দেখেছি, সে-গিঁটও নাবিক ছাড়া আর কারো পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব নয়। জীবনে একবারই নাবিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং তা সাগর পাড়ি দেওয়ার সময়ে। জীবনের যে-স্তরে উনি মানুষ, এই নাবিকটিও সেই স্তরের। খুনিকে আড়াল করার ওঁর প্রয়াস থেকেই জেনেছি এই তথ্যটি। আরও জেনেছি, তাঁকে উনি ভালোবাসেন। সঠিক সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করতে পেরেছিলাম বলেই তো এত সহজে আপনার নাগাল পেয়েছি, ক্যাপ্টেন।'

'আমি ভেবেছিলাম পুলিশ কোনোদিনই আমাদের ফাঁকি ধরে উঠতে পারবে না।'

'এবং পারেওনি। আমার যতদূর বিশ্বাস পারবেও না। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিষয় আপনার সামনেই স্বীকার করছি আমি। চরম আক্রমণের সম্মুখীন হলে যেকোনো পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক আপনিও তাই করছেন। নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে আপনি যা করেছেন, তা যে আইনানুগ নয়, এমন রায়ও কেউ দেবে বলে মনে হয় না আমার। যাইহোক, এ নিয়ে মাথা ঘামাবে ব্রিটিশ জুরিরা। ইতিমধ্যে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আপনার ওপর সহানুভূতি এতই গভীর যে আপনি যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, তাহলে আপনার পিছু ধাওয়া করবে না।'

'আর তারপরেই সব প্রকাশ পাবে?'

'নিশ্চয়। সবই প্রকাশ পাবে।'

রাগে রক্তিম হয়ে ওঠেন ক্যাপ্টেন, 'এ কী ধরনের প্রস্তাব? এ-প্রস্তাব কি কোনো পুরুষের কাছে করা চলে? আইন আমি যতটুকু জানি, তাতে অন্তত এইটুকু বুঝি যে, বিচার চলার সময়ে মেরিকেও দুষ্কর্মের সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য করা হবে। আপনি কি ভাবেন তাকে এই বিষম বিপদের মধ্যে একলা ফেলে রেখে আমি বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে মজা দেখব আড়াল থেকে? ওরা যা করতে চায়, আমাকে নিয়ে করুক। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, মি. হোমস এমন একটা উপায় বাতলান যাতে বেচারি মেরিকে আদালতের জাঁতাকলে না পড়তে হয়।'

দ্বিতীয়বার ক্যাপ্টেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হোমস।

'যাচাই করে দেখছিলাম আপনাকে, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। প্রতিবারেই দেখছি, আপনি নিখাদ সোনা। যাক, এ বড়ো গুরুদায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমায়। কিন্তু হপকিনসকে একটা চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছি। সে যদি তার যথাযথ ব্যবহার না করতে পারে, আমার কিছু করার নেই। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, যা করতে চাই তা আইনমাফিক হোক। আপনি আসামি। ওয়াটসন, তুমি ব্রিটিশ জুরি। ব্রিটিশ জুরি হওয়ার মতো তোমার চাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না আমার। আমি বিচারপতি। এবার শুরু হোক। জুরি মহোদয়গণ, এজাহার আপনারা শুনলেন। আসামি দোষী না নির্দোষ?'

'নির্দোষ, মাই লর্ড', বললাম আমি।

'জনগণের ইচ্ছাই ঈশ্বরের বাণী[৭]। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, আপনি মুক্ত। আইনের কবলে আর কোনো নিরপরাধ না-পড়া পর্যন্ত আমার কাছে আপনি নিরাপদ। বছরখানেকের মধ্যেই ফিরে আসুন লেডির কাছে। আজকের রাতে ন্যায়বিচারের[৮] পর যে রায় আমরা দিলাম, তার মর্যাদা প্রমাণ করুন আপনার এবং তাঁর মিলিত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে।'

টীকা

১. **তিন গেলাসের রহস্য :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ' সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৪-এর কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ, মার্শহ্যাম :** চিস্‌লহার্স্ট-এর কাছাকাছি অ্যাবি উড নামে একটি ছোটো গ্রাম আছে। এর দূরত্ব লন্ডন থেকে কমবেশি এগারো মাইল। আবার নরফোকে আছে মার্শহ্যাম নামের একটি গ্রাম।

৩. **লিখব মাই ডিয়ার ওয়াটসন, লিখব :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যাঁশড সোলজার' এবং 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য লায়ন্স মেন'— এই দুটি গল্প লিখেছিলেন শার্লক হোমস নিজে। কিন্তু দু-বারই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তাঁর লিখনশৈলি ওয়াটসনের লেখার মতো জনপ্রিয় নাও হতে পারে।

৪. **বিয়ের বাঁধনে বাঁধা থাকতে হয় :** ১৮৫৭ সালে ডিভোর্স অ্যান্ড ম্যাট্রিমনিয়াল কজেস অ্যাক্ট পাশ হলেও, হোমসের সমকালে আধুনিক যুগের মতো সহজে ডিভোর্স পাওয়া সম্ভব ছিল না।

৫. **যে সর পড়ে :** 'পোর্ট' বা ওই ধরনের মদ পুরোনো হলে তাতে একটা সর পড়ে। যারা পোর্ট বা তদনুরূপ মদ পছন্দ করেন তারা বোতল ঝাঁকিয়ে বা উলটো করে ধরে সরটিকে ভাঙতে চান না। তবে অ্যাবি গ্র্যাঞ্জের খাওয়ার ঘরে রাখা বোতলটিতে কী-জাতের মদ ছিল, ওয়াটসন তা জানাননি।

৬. **'মারেনগো' :** ওয়াটারলু-র যুদ্ধ ফরাসি জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ। ইংরেজ বাহিনির সঙ্গে ফরাসিদের এই যুদ্ধে ইংলন্ডের সেনাপতি ছিলেন লর্ড নেলসন। মারেনগোর যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন অস্ট্রিয়ান জেনারেল মাইকেল ফ্রিডরিশ ভন মেলাস। উত্তর ইতালির পিয়েডমন্টের কাছে অবস্থিত মারেনগো গ্রামের এই যুদ্ধে প্রথম চোটে ফরাসিদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন মেলাস। কিন্তু তারপর তিনি নিজের বাহিনীর ভার এক অধস্তন অফিসারের হাতে দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে এগিয়ে যান। সেই সময়ে ফরাসি বাহিনী জেনারেল লুই দিশে-র অধিনায়কত্বে প্রতিআক্রমণ করলে অস্ট্রিয়ান সৈন্যদল পর্যুদস্ত হয়ে যায়। মারেনগোর যুদ্ধে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও, নেপোলিয়ন এটিকে একটি স্মরণীয় যুদ্ধ জয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

৭. **জনগণের ইচ্ছাই ঈশ্বরের বাণী :** 'The voice of the people is the voice of the God'. বলেছিলেন দ্বাদশ শতকের উইলিয়াম অব ম্যাম্‌সবেরি।

৮. **ন্যায়বিচার :** ১৮৯৭-এর ঘটনা ১৯০৪-এ প্রকাশ করলেন ওয়াটসন। তখনও কিন্তু ক্রকার, লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং থেরেসা প্রত্যেকেই স্যার অস্টেসকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হতে পারত। শুধু তাই নয়, দোষী সাব্যস্ত হতে পারতেন শার্লক হোমস-ও, ঘটনার পর খুনিকে পালাতে সাহায্য করবার জন্য।

কার্পেটের কারচুপি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন]

কোন বছর তা বলব না। এমনকী সেযুগটারও কোনো নামকরণ করব না। শরৎকালে এক মঙ্গলবারের সকালে বেকার স্ট্রিটে আমাদের দীনহীন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ইউরোপবিখ্যাত দুজন পুরুষ। একজন তপঃকৃশ চেহারা, উন্নত নাক, ইগল পাখির মতো চোখ এবং সব মিলিয়ে ক্ষমতাবান পুরুষের মতো প্রভুত্বময় মূর্তি। দু-দু-বার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি, ইনি সেই স্বনামধন্য লর্ড বেলিনগার[২]। আর একজনের বর্ণ মলিন, মুখের গঠন নিখুঁত, সুষ্ঠু, সুন্দর, পরিপাটি চেহারা। টেনেটুনে তাঁকে মধ্যবয়সিও বলা যায় না। দেহ এবং মনের স্বভাব-দত্ত সর্ববিধ গুণসম্পন্ন এই পুরুষটিই রাইট অনারেবল ট্রেলাওনি হোপ—যিনি ইউরোপ

সংক্রান্ত দপ্তরের সেক্রেটারি এবং দেশের উদীয়মান রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁর স্থান সবার আগে। কাগজপত্র ছড়ানো সেট্টির ওপর পাশাপাশি বসলেন দুজনে। ওঁদের শ্রান্ত শুকনো আর উদ্‌বেগে-আঁকা মুখ দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, রীতিমতো জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে দুজনকে সশরীরে আসতে হয়েছে আমাদের আস্তানায়। নীল-নীল শির-বার-করা পাতলা হাতে ছাতার হাতির দাঁতের বাঁটটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীমশায়। আর বিষাদ-মাখা তপঃকৃশ কঠোর মুখে ক্রমান্বয়ে তাকাচ্ছিলেন আমার আর হোমসের পানে। নার্ভাস হয়ে নিজের গোঁফ ধরে টানাটানি করছিলেন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারি আর চঞ্চল আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন ঘড়ির চেনের সিলমোহরগুলো।

'মি. হোমস, আজ সকালে আটটার সময় চুরিটা আবিষ্কার করার সঙ্গেসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীমশায়কে খবর দিই আমি। তাঁরই প্রস্তাবমতো দুজনে এসেছি আপনার কাছে।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না, মশায়।' চট করে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনভাবে বললেন যেন তাঁর কথাই চূড়ান্ত, তারপর আর কিছু বলার নেই। কথা বলার এই দুটি বিশেষ ভঙ্গিমার জন্যে সুনাম আছে তাঁর। 'আমরা জানাইনি এবং জানানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। পুলিশকে জানানো মানেই, দু-দিন বাদে জনসাধারণকে জানানো। ঠিক এই জিনিসটাই আমরা এড়িয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু কেন, স্যার?'

'কেননা যে-দলিল সম্পর্কে আমরা এসেছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনই বিরাট তার গুরুত্ব যে, একবার যদি প্রকাশ পায়, তাহলে অতি সহজে চরমতম মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে সারা ইউরোপে এবং আরও জটিল হয়ে উঠবে তার বর্তমান পরিস্থিতি। আমি আবার বলছি, এ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশি। বেশি কী, এ-ব্যাপারের ওপর শান্তি অথবা যুদ্ধ নির্ভর করছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। রীতিমতো গোপনতার সাথে এ-দলিল উদ্ধারের চেষ্টা না-করলে, কোনোদিনই তা উদ্ধার করা যাবে না। কেননা এ-জিনিস যারা নিয়েছে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়া।'

'বুঝলাম। মি. ট্রেলাওনি হোপ, কীরকম পরিস্থিতির মধ্যে ও-দলিলটি অদৃশ্য হয়েছে, তা যদি হুবহু বলেন তো বাস্তবিকই উপকার হয় আমার।'

'অল্প কয়েকটি কথা দিয়েই তা বলা যায়, মি. হোমস। চিঠিটা—দলিলটা আসলে এক বিদেশি রাজার একটা চিঠি—পেয়েছিলাম ছ-দিন আগে। চিঠিটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনোদিনই আমার আয়রন সেফে তা রেখে যাওয়া নিরাপদ মনে করিনি। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গে করে এনেছি হোয়াইট হল টেরেসে আমার বাড়িতে। চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ডেসপ্যাচ বাক্স আছে আমার শোবার ঘরে। এই ডেসপ্যাচ-বাক্সেই চাবি দিয়ে রেখে দিতাম চিঠিটাকে। গতরাত্রে এই বাক্সতেই ছিল চিঠিটা। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ডিনারের পোশাক পরার সময়ে বাক্সটা খুলেছিলাম, চিঠিটাকেও ভেতরে দেখেছিলাম। আজ সকালে দেখি তা উধাও হয়েছে। আমার ড্রেসিং টেবিল আয়নার পাশেই সারারাত ছিল ডেসপ্যাচ-বাক্সটা। আমার ঘুম পাতলা, আমার স্ত্রীর-ও তাই। আমরা দুজনেই শপথ করে বলতে রাজি আছি, সারারাত ঘরের মধ্যে তৃতীয় কোনো প্রাণী ঢোকেনি। তা সত্ত্বেও আবার আমি বলছি, চিঠিটা উধাও হয়েছে বাক্সের ভেতর থেকে।'

'ডিনার খেয়েছিলেন কখন?'

'সাড়ে সাতটায়।'

'শুতে গিয়েছিলেন কখন?'

'থিয়েটারে গেছিলেন আমার স্ত্রী। তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলাম কিছুক্ষণ। সাড়ে এগারোটায় আমরা শুতে গেছিলাম।'

'তাহলে পুরো চার ঘণ্টা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল ডেসপ্যাচ-বাক্সটা?'

'সকালে বাড়ির পরিচারিকা, আর সারাদিনে আমার খিদমতগার অথবা আমার স্ত্রীর পরিচারিকা ছাড়া আর কাউকে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। এরা প্রত্যেকেই খুব বিশ্বাসী এবং বেশ কিছুদিন ধরে রয়েছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, ওদের মধ্যে কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে, দপ্তরের সাধারণ কাগজপত্র ছাড়া আরও বেশি মূল্যবান দলিল থাকতে পারে আমার ডেসপ্যাচ-বাক্সে।'

'চিঠিটার অস্তিত্ব কে কে জেনেছিল?'

'বাড়ির মধ্যে কেউ নয়।'

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জেনেছেন?'

'না মশায়। আজ সকালে কাগজটা খোয়া যাওয়ার আগে পর্যন্ত স্ত্রীকে কিছুই বলিনি আমি।'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

বললেন, 'জনসাধারণের কাজে তোমার কর্তব্যবোধ যে কতখানি প্রখর, অনেকদিন ধরেই আমি তা জানি, হোপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন যতই নিবিড় আর মধুর হোক না কেন, সব কিছুর ওপরে স্থান দেওয়া উচিত এ-জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যসম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা।'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন ইউরোপীয় সেক্রেটারি।

বললেন, 'আমার ন্যায্য পাওনাটুকুই শুধু আমায় দেবেন, স্যার। মি. হোমস, আজ সকালের আগে এ-ব্যাপার সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি আমার স্ত্রীর কাছে।'

'উনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কি?'

'না, মি. হোমস। উনি তো পারেনইনি,—আর কারো পক্ষেও সম্ভব ছিল না অনুমান করার।'

'এর আগে আপনার কোনো দলিল খোয়া গেছিল?'

'না মশায়।'

'এ-চিঠির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কে কে খবর রাখেন সারা ইংলন্ডে?'

'ক্যাবিনেটের প্রত্যেক মেম্বাররা জানেন। গতকালই এ-খবর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। ক্যাবিনেট-মিটিংয়ে যাঁরা যোগদান করেন, তাদের প্রত্যেককেই গুহ্যতত্ত্ব গোপন রাখার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার করতে হয়। এ-অঙ্গীকারের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রধানমন্ত্রীমশায়ের দেওয়া গুরুগম্ভীর হুঁশিয়ারিতে। হায় রে! তখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি নিজেই খুইয়ে বসব এ-জিনিস!' প্রবল নিরাশায় দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। দু-হাতে চুল ধরে টানতে লাগলেন উনি। মুহূর্তের জন্য এক ঝলকে দেখে নিলাম আমরা আসল মানুষটিকে—উদগ্র আবেগ, আতীব্র আর আতীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে ঘেরা একটি স্বাভাবিক মানুষকে।

পরের মুহূর্তেই ফিরে এল তাঁর আভিজাত্য-আঁকা মুখোশ আর ধীরগম্ভীর স্বর। 'ক্যাবিনেটের মেম্বাররা ছাড়া এ-সম্বন্ধে জানেন দপ্তরের দুজন, কি খুব সম্ভব তিনজন অফিসার। ইংলন্ডে আর কেউই জানে না, মি. হোমস। এ-বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি।'

'কিন্তু সাগরের ওপারে?'

'আমার বিশ্বাস, এ-চিঠি যিনি লিখেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউই এটা দেখেননি। আমার দৃঢ় ধারণা, মিনিস্টারদের মানে, অফিসের কাউকেই এ-কাজের ভার তিনি দেননি।'

অল্পক্ষণের জন্য কথাগুলো মনে মনে তোলপাড় করে নিল হোমস।

তারপর বললে, 'এবার, স্যার, আরও বিশদভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এ-দলিলটি কীসের এবং এর অন্তর্ধানে পরিণামই-বা এত গুরুতর হবে কেন, তা আমার জানা দরকার।'

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন দুই রাজনীতিবিদ। তারপর, ঝাঁকড়া ভুরু কুঁচকে ভ্রূকুটি করলেন প্রধানমন্ত্রী।

'মি. হোমস, লেফাফাটা লম্বা আর পাতলা। ম্যাড়মেড়ে নীল রং, গুঁড়িমারা একটা সিংহের ছাপ আছে লাল গালার সিলমোহরের ওপর। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে গোটা গোটা, বলিষ্ঠ অক্ষরে—'

হোমস বাধা দিয়ে বললে, 'এসব খুঁটিনাটি যতই চিত্তাকর্ষক আর প্রয়োজনীয় হোক না কেন, সব কিছুরই একদম গোড়ায় পৌঁছোতে চায় আমার তদন্তধারা। চিঠিটা কীসের?'

'সেটা একটা রাষ্ট্রিক গুহ্যতত্ত্ব এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ! এ-প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে পারব না এবং এ-তথ্যের প্রয়োজন আছে বলেও মনে হচ্ছে না আমার। যেসব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় আপনার এত সুনাম, তার সাহায্যে আমার বর্ণনামতো লেফাফা এবং তার মধ্যেকার কাগজপত্র যদি উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলেই জানবেন, আপনার স্বদেশের একটা যথার্থ উপকার আপনি করলেন। আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, একটি পুরস্কারও অর্জন করবেন আপনি।"

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস।

বললে, 'এদেশের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত পুরুষদের মধ্যে আপনারা দুজনেও আছেন। আর, দীনহীন হলেও বহুজনেই দেখা করতে আসে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি, এ-ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব না। এ-সাক্ষাৎকার আর টেনে নিয়ে গেলেও শুধু সময় নষ্টই সার হবে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। কোটরে-বসা দুই চোখে দপ করে জ্বলে উঠল চকিত ভয়ংকর দীপ্তি। এ-চোখের সামনে কতবার কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে গোটা ক্যাবিনেটটা। 'এসব আমি বরদাস্ত করি না' বলেই, প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন তাঁর ক্রোধ। আবার বসে পড়লেন সেট্টির ওপর। মিনিটখানেক কি তারও বেশি হবে চুপচাপ বসে রইলাম সবাই। তারপর দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ, 'আপনার শর্তই মেনে নেওয়া উচিত, মি. হোমস। নিঃসন্দেহে খাঁটি কথাই বলেছেন আপনি। আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আওতায় আপনাকে না-আনা পর্যন্ত আপনার পক্ষে তৎপর হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়।'

'আমি আপনার সাথে একমত, স্যার', বললেন কনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

'আপনার এবং আপনার সহকর্মী, ড. ওয়াটসনের সততার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সবই আমি বলব। আপনাদের স্বদেশপ্রেমের ওপর আস্থা রাখছি আমি। এ-ব্যাপার একবার প্রকাশ পেলে যে চরমতম দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে এদেশের শিরে, তার চেয়ে বেশি আর কিছু আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না।'

'নিশ্চিন্ত মনে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন আপনি।'

'চিঠিটা এসেছে একজন বিদেশি রাজার কাছ থেকে। সম্প্রতি এদেশের উপনিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিস্থিতিতে বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন উনি। চিঠিটা লেখা হয়েছে তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের দায়িত্বে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এ-ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর মিনিস্টাররাও কিছু জানেন না। চিঠিটা কিন্তু লেখা হয়েছে এমন ভঙ্গিমায়, বিশেষ করে এর কয়েকটি কথা এমনই আক্রমণাত্মক যে এ-চিঠি একবার কাগজে ছাপা হয়ে গেলেই অত্যন্ত বিপজ্জনক মনোভাবের সৃষ্টি হবে এদেশে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই আমার। ফলাফলটা এমনই গেঁজে উঠবে যে, কোনোরকম দ্বিধা না-করেই বলছি, এ-চিঠি প্রকাশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশ।'

একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলে হোমস।

'এগজ্যাক্টলি? ইনিই বটে[৩]। এবং এইটাই সেই চিঠি যার পরিণাম হয়তো কোটি কোটি মুদ্রার ব্যয় আর লক্ষ লক্ষ জীবনের হানি। এই চিঠিটাই হারিয়েছি।'

'চিঠি যিনি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, জানিয়েছি। গোপন হরফে লেখা একটি সংকেত-টেলিগ্রাম চলে গেছে তাঁর কাছে।'

'উনি হয়তো চান চিঠিটা ছাপা হোক।'

'না মশায়, না। কাজটা যে মাথা গরম হয়ে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় অত্যন্ত অবিবেচকের মতো করে ফেলেছেন, তা যে এর মধ্যেই উনি বুঝতে পেরেছেন, তা বিশ্বাস করার মতো জোরালো কারণ আমাদের আছে। এ-চিঠি প্রকাশ পেলে আমরা যে-চোট পাব, তার চাইতেও প্রচণ্ড আঘাত গিয়ে পড়বে ওঁর নিজের দেশের ওপর।'

'তাই যদি হয়, তাহলে বলুন তো এ-চিঠি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাক, এ-রকম আগ্রহ কার থাকতে পারে? এ-জিনিস লোপাট করা বা ছাপানোর অভিসন্ধিই যদি কারো মনে জেগে থাকে, তবে তার মূল কারণটাই-বা কী[৪]?'

'মি. হোমস, তাহলেই তো আমাকে বেজায় উঁচুদরের আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক্তিয়ারে এনে ফেললেন। ইউরোপীয় পরিস্থিতি যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন, তাহলেই কিন্তু মোটিভ অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না আপনাকে। সারা ইউরোপটা এখন একটা সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জাতির একটা জোট আছে—সামরিক শক্তির মোটামুটি সমতা রক্ষা করছে এরাই। পাল্লা ধরে বসে রয়েছে গ্রেট ব্রিটেনে। এই দুই রাষ্ট্রের একটির সঙ্গে যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় গ্রেট ব্রিটেন, তাহলেই জোটের অপর রাষ্ট্রটির পরম প্রাধান্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তারা যুদ্ধে যোগদান করলেই-বা কী, না-করলেই-বা কী। বুঝেছেন তো?'

'জলের মতো। তাহলে এই রাজ্যের শত্রুরাই চাইছে চিঠিটা সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিতে—যাতে করে তাঁদের দেশ আর আমাদের দেশের মধ্যে ফাটল ধরে। এই তো?'

'ইউরোপের যেকোনো বড়ো চ্যান্সেলারিতে অর্থাৎ এমব্যাসি-সংলগ্ন অফিসে পাঠিয়ে দিলেই হল। এই মুহূর্তে চিঠিটা খুব সম্ভব এইরকম কোনো চ্যান্সেলারির দিকে ধেয়ে চলেছে তিরবেগে—মানে যতটা বেগে স্টিমের জাহাজ তাকে নিয়ে যেতে পারে।'

মি. ট্রেলাওনি হোপের মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। সজোরে গুঙিয়ে উঠলেন উনি। আলতো করে সান্ত্বনার ছলে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রাখলেন প্রধানমন্ত্রী।

'মাই ডিয়ার, এ তোমার নিছক দুর্ভাগ্য। এজন্যে কেউই অপরাধী করতে পারে না তোমাকে। এমন কোনো সাবধানতা বাকি ছিল না যা তুমি অবহেলা করেছ। মি. হোমস, সব তথ্যই তো পেলেন। এবার বলুন তো, আমাদের করণীয় কী?'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস।

বলল, 'স্যার, আপনি তাহলে মনে করেন, এ-চিঠির পুনরুত্থান না হলে যুদ্ধ হবেই?'

'আমার মনে হয়, সে-সম্ভাবনা খুবই বেশি।'

'তাহলে, স্যার, যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হোন।'

'কথাটা খুবই শক্ত, মি. হোমস।'

'ঘটনাগুলো ভেবে দেখুন, স্যার। চিঠিটা যে রাত সাড়ে এগারোটার পর নেওয়া হয়নি তা সহজেই অনুমেয় এই কারণে যে, এইমাত্র শুনলাম মি. হোপ আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই সেই সময় থেকে চুরি ধরা পড়ার সময় পর্যন্ত ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তাহলে এ-জিনিস উধাও হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে, খুব সম্ভব সাড়ে সাতটার পরেই কোনো সময়ে। এ-কথা বললাম এই কারণে যে, চিঠিটা যে-ই নিক না কেন, সে নিশ্চয় জানত ডেসপ্যাচ-বাক্সেই আছে দলিলটা। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তগত করে ফেলাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আচ্ছা স্যার, এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল যদি ওই সময়ে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলুন তো এখন তা কোথায় থাকতে পারে? চিঠিটা কাছে রেখে দেওয়ার কোনো কারণ নেই কারোরই। এ-জিনিস যারা চায়, তাদের কাছেই চটপট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দলিলটা। এখন বলুন তো এদের পিছু নেওয়ার বা পিছু নিয়ে তাদের পেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ কি আমাদের আছে? না, নেই। চিঠি চলে গেছে আমাদের নাগালের বাইরে।'

সেট্টি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

'মি. হোমস যা বললেন, তা খুবই যৌক্তিক। বেশ বুঝতেই পারছি, বাস্তবিকই এ-ব্যাপার আমাদের হাতের বাইরে।'

'নিছক তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, দলিলটা সরিয়েছে পরিচারিকা অথবা খিদমতগার—'

'দুজনেরই বয়স হয়েছে এবং বহুভাবে যাচাই হয়ে গেছে তাদের সততা।'

'আপনার মুখেই শুনলাম, আপনার ঘরটা তিনতলায়। বাইরে থেকে সে-ঘরে ঢোকার কোনো পথ নেই এবং ভেতর থেকেও অলক্ষিতভাবে কারোর পক্ষে উঠে আসা সম্ভব নয়। তাহলে, নিশ্চয়ই বাড়ির কেউ নিয়েছে চিঠিটা। চোর মহাপ্রভু চিঠিটা নিয়ে যাবে কার কাছে? আন্তর্জাতিক গুপ্তচর আর সিক্রেট এজেন্টদের একজনের কাছে। এদের সংখ্যা বেশি নয় এবং তাদের প্রত্যেকের নামের সাথে পরিচয় আছে আমার। এ-পেশার মাথা বলতে আছে তিনজন। আমার

তদন্ত শুরু হবে এদেরকে দিয়েই। প্রত্যেকের ঘাঁটিতে গিয়ে আমায় দেখতে হবে তারা হাজির আছে কি না। একজন যদি নিপাত্তা হয়—বিশেষ করে কাল রাত থেকে যদি সে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলেই দলিলটা যে কোনদিকে গেছে, সে-সম্বন্ধে কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।'

ইউরোপীয় সেক্রেটারি শুধোলেন, 'কিন্তু সে নিপাত্তাই-বা হবে কেন? চিঠিটা নিয়ে লন্ডনের কোনো এমব্যাসিতে পৌঁছে দিলেই কাজ শেষ হয় তার। অবশ্য এমনটা হতেও পারে, নাও হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। এ ধরনের এজেন্টরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং এমব্যাসির সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ মোলায়েম হয় না।'

ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

'আমার তাই বিশ্বাস, আপনি ঠিক বলেছেন, মি. হোমস। এ-রকম একটা মূল্যবান দলিল সে নিজের হাতেই পৌঁছে দেবে হেড কোয়ার্টারে । আপনার কাজের গতি-পদ্ধতি খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে আমার। হোপ, ইতিমধ্যে এই একটা দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা সাজে না। সারাদিনে নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আপনাকে খবর দেব। আর আপনিও আপনার তদন্তের ফলাফল জানাবেন নিশ্চয়।'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীরমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই রাজনীতিবিদ।

এহেন যশস্বী সাক্ষাৎকারীরা বিদায় হলে পর, নীরবে পাইপটা ধরিয়ে নিলে হোমস। তারপর অতলস্পর্শী চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। সকালের কাগজটা খুলে একটা চাঞ্চল্যকর খুনের সংবাদে ডুবে গিয়েছিলাম আমি। খুনটা হয়েছে গতরাতে লন্ডন শহরেই। ঠিক এমনি সময়ে বিস্ময়চকিত দারুণ চিৎকার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আমার বন্ধুটি। তারপর পাইপটা নামিয়ে রাখল ম্যান্টেলপিসের ওপর।

বললে, 'ঠিক, এ-রহস্যের মুখে পৌঁছোনোর এর চাইতে আর ভালো পথ নেই। পরিস্থিতি বেপরোয়া হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমনকী কখনো যদি জানতে পারি এদের মধ্যে কোন মূর্তিমান এ-জিনিসটাকে চক্ষুদান করেছেন, তাহলেও এমনও হতে পারে যে এখনও চিঠিটা বেহাত হয়নি। একটা কথা কি জানো, এ ধরনের লোকদের কাছে অর্থই হচ্ছে পরমার্থ আর ব্রিটিশ কোষাগার তো আমার পেছনেই রইল। এ-চিঠি যদি বাজারে পৌঁছায়, কিনে নিতে পিছপা হব না আমি—তাতে যদি ইনকাম ট্যাক্সে আর একটি পেনি বৃদ্ধি পায়, পরোয়া করি না। যতদূর মনে হয় আমার, লোকটা হয়তো মওকা বুঝে দাঁও মারবার আশায় এখনও চিঠিটা রেখে দিয়েছে নিজের জিম্মায়। ওদিকে কপাল ঠুকে দেখার আগে দেখে নিতে চায় এদিক থেকে কীরকম দরটা আসে। এ ধরনের বিরাট খেলা খেলতে পারে শুধু তিনজন। ওবারস্টাইন, লা রোথিয়েরা[৫], আর এডুয়ারডো লুকাস। এদের প্রত্যেকের সাথে দেখা করব আমি।'

আমি সকালের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

'গোডোলফিন স্ট্রিটের এডুয়ারডো লুকাস তো?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।'

'কেন হবে না?'

'গতরাতে সে খুন হয়েছে তার বাড়িতে।'

বিগত বহু অ্যাডভেঞ্চারে আমাকে বহুভাবে তাক লাগিয়েছে আমার বন্ধুটি। কাজেই, যখন উপলব্ধি করলাম এক্ষেত্রে তাকেও আমি বিলকুল তাজ্জব বানিয়ে দিতে পেরেছি, তখন বাস্তবিকই পরম সন্তোষ লাভ করলাম আমি। বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ও, তারপর কাগজটা ছিনিয়ে নিলে আমার হাত থেকে! হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকে যে প্যারাগ্রাফটা তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম, তা নীচে দিলাম :

ওয়েস্টমিনিস্টারের হত্যা

গতরাত্রে ১৬ নং গোডোলফিন স্ট্রিটে একটি রহস্যজনক অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। হাউস অফ পার্লামেন্টের সুবিশাল টাওয়ারগুলির ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে নদী এবং মাঠের মধ্যবর্তী স্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সারি সারি কতকগুলি সেকেলে নির্জন বাড়ি আছে। ১৬নম্বর বাড়িটি ইহাদেরই অন্যতম। ক্ষুদ্র কিন্তু রুচিসুন্দর এই আয়তনটিতে মি. এডুয়ারডো লুকাস কয়েক বছর ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন মহলে তিনি দুই কারণে সমধিক পরিচিত। প্রথমত তাঁহার মনোহর ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়ত এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শৌখিন গায়ক হিসাবেও তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম আছে। মি. লুকাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্য বর্ষীয়সী মিসেস প্রিঙ্গল এবং খিদমতগার মিট্টনকে লইয়াই তাঁহার সংসার। মিসেস প্রিঙ্গল সকাল সকাল ঘুমাইতে যায় এবং তাহার শয়নকক্ষ বাড়ির সর্বোচ্চ তলায়। হ্যামারস্মিথে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিবার জন্যে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির বাহিরে গিয়াছিল খিদমতগার। এই সময়ে কী ঘটিয়াছে, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু রাত সওয়া বারোটা নাগাদ পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট গোডোলফিন স্ট্রিট দিয়া যাইতে লক্ষ করে যে ১৬ নম্বর বাড়ির দরজাটি দু-হাত করিয়া খোলা। টোকা মারিয়াও সে কোনো উত্তর পায় না। সামনের ঘরে আলোর আভাস পাইয়া সে প্যাসেজ বরাবর আগাইয়া যায় এবং আবার টোকা মারে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ আসে না। তখন সে দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ঘরে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হইয়া পড়িয়া ছিল। যাবতীয় আসবাবপত্র টানিয়া একধারে জড়ো করা হইয়াছিল এবং একটি চেয়ারের একটি পায়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছিলেন বাড়ির হতভাগ্য ভাড়াটিয়া। তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল এবং প্রাণবায়ু নিশ্চয় সঙ্গেসঙ্গেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। যে ছুরিকা দিয়া অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা একটি বেঁকানো ভারতীয় ভোজালি। নির্জিত শত্রুর দেশ হইতে সংগৃহীত প্রাচ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি টাঙানো ছিল একটি দেওয়ালে। ভোজালিটি এইস্থান হইতে টানিয়া নামানো হয়। হত্যার মোটিভ চুরি বলিয়া মনে হইতেছে না। কেননা ঘরের মূল্যবান সামগ্রীসমূহের একটিও সরানোর প্রচেষ্টা করা হয় নাই। মি. এডুয়ারডো লুকাস এত সুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহার এই নিষ্ঠুর এবং রহস্যাবৃত পরিণতি তাঁহার সুদূরপ্রসারী বন্ধুমহলে সগভীর সহানুভূতি এবং বেদনাময় আগ্রহের সঞ্চার করিবে।

'ওয়াটসন, এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয় শুনি?' দীর্ঘ বিরতির পর শুধোল হোমস।

'একটি আশ্চর্য কাকতালীয়।'

'কাকতালীয়! এ-নাটকে যে তিনজন সম্ভাব্য অভিনেতার নাম বলেছি, এ-লোকটা তাদেরই

একজন। যে সময়ে এ-নাটক অভিনীত হয়েছে বলে আমরা জানি, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে সে। কাকতালীয় না-হওয়ার সম্ভাবনাই দেখছি বিস্তর। কোনো সংখ্যা দিয়েও এসবের প্রকাশ চলে না। না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ দুটো ঘটনার মধ্যেই যোগসূত্র আছে—আছেই। এবং সে-যোগসূত্র কী তা আমাদেরই বার করতে হবে।'

'কিন্তু এখন তো সরকারি পুলিশ সবই জেনে ফেলেছে?'

'মোটেই নয়। গোডোলফিন স্ট্রিটে যেটুকুই দেখেছে, ওরা শুধুই সেইটুকু জানে। হোয়াইট হল টেরেস সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না বা জানবে না। আমরাই শুধু দুটি ঘটনাই জানি এবং আমরাই পারি এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে। তবে একটা জবরদস্ত পয়েন্ট আছে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই শুধু এই পয়েন্টের জোরেই আমার সন্দেহ এসে পড়ত লুকাসের ওপর। ওয়েস্টমিনিস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিট থেকে হোয়াইট হল টেরেস মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। আর যে ক-জন সিক্রেট এজেন্টের নাম করলাম, ওরা থাকে ওয়েস্ট এন্ডের এক প্রান্তে[৬]। কাজেই ইউরোপীয়ান সেক্রেটারির গেরস্থালির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বা সেখান থেকে কোনো বার্তা গ্রহণ করা অন্যান্যের চেয়ে লুকাসের পক্ষেই সহজতর। জিনিসটা খুবই সামান্য কিন্তু যেখানে সমস্ত ঘটনাকে চেপেচুপে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মেয়াদে আনা হচ্ছে, সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও থাকতে পারে। আরে! আরে! আবার কী এল?'

রেকাবিতে এক ভদ্রমহিলার কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস হাডসন। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভুরু তুলল হোমস। তারপর, কার্ডটা তুলে দিলে আমার হাতে।

বললে, 'লেডি হিলডা ট্রেলাওনি হোপকে দয়া করে ওপরে আসতে বলো।'

এক মুহূর্ত পরেই আমাদের দীন হীন ঘরে প্রবেশ করলেন লন্ডনের সবচেয়ে লাবণ্যময়ী রমণী। সকাল বেলাই এই সামান্য প্রকোষ্ঠ একবার ধন্য হয়েছিল দুই রাজনীতিবিদের আগমনে এবং তা আর একবার সম্মানিত হল লেডি হোপের আবির্ভাবে। ডিউক অফ বেলমিনস্টারের কনিষ্ঠতম কন্যার রূপের খ্যাতি আমি প্রায় শুনতাম। কিন্তু বর্ণনা শুনে বা রঙিন ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কল্পনা করেও তাঁর এহেন সুগঠিত চারু করোটির অপরূপ বর্ণসমারোহ আর নিখুঁত মনোহর, নয়ন-সুন্দর কান্তির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরতের সেই সকালে তাঁর সৌন্দর্যই কিন্তু সবার আগে আমাদের মনে গভীর ছাপ এঁকে দেয়নি। গাল দুটি কমনীয় বটে, কিন্তু আবেগের ছোঁয়া লেগে তা ফ্যাকাশে। চোখ দুটি প্রদীপ্ত বটে, কিন্তু সে-দীপ্তি জ্বরের উত্তাপজনিত। অনুভূতি-সচেতন মুখটি দৃঢ়সম্বন্ধ এবং চাপা অধরোষ্ঠে আত্মসংযমের প্রয়াস। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দরজার ফ্রেমে আমাদের রূপসি সৌন্দর্য দর্শনপ্রার্থী যখন এসে দাঁড়ালেন চিত্রার্পিতের মতো, তখন সৌন্দর্য নয়—আতঙ্কই সবার আগে থির থির করে কেঁপে উঠল তাঁর দুই চোখে।

'আমার স্বামী কি এখানে ছিলেন মি. হোমস?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম, এখানে ছিলেন তিনি।'

'মি. হোমস, আপনাকে মিনতি করছি, আমি যে এখানে এসেছি, তা তাঁকে বলবেন না।' ভাবলেশহীন নিস্পৃহ মুখে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল হোমস। তারপর হাতের সংকেতে লেডিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

বললে, 'ইয়োর লেডিশিপ, আমাকে বড়ো সংকটে ফেললেন। আমার অনুরোধ, আগে বসুন, তারপর বলুন কী অভিপ্রায়। কিন্তু আগেই জানিয়ে রাখছি, কোনোরকম শর্তবিহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

দ্রুত পদক্ষেপে আড়াআড়িভাবে ঘর পেরিয়ে জানলার দিকে পিঠ করে বসে পড়লেন লেডি হোপ। রানির মতোই হাবভাব-চেহারা তাঁর—তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, অভিজাত এবং রেখায় রেখায় বরবর্ণিনী।

'মি. হোমস', কথা বলতে বলতে সাদা দস্তানাপরা হাতের মুঠি বন্ধ করতে এবং খুলতে লাগলেন ঘন ঘন, 'অকপটে আপনাকে সব খুলে বলব আমি। বলব এই আশায় যে হয়তো সব শোনার পর আপনিও প্রাণখোলা হবেন আমার কাছে। শুধু একটি বিষয় ছাড়া আমি এবং আমার স্বামী পরস্পরের কাছে কোনো প্রসঙ্গই গোপন করি না। সমস্ত ব্যাপারে আমার ওপর ওঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে—শুধু একটি ছাড়া। এবং তা রাজনীতি। এ-ব্যাপারে যেন গালামোহর করা তাঁর ঠোঁট। কিছুই বলেন না আমাকে। কিন্তু আমি জানি, গতরাত্রে অত্যন্ত শোচনীয় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে আমাদের বাড়িতে। আমি জানি, একটা কাগজ অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা রাজনীতি সম্পর্কিত, সুতরাং আমার স্বামী পুরোপুরিভাবে আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারছেন না। অথচ এ-ঘটনার সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমাকে জানতেই হবে। এবং জানাটা একান্তই দরকার—একান্তই দরকার, আবার বলছি আমি। এই রাজনীতিবিদরা ছাড়া আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্য ঘটনাটা জানেন। সেইজন্যেই আমার অনুরোধ, আমার মিনতি মি. হোমস, দয়া করে বলুন, ঠিকঠিক বলুন কী হয়েছে এবং এর পরিণাম কী। সমস্ত খুলে বলুন, মি. হোমস। মক্কেলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নির্বাক হয়ে থাকবেন না। কেননা, তাঁর স্বার্থ রক্ষা পাবে যদি আমাকে আপনারা সব কথা বলেন এবং আমার ওপর আস্থা রাখেন। যে-কাগজটা চুরি গেছে সেটা কী?'

'ম্যাডাম, যা জিজ্ঞাসা করছেন, তা সত্যিই অসম্ভব।'

গুঙিয়ে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন লেডি।

'জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করুন, ম্যাডাম। আপনার স্বামী যদি এ-ব্যাপারে আপনাকে অন্ধকারে রাখাই সংগত মনে করে থাকেন, তখন, সদ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যেসব তথ্যগুলি আমি জেনেছি এবং যা উনি আপনার কাছে গোপন রেখেছেন, তা কি আপনাকে আমার বলা উচিত? এ-কথা জিজ্ঞেস করাটাও অন্যায়। আপনার উচিত তাঁকেই জিজ্ঞেস করা, আর কাউকে নয়।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে। শেষ উপায় হিসেবে আপনার কাছে আমি এসেছি। মি. হোমস, নিশ্চিত কিছু না বলেও একটি পয়েন্ট সম্পর্কে আপনি যদি আমায় আলোকিত করেন তো বড়ো উপকার হয়।'

'পয়েন্টটা কী, ম্যাডাম?'

'এ-ঘটনার ফলে আমার স্বামীর রাজনৈতিক কর্মজীবন কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?'

'ম্যাডাম, এ-ব্যাপারে একটা সুরাহা না হলে ফলাফল খুবই খারাপ হতে পারে।'

'আ!' এমনভাবে চকিতে নিশ্বাস টানলেন লেডি যেন আরও দৃঢ়মূল হল তাঁর সন্দেহের রাশি। 'আর একটা প্রশ্ন, মি. হোমস। এ-বিপর্যয়ের প্রথম শক পেয়েই আমার স্বামী তাঁর চোখ-মুখে

এমন ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা থেকে আমি বুঝেছিলাম, এ-দলিল খোয়া যাওয়ার ফলে ভয়ানক রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে জনগণের মধ্যে।'

'উনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয় তা উড়িয়ে দিতে পারি না।'

'প্রতিক্রিয়াগুলো কী প্রকৃতির বলুন তো?'

'উহুঁ, ম্যাডাম, আবার আপনি এমন কথা জিজ্ঞেস করছেন যার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাহলে আপনার সময় নষ্ট করব না। আরও একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাইলেন না, সেজন্যে আপনাকে আমি দোষ দিই না, মি. হোমস। আপনিও যে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা নিশ্চয় পোষণ করবেন না— সে-বিশ্বাস আমার রইল। আমার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি চাই তাঁর উদ্‌বেগ উত্তেজনার কিছুটা অংশ নিজের মনে নিতে। আর একবার অনুরোধ জানিয়ে যাই, আমি যে এখানে এসেছিলাম, তা দয়া করে ওঁকে বলবেন না।' দরজার কাছ থেকে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন উনি। শেষবারের মতো দেখলাম তাঁর সুন্দর কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, চমকিত চোখ আর চাপা অধরোষ্ঠ। তারপরই অদৃশ্য হলেন উনি।

স্কার্টের বিলীয়মান খস খস শব্দের পরিসমাপ্তি ঘটল দরজা বন্ধ করার শব্দে। হাসিমুখে হোমস তখন বললে, 'ওহে, ওয়াটসন, মেয়েদের বিভাগটা তো তোমার। সুন্দরী মহিলাটি কী খেলায় মেতেছেন বলো তো? ওঁর আসল অভিপ্রায়টা কী?'

'ভদ্রমহিলার বক্তব্যই তো জলের মতো পরিষ্কার এবং ওঁর উদ্‌বেগও খুবই স্বাভাবিক।'

'হুম। ওঁর চেহারাটা একবার ভেবে দেখ, ওয়াটসন। আরও ভাবো ওঁর হাবভাব, অবরুদ্ধ উত্তেজনা, অশান্ত প্রকৃতি এবং নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করার ধরন। মনে রেখো, উনি যে-সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে কেউ লঘু কারণে আবেগ প্রকাশ করে না।'

'বাস্তবিকই, বেজায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা।'

'আরও মনে রেখো, কীরকম অদ্ভুত ঐকান্তিকতার সঙ্গে উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর স্বামীর সম্যক স্বার্থরক্ষার জন্যেই সব জানা উচিত। ও-কথা বলার অর্থ? আরও একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ করেছ, ওয়াটসন। আলোর দিকে পেছন ফিরে কেমন কৌশলে বসে পড়লেন, তা তো দেখলে। আমরা যে তাঁর মুখের ভাব দেখে মন বুঝে ফেলি, তা উনি চান না।'

'হ্যাঁ, ঘরের একটা চেয়ারই বেছে নিয়েছিলেন উনি।'

'জানোই তো, মেয়েদের মোটিভ সবই অবোধ্য। মার্গারেটের সেই স্ত্রীলোকটার কথা তোমার মনে থাকতে পারে। তাকেও ঠিক এই কারণে সন্দেহ করেছিলাম আমি। নাকের ওপর কোনো পাউডার ছিল না— আর এই সন্দেহই কিনা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল নির্ভুল সমাধান। এ-রকম চোরাবালির ওপর কী করে তোমার সিদ্ধান্তের প্রাসাদ তৈরি করবে বল তো? ওদের অতি তুচ্ছ কার্যকলাপ নিয়েই মোটা মোটা গ্রন্থখণ্ড রচনা করা যায় অথবা ওদের অতি অসাধারণ আচরণের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে পাওয়া যায় হয়তো একটা চুলের কাঁটা বা চুল কোঁচকানোর প্রসাধন-সামগ্রী। গুড মর্নিং, ওয়াটসন।'

'বেরোচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ। যাব গোডোলফিন স্ট্রিটে। পুলিশ অফিসের দোস্তদের সঙ্গে সকালটা কাটাব ওইখানেই।

আমাদের সমস্যার সমাধান আছে এডুয়ারডো লুকাসের মৃত্যু-রহস্যের সাথে—যদিও স্বীকার করছি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে কিছুই আন্দাজ করে উঠতে পারছি না আমি। ইঙ্গিত, ইশারা— কিছুই আমি পাইনি এ-সম্পর্কে। ঘটনা ঘটার আগেই থিয়োরি তৈরি করাটা বিরাট ভুল। ভায়া ওয়াটসন, একটু সামলে থেকো। নতুন কেউ দেখা করতে এলে কথা বোলো আমার হয়ে। যদি সম্ভব হয় তো লাঞ্চের আগেই দেখা হবে তোমার সাথে।'

সেদিন, তার পরের দিন এবং তারও পরের দিন বিশেষ একটা মুডে রইল হোমস। ওর বন্ধুবান্ধবেরা এ সময়ে ওকে বলে স্পল্পভাষী, আর সবাই বলে বিষণ্ণ। এ ক-দিন ও ঝড়ের মতো এল, ঝড়ের মতো গেল, ধূমপান করলে অবিরাম, মাঝে মাঝে বেহালা নামিয়ে টুকটাক দু-একটা গান বাজাল, কখনো-বা ডুবে রইল দিবাস্বপ্নে, স্যান্ডউইচ গিললে যখন-তখন অসময়ে, এবং আমার ছাড়া ছাড়া প্রশ্নগুলোর উত্তর যা দিলে তা না-দেওয়ারই শামিল। বেশ বুঝলাম, তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না ও। নিজের অবস্থাও তেমন ভালো নয়। কেসটা সম্বন্ধে কিছুই বলত না ও। তদন্তের খুঁটিনাটি এবং নিহত ব্যক্তির খিদমতগার জন মিট্টনও গ্রেপ্তার এবং পরে খালাস পাওয়ার খবর জানলাম আমি কাগজ পড়ে। করোনারের জুরিরা জানালে যে খুনটা নিশ্চয় 'উদ্দেশ্যমূলক এবং সুপরিকল্পিত হত্যা।' কিন্তু খুনি অথবা খুনিরা আগের মতোই রইল অজ্ঞাত। মোটিভ কী, সে-রকম আঁচও কেউ দিতে পারলে না। বহু মূল্যবান সামগ্রীতে ঘর বোঝাই থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিসও সরেনি। নিহত ব্যক্তির কাগজপত্রও কেউ নাড়াচাড়া করেনি। কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, ভদ্রলোক ছিলেন একধারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর উৎসাহী এবং উৎসুক ছাত্র, অবিশ্রান্ত গল্পবাজ, অসাধারণ ভাষাবিদ, এবং ক্লান্তিহীন পত্রলেখক। অনেকগুলো দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর ড্রয়ারবোঝাই দলিলপত্র থেকে চাঞ্চল্যকর কোনো তথ্যই আবিষ্কার করা গেল না। স্ত্রীলোকেদের সাথে আলাপের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাছবিচাররহিত। ব্যক্তিনির্বিশেষে সবার সঙ্গে মিশতেন, কিন্তু ওপরে ওপরে, মাখামাখি ছিল না কারোর সাথেই। এ-রকম মেয়েদের মধ্যে তাঁর পরিচিতের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু বান্ধবী ছিল মাত্র কয়েকজন, আর এমন একজনও ছিল না যাকে তিনি ভালোবাসতেন। স্বভাবচরিত্র পরিমিত এবং নিয়মিত। তাঁর আচরণে কেউ রুষ্ট হতেন না। আগাগোড়া একটা বিরাট রহস্য তাঁর মৃত্যু এবং এ-রহস্য সম্ভবত শেষ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে।

সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তার অনুকল্প হিসাবে মরিয়া হয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল খিদমতগার জন মিট্টনকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাই টেনে নিয়ে যাওয়া গেল না। সেই রাতেই হ্যামারস্মিথে বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিল সে। কোনো ফাঁক নেই তার অ্যালিবিতে। একটা পয়েন্ট অবশ্য সত্যি। যে সময়ে বাড়িমুখো রওনা হয়েছিল সে, খুনটা ধরা পড়ার আগেই ওয়েস্টমিনস্টারে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু দেরি হওয়ার যে কারণ সে দর্শালে তা খুবই সম্ভব। সেরাতে খানিকটা পথ হেঁটে এসেছিল সে এবং তা আশ্চর্য নয় এই কারণে যে বড়ো সুন্দর ছিল সেই বিশেষ রাতটি। কাজেই, বারোটার সময়ে বাড়িতে পৌঁছায় সে। পৌঁছেই ওই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভালো। মৃত ব্যক্তির কয়েকটি জিনিস বিশেষ করে ক্ষুর রাখবার একটা ছোট্ট কেস খিদমতগারের

বাক্সে পাওয়া গেছিল। কিন্তু জন মিট্টন জানলেন যে জিনিসগুলো তার মনিবের দেওয়া বকশিশ। মিসেস প্রিঙ্গলও তা সমর্থন করলে। বছর তিনেক হল লুকাসের কাজে বহাল আছে মিট্টন। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়। ইউরোপ সফরের সময়ে লুকাস মিট্টনকে সঙ্গে নিতেন না। মাঝে মাঝে মাস তিনেকের জন্যে প্যারিসে থাকতেন উনি। সে সময়ে মিট্টন থাকত গোডোলফিন স্ট্রিটের বাড়ির তত্ত্বাবধোনে। খুনের রাতে মিসেস প্রিঙ্গলও কিছু শুনতে পায়নি। তার মনিবের সাথে কেউ যদি দেখা করতে এসে থাকে তো তিনি নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

কাজে কাজেই তিনটে দিন কেটে গেল, কিন্তু রহস্য-তিমিরের একটা অংশেরও সমাধান করা গেল না। অন্তত কাগজে আমি তাই পড়লাম! হোমস এর থেকে বেশি খবর যদিও রাখত, তা আর কাউকে জানায়নি। ওর মুখেই শুনেছিলাম, এ-কেসে লেসট্রেড তাকে দলে টেনেছে। সে যে প্রত্যেকটা নতুন পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রয়েছে, তা জানতাম। চতুর্থ দিন প্যারিস থেকে একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোনোর পর মনে হল এ বিরাট প্রশ্নের সব কিছুরই সমাধান হয়ে গেল।

প্যারিসের পুলিশ সদ্য একটা আবিষ্কার করিয়াছে (লিখেছে 'ডেলি টেলিগ্রাফ')। ফলে, যে অবগুণ্ঠন মি. এডুয়ারডো লুকাসের শোচনীয় অদৃষ্টকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা উত্থিত হইল। গত সোমবার রাত্রে ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিটে আক্রান্ত হইয়া মি. এডুয়ারডো লুকাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিতে পারে যে, নিহত ভদ্রলোককে ছুরিকাহত অবস্থায় তাঁহার ঘরেই পাওয়া গিয়াছিল। কয়েকটি কারণে তাঁহার খিদমতগারকে সন্দেহ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি অ্যালিবির জন্য সে-কেস ভাঙিয়া যায়। ম্যাডামজেল হেনরি ফোরনেয়ি নামে পরিচিত এক ভদ্রমহিলা 'রু অস্টারলি'তে একটি ছোট্ট ভিলা লইয়া বাস করিতেন। গতকাল তাঁহার চাকরবাকরেরা কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় যে তিনি নাকি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, বাস্তবিকই তিনি বিপজ্জনক এবং স্থায়ী প্রকৃতির একটা বাতিকে আক্রান্ত[৭]। তদন্তের ফলে পুলিশ আবিষ্কার করিয়াছে যে, লন্ডন পরিভ্রমণ সমাপনান্তে গত মঙ্গলবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন ম্যাডামজেল এবং প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, ওয়েস্টমিনস্টারের অপরাধের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ আছে। ফটোগ্রাফ মিলাইয়া দেখবার পর সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মঁসিয়ে হেনরি ফোরনেয়ি এবং এডুওয়ারডো লুকাস এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি এবং নিহত ব্যক্তি কোনো কারণে লন্ডন এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাডামজেল ফোরনেয়ি বর্ণসংকর। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার ধমনীতে ইউরোপীয় ও নিগ্রো উভয় রক্তই প্রবাহিত। অল্পতেই নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাব এবং অতীতে ঈর্ষার প্রকোপে কয়েকবার তাঁহার চিত্তবিকার ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। অনুমান, উত্তেজনা বা ঈর্ষাবশতই তিনি এ ভয়ানক খুনটা করিয়া ফেলিয়াছেন যাহার ফলে লন্ডনে এই প্রকার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সোমবার রাত্রে তাঁহার গতিবিধির কোনো হদিশ এখনও পাওয়া যায় না বটে, তবে পুলিশের সন্দেহ, তাঁহার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যায় এমন একজন স্ত্রীলোক মঙ্গলবার সকালে শেরিং ক্রস স্টেশনে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা এবং মারমুখো অঙ্গভঙ্গির জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব খুনটা স্বভাবতই উন্মত্ত থাকাকালীনই হইয়াছে অথবা খুনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় এই অসুখী মহিলার চেতনা লোপ পায় এবং তিনি পাগল হইয়া যান। বর্তমানে

অতীতের কোনো সুসংবদ্ধ বর্ণনা দিতে তিনি অপারগ এবং চিকিৎসকেরাও তাঁহার চেতনার পুনরুদ্ধারের কোনো আশা রাখিতেছেন না। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোককে তিনি ম্যাডামজেল ফোরনেয়িও হইতে পারেন, সোমবার রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে গোডোলফিন স্ট্রিটের একটি বাড়িকে লক্ষ করিতে দেখা গিয়াছে।

'এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, হোমস?' খবরটা আমিই জোরে জোরে পড়ে শোনালাম ওকে। শুনতে শুনতে প্রাতরাশ খাওয়া শেষ করল বন্ধুবর।

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন,' টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে বলল ও, 'বুঝতে পারছি নিদারুণ ভোগান্তি চলেছে তোমার কৌতূহলের টুঁটি টিপে বসে থাকার জন্যে। কিন্তু গত তিন দিনে যদি তোমায় কিছু না-বলে থাকি তো বুঝতে হবে বলার মতো কিছুই ছিল না। এমনকী এখনও প্যারিস থেকে আসা এই রিপোর্টও আমায় বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না।'

'লোকটার মৃত্যুই যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে এই রিপোর্টই তো চূড়ান্ত, তাই নয় কি?

'ভদ্রলোকের মৃত্যুটা তো একটা নিছক ঘটনা—আমাদের আসল কাজের তুলনায় তুচ্ছ একটা উপসংহার। আমাদের মুখ্যকর্তব্য হল দলিলটার হদিশ খুঁজে বার করা আর একটা ইউরোপীয় বিপর্যয়কে নিরোধ করা। গত তিনদিনে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঘটেছে, এবং তা হচ্ছে কিছুই ঘটেনি। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি আমি এবং ইউরোপের কোথাও কোনোরকম অশান্তির সূচনা দেখা যায়নি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখন, এ-চিঠিটা যদি দেশছাড়া হত— না, কখনোই তা হয়নি, হতে পারে না— কিন্তু যদি দেশছাড়া না-ই হয়ে থাকে, তবে এখন তা কোথায়? কার কাছে? কেনই-বা একে চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নটাই তো হাতুড়ির মতো দমাদম পড়ছে আমার মগজে। চিঠিটা যে-রাতে অদৃশ্য হল, ঠিক সেই রাতেই লুকাসও ওপারের পথে যাত্রা করলেন— একি বাস্তবিকই নিছক কাকতলীয়? চিঠিটা কি আদৌ পৌঁছেছিল ওঁর কাছে? তাই যদি হয় তো তাঁর কাগজপত্রের মাঝে মাঝে চিঠির সন্ধান মিলছে না কেন? ওঁর বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রী কি যাওয়ার সময়ে চিঠিটাও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? তাই যদি, তাহলে তা কি তাঁর প্যারিসের বাড়িতে আছে? ফরাসি পুলিশের সন্দেহ জাগ্রত না-করে কীভাবে আমি এখন এর সন্ধান করি বল তো? মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ-কেসটা এমনই যে এখানে আইন আমাদের কাছে যতখানি বিপজ্জনক, ঠিক ততখানি বিপজ্জনক ক্রিমিনালরা। প্রত্যেকটি লোকের হাত রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও স্বার্থের ঝুঁকি কিন্তু অতি বিপুল। এ-রহস্যের সাফল্যময় পরিসমাপ্তিতে যদি পৌঁছোতে পারি, তাহলে আমার গৌরবময় কর্মজীবনের মুকুটমণি হয়ে থাকবে এ-ঘটনা। এই তো দেখছি রণাঙ্গন থেকে এসে পৌঁছেছে আমার সর্বশেষ রিপোর্ট!' নোটটা হাতে পেয়েই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে ও। 'হুররে! লেসট্রেড কৌতূহলোদ্দীপক কিছুর খোঁজ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে! ওয়াটসন, টুপিটা মাথায় দিয়ে নাও। চলো, বেড়াতে বেড়াতে ওয়েস্টমিনস্টারের দিকে যাই দুজনে।'

অকুস্থলে সেই আমার প্রথম আগমন। যে-শতাব্দীতে এ-বাড়ির জন্ম— হুবহু তারই মতো আকৃতি। উঁচু মলিন, আর সংকীর্ণ খুপরিতে বহুধা বিভক্ত আয়তন। ফিটফাট, কেতাদুরস্ত আর নিরেট। সামনের জানলা থেকে লেসট্রেডের বুলডগ-আকৃতিকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে

দেখলাম। বিশালবপু একজন কনস্টেবল দরজাটা খুলে ধরতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন লেসট্রেড। যে-ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, খুনটা হয়েছে সেখানেই। তখন কিন্তু কার্পেটের ওপর একটা কুৎসিত এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়া দাগ ছাড়া খুনের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না ঘরের মধ্যে। কার্পেটটা ছোটো আর চৌকোনা, পুরু কাপড়ে আবৃত এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা। চারপাশে ঘিরে ছিল চওড়া কিন্তু ভারি সুন্দর সেকেলে কায়দায় খুব চকচক পালিশ করা চৌকো ব্লকের কাঠের মেঝে। আগুনের চুল্লির ওপরে ঝুলছিল বিজিত শত্রুদের অতি চমৎকার অস্ত্রের সারি। এই অস্ত্রেরই একটাকে কাজে লাগানো হয়েছে সেই শোচনীয় রাতে। জানলার সামনে একটা বহুমূল্য জমকালো লেখবার টেবিল। ঘরের প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু, ছবি, মেঝের আবরণ, দরজা জানলার পর্দা— সব কিছুর মধ্যে একটা সুখাবহ বিলাসপ্রবণ রুচির নিদর্শন।

'প্যারিসের খবরটা দেখেছেন,' শুধোলেন লেসট্রেড।

মাথা নেড়ে সায় দিল হোমস।

'মনে হচ্ছে, আমাদের ফরাসি বন্ধুরা এবার আসল জায়গায় হাত দিতে পেরেছে। ওরা যা বলেছে, নিঃসন্দেহে ঘটেছেও তাই। দরজায় টোকা দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। আমার অনুমান, আচমকা এসে চমকে দিয়েছিলেন লুকাসকে। কেননা, জলনিরোধক নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে জীবনধারণ করতেন উনি। দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আনলেন লুকাস— বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না। কীভাবে লুকাসের ডেরা খুঁজে বার করেছেন, তা বললেন ভদ্রমহিলা। ভর্ৎসনা করলেন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়লেন অচিরে। তারপরই ছোটোখাটো ওই ভোজালির ঘায়ে যবনিকা পড়ল লুকাসের জীবনে। এত কাণ্ড কিন্তু এক মুহূর্তে হয়নি। কেননা, জানেন তো চেয়ারগুলো গিয়ে জড়ো হয়েছিল দূরে ওইখানে। আর, একটা চেয়ার বাগিয়ে ধরেছিলেন এমনভাবে যেন ওই দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন উনি। প্রমাণাদি সবই পেলাম এবং তা এমনই জলের মতো পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে আমরা যেন নিজের চোখেই দেখছি সে-দৃশ্য।'

ভুরু তুললে হোমস।

'আর তবুও কিনা আমায় ডেকে পাঠালে তুমি?'

'আ, হ্যাঁ, সেটা আর একটা বিষয়। নিছক একটা নগণ্য ব্যাপার, কিন্তু এই সবেতেই তো আপনার আগ্রহ জেগে ওঠে। অদ্ভুত। নেহাতই খামখেয়াল। মূল ঘটনার সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে কোনো সংযোগ নেই— থাকতে পারে না অন্তত ওপর দেখে যা মনে হচ্ছে।'

'জিনিসটা কী শুনি?'

'আপনারা জানেন তো এ ধরনের অপরাধের পর যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বেজায় সতর্ক হয়ে থাকি। দিনরাত একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মোতায়েন ছিল এখানে। আজ সকালে মি. লুকাসকে কবর দেওয়ার পর খতম হল তদন্ত পর্ব— এই ঘর সম্পর্কিত তদন্ত। তারপর আমরা ভাবলাম একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যাক জিনিসপত্র। এই কার্পেটটা দেখছেন তো, মেঝের সঙ্গে এটা আঁটা নেই— শুধু পেতে রাখা হয়েছে। কার্পেটটা তোলার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। তুলতে গিয়ে দেখলাম—'

'হ্যাঁ? তুলতে গিয়ে দেখলেন—'

উদ্‌বেগে টানটান হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

'যা দেখলাম তা আপনি এক-শো বছরেও অনুমান করে উঠতে পারবেন না। কার্পেটের ওপর এই দাগটা দেখছেন তো? বেশ খানিকটা রক্ত ভেতরেও নিশ্চয় শুষে নিয়েছে— নেয়নি কি?'

'নিঃসন্দেহে নিয়েছে।'

'বেশ, বেশ, শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সাদা কাঠের ওপর এই দাগটার সঙ্গে মিলে যাওয়ার মতো অনুরূপ দাগটি কিন্তু নেই।'

'দাগ নেই! কিন্তু তা থাকতেই হবে—'

'ঠিক। আপনিও তাই বলছেন। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে দাগটা নেই।'

'সে কার্পেটের কোণটা তার হাতে নিল।'
সিডনি প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৪

কার্পেটের কোণটা তুলে নিয়ে উলটে ফেলে লেসট্রেড দেখাল, বাস্তবিকই সে যা বললে তা সত্যি।

'কিন্তু গালিচার তলার দিকে দাগটা যতখানি, ওপরে ততখানি! কাঠের ওপর নিশ্চয় পড়েছে রক্তের চিহ্ন।'

সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে হতবুদ্ধি বানিয়ে দেওয়ার উল্লাসে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে উঠল লেসট্রেড।

'এবার আপনাকে দেখাচ্ছি এর ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দাগ একটা আছে, কিন্তু তা প্রথমটার সঙ্গে মিলছে না। নিজেই দেখুন।' বলতে বলতে কার্পেটের আর একটা অংশ উলটে ফেললে ও। আর সত্যি সত্যিই দেখলাম বেশ খানিকটা টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়েছে পুরানো কায়দায় মেঝের চৌকোণে সাদা জমির ওপর। 'কী মনে হয় আপনার মি. হোমস?'

'আরে, এ তো ভারি সোজা। দুটো দাগই ওপর ওপর ছিল, কিন্তু কার্পেটটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে পরে। চৌকোনা কার্পেট, মোটেই বেগ পেতে হয়নি।'

'মি. হোমস, কার্পেটটা যে ঘোরানো হয়েছে, এ-কথা বলার জন্যে আপনাকে সরকারি পুলিশের প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কার্পেটটা এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই মিলে যাচ্ছে দাগ দুটো। একটার ওপরেই এসে পড়ছে আর একটা। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, কার্পেটটা ঘুরিয়েছে কে এবং কেনই-বা ঘুরিয়েছে?'

হোমসের শক্ত মুখ দেখে বুঝলাম অবরুদ্ধ উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ও।

বললে, 'লেসট্রেড, প্যাসেজের ওই কনস্টেবলটি কি সর্বক্ষণ এখানে পাহারা দিয়েছিল?'

'নিশ্চয়।'

'আমার উপদেশ নাও। খুব সাবধানে পরীক্ষা করো ওকে। আমাদের সামনে কোরো না। আমরা বরং এখানে অপেক্ষা করছি। পেছনকার ঘরে নিয়ে যাও ওকে। একলা থাকলে অনায়াসেই ওর কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারবে তুমি। ওকে জিজ্ঞেস করো, কোন সাহসে বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে একলা রেখে গেছিল সে এ ঘরের মধ্যে। এ-কাজ করেছিল কি না, তা জিজ্ঞেস কোরো না। ধরে নাও সে করেছে। ওকে বলো, এখানে যে কেউ ছিল তা তুমি জান। চাপ দাও। বলো, আগাগোড়া সব স্বীকার করলেই এ-যাত্রা ক্ষমা পেতে পারে সে। যা বললাম, অবিকল তাই করো।'

'সর্বনাশ! ও যদি এ-খবর জানে তো ওর পেট থেকে এখুনি আমি তা টেনেহিঁচড়ে বার করে নিচ্ছি।' চিৎকার করে উঠে হলের ভেতরে ছিটকে এগিয়ে যায় লেসট্রেড। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওর গমগমে কণ্ঠের তর্জনগর্জন শোনা যায় পেছনের ঘরে!

'এবার, ওয়াটসন, এবার!' চিৎকার করে ওঠে হোমস— বিকারগ্রস্ত ব্যাকুলতা রণরণিয়ে ওঠে ওর স্বরে। নিরুদ্যম, নির্বিকার আচরণের ছদ্ম মুখোশ পরা মানুষটির সমস্ত দানবিক শক্তি তেজ যেন নিমেষে ফেটে পড়ে উৎপিঞ্জর-উৎসাহ প্রকম্পিত সাময়িক কিন্তু উদ্দাম উদ্দীপনের মধ্যে। একটানে মেঝে থেকে কার্পেটটা তুলে ফেলে পলকের মধ্যে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে চৌকোনা কাঠের ব্লকের প্রতিটা জোড় আঁকড়ে আঁকড়ে পরখ করতে লাগল ও। একটা ব্লকের কিনারায় নখ বসে গেল হোমসের এবং সঙ্গেসঙ্গে তা ঘুরে গেল পাশের দিকে।

বাক্সের ডালার মতো পেছনের কবজায় ঘুরে গেল কাঠের ব্লকটা। নীচে বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট অন্ধকারময় গহ্বর। ক্ষিপ্তের মতো সাগ্রহে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে হোমস। পরক্ষণেই রাগে হতাশায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এক তিক্ত গর্জন ছেড়ে হাত টেনে নিল সে। গহ্বর শূন্য।

'তাড়াতাড়ি, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি! যেমন ছিল তেমনি রেখে দাও!' কাঠের ডালা ফিরে এল যথাস্থানে। কার্পেটটা সোজা করে রাখা হয়েছে, এমনি সময়ে প্যাসেজে লেসট্রেডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে এসে দেখলে অসলভাবে ম্যান্টলপিসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হোমস। যেন চিন্তায় ইস্তফা দিয়ে মূর্তিমান সহিষ্ণুতার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদম্য হাইগুলো চাপবার চেষ্টা করছে সে।

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত, মি. হোমস। বেশ দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন আপনি। যাক, সব স্বীকার করেছে ও। এদিকে এসো, ম্যাকফারসন। তোমার এই অত্যন্ত অক্ষমার্হ আচরণের ইতিবৃত্ত শুনিয়ে যাও এই ভদ্রলোকদের।'

সুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিশাল-বপু কনস্টেবলটি। চোখ-মুখ বেজায় লাল হয়ে উঠেছিল তার। হাবভাব দেখে বেশ অনুতপ্ত মনে হল তাকে।

'কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার ছিল না, স্যার, সত্যিই ছিল না। যুবতী মেয়েটি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন এ-দরজায়– বাড়ি ভুল করেছিলেন— উনি তাই বললেন কথাবার্তা কইলাম কিছুক্ষণ। সারাদিন এখানে ডিউটিতে মোতায়েন থাকলে বড়ো একলা একলা লাগে।'

'বেশ, তারপর কী হল শুনি?'

'খুনটা কোথায় হয়েছে, তা তিনি দেখতে চাইলেন। বললেন, কাগজে নাকি এ-সম্বন্ধে খবর পড়েছেন। দেখলে খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় তাঁকে, অল্প বয়স, কথাবার্তাও চমৎকার বলেন। তাই, স্যার, ভাবলাম ওঁকে একবারটি উঁকি মারতে দিলে এমন কী আর ক্ষতি হবে। কার্পেটের ওপর ওই চিহ্নটা দেখেই ধপ করে উনি পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। এমনভাবে পড়ে রইলেন যে দেখে মনে হল বুঝি-বা মারাই গেলেন। পেছনে দৌড়ে গিয়ে খানিকটা জল নিয়ে এলাম, কিন্তু জ্ঞান ফেরাতে পারলাম না। তখন দৌড়ে গেলাম 'আইভি প্ল্যান্ট'-এ কিছু ব্র্যান্ডি আনতে। ফিরে এসে দেখি মেয়েটি আর নেই। নিশ্চয় জ্ঞান ফিরে পেয়ে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে আর মুখ দেখাতে সাহস করেননি।

'কার্পেটটা নড়ল কেমন করে?'

'স্যার, ফিরে এসে কার্পেটটাকে বাস্তবিকই একটু কুঁচকে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু শুনলেন তো, মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কার্পেটের ওপর। পালিশ করা মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটাকে মেঝের সঙ্গে আটকে রাখারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। আমিই পরে তা সিধে করে দিই।'

ভারিক্কি চালে লেসট্রেড বললে, 'কনস্টেবল ম্যাকফারসন, আজকে এই শিক্ষাই পেলে যে, আমার চোখে ধুলো দিতে তুমি পারবে না। ভেবেছিলে তোমার কর্তব্যের গাফিলতি কোনোদিনই ধরা পড়বে না। কিন্তু কার্পেটটার দিকে এক লহমা তাকিয়েই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে এ-ঘরে একজনকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তোমার কপাল ভালো যে কিছুই খোয়া যায়নি। তা না হলে এতক্ষণে কোয়্যার স্ট্রিটে চালান হয়ে যেতে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মিছিমিছি

আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি দুঃখিত, মি. হোমস। ভেবেছিলাম, দ্বিতীয় দাগের সঙ্গে প্রথম দাগের না মিল হওয়ার পয়েন্ট শুনলে নিশ্চয়ই আগ্রহ বোধ করবেন আপনি।'

'আরে পয়েন্টটা তো দারুণ ইন্টারেস্টিং বটেই। কনস্টেবল, এই ভদ্রমহিলাটি কি এ-ঘরে শুধু একবারই এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার, মাত্র একবার।'

'কে তিনি?'

'নাম জানি না, স্যার। টাইপরাইটিং সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞাপন পড়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলেন। এসে পড়েন ভুল ঠিকানায়। ভারি মিষ্টি, আর ভদ্র মেয়ে স্যার।'

'ছিপছিপে লম্বা? সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, স্যার। মিষ্টি চেহারার অল্পবয়সি যুবতী। সুন্দরী বলতে পারেন। কেউ কেউ হয়তো বলবে বেজায় সুন্দরী। "ও, অফিসার, একবারটি আমায় উঁকি মারতে দিন", বললেন মেয়েটি। এমন মিষ্টিভাবে জেদাজেদি করতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম দরজা দিয়ে একবার ওঁকে মাথা গলাতে দিলে কোনো ক্ষতিই হবে না।'

'কীরকম পোশাক পরেছিলেন তিনি?'

'সাদাসিদে, স্যার, পা পর্যন্ত লম্বা একটা আলখাল্লা।'

'কোন সময়ে?'

'সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল তখন। ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরে আসার পর দেখলাম ওরা ল্যাম্পগুলো জ্বালাচ্ছে।'

'বেশ বেশ', বললে হোমস। 'এসো ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় অন্যত্র এর চাইতেও দরকারি কাজ আমাদের আছে।'

লেসট্রেডকে সামনের ঘরে রেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। অনুতপ্ত কনস্টেবলটি এসে দরজা খুলে দিলে। সিঁড়ির ধাপের ওপর বোঁ করে ঘুরে গেল হোমস। হাতের মধ্যে কী-একটা জিনিস নিয়ে তুলে ধরলে ম্যাকফারসনের সামনে। নিবিষ্ট চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কনস্টেবল ম্যাকফারসন।

তারপরই চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় ভগবান, স্যার।' বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার মুখে। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখল হোমস। হাতের জিনিসটা রেখে দিল বুক পকেটে! তারপর যখন রাস্তায় নেমে এলাম, শুরু হল তার অট্টহাস্য। বললে, 'চমৎকার! বন্ধু ওয়াটসন, শেষ দৃশ্যের ড্রপসিন এবার উঠেছে। শুনে তুমি আশ্বস্ত হবে যে যুদ্ধ আর হবে না, রাইট অনারেবল ট্রেলাওনি হোপের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও মসীলিপ্ত হবে না, অবিবেচক নৃপতি মহোদয়কে তাঁর অবিবেচনার কোনো শাস্তি পেতে হবে না, প্রধানমন্ত্রীমহাশয়কে ইউরোপীয় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এবং আমরা যদি সামান্য বুদ্ধি খরচ করে সমস্ত ব্যপারটাকে সুকৌশলে পরিচালনা করতে পারি, তাহলে কারোরই আর একটা পেনিও লোকসান হবে না— নতুবা জানই তো কী বিশ্রী দুর্ঘটনা সৃষ্টি হতে পারে।'

'সমস্যার সমাধান করেছ তাহলে!' চেঁচিয়ে উঠি আমি।

'একেবারে নয় ওয়াটসন। এখনও কতকগুলো পয়েন্ট রয়েছে যা আগের মতোই তিমিরাবৃত।

কিন্তু এত বেশি জেনে ফেলেছি, যে, এখন যদি বাকিটুকু না জানতে পারি তো দোষ হবে আমাদের নিজেদেরই। এখন আমরা সিধে যাব হোয়াইট হল টেরেসে। এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতির সৃষ্টি হবে সেখানেই।'

ইউরোপীয়ান সেক্রেটারির বাসভবনে পৌঁছে হোমস যাঁর খোঁজ করল তিনি লেডি হিলডা ট্রেলাওনি হোপ। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মর্নিংরুমে।

'মি. হোমস।' ঘৃণা মেশানো রোষে অরুণ হয়ে ওঠে লেডির মুখ, 'এ কিন্তু আপনার অত্যন্ত অন্যায় এবং অনুদার আচরণ। আমাদের অভিপ্রায় আপনার সামনেই প্রকাশ করতে এসেছি— আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার গোপনে রাখবেন শুধু এই কারণে যে আমার স্বামী যেন মনে না-করেন যে আমি তাঁর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আর তবুও কিনা এখানে এসে আপনি আমায় সবার সন্দেহভাজন করে তুলেছেন এবং দেখাচ্ছেন যে, আপনার আমার মধ্যে আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক।'

'ম্যাডাম দুর্ভাগ্যক্রমে এ ছাড়া আর কোনো সম্ভাব্য বিকল্প পথ আমার ছিল না। নিদারুণ গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটা পুনরুদ্ধারের কাজে বহাল করা হয়েছে আমাকে। সুতরাং ম্যাডাম, বলতে বাধ্য হলাম, দয়া করে দলিলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিন।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন লেডি— নিমেষের মধ্যে উধাও হল তাঁর সুন্দর মুখের সমস্ত রং। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দুই চোখ— এমনভাবে টলমল করে উঠলেন যে আমি ভাবলাম এবার বুঝি জ্ঞান হারাবেন তিনি। তারপরেই প্রবল প্রচেষ্টায় আঘাতের বিপর্যয় থেকে নিজেকে সামলে নিলেন। আতীব্র বিস্ময় আর ঘৃণা মেশানো ক্রোধ মুখের প্রতিটি রেখা বিতাড়িত করলে আর সব ভাবকে।

'আপনি— আপনি আমায় অপমান করলেন, মি. হোমস!'

'ধীরে, ধীরে, ম্যাডাম, এসবে কোনো লাভ হবে না। চিঠিটা বার করে দিন।'

ঘণ্টার দিকে ছিটকে গেলেন লেডি।

'বাটলার এসে আপনাদের বাইরের পথ দেখিয়ে দেবে।'

'ঘণ্টা বাজাবেন না, লেডি হিলডা। যদি বাজান তো একটা কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্যে আমার যাবতীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। চিঠিটা দিয়ে দিন— তাহলেই সব কিছু দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলুন, সব বন্দোবস্ত আমি করে দেব। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে গেলেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করব না আমি।'

অপরূপ উদ্ধত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন লেডি হিলডা। রানির মতোই দর্পিত চেহারা তাঁর। নিষ্পলক দুই চোখ দিয়ে হোমসকে গেঁথে ফেলে যেন ওর অন্তরাত্মাসুদ্ধ পড়ে নিলেন উনি। ঘণ্টার দড়িতে হাত রেখেছিলেন বটে, দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজানো থেকে নিবৃত্ত করে নিলেন নিজেকে।

বললেন, 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন আপনি। এখানে আসা, অরপর ভ্রূকুটি করে একজন স্ত্রীলোককে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করাটা খুব পুরুষোচিত কাজ নয়, মি. হোমস। আপনি কিছু জানেন বলছেন। কী জানেন আপনি?'

'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, ম্যাডাম। পড়ে গেলে নিজেই চোট পাবেন। আপনি না-বসা পর্যন্ত আমি কথা বলব না! ধন্যবাদ।'

'আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, মি. হোমস।'

'এক মিনিটই যথেষ্ট, লেডি হিলডা। আমি জানি আপনি এডুয়ারডো লুকাসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, দলিলটা তাঁকে দিয়েছিলেন, অতি দক্ষতার সঙ্গে গতরাতে সেই ঘরেই আবার গেছিলেন এবং সুকৌশলে চিঠিটাকে বার করে এনেছেন কার্পেটের তলায় লুকোনো জায়গা থেকে।'

ছাই ছাই মুখে বিস্ফারিত চোখে হোমসের পানে তাকিয়ে ছিলেন লেডি হিলডা।

কথা বলার আগে বার দুয়েক ঢোক গিললেন।

তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি উন্মাদ, মি. হোমস— আপনি উন্মাদ!'

পকেট থেকে ছোট্ট এক টুকরো কার্ডবোর্ড বার করল হোমস। জিনিসটা ফটোগ্রাফ থেকে কেটে নেওয়া একটি স্ত্রীলোকের মুখের ছবি।

বললে, 'ভেবেছিলাম কাজে লাগতে পারে, তাই সবসময়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলাম এই ছবিটি। পুলিশম্যান ছবি দেখে চিনতে পেরেছে।'

যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল লেডি হিলডার— মাথা এলিয়ে পড়ল চেয়ারের পেছনে।

'স্বীকার করুন, লেডি হিলডা। চিঠিটা আপনার কাছেই আছে। ব্যাপারটাকে এখনও সামলে নেওয়া যায়। আপনাকে ঝামেলায় জড়ানোর কোনো অভিপ্রায় নেই। হারানো চিঠিটা আপনার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিলেই শেষ হয় আমার কর্তব্য। আমার উপদেশ নিন— সরলভাবে সব খুলে বলুন আমাকে। এ ছাড়া রেহাই পাওয়ার আর কোনো পথ আপনার নেই।'

প্রশংসনীয় তাঁর সাহস। এত কাণ্ডের পরেও হার মানবার পাত্রী নন।

'আবার আপনাকে বলছি, মি. হোমস, উদ্ভট কতকগুলো কল্পনার জাল বুনে চলেছেন আপনি!'

'আপনার জন্যে আমি দুঃখিত, লেডি হিলডা। আমার যথাসাধ্য করলাম আপনার জন্যে। সবই দেখছি বৃথা।'

ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ও। ঘরে ঢুকল বাটলার।

'মি. ট্রেলাওনি হোপ বাড়িতে আছেন?'

'পৌনে একটার সময় উনি বাড়িতে পৌঁছোবেন, স্যার।'

ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস।

বললে, 'আরও মিনিট পনেরো। বেশ, আমি অপেক্ষা করব।'

বাটলার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে-না-করতেই লেডি হিলডা জানু পেতে বসে পড়লেন হোমসের পায়ের কাছে। দুই হাত সামনে প্রসারিত করে সুন্দর মুখটি তুলে ধরলেন ওপর পানে। দরদর অশ্রুধারে সিক্ত সে-মুখ।

'মি. হোমস, আমাকে এযাত্রা ছেড়ে দিন! আমাকে বাঁচান!' অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতির উদ্দামতার যেন সাময়িক চিত্তবিকার ঘটে ওঁর।

'ঈশ্বরের দোহাই ওঁর কাছে এ-কথা বলবেন না! ওঁকে যে আমি বড়ো ভালোবাসি। ওঁর জীবনে এইটুকু ছায়াও আমি ফেলতে চাই না। আমি তো জানি, সে-আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওঁর মহান অন্তর।'

লেডি হিলডাকে ধরে তুলল হোমস। বললে, 'ধন্যবাদ, ম্যাডাম। আপনি যে এই শেষ

মুহূর্তেও আপনার বিচারবুদ্ধি ফিরে পেয়েছেন, এজন্যে ধন্যবাদ! আর একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যায় না। চিঠিটা কোথায়?'

তিরবেগে একটা লেখবার টেবিলের কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ডেস্কটা খুলে ফেললেন লেডি হিলডা। ভেতর থেকে বার করে আনলেন নীল রঙের একটা দীর্ঘ লেফাফা।

'এই সেই চিঠি, মি. হোমস। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ভেতরে কী আছে, তা আমি কোনোদিনই খুলে দেখিনি!'

'কী করে ফেরত দিই খামটা?' বিড় বিড় করতে থাকে হোমস। 'তাড়াতাড়ি, যা হয় একটা উপায় ভেবে বার করতেই হবে আমাদের! ডেসপ্যাচ-বাক্সটা কোথায়?'

'এখনও ওঁর শোবার ঘরে।'

'ওঃ, কী সৌভাগ্য! তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, বাক্সটা নিয়ে আসুন এখানে।'

মুহূর্ত পরেই লালরঙের একটা চ্যাটালো বাক্স হাতে ফিরে এলেন লেডি হিলডা।

'এর আগে কী করে খুলেছিলেন বাক্সটা? নকল চাবি আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। খুলুন।'

বুকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা চাবি বের করলেন লেডি হিলডা। ওপরদিকে ছিটকে গিয়ে খুলে গেল বাক্সের তালা! কাগজপত্রে ঠাসা ভেতরটা। নীল লেফাফাটা একদম ভেতরে ঠেসে দিলে হোমস। অন্যান্য দলিলের পাতার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখে দিলে বাক্সের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। বন্ধ হয়ে গেল বাক্স, চাবি ঘুরল এবং ফিরে গেল তা শোবার ঘরে।

হোমস বললে, 'এইবার আমরা তৈরি। এখনও দশ মিনিট হাতে আছে। আপনাকে আড়াল করতে গিয়ে অনেক দূরে গড়িয়েছি, লেডি হিলডা। তার প্রতিদানে আপনি শুধু এই সময়টুকুর মধ্যে বলুন, অকপটে বলুন, এই অসাধারণ ব্যাপারের আসল অর্থটা কী?'

'মি. হোমস, সবই বলব আপনাকে,' চিৎকার করে বললেন লেডি। 'ওঃ, মি. হোমস, ওঁকে এক মুহূর্তের জন্যও দুঃখ দেওয়ার আগে যেন আমার ডান হাতটা আমি কেটে ফেলি। সারা লন্ডনে আপনি এমন একজন মেয়েকে খুঁজে পাবেন না যে তার স্বামীকে আমার মতো এতখানি ভালোবাসে। তার, তবু আমি যা করছি— যা করতে আমি বাধ্য হয়েছি— তা যদি শুনতে পান তো জীবনে আর আমায় ক্ষমা করে উঠতে পারবেন না উনি। ওঁর মানসম্মান এতই সুমহান, সুউচ্চ যে কোনোরকম পদস্খলন ভুলত্রুটিকে উনি বিস্মৃত হতে পারেন না বা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন না। আমাকে সাহায্য করুন মি. হোমস। আমার সুখই তাঁর সুখ। অথচ একী মহাসংকটের মাঝে এসে পড়ল আমাদের দুজনের জীবন।'

'তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, সময় কমে আসছে!'

'মি. হোমস, সব কিছুর মূলে আছে আমার লেখা একটি চিঠি, আগে অবিবেচকের মতো, মহামূর্খের মতো লেখা একটা চিঠি, আবেগবিহ্বল, প্রেমাপ্লুত এক বালিকার লেখা একটা চিঠি। কারো ক্ষতিও করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জানি, উনি এ-চিঠিতে গুরু অপরাধ বলেই গণ্য করতেন। এ-চিঠি উনি পড়লে আমার ওপর ওঁর অটুট আস্থা চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যেত। এ-চিঠি লেখার পর অনেক বছর কেটে গেছে। ভেবেছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে গেছে সবাই। আর, তারপরেই এই লুকাস লোকটার কাছে শুনলাম যে চিঠিটা

তার হাতে এসে পৌঁছেছে এবং শিগ্‌গিরই আমার স্বামীর সামনে সে তা হাজির করবে। আমি অনুনয় করে দয়া ভিক্ষা করলাম ওর। সে বলল, চিঠিটা সে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারে একটি শর্তে। আমার স্বামীর ডেসপ্যাচ-বাক্স থেকে বিশেষ একটা দলিল এনে দিতে হবে তার হাতে। অফিসে ওর কয়েকজন গুপ্তচর আছে[৮]। তারাই এসে ওকে দলিলটার অস্তিত্ব জানিয়েছিল। আমাকে আশ্বাস দিলে যে এর ফলে আমার স্বামীর কোনো ক্ষতিই হবে না। আমার স্থানে নিজেকে কল্পনা করুন, মি. হোমস। এ-অবস্থায় কী করা উচিত আমার?'

'স্বামীকে বিশ্বাস করে অকপটে সব খুলে বলা।'

'আমি তা পারিনি, মি. হোমস, আমি তা পারিনি! একদিকে নিশ্চিন্ত ধ্বংস। অপরদিকে, স্বামীর কাগজপত্র অপহরণ করা ভয়ংকর কাজ মনে করলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। তার চেয়ে বরং স্নেহ, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর পরিণাম কী, তা জলের মতো স্বচ্ছ মনে হয়েছিল আমার কাছে। আমি তাই করলাম, মি. হোমস। চাবিটার একটা ছাপ নিলাম আমি। এই লুকাস লোকটা একটা নকল চাবি আনিয়ে দিলে আমায়। ডেসপ্যাচ-বাক্স খুলে কাগজটা নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম গোডোলফিন স্ট্রিটে।'

'সেখানে কী ঘটল, ম্যাডাম?'

'পূর্ব ব্যবস্থামতো দরজায় টোকা দিলাম আমি। দরজা খুলে দিলে লুকাস। এর পিছু পিছু এসে পৌঁছোলাম তার ঘরে। হল ঘরের দরজা দু-হাট করে রেখে এলাম এই কারণে যে লোকটার সঙ্গে একলা থাকতে ভয় ভয় করছিল আমার। ভেতরে ঢোকার সময়ে মনে আছে একজন স্ত্রীলোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ হল অচিরে। আমার চিঠিটা ও টেবিলের ওপর রেখেছিল। আমি দলিলটা তুলে দিলাম ওর হাতে। চিঠিটা আমাকে দিয়ে দিল ও। ঠিক এই মুহূর্তে, দরজার কাছে কীসের শব্দ শুনলাম। প্যাসেজে সিঁড়ির ধাপ ছিল। লুকাস চট করে কার্পেটটা তুলে ফেলে একটা চোরা গর্তের মধ্যে দলিলটা ঠেলে গুঁজে দিয়ে আবার কার্পেটটা পেতে দিল সমান করে।

'এরপরে যা ঘটল তা যেন এক টুকরো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। পলকের মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখলাম একটা মলিন, উন্মত্ত মুখ। কানে শুনলাম ফরাসি ভাষায় একজন স্ত্রীলোকের চিলের মতো তারস্বরে চিৎকার, 'প্রতীক্ষা আমার বিফলে যায়নি। শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি তোমায় ওই মেয়েটার সাথে!' শুরু হল বর্বরের মতো দারুণ ধস্তাধস্তি। লুকাসের হাতে দেখলাম একটা চেয়ার। আর, স্ত্রীলোকটার হাতে ঝলসে উঠল একটা ছোরা। তিরবেগে আমি বেরিয়ে পড়লাম এই দৃশ্য ছেড়ে— এক দৌড়ে এসে পড়লাম বাইরে, রাস্তায় পড়েও দৌড় থামালাম না। খণ্ডযুদ্ধের বীভৎস ফলাফল জানতে পারলাম পরের দিন সকালে— কাগজ পড়ে। চিঠিটা ফিরে পেয়ে সেরাতটা কিন্তু বড়ো সুখে কাটালাম আমি। তখন অবশ্য বুঝিনি ভবিষ্যতের গর্ভে লুকোনো এর বিষময় পরিণতি।

'পরের দিন সকালে বুঝলাম এক উৎপাত নিরোধ করতে গিয়ে আর এক উৎপাতের সৃষ্টি করেছি আমি। দলিল খোয়া যাওয়ায় আমার স্বামীর আতীব্র মানসিক যাতনা তিরের মতো গিয়ে আমার বুকে বিঁধল। তখনই আর কালবিলম্ব না-করে ভাবলাম তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলি আমার কীর্তি। কিন্তু অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। কেননা তা করা মানেই তো অতীতের

অন্যায় স্বীকার করা। সেইদিনই সকালে আপনার কাছে গেলাম এই উৎকট অপরাধের পুরো গুরুত্বটা জানতে। যে-মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম আমার কাজের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, সেই মুহূর্ত থেকে শুধু একটি চিন্তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল আমার মনের কোণে এবং সে-চিন্তা হল যেমন করেই হোক আমার স্বামীর দলিলটাকে ফিরিয়ে আনা। এমনও হতে পারে যে, লুকাস দলিলটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, এখনও তা সেইখানেই আছে। ভয়ংকর ওই স্ত্রীলোকটা ঘরে ঢোকার আগেই কাগজটা ও লুকিয়ে ফেলেছিল এবং সে না এসে পড়লে আমি বোধ হয় জানতেই পারতাম না তার গোপন স্থানের হদিশ। কী করে যাওয়া যায় তার ঘরে? দু-দিন চোখে চোখে রাখলাম জায়গাটাকে। কিন্তু একবারও দরজাটাকে খোলা অবস্থায় দেখলাম না। গতরাতে শেষ চেষ্টা করলাম। কী করেছিলাম এবং কীভাবে আমি কার্যোদ্ধার করি তা তো আপনি আগেই জেনেছেন। কাগজটা নিয়ে এলাম বাড়িতে। অপরাধ স্বীকার না-করে স্বামীর কাছে এ-দলিল ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পথ না-পেয়ে[৯] ভাবলাম নষ্ট করে ফেলব কাগজটাকে। হেভেনস ওঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি সিঁড়ির ওপর।'

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন উত্তেজিত ইউরোপীয় সেক্রেটারি।

'খবর আছে, মি. হোমস, কোনো খবর আছে?' চেঁচিয়ে ওঠেন উনি।

'কিছু আশা আছে।'

'আ, জয় ভগবান!' প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। 'প্রধানমন্ত্রীমশায় আমার সাথে লাঞ্চ খাবেন। আপনার আশার অংশ কি তিনিও নিতে পারেন? ইস্পাতকঠিন নার্ভ থাকা সত্ত্বেও আমি জানি এই ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে ঘুম উড়ে গেছে ওঁর চোখের পাতা থেকে। জেকবস, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে ওপরে আসতে বলবে কি? হিলডা ডিয়ার, এটা একটা রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাইনিং রুমে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে'খন।'

প্রধানমন্ত্রীর অচঞ্চল হাবভাবে সংযমের প্রকাশ দেখলাম। কিন্তু তবুও তাঁর চোখের দীপ্তি আর অস্থিসার হাতের মৃদু কম্পন থেকে বুঝলাম তরুণ সহকর্মীর উত্তেজনার কবল থেকে তিনিও নিস্তার পাননি।

'শুনলাম রিপোর্ট দেওয়ার মতো খবর এনেছেন, মি. হোমস?'

বন্ধুবরও উত্তর দিলে, 'এখনও কিন্তু তা পুরোপুরিই না-বাচক। যেখানে যেখানে এ-দলিলের হদিশ পাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতে খবর নিয়েছি আমি। কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা যে নেই, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয়, মি. হোমস। এ-রকম একটা আগ্নেয়গিরির ওপর আমরা তো চিরকাল বসে থাকতে পারি না। নিশ্চিত কিছু আমাদের পেতেই হবে।'

'আশা আছে, তা পাব। সেই কারণেই এখানে আমি এসেছি। এ-ব্যাপার নিয়ে আমি যতই ভাবছি, ততই একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যাচ্ছে আমার মনে! বিশ্বাসটা এই— চিঠিটা কস্মিনকালেও এ-বাড়ির বাইরে যায়নি।'

'মি. হোমস!'

'যদি যেত, তাহলে তা এতক্ষণে জনসাধারণের সামনেই উপস্থাপিত হত!'

'কিন্তু এ-বাড়ির মধ্যেই রেখে দেওয়ার জন্যে কেই-বা সরাতে যাবে বলুন? আর, কেনই-বা নেবে সে?'

'আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা কেউ নিয়েছে।'

'তাহলে ডেসপ্যাচ-বাক্স থেকে চিঠিটা উধাও হল কেমন করে শুনি?'

'আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা আদৌ ডেসপ্যাচ-বাক্সের বাইরে গেছে।'

'মি. হোমস, বড়ো অসময়ে এসব রঙ্গ-পরিহাস শুরু করেছেন। আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চিঠিটা বাক্স থেকে উধাও হয়েছে।'

'মঙ্গলবার সকালের পর থেকে বাক্সটা আর পরীক্ষা করেছিলেন?'

'না। তার আর দরকার ছিল না।'

'আমার অনুমান, আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে চিঠিটা।'

'অসম্ভব। আমি বলছি, অসম্ভব।'

'কিন্তু আমি তো পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না, বিশ্বাসও করে উঠতে পারছি না। এ-রকম ব্যাপার ঘটতে তো এর আগেও আমি দেখেছি। ধরে নিচ্ছি, নিশ্চয় আরও কাগজপত্র ছিল বাক্সের মধ্যে। সেইসবের মধ্যেই মিশে থাকতে পারে দলিলটা।'

'দলিলটা ছিল সবার ওপরে।'

'কেউ হয়তো নেড়েছিল বাক্সটাকে। তাতেই স্থানভ্রষ্ট হয়েছে।'

'না, না। আমি সব কিছু বার করে দেখেছিলাম।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'হোপ, অনায়াসেই তো সমাধান করা যায় এ-সমস্যার। ডেসপ্যাচ-বাক্সটা এখানে আনাও দিকি।'

ঘণ্টা বাজালেন সেক্রেটারি।

'জেকবস, আমার ডেসপ্যাচ-বাক্সটা নামিয়ে আনো। সময়ের হাস্যকর অপচয় ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না। এই করলেই যদি সন্তুষ্ট হন তো, তবে তাই হোক। ধন্যবাদ, জেকবস, এখানে রাখো। চাবিটা সবসময়ে আমার ঘড়ির চেনে লাগানো থাকে। এই দেখুন এই কাগজগুলো। লর্ড মেররো'র চিঠি, স্যার চার্লস হার্ডির রিপোর্ট, বেলগ্রেড থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণী, রাশিয়ান-জার্মান ফসল-কর সংক্রান্ত টীকাটিপ্পনী, মাদ্রিদ-এর চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ার্সের চিরকুট— গুড হেভেনস! এটা কী? লর্ড বেলিনগার! লর্ড বেলিনগার!'

ওঁর হাত থেকে নীল লেফাফাটা ছিনিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী।

'হ্যাঁ, এইটাই— চিঠিটাও আছে। হোপ, আমার অভিনন্দন নাও!'

'ধন্যবাদ! ওঃ, একী গুরুভার পাথর নেমে গেল আমার বুক থেকে। কিন্তু এ যে অকল্পনীয়— অসম্ভব। মি. হোমস, আপনি ভেলকি জানেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক। কী করে জানলেন আপনি যে চিঠি এখানেই রয়েছে?'

'কেননা, আমি জানতাম এ-চিঠি আর কোথাও নেই।'

'আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি।' ক্ষিপ্তের মতো দরজার কাছে ছুটে গেলেন সেক্রেটারি। 'আমার স্ত্রী কোথায়? ওকে বলে আসি, সব ঠিক হয়ে গেছে। হিলডা। হিলডা।' সিঁড়ির ওপর থেকে ভেসে এল ওঁর কণ্ঠস্বর।

চকচকে চোখে মিট মিট করে হোমসের পানে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী।

বললেন, 'এবার বলুন তো, মশায়। এ ব্যাপারে চোখের দেখার চেয়ে অদেখা জিনিসই আছে বেশি। চিঠিটা কী করে ফিরে এল বাক্সের মধ্যে?'

আশ্চর্য ওই দুটি চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে থেকে মুচকি হেসে সরে গেল হোমস। 'আমাদেরও তো কিছু কিছু কূটনৈতিক মন্ত্রগুপ্তি আছে।' বলে, টুপিটা তুলে নিয়ে ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

টীকা

১. **কার্পেটের কারচুপি :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ২৮ জানুয়ারি ১৯০৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটির পাণ্ডুলিপি হ্যাভারফোর্ড কলেজের সংগ্রহে রক্ষিত আছে।

২. **লর্ড বেলিনগার :** হোমস এবং ওয়াটসনের জীবদ্দশায় মাত্র তিনজন মানুষ দু-বার করে বা তার বেশি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁরা হলেন বেঞ্জামিন ডিসরেইলি (১৮৬৮ এবং ১৮৭৪-১৮৮০), উইলিয়ম গ্ল্যাডস্টোন (১৮৬৮-১৮৭৪, ১৮৮০-১৮৮৫, ১৮৮৬ এবং ১৮৯২-১৮৯৪) এবং রবার্ট সলসবেরি (১৮৮৫-১৮৮৬, ১৮৮৬-১৮৯২ এবং ১৮৯৫-১৯০২)। ওয়াটসন বর্ণিত তপকৃশ চেহারা, উন্নত নাক, ইগল পাখির মতো চোখ প্রভৃতি বিবরণ থেকে বেশির ভাগ গবেষক লর্ড বেলিংগারকে মনে করেন রবার্ট সলসবেরির প্রতিরূপ।

৩. **ইনিই বটে :** হোমস-গবেষকদের মতে 'ইনি' হলেন কাইজার দ্বিতীয় উইললেম (১৮৫৯-১৯৪১) জার্মানির সম্রাট এবং ১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রুশিয়ার রাজা পরিচিত ছিলেন দ্বিতীয় উইলিয়ম নামেও।

৪. **মূল কারণটাই-বা কী :** এই চিঠি নিয়ে কে যে কী করতে পারেন, তা শার্লক হোমস বুঝতে না-পেরে এহেন প্রশ্ন করবেন— এ-কথা ভাবাই যায় না।

৫. **ওবারস্টাইন, লা রোথিয়েরা :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস' গল্পে এই দুটি চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমজনের ভূমিকা গল্পে বেশ উল্লেখযোগ্য।

৬. **ওরা থাকে ওয়েস্ট এন্ডের এক প্রান্তে :** 'ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস' গল্পে ওবাস্টাইনের বাড়ি কেনসিংটনে এবং লা রোথিয়েরার বাসস্থান নটিংহিলে বলে জানা যায়।

৭. **স্থায়ী প্রকৃতির একটা বাতিকে আক্রান্ত :** বাতিকটা যে স্থায়ী প্রকৃতির তা কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বেশ তাড়াতাড়ি জেনে ফেলেছেন।

৮. **অফিসে ওর কয়েকজন গুপ্তচর আছে :** তাদের সন্ধান করার ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? মনে হয় ঘটনার সামঞ্জস্য রাখতে প্লটে জোড়াতালি লাগানোর জন্য হঠাৎ করে এই গুপ্তচরদের সৃষ্টি করলেন লেখক।

৯. **ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পথ না-পেয়ে :** ডেসপ্যাচ বক্সের নকল চাবি ছিল হিলডার কাছে। বাক্সটাও শোবার ঘরে রাখা ছিল। বিস্তর সময় পেয়েও তিনি রেখে দিতে পারলেন না চিঠিটা? এতই বোকা লেডি হিলডা?

হিজ লাস্ট বাও

ভূমিকা

শার্লক হোমসের বন্ধুদের জন্য একটি সুসংবাদ। এখনও সে বেঁচে আছে। গেঁটেবাতের আক্রমণে মাঝেসাঝে একটু কাহিল হয়ে পড়লেও বেঁচে আছে। ইস্টবোর্ন থেকে পাঁচ মাইল দূরে ডাউন্সের[১] একটা খামারবাড়িতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আর চাষবাস নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে। এবারকার অবসর নেওয়ার মধ্যে আর ফাঁকি নেই বলেই কুবেরের সম্পদও পায়ে ঠেলে দিয়েছে— হাজার প্রলোভনেও কোনো কেসের মধ্যে মাথা গলায়নি। জার্মান যুদ্ধ শুরু হতেই অবশ্য আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি বন্ধুবর— ধীশক্তি ধার দিয়েছে গভর্নমেন্টকে— কাজে লাগিয়েছে ওর অদ্ভুত তৎপরতা— ঐতিহাসিক সেইসব কাহিনি নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে 'হিজ লাস্ট বাও'। এই সুযোগে আমার খাতা থেকে ওর আশ্চর্য কিছু পুরোনো কীর্তিকলাপও[২] উদ্ধার করে উপহার দিলাম এই গ্রন্থে।

জন এইচ. ওয়াটসন, এম. ডি.

টীকা

১. **ডাউন্সের :** ডাউন্স বলতে সাউথ ডাউন্স বা সাসেক্স ডাউন্সকে বুঝিয়েছেন ওয়াটসন।

২. **পুরোনো কীর্তিকলাপও :** যেমন বলা যেতে পারে 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স' গল্পের কথা।

উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ উইসটেরিয়া লজ]

১. কিম্ভূতকিমাকার অভিজ্ঞতা

১৮৯২ সালের মার্চ মাস[২]। দিনটা বড়ো বিষণ্ণ, ঝোড়ো বাতাস বইছে একনাগাড়ে। লাঞ্চ খেতে বসে হোমস একটা টেলিগ্রাম পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার জবাবও লিখে দিয়েছে। তারপর এ নিয়ে আর কথা বলেনি বটে, তবে আগুনের চুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে এক মনে তা নিয়ে ভাবছে আর মাঝে মাঝে টেলিগ্রামের বয়ানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এক সময়ে সে আচমকা ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে। দেখলাম, দুষ্টুমি নাচছে তার দুই চোখে। বলল, 'ওয়াটসন, হাজার হলেও তুমি একজন সাহিত্যিক। "কিম্ভূতকিমাকার" শব্দটার সংজ্ঞা কী বলতে পার?'

'অদ্ভুত। আশ্চর্য'— বললাম আমি।

সংজ্ঞাটা পছন্দ হল না হোমসের। মাথা নেড়ে বললে, 'তার চাইতেও বেশি। এ-শব্দের পেছনে ছায়ার মতো যেন লেগে আছে অতি ভয়ংকর বিয়োগান্তক কিছু একটা ব্যাপার। অপরাধীর ক্ষেত্রে এই কিম্ভূতকিমাকার শব্দটা যে কতখানি গভীর তোমার লেখা আমার আগেকার কাহিনিগুলোর মধ্যে তার প্রমাণ পাবে। লালচুলো লোকদের ঘটনাটা মনে করে দেখ। প্রথম দিকে তা কিম্ভূতকিমাকার ঠেকলেও শেষের দিকে দেখা গেল বেপরোয়া ডাকাতির কেস। পাঁচটা কমলাবিচির সেই অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার কেসটার কথাই ধরো না কেন। কেস শেষ হল খুনের ষড়যন্ত্রে। কিম্ভূতকিমাকার শব্দটা শুনলেই তাই সজাগ হই।'

'টেলিগ্রামে শব্দটা আছে বুঝি?' শুধোই আমি।

হোমস তখন পড়ে শোনাল টেলিগ্রামটা : 'এইমাত্র একটা অবিশ্বাস্য আর কিম্ভূতকিমাকার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। আপনার পরামর্শ পাব কি?— স্কট ইক্লিস, পোস্ট অফিস, শেরিং ক্রস[৩]।'

'পুরুষ না মহিলা?'[৪]

'পুরুষ তো বটেই। মহিলারা কখনো রিপ্লাই-পেড টেলিগ্রাম পাঠায় না, সশরীরে হাজির হয়।'

'দেখা করবে তো?'

'ভায়া ওয়াটসন, তুমি তো জান কর্নেল ক্যারুথার্সকে[৫] খাঁচায় পোরার পর থেকে কীরকম একঘেয়ে ভাবে দিন কাটছে আমার। আমার এই মনটা হল ছুটন্ত ইঞ্জিন, যে-কাজের জন্যে সৃষ্টি সে-কাজের মধ্যে না-থাকলে নিজের মনেই ছুটতে ছুটতে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। জীবন বড়ো মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজগুলোয় অপরাধ-জীবাণুর চিহ্নমাত্র নেই, হঠাৎ বড়ো বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অপরাধ দুনিয়া থেকে রোমান্স আর ঔদ্ধত্য যেন হঠাৎ চিরবিদায় নিয়েছে।

কাজেই যত তুচ্ছ হোক না কেন, কোনো মামলাই পায়ে ঠেলতে এখন রাজি নই। হুম, মক্কেল ভদ্রলোক এসে গেলেন মনে হচ্ছে।'

সিঁড়ির ওপর হিসেবি পায়ের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন। গালপাট্টায় পাক ধরেছে, চেহারার মধ্যে অভিজ্ঞতা মাখানো। ভারী মুখ আর জাঁকালো আচরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছে জীবনের ইতিহাস। গোড়ালি ঢাকা কাপড় থেকে আরম্ভ করে সোনার চশমা পর্যন্ত সর্বত্র লেখা একই কাহিনি : ভদ্রলোক সনাতনী, গির্জেভক্ত, সংরক্ষণশীল, গোঁড়া এবং আদর্শ নাগরিক। কিন্তু আশ্চর্য কোনো অভিজ্ঞতার আক্রমণে বেশ বিপর্যস্ত। মনের ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। চুল খাড়া, মুখ লাল, সাধারণ হাবভাব উত্তেজিত। ঘরে ঢুকেই ঝটপট শুরু করে দিলেন কাজের কথাবার্তা। রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'মি. হোমস, জীবনে এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়িনি। অভিজ্ঞতাটা যেমন অস্বস্তিকর, তেমনি আশ্চর্য। অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। এ কী উৎপাত বলুন তো। আমি এর মানে জানতে চাই।'

স্নিগ্ধকণ্ঠে হোমস বললে, 'মশাই, আগে বসুন। তারপর বলুন প্রথমেই আমাকে স্মরণ করলেন কেন?'

'আরে মশাই, এ-কেস পুলিশের আওতায় আসে বলে মনে হয় না আমার। সব ঘটনা শুনলে আপনিও বুঝবেন। এমনিও ফেলে রাখা যায় না, কিছু একটা করা দরকার। যদিও প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আমার নেই, কিন্তু আপনার নাম শোনবার পর...'

'বেশ, বেশ। এবার বলুন তো সঙ্গেসঙ্গে এলেন না কেন?'

'কী বলতে চান?'

ঘড়ি দেখল হোমস। বলল, 'এখন সোয়া দুটো। একটা নাগাদ পাঠিয়েছিলেন টেলিগ্রাম। কিন্তু আপনার প্রসাধন আর পরিচ্ছদের অবস্থা দেখে একমাত্র অন্ধ ছাড়া প্রত্যেকেই বলবে, ঘুম ভাঙার পর থেকেই ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন আপনি।'

হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুল সমান করে নিয়ে না-কামানো গালে হাত বোলালেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'বলেছেন ঠিক, মি. হোমস। প্রসাধন-পারিপাট্য নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি তখন ওইরকম একখানা বাড়ি থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। তারপর থেকে আপনার কাছে আসা পর্যন্ত ক্রমাগত দৌড়োচ্ছি নানান তত্ত্ব তল্লাশি নিয়ে। হাউস এজেন্টের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মি. গারসিয়াকে বাড়িভাড়া দেওয়াই আছে, উইসটেরিয়া লজের ব্যাপারে কোনোরকম লটঘট নেই।'

'মি. স্কট ইক্লিস, আপনি দেখছি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনের মতো উলটোভাবে গল্প শুরু করেন, শেষের কাহিনি আগে বলে দেন। বড়ো বাজে অভ্যেস। ভাবনাচিন্তাগুলো আগে মনে মনে সাজিয়ে নিন। তারপর পর পর যেভাবে যা-যা ঘটেছিল সব বলে যান। বলুন কেন চুল না-আঁচড়ে দাড়ি না-কামিয়ে, বুট আর ওয়েস্টকোটের বোতাম পর্যন্ত ঠিকমতো না-লাগিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসেছেন আমার পরামর্শ আর সাহায্য নিতে।'

মক্কেল ভদ্রলোক হতাশ মুখভঙ্গি করে তাকালেন নিজের বিপর্যস্ত চেহারার দিকে। বললেন, 'কী করব বলুন, জীবনে এ-রকম ঝামেলায় পড়িনি। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। গোড়া থেকে বলছি শুনুন। শোনবার পর বুঝবেন কেন এইভাবে আপনার সামনে—'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হল না, বাইরে একটা হুড়মুড় আওয়াজ, মিসেস হাডসনের ঝটিতি দ্বার উন্মোচন এবং ঝড়ের মতো রঙ্গস্থলে গাঁট্টাগোট্টা দুই পুলিশ অফিসারের প্রবেশ। এদের একজনকে আমি চিনি— স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর গ্রেগসন[৬]। অত্যুৎসাহী, সাহসী কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দৌড় সীমিত। শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গী অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিল গ্রেগসন। সারে কন্সট্যাবুলাবির ইনস্পেকটর বেলেজ।

তারপর বললে, 'মি. হোমস, শিকারের পিছু নিয়ে ছুটে এসেছি এখানে।' অতঃপর তার ডালকুত্তা-চক্ষু নিবদ্ধ হল দর্শনার্থীর ওপর— 'আপনার নাম মি. জন স্কট ইক্লিস, নিবাস লী-এর পপহ্যাম হাউসে, কেমন?'

'অবশ্যই।'

'সকাল থেকে আপনাকে ফলো করছি আমরা।'

'টেলিগ্রামটা দেখে বুঝলেন যে, এখানে এসেছেন উনি?' বললে হোমস।

'ঠিক ধরেছেন। শেরিং ক্রস পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম কার দরজা মাড়িয়েছেন। তারপর সোজা চলে এলাম।'

'কিন্তু ফলো করছেন কেন? কী চান?' দর্শনার্থীর প্রশ্ন।

'আপনার জবানবন্দি। উইসটেরিয়া লজ নিবাসী মি. অ্যালয়সিয়াস গারসিয়া কাল রাতে মারা গেছেন কীভাবে, সেই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।'

বিস্ফারিত চোখে সোজা হয়ে বসলেন মক্কেল ভদ্রলোক। বিস্মিত মুখ থেকে তিরোহিত হল যাবতীয় বর্ণ। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'মারা গেছেন? বলছেন কী? মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছেন।'

'কিন্তু কীভাবে? অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?'

'খুন হয়েছেন।'

'ও গড! কী সাংঘাতিক! আপনি... আপনি কি তাহলে আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'নিহত ব্যক্তির পকেটে আপনার লেখা চিঠি পাওয়া গেছে। আপনি লিখেছিলেন, কাল রাতটা তাঁর বাড়িতে থাকবেন।'

'হ্যাঁ লিখেছিলাম।'

'আচ্ছা! লিখেছিলেন তাহলে!'

ফস করে বেরিয়ে পড়ল পুলিশ নোটবই।

'এক সেকেন্ড, গ্রেগসন।' বাধা দিল শার্লক হোমস, 'তুমি চাও সাদাসিধে একটা জবানবন্দি, কেমন?'

'সেইসঙ্গে মি. স্কট ইক্লিসকে হুঁশিয়ারও করে দিতে চাই— জবানবন্দি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতে পারে।'

'তুমি ঘরে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে সব কথাই বলতে যাচ্ছিলেন মি. ইক্লিস। ওয়াটসন, একটু ব্র্যান্ডি আর সোডা দাও ওঁকে। মি. ইক্লিস, এবার যা বলতে যাচ্ছিলেন। ঘরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ঠিক যেভাবে শুরু করছিলেন, ওইভাবে চালিয়ে যান।'

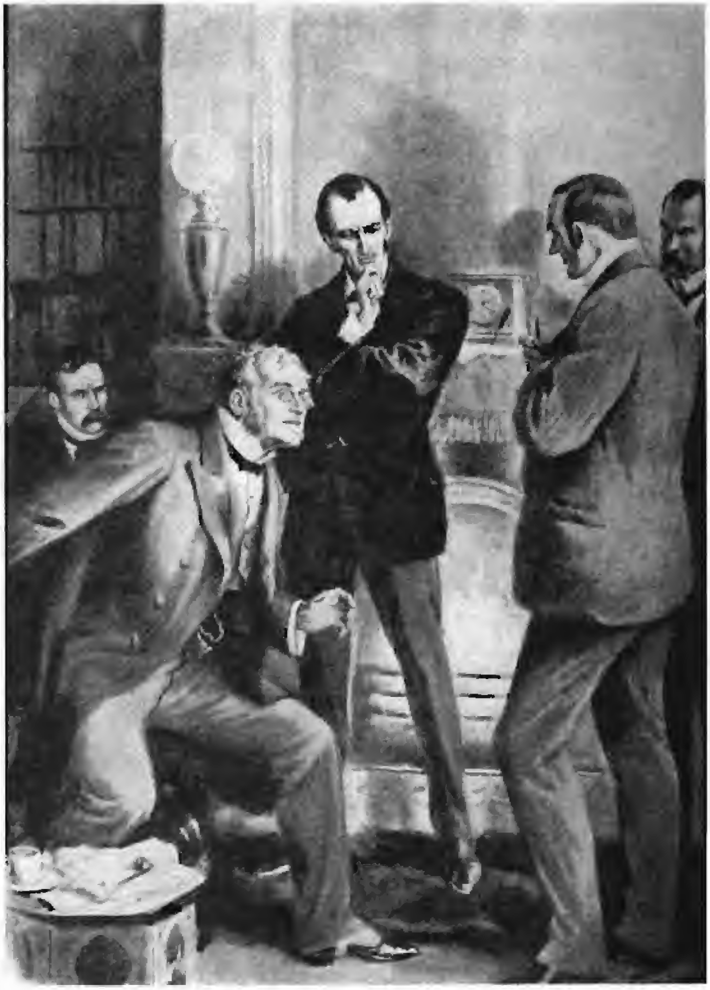

'এ তো ভয়ংকর! আপনি আশা করি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন না?'
আর্থার টুইডল, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৮

কোঁত করে ব্র্যান্ডি-সোডা গিলে নিলেন দর্শনার্থী। রং ফিরে এল মুখে। সন্দিগ্ধ চোখে ইনস্পেকটরের নোটবইয়ের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন অসাধারণ জবানবন্দি।

'আমি বিয়ে করিনি। মিশুকে বলে এন্তার বন্ধুবান্ধব। এদের মধ্যে একটি ফ্যামিলির নাম মেলভিল। এককালে এদের ড্রিঙ্কসের কারবার ছিল, এখন রিটায়ার করেছে। থাকে কেনসিংটনের অ্যালবামারলে ম্যানসনে। কয়েক হপ্তা আগে এর বাড়িতেই টেবিলে আলাপ হল একজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে, নাম তার গারসিয়া। শুনলাম, জন্মসূত্রে সে স্পেনের মানুষ। দূতাবাসের সঙ্গেও কীরকম একটা যোগসূত্র আছে। চমৎকার ইংরেজি বলে, ব্যবহার বড়ো মধুর, দেখতেও বড়ো মিষ্টি। এমন অপূর্ব চেহারা জীবনে দেখিনি।'

'বন্ধুত্ব নিবিড় হল ইয়ংম্যানের সঙ্গে। বেশ লাগত গারসিয়াকে। আমার লীয়ের বাড়িতে এল

আলাপ যেদিন হল সেইদিনই। তারপর আমাকে নেমন্তন্ন করল ওর বাড়ি উইসটেরিয়া লজে দিন কয়েক কাটিয়ে আসার জন্যে। বাড়িটা এশার আর অক্সশটের মাঝামাঝি জায়গায়। গতকাল সন্ধ্যায় এশার গেলাম কথামতো।'

'বাড়ির খবর আগেই শুনেছিলাম গারসিয়ার মুখে। দেশোয়ালি একটি চাকরের সঙ্গে থাকে গারসিয়া। খুব বিশ্বাসী লোক। গারসিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম সে করে। ইংরিজিটা বলে ভালো, সংসার ঠেলে নিজের হাতে। এ ছাড়া আছে একজন পাচক— দেশে দেশে বেড়াতে গিয়ে পথে কুড়িয়ে পাওয়া বলতে পারেন— শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা নেই, কিন্তু রাঁধে চমৎকার। কথার ফাঁকেই জেনেছিলাম এসব। গারসিয়া আরও বলেছিল, সারে-র বুকে অদ্ভুত এই গেরস্থালির মধ্যে থাকতে হয় তাকে। গেরস্থালিটা যা শুনেছিলাম তার চাইতে যে ঢের বেশি অদ্ভুত, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম পরে।'

'এশারের মাইল দুয়েক দক্ষিণাঞ্চলে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলাম আমি। মাঝারি সাইজের বাড়ি, রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে, বাড়ির সামনের পথটার দু-পাশে উঁচু উঁচু চির সবুজ গাছের সারি। বেশ সেকেলে বাড়ি, জরাজীর্ণ অবস্থা, মেরামত হয়নি অনেকদিন। ঘাসছাওয়া পথ মাড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল ছ্যাতলা পড়া রোদ আর বৃষ্টিতে বিবর্ণ দরজার সামনে। গারসিয়া নিজে দরজা খুলে বেশ খাতির করে আমাকে নিয়ে গেল ভেতরে। মালপত্র বয়ে নিয়ে গেল চাকরটা। দেখলুম কীরকম যেন মিইয়ে পড়া বিমর্ষ চেহারা তার। গারসিয়া আগে দেখাল আমার শোবার ঘর। পুরো বাড়িটাই যেন বুকের ওপর চেপে বসে, মন যেন দমে যায়। খেতে বসে গারসিয়া সমানে বকে চললেও লক্ষ করলাম, কথার মধ্যে সংগতি নেই। ঝাপসা আবোল-তাবোল বকুনির মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। এক নাগাড়ে টেবিলে আঙুলের টরে টক্কা বাদ্যি বাজিয়ে, কখনো নখ কামড়ে নানারকমভাবে গারসিয়া বুঝিয়ে দিলে, ভেতরে ভেতরে ও যেন দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছে। খাবার-টাবারও খুব ভালো রান্না হয়নি, পরিবেশনের মধ্যেও খুঁত রয়েছে। বিষণ্ণ আর কাঠখোট্টা চাকরটা হাজির থাকায় খাওয়ার আনন্দটাও যেন মাঠে মারা গেল। বেশ কয়েকবার ভাবলাম, ছুতোনাতা করে সরে পড়ি, ফিরে যাই লী-তে।

'আপনারা দুজনে যে-ব্যাপারে তদন্ত করতে নেমেছেন, একটা ঘটনা শুনলে সে-ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত ঘটতে পারে। তখন অবশ্য এ নিয়ে একদম ভাবিনি। খাওয়া যখন শেষ হতে চলেছে, একটা চিরকুট এনে দিলে চাকরটা। লক্ষ করলাম, চিরকুটটা পড়েই যেন আগের চাইতে উন্মনা আর বিচিত্র হয়ে গেল গারসিয়া। এতক্ষণ জোর করে কথা বলে অতিথি আপ্যায়নের চেষ্টা করছিল। চিরকুট পাওয়ার পর সে-চেষ্টাও আর করল না। একটার পর একটা সিগারেট টানতে টানতে গুম হয়ে বসে রইল। চিরকুটে কী লেখা আছে, সে-সম্পর্কেও কিছু বলল না। এগারোটা নাগাদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম শোবার ঘরে গিয়ে। কিছুক্ষণ পর দরজায় এসে দাঁড়াল গারসিয়া। ঘর তখন অন্ধকার। জিজ্ঞেস করল আমি ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে তলব করেছি কি না। করিনি বললাম। এত রাতে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইল গারসিয়া। ওর মুখেই জানলাম, রাত কম হয়নি— প্রায় একটা। এর পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই রাত কাবার।'

'এবার আসছি আমার কাহিনির সবচেয়ে অদ্ভুত জায়গায়। ঘুম যখন ভাঙল, রোদ তখন বেশ চড়চড়ে। ঘড়ি দেখলাম, প্রায় ন-টা বাজে। বলে রেখেছিলাম, আটটায় যেন তুলে দেওয়া হয়

আমাকে। ডাকেনি দেখে অবাক হলাম। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম চাকরকে। সাড়া পেলাম না। ঘণ্টা বিগড়োয়নি তো? ধড়ফড় করে কোনোমতে জামাকাপড় পরে নিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে এলাম গরম জল চাইতে। কাকপক্ষীকেও দেখতে পেলাম না। হল ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করলাম। কেউ জবাব দিল না। ঘরে ঘরে দৌড়োলাম। সব ঘরই ফাঁকা। আগের রাতে গারসিয়া দেখিয়েছেন কোন ঘরে শোয়। সেই ঘরে গিয়ে পাল্লা খুলে ঢুকলাম ভেতরে। ঘর খালি, বিছানায় কেউ শোয়নি— চাদর নিভাঁজ! চাকরবাকর সমেত গৃহস্বামীও সটকেছে বুঝলাম। একরাতেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে পরদেশি রাঁধুনি, বিদেশি চাকর এবং ভিনদেশি গৃহস্বামী! উইসটেরিয়া লজে এর পর আর কেউ থাকে।'

দু-হাত ঘষতে ঘষতে আপনমনে খুকখুক করে হাসতে হাসতে বিচিত্র কাহিনি শ্রবণ করল শার্লক হোমস। বলল, 'আপনার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তুলনাবিহীন। এবার বলুন, তারপর কী করলেন।'

'রেগে টং হলাম। প্রথমে ভাবলাম, নিশ্চয়ই গাড়োয়ানি ইয়ার্কি করা হচ্ছে আমার সঙ্গে। ব্যাগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম এশারের দিকে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ল্যান্ড এজেন্ট অ্যালান ব্রাদার্সের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, বাড়িটা তাদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তখন মনে হল এত কাণ্ড নিশ্চয়ই আমাকে বোকা বানানোর জন্যে করা হয়নি, আসলে ভাড়া না-দিয়ে পালিয়েছে গারসিয়া। মার্চের প্রায় শেষ, শেষ কয়েকটা দিনের ভাড়া তো মেরে দেওয়া গেল। কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়ল, যখন শুনলাম, ভাড়া আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরে ফিরে এসে গেলাম স্পেনের দূতাবাসে। গারসিয়াকে কেউ চেনে না সেখানে। গেলাম মেলভিলের বাড়িতে। কিন্তু দেখলাম, আমার চাইতেও সে কম খবর রাখে গারসিয়া সম্পর্কে। সবশেষে আপনার কাছ থেকে টেলিগ্রামের জবাব পেয়ে সটান চলে এলাম এখানে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন ইনস্পেকটরদের মুখে শুনছি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে উইসটেরিয়া লজে। যা বললাম, তা সত্যি এ ছাড়া কোনো খবরই আমি রাখি না। কিন্তু পুলিশকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে চাই।'

অমায়িক স্বরে ইনস্পেকটর গ্রেগসন বলল, 'মি. স্কট ইক্লিস, আপনি যা যা বললেন, তার সবই প্রায় ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, ওই চিরকুটখানা, খাবার টেবিলে যা হাজির করেছিল। তারপর কী গতি হয়েছিল চিরকুটটার লক্ষ করেছিলেন কি?'

'দলা পাকিয়ে আগুনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল গারসিয়া।'

'মি. বেনেজ, কী মনে হয় আপনার?'

মি. বেনেজ মৃদুমন্দ হাসল। পকেট থেকে বার করল একটা দলাপাকানো বিবর্ণ কাগজ। ভদ্রলোকের মোটাসোটা লালচে ফুলো মুখের চামড়ার ভাঁজে ঢাকা অত্যুজ্জ্বল অসাধারণ চক্ষু সত্যিই নজর কাড়বার মতো। বলল, 'মি. হোমস, গারসিয়া একটু বেশি জোরে ছুড়েছিল চিরকুটটা, চুল্লি টপকে গিয়ে ওটা পড়েছিল পেছনে। না-পোড়া অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছি আমি।'

মৃদু হেসে তারিফ জানাল হোমস। বলল, 'এ-রকম একটা কাগজ যখন খুঁজে পেয়েছেন, তখন কি ধরে নিতে পারি, পুরো বাড়িটাই খুঁজেছেন তন্নতন্ন করে।'

'আমার কাজের ধারাই সে-রকম, মি. হোমস। মি. গ্রেগসন, পড়ব?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল লন্ডন ইনস্পেকটর।

কাগজটা সাধারণ ক্রীম-লেড পেপার। জলছাপ নেই। একটা কাগজের চার ভাগের এক ভাগ। ছোটো ফলাওলা কাঁচি দিয়ে কাটা কাগজ। তিন ভাঁজ করে লাল গালা দিয়ে সিলমোহর করে একটা চেপটা ডিমের মতো জিনিস দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চাপা হয়েছে। ঠিকানাটা উইসটেরিয়া লজের মি. গালিসার নামে। চিঠির বয়ান :- 'আমাদের নিজেদের রং সবুজ আর সাদা। সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ। মূল সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডাইনে সপ্তম, সবুজ উলের আচ্ছাদন। তাড়াতাড়ি। ডি।' হাতের লেখা মেয়েলি, সরু মুখ কলমে লেখা। কিন্তু ঠিকানাটা হয় অন্য কলমে, না হয় অন্য কারো হাতে লেখা। বেশ মোটা, বলিষ্ঠ লেখা।

'চিরকুটে চোখ বুলিয়ে হোমস বলল, সত্যিই আশ্চর্য চিঠি। খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। মি. বেনেজ, ছোটোখাটো দু-একটা ব্যাপার এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই। ডিশের মতো জিনিসটা হল শার্টের কাফলিংক, সিলমোহর করা হয়েছে তা-ই দিয়ে। কাঁচিটা নখকাটা কাঁচি। দু-বার কাঁচি মারা হয়েছে প্রতিবার, দু-বারেই দেখুন একইভাবে বেঁকে বেঁকে পড়েছে কাঁচির ফলা।'

শুকনো হাসি হাসল বেনেজ। বলল, 'ভেবেছিলাম, সব খবর বার করতে পেরেছি। চিঠির বয়ান সম্বন্ধে কিন্তু এখনও যে তিমিরে, সেই তিমিরে। শুধু বুঝছি, এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আর সব কিছুর মূলে একজন স্ত্রীলোক রয়েছে।'

নড়েচড়ে বসলেন মি. ইক্লিস। বললেন, 'মি. গারসিয়ার কী হল তা কিন্তু এখনও শুনলাম না।'

গ্রেগসন বললে, 'বাড়ি থেকে প্রায় একমাইল দূরে অক্সশট কমনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে গারসিয়াকে। ভারী বালির বস্তা বা এ-জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে মেরে তার খুলি ভেঙে একেবারে পিণ্ডি চটকে দেওয়া হয়েছে। জায়গাটা নির্জন, সিকি মাইলের মধ্যে কোনো বাড়ি নেই। প্রথমে মাথায় মারা হয়েছিল পেছন থেকে। মারা যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে থেঁতো করা হয়েছে মাথাটা। বড়ো ভয়ংকর আক্রমণ। কারো পায়ের ছাপ বা আততায়ীদের কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।'

'উদ্দেশ্যটা ডাকাতি নয় তো?'

'ডাকাতির কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি।'

কাঁপা গলায় মি. ইক্লিস বললেন, 'কিন্তু আমার সঙ্গে গারসিয়ার মৃত্যুর কী সম্পর্ক? কিছুই তো জানি না। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?'

'খুব সহজ কারণে'— বলল ইনস্পেকটর বেনেজ, 'নিহত ব্যক্তির কী নাম এবং কোন বাড়িতে থাকে, তা জানা গেছে একটা খামে লেখা নাম-ঠিকানা থেকে। চিঠিখানা লিখেছিলেন আপনি, পাওয়া গেছে তাও পকেটে। ঠিকানা অনুযায়ী ন-টার পর উইসটেরিয়া লজে পৌঁছে আপনার টিকি দেখতে না-পেয়ে মি. গ্রেগসনকে টেলিগ্রাম করে দিলাম, যেন লন্ডনে আপনাকে খোঁজ করা হয়। তারপর খানাতল্লাশি শুরু করলাম উইসটেরিয়া লজে। শেষকালে এলাম শহরে। দেখা করলাম মি. গ্রেগসনের সঙ্গে এবং হাজির হলাম এখানে।'

গ্রেগসন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবার কর্তব্য করা যাক। মি. ইক্লিস, আপনি থানায় গিয়ে এজাহার দেবেন চলুন।'

'নিশ্চয়ই যাব। মি. হোমস, আপনি কিন্তু এর পেছনে লেগে থাকুন, রহস্য ফাঁস করুন। আপনাকে আমি ছাড়ছি না।'

হোমস বলল, 'আচ্ছা মি. বেনেজ, আপনার সঙ্গে আমি তদন্ত চালিয়ে গেলে আপত্তি করবেন না তো?'

'সম্মানিত বোধ করব।'

'ঠিক কোন সময়ে গারসিয়া মারা গেছে জানতে পেরেছেন? কোনো সূত্র?'

'রাত একটা থেকে ছিল ওখানে। বৃষ্টি হয়েছিল একটা নাগাদ। মারা গেছে বৃষ্টির আগে।'

'কিন্তু তা অসম্ভব, মি. বেনেজ।'— সবিস্ময়ে বললেন মি. ইক্লিস, 'গারসিয়ার গলা আমি চিনি। দিব্যি গেলে বলতে পারি, ঠিক ওই সময়ে শোবার ঘরে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে গেছে ও।'

'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু অসম্ভব নয়।' হাসতে হাসতে বললে হোমস।

'সূত্র হাতে এসেছে মনে হচ্ছে?' শুধোয় গ্রেগসন।

'কেসটা চমকপ্রদ। কিন্তু মোটেই জটিল নয়। তবে সব তথ্য না-জানা পর্যন্ত মুখ খোলা সমীচীন হবে না। ভালো কথা, মি. বেনেজ, বাড়ি তল্লাশ করে এই চিরকুট ছাড়া আর কিছু পেয়েছেন?'

অদ্ভুত চোখে বন্ধুর পানে তাকায় সরকারি ডিটেকটিভ। তারপর বলে, 'তা পেয়েছি। আশ্চর্য কয়েকটা জিনিস চোখে পড়েছে। থানার কাজ শেষ করে আপনাকে নিয়ে গিয়ে চাক্ষুষ দেখাব'খন।'

ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস হাডসনকে ডেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে বললে হোমস, রিপ্লাই-পেড টেলিগ্রাম। দুই ইনস্পেকটরকে নিয়ে মি. ইক্লিস গেলেন থানায়।

চুপ করে বসে আছি দুজনে। হোমস চিন্তানিবিষ্ট, ভুরু কুঁচকে নেমে এসেছে সূচীতীক্ষ্ণ দুই চোখের ওপর, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, ধূমপান করছে অনর্গল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে হোমস বলল, 'ওয়াটসন, কী বুঝলে?'

'কিস্সু না। স্কট ইক্লিস যা নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছেন, আমার কাছে এখনও তা রহস্যাবৃত।'

'কিন্তু খুনটা তো আর অস্পষ্ট নয়।'

'নিহত ব্যক্তির লোকজন পালিয়েছে যখন, বুঝতে হবে, খুনের সঙ্গে তারাও জড়িয়ে পড়েছে, পালিয়েছে পুলিশের ভয়ে।'

'কিন্তু ভায়া, মনিবকে খুন করার জন্যে যেকোনো একটা রাত নির্বাচন করলেই তো হত, বাড়িতে যেদিন অতিথি হাজির, ঠিক সেদিনই খুন না-করলে কি চলত না?'

'তাহলে পালাল কেন?'

'তাও তো বটে। পালাল কেন? এটা যেমন একটা বিরাট ঘটনা, ঠিক তেমনি আর একটা বিরাট ঘটনা হল মি. স্কট ইক্লিসের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এই দুই ঘটনার যোগসূত্র হিসেবে যদি বিচিত্র ওই চিরকুটকে ধরে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু সমাধানে পৌঁছোতে বেশি দেরি নাও হতে পারে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার আন্দাজি যোগসূত্রটা কী, তা বলবে তো?'

অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ারে হেলান দিল হোমস। বলল, 'ওয়াটসন, গাড়োয়ানি ইয়ার্কির

সম্ভাবনা বাদ দিতে পার। জলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন হয়েছে অত্যন্ত নৃশংসভাবে এবং উইসটেরিয়া লজে মি. স্কট ইক্লিসকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে।'

'কী সম্পর্ক?'

'পাটে পাটে ভাঁজ খোলা যাক। প্রথমে দেখা যাচ্ছে, স্পেনের এই ছোকরা হঠাৎ দারুণ ভাব জমিয়ে ফেলল ইংলন্ডের এক জমাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। আলাপ জমানোর ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে গারসিয়া নিজে। যেদিন প্রথম পরিচয়, সেইদিনই লন্ডনের অপর প্রান্তে গিয়েছে ইক্লিসের বাড়িতে। দু-দিন যেতে-না-যেতেই নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে নিজের বাড়িতে। কিন্তু কেন? কী এমন আকর্ষণ আছে মি. স্কট ইক্লিসের মধ্যে? ব্যক্তিত্ব? বুদ্ধিমত্তা? সে-রকম কিছুই তো নেই। তা সত্ত্বেও লন্ডন শহরের এত লোকের মধ্যে থেকে স্কট ইক্লিসকে পছন্দ করেছে গারসিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। কী গুণ দেখে জান? মি. স্কট ইক্লিস হলেন একজন খাঁটি মানী ইংরেজ, যা শোনামাত্র বিশ্বাস করবে যেকোনো ইংরেজ। দেখলে না ভদ্রলোকের আশ্চর্য কাহিনি নিয়ে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস প্রকাশ করল না দুই দুঁদে পুলিশ অফিসার?'

'কিন্তু বাড়িতে নিয়ে গেল কেন? কী দেখাতে?'

'যা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তা আর দেখানো হয়নি। সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস তা-ই।'

'অন্যত্রস্থিতি, মানে, অ্যালিবির সাক্ষী হিসেবে নিশ্চয়ই?'

'আরে ভায়া ঠিক ধরে ফেললে দেখছি। তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, উইসটেরিয়া লজের প্রত্যেকেই একই চক্রান্তের চক্রী। মি. ইক্লিস মনে করেছেন, এগারোটায় শুতে গেলেন। আসলে গেছেন তার অনেক আগে। চালাকি করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে তাঁকে দেখানো হয়েছে এগারোটা। তারপর গারসিয়া গিয়ে অন্ধকারে তাঁকে বলেছে, রাত একটা বাজে[৭]। সে আসলে গেছে বারোটা নাগাদ। অর্থাৎ বারোটায় বেরিয়ে একটার মধ্যে ফিরে আসত গারসিয়া। কোর্টে গিয়ে হলফ করে বলতেন মি. ইক্লিস, গারসিয়ার কণ্ঠস্বর শুনেছেন তিনি একটা নাগাদ। সব্বাই তা বিশ্বাস করত।'

'কিন্তু বাড়ির সবাই হাওয়া হয়ে গেল কেন?'

'সব ঘটনা না-জানা পর্যন্ত ফট করে কিছু বলতে চাই না।'

'চিরকুটের বয়ান সম্বন্ধে কী বলবে?'

'কী ছিল চিঠিতে? "আমাদের নিজেদের রং সবুজ আর সাদা।" কথাগুলো রেসের কথা মনে করিয়ে দেয়[৮] না কি? "সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ।" নিশ্চয়ই একটা সংকেত। 'মূল সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডাইনে সপ্তম, সবুজ উলের আচ্ছাদন।' অর্থাৎ বিশেষ একটা কাজের দায়িত্ব। সব কিছুর মূলে শেষ পর্যন্ত দেখব হয়তো ঈর্ষাকাতর কোনো ব্যক্তিকে। খুবই বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব, নইলে "তাড়াতাড়ি" শব্দটা লিখত না। "ডি" হল সেই ব্যক্তি যে এই নিশানা দিচ্ছে।'

'ডি' নামে হয়তো ডলোরেস, স্পেনে খুব চালু নাম। লোকটাও তো স্প্যানিয়ার্ড।'

'বলেছ ভালো, কিন্তু ভায়া মোটেই ঠিক নয়। কেননা একজন স্প্যানিয়ার্ড যখন আরেকজন স্প্যানিয়ার্ডকে চিঠি লেখে, স্পেনের ভাষাতেই লেখে, ইংরেজিতে লেখে না। চিঠি যে লিখেছে, নিঃসন্দেহে সে ইংরেজ। ধৈর্য ধরো বন্ধু, ইনস্পেকটর কী খবর আনেন দেখা যাক।'

ইনস্পেকটর এসে পৌঁছোনোর আগেই এল হোমসের টেলিগ্রামের জবাব। পড়বার পর নোটবইয়ে রাখতে গিয়ে আমার সাগ্রহ মুখচ্ছবি দেখে হেসে ফেলল হোমস, টোকা মেরে সেটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

তুলে নিলাম তারবার্তা। দেখলাম, সারি সারি অনেকগুলো অভিজাত নাম আর ঠিকানা : লর্ড হ্যারিংবি, দ্য ডিঙ্গল, স্যার জর্জ ফলিয়ট, অক্সশট টাওয়ার্স, মি. হাইনিজ, জে পি, পার্ডে প্লেস, মি. জেমস বেকার উইলিয়ামস, ফোর্টন ওল্ড হল, মি. হেনডারসন, হাই গেবল; রেভারেন্ড জোসুয়া স্টোন, নেদার, নেদার ওয়াল স্লিং।

হোমস বললে, 'তদন্তক্ষেত্র বেশ সংকীর্ণ হয়ে এল হে। আশা করি বেনেজ ওর সাজানো মন নিয়ে ঠিক এই প্ল্যান অনুসারে তদন্ত চালাচ্ছে।'

'স্পষ্ট বুঝলাম না।'

'ভায়া, চিরকুট পাঠিয়ে কোনো একটা কাজের জন্যে বা দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, এটা তো বোঝা গেল। তা-ই যদি হয়, তাহলে গারসিয়াকে কোনো একটা বাড়ির মূল সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা বেয়ে উঠে ডান দিকের সপ্তম দরজায় ঢুকতে হত। অর্থাৎ বাড়িখানা বেশ বড়ো, আর অক্সশট থেকে দু-এক মাইলের মধ্যে, কেননা ওইদিকেই হাঁটছিল গারসিয়া এবং তাকে অ্যালিবি রক্ষার্থে একঘণ্টা মানে একটার মধ্যে ফিরে আসতে হত উইসটেরিয়া লজে। অক্সশটের কাছাকাছি পেল্লায় বাড়ি সংখ্যায় খুব বেশি নেই আশা করে মি. ইক্লিস-বর্ণিত ল্যান্ড এজেন্টের শরণাপন্ন হলাম এবং ফিরতি টেলিগ্রামে পেলাম এই লিস্ট।'

ছ-টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম এশারের সারে গ্রামে। সঙ্গে ইনস্পেকটর বেনেজ। রাত কাটানোর সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম। সরাইখানায় সেসব রেখে বেনেজকে নিয়ে রওনা হলাম উইসটেরিয়া লজ অভিমুখে। তখন বৃষ্টি পড়ছে, জোরে হাওয়া দিচ্ছে। মার্চের কনকনে ঠান্ডা রাতে চোখে-মুখে সূচীতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ঝাপটা সইতে সইতে অগ্রসর হলাম এক বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে।

২. সান পেদ্রোর শার্দূল

মাইল দুয়েক হেঁটে পৌঁছোলাম স্লেট-রঙা আকাশের পটভূমিকায় পিচের মতো কালো একটা বিমর্ষ বাড়ির সামনে। কাঠের ফটক থেকে গাড়ি যাওয়ার রাস্তার দু-পাশে চেস্টনাট গাছের সারি। দরজার বাঁ-দিকের একটা জানলা থেকে ম্যাড়মেড়ে আলো পড়ছে বাইরে।

'একজন কনস্টেবল মোতায়েন রেখেছি বাড়িতে।' বলে বেনেজ শার্সির কাচে আঙুল ঠুকল ঠকঠক করে। কুয়াশায় ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, ঠকঠক আওয়াজ শুনেই আর্ত চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল একজন কনস্টেবল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঠকঠক করে কাঁপছে লোকটা, মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে বিষম ভয়ে, হাতের মোমবাতি পর্যন্ত স্থির নেই।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বেনেজ, 'ওয়াল্টার্স, ব্যাপার কী?'

রুমাল বার করে কপাল মুছল ওয়াল্টার্স। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, তা-ই বলুন আপনারা এসেছেন! উফ! আমার নার্ভ আর সইতে পারছিল না।'

'তোমার শরীরে নার্ভ আছে জানা ছিল না তো?'

'কীরকম খাঁ খাঁ করছে দেখেছেন বাড়িটা? তার ওপরে রান্নাঘরে ওইসব অদ্ভুত জিনিস। কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমন সময়ে শার্সিতে ঠকঠক আওয়াজ শুনে ভাবলাম, ওই রে, আবার বুঝি এসেছে!'

'কে এসেছে?'

'পিশাচ! জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল।'

'কখন?'

'ঘণ্টাদুয়েক আগে। দিনের আলো তখন কমে এসেছে। চেয়ারে বসে বই পড়ছি। হঠাৎ চোখ তুললাম। কেন তুললাম তা বলতে পারব না। দেখলাম, নীচের শার্সিতে মুখ চেপে ধরে পিশাচ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সে কী মুখ স্যার! স্বপ্নে দেখলেও আঁতকে উঠব!'

'ছিঃ ওয়াল্টার্স! তুমি না পুলিশ কনস্টেবল?'

'জানি, স্যার, জানি। কিন্তু ভয়ে আমার ধাত ছেড়ে গিয়েছে। মুখটা স্যার কালো নয়, সাদাও নয়, দুনিয়ার কোনো রং দিয়েই যেন তৈরি নয়। কাদায় দুধ গুলে দিলে যা হয়, অনেকটা যেন সেইরকম। সাইজে আপনার মুখের দু-গুণ। দু-চোখ ভাঁটার মতো ঘুরছে। দু-পাটি দাঁত হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝকঝকে, খিদের চোটে যেন টসটস করে লাল ঝরছে জিভ দিয়ে। স্যার, বিকট বীভৎস সেই মুখ দেখে আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারি না আমি। চেয়ে ছিলাম ফ্যালফ্যাল করে। তারপর সাঁৎ করে মুখটা সরে যেতেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে এলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ঝোপ পর্যন্ত খুঁজলাম। কিন্তু কারো টিকি দেখলাম না। ভাগ্যি ভালো, বেটা পালিয়েছে।'

'ওয়াল্টার্স, তোমার রেকর্ড ভালো বলেই তোমার নামের পাশে ঢ্যাড়া দিলাম না। অন্য কেউ হলে ছাড়তাম না। লজ্জা করে না তোমার পিশাচ বলে ভয় পেয়ে একজনকে ধরতে না-পারার জন্যে ভাগ্য ভালো বলে আস্ফালন করছ। মিথ্যে ভয় পেয়েছ, না, সত্যিই কিছু দেখেছ?'

'তার ফয়সালা এখুনি হয়ে যাবে।' পকেট-লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে বললে হোমস। ঘাসের চাপড়ার ওপর জুতোর ছাপ দেখে বলল, 'বারো নম্বর জুতো দেখছি। দানব বললেই চলে লোকটাকে।'

'কিন্তু সে গেল কোথায়?'

'ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে রাস্তায় সটকান দিয়েছে মনে হচ্ছে।'

বেনেজ বললে, 'চুলোয় যাক সে, কাজের কথায় আসুন। মি. হোমস, বাড়ি দেখবেন চলুন।'

শোবার ঘর, বসবার ঘরে তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে দেখলাম। এ-বাড়িতে যারা ছিল, সঙ্গে তারা খুব বেশি মালপত্র আনেনি। 'মার্ক্স অ্যান্ড কোং, হাই হলবর্ন' মার্কামারা কতকগুলো জামাকাপড় দেখে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল মার্ক্স অ্যান্ড কোং-কে। তারা বলেছে, খদ্দেরের হাঁড়ির খবর তারা রাখে না, তবে টাকাকড়ি পেতে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। খানদুয়েক স্প্যানিশ বই, নভেল, কয়েকটা তামাক খাওয়ার পাইপ, একটা সেকেলে পিনফায়ার পিস্তল আর একটা গিটার— এইসব ফেলে পালিয়েছে বাড়ির লোকজন।

'এর মধ্যে কিছু নেই মি. হোমস।' মোমবাতি হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে যেতে বললে বেনেজ, 'চলুন, এবার রান্নাঘরে যাওয়া যাক।'

রান্নাঘরটা বাড়ির একদম পেছন দিকে। কড়িকাঠ খুব উঁচু। বিমর্ষ চেহারা। এককোণে একরাশ খড়, পাচক মশাইয়ের শোবার জায়গা বোধ হয়। টেবিলে এঁটো বাসনের কাঁড়ি।

বেনেজ বললে, 'এদিকে দেখুন, মি. হোমস।... কী বুঝছেন?'

মোমবাতি তুলে ধরে বাসনের আলমারির পেছনে একটা অত্যন্ত বিচিত্র বস্তু দেখাল বেনেজ। বস্তুটা শুকিয়ে কুঁচকে এমনভাবে গুটিয়ে গেছে যে আসলে কী তা বোঝা মুশকিল। কালচে চামড়ার মতো, অনেকটা বামন চেহারার কোনো মানুষের মতো। প্রথমে মনে হল, নিগ্রো শিশুকে মমি করে রাখা হয়েছে। তারপর মনে হল, পুরাকালের বিকৃত কোনো বাঁদর হলেও হতে পারে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিলাম— জানোয়ার, না মানুষ, ধরতে পারলাম না। জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে খাড়াভাবে এবং শাঁখের একজোড়া মালা ঝুলছে কোমরের কাছে।

পৈশাচিক সেই প্রতীকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে হোমস বললে, 'ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখছি! আর কিছু আছে?'

বাসন ধোয়ার চৌবাচ্চার কাছে মোমবাতি হাতে গেল বেনেজ। দেখলাম, একটা বিরাট সাদা পাখিকে নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে রাশি রাশি পালক ছড়িয়ে আছে, ছিন্ন মস্তকে লেগে আছে ঝুঁটি। ঝুঁটি দেখে হোমস বললে, 'সাদা মোরগ। খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।'

কিন্তু এর চাইতে নারকীয় বস্তুগুলো সবশেষে দেখানোর জন্যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল বেনেজ। এবার চৌবাচ্চার তলা থেকে টেনে বার করল এক গামলা রক্ত। মাংস কাটার টেবিল থেকে আর একটা বারকোশ এনে দেখাল স্তূপাকার একরাশ পোড়া হাড়। বলল, 'কাউকে খুন করে পোড়ানো হয়েছিল, এ-ই সন্দেহ করে সমস্ত বাড়ি আমরা সার্চ করেছি। সকাল বেলা ডাক্তার এসে বলে গেলেন, হাড় আর রক্ত মানুষের নয়।'

খুশি হল হোমস। দু-হাত ঘষে বললে, 'ইনস্পেকটর, অভিনন্দন রইল খুঁটিয়ে তদন্ত করার জন্যে। আপনার ক্ষমতার উপযুক্ত সুযোগ অবশ্য এ-অঞ্চলে কম, তা-ই না?'

'তা যা বলেছেন, মি. হোমস। পাড়াগাঁ তো, ভালো কেসের অভাবে উপোসে দিন কাটে। এ ধরনের সুযোগ নমাসে-ছমাসে এক-আধটা আসে। হাড় দেখে কী বুঝলেন?'

'হয় ছাগলছানা, নয় মেষশাবক।'

'সাদা মোরগ দেখে কী বুঝলেন?'

'অদ্ভুত, মি. বেনেজ, সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। অদ্বিতীয়ও বলতে পারেন।'

'যা বলেছেন। অদ্ভুত কতকগুলো মানুষ ঘাঁটি গেড়েছিল এ-বাড়িতে। সৃষ্টিছাড়া তাদের চালচলন। তাদের একজন অক্কা পেয়েছে। কে মারল তাকে? সঙ্গীরা? তা-ই যদি হয়, তা পালিয়ে তারা পার পাবে না। সবকটা বন্দরে পুলিশ নজর রেখেছে। তবে কী জানেন মি. হোমস আমার নিজের মত একদম অন্য। একেবারে আলাদা।'

'তার মানে, মনে মনে একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন?'

'তা করেছি। কাজও করব সেই থিয়োরি অনুসারে। একাই করব, আপনার সাহায্য নেব না। লোকে জানবে যা করেছি, নিজেই করেছি, আপনার সাহায্য নিইনি।'

অট্টহাসি হাসল হোমস। বললে, 'বেশ তো, তা-ই হবে'খন। আপনি আপনার লাইনে চলুন,

আমি চলি আমার লাইনে, তবে দরকার হলেই আমার তদন্ত-ফল গ্রহণ করতে পারেন। আপাতত এ-বাড়িতে আর কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না। বিদায়। কপাল খুলে যাক আপনার।'

অন্যের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, আমি কিন্তু হোমসের চোখে-মুখে এমন কতকগুলো চাপা লক্ষণ দেখলাম, যা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ডালকুত্তার মতো গন্ধ পেয়েছে আমার শিকারি বন্ধুটি। অন্যের চোখে তা অদৃশ্য, কিন্তু আমি তো ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর চাপা উত্তেজনা, চালচলনের ক্ষিপ্রতা আর ঔজ্জ্বল্য দেখেই বুঝলাম, খেল শুরু হতে আর দেরি নেই। অভ্যেস মতো মুখে চাবি দিল হোমস। আমার অভ্যেসমতো আমিও চুপ করে গেলাম, অযথা প্রশ্ন করে সমস্যা-আবিষ্ট মস্তিষ্ককে উৎপীড়িত করলাম না। জানি তো, যথাসময়ে সবই জানব।

সেই কারণেই নীরবে অপেক্ষা করে গেলাম। কিন্তু সে-অপেক্ষা যে এত লম্বা হবে, কে জানত। দিন এল দিন গেল, হোমস এক পা-ও আর এগিয়েছে বলে মনে হল না। একদিন শুধু শহরে কাটিয়ে এল। কথাচ্ছলে শুনলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিল। এ ছাড়া বাকি দিন হয় স্রেফ বেড়িয়ে, না হয় গ্রামের লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কাটিয়ে দিল।

গ্রামে থাকা যে কত ভালো, এ নিয়ে জ্ঞান দিত আমাকে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বই, টিনের বাক্স আর খন্তা হাতে 'গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করার এই হল মোক্ষম সুযোগ'— বলে রোজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরোত বটে, কিন্তু সন্ধে নাগাদ যেসব নমুনা নিয়ে ফিরত, তা দেখলে কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানীরই উৎসাহ বোধ করার কথা নয়।

পল্লি-ভ্রমণে বেরিয়ে প্রায়ই দেখা হত ইনস্পেকটর বেনেজের সঙ্গে। হাতের কেস নিয়ে কোনো কথা না-ভাঙলেও হাসিতে কোঁচকানো লালচে মুখ আর কুতকুতে চোখের ঝিকমিকে রোশনাই লক্ষ করে বুঝতাম, তাঁর তদন্ত বিলক্ষণ সন্তোষজনক।

দিন পাঁচেক পরে একদিন সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলে দারুণ অবাক হয়ে গেলাম। বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হয়েছে এই খবরটা :

অক্সশট রহস্য সমাধান

সন্দেহভাজন গুপ্তঘাতক গ্রেপ্তার

শিরোনাম পড়ে শোনাতেই চেয়ার থেকে এমনভাবে ছিটকে গেল হোমস, যেন বিছে কামড়েছে।

'কী সর্বনাশ! হল কী! বেনেজ ধরে ফেলেছে খুনিকে।'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' বলে পড়ে শোনালাম পুরো খবরটা :

অক্সশট হত্যা সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে এশার এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন আগে অক্সশট কমনে নৃশংসভাবে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় উইসটেরিয়া লজ নিবাসী মি. গারসিয়াকে। সেই রাতেই তাঁর চাকর এবং পাচক চম্পট দেওয়ায় সন্দেহ করা হয়, খুনের ব্যাপারে তারাও জড়িত এবং দুজনের কেউই ধোয়া তুলসী পাতাটি নয়। অনুমান করা হয়েছিল, নিহত ব্যক্তির বাড়িতে নিশ্চয়ই দামি জিনিস ছিল, তাঁকে খুন করা হয়েছে এই জিনিসের লোভেই। এই অনুমানের কোনো প্রমাণ অবশ্য আজও পাওয়া যায়নি। পলাতকদের গোপন বিবর অন্বেষণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন ইনস্পেকটর বেনেজ। তারা যে পালিয়ে বেশিদূর যায়নি এবং আগে থেকেই

ঠিক করে রাখা কোনো ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে— ইনস্পেকটর বেনেজ তা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। গোড়া থেকেই তিনি জানতেন, পলাতকরা ধরা পড়বেই। কেননা রান্না করার লোকটিকে জনাকয়েক ফেরিওয়ালা রান্নাঘরের শার্সি দিয়ে দেখে বলেছে লোকটাকে দেখতে নাকি অতি কদাকার, বিরাটকায় নিগ্রো-জাতীয় চেহারা। জাতে মুলাটো[১], অসাধারণ তার হলদেটে আকৃতি। লোকটার স্পর্ধা কম নয়। খুন করার পরেও একদিন রাত্রে এসেছিল উইসটেরিয়া লজে। কনস্টেবল ওয়াল্টার্স তার পিছু নেয়। ইনস্পেকটর বেনেজ আঁচ করেছিলেন, লোকটা একবার যখন এসেছে, তখন আবার ফিরে আসবেই। তাই বাড়ি থেকে পাহারা তুলে নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লোক মোতায়েন করেন। এই ফাঁদেই পড়ে লোকটা গতরাতে। দারুণ কামড়ে দেয় কনস্টেবল ডাউনিংকে। আশা করা যাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কয়েদিকে হাজির করার পর অনেক ঘটনাই ফাঁস হয়ে যাবে।

টুপি নিতে নিতে উত্তেজিতভাবে হোমস বললে, 'চলো চলো, এখুনি চলো। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই বেনেজকে ধরতে চাই।'

ছুটতে ছুটতে এলাম গাঁয়ের পথে। বেনেজ তখন সবে বেরিয়েছে বাড়ির বাইরে। আমাদের দেখেই হাতের খবরের কাগজটা নাড়তে নাড়তে বললে, 'কাগজ পড়েছেন মি. হোমস?'

'পড়েছি, বেনেজ। বন্ধুভাবে হুঁশিয়ার করতে এলাম, যদি কিছু মনে না করেন।'

'হুঁশিয়ার করবেন! আমাকে?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বেলাইনে চলেছেন। আর এগোবেন না, গাড্ডায় পড়বেন।'

'আপনার অশেষ দয়া, মি. হোমস।'

'আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, বেনেজ।'

কেন জানি মনে হল, কথাটা শুনে বেনেজের কুতকুতে চোখে চাপা দুষ্টুমি ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, 'কিন্তু মি. হোমস, আমরা যে ঠিক করেছি, যে যার লাইন অনুসারে তদন্ত চালিয়ে যাব।'

'তাহলে তাই হোক। আমাকে দোষ দেবেন না।'

'না, না, সে কী কথা! আপনি তো আমার মঙ্গলই চান। তবে কী জানেন, প্রত্যেকের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি আছে। আপনার পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতি মিলবে কেন?'

'এ নিয়ে আর কথা না-বলাই ভালো।'

'আমার সব খবরই আপনি পাবেন, মি. হোমস। লোকটা একটা আস্ত বর্বর। গায়ে গাড়িটানা ঘোড়ার মতন শক্তি, হিংস্রতায় পিশাচকেও হার মানায়। কবজায় আনার আগেই ডাউনিংয়ের বুড়ো আঙুলটা চিবিয়ে প্রায় ছিঁড়ে এনেছে বললেই চলে। মুখে ইংরেজি বুলি একদম ফোটে না, ঘোঁতঘোঁত করা ছাড়া কোনো আওয়াজই করে না।'

'প্রমাণ পেয়েছেন, এই লোকই খুন করেছে তার মনিবকে?'

'আমি তা বলিনি মি. হোমস, মোটেই তা বলিনি। আপনি চলবেন আপনার লাইনে আমি চলব আমার লাইনে, এ-ই হল গিয়ে আমাদের কাজের চুক্তি।'

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে এল হোমস। আমাকে বললে, 'বেনেজকে ঠিক ধরতে পারছি না। লোকটা জেনেশুনে গাড্ডায় পড়তে চলেছে। ঠিক আছে, ও যখন চায় যে যার লাইনে তদন্ত চালাই, তা-ই হোক। কিন্তু বেনেজের কথাবার্তা যেন কেমনতরো... খটকা লাগছে।'

সরাইতে ফিরে এলাম। হোমস বললে, 'ওয়াটসন, বোসো। পরিস্থিতিটা এবার তোমার সামনে মেলে ধরতে চাই। কারণ আজ রাতে তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে। কেসটা ধাপে ধাপে কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, কান খাড়া করে শোনো। মাঝখান থেকে এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করায় সব গুবলেট না হয়ে যায়! ডিনারের সময়ে টেবিলে যে চিরকুট এসে পৌঁছেছিল, শুরু করা যাক সেখান থেকে। সেই রাতেই মারা যায় গারসিয়া। গারসিয়ার চাকরবাকর খুন করেছে মনিবকে— বেনেজের এই ধারণা মন থেকে সরিয়ে রাখো। প্রমাণ একটাই : গারসিয়া নিজে স্কট ইক্লিসকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল অ্যালিবি খাড়া করার জন্যে। অ্যালিবির জন্যে যখন এত কাণ্ড সে করেছে, বুঝতে হবে বেআইনি কাজে বেরিয়েছিল গারসিয়া, তাই এত আটঘাট বেঁধেছিল। তার এই ক্রিমিনাল অভিযানের ফল হল নিজেই খুন হয়ে যাওয়া। কে তাকে খুন করতে পারে? নিশ্চয়ই সে, যার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অভিযানে সে বেরিয়েছিল। চাকরবাকরের অন্তর্ধান-রহস্য এবার বোঝা যাচ্ছে। ওরা দুজনেই গারসিয়ার নৈশ ষড়যন্ত্রের সাগরেদ। ঠিক হয়েছিল, গারসিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাম ফতে করে ফিরে এলে ইংরেজ ভদ্রলোকের এজাহার অনুযায়ী গারসিয়ার অ্যালিবি প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং কেউ আর তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে না ফেরে, তাহলে বুঝতে হবে বিপজ্জনক অভিযানে সে নিজে খতম হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো জায়গায় গিয়ে এই দুজনে লুকিয়ে থাকবে এবং সময় আর সুযোগমতো গারসিয়ার অসমাপ্ত অভিযান সমাপ্ত করতে নিজেরাই আবার বেরোবে।'

দুর্বোধ্য জট একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে এল আমার মনের মধ্যে। প্রতিবারের মতো এবারেও মনে হল, ভারি সোজা তো! ঠিক এইরকমটাই তো হওয়া উচিত ছিল! বললাম, 'কিন্তু রান্না করার লোকটা ফিরে এল কেন?'

'হয়তো তাড়াহুড়ো করে চম্পট দেওয়ার সময়ে এমন একটা দামি জিনিস ফেলে গিয়েছিল, প্রাণ গেলেও যা কাছছাড়া করতে সে রাজি নয়।'

'তারপর?'

'খেতে বসে একটা চিরকুট পেল গারসিয়া। কে লিখল চিরকুট? নিশ্চয়ই তার আর একজন স্যাঙাত। কোত্থেকে লিখল? আগেই বলেছি তোমাকে, একটা বড়ো বাড়ির নিশানা দেওয়া হয়েছিল চিঠির মধ্যে। এ-অঞ্চলে বড়ো বাড়ি খুব বেশি নেই। উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করার অছিলায় কয়েকটা দিন তল্লাট চষে ফেললাম, বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর নাড়িনক্ষত্র বার করে ফেললাম, বাসিন্দাদের খবর সংগ্রহ করলাম। হাইগেবল-এর সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন জ্যাকারিয়ান প্রাসাদটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি। বাড়িটা অক্সশট থেকে মাইলখানেক দূরে, অকুস্থল থেকে আধ মাইলের মধ্যে। অন্যান্য প্রাসাদের মালিকরা কাঠখোট্টা ধরনের মান্যগণ্য ব্যক্তি, রোমান্সের ধার ধারেন না। কিন্তু হাইগেবলের মি. হেলডারসন সব দিক দিয়ে বড়ো বিচিত্র পুরুষ, বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার তাঁকেই মানায়। তাই তাঁর বাড়ির এবং বাড়ির লোকজনের ওপর আমার দৃষ্টি সংহত করলাম!

'—ওয়াটসন, বাড়ির সব লোকই যেন কেমনতরো। আশ্চর্য, সৃষ্টিছাড়া। সবচাইতে আশ্চর্য হলেন, হেনডারসন স্বয়ং। অছিলা করে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি আমি। ভদ্রলোকের

কালো কোটরে-ঢোকানো ভাবালু চোখ দেখে বুঝেছি, আমার আসল মতলব তিনি ধরে ফেলেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স ভদ্রলোকের, চটপটে, শক্তসমর্থ চেহারা। চুল লৌহ-ধূসর, জটার মতো বিশাল ভুরু, পা ফেলেন হরিণের মতো, হাঁটেন সম্রাটের মতো। কর্তৃত্ব তাঁর চলনেবলনে। মুখের পরতে পরতে ভীষণ প্রকৃতি আর ইচ্ছাশক্তি যেন ঠিকরে যায় স্ফুলিঙ্গের মতো। ভদ্রলোক হয় বিদেশি, না হয় দীর্ঘকাল গরমের দেশে থেকেছেন। সেই কারণেই চেহারা অত হলদে, শুকনো কিন্তু চাবুকের মতো শক্ত। সেক্রেটারির নাম মি. লুকাস। ইনি যে বিদেশি তাতে সন্দেহ নেই। কথাবার্তা মিষ্টি বিষের মতো মধুক্ষরা, চালচলন বেড়ালের মতো চটপটে পিচ্ছিল, গায়ের রং চকলেটের মতো বাদামি। ওয়াটসন, তাহলেই দেখ, এ-রহস্যের দু-দিকে দু-দল বিদেশিকে দেখছি। একদল উইসটেরিয়া লজে, আর একদল হাইগেবলে। মাঝের ফাঁক বন্ধ হতে বিশেষ দেরি নেই আর।'

একটু থেমে হোমস ফের বলতে থাকে, 'বাড়ির মধ্যে এই দুই ব্যক্তিই কেন্দ্রমণি বলতে পার। কিন্তু এ দুজন ছাড়াও একজন আছে, এই মুহূর্তে যার গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি। হেনডারসন দুই মেয়ের বাবা। একজনের বয়স এগারো, আর একজনের তেরো। গভর্নেসের নাম মিস বার্নেট। জাতে ইংরেজ, বয়স বছর চল্লিশ। এ ছাড়াও একজন বিশ্বস্ত চাকর আছে। বাড়ির মধ্যে আসল ফ্যামিলি বলতে এদেরকেই বোঝায়, কেননা হেনডারসন দেশ বেড়াতে খুব ভালোবাসেন। কখনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না এবং এই চারজনে একসঙ্গে টোটো করেন দেশ হতে দেশান্তরে। বছরখানেক বাইরে কাটিয়ে কয়েক হপ্তা হল হেনডারসন হাইগেবল ফিরেছেন। ভদ্রলোক সাংঘাতিক বড়োলোক, যেকোনো খেয়াল চরিতার্থ করার মতো টাকা তাঁর আছে। এ ছাড়া বাড়িতে আছে খাসচাকর, ঝি, দারোয়ান ইত্যাদি, যেকোনো সচ্ছল ইংরেজ পরিবারে যা থাকে। গাঁয়ের লোকের গুলতানি শুনে আর নিজের চোখে দেখে সংগ্রহ করলাম এত খবর। সবচেয়ে বেশি খবর পাওয়া যায় চাকরিতে বরখাস্ত ক্ষুব্ধ চাকরের মুখে। আমার কপাল ভালো, এমনি একটা চাকরের সন্ধান পেলাম। কপাল ভালো বললাম বটে, কিন্তু ঠিক এই ধরনের লোক খুঁজেছিলাম বলেই পেয়ে গেলাম। নইলে বরাত খুলত না কোনোদিনই। বেনেজ তো বড়াই করে গেল, ওর কাজের পদ্ধতি আলাদা। আমারও কাজের পদ্ধতি কারো সঙ্গে মেলে না। বিশেষ এই পদ্ধতি অনুসারেই খুঁজে-পেতে বার করলাম জন ওয়ার্নারকে— এককালে হাইগেবলে মালী ছিল। বাদশাহি মেজাজে রাগের মাথায় দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন হেনডারসন। ওয়ার্নার সেই থেকে মহাখাপ্পা হেনডারসনের ওপর। বাড়ির অন্যান্য চাকরবাকরের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। মেজাজি মনিবের ভয়ে তারা সকলেই একজোট হয়েছে। ওয়াটসন, এইভাবে হাইগেবল রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান আমি পেলাম।'

হোমস থামল। আমি কিছু বলতে যাবার আগেই বলে উঠল, 'ঘাবড়িয়ো না বন্ধু একে একে বলছি সব। বুঝলে ভায়া, অদ্ভুত লোক বটে এরা! স্পষ্ট কিছুই এখনও বুঝে উঠিনি, শুধু বুঝেছি, এদের চালচলন সবই যেন সৃষ্টিছাড়া। বাড়িটায় দুটো অংশ। এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়ার দরজা একটাই। একদিকে থাকে চাকরবাকর, আর একদিকে ফ্যামিলি। হেনডারসনের বিশ্বস্ত চাকর ছাড়া দুই অংশের মধ্যে যাতায়াত কেউ করে না। ফ্যামিলির খাবার সে-ই নিয়ে যায় অন্দরে। মেয়েদের নিয়ে গভর্নেস বাগান ছাড়া কোথাও বেরোয় না। হেনডারসন কখনো একা হাঁটেন না। ছায়ার মতো পেছনে লেগে থাকে কুটিল সেক্রেটারিটা, চাকরবাকরেরা বলে, হেনডারসন

নাকি অষ্টপ্রহর ভয়ে জুজু হয়ে থাকেন। কীসের এত আতঙ্ক, তা কেউ জানে না। তবে ওয়ার্নারের বিশ্বাস, খোদ শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিকিয়ে দিয়েছেন পাজির পাঝাড়া এই হেনডারসন। যেকোনো দিন কেনা জিনিসের দখল নিতে আসতে পারে শয়তান, এই ভয়ে নাক সিটিয়ে থাকেন হেনডারসন। ভদ্রলোক কোন চুলো থেকে এসেছে, আদত পরিচয় কী, কেউ জানে না। মেজাজ এদের প্রত্যেকেরই সপ্তমে চড়ে আছে, অত্যন্ত গনগনে স্বভাব। হেনডারসন নিজে দু-একবার কুকুর মারা চাবুক দিয়ে চাকরবাকরদের এমন ঠেঙিয়েছিলেন যে ব্যাপারটা নির্ঘাত আদালত পর্যন্ত গড়াত। কিন্তু স্রেফ টাকার জোরে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সবার মুখ চেপে দেন ভদ্রলোক। ওয়াটসন, এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। চিঠিটা এসেছে অদ্ভুত এই গেরস্থালি থেকে, গারসিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে চক্রান্ত মাফিক কিছু একটা করার জন্যে। লিখেছে কে? নিশ্চয় মিস বার্নেট— গভর্নেস। যুক্তিতর্ক করে দেখা যাচ্ছে, সে ছাড়া এ-চিঠি লেখার মতো মেয়ে বাড়িতে আর কেউ নেই। অনুমান হিসেবে এই ধারণা নিয়ে তদন্তে নামা যাক, দেখা যাক ঘটনার স্রোতে কতক্ষণ তা খাড়া থাকে। ভালো কথা ওয়াটসন, গোড়ায় তোমায় যে বলেছিলাম, এ-কাহিনিতে ঈর্ষার ব্যাপার আছে, সেটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। না, সে-রকম কিচ্ছু এখানে নেই। যাক, যে-কথা বলছিলাম। মিস বার্নেট যদি চিঠি লিখে ডেকে এনে থাকে গারসিয়াকে, তাহলে বুঝতে হবে, চক্রান্তের অন্যতম চক্রী সে নিজেও। তা-ই যদি হয়, গারসিয়ার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর বুকে প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ে নিশ্চয়ই সে সুযোগ পায়ে ঠেলবে না। তাই আমার প্রথম প্রচেষ্টাই হল মিস বার্নেটের সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলা। কিন্তু মিস বার্নেট যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে গারসিয়া নিধনের রাত থেকেই। বেঁচে আছে কি না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। গারসিয়ার সঙ্গে হয়তো তাকেও যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, অথবা কোথাও কয়েদ করে রাখা হয়েছে। কিছু কখনো জানা যায়নি। ওয়াটসন, আশ্চর্য এই ধাঁধার সমাধান আমাদের করতেই হবে। কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বার করে মিস বার্নেটকে খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা। ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করবেন না জলজ্যান্ত একটা মহিলাকে স্রেফ গায়েব করে দেওয়া হয়েছে এমন একটা খানদানি বাড়িতে, যে-বাড়িতে একটানা কিছুদিন কাউকে দেখতে না-পাওয়াটা অদ্ভুত হলেও অসম্ভব কিছু নয়। অথচ দেখ, সৃষ্টিছাড়া এই বাড়িতে এই মুহূর্তে হয়তো ভদ্রমহিলা ধুঁকছে, প্রাণটা তার যেতে বসেছে। তাই ওয়ার্নারকে নিয়ে আড়াল থেকে ফটক পাহারা দেওয়া ছাড়া কিছুই আমি করতে পারিনি। আইনের সাহায্য নিয়ে যদি কিছু নাও করতে পারি, নিজেরাই ঝুঁকি নেব ঠিক করেছি।'

'কী করতে চাও?'

'ভদ্রমহিলার ঘর আমি চিনি। বারবাড়ির ছাদ থেকে যাওয়া যাবে। আমি চাই আজ রাতে তুমি আর আমি দুজনে হানা দেব রহস্যের ঠিক খাসমহলে।'

শুনে মিইয়ে গেলাম। একে তো ওই অদ্ভুত বাড়ি, লোকজনের প্রকৃতি ভীষণ, খুনের ছায়া জড়িয়ে রয়েছে বাড়ির আনাচেকানাচে, অজানা বিপদ পদে পদে, তাতে করে রাতবিরেতে বেআইনিভাবে ওইরকম একখানা ভয়ংকর বাড়িতে চোরের মতো ঢুকতে হবে শুনে মনের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। তারপর বিচার করে দেখলাম, হোমসের চাঁচাছোলা যুক্তি অনুযায়ী রহস্য সমাধান করার একমাত্র উপায় কিন্তু ওইটাই— বাড়ির মধ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়া। নীরবে তাই জড়িয়ে ধরলাম ওর দুই হাত, ঠিক হয়ে গেল নিশীথ রাতের ভয়ানক অভিযান।

কিন্তু বিধি বাম, তাই এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার মাঠে মারা গেল শেষ পর্যন্ত। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মার্চের বিষণ্ণ সন্ধে যখন একটু একটু করে ঘোমটা ঢাকা দিচ্ছে পৃথিবীর ওপর, ছন্নছাড়া একটা লোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকল ঘরে।

'পালিয়েছে, মি. হোমস! পাখি উড়েছে! কিন্তু ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যেতে পারেনি, রাস্তায় গাড়িতে বসিয়ে এসেছি।'

'শাব্বাশ, ওয়ার্নার!' তড়াক করে লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস, 'ওয়াটসন, মাঝের ফাঁকটা দেখছি খুব তাড়াতাড়িই জুড়ে আসছে।'

ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে এলিয়ে থাকতে দেখলাম গরুড়-নাসা শীর্ণকায়া এক ভদ্রমহিলাকে। স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত ধকল যাওয়ায় যেন আধমরা হয়ে গেছে। বুকের ওপর এলিয়ে পড়েছে মাথা। মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম, চোখের তারা ছোটো হয়ে এসেছে দুটি বিন্দুর মতো, যেন দুটো কালচে ফোঁটা। বুঝলাম, আফিঙে বেহুঁশ রয়েছে মিস বার্নেট।

বরখাস্ত মালী বললে, 'মি. হোমস, আপনার কথামতো নজর রেখেছিলাম ফটকের ওপর। গাড়িটা বেরিয়ে আসতেই পেছনে পেছনে গেলাম স্টেশন পর্যন্ত। মিস বার্নেট যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছিলেন। সবাই মিলে ঠেলেঠুলে ট্রেনে তুলতে যাওয়ার সময়ে উনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন। জোর করে ঠেলে কামরায় তুলে দিতেই উনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমি ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ওঁকে নিয়ে এনে বসলাম ছ্যাকড়াগাড়িতে— আসবার সময়ে কামরায় হলদে শয়তানটাকে যেভাবে কটমট করে তাকাতে দেখেছি, তাতে বুঝেছি, এদিকে ফের যদি ও আসে, তো আমার পরমায়ু আর বেশিদিন নেই।'

ধরাধরি করে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেলাম ওপরতলায়। সোফায় শুইয়ে দিয়ে দু-কাপ কড়া কফি খাওয়াতেই আফিঙের রেশ কেটে গেল মগজ থেকে। খবর পাঠানো হল বেনেজকে।

সব শুনে আনন্দে আটখানা হয়ে হোমসের হাত জড়িয়ে ধরে বেনেজ বললে, 'কী কাণ্ড দেখুন! আরে মশাই, আমিও তো এঁকে খুঁজেছিলাম। গোড়া থেকেই আপনি যে লাইনে চলেছেন, আমিও সেই লাইনে চলেছি।'

'তার মানে? আপনি হেনডারসনের ওপর নজর রেখেছিলেন?'

'মি. হোমস, গাছের মাথায় বসে আপনাকে দেখছি, হাইগেবলের ঝোপের মধ্যে কী চমৎকার হামাগুড়ি দিচ্ছেন! দেখছিলাম কে আগে আসল সাক্ষীকে হাতে পায়।'

'তাহলে মুলাটোকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন কেন?'

খুকখুক করে হেসে উঠে বেনেজ বললে, 'হেনডারসন একটা ছদ্মনাম। ও জানত আমরা ওকে সন্দেহ করছি। ওকে আমরা নিশ্চিন্ত করার জন্যেই জাল পেতে মুলাটোকে ধরেছিলাম। বিপদমুক্ত হয়েছে না-ভাবা পর্যন্ত ও তো পালাবে না মিস বার্নেটকে নিয়ে, তাই নিরীহ লোকটাকে ইচ্ছে করেই গ্রেপ্তার করে চোখে ধুলো দিয়েছিলাম প্রত্যেকের।'

বেনেজের কাঁধে হাত রেখে হোমস বললে, 'জীবনে অনেক উঁচুতে আপনি উঠবেন। আপনার সহজাত বুদ্ধি আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে।'

আনন্দে ঝিকমিক করে ওঠে বেনেজ। বলে, 'এই সাতদিন স্টেশনে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন রেখেছিলাম। হাইগেবলের ফ্যামিলি যে চুলোতেই যাক না কেন, আমার চর পেছন

পেছন যাবে। তবে মিস বার্নেট ছিটকে দলছাড়া হওয়ায় মহাফাঁপরে পড়েছিল বেচারা। যাই হোক, মিস বার্নেটের এজাহার না-নেওয়া পর্যন্ত শয়তানটাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। আসুন, আগে ওঁর বক্তব্য লিখে নিই।'

গভর্নেসের চেহারাখানা একবার দেখে নিয়ে হোমস বললে, 'আগের চাইতে অনেক চাঙা হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। বেনেজ, আরও বলুন হেনডারসন লোকটা আসলে কে।'

'ডন[১০] মুরিলো, সান পেড্রোর টাইগার নামে যাকে সবাই চিনত।'

সান পেড্রোর টাইগার! বিদ্যুৎ ঝলকের মতো লোকটার সমস্ত ইতিহাস ঝলসে উঠল আমার স্মৃতির পটে। সান পেড্রোর টাইগার! সভ্যতার মুখোশ পরে জঘন্য অত্যাচার আর রক্তাক্ত ইতিহাস রচনায় অদ্বিতীয় সেই ডন মুরিলো। অসীম তার মনোবল, নির্ভীক তার অন্তর, উদ্যম তার অপরিসীম, শক্তি তার অপরিমেয়। ভয়ে জুজু গোটা দেশকে একনাগাড়ে দশ-বারো বছর পায়ের তলায় রেখে দেওয়ার মতো গুণ তার মধ্যে ছিল। মধ্য আমেরিকায়[১১] তার নাম শুনলে আঁতকে উঠত না, এমন লোক কেউ নেই। দীর্ঘ একযুগ পরে জাগ্রত হল গণশক্তি। কিন্তু সাপের মতো পিচ্ছিল সে, শেয়ালের মতো ধূর্ত। জাগ্রত গণশক্তিকে কোনো সুযোগই সে দিল না। পট পালটাচ্ছে আঁচ করেই গুপ্ত ধনাগার অতি গোপনে জাহাজ বোঝাই করে পাচার করে দিল দেশের বাইরে। এ-ব্যাপারে সাহায্য করল অনুগত স্যাঙাতরা। পরের দিন মারমুখো জনতা হানা দিয়ে দেখল বাড়ি খালি— পাখি উড়েছে, দুই মেয়ে আর সেক্রেটারিকে নিয়ে বলদর্পী একনায়ক[১২] উধাও হয়ে গিয়েছে ধনরত্ন সমেত। সেই থেকেই ধরাতলে তার নাম আর শোনা যায়নি। ইউরোপের খবরের কাগজে অবশ্য প্রায়ই কটুকাটব্য শোনা গেছে তার সম্পর্কে।

বেনেজ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই ডন মুরিলো, সান পেড্রোর টাইগার। খোঁজ নিলে জানবেন, সান পেড্রোর রং হল সবুজ আর সাদা, চিঠিতে যা লেখা ছিল। হেনডারসন ওর ছদ্মনাম। আমি কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি, প্যারিস, রোম, মাদ্রিদ, বার্সিলোনায়[১৩] ১৮৮৬ সালে গিয়েছিল ওর জাহাজ। প্রতিহিংসার জন্যে ওখানকার লোকেও খুঁজছে ওকে। অবশেষে হদিশ পেয়েছিল এইখানে।'

মিস বার্নেট উঠে বসে কান খাড়া করে শুনছিল কথাবার্তা। এখন বললে, 'এক বছর আগে ডন মুরিলোর সন্ধান পায় ওরা। একবার খতম করার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু যেন পৈশাচিক প্রেতাত্মারা আগলে রেখে দিয়েছে ওকে, কেশাগ্র স্পর্শ করা যায়নি। এবারেও দেখুন, ভালো মানুষের ছেলে দিলখোলা গারসিয়া খতম হয়ে গেল, কিন্তু আসল পিশাচ পার হয়ে গেল। কিন্তু সূর্য যেমন সত্যি, ডন মুরিলোকেও তেমনি একদিন খতম হতেই হবে। একজন গেছে, আবার একজন আসবে। সে না-পারলে আসবে আর একজন।

বলতে বলতে অত্যন্ত ঘৃণায় কুঁচকে গেল মিস বার্নেটের শীর্ণ মুখ, মুষ্টিবদ্ধ হল শিরা-বার-করা সরু হাত।

হোমস বললে, 'কিন্তু ইংরেজের মেয়ে হয়ে আপনি এই রক্তারক্তির ষড়যন্ত্রে ঢুকলেন কেন?'

'পৃথিবীর কোনো আইন বা আদালতে এতবড়ো অন্যায়ের বিচার করা যাবে না বলে। বহু বছর আগে সান পেড্রোতে রক্তনদী বয়ে গেছে, জাহাজ-বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে পিশাচ ডন মুরিলো পালিয়ে এসেছে। তাতে ইংলন্ডের আইনরক্ষকদের কী এসে যায়? আপনাদের কাছে এসব ঘটনা

অন্য গ্রহের ঘটনার শামিল। কিন্তু হাহাকার আর রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে আমরা জেনেছি, নরকের শয়তান যদি কোথাও থাকে, তা এই ডন মুরিলো। প্রতিহিংসা-পাগল সর্বহারারা যতদিন প্রতিহিংসা নিতে না-পেরে হাহাকার করে ফিরবে, ততদিন শান্তি আসবে না এ-পৃথিবীতে।'

'ডন মুরিলো যে কী সাংঘাতিক লোক, আমি তা জানি মিস বার্নেট। কিন্তু আপনার গায়ে আঁচ লাগল কীভাবে?'

'সব বলব। শয়তান ডন মুরিলো নানা অছিলায় পর পর মানুষ খুন করত। যখনই বুঝত অমুকের মধ্যে প্রতিভা আছে, ক্ষমতা আছে, বেশি উঠতে দিলে তার নিজের বিপদ হতে পারে, তাকেই ছুতোনাতা করে ডেকে এনে শেষ করে দিত। আমার আসল নাম সিগনোরা[১৪] ভিক্টর ডোরান্ডো। আমার স্বামী লন্ডনে সান পেড্রো মিনিস্টার ছিলেন। অমন মহৎ মানুষ জীবনে আর দেখিনি। আমাকে উনি লন্ডনে দেখেন এবং বিয়ে করেন। ডন মুরিলো যখন শুনল ওঁর সুনাম, ডেকে পাঠাল বাড়িতে, তারপর কুকুরের মতো গুলি করে ফেলে দিল লাশ। আমার স্বামী বুদ্ধি করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, আঁচ করতে পেরেছিলেন বোধ হয় জীবন্ত আর ফিরতে হবে না। ডন মুরিলো ওঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে। স্বামীহারা আমি রাস্তার ভিখিরি হয়ে হাহাকার করে বেড়াতে লাগলাম সেই থেকে। তারপরেই পতন ঘটল পিশাচ ডন মুরিলোর, পালিয়ে গেল ধনরত্ন আর মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু একদিন যাদের বুকে ও আগুন জ্বালিয়েছে, যাদের জীবন ধ্বংস করেছে, তারা ওকে ছেড়ে দিল না। সংঘবদ্ধ হল, সমিতি স্থাপন করল, প্রতিজ্ঞা করল, ডন মুরিলোর রক্ত দিয়ে হোলি খেলা না পর্যন্ত সমিতি টিঁকে থাকবে। হেনডারসন ছদ্মনামে শয়তানটা এখানে আস্তানা নিয়েছে শুনে ভার পড়ল আমার ওপর গভর্নেসের চাকরি নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে খবর চালান করার। পিশাচ ডন মুরিলো কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি, প্রত্যেকদিন যার সঙ্গে মুখোমুখি বসে খাবার খেয়েছে, তারই স্বামীকে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনন্তের পথিক করে ছেড়েছে। আমি শুধু মনে মনে হেসেছি, ওর সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলেছি, মেয়েদের ওপর যথাকর্তব্য করেছি এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছি। প্যারিসে একটা সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু ও বেঁচে গেল। আমরা সারাইউরোপে ঝড়ের মতো এদিক-ওদিক করে বেড়ালাম যাতে কেউ পিছু নিতে না-পারে। তারপর ফিরে এলাম এখানে। ইংলন্ডে এসেই এই বাড়িটা নিয়েছিল ডন মুরিলো।'

একটু থেমে ফের বলতে শুরু করল মিস বার্নেট : 'কিন্তু এখানেও ওত পেতে ছিল বিচারকর্তারা। সান পেড্রোর একজন উচ্চপদস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তির ছেলে গারসিয়া দুজন একান্ত অনুগত অনুচরকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ওকে বধ করার জন্যে। এই দুজনের জীবনেও কিন্তু সর্বনাশের আগুন জ্বালিয়েছে ডন মুরিলো। তাই প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল তিনজনেরই বুকে। কিন্তু দিনের বেলায় ওরা সুবিধে করে উঠতে পারছিল না ডন মুরিলো কখনো একা বেরোয় না বলে, অতীতের দুষ্কর্মের সঙ্গী লুকাস বা লোপেজ সবসময়ে থাকত সঙ্গে। রাতে কিন্তু একা ঘুমোত, ওকে নিঃশেষ করার মোক্ষম সময় তখনই। ধড়িবাজ ডন মুরিলো কিন্তু পর পর দু-রাত এক ঘরে শুত না, রোজই ঘর পালটাত। একদিন রাতে শোয়ার ব্যবস্থা আমার বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ঠিক করলাম, দরজা খুলে রাখব, অবস্থা অনুকূল থাকলে জানলায় সবুজ আর সাদা আলোর সংকেত দেখাব। সেই সংকেত দেখা না-গেলে গারসিয়া যেন না-আসে। কিন্তু গেল সব ভণ্ডুল হয়ে। কী কারণে জানি না, সেক্রেটারি লোপেজ

সন্দেহ করেছিল আমাকে। চিঠিটা সবে লেখা শেষ করেছি, এমন সময়ে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। ডন মুরিলো তখনই ছুরি বসাত আমার বুকে, কিন্তু দুজনে মিলে শলাপরামর্শ করে ঠিক করলে, গারসিয়াকে আগে খতম করা দরকার। ডন মুরিলো আমার হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে এমন মোচড় দিলে যে নামটা না-বলে পারিনি। তখন অবশ্য জানতাম না, গারসিয়াকে খুন করার জন্যেই নাম জানতে চাইছে। জানলে কখনোই বলতাম না, হাত ভেঙে গেলেও বলতাম না। চিঠিখানা খামে ভরে ঠিকানা লিখল সেক্রেটারি সিলমোহর করল আস্তিনের কাফলিং দিয়ে। গারসিয়ার বাড়ি পাঠিয়ে দিল চাকর জোসির হাতে। লোপেজ আমার পাহারায় ছিল বলেই আমার বিশ্বাস, গারসিয়াকে নিজের হাতে খুন করেছে ডন মুরিলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে খুন করেনি পাছে তদন্তের সময়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায় এই ভয়ে। কিন্তু ঝোপের মধ্যে গারসিয়ার মৃতদেহ পড়ে থাকলে পুলিশ কিছুই আঁচ করতে পারবে না, অথচ গারসিয়ার স্যাঙাতরা ভয় পেয়ে ডন মুরিলোর পিছু নেওয়া ছেড়ে দেবে। তারপর থেকে এই পাঁচদিন অকথ্য অত্যাচার চলেছে আমার ওপর.। পেট ভরে খেতে দেওয়া হয়নি, পিঠে ছোরা দিয়ে খোঁচানো হয়েছে, দু-হাত দেখুন ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে, জানলা দিয়ে একবার চেঁচাতে গিয়েছিলাম বলে মুখের মধ্যে ন্যাকড়া ঠেসে দিয়েছে। আমার মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যে যতরকম উপায় আছে, কোনোটাই বাকি রাখেনি। আজকে দুপুরে পেট ভরে হঠাৎ খেতে দেয়। খাবার পরেই বুঝলাম, আফিং মেশানো ছিল খাবারে। বেহুঁশ অবস্থায় মনে হল, যেন হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথাও। গাড়িতে ওঠানোর পর সম্বিৎ ফিরল। দেখলাম এই শেষ সুযোগ, নইলে ইহজীবনে আর মুক্তি পাব না। ধস্তাধস্তি করলাম, ঠিকরে বেরিয়ে এলাম! তখন এই লোকটি দয়া করে আমাকে টানতে টানতে ওদের খপ্পর থেকে নিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে এখানে এনে ফেললেন। ভগবান বাঁচিয়েছেন। ওদের ক্ষমতা নেই আর আমার ক্ষতি করার।'

নীরবে শুনলাম অত্যাশ্চর্য এই কাহিনি। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল হোমস। মাথা নেড়ে বললে, 'ঝামেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। পুলিশের কাজ মিটল বটে, শুরু হল আইনের কাজ।'

'তা ঠিক।' বললাম আমি, 'যত দুষ্কর্ম করে থাকুক না কেন ডন মুরিলো, এই দুষ্কর্মের সাজা তাকে পেতেই হবে। ভালো আইনজ্ঞের হাতে কেস পড়লে মামলা ঠিক সাজিয়ে ফেলবে। বোঝাবে, ডন মুরিলো যা কিছু করেছে, আত্মরক্ষার জন্যে করেছে।'

প্রসন্নকণ্ঠে বেনেজ বললে, 'আরে রাখুন, আইন জিনিসটা আমিও ভালো বুঝি। আত্মরক্ষা এক জিনিস, আর ঠান্ডা মাথায় একজনকে ভুলিয়ে এনে খুন করা আর এক জিনিস, তা সে যত বিপজ্জনক লোকই হোক না কেন। হাইগেবলের ভাড়াটে ভদ্রলোককে কাঠগড়ায় না দাঁড় করানো পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই জানবেন।'

কিন্তু আবার পুলিশ চরের চোখে ধুলো দিল মহাপাপিষ্ঠ জন মুরিলো। এডমন স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কার্জন স্কোয়ারে। তারপর থেকে বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল মুরিলো পরিবার, নাম পর্যন্ত আর শোনা গেল না ইংলন্ডে। ছ-মাস পরে মাদ্রিদের এসকুরিয়াল হোটেলে খুন হয়ে গেল মনটালভার মারকুইস[১৫] আর তার সেক্রেটারি সিগনর রুলি[১৬]। খুনিরা ধরা পড়ল না। লোকে বললে, নিহিলিস্টদের[১৭] কুকর্ম। নিহতদের ছাপা ছবি নিয়ে বেকার স্ট্রিটে এল ইনস্পেকটর বেনেজ। চুম্বকের মতো কালো চোখ, কর্তৃত্বব্যঞ্জক

আকৃতি আর ঝোপের মতো ভুরু দেখেই চেনা গেল ডন মুরিলোকে। সেক্রেটারির কালচে মুখ দেখেও চিনতে অসুবিধে হল না মোটেই। বুঝলাম, দেরিতে হলেও এতদিনে শেষ হল গুপ্তবিচার সমিতির একমাত্র কাজ।

সন্ধের দিকে পাইপ খেতে খেতে হোমস বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, কেসটা সত্যিই জবরজং টাইপের। দু-দিকে দুটো দেশ, দু-দেশে রহস্যজনক দুটো দল। মাঝে স্কট ইক্লিসের মতো নিরীহ ইংরেজ আর এই হুঁশিয়ার গারসিয়া। এখনও যদি কিছু বোঝার থাকে, তো বলো, বুঝিয়ে দিই।'

'মুলাটো পাচক ফিরে এল কেন?'

'রান্নাঘরে পাওয়া ওই অদ্ভুত মূর্তিটার জন্যে। লোকটা সত্যিই বর্বর, সান পেড্রোর জঙ্গলের মানুষ। মূর্তিটাকে ও দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। তাড়াহুড়ো করে পালানোর সময়ে ওর সঙ্গী ওকে নিতে দেয়নি প্রাণপ্রিয় আরাধ্য দেবতাকে। তাই কুসংস্কারের তাগিদে ফিরে এসেছিল পরের দিন। জানলা দিয়ে ওয়াটসনকে দেখে পালিয়েছে। তিন দিন পরে আবার এসে ধরা পড়েছে। বেনেজ বুঝেছিল, সে আসবে, তাই আমি বোঝবার আগেই ফাঁদ পেতে তাকে ধরেছে শুধু ডন মুরিলোকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে। আর কিছু?'

'টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া পাখি, গামলাভরতি রক্ত, বারকোশ-ভরতি পোড়া হাড়, রান্নাঘরে অদ্ভুত এই জিনিসগুলো গেল কেন?'

মৃদু হেসে নোটবই খুলল হোমস। বলল, 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে এ নিয়ে পড়াশুনা করেছি। নিগ্রোদের ধর্ম আর ডাকিনীবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক সম্বন্ধে একারম্যানের বই থেকে এই ক-টা লাইন লিখে এনেছি। শোনো : 'নোংরা দেবতাদের উপাসনা করার জন্যে ভুডু অর্থাৎ ডাকিনীবিদরা কিছু-না-কিছু বলি দেবেই। নরবলি পর্যন্ত দেওয়া হয়, তারপর মহামাংস নিয়ে ভোজোৎসব হয়। সবচেয়ে বেশি বলি হয় সাদা মোরগ জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলে। কালো ছাগল জবাই করে আগুনে পুড়িয়ে বলি দেওয়ার প্রথাও আছে এদের মধ্যে।' তাহলেই দেখ, বর্বর পাচক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোআচ্চা করে গেছে রান্নাঘরে। আমাদের কাছে তা কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়েছিল ঠিকই, এখন দেখলে তো, কিম্ভূতকিমাকার শব্দটার সঙ্গে ভয়ংকর শব্দটার তফাত খুব সামান্যই। আগেও তোমাকে এ নিয়ে বলেছি, তাই নয় কি?'

টীকা

১. **উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি :** ১৯০৮-এর পনেরোই অগাস্ট তারিখের কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনে এই গল্পটি প্রকাশিত হয় 'দ্য সিঙ্গুলার এক্সপিরিয়েন্স অব মি. জে. স্কট একেলস' নামে। আবার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর ১৯০৮ দুটি সংখ্যায় দুটি কিস্তিতে প্রকাশিত এই গল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দ্য রেমিনিসেন্স অব মি. শার্লক হোমস'। প্রথম কিস্তির শিরোনাম ছিল 'দ্য সিঙ্গুলার এক্সপিরিয়েন্স অব মি. জে. স্কট একেলস' এবং দ্বিতীয় কিস্তির শিরোনাম 'দ্য টাইগার অব সান পেদরো'। পরে, গ্রন্থাকারে সংকলনকালে গল্পটির নামকরণ করা হয় 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব উইসটেরিয়া লজ'।

২. **১৮৯২ সালের মার্চ মাস :** তারিখটি সর্বৈব ভুল। কারণ ১৮৯১-এর এপ্রিল থেকে ১৮৯৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত হোমস ছিলেন নিরুদ্দেশ। 'দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস' গ্রন্থের প্রথম গল্প দ্রষ্টব্য।

৩. **পোস্ট অফিস, শেরিং ক্রস :** হোমসের সমকালে মর্লেজ হোটেলের একতলায় অবস্থিত শেরিং ক্রস পোস্ট অফিস ইংলন্ডের একটি প্রাচীনতম পোস্ট অফিস। এটি সেই সময়ে রাতদিন খোলা থাকত।

৪. **পুরুষ না মহিলা :** কেউ ভাবতে পারেন স্কট পুরুষের নাম। আবার পদবিও হয়। এক্ষেত্রে নাম ‘স্কট’, পদবি ‘একেলস’ (বা ইক্লিস)। কিন্তু ইংরেজ ওয়াটসন বুঝেছিলেন নামের আদ্যক্ষর ‘জে’ পদবি ‘স্কট একেলস’, যেমন রায়চৌধুরি বা বসু মল্লিক বা ঘোষ দস্তিদার হয়ে থাকেন, সেইরকম।

৫. **কর্নেল ক্যারুথার্স :** ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট’ গল্পে শার্লক হোমস ‘খাঁচায় পুরেছিলেন’ বব কারুথার্সকে। তবে সে ‘কর্নেল’ নয়।

৬. **ইনস্পেকটর গ্রেগসন :** এই গল্পে ছাড়া গ্রেগসনকে আর দেখা যায় ‘আ স্টাডি ইন স্কারলেট’ উপন্যাসে এবং ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার’ গল্পে।

৭. **রাত একটা বাজে :** অতিথির ঘুম ভাঙিয়ে গারসিয়া যখন সময় জানাল, তখন স্কট-একেলস নিজের ঘড়ি দেখলে কিন্তু গারসিয়ার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত।

৮. **রেসের কথা মনে করিয়ে দেয় :** রেসের ঘোড়সওয়ার বা জকিদের পোশাকের রঙের কথা মাথায় রেখে সম্ভবত এই উক্তি করা হয়েছে।

৯. **মুলাটো :** যার বাবা এবং মায়ের মধ্যে একজন নিগ্রো এবং অপরজন শ্বেতাঙ্গ, তাদের মুলাটো (Mulatto) বলা হয়। মুলাটো এবং শ্বেতাঙ্গর সন্তানকে বলা হয় কোয়াড্রুন (Quadroon) এবং কোয়াড্রুন এবং শ্বেতাঙ্গর সন্তান অক্টোরুন (Octoroon) নামে পরিচিত।

১০. **ডন :** সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের নামের আগে ব্যবহৃত স্প্যানিশ অভিধা।

১১. **মধ্য আমেরিকায় .:** অধিকাংশ গবেষকের মতে সান পেড্রো হল ব্রাজিল এবং ডন মুরিলো ব্রাজিলের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় পেড্রো বা ডম পেড্রো দে আলকান্তারা। রাজত্বকাল ১৮৩১ থেকে ১৮৮৯। ১৮৮৯-এ এক সামরিক অভ্যুত্থানে গদিচ্যুত হয়ে ইউরোপে পালিয়ে আসেন।

১২. **বলদর্পী একনায়ক :** ব্রাজিলের সম্রাট দ্বিতীয় পেড্রো কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের যথেষ্টই প্রিয় ছিলেন।

১৩. **প্যারিস, রোম, মাদ্রিদ, বার্সিলোনা :** ফ্রান্সে রাজধানী প্যারিস বা পারী, ইতালির রাজধানী রোম, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ এবং স্পেনের বড়ো শহর বার্সিলোনা, কোনোটাই বন্দর নগরী নয়, যেখানে জাহাজ যেতে পারে।

১৪. **সিগনোরা :** সিগনোরা ব্যবহৃত হয় ইতালীয় মহিলাদের নামের প্রারম্ভে; স্পেনীয় মহিলাদের নামের আগে বলা হয় সেনোরা।

১৫. **মারকুইস :** একজন মারকুইস সম্মানে ডিউকের থেকে নীচুতে এবং আর্ল-এর ওপরে।

১৬. **সিগনর রুলি :** এক্ষেত্রে, স্পেনীয় রুলির নামের আগে ‘সিগনর’ নয়, ‘সেনর’ থাকবার কথা। আবার, ‘রুলি’ নামের কোনো স্পেনীয় পদবি দেখা যায় না বলে জানিয়েছেন কয়েকজন গবেষক।

১৭. **নিহিলিস্ট :** ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে’ গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রেড সার্কল]

বিরাট স্ক্র্যাপবুকে নিজের সাম্প্রতিক কীর্তিকাহিনি সাঁটতে সাঁটতে বিরক্ত মুখে শার্লক হোমস বললে, ‘মিসেস ওয়ারেন, আমার সময়ের দাম আছে। খামোখা ভেবে মরছেন, আমাকেও ভাবাতে এসেছেন।’

কিন্তু বাড়িউলি মিসেস ওয়ারেন হাজার হলেও মেয়েমানুষ। মেয়েলি ধূর্ততার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যি হোমসের নেই। ছিনেজোঁকের মতো ভদ্রমহিলা বললেন, ‘গত বছর আমার এক ভাড়াটের ব্যাপার আপনি নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন[২]। নাম তাঁর মিস্টার ফেয়ারডেল হবস।’

'আরে, সে তো একটা সোজা কেস।'

'কিন্তু আপনার প্রশংসায় তিনি এখনও পঞ্চমুখ। মানুষ ধাঁধায় পড়লে কখনো তাকে বিমুখ করেন না। আমিও সেই ধাঁধা নিয়েই ছুটে এসেছি।'

হোমস যেমন তোষামোদে গলে যায়, কারো কষ্ট দেখলেও তেমনি সইতে পারে না। ডবল দাওয়াইয়ে কাজ হল তৎক্ষণাৎ। হাতের কাজ ফেলে রেখে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

বলল, 'আপনার নতুন ভাড়াটের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বলে অস্বস্তিতে মরছেন, এই তো? আমি যদি আপনার ভাড়াটে হতাম, হপ্তার পর হপ্তা আমার মুখও আপনি দেখতে পেতেন না।'

'জানি স্যার জানি। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লোকটা ঘরের মধ্যে যদি সমানে পায়চারি করে, অথচ একবারও মুখ না-দেখায়, ভাবনা হয় না? এত ভয় কাকে? কী এমন কাণ্ড করেছে যে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে? আমার স্বামী কাজ নিয়ে বাইরে থাকে, কিন্তু আমাকে তো দিনরাত বাড়িতে থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে হচ্ছে। স্বামী বেচারার ধাত ছেড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে— আমার অবস্থাও ভালো নয়।'

ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল দিয়ে মিসেস ওয়ারেনের কাঁধ স্পর্শ করল হোমস— উদ্‌বিগ্ন মানুষকে শান্ত করার অদ্ভুত একটা সম্মোহনী শক্তি ওর আছে— মিসেস ওয়ারেনও দেখতে দেখতে সহজ হয়ে এলেন। মুখ থেকে মিলিয়ে গেল ভয়ের রেখা— সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে।

হোমস বললে, 'লোকটা আপনার কাছে দশ দিন আগে থাকা খাওয়া বাবদ পনেরো দিনের টাকা আগাম দিয়েছে বললেন না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উপরতলায় একটা বসবার ঘর আর শোবার ঘরের জন্যে কত দিতে হবে জানতে চাইল। আমি বললাম, হপ্তায় পঞ্চাশ শিলিং। ও বলল, "হপ্তায় পাঁচ পাউন্ড দেব— কিন্তু আমার শর্ত মতো চলতে হবে।" মিস্টার ওয়ারেনের আয় কম— বুঝতেই পারছেন শর্তটা শুনতে চাইলাম। লোকটা একটা দশ পাউন্ডের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "পনেরো দিন অন্তর একখানা নোট পাবেন। কিন্তু বাড়ির চাবিটা আমার কাছে রাখতে হবে।" শর্তটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, অনেক ভাড়াটেই চাবি কাছে রাখতে চায় কারোকে বিরক্ত করতে চায় না বলে।'

'তবে এখন এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'

'হচ্ছি কি করে সাধে? এই দশ দিনে একবারমাত্র বাড়ির বাইরে গেছে— প্রথম রাতে। তারপর থেকে চৌপরদিন খালি ঘরে হাঁটছে। ঝি-টা সুদ্ধ তার চেহারা দেখেনি। এ আবার কী কাণ্ড?'

'প্রথম রাতে তাহলে বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ফিরেছিল মাঝরাতে। আগে থেকে বলে রেখেছিল বলে দরজার খিল দেওয়া হয়নি। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।'

'খাবারদাবার পৌঁছোয় কী করে?'

'আগে থেকেই বলা আছে, ঘণ্টা বাজালে যেন খাবার দরজার সামনে চেয়ারে রেখে আসা হয়। আবার ঘণ্টা বাজালে এঁটো বাসন নিয়ে আসা হয়। বিশেষ কিছু দরকার পড়লে বড়ো হাতের অক্ষরে এক টুকরো কাগজে লিখে জানিয়ে দেয়।'

'বড়ো হাতের অক্ষরে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পেনসিলে লেখে। শুধু শব্দটা— তার বেশি নয়। কয়েকটা কাগজ এনেছি আপনাকে দেখানোর জন্যে। এটা দেখুন : SOAP; এই দেখুন আর একটা— MATCH; এইটা প্রথম দিন সকালে পেয়েছি— DAILY GAZETTE[৩]; প্রত্যেক দিন সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে কাগজটা পাঠিয়ে দিই।'

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো!' ফুলসক্যাপ কাগজ ছেঁড়া স্লিপগুলো দেখতে দেখতে তাজ্জব হয়ে বললে হোমস। টানা হাতে লেখার একটা মানে বুঝি কিন্তু বড়ো হাতের অক্ষর বসিয়ে লেখা তো একটা ঝামেলা। নিরিবিলিতে থাকার না হয় একটা কারণ থাকতে পারে— কিন্তু বড়ো হাতের অক্ষরে লেখার কারণটা তো বুঝছি না। এ তো বড়ো অস্বাভাবিক ব্যাপার। ওয়াটসন, কী বুঝছ?'

'হাতের লেখা লুকোতে চায়।'

'কিন্তু কেন? বাড়িউলি তার টানা হাতের লেখা দেখলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে? তার ওপর দেখ অল্প কথার হুকুমগুলোও এক-একটা হেঁয়ালি।'

'বুঝলাম না।'

'বেগনি রঙের শিস পেনসিলটার, মোটা ধ্যাবড়া মুখ। কাগজটা লেখবার পর এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছে যে SOAP শব্দটার কিছুটা ছিঁড়ে গেছে। খুবই অর্থপূর্ণ ব্যাপার হে!'

'হুঁশিয়ার আদমি, এই তো?'

'একেবারে ঠিক। নিশ্চয় আঙুলের ছাপ-টাপ এমন কিছু একটা পড়েছিল যা দেখলে শনাক্তকরণ সহজ হয়ে যেত। মিসেস ওয়ারেন, লোকটা মাঝবয়েসি, কালচে আর দাড়িওলা বললেন না? বয়স কত?'

'ছোকরার বয়স— তিরিশের বেশি নয়।'

'আর কিছু লক্ষণ দেখেছেন?'

'ইংরেজিটা ভালো বললেও উচ্চারণ শুনে বুঝেছি বিদেশি মানুষ।'

'জামাকাপড় পরিপাটি?'

'দারুণ। ভীষণ স্মার্ট।'

'নাম বলেছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'চিঠিপত্র আসে? দেখা করতে কেউ আসে?'

'একদম না।'

'কিন্তু সকালের দিকে ঝাড়পোঁছ করার জন্যে ঝি ঘরে ঢোকে না?'

'সব কাজ নিজের হাতে করে।'

'কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! জিনিসপত্র কী আছে সঙ্গে?'

'একটা বাদামি ব্যাগ— মস্ত বড়ো— আর কিছু না।'

'ঘর থেকে কিছুই কি পাওয়া যায়নি?'

ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে ঝাড়লেন মিসেস ওয়ারেন। বেরিয়ে এল দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, একটা পোড়া সিগারেট।

'আজ সকালে ট্রেতে পেয়েছি। শুনেছি ছোটোখাটো জিনিস দেখেও অনেক বড়ো ব্যাপার ধরতে পারেন— তাই নিয়ে এলাম দেখানোর জন্যে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। কাঠিগুলি অল্পই পুড়েছে— তার মানে সিগারেট ধরানো হয়েছে। পাইপ বা চুরুট ধরাতে গেলে অর্ধেক কাঠি পুড়ে যায়। কিন্তু, এ আবার কী ব্যাপার! ভারি আশ্চর্য তো! পোড়া সিগারেটটা দেখেছ ওয়াটসন? মিসেস ওয়ারেন, লোকটার দাড়িগোঁফ আছে বললেন না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে। সিগারেটের শেষ পর্যন্ত টানা হয়েছে— গোঁফ তো পুড়ে যাওয়ার কথা। আরে ওয়াটসন, তোমার এমন ছোট্ট গোঁফেও ছ্যাঁকা লাগত এইভাবে সিগারেটের শেষ পর্যন্ত ঠোঁটে রেখে দিলে। এভাবে সিগারেট খেতে পারে যার দাড়ি গোঁফ কামানো।'

'সিগারেট হোল্ডারে লাগিয়েছিল বোধ হয়?' বললাম আমি।

'না হে না, পিছনে থুথু লেগে রয়েছে। মিসেস ওয়ারেন, ঘরে দুজন লোক নেই তো?'

'আজ্ঞে না। লোকটা এমনিতে এত কম খায় যে বলবার নয়।'

'তাহলে আরও দু-দিন অপেক্ষা করা যাক। আপনার এত ধড়ফড় করারও দরকার নেই। আগাম টাকা পেয়েছেন, ভাড়াটে হিসাবেও লোকটা নচ্ছার নয়, একটু সৃষ্টিছাড়া হলেও বদ নয়। যতক্ষণ না তাকে কোনো কারণে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, ততক্ষণ নিরিবিলি বসে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না। তবে কেসটা হাতে রাখলাম, নতুন কিছু ঘটলেই এসে বলবেন।

বিদায় হলেন বাড়িউলি। হোমস বললে, 'ওয়াটসন, কেসটা ইন্টারেস্টিং। হয় কারো নিছক বাতিক, না হয় গভীর জলের ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঘরে অন্য কেউ থাকে— ঘরভাড়া যে নিয়েছে, সে নয়।'

'কেন এমন মনে হল?'

'সিগারেটের ব্যাপারটা ছাড়াও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে যে। লোকটা ঘর ভাড়া নিয়েই বেরিয়ে গেল। ফিরল অনেক রাতে— যখন কেউ নেই, কেউ তাকে দেখল না। যে-লোক বেরিয়ে গেল, সেই লোকই যে ফিরে এল তার কী প্রমাণ? নিশ্চয় তার বদলে এল একজন। প্রথম জন ইংরাজি চোস্ত বলে, দ্বিতীয় জন ইংরাজিতে কাঁচা বলেই MATCHES না-লিখে MATCH লেখে। কেন জান, MATCH শব্দটা ডিকশনারি দেখে লিখেছে বলে— ডিকশনারিতে শব্দটার বিশেষ্য আছে, বহুবচন নেই। কাটছাঁট কথায় হুকুম চালানোর কারণটাই হল ইংরেজি ভাষায় দখল নেই। এইসব কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাড়াটে পালটে গিয়েছে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে!'

'উদ্দেশ্য?'

'সমস্যা তো সেইটাই। তদন্ত চালানোর লাইন এখন একটাই।' বলতে বলতে তাক থেকে ইয়ামোটা একটা জাবদা খাতা নামাল হোমস। নানান কাগজ থেকে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের

অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর কেটে দিনের পর দিন খাতায় সেঁটে রাখা ওর বরাবরের অভ্যেস। একটার পর একটা খবর পড়ে টিপ্পনী কেটে চলল হোমস। একটু পরেই চোখ আটকে গেল একটা খবরে।

বলল, 'ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এই খবরই খুঁজছি[৪]। শোনো : ধৈর্য ধরো। যোগাযোগের কোনো উপায় বার করবই। তদ্দিন এইখানে চোখ রেখো— জি।' রহস্যজনক ভাড়াটে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে ওঠার দু-দিন পরের বিজ্ঞাপন। লোকটা তাহলে ইংরেজি ভালো লিখতে না-পারলেও পড়তে পারে। তিনদিন পরে দেখ আবার একটা বিজ্ঞাপন। 'কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে। ধৈর্য ধরো। মেঘ কেটে যাবে।—জি।' সাতদিন আর খবর নেই। তারপর এই বিজ্ঞাপনটা দেখছি অনেক স্পষ্ট— 'রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। সুযোগ পেলে সংযোগ পেলে সংকেত করব। নিশানা-সংকেত মনে রেখো— একটা A, দুটো B, ইত্যাদি। শিগ্‌গিরই খবর দোব।— জি।' এটা হল গতকালের কাগজের বিজ্ঞাপন, আজ আর কোনো বিজ্ঞাপন নেই। ওয়াটসন, এবার সবুর করলেই ব্যাপারটা অনেকটা বোধগম্য হবে।'

হলও তাই। সকাল বেলা দেখলাম আগুনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাকিয়ে সন্তোষ-উজ্জ্বল মুখে হাসিভরা চোখে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুবর।

টেবিল থেকে সেইদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বললে, 'ওয়াটসন, দেখ, দেখ, ঠিক যা ভেবেছিলাম। "উঁচু লাল বাড়ি, সামনের দিকটা সাদা পাথর। চারতলা। দ্বিতীয় জানলা ছেড়ে। সন্ধের পর।— জি।" এবার তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জল কোনদিকে গড়াচ্ছে। প্রাতরাশ খেয়ে ভাবছি মিসেস ওয়ারেনের ভাড়াটের সঙ্গে একটু দেখা করে আসব। আরে, মিসেস ওয়ারেন যে! সাতসকালে কী খবর নিয়ে এলেন!'

সাংঘাতিক নতুন কিছু একটা ঘটেছে মনে হল। বিপুল উদ্যমে ধূমকেতুর মতো সাঁ করে চলে এসেছেন মিসেস ওয়ারেন।

'মি. হোমস! মি. হোমস! আপনার সঙ্গে পরামর্শ না-করে কিছু করব না বলেই ছুটে এলাম। কিন্তু এবার আমি পুলিশ ডাকব। আমার বুড়ো স্বামীকে যারা ছুড়ে ফেলে দেয়—'

'মিস্টার ওয়ারেনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে?'

'খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে।'

'কে করেছে?'

'আজ সকালে সাতটা নাগাদ আমার কর্তা কাজে বেরিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই হঠাৎ রাস্তায় দুটো লোক পেছন থেকে এসে ঝপাং করে একটা কোট মাথায় ছুড়ে দিয়ে সবসুদ্ধ জাপটে তুলে ফেলে পেছনের একটা গাড়িতে। ঘণ্টাখানেক পরে ফেলে দেয় রাস্তায়। কর্তা তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। গাড়িটা পর্যন্ত দেখেনি। দেখে কী হ্যাম্পস্টেড হিদের ফুটপাতে পড়ে আছে। বাসে করে বাড়ি ফিরেছে। সোফায় শুয়ে এখনও কাঁপছে।

'লোকগুলোর চেহারা দেখেছেন? কথা বলতে শুনেছেন?'

'না। ওঁর তখন মাথা ঘুরছিল। শুধু মনে আছে ঠিক যেন ম্যাজিক দেখানোর মতো তুলে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে, আবার ম্যাজিক দেখানোর মতো ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায়। দুজন কি তিনজন লোক ছিল বোধ হয়।'

'আপনার ধারণা এ-ব্যাপারে আপনার ভাড়াটে জড়িত?'

'তা ছাড়া আর কে? পনেরো বছর এ-বাড়িতে রয়েছি কখনো এমন কাণ্ড ঘটেনি। যথেষ্ট হয়েছে, আর না, টাকা না, টাকা সব নয়। আজকেই ওকে বিদেয় করব বাড়ি থেকে।'

'অত ধড়ফড় করবেন না মিসেস ওয়ারেন, ধৈর্য রাখুন। সকাল সাতটার কুয়াশায় আততায়ীরা ভুল করে আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে— ভুল বুঝতে পেরে ফেলে দিয়ে গেছে। কাজেই আসল বিপদটা আপনার ভাড়াটের। ভুল যদি না হত, ভাড়াটের কী দশা হত ভেবে পাচ্ছি না।'

'তাহলে আমি কী করব, মি. হোমস?'

'মিসেস ওয়ারেন, আপনার এই ভাড়াটের মুখশ্রী দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দরজা না-ভাঙলে ঢুকবেন কী করে? খাবারের ট্রে দরজার সামনে বসিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নেমে যাই, তালা খোলার আওয়াজ পাই তখন— তার আগে নয়।'

'ট্রে-টা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাইরে আসতে হয় তো। তখনই দেখে নেব— কিন্তু কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

একটু ভেবে নিয়ে মিসেস ওয়ারেন বললেন, 'বেশ তো, সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দরজার উলটোদিকে একটা মাচা-ঘর আছে। আমি একটা আয়না বসিয়ে রাখব ভেতরে— আপনারা ঘাপটি মেরে থাকবেন দরজার আড়ালে।'

'চমৎকার! দুপুরের খাওয়া কখন খায় লোকটা?'

'একটা নাগাদ।'

'ওই সময়ে আসছি আমি আর ডাক্তার ওয়াটসন। আপাতত বিদায়।'

সাড়ে বারোটার সময়ে পৌঁছোলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে গ্রেট ওরমে স্ট্রিটে। মিসেস ওয়ারেনের বাড়িটা বেশ উঁচু, হলদে ইট দিয়ে তৈরি। রাস্তার কোণে হোয়ে স্ট্রিটের আবাসিক ফ্ল্যাটবাড়িগুলো চোখে পড়ার মতো। একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে খুকখুক করে হেসে উঠল হোমস। বাড়িটা অন্যান্য বাড়ি থেকে এমনভাবে ঠেলে সামনে এসেছে যে চোখে না-পড়লেই নয়।

বলল, 'ওয়াটসন দেখেছ! উঁচু লাল বাড়ি, সামনেটা পাথর দিয়ে তৈরি। সংকেত খবরের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একটা জানলাতে ঘর ভাড়ার নোটিশও ঝুলছে দেখছি। অর্থাৎ একটা খালি ফ্ল্যাটে ঢোকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে স্যাঙাত। এই যে মিসেস ওয়ারেন, বলুন কোথায় যেতে হবে।'

'বুটজোড়া নীচের চাতালে খুলে রেখে ওপরে চলে আসুন। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

লুকিয়ে দেখার পক্ষে জায়গাটা খাসা। আয়নাটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যে অন্ধকারে গা ঢেকে বসে থেকে উলটোদিকের দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায়। আসন গ্রহণ করলাম, মিসেস ওয়ারেন বিদায় নিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে অনেক দূরে শুনলাম ঘণ্টাধ্বনির ক্ষীণ শব্দ— খাবার তলব করছে রহস্যময় ভাড়াটে। একটু পরেই ট্রে নিয়ে উঠে এলেন মিসেস ওয়ারেন, দরজার সামনে চেয়ারের ওপর রেখে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। দরজার কোণে সেঁটে থেকে আয়নার মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলাম বন্ধ দরজার প্রতিবিম্বর দিকে। হঠাৎ শোনা গেল চাবি ঘোরানোর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, ঘুরে গেল হাতল, ঈষৎ ফাঁক হল পাল্লা এবং একজোড়া সরু হাত ঝপ করে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে

গেল ট্রে-টা। এক মুহূর্ত পরেই খালি ট্রে-টা বসিয়ে দেওয়া হল চেয়ারে এবং চকিতের জন্যে দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে একটা সুন্দর কালচে ভয়ার্ত মুখ কটমট করে চেয়ে আছে মাচা-ঘরের অল্প ফাঁক করা দরজার পানে। পরমুহূর্তেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ঘুরে গেল চাবি এবং নিস্তব্ধ হল বাড়ি। আমার গা টিপে দিয়ে মাচাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল হোমস— পেছনে আমি।

নীচে নেমে মিসেস ওয়ারেনকে বললে, 'রাত্রে আসব'খন। এসো ওয়াটসন, বাড়ি গিয়ে কেসটা নিয়ে কথা হবে।'

বেকার স্ট্রিটে ফিরে ইজিচেয়ারে বসে বলল, 'ওয়াটসন, আমার অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। ভাড়াটে বদল হয়েছে বাড়িটায়। কিন্তু বদলি ভাড়াটে যে একজন মহিলা— এবং নিতান্ত সাধারণ মহিলা নয়— সেটা আগে আঁচ করতে পারিনি।'

'মহিলাটি কিন্তু আমাদের দেখেছে।'

'আমাদের দেখেছে কি না বলতে পারব না— তবে আঁতকে ওঠার মতো কিছু একটা দেখেছে। ব্যাপারটা এবার বুঝেছ? সাংঘাতিক কোনো বিপদের ভয়ে লন্ডনে পালিয়ে এসেছে একটি দম্পতি। স্বামীটির অন্য কাজ আছে— দিনরাত বউকে আগলানো সম্ভব নয়। তাই তাকে নিজের জন্যে ঘরভাড়া করে লুকিয়ে রেখে দিলে— এমনিভাবে রাখল যে বাড়িউলি পর্যন্ত জানল না কে রয়েছে বাড়িতে। দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয় পাছে শত্রুরা পাছু নিয়ে বউকে ধরে ফেলে— সোজাসুজি চিঠি লেখাও সম্ভব নয়— তাই খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলম মারফত খবর পাঠানো শুরু করল হুঁশিয়ার স্বামীটি। স্ত্রীটি মেয়েলি হাতের লেখা গোপন করার জন্যে কাগজের টুকরোয় বড়ো হাতের অক্ষরে চাহিদা লিখে রেখে দিতে লাগল বাইরের চেয়ারে।'

'কিন্তু এত লুকোচুরি কীসের জন্যে?'

'ওয়াটসন, তুমি চিরকালই বড়ো কাঠখোট্টাভাবে প্র্যাকটিক্যাল— আসল পয়েন্টে হাত দিয়েছ— ঠিক কথা, এত লুকোচুরি কীসের জন্যে? প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিশ্চয়। সেইজন্যেই ভুল করে মিস্টার ওয়ারেনের ওপর হামলা করা হয়েছে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে মিস্টার ওয়ারেনকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাও কিন্তু এখনও জানে না ভাড়াটে বদল হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। ভারি জটিল, ভারি অদ্ভুত কেস।

'কিন্তু এ-কেসে আর এগিয়ে তোমার কী লাভ?'

'ভায়া, ডাক্তারি শেখবার পর নতুন কেস পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে কি দক্ষিণার আশায়?'

'মোটেই না। শেখবার জন্যে।'

'আমিও এ-কেসে লেগে থাকতে চাই শেখবার জন্যে। যশ চাই না, অর্থ চাই না— শুধু চাই শিখতে। এ-কেসে শেখবার মতো অনেক কিছু আছে।'

সন্ধে হল। দুই বন্ধু হাজির হলাম মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে। অন্ধকার বসবার ঘরে বসে দেখলাম অনেক উঁচুতে ওপরতলার ফ্ল্যাটবাড়ির জানলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো।

শার্সিতে শীর্ণ ব্যগ্র মুখ চেপে ফিসফিস করে হোমস বললে, 'ঘরে একজন পুরুষ রয়েছে। ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ওই তো আবার দেখা যাচ্ছে! হাতে একটা মোমবাতি রয়েছে। জানলা দিয়ে দেখছে এ-বাড়ির ওপরতলায় ভদ্রমহিলা ওদিকে তাকিয়ে আছে কি না। এবার আলোর নিশানা

শুরু করেছে। ওয়াটসন, বার্তাটা তুমিও লেখো— দুজনে মিলিয়ে দেখব পরে। একটা ফ্ল্যাশ— মানে, A। আবার ফ্ল্যাশ হচ্ছে, কঙ্বার গুনলে? কুড়িবার। তার মানে T, AT– মানে বুঝলাম না। আরেকটা T; দ্বিতীয় শব্দ শুরু হচ্ছে নিশ্চয়। লেখা— TENTA। ব্যস আর ফ্ল্যাশ নেই। কী বুঝলে ওয়াটসন? ATTENTA শব্দের কোনো মানে হয়? আবার শুরু হয়েছে ফ্ল্যাশ। আরে, আরে একই শব্দ আবার ফ্ল্যাশ করছে— ATTENTA। ওয়াটসন, এ তো দেখছি ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ওই দেখো আবার সেই একই শব্দ— ATTENTA! পরপর তিনবার ATTENTA! আর ক-বার ATTENTA বলবে বুঝছি না। সরে গেল জানলা থেকে ওয়াটসন, কী বুঝলে বলো তো?'

'সাংকেতিক খবর।'

হঠাৎ মানেটা মাথায় এসে গেল হোমসের! হেসে উঠলে খুক খুক করে। বলল, 'খুব একটা জটিল সংকেত নয়। ইটালিয়ান শব্দ। A লেখা হয়েছে স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে বলে। "সাবধান!" "সাবধান!" "সাবধান!" বুঝলে?'

'ঠিক ধরেছ মনে হচ্ছে।'

'খুব সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে বলেই পর পর তিনবার হুঁশিয়ার করা হল ভদ্রমহিলাকে। আরে গেল যা— লোকটা যে আবার জানলায় এসেছে!'

ঝুঁকে পড়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ছায়ামূর্তি— শিখা নেড়ে নেড়ে দ্রুত নিশানা করছে এ-বাড়ির মেয়েটিকে। খুব দ্রুত মোমবাতি নাড়ছে— লিখতেও সময় পাচ্ছি না।

'পেরিকোলো— পেরিকোলো— সেটা আবার কী ওয়াটসন? বিপদ, বিপদ, তাই না? আরে হ্যাঁ, এ তো বিপদের সংকেত। আবার শুরু হয়েছে। পেরি— আরে গেল যা। নিভে গেল কেন?'

আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল আলোকিত জানলা— শব্দহীন আর্ত চিৎকারের যেন কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হল মধ্যপথে। জানলার সামনে থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল হোমস।

'ওয়াটসন, আর তো চুপচাপ এ-জিনিস দেখা যায় না। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে ওই ঘরে— নইলে আলোর সংকেত মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল কেন? চলো যাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। তার আগে নিজের চোখে দেখব কী ঘটেছে ও-ঘরে।'

বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির ওপরতলার জানলায় একটি মেয়ের মুখ কাঠ হয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে আচমকা বন্ধ-হয়ে-যাওয়া আলোকবার্তা আবার দেখবার আশায় তাকিয়ে আছে সামনের বাড়ির দিকে। হোয়ে স্ট্রিটের ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার সামনে আসতেই রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রেটকোট পরা মনুষ্যমূর্তিটি সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে হোমস যে!'

'গ্রেগসন নাকি! তুমি কী মনে করে?'

'আপনি কী মনে করে?'

'একই ধান্দায়। আমি দেখেছিলাম জানলায় আলোর সংকেত।'

'সংকেত?'

'ওই জানলাটায় আলো নেড়ে খবর পাঠানো হচ্ছিল এতক্ষণ— হঠাৎ গেল থেমে। তাই দেখতে যাচ্ছিলাম ব্যাপারটা। কিন্তু তুমি যখন স্বয়ং হাজির—'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে গ্রেগসন। 'আপনি পাশে থাকলে মনে দারুণ বল পাই। কাজেই বাছাধন পালিয়ে যাবে কোথায়!'

'কার কথা বলছ?'

'তাহলেই দেখুন, আপনাকেও আমি টেক্কা মারতে পারি।' বলেই ফুটপাতের পাথরে সজোরে ছুরি ঠুকল গ্রেগসন। অমনি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি থেকে চাবুক হাতে নেমে এল গাড়োয়ান। 'আসুন মি. শার্লক হোমস, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পিনকারটন্স আমেরিকান এজেন্সির[৫] মিস্টার লেভারটন।'

হোমস বলে উঠল, 'লং আইল্যান্ড গুহা রহস্যের[৬] সেই নায়ক? কী সৌভাগ্য আমার।'

প্রশংসা শুনে মুখ লাল হয়ে গেল তরুণ আমেরিকানের।

বললে, 'মি. হোমস, গোরজিয়ানোকে যদি ধরতে পারি—'

'রক্তবৃত্তের গোরজিয়ানো? বলেন কী!'

'ইউরোপেও গোরজিয়ানো এত বিখ্যাত জানা ছিল না। আমেরিকায় তো একডাকে সবাই চেনে। পঞ্চাশটা খুনের নায়ক, অথচ টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারছি না। নিউইয়র্ক থেকে পিছু নিয়ে লন্ডনে এসে সাতদিন ধরে ওত পেতে আছি কোনো একটা অছিলায় বাছাধনকে খাঁচায় পোরার জন্যে। পেছনে পেছনে এসেছি আমি আর গ্রেগসন। শয়তানটা উঠেছে ওই বাড়িটায়— বেরোনোর পথ একটাই। এবার আর চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তিনটে লোক এখুনি বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ওদের মধ্যে গোরজিয়ানো ছিল না।

গ্রেগসন বললে, 'মি. হোমস এ-ব্যাপারে আরও খবর রাখেন মনে হচ্ছে। এইমাত্র আলোর সংকেতের কী সব কথা বলছিলেন।'

সংক্ষেপে হোমস বলল ও যা জানত।

সক্ষোভে আমেরিকান ডিটেকটিভ বললে, 'তার মানে ও জেনে ফেলেছে আমরা পেছন নিয়েছি।'

'এ-কথা কেন বললেন?'

'আলো নেড়ে দলের লোকেদের খবর পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ দেখেছে আমরা ওত পেতে রয়েছি নীচে— তাই খবর আর শেষ করেনি। এখন কী করি বলুন তো?'

'হানা দোব ওপরে— একসঙ্গে', বললে হোমস।

'কিন্তু অ্যারেস্ট করার মতো শমন তো আনিনি।'

গ্রেগসন বললে, 'সে-দায়িত্ব আমার। চলুন।'

গ্রেগসনের মাথায় বুদ্ধি কম থাকতে পারে, কিন্তু মনে সাহসের অভাব নেই। চরম বিপদের সামনে নিজেই এগিয়ে গেল সবার আগে। আমেরিকান ডিটেকটিভকে কিছুতেই উঠতে দিল না নিজের আগে। লন্ডনে বিপদের মোকাবিলা করুক লন্ডন ডিটেকটিভ— আমেরিকানকে সে-সুযোগ দিতে সে রাজি নয়।

তিনতলায় বাঁ-হাতের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্রেগসন। অখণ্ড নৈঃশব্দ্য এবং নীরন্ধ্র তমিস্রা বিরাজ করছে ভেতরে। আমি দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম গ্রেগসনের লণ্ঠন। পলতের শিখা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যেতেই বিস্ময়ে শ্বাস টানলাম তিন জনেই। কার্পেটহীন মেঝের ওপর টাটকা রক্তের ধারা। রক্তমাখা পদচিহ্ন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে গিয়ে ঢুকেছে ভেতরের একটা ঘরে। দরজাটা বন্ধ ছিল। ঠেলে খুলে দিয়ে লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুলে ধরল যাতে আমরা সবাই দেখতে পাই ঘরের দৃশ্য। এবং দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য। দেখলাম শূন্য ঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা কাঠের মেঝেতে মুখ গুঁজড়ে থই থই রক্তের মধ্যে বীভৎসভাবে লুণ্ঠিত একজন বিরাটকায় দাড়ি গোঁফ কামানো পুরুষ। দু-হাঁটু মুড়ে দু-হাত সামনে ছড়িয়ে নিঃসীম যন্ত্রণায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে যে-বস্তুটির মরণ মারে, সেটি তখনও চওড়া বাদামি গলায় আমূল ঢুকে থেকে বার করে রেখেছে কেবল সাদা বাঁটটুকু— অত্যন্ত ধারালো হিলহিলে পাতলা একটা ছোরা। হাতের কাছে পড়ে একটা কালো দস্তানা আর একটা ভীষণ দর্শন মোষের শিংয়ের হাতলওলা দু-দিক ধারালো ছোরা।

আমেরিকান ডিটেকটিভ লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্য দেখে, 'আরে সর্বনাশ! এ যে স্বয়ং ব্ল্যাক গোরজিয়ানো! আমাদের আগেই কেউ কারবার শেষ করে গেছে দেখছি।'

গ্রেগসন বললে, 'মি. হোমস, এই দেখুন জানলার সামনে মোমবাতি। আরে! আরে! ওটা কী করছেন?'

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ নাড়ল হোমস— তারপর উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

বলল, 'ওতেই কাজ হবে। আচ্ছা, নীচে দাঁড়িয়ে তিনটে লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন বললেন না? খুঁটিয়ে দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম।'

'একজনের গালে কালো দাড়ি ছিল কি? মাঝারি সাইজ, বয়স বছর তিরিশ, কালচে মুখ?'

'ছিল। সবশেষে সে-ই তো আমার পাশ দিয়ে গেল।'

'খুনটা সে-ই করেছে। দেখতে কীরকম শুনলেন, পায়ের ছাপটা মেঝেতেই দেখে নিন। ওই যথেষ্ট, এবার লেগে পড়ুন।'

'ওতে খুব একটা সুবিধে হবে না মি. হোমস। লন্ডনের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ওই চেহারার মানুষ খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে পাওয়ার শামিল বলতে পারেন।'

'মোটেই না। সেইজন্যেই তো এই ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনলাম।'

কথাটা শুনে সচমকে সবাই তাকালাম দরজার পানে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী— ব্লুমসবেরির সেই রহস্যময়ী ভাড়াটে। দুই চোখে অসীম ভয়ার্তি নিয়ে চেয়ে আছে মেঝের রক্তহ্রদে লুণ্ঠিত মৃতদেহটির পানে। সম্মোহিতের মতো বিবর্ণ মুখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে সেইদিকে।

পরক্ষণেই বিলাপধ্বনির মতো বিড়বিড় করে বললে— 'ডিও মিও... ডিও মিও... ওকেও শেষে খুন করলে!' তারপরেই অবশ্য সব নিশ্বাস টেনে দু-হাত মাথার ওপর তুলে তাথই তাথই নাচ আরম্ভ করে দিলে ঘরময়। সেইসঙ্গে সে কী উল্লাস-চিৎকার! হাততালি দিয়ে আর অনর্গল ইটালিয়ান শব্দের তুবড়ি ছুটিয়ে ঘরময় নেচে নেচে বেড়াতে লাগল রহস্যময়ী রূপসি। আমি

হতবাক, স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত হলাম এ-রকম একটা বিকট দৃশ্যের সামনে এই ধরনের উন্মত্ত নৃত্য দেখে। আচমকা নাচ থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের পানে চাইল রূপসি।

'আপনারা কে? দেখে তো মনে হচ্ছে পুলিশ! গুইসেপ্পি গোরজিয়ানোকে তাহলে আপনারাই খতম করেছেন, তাই না?

'ম্যাডাম, আমরা পুলিশ ঠিকই।'

'কিন্তু জেনারো কোথায়?' ছায়া ঢাকা কোণগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল সুন্দরী। 'সে যে আমার স্বামী। জেনারো লুক্কা আর আমি এমিলি লুক্কা নিউইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছি একসঙ্গে এই কালকুত্তার ভয়ে। কিন্তু সে গেল কোথায়? এই তো একটু আগে জানলা থেকে ডাকল আমাকে— ডাক শুনেই তো ছুটতে ছুটতে আসছি।'

'ম্যাডাম, আমি ডেকেছি আপনাকে', বললে হোমস।

'আপনি ডেকেছেন? আপনি কী করে ডাকবেন?'

'আপনার সংকেত আমি ধরে ফেলেছি বলে। এখানে আপনার থাকাটা দরকার ছিল বলেই শুধু Vieni শব্দটা ফ্ল্যাশ করেছিলাম— দেখেই দৌড়ে এসেছেন।'

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল, ফ্যাকাশে মুখ,
দুই চোখে অসীম ভয়ার্তি।'
এইচ. এম. ব্রক, আর. আই., স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯১১

ভয় মেশানো চোখে হোমসের পানে তাকায় রূপসি ইটালিয়ান।

'কিন্তু... কিন্তু...' হঠাৎ থমকে যায় সুন্দরী। গর্ব আর উল্লাস ফেটে পড়ে চোখের তারায় তারায়। 'বুঝেছি বুঝেছি... ঝড়ঝঞ্ঝায় আপদে বিপদে শোকে দুঃখে যে-মানুষটা এতদিন আমাকে আগলে রেখে দিয়েছে— এ তারই কাণ্ড! নিজের হাতে শয়তানদের রাজা পিশাচ শিরোমণি গুইসেপ্পি গোরজিয়ানোকে খুন করেছে তার নিজের হাতে! জেনারো... জেনারো... কত ভাগ্য করলে তোমার মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়া যায়!'

ভাবাবেশের ধার দিয়ে গেল না কাঠখোট্টা গ্রেগসন। ভদ্রমহিলা যেন নেহাতই একটা নটিং হিল জাঁহাবাজ— ঠিক সেইভাবে বাহুতে হাত রেখে বললে নীরসকণ্ঠে, 'আপনি কে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে আপনার এখন থানায় যাওয়া দরকার।'

বাধা দিল হোমস। বলল, 'একটু দাঁড়াও, গ্রেগসন। ম্যাডাম, খুন করার অপরাধে আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন কুউদ্দেশ্যে খুনটা উনি করেননি, তাহলে যা জানেন তা বলুন— তাতে আপনার স্বামীর ভালো হবে।'

'গোরজিয়ানোই যখন খতম হয়ে গেল, তখন দুনিয়ার কেউ আমার স্বামীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। ওকে খুন করার জন্যে পৃথিবীর কোনো আদালতেই তার সাজা হবে না।'

হোমস বললে, 'তাহলে এ-ঘরের দরজা বন্ধ করে লাশ যেমন তেমন ফেলে রেখে চলুন এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ওঁর ঘরে গিয়ে গল্পটা শোনা যাক।'

আধঘণ্টা পরে সিগনোরা লুক্কার ঘরে বসে অত্যাশ্চর্য যে কাহিনি শুনলাম, তা এখানে হুবহু লিখছি তার জবানিতে— ভাষাটা কেবল মেজেঘষে দিতে হল— কেননা ভদ্রমহিলার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি অনেকেই বুঝবেন না। ব্যাকরণে ভুল ছিল বিস্তর।

'নেপলস-এর কাছে পোসিলিপ্পোতে আমার জন্ম। আমার বাবা অগাস্টাস বেরিলি ওখানকার উকিল। জেনারো তাঁর চাকরি করত। ওর রূপ ছিল, প্রাণশক্তি ছিল— কিন্তু টাকা ছিল না, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। আমি ভালোবাসলাম ওর যা ছিল তার জন্যে— বাবা বিয়েতে রাজি হলেন না ওর যা নেই তার জন্যে। দুজনে তখন পালিয়ে গেলাম, গয়নাগাটি বেচে সেই টাকায় চার বছর আগে আমেরিকায় গিয়ে সুখের সংসার পাতলাম। বিয়ে করেছিলাম আগেই— প্যারিতে।

'প্রথম থেকেই কপাল খুলে গেল আমাদের। ক্যাসটালোট্টি অ্যান্ড জামবিয়া কোম্পানির ক্ষমতাশালী অংশীদার টিটো ক্যাসটালোট্টিকে একবার কিছু গুন্ডাবদমাশের খপ্পর থেকে বাঁচায় আমার স্বামী। ক্যাসটালোট্টি নিজেও ইটালিয়ান, বিয়ে-থা করেননি, কোম্পানির একমাত্র কার্যক্ষম অংশীদার বলতে তিনিই— জামবিয়া বিছানা ছেড়ে নড়তে পারতেন না। উপকার ভুলতে না-পেরে আমার স্বামীকে ক্যাসটালোট্টি নিজের ফার্মে বড়ো চাকরি দিলেন। ব্রুকলিনে নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেন, নিজের ছেলের মতো ওকে দেখতে লাগলেন এবং বেশ বুঝলাম ওঁর সব সম্পত্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের লিখে দেবেন। এরপরেই কপাল পুড়ল আমাদের।

একদিন কাজ থেকে জেনারো বাড়ি ফিরল দানবের মতো বিরাট একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে। পোসিলি পেপার মানুষ সে— নাম গোরজিয়ানো। সব কিছুই তার দানবিক। কথা বললে মনে হয় বাজ ডাকছে, হাত পা নাড়লে মনে হয় গদা ঘোরাচ্ছে। এ-রকম কিম্ভূতকিমাকার কদাকার, বুক কাঁপানো হাড় বজ্জাত মানুষ আমি আর দেখিনি। লাশটা আপনারাও দেখেছেন— বাড়িয়ে যে বলছি না নিশ্চয় বুঝছেন। কিন্তু রাক্ষসটার কথার মধ্যে যেন জাদু ছিল, ঠায় বসে শুনতে হত— ওঠা যেত না। এক লহমার মধ্যেই মনে হত যেন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে— প্রাণটা নির্ভর করছে তার খেয়ালখুশির ওপর।

'জেনারো কাঠ হয়ে বসে তার বকবকানি শুনত। লোকটা ঘনঘন আসত। মুখ দেখে বুঝতাম আমার মতোই জেনারো তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তবুও চুপ করে বসে কখনো রাজনীতি,

কখনো সমাজবাদ, কখনে ছাইপাঁশ বক্তৃতা শুনত। প্রথম প্রথম ভাবতাম বুঝি জেনারো ওকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তারপর ওর মুখের চেহারা দেখে আসল কারণটা ধরতে পারলাম। জেনারো ওকে সাংঘাতিক ভয় করে। একটা চাপা, গোপন, মারাত্মক আতঙ্কে ভেতরে ভেতরে তাই সিটিয়ে আছে। সেই রাত্রেই ওকে দু-হাতে ধরে বললাম, সত্যিই যদি সে আমাকে ভালোবাসে, তাহলে বলতে হবে গোরজিয়ানোকে তার এত ভয় কেন।

'জেনারো তখন সব খুলে বলল। শুনে ভয়ে হিম হয়ে গেলাম আমি। একটা সময় এসেছিল জেনারোর জীবনে, যখন সংসারে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না, নিজের প্রচণ্ডতায় দাপাদাপি করে বেরিয়েছে সমাজে— তখন, সেই আধ পাগল অবস্থায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নিউপলিটান সোসাইটিতে নাম লেখায়— এই হল গিয়ে কুখ্যাত সেই রেড সার্কল— রক্তবৃত্ত সমিতি। এ-সমিতিতে শপথ নিয়ে যে ঢোকে, জীবন নিয়ে সে আর বেরোতে পারে না। আমেরিকায় পালিয়ে এসে জেনারো ভেবেছিল বুঝি বেঁচে গেল। কিন্তু কবজি পর্যন্ত মানুষের রক্তে লাল করেছে যে সেই গোরজিয়ানোও ইটালিয়ান পুলিশের ভয়ে আমেরিকায় পালিয়ে এসে সমিতির একটা শাখার পত্তন করলে সেখানে। তারপর একদিন রাস্তায় জেনারো দেখল সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে— এল আমাদের বাড়িতে। এখানেও একটা গুপ্তচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে— শমন ধরিয়েছে জেনারোকে— বিশেষ দিনে প্রতিষ্ঠিত হবে রেড সার্কলের নতুন শাখার। মানে, নতুন করে আরম্ভ হবে রক্তারক্তি কাণ্ড।

'কিন্তু এর চাইতেও বড়ো বিপদের তখনও বাকি। লক্ষ করেছিলাম সন্ধের দিকে বাড়ি এসে জেনারোর সঙ্গে ফালতু কথা বলে গেলেও গোরজিয়ানোর রাক্ষুসে চোখের দৃষ্টি থাকত আমার দিকে। একদিন যা হবার তা হয়ে গেল, জেনারো বাড়ি ফেরার আগেই গোরজিয়ানো বাড়ি এল। আমাকে কোণঠাসা করে বললে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। ঠিক সেই সময়ে জেনারো ঢুকল ঘরে, প্রচণ্ড রাগে পাগল হয়ে গিয়ে মারতে মারতে গোরজিয়ানোকে বার করে দিলে বাড়ি থেকে। সেই থেকে শয়তান আর বাড়ি ঢোকেনি।

'ক-দিন পরেই মিটিং হল রেড সার্কলের। মুখ অন্ধকার করে বাড়ি ফিরল জেনারো। সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের পরম হিতৈষী ক্যাসটালোট্টিকে বাড়িসুদ্ধ ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে জেনারোর ওপর। পুরোটাই একটা ঘোর ষড়যন্ত্র— চালাকিটা গোরজিয়ানোর। রেড সার্কলের নিয়ম হল, সমিতির তহবিলে টাকা তোলার জন্যে ধনী ইটালিয়ানদের দোহন করা। প্রথমেই ক্যাসটালোট্টিকে ধরা হয়। তিনি এক পয়সা দিতে রাজি হননি— উলটে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। সমিতি তাই ঠিক করেছে এমন শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হবে যে অন্য ইটালিয়ানরা সুড় সুড় করে টাকা বের করে দেবে। লটারি হল কোন মূর্তিমানের ওপর ভারটা পড়বে ঠিক করার জন্যে। কী কায়দায় জানা নেই, থলির মধ্যে থেকে গোরজিয়ানো টেনে বার করল জেনারোর নাম লেখা রক্তবৃত্তের চাকতি— মুখে তার শয়তান হাসি। দেখেই বুঝল জেনারো— কী চায় গোরজিয়ানো। এটা তার পুরানো কায়দা। কাউকে দল থেকে এবং পৃথিবী থেকে জন্মের মতো সরিয়ে দিতে হলে এই কৌশল করে। নিজের প্রিয়জনকে মারবার ভার দেয়— না-পারলে দলকে লেলিয়ে দেয় তার পেছনে।

'সমস্ত রাত আতঙ্কে কাঠ হয়ে হাতে হাত দিয়ে বসে রইলাম স্বামী-স্ত্রী। পরের দিন সন্ধে নাগাদ ডিনামাইট দিয়ে ক্যাসটালোট্টিকে বাড়িসমেত উড়িয়ে দেওয়ার সময় ধার্য হয়েছে। কিন্তু দুপুরেই লন্ডন রওনা হলাম দুজনে। যাওয়ার আগেই ক্যাসটালোট্টিকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে এলাম— পুলিশকেও খবর দেওয়া হল যাতে ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে আঁচ না-লাগে।

'তারপর কী হয়েছে আপনারা জানেন। প্রতিহিংসা পাগল গোরজিয়ানোর তাড়া খেয়ে এখানেও লুকিয়ে থেকেছি। কিন্তু জেনারো ইটালি আর আমেরিকায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বলে অন্যত্র থেকেছে— কোথায় তা আমিও জানি না। গোরজিয়ানোর শয়তানি আর ক্ষমতার শেষ নেই। কোনদিক দিয়ে আঘাত হানবে বোঝা সম্ভব নয় বলেই এইভাবে এখানে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল আমার স্বামী। খবর পাঠাত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। কিন্তু একদিন দেখলাম রাস্তায় দুজন ইটালিয়ান এ-বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম পিশাচ গোরজিয়ানো আমার ঠিকানা জেনে ফেলেছে। তারপরেই জেনারো খবর দিলে সামনের বাড়ির ওই জানলাটা থেকে সংকেত করবে। সংকেত এল ঠিকই— কিন্তু বিপদের। হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, গোরজিয়ানো যে ওর নাগাল ধরে ফেলেছে, এই কথাটাই বলতে গিয়েছিল জেনারো। এখন দেখছি ও তৈরি হয়েই ছিল শত্রু নিধনের জন্যে। কাজ শেষ করে চলে গেছে। এখন আপনারাই বলুন কাঠগড়ায় ওঠবার মতো অপরাধ জেনারো করেছে কি না।'

গ্রেগসনকে বলল আমেরিকান ডিটেকটিভ, 'নিউইয়র্কে কিন্তু মাথায় তুলে নাচা হত জেনারোকে নিয়ে। ব্রিটিশ আইন তাঁকে কী চোখে দেখবে আমার জানা নেই।'

গ্রেগসন বলল, 'উনি যা বললেন, তা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে কারোরই কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ওঁকে থানায় আসতে হবে। একটা ব্যাপার কিন্তু মাথায় ঢুকছে না। এ-ব্যাপারে আপনি কী করে জড়িয়ে পড়লেন মি. হোমস?'

'শেখবার জন্যে, আমি আবার পুরোনো পাঠশালার ছাত্র কিনা— শিক্ষার শেষ দেখতে পাই না। ওহে ওয়াটসন, তোমারও একটা শিক্ষা হল। কিম্ভূতকিমাকার শব্দটার মানে যে ট্র্যাজেডিও হতে পারে— তা জানলে। এখনও আটটা বাজেনি। কভেন্ট গার্ডেনে গিয়ে বাজনা শোনা যাক। চটপট পা চালাও!'

টীকা

১. **রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কল' প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ১৯১১-র মার্চ এবং এপ্রিল সংখ্যায়। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিলি লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় রাখা পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় কন্যান ডয়াল প্রথমে এই গল্পটির নাম দিয়েছিলেন 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লুমসবেরি লজার'।

২. **নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন :** এই কাহিনির বিষয়ে ওয়াটসন কখনো পাঠকদের জানাননি।

৩. **DAILY GAZETTE :** এই নামটি কাল্পনিক।

৪. **এই খবরই খুঁজছি :** লোকটি বিজ্ঞাপন না-দিয়ে ডাকে চিঠি পাঠাল না কেন মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির ঠিকানায়? প্রশ্ন তুলেছেন মার্টিন ডেকিনসহ কয়েকজন গবেষক।

৫. **পিনকারটন্স আমেরিকান এজেন্সি :** অ্যালান পিনকারটনের প্রতিষ্ঠা করা গোয়েন্দা সংস্থা পিনকারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সির বিষয়ে প্রথম খণ্ডে 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬. **লং আইল্যান্ড গুহা রহস্য :** বেশ কিছু গবেষক জানিয়েছেন লং আইল্যান্ডে কোনো গুহা নেই।

নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যান]

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গাঢ় হলদে কুয়াশায় ছেয়ে গিয়েছিল সারা লন্ডন শহর। সোমবার থেকে বেস্পতিবার পর্যন্ত বেকার স্ট্রিটের ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায়নি। প্রথম দিনটা হোমস ঘরে বসে কাটাল বিরাট একটা খাতায় রকমারি খবর আঠা দিয়ে সেঁটে সূচিপত্র তৈরি করার কাজ নিয়ে; দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনটা কাটল মধ্যযুগীয় সংগীত নিয়ে— এটা ওর সাম্প্রতিক শখ; কিন্তু চতুর্থ দিনেও প্রাতরাশ খেয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর পর যখন দেখা গেল চটচটে ভারী বাদামি কুয়াশাবর্ত তখনও রাস্তা দিয়ে ভেসে চলেছে এবং তেলের মতো ফোঁটা ফোঁটা আকারে শার্সির কাচে জমছে, তখন শক্তি আর উদ্যমে ঠাসা শার্লক হোমসের মেজাজ ঠিক রাখা গেল না। অবদমিত এনার্জি যেন ফেটে পড়ল অসহিষ্ণু কথাবার্তায়, বসবার ঘরে অস্থির পাদচারণায়। নখ কামড়ে ফার্নিচারে টরে টক্কা বাজনা বাজিয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল বন্ধুবর।

আমাকে বলল, 'ওয়াটসন, খবরের কাগজে ইন্টারেস্টিং খবর-টবর আছে?'

আমি তো জানি ইন্টারেস্টিং খবর মানে হোমস বোঝে কেবল অপরাধ সম্পর্কিত খবর। অনেক খবরই আছে খবরের কাগজে; যুদ্ধ লাগল বলে, সরকারের পতন ঘটতে পারে, এক জায়গায় বিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে— কিন্তু এসব খবরের কোনো আগ্রহই নেই বন্ধুবরের। তাই ফের অধীরভাবে গজগজ করতে করতে ঘরময় পা ঠুকেঠুকে বেড়াতে লাগল বেচারা।

স্পোর্টসম্যান যদি খেলার সুযোগ না-পায়, তার যা অবস্থা হয়— হোমসের অবস্থা এখন তাই। বকবক করতে লাগল আপন মনে, 'লন্ডন শহরটা দেখছি একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কুয়াশায় ঢাকা এমন শহরেই তো দাপাদাপি করে বেড়ানো উচিত চোরডাকাত বদমাশদের। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে কাজ সেরেই লম্বা দেবে— কেউ টের পাবে না।'

'ছিঁচকে চুরি এন্তার হচ্ছে অবশ্য।'

অবজ্ঞায় নাসিকাধ্বনি করে হোমস বললে, 'আরে ভায়া সমাজের কপাল ভালো আমি নিজে একটা ক্রিমিনাল নই। বিরাট এই স্টেজ সাজানো রয়েছে কি ছিঁচকে চুরির জন্যে? আরও বিরাট অপরাধের উপযুক্ত ক্ষেত্র কি এটা নয়? অপরাধীদের সুবর্ণ সুযোগ তো এখনই।'

'তা যা বলেছ।'

'ওয়াটসন, একঘেয়েমি কাটতে চলেছে মনে হচ্ছে।'

টেলিগ্রাম নিয়ে ঘরে ঢুকল ঝি। খাম ছিঁড়ে অট্টহাসি হাসল হোমস।

'আরে সর্বনাশ! শেষকালে মাইক্রফট দাদা আসছে ছোটো ভাইয়ের আস্তানায়।'

'এমনভাবে বলছ যেন তাঁর আসাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার।'

'বন্ধু, ট্রাম[২] যদি বড়োরাস্তায় বাঁধা লাইন ছেড়ে হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, অবাক হবে তো? আমার এই দাদাটিরও বাঁধা লাইনে হল পলমল আস্তানা, ডায়োজিনিস ক্লাব আর হোয়াইট হল। এই লাইনেই চক্রবৎ সে ঘোরে— বেলাইন কখনো হয় না। জীবনে একবারই সে এসেছিল[৩] এখানে। আজ হঠাৎ লাইন ছেড়ে বেরিয়ে গেল কেন ভাবতে পারছি না।'

'টেলিগ্রামে তা লেখেনি?'

টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে দিল হোমস। আমি পড়লাম :

'ক্যাডোগেনের ব্যাপারে এখুনি দেখা করব। মাইক্রফট।'

'ক্যাডোগেন ওয়েস্ট নামটা কিন্তু শুনেছি।'

'কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ছে না। অবাক হচ্ছি দাদার বেলাইন হওয়া দেখে। কক্ষপথ থেকে গ্রহ ছিটকে যাওয়া আর মাইক্রফট দাদার অন্য পথ পরিক্রমা করা একই ব্যাপার! ভালো কথা, মাইক্রফট কি চিজ তা জান তো?'

'গ্রিক দোভাষীর মামলা হাতে এলে সামান্য কিছু শুনেছি সরকারি চাকুরে, এই পর্যন্ত জানি!'

খুকখুক করে হেসে উঠল, 'তখন তোমাকে ততটা চিনিনি বলে খুলে বলিনি। মাইক্রফট ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করে ঠিকই কিন্তু মাঝে মাঝে ও নিজেই ব্রিটিশ সরকার হয়ে যায়।'

'কী আবোল-তাবোল বকছ ভায়া!'

'জানতাম অবাক হয়ে যাবে। মাইক্রফট বছরে মাইনে পায় মাত্র সাড়ে চারশো পাউন্ড। চিরকালই অন্যের অধীনে খেটে এসেছে, জীবনে কোনোরকম উচ্চাশা নেই, সম্মান বা উপাধি কখনোই পাবে না। তা সত্ত্বেও তাকে ছাড়া মাঝে মাঝে এদেশের চলে না— চলবে না।'

'কীভাবে শুনি?'

'ও-রকম একটা সাজানো ঝকঝকে তকতকে ব্রেন আর দুটি নেই বলে। ফলে নিজেই নিজেকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যে পাল্লা দেওয়ার মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নেই। মগজের মধ্যে অজস্র ঘটনা ঠেসে রাখবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা জীবিত কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি। বিরাট যে ক্ষমতা আমি অপরাধী অন্বেষণে লাগিয়েছি, ও তা সরকারি কাজে লাগিয়েছে। বিপুল এই ক্ষমতার অধিকারী বলেই সব ডিপার্টমেন্ট থেকেই যেকোনো ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা ছেড়ে দেওয়া হয় ওর ওপর। ও হল সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং হাউস— ওর মগজ থেকে যে সিদ্ধান্ত মেজেঘষে বেরিয়ে যাবে, তাতে সব দিক রক্ষে হবেই। অন্যেরা শুধুই বিশেষজ্ঞ, ও কিন্তু সর্বজ্ঞ। ধরো কোনো মন্ত্রীমশায় কোনো একটা ব্যাপারে নৌবিভাগ, ভারতবর্ষ, কানাডা আর ধাতু সম্পর্কে পরামর্শ চান। এর জন্যে আলাদা দপ্তর আছে। সব দপ্তর থেকে আলাদাভাবে পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু মাইক্রফটের ব্রেনে সব দপ্তরই ঠাসা। ও একাই সমস্যাটার সবরকম সম্ভাবনা ভেবে নিতে পারে— মাথার মধ্যে সব খবর ফোকাস করে নিয়ে একই সমস্যার কতরকম প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে, চট করে বলে দিতে পারে। আগে এইজন্যই শর্টকাট পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে লাগানো হত মাইক্রফটকে— এখন তাকে

ছাড়া একদণ্ড চলে না। ওর ওই বিরাট ব্রেনে পায়রার খুপরির মতো ছোটো ছোটো খুপরিতে রাজ্যের খবর থরে থরে সাজানো থাকে বলেই চক্ষের নিমেষে ওর মতামত পেয়ে ব্রিটিশ সরকার বর্তে যায়। একাধিকবার জাতির নীতি নির্ধারিত হয়েছে ওর পরামর্শের ভিত্তিতে। এই নিয়েই আছে ও, এইসবই ওর ধ্যানধারণা, মানসিক ব্যায়ামের উপাদান। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে আমি দ্বারস্থ হলে ছিটেফোঁটা বুদ্ধি বর্ষণ করেছে আমাকে— কিন্তু আজকে যে দেখছি উলটো ব্যাপার। বিরাট বৃহস্পতি খুদে পৃথিবীর কাছে আসছে। কে এই ক্যাডোগেন ওয়েস্ট? তাকে নিয়ে মাইক্রফটের হঠাৎ মাথাব্যথা কেন?

সোফার ওপর থেকে কাগজের তাড়া হাঁটকাতে হাঁটকাতে উত্তেজিতভাবে বললাম— 'পেয়েছি, পেয়েছি! গত মঙ্গলবার সকালে পাতালরেলে একটা ছোকরার মৃতদেহ পাওয়া গেছে— নাম তার ক্যাডোগেন ওয়েস্ট।'

সিধে হয়ে বসল হোমস, পাইপটা ঠোঁট পর্যন্ত আর পৌঁছোল না।

'ওয়াটসন, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুতর। সামান্য একটা মৃত্যু নিয়ে বেলাইনে চলার পাত্র নয় আমার এই দাদাটি। যদ্দুর মনে পড়ছে ছোকরা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে। পকেট মারা যায়নি, কেউ ঠেলেও ফেলে দেয়নি— মারপিট বা চুরিডাকাতির নামগন্ধ নেই। এ-রকম একটা ভিজে ব্যাপারে মাইক্রফট মাথা ঘামাচ্ছে কেন? আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

'তদন্তের ফলে বেশ কিছু আশ্চর্য খবর জানা গেছে। কেসটা কিন্তু অদ্ভুত।'

'নইলে আমার ভাই মাথা ঘামায়।' আর্মচেয়ারে আড় হয়ে শুয়ে হোমস বললে, 'বলো ভায়া, আমি শুনছি।'

'ছোকরার বয়স সাতাশ, নাম আর্থার ক্যাডোগেন ওয়েস্ট, আইবুড়ো, উলউইচ আর্সেনালের[৪] কেরানি।'

'তার মানে সরকারি চাকুরে। মাইক্রফটের লাইনে এসে গেল দেখছি!'

'গত সোমবার রাত্রে হঠাৎ বেরিয়ে যায় উলউইচ থেকে। শেষ দেখেছে তার প্রণয়িনী মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবুরি সন্ধে সাড়ে সাতটার সময়ে— তার কাছ থেকেও হঠাৎ বিদায় নেয় ছোকরা। কারণটা মেয়েটাও বুঝতে পারেনি— কেননা কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়নি দুজনের মধ্যে। মৃতদেহটা পায় ম্যাসোন নামে একজন রেলকর্মচারী। লাইনে প্লেট বসায় সে। দেহটা পাওয়া যায় লন্ডন পাতালরেলের আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক বাইরে।'

'কখন?'

'মঙ্গলবার ভোর ছ-টায়। স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইন যেখানে টানেলে ঢুকছে, সেইখানে পুবদিকে যেতে বাঁ-হাতি লাইনের বেশ খানিকটা তফাতে পড়েছিল দেহটা— মাথাটা এমনভাবে থেঁতলে গিয়েছে যে দেখলেই বোঝা যায় ট্রেন থেকে না-পড়লে লাইনের ধারে দেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। বাইরের রাস্তা থেকে ডেডবডি এনে ওখানে ফেলতে গেলে স্টেশনের টিকিট কালেক্টরের চোখে পড়ত।'

'বুঝলাম। জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ট্রেন থেকে হয় নিজে পড়ে গেছে, না হয় ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর?'

'যে-লাইনের ধারে ডেডবডি পাওয়া গেছে, সেই লাইন দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে ট্রেন যায়। মাঝরাতে ছোকরা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে— কিন্তু ট্রেনে উঠেছিল কখন ধরা যাচ্ছে না।'

'টিকিটটা দেখলেই তো ধরা যায়।'

'টিকিট-ফিকিট কিছুই পাওয়া যায়নি পকেটে।'

'টিকিট পাওয়া যায়নি! ওয়াটসন, এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি জানি টিকিট না-দেখিয়ে মেট্রোপলিটান ট্রেনের প্ল্যাটফর্মেই ঢোকা যায় না। টিকিটটা কি তাহলে পকেট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে পাছে টিকিট দেখে বোঝা যায় কোন স্টেশন থেকে উঠেছে বলে? খুবই সম্ভব। নাকি কামরার মধ্যে নিজেই ফেলে দিয়েছে[৫]? সেটাও সম্ভব। পয়েন্টটা কিন্তু রীতিমতো অদ্ভুত। চুরিডাকাতির নামগন্ধ তো নেই, তাই না?'

'সেইরকমই দেখা যাচ্ছে। পকেটে যা পাওয়া গেছে, তার ফর্দটা শোনো। দু-পাউন্ড পনেরো শিলিং ছিল মানিব্যাগে; ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কের একটা চেকবই— উলউইচ ব্রাঞ্চের; এই চেকবই থেকেই লোকটার ঠিকুজিকুষ্ঠি জানা যাবে। উলউইচ থিয়েটারের দুটো ড্রেস-সার্কল[৬] টিকিটও ছিল পকেটে— তারিখ ওই দিনের। ইভনিং শোয়ের টিকিট। আর ছোটো এক প্যাকেট টেকনিক্যাল কাগজপত্র।'

খুশি হল হোমস— 'দেখলে তো ওয়াটসন— পর পর সব মিলে যাচ্ছে! ব্রিটিশ সরকার— উলউইচ অস্ত্রাগার— টেকনিক্যাল কাগজপত্র— মাইক্রফট দাদা। ওই তো এসে গেছে মাইক্রফট।'

ঘরে ঢুকলেন মাইক্রফট হোমস। দিব্য লম্বা-চওড়া চেহারা। বিরাট চেহারার মধ্যে শারীরিক শক্তি যেন একটু বেশিভাবে প্রকট— অথচ ধড়ের বুদ্ধিসমুজ্জ্বল মুণ্ডখানা দেখলে ধড়ের কথা আর মনে থাকে না। ইস্পাত-ধূসর কোটরে বসানো ধারালো চোখ, কাঠের দৃঢ় ঠোঁট এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক ললাট— সব মিলিয়ে চেয়ে থাকার মতো। ধড়টার কথা ভুলে যেতে হয়— বিরাট ওই মস্তকের মধ্যে শক্তিশালী পর্দাটার কথাই কেবল মনে জেগে থাকে।

পেছনে পেছনে এল লেসট্রেড— স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। ওভারকোট খুলে আর্মচেয়ারে বসলেন মাইক্রফট হোমস।

বললেন, 'শার্লক, কেসটা অতি যাচ্ছেতাই। রোজকার অভ্যেস পালটানো আমার ধাতে সয় না! কিন্তু না-এসেও পারলাম না। শ্যাম দেশের[৭] অমন জরুরি সমস্যা ফেলে চলে আসতে হল প্রধানমন্ত্রীর ছটফটানি দেখে[৮]— নৌবিভাগের প্রশাসন দপ্তরে গেলে শুনবি যেন চাকভাঙা বোলতা গুনগুন করছে— উত্তেজনায় কেউ আর স্থির নেই। কাগজ পড়েছিস তো?'

'এইমাত্র পড়লাম। টেকনিক্যাল কাগজপত্রগুলো কীসের?'

'এই রে, ঠিক পয়েন্টে এসে গেলি দেখছি! কপাল ভালো কাগজে ওটা বেরোয়নি— বেরোলে টি টি পড়ে যেত। ছোকরার পকেটে পাওয়া গেছে ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিনের[৯] নকশা। নামটা শুনেছিস নিশ্চয়?'

'শুধু নামই শুনেছি— তার বেশি নয়।'

'নকশাটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত রাখার সবরকম চেষ্টাই করেছিল সরকার। ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিন জলে নামলে সে-তল্লাটে কোনো যুদ্ধজাহাজকেই আর যুদ্ধ করতে হবে না। তিরিশটা আলাদা পেটেন্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে গোটা নকশাটা— প্রত্যেকটা পেটেন্ট সমান গুরুত্বপূর্ণ—

কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না, দিলে প্ল্যান কেঁচে যাবে। প্ল্যানটা গুপ্ত রাখার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি হয়নি। অস্ত্রাগারের লাগোয়া গোপন চেম্বারে সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং সে-ঘরের দরজা জানলায় এমন ব্যবস্থা করা আছে যে চোর ডাকাতের চোদ্দোপুরুষের ক্ষমতা নেই ভেতরে ঢোকার। অফিস থেকে এ-নকশা বেরিয়ে যাওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় না। নৌবিভাগের চিফ কনট্রাক্টর যদি ইচ্ছে করেন নকশাটা দেখবেন, তাহলে তাঁকেও আসতে হবে ওই ঘরের মধ্যে। উলউইচ অফিসে। তা সত্ত্বেও লন্ডনের বুকে একজন জুনিয়ার ক্লার্কের মৃতদেহের পকেটে পাওয়া গেল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সাংঘাতিক গোপনীয় এই প্ল্যান। সমস্ত সরকারি মহল তাই এখন থরহরি কম্প এই ব্যাপার নিয়ে।'

'কিন্তু প্ল্যান তো পেয়ে গেছ?'

'না, শার্লক না! দশটা কাগজ সরানো হয়েছিল উলউইচ থেকে। তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারি তিনটে কাগজ একদম বেপাত্তা— সাতটা পাওয়া গেছে ছোকরার পকেটে। বাকি তিনটে তাহলে গেল কোথায়? পুলিশ আদালতের ওইসব ছিঁচকে মামলা শিকেয় তুলে আদা জল খেয়ে লেগে পড়— দেশের কাজ কর— ইংলন্ড কৃতজ্ঞ থাকবে তোর কাছে। সমস্যাটা আন্তর্জাতিক[১০], খেয়াল থাকে যেন— ছিঁচকে কেস নয়। কাগজপত্র ক্যাডোগেন ওয়েস্ট সরাতে গেল কেন, তিনটে কাগজ এখন কোন চুলোয়, ক্যাডোগেন পরলোকে গেল কীভাবে, রেললাইনের ধারেই-বা নশ্বর দেহটা পৌঁছোল কী করে, শয়তানি চক্র ফাঁস করা যায় কীভাবে— এতগুলো প্রশ্নের জবাব তোকে বার করতে হবে।'

'দাদা, তোমার চোখ আমার মতোই ধারালো। তুমি নিজে দেখছ না কেন।'

'তথ্য এনে দে— চেয়ারে বসে মাথা খাটিয়ে সমাধান বাতলে দেব। কিন্তু ছুটোছুটি করা আমার পোষায় না। রেলগার্ডকে গিয়ে জেরা করা, কি উপুড় হয়ে লেন্স নিয়ে মাটি পরীক্ষা করা— ওসব আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। কাজটা তোর। বড়ো রকমের খেতাব-টেতাব পাওয়ার ইচ্ছে যদি থাকে তো—'

হেসে উঠল শার্লক হোমস।

মাথা নেড়ে বললে, 'আমি খেলি, খেলতে ভালোবাসি বলে। কেসটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আরও কিছু ঘটনা চাই যে।'

'এই কাগজটা রাখ— এতে দরকারি পয়েন্ট আর কিছু ঠিকানা লিখে এনেছি। কাগজপত্র রাখার মূল দায়িত্ব স্যার জেমস ওয়ালটারের। ভদ্রলোকের মাথার চুল পেকেছে সরকারি কাজে, অসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের পাত্র, ডিগ্রি লিখতে গেলে দু-লাইনেও ধরে না— এর দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সিন্দুকের দুটো চাবির একটা থাকে এঁর কাছে। সোমবার অফিস টাইমে কাগজগুলো সিন্দুকেই ছিল। চাবি নিয়ে স্যার জেমস তিনটে নাগাদ লন্ডন রওনা হন। সন্ধের দিকে এ-ঘটনা যখন ঘটে উনি তখন বারক্লে স্কোয়ারে— অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ারের বাড়িতে বসে।'

'খবরটা যাচাই করা হয়েছে তো?'

'হয়েছে। স্যার জেমসের ভাই কর্নেল ভ্যালেনটাইন ওয়ালটার বলেছেন উলউইচ থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্যার জেমস। অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ার বলেছেন উনি লন্ডনে ছিলেন কখন। কাজেই এদিক দিয়ে স্যার জেমসকে ধাঁধা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।'

'দ্বিতীয় চাবিটা কার কাছে থাকে?'

'মিস্টার সিডনি জনসনের কাছে— একধারে সিনিয়র ক্লার্ক আর নকশা আঁকিয়ে লোকটা বিমর্ষ টাইপের, বয়স চল্লিশ, বিয়ে করেছে, ছেলে-মেয়ে পাঁচটি। কম কথা বলে, খাটে খুব, কাজের রেকর্ড ভালো, কিন্তু সহকর্মীদের কাছে অপ্রিয়। তার বউ বলেছে, সোমবার সন্ধেটা বাড়িতেই ছিল সিডনি জনসন— ঘড়ির চেনে ঝোলানো চাবি কাছছাড়া হয়নি এক সেকেন্ডের জন্যেও।'

'ক্যাডোগেন সম্বন্ধে এবার বলো।'

'ছোকরা চাকরিতে এসেছে বছর দশেক। মাথা গরম, কাজ ভালো, সোজা চরিত্রের লোক। ওর বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। অফিসে সিডনি জনসনের ঠিক পরেই ওর স্থান। কাজের খাতিরে রোজই প্ল্যান নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। প্ল্যানে হাত দেওয়ার সুযোগ আর কারো নেই।'

'রাত্রে প্ল্যান সিন্দুকে তুলেছিল কে?'

'সিনিয়র ক্লার্ক মিস্টার সিডনি জনসন।'

'জুনিয়ার ক্লার্ক ক্যাডোগেন ওয়েস্টের পকেটে যখন প্ল্যান পাওয়া গেছে, তখন চুরিটা সে-ই করেছে— এ নিয়ে দ্বিমত আছে কি?'

'নেই। কিন্তু শার্লক, জট তো তাতে পরিষ্কার হচ্ছে না— বরং বাড়ছে। যেমন, কাগজপত্র ও নিতে গেল কেন?'

'বিনিময়ে টাকা পেত নিশ্চয়?'

'কয়েক হাজার পাউন্ড তো পেতই।'

'বিক্রি করার উদ্দেশ্য ছাড়া লন্ডনে কাগজ নিয়ে যাওয়ার আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি?'

'আমার মাথায় তো আসছে না।'

'তাহলে কাজ শুরু করার জন্যে এই উদ্দেশ্যটা ধরে এগোনো যাক। ওয়েস্ট ছোকরা কাগজ নিয়েছে নকল চাবি দিয়ে—'

'একটা নকল চাবিতে হত না, শার্লক। কয়েকটা লাগবে। সদর দরজা খুলতে হবে, ঘরের দরজা খুলতে হবে।'

'বেশ তো, বেশ কয়েকটা নকল চাবি নিয়ে কাগজ সরাল ছোকরা। লন্ডনে গেল বিক্রি করতে। মতলব ছিল ভোরের আগেই ফিরে সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখবে আসল প্ল্যান। কিন্তু লন্ডনে হাতে হাতে ফল পেল বিশ্বাসঘাতকতার।'

'কীভাবে?'

উলউইচে ফেরার সময়ে ট্রেনেই তাকে খুন করা হয়— লাশ ফেলে দেওয়া হয় লাইনের ধারে।'

'লাশ পাওয়া গেছে আল্ডগেট স্টেশনের কাছে। স্টেশনটা লন্ডন ব্রিজ পেরিয়ে— উলউইচ যাওয়ার রাস্তায়।'

'লন্ডন ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার কারণও নিশ্চয় আছে। কামরায় এমন কেউ ছিল যার সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল ছোকরা। কথার শেষে বচসা, হাতাহাতি, খুন। অথবা হয়তো কামরা থেকেই নিজেই লাফিয়ে বাঁচতে গিয়ে মারা গেছে। সঙ্গে যে ছিল, দরজা বন্ধ করে ছিল। ঘন কুয়াশায় কেউ জানতেও পারল না কী ঘটে গেল।'

'কিন্তু তোর নিজের যুক্তিতেই ফাঁক থেকে যাচ্ছে, শার্লক। প্ল্যান বিক্রি করলেও যে-লোক সন্ধে নাগাদ লন্ডন যাবে, সে উলউইচ-থিয়েটারে সন্ধের শোয়ের টিকিট কাটতে যাবে কেন? প্রণয়িনীকে মাঝপথে ফেলে লম্বা দেবে কেন?'

লেসট্রেড এতক্ষণ ছটফট করছিল কথার যুদ্ধ শুনতে শুনতে। এবার দুম করে বলে উঠল, 'ধোঁকা দেওয়ার জন্যে।'

'খুবই অসাধারণ ধোঁকা সন্দেহ নেই। এই গেল ধোঁকা-তত্ত্বে আমার প্রথম আপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি হল এই : ভোরের আগেই কাগজ দশটা ফিরিয়ে না-আনলে কিন্তু চুরি ফাঁস হয়ে যাবে জেনেও সে পকেটে করে মাত্র সাতটা কাগজ নিয়ে ফিরছিল কেন? বাকি তিনটে গেল কোন মুলুকে? তা ছাড়া এত কাঠখড় পুড়িয়ে নকশা বেচতে যে লন্ডন গেল, নকশা-বেচার টাকাটা পকেটে না-নিয়েই-বা সে ফিরছিল কেন?'

লেসট্রেড তৈরি হয়েই ছিল জবাব দেওয়ার জন্যে। বলে উঠল, 'এ আর এমন কী কঠিন ব্যাপার। বেচবে বলেই নিয়ে গিয়েছিল লন্ডনে। কিন্তু দরে পোষাল না বলে ফিরছিল যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দেবে বলে। শত্রুর চর ছাড়বে কেন, পেছন পেছন এল, ট্রেনের মধ্যে খুন করল, সবচেয়ে দরকারি নকশা তিনটে পকেটস্থ করল, লাশ বাইরে ফেলে দিল, ল্যাটা চুকে গেল। কেমন? সব সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন কি না?'

'কাছে টিকিট ছিল না কেন?'

'কোন স্টেশনের কাছে শত্রুর চর থাকে, পাছে তা ফাঁস হয়ে যায়, তাই খুনি নিজেই টিকিটটা সরিয়েছে পকেট থেকে।'

'তাহলে আর এত ঝঞ্ঝাট কেন? বিশ্বাসঘাতক প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সাবমেরিনের নকশাও এতক্ষণে শত্রুর দেশে চলে গেছে। তাহলে আর খামোকা মাথা ঘামিয়ে দরকারটা কী?'

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে উঠলেন মাইক্রফট— 'গা তোল, শার্লক, গা তোল! আমার মন বলছে তোদের এ সব অনুমানই ভুল— গোড়া থেকেই ভুল। উঠে পড়ে কাজে লেগে যা, অকুস্থলে হানা দে, সংশ্লিষ্ট লোকজনদের ধরে জেরা করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়। সাধ্যমতো যা করতে পারিস— কোনোটা বাকি রাখিসনি। দেশকে এভাবে সেবা করার এত বড়ো সুযোগ জীবনে তুই পাসনি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়! ওয়াটসন, উঠে পড়ো। লেসট্রেড, চলো আমার সঙ্গে আল্ডগেট স্টেশনে। মাইক্রফট, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। সন্ধের মধ্যেই খবর দোব। তবে খুব একটা কিছু আশা করে থেকো না।'

একঘণ্টা পরে আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক আগে টানেল থেকে বেরিয়ে আসা পাতালরেলের ধারে এসে দাঁড়ালাম আমি, হোমস আর লেসট্রেড। রেল কোম্পানির তরফ থেকে একজন সদাশয় লালমুখো বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন সঙ্গে।

লাইন থেকে ফুট তিনেক তফাতে একটা জায়গা দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'লাশ পড়েছিল এইখানে। দেখলেই বুঝবেন ওপর থেকে পড়া সম্ভব নয়— ট্রেনের ভেতর থেকে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। যদ্দুর খবর পেয়েছি, সোমবার মাঝরাতে যে-ট্রেনটা গেছে এখান দিয়ে— লাশ ফেলা হয়েছে সেই ট্রেন থেকেই।'

‘কামরাগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? মারপিটের চিহ্ন পাওয়া গেছে?’

‘সে-রকম চিহ্ন বা টিকিট— কিছুই পাওয়া যায়নি।’

‘কোনো দরজা খোলা ছিল কি?’

‘না।’

লেসট্রেড বললে, ‘আমরা অবশ্য একটা খবর পেয়েছি। আল্ডগেট স্টেশনে ট্রেন ঢোকবার ঠিক আগে সোমবার এগারোটা চল্লিশ নাগাদ ধপাস করে একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ পায় একজন যাত্রী— ঘন কুয়াশার জন্যে কিছু দেখা যায়নি। আরে, আরে, মি. হোমস, ওটা কী করছেন?’

নিঃসীম আগ্রহে উদ্দীপ্ত মুখে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে ছিল আমার বন্ধু।
আর্থার টুইডল, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯০৮

নিঃসীম আগ্রহে উদ্দীপ্ত মুখে ইস্পাতের রেললাইনের পানে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে ছিল শার্লক হোমস। রেললাইন যেখানে বেঁকে বেরিয়ে এসেছে টানেলের মধ্যে থেকে— চেয়ে আছে ঠিক সেইদিকে। আল্ডগেট একটা জংশন স্টেশন, অনেক রেললাইনের কাটাকাটি চলেছে সেখানে— হোমসের সাগ্রহ চাহনি নিবদ্ধ এইসব লাইনের কাটাকুটির দিকে। এ চেহারা, এ চাহনি— আমি চিনি। থিরথির করে কাঁপছে নাকের পাটা, বেঁকে শক্ত হয়ে গিয়েছে পাতলা ঠোঁট, বঙ্কিম চেহারা নিয়েছে ভুরু জোড়া।

বিড়বিড় করে বলল আপন মনে, 'পয়েন্টস!'

'কী বলছেন বলুন তো?'

'রেললাইনের এত পয়েন্ট আর কোথাও নেই, তাই না?'

'না।'

'সেইসঙ্গে একটা বাঁক। লাইনে লাইনে কাটাকুটি আর একটা বাঁক! আহারে, তাই যদি হত!'

'কী হত মি. হোমস? সূত্র পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'একটা আইডিয়া পেয়েছি বলতে পার— অন্ধকারে একটা নিশানা দেখা যাচ্ছে যেন। কেসটা ক্রমশই আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। লাইনে তেমন রক্ত পড়েনি দেখছি।'

'কিন্তু চোটটা জবর রকমের তাই না?'

'হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল— বাইরে চোট খুব একটা লাগেনি।'

'তা সত্ত্বেও রক্তপাতটা সবাই আশা করে। কুয়াশার মধ্যে যে-ট্রেন থেকে ভারী জিনিস পড়বার ধপাস আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল, সে-ট্রেনটা পরীক্ষা করার সুযোগ হবে?'

'সম্ভব নয়, মি. হোমস। কামরাগুলো সব খুলে ফেলে অন্য ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এতক্ষণে।'

লেসট্রেড বললে, 'আমি নিজে সব কামরা দেখেছি। কিন্তু চোখে পড়েনি।'

হোমসের চরিত্রে একটা দুর্বলতা আছে। কারো ভোঁতা বুদ্ধি একদম সইতে পারে না— ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তিরিক্ষে গলায় বললে, 'কিন্তু আমি কামরা পরীক্ষা করার জন্যে ট্রেনটা দেখতে চাইনি। ওয়াটসন, চলো, এখানে আর কিছু দেখবার নেই। লেসট্রেড, তোমাদের আর কষ্ট দেব না। এবার উলউইচে গিয়ে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে দেখছি।'

লন্ডন ব্রিজ থেকে ভাইকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস :

'অন্ধকারে আলোর নিশানা পাচ্ছি। তবে নিভে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। লোক মারফত বেকার স্ট্রিটের বাসায় বিদেশি স্পাই আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের লিস্ট পাঠিয়ে দাও— ইংলন্ডে যারা আছে সবার নাম আর ঠিকানা চাই— লোকটা যেন আমি না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, শার্লক।

উলউইচের ট্রেনে উঠে বসে হোমস, 'এতেই কাজ হবে। এইরকম একটা অতি আশ্চর্য কেসে নাক গলানোর সুযোগ দিয়ে মাইক্রফট যথেষ্ট উপকার করল আমার।'

নিশ্চয় একটা অদ্ভুত রক্ত-চনমন করা চিন্তা ঢুকেছে হোমসের মগজে। চাপা, তীব্র প্রাণশক্তি যেন ফুটে ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ-মুখ থেকে। খাঁচায় বন্ধ ল্যাজঝোলা কানঝোলা ফক্স

হাউন্ডের চেহারা একেবারে পালটে যায় শিকারের গন্ধ পেলে। অবিকল সেই পরিবর্তন দেখা দিয়েছে শার্লক হোমসের মধ্যে। মাত্র ক-ঘন্টা আগে এই মানুষটাই কুয়াশা-পিঞ্জরে বন্দি অবস্থায় ঘরের মধ্যে ইঁদুর-রাঙা ড্রেসিং গাউন পরে অস্থির চরণে যেন লেংচে লেংচে পায়চারি করেছে দীর্ঘতনু নিয়ে— কিন্তু এখন সে আর এক মানুষ।

শুধু বলল, 'উপাদান পাওয়া গেছে, ওয়াটসন। সুযোগ এখনও রয়েছে। আস্ত গাধা আমি তাই, সম্ভাবনাটা আগে বুঝিনি।'

'আমার কাছে কিন্তু এখনও সব অন্ধকার।'

'শেষটা এখনও অন্ধকার আমার কাছেও। তবে কি জান, একটা আইডিয়া মাথায় এলে তা থেকে আর একটা আইডিয়ায় যাওয়া যায়। ছোকরা মারা গেছে অন্য কোথাও, লাশটা রাখা হয়েছিল ট্রেনের ছাদে।'

'ছাদ!'

'ভায়া, লাশটা এমন একটা জায়গায় ঠিকরে পড়েছে যেখানে রেললাইনের কাটাকুটি থাকার দরুন আর বাঁক থাকার দরুন প্রত্যেকটা কামরাকে হেলেদুলে যেতে হবেই। কামরা যখন দুলতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে, কামরার ভেতর থেকে কিছুই ছিটকে পড়ে না— কিন্তু ছাদে কোনো বস্তু থাকলে, তা গড়িয়ে পড়বেই। তারপর দেখ, ও-রকম একটা মারাত্মক জখম হওয়া সত্ত্বেও তেমন রক্ত পড়ে নেই জায়গাটায়। তার মানে কি এই নয় যে ছোকরাকে পরলোকে পাঠানো হয়েছে অন্যত্র এবং লাশটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল ট্রেনের ছাদে? পয়েন্টস আর বাঁক পেরোনোর সময়ে আপনা থেকেই ঠিকরে পড়েছে লাইনের ধারে? পর পর দুটো অদ্ভুত ধাঁধার সমাধান দেখ এই একটা আইডিয়া থেকেই হয়ে গেল, তাই নয় কি?'

'শুধু কি তাই? পকেটে টিকিট না-থাকার কারণও তো স্পষ্ট হয়ে গেল!' সোল্লাসে বললাম আমি।

'ঠিক বলেছ। টিকিট কেন নেই, এবার তাও পরিষ্কার বোঝা গেল। সব সমস্যার সমাধান দেখ একে-একে পাওয়া যাচ্ছে, সঠিক আইডিয়াটি মাথায় আনতে পেরেছি বলে।'

'কিন্তু ভাই, রহস্য যে আরও গভীর হল এই আইডিয়ার ফলে।'

'হয়তো', বলে চিন্তাসাগরে ডুব দিল শার্লক হোমস— ট্রেন উলউইচে পৌঁছোনোর আগে আর একটি কথাও বলল না। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে একটা ছ্যাকড়াগাড়িতে উঠে বসে পকেট থেকে বার করল মাইক্রফটের দেওয়া কাগজখানা।

বললে, 'সারাবিকেলটা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে কাটাতে হবে। প্রথমেই যাব স্যার জেমস ওয়ালটারকে দর্শন করতে।'

টেমসের ধারে বিখ্যাত ব্যক্তিটির সাজানো ভিলায় যখন পৌঁছোলাম, তখন কুয়াশা ফিকে হয়ে আসছে, আর্দ্র রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে। ঘন্টা বাজাতেই খাস চাকর এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়।

বললে গম্ভীর মুখে, 'স্যার জেমসকে খুঁজছেন! তিনি আজ সকালে দেহ রেখেছেন।'

'সেকী কথা!' আঁতকে উঠল হোমস, 'মারা গেছেন! কীভাবে?'

'ভেতরে আসুন। ওঁর ভাই কর্নেল ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে কথা বলে যান।'

'চলো।'

বসবার ঘরে গেলাম। একটু পরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে এলেন একজন দীর্ঘকায় সুশ্রী ব্যক্তি। গালে হালকা রঙের দাড়ি। বয়স বছর পঞ্চাশ। চুল উশকোখুশকো। চোখ উদ্ভ্রান্ত। সদ্য শোকের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না— জড়িয়ে যাচ্ছে।

বললেন, 'বিশ্রী এই কেলেঙ্কারির ধাক্কা উনি সইতে পারলেন না। জীবনে যাঁকে কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি, বীভৎস এই ব্যাপারে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল— তাই চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে।'

'ওঁকে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্যেই এসেছিলাম। ওঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনলে রহস্য পরিষ্কার করতে পারতাম।'

'যা বলবার পুলিশকে উনি বলে গেছেন। ওঁর বিশ্বাস ক্যাডোগেন ওয়েস্ট ছোকরাই যত নষ্টের মূল। বাকিটুকু আরও গোলমেলে।'

'আপনার কী মনে হয়?'

'খবরের কাগজে যা পড়েছি আর দাদার মুখে যা শুনেছি— তার বেশি কিছুই জানি না। মি. হোমস, যদিও ব্যাপারটা অভব্য দেখাচ্ছে তবুও বলি— এইরকম মানসিক অবস্থায় আপনি যত তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে বিদায় নেন, ততই ভালো।'

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসে হোমস বললে, 'এ-রকম একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতেই পারিনি। আত্মহত্যা না হার্টফেল— সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। কর্তব্যে অবহেলা করার গ্লানি সইতে না-পেরে নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দিলেন কি? পরে তা নিয়ে ভাবা যাবে। এখন যাওয়া যাক ক্যাডোগেন ওয়েস্টের বাড়ি।'

শহরের প্রান্তে ছোটো একটা সাজানো বাড়িতে দেখা হল নিহত ছোকরার শোকবিহ্বল মায়ের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কথা বার করা গেল না। তবে ছোকরার প্রণয়িনী মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবুরি অনেক কথা বললে। মেয়েটির মুখ সাদা— সোমবার রাত্রে শেষবার ক্যাডোগেনকে সে-ই দেখেছে।

বললে, 'মি. হোমস, দিনরাত কেবলই ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি— ঘুমাতেও পারছি না— কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এ কী করে সম্ভব। আর্থার দেশকে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে। দেশের যাতে সর্বনাশ হয়, এমন কোনো কাজ ওকে দিয়ে সম্ভব নয়। নিজের হাত এক কোপে কাটতে রাজি সে, কিন্তু গুপ্ত কাগজ দেশের বাইরে সেই হাত দিয়ে পাচার করার পাত্র সে নয়। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য— আর্থারকে যারা জানে তারা কেউই বিশ্বাস করবে না।'

'কিন্তু ঘটনা যে অন্য কথা বলছে, মিস ওয়েস্টবুরি?'

'জানি, জানি, তাই তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'টাকার দরকার হয়েছিল কি আর্থারের?'

'না। ওর চাহিদা কম, রোজগার ভালো। কয়েকশো পাউন্ড জমিয়েছিল। নতুন বছরেই বিয়ে হয়ে যেত দুজনের।'

'কোনোরকম মানসিক উত্তেজনা লক্ষ করেছিলেন কি? বলুন, মিস ওয়েস্টবুরি, আমাদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলুন।'

মেয়েটির চোখ-মুখের চকিত পরিবর্তন হোমসের ধারালো নজরে ধরা পড়েছে। লাল হয়ে গেল মিস ওয়েস্টবুরি— দ্বিধায় পড়ল।

তারপর বললে, 'করেছিলাম। বুঝেছিলাম কী যেন ঘুরঘুর করছে ওর মনের মধ্যে।'

'অনেক দিন ধরেই কি তা লক্ষ করেছিলেন?'

'গত হপ্তায় লক্ষ করেছিলাম। সবসময়ে কী যেন ভাবত, যেন একটা উদ্‌বেগে পেয়ে বসেছিল। একবার চেপে ধরেছিলাম— কীসের এত ভাবনা বলার জন্যে। ও বললে— ব্যাপারটা অফিস সংক্রান্ত। অত্যন্ত গোপনীয়। আমাকেও বলা যাবে না।'

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

'মিস ওয়েস্টবুরি, থামবেন না। আর্থার জড়িয়ে পড়তে পারে— এমন কথাও যদি জানেন— তাও বলুন। বলা যায় না কী থেকে কী বেরিয়ে যায়।'

'নিশ্চয় বলব। বার-দুয়েক বলি বলি করেও কী যেন চেপে গেছে। একবার শুধু বলেছিল, বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়— বিদেশি গুপ্তচররা দেদার টাকা ঢালবে যদি সন্ধান পায়।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

'আর কিছু?'

'আমরা নাকি বড়ো ঢিলে— কড়াকড়ি মোটেই নেই— বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে প্ল্যান হাতানো অত্যন্ত সোজা।'

'এ-কথা সম্প্রতি বলেছিল— না আগেও বলেছিল?'

'এই তো সেদিনের কথা— আগে কক্ষনো বলেনি?'

'শেষ সন্ধের ব্যাপারটা বলুন।'

'থিয়েটারে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। কুয়াশায় হেঁটে যাচ্ছিলাম। অফিসের কাছাকাছি এসে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।'

'কোনো কথা না-বলে?'

'খুব অবাক হয়ে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল— তার বেশি নয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ও ফিরল না। বাড়ি চলে এলাম। পরের দিন সকালে অফিস খুলতে পুলিশ এল খোঁজ নিতে। দুপুর বারোটা নাগাদ শুনলাম ভয়ংকর খবরটা। মি. হোমস, মি. হোমস, কলঙ্কের হাত থেকে ওকে বাঁচান।'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল হোমস।

বললে, 'এসো ওয়াটসন, এবার যাওয়া যাক অফিসে— কাগজ হারিয়েছে যেখান থেকে।'

গাড়ি চলতেই বললে, 'তদন্ত হাতে নিয়ে দেখেছিলাম ছোকরার কপাল মন্দ, এখন দেখছি একেবারেই জঘন্য। আসন্ন বিয়ের জন্যে টাকার দরকার হয়েছিল বলেই ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে পর্যন্ত প্ল্যান হাতানোর প্ল্যান বলে তাকেও দুষ্কর্মের সঙ্গিনী করতে গিয়েছিল।'

'কিন্তু চরিত্র বলে জিনিসটা কি একেবারে ফেলনা? তা ছাড়া ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে দুম করে রাস্তায় ফেলে পালাবে কেন?'

'তা ঠিক, তা ঠিক। কেসটা বড়ো ভয়ংকর হে, এ-রকম খটকা লেগে থাকবেই।'

সিনিয়র ক্লার্ক সিডনি জনসন অফিসেই ছিল। সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাল হোমসকে। চশমাপরা মাঝবয়েসি, পাতলা চেহারার মানুষ। গাল আর আঙুল থিরথির করে কাঁপছে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায়।

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন তো মি. হোমস? স্যার জেমসের মৃত্যুর খবর শুনেছেন?'

'সেখান থেকেই আসছি।'

'সোমবার সন্ধ্যাতেও কত নিখুঁত ছিল এই অফিস— আর আজ? চিফ নেই, ক্যাডোগেন ওয়েস্ট খতম, নকশা উধাও। কী ভীষণ! কী ভীষণ! সব চাইতে ভীষণ হল ক্যাডোগেন ওয়েস্টের রাতারাতি চোর বনে যাওয়া।

'আপনি ঠিক জানেন ক্যাডোগেন ওয়েস্ট চোর?'

'সে ছাড়া কে চুরি করবে বলুন? উঃ ভাবা যায় না!'

'সোমবার কখন বন্ধ হয়েছিল অফিস?'

'পাঁচটায়।'

'আপনি বন্ধ করেছিলেন?'

'আমিই সবশেষে অফিস ছেড়ে বেরোই।'

'নকশা ছিল কোথায়?'

'ওই সিন্দুকে। আমি নিজে রাখি ওখানে।'

'এ-বাড়ি পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে?'

'একজন বুড়ো যুদ্ধফেরত সৈন্য পাহারা দেয়। কিন্তু অন্যান্য অফিসও দেখতে হয় তাকে। লোকটা দারুণ বিশ্বাসী। সেদিন অবশ্য কুয়াশাও পড়েছিল প্রচণ্ড।'

'পাঁচটার পর এ-বাড়ি ঢুকতে গেলে নিশ্চয় তিনটে চাবির দরকার হত ক্যাডোগেন ওয়েস্টের?'

'তা হত। বাইরের দরজার চাবি, এই অফিসের দরজার চাবি, সিন্দুকের চাবি।'

'চাবি থাকত শুধু আপনার কাছে আর স্যার জেমস ওয়ালটারের কাছে?'

'আমার কাছে শুধু সিন্দুকের চাবি থাকে— দরজার নয়।'

'স্যার জেমস কি গুছোনো স্বভাবের মানুষ?'

'অত্যন্ত, তিনটে চাবিই একটা রিংয়ে রাখেন— আমি নিজে দেখেছি।'

'রিংটা নিয়েই লন্ডন গিয়েছিলেন?'

'তাই তো বলেছেন।'

'আপনার চাবি কাছছাড়া হয়নি তো?'

'কখনোই না।'

'অথচ ক্যাডোগোন ওয়েস্টের পকেটে নকল চাবিও পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, কোনো ক্লার্ক যদি নকশা বিক্রির ফন্দি এঁটে থাকে, সে তা কপি করে নেয়— আসল নকশা লোপাট করতে যায় না। ঠিক কিনা?'

'নকশাগুলো এত টেকনিক্যাল, এত জটিল যে কপি করা মুশকিল।'

'কিন্তু আমি তো জানি আপনার, স্যার জেমসের আর ক্যাডোগেন ওয়েস্টের এ-ধরনের টেকনিক্যাল বিদ্যে আছে।'

'তা আছে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে এর মধ্যে টানবেন না— বিশেষ করে নকশা যখন পাওয়া গেছে ওয়েস্টেরই পকেটে।

'কিন্তু কপি করলেই যখন ঝঞ্ঝাট চুকে যেত, আসল নকশা নেওয়ার ঝুঁকি নিতে গেল কেন?'

'খুবই আশ্চর্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়েছে।'

'এ-কেস অনেক ব্যাপারেই এমনি আশ্চর্য। যে কাগজ তিনটে এখনও নিখোঁজ, শুনলাম সেই তিনটেই নাকি গোটা নকশার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ?'

'তা ঠিক।'

'অন্য কাগজ হাতে না-রেখে এই তিনটে কাগজের সাহায্য নিয়ে ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিন তৈরি সম্ভব?'

'আগে সেইরকমই রিপোর্ট করেছিলাম অ্যাডমিরালটিকে। কিন্তু আজকে কাগজপত্র ফের দেখলাম। যে কাগজে ডবল ভালভের অটোমেটিক ব্যবস্থা আঁকা আছে, সেটা ফেরত এসেছে। এ জিনিস বিদেশিদের নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে— নইলে সাবমেরিন বানানো যাবে না। অবশ্য এ-অসুবিধে দু-দিনেই কাটিয়ে উঠবে ওরা।'

'কিন্তু নিখোঁজ কাগজ তিনটেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'বাড়িটা এক চক্কর ঘুরে দেখতে চাই।'

সিন্দুকের তালা, ঘরের দরজা আর জানলার লৌহকপাট খুঁটিয়ে দেখল হোমস। বাইরে এসে উত্তেজিত হল একটা লরেল ঝোপ দেখে। ডাল ভাঙা, পাতা ছেঁড়া— যেন তার ওপর হাঁটাচলা হয়েছে। লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করল মাটির চেহারা। অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। সিনিয়র ক্লার্ককে বললে ভেতর থেকে জানলার লৌহকপাট বন্ধ করতে। করার পর বাইরে দেখা গেল, কপাট পুরো বন্ধ হচ্ছে না— বাইরে থেকে কী ভেতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

বললে, 'তিন দিনে সব চিহ্ন মুছে গেছে। চলো ওয়াটসন, লন্ডনে যাওয়া যাক— উলউইচে আর কিছু পাব বলে মনে হয় না।'

স্টেশনে গিয়ে কিন্তু একটা মনের মতো খবর পাওয়া গেল। টিকিট বিক্রেতা কেরানিটি বললে সোমবার রাতে ক্যাডোগেন ওয়েস্টের কম্পমান মূর্তি তার বেশ মনে আছে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল— থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট কেটে খুচরো পর্যন্ত তুলতে পারছিল না। খুব সম্ভব সোয়া আটটার ট্রেনে চেপেছিল— কেননা প্রণয়িনীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল সাড়ে সাতটা নাগাদ।

'ওয়াটসন,' বলল হোমস, 'ঘটনাগুলো এবার পর পর সাজানো যাক। উলউইচে তদন্ত করে মনে হয়েছিল, ওয়েস্ট নিজে হাতে সরিয়েছে নকশা। এখন দেখা যাচ্ছে, কোনো বিদেশি স্পাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কুয়াশা ঢাকা রাতে বান্ধবীকে নিয়ে থিয়েটার যাওয়ার সময়ে হঠাৎ সে দেখলে সেই স্পাইটি অফিসের দিকে যাচ্ছে। অবাক হয়ে তাই সে চেঁচিয়ে উঠেছে— তার বেশি বলতে পারেনি। কর্তব্য তার কাছে সবার ওপরে— সিদ্ধান্তও নেয় ঝট করে। তাই প্রণয়িনীকে ফেলে দৌড়েছে লোকটার পেছনে, নিজের চোখে দেখেছে জানলার ফাঁক দিয়ে কীভাবে সাবমেরিনের নকশা নিয়ে বেরিয়ে এল সেই গুপ্তচর। এইজন্যেই নকশা নকল করা হয়নি— আসল নকশা খোয়া গেছে। এ-ধাঁধার এভাবে ছাড়া অন্য সমাধান আর হয় না।'

'তারপর?'

'তারপরেই একটু অসুবিধেয় পড়ছি। কেননা, চোখের সামনে গোপন দলিল লোপাট হতে দেখে বাধা দেওয়া উচিত ছিল ওয়েস্টের— কেন দেয়নি? ওপরওলা কাউকে দেখেছিল বলে

কি? হয়তো তাই। নাকি, চোর মহাপ্রভু কুয়াশায় গা-ঢাকা দেওয়ায় পাগলের মতো তার বাড়ি থেকেই নকশা উদ্ধারের জন্যে দৌড়েছিল ওয়েস্ট? হাতে একদম সময় না-থাকায় প্রণয়িনীকেও কিছু বলে যেতে পারেনি? এইখানেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মাইক্রফটের পাঠানো গুপ্তচরদের নাম-ঠিকানা হাতে এলে আবার উলটোদিক থেকে ভাবনা শুরু করব।'

বেকার স্ট্রিটে গিয়ে পেলাম মাইক্রফটের চিঠি— একজন সরকারি কর্মচারীর হাতে পাঠিয়েছে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজখানা আমার দিকে ছুড়ে দিল হোমস।

'চুনোপুঁটি অনেকেই আছে। কিন্তু এ ধরনের বৃহৎ ব্যাপারে নাক গলানোর মতো বুকের পাটা আছে যে তিনটি রাঘব বোয়ালের, তাদের নাম-ঠিকানা দিচ্ছি। অ্যাডলফ মেয়ার, তেরো নম্বর, গ্রেট জর্জ স্ট্রিট, ওয়েস্ট মিনিস্টার; লুই লা রোথিয়েরে[১১], ক্যামডেন ম্যানসন্স, নটিংহিলং হুগা ওবারস্টিন, তেরো নম্বর, কলফিল্ড গার্ডেন্স, কেনসিংটন। এদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি সোমবার পর্যন্ত শহরে ছিল— তারপর কোথায় গেছে। অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছিস শুনে খুশি হলাম। মন্ত্রীপার্ষদ উদ্‌বিগ্ন সুখবর শোনবার প্রতীক্ষায়। জরুরি তলব এসেছে আরও ওপরমহল থেকে। দেশের সমস্ত বাহিনী দরকার হলে তোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে।— মাইক্রফট।'

হোমস ততক্ষণে লন্ডনের একটা ম্যাপ বিছিয়ে বসে আপন মনে বকর বকর করে চলেছে। কারোরই নাকি তর সইছে না এতবড়ো একটা জটিল সমস্যায়। তারপরেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে।

'পেয়েছি, ওয়াটসন, পেয়েছি, এবার ঠিক দিক ধরতে পেরেছি। বন্ধু, তুমি গাড়িতে বসে খাতা কলম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে দাও কীভাবে দেশসেবায় বুদ্ধি ব্যয় করেছি দুজনে। আমি চললাম একটু দেখেশুনে আসতে। ভয় নেই, আসল কাজে আমার জীবনীকার আর কমরেড পাশেই থাকবে।' বলে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মহাউল্লাসে প্রায় নাচতে নাচতে উধাও হল বন্ধুবর।

হোমসকে আমি চিনি। চাপা প্রকৃতির মানুষ অকারণে এত উল্লাস দেখায় না। তাই বেশ ফুর্তি এল মনে। রাত ন-টার পর লোক মারফত পেলাম ওর ছোট্ট চিরকুট :

কেনসিংটনে গ্লসেস্টার রোড গোলডিনির রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খাব। তুমিও এসো। সঙ্গে একটা সিঁধকাঠি, একটা বাটালি, একটা চোরা লণ্ঠন আর একটা রিভলভার আনবে। শা. হো.।

কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় এই ধরনের বস্তু নিয়ে কোনো ভদ্রলোক হাঁটে না। ওভারকোটের তলায় জিনিসগুলো লুকিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম দরজার কাছে একটা গোলটেবিলের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে আমার বন্ধুটি।

'খাবে কিছু? তাহলে কফি আর চুরুট খাও। যন্ত্রপাতি এনেছ?'

'ওভারকোটের পকেটে আছে।'

'চমৎকার। ওয়াটসন, সব ঘটনা শুনলে বুঝবে ক্যাডোগেন ছোকরাকে ট্রেনের ছাদেই রাখা হয়েছিল— ওইজন্যেই ট্রেনটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম— কামরা পরীক্ষা করতে চাইনি।'

'ব্রিজ থেকেও তো পড়তে পারে?'

'অসম্ভব। ট্রেনের ছাদে রেলিং থাকে না— গড়ানে ঢালু ছাদে কিছু থাকলে দুলুনি ঝাঁকুনির সময়ে তা ঠিকরে পড়বেই। ক্যাডোগেন ওয়েস্টকেও ছাদে রাখা হয়েছিল।'

'কিন্তু রাখা হল কেমন করে?'

'সম্ভাবনা একটাই আছে। তুমি তো জান ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছি পাতালরেল টানেল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে? আবছা মনে পড়ছে, টানেল থেকে বেরোনোর সময়ে মাথার ওপরে যেন বাড়ির জানলা দেখেছি। ধরো কোনো ট্রেন যদি এইসব জানলার তলায় দাঁড়িয়ে যায়, লাশটা ছাদে রেখে দেওয়া এমন কিছু কি কঠিন?'

'খুব সম্ভব।'

'তাহলে তোমাকে আমার একটা পুরানো তত্ত্ব ফের মনে করিয়ে দিই। সব পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সব চাইতে অসম্ভব পথটাই আসল পথ বলে ধরে নিতে হবে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সব লাইনের তদন্ত করে নাকের জলে চোখের জলে হওয়ার পর যখন ম্যাপ খুলে দেখলাম একজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচর পাতালরেলের ধারের একটা বাড়িতে থাকে, তখন আর খুশি চাপতে পারিনি। আমার উল্লাস দেখে তুমিও ভড়কে গিয়েছিলে।'

'এইজন্যেই নাচতে নাচতে ছুটেছিলে?'

'আরে হ্যাঁ। তেরো নম্বর কলফিল্ড গার্ডেন্সের সুধীব্যক্তি হুগো ওবারস্টিনকে টার্গেট করে বেরিয়ে পড়লাম নাচতে নাচতে। রেলকর্মচারীদের নিয়ে প্রথমে গেলাম গ্লসেস্টার রোড স্টেশনে। লাইনের ধার বরাবর হাঁটলাম। কর্মচারীরাই দেখিয়ে দিলে তেরো নম্বর বাড়িটার পেছনের দরজা লাইনের ঠিক পাশেই আর দুটো বড়ো রেললাইন সেখানে কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার ফলে হামেশাই পাতালরেলের ট্রেনে বেচারিদের মিনিট কয়েক ঠিক ওই জায়গাটিতে থেমে থাকতে হয়।'

'দারুণ আবিষ্কার হোমস! সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!'

'ভায়া ওয়াটসন, আবিষ্কারের এখনও অনেক দেরি— এই তো সবে খেলা শুরু— গোলপোস্ট এখনও অনেক দূরে। বাড়ির পেছনটা দেখবার পর এলাম সামনের দিকে। দেখেই বুঝলাম পাখি উড়েছে। আসবাবপত্র খুবই কম। একজনমাত্র চাকরকে নিয়ে ওপরতলায় থাকে ওবারস্টিন— নিঃসন্দেহে চাকরটি তার অপকর্মের দোসর। ওবারস্টিন কিন্তু পালায়নি— সে জানে তার নামে শমন বেরোনোর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই চোরাই নকশা নিয়ে গেছে মহাদেশের বিভিন্ন দেশে খদ্দের খুঁজতে। এই সুযোগে তার ঘরদোর দেখে আসব ঠিক করেছি।'

'শমন বার করে ব্যাপারটা আইনসংগত করে নিলে হত না?'

'প্রমাণ কোথায় যে শমন বার করব?'

'কীসের আশায় তাহলে যাচ্ছ?'

'কত রকমের চিঠিপত্র পেতে পারি আগে থেকে কি বলা যায়?'

'হোমস, আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না।'

'ভায়া, তুমি পাহারা দেবে রাস্তায়, অপকর্মটা করব আমি। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার সময় এটা নয়। নৌদপ্তরের কথা ভাবো, চিন্তা করো কী দারুণ উদ্‌বেগে অপেক্ষা করছেন মন্ত্রীপার্ষদ, মাইক্রফটের চিঠিখানা মনে করো— যেতে আমাদের হবেই।'

জবাবে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিল হোমস।

'আমি জানতাম, শেষ মুহূর্তে কেঁচোর মতো গুটিয়ে যাওয়ার পাত্র তুমি নও, মুহূর্তের জন্যে

চোখের তারায় দেখলাম প্রীতি স্নিগ্ধ কোমল প্রতিচ্ছবি— পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এল কর্তৃত্বময় বাস্তব-অনুগত নীরস সত্তা।

বললে, 'আধমাইল যেতে হবে। চলো হেঁটে যাই— তাড়াতাড়ির দরকার নেই। যন্ত্রপাতিগুলো যেন হাত ফসকে মাটিতে না পড়ে যায়— সিঁধেল চোর সন্দেহে তুমি গ্রেপ্তার হলে আমার পরিতাপের শেষ থাকবে না!'

লন্ডনের ওয়েস্ট-এন্ডে চেপটামুখো থামওলা বারান্দা-ঝোলা সারি সারি বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম ভিক্টোরীয় যুগের সুশোভিত বাড়িগুলির একটিতে·বাচ্চাদের পার্টি জমেছে— কচিগলায় হুল্লোড় আর পিয়ানোর বাজনা শোনা যাচ্ছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটা প্রকাণ্ড দরজার সামনে তুলে ধরল হোমস।

বললে, 'আরে সর্বনাশ! এ দেখছি কঠিন ব্যাপার। তালা আর খিল— দুটো খুলতে হবে। তার চাইতে চলো উঠোনে ঢুকে পড়ি— পাশের খিলেন দিয়ে ঢোকা যাবে।'

পাঁচিল টপকে উঠোনে ঢুকতে-না-ঢুকতেই মাথার ওপর কুয়াশার মধ্যে টহলদার চৌকিদারের ভারী বুটের আওয়াজ শুনলাম। ধীর ছন্দের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। যন্ত্রপাতি নিয়ে হেঁট হয়ে দরজার সামনে বসল হোমস। কসরত করল কিছুক্ষণ। কটাং করে আওয়াজ হল একটা। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও— পেছনে আমি। লণ্ঠন জ্বালিয়ে কার্পেটহীন সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা নীচু জানলার সামনে।

'ওয়াটসন, এই সেই জানলা,' বলে দু-হাট করে খুলে দিল পাল্লা। ঠিক তখনই চাপা গুমগুম ঝনঝন আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে— ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল ছুটন্ত যন্ত্রযানের বিকট আওয়াজ— উল্কাবেগে জানলার ঠিক নীচ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল একটা ট্রেন। গোবরাটে লণ্ঠন রেখে জানলার ফ্রেম খুঁটিয়ে দেখল হোমস। ধোঁয়ার ভুসো লেগে কালো হয়ে গেলেও জায়গায় জায়গায় ঘষা লেগে ভুসো উঠে গেছে।

'ওয়াটসন, এখন বুঝলে তো, লাশটা রাখা হয়েছিল এই জানলায়। আরে, আরে, এ যে রক্তের দাগ!' কাঠের ফ্রেমের এক জায়গায় এক বিবর্ণ দাগ দেখিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল হোমস। 'এই দেখ, সিঁড়ির পাথরের ওপর রক্তের দাগ। যাক, অনুমানটা হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল। এবার একটা ট্রেন জানলার তলায় না-দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। টানেলের মধ্যে থেকে গুড়গুড় গুমগুম শব্দে নক্ষত্রবেগে একটা ট্রেন বেরিয়ে এসেই গতি মন্থর করে দিলে এবং ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল জানলার নীচে। একটা কামরার ছাদ রইল জানলার ঠিক চার ফুট দূরে। আস্তে করে পাল্লা বন্ধ করে দিল হোমস।

'ওয়াটসন, অভিযান তাহলে ব্যর্থ হল না বল?'

দারুণ কাজ করলে! বুদ্ধি যুক্তির এতবড়ো চমক এর আগে কখনো দেখাওনি। আগের সব কীর্তি আজ তুমি ছাড়িয়ে গেলে!

'উঁহু, ওই ব্যাপারটিতে এক মত হতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। ওই লাশ ট্রেনের ছাদে ছিল, এই ধারণাটা মাথায় আনার পর থেকে বাকিটুকু ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে— তবে আসল কাজের এখনও বাকি। এসো।'

রান্নাঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরতলায়। খাবার ঘরটা ন্যাড়া বললেই চলে— আসবাবপত্র বিশেষ নেই। শোবার ঘরও তথৈবচ। পাশের ঘরটা পড়াশুনার ঘর— রাশিরাশি বই আর পত্রিকা ছড়ানো। হোমস ড্রয়ারের পর ড্রয়ার টেনে, কাগজপত্র হাঁটকে চলল এক মনে— একঘণ্টা পরে উঠে দাঁড়াল খালি হাতে।

বললে, 'পাক্কা শয়তান। চিঠিপত্র সব নষ্ট করে গেছে। এইটাই আমাদের শেষ ভরসা।' লেখবার টেবিলে একটা ছোট্ট টিনের ক্যাশবাক্স তুলে নিয়ে বাটালির চাড় মেরে খুলে ফেলল ডালাটা। কতকগুলো পাকানো কাগজ বেরোল ভেতর থেকে। কোনোটাতে লেখা 'জলের চাপ', কোনোটায় 'প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে জলের চাপ'— নিঃসন্দেহে ডুবোজাহাজ সম্পর্কিত কাগজপত্র। অসহিষ্ণুভাবে ছুড়ে ফেলে দিল হোমস। একদম তলায় পাওয়া গেল একটা খাম। ভেতরের বস্তুগুলো টেবিলের ওপর ছেড়ে ফেলতেই আশার আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল মুখখানা।

'আরে, আরে, এ যে দেখছি "হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ" কলমে ছাপা কতকগুলো বিজ্ঞাপনের কাটিং। পর পর সাজানো[১২]— কিন্তু তারিখ নেই। ডেলি টেলিগ্রাফ কাগজ। পৃষ্ঠার ডান হাতি ওপরের কোণ। প্রথমটা এই :

"শিগ্‌গিরই খবর শোনার আশায় রইলাম। শর্তে রাজি। কার্ডে লেখা ঠিকানায় বিশদ লিখুন।— পিয়েরট।"

"তারপর : 'বড়ো জটিল— বোঝা যাচ্ছে না। আরও খোলা রিপোর্ট চাই। জিনিস পেলেই বিনিময়ে যা দেবার দেওয়া হবে।— পিয়েরট।'

"এর পরে : 'পরিস্থিতি খুবই জরুরি। চুক্তি রক্ষে না হলে কথা ফিরিয়ে নেব। চিঠিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন। বিজ্ঞাপনে জানাব রাজি আছি— পিয়েরট।'

"সবশেষে : 'সোমবার রাত ন-টার পর। দু-বার টোকা। শুধু আমরা। সন্দিগ্ধ হবেন না। জিনিস পেলে নগদ টাকা।— পিয়েরট।'

'বাঃ, রেকর্ড তো দেখছি শেষ পর্যন্তই আছে! সবার শেষে আসল আদমিটাকে ধরতে পারলেই মণিকাঞ্চন যোগ হয়।' বলে টেবিলে টকাটক করে আঙুলের বাদ্যি বাজিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল হোমস ঘাড় হেঁট করে। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে— 'ঠিক আছে। খুব একটা মুশকিল হবে না। ওয়াটসন, ডেলি টেলিগ্রাফের অফিসে ঢুঁ মেরে যাই।'

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে নেমন্তন্ন রাখতে এলেন মাইক্রফট হোমস আর লেসট্রেড। গতকালের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করল শার্লক হোমস। চোরের মতো বাড়িতে ঢোকা হয়েছে শুনে ব্যাজার মুখে ঘাড় নাড়ল লেসট্রেড।

বললে, 'মি. হোমস, এইসব বেআইনি কাজ করেন বলেই টেক্কা মারেন আমাদের ওপর। একদিন কিন্তু আপনার এই বন্ধুটিকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন বলে দিলাম।'

'কী হে ওয়াটসন? দেশের জন্যে না হয় শহিদই হওয়া গেল? মাইক্রফট তোমার কী মত?'

'চমৎকার কাজ করেছিস, শার্লক, অপূর্ব খেল দেখিয়েছিস। কিন্তু লাভটা কী হল?'

টেবিল থেকে ডেলি টেলিগ্রাফটা তুলে নিয়ে হোমস বললে, 'আজকের কাগজে পিয়েরটের বিজ্ঞাপনটা দেখনি?'

'সেকী রে! আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে?'

'এই তো : আজ রাতে। একই সময়। একই জায়গায় দু-বার টোকা। খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত। পিয়েরট।'

লাফিয়ে উঠল লেসট্রেড, 'কেয়া বাত! এ-বিজ্ঞাপনের জবাবে শ্রীমান এলেই ক্যাঁক করে ধরব আমি।'

'সেইজন্যেই তো বিজ্ঞাপনটা দিলাম খবরের কাগজে। তোমরা দুজনেই আজ রাত আটটায় এসো কলফিল্ড গার্ডেন্সে।'

ভেবে যখন আর কোনো লাভ নেই, তখন ভাবনাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মনকে ছুটি করে দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শার্লক হোমসের। তখন সে ব্যস্ত থাকে— কূট সমস্যার ছায়াপাতও ঘটতে দেয় না মনের মধ্যে। ঝট করে ওভাবে নির্লিপ্ত হওয়ার অসাধারণ মনোবল আমার নেই বলেই সমস্ত দিনটা অপরিসীম স্নায়বিক উত্তেজনায় ছটফট করলাম আমি। রাত আটটার সময়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম গ্লসেস্টার রোড স্টেশনে লেসট্রেড আর মাইক্রফটের সঙ্গে একত্র হয়ে। ওবারস্টিনের উঠোনের দরজা খুলে রাখা হয়েছিল গতরাতে। কিন্তু রেলিং টপকে ঢুকতে কিছুতেই রাজি হলেন না মাইক্রফট— বাধ্য হয়ে আমি ভেতরে গিয়ে হল ঘরের দরজা খুলে দিলাম। ন-টা নাগাদ চার মূর্তিমান ওত পেতে রইলাম পড়বার ঘরে।

একটা একটা করে কাটল দুটো ঘণ্টা। রাত এগারোটার সময়ে মনে হল, বৃথা চেষ্টা। মিনিটে দু-বার করে ঘড়ি দেখছেন মাইক্রফট আর লেসট্রেড। নিষ্কম্প নির্বিকারভাবে আধবোজা চোখে বসে হোমস— অনুভূতি কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়— অত্যন্ত প্রখর। আচমকা এক ঝটকায় সিধে করল মাথা।

বলল, 'আসছে।'

পা টিপেটিপে কে যেন চলে গেল দরজার সামনে দিয়ে। ফিরে এল একটু পরে। খসখস শব্দ শুনলাম দরজার সামনে। তারপরেই দু-বার কড়া বাজানোর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল কানে। হোমস আমাদের নিরস্ত করে নিজেই উঠে এল। টিমটিম করে গ্যাসের বাতি জ্বলছিল হল ঘরে। দরজা খুলে দিতেই সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকল একটা কৃষ্ণমূর্তি— দরজা বন্ধ করে দিল হোমস। শুনলাম চাপা গলায় বলছে, 'এদিকে।' কৃষ্ণমূর্তি এসে দাঁড়াল আমাদের ঘরে— পেছন পেছন ঘরে ঢুকেই ঝট করে দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল হোমস। কৃষ্ণমূর্তি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে পেছন ফিরে দাঁড়াতেই হোমস খপ করে তার কলার চেপে ধরে আসুরিক শক্তিবলে ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের মেঝেতে। লোকটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। আছড়ে পড়ায় চওড়া কিনারা টুপি ঠিকরে গেল মাথা থেকে— ঠোঁটের ওপর থেকে সরে গেল মাফলার। বেরিয়ে পড়ল একটা সুদর্শন মুখ— একগাল হালকা রঙের দাড়ি। কর্নেল ভ্যালেনটাইন ওয়ালটার।

বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

'ওয়াটসন, কী গাধা আমি! এর কথা তো একদম ভাবিনি আমি।'

'কে এ?' সাগ্রহে শুধোন মাইক্রফট।

'সাবমেরিন ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্তা স্যার জেমস ওয়ালটারের ছোটোভাই। জ্ঞান ফিরে আসছে দেখছি। ওঁকে জেরা করার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

লম্ববান দেহটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলাম একটা সোফায়। একটু পরেই উঠে বসলেন কর্নেল। ভয়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে এমনভাবে কপালে হাত দিলেন যেন স্বপ্ন দেখছেন কি না বুঝতে পারছেন না।

বললেন, 'এ আবার কী? আমি তো এসেছি মিস্টার ওবারস্টিনের সঙ্গে দেখা করতে।'

হোমস বললেন, 'কর্নেল ওয়ালটার, হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে আপনার। সব কীর্তিই আমরা জেনে ফেলেছি। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যে এত নীচে নামতে পারেন, ভাবাও যায় না। ওবারস্টিনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী ধরনের এবং কী জাতীয় চিঠি লেখালেখি করেছিলেন, সব আমরা জানি। ক্যাডোগেন ওয়েস্ট ছোকরা মারা গেছে কী পরিস্থিতিতে, তাও অজানা নয়। এখন একটু প্রায়শ্চিত্ত করুন। কুকর্ম স্বীকার করুন। কয়েকটা কথা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

গুঙিয়ে উঠে দু-হাতে মুখ ঢাকা দিলেন কর্নেল। কথা বললেন না। আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম।

হোমস বললে, 'কর্নেল ওয়ালটার, বিশ্বাস করুন, আমরা সব জানি। আমরা জানি আপনার টাকার দরকার হয়েছিল, দাদার চাবি নকল করেছিলেন, ওবারস্টিনের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছিলেন— ওবারস্টিন আপনার চিঠির জবাব দিত ডেলি টেলিগ্রাফে বিজ্ঞাপন দিয়ে। আমরা জানি সোমবার রাত্রে কুয়াশায় গা ঢেকে আপনি অফিসে গিয়েছিলেন, ক্যাডোগেন ওয়েস্ট আপনাকে দেখে ফেলেছিল— কোনো কারণে আপনাকে আগে থেকেই ও সন্দেহ করেছিল। আমরা জানি, ও আপনাকে নকশা চুরি করতে দেখেছে— কিন্তু বাধা দেয়নি খাঁটি ভদ্রলোকের মতোই এই ভেবে যে নকশা নিয়ে আপনি হয়তো লন্ডনে দাদার কাছে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার পেছন ছাড়েনি। আপনি যখন এ-বাড়িতে ঢুকলেন— তখন সে বাগড়া দিয়েছে। কর্নেল ওয়ালটার, তখন আর শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়— আরও একটা বড়ো অপরাধে আপনি জড়িয়ে পড়লেন— নররক্তে হাত রাঙালেন।'

'আমি না! আমি না। বিশ্বাস করুন আমি খুন করিনি!' ককিয়ে উঠলেন কর্নেল।

'তাহলে ক্যাডোগেনের লাশ ট্রেনের ছাদে শুইয়ে দেওয়ার আগে তাকে খুন করা হয়েছিল কীভাবে?'

'নিশ্চয় বলব। সব বলব। স্টক এক্সচেঞ্জের দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওবারস্টিন আমাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খুনটা আমি করিনি।'

'তাহলে?'

'ক্যাডোগেন আমাকে আগে থেকেই কেন জানি না সন্দেহ করে বসেছিল। ও যে আমার পেছন পেছন এ-বাড়ি এসেছে— আমি জানতামই না। দরজায় দু-বার টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই পেছন পেছন ঝড়ের মতো ক্যাডোগেন ঢুকে পড়ল— ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল হল ঘরে। ওবারস্টিনের কাছে একটা পিস্তল থাকত। সেই পিস্তল দিয়ে ওর মাথায় মারতেই আছড়ে পড়ল মেঝেতে— মারা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে। তারপর বুদ্ধিটা এল ওবারস্টিনের মাথায়। বললে, 'ট্রেনের মাথায় লাশ ফেলে দেব। তার আগে দেখে নিই কী-কী নকশা এনেছেন!' দশটা নকশার মধ্যে তিনটে রেখে দিলে। বললে, 'বড্ড

টেকনিক্যাল— কপি করা যাবে না।' আমি বললাম, 'তা হবে না। আজ রাতেই সব কাগজ ফেরত দিতে হবে। নইলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।' ও বললে, 'কপি করা অসম্ভব।' আমি বললাম, 'তাহলে দশটা কাগজই ফেরত নিয়ে যাব।' ও তখন বললে, 'তার চাইতে এক কাজ করা যাক। সাতটা কাগজ এই ছোকরার পকেটে পুরে ট্রেনের ছাদে লাশ ফেলে দেওয়া যাক। পুলিশ জানবে ছোকরাই নকশা সরিয়েছে।' রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। একটা ট্রেন দাঁড়াল জানলার তলায়। দারুণ কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ক্যাডোগেনের লাশ শুইয়ে দিলাম একটা কামরার ছাদে। এ-ব্যাপারে এর বেশি আমি আর জানি না।'

'আপনার দাদা?'

'একটা কথাও বলেনি। তবে চাবি নেওয়ার সময়ে একবার আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। সন্দেহ করত তখন থেকেই। চোখ দেখে বুঝেছি এ ব্যাপারে ও আমাকে সন্দেহ করেছে। তাই আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি!'

ঘর নিস্তব্ধ। তারপর মাইক্রফট হোমস বললেন, 'ক্ষতিপূরণ করুন। শাস্তির বহর কমে যাবে।'

'কী ক্ষতিপূরণ করতে হবে বলেন?'

'ওবারস্টিন নকশা নিয়ে এখন কোথায়?'

'জানি না।'

'ঠিকানা দেয়নি?'

'বলেছিল প্যারিসের হোটেল দ্য লুভরে চিঠি লিখলেই ওর কাছে পৌঁছে যাবে।'

শার্লক হোমস বললে, 'ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ তাহলে এখনও পাবেন।'

'যা করতে বলবেন, তাই করব। লোকটার ওপর আমার তিলমাত্র মমতা নেই। ওর জন্যেই আমার আজ এই অবস্থা।'

'বসুন এখানে। এই নিন কাগজ কলম। যা বলছি লিখে যান। খামের ওপর যে-ঠিকানা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেই ঠিকানা লিখুন। ঠিক আছে। এবার লিখুন চিঠি, ''মহাশয়— নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কাগজপত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নেই। আমার কাছে নকলটা আছে। প্ল্যানটা নইলে সম্পূর্ণ হবে না। এর জন্যে নতুন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে— তাই আরও পাঁচ হাজার দিতে হবে। ডাকযোগে নকশা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না— টাকাটা নোট বা গিনিতে নেব— চেক নয়। এ সময়ে এদেশ ছেড়ে আপনার কাছে গেলে লোকের সন্দেহ হবে। তাই, শনিবার দুপুরে শেরিংক্রস হোটেলের ধূমপান করার ঘরে আপনার জন্যে বসে থাকব। ইংলিশ নোট বা গিনি নেব— অন্য দেশের নয়।' 'ঠিক আছে, ওতেই হবে। এরপরেও যদি শয়তানটা না-আসে তো খুবই অবাক হব।'

সত্যিই কাজ হল! সে এক ঐতিহাসিক কাণ্ড— গুপ্ত ইতিহাস যদিও। নকশা সম্পূর্ণ করার লোভে ফাঁদে পা দিলে ওবারস্টিন— এখন পনেরো বছরের মেয়াদে[১৩] ঘানি ঘোরাচ্ছে ব্রিটিশ জেলখানায়। তার ট্রাঙ্কে পাওয়া গেছে ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যান— ইউরোপের নানান দেশের নৌদপ্তরের কর্তাদের নিলাম ডেকে বিক্রি করবে বলে তুলে রেখেছিল।

কর্নেল ওয়ালটারকেও জেলে যেতে হয়েছিল— তবে বছর দুয়েক পরে জেলেই মারা যান।

হোমস আবার তন্ময় হল প্রবন্ধ লেখা নিয়ে। মাঝে একটা দিন কাটিয়ে এল উইন্ডসরে। ফিরে এল একটা ভারি সুন্দর পান্না বসানো টাই-পিন নিয়ে। জিজ্ঞেস করতে মুচকি হেসে বললে, এক ভদ্রমহিলা দিয়েছেন— তাঁর নাকি একটা উপকার করেছে হোমস। এর বেশি কিছু না-বললেও ভদ্রমহিলার নামটা আঁচ করতে কষ্ট হয়নি আমার। এও জানি যে ওই টাই-পিন দেখলেই ব্রুস-পার্টিংটন নকশাঘটিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি জাগ্রত হবে বন্ধুবর শার্লক হোমসের স্মৃতিপটে চিরকালের জন্য।

টীকা

১. **নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ১২ ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **ট্রাম :** সেকালের ট্রাম ঘোড়ায় টানত।

৩. **জীবনে একবারই সে এসেছিল :** সে-ঘটনা 'দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার' গল্পের। তা ছাড়াও 'দ্য এমটি হাউজ' গল্পের বর্ণনাতে মাইক্রফটের বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের খবর পাওয়া যায়।

৪. **উলউইচ আর্সেনাল :** উলউইচের রয়্যাল আর্সেনাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৫ সালে। রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমি এবং রয়্যাল আর্টিলারি হল আর্সেনালের অংশ। আর্সেনালে বন্দুক, কার্তুজ, অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া গান-ক্যারেজ এবং ওয়াগন নির্মিত হত।

৫. **কামরার মধ্যে নিজেই ফেলে দিয়েছে :** হতেই পারে না। কারণ তৎকালীন নিয়মে যাত্রাশেষে যাত্রীকে টিকিট দেখাতে হত, জানিয়েছেন লেসলি ক্লিংগার এবং অন্য কয়েকজন।

৬. **ড্রেস-সার্কল :** থিয়েটারে সর্বনিম্ন ব্যালকনির এই আসনের দর্শকদের সান্ধ্য-পোশাক পরিধান সেকালে বাধ্যতামূলক ছিল।

৭. **শ্যাম দেশ :** সিয়াম বা বর্তমান থাইল্যান্ড হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র দেশ যেখানে কোনো ইউরোপীয় উপনিবেশ কায়েম হয়নি।

৮. **প্রধানমন্ত্রীর ছটফটানি দেখে :** ১৮৯৫-এ লর্ড সলসবেরি ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

৯. **সাবমেরিন :** প্রথম সাবমেরিন নির্মিত হয় ১৬২০ সালে ইংলন্ডে। নির্মাতা এক ওলন্দাজ ব্যক্তি। এই জলযানকে আরও উন্নত রূপ দেন রবার্ট ফুলটন। ১৮৮০ সালে রবার্ট ডবল্যু. গ্যারেট নামে এক ইংরেজ কয়লার বয়লারের সাহায্যে চালিত সাবমেরিন তৈরি করেন। ইলেকট্রিক মোটরচালিত জলের নীচে চলবার যান নির্মিত হয় ১৮৮৬-তে। অ্যান্ড্রু ক্যাম্পবেল এবং জেমস অ্যাশ নামক দুই ইংরেজের নকশা মোতাবেক। ১৮৯৫ নাগাদ জন পি. হল্যান্ডের নকশায় 'প্লাঞ্জার' নামক সাবমেরিন নির্মাণের পরিকল্পনা হলেও সেই নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি। যেমন হয়নি ব্রুস-পার্টিংটনের নকশায় কোনো ডুবোজাহাজের নির্মাণ।

১০. **সমস্যাটা আন্তর্জাতিক :** কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন ১৮৯০-এ জার্মান চ্যান্সেলর অটো ফন বিসমার্ককে বরখাস্ত করে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের জার্মানির নৌশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে ব্রুস-পার্টিংটন নকশা চুরি যাওয়ার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে।

১১. **লা রোথিয়েরে :** রোথিয়েরে এবং ওবেরস্টিনের উল্লেখ পাওয়া যায় 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন' গল্পে।

১২. **পর পর সাজানো :** ডেলি টেলিগ্রাফের কাটিংগুলো রেখে দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না ওবেরস্টিনের। তাহলে সে ওগুলো ওভাবে সাজিয়ে রাখল কি শার্লক হোমসের সুবিধার জন্য? প্রশ্ন তুলেছেন হোমস-গবেষক ডি মার্টিন ডেকিন।

১৩. **পনেরো বছরের মেয়াদে :** নৃশংস খুন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা মাত্র পনেরো বছর হতেই পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায়[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডাইং ডিটেকটিভ]

শার্লক হোমসের বাড়িউলি মিসেস হাডসন বেচারির হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছিল ওইরকম একখানা ভাড়াটেকে বাড়িতে ঢুকিয়ে। একে তো রাজ্যের আজেবাজে লোক হানা দিয়েছে দোতলার ফ্ল্যাটে, তার ওপর ভাড়াটের সৃষ্টিছাড়া খ্যাপামি আর উলটোপালটা অভ্যেসের দরুন নিশ্চয়ই ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন ভদ্রমহিলা।

একদিকে যেমন অবিশ্বাস্য রকমের অগোছালো, অন্যদিকে তেমনি রাতবিরেতে গান-বাজনার গিটকিরি। এ ছাড়াও আছে ঘরের মধ্যে বসে রিভলভার ছুড়ে হাত পাকানো আর দুর্গন্ধময় বৈজ্ঞানিক গবেষণা। সর্বোপরি সবসময়ে বিপদ আর দাঙ্গাহাঙ্গামার হাওয়ায় সারাবাড়ি যেন থমথমে। সব মিলিয়ে এত জঘন্য ভাড়াটে সারালন্ডন শহরে আর দুটি নেই। পক্ষান্তরে টাকাকড়ি দেওয়ার ব্যাপারে রাজারাজড়ার মতো দিলখোলা হোমস[২]। এত টাকা ভাড়া বাবদ সে গুনেছে, আমার তো মনে হয়, সে-টাকায় অনায়াসেই বাড়িটা কিনে নিতে পারত সে।

গা জ্বালানো অভ্যেস আর সৃষ্টিছাড়া খ্যাপামি সত্ত্বেও ভাড়াটেকে যমের মতো ভয় করেন মিসেস হাডসন, ভুলেও কখনো নাক গলান না ওর ব্যাপারে। তবে ভালোও বাসেন। কেননা মেয়েদের মন জয় করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল হোমসের। অদ্ভুত সৌজন্য আর কোমল শিষ্টাচার দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারত যেকোনো মহিলাকে। মেয়েদের কিন্তু পছন্দ করত না, বিশ্বাস করত না— অথচ ছিল আশ্চর্য রকমের নারীপ্রিয়। শার্লক হোমস যে মিসেস হাডসনের শ্রদ্ধার পাত্র, আমি তা জানতাম বলেই আমার বিয়ের দ্বিতীয় বছরে যখন ভদ্রমহিলা আমার বাড়ি বয়ে এসে বন্ধুবরের মুমূর্ষু অবস্থা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন উৎকর্ণ হয়ে না-শুনে পারলাম না।

মিসেস হাডসন বললেন, 'আপনার বন্ধু যে মরতে চলেছেন, ডক্টর ওয়াটসন! তিন দিন ধরে তিল তিল করে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে, আর একটা রাত পেরোবেন বলে মনে হয় না। ওদিকে ডাক্তারও আনতে দেবেন না আমাকে। আজ সকালে মুখ-চোখের চেহারা দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, "মি. হোমস, আপনি বলুন চাই না-ই বলুন, আমি চললাম ডাক্তার ডাকতে।" উনি শুনে বললেন, "তাহলে বরং ওয়াটসনকেই ডাকুন।" তাই দৌড়াতে দৌড়াতে আসছি। এখুনি চলুন, দেরি করলে আর জ্যান্ত দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ।'

ভীষণ ভয় পেলাম। হোমসের শরীর যে এত খারাপ হয়েছে, কিছুই জানতাম না। কোট আর টুপি নিয়ে রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ। গাড়িতে যেতে যেতে শুনলাম বাকি কাহিনি।

'আমিও কি ছাই সব জানি!' মিসেস হাডসন বললেন, 'নদীর ধারে রোদারহিদেব গলিতে কী-একটা মামলা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন উনি। ধুঁকছেন বুধবার বিকেল থেকে। বিছানা থেকে একদম উঠছেন না। এই তিনটে দিন একফোঁটা জল পর্যন্ত খাননি, দাঁতেও কিছু কাটেননি।'

'গুড গড! ডাক্তারকে খবর দেননি কেন?' অবাক হয়ে শুধোলাম।

'দিতে দিলে তো? জানেনই তো, উনি কারো কথায় চলেন না, সবাই চলে ওঁরই কথায়।

কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়, হয়ে এল মি. হোমসের! মুখের চেহারা দেখলেই বুঝবেন।'

নভেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে দেখলাম সেই শোচনীয় দৃশ্য। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে শার্লক হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি। কোটরাগত দুই চক্ষুর চাহনি আমার ওপর নিবদ্ধ হতেই মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিউরে উঠল আমার। এ কী দেখছি আমি? এই কি আমার প্রিয়বন্ধু শার্লক হোমস? এ কী হাল হয়েছে তার? ঠোঁটের দুই কোণে কালচে ফেনা জমে গেছে, জ্বরের ঘোরে চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে, গাল লাল হয়ে গেছে দেহের উত্তাপে, লেপের ওপর হাড়-বার-করা হাতের আঙুল বিকারগ্রস্ত রুগির মতো থরথর কাঁপছে, মোচড় খাচ্ছে বিরামবিহীনভাবে, থেকে থেকে গলা থেকে দমকে দমকে ব্যাঙের ডাকের মতো কোঁ-কোঁ কাতরানি ঠিকরে আসছে। আমি ঘরে ঢুকতেই আমায় চিনতে পেরেছে মনে হল, ঈষৎ উজ্জ্বল হল দুই চক্ষু।

বললে সে ক্ষীণ কণ্ঠে, 'ওয়াটসন, সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে।'

'ভাই হোমস!' রুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলি বলে ওর দিকে এগোতেই চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'কাছে এস না! কাছে এস না। এলে কিন্তু দূর করে দেব বাড়ি থেকে।'

সংকটে পড়লে চিরকালই এমনি তুঘলকি মেজাজ দেখায় হোমস।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, 'কিন্তু কেন?'

'কেন আবার? আমার ইচ্ছা, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

ঠিকই বলেছেন মিসেস হাডসন। আগের মতোই হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে হোমস— কারো হুকুমে চলতে সে রাজি নয়। কিন্তু এই ছোট্ট হুকুমটা চালাতে গিয়ে যেভাবে বেদম হয়ে পড়ল যে দেখে বড়ো কষ্ট হল।

'যা বলি, তা-ই করো। তাতেই বেশি কাজে লাগবে!'

'বেশ তো, বলো।'

একটু নরম হল যেন হোমস। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললে, 'রাগ করলে না তো?'

হায় রে! ওই অবস্থায় কাউকে দেখে তার ওপর রাগ করা যায়?

কোঁ-কোঁ করতে করতে ফের বলল সে, 'তোমার ভালোর জন্যেই কাছে আসতে বারণ করলাম।'

'আমার ভালোর জন্যে?'

'হ্যাঁ। আমি তো জানি আমার কী হয়েছে। সুমাত্রার[৩] কুলিদের[৪] রোগ। মারাত্মক, কেউ বাঁচে না। আর সাংঘাতিক ছোঁয়াচে। ওলন্দাজরা খবর রাখে এ-রোগের, কিন্তু বাঁচবার পথ আজও বের করতে পারেনি।' হাড়-বার-করা আঙুল নাড়তে নাড়তে জ্বরের ঘোরে অতিদ্রুত যেন প্রলাপ বকে চলল হোমস, 'খবরদার কাছে আসবে না। দারুণ ছোঁয়াচে রোগ। দূরে থাকো।'

'হোমস, ছোঁয়াচে রোগ বলে আমার কর্তব্য করতে দেবে না? অচেনা মানুষও যদি ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আসে তো ডরাই না, আর তুমি হলে আমার কদ্দিনের বন্ধু!' বলে যেই আবার এগোতে গেছি বিছানার দিকে, গনগনে চোখে কটমট করে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল হোমস, 'আর এক পা এগোলে তাড়িয়ে দেব ঘর থেকে, একটা কথাও আর বলবে না।'

হোমসকে আমি বরাবরই অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি বলে কখনো তার হুকুমের উলটো কাজ করি না, তা সে যত অপ্রিয় আদেশই হোক না কেন। কিন্তু এ-ব্যাপারটা আলাদা। এখন তার গুরুগিরি মানতে আমি রাজি নই, রুগির ঘরে ডাক্তারই গুরু— আমিই এখন তার মনিব। কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। বললাম, 'হোমস, তুমি এখন অসুস্থ, মোটেই ধাতস্থ নও। অসুখে পড়লে রুগিমাত্রই শিশু হয়ে যায়। তখন তাকে সেইভাবেই চিকিৎসা করতে হয়। কাজেই এখন তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ধার ধারি না আমি, তোমার নাড়ি আমাকে দেখতেই হবে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থাও করতে হবে।'

বিষ মাখানো চোখে চাইল হোমস। বললে, 'তাহলে এমন ডাক্তার ডাকব, যার ওপর আমার আস্থা আছে।'

'তার মানে আমার ওপর তোমার আস্থা নেই?'

'তোমার বন্ধুত্বে আস্থা আছে, ডাক্তারি বিদ্যেতে নেই। সামান্য জেনারেল প্র্যাকটিশনার তুমি, সীমিত অভিজ্ঞতা আর অতি মামুলি ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি কর। জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে শুনতে, কিন্তু বলতে তুমিই বাধ্য করলে।'

মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'হোমস, তোমার মুখে এ-কথা কোনোদিন শুনব ভাবিনি। বেশ, আমার বিদ্যেবুদ্ধিতে যদি তোমার আস্থা না-থাকে, তো লন্ডন শহরের সেরা ডাক্তারদের ডেকে আনছি। স্যার জ্যাসপারসিক বা পেনরোজ ফিশার বা বিখ্যাত কোনো বিশেষজ্ঞকে এখুনি ডেকে আনছি। কিন্তু চোখের সামনে এভাবে তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না।

যেন গুঙিয়ে উঠল হোমস, যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমার আবেগরুদ্ধ এই কথায়। বললে, 'তাহলে হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার বিদ্যের দৌড় কত কম। তাপানুলি জ্বরের নাম কখনো শুনেছ? জান কি ব্ল্যাক ফরমোশা ব্যাধি কাকে বলে?'

'জীবনে নাম শুনিনি[৫]।'

'প্রাচ্যদেশে এইরকম অনেক অজানা ভয়ংকর রোগ আছে, ওয়াটসন। কেউ তার খবর রাখে না। আমি জেনেছি রোগগুলো অপরাধ-সংক্রান্ত বলেই। তদন্ত করতে গিয়ে নিজেই রোগে পড়েছি।' প্রত্যেকটা শব্দ অতি কষ্টে থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে কোনোমতে বলল হোমস, 'তাই বলছিলাম, তুমি পারবে না আমাকে ভালো করতে।'

'বেশ তো, ট্রপিক্যাল রোগে সেরা বিশেষজ্ঞ ডক্টর এইন্সট্রে এখন লন্ডনে আছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপও আছে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না-করে চললাম তাঁকে ডাকতে।' বলে পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

এ-রকম শক জীবনে পাইনি। আচম্বিতে মৃত্যুপথের পথিক শার্লক হোমস বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে, আমার আগেই ছিটকে গেল দরজার সামনে, কড়াৎ করে দরজায় চাবি দিয়ে চাবিটা হাতে নিয়ে ফের গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানায়। প্রাণশক্তির আচমকা বিস্ফোরণে হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে সে নেতিয়ে রইল শয্যায়।

খানিক বাদে বললে, 'ওয়াটসন, এখন চারটে বাজে। ঠিক ছ-টার সময় ছাড়া পাবে ঘর থেকে। চাবিটা গায়ের জোরে কাছ থেকে নিতে যেয়ো না, যেখানে আছে, সেখানেই থাক।'

'হোমস, এ যে বদ্ধ পাগলামি!'

'কথা দিচ্ছি, ঠিক দু-ঘণ্টা পরে তোমায় ছেড়ে দেব। ঠিক ছ-টায়। রাজি?'

'রাজি না হয়ে আর তো উপায় দেখছি না।'

'কাছে এস না। দূরে থাকো। শোনো, লন্ডন শহরে একজনই আমাকে আরাম করতে পারে। যার নাম বলব, তুমি তার কাছে যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে। ছ-টা পর্যন্ত বই পড়ো। এখন আর কথা বলবার শক্তি আমার নেই। ঠিক ছ-টায় আবার কথা বলব।'

কিন্তু তার আগেই আবার প্রাণশক্তি আর বাক্যশক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাড়ল মরণপথের পথিক শার্লক হোমস। আঁতকে উঠলাম তার বজ্রনাদে। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

চেয়ে দেখি মুখ পর্যন্ত লেপ চাপা দিয়ে বোধ হয় ঘুমুচ্ছে হোমস।

মনের এই অবস্থায় বই পড়া যায় না। তাই ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে ঝোলানো কুখ্যাত ক্রিমিনালদের ছবি দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছোলাম ম্যান্টলপিসের সামনে। দেখলাম, খানকয়েক পাইক, তামাকের থলি, ইঞ্জেকশন নেওয়ার সিরিঞ্জ[৬], কাগজকাটা ছুরি, রিভলভারের কার্তুজ এবং অন্যান্য হাবিজাবি জিনিসের স্তূপের মধ্যে পড়ে আছে একটা সাদা-কালো আইভরি কৌটো। হাতির দাঁতের ভারি সুন্দর কৌটোটা দেখে যেই সেদিকে হাত বাড়িয়েছি, অমনি বিকট বীভৎস একটা চিৎকারে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ভয়াবহ সেই আর্তনাদ রাস্তার লোকেও শুনেছিল নিশ্চয়। মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল আমার অবর্ণনীয় সেই আর্তনাদে। ফিরে দেখি, বিকৃত উন্মত্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার মুমূর্ষু বন্ধু। কৌটোটা হাতে নিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি স্থাণুবৎ।

একটু বাদেই হোমসের হুমকি কানে এল, 'নামিয়ে রাখ ওয়াটসন, যেখানকার জিনিস এখুনি রেখে দাও সেখানে।'

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে হাবিজাবি স্তূপে কৌটোটা রেখে দিতেই পরম স্বস্তিতে পাঁজর-খালি-করা নিশ্বাস ছেড়ে ফের বালিশে এলিয়ে পড়ল হোমস। বললে, 'ওয়াটসন, আমি চাই না, আমার জিনিসপত্রে কেউ হাত দিক। তুমি তা জান, জেনেও আমাকে মারতে বসেছ! আমার সহ্যশক্তির বাঁধ ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছ! ডাক্তার হয়ে আমাকে পাগলাগারদে ঢোকানোর মতো কাজ করছ! বোসো, বোসো, বলছি। একটু জিরোতে দাও আমাকে!'

ঘটনাটা নাড়া দিয়ে গেল আমার ভেতর পর্যন্ত। হোমসের কথাবার্তা চিরকালই মাজাঘষা, মসৃণ। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর প্রচণ্ডতা, ওর ভয়াবহ উত্তেজনা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, মস্তিষ্কের সুস্থতা একেবারেই হারিয়েছে বন্ধু। শরীর যায় যাক, কিন্তু একটা উঁচুদরের মহৎ মনের এই দুরবস্থা দেখা যায় না। দু-ঘণ্টার মেয়াদ উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম চুপচাপ।

আমার মতোই ঘড়ির দিকে হোমসও নজর রেখেছিল নিশ্চয়ই। কেননা ছ-টা বাজতে-না-বাজতেই ঠিক আগের মতো জ্বরগ্রস্ত বিকারের ঘোরে উত্তেজিত গলায় বললে, 'ওয়াটসন, খুচরো পয়সা আছে পকেটে?'

'নামিয়ে রাখো ওয়াটসন, যেখানকার জিনিস এখুনি রেখে দাও সেখানে।'
ওয়াল্টার প্যাগেট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯১৩

'আছে।'

'রুপোর খুচরো?'

'বেশ কিছু?'

'আধক্রাউন ক-টা?'

'পাঁচটা!'

'মাত্তর! কী কপাল! কী কপাল! যাকগে, ঘড়ির পকেটে রাখো আধক্রাউনগুলো, বাকি খুচরো রাখো বাঁ-দিকের প্যান্টের পকেটে।... ধন্যবাদ! এতক্ষণে ব্যালেন্সে এলে তুমি।'

বদ্ধ উন্মত্ততা সন্দেহ নেই। মাথার একদম ঠিক নেই ওর। থরথর করে একবার কেঁপে উঠেই ফের কাশি আর ফোঁপানি জাতীয় অদ্ভুতভাবে কাতরে উঠল হোমস। বললে, 'গ্যাসের আলোটা

জ্বালাও ওয়াটসন। বেশি না, অর্ধেকের বেশি না। খুব সাবধান।... ঠিক আছে। চমৎকার হয়েছে। না, না, জানলার খড়খড়ি বন্ধ করার দরকার নেই। এবার দয়া করে খানকয়েক চিঠি আর কাগজ এনে আমার হাতের কাছের এই টেবিলটায় রাখ।... ধন্যবাদ! এবার ম্যান্টলপিস থেকে কিছু হাবিজাবি জিনিস এনে রাখো তো।... চমৎকার হয়েছে ওয়াটসন! চিনির ডেলা তোলার চিমটেটা ওইখানে আছে, ওটা দিয়ে আইভরি কৌটোটা তুলে এনে রাখো কাগজপত্তরের ওপর।... বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে! এবার যাও, তেরো নম্বর লোয়ার বার্ক স্ট্রিট থেকে মি. কালভার্টন স্মিথকে ডেকে আনো।'

হোমসের প্রলাপ শুনে এই অবস্থায় ওকে ফেলে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম বলেই ডাক্তার ডাকার উৎসাহ উবে গিয়েছিল আমার। যাই হোক, আগে ডাক্তারের নাম শুনে ও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছিল, এখন তবু একজনকে ডাকতে বলছে। কিন্তু এ-নাম জীবনে আমি শুনিনি। হোমসকে সে-কথা বলতে ও বললে, 'কী করে শুনবে বল! এ-রোগে পণ্ডিত বলতে যাঁকে বোঝায়, তিনি ডাক্তার নন মোটেই, চাষবাসের কাজ করেন সুমাত্রায়। খেত-খামারে বিচিত্র এই কালব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার পাওয়া সেখানে দুষ্কর। তাই নিজেই রোগটা নিয়ে গবেষণা করেন ইনি এবং বেশ কিছু মাশুল গোনবার পর ভয়ংকর এই ব্যাধির অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন মি. কালভার্টন স্মিথ। এই মুহূর্তে ইনি রয়েছেন লন্ডনে। ভদ্রলোক বড়ো গোছালো মানুষ, ঘড়ি ধরে কাজ করেন, সব ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলেন। ছ-টার আগে গেলে তাঁকে পেতে না বলেই বসিয়ে রেখেছিলাম তোমাকে। রোগটা নিয়ে উনি শখের খাতিরে গবেষণা করছেন বলেই তোমাকে পাঠাচ্ছি তাঁর কাছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবেই হোক তাঁকে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

কী কষ্টে যে এতগুলো কথা বলে গেল হোমস, চোখে না-দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রত্যেকটা শব্দ দেহ আর মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করে দু-হাতে কাঁপা আঙুল দিয়ে লেপ খামচে ধরে যেভাবে বলে গেল, তা থেকেই স্পষ্ট বুঝলাম ভেতরে ভেতরে কী সাংঘাতিক যন্ত্রণায় শেষ হয়ে আসছে শার্লক হোমস। এই দু-ঘণ্টার মধ্যে আরও অবনতি ঘটেছে ওর চেহারার— চোখ আরও কোটরে বসে গেছে, অন্ধকার গর্তের মধ্যে আগের চাইতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে উদ্ভ্রান্ত দুই চক্ষু। বিন্দু বিন্দু ঘাম চকচক করছে কালচে কপালে। কথা বলছে অবশ্য আগের মতো ঝাঁকি মেরে মেরে বাদশাহি মেজাজে। নাঃ দেখছি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর এই নবাবি মেজাজ চালিয়ে যাবে ও, কারো কাছে মাথা নোয়াবে না। ফের বললে, 'আমাকে যেভাবে দেখে গেলে, ঠিক সেইভাবে আমার দুরবস্থা ফুটিয়ে তুলবে ওঁর কাছে। বলবে, আমি মরতে চলেছি! শরীর বিছানায় মিশে গেছে, পাগলের মতো প্রলাপ বকছি। আমাকে যেরকম তোমার মনে হচ্ছে, তোমার কথায় তাঁরও যেন সেইরকম মনে হয়। আহা রে, গোটা সমুদ্রটা যদি শুক্তিতে বোঝাই হত, কী মজাই না হত তাহলে! কী বলছিলাম যেন ওয়াটসন?

'মি. কালভার্টন স্মিথের কাছে গিয়ে কী বলব, তা-ই বলছিলে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে এঁর ওপর। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবে, দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আসবে। আমার ওপর তিনি চটে আছেন। তাঁর ভাইপোর একটা ব্যাপারে একটা বিশ্রী জিনিস আমি আঁচ করেছিলাম, শেষকালে ভয়ানকভাবে

মারা যায় ছেলেটা। সেই থেকে আমার নাম পর্যন্ত সইতে পারেন না উনি। তুমি তাঁকে ঠান্ডা করবে। কাকুতিমিনতি করবে, হাতে পায়ে ধরবে, যেভাবেই হোক এখানে নিয়ে আসবে। আমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে জানবে।'

আমি আশ্বাস দিলাম, 'ঘাবড়িয়ো না বন্ধু, দরকার হলে তাঁকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসব।'

'খবরদার!' হোমস শাসিয়ে উঠল, 'এসব করতে যেয়ো না! ওঁকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেবে, আগে চলে আসবে তুমি। একসঙ্গে এস না, পইপই করে বারণ করছি, একসঙ্গে এস না। এ-ব্যাপারে ভুল যেন না হয়। তোমার ওপর আস্থা আছে বলেই বলছি এত কথা। ঠিক যেমনটি বললাম, তেমনটি করবে। আহা রে, শুক্তিগুলোর শত্রু দেখছি বেড়েই চলেছে। সারাপৃথিবীটা যদি ওরা ছেয়ে ফেলে! না, না! কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! যা বললাম, ঠিক সেইভাবে বলবে ওয়াটসন। আমি জানি, তোমাকে যা বলি, কখনো তার অন্যথা হয় না।'

পাছে বিকারের ঘোরে ফের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় হোমস, এই ভয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে এলাম। আসবার সময় দেখে এলাম একটা অসাধারণ অতুলনীয় মেধা কীভাবে কচি খোকার মতো আধো-আধো স্বরে আবোল-তাবোল বকে চলেছে আপন মনে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম, আচমকা উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণ সরু গলায় মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেছে হোমস। মিসেস হাডসনের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলাম ভদ্রমহিলা ভয়ে দুঃখে কাঁপছেন আর কাঁদছেন।

রাস্তায় নেমে শিস দিয়ে ভাড়াটে গাড়ি ডাকতেই কুয়াশার মধ্যে থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ও মশাই, মিস্টার হোমস আছেন কেমন?'

লোকটাকে চিনি; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর মর্টন। এখন গেরস্তর মতো টুইডের সুট পরে হাওয়া খাচ্ছে।

বললাম, 'খুবই খারাপ।'

অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল মর্টন। আবছা আলোয় মনে হল, যেন একটা পৈশাচিক উল্লাস চকিতের জন্যে ভেসে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে। বললে, 'হুঁ গুজবও সেইরকমই।'

গাড়ি এসে গেল, উঠে বসলাম আমি।

লোয়ার বার্ক স্ট্রিট রাস্তাটা নটিংহিল আর কেনসিংটনের মাঝামাঝি জায়গায়। সারি সারি সুন্দর বাড়ি। যে-বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল, সেটি পুরেনো আমলের লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা বেশ জমকালো ধরনের ভাঁজ-করা বিরাট পাল্লাওয়ালা দরজার বাড়ি। কপাটে চকচকে তামার কারুকাজ। ঘণ্টা বাজাতেই গম্ভীরবদন বাটলার এসে কার্ড নিয়ে গেল ভেতরে। কিন্তু আমার সামান্য নাম আর খেতাব মনঃপূত হল না মি. কালভার্টন স্মিথের, আধাখোলা দরজার মধ্যে দিয়ে শুনলাম তাঁর তীক্ষ্ণ চড়া কণ্ঠস্বর, 'লোকটা কে? কী চায়? কতবার বলব তোমাকে, আমার কাজের সময়ে যেন কেউ বিরক্ত না-করে?'

বিড়বিড় করে কী যেন সাফাই গাইল বাটলার। কিন্তু তাতে ঠান্ডা না হয়ে আরও জ্বলে উঠলেন মি. স্মিথ, চিৎকার করে বললেন, 'বলে দাও, আমি বাড়ি নেই। খুব বেশি দরকার থাকলে যেন কাল সকালে আসে। যাও। কাজের সময়ে যত উৎপাত।'

আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল বাটলার।

'যা বললাম, তা-ই বলো গিয়ে। কাল সকালে যেন আসে। কাজের সময় ঝগড়া আমি পছন্দ করি না।'

আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠল হোমসের ছটফটানি, রোগযন্ত্রণা, প্রলাপের ঘোরে উন্মত্ত আচরণ। মিনিটে আয়ুক্ষয় হচ্ছে তার, মিনিটে মিনিটে সে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। এখন আর সৌজন্য বা শিষ্টাচার দেখাবার সময় নয়। মি. স্মিথের ধমকে জবুথবু বাটলার এসে পৌঁছোনোর আগেই আমি ধেয়ে গেলাম তার পাশ দিয়ে সোজা ভেতরের পড়ার ঘরে।

আগুনের পাশে রাখা চেয়ার থেকে ভীষণ রাগের আতীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এক ব্যক্তি। হলদে মুখ, চামড়ায় অজস্র ভাঁজ, ভারী দু-পাটকরা তেলতেলে চিবুক। ঝোপের মতো ঘন বালিরঙা একজোড়া ভুরুর তলা থেকে দুটো পিলেচমকানো ধূসর চোখের গনগনে চাহনি যেন পলকের মধ্যে দগ্ধ করে দিতে চাইল আমার নশ্বর দেহকে। লোকটার মাথায় বিরাট টাকের ওপর হেলিয়ে বসানো একটা ভেলভেটের টুপি। মগজের সাইজ নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড, করোটির সাইজেই তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু অবাক হলাম সেই অনুপাতে তাঁর ছোট্ট ধড়টা দেখে। হাত-পা লিকলিকে, ছেলেবেলায় যেন রিকেটি রোগে ভুগে ডিগডিগে হয়ে গিয়েছেন।

বিষম বিকট আর্ত চিৎকারের ধরনে উনি বললেন, 'মানেটা কী? কে বলেছে আপনাকে এভাবে ঘরে ঢুকতে? বলে পাঠালাম না কাল সকালে আসবেন?'

'দুঃখিত। সময় একদম নেই। মি. শার্লক হোমস—'

নামটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে অসাধারণ পরিবর্তন এল লোকটার চোখে-মুখে, মিলিয়ে গেল ক্রোধের অভিব্যক্তি, নিমেষ মধ্যে টানটান হয়ে গেল মুখের প্রতিটি রেখা। আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হোমসের কাছ থেকে আসছেন নাকি?'

'সোজা আসছি সেখান থেকে।'

'আছে কীরকম?'

'মরতে চলেছে। ভীষণ অসুখ। সেইজন্যেই এসেছি।'

হাত নেড়ে আমাকে বসতে বলে নিজেও বসলেন ভদ্রলোক। বসতে গিয়ে তাঁর মুখটা অন্যদিকে একটু ঘুরে গিয়েছিল বলে উলটোদিকে আয়নায় দেখতে পেলাম হলদে মুখের প্রতিফলন। চোখের ভুল নিশ্চয়ই— অবিশ্বাস্য রকমের পৈশাচিক একটা উল্লাস ফুটে উঠতে দেখলাম যেন সে-মুখের পরতে পরতে। চোখের ভুলই, কেননা পরমুহূর্তেই যখন আমার দিকে ফিরলেন, তখন তাঁর মুখের চেহারায় দেখলাম আত্যন্তিক উদ্‌বেগের অভিব্যক্তি। বললেন, খুবই দুঃসংবাদ। হোমসের সঙ্গে কর্মসূত্রে একবার আলাপ হয়েছিল আমার। ওর ধীশক্তি, ওর চরিত্রকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যেমন অসুখবিসুখের শখের গবেষণা নিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলেছি, হোমস তেমনি হাজারো অপরাধ নিয়ে শখ মিটিয়ে চলেছে। ওর জীবনের লক্ষ্য দুনিয়ার পাপীকে খাঁচায় পোরা, আমার জীবনের লক্ষ্য জীবাণুদের সবংশে ধ্বংস করা। ওই দেখুন, ওদের জন্যে কেমন খাঁচা বানিয়ে রেখেছি।'

একটা টেবিলে সারি সারি সাজানো বোতল আর বয়েম দেখিয়ে উনি বললেন, 'দুনিয়ার অত্যন্ত জঘন্য কয়েকটা জীবাণু কীরকম প্রায়শ্চিত্ত করছে দেখুন জিলেটিনের মধ্যে।'

'এই কারণেই আপনার সাহায্য চায় হোমস। লন্ডন শহরে আপনি ছাড়া এ-ব্যাপারে বড়ো বিশারদ আর দ্বিতীয় নেই। আপনার ওপর অসীম শ্রদ্ধা আর আস্থা আছে বলেই ও পাঠিয়েছে আমাকে।'

চমকে উঠলেন খুদে ব্যক্তি, টাক মাথা থেকে ভেলভেটের টুপিখানা সুড়ুৎ করে পিছলে পড়ে গেল মেঝেতে। বললেন, 'আমার সাহায্য চায় হোমস, অ্যাঁ? সে আবার কী কথা? ওকে আমি সাহায্য করব কী করে তা কি বলেছে হোমস?'

'প্রাচ্যরোগে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে বলেই সাহায্য করতে পারবেন।'

'কিন্তু রোগটা প্রাচ্যমুলুক থেকে নিয়ে এসেছে, এমন ধারণাটা তার হল কেন?'

'জাহাজঘাটায় কিছু প্রাচ্যদেশীয় খালাসির সঙ্গে একটা তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল হোমসকে, তখনই সংক্রামিত হয়েছে রোগটা।'

প্রসন্ন হেসে মেঝে থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিলেন স্মিথ। বললেন, 'তা-ই নাকি? তা, ভুগছে কদ্দিন?'

'দিন তিনেক।'

'প্রলাপ বকছে কি?

'মাঝে মাঝে।'

'আরে সর্বনাশ! এ-অবস্থায় ওর পাশে না-যাওয়াটা জানোয়ারের মতো কাজ হবে। যদিও কাজের ক্ষতি হবে আমার, তাহলেও আপনার সঙ্গে আমি যাব ডক্টর ওয়াটসন।'

হোমসের নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ল আমার। বললাম, 'আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'তাহলে আমি নিজেই যাচ্ছি, ঠিকানা কাছেই আছে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

বুকভরা হতাশা নিয়ে ফিরলাম বেকার স্ট্রিটের বাসায়। ভেবেছিলাম, এইটুকু সময়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই হোমসের আরও সাংঘাতিক অবনতি দেখব। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম ওর অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে। চেহারা আগের মতোই বিবর্ণ, কিন্তু প্রলাপ আর বকছে না। কথা বলল খুব ক্ষীণ কণ্ঠে স্বভাবমতো রসিয়ে রসিয়ে, 'দেখা হল, ওয়াটসন?'

'হয়েছে। আসছেন উনি।'

'চমৎকার! তুমিই আমার সেরা দূত।'

'উনি আমার সঙ্গেই আসতে চেয়েছিলেন।'

'অসম্ভব! তা হতেই পারে না। রোগটা জুটিয়েছি কোত্থেকে জানতে চাননি?'

উত্তরে আমি যা বলেছি তা জানাতে হোমস সোল্লাসে বললে, 'ঠিক বলেছ! ওয়াটসন, খাঁটি বন্ধুর কাজ করে এলে। এবার সরে পড়ো।'

'হোমস, ওঁর মতামতটা শুনে তারপর যাব।'

'নিশ্চয়ই শুনবে। তবে কী জান, উনি প্রাণ খুলে মতামত প্রকাশ করবেন শুধু আমার সাক্ষাতে। অন্য কেউ থাকলে মন খুলে কথা বলবেন না বলেই জানি। আমার এই খাটের মাথার দিকে একটা ছোট্ট ঘর আছে, ওইখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।'

'হোমস! কী আবোল-তাবোল বকছ!'

'যা বলছি, তা-ই করো। ঘরটা লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত নয় বলেই উনি সন্দেহ করবেন না ওখানে কেউ আছে বলে। এ ছাড়া আর উপায় নেই, ওয়াটসন।'

বলতে বলতে আচম্বিতে সটান উঠে বসে হোমস বললে চাপা তীক্ষ্ণ গলায়, 'গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনছি। এসে গেলেন বলে। যাও, ওয়াটসন, যাও! সত্যিই যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, যাও, গিয়ে লুকিয়ে পড়ো! কুইক! শুধু কান খাড়া করে শুনে যাবে, যা-ই ঘটুক না কেন, একটা কথাও বলবে না। মনে থাকে যেন, শুধু শুনবে, নড়বে না, কথা বলবে না!'

বলেই হোমস ঝপ করে পড়ে গেল বিছানায়। আচমকা উত্তেজনার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্যের অবসাদ। আবার শুরু হল তার বিড়বিড় প্রলাপ বকুনি।

লাফ দিয়ে কোনোমতে লুকিয়ে পড়লাম ছোট্ট খুপরিটার মধ্যে। সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ, শোবার ঘরের দরজা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপর আর শব্দ নেই, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেবল হাপরের মতো হাঁপানির আওয়াজ... মুমূর্ষুর শ্বাসটানার চেষ্টা! বেশ বুঝলাম, খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হোমসের দিকে চেয়ে আছেন মি. স্মিথ। একটু বাদেই ভঙ্গ হল নীরবতা। উচ্চকণ্ঠে বললেন দর্শনার্থী, 'হোমস! হোমস! শুনতে পাচ্ছ? হোমস!'

ঠিক যেন ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে অর্ধ অচেতন মুমূর্ষুর ঘোর কাটানোর চেষ্টা, সেই রকমই খসখস আওয়াজও শুনলাম।

ফিসফিস করে হোমস বললে, 'মি. স্মিথ, আপনি! আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।'

হেসে উঠলেন স্মিথ, 'তা অবশ্য ঠিক। তবু দেখ, এসেছি। কয়লার আগুন[৭], হোমস, কয়লার আগুন।'

'আপনার অসীম দয়া। আপনাকে আমি সমীহ করি আপনার বিশেষ কাজের জন্যে।'

চাপা হাসি হেসে উঠলেন মিস্টার স্মিথ। বললেন, 'বটে! এ-খবর কিন্তু লন্ডনের একজনই রাখে— তুমি। জান কী হয়েছে তোমার?'

'সেই রোগ?'

'আ-চ্ছা! লক্ষণগুলো চিনতে পেরেছ তাহলে?'

'হাড়ে হাড়ে।'

'হোমস, তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। লক্ষণ সেই একই। ভিক্টর বেচারা চারদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এশিয়ার কালব্যাধি লন্ডনের বুকে একজনকে শেষ করে দেয় কীভাবে ভেবে খুবই অবাক হয়েছিলে তুমি, বিশেষ করে যে-রোগ নিয়ে শুধু আমিই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছি। তবে কী জান, রোগটার উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়েই তুমি মরেছ।'

'আমি তো জানি, ভিক্টরকে আপনিই শেষ করেছেন।'

'জান নাকি? এতই যদি জান, তো ফের আমাকে ডেকেছ কেন বাঁচবার জন্যে? আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে ফের পায়ে ধরে ডেকে এনেছ কেন শুনি? মতলবটা কী?'

রুদ্ধ নিশ্বাসে খাবি খেতে খেতে হোমস বললে, 'একটু জল দিন!'

'আর বেশি দেরি নেই তোমার। কিন্তু কাজের কথাটা শেষ হওয়ার আগে তোমাকে মরতে দিতে চাই না বলেই জল দিচ্ছি। উঁহু, ঢকঢক করে খেয়ো না, একটু খাও।— ঠিক আছে। কী বললাম বুঝেছ?'

গুঙিয়ে উঠল হোমস। বলল ফিসফিস করে, 'আমাকে বাঁচান! কথা দিচ্ছি, এ নিয়ে আর কোনো কথা বলব না। আমাকে সারিয়ে তুলুন, দেখবেন, সব ভুলে গেছি।'

'কী ভুলে যাবে?'

'ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ যে আপনি, এইমাত্র নিজের মুখেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওসব কথা আর মনে রাখব না।'

'কাঠগড়ায় সাক্ষী হয়ে এ-জীবনে আর তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। কাজেই তুমি মনে রাখলে কি রাখলে না, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কীভাবে মারা গেছে আমার ভাইপো, তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। আমার যত মাথাব্যথা, শুধু তোমার জন্যে, বুঝেছ, শুধু তোমার জন্যে।'

'আমি জানি, আমার জন্যে।'

'নিজের ব্রেন নিয়ে অহংকারে মটমট কর বলেই আজ তোমার এই অবস্থা। তোমার ধারণা, তোমার মতো ধারালো মগজ দুনিয়ায় আর কারো নেই। বড্ড স্মার্ট মনে কর নিজেকে। প্রাচ্যদেশীয় খালাসিদের মারফত সংক্রামিত হওয়া ছাড়াও এ-রোগ তোমার শরীরে ঢুকতে পারে ভেবে দেখেছ কি?'

'ভাববার শক্তি আর নেই। আমাকে বাঁচান!'

'এখনও বাঁচতে চাও! মরবার আগে বরং জেনে যাও কোত্থেকে জীবাণুটা ঢুকল তোমার শরীরে।'

'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে! যা হয় একটা ওষুধ দিন!'

'তা-ই নাকি? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কুলিগুলোও শেষের দিকে ইঁদুরের মতো চিঁ-চিঁ করত। হাতে-পায়ে খিঁচ ধরছে, তাই-ই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিঁচ ধরছে!'

'ধরুক, কিন্তু কানে তো খিঁচ ধরেনি, কথা এখনও শুনতে পাচ্ছ। এখন যা বলি শোনো। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ঠিক আগে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা মনে পড়ে?'

'না তো।'

'ভালো করে ভেবে দেখো।'

'ভাববার মতো মাথা আর নেই। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

'বেশ, বেশ, তাহলে আমিই বরং ধরিয়ে দিচ্ছি। ডাকযোগে কিছু পেয়েছিলে?'

'ডাকযোগে?'

'ধর একটা কৌটো?'

'মনে করতে পারছি না... জ্ঞান হারাচ্ছি... উঃ, মা গো!'

'হোমস! হোমস! আমার কথা শোনো।'

স্পষ্ট শুনলাম, মুমূর্ষু হোমসকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেওয়া হচ্ছে। কী কষ্টে যে হাত পা গুটিয়ে বসে রইলাম, তা শুধু আমিই জানি।

স্মিথের গলা ভেসে এল, 'আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। হাতির দাঁতের একটা কৌটোর কথা মনে পড়ছে? বুধবার ডাকপিয়োন এসে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি খুলেছিলে, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলেছিলাম বটে। ভেতরে একটা ছুঁচোলো স্প্রিং ছিল। ইয়ার্কি করে কেউ নিশ্চয়ই—'

'ইয়ার্কি নয় হে, ইয়ার্কি নয়। জীবন দিয়ে এখুনি সেটা টের পাবে। মাথায় তোমার গোবর আছে বলেই বুঝতে পারনি, এমনি ইডিয়ট তুমি। এই বুদ্ধি নিয়ে আমাকে ঘাঁটাতে এসেছিলে কোন সাহসে? তেমনি দিয়েছি পালটা মার!'

আবার খাবি খেতে খেতে হোমস বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! কৌটো খুলতেই স্প্রিংয়ের খোঁচায় আঙুল থেকে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। এই তো সেই কৌটো টেবিলেই রয়েছে।'

'হ্যাঁ এই সেই কৌটো। থাক এটা আমার পকেটে। সঙ্গে নিয়ে যাব, কোনো প্রমাণ আর থাকবে না। ভিক্টরের মৃত্যু সম্পর্কে বেশি খবর জেনে ফেলেছিলে বলেই তোমাকে মরণ দাওয়াই দিতে হল আমাকে। আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই তোমার। শেষ নিশ্বাসটা দেখে তারপর যাব। বসে বসে দেখে যাই কীভাবে অক্কা পাও তুমি।'

এবার হোমসের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, না-শোনারই শামিল। স্মিথ বললেন, 'কী বললে? গ্যাসের আলো বাড়িয়ে দেব? চোখে অন্ধকার দেখছ বুঝি? শুরু হয়ে গেছে তাহলে। বেশ, বেশ, আলো বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

পায়ের আওয়াজ গেল জানলার কাছে, তারপর হঠাৎ জোরালো আলো দেখা গেল ঘরে, সেইসঙ্গে ভেসে এল স্মিথের গলা, 'বলো, বন্ধু, বলো, শেষ মুহূর্তে তোমার আর কী সেবায় লাগতে পারি বলে ফেলো।'

'সিগারেট আর দেশলাইটা দিন।'

আর একটু হলেই বিস্ময়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতাম আমি। একটু কাহিল গলায় হলেও বেশ স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে হোমস। এ-স্বর আমি চিনি। বেশ কিছুক্ষণ থমথমে হয়ে রইল, কোনো শব্দ নেই। বেশ বুঝলাম, বিষম অবাক হয়ে হাঁ করে হোমসের দিকে চেয়ে আছেন মি. কালভার্টন স্মিথ।

তার পরেই শুনলাম তাঁর শুষ্ক কাটা-কাটা কণ্ঠস্বর, 'এর মানে কী?'

'স্রেফ অভিনয়। অভিনয়টা মর্মস্পর্শী করার জন্যে অবশ্য গত তিনদিন জল বা খাবার কিছুই খাইনি। আপনার হাত থেকে ওই প্রথম একটু জল খেলাম। তবে কী জানেন, ধূমপানটা আমার কাছে আরও উপাদেয়। এই তো পেয়েছি সিগারেট।'

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার আওয়াজ পেলাম। তারপরই হোমসের গলার আওয়াজ, 'আঃ কী আরাম! আরে, আরে! পুরোনো বন্ধুর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি মনে হচ্ছে!'

পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বাইরে, খুলে গেল দরজা, কে যেন ঘরে ঢুকল ভারী বুটের আওয়াজ তুলে।

হোমস বললে, 'মর্টন, এই তোমার আসামি।'

ইনস্পেকটর মর্টন রুটিনমাফিক গাওনা গাইল, 'মি. স্মিথ, ভিক্টর স্যাভেজকে খুন করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

খুক খুক করে হেসে উঠল হোমস। বললে, 'সেইসঙ্গে আর একটা চার্জ জুড়ে দিয়ো হে, শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টাও ইনি করেছিলেন। তবে মুমূর্ষুর মুখ চেয়েই বোধ হয় মি.

কালভার্টন স্মিথ একটা উপকারও করেছেন, নিজেই গ্যাসের আলো বাড়িয়ে সিগন্যাল দিয়ে ডেকে এনেছেন তোমাকে। ওঁকে তাই আগে ভারমুক্ত করো। ওঁর কোটের ডান পকেটে একটা ছোট্ট কৌটো আছে, আগে ওটা বার করে নাও, ধন্যবাদ! এখানে রাখো কৌটোটা, নাড়াচাড়া করতে যেয়ো না, মারা পড়বে। কোর্টে মামলা উঠলে কৌটোটা কাজে লাগবে।'

আচমকা ধাবমান পদশব্দ, ধস্তাধস্তি, লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকির ঝনৎকার এবং যন্ত্রণাবিকৃত চিৎকার শোনা গেল।

ইনস্পেকটর বললে, 'খামোখা মার খেয়ে মরছেন, সিধে হয়ে দাঁড়ান।'

কড়াং করে আওয়াজ হল হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়ার।

হিংস্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন স্মিথ, 'খুব ফাঁদে ফেললে দেখছি! হোমস, কাঠগড়ায় শেষ পর্যন্ত তোমাকেই উঠতে হবে, আমাকে নয়। রোগ সারানোর নাম করে ডেকে এনে পাগলের মতো যা-তা বলে আমাকে ফাঁসাতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে। মিথ্যে সন্দেহকে গল্প বানিয়ে প্রমাণ করা যায় না, পাগলের প্রলাপ বলবে সবাই।'

'আরে ওয়াটসন যে[৮]!' আমি বেরিয়ে আসতে সোল্লাসে বললে হোমস, 'কী ভুলো মন দেখেছ আমার, তোমার কথা একদম খেয়ালই ছিল না। ভায়া, এক হাজার এক বার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মি. স্মিথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আর দরকার আছে কি? আজ বিকেলেই তো সে-পালা চুকিয়ে এসেছ। গাড়ি আছে তো নীচে? মহামান্য অতিথিকে নিয়ে তোমরা এগোও, আমি জামাকাপড় পালটে যাচ্ছি। থানায় আমার থাকা দরকার।'

মুখ-হাত ধোয়ার ফাঁকে ফাঁকে এক গেলাস ব্র্যান্ডির সঙ্গে খানকয়েক বিস্কুট খেয়ে নিয়ে হোমস বললে, 'আঃ বাঁচলাম। এমনিতে বড়ো অগোছালো আমি, তার ওপর এত বড়ো ধকল গেলে শরীরপাত হয়ে যাবে। অথচ দেখ, এসব না-করলেও চলত না। মিসেস হাডসনকে যদি বিশ্বাস করাতে না-পারতাম যে মরতে চলেছি, তোমাকে ঠিক সেইভাবে উনি বোঝাতে পারতেন না। তোমার মনে সেই বিশ্বাস আনতে না-পারলে ধুরন্ধর স্মিথকে তুমি এখানে আমার খপ্পরে টেনে আনতে পারতে না। আমি জানতাম, নিজের কীর্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ছুটে সে আসবেই। এত লুকোচুরির জন্যে ভাই কিছু মনে কোরো না। তোমার ওপর আমার প্রচণ্ড আস্থা, তোমার বিদ্যেবুদ্ধির ওপর আমার দারুণ ভরসা।'

'কিন্তু হোমস, তোমার মুখটা ওইরকম বীভৎস ফ্যাকাশে হল কী করে?'

'তিনদিন পেটে দানাপানি না-পড়লে কেউই খুব সুস্থ থাকে না। বাকিটুকু সাজাতে একটা স্পঞ্জই যথেষ্ট। কপালে একটু ভেসলিন, চোখে বেলেডোনা[৯], গালের হাড়ে রুজ আর ঠোঁটের কোণে একটু মোম[১০], ব্যস, যে কেউ আঁতকে উঠবে সেই চেহারা দেখলে। বুঝলে, ধোঁকা দেওয়াও একটা আর্ট। মাঝে মাঝে আধক্রাউন আর শুক্তি নিয়ে বকবকানি জুড়ে দিলে মনে হবে, ঠিক যেন প্রলাপ বকুনি। ছলনা-শিল্প নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।'

'বেশ, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সত্যিই যখন ছোঁয়াচে রোগ হয়নি তোমার, তখন আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিলে না কেন?'

কৃত্রিম হতাশায় কপালে কপট করাঘাত করে হোমস বললে, 'হায় রে, তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে! চার ফুট দূর থেকে আমি ধোঁকা দিতে পারি একজন ঝানু ডাক্তারকে, কিন্তু আমার

গায়ে হাত দিলে কি সঙ্গেসঙ্গে ধরা পড়ে যেতাম না? জ্বর কোথায় আমার? নাড়ি তো অচঞ্চল! মুমূর্ষুর মতো অবস্থা যে আমার নয়, তা তো গায়ে হাত দিলেই বোঝা যায়। তোমার মনে অবিশ্বাস এসে গেলে ধড়িবাজ স্মিথকে বিশ্বাস করিয়ে আমার খপ্পরে কি নিয়ে আসতে পারতে? তুমি কি ভাব, তোমার ডাক্তারি বিদ্যেবুদ্ধির উপর আমার সত্যিই অশ্রদ্ধা আছে? তোমাকে কি আমি চিনি না? উঁহু ওয়াটসন, কৌটোয় হাত দিয়ো না। পাশ থেকে ডালাটা সামান্য ফাঁক করে দেখতে পার, বিষধর সাপের দাঁতের মতো স্প্রিংয়ের ডগাটা উঁকি দিচ্ছে কোনখান থেকে, তার বেশি নয়। ঠিক এই কায়দায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যাভেজ বেচারাকে, এই পিশাচটার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মাশুল সে দিয়েছে নিজের জীবন দিয়ে! অনেকরকম চিঠিপত্র আসে আমার কাছে, তাই প্যাকেট খোলার সময় আমি হুঁশিয়ার থাকি। কিন্তু আমি শয়তানটাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে, সত্যি সত্যিই যেন ওর মরণ-মারে ঘায়েল হয়েছি, যাতে উল্লাসের চোটে বাহাদুরি নিতে গিয়ে নিজের মুখেই স্বীকার করে নিজের কীর্তি। তা অভিনয়টা কীরকম করেছি বল? পাকা শিল্পীর মতোই ছলনার প্যাঁচে কুপোকাত করে ছেড়েছি মহাপাপিষ্ঠ এক শয়তানকে। ধন্যবাদ ওয়াটসন, নাও, কোটটা পরিয়ে দাও। থানার কাজ শেষ হলে সিম্পসনের রেস্তোরাঁয়[১১] গিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার আহার করে আসা যাবে'খন।'

টীকা

১. **শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায় :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডাইং ডিটেকটিভ' ১৯১৩-র ডিসেম্বর সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **টাকাকড়ি দেওয়ার ব্যাপারে রাজারাজড়ার মতো দিলখোলা হোমস :** এ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল একা ভাড়া গুনতে না-পারায় বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এনে অর্থ সাশ্রয় করতে চেষ্টা করছেন শার্লক হোমস। বোঝা যায় যে এই ক-বছরে যথেষ্ট সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাটি। তবে সেই সময়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছিল বলেই হোমস-ওয়াটসনের সাক্ষাৎ হয় এবং শার্লক হোমসের কীর্তিকলাপ গোচরে আসে সাধারণ মানুষের।

৩. **সুমাত্রা :** ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ সুমাত্রার দখল উনবিংশ শতকের প্রায় সম্পূর্ণ জুড়ে লড়াই চলে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ওলন্দাজরা এখানে তাদের অধিকার কায়েম করতে সক্ষম হয়।

৪. **কুলি :** হিন্দিতে কুলি শব্দের অর্থ মজুর, তামিল ভাষায় মজুরি। অর্থাৎ শব্দটি খাঁটি ভারতীয় এবং ইংলন্ডে এশীয় বা আফ্রিকান মজুরদের বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হত। সম্ভবত ১৮৪০-এ ক্রীতদাস-প্রথা রদ হওয়ার পর এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে কম মজুরির শ্রমিক আনা শুরু হয়। এদের নিয়ে আসা হত পাঁচ বা তার বেশি বছরের চুক্তিতে। এদের নিয়ে আসা বা বসবাসের ব্যবস্থা যেভাবে করা হত, তা ছিল চরম অস্বাস্থ্যকর এবং তার ফলে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হত। পরের দিকে এইভাবে কুলি নিয়ে আসার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করে বিভিন্ন দেশ।

৫. **জীবনে নাম শুনিনি :** দুটি অসুখের নামই কাল্পনিক।

৬. **ইঞ্জেকশন নেওয়ার সিরিঞ্জ :** নিশ্চয়ই কোকেন সেবন করবার জন্য রাখা ছিল।

৭. **কয়লার আগুন :** সম্ভবত বাইবেলে সেন্ট পলের উক্তির উদ্ধৃতি : '... for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.' (রোমানস ১২ : ২১)।

৮. **আরে ওয়াটসন যে :** লুকোনো সাক্ষী রেখে অপরাধীকে দিয়ে দোষ কবুল করানোর ঘটনা দেখা গিয়েছে 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মাজারিন স্টোন' গল্পে।

৯. **বেলেডোনা :** বেলেডোনা বা নাইটশেড এক ধরনের বিষাক্ত ভেষজ। লালচে গাছড়ায় জন্মানো কালো জাম-গোছের ফলের সুগন্ধী রস থেকে বেলেডোনা আহরিত হয়। অ্যাট্রোপিন সালফেট জাতীয় ওষধি তৈরি হয় এই রস থেকে।

১০. **মোম :** সে-যুগের ইংলন্ডে মোম লাগিয়ে গোঁফ চকচকে এবং শক্ত রাখার প্রচলন ছিল।

১১. **সিম্পসনের রেস্তোরাঁ :** লন্ডনের স্ট্র্যান্ডে স্যামুয়েল রীসের ১৮২৮-এ প্রতিষ্ঠা করা গ্র্যান্ড সিগার ডিভান, ক্রমে একটি কফির দোকানে পরিণত হয়। তা ছাড়া, এখানকার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এটি একটি দাবা খেলার আড্ডাও হয়ে ওঠে অচিরে। ১৮৪৮-এ এর অংশীদার হিসেবে যোগ দেন বিখ্যাত খাদ্য পরিবেশক বা ক্যাটারার, জন সিম্পসন এবং এর নতুন নাম হয় সিম্পসন্স গ্র্যান্ড সিগার ট্যাভার্ন। বেঞ্জামিন ডিসরেইলি, উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল এই আড্ডায়।

লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান-রহস্য[১]

[দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অফ লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স]

আমার বুটজোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শার্লক হোমস বললে, 'কিন্তু ভায়া, হঠাৎ টার্কিশ শখ হল কেন?'

বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে দু-পা সামনে বাড়িয়ে বসে ছিলাম আমি। বন্ধুবরের চনমনে নজর ঠিক সেইদিকেই পড়েছে।

অবাক হলাম। বললাম, 'ইংলিশ জুতো। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ল্যাটিমারের দোকান থেকে কিনেছি।'

অসহিষ্ণুভাবে হাসল হোমস।

বললে, 'ধুত্তোর! আমি বলছি টার্কিশ বাথের[২] কথা! সস্তায় বাড়ির স্নান ছেড়ে হঠাৎ এত দামি টার্কিশ স্নানের দরকার পড়ল কেন?'

'কারণ দিনকয়েক ধরে নিজেকে বড়ো বুড়োটে আর বেতো মনে হচ্ছে। টার্কিশ বাথ শরীরটাকে ভেতর থেকে তাজা ঝরঝরে করে দেয়— কিন্তু ভায়া আমার জুতো আর টার্কিশ বাথের মধ্যে যোগসূত্রটা তোমার মতো যুক্তিসিদ্ধ ব্রেনের কাছে নিশ্চয় সুস্পষ্ট, আমার কাছে নয়। একটু খোলসা করে বলবে?'

চোখ নাচিয়ে হোমস বললে, 'যুক্তির ধারাবাহিকতা অনুধাবন করতে পারলেই ঠিক খোলসা হয়ে যাবে। যেমন ধর, আজ সকালে তোমার সঙ্গে একজন একই গাড়িতে উঠেছিলেন।'

একটু গরম হয়ে বললাম, 'এর মানে কি খোলসা করা হল? এ তো আর একটি ধাঁধা?'

'শাব-বাশ! বিক্ষোভ প্রকাশটা চমৎকার যুক্তিসংগত হয়েছে। শেষ বিষয়টা থেকেই তাহলে খোলসা পর্ব শুরু করা যাক। গাড়ির ব্যাপারটা ধরা যাক আগে। তোমার কোটের একদিকের হাতায় আর কাঁধে কাদার ছিটে লেগেছে লক্ষ করেছ? গাড়ির মাঝখানে বসলে কাদা ছিটকে গায়ে লাগলে দু-পাশে সমানভাবে লাগত— একপাশে লাগত না। তাই ধরে নিলাম, তুমি গাড়ির একপাশে বসে ছিলে— আর একপাশে বসেছিল অন্য এক ব্যক্তি।'

'এ তো সোজা ব্যাপার।'

'খুবই সোজা— এক্কেবারে ছেলেখেলা, তাই তো?'

'বুটের সঙ্গে চান করার সম্পর্কটা এবার বলো?'

'সেটাও একটা ছেলেখেলা। তোমার বুটের ফিতেতে ডবল ফাঁস দেখছি— যা তুমি কখনোই নিজে লাগাও না। তার মানে, জুতোজোড়া তুমি খুলেছিলে। অন্য একজন পরিয়ে দিয়েছে। কে পরিয়ে দিয়েছে? মুচি নিশ্চয় নয়— কেননা জুতোজোড়া এই সেদিন কিনেছ। তাহলে নিশ্চয় টার্কিশ বাথ নিতে গেছিলে। নিয়ে অবশ্য ভালোই করেছ— কাজে লাগবে।'

'সেটা আবার কী?'

'এইমাত্র বললে না টার্কিশ বাথ নিয়েছ শরীরটাকে ঝরঝরে তাজা করার জন্যে— তার মানে একটু হাওয়া বদলও দরকার। লসানে[৩] যাবে। ফার্স্টক্লাস টিকিট পাবে— রাজার হালে থাকার খরচ পাবে?'

'সে তো অতি চমৎকার হয়! কিন্তু কেন?'

আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পকেট থেকে নোটবই বার করে হোমস বললে, 'নির্বান্ধব মেয়েরা যখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, সমাজে কেবল অশান্তির সৃষ্টি করে। এক দল শেয়ালের মাঝে তারা তখন অসহায় মুরগি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেরা নিরীহ হলেও এই ধরনের মেয়েদের জন্যেই অন্যেরা অনেক ধরনের অপরাধ ঘটিয়ে বসে। টাকা আছে বলেই দেশে দেশে এরা ভেসে বেড়ায়, ভালো ভালো হোটেলে থাকে— তারপর একসময়ে হারিয়ে যায়, শেয়ালের খপ্পরে পড়ে। লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সেরও এই ধরনের সাংঘাতিক কোনো বিপদ ঘটেছে বলে আমার মনে হয়।'

দুনিয়ার নির্বান্ধব মেয়েদের নিয়ে কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বিশেষ একজনের নাম বলায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

নোটবই দেখে হোমস বললে, 'লেডি ফ্রান্সেস হলেন পরলোকগত আর্ল অফ রাফটনের শেষ বংশধর। তোমার মনে থাকতে পারে, এ-বংশে সম্পত্তি পেয়েছে কেবল পুরুষেরাই— এই প্রথম একজন মহিলার বরাতে জুটেছে আর্লের সম্পত্তি। ওঁর সঙ্গে সবসময় এক ট্রাঙ্ক বোঝাই দামি দামি স্পেনীয় জড়োয়া গয়না থাকে। রুপোর জড়োয়া আর অদ্ভুতভাবে কাটা হিরেগুলো উনি কোনো ব্যাঙ্কে রাখেন না— যেখানে যান, সঙ্গে নিয়ে যান। লেডি ফ্রান্সেস সুন্দরী, মাঝবয়সি, কিন্তু একাকিনী। টাকাকড়ি মোটামুটি আছে, কিন্তু ট্রাঙ্কটিই ওঁর আসল সম্পত্তি।'

'কী হয়েছে ওঁর?'

'বেঁচে আছেন কি না সেইটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা গত চার বছর ধরে প্রতি হপ্তায় একখানা চিঠি লিখেছেন ওঁর এককালের গভর্নেস মিস ডবনি-কে। ইনি থাকেন ক্যামবারওয়েলে, অবসর নিয়েছেন। গত পাঁচ হপ্তা ধরে কোনো চিঠি পাচ্ছেন না লেডির কাছ থেকে। শেষ চিঠিটা লেখা হয়েছিল লসানের হোটেল ন্যাশনাল থেকে। খবর নিয়ে জানা গেছে হোটেল ছেড়ে নাকি চলে গেছেন— ঠিকানা রেখে যাননি। টাকার অভাব হবে না ভায়া— কিন্তু ওঁর অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতেই হবে— মিস ডবনির অনুরোধে এ-কেসে তাই নাক গলিয়েছি।'

'কিন্তু মিস ডবনি ছাড়া নিশ্চয় অন্য অনেককেও উনি চিঠি লেখেন?'

'চিঠি আর এক জায়গাতেই লেখেন— সেখানেও ঢুঁ মেরে কিছু পায়নি। নির্বান্ধব একাকিনী

মেয়েদের বাঁচতে হলে টাকা দরকার এবং সে-টাকা আসে ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্কের পাশবই ঘাঁটলেই অনেক জানা যায়। ওঁর ব্যাঙ্কের হিসেব আমিও দেখেছি। লসানের বিল মিটোতে সবশেষে একটা চেক কেটেছেন— কিন্তু টাকাটা মোটা অঙ্কের। তার মানে নিশ্চয় হাতে নগদ টাকা নিয়েই লসান ত্যাগ করেছেন। তারপর একটাই চেক কেটেছেন।'

'কাকে? কোথায়?'

'মিস মেরি ডেভিনের নামে। কোথায় কেটেছেন ধরা যাচ্ছে না। তবে চেকটা ভাঙানো হয়েছে ক্রেডিট লায়েনেসে— মঁপেলিয়রে— হপ্তা তিনেক আগে। পঞ্চাশ পাউন্ডের চেক।'

'মিস মেরি ডেভিন কে?'

'লেডি কারফাক্সের পরিচারিকা। কিন্তু তাকে এত টাকা দেওয়া হল কেন সেটাই আবিষ্কার করতে পারিনি। তোমার গবেষণায় রহস্য পরিষ্কার হবে, এ-বিশ্বাস আছে।'

'আমার গবেষণা মানে?'

'লসান অভিযানে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে তোমার। তুমি তো জান, বুড়ো আব্রাহাম প্রাণের ভয়ে কাঁপছে, তাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া লন্ডন ছেড়ে কোথাও বেরোতেও চাই না— প্রথমত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বড়ো একা বোধ করে, দ্বিতীয়ত আমি কোথাও গেলেই লন্ডনের দুর্বৃত্তদল উল্লসিত হয়। তাই আমি থাকি, তুমি যাও। শব্দ পিছু দু-পেনি খরচ করে টেলিগ্রাম মারফত খবরাখবর পাঠিয়ো।'

দু-দিন পরে লসানের হোটেল ন্যাশনাল পৌঁছোলাম। খুব খাতির করলেন ম্যানেজার মঁসিয়ে মোজার। বেশ কয়েক হপ্তা হোটেলে ছিলেন লেডি কারফাক্স। খুবই পছন্দ করত ভদ্রমহিলাকে। বয়স চল্লিশের বেশি নয়। এখনও সুন্দরী— যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন সন্দেহ নেই। সঙ্গে দামি জড়োয়া ছিল কি না ম্যানেজারের জানা নেই। তবে চাকরবাকরেরা বলত, শোবার ঘরে একটা ভারী ট্রাঙ্কে সবসময়ে তালা লাগিয়ে রাখতেন। পরিচারিকা মেরি ডেভিনকেও সবার খুব পছন্দ ছিল। হোটেলেরই ওয়েটারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে। ঠিকানা পেতে অসুবিধে নেই। মেয়েটা থাকে মঁপেলিয়রের[৪] এগারো নম্বর রু দ্য এ্যজানে। যা শুনলাম, সব লিখে নিলাম। হোমস নিজেও এর চাইতে বেশি ঘটনা জোগাড় করতে পারত না।

শুধু একটা রহস্যই রয়ে গেল। লেডি কারফাক্সের হঠাৎ অন্তর্ধান ঘটল কেন, তা জানা গেল না। লসানে বহাল তবিয়তে ছিলেন ভদ্রমহিলা। লেকের ধারের বিলাসবহুল কক্ষে পুরো ঋতুটা কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে নাকি ছিল। তা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন অযথা এক হপ্তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে। পরিচারিকা মেরির হবু বর জুলভাইবার্ট বললে, আগের দিন লম্বা কালচে দাড়িওলা এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বলেই লেডি কারফাক্স পালিয়ে গেছেন। লোকটা নাকি একটা আস্ত বর্বর! শহরেই কোথাও থাকে। লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে ম্যাডামের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কী সব কথা বলছিল যেন। তারপর আবার আসতেই ম্যাডাম আর দেখা করেননি— পরের দিন হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে যান। সেই থেকেই মনে হয় লোকটার ভয়েই ম্যাডাম গা-ঢাকা দিয়েছেন। তবে মেরি ম্যাডামের চাকরি ছেড়ে দিল কেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণটা মেরি জানতে পারে— মঁপেলিয়রে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

শেষ হল অনুসন্ধান পর্বের প্রথম অধ্যায়। এবার যেতে হবে লেডি কারফাক্স লসান ছেড়ে

যেখানে গেছে, সেখানে। কিন্তু এ-জায়গাটা পাঁচজনে জেনে ফেলুক, লেডি কারফাক্সের তা ইচ্ছে ছিল না বলেই বাক্সপ্যাঁটরায় খোলাখুলি বাদেন[৫]-এর লেবেল লাগাননি। কেউ পিছু নিয়েছিল বোধ হয়— তাই অনেক ঘুরপথে মালপত্র এবং নিজে পৌঁছেছেন খনিজ জলের উৎস রেনিজে[৬]। কুক-এর স্থানীয় অফিস[৭] থেকে জোগাড় করলাম এই খবর। টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম হোমসকে। জবাবে পেলাম একটা কৌতুকতরসিত প্রশংসা।

বাদেন পৌঁছে খবরাখবর পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। ইংলিশচার হফে দিন পনেরো ছিলেন লেডি কারফাক্স, এইখানেই সাউথ আমেরিকার ধর্মপ্রচারক ডক্টর শ্লেসিংগার এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। ধার্মিক লোকের সঙ্গ পেলে বর্তে যায় নিঃসঙ্গ মহিলারা— লেডি কারফাক্সও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন ডক্টর শ্লেসিংগারের সঙ্গ পেয়ে। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ভদ্রলোক স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে বসেছিলেন বলে প্রাণ কেঁদে ওঠে লেডি কারফাক্সের। তা ছাড়া, ব্যক্তিত্বও নাকি অসাধারণ রকমের। স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসে দিনরাত বারান্দায় বসে একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন মিডিয়ানটিস রাজ্য[৮] সম্পর্কে— দু-পাশে বসে সেবা করতেন তাঁর স্ত্রী আর লেডি কারফাক্স। এসব খবর পেলাম ম্যানেজারের মুখে। একটু সেরে উঠলেই লন্ডন রওনা হন সস্ত্রীক ডক্টর শ্লেসিংগার। সঙ্গে যান লেডি কারফাক্স। কিন্তু পরিচারিকা মেরি কাঁদতে কাঁদতে 'জন্মের-মতো-ওর-চাকরি-ছেড়ে-দিচ্ছি' বলে চলে গেল কেন, তা ম্যানেজার জানে না। টাকাপত্র সব মিটিয়ে দেন ডক্টর শ্লেসিংগার।

সবশেষে ম্যানেজার বললেন, 'আপনি কিন্তু একাই খোঁজ করতে আসেননি লেডির। হপ্তাখানেক লাগে আর একজন এসেছিলেন।'

'নাম বলেছে?'

'না। ইংরেজ ভদ্রলোক— একটু অস্বাভাবিক ধরনের।'

শার্লক হোমসের পদ্ধতিতে ঘটনার মালা গাঁথার কায়দায় জিজ্ঞেস করলাম, 'বর্বর ধরনের লোক বোধ হয়?'

'ঠিক বলেছেন। হুবহু তাই। চাষাড়ে, চোয়াড়ে, জাঁহাবাজ। শৌখিন হোটেলে না-উঠে চাষাভুষোর হোটেলে উঠলেই বরং মানাত।'

অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম এবার। ছিনেজোঁকের মতো লোকটা পেছন ধরে রয়েছে কেন! এর ভয়েই গোপনে পালিয়েছেন লেডি কারফাক্স— এখানেও সে এসে গেছে। লন্ডন পর্যন্ত গিয়ে লেডির নাগাল ধরে ফেলেনি তো? কী মতলবে ঘুরছে পেছনে কুটিল লোকটা? নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে এর পেছনে।

হোমসকে জানালাম রহস্যের মূল ধরে ফেলেছি। ও জবাবে লিখল, ডক্টর শ্লেসিংগারের বাঁ-কানটা কীরকম দেখতে বলো তো? মাঝে মাঝে ওর ইয়ার্কি-মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রসিকতার সময় এটা নয় বলেই পাত্তা দিলাম না টেলিগ্রামটার। তা ছাড়া টেলিগ্রাম যখন পেলাম, তখন আমি মেরির সন্ধানে মঁপেলিয়র পৌঁছে গেছি।

মেরি বললে, তার নিজের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে বলে আর সৎসঙ্গে লেডি কারফাক্সের দিন কাটছে দেখে চাকরি ছেড়ে দেয় সে। চাকরি ছাড়তে সুবিধে হয়ে গেল যখন লেডি কারফাক্স নিজেই একদিন তার সততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ বসলেন। ইদানীং তাঁর মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। কারণ নিশ্চয় সেই চোয়াড়ে জাঁহাবাজ লোকটা। নিজের চোখে সে দেখেছে, লেকের

পাড়ে দাঁড়িয়ে লেডি কারফাক্সের হাত ধরে মোচড়াচ্ছে বদমাশটা। মুখে না-বললেও, লেডি কারফাক্স যে তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই ডক্টর শ্লেসিংগারের আশ্রয়ে লন্ডন গিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই মেরির। সবসময় যেন ভয়ে-ভয়ে থাকতেন।— এই পর্যন্ত বলেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল মেরি।— 'ওই দেখুন! বদমাশটা এখানে পর্যন্ত এসেছে!'

জানলা দিয়ে দেখলাম বিরাটকায় খোঁচা-খোঁচা কালো দাড়িওলা এক পুরুষ ফুটপাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির নম্বর দেখছে। নিশ্চয় আমার মতোই মেরিকে খুঁজছে। দেখেই আর দেরি করলাম না। ঝড়ের মতো রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

শুধোলাম, 'আপনি ইংরেজ?'

পাক্কা শয়তানের মতো ভুরু কুঁচকে সে বললে, 'তা হয়েছেটা কী?'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'না পারেন না।'

ফাঁপরে পড়লাম। কিন্তু সোজা পথই অনেক সময়ে সেরা পথ।

তাই দুম করে জিজ্ঞেস করলাম, 'লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স কোথায়?'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটা।

আমি বললাম, 'ওঁর পেছনে ঘুরছেন কেন? কী করেছেন তাঁর? জবাব দিন!' লোকটা বাঘের মতো গর্জে উঠে সটান লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর এবং সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল আমার গলা। চোখে যখন সর্ষেফুল দেখছি, ঠিক তখনই পাশের ক্যাবারে থেকে নীল কুর্তা পরা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা একজন ফরাসি মজুর তিরের মতো ছুটে এসে হাতের মোটা খেঁটো দিয়ে ধাঁই করে মারল শয়তানটার বাহুতে— এক মারেই আঙুল ঢিলে হয়ে গেল রাসকেলের। আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে ভাবল বোধ হয় আমার টুঁপি টিপে ধরবে কি না— পরক্ষণেই উল্কাবেগে ঢুকে গেল আমি যে-কটেজ থেকে বেরিয়েছি, সেই কটেজে।

ফরাসি মজুরটা তখনও আমার পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ঘুরে দাঁড়ালাম ধন্যবাদ দিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, খুব হয়েছে। আজ রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে চলো আমার সঙ্গে লন্ডনে।'

এক ঘণ্টা পর হোটেলে আমার প্রাইভেট রুমে বসে চিরাচরিত ধড়াচূড়া পরে স্বভাবসিদ্ধ নীরস কণ্ঠে বললে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো কেন সে ঠিক বিপদের মুহূর্তটিতে আমার পাশে আসতে পেরেছিল। লন্ডনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছিল লন্ডন ছেড়ে। মজুর সেজে আগেভাগে এসে বসে ছিল মঁপেলিয়রে আমার পথ চেয়ে।

'ওয়াটসন, অপূর্ব তদন্ত করেছ। সবকটা বিরাট ভুলই নিখুঁতভাবে করে গেছ। যেখানে গেছ, সেখানেই সন্ত্রাস ছড়িয়ে এসেছ, কিন্তু লাভ হয়েছে অষ্টরম্ভা।'

তিক্ত কণ্ঠে বললাম, 'তুমি নিজে তদন্ত করলেও পক্বরম্ভা পেতে।'

'আরে ভায়া, আমি তো আসল কাজটা করে বসে আছি। অনারেবল ফিলিপ গ্রিনকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। এই হোটেলেই তিনি রয়েছেন। সার্থক তদন্ত শুরু হবে তো তাঁকে দিয়েই।'

বলতে-না-বলতেই ট্রে-র ওপর একটা কার্ড নিয়ে এল চাকর— পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল দাড়িওলা সেই মারকুটে বদমাশটা— যার গলা টিপুনির ঠেলায় এখনও টনটন করছে কণ্ঠদেশ। আমাকে দেখেই কটমট করে চাইল লোকটা।

বলল, 'এ আবার কী, মি. হোমস? আপনার চিঠি পেয়ে এসে এ-লোকটাকে এখানে দেখছি কেন?'

'ইনি আমার পুরোনো দোস্ত এবং সহযোগী ডক্টর ওয়াটসন— এ-কাজে ইনি আমাকে সাহায্য করছেন।'

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিশাল রোদে পোড়া দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন আগন্তুক।

বললেন, 'আশা করি খুব লাগেনি। লেডি কারফাক্সকে আমি লোপাট করেছি বলায় মাথার ঠিক রাখতে পারিনি, আজকাল আমার স্নায়ুর অবস্থা মোটেই ভালো নয়— ধাঁ করে রেগে যাই। এ-পরিস্থিতি আর সইতে পারছি না, মি. হোমস, আগে বলুন আমার খবর পেলেন কোত্থেকে?'

'লেডি ফ্রান্সেসের গভর্নর মি. ডবনির কাছ থেকে।'

'তাই নাকি! সুশান বুড়িকে কি এত সহজে ভোলা যায়!'

'উনিও আপনাকে ভোলেননি। আপনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার আগে থেকেই তো চেনেন আপনাকে।'

'তাহলে তো সব খবরই জেনে ফেলেছেন। যৌবনে বড়ো দুর্দান্ত জীবনযাপন করছি। লেডি কারফাক্স তা জেনে ফেলে। মনটা খিঁচড়ে যায় আমার ওপর। সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়— অথচ ভুলতে পারেনি। আমার কুকীর্তি ওকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে— কিন্তু মন থেকে আমার স্মৃতি মুছতে পারেনি। আমার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসায় এতটুকু চিড় খায়নি। সেই কারণেই বিয়ে পর্যন্ত করেনি। বারবারটনে[৯] গিয়ে দু-পয়সা করলাম। ভাবলাম এবার ওর মনটা নরম করা যাক। লসানে গিয়ে কাকুতিমিনতি করলাম। মনটা সত্যিই নরম হয়েছে দেখলাম। তারপরেই খবর পেলাম লসান ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আসলে ওর মনের জোর সাংঘাতিক। ভাঙবে তবু মচকাবে না। খোঁজখবর নিয়ে এলাম বাদানে। শুনলাম, এখানেই থাকে ওর পুরানো পরিচারিকা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসন আমাকেই ওর অন্তর্ধানের জন্যে দায়ী করায় মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। যাক গে সে-কথা, লেডি ফ্রান্সেস কোথায় আপনার জানা থাকলে দয়া করে বলুন।'

অদ্ভুতভাবে গম্ভীর হয়ে গেল হোমস। বললে, 'সেইটাই তো জানতে চাই। আপনার লন্ডনের ঠিকানাটা কী, মিস্টার গ্রিন?'

'ল্যাংহ্যাম হোটেলে[১০] পাবেন আমাকে।'

'তাহলে আপনি সেখানেই যান। হোটেল ছেড়ে নড়বেন না— দরকার হলে যেন ডাকলেই পাই। মিথ্যে আশা দিতে চাই না— তবে যা করবার সবই করব কথা দিচ্ছি। আমার এই কার্ডটা রাখুন— আপনিও যোগাযোগ রাখবেন। ওয়াটসন, বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নাও। মিসেস হাডসনকে আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, কাল সাড়ে সাতটায় বুভুক্ষু দুই ট্রেনযাত্রীর জন্যে ভালোমন্দ খাবার যেন তৈরি থাকে।'

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছেই হোমস দেখল একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে রয়েছে ওর নামে। খুলে পড়ল। আগ্রহ চিকমিকিয়ে উঠল দুই চোখে, ছুড়ে দিল আমার দিকে। আমি দেখলাম শুধু দুটো শব্দ লেখা রয়েছে টেলিগ্রামে— 'খাঁজকাটা ছেঁড়া।' টেলিগ্রাম এসেছে বাদেন থেকে।

'মানে?' শুধোই আমি।

'সব মানে তো ওরই মধ্যে। তোমাকে বলেছিলাম পাদরি সাহেবের বাঁ-কানটা দেখতে কীরকম জানাতে— জানাওনি। মনে পড়ে?'

'আমি তো তখন বাদেন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি— জানাব কী করে?'

'সেইজন্যেই ইংলিশচার হফের ম্যানেজারকে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। এই তার জবাব।'

'কিন্তু মানেটা কী?'

'মানেটা হল, আমরা অসাধারণ দুঁদে আর বিপজ্জনক এক ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়তে নেমেছি! সাউথ আমেরিকায় প্রাতঃস্মরণীয় পাদরি সাহেব ডক্টর শ্লেসিংগারের আসল নাম হোলি পিটার্স— অস্ট্রেলিয়ার বদমাশ শিরোমণি হোলি পিটার্স— যার কীর্তিকাহিনি গায়ে কাঁটা জাগিয়ে ছাড়ে। শয়তানটার কুকাজের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ধর্মপ্রাণা মেয়েদের ধর্মের কথায় ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলা। ওর এই বৈশিষ্ট্য জানা আছে বলেই ডক্টর শ্লেসিংগারের কাহিনি শুনে সন্দেহ হয় আমার— যাচাই করার জন্যে পাদরির বাঁ-কানের বর্ণনা চেয়েছিলাম। কেননা, ১৮৮৯ সালে অ্যাডিলেডে[১১] মারপিট করতে গিয়ে কুকুর-কামড়ানোর মতো কামড়ানো হয় ওর বাঁ-কান। ওর সঙ্গে স্ত্রীর ভূমিকায় যে স্ত্রীলোকটি থাকে, তার আসল নাম ফ্রেজার— জাতে ইংরেজ। এই দুজনের পাল্লায় যখন পড়েছেন লেডি ফ্রান্সেস, তখন ধরে নিতে পারি তিনি বেঁচে নেই, অথবা এমন অবস্থায় আছেন যে পাঁচ হপ্তায় একখানা চিঠিও লিখতে পারেননি। হতে পারে ওরা লন্ডনেই পৌঁছোয়নি। তবে সে-সম্ভাবনা কম। কেননা, কন্টিনেন্টাল পুলিশের কাছে এসব বদমাশদের বাঁদরামি গোপন থাকে না— চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। তাই আমার ধারণা লন্ডনেই কোথাও এরা ঘাপটি মেরে আছে— কিন্তু ঠিক কোথায় বলা সম্ভব নয়। আপাতত খেয়েদেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করা যাক। সন্ধে নাগাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করব।'

কিন্তু লেসট্রেড আর হোমস দুজনেই ঘোল খেয়ে গেল। সাত-সাতটা দিন কতরকম চেষ্টাই করা হল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, বদমাশদের বিবরে হানা দেওয়া হল, ডক্টর শ্লেসিংগারের যেখানে-যেখানে যাওয়া সম্ভব সব জায়গাতেই টুঁ মারা হল— কিন্তু মহানগরীর কোন গর্তে যে তিনটি মানুষ ঢুকে বসে রয়েছে, সে-হদিশ পাওয়া গেল না। সাত দিন পরে আচমকা খবর এল ওয়েস্টমিনস্টার রোডে[১২] বেভিংটনের[১৩] দোকানে একটা স্পেনীয় ডিজাইনের রুপোর জড়োয়া গহনা বাঁধা দেওয়া হয়েছে। বাঁধা যে দিয়েছে, তার চেহারাটা পাদরির মতন। লম্বা-চওড়া, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো। কানের চেহারা লক্ষ করা যায়নি— তবে বাদবাকি চেহারার সঙ্গে শ্লেসিংগারের চেহারার মিল আছে।

এই সাতদিনের মধ্যে ল্যাংহ্যাম হোটেল থেকে মিস্টার গ্রিন তিনবার এসেছেন নিখোঁজ প্রেয়সীর খবর নিতে। উৎকণ্ঠায় যে তাঁর অবস্থা শোচনীয়, তা পোশাক-আশাকের ঢিলেঢালা অবস্থা দেখেই মালুম হয়েছে। তৃতীয়বার যখন এলেন, ঠিক তখনই জড়োয়া গয়না বাঁধা দেওয়ার খবরটা এসেছে।

হোমস খবরটা দিল মিস্টার গ্রিনকে। বললে, 'গয়না বাঁধা দেওয়া শুরু করেছে রাসকেল।'

আকুল কণ্ঠে গ্রিন বললেন, 'আমাকে কিছু একটা করতে দিন মি. হোমস। কিন্তু গয়না বাঁধা দেওয়ার মানে কি এই নয় যে সর্বনাশ হয়ে গেছে লেডি ফ্রান্সেসের?'

গম্ভীর হয়ে হোমস বললে, 'কয়েদ করেও যদি রেখে দেয় মুক্তি দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই বিপদে পড়বে। কাজেই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্যেই তৈরি থাকা ভালো।'

'কী করতে বলেন আমাকে?'

'ওরা কি আপনাকে চেনে?'

'না।'

'তাহলে বেভিংটনের দোকানে গিয়ে ওত পেতে থাকুন— আবার আসতে পারে গয়না বাঁধা দিতে। অন্য দোকানেও যেতে পারে, তবে বেভিংটন টাকা দিয়েছে ভালো, প্রশ্নও করেনি— কাজেই ওর কাছেই আবার আসাটা সম্ভব। আপনি কিন্তু হামলা করবেন না। শুধু পেছনে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসবেন। কথা দিন আমাকে না-জানিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবেন না।'

দু-দিন নতুন খবর আনতে পারলেন না অনারেবল ফিলিপ গ্রিন (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ইনি বিখ্যাত অ্যাডমিরাল ফিলিপ গ্রিনের ছেলে— ক্রিমিয়ান যুদ্ধে[১৪] অ্যাজোভ সাগরের[১৫] নৌবাহিনী পরিচালনা করে যিনি বিখ্যাত)। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় উদ্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে বিবর্ণ মুখে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক।

'পেয়েছি! ওকে পেয়েছি!'

উত্তেজনায় কথা আটকে গেল ভদ্রলোকের। হোমস সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বলল, 'আস্তে আস্তে বলুন।'

'স্লেসিংগারের সঙ্গে যে মেয়েছেলেটা থাকে, সে এসেছিল। যে গয়নাটা বাঁধা দিয়ে গেল, সেটা কিন্তু লেডি ফ্রান্সেসের। মাগির চোখ দুটো বেজির মতো খরখরে। মাথায় বেশ লম্বা, ফ্যাকাশে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্লেসিংগারের সঙ্গিনীই বটে।'

'দোকান থেকে বেরিয়ে গেল কেনসিংটন রোডে— পেছনে আমি। ঢুকল একটা আন্ডারটেকারের দোকানে— যাদের কাজ মড়া কবর দেওয়া।'

চমকে উঠল হোমস। কেঁপে উঠল গলা। বুঝলাম, কীরকম তোলপাড় চলছে ভেতরে। ধূসর শীতল মুখের প্রতিটা মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল কথাটা শুনেই।

'তারপর?'

কাঁচুমাচু মুখে দোকানি মেয়েটা বললে, 'একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব বলুন, বেমক্কা সাইজ, বড্ড বড়ো। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।' আমাকে দেখেই চুপ মেরে গেল দুজনেই। আমি ধানাইপানাই করে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।'

'খুব ভালো করেছেন। তারপর কী হল?'

'মাগিটা বেরিয়ে এল— সন্দিগ্ধচোখে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটা ছ্যাকড়াগাড়িতে উঠে বসল। আমাকে দেখতে পায়নি— লুকিয়ে ছিলাম। কপাল ভালো একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম। পেছন পেছন গেলাম। সামনের গাড়ি থামল ব্রিক্সটনের ছত্রিশ নম্বর পোল্টনি স্কোয়ারে। আমি সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নামলাম পার্কের কোণে। ওখান থেকেই নজর রাখলাম বাড়ির ওপর।'

'দেখলেন কাউকে?'

'ওপরের সব জানলা বন্ধ— অন্ধকার। নীচের তলায় একটা জানলাই কেবল খোলা— তাও খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা। ভেতরে কাউকে তাই দেখতে পাইনি। হঠাৎ একটা ভ্যান এসে দাঁড়াল

বাড়ির সামনে। দুজন লোক ধরাধরি করে একটা জিনিস নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকল হল ঘরের দরজা দিয়ে। মিস্টার হোমস, জিনিসটা একটা কফিন।'

'আ-চ্ছা!'

'আর একটু হলেই তেড়েমেড়ে ঢুকে পড়তাম ভেতরে। দরজাটা ফাঁক করে ধরেছিল মাগিটা লোক দুজনকে ঢুকিয়ে নেওয়ার জন্যে— এই সময় দেখল আমাকে। দেখেই চিনেছে নিশ্চয়— চমকে উঠেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। আপনাকে কথা দিয়েছি নিজে কিছু করব না— তাই ছুটতে ছুটতে আসছি খবরটা দিতে।'

খসখস করে একটা কাগজে কী লিখতে লিখতে হোমস বলল, 'অপূর্ব কাজ করেছেন। ওয়ারেন্ট ছাড়া এখন আর কিছু করা মানেই বেআইনি কাজ করা। আপনি এটা নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে যান। লেসট্রেড ওয়ারেন্ট বার করে দেবে। জড়োয়া গয়না পাওয়া গেছে— এর সাহায্যেই লেসট্রেড পারবে শমন ধরাতে।'

'কিন্তু এর মধ্যে ওকে তো খুন করেও ফেলতে পারে? কফিনটা এল কেন? কার জন্যে?'

'অযথা সময় নষ্ট করবেন না— ও-ব্যাপারটা ছেড়ে দিন আমাদের ওপর,' মিস্টার গ্রিনকে ঠেলেঠুলে ঘর থেকে বিদেয় করে আমার দিকে ফিরল হোমস। 'ওয়াটসন, উনি গেলেন আইনের পথে— দরকার পড়লেই চিরকাল যা করেছি। পরিস্থিতি খুব খারাপ— চরম ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া পথ দেখছি না। এক্ষুনি চল পোল্টনি স্কোয়ার যাই।'

পার্লামেন্ট হাউসের পাশ দিয়ে আর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটল আমাদের গাড়ি। ভেতরে বসে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, লেডি ফ্রান্সেসকে ছুতোনাতা করে পরিচারিকার কাছ থেকে সরিয়ে রাসকেলরা এনে ফেলে লন্ডনের ওই ভাড়া বাড়িটায়। চিঠিপত্র যদিও-বা লিখে থাকেন লেডি— সে-চিঠি এরা গায়েব করেছে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল গয়না দখল করা— এতদিনে সে-কাজও করেছে— তাই একটা একটা করে গয়না বাঁধা দিতে আসছে। এখন আর লেডি কারফাক্সকে জ্যান্ত ছেড়ে দেওয়া যায় না— তাই তাঁকে খুন করাই ওদের পক্ষে মঙ্গল।'

'সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

'এবার আর এক লাইন ধরে চিন্তা করা যাক। দু-লাইনের যুক্তি যেখানে কাটাকুটি করবে— সেইটাই আসল সত্যি বলে জানবে। আমরা এখন লেডিকে ছেড়ে কফিনকে নিয়ে চিন্তা করব। বাগান খুঁড়ে লাশ পুঁতে দিলেই যখন ল্যাটা চুকে যায়, তখন এত হেপাজত করে কফিন আনা হল কেন? পুরো ব্যাপারটাই আইনসংগত হচ্ছে। তাই না? মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আর সরকারি অনুমতি না-থাকলে কাউকে কফিনে করে কবর দেওয়া যায় না। তাহলে কি বিষ খাইয়ে অথবা এমনভাবে লেডিকে খুন করা হয়েছে যে ডাক্তারের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে? ডাক্তার কিন্তু হাতের লোক না হলে এ-অবস্থায় লাশের ধারেকাছেও কেউ আসতে দেয় না। তবে কি ডাক্তার ওদেরই লোক? এটা কিন্তু সম্ভব বলে মনে হয় না।'

'মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জাল করেনি তো?'

'সেটা আরও বিপজ্জনক, ওয়াটসন। এসে গেছি— ওই তো বন্ধকি দোকান ছাড়িয়ে এলাম। দাঁড়াও হে গাড়োয়ান! নামো ওয়াটসন। তোমার চেহারা এমনি যে দেখলেই বিশ্বাস হয়— কারো

সন্দেহ হয় না। সোজা ঢুকে পড়ো। জিজ্ঞেস করো, আগামীকাল পোল্টনি স্কোয়ারের কফিন কবরে যাবে ক-টার সময়ে।'

বিনা দ্বিধায় দোকানের মেয়েটি বললে, 'সকাল আটটার সময়ে।'

হোমস শুনে বললে, 'দেখলে তো, যেভাবেই হোক রাস্তা পরিষ্কার রেখেছে রাসকেলরা— সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে— আইনসংগতভাবে কবর দিতে চলেছে লেডিকে। আর দেরি করা চলে না। আইনের পথে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে— পুলিশের আশায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। কপাল ঠুকে দেখাই যাক না কেন। হাতিয়ার আছে কাছে?'

'ছড়িটা আছে!'

'ওতেই হবে। আইনের রক্তচক্ষুকে ওরা যখন আর পরোয়া করে না, তখন বেআইনিভাবে সোজা হামলা জুড়ে দেখা যাক কাজ হয় কি না। ওহে গাড়োয়ান, তুমি যেতে পারো। চলো ওয়াটসন।'

পোল্টনি স্কোয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড়োসড়ো কালচে রঙের বাড়ির সামনে গিয়ে খুব জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে কপাট খুলে দাঁড়াল ঢ্যাঙা মতন একটা মেয়েছেলে।

হল ঘরের ম্যাড়মেড়ে আলোর পটভূমিকায় কালো ছায়ামূর্তিটাই কেবল চোখে পড়ল আমাদের। শুধোল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'কী চাই?'

'ডক্টর শ্লেসিংগারের সঙ্গে কথা বলতে চাই', ঝটিতি জবাব দিল হোমস।

'ও-নামে এখানে কেউ থাকে না', বলেই যেই দরজা বন্ধ করতে যাবে, একটা দরজার ফাঁকে পা ঢুকিয়ে দিল হোমস।

বলল কড়া গলায়, 'যে-নামেই থাকুক না কেন, দেখা করতে চাই।'

দ্বিধায় পড়ল স্ত্রীলোকটি। পরক্ষণেই দু-হাট করে দরজা খুলে ধরে বললে, 'আসুন ভেতরে। আমার স্বামী কাউকে ডরায় না।' হল ঘরের ডান পাশে বসবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, 'বসুন। আসছেন মিস্টার পিটার্স।'

বেরিয়ে গেল মেয়েটি। পোকায় খাওয়া ধুলোয় ভরা ঘরটার চেহারা ভালো করে দেখবার আগেই বেড়ালের মতো নিঃশব্দ চরণে ঘরে ঢুকল সৌম্যদর্শন টাক মাথা দাড়ি গোঁফ কামানো বিরাট একটা লোক— মুখটা আশ্চর্য লাল, পুরন্ত গাল— কিন্তু ঠোঁটের গড়ন নিষ্ঠুর, পাশবিক।

বলল সহজ সুরে, 'ভুল করেছেন মনে হচ্ছে। যাকে খুঁজছেন, তাকে আর একটু এগোলেই—'

শক্ত গলায় হোমস, 'ব্যস, ওতেই হবে। নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। তুমি হেনরি পিটার্স ওরফে রেভারেন্ড ডক্টর শ্লেসিংগার। আমার নাম শার্লক হোমস।'

চমকে উঠল লোকটা। খরখরে চোখে চাইল ভয়ানক মানুষটার দিকে। বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, 'মিস্টার হোমস, আপনার নাম শুনে আঁতকে ওঠার কারণ দেখি না। বিবেক আমার পরিষ্কার। কী জন্যে এসেছেন এখানে?'

'বাদেন থেকে সঙ্গে যাকে পাকড়ে এনেছ, সেই লেডি কারফাক্সকে নিয়ে কী করেছ জানতে চাই।'

'ভদ্রমহিলা কোথায় আমাকে যদি বলেন তো আমারও খুব উপকার হয়। প্রায় এক-শো পাউন্ড পাই তাঁর কাছ থেকে। বাদেনে অন্য নাম নিয়েছিলাম ঠিকই, সেই সময়ে ভদ্রমহিলা ভাব জমালেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আঠার মতো পেছনে লেগে থেকে আসেন লন্ডনেও। হোটেলের বিল, টিকিট— সব, সব আমি মিটিয়েছি। লন্ডনে এসেই হাওয়া হয়েছেন— ফেলে গেছেন কয়েকটা যাচ্ছেতাই সেকেলে গয়না— দেনা মিটোনোর জন্যে নিশ্চয়ই। মিস্টার হোমস, খুঁজে বার করুন তাঁকে— আর আমার দেনাটা মিটিয়ে দিন।'

'খুঁজে বার করব বলেই তো এসেছি। এ-বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখব এখুনি।'

'শমন এনেছেন?'

হোমস তার পকেট থেকে রিভলভারটা একটু টেনে বের করল।

অ্যালেক বল, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯১১

পকেট থেকে রিভলভারটা একটু টেনে বার করে দেখাল শার্লক হোমস, 'আপাতত এই শমনেই কাজ হবে— এর চাইতে ভালো শমন পরে আসছে।'

'আচ্ছা ছিঁচকে চোর তো আপনি!'

প্রফুল্ল কণ্ঠে হোমস বললে, 'আমার এই স্যাঙাতটিও কিন্তু বিপজ্জনক লোক। এ-বাড়ি তল্লাশ করব দুজনেই।'

দরজা খুলে ধরে পিটার্স বললে, 'অ্যানি পুলিশ ডাক!' মেয়েলি স্কার্টের খসখস আওয়াজ শুনলাম সিঁড়িতে— দুম করে খুলেই বন্ধ হয়ে গেল হল ঘরের দরজা।

'ওয়াটসন!' দ্রুত কণ্ঠে বললে হোমস, 'সময় খুব কম। পিটার্স, বাধা দিতে এস না— জখম হবে। কফিনটা কোথায়?'

'কফিন নিয়ে আপনার কী দরকার? একটা ডেডবডি রয়েছে ওর মধ্যে।'

'আমি দেখব বডিটা।'

'আমি দেখতে দেব না।'

'তাহলে নিজেই দেখব,' হন হন করে হল ঘরে ঢুকে গেল হোমস। পাশের দরজাটা আধখোলা দেখে ঢুকে পড়ল সেই দরজা দিয়ে। খাবার ঘর সেটা। ম্যাড়মেড়ে গ্যাসের আলোটা বাড়িয়ে দিতেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপর শোয়ানো কফিনটা। ডালা খুলে ফেলল হোমস। ভেতরে শুয়ে সিটিয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। হাজার অনাহার, উৎপীড়ন বা অসুখেও এ-চেহারায় আসতে পারেন না সুন্দরী লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স। যুগপৎ বিস্ময় আর স্বস্তিবোধ ফুটে উঠল হোমসের চোখে-মুখে।

'হে ভগবান! এ যে দেখছি অন্য একজন।'

'মিস্টার শার্লক হোমসও ভুল করেন তাহলে!' পেছন পেছন এসে মিষ্টি মিষ্টি করে বলল পিটার্স।

'কে এ?'

'আমার স্ত্রীর বুড়ি নার্স— রোজ স্পেন্ডার। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি[১৬] থেকে নিয়ে আসি তিনদিন আগে, তেরো নম্বর ফেয়ার ব্যাঙ্ক ভিলা থেকে ডক্টর হর্সোমকে এনে চিকিৎসা করাই এই তিনদিন— ঠিকানাটা মুখস্থ করে ফেলুন মিস্টার হোমস। তিনদিন সবরকম চেষ্টা করেও লাভ কিছু হল না— মারা গেলেন তৃতীয় দিনে। ডাক্তার বলছেন বুড়ি হয়েছে বলে টিঁকে থাকতে আর পারল না— আপনি কী বলবেন সেটা আপনিই ভেবে নিন। ধার্মিক খ্রিস্টানের মতোই তাকে বাঁচাতে গিয়েছি, না-পেরে কবর দেওয়ার ব্যবস্থাও করছি। কেনিংটন রোডের স্টিমসন কোম্পানিকে বলে দিয়েছি কাল সকাল আটটায় যেন কবর দেওয়া হয় কফিনটা। ছ্যাঁদা পেলেন মিস্টার ছিদ্রান্বেষী? আস্ত গাধার মতো এমন ভুলও মানুষে করে? কফিনের ডালা খোলার সময়ে আপনার হাঁ-করা চোখ-ঠেলে-বেরিয়ে আসা মুখের চেহারাটার ফটো তুলে রাখলে পারতাম। ভেবেছিলেন দেখবেন অন্তিম শয়ানে শুয়ে আছেন লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স। তার বদলে দেখতে পেলেন নব্বই বছরের এ-বুড়িকে।'

ঠাট্টা বিদ্রূপের তুফানের মধ্যেও অবিচলিত রইল শার্লক হোমস। ভেতর ভেতর যে ফুঁসছে, তা বোঝা গেল দু-হাত মুঠো করা দেখে।

বলল, 'বাড়িটা তল্লাশ করব।'

'করা বার করছি আপনার!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে পিটার্স। বাইরের প্যাসেজে শোনা গেল নারীকণ্ঠ এবং একাধিক পদশব্দ। 'এইদিকে আসুন, এই দেখুন— এই দুটো লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে হামলা জুড়েছে— কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। ঘাড় ধরে বের করে দিন তো।'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন সার্জেন্ট আর একজন কনস্টেবল। পকেট থেকে নিজের কার্ড বার করে এগিয়ে দিল হোমস, 'এই আমার নাম-ঠিকানা। ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন।'

'আপনাকে কে না চেনে, মিস্টার হোমস। কিন্তু স্যার শমন ছাড়া এখানে আর থাকতে তো পারবেন না,' বললে সার্জেন্ট।

'তা পারব না।'

'গ্রেপ্তার করুন!' চিৎকার করে বলল পিটার্স।

'সেটা আমার কাজ, আমি বুঝব,' গ্রামভারী চালে বললে সার্জেন্ট। 'মিস্টার হোমস, আপনার কিন্তু এখানে আর থাকা হবে না।'

'চলো, ওয়াটসন।'

রাস্তায় এসে রাগে অপমানে গরম হয়ে গেলাম আমি— হোমস কিন্তু নির্বিকার। পেছন পেছন সার্জেন্ট বেরিয়ে এসে বললে, 'মিস্টার হোমস, আমি দুঃখিত। কিন্তু আইন যা, তা মানতেই হবে।'

'ঠিক কথা, সার্জেন্ট। আপনার আর কিছু করার ছিল না।'

'কারণ ছিল বলেই বাড়ি ঢুকেছিলেন বুঝতে পারছি। আমাকে দিয়ে যদি কোনো সাহায্য হয় তো বলতে পারেন।'

'একজন নিখোঁজ লেডির খোঁজে গিয়েছিলাম। বাড়ির মধ্যেই আছেন ভদ্রমহিলা। শমনও এল বলে।'

'বেশ তো, আমি চোখ রাখছি। খবর পেলেই জানাব আপনাকে।'

সবে তখন ন-টা বাজে। তদন্ত চালিয়ে গেলাম পুরোদমে। সোজা গেলাম ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস আতরশালায়। সত্যিই দিন তিনেক আগে এক সহৃদয় দম্পতি এসে তাদেরই এক পুরোনো চাকরানিকে নিয়ে গেছে। মারা গেছে বুড়ি? আশ্চর্য কিছু নয়। অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

এর পর গেলাম ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্রেফ জরায় ধুঁকতে ধুঁকতে পরলোকে গিয়েছে বুড়ি। আমি তো গিয়ে দেখলাম শেষ হয়ে গিয়েছে। লিখে দিলাম ডেথ সার্টিফিকেট। না, বাড়ির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ, একটা খটকা লেগেছে। ওইরকম দানধ্যানের মন আর পকেটের জোর যাদের, তাদের বাড়িতে একটা চাকর পর্যন্ত নেই, এ কেমন কথা?'

শেষকালে গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। গিয়ে শুনলাম শমন বার করা নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে বেচারি লেসট্রেড। দেরি একটু হবেই। আগামীকাল সকালের আগে সই পাওয়া যাবে না ম্যাজিস্ট্রেটের। শার্লক হোমস যদি লেসট্রেডের সঙ্গে সকাল ন-টা নাগাদ একটু তদবির করেন তো ভালো হয়। মাঝরাত নাগাদ এল সার্জেন্ট। বললে, বিশেষ কিছু খবর নেই। বিশাল বাড়িটার নানান জানলায় মাঝে মাঝে কেবল আলোর ঝলক দেখা গেছে।

মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়ায় কথা বলার মুডে পর্যন্ত রইল না হোমস। শুতে যাওয়ার সময়ে দেখলাম পাইপের পর পাইপ কড়া তামাক টেনে চলেছে আর সরু সরু কাঁপা আঙুল দিয়ে সমানে টরে টক্কা বাজনা বাজিয়ে চলেছে চেয়ারের হাতলে। এ-লক্ষণ আমার চেনা। সমস্যার অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধান মাথার মধ্যে নিয়ে তোলপাড় করার সময়ে এমনি অস্থির হয়ে পড়ে ও। সারারাত বেশ কয়েকবার তন্দ্রার ঘোরে শুনলাম পায়চারি করছে বাড়িময়। সকাল বেলা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল ঘরে। পরনে ড্রেসিং গাউন, কিন্তু ফ্যাকাশে মুখ আর গর্তে-বসা চোখ দেখেই বুঝলাম নিদ্রাদেবীকে বিমুখ করেছে সারারাত।

'কবর দেওয়া হবে ক-টার সময়ে ওয়াটসন? আটটা তো? এখন বাজে সাতটা কুড়ি। এখনও সময় আছে, ওয়াটসন, এখনও সময় আছে। মাথায় আমার কী আছে বলতে পার? ব্রেনটা কি ঘুমিয়েছিল? তাড়াতাড়ি নাও, ঝটপট গা তোলো! জীবন ঝুলছে সুতোর ওপর— কে জানে এতক্ষণে মরণ এসে গেল কি না। এ ভুলের জন্যে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না নিজেকে! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

পাঁচ মিনিটও গেল না, বেকার স্ট্রিট দিয়ে আমাদের নিয়ে উল্কাবেগে যেন উড়ে চলল একটা ঘোড়ার গাড়ি। আটটা বাজতে পঁচিশ মিনিটের সময়ে পেরিয়ে এলাম বিগবেন[১৭], ঠিক আটটার সময়ে ঢুকলাম ব্রিক্সটনে, আটটা দশে বাড়িটার দোরগোড়ায়। আমাদের মতো অপরপক্ষরও দেরি হয়েছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘোড়া যখন দাঁড়াল, ঠিক তখনই চৌকাঠের ওপর দিয়ে একটা বিরাট কফিন ধরাধরি করে বার করে আনা হল বাইরে। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেল হোমস।

পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে একদম সামনের লোকটার বুকে ঠেলা দিয়ে বললে তারস্বরে, 'ফিরে চলো! ফিরে চলো! এক্ষুনি ফিরে চলো!'

কফিনের পেছন থেকে বিরাট লাল মুখখানা আরও লাল করে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল পিটার্স, 'আবার কী শয়তানি করতে এসেছেন? শমন কোথায়?'

'শমন আসছে— না-আসা পর্যন্ত কফিন বাড়িতে থাকবে।'

হোমসের কণ্ঠস্বরের কর্তৃত্ব অমান্য করা বড়ো কঠিন— সেইমুহূর্তে প্রত্যেকেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল চৌকাঠে। নিমেষমধ্যে বাড়ির মধ্যে উধাও হল পিটার্স। ফলে, হোমসের হুকুম না-মেনে পারল না কুলিরা। টেবিলে কফিন রাখতে-না-রাখতেই একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে ক্ষিপ্তের মতো, 'তাড়াতাড়ি হাত চালাও, ওয়াটসন! যত তাড়াতাড়ি পার ডালাটা খোলো।' আর একটা স্ক্রু-ড্রাইভার একজন কুলির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এই নাও, তুমিও খোলো— এক মিনিটের মধ্যে খুলতে পারলে এক মোহর বকশিশ!' একটার পর একটা স্ক্রু খুলে ছিটকে যেতে লাগল মেঝের ওপর— আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল হোমসের উত্তেজনা— তুবড়ির মতো ছুটল কথার ফুলকি, 'খুলেছে! খুলেছে! আর একটা স্ক্রু খুলেছে! প্রশ্ন নয়— একদম প্রশ্ন নয়! আরও খুলছে! নাও, এবার সবাই মিলে চাড় মারো— টান মারো— হেঁইয়ো! খুলে গেছে! খুলে গেছে!'

সবাই মিলে গায়ের জোরে টেনে খুলে ফেললাম কফিনের ডালা। সঙ্গেসঙ্গে ভক করে নাকে ঢুকল ক্লোরোফর্মের কড়া গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল সেই গন্ধে। ভেতরে শায়িত একটা নারীদেহের সারামুখটা ঢাকা রয়েছে জ্ঞানলোপকারী এই আরকে ভিজানো তুলোর আস্তরণে। টান

মেরে ছুড়ে ফেলে দিল হোমস— বেরিয়ে পড়ল মাঝবয়েসি এক মহিলার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে সুন্দরী সুশ্রী মুখশ্রী। চকিতের মধ্যে মূর্তির তলায় হাত দিয়ে উঠিয়ে বসিয়ে দিল হোমস।

'ওয়াটসন বেঁচে আছে না, মারা গেছে? খুব দেরি করে ফেললাম কি?'

আধঘণ্টা ধরে মনে হল সত্যিই বড়ো দেরি করে ফেলেছি। ক্লোরোফর্মের জন্যেই হোক কি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক মনে হল জীবনের শেষ দ্বার পেরিয়ে গেছেন লেডি ফ্রান্সেস— বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছি— আর ওঁকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তা সত্ত্বেও চালিয়ে গেলাম কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বওয়ানোর চেষ্টা, ইথার ইঞ্জেকশন[১৮], বিজ্ঞান যা কিছু জেনেছে, তার কোনো পদ্ধতিটাই বাদ দিলাম না। তারপর যেন মনে হল, নাকের সামনে আয়না ধরলে সামান্য ঝাপসা দেখাচ্ছে, চোখের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে এবং পলায়মান প্রাণ আবার ফিরে আসছে। এই সময়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। খড়খড়ি ফাঁক করে দেখল হোমস। বলল, 'লেসট্রেড এসে গেছে শমন নিয়ে— কিন্তু যার জন্যে আনা সে তো ভাগলবা! ওই তো আর একজন আসছেন— ' ভারী পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল প্যাসেজে— 'লেডিকে সেবা করার অধিকার আমাদের চাইতে এঁরই বেশি। আসুন, মিস্টার গ্রিন।' লেডি ফ্রান্সেসকে এখুনি এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করুন। আর হ্যাঁ, কফিন নিয়ে যাও— ওর মধ্যে যে-বুড়িটা শুয়ে আছে, তাকে শান্তির শয্যায় শুইয়ে দাও।'

সেইদিন রাতেই হোমস বললে, 'ওয়াটসন, এ-কাহিনি যদি কখনো লেখ, তবে তা আমার এই অত্যন্ত সাজানো গোছানো ব্রেনের মারাত্মক পদস্খলনের নজির হয়ে থাকবে চিরকাল। মস্তিষ্কের এ-রকম বাহাত্তুরে রোগ সবারই মাঝে মাঝে হয়— এ ধরনের সাংঘাতিক ভুল সব মানুষই করে— কিন্তু ভুলটা ধরতে পেরে যে-মানুষ শুধরে নিতে পারে, তাকেই বলব মানুষের মতন মানুষ। এ-মর্যাদার যোগ্য কেবল আমিই। কেননা সমস্ত রাতটা আমি অস্থির হয়ে কেবল একটা সূত্র, একটা কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছি। বার বার মনে হয়েছে, সামান্য এই কথাটা আমার গোচরে আনা হয়েছিল। কিন্তু আমি খেয়াল করিনি। কথাটা অদ্ভুত, বিচিত্র একটা পর্যবেক্ষণ, কিন্তু সূত্র হিসেবে অসাধারণ। অথচ আমি শুনেও শুনিনি— মনে রাখিনি। ভোরবেলা বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল কথাটা। কবর দেওয়ার ব্যবস্থা যে করে, তার বউ বলেছিল— শুনে ফেলেছিলেন মিস্টার গ্রিন— 'একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব বলুন, বেমক্কা সাইজ— বড্ড বড়ো। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।' বেমক্কা সাইজ— বড্ড বড়ো বলতে কী বোঝাচ্ছিল বুঝেছ? কফিন— কফিন! কফিনের কথা হচ্ছিল। আকারে বড়ো— সাধারণ কফিনের মতো নয়। কেন? এ-রকম বেয়াড়া মাপে কফিন তৈরি হল কেন? সঙ্গেসঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল সুগভীর কফিনের মাঝখানে শোয়ানো ছোট্ট একটা দেহ— গুটিয়ে এইটুকু হয়ে যাওয়া বুড়ির মৃতদেহ। কেন? এইটুকু দেহের জন্যে এতবড়ো কফিন কেন? আর একটা দেহ রাখবার জন্যে। কিন্তু কবর দেওয়া হবে একই ডেথ সার্টিফিকেটের জোরে। এত সোজা ব্যাপারটা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বুদ্ধির গোড়ায় গলদ জমেছিল বলে। ঠিক আটটায় কবরস্থ হবেন লেডি ফ্রান্সেস। গাড়ি থেকে কফিন বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আটকাতে হবে আমাদের— যেভাবেই হোক।

'জীবিত পাব কি না জানি না— তবুও মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। তার দামও পেয়েছি—

প্রাণটা গিয়েও বলতে পার ফিরে এসেছে সময়মতো পৌঁছোতে পেরেছিলাম বলে। যদ্দূর জানি, এরা খুন-টুনের ধার দিয়েও যায় না। মারপিটের সম্ভাবনা দেখলেই সরে পড়ে। লেডি ফ্রান্সেসকে কবর দেওয়া হবে মৃত অবস্থায়— অথচ যদি কোনোদিন কবর খুঁড়ে দেখা হয় তো মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার বিশ্বাস ঠিক এই লাইনেই চিন্তা করেছিল পিটার্স। এরপর কী কী ঘটেছিল, মনে মনে ভেবে নিতে পার। সিঁড়ির ওপরে কি কাছে আমরা দেখিনি। ওপরতলাতেই একটা খুপরিতে বন্দিনী ছিলেন লেডি ফ্রান্সেস অ্যাদ্দিন। দুজনে দৌড়ে গেছে সেখানে, গায়ের জোরে নাকে ক্লোরোফর্ম চেপে ধরেছে, ধরাধরি করে এনে কফিনে শুইয়েছে। কফিনের মধ্যে আরও ক্লোরোফর্ম ঢেলেছে যাতে জ্ঞান ফিরে না-পায়, তারপর স্ক্রু এঁটে ডালা বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়াটসন, এ-রকম অপূর্ব কায়দা এত বছরেও আমার চোখে পড়েনি। অপরাধের ইতিহাসে এ-ঘটনা একেবারে নতুন। লেসট্রেডের হাত ফসকে প্রাক্তন-পাদরি যদি সত্যিই লম্বা দেয়, শিগ্গিরই আরও চমকপ্রদ অপরাধের পর অপরাধের সংবাদ কানে আসবে তোমার।'

টীকা

১. **লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান রহস্য :** স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন এবং আমেরিকান ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অব লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স'। জানা যায়, প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লেডি ফ্রান্সেস উল্লিখিত হয়েছিলেন লেডি মারিয়া নামে। আমেরিকান ম্যাগাজিনে গল্পটির শিরোনাম ছিল 'দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অব লেডি কারফাক্স'।

২. **টার্কিশ বাথ :** স্টিম বাথ বা বাষ্পের দ্বারা স্নানের তুর্কি সংস্করণ। ভিক্টোরীয় যুগে ইংলন্ডে এই ধরনের স্নান জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৩. **লসান :** সুইজারল্যান্ডে, লেক জেনেভার তীরবর্তী শহর। জেনেভা শহর থেকে বাষট্টি কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এর অবস্থান। শহরের উত্তর পশ্চিমে জুরা পর্বতমালা অবস্থিত।

৪. **মঁপেলিয়র :** প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য। এই শহরের এক ল্যাবরেটরিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪-এর অজ্ঞাতবাসের সময়ে কয়েকমাস পরীক্ষানিরীক্ষা করেন হোমস।

৫. **বাদেন :** জার্মানির ব্যাদেন-ব্যাদেন কিংবা সুইজারল্যান্ডের ব্যাদেন-এর মধ্যে যেকোনো একটি জায়গা হওয়া সম্ভব।

৬. **রেনিজ :** রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। মধ্য ইউরোপের এই অঞ্চল বিখ্যাত রাইনল্যান্ড নামে।

৭. **কুকস-এর স্থানীয় অফিস :** ১৮৪১-এর ৯ জুন প্রতিষ্ঠিত থমাস কুক ট্র্যাভল এজেন্সি। ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক থমাস কুক (১৮০৮-১৮৯২) লাফবরোতে একটি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সহকর্মীদের প্রস্তাব দেন একসঙ্গে ভ্রমণ করতে এবং মিডল্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করেন আলাদা কয়েকটি কামরায় মাথাপিছু এক শিলিং ভাড়ায় পাঁচশো যাত্রীকে নিয়ে যেতে। এতে যে অর্থের সাশ্রয় হয়, তাই দেখে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজেই ব্যাবসা শুরু করেন দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করাতে। কুকের ব্যাবসা ইংলন্ডের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ১৮৫৫ সাল থেকে। লসেন শহরে কুক কোম্পানির অফিস খোলা হয় ১৮৯১-এ।

৮. **মিডিয়ানটিস রাজ্য :** ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত, ইস্রায়েলাইটদের সঙ্গে সম্পর্কিত, আরব মরুভূমির যাযাবর জাতি মিডিয়ানটিস। এঁরা হলেন আব্রাহামের ছেলে মিডিয়ানের বংশধর। মোজেসের স্ত্রী জিফোরা ছিলেন মিডিয়ানটিস পুরোহিত জেথ্রোর কন্যা। তবে মিডিয়ানটিস রাজ্য নামে আলাদা কোনো রাজ্য ছিল না।

৯. **বারবারটন :** দক্ষিণ আফ্রিকার ডি কাপ উপত্যকায় মাকনজোয়া পর্বতমালায় অবস্থিত শহর। এই শহরের সন্নিহিত বারবার্স রীফ অঞ্চলে ১৮৫৪ সালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়।

১০. **ল্যাংহ্যাম হোটেল :** লন্ডনের পোর্টল্যান্ড প্লেসে অবস্থিত এই হোটেলে আর্থার কন্যান ডয়ালের সঙ্গে লিপিনকট

ম্যাগাজিনের সম্পাদক যোসেফ মার্শাল স্টডার্টের 'দ্য সাইন অব ফোর' উপন্যাসের প্রকাশন সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছিল।

১১. **অ্যাডিলেড :** দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী শহর।

১২. **ওয়েস্টমিনস্টার রোড :** লন্ডনে এই নামে কোনো রাস্তা নেই। হোমস সম্ভবত ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ রোডের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

১৩. **বেভিংটনের :** সম্ভবত ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত অলংকার বিক্রেতা 'ব্র্যাভিংটন্স'।

১৪. **ক্রিমিয়ান যুদ্ধ :** 'দ্য গ্লোরিয়া স্কট' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫. **অ্যাজোভ সাগর :** স্থলে ঘেরা বিশাল হ্রদ অ্যাজোভ বা অ্যাজফ সাগর আসলে ব্ল্যাক সি-র উত্তর দিকের অংশ। কার্চ (Kerch) প্রণালী এটিকে ব্ল্যাক সি-র সঙ্গে যুক্ত করেছে।

১৬. **ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি :** ইংলন্ডে ওয়ার্কহাউস দরিদ্র মানুষদের কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৬০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া দরিদ্র এবং অসুস্থদেরও রাখা হত এখানে। এখানকার বাসিন্দাদের বেওয়ারিশ মৃতদেহ অ্যানাটমির ক্লাসে ব্যবহার করা হত ১৮৩৩ সালের আইনে। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি সংস্থাটি অবশ্য কাল্পনিক।

১৭. **বিগবেন :** লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার প্যালেসের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত টাওয়ারের চারমুখো ঘড়ির ঘণ্টার আদরের ডাকনাম বিগবেন হলেও সম্পূর্ণ টাওয়ারটিকেই বিশ্ববাসী চেনেন বিগবেন নামে। ১৮৫৮-র দশই এপ্রিল এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল।

১৮. **ইথার ইঞ্জেকশন :** ইথারের গন্ধ রোগীকে অ্যানিস্থিসিয়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হলেও হৃৎপিণ্ডকে 'স্টিমুলেট' করতে ইথার ইঞ্জেকশন দিতেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন ওঠে ওই তাড়াহুড়োয় ইথার ইঞ্জেকশন জোগাড় হল কোথা থেকে? ওয়াটসন কি তার ডাক্তারি সরঞ্জাম সবসময়ে সঙ্গে রেখে দিত?

শয়তানের পা[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডেভিলস ফুট]

বন্ধুবর শার্লক হোমসের কীর্তিকাহিনি লিখতে গিয়ে সবচেয়ে বড়ো যে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছি তা হল হোমসেরই অনিচ্ছা— নিজের ঢাক নিজে তো পিটবেই না— কাউকে পিটতেও দেবে না। কথা বলে কম, ছিদ্র খোঁজে সব কিছুর মধ্যে। প্রকৃতি কাঠখোট্টা। কাছে গেলে ভয় লাগে। সস্তা বাহবায় তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। রহস্যের জট সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে ঠিক সমাধানে পৌঁছোতে পারলেই অনাবিল তৃপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে কানায় কানায়— সেইটাই ওর সবচেয়ে বড়ো আনন্দ, সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। তারপর বাহবার ভাগটুকু তুলে দেয় সরকারি গোয়েন্দার হাতে এবং যখন দেশ জুড়ে ধন্য-ধন্য রব ওঠে সরকারি গোয়েন্দাটির নামে, বিদ্রূপের হাসি হাসে আপন মনে। শুধু এই কারণেই প্রচুর রসদ হাতে থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক বছর ওর অনেক ভালো ভালো কীর্তিকলাপ জনগণকে উপহার দিতে পারিনি আমি।

তাই গত মঙ্গলবার হোমসের কাছ থেকে টেলিগ্রামটা পেয়ে অবাক হলাম। এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। এভাবে তো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কখনো ফরমাশ করেনি হোমস। লিখেছে : 'কর্নিশ-আতঙ্ক নিয়ে এবার কিছু লিখে ফেলো— পাঠকরা চমকে যাবে। অনেক অদ্ভুত কেসের সমাধান করেছি— কিন্তু এত অদ্ভুত কোনোটাই নয়।' জানি না হঠাৎ এ-খেয়াল ওর মাথায় এল

কেন, কেনই-বা মনে পড়ল পুরোনো কাহিনি— আমি কিন্তু আর দেরি করলাম না। মত পালটে যাওয়ার আগেই তড়িঘড়ি কেসটার পুরোনো কাগজপত্র খুঁজে নিয়ে লিখতে বসেছি আশ্চর্য ভয়াল সেই উপাখ্যান।

১৮৯৭ সালের বসন্তকালে শরীর ভেঙে পড়ে শার্লক হোমসের। লোহার কাঠামোতেও ঘুণ ধরার উপক্রম হয় অত্যধিক পরিশ্রম আর স্বাস্থ্যরক্ষায় বিন্দুমাত্র যত্ন না-নেওয়ার দরুন। মার্চ মাসে ধূমকেতুর মতো রীতিমতো নাটকীয়ভাবে হোমসের জীবনে ঢুকে পড়লেন হার্লে স্ট্রিটের[২] বিখ্যাত ডাক্তার মুর আগার— সে-কাহিনি অন্য সময়ে বলা যাবে'খন[৩] এবং জানিয়ে দিলেন কর্মক্ষমতা জন্মের মতো চলে যাবে যদি এখুনি সব কাজ ফেলে ঢালাও বিশ্রাম না নেয় হোমস। নিজের শরীর নিয়ে কোনোকালেই ভাবত না হোমস— শরীর থেকে মনকে সরিয়ে আনার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বলেই বুঁদ হয়ে থাকত হাতের কাজ আর চিন্তায়। কিন্তু যখন শুনল জন্মের মতো কাজ করার ক্ষমতা চলে যেতে পারে বিশ্রাম না নিলে, তখন সব কাজ ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঠিক করল বায়ু পরিবর্তনে যাবে। এই কারণেই সেই বছর বসন্তের গোড়ায় কর্নিশ অন্তরীপের[৪] শেষ প্রান্তে পোলধু উপসাগরের[৫] কাছে একটা ছিমছাম ছোট্ট কটেজে আস্তানা নিলাম দুই বন্ধু।

অপূর্ব জায়গা বটে, হোমসের নীরস অন্তর প্রকৃতির উপযুক্ত। ঘাস ছাওয়া উঁচু জমির ওপর আমাদের চুনকাম করা কটেজের জানলা থেকে চোখ পড়ত অর্ধবৃত্তাকারে ক্রূর কুটিল দৃশ্যের পর দৃশ্য, দেখতাম পালতোলা জাহাজের মরণফাঁদ মাউন্টস বে[৬]— দেখতাম কীভাবে সারি সারি খোঁচা খোঁচা কালচে এবড়োখেবড়ো পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জলের মধ্যে থেকে। সাগরফেনায় ঢাকা এই চোরা পাথরের ধাক্কায় ডুবেছে বহু জাহাজ, মরেছে বহু খালাসি। অথচ উত্তুরে বাতাসে বড়ো শান্ত দেখায় ভয়াল এই মাউন্টস বে— দূর থেকে ঝড়ে উথালিপাথালি জাহাজ ছুটে আসে মরীচিকার টানে— আসে একটু স্থির হতে, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের ঝড় এলেই কিন্তু চেহারা পালটে যায় শান্ত সুন্দর এই উপসাগরের। তখন ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে জল ফুঁসে ওঠে, নোঙরে হ্যাঁচকা টান পড়ে, শুরু হয় পাথরের খোঁচা বাঁচিয়ে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শেষ লড়াই। তাই বুদ্ধিমান খালাসি এই শয়তান-অঞ্চলের ধারেকাছেও জাহাজ আনে না।

জলের মতো ডাঙার চেহারাও বুক কাঁপানো। ঢেউ খেলানো বাদার পর বাদা— বালিয়াড়ি রঙের তরঙ্গায়িত জলাভূমির শেষ যেন আর নেই। কাকপক্ষীও বুঝি থাকে না ধু-ধু সেই প্রান্তরে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে থাকা এক আধটা গির্জের চুড়ো দেখে কেবল বোঝা যায় ছন্নছাড়া সেকেলে গ্রামগুলো রয়েছে কোথায় কোথায়। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক বাসিন্দাদের তৈরি পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ— সুদূর অতীতে তারা যে এই বিজন অঞ্চলে ঘরসংসার করে গিয়েছিল— তার পাথুরে প্রমাণ— বিচিত্র থাম আর বিদঘুটে স্তূপের অন্তরালে তাদেরই চিতাভস্ম আর কিম্ভূতকিমাকার মাটির বাসনপত্র। জায়গাটার এই প্রাগৈতিহাসিক মাহাত্ম্য, হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া জাতির স্মৃতিচিহ্ন এবং সব মিলিয়ে একটা ভয়াল ভয়ংকর রূপ শার্লক হোমসের বেশ মনে ধরেছে বোঝা গেল। কল্পনায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার এমন উপযুক্ত খোরাক পেয়ে অধিকাংশ সময় কাটত নির্জন জলায় একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে। সুপ্রাচীন কর্নিশ ভাষাটাও[৭] খুব পছন্দ হয়েছে দেখা গেল। এই নিয়ে রীতিমতো চর্চাও আরম্ভ করে দিল। আমাকে

বললে, চালডিন ভাষার[৮] সঙ্গে নাকি কর্নিশ ভাষার দারুণ মিল আছে। টিনব্যবসায়ী ফিনিশিয়ানদের[৯] ভাষা থেকে বেশ কিছু শব্দ ধার করাও হয়েছে। ভাষাতত্ত্বর ওপর এক বাক্স বই আনিয়ে এই সম্পর্কে সবে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে পাণ্ডববর্জিত অমন একটা বিকট স্বপ্নিল দেশের কোত্থেকে একটা হতকুচ্ছিত কূট সমস্যা এসে হাজির হল একেবারে দোরগোড়ায়— খাস লন্ডন শহরেও এমন রক্ত-জল-করা, এমন প্যাঁচালো, এমন রহস্যজনক ধাঁধার জট কখনো ছাড়াতে হয়নি। দিব্যি শান্তিতে খেয়েদেয়ে বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম, এমন সময়ে মূর্তিমান উৎপাতের মতো এই চক্রান্তে জড়িয়ে যাওয়ায় শান্তিতে দিনযাপন শিকেয় উঠল, অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনার আবর্ত নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিপর্যস্ত করে তুলল আমাদের প্রাত্যহিক জীবন এবং সে-উত্তেজনায় চঞ্চল হল শুধু কর্নওয়াল নয়— সমগ্র পশ্চিম ইংলন্ড। আমার কিছু কিছু পাঠক হয়তো সে সময়ে খবরের কাগজে কর্নিশ-আতঙ্ক সম্বন্ধে দু-এক লাইন খবর পড়ে থাকতে পারেন— কিন্তু পুরো খবর কেউ জানেন না। তেরো বছর পরে অকল্পনীয় সেই কাহিনিই সবিস্তারে উপহার দিতে বসেছি সারাদেশকে।

আগেই বলেছি এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে থাকা গির্জের মাথাগুলো দেখেই বোঝা যেত মান্ধাতার আমলের গাঁগুলো রয়েছে কর্নওয়ালের কোথায় কোথায়। সবচেয়ে কাছের গ্রামটার নাম ট্রেডান্নিক ওলাস। শ্যাওলা ধরা সুপ্রাচীন একটা গির্জাকে ঘিরে শ-দুই বাসিন্দার অনেকগুলো কটেজ নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই গ্রাম। গাঁয়ের পাদরি মিস্টার রাউন্ড হে ভদ্রলোকের প্রত্নতত্ত্বের বাতিক থাকায় হোমস বেশ খাতির জমিয়ে নিল তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোক মাঝবয়েসি, মোটাসোটা, অমায়িক। স্থানীয় খবরের ডিপো বললেই চলে। চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে পাদরিসাহেবের বাড়ি গিয়ে জেনেছিলাম মর্টিমার ট্রেগেন্নিস নামে এক ভদ্রলোক পাদরির স্বল্প আয়কে একটু বৃদ্ধি করেছেন তাঁর পেল্লায় বাড়ির খানকয়েক ঘর ভাড়া নিয়ে। ভাড়াটের সঙ্গে পাদরির এমনিতে অনেক অমিল থাকলেও পয়সার দিক দিয়ে কিছুটা সুরাহা হওয়ায় কৃতার্থ হয়েছেন ব্যাচেলর পাদরি। ভাড়াটের চেহারাটা কিন্তু পাতলা, কালচে চোখে চশমা; হাঁটেন একটু ঝুঁকে— যেন বিকৃতি আছে শরীরের কোথাও! চায়ের আসর একাই মাতিয়ে রাখলেন পাদরিসাহেব— কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক চুপচাপ বসে রইলেন অন্যদিকে তাকিয়ে। যত রাজ্যের বিষাদ মুখে টেনে এনে অদ্ভুতভাবে মুখে চাবি এঁটে ডুবে রইলেন নিজের মনের ভেতর— মনে হল যেন অনেক দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। আসলে তাঁর প্রকৃতিই এইরকম মৌন।

ষোলোই মার্চ মঙ্গলবার এহেন দুই ব্যক্তি দুম করে ঢুকে পড়লেন আমাদের ঘরে— প্রাতরাশের ঠিক পরেই। আমরা তখন সবে ধূমপান আরম্ভ করেছি— শেষ করেই রোজকার অভ্যেসমতো জলা পরিভ্রমণে বেরোব ভাবছি।

উত্তেজিত কণ্ঠে পাদরি সাহেব বললেন, 'কাল রাতে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আর অত্যন্ত মর্মান্তিক একটা কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কপাল ভালো, বিধাতা সদয় বলেই অশ্রুতপূর্ব এই ঘটনার মধ্যে আপনাকে আমরা পেয়ে গেছি— ইংলন্ডে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যিনি এ-রহস্যের সমাধান করতে পারেন।'

আমি পাদরিমশায়ের দিকে নির্দয় চোখে কটমট করে তাকালাম। কিন্তু শিকারের গন্ধ পেলে ঝানু হাউন্ড যেভাবে চনমনে হয়ে ওঠে, ঠিক সেইভাবে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে পিঠ খাড়া করে

হোমস সিধে হয়ে বসল আস্তে আস্তে। হাতের ইশারায় বসতে বলল উত্তেজিত দুই অভ্যাগতকে। এঁদের মধ্যে অনেক সংযত দেখলাম মর্টিমার ট্রেগেনিসকে। তা সত্ত্বেও যেভাবে ভদ্রলোক অস্থিরভাবে রোগা-রোগা দু-হাত পরস্পর ঘষতে লাগলেন এবং কালো চোখের উজ্জ্বল চাউনি মেলে তাকিয়ে রইলেন, বেশ বুঝলাম, একই আতঙ্কে দুজনেই সমানভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বললেন পাদরিকে, 'আপনি বলবেন, না আমি বলব?'

হোমস বললে, 'দেখেছি আপনিই প্রথম ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছেন— উনি জেনেছেন পরে— সুতরাং আপনি শুরু করুন।'

ভারি সোজা এই অনুমিতি সিদ্ধান্ত অকৃত্রিম বিস্ময়চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল দুজনেরই মুখে। ব্যাপারটা আমিও বুঝলাম দুজনের সাজপোশাক দেখে। পুরুতমশায় পোশাক পরেছেন তাড়াহুড়ো করে, কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক শ্রীঅঙ্গে জামাকাপড় চাপিয়েছেন বেশ পরিপাটি করে।

পাদরি বললেন, 'আমি বরং গোড়ায় দু-একটা কথা বলে নিই। শোনবার পর ভেবে দেখবেন মিস্টার ট্রেগেনিসের কাছে বিশদ শুনবেন না সোজা ধাওয়া করবেন রহস্যে ঘেরা অকুস্থল অভিমুখে। জলার কাছে মান্ধাতার আমলের পাথরটার কাছেই ট্রেডান্নিক ওয়ার্দা ভবনে গত সন্ধ্যা কাটিয়ে এসেছেন ওঁর দুইভাই আর এক বোনের সঙ্গে, ভাইদের নাম ওয়েন আর জর্জ। বোনের নাম ব্রেন্দা। তাস খেলেছেন রাত দশটা পর্যন্ত— দশটার একটু পরেই চলে আসবার সময়ে দেখে এসেছেন তাস নিয়ে খাবার ঘরের গোল টেবিল ঘিরে মশগুল হয়ে বসে তিন ভাইবোন— শরীর বা মনের স্বাস্থ্য যতখানি ভালো থাকা সম্ভব, ততটা ভালো। খুব ভোরে ওঠা ওঁর অভ্যেস। আজ ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখা হয়ে গেল ডক্টর রিচার্ডসের সঙ্গে— জরুরি কল পেয়ে ছুটছেন ট্রেডান্নিক ওয়ার্দা ভবনে। উদ্‌বিগ্ন হলেন মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেনিস। গেলেন তৎক্ষণাৎ। গিয়ে দেখলেন এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখলেন, কাল রাতে ঠিক যেভাবে গোলটেবিল ঘিরে সামনে তাস নিয়ে বসা অবস্থায় ভাইবোন তিনজনকে দেখে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই বসে রয়েছে তারা, টেবিলে ছড়ানো রয়েছে তাস, মোমবাতি গোড়া পর্যন্ত পুড়ে নিভে গেছে। চেয়ারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে মরে পড়ে আছে বোন আর দু-পাশে বসে দু-ভাই বিকৃত গলায় চেঁচাচ্ছে, পাগলের মতো হাসছে, গান গাইছে, কখনো কাঁদছে— সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লক্ষণ তাদের নেই। তিন জনেরই মুখে ফুটে উঠেছে অবর্ণনীয় বিভীষিকার প্রতিচ্ছবি— বিকট খেঁচুনি আর প্রবল আক্ষেপে মুখগুলো যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে সীমাহীন আতঙ্কে। অনেক দিনের রাঁধুনি আর হাউসকিপার মিসেস পোর্টার ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। রাত্রে সে মড়ার মতো ঘুমিয়েছে— আওয়াজ-টাওয়াজ পায়নি। চুরিও যায়নি কিছু— কোথাও কিছু অগোছালো অবস্থাতেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না এমন কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল যা দেখে কল্পনাতীত আতঙ্কে একটি মেয়ে মরে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর দুটি শক্তসমর্থ পুরুষের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মিস্টার হোমস, সংক্ষেপে এই হল ঘটনা। আপনি যদি মাথা খাটান এ নিয়ে, মস্ত উপকার হয় আমাদের।'

মনে মনে ভাবছিলাম, কী করে কয়েকটা বাক্যবাণ ত্যাগ করে বন্ধুবরকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনব— এসেছি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগাতে— রহস্য সমাধান করতে নয়— এইটাই বুঝিয়ে বলব। কিন্তু ওর কোঁচকানো কপালের ভাঁজে আঁকা গভীর চিন্তার রেখা দেখে বুঝলাম বৃথা চেষ্টা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে অদ্ভুত নাটকটা নিয়ে যেন সমাহিত হয়ে রইল মনে মনে।

তারপর বললে, 'কথা দিচ্ছি, এ-ব্যাপারে আপনাদের পাশে আমি আছি। সত্যিই খুব

জটপাকানো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, খুবই রহস্যময়। আপনি কি সেখানে নিজে গেছিলেন, মিস্টার রাউন্ড হে?'

'না। মিস্টার ট্রেগেন্নিস ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিতেই তড়িঘড়ি করে আসছি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে।'

'জায়গাটা এখান থেকে কদ্দূরে?'

'মাইলখানেক।'

'তাহলে হেঁটেই যাওয়া যাক। যাওয়ার আগে মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

এতক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে ছিলেন মিস্টার ট্রেগেন্নিস। লক্ষ করলাম, ওঁর চাপা উত্তেজনা পাদরিমশায়ের ফেটে-পড়া উত্তেজনার চাইতে কোনো অংশে কম তো নয়ই— বরং বেশি। ফ্যাকাশে মুখে হোমসের দিকে উদ্‌বিগ্ন চোখে তাকিয়ে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। রোগা-রোগা দু-হাত কচলাচ্ছেন বিরামবিহীনভাবে। পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনি শুনতে শুনতে থর থর করে কাঁপছে দুই ঠোঁট। কুচকুচে কালো দুই চোখেও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্ণনার অতীত সেই আতঙ্ক।

বললেন সাগ্রহে, 'যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করুন, মিস্টার হোমস। যদিও বিষয়টা আলোচনা করার মতো নয়। তাহলেও যা জানি সব বলব।'

'কাল রাতের ঘটনা বলুন।'

'পাদরিমশায় যা বললেন, গেছিলাম আড্ডা মারতে। ওরা বললে, এক হাত হুইস্ট খেলা যাক। বসে গেলাম তাস নিয়ে। তখন ন-টা। উঠলাম সোয়া দশটা নাগাদ। ওরা তখন দারুণ ফুর্তিতে মশগুল হয়ে বসে টেবিল ঘিরে।'

'আপনাকে এগিয়ে দিল কে!'

'মিসেস পোর্টার শুয়ে পড়ায় আমি নিজেই হল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম— দরজা বন্ধ করলাম নিজেই। খাবার ঘরের জানলা বন্ধ ছিল কিন্তু খড়খড়ি তোলা ছিল। আজ সকালেও জানলা দরজার অবস্থা দেখলাম সেইরকম। বাড়িতে কেউ ঢুকেছে বলে মনে হল না। তা সত্ত্বেও সাংঘাতিক আতঙ্কে স্রেফ পাগল হয়ে গিয়েছে ভাইরা— আর ভয়ের চোটে মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে বোন— মাথাটা ঝুলে পড়েছে চেয়ারের হাতল পর্যন্ত। মিস্টার হোমস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঘরের সেই দৃশ্য মন থেকে আমি মুছতে পারব না।'

'আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য। আপনার নিজের কোনো ব্যাখ্যা আছে এ-ব্যাপারে?'

'খোদ শয়তান ঘরে ঢুকেছিল, মিস্টার হোমস!' কাঁপতে কাঁপতে বললেন মর্টিমার ট্রেগেন্নিস। শয়তান নিজে এসে দু-দুটো মানুষকে বদ্ধ উন্মাদ করে গিয়েছে— আর একজনের প্রাণকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে! এ-কাজ মানুষের নয়— হতে পারে না!'

'তাই যদি হয় তো এ-ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তবে সে-সিদ্ধান্তে আসার আগে স্বাভাবিক ব্যাখ্যা যদি পাওয়া যায়, চেষ্টা করে দেখতে হবে। মিস্টার ট্রেগেন্নিস, আপনি দেখছি ফ্যামিলি থেকে আলাদা— ভাইবোনদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতেন না।'

'কথাটা ঠিক। আমাদের টিনের খনি ছিল। বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিই।

সেই সময়ে একটু মন কষাকষি হয়েছিল বটে, এখন সেসব কারো মনে নেই। মানিয়ে নিয়েছি— আলাদা থাকলেও মিলেমিশে আছি।'

'কাল রাতের ব্যাপারে ফিরে যাওয়া যাক। একসঙ্গে আড্ডা মেরে যাওয়ার সময়ে এমন কিছু নজরে পড়েছিল যার সঙ্গে আজকের এই মর্মান্তিক ব্যাপারের যোগাযোগ আছে? ভালো করে ভেবে দেখুন, মিস্টার ট্রেগেন্নিস। ছোটোখাটো সূত্র পেলেও উপকার হবে আমার!'

'সে-রকম কিছু মনে পড়ছে না।'

'চারজনেই কি হইচই করছিলেন? ফুর্তির মেজাজে ছিলেন?'

'দারুণভাবে।'

'ভাইবোনেরা কি ভীতু ধাতের? আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কোনোরকম ভয়-টয় এর আগে দেখিয়েছিল?'

'একদম না।'

'কাজে লাগে, এ-রকম কিছুই তাহলে বলার নেই আপনার?'

তন্ময় হয়ে মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন মর্টিমার ট্রেগেন্নিস।

বললেন, 'একটা ব্যাপার মনে পড়ছে। আমি জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসে ছিলাম। জর্জ বসে ছিল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে[১০]। হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে জানলার দিকে কেন তাকাল দেখবার জন্যে ঘাড় ঘুরিয়েছিলাম। খোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখলাম অন্ধকার বাগানে কালো ছায়ার মতো সাঁৎ করে কী যেন একটা সরে গেল, মানুষ কি জন্তু বোঝা গেল না। জর্জকে জিজ্ঞেস করতে বললে, ওরও মনে হল কী যেন একটা ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল— ভালোভাবে ঠাহর করা গেল না।'

'উঠে গিয়ে দেখে এসেছিলেন?'

'না। সামান্য ব্যাপার বলেই যাইনি। গুরুত্ব দিইনি।'

'এর মধ্যে আসন্ন বিপদের সংকেত টের পাননি? অমঙ্গলের পূর্বাভাস?'

'একেবারেই না।'

'এত সকালে দুঃসংবাদটা কীভাবে শুনলেন?'

'ভোরে উঠে বেড়াতে বেরোনো আমার বরাবরের অভ্যেস। আজকেও বেরিয়েছি, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়াল ডক্টর রিচার্ডসনের গাড়ি। মিসেস পোর্টার একটা ছোকরা মারফত ওঁকে এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। উঠে বসলাম গাড়িতে। বাড়িতে পৌঁছে ঘরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মোমবাতি আর ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। অন্ধকার ঘরে বসে থেকেছে ওরা ভোরের আলো না-ফোটা পর্যন্ত। ডাক্তার বললেন, ঘণ্টা ছয়েক আগে মারা গেছে ব্রেন্দা— জোরজবরদস্তির কোনো চিহ্ন কোথাও নেই! মুখ-চোখের ওইরকম বিকট চেহারা নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছে চেয়ারে। বিরাট হনুমানের মতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে জর্জ ওয়েন। সে-দৃশ্য দেখা যায় না! আমি সহ্য করতে পারলাম না— ডাক্তার তো প্রায় অজ্ঞানের মতো এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে— কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল মুখ। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে এলাম বাইরে।'

'পরমাশ্চর্য হলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই কেস', উঠে দাঁড়িয়ে আলনা থেকে টুপি

নামাতে নামাতে বললে হোমস। 'আর দেরি করা সমীচীন হবে না— চলুন যাওয়া যাক ওয়ার্দায়। উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়— শুরুতেই এ-রকম গোলমেলে সমস্যা এর আগে কক্ষনো হাতে আসেনি আমার।'

আমাদের প্রথম দিনের কার্যকলাপ তদন্তের অগ্রগতির পক্ষে খুবই সামান্য। সূত্রপাতেই একটা ঘটনা অদ্ভুত ছাপ রেখে গেল আমার মনে। অকুস্থলে যাওয়ার পথে রাস্তাটা সরু গলির মতো এক জায়গায় বাঁক নিয়েছে। হঠাৎ শুনলাম সামনের দিক থেকে চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। সরে দাঁড়ালাম একপাশে। পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পলকের জন্যে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম বীভৎসভাবে বিকৃত, বিকট, একটা মুখ জ্বলন্ত চাহনি মেলে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষটানি আর নিমেষহীন বিস্ফারিত চাহনি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো বিদ্যুৎবেগে অতিক্রম করে গেল আমাদের।

দাঁতে দাঁতে ঘষটানি আর নিমেষহীন বিস্ফারিত চাহনি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো বিদ্যুৎবেগে অতিক্রম করে গেল আমাদের।

গিলবার্ট হলিডে, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯১০

ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের। আচ্ছন্নকণ্ঠে শুধু বললেন, 'হেলসটনে নিয়ে যাচ্ছে ভাইদের।'

আমাদের ঘোর তখনও কাটেনি। আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে দুঃস্বপ্নের মতো অপস্রিয়মাণ কালো গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। তারপর পা চালালাম অভিশপ্ত বাড়িটার দিকে— যে-বাড়ি থেকে এই অদৃষ্ট নিয়ে পাগলাগারদে যাত্রা করেছে দু-দুটো শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ।

কটেজ ঠিক নয়— বাড়িটাকে ভিলা বলা উচিত। বেশ বড়ো, ঝকঝকে। চারিদিকে বাগান। কর্নিশ বাতাসের দৌলতে এর মধ্যেই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বাগানের দিকে খাবার ঘরের জানলাটা দেখা যাচ্ছে। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বর্ণনা মতো এই জানলা দিয়ে এসেছে অপার্থিব সেই ভয়ংকরটি, যাকে দেখামাত্র বিপুল আতঙ্কে তিন তিনটে মানুষের সুস্থ চেতনায় তুমুল বিস্ফোরণ ঘটেছে— নিমেষে বিকৃত হয়েছে মস্তিষ্ক। হোমস চিন্তায় বুঁদ হয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে ফুলের টবের পাশ দিয়ে বারান্দার দিকে। চিন্তায় সে এমনভাবে ডুবে গেছিল যে, জলের ঝারিটার ওপর আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ায় বাগানের পথ আর আমাদের সকলের পায়ের ওপর দিয়ে ছোটোখাটো একটা বন্যা বয়ে গেল বললেই চলে। বাড়ির ভেতরে দেখা হল প্রৌঢ়া কর্নিশ হাউসকিপার মিসেস পোর্টারের সঙ্গে। একটি বাচ্চা মেয়ের সাহায্য নিয়ে সংসারের কাজ দেখাশুনা করে। হোমসের সমস্ত প্রশ্নের জবাব মুখে মুখে দিয়ে গেল মিসেস পোর্টার। রাত্রে শব্দ-টব্দ কিস্সু কানে আসেনি। গতরাতে মনিবরা যেরকম খোশমেজাজে ছিলেন, সে-রকম সচরাচর থাকেন না। সকালে ঘরে ঢুকেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর সুস্থ হয়ে জানলাটা খুলে দেয় যাতে ভোরের বাতাস ঘরে ঢোকে। তারপর ছুটে বাইরে গিয়ে চাষাদের একটা ছোটো ছেলেকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠায়। বোনের দেহ ওপরের বিছানায় শোয়ানো আছে, ইচ্ছে হলে দেখে আসতে পারি। ভাই দুজনকে পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়ার সময় চারজন গাঁটাগোট্টা পালোয়ানকে হিমশিম খেতে হয়েছে। সে নিজে এ-বাড়িতে আর একদণ্ডও থাকবে না— সেন্ট ইভসে আত্মীয়স্বজনের কাছে যাচ্ছে আজকেই বিকেলে।

ওপরে গিয়ে দেখলাম মিস ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিসের মৃতদেহ। সত্যিই পরমাসুন্দরী মেয়ে— মাঝবয়সি হলেও রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নিখুঁত মুখটি প্রকৃত সুন্দর— যদিও সে-মুখ নিঃসীম আতঙ্কে বিকৃত হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যা দেখে প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গিয়েছে, সেই ভয়ের রেশ এখনও লেগে রয়েছে মুখের পরতে পরতে। শোবার ঘর থেকে নেমে এলাম বসবার ঘরে— যে-ঘরে আশ্চর্য এই ঘটনার সূত্রপাত এবং শেষ। ফায়ার প্লেসে শুধু কাঠকয়লা, টেবিলের ওপর শেষ পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া চারটে মোমবাতি আর ছড়ানো তাস। চেয়ারগুলো কেবল সরিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালের গা ঘেঁষে— এ ছাড়া ঘরের কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হয়নি। লঘু পায়ে অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল হোমস। চেয়ারগুলোকে টেনে এনে রাখল টেবিলের পাশে যেখানে থাকা উচিত, সেইখানে। প্রত্যেকটা চেয়ারে বসে দেখলে জানলা দিয়ে বাগানের কতখানি দেখা যায়। খুঁটিয়ে দেখলে মেঝে, কড়িকাঠ আর ফায়ারপ্লেস। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যেও চোখ জ্বলে উঠতে দেখলাম না। ঠোঁট শক্ত হতে দেখলাম না— যে-লক্ষণ দেখলেই বুঝতাম নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আলোর নিশানা পেয়েছে বন্ধু আমার।

একবার কেবল জিজ্ঞেস করল, 'বসন্তের সন্ধেবেলায় এইটুকু ঘরে আগুন জ্বালানোর কী এমন দরকার পড়ল বলতে পারেন?'

মর্টিমার ট্রেগেন্নিস বললেন, 'বড্ড ঠান্ডা পড়েছিল, স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছিল— তাই আমি আসবার পরেই হয়েছিল আগুনটা। এখন কী করবেন, মি. হোমস?'

হাসল হোমস। আমার বাহু স্পর্শ করে বললে, 'ওহে ওয়াটসন, তামাক দিয়ে বিষোনো যে উচিত নয়, তা তোমার কাছে বহুবার শুনেছি। এখন কিন্তু সেই তামাক সেবনের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি চললাম তামাক খেতে— কেননা এখানে দেখবার মতো আর কিছু নেই। ভেবেচিন্তে যদি কিছু পাই তো আপনাকে জানাব, মিস্টার ট্রেগেন্নিস। পাদরি সাহেবকেও খবর দেব। আপাতত সুপ্রভাত।'

পোলধু কটেজে ফিরে না-আসা পর্যন্ত আর একটি কথাও বলল না হোমস। গুটিসুটি মেরে বসে রইল আর্মচেয়ারে। তাম্রকূটের নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে রইল বললেই চলে চিন্তাকুটিল বিশুষ্ক মুখখানা। কালো ভুরু কুঁচকে কপালের রেখায় রেখায় অজস্র চিন্তার ছাপ ফেলে শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কোন সুদূরের পানে। অবশেষে এক সময়ে পাইপ নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অট্টহেসে বললে, 'ভায়া, অযথা ভেবে সুবিধে হবে না। সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস, সূর্যদেবের মিষ্টি রোদ আর ধৈর্য— এই তিনটেই এখন বিশেষ দরকার। চলো, পাহাড়ে বেড়িয়ে বরং চকমকির পাথরের তির খোঁজা যাক। সমস্যার সূত্র খোঁজার চাইতে সেটা সহজ। কয়লা ছাড়া ইঞ্জিন চালাতে গেলে ইঞ্জিন যেমন বিগড়ে যায়, উপযুক্ত রসদ ছাড়া ব্রেন খাটাতে গেলেও ব্রেন তেমনি বিকল হয়। চলো, চলো, হাওয়া আর রোদ খেয়ে আসা যাক।'

সমুদ্রের ধারে ধারে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটা এবার ঠান্ডা মাথায় তলিয়ে দেখা যাক। সবার আগে, এ-ব্যাপারে যা কিছু জেনেছি— তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন— পর-পর সাজিয়ে ফেলা যাক— তাহলে নতুন কোনো ব্যাপার যখন জানব, ঠিকমতো জায়গায় বসিয়ে ঘটনা-পরম্পরা সম্পূর্ণ করা সহজ হবে। ভূত-প্রেত-পিশাচ শয়তানের হাত ঘটনায় নেই— প্রথমেই কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক, কেমন? মানুষের ব্যাপারে পিশাচ নাক গলিয়েছে, এ-তত্ত্ব মানতে আমি রাজি নই— মন থেকে এ-সম্ভাবনা তাই একেবারেই বাদ দেওয়া গেল। বেশ, বেশ। তাহলে কী পাচ্ছি এখন? কোনো একটা মানবিক উৎপাতের দরুন মারাত্মক চোট পেয়েছে তিন ব্যক্তি— একজন মারা গেছে, দুজন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। উৎপাতটা জ্ঞাতসারে হতে পারে, অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। এই হল গিয়ে শক্ত জমি— চিন্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র— এর ওপর সিদ্ধান্তর ইমারত তৈরি করা যাক। ভয়াবহ এই কাণ্ডটা ঘটল কখন? মি. ট্রেগেন্নিসের কথা মেনে নিলে, তিনি ঘর ছেড়ে চলে আসবার ঠিক পরেই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ধরে নিতে পারি, উনি চলে আসার মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছে। কেননা, টেবিলের তাস টেবিলেই পড়ে— জড়ো করা হয়নি। শোয়ার সময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টেবিল ছেড়ে কেউ নড়েনি— চেয়ার পর্যন্ত সরায়নি। তাই ফের বলছি— উনি চলে আসতে-না-আসতেই রহস্যজনক সেই আতঙ্ক এসে উপস্থিত হয়েছে জানলার বাইরে— এবং তা ঘটেছে রাত এগারোটার মধ্যেই— পরে নয়।

'আচ্ছা এরপর আমাদের করণীয় হল ঘর ছেড়ে চলে আসবার পর মি. ট্রেগেন্নিসের গতিবিধি

তাঁর জবানবন্দির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। সত্যিই উনি সন্দেহের উর্ধ্বে। কেননা, ঝারি উলটে দেওয়ার বদখত কৌশলটা তোমার অজানা নয়। ফলে, ভদ্রলোকের পায়ের স্পষ্ট ছাপ পেলাম ভিজে মাটির ওপর। গতদিনও বৃষ্টি হয়েছিল, মাটি ভিজে ছিল। মি. ট্রেগেনিস এবং আরও অনেকের পায়ের ছাপ ভিজে মাটিতে ছিল। তার মধ্য থেকে মি. ট্রেগেনিসের পায়ের ছাপ খুঁজে নেওয়া খুব একটা কষ্টকর হল না। ভদ্রলোকের গতিবিধি লক্ষ করে নিশ্চিন্ত হলাম— দেখলাম, উনি বাড়ি থেকে বেরিয়েই খুব তাড়াতাড়ি পাদরিমশায়ের বাড়ির দিকে— মানে— নিজের বাড়ির দিকে গেছেন।

'সন্দেহ-চক্র থেকে তাহলে বাদ গেলেন মি. ট্রেগেনিস। তাস খেলা জন্মের মতো পণ্ড হয়ে গেল কার জন্যে, এখনও কিন্তু তা জানা যাচ্ছে না। কার আবির্ভাবে এত আঁতকে উঠল তিন-তিনটে সুস্থ মানুষ— তাও এখনও রহস্য তিমিরে অদৃশ্য। আতঙ্কটা এল কোন পথে— কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস পোর্টারকে বাদ দেওয়া যায়। একেবারেই গোবেচারা মেয়েছেলে। এমনও হতে পারে, বাগানের জানলায় গুঁড়ি মেরে এসে দাঁড়িয়েছিল কেউ— এমন বিকট কাণ্ড করেছে যে দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছে তিনজনের। ঠিক এই ধরনের সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন একজনই— মি. মর্টিমার ট্রেগেনিস! বাগানের অন্ধকারে সাঁৎ করে কী যেন একটা মিলিয়ে গিয়েছিল— দেখেছেন উনি, দেখেছে ওঁর ভাই। খুবই আশ্চর্য ঘটনা। কেননা গতরাতে আকাশ মেঘলা থেকেছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করেছে। কাজেই এদেরকে ভয় দেখিয়ে পাগল করবার মতলব নিয়ে কেউ এসে থাকলে তাকে শার্সির কাচে মুখ চেপে ধরতেই হবে— নইলে অন্ধকার দেখাই যাবে না। জানলার নীচেই একটা ফুট তিনেক চওড়া ফুলের ঝোপ আছে— কিন্তু নরম মাটিতে কই কারো পায়ের ছাপ তো পড়েনি। সেই কারণেই ভেবে পাচ্ছি না বাইরে থেকে এসে কারো পক্ষে মুখ না-দেখিয়ে ভয় দেখানো সম্ভব হয় কী করে— সবচেয়ে বড়ো কথা এত কাঠখড় পুড়িয়ে এত ঝঞ্ঝাট করে গোবেচারা তিনটে মানুষকে ভয় দেখানোর কারণটাই-বা কী, তাও তো মাথায় আসছে না। ওয়াটসন, বুঝেছ তো অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়?'

'হাড়ে হাড়ে বুঝছি', বললাম দৃঢ়স্বরে।

'তা সত্ত্বেও জেনো আরও একটু সূত্র-টুত্র পেলে এর মধ্যেও আলোর নিশানা দেখা যাবে। তুমি তো জান, অতীতে এমনি অনেক ঝাপসা কেস নিয়ে প্রথম-প্রথম নাকানিচোবানি খেয়েছি— শেষকালে কিন্তু সমস্যার হিমালয়ও একলাফে পেরিয়ে গিয়েছি। কাজেই আমার বুদ্ধি যদি নাও তো, যতক্ষণ ঠিক তত্ত্ব হাতে না-আসছে, ততক্ষণ এ-কেস শিকেয় তুলে রেখে চলো গুহাবাসী মানবের অন্বেষণে সময়টা ব্যয় করা যাক।'

যখন খুশি মনটাকে বিষয়ান্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল শার্লক হোমসের— এ নিয়ে এর আগেও অনেক কথা বলেছি আমি। কিন্তু সেদিন কর্নওয়ালের সেই বাসন্তী প্রভাতে যেভাবে ঝাড়া দু-ঘণ্টা কেল্ট, তিরের ফলা আর খোলামকুচি নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে গেল ও, তেমনটি কখনো দেখিনি। হালকাভাবে কথা বলার ধরন দেখে মনেই হল না যে অত্যন্ত নারকীয় একটা কেস একটু আগেই কুরে কুরে খেয়েছে ওর মস্তিষ্ককে— সমাধান না-পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিকেল বেলা কটেজে ফিরে দেখলাম একজন দর্শনার্থী বসে রয়েছেন আমাদের ফেরার পথ চেয়ে— ইনিই নিমেষ মধ্যে আমাদের ফিরিয়ে আনলেন ভয়াবহ কেসের আলোচনায়।

এক নজরেই দুজনেই চিনলাম ভদ্রলোককে— পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার হল না। বিরাট চেহারা, এবড়োখেবড়ো সুগভীর বলিরেখা আঁকা মুখ, জ্বলজ্বলে ভয়ানক চোখ আর গরুড় পাখির চঞ্চুর মতো টিকোলো নাক, প্রায়-কড়িকাঠ-ছোঁয়া তেল চটচটে চুল আর চিরন্তর চুরুটের দৌলতে ঠোঁটের কাছে নিকোটিন রাঙানো সোনালি-ঝালরওলা অমন আশ্চর্য সাদাটে দাড়ি গোটা লন্ডন আর আফ্রিকায় শুধু একজনেরই আছে— প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিখ্যাত সিংহশিকারী এবং অজানার অভিযাত্রী— ডক্টর লিয়ন স্টার্নডেল।

উনি যে এ-জেলায় আছেন, সে-খবর পেয়েছিলাম। জলার রাস্তায় বার কয়েক ওঁর তালঢ্যাঙা চেহারাও দেখেছিলাম। উনি আমাদের কাছে ঘেঁষেননি, আমরাও ওঁকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছি উনি একলা থাকতে ভালোবাসেন বলে। এই কারণেই পর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে বেশির ভাগ সময় কাটান বুচান অ্যারায়েন্সের নির্জন জঙ্গলের গভীরে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়িতে। এ-অঞ্চলে এলে বই আর ম্যাপ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের মধ্যে— নিজের কাজকর্ম নিজেই করেন, কারো সাহায্য নেন না— কারো সঙ্গে থাকেন না— কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে মেশেন না— তাদের ব্যাপারে নাক গলান না। তাই অবাক হয়ে গেলাম ব্যগ্রভাবে যখন হোমসের কাছে জানতে চাইলেন, রহস্যজনক এই উপসংহারে অগ্রগতি কিছু হয়েছে কি না। বললেন, 'গাঁয়ের পুলিশগুলো একেবারে আকাট— আপনার অভিজ্ঞতা তো কম নয়— নিশ্চয় হালে পানি পাবেন। এ-ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ কেন জানেন? আমার মা কর্নিশ— সেইদিক দিয়ে ট্রেগেন্নিসরা আমার মাসতুতো ভাইবোন। এদের আমি ভালো করেই চিনি। তাই মন আমার ভেঙে গেছে ওদের এই শোচনীয় পরিণতিতে। প্লিমাউথ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম আজ সকালেই খবরটা পেয়ে, এলাম যদি আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারি— এই আশায়।'

ভুরু তুলে হোমস বললে, 'জাহাজ ছেড়ে গেল তো?'

'পরের জাহাজে যাব।'

'তাই নাকি! একেই বলে বন্ধুত্ব।'

'আত্মীয়— আগেই বলেছি।'

'তা বলেছেন— মায়ের তরফে মাসতুতো ভাইবোন। মালপত্র কোথায়? জাহাজে নাকি?'

'কিছু কিছু— বেশিরভাগই হোটেলে।'

'কিন্তু খবরটা নিশ্চয় প্লিমাউথ খবরের কাগজে বেরোয়নি?'

'আজ্ঞে না। টেলিগ্রামে খবর পেয়েছি।'

'কে পাঠিয়েছে জানতে পারি?'

অভিযাত্রীর বৃহৎ কৃশ বদনের ওপর দিয়ে একটা ছায়া ভেসে গেল যেন।

'আপনার কৌতূহলটা একটু বেশি রকমের, মি. হোমস।'

'আমার ব্যাবসাই যে তাই।'

রুক্ষ ভাবটা অতিকষ্টে সামলে নিলেন ডক্টর স্টার্নডেল।

'মি. রাউন্ড হে পাঠিয়েছেন টেলিগ্রাম।'

'ধন্যবাদ। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, কেসটা সম্পর্কে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। তবে শিগ্‌গিরই করব। তার আগে কিন্তু বলাটা সমীচীন হবে না।'

'আপনার সন্দেহ কোন খাতে বইছে বলতে আপত্তি আছে?'

'জবাবটা জানা থাকলে তো বলব।'

'খামোখা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম দেখছি। যাক, আর কথা বাড়াতে চাই না,' অসভ্যের মতো হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বিখ্যাত সিংহ শিকারি। পাঁচ মিনিটও গেল না, পেছন নিল শার্লক হোমস। ফিরল সন্ধেবেলায়! উদ্ভ্রান্ত মুখচ্ছবি আর শ্লথ পদক্ষেপ দেখেই বুঝলাম পণ্ডশ্রম হয়েছে— সুবিধে করে উঠতে পারেনি। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে ছিল। চোখ বুলিয়ে নিয়েই ছুড়ে ফেলে দিলে অগ্নিকুণ্ডে।

বললে, 'প্লিমাউথ হোটেলের টেলিগ্রাম। মি. রাউন্ড হের কাছে ঠিকানা নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম ডক্টর স্টার্নডেল যা বলে গেলেন, তা সত্যি কি না। দেখা যাচ্ছে, সব সত্যি। সত্যিই উনি জাহাজে কিছু মাল পাঠিয়েছেন— একরাত হোটেলে কাটিয়েছেন, তারপর ছুটে এসেছেন এখনকার তদন্ত দেখতে। কী বুঝলে ওয়াটসন?'

'বুঝলাম যে এ-ব্যাপারে ওঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে।'

'খুবই গভীর, বন্ধু খুব গভীর। ওঁর এই সুগভীর আগ্রহের মধ্যেই কিন্তু একটা সুতো রয়েছে— খেইটা ধরতে পারছি না। ঠিকমতো নাগাল পেয়ে গেলেই জানবে জট ছড়িয়ে ফেলা যাবে। অত মুষড়ে পোড়ো না, ওয়াটসন। ফুর্তি করো। সব সূত্র এখনও হাতে আসেনি— এলে আর অসুবিধে থাকবে না বলে রাখছি।'

হোমসের কথার তাৎপর্য যে কতখানি এবং কী ধরনের পৈশাচিক আর অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের ফলে তদন্ত নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে, তখন কিন্তু তা একদম বুঝিনি। সকাল বেলা জানলায় দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম একটা এক্কাগাড়ি ঝড়ের মতো আসছে রাস্তা দিয়ে। গাড়ি দাঁড়াল আমাদেরই কটেজের সামনে, লাফিয়ে নামলেন পাদরি মশায় এবং নক্ষত্রবেগে দৌড়ে এলেন ভেতর দিকে। জামাকাপড় পরে তৈরি হয়েছিল হোমস— দুজনেই দৌড়ে গেলাম ওঁর দিকে।

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়েছিলেন পাদরি। ভালো করে কথাও বলতে পারছিলেন না। হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন :

'অপদেবতা! অপদেবতায় আমাদের ভিটেমাটি তুলে ছাড়বে মি. হোমস। কারুর নিস্তার নেই— কেউ বাঁচবে না। সবাই মরবে এ-অঞ্চলে।'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে, আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে প্রায় নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগলেন ভদ্রলোক। চোখ-মুখের ওইরকম অবস্থা না-দেখলে নির্ঘাত হেসে ফেলতাম : অবশেষে একটু ধাতস্থ হয়ে ব্যক্ত করলেন ভয়াবহ সংবাদটা।

'মি. ট্রেগেন্নিস কাল রাতে মারা গেছেন— তিন ভাইবোনের চোখে-মুখে যেসব লক্ষণ দেখা গেছে, তার সমস্ত ওঁর মুখেও ফুটে উঠেছে।'

সঙ্গেসঙ্গে যেন এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটল শার্লক হোমসের সর্ব অঙ্গে, ছিটকে গেল জ্যামুক্ত তিরের মতো।

'আপনার এক্কায় আমাদের জায়গা হবে তো?'

'হবে।'

'ওয়াটসন, ব্রেকফাস্ট পরে খাব। মি. রাউন্ড হে, চলে আসুন, আর দেরি করা যায় না— তাড়াতাড়ি চলুন। কে আবার কোথায় হাত দিয়ে ফেলবে, তার আগেই পৌঁছোতে হবে।'

পাদরি সাহেবের বাড়িতে ওপর নীচে দুটো ঘর নিয়ে থাকতেন মি. মর্টিমার ট্রেগেনিস। নীচে বসবার ঘর, ঠিক ওপরে শোবার ঘর। জানলার ধার পর্যন্ত বাগান। পুলিশ বা ডাক্তার এসে অকুস্থল লাটঘাট করার আগেই পৌঁছে গেলাম আমরা। গিয়ে যা দেখলাম, হুবহু তার বর্ণনা দিচ্ছি। দৃশ্যটা ইহজীবনে ভোলবার নয়।

ঘরের আবহাওয়া এমনই ভয়াবহ আর গুমোট যে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চাকরটা ঘরে ঢুকেই জানলা খুলে দিয়েছিল তাই রক্ষে, নইলে আরও অসহ্য ঠেকত। এর কারণ বোধ হয় একটা তেলের বাতি— ঘরের ঠিক মাঝখানে। টেবিলের ওপর সেটা তখনও দপদপ করে ধোঁয়া ছাড়ছে। পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মি. মর্টিমার ট্রেগেনিস। ছুঁচালো থুতনি ঠেলে এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে— চশমা জোড়া ঠেলে তোলা কপালের ওপর— শীর্ণ মুখটা জানলার দিকে ফেরানো। মরা বোনের মুখে যে বিকট চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম— অবিকল সেই আতঙ্ক এঁরও মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। হাত-পা মুচড়ে রয়েছে অস্বাভাবিকভাবে— প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক মুহূর্তের আক্রমণে বেঁকিয়ে আড়ষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে হাতের দশ আঙুল। বেশবাস সম্পূর্ণ— কিন্তু তা তাড়াহুড়ো করে পরেছেন। আগেই শুনেছিলাম, রাতে শুয়েছেন— বিছানায় শোয়ার চিহ্ন আছে। খুব ভোরে ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

এহেন মৃত্যুমহলে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে হোমসের সর্বাঙ্গে যে কী ধরনের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল, তা যে না দেখেছে সে কল্পনাই করতে পারবে না যে কী নিদারুণ বিদ্যুৎগতি সুপ্ত থাকে ওর বাইরের শ্লথ-প্রকৃতির অন্তরালে। মুহূর্তের মতো চনমনে হল যেন প্রতিটি অণুপরমাণু— সজাগ, সতর্ক, হুঁশিয়ার। উজ্জ্বল হল দুই চোখ, শক্ত হল পেশি। যেন ব্যগ্র তৎপরতার নব বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হল সারাদেহে। জানলা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে গিয়ে ফের ফিরে এল ঘরে। বেশ বার কয়েক ঘরময় চরকিপাক দিয়ে ছুটে গেল ওপরের শোবার ঘরে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল শয়নকক্ষের ওপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে— এক ধাক্কায় খুলে দিলে জানলা। সঙ্গেসঙ্গে বুঝলাম মনের মতো কিছু একটা চোখে পড়েছে। কেননা, পাল্লা খুলে যেতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ল নীচে। দুমদুম করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, ছিটকে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে, সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাগানের মাটিতে। আবার দাঁড়িয়ে উঠল একলাফে, ফিরে এল ঘরে এবং সব কিছুই এমন একটা প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে করে চলল যেন শিকারের ঠিক পেছনটিতে এসে পড়েছে শিকারি কুকুর। অতি মামুলি তেলের বাতিটাকে অসীম মনোযোগ নিয়ে দেখল। খোলের মাপ নিল। চিমনির ওপর যে অভ্র-আচ্ছাদন আছে, আতশকাচের মধ্যে দিয়ে সেটা অনেকক্ষণ খুব খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ওপর থেকে খানিকটা ছাই চেঁছে নিয়ে রাখল খামের ভেতর। সবশেষে ডাক্তার আর পুলিশ আসতেই মি. রাউন্ড হেঁকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বললে, 'তদন্ত সার্থক হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আমার নেই। তবে আপনি দয়া করে বলে দেবেন, যেন ওঁরা শোবার ঘরের জানলা আর বসবার ঘরের তেলের বাতি— এই দুটো জিনিসের ওপর বেশি নজর দেন। প্রত্যেকটাই তদন্তে সাহায্য করবে, চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নিতে কাজে লাগবে। এর বেশি খবর যদি চায় পুলিশ, আমার কটেজে গিয়ে যেন দেখা করে। ওয়াটসন, চলো এবার অন্য ব্যাপারে মন দেওয়া যাক।'

পুলিশি ব্যাপারে শখের গোয়েন্দার নাক গলানো বোধ হয় মনঃপূত হয়নি পুলিশ মহলের, অথবা হয়তো আশাব্যঞ্জক কোনো তদন্তসূত্র পেয়ে সেইদিকেই ছুটেছিল পুলিশ— কারণ যাই হোক না কেন, পরের দুটো দিন কেউ চৌকাঠ মাড়াল না আমাদের। এই দু-দিনের বেশির ভাগ সময় কটেজেই রইল হোমস, পাইপ টানল সমানে আর বিভোর হয়ে রইল দিবাস্বপ্নে। মাঝে মাঝে একাই বেরিয়ে যেত বেড়াতে— ফিরত বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে— কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলত না কোথায় গিয়ে কী করে এল। এর মধ্যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অবশ্য দেখিয়ে দিলে তদন্তের লাইনটা কী। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের মৃত্যুর রাতে তাঁর ঘরে যে তেলের বাতি দেখে এসেছি, হুবহু সেই ডিজাইনের একটা তেলের বাতি কিনে আনল বাজার থেকে। একই তেল দিয়ে ভরল বাতিটা এবং... জ্বালিয়ে রেখে দেখল তেল ফুরোয় কতক্ষণে— হিসেবটা লিখে রাখল কাগজে। আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল— অত্যন্ত অপ্রীতিকর এক্সপেরিমেন্ট— জীবনে ভুলতে পারব কি না সন্দেহ।

একদিন বিকেলের দিকে আমাকে বলল, 'ওয়াটসন, নিশ্চয় লক্ষ করেছ— বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে একটা বিষয় কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গেছে। প্রথমেই ঘরে যে ঢুকেছে, অদ্ভুতভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ঘরের আবহাওয়া। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বর্ণনা মনে করে দেখ। ডাক্তার ঘরে ঢুকেই অজ্ঞানের মতো চেয়ারে পড়ে যান। ভুলে গেছিলে? যাচ্চলে! কিন্তু আমার মনে আছে। হাউসকিপার মিসেস পোর্টারও ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে যায়— পরে জানলা খুলে দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের ঘরে আমরা ঢুকে টের পেয়েছিলাম একটা দম আটকানো আবহাওয়া। জানলা যদিও খোলা ছিল, তবুও ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে সেই দম আটকানো গুমোট আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা চট করে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না! খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে-চাকরটা প্রথমে ঘরে জানলা খুলেছিল, সে বেচারাও এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। ওয়াটসন, বলো দিকি প্রতিক্ষেত্রে এইভাবে কাহিল হয়ে পড়ার মানেটা কী? কীসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে এর মধ্যে? বিষাক্ত আবহাওয়া, তাই নয় কি? আরও আছে— প্রতি ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে কিছু-না-কিছু জ্বলছে। প্রথম ক্ষেত্রে চুল্লির আগুন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তেলের বাতি। চুল্লির আগুন না হয় দরকার হয়েছিল— কিন্তু তেলের বাতিটা ইচ্ছে করে জ্বালানো হয়েছিল— তেল পুড়তে কতটা সময় লাগে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি, দিনের আলো ফোটবার পরেও জ্বালানো হয়েছিল বাতিটা। এই তিনটে জিনিসের মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আগুন, দম-আটকানো আবহাওয়া, আর সবশেষে উন্মত্ততা অথবা মৃত্যু। পরিষ্কার হল তো?'

'মনে তো হচ্ছে।'

'কাজ শুরু করার মতো একটা অনুমিতি এইভাবে খাড়া করে নিয়ে এগোনো যাক। প্রত্যেকবার ঘরের মধ্যে কিছু একটা পোড়ানো হয়েছে। ফলে এমন একটা নাম-না-জানা বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যার প্রভাব থেকে কেউই রেহাই পায়নি। বেশ, বেশ। প্রথম ক্ষেত্রে, ট্রেগেন্নিস ভাইবোনের বেলায়— জিনিসটা রাখা হয়েছিল চুল্লির আগুনে। জানলা বন্ধ ছিল যদিও, কিন্তু

চুল্লির ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়েছে চিমনি দিয়ে। বিষটার কাজও হয়েছে দেরিতে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের ঘরে, তেলের বাতির মধ্যে জিনিসটা পোড়ানো হয়েছে বলে ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার তেমন সুযোগ পায়নি; তাই বিষের ক্রিয়া হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি, প্রভাবটা হয়েছে প্রচণ্ড। সেইকারণেই প্রথম ক্ষেত্রে একটি মেয়ে বিষের সংস্পর্শে আসতে-না-আসতেই মারা গিয়েছে— মেয়েদের দেহযন্ত্র পুরুষদের চাইতে অনেক বেশি অনুভূতি সচেতন বলেই কাজটা হয়েছে দ্রুত— কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর বদলে এসেছে সাময়িক অথবা স্থায়ী উন্মত্ততা— বিষটার প্রথম কাজ বোধ হয় তাই পাগল করিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়েছে বিষক্রিয়া। এই দুই ঘটনা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অন্তরালে কাজ করেছে এমন একটা বিষ যা পুড়ে গিয়ে ধোঁয়ার আকারে প্রথমে নিদারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে পাগল করে দেয় মানুষকে— তারপরে আনে মৃত্যু[১১]।

'যুক্তির এই ধারাবাহিকতা মগজের মধ্যে নিয়ে দৌড়ে গেলাম মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের ঘরে— আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম মারণদ্রব্যটার অবশিষ্টাংশ। তেলের বাতির অভ্রআচ্ছাদনেই এ-জিনিস লেগে থাকার কথা— যেখানে লাগিয়ে রাখলে নিজে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে যাবে। সত্যিই দেখলাম স্তরে স্তরে সাজানো কিছু ছাই জমে রয়েছে ধোঁয়া আটকানোর আচ্ছাদনের মধ্যে— কিনারা ঘিরে খানিকটা বাদামি পাউডার— তখনও পোড়েনি। তুমি তো দেখলে অর্ধেক পাউডার তুলে রাখলাম খামের মধ্যে।'

'অর্ধেক কেন?'

'ভায়া ওয়াটসন, সরকারি পুলিশবাহিনির অন্তরায় হওয়া আমার উচিত নয়। প্রমাণ-টমান যাই পাই না কেন, ওদের জন্যে তা রেখে আসি— নিজে সরাই না। অভ্র আচ্ছাদনের কীসের গুঁড়ো এখনও লেগে রয়েছে, ওদের বুদ্ধি থাকে, সংগ্রহ করুক। ওয়াটসন, এবার শুরু হবে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট। জানলাটা খোলা থাক— সমাজে আমাদের এখনও দরকার আছে— অকালমৃত্যু ঘটাতে চাই না। তুমি বসবে খোলা জানলার ধারে আর্মচেয়ারে— নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যদি বোঝো এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করার সময়ে এসেছে— হস্তক্ষেপ করবে। কী বললে? এক্সপেরিমেন্টে তুমিও অংশ নেবে? আরে আরে ভায়া, তোমাকে আমি চিনি— ঠিক এমনটাই আশা করেছিলাম। ঠিক আছে ভায়া, ঠিক আছে। টেবিলের দু-দিকে পাতলাম দুজনের চেয়ার— বিষ থেকে সমান দূরত্বে রইলাম দুজনে— বসব মুখোমুখি। দরজা খোলা থাকুক। দুজনেই কিন্তু বিষের খপ্পরে সমান ভাবে পড়ব, সমান ভাবে টের পাব বিষের ধোঁয়া কাজ করছে কীভাবে এবং সমানভাবে সুযোগ পাব বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার আগেই এক্সপেরিমেন্ট ভন্ডুল করে দেওয়ার। পরিষ্কার তো? বেশ, বেশ। খাম থেকে বিষের গুঁড়ো বার করে রাখলাম জ্বলন্ত বাতির আচ্ছাদনে। এইবার! ওয়াটসন, বসে পড়ো, ভায়া বসে পড়ো। দেখো, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।'

বেশি দেরি হল না। ভয়ংকররা এল অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে— অত্যন্ত অদ্ভুত পদসঞ্চারে। চেয়ারে চেপে বসবার আগেই নাসিকারন্ধ্রে ভেসে এল ঘন মৃগনাভির একটা কটু গুড়-পাক-দেওয়া গন্ধ। উগ্র বিচিত্র সেই গন্ধের প্রথম ঝাপটাতেই আমি আর আমার মধ্যে রইলাম না— আমার মস্তিষ্ক, আমার কল্পনাশক্তি যেন বেহাত হয়ে গেল অন্যের হাতে— কর্তৃত্ব হারালাম আমারই মগজ আর কল্পনার ওপর। চোখের সামনে দুরন্ত ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল নীরন্ধ্র

তমিস্রাময় কালো ছায়া। শিউরে উঠল আমার অন্তরাত্মা। অকস্মাৎ একটা নামহীন আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়ে গেল আমার অণুতে পরমাণুতে— মন বললে, কুণ্ডলী পাকানো ওই বিকট মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু রক্ত-জল-করা বিভীষিকা। ওরা যেন ওত পেতে রয়েছে পুরু ছায়ার মধ্যে, সময় গুনছে একযোগে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। বর্ণনাতীত সেই লোমহর্ষক অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে সিটিয়ে তুলল আমার সর্ব অঙ্গ। দুনিয়ার সমস্ত দানবীয় আর ভয়াল শয়তানিকে প্রত্যক্ষ করার ভয়ে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মনে হল যেন নিকষ মেঘের মতো ঘুরপাক খাওয়া কৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে সরে সরে যাচ্ছে অজস্র আবছা আকৃতি— ভাসছে, কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। তারা কেউ স্পষ্ট নয়— কিন্তু তারা হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো ভয়াবহ। প্রতিমুহূর্তেই মনে হল এই বুঝি সিঁড়ির ওপর শুনব ভয়ংকরের পদধ্বনি— যার ছায়া দেখামাত্র নিঃসীম আতঙ্কে অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হয়ে যাবে আমার। অথচ সে কে, কীরকম তাকে দেখতে— কিছুই জানি না— বুঝতে পারছি না। কিন্তু এই না-বোঝা আতঙ্কের খপ্পরে অসাড় হয়ে এল আমার জ্ঞানবুদ্ধি চেতনা— ক্ষণে ক্ষণে মনে হল অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য অস্বাভাবিক এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যার তুল্য নজির আর দ্বিতীয় নেই। আমি অনুভব করলাম কল্পনাতীত আতঙ্কে। আমার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, কোটর থেকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে, জিভটা চামড়ার মতো শক্ত হয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে। এমন একটা তুমুল হট্টগোল, একটা বিকট বিপর্যয় লেগে গেল মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে মনে হল যেকোনো মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে দলা পাকিয়ে যাবে মগজের সবকটা স্নায়ু। ভীষণ ভয়ে আর্তগলায় বুকফাটা হাহাকার করতে গেলাম— কিন্তু গলা দিয়ে বীভৎস কর্কশ যে-আওয়াজটা বেরোল— সেটা বুঝি আমার নয়— যেন কা-কা করে কেঁদে উঠল একটা দাঁড়কাক। অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও এহেন ডাক যে আমার গলা দিয়ে কখনো বেরোতে পারে— ভাবতেও পারিনি। গা হাত পা হিম হয়ে গেল স্বকর্ণে সেই বিকৃত ধ্বনি শুনে। আতঙ্কের এই সর্বনেশে নাগপাশকে ঝেড়ে ফেলে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই প্রাণপণে, দেহের আর মনের শেষ শক্তিবিন্দু সঞ্চয় করে, সীমাহীন নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত মেঘের ফাঁক দিয়ে তাকালাম হোমসের পানে। অবশ অক্ষিপটে পলকের জন্যে ভেসে উঠল একটা সাদা কঠিন আতঙ্ক বিকৃত, দুমড়োনো-মুচড়োনো ভয়াল মুখচ্ছবি। ঠিক এই দৃশ্য, এই আতঙ্ক দেখেছি এর আগে দুটি মৃতদেহের মুখে। তৃতীয়বার দেখলাম যার মুখে সে আমার প্রাণাধিক বন্ধু শার্লক হোমস। হোমস! হোমস! হোমস! হোমসের মুখের এই ভয়ানক চেহারাই চাবুক হেনে জড়তা কাটিয়ে দিল আমার। মুহূর্তের মধ্যে আমার চেতনা আসন্নমৃত্যু আর উন্মত্ততার নরককুণ্ড থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে— ফিরে এল আমার শক্তি আর মস্তিষ্কের সুস্থতা। চেয়ার থেকে লাফিয়ে গেলাম। হোমসকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে কাত হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়তে পড়তেও কোনোমতে ছিটকে এলাম দরজা দিয়ে বাইরে এবং আছড়ে পড়লাম ঘাস ছাওয়া জমির ওপর। অবশ্য দেহে প্রায় বিলুপ্ত চেতনা নিয়ে পাশাপাশি পড়ে রইলাম দুই বন্ধু। আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারলাম না— শুধু টের পেলাম চারদিকে যেন নেচে খেলা করছে প্রাণদায়ী সূর্যরশ্মি— আতঙ্কে ঠাসা নারকীয় মেঘ ছিন্নভিন্ন করে উজ্জ্বল হিতকর তপন কিরণ এগিয়ে আসছে যেন আত্মার কাছে— শয়তানের মুঠি শিথিল হয়ে যাচ্ছে অরুণ দেবের উষ্ণ স্পর্শে—

কুয়াশার গাঢ় অবগুণ্ঠন যেভাবে দিকদিগন্ত থেকে একটু একটু করে উঠে গিয়ে মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে জমাট বাঁধা বর্ণনাতীত সেই আতঙ্ক মেঘও ওপরে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল— মনের ভেতর থেকেও নিকষ মেঘের তিরোধান ঘটল। মন আর দেহের শক্তি পুরোপুরি ফিরে না-আসা পর্যন্ত ঘামে ভেজা কপাল মুছতে লাগলাম ঘাসে বসে— ভয়ার্ত চোখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আসন্ন মৃত্যুর অপস্রিয়মাণ লক্ষণ দেখে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম এইমাত্র কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এলাম দুজনে।

অবশেষে ভাঙা ভাঙা গলায় হোমস বললে, 'ভায়া, আমাকে ক্ষমা করো। এ-এক্সপেরিমেন্টে বন্ধুকে টেনে আনা আমার উচিত হয়নি।'

হোমসকে এভাবে বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। এভাবে ওর ভেতরের চেহারা কখনো চোখে পড়েনি। তাই আবেগে কেঁপে উঠল আমার গলা।

বললাম, 'হোমস, তোমার কাজে লাগতে পেরেছি, এইটাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।'

মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল ওর চিরপরিচিত মুখের চেহারা— আশেপাশে যারা থাকে। তারাই চেনে হোমসের বাইরের এই খোলস। কিছুটা কৌতুক, কিছুটা ছিদ্রান্বেষী মুখচ্ছবি দিয়ে ঢেকে দেয় কোমল অন্তর-প্রকৃতি। বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, নতুন করে আমাদের পাগল বানানোর আর দরকার ছিল না। পাগল হয়েছিলাম বলেই এ-জাতীয় এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলাম। বিষের ক্রিয়া যে এত আচমকা আর এত প্রচণ্ড হবে— কল্পনাও করিনি।' ঝড়ের মতো কটেজে ঢুকে লম্ফটা ধরে নাকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বেরিয়ে এল হোমস— ছুড়ে ফেলে দিলে কাঁটা ঝোপের মধ্যে। 'ঘরটা একটু পরিষ্কার হোক। ওয়াটসন, আগের ট্র্যাজেডিগুলো ঘটেছে কীভাবে, এখন নিশ্চয় বুঝেছ?'

'একেবারে।'

'উদ্দেশ্য কিন্তু এখনও অস্পষ্ট। এসো, এই কুঞ্জবনে বসে আলোচনা করা যাক। বিশ্রী গ্যাসটা যেন এখনও গলায় আটকে রয়েছে। সবকটা প্রমাণ কিন্তু মর্টিমার ট্রেগেনিসকেই ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। প্রথম ট্র্যাজেডিতে তিনি খুন করেছেন, দ্বিতীয় ট্র্যাজেডিতে তিনি নিজে খুন হয়েছেন। প্রথমেই একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। ট্রেগেনিস পরিবারে একটা পুরোনো ঝগড়া আছে। পরে অবশ্য তা মিটে গেছে। ঝগড়াটা কতখানি তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল— পরে যে সত্যি সত্যিই তা অন্তর থেকে মিটে যায়নি— তার বিশদ খবর কোনোদিনই আর জানা যাবে না। মর্টিমার ট্রেগেনিসের শেয়ালের মতো ছুঁচোলো মুখ, চশমা ঢাকা পুঁতির মতো ছোটো ধূর্ত চোখ দেখলে মনে হয় না অন্তর থেকে ক্ষমা করার মানুষ উনি। বাগানে কী যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে— এই খবরটা শুনে সাময়িকভাবে আমাদের মন অলীক একটা অস্তিত্বের দিকে ছুটে গিয়েছিল— খবরটা কিন্তু ওই ভদ্রলোকেরই দেওয়া। গোড়া থেকেই আমাদের ভুল পথে চালিয়ে দেওয়ার পেছনে ওঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল— সোজা কথায় যাকে বলব মোটিভ। সবচেয়ে বড়ো কথা, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তেলের বাতিতে উনি গুঁড়োটা না রেখে গেলে আর কে রাখবে বলতে পার? উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই ঘটেছে ঘটনাটা। অন্য কেউ ঘরে ঢুকলে তিন ভাইবোনেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত নিশ্চয়— টেবিলের কাছ থেকে সরে আসত। তা ছাড়া,

কর্নওয়ালের মতো নিরুপদ্রব অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা রাত দশটার পর কারো বাড়িতে সামাজিকতা রাখতে যায় না। কাজেই, সব পয়েন্ট একদিকেই মুখ করে আছে— মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের দিকে— অপরাধী তিনিই স্বয়ং।'

'ওঁর নিজের মৃত্যুটা তাহলে আত্মহত্যা?'

'দেখে সেইরকমই মনে হতে পারে— অসম্ভব কিছু নয়। তিন ভাইবোনের এ-হাল যে করেছে, অনুতাপে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে সে যে নিজের হাতে নিজেকে একইভাবে মেরে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে, এইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তবে এ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকটা প্রবল যুক্তি আছে। ইংলন্ডে একজনই জানেন। তাঁর নিজের মুখে সব শুনব বলে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে রেখেছি। আরে! একটু আগেই ভদ্রলোক এসে গেছেন দেখছি! এদিকে আসুন, ডক্টর লিয়ন স্টার্নডেল। ঘরে বসে এমন একটা বিতিগিচ্ছিরি কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছি যে আপনার মতো বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও ঘরে আর আপ্যায়ন করা যায় না।'

কটাং করে গেট খোলার আওয়াজ শুনলাম। বাগানের পথে আবির্ভূত হল সুবিখ্যাত আফ্রিকান অভিযাত্রীর রাজকীয় মূর্তি। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমাদের গাঁইয়া কুঞ্জের দিকে।

'ঘণ্টাখানেক আগে আপনার চিঠি পেলাম, মি. হোমস। আসতে বলেছেন বলে এলাম। কিন্তু হঠাৎ শমন পাঠানো হল কেন বুঝলাম না।'

'আপনার মুখে ব্যাপারটা সবিস্তার শোনবার জন্যে। তারপর আপনি যাবেন আপনার জায়গায়, আমরা যাব আমাদের ডেরায়। যাই হোক, এসে ধন্য করেছেন। এইভাবে ফাঁকা জায়গায় আকাশের নীচে আপনাকে আপ্যায়ন করতে হচ্ছে বলে কিছু মনে করবেন না। এইমাত্র একটা লোমহর্ষক কাহিনির মালমশলা সংগ্রহ করলাম আমি আর আমার এই ডাক্তার বন্ধুটি। কাহিনির নাম দিয়েছি— কর্নিশ-আতঙ্ক। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে যেসব আলোচনায় বসব এখন, তা আপনাকে ব্যক্তিগত আঘাত হানতে পারে। সেইদিক দিয়ে এখানে আপনি নিরাপদ, আড়ি পাতার কেউ নেই।'

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে কঠোর চোখে হোমসের পানে চাইলেন সিংহশিকারি অভিযাত্রী।

'মশায়, আমাকে ব্যক্তিগত আঘাত হানতে পারে এমন কী ব্যাপার আপনার পেটে আছে আমার মাথায় আসছে না।'

'মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে খুন করার ব্যাপার।' বললে হোমস।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল সশস্ত্র থাকলেই বুঝি ভালো করতাম। স্টার্নডেলের প্রবৃত্তি-প্রকটিত ভীষণ মুখটা নিমেষ মধ্যে কালচে-লাল হয়ে গেল, অঙ্গারের মতো জ্বলে উঠল দুই চোখ। দড়ির মতো ফুলে উঠল রগের শিরা— দু-হাত মুঠো করে বাঘের মতো লাফিয়ে গেলেন হোমসের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন পরক্ষণেই— প্রবল চেষ্টায় আসুরিক হিংস্র প্রবৃত্তিগুলোর লাগাম টেনে ধরলেন— হঠাৎ এমন ভয়ংকরভাবে ঠান্ডা হয়ে গেলেন যা তাঁর ক্রোধের অকস্মাৎ বিস্ফোরণের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক বলে মনে হল।

'মি. হোমস, বহুদিন বর্বরদের সঙ্গে ঘর করেছি, আইনকানুনের নাগালের বাইরে জীবন কাটিয়েছি, দরকার হলে আইন আমিই সৃষ্টি করেছি— দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমিই হয়েছি। দয়া করে তা মনে রাখবেন। আপনি জখম হোন, এটা আমি চাই না।'

'আমিও আপনাকে আহত করতে চাই না, ডক্টর স্টার্নডেল। সেইজন্যেই তো পুলিশ না-ডেকে আপনাকে এনেছি। আমার সদিচ্ছের এইটাই কি স্পষ্ট প্রমাণ নয়?'

অ্যাডভেঞ্চার-আকীর্ণ জীবনে এই প্রথম বুঝি ভয় পেলেন ডক্টর স্টার্নডেল। সশব্দে শ্বাস টেনে বসলেন পাশে। হোমসের আচরণে প্রশান্ত অভয়— উদ্‌বিগ্ন পুরুষের অন্তরে প্রলেপ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বিশাল থাবার মতো দু-হাত বারকয়েক মুঠো করে এবং খুলে বিড়বিড় করে আপন মনে কী যেন বললেন ডক্টর স্টার্নডেল।

তারপর বললেন, 'কী চান বলুন তো? খুলে বলুন মশায়, চালাকি করতে যাবেন না। আড়ে আড়ে কথা ছাড়ুন— খুলে বলুন। আর যদি ধাপ্পা মেরে বাজিমাত করব ভেবে থাকেন— খুব খারাপ জায়গায় চালাকি করতে এসেছেন জেনে রাখবেন।'

'আমি তো খুলেই বলব— নইলে আপনি মন খুলবেন কী করে। খোলামেলা হাওয়াটা পারস্পরিক ব্যাপার তো। এরপর আমি যা করব, সেটা কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনি কীভাবে আত্মসমর্থন করবেন, তার ওপর।'

'আত্মসমর্থন?'

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার?'

'মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে খুন করার অভিযোগের ব্যাপারে।'

রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে স্টার্নডেল বললেন, 'আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এইভাবেই কি ধাপ্পা মেরে জেতেন সব কেসে?'

শক্ত গলায় হোমস বললে, 'ডক্টর স্টার্নডেল, ধাপ্পাটা আপনি মারছেন— আমি নয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটা ঘটনা বলব— যার ভিত্তিতে পৌঁছেছি এই সিদ্ধান্তে। জাহাজে মালপত্র চাপিয়ে আফ্রিকায় পাচার করে দেওয়ার পর আপনার হঠাৎ ফিরে আসার ঘটনাটা শুনেই বুঝেছিলাম, এই নাটক নতুন করে খাড়া করতে গেলে আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন—'

'আমি ফিরে এলাম—'

'শুনেছি কেন ফিরে এলেন এবং কারণটা নাকচও করেছি বিশ্বাস করার মতো নয় বলে। যাকগে সে-কথা। আপনি আমার কাছে এলেন শুধু একটা কথা জানতে— কাকে সন্দেহ করেছি আমি। আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিলাম না। আপনি সোজা পাদরিমশায়ের বাড়িতে গিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের বাড়ি চলে গেলেন।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনার পেছন পেছন আমি গিয়েছিলাম বলে।'

'আমি তো কাউকে দেখিনি।'

'আমি যখন আপনার পেছন নেব, ঠিক এইরকমটাই দেখবেন সবসময়ে— মানে, আমাকে কখনো দেখতে পাবেন না— আমি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাব। সারারাত ছটফটিয়ে কাটালেন নিজের কটেজে, শেষকালে একটা মতলব মাথায় এল। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়লেন প্ল্যানমাফিক কাজ হাসিল করার জন্যে। তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে! কটেজ থেকে বেরিয়েই দরজার পাশ থেকে তাগাড় করা লালচে নুড়ি কয়েক খামচা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন।'

ভীষণ চমকে উঠলেন স্টার্নডেল, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন হোমসের দিকে।

'হনহন করে এক মাইল হেঁটে পৌঁছোলেন পাদরিমশায়ের বাড়িতে। এখন যে খাঁজকাটা সুখতলাওলা টেনিস জুতো পায়ে দিয়েছেন, তখন এই জুতো পরেই বেরিয়েছিলেন। পাদরিভবনে পৌঁছে ফলের বাগান পেরিয়ে পাশের ঝোপ টপকে পৌঁছোলেন ভাড়াটে ট্রেগেন্নিসের জানলার ঠিক নীচে। তখন দিনের আলো ফুটেছে, কিন্তু বাড়ির কেউ জাগেনি। পকেট থেকে কয়েকটা নুড়ি বার করে আপনি মাথার ওপরকার জানলা টিপ করে ছুড়তে আরম্ভ করলেন।'

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন স্টার্নডেল।

'সাক্ষাৎ শয়তান নাকি আপনি!'

অভিনন্দন শুনে হাসল হোমস। দু-মুঠো, কি তিন মুঠো নুড়ি ছোড়বার পর জানলায় এসে দাঁড়ালেন ভাড়াটে ভদ্রলোক। হাত নেড়ে তাঁকে নীচে আসতে বললেন আপনি। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে নীচের বসবার ঘরে নেমে এলেন ভদ্রলোক। আপনি ঢুকলেন জানলা দিয়ে। কথা বললেন সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে— আগাগোড়া পায়চারি করলেন ঘরময়। তারপর বেরিয়ে এসে জানলা বন্ধ করে দিলেন। লনে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে দেখতে লাগলেন কী হয়। ট্রেগেন্নিস মারা যাওয়ার পর যে-পথে এসেছিলেন, সেই পথেই বাড়ি ফিরে গেলেন। ডক্টর স্টার্নডেল, এবার বলুন এ-কাজ করলেন কেন? কী যুক্তিতে করলেন? মোটিভ কী আপনার? ওপরচালাকি করতে গেলে কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে জেনে রাখবেন।'

মুখখানা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ডক্টর স্টার্নডেলের। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরেই এক ঝটকায় বুক পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বার করে ছুড়ে দিলেন সামনের ঘেসো টেবিলের ওপর।

'যা কিছু করেছি, এইজন্যেই করেছি।'

পরমাসুন্দরী এক মহিলার আবক্ষ আলোকচিত্র! ঝুঁকে পড়ল হোমস।

বলল, 'ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস।'

'হ্যাঁ, ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস।' বললেন ডক্টর স্টার্নডেল। 'আমার ভালোবাসার মানুষ ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস। এ-ভালোবাসা আজকের নয়— বহু বছরের মনপ্রাণ দিয়ে সে ভালোবেসেছে আমাকে, আমি বেসেছি তাকে। কর্নিশ অঞ্চলে কেন মাঝে মাঝে এসে একলা কাটিয়ে যাই— কেউ তা বোঝেনি— অবাক হয়েছে— কারণটা আবিষ্কার করতে পারেনি। এই হল সেই রহস্য। শুধু এর জন্যেই সুদূর আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছি বার বার। বছরের পর বছর গিয়েছে— ভালোবাসা আরও নিবিড় হয়েছে। সে অপেক্ষা করেছে, আমিও অপেক্ষা করেছি, বিয়ে কিন্তু হয়নি। কেননা, আমি বিবাহিত। বউ অনেকদিন পালিয়েছে। অথচ ইংলন্ডের জঘন্য আইনের জন্যে তাকে ডাইভোর্সও করতে পারিনি। বছরের পর বছর কেবল অপেক্ষাই করে গিয়েছে— সে-অপেক্ষা যে এই পরিণতির জন্যে, তা কে জানত বলুন।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ডক্টর স্টার্নডেল। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সুবিশাল দেহ। দাড়ির নীচে দু-হাত ঢুকিয়ে নিজেই টিপে ধরলেন নিজের গলা। অতি কষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে— ফোঁপানি থামিয়ে আত্মস্থ হয়ে ফের বলতে লাগলেন।

'পাদরি সাহেব সব জানেন। উনি আমাদের দুজনেরই সব খবর রাখেন। বিশ্বাস করে ওঁর কাছেই কেবল মনের কথা বলেছি আমরা। তাই উনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আফ্রিকায়

যাওয়া বা মালপত্রের কথা তখন কি আর মনে থাকে? সব ফেলে চলে এলাম। যাকে জীবন দিয়ে ভালোবেসেছি তার এই পরিণতি দিশেহারা করে দিল আমাকে— সব ফেলে দৌড়ে এলাম শোধ নেব বলে। মি. হোমস, আপনার হারানো সূত্র এবার নিশ্চয় পেয়েছেন?'

'বলে যান।'

পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে ঘেসো-টেবিলের ওপর রাখলেন ডক্টর স্টার্নডেল। প্যাকেটটার ওপরে লেখা 'র‍্যাডিক্স পেডিস ডায়াবোলি।' নীচে লাল রঙের বিষের লেবেল সাঁটা। প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো ডাক্তার। এ-জিনিসের নাম কখনো শুনেছেন?'

'শয়তানের-পা শেকড়! না, কক্ষনো শুনিনি!'

'তার জন্যে ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। যদ্দূর জানি, বুডার[১২] ল্যাবরেটরিতে একটাই নমুনা আছে এই শেকড়ের— ইউরোপের আর কোথাও নেই! বিষবিজ্ঞান বা ভেষজবিজ্ঞানে এখনও ঠাঁই পায়নি এই শেকড়। শেকড়টাকে দেখতে কিছুটা মানুষের পায়ের মতো, কিছুটা ছাগলের পায়ের মতো— তাই উদ্ভিদবিজ্ঞানী অভিযাত্রীরা এর নামকরণ করেছেন শয়তানের পা। পশ্চিম আফ্রিকায় যারা রোগ সারায়, এ-শেকড়ের খবর তারাই কেবল রাখে— আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ প্রয়োগের সময়[১৩] কাজে লাগায়— তাই শেকড়-রহস্য আর কাউকে জানায় না। উবাঙ্গিতে[১৪] অদ্ভুত একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় এই নমুনাটা হাতে পেয়েছিলাম আমি; বলতে বলতে, প্যাকেট খুলে লালচে-বাদামি নস্যির মতো একগাদা গুঁড়ো বার করে দেখালেন ডক্টর স্টার্নডেল।

'তারপর?' কঠিন কণ্ঠে বললে হোমস।

'সবই আপনাকে বলব, মি. হোমস। অনেক কিছুই আপনি জানেন, তাই আমার স্বার্থে আপনার বাকিটুকুও জানা দরকার। ব্রেন্দার জন্যেই ট্রেগেন্নিস ফ্যামিলির সঙ্গে খাতির জমেছিল আমার। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মর্টিমারের সঙ্গে এদের একবার বিবাদ লাগে। পরে তা মিটে যায়। মর্টিমারকে কিন্তু আমি বেশ কয়েকটা ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলাম। লোকটা ধূর্ত, চাপা, প্যাঁচালো— কিন্তু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধাতে চাইনি সঠিক কোনো কারণ না-থাকায়।

'হপ্তা দুয়েক আগে কটেজে এসেছিল মর্টিমার। আফ্রিকায় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে গল্প করেছিলাম। এই পাউডারটাও দেখিয়েছিলাম। আশ্চর্য গুঁড়োর অদ্ভুত ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলাম। ব্রেনের মধ্যে ভয় পাওয়ার কেন্দ্রকে কীভাবে উদ্দীপ্ত করে, কীভাবে মানুষকে হয় পাগল, নয় একেবারে মেরে ফেলে— তা বলেছিলাম, নিগ্রোদের কাউকে শাস্তি দেওয়ার দরকার হলে গাঁয়ের পুরুত এই গুঁড়ো আগুনে ফেলে তার দফারফা করে ছাড়ে। ইউরোপের বিজ্ঞান আজও এই বিষের সন্ধান পায়নি— বিষের ক্রিয়া ধরবার ক্ষমতাও কোনো বিজ্ঞানীর নেই। ঘর ছেড়ে বাইরে যাইনি আমি, তা সত্ত্বেও কীভাবে যে গুঁড়োটা সরিয়েছিল মর্টিমার জানি না। খুব সম্ভব আমি যখন আলমারি খুলে ঝুঁকে পড়ে কৌটো দেখছিলাম, সেই সময়ে শেকড়ের কয়েক চিমটে গুঁড়ো হাতসাফাই করে। বিষটা কতক্ষণে কাজ দেয় পরিমাণ কতখানি লাগে— এই নিয়ে ওর প্রশ্নগুলো কিন্তু বেশ মনে আছে। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য আছে বলেই অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছে শয়তানের পায়ের শয়তানি বৃত্তান্ত।

'প্লিমাউথে পাদরির টেলিগ্রাম পাওয়ার আগে এ-প্রসঙ্গে আর ভাবিনি। কুচক্রী মর্টিমার ভেবেছিল, আমি আফ্রিকায় রওনা হয়ে গিয়েছি— বেশ কয়েক বছরের জন্যে কেউ আর আমার খবর পাবে না। কিন্তু আমি ফিরে এলাম সঙ্গেসঙ্গে। সত্যিই আমারই শয়তানের-পা বিষ দিয়ে পৈশাচিক এই কাণ্ডটা করা হয়েছে কি না, আগে তা যাচাই করতে চেয়েছিলাম। আপনার কাছে এলাম আপনি কী ভেবেছেন জানবার জন্যে। কিন্তু দেখলাম, কিছুই জানেন না আপনি। আমি কিন্তু বুঝেছিলাম, দুজনকে পাগল আর একজনকে খুন করেছে মর্টিমার। করেছে বিষয় সম্পত্তির লোভে। তিনজনকেই পথ থেকে সরাতে পারলে সব বিষয় একা পাবে— এই লোভে শয়তানের-পা শেকড় দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এমন একটি মেয়েকে যাকে আমি সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছি— আমাকেও যে ভালোবেসেছে। মহাপাপী এই মর্টিমারকে সাজা দেওয়ার দায়িত্বও আমার। ভাবতে বসলাম সাজাটা কী ধরনের হওয়া উচিত।

'আইনের স্মরণ নেব কি? কিন্তু প্রমাণ কই? প্রমাণ ছাড়া অত্যাশ্চর্য এই উপকথা আদালত বিশ্বাস করবে কেন? মর্টিমার অপরাধী— আমিই শুধু জানি— ও যা করেছে, তা বর্ণে বর্ণে যে সত্য— কল্পনা নয়, তা দেশের লোককে বিশ্বাস করাব কেমন করে? চেষ্টা করলে হয়তো সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ জোগাড় করে বিশ্বাস করাতে পারি— নাও পারি! কিন্তু যদি না-পারি? ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই। আমার প্রতিটা রক্তবিন্দু তখন প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছে। মি. হোমস, এর আগেও আপনাকে বলেছি, বহু বছর আদিম অসভ্যদের সঙ্গে ঘর করেছি আমি— আইনের বাইরে কাটিয়েছি বলেই নিজের আইন নিজেই বানিয়েছি— সাজা নিজেই দিয়েছি। এখনও তাই করব। ঠিক যেভাবে মারা গেছে আমার ভালোবাসার পাত্রী, ঠিক সেইভাবে মরতে হবে মর্টিমারকেও। ব্রেন্দার যে-পরিণতি সে ঘটিয়েছে— সেই একই পরিণতির দিকে তাকে ঠেলে দেব আমি— এই হল আমার প্রতিজ্ঞা।

'সবই বললাম আপনাকে। বাকিটুকু আপনিই বলেছেন। সারারাত ছটফট করলাম। ভোর বেলা বেরিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে টেনে তুলতে অসুবিধে আছে অনুমান করেই পকেট বোঝাই করে কয়েকমুঠো নুড়ি নিয়ে গেলাম, জানলা লক্ষ করে ছুড়তে লাগলাম। নীচে এসে জানলা খুলে আমাকে ভেতরে ঢোকাল মর্টিমার। ভণিতা না-করে সোজাসুজি আরম্ভ করলাম কাজের কথা— বুঝিয়ে দিলাম আর সমস্ত কুকীর্তি আমি ধরে ফেলেছি এবং শাস্তি দেওয়ার জন্যেও তৈরি হয়ে এসেছি। রিভলভার তুলে রাসকেলকে কাঠের পুতুলের মতো বসিয়ে রাখলাম চেয়ারে। ল্যাম্প জ্বেলে খানিকটা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম ওপরে। তারপর রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম জানলার বাইরে— পালাবার চেষ্টা করলেই ভয় দেখিয়ে ফের ঘরে ঢোকাব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মারা গেল মর্টিমার। অকথ্য যন্ত্রণা পেয়েছিল মরবার আগে— চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমার পাথরের মতো শক্ত মনে কোনো দাগ পড়ল না। ব্রেন্দা যে কষ্ট পেয়েছে, তত কষ্ট তো পেতে হয়নি— কাজেই আমার মন কাঁদবে কেন? মি. হোমস, সবই তো শুনলেন, এখন বলুন কী করবেন আমাকে নিয়ে। আমি এখন আপনার মুঠোর মধ্যে। যা খুশি করতে পারেন— বাধা দেব না। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না— শুধু এইটুকু জেনে রাখুন জানি না কোনো নারীকে কখনো ভালোবেসেছেন কি না— বাসলে আমি যা করেছি, আপনিও তাই করতেন।'

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল হোমস।

তারপর বলল, 'আপনার প্ল্যান কি এখন?'

'বাকি জীবনটা মধ্য আফ্রিকায় প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে কাটাব। অর্ধেক কাজ এখনও বাকি।'

'যান, বাকিটুকু শেষ করে ফেলুন। আপনাকে আমি অন্তত আটকাব না।'

উঠে দাঁড়াল ডক্টর স্টার্নডেলের দৈত্যমূর্তি। গম্ভীরভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে মন্থর চরণে বেরিয়ে গেলেন কুঞ্জের বাইরে। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে তামাকের থলি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হোমস।

বলল, 'ভায়া, পৃথিবীতে এমন অনেক ধোঁয়া আছে যা খুব বিষাক্ত নয়, কিন্তু শ্রান্ত মনকে চাঙা করে তুলতে অদ্বিতীয়। আপাতত সেই জাতীয় ধোঁয়া খানিকটা খাও। এ-কেসে আমাদের নাক গলাতে কেউ যখন ডাকেনি— তখন আমাদের যা খুশি আমরা করতে পারি। নিজেরা যখন তদন্ত করেছি, কী করব না-করব, সেটাও ঠিক করব নিজেরা। তাই নয় কি? তুমি হলে কী করতে? পুলিশে ধরিয়ে দিতে ভদ্রলোককে?'

'নিশ্চয় না।'

'ওয়াটসন, জীবনে কোনো নারীকে ভালোবাসিনি, যদি বাসতাম এবং সে-নারীটির শেষ দশা যদি এইরকম হয়, তাহলে সিংহশিকারি ঠিক যেভাবে আইনের বাইরে গিয়ে সাজা দিয়েছেন, আমিও হয়তো তাই করতাম। যাকগে ভায়া কীভাবে রহস্যভেদ করলাম, তা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে তোমার বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করতে চাই না। জানলার বাইরে নুড়ি দেখেই শুরু করেছিলাম গবেষণা। পাদরির বাগানে এ-রকম নুড়ি কোথাও নেই[১৫]। ডক্টর স্টার্নডেলের ওপর নজর পড়তেই তাঁর কটেজের বাইরে দেখলাম একই নুড়ি পড়ে রয়েছে স্তূপাকার। দিনের আলোয় জ্বলন্ত ল্যাম্প এবং অভ্র-আচ্ছাদনের ওপর গুঁড়ো দেখেই যুক্তির কৌশল মনে মনে বানিয়ে নিয়েছিলাম। যাকগে, এ-প্রসঙ্গ এবার বাদ দাও। কেল্টিক কথাবার্তার চালডিয়ান শেকড় যে এই কর্নিশ অঞ্চলেই রয়েছে তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করা যাক।'

টীকা

১. **শয়তানের পা** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডেভিলস ফুট' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯১০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **হার্লে স্ট্রিট** : লন্ডনের এই রাস্তায় বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অফিস বা চেম্বার অবস্থিত : 'দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. **সে কাহিনি অন্য সময়ে বলা যাবে'খন** : এই গল্প ওয়াটসন কোনোদিনই বলেননি।

৪. **কর্নিশ অন্তরীপ** : ইংল্যান্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অঞ্চল।

৫. **পোলধু উপসাগর** : এই নামে কোনো উপসাগর নেই। কিন্তু মাউন্টস বে-র তীরবর্তী পোলধু কোভ নামে একটি জায়গা আছে। এই পোলধু থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে মর্স কোডে প্রথম রেডিয়ো ট্রান্সমিশন প্রেরিত হয় অতলান্তিকের ওপারে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জন-এ সেই রেডিয়ো বার্তা গ্রহণ করেন ইতালিয় পদার্থবিদ ওগলিয়েমো মার্কনি (১৮৭৪-১৯৩৭)।

৬. **মাউন্টস বে** : ইংলিশ চ্যানেল এবং অতলান্তিক মহাসাগরের ঠিক সংযোগস্থলে এর অবস্থান।

৭. **কর্নিশ ভাষা** : জুলিয়াস সীজারের সময় থেকে ব্রাইটনদের কথ্য ভাষা কর্নিশ, কেল্টিক উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টিয়

দশম শতাব্দীতে এই ভাষার প্রচলন থাকার নথীভুক্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইংল্যান্ডের অন্য দুটি ভাষা ব্রেটন এবং ওয়েলশ অদ্যাবধি প্রচলিত থাকলেও কর্নিশ ভাষার ব্যবহার অষ্টাদশ শতকে লুপ্ত হয়।

৮. **চালডিন ভাষা :** সেমিটিক ভাষা চলে ভিন্ন বা চ্যালডিয়নের অপর প্রচলিত নাম অ্যারামিক। এই ভাষার সঙ্গে হিব্রু, সিরিয়াক এবং ফিনিশীয় ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়।

৯. **ফিনিশিয়ান :** বর্তমান লেবানন যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানেই ছিল ফিনিশিয়া। ফিনিশীয়রা ছিল নৌবাণিজ্যে পারদর্শী। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি ফিনিশিয়া পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১০. **আমি জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসেছিলাম। জর্জ বসে ছিল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে :** জর্জ যদি হুইস্ট খেলায় মর্টিমারের বিপরীতে বসে, তাহলে ওয়েন আর ব্রেন্দা ছিল মুখোমুখি চেয়ারে। সেক্ষেত্রে মৃত ব্রেন্দার দুই পাশে দুই ভাইয়ের থাকা সম্ভব হয় না।

১১. **তারপরে আনে মৃত্যু :** একইরকমভাবে বিষাক্ত মোমবাতির ধোঁয়া দিয়ে হত্যা করবার ঘটনা দেখা গিয়েছে এডগার অ্যালান পো-র লেখা একটি গল্পে।

১২. **বুডা :** ১৩৬১ সালে হাঙ্গেরী রাজধানীর পত্তন হয় বুডা শহরে। ১৮৭৩-এ দানিয়ুব নদীর অপর পারে অবস্থিত পেস্ট শহরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে শহরের নতুন নাম হয় বুডাপেস্ট।

১৩. **আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ প্রয়োগের সময় :** আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বন্য উপজাতির মানুষদের মধ্যে অভিযুক্তকে বিষ খাইয়ে তার অপরাধ নির্ণয়ের প্রথা আছে। বিষ খেয়ে যদি সে বমি করে বিষ উগরে দেয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় লোকটি নিরপরাধ। অন্যথায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

১৪. **উবাঙ্গি :** কিংবা উবাংসি বা মুরাংসি মধ্য আফ্রিকার একটি নদী। কঙ্গোর প্রধান শাখানদী ভবাংগি এবং এমবমু (Ambomu) নদী ১৮৯৭ সালে বেলজিয়ান কঙ্গো এবং ফরাসি কঙ্গোর সীমা নির্ধারক রেখা হিসেবে চিহ্নিত হত।

১৫. **এ-রকম নুড়ি কোথাও নেই :** স্টার্নডেল পাদরির বাগানের নুড়ি না কুড়িয়ে নিজের বাগান থেকে নুড়ি নিয়ে এসেছিল কি শার্লক হোমসের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে? প্রশ্ন তুলেছেন গবেষক ডি. মার্টিন ডেকিন।

বিদায় নিলেন শার্লক হোমস[১]

[হিজ লাস্ট বাও]

শার্লক হোমস নাটকের শেষ অঙ্ক[২]

দোসরা অগাস্ট রাত ন-টা— পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন কালান্তক অগাস্ট[৩] আর আসেনি— ভয়ংকরের ঘনঘটা এভাবে কখনো দেখা দেয়নি। স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি কুপিত হয়েছিলেন— বদ্ধ গুমোট বাতাস তাই বুঝি থমথম করছিল তাঁরই চূড়ান্ত অভিশাপের অশনিসংকেত রূপে। সূর্য ডুবে গেছে কোনকালে— তবুও সুদূর পশ্চিমের আকাশে রক্তরাঙা ক্ষতচিহ্নের মতো দগদগ করছে একটা লাল তির্যক আভা। মাথার ওপর আকাশে ঝিলমিল করছে অগুনতি জাহাজের রোশনাই। বাগানের পাথুরে পথে ধীরপদে পায়চারি করছে দুজন জার্মান, ঠিক পেছনেই লাল পাথর গাঁথা পাথরের নীচু প্যাটার্নের বাড়ি। পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো চকখড়ি পাহাড়ের সানুদেশে সমুদ্রসৈকত। চার বছর আগে এই পাহাড় আর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে ভন বর্ক— দিক-দিগন্তে টহল দেওয়ার জন্যেই যেন জায়গা খুঁজে নিয়েছে প্রকাণ্ড একটা ইগল। দুই মাথা এক করে গোপনে ফিসফাস করছে দুই মূর্তি— যেন ঘোর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে— দুজনের কথায়।

মুখে জ্বলন্ত চুরুট। নীচে থেকে চুরুটের আগুন দেখে মনে হবে যেন দূরায়ত কোনো পিশাচ ধূমায়িত গনগনে চোখ মেলে কটমট করে দেখছে অন্ধকারের দৃশ্য।

কাইজারের[৪] অগুনতি অনুরক্ত গুপ্তচরের মধ্যে অতুলনীয় এই ভন বর্ক লোকটা অনন্য প্রতিভার দৌলতেই ইংরেজদের সর্বনাশ করার ভার পেয়েছিল প্রথমে এবং এই কুচক্রী ধীশক্তির প্রসাদেই আজ সে অদ্বিতীয় গুপ্তচর হতে পেরেছে। এই পৃথিবীর অন্তত জনাছয়েক ব্যক্তি— যারা ভেতরের খবর রাখে— তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ভন বর্ক কী চিজ। কী বিপুল তার অধ্যবসায় এবং কী পরিমাণ সূক্ষ্ম তার কূট বুদ্ধি। এই ছ-জনের একজন এই মুহূর্তে তার পাশেই দাঁড়িয়ে। এঁর নাম ব্যারন ভন হার্লিং। জার্মান কূটনৈতিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধির চিফ সেক্রেটারি। অদূরে সরু রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এক-শো হর্সপাওয়ারের সুবৃহৎ বেঞ্জগাড়ি[৫]— কথা শেষ হলেই এই গাড়ি চেপে তিনি ফিরে যাবেন লন্ডনে।

চিফ সেক্রেটারি বলছিলেন, 'ঘটনাস্রোত দেখে মনে হচ্ছে এই হপ্তার শেষ নাগাদ তুমি বার্লিন ফিরে যাবে। অভ্যর্থনার বহর দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেশের জন্যে যা করেছ, তা নাড়া জাগিয়েছে খুব উঁচুমহলে। এদেশের উঁচুমহলও তোমাকে তো মাথায় তুলে রেখেছে।' ব্যারন ভদ্রলোক কথা বলেন খুব মন্থর ভঙ্গিমায় টেনে টেনে— কূটনৈতিক জীবনে শুধু এই বাচনভঙ্গিকে সম্বল করেই আজ তিনি এত উর্ধ্বে উঠেছেন। বিরাট চেহারা। কপাটের মতো চ্যাটালো বুক। মাথায় বেশ লম্বা।'

হেসে উঠল ভন বর্ক।

'ওদের ঠকানো এমন কিছু কঠিন নয়, ব্যারন। বড়ো সাদাসিদে, সরল। ঘোরপ্যাঁচ একদম বোঝে না।'

'তা অবশ্য বলতে পারব না', চিন্তাচ্ছন্ন সুরে বললেন ব্যারন। এদের ব্যাপারস্যাপার বড়ো অদ্ভুত— দেখে শেখার মতো। বাইরে থেকে গোবেচারা মনে হয় বটে— কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদেই পড়তে হয় নতুন লোককে— ঠকে যায় বাইরের সরল ব্যাপার দেখে। প্রথমটা দেখে মনে হয় না জানি কী নরম ধাত। তারপরেই আচমকা এমন একটা শক্ত জায়গায় হোঁচট খেতে হয় যে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়ে। এদের এই সনাতনী রূপটা দেখে ভুল ধারণা করা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন ধরো, এদের সনাতনী কাষ্ঠলৌকিকতা। যত আড়ষ্টই হোক না কেন, অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়।'

'তা আর বলতে', দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভন বর্ক— যেন অভিজ্ঞতাটা তারও খুব কম নয়।

'আমি নিজে একটা বিরাট ভুল করেছিলাম— আমার অনেক সফল কীর্তি যখন তুমি জান, বিফল কীর্তিটাও জেনে রাখো। এদেশে এসেই নেমন্তন্ন পেলাম একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বাগানবাড়িতে। কথাবার্তা হল অত্যন্ত অবিবেচকের মতো।'

'জানি। আমিও ছিলাম সেখানে,' শুকনো গলায় বললেন ভন বর্ক।

'রিপোর্ট পাঠালাম বার্লিনে। চ্যান্সেলর[৬] বড়ো কড়া লোক। এমন একটা মন্তব্য করলেন যে বুঝলাম তিনি ধরে ফেলেছেন আমি সব গুবলেট করে বসেছি। দু-দুটো বছর এই ভুলের মাশুল গুনতে হয়েছে। বাইরে থেকে যাঁকে খুব নরম ভেবেছিলাম, এই ঘটনার পর সেই ইংরেজ

গৃহস্বামীর অন্য মূর্তি দেখলাম— সে-মূর্তি আর যাই হোক নরম নয় মোটেই। আমার যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে, এখন তুমি এসেছ স্পোর্টসম্যানের ভেক নিয়ে।'

'ভেক বলছেন কেন— ভেক মানে তো মিথ্যে, নকল। আমি তা নই। স্পোর্টস আমার শিরায় উপশিরায়। সারাজীবন খেলাধুলা নিয়েই তো কাটালাম।'

'সেইজন্যেই অভিনয়টা আরও ভালো হচ্ছে— ওষুধ ধরছে— কাজ হচ্ছে। একই সঙ্গে নৌকা চালাও, শিকারে বেরোও, পোলো খেলো, সব খেলাতেই নেমে পড়, অলিম্পিয়ায়[৭] গিয়ে প্রাইজ পর্যন্ত নিয়ে আসো। শুনলাম ছোকরা অফিসারদের সঙ্গে বক্সিংও লড়ছ। ফলে নিজের মতো করেই তোমাকে নিয়েছে সবাই। খেলাধুলা-পাগল জার্মান হিসেবে খ্যাতির শ্রদ্ধা, সম্মান পেয়েছ সর্বত্র। নাইট ক্লাবে যাও, টেনে মদ খাও, শহর জুড়ে দাপিয়ে বেড়াও— বেপরোয়া জীবনযাপন দেখে ওরা হাসে— তোমাকে আরও কাছে টেনে নেয়। কেউ জানতেও পারে না, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট এই বাড়িটায় ইংলন্ডের অর্ধেক দুষ্কর্মের ঘাঁটি আগলে বসে রয়েছ তুমি নাটের গুরু হয়ে— কল্পনাও করতে পারে না জার্মান হয়েও খেলা-পাগল বলে যাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না— তার চেয়ে দুঁদে গুপ্তচর সারাইংলন্ডে আর নেই। ভায়া ভন বর্ক— সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!'

'খুব যে খোশামোদ করছেন দেখছি। তবে হ্যাঁ, এই চারটে বছর বৃথা কাটাইনি এদেশে। আমার ভাঁড়ার কখনো দেখাইনি আপনাকে— আসুন না ভেতরে।'

পড়ার ঘরে ঢুকল ভন বর্ক। আলো জ্বেলে জানলার পর্দা টেনে দিল ভালো করে। তারপর রোদে-পোড়া বাজপাখির মতো মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিরাটকায় ব্যারনের পানে।

বললে, 'গতকাল স্ত্রী কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে ফ্লাসিং[৮]-এ। তবে আসল কাগজপত্র আমার কাছে। দূতাবাস যেন আমাকে সাহায্য করে।'

'করবে। তোমার মালপত্র আগলাবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। তবে আমাদের ইংলন্ড ছেড়ে যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না আমার। ফ্রান্সের কপালে যা আছে তা ঘটবেই— ইংলন্ড আটকাতে পারবে না। দু-দেশের মধ্যে সন্ধিপত্রও সই হয়নি।'

'বেলজিয়ামের কী হবে?'

'বেলজিয়ামকে ডুবতে হবে।'

'কিন্তু তা কী করে হয়? সন্ধিপত্র সই করা আছে যে। হেনস্থা সইবার পাত্র ওরা নয়।'

'কিছুদিনের জন্যে শান্তিতে থাকব— তারপর যা হবার তা হবে।'

'কিন্তু মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?'

'আরে রাখো ওসব ছেঁদো কথা! যুগটাই হল জনহিতকর ন্যায়সংগত মতবাদের যুগ। সম্মান শব্দটা সেকালে চলত— এখন চলে না। তা ছাড়া, ইংলন্ড এখনও তৈরি নয়। খুবই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য— কিন্তু সত্যি। টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় যখন খবর বেরোল, আমরা বিশেষ যুদ্ধ কর বাবদ পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহ করছি— তখনই তো টনক নড়া উচিত ছিল— কিন্তু ঘুম এখনও ভাঙেনি— অথচ সে-খরচটা আমার আসল মতলবের বিরাট বিজ্ঞাপন বললেই চলে। মাঝে মাঝে এক আধটা প্রশ্ন কানে আসে— আমার কাজ মনের মতো জবাব বানিয়ে বলে যাওয়া। মাঝেমধ্যে কেউ খেপে যায়— আমি তাদের ঠান্ডা করি। এর বেশি আসল প্রস্তুতি

কোথাও হচ্ছে না। সাবমেরিন আক্রমণ আটকানোর প্রস্তুতি, গোলাবারুদ গুদোমজাত করা, আরও বড়ো রকমের বিস্ফোরণ বানানো— কোনো ব্যাপারেই এরা এক পাও এগোয়নি— বিশ্বাস করো, কোথাও কোনো প্রস্তুতি নেই। উলটে আমরাই আইরিশ গৃহযুদ্ধের[৯] মতো নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করে এদের মন অন্যদিকে আটকে রেখেছি— প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা কারো খেয়ালই নেই!'

'কিন্তু খেয়াল করা তো দরকার— ভবিষ্যৎ নিয়ে সজাগ হওয়া দরকার।'

'সেটা ওদের ব্যাপার— আমাদের নয়। ভবিষ্যতে আমরা কী করব ইংলন্ডকে নিয়ে, তা ঠিক করাই রয়েছে— তোমার আনা খবর-টবরগুলো তখন কাজে লাগবে। সেটা আজকে কি কালকে— তা কিন্তু ঠিক করবেন জন বুল মশাই[১০]। উনি যদি মনে করেন— টক্কর লাগুক আজকেই— আমরা তৈরি। আর যদি লড়াই বাধাতে হয় দু-দিন পরে— আমরা আরও একটু বেশি তৈরি হব— এই যা তফাত। আমার কী মনে হয় জান— একলা লড়বার সাহস ওদের হবে না— মিত্রপক্ষর সাহায্য নেবে। এই সপ্তাহেই বোঝা যাবে নিয়তি ওদের কোনদিকে নিয়ে যায়। যাক সে-কথা, কাগজপত্র দেখাবে বলছিলে দেখাও।' আর্মচেয়ারে বসে মৌজ করে চুরুট টানতে লাগলেন ব্যারন— আলোয় চিকমিক করতে লাগল চওড়া টাকখানা।

বইয়ের তাকের সামনে পর্দা ঝুলছিল। এককোণে ওককাঠের টানা লম্বা প্যানেল। পর্দা টেনে সরাল ভন বর্ক। দেখা গেল তামার পাত দিয়ে মজবুত একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক। পকেট থেকে চাবি বার করে বেশ কিছুক্ষণ কসরত করবার পর তালা খুলে ভারী পাল্লা টেনে দু-হাট করল ভন বর্ক।

বলল, 'দেখুন।'

খোলা সিন্দুকের গর্ভে আলো পড়ায় স্পষ্ট দেখা গেল সারি সারি অনেকগুলো খুপরি। প্রত্যেকটা খুপরিতে কাগজের লেবেল সাঁটা। লেবেলে লেখা— 'ফোর্ডস', 'বন্দর— প্রতিরক্ষা', 'এরোপ্লেন', 'আয়ারল্যান্ড', 'মিশর', 'পোর্টসমাউথ কেল্লা[১১]', 'চ্যানেল', 'রোসিথ[১২]' ইত্যাদি। প্রত্যেকটা খুপরির মধ্যে থরে থরে সাজানো দলিল আর নকশা।'

'দারুণ!' মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে মোটাসোটা দুই হাত এক করে আনন্দে উথলে উঠলেন ব্যারন।

'আমার চার বছরের কাজ, ব্যারন। গাঁইয়া জমিদারের ছদ্মবেশে কাজটা খারাপ নয়, তাই না? মদ খাওয়া আর খেলাধুলো নিয়ে মেতে থেকেছি— কিন্তু কাজও করেছি। তবে সব সেরা বস্তুটি এখুনি এসে পৌঁছোবে,' বলে একটা খুপরি দেখাল ভন বর্ক— খুপরির ওপরকার লেবেলে লেখা 'নৌদপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন'।

'কিন্তু এ-সম্বন্ধে কাগজপত্র সব খরচ তো তোমার নেওয়া হয়ে গেছে।'

'এখন তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে হবে। নৌবিভাগ কীভাবে জানি না সন্দেহ করেছিল খবর পাচার হচ্ছে— রাতারাতি সব সাংকেতিক চিহ্ন পালটে দিয়েছে। এত বছর কাজ করছি— শেষ মুহূর্তে এমন চোট কখনো খাইনি। তবে আমার এই চেকবুকের দৌলতে সে বাধাও পেরিয়েছি। আজ রাতেই আলটামন্ট আসছে সব খবর নিয়ে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন ব্যারন।

'আরে সর্বনাশ? এখুনি যেতে হবে আমাকে। কার্লটন টেরেসে[১৩] এই মুহূর্তে এখন কী ঘটছে, তা তুমিও জান। কাজেই যে-যার ঘাঁটি আগলানো দরকার। আলটামন্ট কখন আসবে বলেছে?'

একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিল ভন বর্ক।

'আজ রাতে— সঙ্গে আনবে নতুন স্পার্কিং প্লাগ।'

'স্পার্কিং প্লাগ?'

'আলটামন্ট মোটর এক্সপার্টের ভেক নিয়েছে। আমার গ্যারেজে গাড়িও তো অনেক। এক-একটা স্পেয়ার পার্টসের নামে পাঠায় এক-একটা গোপন খবর। র‍্যাডিয়েটর নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালে বুঝে নিতে হবে যুদ্ধজাহাজের কথা বলছে, অয়েল পাম্প মানে ক্রুজার, এইরকম আর কি। স্পার্কিং প্লাগ মানে নৌ দপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন।'

টেলিগ্রামটা নিজের মনেই পড়লেন সেক্রেটারি— 'আজই আসছি পোর্টসমাউথ থেকে'!— ভালো কথা ওকে কত টাকা দিচ্ছ?

'শুধু এই কাজের জন্যে পাঁচশো পাউন্ড— এ ছাড়াও মাস-মাইনে তো আছেই।'

'টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতক হতে এদের আটকায় না। সব ভালো, কিন্তু এত টাকা শুষে নেয় যে বলবার নয়!'

'আলটামন্টকে টাকা দিয়ে আমি কিন্তু কখনো পস্তাইনি। একহাতে টাকা নেয়, আর এক হাতে কাজ দেয়। তা ছাড়া, ওকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না। আইরিশ-আমেরিকানরা ইংলন্ডকে যতখানি ঘৃণা করে, ততখানি আমরা জার্মানরাও করি না।'

'তাই নাকি? আলটামন্ট আইরিশ-আমেরিকান?'

'কথা শুনলেই বুঝবেন। ওর সব কথা বুঝতেই পারি না— এমন উচ্চারণ। রাজার ইংরিজি আর ইংরেজ রাজা— এই দুইয়ের বিরুদ্ধেই যেন যুদ্ধঘোষণা করেছে একই সাথে। চললেন নাকি? আর একটু বসে গেলে দেখা হয়ে যেত।'

'না হে, এমনিতেই অনেকক্ষণ আছি— আর নয়। কাল সকালে তোমার আশায় থাকব। নৌ দপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন তোমার হাতে এলেই ইংলন্ডের সব খবর নেওয়া শেষ হল বুঝব। আরে! টোকে[১৪] নাকি!' ধুলোঢাকা একটা বোতল দেখিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ব্যারন।

'দেব এক গেলাস?'

'আর না? কিন্তু খুব হইহল্লা হবে মনে হচ্ছে!'

'মদ জিনিসটা আলটামন্টের খুব পছন্দ— ভালো জিনিস পেলে তারিফ করতে জানে। "টোকে" ওর মনে ধরেছে। ছোটোখাটো ব্যাপারেও ত্রুটি থাকলে ওর আবার আঁতে লেগে যায়— তাই বোতলটা তৈরি রেখেছি।'

কথা বলতে বলতে দুই মূর্তি বেরিয়ে এল উঠোনে। অদূরে দাঁড়িয়ে সুবিশাল গাড়িটা। ব্যারনের ড্রাইভারের আঙুলের ছোঁয়ায় চাপা শব্দে গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

কোটটা গায়ে দিয়ে ব্যারন বললেন, 'চারদিক কী শান্ত, কী সুন্দর।' কয়েক হপ্তার মধ্যেই ছুটে যাবে এই শান্তি— ইংলন্ডের উপকূল বরাবর আগুন জ্বালিয়ে ছাড়ব আমরা। শুধু সমুদ্র কেন, আকাশেও আগুন জ্বলবে যদি জেপেলিন[১৫] বাহিনী ঠিকমতো ভেলকি দেখাতে পারে। আরে বুড়িটা কে?'

একটিমাত্র জানলায় আলো জ্বলছে পেছনে। একটা ল্যাম্প। 'ল্যাম্পের সামনে টেবিলে বসে

গাঁইয়া টুপি মাথায় লালমুখো এক বুড়ি। হেঁট হয়ে উল বুনছে, আর মাঝে মাঝে পাশের টুলে বসা একটা বিরাট কালো বেড়ালের মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

'মার্থা— আমার ঝি। আর সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি— শুধু ওকে রেখেছি।'

নীরস হাসি হাসলেন সেক্রেটারি।

'শান্ত ইংলন্ডের মূর্ত প্রতীক ওই বুড়ি। নিশ্চিন্তভাবে বসে দিন কাটাচ্ছে পরম আরামে। জানেও না কী ঘটতে চলেছে আর কয়েক হপ্তার মধ্যে। ঠিক আছে, ভন বর্ক। চললাম!' হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ব্যারন। একজোড়া হেডলাইটের জোরালো আলো অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে ধেয়ে গেল সামনে। ধাবমান গাড়ির পেছনে নরম কুশনে হৃষ্টচিত্তে বসে সুখকর চিন্তায় নিমগ্ন থাকার দরুন ব্যারন মশায় খেয়াল করলেন না গাঁয়ের রাস্তার মোড় ফেরার সময়ে উলটো দিক থেকে একটা ছোট্ট ফোর্ড গাড়ি[১৬] বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

মোটর ল্যাম্পের শেষ দীপ্তি বহুদূর মিলিয়ে যেতেই ধীরপদে পড়ার ঘরে ফিরে এল ভন বর্ক। যাওয়ার সময়ে দেখল বুড়ি ঝি ল্যাম্প নিভিয়ে শুতে গিয়েছে। এতবড়ো নিঝুম বাড়িতে এভাবে একলা কখনো থাকেনি ভন বর্ক— এতদিন বাড়ি গমগম করত লোকজন থাকায়। একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে— নিরাপদ জায়গায় পাচার করা গিয়েছে ফ্যামিলির প্রত্যেককে। বিরাট এই বাড়ির রান্নাঘরে ওই এক বুড়ি ছাড়া কেউ আর নেই! যাওয়ার আগে পড়ার ঘরে বেশ কিছু জিনিস সাফ করতে হবে। সেই কাজেই ডুবে গেল ভন বর্ক। কাগজ পোড়াতে পোড়াতে আগুনের তাতে লাল হয়ে গেল সুশ্রী শানিত মুখটা। সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান দলিল আর নকশা নামিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগে থরে থরে সাজাতে লাগল। আচমকা কানে ভেসে এল দূরায়ত মোটর ইঞ্জিনের আওয়াজ। সোল্লাসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল ভন বর্ক। চামড়ার ব্যাগ বন্ধ করল, সিন্দুকের পাল্লায় তালা দিল। বেরিয়ে এল বাইরে। ঠিক সেই সময়ে অদূরে এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট গাড়ি। লাফিয়ে নামল এক চটপটে ব্যক্তি। ইঞ্জিন বন্ধ করে হেলান দিয়ে বসল ড্রাইভার— ভারী চেহারা লোকটার, বয়স্ক, ধূসর গোঁফ ঝুলছে নাকের নীচে। এমনভাবে বসল গা এলিয়ে যেন বসতে হবে অনেকক্ষণ।

দৌড়ে গিয়ে ভন বর্ক বললে, 'এনেছেন?'

ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট বিজয়-গৌরবে মাথার ওপর তুলে ধরল দর্শনার্থী লোকটা।

বলল, 'সব নিশানা এর মধ্যে।'

'সিগন্যাল তো?'

'সমস্ত— যতরকম সংকেত আছে নৌদপ্তরে— সমস্ত। ল্যাম্পের গুপ্ত সংকেত, দূরে সংকেত জানানোর যন্ত্র, মার্কনি[১৭] বেতার সংকেত— সমস্ত। কপি করে এনেছি কিন্তু— মূল দলিল আনা খুবই বিপজ্জনক।' বলেই সশব্দে চাষাড়ে ভঙ্গিমায় পিঠ চাপড়ে দিল ভন বর্কের। চোখ টিপে সহ্য করল ভন বর্ক।

বলল, 'ভেতরে আসুন। কেউ নেই বাড়িতে— আমি একা। কপি করে এনে ভালোই করেছেন— আসলের চাইতে ভালো। আসলটা খোয়া গেছে জানাজানি হয়ে গেলে সমস্ত পালটে নতুন করে করতে পারে। কপিটা ঠিকমতো হলেই হল।'

ভেতরে এসে আর্মচেয়ারে লম্বা হাত-পা ছড়িয়ে বসল আইরিশ আমেরিকান আগন্তুক। লোকটা তালঢ্যাঙা। কৃশ। বয়স প্রায় ষাট, চোখ-মুখ ধারালো, ছাগুলে দাড়ির জন্যে আঙ্কল স্যামের কৌতুকচিত্রের মতো দেখতে লাগছে। ঠোঁটের কোণ থেকে ঝুলছে একটা আধপোড়া থুথুভেজা চুরুট। দেশলাই ধরিয়ে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল চেয়ারে বসবার পর। চারদিক দেখে নিয়ে বললে, 'ওড়বার মতলবে আছেন দেখছি।' সিন্দুকের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠে বললে, 'আরে সর্বনাশ, কাগজপত্র ওর মধ্যে রাখেন নাকি?'

'রাখলে ক্ষতি কী?'

'আরে, এ-রকম খোলাখুলিভাবে রাখেন এত গোপন কাগজপত্র! আপনি না স্পাই? টিন কাটা যন্ত্র দিয়ে যেকোনো ইয়াঙ্কি বদমাশ চক্ষের নিমেষে কেটে খুলে ফেলবে ওই সিন্দুক। ওর মধ্যে আমার চিঠি রাখেন জানতে পারলে একটা চিঠিও আপনাকে লিখতাম ভেবেছেন?'

'ও-সিন্দুক কাটবার ক্ষমতা কোনো চোর বদমাশের নেই— কোনো যন্ত্র দিয়ে এ-সিন্দুকের ধাতু কাটা যায় না।'

'কিন্তু তালাটা?'

'ডবল কম্বিনেশন তালা। মানেটা বুঝেছেন নিশ্চয়?'

'খুলে বলুন।'

'প্রথমে একটা শব্দ আর কয়েকটা সংখ্যা দরকার হবে। নইলে তালা খুলবে না।' উঠে দাঁড়াল ভন বর্ক। চাবির ফোকরের চারধারে বেড় দেওয়া দুটো চাকতি দেখাল। 'বাইরের চাকতিটা শব্দের অক্ষরের, ভেতরেরটা সংখ্যার।'

'চমৎকার!'

'তাই বলছিলাম, যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। চার বছর আগে বানিয়েছিলাম এই সিন্দুক। জানেন তখন কী শব্দ আর কী সংখ্যা রেখেছিলাম?'

'কী করে বলব বলুন।'

'অগাস্ট আর ১৯১৪।'

বিস্ময় আর প্রশংসা যুগপৎ ফুটে ওঠে আমেরিকান ভদ্রলোকের চোখে-মুখে।

'দারুণ ব্যাপার করেছেন দেখছি! একেবারে নিখুঁত।'

'তারিখটা পর্যন্ত আমাদের কেউ কেউ আঁচ করে নিতে পারবে। কাল সকালেই লম্বা দিচ্ছি দলিল দস্তাবেজ নিয়ে।'

'আমিও সরে পড়ব হপ্তাখানেকের মধ্যে। একলা এদেশে থেকে মরব নাকি? সাগর পার থেকে দেখব কীভাবে ল্যাংচায় বেটা জন বুল।'

'আপনি পালাতে যাবেন কেন? আপনি তো আমেরিকার নাগরিক।'

'ব্রিটিশ আইনে আমেরিকান নাগরিক হলেই যে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে, তার কোনো মানে নেই। যেদেশে যে নিয়ম— অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে। যেমন পাচ্ছে জ্যাক জেমস— পচে মরছে পোর্টল্যান্ড জেলে[১৮]। ভালো কথা, আপনারা কিন্তু নিজের লোকদের বিপদ থেকে মোটেই বাঁচান না।'

'কী বলতে চান?' তেড়ে ওঠে ভন বর্ক।

'আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করা আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু আপনারা পিছলে বেরিয়ে যান। যেমন ধরুন জেমস—'

'জেমস মরেছে নিজের দোষে। আপনি তা জানেন। নিজের মতে চলতে গেলে অমন হবেই।'

'জেমস না হয় মাথামোটা। কিন্তু হোলিসকে বাঁচালেন না কেন?'

'ও তো একটা পাগল!'

'সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একনাগাড়ে অভিনয় করলে আর অষ্টপ্রহর শ-খানেক পুলিশচর লেগে থাকলে পাগল প্রত্যেকেই হয়। কিন্তু স্টিনারের কেসটা—'

চমকে ওঠেন ভন বর্ক, 'কী হয়েছে স্টিনারের?'

'ধরা পড়েছে। কাল রাতে দোকানে হানা দিয়েছিল পুলিশ। কাগজপত্র সমেত স্টিনার এখন পোর্টল্যান্ডে। ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারবে কি না সন্দেহ। এইসব কারণেই আমি সাগরপারে যেতে চাই যত তাড়াতাড়ি পারি।'

ভন বর্কের মনের জোর নেহাত কম নয়। নিজেকে সামলাতে সে জানে। কিন্তু খবরটায় বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছে দেখা গেল— ফ্যাকাশে হয়ে গেল লালচে মুখ।

বিড়বিড় করে বললে, 'স্টিনারকে ওরা পাকড়াও করল কী করে?'

'আমি বেঁচে গেছি অল্পের জন্যে।'

'কী বলতে চান?'

'বাড়িউলির কাছে আমার খোঁজ নিতে এসেছিল একজন। শুনেই বুঝেছি এবার আমার পালা। এত তাড়াহুড়ো করছি সেই কারণেই। কিন্তু পুলিশ এত খবর পাচ্ছে কী করে? স্টিনারকে নিয়ে পাঁচ জনকে ওরা ধরল— ষষ্ঠজন কে হবে আঁচ করতে পেরেই আমি সটকান দেব ঠিক করেছি। কিন্তু আপনার হয়ে যারা খাটছে, একে-একে তারা ধরা পড়ছে কেন? কীভাবে?'

মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেল ভন বর্কের।

'আপনার সাহস তো কম নয়!'

'মিস্টার, সাহস আছে বলেই আপনার সেবা করতে এসেছি— নইলে আমাকে পেতেন না। যা বলব মুখের ওপর বলব। শুনেছি আপনারা জার্মানরা কাজ মিটে গেলেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে দেন কাজের লোককে।'

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ভন বর্ক।

'তার মানে আপনি বলতে চান আমিই ধরিয়ে দিয়েছি আমার এজেন্টদের?'

'আমি তা বলতে চাই না। তবে কোথাও কেউ কলকাঠি নাড়ছে। সেইজন্যেই হল্যান্ডে না-যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

রাগ সামলে নিল ভন বর্ক।

'অ্যাদ্দিন একসঙ্গে কাজ করার পর শেষকালে আর ঝগড়া করতে চাই না। আপনি হল্যান্ডে যান— রাটারড্যাম থেকে জাহাজে নিউইয়র্ক চলে যান। এক সপ্তাহ পর থেকে আর কোনো জাহাজ লাইন নিরাপদ থাকবে না। বইটা দিন— প্যাক করে ফেলি।'

হাতের পার্সেলটা হাতেই রেখে দিল আমেরিকান— বাড়িয়ে দিল না ভন বর্কের দিকে।

'টাকাটা?'

'আবার কীসের টাকা?'

'আরও পাঁচশো পাউন্ড বাড়তি খরচ করতে হয়েছে। সেটা এখুনি দিতে হবে।'

তেঁতো হেসে ভন বর্ক বললে, 'আপনি আমাকে অসম্মান করছেন। বই দেওয়ার আগেই টাকা চাইছেন।'

'কারবার করতে এসে অত ভাবলে চলে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, টেবিলে গিয়ে বসল ভন বর্ক। খসখস করে লিখল একটা চেক। চেক রাখল টেবিলের ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'আমাদের সম্পর্কটা যখন অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শেষ হতে চলেছে, তখন চেক নেওয়ার আগে বইটা আমাকে দেখাবেন।'

নিরুত্তরে প্যাকেট এগিয়ে দিল আমেরিকান। মোড়ক খুলে স্তম্ভিত চোখে নীলরঙের ছোট্ট বইটার দিকে চেয়ে রইল ভন বর্ক। মলাটে লেখা 'মৌ-চাষের হাতেকলমে বিদ্যে'। জ্বলন্ত চোখ তোলবার আগেই পেছন থেকে সাঁড়াশির মতো কয়েকটা আঙুল চেপে বসল গলার ওপর এবং ক্লোরোফর্ম ভিজোনো তুলো এসে পড়ল নাকের ওপর।

'ওয়াটসন, নাও আর এক গেলাস!' ইম্পিরিয়েল টোকের[১৯] বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বলল শার্লক হোমস।

টেবিলের পাশে আসীন হৃষ্টপুষ্ট ড্রাইভার সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল বোতলটার দিকে।

'খাসা মদ, হোমস।'

'অত্যাশ্চর্য বলতে পার। সোফায় শুয়ে ওই যে ঘুমোচ্ছে আমাদের প্রাণের বন্ধুটি, ওর মুখেই শুনেছি, সোনবার্ন প্যালেসের[২০] বিশেষ মদের কুঠরি থেকে আনা হয়েছে এই বোতল। জানলাটা খুলে দাও— ক্লোরোফর্মের গন্ধে মনের মেজাজ চলে যায়।'

সিন্দুকের পাল্লা দু-হাট করে খুলে দাঁড়িয়ে আছে শার্লক হোমস। ভেতর থেকে নামাচ্ছে গুপ্ত দলিল আর নকশা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখছে ভন বর্কের চমড়ার ব্যাগে। সোফায় শুয়ে নাক ডাকছে জার্মান গুপ্তচর— হাত আর পা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, ওয়াটসন। কেউ নেই বাড়িতে— মার্থা ছাড়া। ওর সাহায্য না-পেলে এত সহজে কিস্তিমাত করতে পারতাম না। ঘণ্টা বাজাও— মার্থা আসবে। ওই তো এসে গেছে!'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা— মুখে মৃদু হাসি। সোফায় শায়িত জার্মানকে দেখে ঈষৎ উদ্‌বিগ্ন হয়েছে মনে হল।

হোমস বললে, 'ঘাবড়াও মাৎ, মার্থা। চোট লাগেনি— ঘুমোচ্ছে।'

'বাঁচলাম। মনিব হিসেবে ভদ্রলোক খুব ভালো। উনি চেয়েছিলেন গতকাল ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে জার্মানি চলে যাই— তাতে আপনার প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যেত, তাই না?'

'ঠিক কথা। তুমি এখানে ছিলে বলেই তো এত নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি। আজ রাতে অবশ্য তোমার সিগন্যালের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছে।'

'কী করি বলুন। সেক্রেটারি না-যাওয়া পর্যন্ত সিগন্যাল দিতে পারিনি!'

'জানি, জানি, আমাদের পাশ দিয়েই গাড়ি নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।'

'যেতে কি আর চায়, খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।'

'তোমার ল্যাম্প নিভতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কালকে ক্ল্যারিজ হোটেলে দেখা করো, কেমন?'

'ঠিক আছে স্যার।'

'জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা আছে তো?'

'আছে। আজ উনি সাতটা চিঠি লিখেছেন। একই ঠিকানায়।'

'কাল সকালে দেখব'খন। গুড নাইট', বিদেয় হল মার্থা। ওয়াটসনকে বললে হোমস, 'এ-কাগজগুলো খুব একটা কাজে লাগবে না— বেশির ভাগ খবরই জার্মানিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই মূল দলিলগুলো দেশের বাইরে যেতে দেব না।'

'অন্য কাগজগুলো তাহলে আর কাজে লাগবে না?'

'এর বেশির ভাগ আমিই পাঠিয়েছিলাম। ঠিক যেখানে যেখানে জলে মাইন ডোবানো আছে, সেই সেই জায়গা দিয়ে জার্মান জাহাজ যখন যাবে আমার পাঠানো নকশা অনুযায়ী, তখন যে-কাণ্ডটা ঘটবে, তা দেখে শেষ জীবনটা আমার ভালোভাবেই কাটবে ওয়াটসন।— কিন্তু তোমাকে তো এখনও ভালো করে আলোয় দেখিনি। এতগুলো বছর কাটল কীরকম বল[২১]? ঠিক আগের মতোই ছোকরা আছ দেখছি।'

'বিশ বছর বয়স কমে গেছে হোমস তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে। সঙ্গেসঙ্গে হাজির হয়েছি হারউইচে গাড়ি নিয়ে। তুমিও খুব একটা পালটাওনি— বিকট ওই ছাগুলে দাড়িটাই কেবল চোখে লাগছে।'

'কাল থেকে এ-দাড়ি একটা বিকট স্মৃতি হয়েই থাকবে, ওয়াটসন। দেশের জন্যে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়— দাড়িটা তার মধ্যে একটা। ক্ল্যারিজ হোটেলে দাড়ি কামিয়ে চুল কেটে— ঠিক আগের চেহারায় ফিরে যাব ঠিকই— কিন্তু আমেরিকান বুকনি রপ্ত করতে গিয়ে আমার চোস্ত ইংরিজিটাকে জন্মের মতো জখম করে ফেলেছি মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি তো শুনেছিলাম অবসর নিয়েছ। মৌমাছির চাষ আর বই লেখা নিয়ে সাউথ ডাউন্সে সন্ন্যাসীর মতো দিন কাটাচ্ছ।'

'শুনেছ ঠিকই ওয়াটসন। এই তো আমার পরবর্তী জীবনের পরিশ্রমের ফল!' টেবিল থেকে বইটা তুলে নিয়ে পুরো নামটা পড়ে শোনাল হোমস। 'মৌ-চাষের হাতেকলমে বিদ্যে— বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রানি মক্ষিকাকে পর্যবেক্ষণ।' একাই করেছি ওয়াটসন। দিনরাত একনাগাড়ে মেহনতি দলবলের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে মনে হয়েছে যেন লন্ডনের ক্রিমিনাল দুনিয়ার ওপর নজর রাখছি।'

'কিন্তু ফের কাজে নামলে কেন?'

'সে এক কাহিনি। বৈদেশিক মন্ত্রী পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী[২২] এই দীনের কুটিরে পায়ের ধুলো দিলেন—। ওয়াটসন, অত্যন্ত ভালো মানুষ সেজে অনেক দিন ধরে দেশের সর্বনাশ করে ছাড়ছিল সোফায় শোয়া এই লোকটা। দীর্ঘদিন ধরে লটঘট ব্যাপার

চলছে, বিস্তর স্পাই ধরা পড়ছে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল মধ্যমণির নাগাল ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। আমার ওপর বেজায় চাপ পড়ল পালের গোদাকে খুঁজে বার করার জন্যে। দু-বছর সেই খোঁজেই কাটিয়েছি ওয়াটসন, সময়টা খুব খারাপ কাটেনি— প্রতি মুহূর্তে পেয়েছি আশ্চর্য উত্তেজনা। হাতেখড়ি হল শিকাগোতে, বাফেলোর আইরিশ গুপ্ত সমিতি থেকে বেরিয়ে পাকা গুপ্তচরের শিক্ষা নিয়ে, স্কিবেরিনের[২৩] পুলিশ মহল নাকের জলে চোখের জলে হল আমার জ্বালায়— ফলে চোখে পড়লাম ভন বর্কের এক স্যাঙাতের। তার সুপারিশ নিয়ে এলাম পালের গোদার কাছে— সেই থেকেই ভন বর্ককে গোপন খবর জুগিয়ে আসছি আমি। ফলে, ওদের, সব প্ল্যান ভন্ডুল হয়েছে— পাঁচজন সেরা স্পাই জেলে পচছে। পাঁচজনের কাজ কারবার লক্ষ করতাম— সময় হলেই টুপ করে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম। মশায়, আপনাকেও সেই দলে ঢুকতে হবে!'

শেষ কথাটা বলা হল ভন বর্ককে। চুপচাপ শুয়ে চোখ পিটপিট করতে হোমসের কথা শুনছিল এতক্ষণ। জার্মান গালাগালির ফুলঝুরি ঝরতে লাগল এখন— রাগের চোটে বেঁকে গেল মুখখানা। কান দিল না হোমস, চটপট চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল দলিল দস্তাবেজের ওপর।

কিছুক্ষণ পরেই দম ফুরিয়ে গেল ভন বর্কের। হোমস বললে, 'জার্মান ভাষাটা কাঠখোট্টা হলে কী হবে, মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত। আরে! আরে! আর একটা বড়ো পাখিকে পাওয়া গেছে! অনেক দিন ধরে চোখ রেখেছিলাম এর ওপরে— কিন্তু এত বড়ো রাসকেল জানা ছিল না তো!' সিন্দুকের কোণে খরখরে চোখে তাকিয়ে হোমস ফেটে পড়ল প্রচণ্ড উল্লাসে। মিস্টার ভন বর্ক, তোমাকে অনেক কিছুর জন্যেই জবাবদিহি করতে হবে দেখছি।'

অতি কষ্টে সোফার ওপর বসে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে হোমসের পানে চেয়েছিল ভন বর্ক। এবার ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, 'অ্যালটামন্ট, এ-জীবনে তোমার রেহাই নেই!'

'এর আগেও ও-হুমকি অনেকবার শুনেছি। প্রফেসর মরিয়ার্টি শুনিয়েছে জীবদ্দশায়, শুনেছি কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরানের মুখেও। কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি সাউথ ডাউন্সে মৌমাছিদের নিয়ে।'

'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' জ্বলন্ত চোখে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ভন বর্ক।

'আরে ছ্যাঃ! অতটা বদ আমি নই। আমার কথা শুনে বুঝছ না কেন শিকাগোর অ্যালটামন্ট কাজ শেষ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'কে তুমি?'

'জেনে আর লাভ আছে কী? তাহলেও তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করব। মিস্টার ভন বর্ক, তোমার দেশের লোক এর আগেও আমার নাম শুনেছে— তুমিও শুনে থাকতে পারো।

'তোমার খুড়তুতো ভাই যখন রাজদূত, তখন আইরিন অ্যাডলার আর বোহেমিয়ার পরলোকগত রাজার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম আমিই[২৪]। আমি না-থাকলে নিহিলিস্ট কোপম্যানের হাতে নির্ঘাত খুন হয়ে যেতেন তোমার বড়োমামা কাউন্ট গ্রায়েন্সটাইন। আমার জন্যেই—'

সবিস্ময়ে সোজা হয়ে বসল ভন বর্ক।

'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' জ্বলন্ত চোখে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ভন বর্ক।
এ. গিলবার্ট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯১৭

'সে-লোক তো একজনই আছে পৃথিবীতে!'

'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক!'

গুঙিয়ে উঠে সোফায় এলিয়ে পড়ল ভন বর্ক।

'যা কিছু খবর জার্মানিতে পাঠিয়েছি, সমস্ত এসেছে আপনার মারফত! কী দাম সেই খবরের বলতে পারেন? এ আমি কী করলাম? নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম।'

'খুবই খারাপ কাজ করেছ। তোমার দেশ দু-দিন পরেই টের পাবে ফলটা। দেখবে এদেশের কামান বন্দুককে যতটা খাটো মনে করা হয়েছিল— তার চাইতে ঢের বেশি লম্বা। যুদ্ধজাহাজগুলোও এত জোর ছুটবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।'

নিঃসীম হতাশায় দু-হাতে নিজের টুঁটি টিপে ধরল ভন বর্ক।

হোমস বলল, 'আরও অনেক ব্যাপার শিগ্‌গিরই জানবে তোমার দেশের জন্যে— আমি খেটেছি আমার দেশের জন্যে। অন্যায় কিছু কি? তুমি বেশি চালাকি করতে গিয়েছিলে বলেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছ। ওয়াটসন, কাগজপত্র নেওয়া হয়ে গেছে। হাত লাগাও, কয়েদিকে নিয়ে লন্ডনে রওনা হওয়া যাক।'

ভন বর্ককে টেনে তুলতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল দুজনে। একে শক্তিমান, তায় বেপরোয়া। শেষকালে দু-দিক থেকে ধরে একরকম টেনে হিঁচড়েই রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলা হল গাড়ির পেছনের সিটে। কয়েক ঘণ্টা আগে এই রাস্তাতেই কিন্তু ভন বর্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন সুবিখ্যাত কূটনীতিবিদ ভদ্রলোক।

হোমস বললে, 'যদি অনুমতি দাও তো একটা চুরুট ধরিয়ে তোমার মুখে গুঁজে দিতে পারি।'

আপ্যায়নটা পছন্দ হল না ভন বর্কের।

রক্তচোখে বললে, 'মিস্টার শার্লক হোমস আপনার এই কাজটা কিন্তু জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল— আশা করি আপনার সরকার তা বুঝবে?'

'এই ব্যাগে যা নিয়ে যাচ্ছিলে, সেটাও তাই', বললে হোমস। 'তোমার দেশ নিশ্চয় তা বুঝবে।'

'আমাকে গ্রেপ্তার করার শমন আপনার নেই। আপনি সরকারি পুলিশ নন। কাজটা বেআইনি।'

'বলা বাহুল্য।'

'জার্মানকে কিডন্যাপ করার ফল কিন্তু সাংঘাতিক হবে।'

'সেইসঙ্গে তার কাগজপত্র চুরি করার শাস্তিও পেতে হবে!'

'তাহলে যদি এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাই, আপনাদের দুজনের কী হাল হবে বুঝতে পারছেন?'

'ওহে ভন বর্ক, বোকামি করতে যেয়ো না। ইংরেজদের তুমি এখনও চেনো না। ছোট্ট এই গাঁয়ের লোক তোমার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেবে যদি চেঁচাতে যাও। এরা কীরকম খেপে আছে জান না বলেই সাবধান করে দিলাম। চুপচাপ চলে এসো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। ওয়াটসন, লন্ডনে গিয়ে তুমি রুগি দেখতে যাবে[২৫]— আর দেখা হবে না, তাই এসো শান্তিতে শেষ বারের মতো দুটো কথা বলে নিই।'

দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করল মিনিট কয়েক। গাড়ির মধ্যে ছটফট করতে লাগল জার্মান গুপ্তচর। গাড়ির দিকে পা বাড়ালে হোমস। আঙুল তুলে দেখাল চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের দিকে।

চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে, 'ওয়াটসন, পুবের ঝড় আসছে।'

'আরে না। বেশ তো গরম বাতাস বইছে।'

'সেই আগের মতোই রয়ে গেলে ওয়াটসন, একটুও পালটালে না। ঝড় কিন্তু আসছে। এ-রকম ঝড় এর আগে ইংলন্ডের ওপর কখনো বয়নি। হিমেল ঝড় আসবার আগেই আমাদের মতো অনেককেই বিদেয় নিতে হবে ধরাধাম থেকে[২৬]। স্বয়ং ঈশ্বর যে-ঝড় আনছেন— তা আসবেই। ঝড় চলে গেলে আবার রোদ উঠবে, আরও বলিষ্ঠ, আরও পরিচ্ছন্ন, আরও ভালো ইংলন্ড জেগে উঠবে। চালাও, ওয়াটসন, সময় হয়েছে— এবার রওনা হওয়া যাক। পাঁচশো

পাউন্ডের চেকটা ঝটপট ভাঙাতে হবে— নইলে চেক যে দিয়েছে, ব্যাঙ্ককে সে বারণ করে দিতে পারে।'

টীকা

১. **বিদায় নিলেন শার্লক হোমস :** স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় এবং কেলিয়ার্স উইকলির ২২ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ তারিখের সংখ্যায় 'হিজ লাস্ট বাও' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **শার্লক হোমস নাটকের শেষ অঙ্ক :** 'অ্যান এপিলোগ অব শার্লক হোমস' নামের এই সাব-টাইটেলের বদলে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছিল 'দ্য ওয়ার-সার্ভিস অব শার্লক হোমস'।

৩. **কালান্তক অগাস্ট :** ১৯১৪-র অগাস্ট মাসেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এক তারিখে এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিন তারিখে। তার ঠিক পরদিন, চার তারিখে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গ্রেট ব্রিটেন। এরপর সারা মাস বিভিন্ন দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আরম্ভ করে।

৪. **কাইজার :** ওই সময়ে জার্মানির সম্রাট বা কাইজার ছিলেন ফ্রিডরিশ উইলহেলম ভিক্টর অ্যালবার্ট (১৮৫৯-১৯৪১) বা দ্বিতীয় উইলিয়াম। 'দ্য সেকেন্ড স্টেন' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫. **বেঞ্জগাড়ি :** জার্মান ইঞ্জিনিয়ার কার্ল বেঞ্জ-এর নকশায় নির্মিত মোটরগাড়ি। এই সংস্থার পত্তন হয় ১৮৮৬ সালে। পরে ডেইমলার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯২৬-এ শুরু হয় মার্সিডিজ-বেঞ্জ নামক গাড়ির নির্মাণ।

৬. **চ্যান্সেলর :** ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন থিওবোল্ড ফন বেথম্যান-হলোয়েগ (১৮৫৬-১৯২১)।

৭. **অলিম্পিয়া :** লন্ডনের কেনসিংটন অঞ্চলে অবস্থিত অলিম্পিয়া অ্যাম্পিথিয়েটারে নানারকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সার্কাস, রোলার স্কেটিং, সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। এখানে প্রায় দশ হাজার দর্শকের বসবার ব্যবস্থা ছিল।

৮. **ফ্লাসিং :** ওলন্দাজ উচ্চারণে ভ্লিসিজেন বা ফ্লাসিং হল্যান্ডের ভিল্যান্ড রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালসেরেন দ্বীপের দক্ষিণ তটে অবস্থিত শহর। নেপোলিয়নের সময়ে এই শহর ব্যবহৃত হয়েছিল নৌ-ঘাঁটি হিসেবে।

৯. **আইরিশ গৃহযুদ্ধ :** আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের কারণে আয়ারল্যান্ড সংক্রান্ত আইন পাশ করতে পারেনি বা করেনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। সেই সময়ে আয়ারল্যান্ডের আলস্টার শহরে এবং অন্যত্র প্রবল আন্দোলন চলে আয়ারল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে।

১০. **জন বুল মশাই :** ভারতবর্ষের মানবরূপ যেমন ভারতমাতা, ব্রিটেনের তেমন হল জন বুল। মাঝবয়সি এবং ভারিক্কি চেহারার জন বুলকে প্রায়শই দেখা যায় ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক দিয়ে তৈরি ওয়েস্টকোট পরিহিত অবস্থায়।

১১. **পোর্টসমাউথ কেল্লা :** ইংলন্ডের প্রধান নৌঘাঁটি পোর্টসমাউথ।

১২. **রোসিথ :** স্কটল্যান্ডের ফার্থ বা ফোর্থ নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি। এডিনবরা শহরের সামান্য পশ্চিমে এর অবস্থান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখানে জাহাজ সারানোর কারখানা নির্মিত হয়।

১৩. **কার্লটন টেরেস :** ওই বিশেষ সময়ে লন্ডনে জার্মানির রাষ্ট্রদূতের অফিসের ঠিকানা ছিল ৯, কার্লটন হাউস টেরেস।

১৪. **টোকে :** হাঙ্গেরির টোকে বা টোকায় (Tokaj) শহর-সন্নিহিত এলাকায়, কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে তৈরি মদ।

১৫. **জেপেলিন :** জার্মান মিলিটারি অফিসার ফার্দিনান্দ ফন জেপেলিন (১৮৩৮-১৯১৭) সৈনিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজেকে নিযুক্ত করেন মোটরচালিত উড়োজাহাজ নির্মাণে। ১৯০৬ সালে জার্মানির ফ্রিডরিশ্যাফেনে প্রতিষ্ঠিত হয় জেপেলিন ফাউন্ডেশন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী এক-শোর কিছু বেশি সংখ্যক জেপেলিন যুদ্ধে ব্যবহার করে।

১৬. **ফোর্ড গাড়ি :** হেনরি ফোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থা ফোর্ড মোটর কোম্পানি সংগঠিত হয় ১৯০৩-এর ১৬ জুন। তাদের তৈরি ছোটো গাড়ি আমেরিকা এবং ইংলন্ডে দারুণভাবে জনপ্রিয় হয় বাজারে আসবার সঙ্গেসঙ্গে।

১৭. **মার্কনি** : ইতালিয় পদার্থবিদ গুগলিয়েমো মার্কনির বেতার সংকেত প্রেরণ করবার আগে অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, তা করে থাকলেও আধুনিক রেডিয়োর জনক হিসাবে মার্কনিকেই চিহ্নিত করা হয়। মার্কনি এই কীর্তির পেটেন্ট গ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালে এবং ১৮৯৭-এ নিজের ভাইয়ের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ অ্যান্ড সিগন্যাল কোং লিমিটেডের। ১৯০৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৮. **পোর্টল্যান্ড জেল** : ইংলন্ডের ডেভনশায়ারের সমুদ্রতটের একটি উপদ্বীপ, আইল অব পোর্টল্যান্ড-এ ছিল ষোলোশো কয়েদি রাখবার মতো কারাগার এবং একট নৌঘাঁটি।

১৯. **ইম্পিরিয়াল টোকে** : একটি বিশেষ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষারস থেকে তৈরি ইম্পিরিয়াল টোকের উৎপাদন অনেকদিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

২০. **সোনবার্ন প্যালেস** : সনব্রুন প্যালেস বা শ্লস সনব্রুন, ভিয়েনা শহরে অস্ট্রিয়ার রাজপরিবারের বাসস্থান। এই প্রাসাদের লাগোয়া বাগান এবং পশুশালা, যা সম্ভবত ইউরোপের প্রাচীনতম, তা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৭৭৯ সালে।

২১. **এতগুলো বছর কাটল কীরকম বলো** : ১৯১৪-র ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। এর ঠিক আগের ঘটনা ১৯০৩-এ। 'দ্য ক্রিপিং ম্যান' গল্পে বলেছেন ড. ওয়াটসন।

২২. **প্রধানমন্ত্রী** : আর্ল অব অক্সফোর্ড অ্যান্ড অ্যাসকুইথ, হার্বার্ট হেনরি অ্যাসকুইথ (১৮৫২-১৯২৮) ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত।

২৩. **স্কিবেরিন** : আয়ারল্যান্ডের কর্ক কাউন্টির একটি শহর।

২৪. **বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম আমিই** : ভুল। আইরিন অ্যাডলার বোহেমিয়ার রাজাকে ত্যাগ করে নিজেই চলে গিয়েছিলেন তাঁর সদ্য-বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে।

২৫. **তুমি রুগি দেখতে যাবে** : রুগি দেখেছিলেন কি ওয়াটসন? এই ঘটনার এক মাস পরেই প্রকাশিত হয় 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' উপন্যাস। ওয়াটসন নিশ্চয়ই তার পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করছিলেন তখন। অনুমান করেছেন গবেষক এডগার স্মিথ।

২৬. **বিদেয় নিতে হবে ধরাধাম থেকে** : 'বিদেয়' নিতে হয়নি হোমস বা ওয়াটসনকে। হলে ১৯২৬ বা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত গল্পগুলো আর লেখা হত না।

দ্য কেস-বুক অফ শার্লক হোমস

শার্লক হোমসের বিস্ময়কর কর্মজীবনের
শেষ দ্বাদশ অ্যাডভেঞ্চার

বিখ্যাত মক্কেলের বিচ্ছিরি বিপদ[১]

[অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট]

বেশ কয়েক বছরের মধ্যে বার দশেক অনুমতি চেয়েছি শার্লক হোমসের কাছে নীচের এই আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের ইতিবৃত্ত লেখবার জন্যে। অনুমতি মিলল দশমবার খোশামোদের পর। বলল, 'লিখতে পারো, এখন কারো গায়ে লাগবে না।'

টার্কিশ বাথ[২] অর্থাৎ বাষ্প-স্নান দারুণ ভালো লাগে আমার আর হোমসের। স্নানের পর গা শুকানোর ঘরে পাইপ টানবার সময়ে এমন একটা আমেজ আসে হোমসের মেজাজে তখন, অন্য সময়ের মতো অতটা অমানুষ আর মুখটেপা থাকতে পারে না। এইরকমই একটা দুর্বল মুহূর্তে নর্দামবারল্যান্ড অ্যাভিন্যুর একটা স্নানঘরের ওপরতলায় পাশাপাশি দুটো কোচে চাদর মুড়ি দিয়ে আয়েশ করে বসে থাকার সময়ে শুরু এই অত্যাশ্চর্য কাহিনির। তারিখটা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় দিবস, সাল ১৯০২। গা ঢালা অবস্থায় বসে থেকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম চাঞ্চল্যকর কোনো কেস হাতে আছে কি না। জবাবে কোটের পকেট থেকে একটা খাম টেনে নিয়ে চাদরের বাইরে লম্বা সরু হাতে বাড়িয়ে ধরল হোমস।

বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। হয় জীবন মরণের প্রশ্ন, নয় আকাট বোকামি। চিঠিতে যা লেখা আছে, এর বেশি আর কিছুই জানি না।'

চিঠি লেখা হয়েছে আগের সন্ধ্যায় কার্লটন ক্লাব[৩] থেকে।

'মিস্টার শার্লক হোমসকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন স্যার চার্লস ড্যামারি। আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটায় আসছেন দেখা করতে। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— বলতেও কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। সেই কারণেই পরামর্শ দরকার মিস্টার হোমসের। তিনি যেন কার্লটন ক্লাবে টেলিফোন করে জানিয়ে দেন দেখা করতে রাজি আছেন।'

হোমস বললে, 'রাজি আমি হয়েছি, ওয়াটসন। ফোনেও জানিয়ে দিয়েছি, ড্যামারি লোকটাকে চেনো?'

'নাম শুনেছি।'

'আমি আরও কিছু শুনেছি। যেসব কথা বাইরের লোককে বলা যায় না, সেইসব ব্যাপারে নাক না-গলিয়ে মিটমাট করিয়ে দিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। হ্যামার ফোর্ড উইল মামলায় স্যার জর্জ লিউইসের[৪] সঙ্গে ইনি যে কথাবার্তা চালিয়েছেন, তা মনে রাখার মতো। সুতরাং ধরে নিতে পারি কেসটা বাজে নয়— ঠেকায় পড়েই উনি চিঠি লিখেছেন— আমাদের সাহায্য চাইছেন।'

'আমাদের বলছ কেন? চিঠি তো লিখেছেন তোমাকে?'

'ক্ষমাঘেন্না করে তুমিও থাকছ, নয় কি?'

'সে তো আমার পক্ষে সম্মানের ব্যাপার হে।'

'বেশ তো, সম্মানটা না হয় দেওয়াই গেল। সময়টা মনে থাকে যেন— সাড়ে চারটে, তার আগে এ নিয়ে আর কথা নয়।'

কুইন অ্যানি স্ট্রিটে[৫] আলাদা থাকতাম তখন। যথাসময়ে এলাম বেকার স্ট্রিটে হোমসের ডেরায়। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটের সময়ে এলেন কর্নেল স্যার জেমস ড্যামারি। গম্ভীর মোলায়েম গলা। ফিটফাট পোশাক। পরিষ্কার কামানো গাল। সজ্জন ব্যক্তিত্ব। ধূসর আইরিশ চোখে অসীম সরলতা আর সুমিষ্ট ঠোঁটে নিঃসীম কৌতুকবোধ দেখবার মতো। টপহ্যাট থেকে ভার্নিশ করা জুতো পর্যন্ত সর্বত্র বনেদিয়ানার ছাপ, ঘর যেন আলো হয়ে উঠল তাঁর আবির্ভাবে।

আমাকে দেখে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করে বললেন, 'ভালোই হল ডক্টর ওয়াটসনকে পেয়ে। যার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছি তার মতো মারকুটে বিপজ্জনক লোক ইউরোপে আর দুটি নেই। কোনো কিছুতেই সে পেছপা নয়।'

হাসল হোমস। বলল, 'পরলোকগত প্রফেসর মরিয়ার্টি অথবা এখনও জীবিত কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরানের চাইতেও যদি বিপজ্জনক হয়, তাহলে একহাত নিতে পারলে খুশিই হব। সিগারেট খান? না! বেশ তাহলে আমি ধরাচ্ছি। নাম কী লোকটার?'

'ব্যারন গ্রানারের নাম শুনেছেন?'

'অস্ট্রিয়ার সেই মানুষখুনে?'

হেসে ফেললেন কর্নেল ড্যামারি, 'ওয়ান্ডারফুল! কিছুই দেখছি চোখ এড়ায় না আপনার। লোকটাকে এর মধ্যেই খুনি ঠাউরে নিয়েছেন?'

'কোন মহাদেশে কী ধরনের অপরাধ ঘটছে, সব খবর রাখাটাই যে আমার কাজ কর্নেল। স্প্লুজেন গিরিবর্ত্মে[৬] দুর্ঘটনায় বউ মারা গেছে বললেই হল? ওভাবে আইনের চোখে ধুলো দেওয়া যেতে পারে। লন্ডনে যখন এসেছে রাসকেল, তখন আমার সঙ্গেও টক্কর লাগবে জানি। কিন্তু এসেছেন কেন? পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে?'

'আজ্ঞে না। নতুন ঘটনা ঘটাতে। মি. হোমস, ব্যাপারটা ভয়ানক, অত্যন্ত ভয়ানক। যে-মক্কেলের হয়ে এসেছি, তার স্বার্থ আপনাকে দেখতেই হবে।'

'আপনি যে কারো হয়ে এসেছেন বুঝিনি। আসল মক্কেলটি তাহলে কে?'

'মি. হোমস, নামটা জিজ্ঞেস করবেন না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'তাহলে আমাকে মাপ করবেন। আমি একমুখো রহস্যের জট খুলতে অভ্যস্ত— দু-মুখো রহস্যের নয়।'

'মি. হোমস, এ যে শাঁখের করাতে ফেললেন আমাকে। নাম বলতে পারব না কথা দিয়ে এসেছি যে। বেশ তো, ঘটনাটা শুনতে কি আপত্তি আছে?'

'বলতে পারেন। কিন্তু আমি কোনো কথা দিচ্ছি না।'

'জেনারেল দ্য মারভিলের নাম শুনেছেন?'

'খাইবার পাস[৭] বিখ্যাত দ্য মারভিল?'

'হ্যাঁ। ওঁর মেয়ে ভায়োলেট দ্য মারভিল শয়তানটার খপ্পরে পড়েছে। অথচ মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি মার্জিতা। কম বয়স, হাতে পয়সা আছে, অপূর্ব মেয়ে বলতে যা বোঝায়— তাই।

'ভালোবেসে। জানেন তো এ-কবজায় পড়লে কোনো মেয়েই আর বেরোতে পারে না। লোকটা শুনেছি সাংঘাতিক সুন্দর। চালচলন চমকে দেওয়ার মতো, কথাবার্তা মধু ঝরানো। দারুণ রোম্যান্টিক ফিগার— দেখলেই মেয়েরা ভালোবেসে ফেলে।'

‘কিন্তু মিস ভায়োলেট দ্য মারভিলের মতো মেয়ের সান্নিধ্যে সে এল কী করে?’

‘ভূমধ্যসাগরে জাহাজে বেড়ানোর সময়ে। দুজনের দেখা সেইখানেই, আলাপটা এমন ভালোবাসায় এসে ঠেকেছে যে বিয়ে হতে চলেছে সামনের মাসে। কিছুতেই টলানো যায়নি মিস মারভিলকে। ব্যারন ছাড়া ওর কাছে দুনিয়া এখন অন্ধকার।’

‘ব্যারনের কুকীর্তি শোনবার পরেও?’

‘ব্যারন নিজেই নিজের কুৎসা শুনিয়েছে মেয়েটিকে— এমনভাবে শুনিয়েছে যেন সবই মিথ্যে অপবাদ। ফলে মেয়েটিকে— কোনো কুৎসাকাহিনিই আর টলাতে পারছে না।’

‘আপনি কিন্তু অজান্তে মক্কেলের নাম বলে ফেলেছেন, কর্নেল। জেনারেল দ্য মারভিলের হয়ে এসেছেন, তাই না?’

‘আজ্ঞে না। জেনারেল এই ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আমি এসেছি এমন একজনের তরফে যিনি মেয়েটিকে ফ্রকপরা অবস্থা থেকে দেখে এসেছেন, নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন। কথা দিয়েছি, তার নাম ফাঁস করব না। মি. হোমস, দয়া করে পীড়াপিড়ি করবেন না।’

‘বেশ, কথা দিলাম। কেসটাও হাতে নিলাম— বেশ ইন্টারেস্ট লাগছে। যোগাযোগ করব কীভাবে?’

‘কার্লটন হোটেলে। খুব জরুরি দরকার থাকলে ‘XX.31’ এই প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করবেন!’

‘ব্যারনের ঠিকানা?’

‘কেনসিংটনের ভারনন লজে। বেশ বড়ো বাড়ি। অবস্থাপন্ন লোক। সেই কারণেই আরও বেশি বিপজ্জনক।’

‘এখন বাড়িতেই আছে তো?’

‘আছে।’

‘ব্যারন সম্বন্ধে আর কোনো খবর দিতে পারেন?’

‘লোকটার রুচি আছে— দেদার টাকা ওড়ায় বই আর ছবি কিনতে। বদমাশ হলেও শিল্পী-সত্তা আছে। চৈনিক বাসন-কোসনের অনেক খবর রাখে। এই নিয়ে একটা বইও লিখেছে। হার্লিংটনে[৮] এক সময়ে পোলো খেলত। প্রাহার কেলেঙ্কারির জন্যে চলে আসে।’

‘পৃথিবীর বড়ো বড়ো বদমাশরা এই ধরনেরই জটিল চরিত্রের অধিকারী হয়, কর্নেল। চার্লি পিস[৯] বেহালায় তুখোড় ছিল, ওয়েনরাইট[১০] মস্ত আর্টিস্ট ছিল। এবার পড়া যাক ব্যারন গ্রানারকে নিয়ে।’

কর্নেল তো গেলেন, মুখ গোমড়া করে অনেকক্ষণ বসে রইল হোমস— আমার অস্তিত্বই যেন ভুলে গেল। তারপরেই আচমকা ফিরে এল চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে।

‘ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার?’

‘মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেখা করা দরকার।’

‘ভায়া ওয়াটসন, ভগ্নহৃদয় পিতৃদেব নিজে যেখানে ব্যর্থ, সেখানে আমার মতো উটকো লোক কিছু করতে পারবে? অন্যদিক থেকে চেষ্টা করতে হবে। শিনওয়েল জনসনকে দিয়ে কাজ হতে পারে।’

হোমসের কর্মজীবনের শেষের দিকে আবির্ভাব ঘটেছিল এই শিনওয়েল জনসনের। সেই কারণেই তার সম্বন্ধে কোনো কথা আগের কাহিনিতে লেখা হয়নি। লোকটা মহা দুর্বৃত্ত। পার্কহার্স্টে[১১] দু-বার জেল পর্যন্ত খেটেছে। তারপর অনুতাপের আগুনে পুড়ে পালটে যায় এবং হোমসের শাগরেদি করে এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরে। লন্ডনের সুবিশাল অপরাধী মহলের নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে। হোমসের এজেন্ট হিসেবে এনে দিত সেইসব খবরাখবর। পুলিশের তাঁবেদারি করলে কোনকালে কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যেত শিনওয়েলের। কিন্তু হোমসের কাছ থেকে কোনো খবর বেরোত না— শিনওয়েলের স্যাঙাতরাও জানতে পারত না খবর চালান করেছে কে। দু-বার জেলখাটার ফলে দাগি আসামি হিসেবে শহরের সমস্ত খারাপ জায়গায় অবাধ গতিবিধি ছিল শিনওয়েলের। লোকটার ব্রেন ছিল, চোখ ছিল। ফলে যা দেখত ঝটপট তা থেকে খবর বার করে এনে উপহার দিত হোমসকে। শার্লক হোমস ঠিক করল এই শিনওয়েল জনসনকেই এবার কাজে লাগাবে।

হাতে অন্য কাজ ছিল বলে হোমসের সঙ্গে লেগে থাকতে পারিনি— কী করল, কোথায় গেল সে-খবরও রাখিনি। দেখা হল সন্ধ্যায়—সিম্পসনে। রাস্তার দিকের জানলার ধারে ছোট্ট টেবিলে বসলাম দুই বন্ধু। স্ট্যান্ডের চলমান জলপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে হোমস বললে সারাদিনের ঘটনা।

'জনসন বেরিয়ে পড়েছে খবরের খোঁজে। লন্ডনের চোরডাকাত মহলেই পাওয়া যাবে বদমাশটার গোপন কুকীর্তির যাবতীয় সংবাদ।'

'কিন্তু যে-মেয়ে কোনোরকম কুকীর্তি শুনেই টলেনি। সে তোমার জানা নতুন কুকীর্তি শুনে টলবে কি?'

'বলা যায় না। মেয়েদের মন বোঝা ভার। খুন-টুনকেও মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ছোটোখাটো ব্যাপার মন বিষিয়ে দিতে পারে। ব্যারন গ্রানারই তো বলছিল—'

'বলছিল! তোমাকে!'

'লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি বসে চোখাচোখি চেয়ে দেখতে চেয়েছিলাম দৌড় কতখানি। জনসনকে খবর আনতে পাঠিয়ে নিজেই গেছিলাম কেনসিংটনে। বেশ তোফা মুডে পেলাম ব্যারনকে।'

'চিনে ফেলেনি তো?'

'না ফেলার কোনো কারণ ছিল না— কেননা নিজের ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এ-লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়েও সুখ। বরফের মতো ঠান্ডা মেজাজ, কথাবার্তা সিল্কের মতো মসৃণ, রীতিমতো ফ্যাশন দুরস্ত, কেউটের মতো বিষধর। উঁচু জাতের ক্রিমিনাল। অভিজাত অপরাধী। মুখে মধু— ভেতরে ছুরি।'

'তোফা মুডে পেলে?'

'ইঁদুর দেখলে বেড়ালের মুড যেরকম হয়— সেইরকম আর কি। কিছু লোক যখন মুডে থাকে, তখন তারা মারদাঙ্গা লোকদের চাইতেও বিপজ্জনক। আমাকে দেখেই মহা খাতির করে বললে, 'মিস্টার হোমস, আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক আপনি আসবেনই। ভায়োলেটের সঙ্গে আমার বিয়েটা ভন্ডুল করার জন্যেই নিশ্চয় আপনাকে পাঠিয়েছেন জেনারেল দ্য মারভিল?'

'আমি বললাম, কথাটা ঠিক।'

'মশায়, মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। এতদিনের সুনাম খোয়াবেন। দুর্নামের শেষ থাকবে না। মাঝখান থেকে বিপদ ডেকে আনবেন। আমার কথা শুনুন। এ-কেস ছেড়ে দিন।'

আমি বললাম, 'মশায়, ঠিক ওই উপদেশটা আপনাকেও দিতে চাই। আপনার ব্রেনকে খাতির করি বলেই বলছি। এতদিনের নামডাক ধুলোয় লুটোবে যদি পত্রপাঠ সরে না-পড়েন। মেয়েটাকে ছাড়ুন। নইলে ইংলন্ডের এমন সব বাঘা বাঘা ব্রেন আপনার পেছনে লাগবে যে তিষ্ঠোতে পারবেন না! অতীতে অনেক কাণ্ড করেছেন— এখন যদি সেসব ভায়োলেটের কানে তোলা যায়, পরিণামটা সুখের হবে কি?'

'ব্যারনের নাকের নীচে পোকামাকড়ের শুঁড়ের মতো মোম মাখানো কয়েক গাছি গোঁফের চুল বিষম মজায় থিরথির করে কাঁপতে লাগল আমার কথায়। শেষকালে খুক খুক করে হেসেও ফেলল রাসকেলটা।'

'বলল, "মিসটার হোমস, হাতে রঙের তাস একটাও নেই— কিন্তু বেশ তড়পে যাচ্ছেন দেখছি। আমার হাতে কিন্তু তুরুপের তাস আছে— দরকার হলে দেখাতে দ্বিধা করব না।"

"ওই জেনেই বসে থাকুন।"

"বসেই তো আছি। মিস্টার হোমস, বহাল তবিয়তে আছি। আমার সব কুকীর্তিই ভায়োলেটকে বলেছি। সেইসঙ্গে বলে রেখেছি বেশ কিছু বদলোক সেইসব কাহিনি বলে মন ভাঙাতে আসতে পারে— আপনিও কিন্তু তাদের একজন মিস্টার হোমস। সম্মোহন করে যা হুকুম দেওয়া যায়, সম্মোহিত মানুষ সেই হুকুম হুবহু মেনে চলে[১২] জানেন তো? এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে সম্মোহন করেছি ভায়োলেটকে— বলে রেখেছি মন ভাঙাতে যারা আসবে, তাদের যেন উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা করতে পারেন ভায়োলেটের সঙ্গে, সে দেখাও করবে— ফলটা হাতে হাতে পেয়ে যাবেন।"

'ওয়াটসন, এরপর আর কথা চলে না। মানে মানে সরে পড়াই ভালো। খুবই গম্ভীরভাবে দরজার হাতলে হাত রাখলাম দরজা খুলব বলে, এমন সময়ে ডাক এল পেছন থেকে।

'মিস্টার হোমস, ফ্রেঞ্চ এজেন্ট লাবার্নের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লাবার্নের পরিণামটা কী হয়েছিল জানেন?'

'মারের চোটে পঙ্গু হয়ে গেছে।'

'কী অদ্ভুত যোগাযোগ দেখুন, তার ঠিক আগেই সে ঘাঁটাতে এসেছিল আমাকে, আরও অনেকের একই হাল হয়েছে বেশি বাড়াবাড়ি করায়। মিস্টার হোমস, সরে পড়ুন, সরে পড়ুন, নিজের চরকায় তেল দিন।'

'ওয়াটসন, এই হল গিয়ে আজকের রিপোর্ট।'

'লোকটা বিপজ্জনক।'

'অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ ধরনের লোকরা যা করে, বলে তার চাইতে কম।'

'তোমার নাক গলানো কি ঠিক হবে? ভায়োলেটকে ব্যারন বিয়ে করলে তোমার কী?'

'যেহেতু নিজের বউকে সে খুন করেছে, তাই ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ নয়। ও-কথা থাক, ওয়াটসন। কফিটা শেষ করো, বাড়ি চলো। শিনওয়েল খবর নিয়ে আসছে ওখানে।'

বেকার স্ট্রিটের ডেরায় গিয়ে দেখলাম শিনওয়েলকে। বিরাট লালমুখো ধ্যাবড়া চেহারা। গায়ে স্কার্ভি[১৩] চর্মরোগের ছাপ। চোখ দুটোই যা কেবল রীতিমতো কালো আর চকচকে— অপরিসীম ধূর্ততা মাখানো। সঙ্গে এনেছে ছিপছিপে চেহারার অগ্নিশিখার মতো এক তরুণীকে। মুখে লাবণ্য, কিন্তু পাপবোধ আর অনুতাপে পুড়ে কালো। বহু বছরের দহন যেন কুষ্ঠরোগের[১৪] কুৎসিত দাগ রেখে গিয়েছে সুন্দর মুখটিতে।'

'মিস্টার হোমস, ইনি মিস কিটি উইন্টার।'

'মিস্টার হোমস', সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠল রূপসি, 'লন্ডন নরকে আমাকে খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো নরকে একজনের ঠাঁই হোক। আপনি তার পেছনেই লেগেছেন শুনলাম।'

'আপনার ইচ্ছে যেন ফলে যায়, মৃদু হেসে বলল হোমস।'

বিষম আবেগে সাদা মুখখানাকে আরও সাদা করে দু-হাতে বাতাসখানাকে ধরে তীব্র গলায় বললে রূপসি, 'যে-নরকে সে আমাকে নামিয়েছে, আমার মতো আরও অনেককে পাঠিয়েছে— আমি চাই তাকে তারও নীচে নামাতে।' বলতে বলতে দু-চোখ ধকধক করে জ্বলতে লাগল মেয়েটার। মেয়েদের চোখে এ-আগুন বড়ো একটা দেখা যায় না।

'জল কদ্দুরে গড়িয়েছে শুনেছেন?'

'শিনওয়েল বলেছে। আর একটা আহাম্মক মেয়ে ফাঁদে পা দিয়েছে— বিয়েটা বন্ধ করতে চান আপনি।'

'হ্যাঁ। মেয়েটা অন্ধের মতো ভালোবাসে ব্যারনকে। সব শুনেও কর্ণপাত করছে না।'

'বউকে খুন করার ঘটনাটা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার সাহস তো কম নয়!'

'ওর মতে এ সবই মিথ্যে রটনা।'

'প্রমাণ তুলে ধরেছেন?'

'আপনি জোগাড় করতে পারবেন?'

'প্রমাণ তো আমি নিজে।'

'সামনে গিয়ে বলতে পারবেন?'

'কেন নয়?'

'ব্যারনের সব কুকীর্তি শোনার পর ভায়োলেট তাকে ক্ষমা করেছে। এ-প্রসঙ্গ নতুন করে আলোচনা নাও করতে পারে।'

'ওসব কথা আমিও শুনেছি। আপনারা যে খুনের কথা শুনেছেন। এ ছাড়াও অনেক খুন সে করেছে। সব কথাই আমাকে শুনিয়েছে। বলেছে, অমুক ঘটনার এক মাসের মধ্যেই অমুক লোকটা মারা যায়। আমি তখন পাগলের মতো ভালোবাসতাম। তাই কিছুই গ্রাহ্য করিনি— যেসব এখন করছে ভায়োলেট। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভেতর পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায়। সেদিন মদ খেয়ে বেহুঁশ ছিল বলেই জিনিসটা আমাকে দেখিয়ে ফেলেছিল গ্রানার। একটা বাদামি চামড়া বাঁধানো বই— মলাটে ওর প্রতীক চিহ্ন আর তালা লাগানো।'

'কীসের বই?'

'পাপের বই। সারাজীবনে যত মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তাদের প্রত্যেকের ছবি, নামধাম সমস্ত সেই বইতে আছে। লোকে যেমন প্রজাপতি আর মথপোকা সংগ্রহ করে, এই শয়তান তেমনি মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে।'

'বইটা কোথায়?'

'এখন কোথায় তা বলতে পারব না। এক বছর হল আমাকে ছেড়ে দিয়েছে শয়তানটা। তবে প্রথমবার দেখেছিলাম ভেতরের পড়ার ঘরে পুরোনো আলমারির খুপরিতে। এখনও থাকতে পারে সেইখানেই— লোকটা এমনিতে খুব গুছোনো— জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার অভ্যেস নেই।'

'বাড়িতে আমি গেছিলাম।'

'বলেন কী! আজ সকালেই কেস হাতে নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন দেখছি। অ্যাদ্দিনে ঠিক লোকের পাল্লায় পড়েছে রাসকেল। ভেতরের পড়ার ঘরটা ছোটো— দরকারি কাগজ আর জিনিস থাকে।'

'চোরের ভয় নেই?'

'অ্যাডেলবার্ট আর যাই হোক, কাওয়ার্ড নয়। বাড়িতে লুকোনো ঘণ্টা আছে— চোর ঢুকলেই বেজে ওঠে। চোর এসে দামি দামি বাসন-কোসন নেবে— কাগজ নিতে যাবে কেন?

'হক কথা', সায় দিল শিনওয়েল।

হোমস বললে, 'মিস উইন্টার, আপনি কাল বিকেল পাঁচটায় আসুন এখানে। দেখি ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করানো যায় কি না। আমার মক্কেল কিন্তু আপনাকে মোটা পারিশ্রমিক দিতে রাজি।'

'টাকার জন্যে আমি আসিনি। যে-কাদায় আমি নেমেছি সেই কাদা পায়ে করে তার মুখে মাখাতে পারলেই আমার মেহনতের দাম আমি পাব।'

পরের দিন স্ট্যান্ড রেস্তোরাঁয় ফের দেখা হল হোমসের সঙ্গে। রুক্ষ রসকষহীন কথায় যা বললে, তা এই :

'ভায়োলেট সহজেই দেখা করতে চেয়েছিল। জেনারেলের ফোন পেয়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়ে মিস উইন্টারকে নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছোলাম ১০৪ নম্বর বার্কলে স্কোয়ারে। পুরানো কেল্লাবাড়ি— জাঁকালো চেহারা— বিরাট গির্জেও সে তুলনায় কিছু নয়। হলদে পর্দা ঝোলানো বসবার ঘরে দেখা হল ভায়োলেটের সঙ্গে। শান্ত সংযত, বরফচূড়ার মতো! অনমনীয় এবং উদাসীন।

'ওয়াটসন, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। সে-সৌন্দর্য ভাষায় বলবার নয়। পুরোনো তৈলচিত্রে এমনি রূপ আমি দেখেছি। এমন মেয়েকে কী করে যে ফাঁদে ফেলল ভেবে পেলাম না। তবে কি জানো, কার কোথায় মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম কথাটা যুগে যুগে সত্যি হয়েছে।

'শয়তান ব্যারন যে আগে থেকেই ভায়োলেটের মন বিষিয়ে তুলেছে, তা বুঝলাম আমাদের অভ্যর্থনার ধরন থেকেই। কুষ্ঠরোগীদের যেন চেয়ারে বসতে বলছে গির্জের পুরুষ— অনেকটা এইরকম ভাব দেখাল মেয়েটা।

'তারপর বলল বরফঠান্ডা গলায়, "আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি এসেছেন ভাঙচি দিতে, আমি যাকে ভালোবাসি তার নিন্দে করে বিয়েটা ভাঙাতে। বাবা বলেছেন বলেই দেখা করছি মনে রাখবেন। কিন্তু নিন্দে করে লাভ কিছু হবে না।"

'ওয়াটসন, দুঃখ হল মেয়েটার জন্য; সেই মুহূর্তে তাকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতোই দেখেছিলাম। বুঝিয়েওছিলাম। তুমি তো জান আমি মাথার যুক্তিতে চলি— হৃদয়াবেগে নয়। সব সময়ে গুছিয়ে কথা বলতেও পারি না। কিন্তু সে-সময়ে যতরকমভাবে বোঝানো যায়, বুঝিয়েছিলাম। তবুও মুখে রং ফোটাতে পারিনি। ধ্যানস্থ চোখে আবেগের আলো জাগাতে পারিনি। সত্যিই যেন ব্যারনের সম্মোহনের প্রভাবে আচ্ছন্ন মেয়েটা— যেন মর্তে থেকেও স্বর্গস্বপ্নে মশগুল।'

শেষকালে বললে, 'মিস্টার হোমস, আপনি ভাড়াটে এজেন্ট। আমার মন ভাঙাতে এসেছেন— টাকা খেলে ব্যারনের হয়েও অন্যের মন ভাঙাতে পা বাড়াবেন। কাজেই আমার মন আপনি ভাঙাতে পারবেন না। আপনাদের কথা জানলার ওই চড়ুইদের কিচিরমিচিরের শামিল আমার কাছে। ব্যারন মহৎ। অতীতে যদি তার পদস্খলন হয়েই থাকে, আমি এসেছি তাকে মহত্তর জীবনে নিয়ে যেতে।— ইনি কে?' বলে ফিরে তাকাল মিস উইন্টারের দিকে।

'আমি কথা বলার আগেই ঘূর্ণি বাতাসের মতো ভেঙে পড়ল মিস উইন্টার। বরফ আর আগুন মুখোমুখি কখনো দেখেছ? আমি দেখলাম সেই মুহূর্তে।

'তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ভীষণ আবেগে চোখ-মুখ বিকৃত করে বললে মিস উইন্টার— উজবুক মেয়ে কোথাকার। এখনও বুঝছেন না কোন নরকে আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শয়তান ব্যারন। আমার যা দশা হয়েছে, অনেকের সে-হাল হয়েছে— আপনারও তাই হবে— তার চাইতেও বেশি হবে। আমিও তাকে ভালোবাসতাম। এখন তাকে ঘৃণা করি। আমার মতোই একদিন সে আপনার হয় বুক নয় ঘাড় ভাঙবে।'

ঠান্ডা গলায় বললে মিস দ্য মারভিল, 'এসব অবান্তর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমি জানি অতীতে মতলববাজ তিনটে মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল ব্যারন।'

'তিনটে মেয়ে! বলছেন কী আপনি! আপনার মতো নিরেট বোকা আমি আর দেখিনি!'

'মিস্টার হোমস, বাবার কথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছি, এই জীবটির হাত পা ছোড়া দেখতে নয়। আজ এখানেই থাক।'

'আমি চেপে না-ধরলে মিস উইন্টার রাগে ফুলতে ফুলতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত মিস দ্য মারভিলের ওপর। কোনোরকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তুললাম ছ্যাকড়াগাড়িতে। একটা পাবলিক কেলেঙ্কারি এড়ানো গেল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমারও মেজাজ ঠিক ছিল না। মিস দ্য মারভিলের নির্বিকার মুখচ্ছবি আর বরফ ঠান্ডা মেজাজে কারো মেজাজ ঠিক থাকতে পারে না। যাকে বাঁচাতে চাই, তার এই ব্যবহার অসহ্য। এ-পথে হবে না, ওয়াটসন। অন্য দাওয়াই দিতে হবে। তোমাকেও দরকার হতে পারে। তবে এবার ওরাই হয়তো দাওয়াই ছাড়বে আমার ওপর।'

ঘটলও তাই! তবে সে-দাওয়াই শুধু সেই রাসকেলের— এর মধ্যে ভায়োলেটকে টেনে আনতে মন সায় দিচ্ছে না। দু-দিন পরে রাস্তায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম দেয়ালে লটকানো একটা খবরের কাগজের শিরোনাম দেখে :

শার্লক হোমসকে খুনের চেষ্টা

কিছুক্ষণ সম্বিৎ ছিল না হলদে কাগজের ওপর কালো হরফে ছাপা ভয়ংকর সংবাদটা পড়বার পর। তারপর হকারের কাছ থেকে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে একটা দোকানের দোরগোড়ায়

দাঁড়িয়ে চক্ষের নিমেষে পড়ে ফেললাম শার্লক হোমসকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কীভাবে :

সুবিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলেছে আজ সকালে তাঁর ওপর হত্যাকারী চড়াও হওয়ার পর থেকে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি! ঘটনার সূত্রপাত সম্ভবত বেলা বারোটার সময় কাফে রয়ালের সামনে রিজেন্ট স্ট্রিটের ওপর। দুজন হানাদার লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটোয় শার্লক হোমসকে। মাথা এবং দেহের ক্ষত দেখে ডাক্তার বলেছেন অবস্থা ভালো নয়। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বেকার স্ট্রিটের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁরই জেদে। যারা পিটিয়েছে, বেশভূষায় তারা রীতিমতো ভদ্রলোক।'

'দুজন হানাদার লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় শার্লক হোমসকে।'
হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৫

কাগজ পড়েই ছুটলাম বেকার স্ট্রিটে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখলাম বাইরে দাঁড়িয়ে একটা ব্রুহাম গাড়ি, ভেতরে সুবিখ্যাত সার্জন স্যার লেসলি ওকশট। আমাকে বললেন, 'এখুনি কোনো বিপদ ঘটবে না। মাথায় দুটো বড়ো রকমের চোট লেগেছে— সারা গা থেঁতলে গেছে। বেশ কয়েকটা সেলাই দরকার হল সেইজন্যেই। মরফিন দিয়েছে— একটু শান্তিতে থাকা দরকার। তবে মিনিট কয়েক দেখা করা যেতে পারে।'

প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকে দেখলাম খড়খড়ি নামানো জানলার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু রোদ আসছে। মাথায় রক্ত চুঁয়ে-বেরিয়ে-আসা ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে রয়েছে হোমস! আমাকে দেখেই ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'ভালোই আছি, ওয়াটসন। ঘাবড়ে যেয়ো না।'

'ভগবান বাঁচিয়েছেন!'

'জানই তো আমি নিজেও লেঠেল। একজনকে সামাল দিয়েছিলাম— আরেকজনকে পারলাম না।'

'সেই রাসকেলের কাজ। এখুনি যাচ্ছি— ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি।'

'খবরদার, ওটি কোরো না! আমার প্ল্যানটা শোনো, ওরা তোমার কাছেই আসবে আমার অবস্থা কীরকম জানতে। বাড়িয়ে বলবে। মাথায় চোট— প্রলাপ— তুমিই ভালো পারবে।'

'কিন্তু স্যার লেসলি ওকশট তো আসল কথা বলে দেবেন।'

'ওঁকে সামলানোর ভার আমার।'

'আর কিছু?'

'শিনওয়েলকে বল মিস উইন্টারকে এখুনি সরিয়ে নিয়ে যেতে। এভাবে যারা পথের কাঁটা সরায়, আমাকে খুন করতে চেষ্টা করে— তারা ও-মেয়েকে ছাড়বে না। আজ রাতের মধ্যেই মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'এখুনি যাচ্ছি। আর কিছু?'

'পাইপ আর তামাক টেবিলে রেখে যাও। রোজ সকালে একবার এসো— ফন্দি আঁটা যাবে।'

জনসনকে দিয়ে সেই রাতেই মিস উইন্টারকে শহরতলিতে চালান করে দিলাম— বিপদ না-কাটা পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বললাম।

এর পরের ছ-দিন জনসাধারণ জানল, শার্লক হোমসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। যমে মানুষে টানাটানি চলছে। বুলেটিন আর খবরের কাগজে বেরোতে লাগল অতি যাচ্ছেতাই সংবাদ। আমি কিন্তু রোজ যেতাম বলেই জানতাম অবস্থা তার সে-রকম নয় মোটেই। দ্রুত সেরে উঠছে। বরং সন্দেহ হত, আমার কাছেও যেন দ্রুত সেরে ওঠার খবর চেপে যাচ্ছে। ওর মনের জোর আর লৌহ কাঠামোর দৌলতে ভেতরে ভেতরে ফিরে আসছে লুপ্ত শক্তি। কিন্তু নিকটতম বন্ধুর কাছেও চেপে যাচ্ছে, এরপর ওর প্ল্যান কী। যে চক্রান্তকারী একা-একা চক্রান্ত করে— কারো সাহায্য নেয় না— সেরা চক্রী সে-ই— এই আপ্তবাক্য অনুসারে ও কাউকেই মনের মধ্যে টেনে আনে না। কাছে থেকেও তাই বুঝতাম বেশ দূরে আছি আমি।

সপ্তম দিনে সেলাই খোলা হলেও কাগজে বেরোল মৃগীরোগে ধুঁকছে হোমস। সেইদিনই একটা খবর পেয়ে অসুস্থ বন্ধুবরকে না-জানিয়ে পারলাম না। রুরিটানিয়া জাহাজে ব্যারন অ্যাডেলবার্ট গ্রানার লিভারপুল থেকে সামনের শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র রওনা হচ্ছে[১৫] গুরুত্বপূর্ণ কাজ

নিয়ে— বিয়েটা হবে তারপর। গুম হয়ে খবরটা শুনে গেল হোমস— বুঝলাম নড়বড় করে উঠেছে ভেতরটা।

বললে চাপা গলায়, 'রাসকেল কোথাকার! পালিয়ে বাঁচতে চায়! আর মাত্র তিন দিন! ওয়াটসন, পালাতে ওকে দোব না। একটা কাজ করতে পারবে?'

'সেইজন্যেই তো এসেছি।'

'তাহলে সামনের চব্বিশ ঘণ্টা চীনেমাটির বাসন-কোসন নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনো করো।'

এর বেশি হোমস একটা কথাও বলল না, আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। সোজা গেলাম লন্ডন লাইব্রেরিতে[১৬]। একগাদা বই আগলে ফিরলাম বাড়ি।

সারাসন্ধে, গভীর রাত পর্যন্ত, পরের দিন সকালেও শুধু জিরোনোর সময় ছাড়া একটানা পড়ে গেলাম বইয়ের পর বই। চৈনিক পটারি সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ করলাম যে বলবার নয়। হাং-ও[১৭], আং-লো[১৮], তাং-ইং[১৯], সাং[২০] আর উয়াংদের[২১] আশ্চর্য, রহস্যময়, বিস্ময়কর, গৌরবময় কীর্তিকলাপ মাস তারিখ সমেত মুখস্থ করে ফেলে পরের দিন সন্ধে নাগাদ বেকার স্ট্রিটে গিয়ে দেখলাম মাথায় পেল্লায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় গালে হাত দিয়ে আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে শার্লক হোমস।

বললাম, 'ভায়া, লোকে কিন্তু জানে তুমি মরতে বসেছ।'

'সেইরকম জানাতেই তো চাই। পড়া হয়েছে?'

'চেষ্টা করেছি।'

'এ-প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব।'

'তাহলে ম্যান্টলপিস থেকে ওই কৌটোটা পেড়ে দাও।'

ঢাকনা খুলে সূক্ষ্ম মসলিনে মোড়া একটা ভারি সুন্দর লাল-নীল রঙের প্লেট বার করল হোমস।

'ওয়াটসন, মিং রাজবংশের[২২] আসল ডিমের খোলার বাসন এটি। পিকিংয়ের রাজপ্রাসাদের বাইরে পুরো সেটটা আজও বেরিয়েছে কি না সন্দেহ। যেকোনো সমঝদার এ-জিনিসের জন্যে রাজত্ব বিলিয়ে দিতেও রাজি।'

'এ নিয়ে আমি কী করব?'

'ডক্টর হিল বার্টন, ৩৬৯ হাফমুন স্ট্রিট' ঠিকানা ছাপানো একটা কার্ড আমার হাতে দিয়ে হোমস বললে, 'এই হল তোমার ছদ্মনামী ঠিকানা। তুমি ডাক্তার বলেই ডাক্তারের ভূমিকা অভিনয় করতে হবে। সাড়ে আটটা নাগাদ ব্যারনের সঙ্গে দেখা করবে।' আগেই জানিয়ে আসবে মিং চায়নার একটা নমুনা তোমার হাতে দৈবাৎ এসে গেছে— সমঝদারের হাতে তুলে দিতে চাও। তুমি নিজেও একজন সংগ্রাহক।'

'কী দামে?'

'চমৎকার প্রশ্ন করেছ, ওয়াটসন। এ জিনিসের দাম জানা না-থাকলে বোকা বনে যাবে। জিনিসটা জোগাড় করেছি স্যার জেমসের কাছ থেকে। তুমি বলবে এর জুড়ি নেই পৃথিবীতে—'

'বলব যেকোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দাম ঠিক করাই সংগত।'

'চমৎকার! চমৎকার!! দারুণ বুদ্ধির ঝিলিক দেখাচ্ছ আজ! সোদবি-র ক্রিস্টির নাম করবে। নিজে দাম হাঁকতে চাইবে না।'

'কিন্তু যদি দেখা না করে?'

'দেখা করবেই। চীনেমাটির বাসন সংগ্রহের দারুণ বাতিক আছে বলেই দেখা করবে। এ-ব্যাপারে ও নিজেও একজন বিশারদ। বোসো। চিঠিখানা বলছি, লিখে নাও। জবাব দরকার নেই। শুধু জানাবে— তুমি আসছ এবং কেন আসছ।'

লোক মারফত ছোট্ট কিন্তু কৌতূহল জাগানো পত্র পাঠিয়ে দিলাম। তারপর ডক্টর হিলবার্টনের কার্ড পকেটে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে রওনা হলাম।

ব্যারনের বাড়ি তো নয়— পেল্লায় প্রাসাদ। আফ্রিকায় সোনা খুঁজে পেয়ে আঙুল-ফুলে কলাগাছ এক ভদ্রলোক বিরাট জমির ওপর তৈরি করেছিলেন আশ্চর্য এই ইমারত।

ব্যারন দাঁড়িয়ে ছিল দুই জানলার মাঝে রাখা চৈনিক বাসন বোঝাই আলমারির সামনে। আমি ঘরে ঢুকতেই হাতে একটা বাদামি ফুলদানি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'বসুন। আমার নিজের জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। এই যে তার নমুনাটা দেখছেন।— এর সৃষ্টি সপ্তম শতাব্দীতে। এমন পালিশ কখনো দেখেছেন? মিং প্লেটটা এনেছেন?'

সন্তর্পণে মোড়ক খুলে এগিয়ে দিলাম ঠুনকো বস্তুটা। ল্যাম্প টেনে নিয়ে টেবিলে বসে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল গ্রানার— সেই ফাঁকে ল্যাম্পের হলদে আলোয় আমি দেখলাম ওর মুখ।

সত্যিই সুশ্রী চেহারা। দেখলেই মেয়েদের পছন্দ হয় এই কারণেই। বিশেষ করে কুচকুচে কালো চোখের আকর্ষণ এড়ানো বড়ো সহজ নয়। চুল আর গোঁফও দাঁড়কাকের পালকের মতো মিশমিশে, কালো গোঁফ ছুঁচোলো— মোম দিয়ে পাকানো।

ঠোঁট পাতলা— প্রীতিকর মুখের মধ্যে ওই একটি জায়গাতে কেবল খুনি অন্তরের ছাপ ফুটে বেরিয়েছে— ভয়ংকর, নির্মম, কঠিন। কথাবার্তা মোলায়েম— মন ভুলানো। গোঁফ জোড়াই কেবল বিপদ সংকেতের মতো উঁচিয়ে আছে কাটা দাগের মতো মুখবিবরের ঠিক ওপরে। বয়স মনে হয়েছিল তিরিশ— পরে শুনলাম বিয়াল্লিশ।

'চমৎকার— সত্যিই চমৎকার! আপনি বলছেন আরও ছ-টা প্লেট আছে আপনার কাছে। গোলমাল লাগছে কেবল এই একটা ব্যাপারে। আমি জানি এ-জিনিস একটাই আছে ইংলন্ডে একজনের কাছে। এতগুলো যে পাওয়া যাচ্ছে, আগে কখনো শুনিনি। আপনি পেলেন কোত্থেকে?'

'জিনিসটা খাঁটি। বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই করেও নিতে পারেন। কোত্থেকে পেয়েছি জেনে কী করবেন?'

কালো চোখে সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে ব্যারন বললে, 'ভারি রহস্যজনক ব্যাপার দেখছি। জিনিসটা খাঁটি সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার বিক্রি করার আদৌ কোনো অধিকার আছে কি না জানা দরকার তো।'

'সে-দায়িত্ব আমার... গ্যারান্টি দিচ্ছি আর কেউ এসে নিজের বলে দাবি করবে না।'

'কী ধরনের গ্যারান্টি?'

'ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি।'

'তা সত্ত্বেও পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে লাগছে।'

'নেওয়া না-নেওয়া আপনার ইচ্ছে। আপনি সমঝদার শুনেই এসেছি— না নেন অন্যত্র যাব।'

'আমি সমঝদার আপনাকে কে বলল?'

'একটা বই লিখেছেন এ-ব্যাপারে।'

'আপনি পড়েছেন?'

'না।'

'রহস্য আরও বাড়ল। যে-বই পড়লে এ-জিনিসের মর্ম বুঝতেন, সেই বইখানা না-পড়েই এ-জিনিস আপনি সংগ্রহ করেছেন?'

'আমি ডাক্তার মানুষ— ভীষণ ব্যস্ত।'

'ওটা জবাব হল না। শখের খাতিরে মানুষ সব করে— জীবিকা যাই হোক না কেন। আপনি নিজে সমঝদার— চিঠিতে লিখেছেন।'

'তা তো বটেই।'

'তাহলে আপনার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় একটু যাচাই করা যাক। ডাক্তার— জানি না আপনি সত্যিই ডাক্তার কিনা— বলুন তো সম্রাট শোমু[২৩] সম্বন্ধে কী জানেন? নারা[২৪]-র শোশোর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? ভড়কে গেলেন দেখছি! উঙ্গ রাজবংশ সম্বন্ধে কিছু জানেন? চৈনিক বাসন-কোসনের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক জানেন?'

রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'অসহ্য! আমি এসেছি আপনার উপকার করতে— পরীক্ষা দিতে নয়। এ-ব্যাপারে আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে কম সন্দেহ নেই— কিন্তু আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল ব্যারন। চাউনিতে আর কৌতুক নেই— আগুন ঝলসাচ্ছে। হঠাৎ নিষ্ঠুর চাপা দুই ঠোঁটের আড়ালে ঝিলিক দিল সাদা দাঁতের মাড়ি।

'স্পাই কোথাকার! হোমসের গুপ্তচর! নিজে মরতে বসেছে, তাই স্পাই পাঠিয়ে আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে! ঢুকেছেন যত সহজে— বেরোনো কিন্তু তত সহজ হবে না।'

বলেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল গ্রানার। আমিও ছিটকে গেলাম পেছনে। গোড়া থেকেই আমাকে সন্দেহ করেছে বলেই এত জেরা করে এসেছে। এখন পাগলের মতো হাতড়াতে লাগল ড্রয়ারের ভেতরে। আচমকা স্তব্ধ হয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল।

পরমুহূর্তেই অস্ফুট শব্দে চেঁচিয়ে তিরবেগে ধেয়ে গেল পেছনের ঘরে।

চক্ষের পলকে আমিও পৌঁছোলাম দোরগোড়ায়। দেখলাম বাগানের দিকে খোলা জানলার সামনে অপচ্ছায়ার মতো মাথায় রক্তমাখা ব্যান্ডেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস। নীরক্ত মুখে জানলা দিয়ে বেগে ছিটকে গেল ওর বিকট ভূতের মতো দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি— নীচের লরেল ঝোপে আছড়ে পড়ল হুড়মুড় করে। ব্যারন গ্রানারও রাগে হুংকার ছেড়ে ধেয়ে গেল জানলার দিকে।

তারপরের ঘটনাটা ঘটল চোখের পলক ফেলবার আগেই। স্পষ্ট দেখলাম একটা নারী-হস্ত বেরিয়ে এল পাতার আড়াল থেকে। পরমুহূর্তেই বীভৎস চিৎকার ছেড়ে দু-হাতে মুখ খামচে ধরে পাগলের মতো ঘরময় ছুটতে ছুটতে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মেঝের ওপর পড়ে বিষম যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগল ব্যারন।

'জল! জল! জল!'

পাশের টেবিল থেকে কাচের কুঁজো ভরতি জল নিয়ে দৌড়ে গেলাম। ততক্ষণে দুজন চাকর দৌড়ে এসেছে ঘরের মধ্যে। একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ব্যারনের মুখখানা ল্যাম্পের দিকে আমি ঘুরিয়ে ধরতেই। একটু আগেই যে-মুখ দেখে আমি তারিফ করেছি, সে-মুখ এখন বীভৎস, কদাকার। অমানবিক, বর্ণবিহীন আর্টিস্ট যেন ছবির ওপর দিয়ে ভিজে স্পঞ্জ বুলিয়ে এইমাত্র ধেবড়ে দিয়ে গেল সুন্দর মুখখানা। তরল অ্যাসিড তখনও গড়িয়ে পড়ছে কান আর চিবুক বেয়ে। মুখের সর্বত্র প্রবেশ করছে ভয়ংকর অ্যাসিড। একটা চোখ সাদা হয়ে এসেছে— আর একটা চোখ লাল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

'কিটি উইন্টার! কিটি উইন্টার! আমার সর্বনাশ করে গেল শয়তানি কিটি উইন্টার! উঃ বড়ো যন্ত্রণা... আর সইতে পারছি না... বড়ো যন্ত্রণা!'

জানলা গলে বৃষ্টি ঝরা অন্ধকার বাগানে লাফিয়ে পড়ল চাকরবাকর। আমি মুখে তেল মাখিয়ে কাঁচা মাংসের ওপর তুলো লেপে দিলাম, মরফিন ইঞ্জেকশন দিলাম। আমার ওপর থেকে সব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো দু-হাতে আমাকে খামচে রইল গ্রানার— মরা মাছের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল এমনভাবে যেন ও-চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে দিতে পারি আমি। কদাকার সেই মুখ দেখে কেঁদেই ফেলতাম যদি-না— শয়তানটার পুরোনো পাপ কাহিনি মনের মধ্যে ভিড় করে আসত। বাড়ির ডাক্তার এসে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেইসঙ্গে এল পুলিশ। আমার আসল কার্ড তাদের হাতে দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রিটে।

শ্রান্ত-ক্লান্ত ফ্যাকাশে মুখে চেয়ারে বসে ছিল হোমস। এমনিতেই জখম দেহ। তার ওপর একটু আগের ওই ভয়াবহ ঘটনা— প্রচণ্ড শক পেয়েছে দেখলাম। আমার মুখে সভয়ে শুনল কী ভয়ংকরভাবে পালটে গিয়েছে ব্যারনের মুখের চেহারা।

বলল, 'পাপের সাজা এইভাবেই পেতে হয়, ওয়াটসন।' টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে— 'এই সেই বই যার দৌলতে বিয়ের দফারফা করে ছাড়ব— মিস উইন্টার এই বইটার কথাই বলছিল। যে-মেয়ের ভেতরে এতটুকু আত্মসম্মান আছে, এই বই পড়বার পর সে আর ব্যারনকে স্বামী বলে কল্পনাও করতে পারবে না।'

'ব্যারনের প্রেমের ডাইরি?'

'প্রেমের নয় ওয়াটসন, কামের ডাইরি। মিস উইন্টারের কাছে ডাইরির কথা শুনেই বুঝেছিলাম এই সেই মোক্ষম অস্ত্র যা দিয়ে বিয়ে ভাঙা সম্ভব হবে। কী করব ভেবেও নিয়েছিলাম— কিন্তু মেয়েটাকে বলিনি পাছে ফাঁস করে দেয়। তারপরেই আমার এই অবস্থা করে গেল ব্যারনের লোক। ভালোই হল। আমি শয্যাশায়ী মুমূর্ষু জেনে আমার দিকে নজর দেওয়া ছেড়ে দিল ও। আমি তক্কে তক্কে রইলাম। আরও দিনকয়েক সবুর করতাম। কিন্তু রাসকেলটা আমেরিকা যাচ্ছে শুনে আর দেরি করতে পারলাম না। এ-রকম একটা মূল্যবান দলিল ফেলে রেখে যাবার পাত্র সে নয়— সঙ্গে নেবেই। তাই তৎক্ষণাৎ চড়াও হওয়ার প্ল্যান করলাম। তোমাকে চাইনিজ পটারি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিয়ে নীল পিরিচ সমেত পাঠালাম। হাতে সময় খুবই কম পাব জানতাম— অল্প বিদ্যার ফলে পটারি প্রসঙ্গ নিয়ে কতক্ষণই-বা আর আটকে রাখতে পারবে ব্যারনকে— ওর মধ্যেই যাতে ডাইরি উদ্ধার করতে পারি, তাই সঙ্গে নিলাম মিস উইন্টারকে।

কিন্তু ও যে আমার কাজ করতেই শুধু যাচ্ছে না— নিজের কাজ সারতেও যাচ্ছে— তা বুঝিনি। পোশাকের তলায় ছোট্ট প্যাকেটটা কেন অত সযত্নে নিয়ে যাচ্ছে— একদম মাথায় আসেনি।'

'ব্যারন কিন্তু আঁচ করে নিয়েছিল যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।'

'আমি জানতাম ও করবেই। ডাইরিটা পকেটস্থ করার সময়টুকুই কেবল দিয়েছিলে তুমি— আর একটু সময় পেলে কাকপক্ষীও টের পেত না— লম্বা দিতাম। এই যে স্যার জেমস, আসুন!'

সান্ধ্য অ্যাডভেঞ্চার শোনবার পর ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'চমৎকার! মুখের চেহারা যদি ওইরকম হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই ডাইরি না-দেখলেও বিয়ে ভেঙে যাবে।'

মাথা নেড়ে হোমস বললে, 'মিস দ্য মারভিলের মতো মেয়েরা মুখ দেখে টলে না। বরং আরও বেশি করে পছন্দ করে বসবে ব্যারনকে। ওর শারীরিক দোষ নয়, চরিত্রের দোষটাই মারভিলের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ-ডাইরি ব্যারনের নিজের হাতে লেখা— অবিশ্বাস করতে পারবে না।'

পিরিচ আর ডাইরি নিয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন স্যার জেমস। আমারও বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে বলে নেমে এলাম পেছনে পেছনে। ব্রুহাম গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন স্যার জেমস। আলখাল্লা দিয়ে প্যানেলের ওপর বর্ণ-চিহ্ন চাপা দিতে গেলেন বটে, কিন্তু তার আগেই যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছিলাম। সঘন নিশ্বাস টেনে দৌড়ে উঠে এলাম হোমসের ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিষম উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'হোমস, তোমার আসল মক্কেলের নাম জানতে পেরেছি। ইনি—'

হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে হোমস বললে, 'খুবই খানদানি মানুষ তিনি। এইটুকুই শুধু জানা থাক, কেমন?'

ডাইরিটাকে বিয়ে ভাঙার কাজে লাগানো হল কীভাবে আমি জানি না। স্যার জেমস নিজে হয়তো ঝুঁকি নেননি— মিস মারভিলের বাবার হাতে ভারটা দিয়েছিলেন। তিন দিন পরে 'মর্নিং পোস্ট'-এ একটা খবর বেরোল। গ্রানারের সঙ্গে ভায়োলেটের বিয়ে আর হবে না। সেইসঙ্গে বেরোল আর একটা খবর। ব্যারনের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে দেওয়ার অপরাধে মিস কিটি উইন্টারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বিচার চলার সময়ে এমন সব ভয়ানক ভয়ানক খবর ফাঁস হয়ে গেল যে মানবতার খাতিরে নামমাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল মিস উইন্টারকে। শার্লক হোমসের বিরুদ্ধেও ডাইরি চুরির অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, কঠোর ব্রিটিশ আইনও তখন নুয়ে পড়ে। ফলে, বন্ধুবরকে আজও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

টীকা

১. **বিখ্যাত মক্কেলের বিচ্ছিরি বিপদ** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯২৫ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে এবং আমেরিকার কলিয়ার্স উইকলির ৮ নভেম্বর ১৯২৪-এর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **টার্কিশ বাথ** : ডেভিড উর্কহার্ট ইস্তাম্বুল-এর ব্রিটিশ দূতাবাসে কাজ করবার সময়ে টার্কিশ বাথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে পরে পার্লামেন্টের সদস্য থাকাকালীন ইংলন্ডে তা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রথমে নিজের বাড়ি তুর্কি ঘরানায় সাজিয়ে। তাঁরই লেখা বই পিলারস অব হারকিউলিস-এর বিবরণ অনুসারে আয়ারল্যান্ডে প্রথম টার্কিশ বাথ প্রচলন করেন ড. রিচার্ড বার্টার নামক এক চিকিৎসক, ১৮৫৬ সালে।

৩. **কার্লটন ক্লাব :** ৯৪, পলমল ঠিকানায় অবস্থিত কার্লটন ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১৮৯৬-এ ছিল প্রায় আঠারোশো।

৪. **স্যার জর্জ লিউইস :** লিউইস অ্যান্ড লিউইস ফার্মের স্যার জর্জ লিউইস (১৮৩৩-১৯১১) ছিলেন তৎকালীন ব্রিটেনের একজন বিখ্যাত সলিসিটর।

৫. **কুইন অ্যানি স্ট্রিট :** ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ারে, ডাক্তারদের পাজ হার্লে স্ট্রিট থেকে কুইন অ্যানি স্ট্রিট বেশি দূরে নয়। বেকার স্ট্রিট থেকেও এই রাস্তার দূরত্ব সামান্য।

৬. **স্প্লুজেন গিরিবর্ত্ম :** প্রাহা বা প্রাগ ছিল চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী। কিন্তু স্প্লুজেন গিরিবর্ত্মের অবস্থান সুইজারল্যান্ড এবং ইতালির সীমান্তে।

৭. **খাইবার পাস :** দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে, খাইবার পাসের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৮-৭৯ সালে।

৮. **হার্লিংটনে :** ফুলহ্যামের হার্লিংটন ক্লাব ছিল ইংলন্ডে পোলো খেলার প্রধান ঘাঁটি। পোলো খেলার উৎপত্তি সম্ভবত পারস্যে অথবা ভারতবর্ষে ছ-শো খ্রি. পূ. থেকে খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে বলে মনে করা হয়।

৯. **চার্লি পিস :** শেফিল্ডের বাসিন্দা চার্লস পিস ছিলেন আবিষ্কারক, নামি বেহালাবাদক, অভিনেতা এবং সেইসঙ্গে সিঁধেল চোর এবং খুনি।

১০. **ওয়েনরাইট :** থমাস গ্রিফিথ ওয়েনরাইট (১৭৯৪-১৮৫২) ছিলেন চিত্রকর এবং শিল্প সমালোচক। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন ইগোমেট বনমট এবং জানুস ওয়েদারকুক ছদ্মনামে। শোনা যায় তিনি একটি হত্যার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

১১. **পার্কহার্স্ট :** ১৮৩৮-এ আইল অব ওয়েটে প্রতিষ্ঠিত অতীব সুরক্ষা সংবলিত কারাগার।

১২. **সম্মোহিত মানুষ সেই হুকুম হুবহু মেনে চলে :** ভিয়েনার চিকিৎসক ফ্রানজ আন্তন মেসমার (১৭৩৪-১৮১৫) সম্মোহন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহারের প্রচলন করেন। উনবিংশ শতকের শেষে ইউরোপে সম্মোহন ছিল একটি জনপ্রিয় বিষয়।

১৩. **স্কার্ভি :** ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে ঘটিত চর্মরোগ।

১৪. **কুষ্ঠরোগ :** কুষ্ঠরোগের জীবাণু মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম ল্যাপরে প্রথম চিহ্নিত করেন নরউইজিয় চিকিৎসক জি. আরমোয়ার হ্যানসেন। সেকালে এই রোগ ছিল দুরারোগ্য এবং সংক্রামক মনে করা হত কুষ্ঠরোগকে।

১৫. **সামনের শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র রওনা হচ্ছে :** গবেষক লেসলি ক্লিংগার জানিয়েছেন রুরিটানিয়া জাহাজের কর্তৃপক্ষ কুনার্ড লাইনারের জাহাজ লিভারপুল থেকে সেই সময়ে শুধুমাত্র মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার রওনা হত।

১৬. **লন্ডন লাইব্রেরি :** সেন্ট জেমস স্কোয়ারে অবস্থিত লন্ডন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১-এ। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টমাস কার্লাইল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল-এর নাম।

১৭. **হাং ও :** দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা হাং ও (১৩২৮-১৩৯৮)-র আসল নাম চু উয়ান চ্যাং। ইনি মিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৮. **আং লো :** আং লো (১৩৬০-১৪২৮) ছিলেন মিং বংশের তৃতীয় সম্রাট।

১৯. **তাং ইং :** মিং যুগের এক বিখ্যাত কবি এবং শিল্পী ছিলেন তাং ইং বা তান ইন (১৪৭০-১৫২৩)।

২০. **সাং :** চৈনিক রাজবংশ 'সাং'-এর শাসনকাল ছিল খ্রিস্টিয় ৯৬০ থেকে ১২৫৯ পর্যন্ত।

২১. **উয়াং :** বা উয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খান (১২১৫-১২৯৪)। সাং বংশীয় শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করে কুবলাই খান এই রাজবংশের সূচনা করেন ১২৭১ সালে। উয়াল রাজবংশ রাজত্ব করে ১৩৬৮ পর্যন্ত।

২২. **মিং রাজবংশ :** উয়ান রাজবংশের পতনে মিং রাজবংশের সূচনা হয় চিনদেশে ১৩৬৮ সালে। এর শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে ১৬৪৪-এ।

২৩. **সম্রাট শোমু :** জাপানের সম্রাট শোমু (৭০১-৭৫৬) সিংহাসনে অভিষিক্ত হন ৭১৫ সালে মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে। শোমু ছিলেন বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মের অনুগামী এবং বৌদ্ধশিল্পের পৃষ্ঠপোষক।

২৪. **নারা :** জাপানের প্রথম রাজধানী নারা। সেখানে ৭৫২ সালে সম্রাট শোমু টোডাই-জি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোশো-ইন হল টোডাই-জি মন্দিরের একটি হর্ম্যের নাম। শোশো-ইন এখন শোমুর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা।

সাদাটে সৈন্যর সাংঘাতিক সংকট[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্লাঞ্চড সোলজার]

বন্ধুবর ওয়াটসনের মাথাটি খুব উর্বর নয়— আইডিয়া বেরোয় কদাচিৎ— কিন্তু যখন বেরোয় তখন তার পেছনে লেগে থাকে ছিনেজোঁকের মতো। অনেকদিন ধরেই ও আমাকে খেয়ে ফেলছে আমাকে দিয়েই আমার একখানা অ্যাডভেঞ্চার লেখানোর জন্যে। মতলবটা সম্ভবত আমিই জুগিয়েছি ওর মাথায়। ওর লেখা নিয়ে কম সমালোচনা তো করিনি। বরাবর বলেছি, 'লোকরঞ্জনের দিকে না-ঝুঁকে ঘটনার দিকে নজর দাও।' ও খেপে গিয়ে বলত, 'নিজে চেষ্টা করলেই পার।' কলম হাতে নিয়ে বুঝছি[২], লেখাটা পাঠকের মনোরঞ্জন করার মতো করেই লেখা দরকার। আমার ঝুলিতে জমানো সবচেয়ে অদ্ভুত কেসগুলোর একটা বেছে নিয়েছি। ওয়াটসন, আমার জীবনীকার, কিন্তু এ-কেসের বৃত্তান্ত জানে না। ওয়াটসনের নিজস্ব কতকগুলো অত্যাশ্চর্য গুণ আছে। আমাকে নিয়ে রং চড়িয়ে গল্প লিখতে গিয়ে নিজের গুণটা বিনয় সহকারে এড়িয়ে গেছে। স্যাঙাত যদি আপনার মতলব আগে থেকেই আঁচ করে ফেলে— তাকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে চমকানো যায় না। কিন্তু যে তা পারে না, প্রতি মুহূর্তে সে চমকে চমকে ওঠে। ওয়াটসন ছিল তাই। ভবিষ্যতের খবর সে আঁচ করতে পারত না বলেই সঙ্গী হিসেবে সে আদর্শ— তার লেখার মধ্যেও এই চমকটা ফুটে উঠত এই লাইনে।

ওয়াটসন যে সময়ে স্বার্থপরের মতো বউ নিয়ে ঘরসংসার করবে বলে আমাকে একলা ফেলে গিয়েছিল, এ-কাহিনি তখনকার। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। বুয়র যুদ্ধ[৩] তখন সবে শেষ হয়েছে। আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন রোদেপোড়া তাজা চেহারার বিরাটকায় এক ইংরেজ। নাম তাঁর জেমস এম ডড।

জানলার দিকে পিঠ দিয়ে বসে মক্কেলকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা আমার চিরকালের অভ্যেস। মিস্টার ডডকেও বসালাম সেই চেয়ারে। উনি কিন্তু কথা শুরু করবেন কী করে ভেবে না-পেয়ে মহা ধাঁধায় পড়লেন। আমিও কথা ধরিয়ে না-দিয়ে সেই ফাঁকে ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে দু-একটা পিলে চমকানো খবর শুনিয়ে দেব ঠিক করলাম। আমি দেখেছি এতে কাজ হয় ভালো।

'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন দেখছি?'

চমকে উঠে ডড বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'রাজকীয় অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক[৪]?'

'এক্কেবারে ঠিক।'

'মিডলসেক্স বাহিনী[৫]।'

'ঠিক, ঠিক। মিস্টার হোমস কি গণৎকার!'

ভদ্রলোকের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখে মুচকি হেসে বললাম, 'রোদেপোড়া মুখ দেখলেই বোঝা যায় এ-রোদ ইংলন্ডের রোদ নয়— বিশেষ করে রুমাল পকেটে না-রেখে হাতায় গুঁজে রাখলে পরিষ্কার বোঝা যায় আগমন হচ্ছে কোত্থেকে। খাটো দাড়ি দেখেই বুঝেছি আপনি বারোমেসে সেপাই নন— স্বেচ্ছাসেবক। চেহারার ধার দেখেই বোঝা যায় ঘোড়ায় চড়েন। মিডলসেক্স

বাহিনীতে নাম লিখিয়েছেন বুঝলাম আপনার কার্ড থেকে— থ্রগমর্টন স্ট্রিটের শেয়ারের দালাল আপনি। আরও বাহিনীতে যোগ দেওয়ার মতলব আছে দেখছি?'

'সবই দেখেন দেখছি।'

'আপনাকে ছাড়া কিছুই আর দেখিনি। চোখ মেলে সব কিছু দেখবার ট্রেনিং এই চোখ জোড়াকে দিয়েছি। যাকগে সে-কথা, পর্যবেক্ষণ-বিজ্ঞান নিয়ে গল্প করার জন্যে নিশ্চয় সাতসকালে আসেননি। ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে কী ঝামেলায় পড়েছেন বলুন।'

'মিস্টার হোমস—!'

'আরে মশাই, অমন আঁতকে উঠছেন কেন? এর মধ্যে রহস্য একদম নেই। আপনার চিঠিতে শিরোনাম দিয়েছিলেন ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্ক। দেখাও করতে চেয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি— ঝামেলায় না-পড়লে এত ধড়ফড় কেউ করে?'

'তা ঠিক, তা ঠিক। চিঠিখানা লিখেছিলাম বিকেলে। তারপর জল অনেক গড়িয়েছে। কর্নেল এমসওয়ার্থ আমাকে লাথিয়ে বার করে না-দিলে—'

'লাথিয়ে বার করে দিয়েছেন?'

'প্রায় তাই। বড়ো দুঁদে লোক মশাই এই এমসওয়ার্থ। কর্নেল যখন ছিলেন, তখনও যা, এখনও তাই। কথাবার্তাও চোয়াড়ে। শুধু গডফ্রের খাতিরেই ভদ্রলোকের সামনে গিয়েছিলাম।'

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলাম চেয়ারে।

বললাম, 'খুলে বলুন।'

দুষ্টামির হাসি হেসে মক্কেল বললেন, 'ভেবেছিলাম আপনাকে কিছু খুলে বলতে হয় না— সব বুঝে নেন। যাই হোক, যা-যা ঘটেছে, সব বলছি। সারারাত ভেবেও কূল-কিনারা পাইনি— দেখি আপনি পান কি না।

'দু-বছর আগে আমি বাহিনীতে নাম লেখাই। সেই বছরেই একটা স্কোয়াড্রনে নাম লেখায় কর্নেলের ছেলে গডফ্রে এমসওয়ার্থ। বাপকা বেটা— লড়াই ওর রক্তেও ছিল। দারুণ বন্ধুত্ব জমে গেল দুজনের মধ্যে। তারপর প্রিটোরিয়ার[৬] বাইরে ডায়মন্ড হিলের[৭] কাছে হাতি মারা বুলেটের চোট পেল গডফ্রে। কেপটাউনের হাসপাতাল থেকে একবার একটা চিঠি পেলাম— আর একটা পেলাম সাদাম্পটন থেকে। তারপর ছ-মাস কেটে গেছে মিস্টার হোমস— আর কোনো চিঠি পাইনি।

'যুদ্ধ শেষ হলে 'পর গডফ্রের বাবাকে একটা চিঠি লিখে ওর খবর জানতে চাইলাম। জবাব পেলাম না। আবার একখানা চিঠি ছাড়তেই কাঠখোট্টা ভাষায় আমাকে জানানো হল গডফ্রে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছে জাহাজে চেপে— ফিরতে সেই এক বছর।

'জবাব মনে ধরল না আমার। গডফ্রের মতো ছেলে দোস্তের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে ভাবাও যায় না। আমি জানতাম উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে গডফ্রে। এও জানতাম যে বাপের সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব মধুর নয়। বাপের জোর জুলুম সইতে সইতে হাড় কালি হয়ে গিয়েছে গডফ্রের। তাই বাপের জবাব মনে ধরল না আমার। ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব। কিন্তু নিজের কাজে এত জড়িয়ে পড়েছিলাম যে সময় করে উঠতে পারিনি অ্যাদ্দিন। দিন সাতেক হল গডফ্রের কেস নিয়ে পুরোদমে মাথা ঘামাচ্ছি— এসপার কি ওসপার করে ছাড়ব।'

জেমস ডডের শক্ত চোয়াল আর কঠোর চাউনি দেখে বুঝলাম এ-লোক শত্রু না হয়ে বন্ধু হলেই মঙ্গল।

‘কী করলেন, তাই বলুন।’

‘প্রথমেই ঠিক করলাম বেডফোর্ডের কাছে ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে নিজেই যাব। দেখব ব্যাপারটা কী। চিঠি লিখলাম গডফ্রের মাকে— রগচটা গোমড়ামুখো বাপকে এড়িয়ে যাওয়া মনস্থ করলাম। সোজাসুজি লিখলাম গডফ্রে আমার প্রাণের বন্ধু। তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে আমার। তাই আমি আসতে চাই ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে। ভারি মিষ্টি জবাব দিলেন গডফ্রের মা। রাতটা বাড়িতে কাটিয়ে যেতে নেমন্তন্ন করলেন। তাই গত সোমবার গেলাম সেখানে।

‘ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে যেদিক দিয়েই যান না কেন, পাঁচ মাইল হাঁটতেই হবে। স্টেশন থেকে সুটকেস নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়িটা দেখলাম পেল্লায়— মস্ত পার্কের মাঝখানে পুরোনো আমলের হাজার রহস্যে ঘেরা ছায়াময় থমথমে ইমারত। এলিজাবেথ-আমলের ভিত, ভিক্টোরিয়া-আমলের গাড়িবারান্দা। পর্দা, তৈলচিত্র, কাঠের প্যানেল সব কিছুই কালের মহিমায় জীর্ণ, বিবর্ণ এবং হতশ্রী। খাস চাকরের নাম রালফ— বয়সটা বাড়ির বয়সের সমান বলেই মনে হল। তার বউয়ের বয়স যেন আরও বেশি। গডফ্রের ধাইমা সে। মায়ের মতোই ভালোবাসত গডফ্রে। ভালো লাগল আমারও। ভালো লাগল গডফ্রের মাকেও— ছোটোখাটো সাদা মহিলা— খলবলে ইঁদুরের মতোই চটপটে। পছন্দ হল না কেবল খোদ কর্নেলকে।

‘প্রথমেই এমন একচোট কস্তাকস্তি হয়ে গেল যে ইচ্ছে হল তৎক্ষণাৎ রওনা হই স্টেশন অভিমুখে। তারপর ভেবে দেখলাম বুড়ো কর্নেলেরও মতলব হয়তো তাই। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

‘কর্নেলের ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া পর দেখলাম রাজ্যের জিনিস ছড়ানো টেবিলের একপ্রান্তে বসে আমার দিকে জ্বলন্ত ধূসর চোখে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা, গালে দাড়ির জঙ্গল, বিরাট আকৃতি, চামড়া ধোঁয়াটে রঙের, লাল ধমনী ওঠা নাকটা বেরিয়ে গেছে শকুনির ঠোঁটের মতো, ভুরু দুটো ঝোপের মতো নেমে আছে জ্বলন্ত চোখজোড়ার ওপর। এক নজরেই বুঝলাম বাপ সম্পর্কে কেন ওই ধরনের টীকাটিপ্পনী ছাড়ত গডফ্রে ছোকরা।’

উখোঘসা গলায় বললেন, ‘বাড়ি বয়ে আসার আসল কারণটা জানতে পারি?’

‘আমি তখন বললাম, চিঠিতে ওঁর স্ত্রীকে কী লিখেছি। উনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন সত্যিই আফ্রিকায় থাকার সময়ে আমার সঙ্গে গডফ্রের বন্ধুত্ব ছিল কি না। গডফ্রের লেখা চিঠি বাড়িয়ে দিলাম। উনি পড়ে ফেরত দিয়ে বললেন, ‘তা তো হল, এখন কী চাই?’

‘গডফ্রে এখন কোথায় জানতে চাই?’

‘আপনাকে আগেই একখানা চিঠিতে তা জানানো হয়েছে। জাহাজে করে পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে ওর এখন বিশ্রাম দরকার। সবাইকে তাই বলে দেবেন।’

‘কোন জাহাজ দেশ বেড়াতে বেরিয়েছে, দয়া করে বলুন। চিঠি লিখব।’

কর্নেল যেন হকচকিয়ে গেলেন আমার এই প্রশ্নে। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকার পর যখন মুখ তুললেন, দেখলাম মুখ থমথম করছে। দাবা খেলায় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনাসামনি

কোণঠাসা চালের পালটা চাল যেন ভেবে পেয়েছেন, এমনি সুরে বললেন, 'আপনার ছিনেজোঁকের মতো কথাবার্তা কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'সেটা আপনার ছেলের প্রতি আমার ভালোবাসার জন্যে।'

'প্রত্যেক ফ্যামিলির গোপন কথা থাকে— বাইরের লোককে তা বলা যায় না। গডফ্রের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোরকম খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কেবল তার অতীত নিয়েই আলোচনা করবেন— তার বেশি নয়।'

'মিস্টার হোমস, এরপর আর কথা জমল না। খেতে বসেও মুখ গোঁজ করে রইলাম তিনজনে। কর্তা-গিন্নিও হাওয়া স্বাভাবিক করতে পারলেন না। খাওয়া শেষ হতেই অছিলা করে উঠে গেলাম আমার একতলার ঘরে। বাইরে চাঁদ উঠেছে। জানলা খুলে দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে হাতের কাছে ল্যাম্প জ্বেলে বসলাম ফায়ার প্লেসের পাশে। এমন সময়ে এল বুড়ো চাকর রালফ। কথায় কথায় বললে, তার স্ত্রী গডফ্রেকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছে। সেইদিক দিয়ে গডফ্রের ধর্ম-বাপ বলা যায় তাকে। গডফ্রের কথা উঠতেই আমি তার সাহসের প্রশংসা করলাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে রালফ সায় দিলে। ছেলেবেলায় পার্কের হেন গাছ নেই যাতে সে না-উঠেছে। দারুণ ডাকাবুকো ছেলেবেলা থেকেই।

বলল, 'বড়ো ভালো ছেলে ছিল। কিছুতেই গাছে চড়া আটকাতে পারতাম না। বড়ো হয়েও অমন চমৎকার মানুষ আর ছিল না।'

'তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বুড়োর কাঁধ খামচে ধরে বললাম, "তার মানে? 'ছিল' কেন বলছ? মরে গেলে তো বলে 'ছিল'। কী হয়েছে গডফ্রের? বেঁচে আছে তো?"

'আমার চাউনির সামনে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল রালফ। তারপর এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "মরলেই বরং ভালো ছিল।"

'মিস্টার হোমস, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল এই কথা শুনে। এসে বসলাম চেয়ারে। মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলাম কী বলতে চেয়েছে বুড়ো রালফ। মানে একটাই দাঁড়ায়। নিশ্চয় কোনো গর্হিত কাজ করে ফেলেছে গডফ্রে। ওর বাপ তাই ওকে লুকিয়ে রেখেছে ফ্যামিলির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ঘাড় হেঁট করে এইসব ভাবতে ভাবতে মাথা তুলে দেখলাম, খোলা জানলার ঈষৎ সরানো পর্দার ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গডফ্রে এমসওয়ার্থ।

'মিস্টার হোমস, সে-মুখের বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। জানলাটা মেঝে পর্যন্ত। পর্দার ফাঁকে গডফ্রের পুরো দেহটাই দেখা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমার চোখ আটকে রইল কেবল মুখখানার ওপর। সাদাটে, ফ্যাকাশে, ভ্যাটভেটে, বীভৎস। চোখ তো নয়— যেন মড়া তাকিয়ে আছে। শুনেছি ভূতদের মুখ এমনি মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়। কিন্তু গডফ্রের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখজোড়ার মধ্যে প্রাণের সাড়া পেলাম। আমি দেখে ফেলেছি দেখেই পরমুহূর্তেই ছিটকে সরে গেল গডফ্রে।

'ভয়ের চোটে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো মানুষের মুখ এমন বিকট সাদা ভ্যাটভেটে ফ্যাকাশে হয় না। পালিয়ে যাওয়াটা কেমন যেন চোরের মতো, মহা অপরাধীর মতো— আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। অথচ গডফ্রের ভেতরে লুকোছাপা কোনোকালেই

ছিল না। চিরকালই খোলামেলা, পষ্টাপষ্টি চরিত্রের মানুষ সে। কিন্তু হাজার হোক আমি বুয়র যুদ্ধ লড়ে এসেছি, ভয়ে বসে থাকার পাত্র নই। তাই সঙ্গেসঙ্গে লাফিয়ে উঠে ছুটলাম দরজার দিকে। বেয়াড়া ছিটকিনি খুলতেই গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বাগানে ধেয়ে গিয়ে গডফ্রেকে আর দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু যেদিকে ছিটকে গিয়েছিল, সেইদিকের পথে গাছপাতা নড়া দেখে মনে হল নিশ্চয়ই ও দৌড়োচ্ছে সেদিকে। আমিও ছুটলাম। নাম ধরে ডাকলাম, এক জায়গায় রাস্তাটা অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কোনদিকে যাব ভেবে না-পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি, এমন সময়ে স্পষ্ট শুনতে পেলাম সামনের দিকে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। পেছনে নয়— যে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে এসেছি, সে-বাড়ি থেকে নয়— সামনের দিকে। আর কোনো সন্দেহ রইল না। গডফ্রেই আমাকে দেখে পালিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

'আমিও ছাড়বার পাত্র নই। যেন বাগান দেখতে বেরিয়েছি এমনিভাবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। অনেকগুলো আউটহাউস চোখে পড়ল। একটা বেশ বড়ো। মালি-টালির বাড়ি হতে পারে। বাড়িটার সামনে আসতেই কালো কোট আর টুপি পরা, দাড়িওলা ছোটোখাটো চেহারার চটপটে এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চাবি রাখলেন পকেটে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন।

"আপনি কে?"

'আমি বললাম আমি কে। গডফ্রের বন্ধু। কিন্তু সে যে দেশ বেড়াতে বেরিয়ে যাবে কে জানত।

'শুনে কেমন যেন চোরা গলায় বললেন ভদ্রলোক, "তা ঠিক, তা ঠিক, বড়ো অসময়ে এসে পড়েছেন।"

'বলতে বলতে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ করলাম ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছেন আমি কী করছি। আমি তাই বাড়ি ফিরে এলাম। রাত গভীর হতেই চুপিসারে গেলাম আউটহাউসটায়। সব জানলায় পর্দা টানা, খড়খড়ি নামানো। বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু একটা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। কপাল ভালো আমার। জানলার খড়খড়িটা একটু ভাঙা ছিল, পর্দাও একটু ফাঁক ছিল। সে-ফাঁকে চোখ রাখতেই দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যে ল্যাম্প জ্বলছে, ফায়ার প্লেসে আগুন লকলক করছে। কালো কোট পরা দাড়িওলা সেই লোকটা জানলার দিকে ফিরে কাগজ পড়ছেন।'

এই পর্যন্ত শুনেই প্রশ্ন করলাম, 'কী কাগজ?'

বাধা পেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে ডড বললেন, 'তা জেনে কি দরকার আছে?'

'খুবই দরকার আছে।'

'অত দেখিনি।'

'সাইজ কী? দৈনিক কাগজের মতো বড়ো? না, সাপ্তাহিকের মতো ছোটো?'

'খুব একটা বড়ো নয়। স্পেকটেটর কাগজ হলেও হতে পারে। তখন অত ভাববার সময় বা মনের অবস্থা আমার ছিল না। জানলার দিকে পিঠ করে সে বসে আছে, তার মুখ দেখতে না-পেলেও পিঠের গোলভাব দেখেই বুঝলাম গডফ্রে। বিষণ্ণভাবে চেয়ে আছে আগুনের চুল্লির দিকে। কী করব ভাবছি। এমন সময়ে থাবড়া পড়ল কাঁধে।

'ফিরে দেখি, কর্নেল এমসওয়ার্থ। চাপা গলায় ফ্যাঁস করে খালি বললেন, ''এদিকে আসুন।''

'এলাম পেছন পেছন— একেবারে আমার শোবার ঘরে। হল ঘর থেকে একটা টাইমটেবিল নিয়ে এসেছিলেন কর্নেল। বাড়িয়ে দিয়ে বললেন রাগ থমথমে গলায়, 'সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডনের ট্রেন— আটটায় গাড়ি আসবে আপনাকে নিতে।''

'আমি তখন এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেছি যে তোতলাতে তোতলাতে গডফ্রে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে যেতেই উনি ফ্যাঁস করে বলে বসলেন, ''খবরদার। এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। ফ্যামিলির গোপন ব্যাপারে নাক গলিয়েছেন আপনি। আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম অতিথি হিসেবে— কিন্তু আপনার কাজকর্ম স্পাইয়ের মতো। আর কোনোদিন যেন আপনার মুখ আমাকে না দেখতে হয়।''

'এই শুনেই ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল প্রচণ্ড রাগে। চিৎকার করে বললাম, ''আমি আপনার ছেলেকে দেখেছি। তাকে আটকে রাখা হয়েছে। কেন রেখেছেন, তা আপনিই জানেন। কিন্তু তার স্বাধীনতা কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা না-জানা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না, কর্নেল এমসওয়ার্থ। এ-রহস্যের তলা পর্যন্ত দেখে ছাড়ব— ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে আমাকে আটকাতে পারবেন না।'

'বুড়োর মুখ দেখে মনে হল এবার আমাকে মেরে বসবেন। আগেই বলেছি, চেহারার দিক দিয়ে কর্নেলকে ছোটোখাটো দৈত্য বললেই চলে। আমিও কম যাই না। টক্কর লাগলে একাই লড়ে যেতাম। উনি কিন্তু কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমিও যথাসময়ে গাড়ি আসতেই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে সোজা চলে এলাম আপনার কাছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম আগেই।'

জেমস ডডের কাহিনি শুনে পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সমস্যা সমাধান বেশ দুরূহ। কেসটা কিন্তু বিলক্ষণ ইন্টারেস্টিং।

প্রশ্ন করলাম, 'বাড়িতে চাকরবাকর ক-জন?'

'যদ্দুর দেখেছি বুড়ো রালফ আর তার বউ।'

'আউটহাউসে চাকর নেই?'

'কালো কোট পরা লোকটাকে কিন্তু চাকর বলে মনে হয়নি— উঁচু জাতের মানুষ বলেই মনে হয়েছে।'

'খুবই প্রণিধানযোগ্য পয়েন্ট। আউটহাউসে খাবার নিয়ে যাওয়া হয় কি না দেখেছেন?'

'বললেন বলে মনে পড়ছে। রালফকে ঝুড়ি হাতে ওদিকেই যেতে দেখেছি। তখন অবশ্য মনে হয়নি খাবার নিয়ে যাচ্ছে।'

'পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন?'

'নিয়েছি। স্টেশন মাস্টার আর গাঁয়ের মোড়লকে জিজ্ঞেস করেছি। দুজনেই বলেছে, গডফ্রে যুদ্ধ থেকে ফিরেই পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে।'

'আপনার সন্দেহের কথা কাউকে বলেননি?'

'একদম না।'

'ভালো করেছেন। আপনাকে নিয়ে ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে যাব ভাবছি।'

'আজ?'

হাতে তখন কাজ ছিল। ডিউক অফ গ্রেমিস্টার আর তুর্কির সুলতান[৮] দুটি কেস দিয়েছিলেন হাতে। তাই জেমস ডডকে নিয়ে রওনা হলাম দিন সাতেক পরে। স্টেশনে পৌঁছে গম্ভীর বদন কঠোর চেহারার এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে ডডকে বললাম, 'ইনি আমার পুরোনো বন্ধু, সঙ্গে থাকবেন— দরকার আছে।' এর বেশি একটা কথাও আর বললাম না। ওয়াটসন আমার স্বভাব আর তদন্ত পদ্ধতির কথা আপনাদের জানিয়েছে। দরকারের বেশি একটা কথাও তদন্তকালে আমি বলি না— প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করি না। জেমস ডড একটু অবাক হলেন— কিন্তু কৌতূহল দেখালেন না। ট্রেনে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে।

'গডফ্রেকে জানলায় দেখে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তো? একই লোক?'

'একেবারে। শার্সির কাচে নাক চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। ল্যাম্পের আলো মুখে পড়েছিল।'

'আর কেউ নয়? একরকম দেখতে কেউ?'

'না।'

'আপনিই তো বললেন তার সবটাই গডফ্রের মতো নয়?'

'রংটাই কেবল আলাদা। মাছের তলপেটের মতো ভ্যাটভেটে সাদা মুখ। সব রং নিংড়ে বার করে নেওয়া মুখ।'

'মুখের আগাগোড়াই কি এমনি সাদাটে?'

'মনে হয় না। কপালটা কাচে ঠেকে ছিল বলেই স্পষ্ট দেখেছিলাম।'

'ডেকেছিলেন তখন?'

'আঁতকে উঠে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম— ডাকবার কথা মনে ছিল না। পরে পেছন পেছন গিয়ে ডেকেছিলাম।'

সমাধান পেয়ে গেলাম। রহস্য আর কিছুই নেই। এখন শুধু একটা ঘটনা ঘটানো দরকার উপসংহার টানার জন্যে। ট্যাক্সবুরি ওল্ড পার্কে পৌঁছোলাম গাড়ি ভাড়া করে। গম্ভীর বদন বন্ধুটিকে গাড়িতে বসিয়ে জেমস ডডকে নিয়ে গেলাম পেল্লায় বাড়ির সদর দরজায়। দরজা খুলে দিল রালফ— হাতে চামড়ার দস্তানা। আমাদের দেখেই ঝটিতি হল ঘরের টেবিলে দস্তানা খুলে রেখে আমাদের কার্ড নিয়ে গেল কর্নেলের কাছে। সেই ফাঁকে আমি একটা ছোট্ট সন্দেহ ভঞ্জন করলাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে। ওয়াটসনের লেখনীর দৌলতে পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয় জেনে গেছেন আমার গন্ধেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। গন্ধটা আসছিল হল ঘরের মাঝখান থেকে। টেবিলের ওপর টুপি রেখে তুলে নেওয়ার অছিলায় মাথা হেঁট করে নাকটা নিয়ে এলাম চামড়ার দস্তানা জোড়ার কাছে। গন্ধটা আসছে দস্তানা থেকেই। যেটুকু বাকি ছিল সমাধানকে জোরদার করতে, তাও পেয়ে গেলাম ওই গন্ধের মধ্যে থেকে। ওয়াটসন হলে রহস্য শৃঙ্খলের এই বিশেষ গ্রন্থিটুকু না-জেনেই রহস্যকে রুদ্ধশ্বাসী করে উপস্থাপিত করত। আমাকে করতে হবে জেনেশুনেও তার কথা চেপে রেখে।

'কর্নেল ওঁর ঘরে ছিলেন না। কার্ড পেয়ে এলেন দুমদাম করে। প্যাসেজে শুনলাম তাঁর রাগী পায়ের আওয়াজ। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে গাঁক গাঁক করে বললেন, "ফের এসেছেন? বললাম না আপনার মুখ দেখতে চাই না?" তারপর ফিরলেন আমার দিকে, "আপনার সুনাম আমি শুনেছি। ক্ষমতা দেখাতে হয় অন্য জায়গায় দেখান, এখানে নয়।"

দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল আর তিনি তাঁর কড়া দাড়ি সম্বলিত বাঁকা মুখ দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন, যাঁর মতো ভয়ংকর বুড়ো এর আগে আমি আর দেখিনি।
হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৬

গোঁয়ার গলায় জেমস ডড বললেন, 'গডফ্রে আগে নিজে বলুক তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়নি— তাহলেই যাব—নইলে নয়।'

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক দিলেন কর্নেল, 'রালফ! পুলিশকে টেলিফোন করো, দুজন কনস্টেবল পাঠাতে বলো। বাড়িতে চোর ঢুকেছে।'

আমি বললাম ডডকে, 'কর্নেল ঠিকই বলেছেন। ওঁর বাড়িতে ওঁর ইচ্ছে না হলে আমরা থাকতে পারি না। কিন্তু আমি যদি কর্নেলের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলার সুযোগ পাই, তাহলে ব্যাপারটা সরল করে তুলতে পারব।'

'কোনো কথা নয়।— রালফ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও, ফোন করো[৯] থানায়।'

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সেটি হচ্ছে না। পুলিশ এলে আপনি যা ঢাকতে চাইছেন, তা ফাঁস হয়ে যাবে।' বলতে বলতে পকেট থেকে নোটবই বার করে একতাড়া ছেঁড়া কাগজে একটা কথা লিখে এগিয়ে দিলাম কর্নেলের দিকে— 'আমি এসেছি এইজন্যেই।'

ফ্যালফ্যাল করে কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। বিস্ময় ছাড়া সব অভিব্যক্তিই মুছে গেল মুখ থেকে।

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'আপনি জানলেন কী করে?'

'জানাটাই আমার কাজ, আমার ব্যাবসা।'

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে দাড়ি নিয়ে টানাটানি করে যেন হাল ছেড়ে দিলেন কর্নেল। বললেন, 'ঠিক আছে, গডফ্রেকে দেখলেই যদি প্রাণ ঠান্ডা হয় তো তাই হোক। আপনারাই জোর করলেন— আমার আর দোষ রইল না। রালফ, মিস্টার গডফ্রে আর মিস্টার কেন্টকে বলো পাঁচ মিনিট পর সবাই আসছি।'

পাঁচ মিনিট ফুরোতেই রওনা হলাম রহস্যময় সেই আউটহাউস অভিমুখে। দাড়িওলা খর্বকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। সবিস্ময়ে বললেন, 'কর্নেল এমসওয়ার্থ, করছেন কী! প্ল্যান যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে!'

'আমি নিরুপায় মিস্টার কেন্ট। চাপের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া পথ আর নেই। গডফ্রে তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

সদলবলে ঢুকলাম ভেতরের ঘরে। আসবাবপত্র মামুলি। ঘরের ঠিক মাঝখানে ফায়ার প্লেসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি। দেখেই দু-হাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেলেন জেমস ডড— 'গডফ্রে! গডফ্রে!'

হাত তুলে কাছে আসতে নিরস্ত করল গডফ্রে।

বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না। তফাত থাকো। হ্যাঁ, ফ্যালফ্যাল করে শুধু দেখো! বি স্কোয়াড্রনের সেই স্মার্ট লান্স-কর্পোরাল এমসওয়ার্থ আর আমি নই, ঠিক কিনা?'

সত্যিই সে-চেহারা অস্বাভাবিক। একককালে দেখতে নিশ্চয় ভালো ছিল, কিন্তু আফ্রিকার রোদে পোড়া বাদামি চামড়ার ওপর অদ্ভুত ছোপ-ছোপ সাদাটে দাগের ফলে বীভৎস দেখাচ্ছে এখন।

'জিমি, এই কারণেই কারো সঙ্গে আমি দেখা করি না।'

'গডফ্রে, সেই রাতে জানলায় তোমাকে দেখা পর্যন্ত আমি পাগলের মতো হয়ে রয়েছি... সব ব্যাপার খোলসা না-করা পর্যন্ত থাকতে পারিনি।'

'রালফের মুখে তুমি এসেছ শুনে লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু এ-হাল তোমার হল কী করে?'

'প্রিটোরিয়ার বাইরে ইস্টার্ন রেলওয়ের[১০] ওপর লড়াইটার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'লড়তে লড়তে তিনজন দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলাম। দুজন মারা গেল, আমি কাঁধে

হাতিমারা বুলেটের চোট খেলাম। ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলাম বেশ কয়েক মাইল, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

‘জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলাম রাত হয়েছে। ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কাঁপছে। বরফ পড়া ঠান্ডায় এত কষ্ট হয় না— ওখানকার সেই রাত-হলেই-বিতিকিচ্ছিরি-ঠান্ডার অভিজ্ঞতা তোমারও আছে, জিমি। খুব কাহিল লাগছিল নিজেকে। দেখলাম পেছনে একটা বড়ো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে বুকে হেঁটে পৌঁছোলাম খোলা দরজায়— সিঁড়ি বেয়ে ঢুকলাম একটা বড়ো ঘরে। চোখে তখন ধোঁয়া দেখছি। অস্পষ্ট মনে আছে ঘরে অনেকগুলো বিছানা পাতা— কেউ কোথাও নেই। আমি একটা লাটঘাট বিছানায় শুয়ে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।

‘ঘুম ভাঙল চেঁচামেচি টানাটানিতে। সকাল হয়েছে। আফ্রিকার সূর্য তেজালো রোদ ঢালছে জানলা দিয়ে। ঘরের সব কিছু অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছে মর্কটের মতো একটা অদ্ভুত লোক— মাথাটা বাল্‌বের মতো প্রকাণ্ড গোল। পেছনে এক দঙ্গল কিম্ভূতকিমাকার লোক দাঁড়িয়ে রগড় দেখছে। এদের দেখেই আমার গা শিরশির করে উঠল। দুঃস্বপ্ন দেখছি কি না বুঝতে পারলাম না। স্বাভাবিক মানুষ কেউ নয়— প্রত্যেকেই বিকৃত, বীভৎস। দোমড়ানো তেউড়োনো হাত পা মুখের এমন চেহারা কোনো জীবন্ত দেহে কখনো দেখিনি। মর্কটের মতো লোকটা বাদামি স্পঞ্জের মতো অদ্ভুত হাত ছুড়তে ছুড়তে আর ডাচ ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল একজন কর্তাব্যক্তি চেহারার মানুষ। কড়া গলায় ডাচ ভাষায় ধমকে উঠে সরিয়ে দিলেন সবাইকে। টানাহ্যাঁচড়ায় আমার কাঁধের ফুটো দিয়ে ফের রক্তপাত ঘটছে দেখে ভদ্রলোক কাছে এসে ইংরেজিতে বললেন, “এখানে এলেন কী করে! ইস বড্ড রক্ত পড়ছে দেখছি! দাঁড়ান, ব্যান্ডেজ করে দিই! কিন্তু আপনি করেছেন কী! এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো ছিল। কুষ্ঠরুগির বিছানায় শুয়ে[১১] রাত কাটিয়েছেন। এটা যে কুষ্ঠ হাসপাতাল!’

‘জিমি, আমার মনের অবস্থাটা তখন কল্পনা করো। পরে শুনলাম, শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে দেখে রুগিদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছিলেন ডাক্তার। এখন ব্রিটিশরা জিতেছে দেখে ফিরে এসেছেন। যাই হোক, দিন সাতেক পরে একটু সেরে উঠে চলে এলাম প্রিটোরিয়ার বড়ো হাসপাতালে।

‘তারপর থেকেই আতঙ্কে ছিলাম, আশা নিরাশায় দুলছিলাম। বাড়ি ফিরে আসার পর কুষ্ঠর লক্ষণ ফুটে বেরোল মুখে। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িছাড়া হতে হবে— কুষ্ঠরুগিদের সঙ্গে আলাদা থাকতে হবে। তাই লুকিয়ে বাড়িতে থাকাই ঠিক করলাম। চাকর দুজন ছাড়া সেবার জন্যে রইলেন মিস্টার কেন্ট— ডাক্তার মানুষ। কাকপক্ষীও যাতে জানতে না-পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল— নইলে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে এমন এক ভয়ংকর পরিবেশে যা ভাবতেও গা ঠান্ডা হয়ে যায়। জানি না বাবা হঠাৎ নরম হল কেন, তোমাদের ডেকে আনল কেন।’

আমাকে দেখিয়ে কর্নেল এমসওয়ার্থ বললেন, ‘এই ভদ্রলোকের জন্যে।’ পকেট থেকে আমার দেওয়া ‘কুষ্ঠ’ লেখা কাগজটা বার করে বললেন, ‘এতই যখন জেনেছেন ভদ্রলোক, তখন বাকিটাও জানা উচিত, এই ভেবে নিয়ে এলাম তোর কাছে।’

আমি বললাম, 'মিস্টার কেন্ট, আপনি কুষ্ঠরোগে বিশেষজ্ঞ?'

একটু শক্ত হয়ে গিয়ে মিস্টার কেন্ট বললেন, 'মামুলি ডাক্তার আমি।'

'আপনার যোগ্যতা নিশ্চয় আছে। তবে কী জানেন, এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামতের দাম আছে। পাছে রুগিকে ঘরছাড়া করতে হয়, এই ভয়ে আপনারা বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হননি।'

'তা ঠিক', সায় দিলেন কর্নেল।

'তা ভেবেই আমি একজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে এনেছি— গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। আমার পুরোনো বন্ধু— বিশ্বাসের পাত্র। নাম, স্যার জেমস সন্ডার্স।

লর্ড রবার্টস[১২] স্বয়ং এসেছেন শুনেও বুঝি এত খুশি হতেন না মিস্টার কেন্ট। বিস্ময় আর আনন্দ উপচে উঠল চোখে-মুখে।

'কর্নেল, চলুন আপনার স্টাডিতে বসে, সব ব্যাপারটা বলছি। ইতিমধ্যে স্যার জেমস এসে দেখুক আপনার ছেলেকে।'

এরপরের কথাগুলো লিখতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে ওয়াটসনের অভাব অনুভব করছি। সে থাকলে বিস্ময়বোধ, উচ্ছ্বাসোক্তি, চতুর প্রশ্ন দিয়ে আমার এই অতি সহজ বিধিবদ্ধ কমনসেন্সের আর্টকে বেশ একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত। সে-উপায় আমার নেই। তাই যেভাবে শুনিয়েছিলাম সস্ত্রীক কর্নেলকে ঠিক সেইভাবেই লিখছি সব কথা।

'কর্নেল এমসওয়ার্থ, সমস্ত অসম্ভব সম্ভাবনা বাদ দেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, তা যত অবিশ্বাস্য উদ্ভটই হোক না কেন— আসলে তাই নির্জলা সত্য। এই সূত্র অনুসারে এ-বাড়িতে গডফ্রে রহস্যর তিনটে ব্যাখ্যা আঁচ করেছিলাম। হয় সে কোনো কুকর্ম করেছে, নয় পাগল হয়ে গিয়েছে, অথবা এমন কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে যার জন্যে তাকে পাঁচজনের থেকে আলাদা করে রাখা দরকার। এখন এই তিনটে সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে করে দেখতে হয় কোনটা সঠিক।

'কুকর্ম সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যেতে পারে। গা-ঢাকা দেওয়ার মতো বড়ো রকমের কোনো অপরাধ করলে আমার কানে সে-খবর আসতই। পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বরং বেশি জোরদার। দরজায় তালা দেওয়া থাকে শুনেই সন্দেহটা বাড়ল। পাগল বলেই তাকে চব্বিশঘণ্টা ঘরবন্দি করে রাখা হয়নি— রাত্রে বন্ধুকে দেখতে এসেছিল সেই কারণেই। একজনকে রাখা হয়েছে পাগলের দেখাশুনা করার জন্যেই। সেই মানুষটা যে কাগজ পড়ছিল, তার সাইজটা মিস্টার ডডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেডিক্যাল জার্নাল 'ল্যানসেট' বা ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের মতো আকারে ছোটো হলেই সন্দেহ আর সন্দেহ থাকত না। কিন্তু পাগলকে আটকে রাখার মধ্যে এত লুকোচুরি কেন? কাজটা তো বেআইনি নয়? তবে?

তাহলে বাকি রইল শেষ সম্ভাবনাটা। সব রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল ওই সম্ভাবনার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠরোগ খুব একাট বিরল রোগ নয়। গডফ্রে হয়তো এই রোগ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। জানাজানি হলেই তাকে কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে আলাদা থাকতে হবে এই ভয়ে জানাশুনো এক ডাক্তারের হেপাজতে বাড়িতেই রাখা হয়েছে— শুধু রাত্রে বাগানে বেড়ায়— কেউ দেখতেও পায় না। এ-রোগে চামড়া সাদাটে হয়ে যায়। প্রমাণটা পেলাম এ-বাড়ি এসে রালফকে চামড়ার দস্তানাপরা হাতে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে যেতে দেখে। নিশ্চয় ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে দস্তানা-পরা হয়েছে। নাকে জীবাণুনাশকের গন্ধ আসতেই দস্তানা শুঁকে দেখলাম অ্যান্টিসেপটিক লাগানো

রয়েছে তাতে। এ-সম্ভাবনাটাই যে একমাত্র সম্ভাবনা, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম বলেই আসবার সময়ে সঙ্গে এনেছিলাম বিশেষজ্ঞকে— আপনাকেও কাগজে লিখে জানিয়েছিলাম মিছে গোপনতা— সব জেনে গিয়েছে। আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘরে ঢুকলেন সুবিখ্যাত চর্মরোগ বিশারদ। এখন আর ততটা গম্ভীর আর কঠোর নন— কৌতুকের রোশনাই ভাসছে চোখে। সোজা এগিয়ে গিয়ে কর্নেলের হাত ধরে বেশ করে ঝাঁকুনি দিলেন।

বললেন, 'সবসময়ে বদ সংবাদ আমি আনি না— ভালো খবরও আনি। যেমন এনেছি এখন। রোগটা কুষ্ঠরোগ নয়।'

'কী বললেন?'

'এ হল ছদ্ম-কুষ্ঠ বা ইকথিয়োসিম। চামড়ার খোসা ওঠা অবস্থা। বড়ো ছ্যাঁচড়া রোগ। কিন্তু সারানো যায় এবং ছোঁয়াচে মোটেই নয়। কিন্তু এ বড়ো অদ্ভুত কাকতালীয় মিস্টার হোমস। কাকতালীয় কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ হচ্ছে আমার। অনেক জিনিসই জানি না আমরা। গডফ্রে এমসওয়ার্থও কি স্রেফ ভয়ে সিটিয়ে থেকে রোগের লক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছে চামড়ায়? কে জানে! আমার বিদ্যেবুদ্ধি অনুসারে অবশ্য— আরে! ভদ্রমহিলা যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন! মিস্টার কেন্ট বরং ওঁর সঙ্গে থাকুন— আনন্দের ধাক্কা কাটিয়ে না-ওঠা পর্যন্ত কাছছাড়া হবেন না।'

টীকা

১. **সাদাটে সৈন্যর সাংঘাতিক সংকট** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যান্চ্‌ড সোলজার' নভেম্বর ১৯২৬-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং আমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার ১৬ অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **কলম হাতে নিয়ে বুঝেছি** : কোনো কোনো গবেষক মনে করেছেন শার্লক হোমসের বকলমে ড. ওয়াটসন কিংবা আর্থার কন্যান ডয়াল লিখেছেন এই গল্পটি। কারণ, হোমসের লেখা হত কাঠখোট্টা প্রবন্ধ-গোছের। তা ছাপা হত কোনো বিশেষ জার্নালে।

৩. **বুয়র যুদ্ধ** : দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজদের জমি দখলের লড়াই। সময় : ১৮৯৯ থেকে ১৯০২। ওলন্দাজ ভাষায় বুয়র (BOER) শব্দের অর্থ কৃষক।

৪. **রাজকীয় অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক** : ১৭৯৪-এ সংগঠিত ইয়োমেনরি ক্যাভালরির নাম ১৯০১-এ বদলে ইম্পিরিয়াল ইয়োমেনরি করে দেওয়া হয়।

৫. **মিডলসেক্স কাহিনি** : মিডলসেক্স (ডিউক অব কেম্ব্রিজ'স হাসার্স) ইয়োমেনরি ক্যাভালরিকে বলা হত মিডলসেক্স কোর। ১৯০১-এ এই বাহিনীর নাম হয় মিডলসেক্স ইম্পিরিয়াল ইয়োমেনরি এবং ১৯০৮-এ ফার্স্ট কাউন্টি অব লন্ডন ইয়োমেনরি।

৬. **প্রিটোরিয়া** : সাউথ আফ্রিকান ট্রান্সভালের পূর্বতন রাজধানী প্রিটোরিয়া শহরের পত্তন ১৮৫৫ সালে বুয়র নেতা আন্দ্রিস প্রিটোরিয়াসের নামে। বুয়র যুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের মর্নিংপোস্ট কাগজের সংবাদদাতা উনিস্টন চার্চিল এই শহরে গ্রেপ্তার হলেও পরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরবর্তীযুগে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্মৃতিচারণে প্রিটোরিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

৭. **ডায়মন্ড হিল** : ব্রিটিশ বাহিনীর প্রিটোরিয়া দখলের ঠিক পরে ১৯০০ সালের ১১ এবং ১২ জুন ডায়মন্ড হিলের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

৮. **তুর্কির সুলতান** : তুর্কির সমসাময়িক সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (১৮৪২-১৯১৪)। ১৮৭৬-এ পূর্ববর্তী সুলতান পঞ্চম মুরাদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগে তার ভাই আব্দুল হামিদ ক্ষমতা দখল করেন।

৯. **ফোন করো** : লন্ডনের প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৮৭৯-তে। ১৯০২ সালে ন্যাশনাল টেলিফোন

কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ২৫০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া পাঁচ হাজারের বেশি পোস্ট অফিসেও টেলিফোন পৌঁছেছিল।

১০. **ইস্টার্ন রেলওয়ে :** খুব সম্ভব ইস্ট আফ্রিকান রেলওয়ে।

১১. **কুষ্ঠরোগীর বিছানায় শুয়ে :** বিশেষজ্ঞরা বলেন, কুষ্ঠরোগীর বিছানায় শুয়ে একরাত কাটালেই যে রোগ সংক্রামিত হবে, সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

১২. **লর্ড রবার্টস :** ফ্রেডরিক স্লে রবার্টস বা ফার্স্ট আর্ল রবার্টস অব কান্দাহার (১৮৩২-১৯১৪), ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ফ্লিড মার্শাল ছিলেন। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহে তাঁর অবদানের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রসে ভূষিত হন।

হলদে হিরের হয়রানি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য মাজারিন স্টোন]

অনেক অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের স্মৃতি মাখানো বেকার স্ট্রিটের ঘরখানিতে ফের দাঁড়িয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল ডক্টর ওয়াটসনের। দেওয়ালে ঝোলানো সায়েন্টিফিক চার্ট, অ্যাসিড-পোড়া কেমিক্যাল-বেঞ্চ, কোণে দাঁড় করানো বেহালার বাক্স আর কয়লা রাখবার ধাতবপাত্রে রাখা পাইপ আর তামাকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকাল হোমসের নতুন ছোকরা চাকর বিলির হাসিহাসি তাজা মুখখানার দিকে। গ্রেট ডিটেকটিভের বিষণ্ণ মূর্তি ঘিরে বিরাজিত একাকিত্ব আর বিচ্ছিন্নতা কিছুটা ভরিয়ে তুলতে পেরেছে এই ছোকরা।

'বিলি, কিছুই দেখছি পালটায়নি। তুই পর্যন্ত একইরকম আছিস। তোমার মনিবও নিশ্চয় তাই?'

শোবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বিলি বললে, 'ঘুমোচ্ছেন।'

অবাক হল না ওয়াটসন। গ্রীষ্মের এমন ফুরফুরে সন্ধ্যায় সাতটার সময়ে ঘুমোনো শার্লক হোমসের মতো বিদঘুটে স্বভাবের লোককেই মানায়।

'হাতে কেস এসেছে নিশ্চয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভীষণ খাটছেন। শরীর না ভেঙে পড়ে। কিছু খাচ্ছেন না। শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছেন। মিসেস হাডসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মিস্টার হোমস, ডিনার খাবেন কখন?" "পরশু সাড়ে সাতটায়", বললেন উনি। হাতে কেস এলে যা করেন আর কি।'

'তা যা বলেছিস।'

'কারো পিছু নিচ্ছেন নিশ্চয়। কালকে বেরিয়েছিলেন বেকার শ্রমিকের ছদ্মবেশে— কাজ খুঁজছেন যেন। আজকে নিয়েছিলেন বুড়ির বেশ। অ্যাদ্দিনে তো অনেক দেখলাম, তবুও চমকে গিয়েছিলাম আজ। ওই দেখুন না বুড়ির ছাতা—' বলে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা একটা বেঢপ মেয়েদের ছাতা দেখিয়ে দাঁত বার করে হেসে ফেলল বিলি।

'কিন্তু কেন, বিলি?'

গলা নামিয়ে বিলি বললে, 'আর কেউ যেন না-শোনে। ক্রাউন ডায়মন্ড কেস!'

'বল কী। লাখ পাউন্ড দামের হিরে চুরির কেস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইম মিনিস্টার[২] আর হোম সেক্রেটারি[৩] পর্যন্ত এসে ওই সোফায় বসে মিস্টার হোমসকে দিয়ে কথা আদায় করেছেন— হিরে বার করে দিতেই হবে। তারপরেই এলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার—।'

'বটে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি খারাপ লোক, স্যার। প্রাইম মিনিস্টার আর হোম সেক্রেটারির মতো মানুষ হয় না। কিন্তু এই লর্ড ক্যান্টলমিয়ারের ব্যাভার ভারি খারাপ। ওঁর বিশ্বাস মিস্টার হোমস একটা ফালতু লোক— হিরে খোঁজের কাজ ওঁকে দেওয়ার একদম ইচ্ছেও নেই। মিস্টার হোমস হেরে গেলেই যেন তিনি বাঁচেন।'

'মিস্টার হোমস তা জানেন তো?'

'যা জানবার, মিস্টার হোমস তা ঠিকই জেনে ফেলেন।

'তাহলে লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকেই বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়বে হোমস। জানলার ওই পর্দাটা কীসের বিলি?'

'দিন তিনেক আগে মিস্টার হোমস ঝুলিয়েছেন। আড়ালে একটা মজার জিনিস আছে।'

ধনুক জানলার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিল বিলি।

আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠত ডাক্তার ওয়াটসন। অবিকল শার্লক হোমসের মতোই একটা নকল মূর্তি একইরকম ড্রেসিং গাউন পরে মুখখানা জানলার দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে যেন একটা অদৃশ্য কেতাব পড়ছে। মুণ্ডুখানা খুলে নিয়ে তুলে ধরল বিলি।

'মাঝে মাঝে মুণ্ডু ঘুরিয়ে বসাই যাতে রাস্তা থেকে দেখলে মনে হয় জ্যান্ত মানুষ মাথা ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছে— খড়খড়ি বন্ধ না-থাকলে কিন্তু হাতও দিই না।'

'বিলি, এর আগেও এই ধরনের জিনিস একবার কাজে লাগিয়েছিলাম[৪]।'

'আমি আসার আগে।' বলতে বলতে জানলার পর্দা সরিয়ে বিলি বললে, ওই দেখুন ওদিকের জানলায় একটা লোক বসে নজর রেখেছে এদিকে।'

ওয়াটসন যেই পা বাড়িয়েছে, অমনি শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল শার্লক হোমসের দীপ্ত শীর্ণমূর্তি। মুখ ফ্যাকাশে, কিন্তু চলনভঙ্গিমা রীতিমতো ক্ষিপ্র, প্রাণবন্ত। এক লাফে জানলায় গিয়ে পর্দা টেনে এনে বন্ধ করে দিল খড়খড়ি।

'বেঘোরে মরবি ছোঁড়া। যা ভাগ! ওয়াটসন, সঙিন মুহূর্তে এসে গেছ দেখছি।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'খুব বিপদে পড়েছি।'

'কীরকম বিপদে?'

'হঠাৎ মৃত্যুর বিপদ! আজ সন্ধ্যা নাগাদ ঘটতে পারে।'

'কী— কী বললে?'

'খুন হয়ে যেতে পারি— একটু পরেই।'

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'ঠাট্টা জিনিসটা অল্পস্বল্পই আছে আমার মধ্যে। তা সত্ত্বেও ঠাট্টা করার দরকার হলে এর

চাইতে ভালো ঠাট্টাই করতাম ওয়াটসন। বোসো, তামাক, মদ যা খুশি খাও। ইদানীং আমার অবশ্য তামাক খেয়েই দিন কাটছে।'

'খাওয়া ছেড়েছ কেন?'

'খেলে রক্ত ব্রেন থেকে পেটে চলে যায় বলে। হজম করানোর জন্যে রক্ত চালান দেওয়ার সময় এটা নয়— আমার পুরোটাই ব্রেন— না-খেলে পুরো ব্রেনটা বেশ চাঙা থাকে— বাদবাকি অঙ্গগুলো এখন শুকিয়ে থাকুক।'

'কিন্তু বিপদটা—।'

'ও হ্যাঁ, সত্যিই যদি খুন হয়ে যাই, খুনির নামধামটা তুমি একটু কষ্ট করে মনে রেখো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়ো আমার শেষ শুভেচ্ছাসহ। নামটা সিলভিয়াস— কাউন্ট নেগ্রেটো সিলভিয়াস— লিখে নাও হে, লিখে নাও। ১৩৬ মুরসাইড গার্ডেন্স, নর্থ ওয়েস্ট। হয়েছে?'

উদ্‌বেগে মুখখানা কীরকম যেন হয়ে গেল ওয়াটসনের। হোমস যে বাড়িয়ে বলছে না, বরং কমিয়ে বলছে বুঝতে পেরে সঙ্গেসঙ্গে নাম-ঠিকানাটা লিখে নিল কাগজে।

বলল, 'হোমস, দিন দুয়েক আমার হাতে কাজ নেই। বলো কী উপকার করতে পারি।'

'ভায়া, তুমি ব্যস্ত ডাক্তার। রুগিদের ভিড় লেগেই থাকে।'

'এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। লোকটাকে গ্রেপ্তার করাচ্ছ না কেন?'

'পারি, কিন্তু করাচ্ছি না বলেই এত দুশ্চিন্তা।'

'কেন?'

'হিরেটা কোথায় এখনও জানি না।'

'ক্রাউন জুয়েল?'

'হ্যাঁ। হলদে হিরে— প্রকাণ্ড সেই মাজারিন হিরে[৫]। জাল পাতাই রয়েছে— হিরে চোরদের ধরেও ফেলব যেকোনো মুহূর্তে— কিন্তু লাভ কী ওয়াটসন? হিরে তো পাব না?'

'জালের মৎস্যদের মধ্যে কাউন্ট সিলভিয়াস বুঝি একজন?'

'শুধু মৎস্য নয়— হাঙর। কামড়ায়। অন্যজন হল বক্সার স্যাম মার্টন। লোক খারাপ নয়— কিন্তু কাউন্টের হাতের পুতুল। হাঙর হয় বাজন মাছ— সহজেই টোপ খেয়ে বসে। গোড়া থেকেই জালে পড়ে তিড়িক-তিড়িক নেচে বেড়াচ্ছে।'

'কাউন্ট সিলভিয়াস এখন কোন চুলোয়?'

'সকালটা তার সঙ্গেই তো কাটিয়ে এলাম বুড়ির ছদ্মবেশে। হাতে ছাতা তুলে দিয়ে আধা-ইটালিয়ান উচ্চারণে কী খাতিরটাই না করল। সহবত জানে ঠিকই, পাক্কা শয়তান যখন আসল রূপ ধরে।'

'বেঁচে গেছ।'

'তা গেছি। পেছন পেছন তো ছিলাম স্ট্রবেনজির কারখানায়— এয়ার গান যে তৈরি করে, সেই স্ট্রবেনজি। রাস্তার ওপারের জানলায় এয়ার গানখানা এখন এই জানলাই তাক করে রয়েছে— যেকোনো মুহূর্তে নকল মূর্তির খাসা ব্রেন ফুটো হয়ে যাবে শব্দহীন একখানা বুলেটের আবির্ভাবে। কী ব্যাপার, বিলি?'

ট্রেতে করে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এসেছিল বিলি। চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরম কৌতুকে হেসে উঠল হোমস।

'আসলি মাল এসে গেছে ওয়াটসন। খোদ কাউন্ট স্বয়ং হাজির। লোকটার বুকের পাটা দেখেছ? বড়ো শিকারে নাম আছে কাউন্টের। আমাকে শিকার করতে পারলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়।'

'পুলিশ ডাকো।'

'ডাকব, পরে। জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখো তো রাস্তায় কেউ ঘুরঘুর করছে কি না।'

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে ওয়াটসন বললে, 'দরজার কাছেই একজনকে দেখা যাচ্ছে।'

'ওই হল স্যাম মার্টন—মাথামোটা পরম অনুগত অনুচর। বিলি, ভদ্রলোক কোথায়?'

'ওয়েটিংরুমে[৬]।'

'আমার ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিয়ে আসবে।'

'আজ্ঞে।'

'আমি ঘরে না-থাকলেও ঘরে বসাবে।'

'আজ্ঞে।'

বিলি বেরিয়ে যেতেই ওয়াটসন বললে, 'হোমস, অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাচ্ছ। লোকটা বিপজ্জনক। মরিয়া। সব করতে পারে। খুনও করতে পারে।'

'করলে অবাক হব না।'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'তাতে পথের কাঁটাই কেবল হবে।'

'তার?'

'না, আমার।'

'তোমাকে ফেলে আমি যাব না।'

'যাবে, ভায়া, যাবে। এ-খেলাও তুমি খেলে যাবে শেষ পর্যন্ত— আমার সঙ্গেই— তবে সামনে থেকে নয়, আড়াল থেকে', বলে নোটবই নিয়ে খসখস করে একটা পাতায় কী লিখে ছিঁড়ে নিয়ে ধরিয়ে দিল ওয়াটসনের হাতে, 'সোজা চলে যাও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে— পুলিশ ডেকে এনে অ্যারেস্ট করিয়ে দাও কাউন্টকে। ততক্ষণ আমি ওকে আটকে রাখছি— এসেছে আমার সঙ্গেই কথা বলতে— ইচ্ছেটা পূরণ করা যাক।'

'সানন্দে যাব।'

'সেই ফাঁকে আমি কথায় কথায় ওর পেট থেকে হিরে কোথায় আছে বার করে নেব।' ঘণ্টা বাজিয়ে দিল হোমস, 'শোবার ঘরে লুকোনো দরজা[৭] দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে চাই হাঙর মহাপ্রভুর সুরতখানা।'

ফাঁকা ঘরে কাউন্টকে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বিলি। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ইতিউতি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল বিরাটকায় কাউন্ট। সত্যিই দর্শনীয় মূর্তি। নাকখানা ইগলপাখির চঞ্চুর মতো। ইয়া কালো গোঁফের নীচে পাতলা দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁটে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। বেশভূষা অত্যন্ত পরিপাটি— কিন্তু চাকচিক্য যেন বড়ো বেশি চোখে লাগে। ফাঁদ পাতা আছে কি না এই সন্দেহে

ইতিউতি তাকিয়ে ভীষণ চমকে উঠল কাউন্ট। চোখ পড়েছে জানলার সামনে রাখা চেয়ারে বসা অবস্থায় শার্লক হোমসের নকল মূর্তির দিকে। কিছুক্ষণ নিথর দেহে নিঃসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর খুনের সংকল্পে কঠিন হয়ে গেল চোয়ালের হাড়, চোখের মণি। ঘরে কেউ নেই দেখে নিয়ে হাতের লাঠিখানা মাথার ওপর তুলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মূর্তির পেছনে। শেষ লাফটা লাফাতে যাচ্ছে এমন সময়ে পেছনের শোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল শ্লেষমাখা হিমশীতল কণ্ঠস্বর :

'ভাঙবেন না, কাউন্ট! ভাঙবেন না!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাউন্ট। ক্ষণেকের জন্যে ফের লাঠি মাথায় তুলে এমনভাবে পা বাড়াল যেন নকল ছেড়ে আসল লোকের মাথাটাই এবার ছাতু করে ছাড়বে। কিন্তু দীর্ঘ মূর্তির ধূসর স্থির চাউনি আর বিদ্রূপমাখা হাসির মধ্যে যেন জাদু ছিল— লাঠি নামিয়ে নিল কাউন্ট।

নকল মূর্তির দিকে পা বাড়িয়ে হোমস বললে, 'জিনিসটা খাসা বানিয়েছে বটে ট্যাভারনিয়ার— ফ্রেঞ্চ মডেল শিল্পী ট্যাভারনিয়ার[৮]। মোমের মূর্তি তৈরি করতে জুড়ি নেই। যেমন এয়ারগান চালাতে জুড়ি নেই আপনার বন্ধু স্ট্রবেনজির।'

'এয়ারগান! মানে?'

'টুপি আর লাঠি পাশের টেবিলে রাখুন। ধন্যবাদ! চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন। রিভলভারটাও বার করুন। চমৎকার! ইচ্ছে হলে রিভলভারের ওপরেই বসতে পারেন। আপনি এসে ভালো করেছেন— কথা ছিল।'

ভীষণভাবে ভ্রূকুটি করে কাউন্ট বললে, 'আপনার সঙ্গেও আমার কথা ছিল হোমস। সেইসঙ্গে ইচ্ছে ছিল মেরে পাট করে দেওয়ার।'

টেবিলে পা তুলে দিয়ে হোমস বলে, 'জানি। কিন্তু হঠাৎ আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কারণটা জানতে পারি?'

'বড্ড বেড়েছেন বলে। পেছনে ফেউ পর্যন্ত লাগিয়েছেন।'

'ফেউ! মোটেই না!'

'বাজে কথা একদম বলবেন না। জোড়া ফেউ পেছনে লাগিয়েছেন।'

'তুচ্ছ ব্যাপার। তার আগে একটা ব্যাপার আপনি শুধরে নিন। আমার নামের আগে উপসর্গটা বলতে ভুলবেন না। চোরচোট্টাদের সঙ্গে কারবার করলেও তারা আমাকে মিস্টার হোমস বলেই ডাকে— আপনি ব্যতিক্রম হতে যাবেন না।'

'মিস্টার হোমস!'

'চমৎকার! এবার বলি, ফেউ বলে যাদের ভুল করেছেন, তারা ফেউ নয়।'

ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে হাসল কাউন্ট।

'অন্যের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, আমার চোখে নয়। গতকাল একটা স্পোর্টিং বুড়ো পেছনে লেগেছিল— আজ একটা বুড়ি। সারাদিন ঘুরেছে পেছন পেছন।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগে ব্যারন ডোসন দুঃখ করে বলেছিলেন— আমি আইনকে যেমন অনেক দিয়েছি, মঞ্চকে তেমনি অনেক বঞ্চিত করেছি। প্রশংসা আপনিও করলেন আমার অভিনয় প্রতিভার। ফেউ দুজন কেউ নয়— আমি!'

'আপনি!'

'ওই তো সোফার গায়ে হেলান দেওয়া রয়েছে ছাতাটা। চিনতে পারছেন? নিজে হাতে করে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন?'

'ইস! যদি জানতাম—'

'তাহলে গরিবের ঘরে আর পায়ের ধুলো দিতে আসতেন না!'

আরও ভ্রূকুটি কুটিল হল কাউন্টের ভয়ানক মুখখানা।

'ব্যাপার আরও ঘোরালো হল। নিজেই স্বীকার করলেন আমার পেছনে লেগেছেন। কেন?'

'আলজেরিয়ায় আপনি সিংহ শিকার করতেন না?'

'করতাম।'

'কেন করতেন?'

'উত্তেজনার জন্যে— বিপদের স্বাদ পাওয়ার জন্যে।'

'সেইসঙ্গে দেশ থেকে উৎপাতকে দূর করার জন্যে, তাই না?'

'তা তো বটেই!'

'সংক্ষেপে— আমার উদ্দেশ্যও তাই।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হিপপকেটে হাত দিল কাউন্ট।

'বসে পড়ুন মশায়, বসে পড়ুন। আমি জানি ওখানে আর একটা পিস্তল আছে। হলদে হিরে কোথায় আছে বলুন।'

কুটিল হেসে চেয়ারে হেলান দিল কাউন্ট।

'তাই নাকি?'

'আপনার পেছনে কেন লেগেছি আপনি জানেন। কতটা আমি জেনেছি জানবার জন্যেই আজ আপনি গরিবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। শুনে রাখুন, আমি সব জানি। শুধু একটা খবর বাদে। এখুনি আপনি তা বলবেন।'

'বটে! বটে! কোন খবরটা জানেন না শুনি?'

'ক্রাউন ডায়মন্ড এখন কোথায়?'

'আমি তার কী জানি?'

'আপনি জানেন।'

'তাই নাকি?'

দুই চোখ ইস্পাত বিন্দুর মতো সূচাগ্র করে হোমস শুধু বললে, 'ধাপ্পা দেবেন না। আমার চোখের সামনে আপনি কাচ ছাড়া কিছুই নয়— ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।'

'তাহলে তো জেনেই ফেলেছেন হিরে কোথায়।'

সকৌতুক হাততালি দিয়ে হোমস বললে, 'তাহলে স্বীকার করলেন আপনি জানেন।'

'কিছুই স্বীকার করিনি আমি।'

'পথে আসুন, কাউন্ট। নইলে বিপদে পড়বেন।'

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কাউন্ট বলল, 'ব্লাফ মেরে যান— কান খোলা আছে।'

কিস্তিমাতের চাল দিতে গিয়ে পাকা দাবা খেলুড়ে যেমন চোখ কুঁচকে তাকায়, সেইভাবে চেয়ে রইল হোমস। তারপর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা নোটবই বার করে বললে :

'এর মধ্যে কী আছে জানেন?'

'না!'

'আপনি!'

'আমি?'

'আজ্ঞে, আপনি! পাতায় পাতায় হাজির আপনার বিপজ্জনক নোংরা জীবনের কীর্তিকাহিনি।'

'হোমস!' দু-চোখ জ্বলে উঠল কাউন্টের। 'আমার সহ্যের একটা সীমা আছে, খেয়াল থাকে যেন!'

'সব পাবেন এর মধ্যে, মিসেস হ্যারল্ডের মৃত্যুর আসল ঘটনা পর্যন্ত— যার ফলে আপনি তাঁর ব্লাইমার এস্টেটের মালিক হয়ে বসে দু-দিনে জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'স্বপ্ন দেখছেন নাকি?'

'মিস মিন্নি ওয়ারেনডারের পুরো জীবনকাহিনিও পাবেন।'

'ছোঃ! অত সোজা নয়!'

'আরও আছে। ১৮৯২ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি রিভিয়েরাগামী ডিলুক্স ট্রেনে ডাকাতির ঘটনা। আর এই দেখুন সেই বছরেই ক্রেডিট লায়নেসে জাল চেকের কারবার।'

'উঁহু, ভুল করলেন ওইখানে।'

'তাহলে ভুল করিনি অন্যখানে! কাউন্ট তাস খেলাটা আপনি ভালোই জানেন। প্রতিপক্ষের হাতে তুরুপের তাস এসে গেলে নিজের হাতের তাস দেখিয়ে দেওয়াই ভালো— সময় বাঁচে।'

'হলদে হিরের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

'অত ছটফট করবেন না! আপনার সব কীর্তিই আমার জানা— এমনকী ক্রাউন ডায়মন্ডের কেসে মাথামোটা ওই লড়াকু স্যাঙাতকে নিয়ে আপনি যা যা করেছেন সমস্ত নখদর্পণে।'

'বটে!'

'হোয়াইট হলে যে-গাড়োয়ান আপনাকে নিয়ে গেছিল, তাকে আমি পেয়ে গেছি। যার গাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, সেও আমার হাতের মুঠোয়। ডায়মন্ড কেসের কাছে আপনাকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে যে দারোয়ান, তার জবানবন্দিও আছে এই খাতায়। ইকি স্যান্ডার্সের কাছে হিরে নিয়ে গেছিলেন কেটে চেহারা পালটানোর জন্যে— ইকি রাজি হয়নি— কিন্তু এখন সে ইনফর্মার হয়ে আমার কবজায় চলে এসেছে! কাজেই, খেলা আপনার ফুরিয়েছে কাউন্ট।'

রগের শিরা ফুলে উঠল কাউন্টের। দু-হাত মুঠো পাকিয়ে কোনোমতে সামলে নিল নিজেকে। কথা বলতে গেল, কিন্তু শব্দ ফুটল না।

হোমস বললে, 'সব তাস দেখিয়ে দিলাম—একটা বাদে। সেটাই কেবল পাচ্ছি না— ডায়মন্ড সাহেব।'

'পাবেনও না।'

'তাই নাকি?' কাউন্ট সিলভিয়াস, তাহলে একটা রফায় আসুন। হিরে না-পেলে বিশ বছর জেল হয়ে যাবে আপনার আর স্যাম মার্টনের। তাতে কোনো লাভ নেই আপনার। কিন্তু হিরে

যদি বার করে দেন— আপনার চুল পর্যন্ত ছোঁব না। এবারকার মতো আমার হিরে দরকার— আপনাকে নয়। কিন্তু পরে যদি বেচাল দেখি—ছাড়ব না।'

'যদি রাজি না হই?'

'বললাম তো, হিরে না-পেলে আপনাকে ধরব।'

দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল বিলি।

'আজকের আলোচনায় স্যাম মার্টনের থাকা দরকার কাউন্ট। বিলি, সদর দরজার সামনে একজন হোঁতকা চেহারার বিচ্ছিরি দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে আসতে বলো।'

'যদি না-আসে?'

'জোর করতে যেয়ো না। শুধু বলো, কাউন্ট সিলভিয়াস দেখা করতে চান।'

বিলি উধাও হতেই কাউন্ট বললে, 'কী করতে চান?'

'ওয়াটসন এতক্ষণ এখানে ছিল। ওকে বলেছি, এখুনি আমার জালে ধরা দিতে দুটো মাছ আসবে। একটা হাঙর, আর একটা বাজন।'

হিপপকেটে হাত দিয়ে চেয়ার ছেড়ে কাউন্ট উঠে দাঁড়াতেই ড্রেসিং গাউনের ভেতর একটা বস্তু আধখানা টেনে বার করল হোমস।

'খামোখা পিস্তলে হাত রাখছেন। আওয়াজ করে আমাকে মারা বিপজ্জনক, আপনি জানেন। ওর চাইতে এয়ার গান অনেক নিরাপদ। গুড ডে, মিস্টার মার্টন। রাস্তাটা বড়ো একঘেয়ে লাগছিল, তাই না?'

হোমসের সৌজন্য হকচকিয়ে দিল মুষ্টিযোদ্ধা স্যাম মার্টনকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইতিউতি তাকিয়ে বুঝতে পারল না জবাবটা কীরকম হওয়া উচিত।

জিজ্ঞেস করল কমরেডকে, 'ব্যাপার কী, কাউন্ট? কী চায় এ?'

কাউন্ট শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে গেল— জবাব দিল হোমস।

'ছোট্ট করে বলছি। খেল খতম।'

কমরেডকেই জিজ্ঞেস করল মার্টন, 'তামাশা করছে নাকি?'

জবাব দিল হোমস, 'তামাশা যে হচ্ছে না, আর একটু পরেই হাড়ে হাড়ে বোঝা যাবে। কাউন্ট সিলভিয়াস, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। শলাপরামর্শ করে ঠিক করুন, ধরা দেবেন, না হিরে দেবেন। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বেহালা বাজাচ্ছি— ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আসব।'

কোণ থেকে বেহালা তুলে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল হোমস। পরক্ষণেই শোনা গেল বেহালার তারে ছড়ি টানার করুণ সুর।

উদ্‌বিগ্ন স্বরে মার্টন বললে, 'হিরের খবর জেনে ফেলেছে নাকি?'

'তার চাইতেও বেশি জেনেছে।'

'গুড লর্ড!' মুখ সাদা হয়ে গেল ঘুসিবাজের।

'ইক স্যান্ডার্স ফাঁস করে দিয়েছে।'

'খুন করব।'

'তাতে আমাদের সুবিধে হবে না।'

জুলজুল করে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে মার্টন বললে, 'আড়ি পেতে কথা শুনছে না তো?'

'বেহালা বাজাতে বাজাতে আড়ি পাতা যায়?'

'তা ঠিক। পর্দার আড়ালে কেউ নেই তো? বড়ো বেশি পর্দা এ-ঘরে', বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানলার সামনে ডামি মূর্তিটা দেখে আঁতকে উঠল মার্টন।

'ভয় নেই, ডামি।' অভয় দিল কাউন্ট।

'তাই নাকি? সব্বোনাশ! অবিকল ওইরকম! কিন্তু পর্দাগুলো—'

'ধুত্তোর পর্দা! খামোখা সময় নষ্ট হচ্ছে। হিরে না-দিলে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বে হোমস।'

'অ্যাঁ!'

'ছেড়ে দেব যদি হিরে দিই।'

'লাখ লাখ টাকার হিরে দিয়ে দোব!'

'নইলে জেল।'

'ঘরে তো একলা। দুজনে গিয়ে সাবাড় করে দোব?'

'তাতে বাঁচব না। প্রথমত গুলি করে পালাতে পারব না। দ্বিতীয়ত প্রমাণ-টমান নিশ্চয় পুলিশের হাতে পৌঁছে গেছে। ওকী?'

একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল জানলার দিক থেকে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল দুই মূর্তিমান। কিন্তু কেউ কোথাও নেই— চেয়ারে বসানো ডামি মূর্তিটা ছাড়া।

'রাস্তার আওয়াজ', বললে মার্টন। 'তাহলে বলুন এখন কী করা যায়।'

'হিরে আমার কাছেই— চোরা পকেটে। আজ রাতেই পাচার করতে হবে ইংলন্ডের বাইরে— রোববারের মধ্যেই চার টুকরো করতে হবে আমস্টারডামে[৯]। ভ্যান সেডারের খবর এখনও পায়নি হোমস।'

'ভ্যান সেডার তো সামনের হপ্তায় যাবে?'

'তাই কথা ছিল। এখন যেতে হবে পরের জাহাজেই। হয় তুমি নয় আমি হিরে নিয়ে লাইম স্ট্রিটে যাব তার কাছে— এখুনি।'

'কিন্তু চোরা কুঠরি যে এখনও তৈরি হয়নি।'

'না হোক, ঝুঁকি নিতে হবে।' আবার খরখরে চোখে এদিক-ওদিক তাকাল কাউন্ট। আওয়াজটা রাস্তা থেকেই এসেছে— সন্দেহ নেই।

বলল, 'হোমসকে হিরে দোব বলে ভুলিয়ে রাখছি। গর্দভটা হিরে পাবে শুনলে আমাদের জেলে ঢোকাবে না। হিরে হল্যান্ডে পৌঁছে গেলেই আমরা সটকান দেব ইংলন্ডের বাইরে।'

'খাসা প্ল্যান!'

'তুমি যাও— খবর দাও ওলন্দাজটাকে।'

'আঃ, কান ঝালাপালা হয়ে গেল বেহালার আওয়াজে! এদিকে এসো, এই নাও হিরে।'

'আপনার সাহস তো কম নয়। সঙ্গে রেখেছেন।'

'আর কোথাও নিরাপদ নয়— আমার কাছে ছাড়া।'

'আলোয় একটু ধরুন তো— দেখি ভালো করে।'

'এই দেখো।'

'ধন্যবাদ!'

হোমস বলল, 'আমি ওই শোয়ার ঘরে যাচ্ছি। যতক্ষণ না আসি তোমরা নিজেদের নিজেদের মতো থেকো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদের জন্য চূড়ান্ত উত্তর নিয়ে ফিরব।'
এন. গিলবার্ট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২১

চক্ষের পলকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে ছোঁ মেরে এক হাতে হিরে খামচে নিয়ে আরেক হাতে রিভলভার তুলে ধরল হোমস। বিষম বিস্ময়ে টলমলিয়ে উঠল দুই মূর্তিমান— সেই ফাঁকে ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিল হোমস।

'মারপিট করতে যাবেন না— ফার্নিচার চুরমার হয়ে যাবে। প্লিজ! পুলিশ নীচে দাঁড়িয়ে আছে।'

রাগে বিস্ময়ে খাবি খেতে খেতে কাউন্ট বললে, 'আ— আপনি কোত্থেকে—'

'অবাক হচ্ছেন? আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেননি আমিই পর্দার আড়ালে ডামি মূর্তি সরিয়ে

রেখে নিজে বসেছি সে-জায়গায়। নইলে কি এত মন খুলে কথা বলতেন? শোবার ঘর থেকে পর্দার আড়াল পর্যন্ত দোসরা পথ আছে একটা।'

'কিন্তু বেহালার বাজনা—'

'আরে ছ্যাঃ! ওটা তো গ্রামোফোন[১০] বাজছে! বাজুক গে! আধুনিক আবিষ্কারের কত সুফল দেখছেন।'

হুড়মুড় করে এক পাল পুলিশ ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে আসামিদের তুলে সদলবলে সবাই উধাও হতেই ঘরে ঢুকল বিলি। হাতে ট্রে। ট্রে-র ওপর একটা কার্ড।

'লর্ড ক্যান্টলমিয়ার এসেছেন।'

ঘরে তখন ওয়াটসন। চোখ মটকে হোমস বললে, 'লোকটাকে একটু শিক্ষা দোব। হিরে পেয়েছি বলতে যেয়ো না।— বিলি, নিয়ে এসো।'

ঘরে ঢুকল কালো জুলপিওলা বেঁটেখাটো শুকনো চেহার শ্লথচরণ এক ভদ্রলোক— গোল কাঁধের সঙ্গে এহেন চেহারা যেন মানাচ্ছে না।

সোল্লাসে বললে হোমস, 'আসুন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার। বাইরে কনকনে শীত, তাই না? ওভারকোটটা খুলে দোব?'

'ধন্যবাদ। কোট খুলব না।'

নাছোড়বান্দার মতো কোটের হাতায় হাত রাখল হোমস।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন লর্ড মশায়, 'আমি এখানে বসতে আসিনি। আপনার গাঁয়ে-মানে-না-মোড়লগিরি দেখতে এসেছি।'

'কাজটা খুবই কঠিন।'

'জানতাম— ল্যাজেগোবরে হবেন আমি জানতাম।'

'সত্যিই স্যার, হাবুডুবু খেয়ে মরছি।'

'তা আর বলতে।'

'একটা ব্যাপারে একদম খেই পাচ্ছি না। একটু বুদ্ধি দেবেন?'

'বড্ড দেরিতে চাইলেন বুদ্ধিটা। বলুন।'

'চোর ধরবার পর কেস ঠিক সাজিয়ে ফেলব।'

'আগে ধরুন।'

'তা ঠিক। কিন্তু হিরে যে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কী হবে?'

'হিরে তার কাছে পাওয়া গেছে— এইটাই মোক্ষম প্রমাণ।'

'তখন তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে?'

'অবশ্যই।'

হোমস বড়ো একটা হাসে না[১১]— কিন্তু সেদিন ওইরকমই একটা আওয়াজ শুনতে পেল ওয়াটসন!

'মাই ডিয়ার স্যার, তাহলে দুঃখের সঙ্গে আপনাকে গ্রেপ্তার করার কথাই বলতে হয়।'

ভীষণ রেগে গেলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার। পাণ্ডুর গাল লাল হয়ে গেল ভেতরের আঁচে।

'মিস্টার হোমস, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনার ক্ষমতায় কোনোদিনই আস্থা আমার ছিল না— পুলিশই পারবে হিরে উদ্ধার করতে— আপনি নন। চললাম।'

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, 'সে কী! কিছুক্ষণের জন্যে হিরে কাছে রাখার চাইতেও বড়ো অপরাধ হল চলে যাওয়া।'

'অসহ্য! যেতে দিন!'

'ওভারকোটের ডান পকেটে হাত দিন।'

'কী বলতে চান?'

'যা বলছি করুন।'

পর মুহূর্তে বেবাক বোকার মতো কাঁপা হাতে প্রকাণ্ড হলদে হিরে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল লর্ড মশায়।

বলল তোতলাতে তোতলাতে, 'একী! একী! এ আবার কী মিস্টার হোমস!'

'খুব খারাপ অভ্যেস লর্ড ক্যান্টলমিয়ার, খুব খারাপ অভ্যেস। গাড়োয়ানি ইয়ার্কির অভ্যেসটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না— একটু নাটক করার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারি না— ওয়াটসন জানে আমার এই দুর্বলতা। হিরেটা আমিই রেখেছিলাম আপনার পকেটে।'

সবিস্ময়ে একবার হিরে আরেকবার হোমসের হাসি উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে লর্ড বলল, 'ইয়ার্কির সময় যদিও এটা নয়— ইয়ার্কির এই প্রবৃত্তিটাও অসুস্থ— বিকৃত— তাহলেও মিস্টার হোমস, আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে এক্ষুনি যা বলেছিলাম, তা ফিরিয়ে নিচ্ছি। শুধু বুঝতে পারছি না মাজারিন হিরে—'

'কী করে পেলাম, পরে শুনবেন। আপনার বন্ধুদের কাছে এই গাড়োয়ানি ইয়ার্কির কাহিনি ফলাও করে বললেই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার, বিলি, লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকে এগিয়ে দিয়ে এসো। আর মিসেস হাডসনকে বলো ঝটপট দুজনের ডিনার দিতে।'

টীকা

১. **হলদে হিরের হয়রানি** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মাজারিন স্টোন' অক্টোবর ১৯২১ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং নভেম্বর ১৯২১ সংখ্যার হার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কয়েকমাস আগে এই কাহিনির ভিত্তিতে 'দ্য ক্রাউন ডায়মন্ড' বা 'অ্যান ইভনিং উইদ শার্লক হোমস' নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৯২১-এর দোসরা মে। ব্রিস্টলের হিপোড্রোমে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের পর প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন মঞ্চে এটি অভিনীত হয়।

২. **প্রাইম মিনিস্টার** : সেই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর্থার জেমস বলফোর (১৮৪৮-১৯৩০)।

৩. **হোম সেক্রেটারি** : চিলস্টনের ফার্স্ট ভাইকাউন্ট, অ্যারিটাস একার্স-ডগলাস ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারি ছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত।

৪. **এই ধরনের জিনিস একবার কাজে লাগিয়েছিলাম** : 'দি এমটি হাউস' গল্পে এই ঘটনা ঘটেছিল।

৫. **মাজারিন হিরে** : জন্মসূত্রে ইতালীয় কার্ডিনাল জুল মাজারিন (১৬০২-১৬৬১) চতুর্দশ লুইয়ের যুবাবয়সে ফ্রান্সের মন্ত্রী ছিলেন। মিলান শহরে পোপের প্রতিনিধি মাজারিনকে ফ্রান্সে পাঠানো ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে কাজিয়ার মীমাংসার মধ্যস্থতা করতে। পরে মাজারিন ফরাসি রাজদূত, অ্যানি অব অস্ট্রিয়ার মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত হন। মাজারিনের

ছিল মহামূল্যবান রত্নের বিশাল সংগ্রহ। নিজের উইলে মাজারিন তাঁর সংগ্রহের বহুলাংশ ফরাসি রাজবংশকে দিয়ে যান। এর মধ্যে ছিল আঠারোটি হিরে। অবশ্য যতদুর জানা যায়, এর মধ্যে একটি হিরেও হলুদ রঙের ছিল না।

৬. **ওয়েটিংরুমে :** বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়িতে ওয়েটিংরুমের উল্লেখ এই একবারই মাত্র পাওয়া গিয়েছে।

৭. **শোবার ঘরে লুকোনো দরজা :** এ-রকম কোনো দরজার উল্লেখও এই প্রথম এবং শেষ।

৮. **ফ্রেঞ্চ মডেল শিল্পী ট্যাভারনিয়ার :** দি এমটি হাউস গল্পের মূর্তিটির ভাস্কর ছিলেন গ্রেনোবলের মঁসিয়ে অস্কার মিনিয়ে।

৯. **আমস্টারডাম :** হল্যান্ডের আমস্টারডাম শহর হিরে কাটাবার বিখ্যাততম স্থান। পৃথিবীর বৃহত্তম হিরে কালিনান এবং ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া কোহিনুর এই শহরেই কর্তিত হয়েছিল।

১০. **গ্রামোফোন :** ওই সময়ে ইংলন্ডে গ্রামোফোন বলতে বার্লিনার-গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার কোম্পানির তৈরি রেকর্ড বোঝা যেত। আমেরিকায় এর প্রচলিত নাম ছিল ফোনোগ্রাফ। এমিল বার্লিনার (১৮৫১-১৯২৯) আমেরিকায় গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

১১. **হোমস বড়ো একটা হাসে না :** 'হোমসিয়ান হিউমার' প্রবন্ধে এ. জি. কুপার লিখেছিলেন হোমসকে হাসতে দেখা গিয়েছে দু-শো বিরানব্বই বার। কিন্তু চার্লস ই. লটারবাখ এবং এডোয়ার্ড এস. লটারবাখ 'দ্য ম্যান হু সেলডম লাফড' প্রবন্ধে হোমসের জোরে হাসি, কাষ্ঠ হাসি, মুচকি হাসি, বাঁকা হাসি, ঠাট্টা করে হাসি প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণিবিভাগ করে দেখিয়েছেন। সব গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে হোমসের হাসির মোট ঘটনা তিনশো ষোলো।

পাণ্ডুলিপির প্যাঁচ[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গেবলস]

থ্রি গেবলস-এর কাহিনি যেরকম অতর্কিত এবং নাটকীয়ভাবে শুরু হয়েছে, শার্লক হোমসের কোনো কাহিনি সেভাবে আরম্ভ হয়নি।

হোমসের সঙ্গে দিনকয়েক মোলাকাত হয়নি বলে জানা ছিল না কী কী রহস্য নিয়ে সম্প্রতি ও মাথা ঘামাচ্ছে। সকালের দিকে তাই ফায়ার প্লেসের দু-পাশে দুটো চেয়ারে বসে ছিলাম দুজনে। হোমসের মুখে ধূমায়িত পাইপ। এমন সময়ে যেন একটা খ্যাপা ষাঁড় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

একটা নিগ্রো। পরনে চোখ ধাঁধানো চেক কোট। জ্বলজ্বলে টাই। চওড়া মুখ আর ধ্যাবড়া নাক সামনে ঠেলে বিষ মাখানো চোখে কটকট করে পর্যায়ক্রমে আমাদের দেখে নিয়ে বললে দাঁতে দাঁত পিষে, 'মাসার হোমস কে?'

স্মিত মুখে পাইপটা হাতে নিল হোমস।

'ওঃ, আপনি!' টেবিল ঘুরে ভয়াবহ ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল দানব নিগ্রো, 'মাসার হোমস, নিজের চরকায় তেল দিন— অন্যের ব্যাপারে কাঠি দিতে যাবেন না, বুঝেছেন?'

'বলে যাও, ফাইন হচ্ছে।'

'ফাইন হচ্ছে!' হিংস্র কণ্ঠে গর্জে উঠল বর্বর কৃষ্ণকায়। 'ফাইন আর থাকবেন না আমি হাত লাগালে— একটু ঝেড়ে দিলেই বুঝবেন ঠেলাটা।'

'দেখুন মি. হোমস, অন্যের ব্যাপারে কাঠি দিতে যাবেন না।
নিজের চরকায় তেল দিন। বুঝেছেন, মি. হোমস?'
হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৬

বলে, গাঁটওলা প্রকাণ্ড থাবার মতো ঘুসি নাড়তে লাগল হোমসের নাকের ডগায়।

খুঁটিয়ে ঘুসিটা দেখল হোমস। বলল, 'পেট থেকে পড়েই এমনি ঘুসি পেয়েছ না, আস্তে আস্তে বাগিয়েছ?'

ফায়ার প্লেস খুঁচোনোর লোহার ডান্ডাটা তুলে নিতে গিয়ে শব্দ করেছিলাম বলেই, না, হোমসের হিমশীতল আচরণের জন্যে কিনা জানি না, নিগ্রো দর্শনার্থীর উগ্রতা স্তিমিত হল যৎসামান্য।

বললে, 'হ্যারোর পথ মাড়াবেন না— হুঁশিয়ার করে গেলাম! আইন আমি এই হাত দিয়ে বানাই— পিণ্ডি চটকে ছাড়ব।'

'তোমার গায়ে বড়ো গন্ধ। অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম, তোমার নামই তো কালসিটে ফেলনেওয়ালা স্টিভ ডিক্সি?'

'হ্যাঁ, আমিই স্টিভ ডিক্সি। চুমু খেয়েছেন কি মরেছেন।'

'পাগল, ওই জিনিসটা মরে গেলেও তোমাকে কেউ দেবে না। হলবর্ন পার্কে[২] পার্কিন্স ছোকরার খুন হওয়ার ব্যাপারে— ও কী! চললে নাকি?'

তড়াক করে লাফিয়ে পেছিয়ে গিয়ে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে চেঁচিয়ে উঠল নিগ্রো দৈত্য, 'মাসার হোমস! মাসার হোমস! পার্কিন্স নিজেই ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছিল, আমি তো ট্রেনিং দিচ্ছিলাম— কিন্তু তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো সে-কথা। তোমাকে আর বার্নে স্টকডেলকে সেইদিন থেকেই চোখে চোখে রেখেছি আমি।'

'মাসার হোমস, রক্ষে করুন—'

'বেরোও!'

'যাই মাসার হোমস। রাগ করলেন না তো?'

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'যার নাম এইমাত্র করলেন।'

'তাকে কে হুকুম করেছে?'

'তা তো জানি না। বার্নে আমাকে বলল— যা, মাসার হোমসকে একটু ডেঁটে দিয়ে আয়। হ্যারো মাড়ালেই জানে খতম হয়ে যাবে বলে চলে আয়। তাই এসেছিলাম।'

বলতে বলতে আবার ঠিক খ্যাপা ষাঁড়ের মতো চক্ষের নিমেষে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল স্টিভ ডিক্সি। খুক খুক করে হেসে উঠে পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল হোমস।

'ডাহা ভীতু, কত সহজে কবজায় আনলাম দেখলে। যেভাবে ডান্ডা বাগিয়ে ধরে ছিল— বেচারার খুলি পাউডার হয়ে যেত আমি না-থাকলে। স্টিভ হল স্পেনসার জন গুন্ডাবাহিনীর মেম্বার— ওর গুরু বার্নের কলজে এর চাইতে মজবুত। টাকা খেয়ে হুমকি দেওয়া আর মারপিট করাই এদের ব্যাবসা!'

'তোমার পেছনে কেন?'

'হ্যারো উইল্ড কেসে পাছে হাত দিই— এই ভয়ে। এই ঘটনার পর হাত দেবই। নিশ্চয় লটঘট ব্যাপার কিছু আছে, নইলে বাড়ি পর্যন্ত চড়াও হত না।'

'কেসটা কী?'

'এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝবে। ইচ্ছে থাকলে চল দুজনে ঘুরে আসি।'

চিঠিখানা এই :

প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস,

এ-বাড়িতে পর-পর এমন অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে যে আপনার পরামর্শ আমার একান্তই দরকার। কালকে যেকোনো সময়ে বাড়িতেই পাবেন আমাকে। উইল্ড স্টেশন থেকে একটু দূরেই আমার বাড়ি। আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবারলি আপনার মক্কেল হয়েছিল এক সময়ে।

আপনার বিশ্বস্ত
মেরি মেবারলি
থ্রি গেবলস, হ্যারো উইল্ড

ট্রেনে চেপে আর সামান্য পথ একটা ঘোড়ার গাড়িতে পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম ইট কাঠ দিয়ে তৈরি বিষণ্ণ চেহারার বাড়িটার সামনে। পেছনে পাইন, সামনে অযত্নবর্ধিত ঘাস। সামনের জানলাগুলোর ওপরে তিনটে খোঁচা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে— থ্রি গেবলস নামটার কিছুটা সার্থকতা শুধু সেইখানেই। বাড়ির ভেতরটা কিছু ভালো ভালো ফার্নিচারে ঠাসা। গৃহকর্ত্রীও বেশ মার্জিতা। প্রৌঢ়া মহিলা।

হোমস বললে, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যাপারে যোগাযোগ ঘটেছিল বটে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার ছেলে ডগলাসের নামও নিশ্চয় শুনেছেন?'

'ডগলাস! লন্ডনের সবাই শুনেছে ও-নাম। দারুণ মানুষ! কোথায় তিনি?'

'স্বর্গে। রোমে চাকরি করতে করতেই নিউমোনিয়ায় মারা গেছে গতমাসে।'

'সেকী! এ-রকম তাজা প্রাণবন্ত মানুষটা... ভাবাও যায় না! ক্ষণজন্মা পুরুষ। স্বল্প জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে যাপন করে গেল।'

'বড়ো বেশি তেজের সঙ্গে, মিস্টার হোমস। তাই ভেঙে পড়ল শেষের দিকে— বুক ভেঙে গেল— দেখলে আর চিনতেও পারতেন না।'

'ভালোবাসার ব্যাপার?'

'হ্যাঁ— এক শয়তানির সঙ্গে— পিশাচিনীর সঙ্গে। যাক গে, ছেলের কথা বলতে আপনাকে আনাইনি।'

'বলুন কী সমস্যা।'

'আমি এই বাড়িটা কিনেছি বছরখানেক আগে। অবসর জীবনযাপন কবর বলে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি। তা সত্ত্বেও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে এই বাড়ি ঘিরে। তিনদিন আগে একজন বাড়ির দালাল এসে এই বাড়ি কিনতে চাইল তার এক মক্কেলের জন্যে। আমি তো অবাক। এ তল্লাটে পাকাবাড়ি অনেক রয়েছে— তা সত্ত্বেও আমার বাড়ি কেন? যাই হোক, দেশভ্রমণের খুব ইচ্ছে আমার। তাই পাঁচশো পাউন্ড দর চড়িয়ে একটা দাম হাঁকলাম— সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেল দালালটা। তারপর বললে, বাড়ির মধ্যে যা কিছু আছে, সব রেখে যেতে হবে তার দামও দেওয়া হবে। ফার্নিচারগুলো ভালোই। তাই মোটা দর হাঁকলাম। রাজি হয়ে গেল লোকটা। এত টাকা একসঙ্গে হাতে পেলে শেষ জীবনটা নিশ্চিন্তভাবে কাটবে ভেবে বেশ আনন্দ হল।

'গতকাল সকালে দলিলের খসড়া রেখে গেল দালাল। আমার উকিল মিস্টার সুত্রো এই অঞ্চলেই থাকেন। দলিল দেখেই তিনি বললেন— বড়ো অদ্ভুত শর্ত দেখছি। এতে সই করলে বাড়ির মধ্যে থেকে খড়কুটো পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি।'

'রাত্রে দালাল এলে বললাম, একী ব্যাপার। আমি তো শুধু ফার্নিচার বিক্রি করব। লোকটা বললে, তা হয় না। মক্কেলের বাতিক বড়ো বিদঘুটে। সব রেখে যেতে হবে। আমি বললাম— তাই কি হয়? আমার গয়নাগাটি কাগজপত্র। দালাল বললে— ঠিক আছে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারেন— কিন্তু যাওয়ার সময়ে সব দেখিয়ে যেতে হবে। আমি খেপে গিয়ে বললাম— তাহলে বাড়ি বেচব না। লোকটা গেল, আমিও ভাবনায় পড়লাম। এ-রকম অদ্ভুত কাণ্ড—'

এই পর্যন্ত শোনবার পর অদ্ভুত একটা বাগড়া পড়ল।

নিঃশব্দে হাত তুলে মিসেস মেবারলিকে নিরস্ত করল হোমস। মার্জার চরণে হেঁটে গেল দরজার কাছে। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে মস্ত চেহারার হাড়সর্বস্ব একটি স্ত্রীলোককে ঘাড় খামচে ধরে এমনিভাবে হিড় হিড় করে টেনে আনল যেন খাঁচা থেকে মুরগি বার করছে— স্ত্রীলোকটাও ঝটপট করতে লাগল খাঁচা থেকে টেনে আনা মুরগির মতোই।

'একী। একী হচ্ছে! ছাড়ুন বলছি!'

'সুশান! ওখানে কী করছিলে?'

'এঁরা লাঞ্চ খাবেন কি না জিজ্ঞেস করতে আসছি, অমনি এই ভদ্রলোক—'

হোমস বললে, 'পাঁচ মিনিট ধরে তোমার সোঁ-সোঁ করে নিশ্বেস নেওয়ার শব্দ আমি শুনেছি সুশান।'

সুশানের মুখের রং পালটে গেল এই কথায়। তা সত্ত্বেও তেড়ে উঠে বললে, 'আমার ঘাড় আপনি ধরার কে?'

'ধরেছি সামনাসামনি একটা জিনিস ভজিয়ে নেব বলে। মিসেস মেবারিল, আপনি আমাকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন— এ-কথা কাউকে বলেছেন?'

'না।'

'চিঠি ডাকবাক্সে কে ফেলেছিল?'

'সুশান।'

'সুশান, চিঠির কথা তুমি কাকে জানিয়েছিলে?'

'কাউকে না।'

'সোঁ-সোঁ করে যারা নিশ্বেস নেয়, তারা বেশিদিন বাঁচে না, সুশান। কেন মিথ্যে বলছ?'

'সুশান,' গর্জে উঠলেন মিসেস মেবারলি, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি ঝোপের আড়ালে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে।'

'সে অন্য কথা,' বেপরোয়া সুর সুশানের। 'আমার ব্যাপার—'

'যাকে বলছিলে তার নাম বার্নে স্কটডেল,' বলল হোমস।

'জানেনই তো জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'সঠিক জানতাম না— এখন জানলাম। দশ পাউন্ড দোব সুশান— বলে ফেলো বার্নেকে কে পাঠিয়েছে।'

'যে পাঠিয়েছে সে আপনার এক একটা দশ পাউন্ডের বদলে হাজার পাউন্ড দিতে পারে।'

'এতই টাকার জোর ভদ্রলোকের? ভদ্রলোক নন— মিটিমিটি হাসছ দেখছি— ভদ্রমহিলা। যাক, অনেক কথাই তো বললে, এবার নামটা বলো— দশ পাউন্ড নিয়ে যাও।'

'জাহান্নমে যান।'

'সুশান, মুখ সামলে কথা বলো!' কড়া গলা মিসেস মেবারলির।

'আপনার চাকরির কাঁথায় আগুন! ঢের সয়েছি, আর না— চললাম। কাল লোক পাঠিয়ে দোব— আমার জিনিসপত্র দিয়ে দেবেন।' বলেই দরজার দিকে ছিটকে গেল সুশান।

'গুডবাই সুশান'— দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সহজ সুরে হোমস বললে, 'কত তাড়াতাড়ি

গুন্ডার দলটা কাজ চালিয়ে গেছে দেখুন; আপনার চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায়— আমার কাছে এদের শাসানি পৌঁছে গেছে আজ সকাল এগারোটায়। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সুশান খবর পাঠিয়েছে নাটের গুরু সেই ভদ্রমহিলাকে— ভদ্রমহিলাই বলব, কেননা ভদ্রলোক বলায় সুশান ফিক করে হেসে ফেলেছিল আমিও গোড়ায় গলদ করছি দেখে। ভদ্রমহিলা ব্ল্যাক স্টিভকে পাঠিয়েছেন আমাকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে।

'কিন্তু ওরা চায় কী?'

'সেইটাই তো প্রশ্ন। এ-বাড়ি আগে কার ছিল?'

'একজন রিটায়ার্ড সী-ক্যাপ্টেনের।'

'ভদ্রলোক সম্বন্ধে আশ্চর্য কোনো খবর জানেন?'

'আমি অন্তত জানি না।'

'কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখেনি তো! আজকাল অবশ্য গুপ্তধন রাখতে হলে পোস্টঅফিসের ব্যাঙ্কেই রাখা হয়। তবে কিছু পাগল-ছাগল আছে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করতে না-পারলে ঘুম হয় না। কিন্তু গুপ্তধনই যদি হবে তো ফার্নিচার নিতে চাইবে কেন? নিশ্চয় র‍্যাফেলের ছবি[৩] বা শেক্সপিয়রের পাণ্ডুলিপি এখানে নেই?'

'মোটেই না। ক্রাউন ডার্বি টি সেট[৪] ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'সেজন্যে এত ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে রহস্য সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না। টি-সেটই যদি দরকার হবে তো সোজাসুজি বললে পারত? সরাসরি দাম হেঁকে শুধু ওই বস্তুটাই কিনতে চাইত। বাড়িসুদ্ধ জিনিস নিতে যাবে কেন? মিসেস মেবারলি, আমার মনে হয় ওরা এমন একটা জিনিসের দখল চায় যেটা আপনি জানেন না আপনার কাছে আছে— জানলে প্রাণ গেলেও হাতছাড়া করবেন না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বললাম আমি।

'ডাক্তার ওয়াটসন একমত আমার সঙ্গে।'

'জিনিসটা তাহলে কী হতে পারে, মিস্টার হোমস?' শুধোন মিসেস মেবারলি।

'দেখাই যাক না মানসিক গবেষণা করে তার হদিশ পাওয়া যায় কি না। এ-বাড়িতে এক বছর আছেন?'

'প্রায় বছর দুয়েক।'

'আরও ভালো। এতদিনে কেউ আপনার কাছে কিছু চায়নি— হঠাৎ তিন চার দিনের মধ্যে উঠল বাই তো কটক যাই অবস্থা হল— জিনিসটা ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার। কী মনে হয় এতে?'

'জিনিসটা খুব সম্প্রতি বাড়িতে এসেছে,' বললাম আমি।

'আবার একমত হওয়া গেল ডাক্তারের সঙ্গে।' বললে হোমস। 'মিসেস মেবারলি, দিন কয়েকের মধ্যে নতুন কী জিনিস এ-বাড়িতে পৌঁছেছে?'

'কিছু না। এ-বছর নতুন কিছুই কিনিনি।'

'তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাহলেও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যাক। আপনার এই উকিল ভদ্রলোক খুব কাজের লোক?'

'খুবই।'

'সুশান ছাড়া আপনার আর কোনো ঝি আছে?'

'একটা বাচ্চা মেয়ে আছে।'

'মিস্টার সুত্রোকে দু-এক রাত এ-বাড়িতে থাকতে বলুন। আপনাকে আগলানো দরকার[৫]!'

'কার খপ্পর থেকে?'

'এখনও জানা নেই— ওদের উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারলে সেইদিক থেকে নাটের গুরুর হদিশ বার করে ফেলতাম। দালালটার ঠিকানা কী?'

'কার্ডেতে শুধু নাম আর পেশা লেখা আছে। হেন্স-জনসন, নিলামদার।'

'ডিরেক্টরি[৬] হাঁটকেও ঠিকানা পাব না। সৎ কারবারিরা কখনো কারবারের ঠিকানা লুকিয়ে রাখে না। মিসেস মেবারলি, নতুন কিছু ঘটলে জানাবেন— আমি রইলাম আপনার পেছনে।'

হল ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়ে শ্যেনচক্ষু হোমসের নজরে পড়ল এক কোণে বেশ কিছু ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স তাগাড় করা হয়েছে। হোমসের চোখ এড়ায় না কিছুই। বলল, 'বাক্সর গায়ে দেখছি 'মিলানো', 'লুসারেনে[৭]' লেখা রয়েছে? ইটালি থেকে এসেছে।'

'ডগলাসের জিনিসপত্র।'

'এখনও খোলেননি? কদ্দিন এসেছে?'

'দিন সাতেক।'

'সেকী! আপনি যে বললেন দিনকয়েকের মধ্যে কিছুই আসেনি বাড়িতে। নিশ্চয় এর মধ্যে দামি জিনিস কিছু আছে যার জন্যে লোক লেগেছে আপনার পেছনে।'

'দামি জিনিস কী আর থাকবে বলুন। ডগলাস মাইনে পেত সামান্যই।'

একটু ভাবল হোমস। বলল, 'আর দেরি করবেন না। সব জিনিস ওপরতলায় আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যান। খুলে দেখুন কী আছে। আমি কাল আসছি।'

থ্রি গেবলস-কে যে খর নজরে রাখা হয়েছে, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলাম রাস্তায় বেরোতেই। মোড়ের মাথায় গাছের ছায়ায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা দানব নিগ্রোর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম আচমকা। সঙ্গেসঙ্গে পকেটে হাত দিল হোমস।

'মাসার হোমস কি পিস্তল বার করছেন?'

'না হে; সেন্টের শিশি বার করছি।'

'আপনি বড়ো মজার লোক, মাসার হোমস।'

'স্টিভ, আমি যদি তোমার পেছনে লাগি, খুব বেশি মজা আর পাবে না। সকালে সাবধান করেছি, খেয়াল নেই দেখছি।'

'খুব খেয়াল আছে মাসার হোমস। সেইজন্যেই তো এসেছি আপনার কাজে লাগতে— মাসার পার্কিন্সের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে নয়।'

'তাহলে বলো তো বাপু কে তোমাদের এ-কাজে নামিয়েছে?'

'মাসার হোমস, ভগবানের দিব্যি আমি জানি না। বার্নির হুকুমে নেমেছি— এর বেশি জানি না।'

'স্টিভ, মনে থাকে যেন ও-বাড়ির ভদ্রমহিলা আর সব কিছুর দেখাশুনার ভার এখন আমার ওপর।'

'মনে থাকবে, মাসার হোমস।'

কিছু দূরে এসে হোমস বললে, 'পালের গোদাটির নাম জানা থাকলে ব্ল্যাক স্টিভ এখন তাঁর সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসত। স্পেনসার জনের দলের লোকজনদের মতিগতি আমি জানি। ওয়াটসন, এ-কেসে ল্যাঙ্গডেল স্পাইকের সাহায্য দরকার। চললাম সেইখানে।'

'আমি বলছি, মিস্টার হোমস। যদিও বলবার মতো তেমন কিছু নেই।

সারাদিন আর টিকি দেখা গেল না হোমসের। আমি জানি ও যার কাছে গেছে, তার কাছ থেকে শহরের নোংরা কেলেঙ্কারির কিছু খবর ও আনবেই। ল্যাঙ্গডেল স্পাইক লোকটা চার অঙ্কের মোটা টাকা রোজগার করে পত্রিকায় ফি হপ্তায় কদর্য কুৎসা পরিবেশন করে। এ-ব্যাপারে একযোগে সে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার। হোমস তার কাছে কেলেঙ্কারি কাহিনি মাঝে মাঝে পৌঁছে দেয়— বিনিময়ে নতুন খবর সংগ্রহ করে। কেলেঙ্কারি কাহিনির এহেন ডিপো থেকে রিক্তহস্তে যে সে ফেরেনি, তা বুঝলাম পরের দিন সকালে দেখা হওয়ার পর হাবভাব দেখে। কিন্তু তার পরেই এল টেলিগ্রামের আকারে একটা বিরাট বিস্ময় :

'এখুনি আসুন। মক্কেলের বাড়িতে রাতে চোর পড়েছিল। পুলিশ এসেছে।'

শিস দিয়ে উঠল হোমস, 'দেখলে তো ওয়াটসন, নাটকের গুরুটি বেশ করিতকর্মা ব্যক্তি। তোমাকে ওখানে রাত কাটাতে না-বলে খুব ভুল করেছি— সুত্রো লোকটা কোনো কাজের নয়। যাক গে, নাটক যখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে, তখন থ্রীরো উইন্ডে আবার না-গেলেই নয়।'

এবার পৌঁছে দেখলাম বিষণ্ণ বাড়িটার সামনে এক পাল নিষ্কর্মা লোকের ভিড়, জানলা আর ফুলের ঝোপ পরীক্ষা করছে পুলিশ কনস্টেবল। বাড়ির ভেতর আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন পক্ককেশ এক বৃদ্ধি ভদ্রলোক— মিস্টার সুত্রো। পুলিশ ইনস্পেকটর হোমসের পুরোনো বন্ধু[৮]। সোল্লাসে বললেন, 'এক্সপার্টের দরকার হবে না। ছিঁচকে চুরি। হাড়হাবাতে পুলিশই সামলাতে পারবে।'

'ছিঁচকে চুরি?' হোমসের প্রশ্ন।

'একেবারে। চোর কারা, তাও জানা হয়ে গেছে। বার্নে স্টকডেলের দলবলের কাজ— নিগ্রোটাকেও দেখা গেছে ধারেকাছে।'

'চমৎকার! কী চুরি গেল?'

'তেমন কিছু না। মিসেস মেবারলিকে ক্লোরোফর্ম করে— ওই যে, এসে গেছেন উনি।'

ঝিয়ের কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে ঘরে ঢুকলেন মিসেস মেবারলি— 'মিস্টার হোমস আপনার কথা শুনিনি বলেই এই কাণ্ড ঘটল। মিস্টার সুত্রোকে আর কষ্ট দিতে চাইনি কাল রাত্রে।'

'আজ সকালেই শুনলাম আপনার নির্দেশ', বললেন মিস্টার সুত্রো।

'খুব ক্লান্ত দেখছি আপনাকে', বললে হোমস। 'কী ব্যাপার খুলে বলতে পারবেন?'

মোটকা নোটবই ঠুকে ইনস্পেকটর বললেন, 'এর মধ্যেই সব পাবেন।'

'ওঁর মুখে শুনতে চাই— যদি খুব ক্লান্ত বোধ না-করেন।'

'আমি বলছি, মিস্টার হোমস। যদিও বলবার মতো তেমন কিছু নেই। বাড়িতে চোর ঢোকানোর ব্যবস্থাটা নিশ্চয় সুশানের কীর্তি। নাকে ক্লোরোফর্ম দেওয়ার পর জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরে আসার

পর দেখলাম বিছানার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে। আর একজন হাতে করে কী তুলছে ছেলের ব্যাগের মধ্যে থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরলাম তাকে। অন্য লোকটা নিশ্চয় তখন মেরে ফের অজ্ঞান করে দেয় আমাকে। আওয়াজ শুনে মেরি দৌড়ে এসে চেঁচামেচি করে পুলিশ ডাকে— চোর পালায় তার আগেই।'

'কী নিয়ে গেছে?'

'তেমন কিছু নয়। ডগলাসের বাক্সে ব্যাগে দামি কিছু ছিল না।'

'সূত্র কিছু ফেলে গেছে চোরেরা?'

'যে-লোকটাকে জাপটে ধরেছিলাম, তার হাত থেকে একটা কাগজ খামচে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম বোধ হয়— মেঝেতেই পড়ে ছিল দলা পাকানো অবস্থায়। ছেলের হাতে লেখা কাগজ।'

'তার মানে কোনো কাজে আসবে না। চোরেদের হাতের লেখা থাকলে একটা কথা ছিল', বললেন ইনস্পেকটর।

'ঠিক বলেছেন। তবুও কাগজটা দেখতে চাই।'

নোটবই থেকে ভাঁজ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজটা বার করতে ইনস্পেকটর বললেন, 'পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, আঙুলের ছাপ-টাপ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়।'

কাগজ দেখে হোমস বললে, 'আপনি কী পেয়েছেন এ থেকে?'

'অদ্ভুত একটা নভেলের উপসংহার বলেই মনে হল।'

'উপন্যাসের উপসংহার তো বটেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখছেন না, দু-শো পঁয়তাল্লিশ। আগের দু-শো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা কোথায়?'

'চোরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। নিয়ে যাওয়াই সার হবে— লাভ হবে অষ্টরম্ভা।'

'অদ্ভুত, গল্প চুরির জন্যে বাড়িতে চোর ঢোকাটা একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

'তাড়াহুড়োর মাথায় হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে সটকেছে', বললেন ইনস্পেকটর।

'কিন্তু আমার ছেলের জিনিসের ওপর নজর পড়লে কেন?' মিসেস মেবারলির প্রশ্ন।

'নীচের তলায় কিছুই পায়নি বলে।' ইনস্পেকটরের জবাব।

হোমস বললে, 'ওয়াটসন, জানলার কাছে এসো। পড়া যাক কাগজটা।'

আলোয় দাঁড়িয়ে পড়লাম একটা বাক্যের মাঝখান থেকে আশ্চর্য কয়েকটা কথা।

'... দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল মুখের কাটা ছেঁড়া থ্যাঁতলানো জায়গাগুলো দিয়ে। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত রুধিরপ্লাবিত হৃদয়ের তুলনায় মুখের ক্ষত কিছুই নয়। হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানির সহসা পরিবর্তন দেখে... সেই মুখ... যে-মুখের জন্যে জীবন পর্যন্ত নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারত সে, সেই মুখ তার দিকে চেয়ে... তার যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসল... হাসির মধ্যে ফুটে উঠল হৃদয়হীনার হায়নাহাসি... পিশাচিনীর নিষ্করুণ উল্লাস... সেই মুহূর্তেই... হ্যাঁ, হ্যাঁ... সেই মুহূর্তেই নির্মম ওই হাসি দেখেই প্রেম মারা গেল তার হৃদয়ের মধ্যে— জন্ম নিল ঘৃণা। মানুষ কিছু নিয়ে বাঁচতে চায়। আমিও বাঁচব। প্রতিহিংসার অনলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে বাঁচব। তোমার প্রেম পাইনি প্রেয়সী, পাইনি তোমার বাহুবন্ধন— কিন্তু তোমার কীর্তিকাহিনি ফাঁস করে দেওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকবে এই অধম।'

'চমৎকার ব্যাকরণ!' মৃদু হেসে কাগজটা ইনস্পেকটরের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে হোমস, 'সে' আর 'তার' কীরকম শেষের দিকে আবেগের মাথায় 'আমি' হয়ে গেল লক্ষ করেছেন? চরম মুহূর্তে নিজেকেই নাটকের নায়ক কল্পনা করে বসেছে লেখক।'

'লেখার যা ছিরি,' কাগজটা নোটবইতে রাখতে রাখতে মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর। 'একী! চললেন নাকি, মিস্টার হোমস?'

'যোগ্য ব্যক্তির হাতে তদন্তভার যখন রয়েছে, আমার আর থাকার দরকার নেই। মিসেস মেবারলি, আপনি দেশভ্রমণ করতে চাইছিলেন না?'

'অনেক দিনের সাধ।'

'কোথায় যেতে চান? কায়রো? মাদিরা? রিভিয়েরা?'

'টাকা থাকলে পৃথিবীটা ঘুরে আসতাম।'

'বেশ, বেশ, পৃথিবী ঘুরতে চান। ঠিক আছে, সুপ্রভাত সবাইকে। সন্ধে নাগাদ আমার চিঠি পেতে পারেন।' বেরিয়ে আসার সময়ে ইনস্পেকটরের ঠোঁটের কোণে হাসিটুকুর মানে মনে হল এইরকম— সেয়ানা হলেই কি এমনি মাথাপাগলা হতে হয়?

লন্ডন পৌঁছে হোমস বললে, 'এ-ব্যাপারের এখুনি নিষ্পত্তি করা দরকার। ইসাদোরা ক্লিনের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে একা দেখা করা নিরাপদ নয়— তুমিও চলো, সাক্ষী থাকবে।'

গাড়ি নিয়ে চললাম গ্রসভেনস স্কোয়ারের দিকে। কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকার পর আচমকা যেন জেগে উঠে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, সব বুঝেছ নিশ্চয়?'

'নাটের গুরুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছ— এ ছাড়া কিছু বুঝিনি!'

'ঠিক, ঠিক। ইসাদোরা ক্লিন নামটা শুনেও কিছু বুঝলে না? এ সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ বিউটি— যার পূর্বপুরুষরা পুরুষানুক্রমে পারনামবুকোতে[১] সর্দারি করে গেছে— যে হঠাৎ কুবের হয়ে গিয়েছিল জার্মান চিনি সম্রাট ক্লিনকে বিয়ে করার পরেই বিধবা হওয়ার পর। তারপর থেকেই ঘরোয়া প্রেমে বুঁদ হয়েছিল বিখ্যাত বিউটি— একাধিক পুরুষের সঙ্গে। পার্মানেন্ট প্রেমিক এ-জাতীয় মেয়েরা রাখে না— ধরে আর ছাড়ে— শখ মিটে গেলেই ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ডগলাস মেবারলি সোসাইটি প্রজাপতি না হয়েও এর জালে জড়িয়ে গিয়েছিল রূপের টানে অন্ধ পোকার মতো।'

'উপন্যাসটা তাহলে ডগলাসের নিজের?'

'এই তো বেশ জোড়াতালি লাগিয়ে ফেলছ। ইসাদোরা ডিউক অফ লোমোন্ডকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনলাম— যদিও ছেলের বয়সি। ভাবী শাশুড়ি মানিয়ে নিলেও কেলেঙ্কারির মুখ চাপা দেওয়া যাবে না।— এসে গেছি!'

ওয়েস্ট এন্ডের ভারি চমৎকার একটা কোণের বাড়ির সামনে এসে নামলাম দুই বন্ধু। যন্ত্রবৎ একজন ফুটম্যান হোমসের কার্ড ভেতরে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে এনে দিয়ে বললে, 'ভদ্রমহিলা বাড়ি নেই।' হোমস হৃষ্টকণ্ঠে বললে, 'তাহলে ফিরে না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

শুনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যন্ত্র।

খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'বাড়ি নেই মানে আপনার জন্যে নেই।'

'তোবা! তোবা! তাহলে আর অপেক্ষা করতে হবে না। এই চিঠিটা গিয়ে দাও তোমার মনিবানিকে।'

নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে হোমস শুধু লিখল, 'তাহলে কি পুলিশ আসবে? ফুটম্যান বিদেয় হতেই মুচকি হেসে আমাকে বললে, 'দেখো না কীরকম কাজটা হয়।'

হলও বটে— অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে অতিশয় ঝটপট ফলটা ফলে গেল। এক মিনিটও গেল না, আরব্যরজনীর উপন্যাস বর্ণিত একখানা দারুণ জমকালো ড্রয়িং রুমে সাদরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। ঘরে আলো আর আঁধারির খেলা— মাঝে একটা গোলাপি রঙের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। বিখ্যাত বিউটিটিকে দেখে এইটুকুই বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা এমন একটা বয়সের সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছেন যে-বয়সে পৌঁছে বিশ্বসুন্দরীরাও আলো আঁধারির মধ্যে থাকতে চায়। আমরা ঘরে ঢুকতেই রানির মতো দীর্ঘতনু সোফা থেকে সিধে করে মুখোশসদৃশ অপরূপ আননে গাঁথা ওয়ান্ডারফুল একজোড়া স্প্যানিশ চোখে খুন জাগিয়ে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেললেন আমাদের।

নোটবই থেকে ছেঁড়া কাগজটা নাড়তে নাড়তে বললেন তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে, 'মানে কী? এই হামলাবাজির মানেটা কী?'

'মানেটা আপনি ভালোই জানেন। আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে— যদিও ইদানীং বড়ো ভুল করে ফেলছেন— বুদ্ধির ঘটে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।'

'কীভাবে শুনি?'

'আমাকে ভাড়াটে গুন্ডার ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত রাখার চেষ্টা করে। প্রাণের ভয় থাকলে এ-পেশা কেউ নেয় না ম্যাডাম। বিপদকে ভালোবাসে বলেই আসে। আপনিই সেই বিপদের লোভ দেখিয়ে কেসটার মধ্যে আমাকে টেনে এনেছেন।'

'কী বলছেন বুঝছি না। ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

ক্লান্ত ভঙ্গিমায় দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হোমস বললে, 'সত্যিই আপনার বুদ্ধির ঘট শূন্য হতে চলেছে। চললাম।'

'দাঁড়ান! কোথায় যাচ্ছেন?'

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে।'

কয়েক পা যেতে-না-যেতেই ইসাদোরা ঝড়ের বেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। চক্ষের নিমেষে স্টিল হয়ে গেল ভেলভেট।

'আসুন, বসুন। খোলাখুলি কথা বলা যাক। বন্ধুরূপে পেতে চাই আপনাকে।'

'কথা দিতে পারছি না। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমি নই। যা বলবার বলুন, তারপর বলব আমি কী করব।'

'আপনি খাঁটি ভদ্রলোক। বুকের পাটাও আছে। আপনাকে ভয় দেখাতে যাওয়াটা বোকামো হয়েছে।'

'আসল বোকামি হয়েছে একদল রাসকেলের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। ওরা এখন হয় ব্ল্যাকমেল করবে আপনাকে, নয় সব ফাঁস করে দেবে।'

'অত প্রাণখোলা আমি নই, মিস্টার হোমস। বার্নে স্টকডেল আর সুশান ছাড়া কেউ জানে

না আমিই ওদের কাজে নামিয়েছি। ওরা তো এ-রকম কাজ এই প্রথম করছে না'— চোখ টিপে বড়ো সুন্দরভাবে ইঙ্গিত করে কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখলেন পরমাসুন্দরী ইসাদোরা।

'তাই বলুন। এর আগেও ওদের কাজে লাগিয়েছেন।'

'নিঃশব্দে কাজ সারতে ওদের মতো দুঁদে হাউন্ড আর হয় না।'

'এরাই আবার ঘুরে কামড়ে দেয় যে লেলিয়ে দেয় তাকেই। চুরির চার্জে শিগ্‌গিরই ধরা পড়বে প্রত্যেকেই— পুলিশ পেছনে লেগেছে।'

'লাগুক। ওরা মুখ বুজে থাকতে জানে। টাকা খায় সেইজন্যেই।'

'কিন্তু আমি যদি মুখ খুলিয়ে দিই?'

'আপনি দেবেন না। আপনি ভদ্রলোক। মেয়েদের গোপন কথা গোপনে রাখতে জানেন।'

'তাহলে আগে ফেরত দিন পাণ্ডুলিপিটা।'

খিলখিল করে হেসে উঠে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আগুন খোঁচানোর ডান্ডা দিয়ে একগাদা কালো ছাই নাড়তে নাড়তে ইসাদোরা বললে, 'নিয়ে যেতে পারবেন?'

হোমসের মুখভাব এ-রকম গ্রানাইট কঠিন হতে কখনো দেখিনি।

'আপনার কপালে অনেক দুর্গতি আছে দেখছি। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেললেন।'

ডান্ডাটা ছুড়ে ফেলে ইসাদোরা বললে, 'আপনি বড়ো নির্দয়! শুনবেন সব কথা?'

'আমি বলছি, আপনি শুনুন।'

'না, না, আমার মুখে শুনুন। মেয়েমানুষের স্বপ্নের প্রাসাদ যখন ভেঙে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন এ ছাড়া আর কিছু করার থাকে না, মিস্টার হোমস।'

'প্রথম পাপটা আপনার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বীকার করছি প্রথম পাপ আমার। ডগলাস ছেলেটা ভালো— কিন্তু সে বড়ো বেশি চেয়ে ফেলেছিল আমার কাছে— আমি ভান করেছিলাম যা দেওয়ার নয় তাকে তাই দোব— সে তা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল সে-ই শুধু পাবে আমাকে— আর কেউ নয়। অসহ্য! তাই তাকে সমঝে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'দোরগোড়াতেই গুন্ডা দিয়ে পিটিয়ে?'

'সবই তো জানেন। বার্নে দলবল দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছিল দরজা থেকেই, একটু বাড়াবাড়িই করেছিল অবশ্য। কিন্তু তারপর কী করেছিল জানেন? কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে যা করা উচিত নয়— তাই করেছিল। আমাকে নেকড়ে আর নিজেকে মেষশাবক সাজিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিল। সে-উপন্যাস পড়লেই লোকে জেনে যেত আমার সমস্ত কীর্তিকাহিনি।'

'অধিকার ছিল বলেই লিখেছিল।'

'ইটালির নিষ্ঠুরতা ওর রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। তাই জঘন্য সেই উপন্যাসের দুটো পাণ্ডুলিপি করে একটা আগেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে প্রকাশের আগেই জ্বলে পুড়ে মরি। আর একটা পাঠাত প্রকাশকের কাছে।'

'প্রকাশকের কাছে যে পাঠিয়ে দেয়নি জানলেন কী করে?'

'প্রকাশকের কাছে খোঁজ নিয়ে। এর আগেও অনেক বই ও লিখেছে— প্রকাশকের নাম ঠিকানা জানতাম। তারপরেই হঠাৎ খবর এল, ইটালিতে মারা গেছে ডগলাস। লোক লাগালাম

পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করার জন্যে— জানতাম মালপত্র মায়ের কাছে ফেরত আসবেই। প্রথমে সোজা আঙুলে ঘি তুলতে চেয়েছিলাম— পাণ্ডুলিপিসমেত পুরো বাড়িটা যেকোনো দামে কিনে নিতে চেয়েছিলাম। যখন পারলাম না, তখন আঙুল বাঁকাতে হল। মিস্টার হোমস, বলুন, এ ছাড়া আমার করার আর কী ছিল? ও-পাণ্ডুলিপি প্রেসে গেলে আমার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকত কি? স্বীকার করছি ডগলাসের ওপর অতটা নির্দয় না হলেই ভালো হত। কিন্তু আমারও তো একটা জীবন আছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'তা বলে আসুন একটা মন্দ রফা করা যাক। ফার্স্ট ক্লাস টিকিটে পৃথিবী বেড়িয়ে আসতে কত খরচ হয়?'

হাঁ করে পরম বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ইসাদোরা।

'পাঁচহাজার পাউন্ডে সম্ভব?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে পাঁচ হাজারের একটা চেক লিখে দিন[১০]— মিসেস মেবারলিকে আজই পৌঁছে দোব। ওঁর একটু হাওয়া পরিবর্তনের দরকার— আপনারও তাঁর প্রতি কর্তব্যটা করা দরকার। আর হ্যাঁ, আঙুল তুলে হুঁশিয়ার করার ভঙ্গিমায় শেষ করল শার্লক হোমস, 'সাবধান! সাবধান! আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে চাঁপার কলির মতো ওই আঙুলও একদিন পুড়ে যেতে পারে খেয়াল থাকে যেন।'

টীকা

১. **পাণ্ডুলিপির প্যাঁচ :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি গেবলস' স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অক্টোবর ১৯২০ সংখ্যায় এবং আমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **হলবর্ন পার্কে :** সম্ভবত গ্রেস ইন রোডের হলবর্ন বারস-এর কথা বলা হয়েছে।

৩. **র‍্যাফেলের ছবি :** ইতালির রেনেসাঁ যুগের চিত্রকর র‍্যাফায়েল সানতি (১৪৮৩-১৫২০) বা র‍্যাফায়েলো সানজিও-কে বলা হত ইল দিভিন্নো বা দ্য ডিভাইন। পোপ লিও দ্য টেনথ-এর আদেশে ভ্যাটিকানের সিসতিন চ্যাপেলের দেওয়ালে ছবি আঁকেন র‍্যাফায়েল।

৪. **ক্রাউন ডার্বি টি সেট :** ১৮৯০ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ডার্বির একটি চিনামাটির বাসন তৈরির কারখানাকে 'ম্যানুফাকচারার্স অব পোর্সেলিন টু হার ম্যাজেস্টি' আখ্যা দেন। তাদের নামের সঙ্গে রয়্যাল শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি দেন। দ্য রয়্যাল ক্রাউন ডার্বি পোর্সেলিন কোম্পানির তৈরি চিনামাটির বাসনকে ক্রাউন ডার্বি বলা হয়।

৫. **আপনাকে আগলানো দরকার :** কোনো উকিলের পক্ষে এই ধরনের কাজ করা বেশ কষ্টকল্পিত।

৬. **ডিরেক্টরি :** সে যুগের ডিরেক্টরিগুলির মধ্যে কেলি অ্যান্ড কোং প্রকাশিত কেলিস ডিরেক্টরি ছিল সমধিক জনপ্রিয়।

৭. **লুসারেনে :** জার্মানভাষী শহর লুসার্ন বা জার্মান উচ্চারণে লুজার্ন, ইতালিয় উচ্চারণে লুসার্নে লেখা হওয়ার কথা। লুসারেনে ফরাসি উচ্চারণ।

৮. **পুরোনো বন্ধু :** শার্লক হোমসের কাহিনিতে একমাত্র এখানেই ইনস্পেকটরের নাম জানা যায়নি।

৯. **পারনামবুকো :** ১৬৫৪ সালে ওলন্দাজদের হাত থেকে পর্তুগিজদের দখলে আসে পারনামবুকো। ১৮৯১ সালে ব্রেজিল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে স্পেনীয় উপনিবেশ বা দখল কোনোকালে ছিল না।

১০. **পাঁচ হাজারের একটা চেক লিখে দিন :** ডেভিড গেলারস্টিন লিখেছেন, এই টাকা থেকে যদি মিসেস মেবারলিকে হোমসের পারিশ্রমিক মেটাতে হয়, তাহলে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস টিকিটে পৃথিবী বেড়িয়ে আসার টাকা কুলোবে না।

রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো কাহিনি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার]

ডাকের চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ল হোমস। তারপর হেসে উঠল খুকখুক করে— শুকনো এই হাসিই ওর কাছে হা-হা হাসির কাছাকাছি[২]। টুক করে টোকা মেরে চিঠিখানা ছুড়ে দিল আমার দিকে।

বলল, 'একাল আর সেকাল, বাস্তব আর দুর্বার কল্পনার অদ্ভুত জখাখিচুড়ির এইটাই বোধ হয় চূড়ান্ত সীমা— ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয়?'

আমি পড়লাম :

৪৬, ওল্ডজুরি[৩]

১৯ নভেম্বর

বিষয় : ভ্যাম্পায়ার

মহাশয়,

মিন্সিং লেনের চায়ের দালাল ফার্গুসন অ্যান্ড মুরহেডের মিস্টার রবার্ট ফার্গুসন আমাদের একজন মক্কেল। ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে উনি খোঁজখবর করেছেন আমাদের কাছে। যেহেতু আমরা কলকবজা নিয়ে কারবার করি[৪] মিস্টার ফার্গুসনকে বলেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। মার্টিলডা ব্রীগস-এর কেসে আপনার সাফল্য আমরা ভুলিনি।

আপনার বিশ্বস্ত

ই জে সি-র পক্ষে

মরিস, মরিস অ্যান্ড ডড

'ওয়াটসন,' স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বলল হোমস, 'মার্টিলডা ব্রীগস কিন্তু কোনো মহিলার নাম নয়। একটা জাহাজের নাম[৫]— সুমাত্রার দানব ইঁদুরের[৬] সঙ্গে জড়িত এই জাহাজের আশ্চর্য কাহিনি দুনিয়ার সামনে হাজির করার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু ভ্যামপায়ার কি আমাদের আওতায় আসে? অবশ্য একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা নিয়ে মাথাটাকে খেলানো মন্দ নয়। গ্রিমভাইয়ের উপকথা নিয়ে শেষকালে তদন্ত করতে হবে ভাবিনি। 'ভি' ভল্যুমটা হাত বাড়িয়ে নামাও তো।'

ইংরেজি 'ভি' চিহ্নিত বিরাট আয়তনের নির্দেশিকা গ্রন্থটি নামিয়ে আনলাম তাক থেকে। এ-গ্রন্থে আছে ওর সারাজীবনের সঞ্চিত বহু তথ্য এবং পুরানো মামলার বৃত্তান্ত।

উচ্চ কণ্ঠে পড়ে গেল হোমস, 'গ্লোরিয়া স্কটের সমুদ্রযাত্রা। খুবই বাজে তদন্ত— এ নিয়ে ফলাও করে একটা গল্প তুমি লিখেছিলে ওয়াটসন— অভিনন্দন জানাতে কিন্তু পারিনি। জালিয়াত ভিক্টর লিঞ্চ। বিষধর গিরগিটি গিলা। কেসটা সত্যিই অত্যাশ্চর্য! সার্কাসবালা ভিক্টোরিয়া। ভ্যানডারবিল্ট আর এগম্যান। ভাইপার ভোগিস, হ্যামরস্মিথের বিস্ময়। এই তো! এই তো! খাসা নির্দেশিকাই বটে— এ-বইকে টেক্কা মারতে তুমি পারবে না ওয়াটসন— যত পুরোনো হচ্ছে, তত দাম বাড়ছে। শোনো। হাঙ্গারিতে ভ্যাম্পায়ারের উৎপাত। এই দেখো আবার ট্রানসিলভানিয়ায়[৭] ভ্যাম্পায়ারের দৌরাত্ম্য।' সাগ্রহে পাতা উলটে পড়ে গেল হোমস। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য নিরাশ হয়ে দমাস করে নামিয়ে রাখল প্রকাণ্ড কেতাবখানা।

'রাবিশ! হৃৎপিণ্ডে কাঠের গোঁজ ঠুকে যাদের কফিনে ঠেকিয়ে রাখতে হয় তাদের সঙ্গে আমার আবার কারবার কীসের? রাবিশ! পাগলামির একটা সীমা আছে।'

'ভ্যাম্পায়ার মানেই যে কেবল জ্যান্ত মড়া, তা তো নয়। জলজ্যান্ত মানুষরাও রক্ত শুষে খায়। আমি তো জানি যৌবনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এককালে কমবয়সিদের রক্ত পান করা হত।'

'সে-রকম কিংবদন্তিও এ-বইতে আছে, ওয়াটসন। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার আছে কি? আমরা নিরেট বাস্তব নিয়ে দিব্যি খাড়া আছি— ভূতপ্রেতকে কাছে ঘেঁষতে দেব না। মিস্টার ফার্গুসনের এ-কেস নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ-চিঠিখানা বোধ হয় উনিই লিখেছেন। দেখা যাক কীসের উদ্‌বেগে মরছেন ছটফটিয়ে।'

প্রথম চিঠি নিয়ে তন্ময় হয়েছিল বলেই আরেকখানা লম্বা লেফাফার দিকে এতক্ষণ নজর দেয়নি হোমস। এবার তুলে নিল। পড়তে শুরু করল পরম কৌতুকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখের পরতে পরতে জাগ্রত হল অপরিসীম আগ্রহ আর কৌতূহল। পড়া শেষ করে দু-আঙুলে চিঠিখানা ঝুলিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই যেন ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বললে, 'চীজম্যান্স, ল্যামবার্লি। ল্যামবার্লি জায়গাটা কোথায়, ওয়াটসন?'

'সাসেক্স[৯], হর্সম্যানের দক্ষিণে।'

'খুব দূরে নয় তাহলে। চীজম্যান্স কোথায়?'

'কয়েকশো বছর আগে ওই নামে যিনি ওখানে একগাদা বাড়িঘর তৈরি করে গিয়েছিলেন, তাঁর নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে চীজম্যান্স। বাড়িগুলো এখনও আছে। আমি চিনি।'

'ঠিক বলেছ।' খুব একটা আগ্রহ না-দেখিয়ে বলল হোমস। আসলে নিজে যে-খবর জানে না, তা চট করে জেনে নিয়ে মগজের ভাঁড়ারে জমিয়ে রেখে খবরদাতাকে খুব একটা আমল না-দেওয়া ওর একটা স্বভাব। 'চীজম্যান্স আর ল্যামবার্লি' সম্পর্কে পরে আরও খবর সংগ্রহ করা যাবে'খন। চিঠিখানা রবার্ট ফার্গুসনই লিখেছেন। উনি তো বলছেন চেনেন তোমাকে।'

'আমাকে!'

'পড়েই দেখো।'

পড়লাম চিঠিটা :

প্রিয় মিস্টার হোমস,

আমার উকিল আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে সুপারিশ করেছেন। বিষয়টা অসাধারণ। আলোচনা করাটাও মুশকিলের ব্যাপার। আমার এক বন্ধুর হয়ে এ-চিঠি আমি লিখছি— সমস্যাটা তাঁরই। বছর পাঁচেক আগে ইনি এক পেরুভিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। ভদ্রমহিলার বাবা একজন পেরুভিয়ান কারবারি— আলাপ হয়েছিল নাইট্রেট আমদানি করার সময়ে[৮]। ভদ্রমহিলা ডাকসাইটে সুন্দরী। কিন্তু ভিনদেশের ভিনধর্মী মেয়ে বলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে এই ক-বছরে। ভদ্রলোকও এখন পস্তাচ্ছেন। ভালোবাসায় বলাবাহুল্য একটু ভাটা পড়েছে। মহিলাটি কিন্তু প্রকৃতই পতিভক্ত— অথচ তাঁর চরিত্রের কয়েকটা দিক স্বামীর কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যাওয়ার ফলে ভদ্রলোকের মনোবেদনা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

এবার যে-বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাই নিয়ে বসা যাক। এ-চিঠি শুধু

একটু সূচনা— পড়বার পর আপনি চিন্তা করবেন কেসটা নেবেন কি না। ভদ্রমহিলা খুবই নরমস্বভাবা মিষ্টি মনের মেয়ে— অথচ এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছেন যা তাঁর চরিত্রের ঠিক উলটো। ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন দু-বার, প্রথম পক্ষের এক ছেলে বর্তমান। পনেরো বছর বয়স ছেলেটার, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়, এত মিষ্টি স্বভাব। ছেলেবেলায় একটা দুর্ঘটনার ফলে একটু জখম হয়েছিল। দু-দুবার এই ছেলের ওপর চড়াও হয়েছিলেন সৎমা— একবার লাঠি দিয়ে এমন পিটিয়েছিলেন যে হাতে কালশিটে পড়ে যায়।

নিজের বছরখানেক বয়সের ছেলের সঙ্গে ভদ্রমহিলা যে-কাণ্ড করেছেন, সে তুলনায় সৎছেলের ওপর হামলাবাজি কিছুই নয়। মাসখানেক আগে একবার মিনিটকয়েকের জন্যে শিশুটিকে একলা রেখে যায় ধাইমা। সেই সময়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। শুনে দৌড়ে যায় নার্স। গিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা যেন নিজের ছেলের ওপর ঝুঁকে ঘাড়ে কামড় বসাচ্ছে। ঘাড়ে একটা ছোট্ট ক্ষতও দেখা গেল— দরদর করে রক্ত পড়ছে ক্ষত দিয়ে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ছেলের বাবাকে ঘটনাটা বলতে গিয়েছিল নার্স, কিন্তু কাকুতিমিনতি করে তাকে আটকান ছেলের মা। এমনকী মুখ বন্ধ রাখার জন্যে কড়কড়ে পাঁচটা পাউন্ড ঘুস পর্যন্ত দেন। ব্যাপারটা সেইখানেই ধামাচাপা পড়ে। ভদ্রমহিলাও বলেননি কেন এমন করে কামড়চ্ছিলেন নিজের ছেলেকে।

নার্স কিন্তু ভুলতে পারল না ভয়ংকর সেই দৃশ্য। চোখে চোখে রাখল ছেলেকে। স্পষ্ট বুঝল, ছেলের মা-ও যেন চোখে চোখে রাখছে নার্সকে— তার একটু সরে যাওয়ার আর ছেলেকে নিরিবিলিতে একলা পাওয়ার সুযোগ খুঁজছে। দিনরাত নার্স আগলে রইল ছেলে, দিনরাত ছেলের মা খরনজরে রাখল নার্সকে— যেন মেষশাবককে একলা পাওয়ার তালে ঘুরছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে। উপমাটা অবিশ্বাস্য— কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবেন না— একটি শিশুর জীবন আর একজন ভদ্রলোকের মানসিক সুস্থতা নির্ভর করছে এর ওপর।

তারপর এল সেই ভয়ানক দিনটি যেদিন স্বামীর কাছে কোনো ব্যাপারই আর গোপন করা গেল না। স্নায়ুর ওপর দিবানিশি এই নিপীড়ন নার্স আর সহ্য করতে পারল না— ভেঙে পড়ল। মুক্তকণ্ঠে সব স্বীকার করল ছেলের বাবার কাছে। শুনে বিশ্বাস করলেন না ভদ্রলোক— যেমন করছেন না আপনি। সৎছেলের ওপর হামলাবাজি করা ছাড়া ভদ্রমহিলার মিষ্টি চরিত্রে কোনোরকম কদর্যতা এবং পৈশাচিকতা কল্পনাও করা যায় না। মনিবানি সম্পর্কে এইসব কুৎসার জন্যে নার্সকে যেই ধমকাতে শুরু করেছেন ভদ্রলোক, ঠিক সেই সময়ে তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে কেঁদে উঠল শিশুপুত্র। নার্সারিতে দৌড়ে গেলেন দুজনে। মিস্টার হোমস কল্পনা করুন ভদ্রলোকের তখনকার মনের অবস্থা যখন তিনি স্বচক্ষে দেখলেন ছোট্ট খাটের পাশে হেঁট হয়ে বসে নিজের ছেলের ঘাড় কামড়ে রয়েছেন তাঁরই স্ত্রী, দেখলেন রক্তে মাখামাখি হয়ে রয়েছে ছেলের ঘাড় আর বিছানার চাদর। বিষম আতঙ্কে বিকট চেঁচিয়ে উঠে স্ত্রীর মুখ চেপে ধরে আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিতেই দেখলেন রক্ত লেপে রয়েছে দুই ঠোঁটে। না, কোনো সন্দেহই নেই আর— নিজের ছেলের রক্তপান করছিলেন ভদ্রমহিলা।

এই ব্যাপার। ভদ্রমহিলা এখন নিজের ঘরে অন্তরিন। কেন এমন করতে গেলেন, তা বলেননি। ভদ্রলোকও উন্মত্ত-প্রায়। ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না, আমিও জানি

না। আগে ভাবতাম এসব বিদেশি গালগল্প। এখন তো দেখছি খাস ইংলন্ডের মাটিতেই এ-কাণ্ড ঘটছে। বিষয়টা নিয়ে সাক্ষাতে আলোচনা করতে চাই। আপনার অসামান্য ক্ষমতা যদি প্রয়োগ করতে চান, বিকৃত বুদ্ধি এক ভদ্রলোকের উপকার করতে চান, দয়া করে ফার্গুসন্স, ল্যামবার্লি— এই ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে দিন। দশটার মধ্যেই আপনার ঘরে পৌঁছে যাব।

আপনার বিশ্বস্ত

রবার্ট ফার্গুসন।

পুনশ্চ— আপনার বন্ধু ওয়াটসন ব্ল্যাকহিদে[৯] যখন রাগবি খেলতেন, আমি তখন রিচমন্ডের[১০] তরফে থ্রিকোয়ার্টার ছিলাম। ব্যক্তিগত পরিচয় হিসেবে শুধু এইটুকুই বলা যায়।

চিঠি রেখে বললাম, 'চিনি বই কী ফার্গুসনকে। বব ফার্গুসন। রিচমন্ডে অমন দুঁদে থ্রিকোয়ার্টার আর ছিল না। দিলদরিয়া মানুষ। বন্ধুর সমস্যায় এত উদ্‌বেগ ওকেই মানায়।'

চিন্তাকুটিল ললাটে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে হোমস বললে, 'তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, ওয়াটসন। টেলিগ্রামটা লিখে ফেলো! ''সানন্দে গ্রহণ করব আপনার কেস।''

'আপনার কেস!'

'তা নয় তো কী! আমাদের এই এজেন্সি যে দুর্বলমনাদের জন্যে নয়, প্রথমেই তা সমঝে দেওয়া দরকার। এ-কেস তাঁর নিজের।'

ফার্গুসন এল ঠিক দশটার সময়ে। এককালের সেই বিরাটকায় খেলোয়াড়ি চেহারা আর নেই— ধসে গেছে। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কাঁধ গোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। এককালের দুর্দান্ত খেলোয়াড়দের এ-চেহারা দেখলে কষ্ট হয়। আমার তো মনে হল আমাকে দেখেও একই ভাবের উদয় হল ফার্গুসনের মনের মধ্যে।

বলেও ফেলল আগের মতোই গম্ভীর ভরাট আন্তরিক গলায়, 'হ্যালো ওয়াটসন, ওল্ড ডিয়ার পার্কে[১১] দড়ির ওপর দিয়ে ভিড়ের মধ্যে যে-ওয়াটসনকে ছুড়ে দিয়েছিলাম— দেখছি সে-ওয়াটসন তুমি আর নও। আমিও পালটেছি— বিশেষ করে গত দু-তিন দিনের মধ্যে হঠাৎ বয়সটা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে ফেলেছি। মিস্টার হোমস আপনার চিঠি পড়ে বুঝলাম, কেসটা যে আমারই, তা আপনি ধরে ফেলেছেন।'

'সোজাসুজি কথা বলাই ভালো', বলল হোমস।

'কথাটা ঠিক। কিন্তু কী জানেন, আমি যে কী করব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে— প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাকে যেমন আলগাতে চাই, বাচ্চা দুটোকেও তেমনি আগলাতে চাই। বলুন এ-পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আমার। কী মনে হয় আপনার? মাথার রোগ? পাগলামি? রক্তের দোষ? এ-রকম কেস আগে হাতে কখনো পেয়েছেন? বলুন, মিস্টার হোমস, বলুন আমাকে, গাইড করুন, পরামর্শ দিন— আমার মাথার একদম ঠিক নেই।'

'আগে বসুন। যা বলি, তার সোজা জবাব দিন, বুদ্ধিশুদ্ধি আমারও গুলিয়ে গেছে। প্রথমে বলুন, স্ত্রী কি এখনও ছেলেদের কাছে আছে?'

'মি. হোমস, বলুন আমাকে, গাইড করুন, পরামর্শ দিন—
আমার মাথার একদম ঠিক নেই।'
হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৫

'না। ভয়ংকর সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার পর পাগলের মতো তাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছি, এ-কাজ সে কেন করতে গেল, কেন, কেন, কেন? ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কীরকম ভাবে যেন চেয়ে রইল সে— একটা কথারও জবাব দিলে না। সে যে আমাকে বড়ো ভালোবাসে মিস্টার হোমস— সমস্ত অন্তর দিয়ে উন্মাদিনীর মতোই ভালোবাসে। তারপরেই ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। খিল তুলে দিল ভেতর থেকে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চাইছে না আর। ওর বাপের বাড়ির একজন ঝি আছে— ডোলোরেস তার নাম— ঝি না-বলে বান্ধবীই বলা উচিত। খাবারদাবার সে-ই ভেতরে নিয়ে যায়।'

'যাক। ছেলে দুটো তাহলে বিপদের মধ্যে আর নেই?'

'নার্স মিসেস ম্যাসন দিব্যি গেলে বলেছে, বাচ্চাকে এক সেকেন্ডের জন্যও আর চোখের

আড়ালে করবে না। অস্বস্তি হচ্ছে কেবল জ্যাকের জন্যে— আমার বড়ো ছেলে। এর আগে দু-দুবার তাকে মারধর করেছে আমার স্ত্রী।'

'জখম তো করেনি?'

'না, কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। বেচারা এমনিতেই পঙ্গু। শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে ছেলেবেলায় পড়ে যাওয়ার পর থেকে। দেখলে মায়া হয়— মনটা বড়ো ভালো, প্রাণে স্নেহ মমতা ভালোবাসা আছে— বলতে বলতে কোমল হয়ে এল ফার্গুসনের বিরাট কাঠামো।

ফার্গুসনের লেখা গতকালের চিঠিটা পড়তে পড়তে হোমস বললে, 'বাড়িতে আর কে কে আছে?'

'দুজন চাকর, মাইকেল— আমার সহিস— বাড়িতেই ঘুমোয়, আমার স্ত্রী। আমি, বড়ো ছেলে জ্যাক, বাচ্চাটা, ডোলোরেস আর মিসেস ম্যাসন। আর কেউ নেই।'

'বিয়ের সময়ে স্ত্রী সম্বন্ধে সব খবর নিশ্চয় জানা ছিল না?'

'কয়েক হপ্তা আলাপের পর বিয়ে হয়েছিল।'

'ডোলোরেস কদ্দিন আছে ওঁর সঙ্গে?'

'বেশ কয়েক বছর।'

'তার মানে, স্ত্রীর চরিত্র আপনি যা জানেন, তার চাইতে বেশি জানে ডোলোরেস?'

'তা বলতে পারেন।'

কী যেন লিখে নিল হোমস।

বললে, 'তদন্ত এখানে বসে হবে না— আপনার বাড়ি যেতে হবে। উঠব অবশ্য সরাইখানায়।'

ফার্গুসন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'দুটোয় একটা ট্রেন আছে ভিক্টোরিয়ায়।'

'তাতেই যাব। হাতে এখন একদম কাজ নেই। ওয়াটসনও আসবে। তার আগে দু-একটা প্রশ্ন। ভদ্রমহিলা দুটো ছেলের ওপরেই চড়াও হয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ধরনটা দু-রকমের। জ্যাককে উনি মেরেছেন।'

'একবার লাঠি দিয়ে, আর একবার শুধু হাতে— অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে।'

'কেন মেরেছিলেন, বলেছিলেন?'

'না। শুধু বলেছে জ্যাককে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে— দু-চক্ষে দেখতে পারে না। একবার নয়— বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে একই কথা।'

'সৎমা-রা ওইরকমই বলে বহুক্ষেত্রে! ঈর্ষার ব্যাপার। আপনার স্ত্রীর স্বভাবেও কি ঈর্ষার আগুন আছে?'

'প্রচণ্ডভাবে আছে। গরমের দেশে জন্মালে যা হয় আর কি।'

'জ্যাকের বয়স যখন পনেরো, মাথাও নিশ্চয় সাফ— বিশেষ করে শারীরিক বিকৃতি থাকার ফলে আর পাঁচটা সুস্থ ছেলের চেয়ে মগজের বুদ্ধি একটু বেশিই হয়েছে বলা যেতে পারে। কেন অমন মারা হয়েছে তাকে, সে কী বলেছে?'

'বলেছে স্রেফ অকারণে নাকি মেরেছে সৎমা।'

'স্নেহের সম্পর্ক নিশ্চয় এককালে ছিল দুজনের মধ্যে?'

'কোনোকালেই ছিল না।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন ছেলেটার প্রাণে স্নেহ মমতা ভালোবাসা আছে?'

'এ-রকম পিতৃভক্ত ছেলে দুটি আর হয় না। আমার জীবনই তার জীবন। আমার কথায় আমার কাজে ডুবে থাকে অষ্টপ্রহর।'

হোমস আবার কী যেন লিখে নিল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

'দ্বিতীয় বিয়ের আগে আপনি আর জ্যাক খুব কাছাকাছি ছিলেন— প্রাণের বন্ধু বলতে পারেন। তাই তো?'

'খুবই।'

'যার মনে এত স্নেহ মমতা ভালোবাসা, মরা মায়ের স্মৃতিও নিশ্চয় তার মনে খুব উজ্জ্বল?'

'খুবই।'

'ইন্টারেস্টিং ছেলে। আর একটা প্রশ্ন। বাচ্চা আর জ্যাকের ওপর কি একই সময়ে চড়াও হতে দেখা গেছে আপনার স্ত্রীকে?'

'প্রথমবারে তাই। যেন খুন চেপেছিল স্ত্রীর মাথায়— একই সঙ্গে দুধের বাচ্চা আর জ্যাকের ওপর ঝাল বেড়েছে। দ্বিতীয়বারে মার খেয়ে মরেছে কেবল জ্যাক— বাচ্চা নিরাপদেই ছিল— বলেছে মিসেস ম্যাসন।'

'তাহলে তো আরও জট পাকিয়ে গেল ব্যাপারটা।'

'বুঝলাম না, মিস্টার হোমস।'

'এখন বুঝবেন না। থিয়োরির পর থিয়োরি খাড়া করে যাওয়া আমার মেথড। তার আগে মুখ খুলি না এবং সেটাই আমার বদভ্যাস। আপনার বন্ধু আমার সম্বন্ধে খুব বাড়িয়ে গল্প-টল্প লেখে। তবে কী জানেন আপনার এ-কেস খুব একটা দুর্ঘট নয়— মীমাংসা করা যাবে। যাই হোক, বেলা দুটোয় ভিক্টোরিয়ায় দেখা পাবেন আমাদের।

নভেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ল্যামবার্লি এসে পৌঁছোলাম আমরা। সঙ্গের জিনিসপত্র সরাইখানায় রেখে সাসেক্সের কাদামাটি মাখা দীর্ঘ গলিপথ বেয়ে এসে দাঁড়ালাম অতি পুরাতন নিভৃত একটা খামারবাড়ির সামনে। বিরাট বাড়ি। মাঝের অংশ অতিশয় প্রাচীন, ধারের দিক অতিশয় আধুনিক। বেজায় উঁচু টিউডর চিমনি, ছ্যাতলাপড়া হর্স্যাম টালি ছাওয়া ছাদ দেখবার মতো। চৌকাঠ ক্ষয়ে গেছে বহুবছর ধরে বহু মানুষের আনাগোনায়। প্রথম যিনি এ-বাড়ি বানিয়েছেন, তাঁর নাম লেখা রয়েছে সেকালের টালিতে। বাড়ির ভেতরে কড়িকাঠগুলো ভারী ওক কাঠের। মেঝে ক্ষয়ে গর্ত গর্ত হয়ে গেছে। পড়োপড়ো বাড়ির চারদিক থেকে যেন বয়স আর জরার গন্ধ নাকে ভেসে আসছে।

মাঝের একটা প্রকাণ্ড ঘরে আমাদের নিয়ে গেল ফার্গুসন। অতিশয় মান্ধাতার আমলের ফায়ার প্লেসে কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে দাউদাউ করে। আগুনের পেছনে লোহার চাদরে লেখা সালটা— ১৬৭০।

বিভিন্ন সময় আর বিভিন্ন দেশের সমন্বয় ঘটেছে ঘরখানার মধ্যে। দেওয়ালের তলার দিকে

কাঠের প্যানেল— সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত, কিন্তু আধুনিক জলরঙে চিত্রিত। কাঠের তক্তার ওপরদিকে হলদে পলেস্তারার ওপর ঝুলছে সারি সারি দক্ষিণ আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র আর বাসনপত্র—ফার্গুসনের পেরুভিয়ান বউ নিশ্চয় বাপের বাড়ি থেকে এনে টাঙিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। দেখেই জাগ্রত হল হোমসের কৌতূহল। দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রত্যেকটা অস্ত্র। ঘুরে দাঁড়াল চোখের মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে।

পরক্ষণেই বলল সবিস্ময়ে, 'আরে! আরে! এ আবার কী!'

এক কোণে ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে ছিল একটা স্প্যানিয়েল কুকুর। এখন বেরিয়ে এল বাইরে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পেছনের পা টেনে, মেঝের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে এসে হাত চাটতে লাগল ফার্গুসনের।

'কী হল, মিস্টার হোমস?'

'কুকুরটার এমন দশা হল কী করে?'

'সেটাও একটা সমস্যা। পশুর ডাক্তাররাও বুঝতে পারছে না। এক রকমের পক্ষাঘাত— শিরদাঁড়ার মেনিনজাইটিস। তবে আগের চাইতে ভালো আছে— সেরে উঠবে দু-দিনেই। না রে কার্লো?'

কার্লোর ঝুলে পড়া ল্যাজের মধ্যে দিয়ে যেন একটা শিহরন বয়ে গেল। তাকে নিয়েই যে আলোচনা হচ্ছে বুঝতে পেরে কীরকম যেন করুণ চোখে পর্যায়ক্রমে দেখতে লাগল আমাদের।

'রোগটা কি হঠাৎ হয়েছে?'

'রাতারাতি।'

'কদ্দিন আগে?'

'মাস চারেক আগে।'

'খুবই আশ্চর্য! খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।'

'কী বলতে চান, মিস্টার হোমস?'

'ঠিক যেরকমটি ভেবেছি, দেখছি তার সবই মিলে যাচ্ছে।'

'ভগবানের দোহাই মিস্টার হোমস, কী ভেবেছেন দয়া করে বলুন! আপনার কাছে এটা বুদ্ধির ব্যায়াম হতে পারে, আমার কাছে জীবন মরণের খেলা। আমার স্ত্রী ভাবী খুনি— আমার ছেলের প্রাণ যেতে বসেছে! আমার সঙ্গে অন্তত খেলা করবেন না!'

রাগবি থ্রি কোয়ার্টারের অতবড়ো দেহখানা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল বিষম উত্তেজনায়। বাহু স্পর্শ করে আশ্বস্ত করে হোমস বললে—

'এই মুহূর্তে কিছুই বলব না। তবে সমাধানটা আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে— এইটুকুই শুধু শুনে রাখুন।'

'একটু বসুন। স্ত্রীর খোঁজটা নিয়ে আসি।'

ফার্গুসন বেরিয়ে যেতেই ফের দেওয়ালের সামনে গিয়ে তন্ময় হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করতে লাগল হোমস। একটু পরেই ফিরে এল ফার্গুসন— মুখ দেখে বুঝলাম অবস্থার তিলমাত্র উন্নতি ঘটেনি। পেছন পেছন এল ছিপছিপে লম্বা চেহারার বাদামি মুখ একটি মেয়ে।

'ডোলোরেস, মিসেস ফার্গুসনকে চা দাও,' বলল ফার্গুসন।

বিতৃষ্ণা জ্বলজ্বল চোখে মনিবের দিকে তাকিয়ে ডোলোরেস বললে দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চারণে, 'ওঁর শরীর খুব খারাপ। কিছু খাচ্ছেন না। ডাক্তার ডাকতে বলছেন। আমার বড়ো ভয় হচ্ছে।'

সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে ফার্গুসন তাকাতেই আমি বললাম, 'আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি।'

'ডোলোরেস, মিসেস ফার্গুসন ডাক্তার ওয়াটসনকে ঢুকতে দেবেন তো?'

'দেবেন, দেবেন, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আসুন আমার সঙ্গে।'

'চলো।'

আবেগকম্পিত ডোলোরেসের পেছন পেছন অনেক সিঁড়ি অনেক গলিপথ পেরিয়ে লোহার চাদর দিয়ে মজবুত করা প্রকাণ্ড একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুঝলাম গায়ের জোরে এ-দরজা ভেঙে বউয়ের সঙ্গে দেখা করার ক্ষমতা ফার্গুসনের হবে না। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডোলোরেস— পেছনে আমি। সঙ্গেসঙ্গে খিল তুলে দেওয়া হল দরজায়।

শয্যায় শুয়ে এক মহিলা। দেখেই বুঝলাম দারুণ জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। আমার পায়ের আওয়াজ পেতেই জ্বরের ঘোরে অর্ধেক উঠে সভয়ে তাকালেন— বড়ো বড়ো সুন্দর দুটি চোখে অসীম আতঙ্ক ঘনিয়ে উঠল। আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের এলিয়ে পড়লেন বালিশে। নাড়ি দেখলাম। জ্বর হয়েছে ঠিকই, তবে আমার মনে হল কারণটা মানসিক— নিদারুণ স্নায়বিক উত্তেজনা।

'দিন দুই হল এইভাবে শুয়ে আছেন— বাঁচবেন তো?' ভয়ে বিকৃত শোনাল ডোলোরেসের গলা।

আরক্ত সুন্দর মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার স্বামী কোথায়?'

'নীচে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'দেখা করব না— কখনোই করব না।' বলতে বলতে যেন প্রলাপবকুনি আরম্ভ করে দিলেন, 'পিশাচ! পিশাচ! শয়তান কোথাকার!'

'বলুন আমি কী করতে পারি?'

'কিছু করতে পারবেন না— কেউ পারবে না। সব শেষ! সব শেষ! আমার যা খুশি করব। সব শেষ!'

ভদ্রমহিলা নিশ্চয় কোনো বিচিত্র বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। সজ্জন বব ফার্গুসনকে নরপিশাচ বা শয়তানের ভূমিকায় কল্পনাও করতে পারলাম না।

বললাম, 'ম্যাডাম, বুক দিয়ে আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন। এ-ঘটনায় তিনি গভীর শোক পেয়েছেন।'

আবার সেই জ্বালাময় চোখে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা।

বললেন, 'হ্যাঁ বাসে। আমিও কি বাসি না? ভালোবাসায় ভরা তার বুক ঘা মেরে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চাইতে নিজেকে তিল তিল করে মেরে ফেলার মতো ভালো কি আমি বাসি না? আমার এই ভালোবাসার পরেও সে কিনা ওইভাবে আমার সম্পর্কে কথা বলতে পারে?'

'বড়ো দুঃখ পেয়েছে— বুঝতে পারেনি।'

'বুঝতে পারেনি ঠিকই— কিন্তু বিশ্বাস তো করা উচিত ছিল।'

'দেখাও করবেন না?'

'না, না। যেসব কথা ও বলেছে, যে-চোখে তাকিয়েছে— কোনোদিনই তা ভুলব না। দেখাও করব না। আপনি যান। কিছুই করতে পারবেন না আমার জন্যে। শুধু একটা কথা বলবেন। আমার ছেলেকে আমি চাই। আমার দাবি আছে বলেই চাই। এ ছাড়া আর কোনো কথা তার সঙ্গে আমার নেই।' বলে, দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শুলেন ভদ্রমহিলা— আর একটা কথাও বললেন না।

নীচের তলায় এসে বললাম সব। বিষম উৎকণ্ঠায় শুনল ফার্গুসন।

বলল, 'ছেলেকে পাঠানো কি যায়? ওর ভেতরে এখন কোন প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়েছে কেউ তা জানে না। রক্তমাখা ঠোঁটে যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চার পাশ থেকে— আমি তা ভুলিনি— ভোলা যায় না। মিসেস ম্যাসনের কাছে ছেলে যেমন আছে থাকবে।'

মান্ধাতার আমলের এ-বাড়িতে অত্যাধুনিক বস্তু দেখলাম একটিই— স্মার্ট চেহারার ফিটফাট একজন পরিচারিকা। চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। চা দিচ্ছে সবাইকে, এমন সময়ে আবির্ভাব ঘটল বছর পনেরো বয়সের হালকা নীল চক্ষু এক কিশোরের, চুল সুন্দর, মুখশ্রী পাণ্ডুর। ফার্গুসনকে দেখেই আবেগ আর আনন্দের রোশনাই জ্বলে উঠল আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখে। দৌড়ে এসে আদরিণী মেয়ের মতো বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে সোল্লাসে, 'ড্যাডি, ড্যাডি, কখন এলে?'

অপ্রস্তুত হয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে নিল ফার্গুসন।

সোনালি সিল্কের মতো হালকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে পরম স্নেহে, 'মিস্টার হোমস আর ডাক্তার ওয়াটসনও এসেছেন।'

'ডিটেকটিভ মিস্টার হোমস?'

'হ্যাঁ।'

অন্তর্ভেদী চোখে আমাদের দেখল কিশোর। গভীর সেই চাউনির মধ্যে বিদ্বেষের ভাবটাই যেন বেশি।

হোমস বললে, 'আপনার ছোটো ছেলের সঙ্গে এবার আলাপ করা দরকার।'

ফার্গুসন বললে, 'জ্যাক, যা, মিসেস ম্যাসনকে বল বাচ্চা নিয়ে এখানে আসতে।' বেরিয়ে গেল জ্যাক। আমার সার্জিক্যাল অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, ছেলেটি কেঁপে কেঁপে হাঁটছে মেরুদণ্ডের বিকৃতির জন্যে। ফিরে এল একটু পরেই। পেছনে দীর্ঘকায়া আঁটসাঁট চেহারার এক স্ত্রীলোক— কোলে ভারি সুন্দর এক শিশু, কালো চোখ, সোনালি চুল, স্যাক্সন আর ল্যাটিনের অপূর্ব সমন্বয়। ফার্গুসন কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল বাচ্চাকে— গভীর স্নেহ ফুটে উঠল চোখে-মুখে।

দেবশিশুর গলার মতো পেলব গলায় ছোট্ট একটা লাল টকটকে ক্ষতর দিকে তাকিয়ে বললে আপন মনে, 'এমন বাচ্চাকেও জখম করতে প্রাণ চায়?'

ঠিক এই সময়ে হোমসের ওপর চোখ পড়ায় দেখলাম বিচিত্র তন্ময়তা জাগ্রত হয়েছে তার ভাবভঙ্গিতে। পুরোনো হাতির দাঁত খুদে তৈরি করা মুখের মতো স্থির হয়ে উঠেছে মুখভাব— যে-চোখ একটু আগেই ন্যস্ত ছিল বাপবেটার ওপর এখন তা দূর বিস্তৃত— ঘরের অন্যদিকে কী যেন দেখছে অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে। ঔৎসুক্যের কারণ আবিষ্কারের জন্য দৃষ্টি অনুসরণ করে মনে হল যেন জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরের বিষাদ-মলিন কুয়াশাভেজা বাগান দেখছে তন্ময় হয়ে।

খড়খড়ি অর্ধেক নামানো— বাইরের দৃশ্য পুরো দেখা যাচ্ছে না— তবুও কিন্তু সেই আধবন্ধ কাচের জানলার দিকেই ধ্যানস্থ চোখে তাকিয়ে আছে শার্লক হোমস। হেসে উঠল পরের মুহূর্তেই— দৃষ্টি ফিরে এল বাচ্চার ওপর। মোলায়েম ঘাড়ের ওপর ছোট্ট কুঁচকোনো ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষে। সযত্নে পরীক্ষা করল দাগটা। কথা বলল না। তারপর ফুলোফুলো নধর মুঠো দুটো ধরে অল্প নেড়ে দিয়ে বললে, 'গুডবাই, খুদে মানুষ। জীবনটাকে শুরু করলি কিন্তু বড়ো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দিয়ে।— নার্স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

মিসেস ম্যাসনকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কী সব কথা বলল হোমস। শেষের কথা ক-টা কানে ভেসে এল— 'ভয় নেই, শিগ্‌গিরই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটবে তোমার।' বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেল স্বল্প ঝাঁঝালো প্রকৃতির নার্স।

ফিরে এসে হোমস বললে, 'মিসেস ম্যাসনকে আপনার কীরকম মনে হয়?'

'মনটা ভালো— বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ছেলেটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।'

'জ্যাক কী বলে? পছন্দ হয় মিসেস ম্যাসনকে?'

মুখ কালো হয়ে গেল জ্যাকের। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ পছন্দ নয় কাঠখোট্টা চেহারার মিসেস ম্যাসনকে।

আদর করে বড়োছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে ফার্গুসন বললে, 'জ্যাকের পছন্দ অপছন্দ বড়ো চুলচেরা। কপাল ভালো, ওর পছন্দসই মানুষদের মধ্যে আমি একজন।'

বাবার বুকে মুখ গুঁজল জ্যাক। স্নেহভরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ফার্গুসন।

বললে, 'যা পালা।' দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল জ্যাক— পেছন থেকে গভীর স্নেহে চেয়ে রইল ফার্গুসন। চোখের আড়াল হতেই হোমসকে বললে, 'আপনাকে এই টানাপোড়েনের মধ্যে টেনে এনে কি ভুল করলাম? এত সূক্ষ্ম আর জটিল সমস্যায় আমাকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কি কিছু করতে পারবেন?'

'সূক্ষ্ম তো বটেই', কৌতুক হাসি হেসে বললে শার্লক, 'তবে জটিল নয়। ধাপে ধাপে বুদ্ধির বিশ্লেষণ বেয়ে সমাধানে পৌঁছে গেছি বেকার স্ট্রিট থেকে বেরোনোর আগেই। এসেছি কেবল নিজের চোখে দেখে বাজিয়ে নেওয়ার জন্যে।'

বলি আঁকা কপালে হাত বুলিয়ে ভাঙা গলায় ফার্গুসন বললে, 'তাহলে আর আমাকে উদ্‌বেগের মধ্যে রাখছেন কেন?'

'খুলে বলার আগে আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওয়াটসন, উনি কি পারবেন দেখা করতে?'

'পারবেন।'

'তবে চলো। জট পরিষ্কার তাঁর সামনেই হোক।'

ভাঙা গলায় ফার্গুসন বললে, 'অসম্ভব। আমার মুখ দেখবে না ও।'

'দেখবেন, দেখবেন, নিশ্চয় দেখবেন,' বলতে বলতে এক টুকরো কাগজে খসখস করে কী যেন লিখে আমার হাতে দিয়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, তুমি তো ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার অধিকার পেয়েছ। এই চিরকুটটা পৌঁছে দেবে?'

ওপরে গিয়ে দরজায় নক করতেই পাল্লা ফাঁক করল ডোলোরেস— বাড়িয়ে দিলাম চিরকুটটা। একটু পরেই ভেতর থেকে ভেসে এল বিস্ময় আর হর্ষ ভরা চিৎকার।

ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডোলোরেস বললে, 'দেখা করবেন।'

ডেকে নিয়ে এলাম হোমস আর ফার্গুসনকে। ঘরে ঢুকেই শয্যায় উঠে বসা বউয়ের দিকে এগোতে গিয়েছিল ফার্গুসন— কিন্তু হাত তুলে ভদ্রমহিলা নিরস্ত্র করতেই ধপ করে বসে পড়ল আর্মচেয়ারে। অভিবাদন সেরে নিয়ে হোমস বসল পাশের চেয়ারে। ফ্যালফ্যাল করে বিষম বিস্ময়ে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা।

হোমস বললে, 'সবচেয়ে চটপট অপারেশনই সবচেয়ে কম ব্যথা দেয়। তাই ছোট্ট করে বলি, মিস্টার ফার্গুসন, আপনার স্ত্রী রীতিমতো সাধ্বী, অত্যন্ত প্রেমময়ী এবং তাঁর সঙ্গে খুবই জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে!'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ফার্গুসন, 'প্রমাণ করুন মশায়, আজীবন দাসখত লিখে দোব আপনাকে।'

'প্রমাণ তো করবই— কিন্তু আপনাকে আহত করে।'

'পরোয়া করি না। আমার স্ত্রী অপরাধিনী নন যদি প্রমাণ করতে পারেন— সব আঘাত সয়ে যাব।'

'বেশ তাহলে শুনুন। বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে যখন রক্তপায়ী-পিশাচের কাহিনি বলেছিলেন, আমি একদম বিশ্বাস করিনি— ওসব গালগল্পেই মানায়। অথচ আপনি স্পষ্ট দেখেছিলেন বাচ্চার খাটের পাশ থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়াচ্ছেন আপনার স্ত্রী।'

'হ্যাঁ— হ্যাঁ—'

'ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত পান করা ছাড়াও অন্য কারণে রক্ত টেনে নেওয়া যায়— এ-ধারণাটা আপনার মাথায় এল না কেন বলতে পারেন? বিষ টেনে বার করার জন্যে ইংলিশ ইতিহাসের এক রানি ক্ষতমুখে মুখ দিয়ে রক্ত শুষে বার করেননি?'

'বিষ!'

'দক্ষিণ আমেরিকার জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে বাড়িময়। দেওয়ালে ঝোলানো অস্ত্রশস্ত্র দেখেই মন টেনেছিল ওই কারণেই। অন্য কোনো বিষও হতে পারত— কিন্তু আমার সহজাত প্রবৃত্তি মন থেকে বলে উঠল— বিষ এসেছে ওদের মধ্যেরই কোনো একটা থেকে। পাখি মারা পুঁচকে ধনুকটার পাশে ছোট্ট কিন্তু শূন্য তূণটা দেখেই বুঝলাম— যা ভেবেছি তাই। তির নেই। তার মানে ক্যুরারি[১২] বা ওই জাতীয় কোনো মারাত্মক শেকড়ের রসে তিরখানা ডুবিয়ে নিয়ে যদি বাচ্চাটাকে খোঁচা মারা হয়— সে-বিষ মুখ দিয়ে টেনে সঙ্গেসঙ্গে বার করে না-দিলে প্রাণে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই।

'তারপর ধরুন স্প্যানিয়েল কুকুরটার রাতারাতি রোগ হওয়াটা[১৩]। আগে অবশ্য কুকুরের কথা মাথায় আসেনি— দেখামাত্র বুঝলাম ব্যাপারটা কী। তিরের খোঁচায় কাজ কীরকম হয় দেখার জন্যে মহড়া দেওয়া দরকার। কুত্তা বেচারার ওপর সেই এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল। দেখা গেল বিষের ক্ষমতা মোটেই নষ্ট হয়নি।'

'আপনার স্ত্রী স্বচক্ষে দেখেছেন আপনার বড়ো ছেলে তার ছোটো ভাইকে তির দিয়ে খুঁচিয়ে পালাচ্ছে— মেরেছেন সেই কারণেই— কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। মুখ দিয়ে সঙ্গেসঙ্গে বিষ টেনে বার করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনাকে জ্যাকের কুকীর্তি বলেননি পাছে আপনার মন ভেঙে যায়— ভালোবাসা কতখানি গভীর হলে এতখানি গোপনতা সম্ভব কল্পনা করতে পারেন?'

'জ্যাকি!'

'একটু আগেই তো দেখলাম, ছোটো ছেলেকে আপনার আদর করা দেখে নৃশংস ঘৃণা আর পাশবিক হিংসা ফুটে উঠেছে আপনার আদরের বড়ো ছেলের চোখে-মুখে— দেখলাম জানলার শার্সিতে জ্যাকের হিংসায় কালো ঘৃণায় নিষ্ঠুর মুখের প্রতিবিম্ব— দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি— এ-রকম জিঘাংসা কোনোদিন কারো মুখে এভাবে ফুটে উঠতে কখনো আমি দেখিনি।'

'জ্যাকি!'

'সহ্য করুন, মিস্টার ফার্গুসন, সহ্য আপনাকে করতেই হবে। ভালোবাসা বিকৃত চেহারা নিলে এই পথেই চলে। সে ভালোবাসে নিজের মায়ের স্মৃতিকে, ভালোবাসে আপনাকে— সে জানে নিজের শরীরের দুর্বলতা কোথায়— ঠিক তার বিপরীত আপনার ছোটো ছেলে— ফুটফুটে সুন্দর যেন এক দেবশিশু— ঈর্ষার বিষে তাই অমানুষ হয়ে গেছে জ্যাকের মতো ছেলেও।'

'গুড গড! এ যে বিশ্বাস করাও যায় না।'

'ম্যাডাম, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

এতক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন ভদ্রমহিলা। এবারে মুখ ফেরালেন স্বামীর পানে।

'এ-কথা কি তোমাকে বলা যায়, বব? আমি চেয়েছিলাম— আমি নয়, আর কেউ তোমাকে সব বলুক, এই ভদ্রলোকের সেই ক্ষমতা আছে— অলৌকিক ক্ষমতা। চিরকুটে লিখে পাঠালেন— সব জানেন, সমস্ত।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে হোমস বললে, 'আমার প্রেসক্রিপশন যদি শোনেন তো জ্যাককে বছরখানেক সাগরে হাওয়া খাইয়ে আনুন। মিসেস ফার্গুসন, একটা ব্যাপার এখনও ধোঁয়াটে রয়ে গেল আমার কাছে। বাচ্চাটাকে এই দু-দিন ছেড়েছিলেন কোন সাহসে?'

'মিসেস ম্যাসন সব জানে— আমি বলেছি।'

'ঠিক, ঠিক। আমিও তাই আঁচ করেছিলাম।'

ফার্গুসন দু-হাত বাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ফিসফিস করে হোমস বললে, 'ওহে ওয়াটসন, চলো এবার পালাই। ডোলোরেসের এক হাত তুমি ধরো, আর একটা হাত আমি ধরছি।' তিনজনে বাইরে আসতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'বাকিটা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিক।'

যে-চিঠি পাওয়ার পর কেসের সূত্রপাত, হোমস তার জবাব দিল এইভাবে :

বেকার স্ট্রিট
২১ নভেম্বর

বিষয় : ভ্যাম্পায়ার

মহাশয়,

আপনার ১৯ তারিখের চিঠির জবাবে জানাচ্ছি, আপনাদের মক্কেল মিন্সিং লেনের চায়ের দালাল ফার্গুসন অ্যান্ড মুরহেডের মিস্টার রবার্ট ফার্গুসনের সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান আমি করেছি। আপনার সুপারিশের জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত
শার্লক হোমস

টীকা

১. **রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো কাহিনি :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সাসেক্স ভ্যামপায়ার' ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের এবং আমেরিকার হার্স্টস ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের জানুয়ারি ১৯২৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **হা-হা হাসির কাছাকাছি :** হোমসকে কিন্তু অনেক সময়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠতে দেখা গিয়েছে।

৩. **ওল্ডজুরি :** লন্ডনের ওল্ড জিউইস স্ট্রিটে ইহুদি শরণার্থীরা ঘাঁটি গেড়েছিল দ্বাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে। খুদে টাকা খাটানো ছিল এদের ব্যাবসা, কারণ তাদের অন্য ব্যাবসা করবার অনুমতি দেওয়া হত না।

৪. **কলকবজা নিয়ে কারবার করি :** যে আইন ব্যবসায়ী সংস্থা কলকবজা নিয়ে কারবার করে, একজন চায়ের দালালের পক্ষে তাদের মক্কেল হওয়া বেশ অস্বাভাবিক।

৫. **জাহাজের নাম :** একজন গবেষক, রিচার্ড ডবল্যু ক্লার্ক, জানিয়েছেন সাংহাইয়ের ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং কোম্পানির মাটিলডা ব্রিগস নামে একটি জাহাজ ছিল।

৬. **সুমাত্রার দানব ইঁদুর :** বৈজ্ঞানিক নাম সানডামিস ইনফ্রালুটিউস। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ইঁদুরের ওজন বাইশ পাউন্ড এবং লেজসহ দৈর্ঘ্য চব্বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

৭. **ট্রানসিলভানিয়া :** ভিক্টোরীয়-যুগে মধ্য রোমানিয়ার ট্রানসিলভানিয়া ছিল হাঙ্গেরির দখলভুক্ত। ব্রাম স্টোকারের বিখ্যাত গল্প 'ড্রাকুলা'-র পটভূমি হল এই অঞ্চল। কাহিনি অনুসারে এখানেই ছিল রক্তচোষা কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গ প্রাসাদ। এই অঞ্চলে বাস্তবেও একটি প্রাসাদ আছে যার নাম ড্রাকুলাস ক্যাসল। তবে ওই ক্যাসলের কাউন্ট ড্রাকুলা বাস্তবে ছিলেন উদার এবং উপকারী মানুষ।

৮. **নাইট্রেট আমদানি করার সময়ে :** একজন চায়ের দালাল হঠাৎ পেরু থেকে নাইট্রেট আমদানি করতে গেল কী কারণে?

৯. **ব্ল্যাকহিদে :** ব্ল্যাকহিদের রাগবি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ সালে।

১০. **রিচমন্ডের :** রিচমন্ডের রাগবি ক্লাব সংগঠিত হয় ১৮৬১-তে। ১৮৭১-এ এই দুই ক্লাব অন্য আরও কয়েকটি ক্লাব মিলে রাগবি ফুটবল ইউনিয়ন গঠন করে।

১১. **ওল্ড ডিয়ার পার্ক :** রিচমন্ডের কাছাকাছি রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন লাগোয়া ওল্ড ডিয়ার পার্কের দশ একর জমি রিচমন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে লিজ দেওয়া হয় ১৮৬৫ সালে। পরের বছর ক্রিকেট ক্লাব ওই জমি রিচমন্ড ফুটবল ক্লাবকে ব্যবহার করতে দেয় শীতকালে রাগবি খেলবার জন্য।

১২. **ক্যুরারি :** নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ থেকে লব্ধ এক ধরনের বিষ। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে শিকার করতে বা যুদ্ধের সময়ে শত্রুর ওপর তিরের বা বর্শার ফলায় মাখিয়ে এই বিষ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

১৩. **কুকুরটার রাতারাতি রোগ হওয়াটা :** ক্যুরারি বা কিউরারির প্রথম অভিঘাত লক্ষিত হয় রোগীর মুখের পেশিতে। কুকুরটার তা হয়নি। বিষের আক্রমণে কুকুরটির মুখ, ঘাড় বা পায়ে কোনো অস্বাভাবিকত্ব দেখা যাওয়ার কথা। কিংবা কুকুরটির মরে যাওয়ার কথা।

তিনের ত্র্যহস্পর্শ[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গ্যারিডেবস]

কাহিনিটা কমেডি হতে পারে, ট্র্যাজেডিও হতে পারে। এর জন্যে তিনজনকে দাম দিতে হয়েছে তিন রকমের। একজন দিয়েছে বুদ্ধি, আমি দিয়েছি রক্ত, আর একজনের ঘটেছে শ্রীঘরবাস। তা সত্ত্বেও বলব বিচিত্র এই উপাখ্যানের মধ্যে কোথায় যেন একটা কৌতুকরস, একটা কমেডির সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যাকগে, বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আপনাদের ওপর।

তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে একটা কারণে। ঠিক সেইদিনই নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিল শার্লক হোমস[২]। যে-কাজের জন্যে এই সম্মান— সে-কাহিনি অন্য কোনো সময়ে বলা যাবে'খন। যার গল্প আমি লিখি, তার কাজকর্মের গোপনতা রক্ষা করাও আমার ধর্ম।

সময়টা জুনের শেষ, সাল ১৯০২। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে হোমসকে— যে-অভ্যেস মাঝেমধ্যেই দেখা যায় ওর মধ্যে।

কিন্তু সেই বিশেষ দিনটিতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল হাতে একটা লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে— ধূসর শুষ্ক চোখে দেখলাম কৌতুকের ঝিকিমিকি।

বলল, 'ভায়া ওয়াটসন, দু-পয়সা করার একটা সুযোগ তোমায় দিচ্ছি। গ্যারিডেব নামটা কখনো শুনেছ?'

'না।'

'তাহলে খুঁজে পেতে বার করে ফেলো একটা গ্যারিডেবকে— পয়সা পাবে।'

'কেন?'

'সে এক মস্ত কাহিনি। খামখেয়ালের ব্যাপার। মানুষের চরিত্রে কতরকম জটিলতাই যে আছে— এই বিশেষ খামখেয়ালটি নজিরবিহীন। এখুনি আসছে লোকটা— তখন জেরা করা যাবে'খন। কাজেই এ নিয়ে এখন আর কথা বলব না। নামটা খালি দেখো।'

টেলিফোন ডিরেক্টরিটা[৩] সামনেই টেবিলে পড়ে ছিল বলে পাতা উলটে দেখতে গিয়েছিলাম নিরাশ হব জেনেও, কিন্তু চমকে উঠলাম অদ্ভুত নামটা হঠাৎ চোখে পড়ায়।

'হোমস, এই তো সেই নাম!'

হাত থেকে ডিরেক্টরি নিয়ে পড়ে গেল হোমস, 'এন গ্যারিডেব, ১৩৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, ডব্লিউ। হল না ওয়াটসন, হল না। এ-চিঠি যে লিখেছে, এ-নামটা তারই। আমি চাই আর একজন গ্যারিডেবকে।'

এই সময়ে ট্রে-র ওপরে একটা কার্ড নিয়ে ঘরে এল মিসেস হাডসন।

দেখেই বললাম বিষম অবাক হয়ে, 'পেয়েছি! এই তো আরেক গ্যারিডেব! জন গ্যারিডেব, কাউন্সিলর অ্যাটল, মূরভিল[৪], কানসাস[৫], যুক্তরাষ্ট্র।'

মৃদু হেসে হোমস বললে, 'ভায়া আবার চেষ্টা করো। এ-প্লটের অন্যতম নায়ক ইনি— যদিও সাতসকালে বাড়ি বয়ে চলে আসবেন আশা করিনি। এসেছেন যখন তখন পেট থেকে কিছু কথা বার করা যাক।'

বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার জন গ্যারিডেব। ছোটোখাটো শক্তসমর্থ পুরুষ— আমেরিকান ঢংয়ে দাড়িগোঁফ কামানো গোলগাল পরিচ্ছন্ন মুখ— কীরকম যেন বাচ্চা বাচ্চা মুখশ্রী, দেখনহাসি ঝুলছে ঠোঁটের এ-কোণ থেকে সে-কোণ পর্যন্ত। চোখ দুটো কিন্তু নজর কাড়ার মতো। অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল, সজাগ। উচ্চারণ আমেরিকান— কিন্তু উদ্ভট টান নেই।

আমাদের দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনিই মিস্টার হোমস— ছবিতে যা দেখেছি, ঠিক তাই। আমার নামে নামি মিস্টার নাথন গ্যারিডেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন?'

'বসুন আপনিই মিস্টার জন গ্যারিডেব— আপনার নামও দেখছিলাম এই কাগজে। ইংলন্ডে বেশ কিছুদিন আছেন দেখছি।'

সন্দেহ ঝিলিক দিল জন গ্যারিডেবের চোখে, 'এ-প্রশ্ন কেন?'

'ইংলিশ ছাঁটের কোট প্যান্ট পরেছেন বলে।'

কাষ্ঠ হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার এসব কায়দার কথা শুনেছি বটে। শেষ পর্যন্ত আমাকেই তার শিকার হতে হবে ভাবিনি। বুঝলেন কী করে?'

'কোটের কাঁধ আর বুটের ডগা দেখে।'

ধাঁ করে রেগে গিয়ে জন গ্যারিডেব বললেন, 'কিন্তু জামার ছাঁট কীরকম তা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমি আসিনি। আমার সময়ের দাম আছে, মিস্টার হোমস। কাজ নিয়ে বেশ কিছুদিন আগেই লন্ডন এসেছি বলেই লন্ডনের কোট প্যান্ট পরতে হয়েছে।'

হোমস চটিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোককে— চোখ-মুখ বেশ লাল করে ফেললেন কথা বলতে বলতে।

'ধৈর্য ধরুন। আমার এই ছোটোখাটো পর্যবেক্ষণ যে তদন্তে সহায় হয় শেষ পর্যন্ত, ওয়াটসন তার সাক্ষী। মিস্টার নাথন গ্যারিডেব আপনার সঙ্গে এলেন না কেন বলুন তো?'

'আপনাকে এর মধ্যে টেনে আনার কী দরকার ছিল তা বলতে পারেন! আমার পেশা নিয়ে তাঁর কাছে গেছি, তিনি আমাদের মধ্যে বড়ো গোয়েন্দা মোতায়েন করলেন কী আক্কেলে? আজ সকালেই ওঁর মুখে শুনে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার। খুব খারাপ! খুব খারাপ! এসব চালাকির দরকার ছিল কি?'

'চটছেন কেন? আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে আমাকে তলব করেননি উনি, করেছেন আপনার লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনোর জন্যে। উনি জানেন খবর জোগাড় করার ক্ষমতা আমার আছে।'

শুনে গ্যারিডেবের রাগী মুখটা যেন একটু ফর্সা হল।

বললে, 'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আজ সকালে ওঁর ওখানে গিয়েই শুনলাম ডিটেকটিভ লাগানো হয়েছে। আপনার ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এসেছি শুধু একটা কথা বলতে— প্রাইভেট ব্যাপারে পুলিশ আবার কী? তবে হ্যাঁ, আপনি যদি সাহায্য করতে চান, কোনো ক্ষতি নেই।'

'তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলুন। আমার এই বন্ধুটি তো কিছুই জানেন না।'

'ওঁর জানার কি দরকার আছে?'

'একসঙ্গেই তদন্ত করি দুজনে।'

'গোপন করারও দরকার দেখছি না। কানসাসে যদি থাকতেন, তাহলে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন গ্যারিডেব যে কে, তা আর খুলে বলতে হত না। জমি কেনাবেচা করে ভদ্রলোক টাকার কুমির হয়ে যান। তারপর শিকাগোয় গমের ব্যাবসা করেন। তারপর আরকানসাস নদীর ধারে যত জমি আছে সব কিনে নেন।

'ভদ্রলোকের তিনকুলে কেউ নেই। যেহেতু নিজের পদবি গ্যারিডেব, তাই অন্যান্য গ্যারিডেবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার শখ ছিল প্রচণ্ড। অদ্ভুত খেয়ালও বলতে পারেন। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে সেই কারণেই। প্রায় বলতেন, "আরও একটা গ্যারিডেব বার করুন দিকি!" আমি বলতাম, "অত সময় আমার নেই," উনি বলতেন, "শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই করতে হবে।" তখন বুঝিনি কথাটার আসল মানে কী।

'বুঝলাম এই কথা বলার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যুর পর। একটা অদ্ভুত উইল রেখে গেলেন। সমস্ত ভাগ করে গেছেন তিন ভাগে। এক এক ভাগের পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ ডলার[৭]। পাবে তিনজন গ্যারিডেব। একজন আমি। আরও দুজনকে খুঁজে বার করতে হবে আমাকেই— ততদিন সম্পত্তি কেউ পাবে না।

'এতবড়ো মওকা পেলে আইনের কাজকারবার সরিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়া যায় গ্যারিডেবের খোঁজে। বেরোলামও। কিন্তু সারাযুক্তরাষ্ট্র চিরুনি আঁচড়ানো করেও পেলাম না একজন গ্যারিডেবকেও। এলাম লন্ডনে। লন্ডন টেলিফোন ডিরেক্টরিতে একজনের নাম দেখে ছুটলাম ভদ্রলোকের কাছে। গিয়ে দেখলাম আমার মতোই একক পুরুষ তিনি— আত্মীয় কেউ নেই— উইলে কিন্তু ঠিক সেইরকমটিই চাওয়া হয়েছে। তার মানে দুজন গ্যারিডেব পাওয়া গেছে— দরকার আরও একজনকে। আপনি যদি খুঁজে দিতে পারেন— দক্ষিণা পেয়ে যাবেন।'

মুচকি হেসে হোমস বললে, 'কি ওয়াটসন, বলেছিলাম না কেসটা খামখেয়ালের কেস? মিস্টার গ্যারিডেব হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছি। জবাব পাইনি।'

'বলেন কী! সত্যিই বড়ো অদ্ভুত কেস দেখছি! হাত খালি থাকলে মাথা ঘামানো যাবে'খন। ভালো কথা, টোপেকা থেকে কখন এসেছেন, তখন ডাক্তার লাইসান্ডার স্টারকে নিশ্চয় চেনেন? এককালে খুব চিঠিপত্র লিখতেন আমাকে। ১৮৯০ সালে মেয়র ছিলেন। এখন দেহ রেখেছেন।'

'ডাক্তার স্টার! কে-না চেনে ও-নাম? খুবই নামি পুরুষ ছিলেন। যাই হোক, এখন চলি। আসব দু-একদিনের মধ্যেই। নিশ্চয় খবর পাওয়া যাবে তখন,' বলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন আমেরিকান দর্শনার্থী।

অদ্ভুত হাসি ঠোঁটের কোণে ভাসিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে পাইপ টানল হোমস।

অনেকক্ষণ পরে আমিই মুখ খুললাম, 'কী হয়েছে? কিছু বলো?'

পাইপ নামিয়ে হোমস বললে, 'ভাবছি ওয়াটসন, আকাশ-পাতাল ভেবেই চলেছি।'

'কী নিয়ে ভাবছ ভায়া?'

'লোকটা এত ধাপ্পা মেরে গেল কেন। মুখের ওপর তা বলতে গিয়েও বললাম না— ও যে আমাদের বোকা বানিয়ে গেল— এই ধারণা নিয়েই যেতে দিলাম ইচ্ছে করেই। লোকটার হাতের

কনুই থেকে সুতো বেরিয়ে এসেছে, প্যান্টের হাঁটু গোল হয়ে গেছে— বছরখানেক লন্ডনে চষে না-বেড়ালে এমনি হয় না— অথচ বলছে সবে এসেছে আমেরিকা থেকে। সবে এলে উচ্চারণে মার্কিন টান থাকত— কিন্তু তা নেই। বেশ কিছুদিন এদেশের ঢংয়ে কথা বলায় উচ্চারণ প্রায় এদেশি। টোপেকায় ডাক্তার লাইসান্ডার স্টার বলে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে এই ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন বেরোয়নি— বেরোলে আমার চোখে পড়তই— অপরাধীদের খোঁজখবর নিতে ওই কলমটি আমি আদ্যোপান্ত রোজ পড়ি। তাই ভাবছি লোকটা এত মিথ্যে বলে গেল কেন, নিশ্চয় পাকা বদমাশ। গ্যারিডেবদের খুঁজে বার করার ব্যাপারটাও একটা গল্প— বানানো। এখন দেখা যাক, চিঠি যিনি লিখেছেন— সেই গ্যারিডেবটি জোচ্চোর কি না। টেলিফোন করো তো ওয়াটসন।'

করলাম। অপর প্রান্তে শুনলাম ক্ষীণ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই নাথান গ্যারিডেব। মিস্টার হোমস আছেন? দিন তো, বড্ড দরকার।'

হোমস রিসিভার নিয়ে কথা বলে গেল এইভাবে—

'হ্যাঁ, এসেছিলেন এখানে। আপনার সঙ্গে খুব একটা পরিচয় নেই দেখেই বুঝেছি... কদ্দিন?... মাত্র দু-দিন!... নিশ্চয়, নিশ্চয়, এত বড়ো মওকা পেলে ছাড়া ঠিক নয়... সন্ধের দিকে বাড়ি থাকবেন? তখন যেন আমেরিকান গ্যারিডেব না থাকেন... ঠিক আছে, তখন আসব... ওঁর সামনে এসব কথা বলতে চাই না... ডাক্তার ওয়াটসন আমার সঙ্গেই আসবেন... চিঠি পড়ে বুঝলাম বাড়ি ছেড়ে বড়ো একটা বেরোন না... ঠিক ছ-টায় আসছি... আমেরিকান উকিলকে বলবেন না যেন আসছি... ঠিক আছে, গুডবাই!'

বসন্তের মনোরম গোধূলি-আলোকে এসে দাঁড়ালাম লিটল রাইডার স্ট্রিটে। পড়ন্ত রোদে সোনালি দেখাচ্ছে পাথুরে রাস্তা। খুঁজে বার করলাম বাড়িটা। বেশ বড়ো বাড়ি। সেকেলে। পুরোনো আমলের জর্জিয়ান অট্টালিকা। সামনের দিকটা ইট দিয়ে তৈরি। দুটো বো-উইন্ডো— অর্থাৎ কুলুঙ্গিযুক্ত জানলা— যার তিনদিক থেকে আলো বাতাস আসতে পারে। যার খোঁজে আসা, তিনি থাকেন একতলাতেই এবং যতক্ষণ জেগে থাকেন, ততক্ষণ কাজ করেন এই দুটো জানলার সামনেই।

ছোটো ছোটো দুটো তামার প্লেট দেখিয়ে হোমস বললে, 'প্লেটের চেহারা দেখেছ? জরাজীর্ণ। তার মানে নামটা আসল নাম— নকল নয়।'

একটাই সিঁড়ি বেয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয় এবং তারপর বিভিন্ন ঘরে যেতে হয় মাঝের হল ঘর থেকে। অনেক চেম্বার আর অফিসের নাম লেখা প্লেট লাগানো রয়েছে হল ঘরের দেওয়ালে। আবাসিক ফ্ল্যাটবাড়ি বলতে যা বোঝায়— এ-বাড়ি তা নয়। বরং বলা যায় বেশ কিছু বাউন্ডুলে ব্যাচেলারদের আস্তানা। মিস্টার নাথান গ্যারিডেব ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে সমাদর করে নিয়ে গেলেন আমাদের। বয়স প্রায় ষাট। ঢিলেঢালা চেহারা। কৃশ অস্থিসর্বস্ব দীর্ঘকায় টেকো পুরুষ, মুখের চামড়া মড়ার চামড়ার মতো— যেন ব্যায়াম কী বস্তু তা কখনো টের পায়নি দেহ মন্দির, একটু ঝুঁকে চলেন, পিঠ বেঁকিয়ে হাঁটেন। সব কিছু যেন খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখেন গোল চশমার মধ্যে দিয়ে ছাগুলে দাড়ি নেড়ে। সব মিলিয়ে ভদ্রলোক অমায়িক, কিন্তু ছিটিয়াল।

ঘরটাও ভদ্রলোকের মতোই অদ্ভুত। বিশ্বের সব শাস্ত্রেই যে তাঁর অগাধ কৌতূহল— তার

নিদর্শন ঘরময় ছড়ানো। ঘর তো নয়— যেন একটা মিউজিয়াম। চওড়া, মোটা, লম্বা, খাটো আলমারি আর দেরাজে ঠাসা ঘরের প্রতি বর্গ ইঞ্চি মেঝে। প্রজাপতি আর মথ পোকা প্রবেশ পথের দু-পাশেই ঝুলছে বোর্ডে। মাঝখানে একটা মস্ত টেবিলে রাশি রাশি আবর্জনার মাঝে চকচক করছে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের লম্বা তামার নল। কোনো আধারে প্রাচীন মুদ্রার স্তূপ, কোথাও ফ্লিন্ট পাথরের যন্ত্রপাতি, কোথাও জীবাশ্ম শঙ্কু। ওপরে লাইনবন্দি মড়ার মাথার খুলির প্লাস্টার ছাঁচ। তলায় লেখা নিয়ানডারথাল[৮], ক্রোম্যাগঁ[৯], হাইডেলবার্গ[১০]। আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়েও স্যাময় চামড়া দিয়ে একটা মুদ্রা ঘষে চকচকে করতে করতে বললেন, 'সাইরাকুসানদের[১১] সেরা সময়ের মুদ্রা— পরের দিকে অধঃপতন ঘটেছিল যদিও। মিস্টার হোমস, চেয়ার থেকে হাড়গোড়গুলো সরিয়ে নিয়ে বসে পড়ুন। ডাক্তার ওয়াটসন, জাপানি ফুলদানিটা পাশে রেখে আপনিও বসুন। এইসব নিয়েই মশাই দিব্যি আছি। ডাক্তার বলে বাইরে বেরোই না কেন? বেরোতে কেন যাব বলতে পারেন? জীবনের আকর্ষণ যেখানে, জীবনটা তো সেখানেই কাটাব।'

উৎসুক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে হোমস বললে, 'কখনোই বেরোন না?'

'কদাচিৎ সোদবি অথবা ক্রিস্টিতে[১২] যাই গাড়ি নিয়ে, নইলে এ-ঘরের চৌকাঠ পেরোই না। গায়ে শক্তিও তেমন নেই— গবেষণা ছেড়ে নড়বার উপায়ও নেই। খবরটা কিন্তু দারুণ, তাই না মিস্টার হোমস? রাতারাতি কুবের বনে যাচ্ছি। আর একটা গ্যারিডেব কি পাওয়া যাবে না? নিশ্চয় যাবে। আপনি অনেক অদ্ভুত কেস নাড়াচাড়া করেন জেনে আপনাকেই তাই চিঠি লিখে বসলাম। আমেরিকান ভদ্রলোক অবশ্য তা চান না— কিন্তু আমি যা ভালো মনে করেছি, তাই করেছি।'

'খুব ভালো করেছেন,' সায় দিল হোমস। 'কিন্তু সত্যিই কি আমেরিকার জমিদারি আপনি চান?'

'দুর মশায়, আমার দরকার টাকার। এসব ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না। ওই ভদ্রলোক বলে গেলেন উনিই পাঁচ লাখ ডলার দিয়ে কিনে নেবেন আমার অংশ। ভাবতে পারেন? মাত্র কয়েকশো পাউন্ডের অভাবে অত্যন্ত দরকারি কয়েকটা নমুনা কিনতে পারছি না, পাঁচ লাখ ডলার পেলে তা একালের হান্স স্লোন[১৩] বনে যাব মশায়।'

বলতে বলতে চশমার আড়ালে চোখ জ্বলতে লাগল গ্যারিডেবের।

হোমস বললে, 'কেস হাতে নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয় বলেই আমি এসেছি। সব কথা চিঠিতেই লিখেছেন। দু-একটা প্রশ্ন শুধু করব। দু-দিন আগেও নিশ্চয় এই আমেরিকান ভদ্রলোকের খবর রাখতেন না?'

'ঠিক বলেছেন। রাখলাম মঙ্গলবার— উনি এলেন বলে।'

'আমাদের আজকের এই দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে কিছু বলছেন উনি?'

'রেগে কাঁই হয়ে গেছেন।'

'কেন?'

'এতে নাকি তাঁর মাথা কাটা গেল। পরে অবশ্য বেশ খুশি মনেই গেলেন।'

'কী করবেন কিছু বলেছেন?'

'না।'

'টাকাপয়সা চেয়েছেন আপনার কাছে?'

'না, একদম না!'

'উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন?'

'যা বলে গেলেন তার বেশি কিচ্ছু না।'

'আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলেছেন নাকি?'

'বলেছি।'

চিন্তায় পড়ল হোমস। মুখ দেখে বুঝলাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

'আপনার এখানে দামি জিনিস কিছু আছে?'

'না। পয়সাওলা লোক আমি নই, জিনিসপত্র সংগ্রহ করার বাতিক আছে বটে— কিন্তু দামি জিনিস কিছু নেই।'

'চোর ডাকাতের ভয় করেন না?'

'এক্কেবারেই না!'

'কদ্দিন আছেন এ-ঘরে?'

'বছর পাঁচেক।'

খটাখট খটাখট শব্দে কে যেন অধীরভাবে দরজা নক করায় বাগড়া পড়ল হোমসের জেরায়। দরজা খুলতেই ঝড়ের মতো ভেতরে ঢুকলেন আমেরিকান উকিল।

'এই যে! এসে গেছেন দেখছি!' মাথার ওপর একখানা কাগজ নাড়তে নাড়তে উল্লাসে যেন ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, 'জানতাম থাকবেন এখানে! অভিনন্দন নিন মিস্টার গ্যারিডেব। আজ থেকে আপনি টাকার কুমির হয়ে গেলেন। মিস্টার হোমস, মিছে কষ্ট দেওয়া হল আপনাকে।'

বলেই কাগজখানা ধরিয়ে দিলেন নাথান গ্যারিডেবকে। ফ্যালফ্যাল করে কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন খ্যাপাটে সংগ্রাহক। বিজ্ঞাপনটা এই—

হাওয়ার্ড গ্যারিডেব

কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতা

বাইন্ডার্স, রীপার্স, স্টিম অ্যান্ড প্লাউস, ড্রিলস, হ্যারোজ, ফার্মার্স কার্টস, বাকবোর্ডস এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি। আর্টেজীয় কূপখননের খরচপত্র জানানো হয়। গ্রসভেনর বিল্ডিংস, অ্যাসটন।

প্রায় খাবি খেতে খেতে বললেন নাথান গ্যারিডেব, 'দারুণ! দারুণ! তিন নম্বর গ্যারিডেব তাহলে এসে গেল!'

আমেরিকান গ্যারিডেব বললেন, 'বার্মিংহ্যামে লোক লাগিয়েছিলাম। ওখানকার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা তারই চোখে পড়ে। লিখে দিয়েছি আপনি যাচ্ছেন।'

'আমি!'

'মিস্টার হোমস, আপনি কী বলেন? মিস্টার নাথান গ্যারিডেব ইংলন্ডের মানুষ— আমি এসেছি আমেরিকা থেকে। ওকে অনেকে চেনে— আমাকে কেউ চেনে না। উনি গিয়ে যদি পুরো ব্যাপারটা হাওয়ার্ড গ্যারিডেবকে বুঝিয়ে বলেন, তিনি বিশ্বাস করবেনই, তাই না?'

‘কিন্তু আমি যে লন্ডন ছেড়ে বেরোইনি অনেক বছর?’

‘খুব একটা বেশি দূর তো যেতে হচ্ছে না। বারোটায় বেরোবেন— দুটো নাগাদ পৌঁছে যাবেন। রাতের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কাজও এমন হাতি-ঘোড়া নয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলে তিনিই যে হাওয়ার্ড গ্যারিডেব তার একটা শপথপত্র নিয়ে আসবেন। আরে মশাই, আমি আমেরিকা থেকে ট্যাঙস ট্যাঙস করে এতটা পথ এলাম, আর আপনি এই এক-শো মাইল যেতে পারবেন না?’

হোমস বললে, ‘ঠিক বলেছেন।’

অত্যন্ত নাচার ভঙ্গিমায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে নাথান গ্যারিডেব বললেন, ‘বেশ, সবাই যখন বলছেন, তখন যাব।’

‘ফিরে এসে খবর দেবেন কিন্তু,’ বললে হোমস।

‘সে-ভার আমার,’ সাততাড়াতাড়ি বললে আমেরিকান গ্যারিডেব। ‘তাহলে ওই কথাই রইল মিস্টার নাথান। কাল আপনাকে রওনা করিয়ে দেব বার্মিংহ্যামে— আমার হাতে বড্ড কাজ— শহর ছেড়ে নড়তে পারব না। আসছেন নাকি মিস্টার হোমস? আচ্ছা, তাহলে চলি। কাল রাত্রে সুসংবাদের আশায় থাকবেন।’

আমেরিকান উধাও হতেই চিন্তার ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল হোমসের মুখ থেকে।

বললে, ‘মিস্টার গ্যারিডেব, আপনার সংগ্রহগুলো দেখতে বড়ো ইচ্ছে যাচ্ছে। আমার এই পেশায় অনেক খবরই রাখতে হয় তো।’

গোল চশমার আড়ালে চকচক করে উঠল নাথান গ্যারিডেবের দু-চোখ।

‘দেখবেন? আপনার বুদ্ধিমত্তার অনেক প্রশংসা আমি শুনেছি। যদি সময় থাকে তো বলুন নিজেই দেখাচ্ছি।’

‘সময় এখন নেই— কাল হবে। তা ছাড়া আপনি কষ্ট করে দেখাবেন কেন? এমন চমৎকার ভাবে লেবেল লাগিয়ে রেখেছেন যে নিজেই দেখে নিতে পারব। আপত্তি আছে?’

‘এক্কেবারে না। ঘরদোর অবশ্য কাল বন্ধ থাকবে, চাবি থাকবে মিসেস সন্ডার্সের কাছে— চারটে পর্যন্ত উনি থাকেন। আপনি চাইলেই চাবি পাবেন।’

‘তাহলে একটু বলে রাখুন মিসেস সন্ডার্সকে। ভালো কথা, আপনার বাড়ির দালাল কে?’

অতর্কিত প্রশ্নে অবাক হলেন নাথান গ্যারিডেব।

‘এজওয়্যার রোডে হলোওয়ে অ্যান্ড স্টিল। কিন্তু কেন বলুন তো?’

‘বাড়িটা কত পুরোনো জানতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কুইন অ্যানির আমলের না জর্জিয়ান[১৪]?’

‘জর্জিয়ান।’

‘আমি অবশ্য আরও একটু পুরোনো ভেবেছিলাম। তাহলে এখন ওঠা যাক। সফল হোক আপনার বার্মিংহ্যাম সফর।’

বাড়ির দালালের অফিস কাছেই। কিন্তু অফিস বন্ধ থাকায় ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে। রাতের খাওয়া না-হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে আর একটা কথাও বলল না হোমস।

ডিনার শেষ হইতে বললে, ‘ওয়াটসন, সমস্যার সমাধান হতে আর দেরি নেই। তুমিও ধরে ফেলেছ নিশ্চয়?’

'ল্যাজা মুড়ো কিছুই বুঝছি না।'

'ল্যাজটা কাল পরিষ্কার হয়ে যাবে, মুড়ো বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনটায় প্লাউস বানানটা ভুল।'

'তুমিও দেখেছ? শাবাশ, দিনে দিনে তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে। ছাপাখানায় যেমন বানান পৌঁছেছে, সেইরকমটিই ছাপা হয়েছে। বাকবোর্ডস শব্দটাও আমেরিকান। আর্টেজীয় কূপ আমেরিকায় বেশি চালু। সব মিলিয়ে, বিজ্ঞাপন আমেরিকান— ছাড়া হয়েছে ইংলন্ডের মাটিতে। কী বুঝলে?'

'আমেরিকান গ্যারিডেব নিজেই ছাপিয়েছে। উদ্দেশ্যটা বুঝছি না।'

'নাথান গ্যারিডেবকে ঘর থেকে সরানো। কালকে বোঝা যাবে কেন ভদ্রলোককে সরানো হল বার্মিংহ্যামে।'

পরদিন সকাল সকাল উঠে বেরিয়ে গেল হোমস। ফিরল দুপুরে খাওয়ার সময়ে।

মুখ বেশ গম্ভীর।

বললে, 'ভায়া, কেসটা সিরিয়াস। বিপদ আছে।'

'কীরকম বিপদ?

'খুন হয়ে যাওয়ার। জন গ্যারিডেবের আসল নাম 'খুনে ইভ্যান্স।'

'খুলে বলো।'

'অপরাধের পাঁজি স্মৃতির মধ্যে রেখে দেখার পক্ষে সম্ভব নয়— কেননা এটা তোমার জীবিকা নয়। আমারও মনে হয়েছিল আমেরিকান গ্যারিডেবের ঠিকুজি কুষ্ঠি জানতে হলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডের কাছে যাওয়া দরকার; ওদের ঘিলুতে কল্পনা কম থাকতে পারে, কিন্তু খবর-টবরগুলো বেশ গুছিয়ে রাখে। চোর বদমাশ গুন্ডাদের ছবির ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে গেলাম আমেরিকান গ্যারিডেবের হাসিহাসি গোলগাল মুখখানা। গায়ে অনেক নামের নামাবলি। জেমস উইনটার ওরফে মর্টিমার, ওরফে খুনে ইভ্যান্স। বয়স ছেচল্লিশ। শিকাগোয় জন্ম। যুক্তরাষ্ট্রে গুলি করে মেরেছে তিনজনকে। সংশোধন-কারাগার থেকে সরে পড়ে রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন। লন্ডনে আসে ১৮৯৩ সালে। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াটারলু রোডের নাইট ক্লাবে তাসখেলা নিয়ে গুলি করে মারে একজনকে— খুন যে হয়, সেই নাকি প্রথম খুন করতে গিয়েছিল খুনে ইভ্যান্সকে— এইরকমভাবে কেসটা দাঁড় করানোয় সে ছাড় পায় ১৯০১ সালে। নিহত ব্যক্তির নাম রোজার প্রেসকোট। শিকাগোর বিখ্যাত জালিয়াত— নকল টাকা তৈরি করতে অদ্বিতীয়। খুনে ইভ্যান্স সেই থেকে পুলিশের নজরবন্দি— সৎ জীবনযাপন করেছে বলেই জানা গেছে ভীষণ বিপজ্জনক লোক, সবসময় পিস্তল থাকে সঙ্গে, গুলি চালাতে একদম আটকায় না। ওয়াটসন, এই লোককেই সামাল দিতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু এ-খেলায় তার লাভ?'

'বাড়ির দালালের কাছে গিয়ে শুনলাম, নাথান গ্যারিডেব এ-বাড়িতে পাঁচ বছর আছেন। তার আগে এক বছর বাড়ি খালি ছিল। তার আগে ও-ঘরে যে থাকত, তার নাম ওয়াল্ড্রন।

বেকার। লম্বা দাড়িওলা, কালচে মুখ! লোকটা হঠাৎ যেন উবে যায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে জেনেছি, খুনে ইভ্যান্স যাকে খুন করেছে, সেই প্রেসকোটের চেহারাও অবিকল ওইরকম— লম্বা দাড়িওলা, কালচে মুখ। তাহলে ধরে নিতে পারি, আমেরিকার মহাবদমাশ রোজার প্রেসকোট নাম ভাঁড়িয়ে যে-ঘরে থাকত সেই ঘরেই এখন মিউজিয়াম সাজিয়ে বসেছেন নাথান গ্যারিডেব। এই হল রহস্য শৃঙ্খলের পয়লা নম্বর আংটা।'

'তার পরের আংটাটা কী?'

'সেটা গিয়ে দেখব।'

বলে, ড্রয়ার খুলে একটা পিস্তল বার করে আমাকে এগিয়ে দিল হোমস।

'আমারটা আমার কাছেই আছে! ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রার সময় তুমি পাবে। ওয়াটসন, তারপর বেরিয়ে পড়ব রাউডার স্ট্রিট অ্যাডভেঞ্চারে।'

চারটে নাগাদ নাথান গ্যারিডেবের কোঠায় পৌঁছে দেখলাম মিসেস সন্ডার্স যাই-যাই করছেন। চাবিটা আমাদের কাছে গছিয়ে স্প্রিং-লক বাইরে থেকে টেনে দিয়ে তিনি বিদেয় হতেই একতলায় আমরা দুই মূর্তিমান ছাড়া আর কেউ রইলাম না। একটা আলমারি দেওয়াল থেকে একটু তফাতে বসানো ছিল। তার ফাঁকে গুড়ি মেরে ঢুকলাম দুজনে!

ফিসফিস করে হোমস বললে, 'ভায়া, নাথন গ্যারিডেবকে এ-ঘর থেকে অদ্ভুত অছিলায় সরানো হয়েছে নিশ্চয় একটা মতলব হাসিল করার জন্যে। খুনে ইভ্যান্সের ধড়িবাজির প্রশংসা না-করে পারছি না। তিন গ্যারিডেবের গল্পটা আগাগোড়া বানানো।'

'কিন্তু কেন?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম নাথান গ্যারিডেবের সংগ্রহ করা জিনিসপত্রের মধ্যে এমন কিছু দামি জিনিস আছে যার দাম নাথান গ্যারিডেব নিজেই জানেন না। তারপর যখন রোজার প্রেসকোটের নাম শুনলাম, এ-ঘরেই এককালে সে থাকত জানলাম এবং ইভ্যান্সের হাতেই প্রেসকোটের নরকগমনের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হলাম— তখন বুঝলাম ব্যাপারটা আরও গভীরে এবং এই ঘরখানার মধ্যেই প্রেসকাটের কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। নাথান গ্যারিডেব ঘর ছেড়ে একদম বেরোন না বলে তার অদ্ভুত নামের সুযোগ নিয়ে অদ্ভুত গল্প বানিয়ে ঘর থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে সেই রহস্য উদ্ধারের জন্যেই। একটু ধৈর্য ধরো— এখুনি জানা যাবে সেটা কী।'

জানা গেল খুব তাড়াতাড়ি। আলমারির পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে থাকতেই শুনলাম সদর দরজা খোলার শব্দ। তারপরেই স্প্রিং-লকে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ[১৫]। কড়াৎ করে তালা খুলে পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকল আমেরিকান ইভ্যান্স। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চোরা চাউনি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে হনহন করে এমনভাবে সটান মাঝের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যেন কী করতে হবে তা নখদর্পণে। টেবিলটা টেনে সরিয়ে তলার কার্পেট চৌকো করে টেনে ছিঁড়ে গুটিয়ে রাখল একপাশে। পকেট থেকে সিঁধকাঠি বার করে ভীমবেগে মেঝে খুঁড়ে একটু পরেই হ্যাঁচকা টান মারতেই সড়াৎ করে কাঠের পাটাতন হড়কে সরে যাওয়ার শব্দ পেলাম। একটা চৌকো ফোকর বেরিয়ে পড়েছে মেঝেতে। বেঁটে মোমবাতি আর দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে পাতালে নেমে গেল ইভ্যান্স।

আমাদের দেখেই ভয়ংকর রাগে কঠিন হয়ে গেল মুখখানা। কিন্তু আবার তা হাসি হাসি হয়ে উঠল জোড়া পিস্তলের নলটা তার দিকেই ফেরানো রয়েছে দেখে।
হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৫

আড়াল থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম দুজনে। মেঝের তক্তা আলগা ছিল বলেই হঠাৎ ক্যাঁচ শব্দ হতেই পাতাল ঘর থেকে সহসা বেরিয়ে এল ইভ্যান্সের মুখ। আমাদের দেখেই ভয়ংকর রাগে কঠিন হয়ে গেল মুখখানা। কিন্তু আবার তা হাসি হাসি হয়ে উঠল জোড়া পিস্তলের নলচে তার দিকেই ফেরানো রয়েছে দেখে। যেন দোষ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে কাষ্ঠ হেসে বললে, 'যাচ্চলে! সবই বুঝে ফেলেছেন দেখছি। খুব একহাত নিলেন তাহলে—'

বলেই ফস করে বুক পকেট থেকে পিস্তল বার করে পর পর দু-বার গুলি করে বসল

ইভ্যান্স। যেন একটা গরম লোহার শিক আমার উরু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল টের পেলাম। একই সঙ্গে সশব্দে হোমসের পিস্তলের বাঁট নেমে এল ইভ্যান্সের খুলির ওপর— রক্তাক্ত মুখে মুখ থুবড়ে পড়ল ইভ্যান্স। চকিতে তার পকেট হাতড়ে অস্ত্র-টস্ত্র বার করে নিয়ে আমাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল হোমস।

'ওয়াটসন! ওয়াটসন! লেগেছে তোমার?'

শুধু এই মুখের কথাটা— বজ্রকঠিন অনুভূতিবিহীন, আবেগহীন একটা মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আকুল এই ক-টি কথা শোনার জন্যে একটা গুলি কেন— আরও গুলি খেয়েও পেছপা হতাম না। শুষ্ক কঠোর দুই চক্ষু উদ্‌বেগে নিমীলিত হয়ে গিয়েছে দেখে বুকের ভেতরটা আমার কীরকম যেন করে উঠল।

বললাম, 'কিছু হয়নি, হোমস। সামান্যই।'

পকেট ছুরি বার করে আমার ট্রাউজার্সের খানিকটা ফ্যাঁস করে কেটে ছিঁড়ে ফেলল হোমস। ক্ষতস্থান দেখে বললে হাঁফছাড়া গলায়, 'যাক চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। ওহে, এবার তোমার পালা।' যার উদ্দেশে বলা হল শেষ কথাটা, সে তখন টলতে টলতে উঠে বসেছে মেঝের ওপর। 'ওয়াটসন মারা গেলে তোমাকেও আর জ্যান্ত বেরোতে হত না ও-ঘর থেকে।'

বেহুঁশের মতো বসে রইল ইভ্যান্স। হোমেসের হাতে ভর দিয়ে পাতাল ঘরের কিনারায় গিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। ইভ্যান্সের জ্বালানো মোমবাতির আলোয় দেখলাম বিস্তর মরচে ধরা যন্ত্র, রাশিরাশি বোতল আর একপাশে এক টেবিলের ওপর ছোটো ছোটো কাগজের বান্ডিল থরে থরে সাজানো।

হোমস বললে, 'ছাপাখানা— নোটজালের কারখানা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজার প্রেসকোটের নোটজালের কারখানা— গোটা লন্ডন শহরে এতবড়ো জালিয়াত আর ছিল না।' বলতে বলতে কোনোরকমে উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল ইভ্যান্স। 'টেবিলের ওপর দেখছেন দু-লক্ষ পাউন্ডের জাল নোট। আসুন, ভাগ নিন, চেপে যান।'

হাসল হোমস।

'এদেশে বখরা দিয়ে সটকানো যায় না ইভ্যান্স। প্রেসকোটকে তাহলে তুমিই খতম করেছিলে?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। করে আপনাদের অনেক উপকারই করেছি। প্রেসকোটের নোটের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের নোটের কোনো তফাত নেই— বাজারে বেরোলে টের পেতেন। আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি আপনাদের। তারপর না হয় নোটগুলো লুকোনো আছে কোথায় সেই খোঁজেই বেরিয়েছিলাম— দোষটা কোথায়? এখানে এসে দেখি এই মক্কেল ঘর জুড়ে বসে—কস্মিনকালেও বেরোয় না ঘর থেকে— জানেও না বসে আছে বিশলাখ পাউন্ডের ওপর। খুন করলেই আপদ মিটে যেত— এত ঝামেলা হত না। আমি আবার শুধু শুধু কাউকে গুলি করি না— গুলি না-করতে এলে গুলি চালাই না। প্রেসকোট ভুল করেছিল। কিন্তু এই মক্কেলকে ভালোয় ভালোয় সরিয়ে দিতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লাম জালে। ধরে কিন্তু রাখতে পারবেন না— নোট আমি জাল করিনি।'

'কিন্তু খুন করতে গিয়েছিলেন।' বললে হোমস। 'যাকগে, সে দেখবার মালিক আমরা নই। ওয়াটসন, দাও তো ভায়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে একটা ফোন করে। ওদের পাখি নিয়ে যাক ওরা।'

খুনে ইভ্যান্সের কিন্তু মন ভেঙে গেল এই ঘটনায়। স্বপ্নভঙ্গের পরিণামে নার্সিং হোমে কাটাতে হল দীর্ঘদিন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লন্ডনের সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্ট। অনেকদিন ধরেই তারা খবর রেখেছিল প্রেসকোটের নোট জালের কারখানা লন্ডনেই আছে— কিন্তু ঠিক কোথায় আছে সে-হদিশ পাচ্ছিল না কিছুতেই। পাবলিকের এতবড়ো একটা বিপদের অবসান ঘটায় তারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল বটে, কিন্তু খুনে ইভ্যান্সের জেল হয়ে গেল অ্যাটেম্পটেড মার্ডারের চার্জে।

টীকা

১. **তিনের ত্র্যহস্পর্শ** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি গ্যারিডেবস' ২৫ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের কলিয়ার্স উইকলিতে এবং জানুয়ারি ১৯২৫ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিল শার্লক হোমস** : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁশনে গল্পে জানা যায় শার্লক হোমস ফরাসি দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লিজিয়ঁ দ্য'নর গ্রহণ করেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে তাঁর নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যানের কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়।

৩. **টেলিফোন ডিরেক্টরিটা** : ডিরেক্টরির উল্লেখ পাওয়া গেলেও বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে টেলিফোনের উল্লেখ পাওয়া যায় শুধুমাত্র 'দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট' এবং 'দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান' গল্পে।

৪. **মূরভিল** : কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন কানস রাজ্যে মূরভিল নামে কোনো জায়গা নেই।

৫. **কানসাস** : বা কানস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য।

৬. **ছবিতে যা দেখেছি** : খবরের কাগজের রিপোর্টে হোমসের ছবি, নাকি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ইলাসট্রেটরের আঁকা ছবি, তা কিন্তু বলেননি জন গ্যারিডেব।

৭. **পঞ্চাশ লক্ষ ডলার** : বর্তমানের সূচকে কিন্তু এক-শো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা।

৮. **নিয়ানডারথাল** : ১৮৫৬ সালে জার্মানির নিয়ানডার উপত্যকায় আবিষ্কৃত আদিম গুহাবাসী হোমোস্যাপিয়্যান্সের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। মনে করা হয় এই মানুষ ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে প্লিস্টোসিন যুগের শেষ ভাগে বাস করত।

৯. **ক্রোম্যার্গ** : দশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার মানুষ হোমোস্যাপিয়েন্সের শেষদিকের প্রতিনিধি।

১০. **হাইডেলবার্গ** : হোমো ইরেকটাস বা হোমোস্যাপিয়েন্সের অন্তর্গত হাইডেলবার্গ ম্যানের চোয়ালের হাড় ১৯০৭-এ জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে করা হয় এই মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করতেন চার লক্ষ বছর আগে।

১১. **সাইরাকুসান** : সিসিলির সাইরাকুস বা সাইরাকিউস শহর রোমানরা দখল করে ২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

১২. **সোদবি অথবা ক্রিস্টি** : সোদবিজ এবং ক্রিস্টিজ লন্ডন শহরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিলামঘর। ১৭৪৪-এ সোদবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিস্টিজ হয় ১৭৬৬ সালে।

১৩. **হান্স স্লোন** : স্যার হান্স স্লোন (১৬৬০-১৭৫৩) ছিলেন ধনকুবের এবং সংগ্রাহক। এঁর সংগ্রহ নিয়েই ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রথম খোলা হয়।

১৪. **জর্জিয়ান** : ১৭১৪ থেকে ১৮৩০, রাজা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ জর্জের রাজত্বে নির্মিত স্থাপত্য বা তদসম্পর্কিত অন্য কিছু।

১৫. **চাবি ঘোরানোর আওয়াজ** : বাড়ির চাবি খুনে ইভান্স পেল কোথা থেকে? চোরের মতো উপায়ে খুলে থাকলে, এভাবে একবার ঘুরিয়েই তালা খোলা যেত না।

প্রস্তরের প্রহেলিকা[১]

[দ্য প্রব্লেম অফ থর ব্রিজ]

শেরিং ক্রসে কক্স অ্যান্ড কোম্পানির[২] ব্যাঙ্কের ভল্টে একটা তোবড়ানো টিনের বাক্স আছে। ডালায় লেখা আছে আমার নাম— জন এইচ[৩] ওয়াটসন, এম. ডি.। এককালের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর[৪] ডাক্তার। বহু দেশ পাড়ি দেওয়ার ফলে টোল খেয়ে বাক্সের অবস্থা শোচনীয়। ভেতরে ঠাসা শার্লক হোমসের বহুবিধ কেসের বৃত্তান্ত লেখা রাশি রাশি কাগজ। কতকগুলো কেস নিষ্ফল তদন্তেই শেষ হয়েছে। শার্লক হোমস হালে পানি পায়নি। সেসব নিয়ে গল্প লেখা আর হবে না— পাঠক মজা পাবে না। যেমন, জেমস ফিলিমোরের অসমাপ্ত কাহিনি। ভদ্রলোক ছাতা নেওয়ার জন্যে বাড়ি ফিরলেন— তারপর থেকেই বেমালুম যেন উবে গেলেন ধরাতল থেকে। বিচিত্র কাহিনি হিসেবে অ্যালিসিয়া জাহাজের[৫] অদ্ভুত রহস্যও কম যায় না। কুয়াশার মধ্যে ঢুকে জাহাজখানা যেন অদৃশ্যই হয়ে গেল লোকজন সমেত। ইসাদোরা পারসানোর উপাখ্যানও চক্ষু কপালে তুলে দেবার মতো বিস্ময়কর। ইনি একাধারে দুঁদে দ্বন্দ্বযোদ্ধা এবং সাংবাদিক। কিন্তু এহেন ব্যক্তিকেই একদিন দেখা গেল বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় সামনে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে আছেন— বাক্সের মধ্যে একটা আশ্চর্য পোকা, যে-পোকার নাম বিজ্ঞান এখনও শোনেনি। এ ছাড়াও এমন সব গোপন কাহিনি নিয়ে তদন্ত করেছে হোমস যা নিয়ে এখন গল্প লিখলে হইচই পড়ে যাবে। বাকি কেসগুলো কম বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও এতদিন গল্প লেখায় হাত লাগাইনি পাছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বন্ধুবরের সুনামে আঁচড় পড়ে— এই ভয়ে। এই ধরনের কিছু কেসে আমি নিজে থেকেছি, কিছু শুনেছি। আজ যে-কেসটা লিখতে বসেছি, তার মধ্যে আমি নিজে ছিলাম।

অক্টোবরের সকাল। বাড়ির পেছনে একমাত্র গাছটার শেষ পাতা ক-টাও হাওয়ায় ঝরে পড়ছে মাটিতে। শয্যাত্যাগ করে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্যে নামতে নামতে ভাবলাম, নিশ্চয় বিষণ্ণ মেজাজে দেখব হোমসকে। পরিবেশের প্রভাব ওর ওপর বড্ড বেশি পড়ে তো। কিন্তু দেখলাম তার বিপরীত। হালকা মুডে থাকলে যা— তাই। দুষ্ট প্রসন্নতা ভাসছে চোখে-মুখে। খুশি যেন উপচে পড়ছে। খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে।

বললাম, 'কী হে, হাতে কেস এসেছে মনে হচ্ছে?'

ও বলল, 'গোয়েন্দাগিরি জিনিসটা দেখছি ছোঁয়াচে রোগ। ঠিক ধরে ফেলেছ। মাসখানেক ছ্যাঁচড়া কাজ নিয়ে উপোসি থাকার ফলে আজ জবর কেস এসেছে হাতে।'

'ভাগ পাব তো?'

'ভাগ দেওয়ার মতো তেমন কিছু যদিও নেই, তাহলেও তোমার পাতের ওই কড়া সেদ্ধ ডিম দুটো সাবাড় করার পর এ নিয়ে কথা বলা যাবে'খন।'

পনেরো মিনিটেই শেষ হল প্রাতরাশ— সাফ হয়ে গেল টেবিল। পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস বললে, সোনার রাজা নীল গিবসনের নাম নিশ্চয় শুনেছ?'

'সে তো কিছুদিনের জন্যে ছিলেন। আসলে ওঁর খ্যাতি অন্য কারণে। সোনার খনিওয়ালাদের মধ্যে ওঁর চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই পৃথিবীতে।'

'এখন আছেন ইংলন্ডে।'

'বছর পাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ারে বাড়ি কিনেছেন। ওঁর স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর খবরটা নিশ্চয় শুনেছ?'

'এখন মনে পড়েছে। নামটা ওইজন্যেই অত চেনা চেনা লাগছে।'

চেয়ারে গাদা করা একরাশ কাগজ দেখিয়ে হোমস বললে কেসটা যে শেষ পর্যন্ত আমার হাতে আসবে ভাবিনি। ঘটনাটা সাংঘাতিক চাঞ্চল্যকর। কিন্তু দারুণ সোজা— কোনো সমস্যাই নেই যেন। করোনারের জুরি যাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বও দোষের মাত্রা লাঘব করতে পারেনি— ঘটনা ঘটনাই থেকে গিয়েছে এবং নতুন কোনো ঘটনা না-জানা পর্যন্ত মক্কেল ভদ্রলোকের খুব একটা উপকার করতে পারব বলেও মনে হয় না।'

'তোমার মক্কেল?'

'এই দেখো! তোমার সঙ্গে থেকে থেকে পেছন থেকে গল্প বলা অভ্যেস করে ফেলেছি। আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেরে বসে আছি। এই নাও, পড়ো।' বলে চিঠিখানা এগিয়ে দিল হোমস। বেশ কড়া হাতে লেখা চিঠির ভাবটা এইরকম :

ক্ল্যারিজ্স হোটেল
তেসরা অক্টোবর

প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস,

ঈশ্বর যে-মেয়েটিকে সব মেয়ের সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন, এইভাবেই কি তার মৃত্যু হবে? তাকে বাঁচানোর জন্যে কোনো চেষ্টাই কি হবে না? বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই, কিছু বুঝতেও পারছি না— শুধু বলব, মিস ডানবার নিরপরাধিনী। দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে-ব্যাপার, আপনিও তা জানেন। গুজবের অন্ত নেই, প্রতিবাদে কেউ কিন্তু সোচ্চার হচ্ছে না। এতবড়ো অন্যায় আমি আর সইতে পারছি না— মাথা খারাপ হতে বসেছে। মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না যে-মেয়ে, সে করবে মানুষ খুন? কাল ঠিক এগারোটায় আমি আসছি। দেখুন, অন্ধকারে আলো আবিষ্কার করতে পারেন কি না। সূত্র হয়তো আমার কাছে, কিন্তু আমিই জানি না তা কী। আমার সর্বস্ব আপনার— যদি তাকে বাঁচাতে পারেন। আপনার ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগ করুন এই কেসে।

আপনার বিশ্বস্ত
জে নীল গিবসন

ব্রেকফাস্ট পাইপ থেকে ছাই ফেলে দিয়ে ফের তামাক ঠাসতে ঠাসতে হোমস বললে, 'বসে আছি এঁর জন্যেই। কেসটা সব কাগজেই বেরিয়েছে। সমস্ত পড়বার হয়তো সময় পাওনি। আমি ছোটো করে বলছি। যিনি আসছেন, পৃথিবীতে এঁর টাকার দাপট প্রচণ্ড। মানুষ হিসেবেও অতি ভয়ংকর, অতি প্রচণ্ড। যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি এখন যৌবনোত্তীর্ণা। দুই সন্তানের ভার দেওয়া ছিল পরমাসুন্দরী এক গভর্নেসের হাতে। তিন জনের মধ্যে থেকে একজন, মানে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, সোজাসুজি খুন হয়ে গেলেন একটা ঐতিহাসিক খামারবাড়িতে। মাথায় বুলেট, গায়ে শাল, পরনে ডিনার ড্রেস। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে গভীর রাতে পাওয়া গেল তাঁর দেহ। খুনের অস্ত্র ডেডবডির কাছে পাওয়া যায়নি— খুনের কোনো পত্রও পাওয়া যায়নি।

ওয়াটসন, পয়েন্টটা খেয়াল রেখো— ডেডবডির ধারেকাছে হত্যার হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। খুনটা হয়েছে সন্ধে নাগাদ, ডেডবডি চোখে পড়েছে রাত এগারোটা নাগাদ, পুলিশ আর ডাক্তার তন্নতন্ন করে লাশ পরীক্ষা করে তবে বাড়ির মধ্যে এনেছে। খুব ছোটো হয়ে গেল না তো? স্পষ্ট হল?'

'খু-উ-ব। কিন্তু সন্দেহটা গভর্নেসের ওপর কেন?'

'স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে। একই বুলেটের ক্যালিবারের পিস্তল পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলার ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে— একটা চেম্বার খালি।' বলতে বলতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল হোমসের— ছাড়া ছাড়া ভাবে বললে নিজের মনে, 'পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলার ওয়ার্ডরোবের— নীচের তাকে।' এ-লক্ষণ আমি চিনি। চিন্তার ট্রেন ছুটছে মাথায়। বাগড়া দেওয়া ঠিক হবে না। ঝাঁকি মেরে ফের প্রাণবন্ত হল সেকেন্ড কয়েক পরেই। বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে। খুবই খারাপ। তার চাইতেও খারাপ হল একটা চিরকুট। লিখেছেন গভর্নেস। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন গিবসনের স্ত্রীর সঙ্গে। চিরকুট মুঠোর মধ্যে নিয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জায়গায় খুন হয়েছেন তিনি। কী বুঝলে? চূড়ান্ত প্রমাণ হল মোটিভ। সিনেটর গিবসন বিপত্নীক হলে গভর্নেসের পোয়াবারো। প্রেম, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এসে যাবে গিবসনের প্রসাদে। ওয়াটসন, কেস অতি কদর্য!

'খুবই।'

'গভর্নেস নিজেও তাঁর অন্যত্রস্থিতি বলতে পারেননি। উলটে তিনি যে ওই সময়ে ওই জায়গায় ছিলেন— তা বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী দেখেছে।'

'তাহলে তো হয়েই গেল।'

'উঁহু, তাহলেও... সব হয়েও... যাকগে! লাশ পাওয়া গেছে থর ব্রিজের মুখে। পাথরের ব্রিজ। থর জলা যেখানে সরু হয়ে গিয়েছে, তার ওপর তৈরি পাথরের ব্রিজটার নাম থর ব্রিজ। আরে, মক্কেল ভদ্রলোক দেখছি একটু আগেই এসে গেলেন।'

বলতে-না-বলতেই দরজা খুলে বিলি যাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এবং নামটা তার আগেই বলে গেল— তিনি নীল গিবসন নন। মার্লো বেটস। নার্ভাস, রোগা, ভয়ার্ত চক্ষু। দুজনের কেউই চিনি না ভদ্রলোককে। কম্পিত কলেবর দেখে আমার ডাক্তারি মন বলল, লোকটা স্নায়ুপীড়নের ধকল সইতে না-পেরে ভেঙে পড়ার মুখে এসে পৌঁছেছেন।

হোমস বলল, 'বড্ড উত্তেজিত দেখছি আপনাকে। বসুন। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। এগারোটায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'জানি কার সঙ্গে আছে।' হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন মার্লো বেটস— যেন দম আটকে এল প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে, 'নীল গিবসন আমার মনিব— আমি তার এস্টেট ম্যানেজার। শয়তান, পিশাচ জানোয়ার কোথাকার!'

'বড্ড শক্ত শক্ত কথা বলছেন কিন্তু।'

'মনের কথা চট করে বোঝাতে চাই বলেই বলছি। সময় খুব কম। এখানে আমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। আজ সকালে সেক্রেটারি ফার্গুসনের কাছে শুনলাম উনি আসছেন এখানে। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।'

'আপনি না তাঁর ম্যানেজার?'

'ছিলাম— চাকরিতে জবাব দিয়েছি। পিশাচ নীল গিবসন দানধ্যান করে শুধু কুকীর্তি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে। সবচেয়ে জঘন্য ব্যবহার করেছে নিজের বউয়ের সঙ্গে। জানোয়ার কোথাকার! কী করে মারা গেলেন মিসেস গিবসন বলতে পারব না— তবে ওঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল এই শয়তান। মিসেস গিবসনের জন্ম গরমের দেশে— ব্রেজিলে। জানেন তো?'

'এই শুনলাম।'

'স্বভাবটাও তাই গরম। সূর্যের দেশের মেয়ে— আবেগে ফুটতেন সবসময়ে। স্বামীকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু যেই রূপ যৌবন গেল, এককালে খুবই রূপবতী ছিলেন— আরম্ভ হয়ে গেল শয়তানির শয়তানি। অসম্ভব ধূর্ত, অসম্ভব বদমাশ। মুখের কথায় ভুলবেন না। যা বলবে, ঢাকবে তার বেশি। আমি চলি। না, না, আটকাবেন না— এসে গেল বলে নীল গিবসন!'

ঘড়ির দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল বিচিত্র আগন্তুক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হোমস বললে, 'নীল গিবসনের কর্মচারীরা মনিবের প্রতি খুব একটা অনুগত নন দেখছি। ভালোই হল। হুঁশিয়ারিটা কাজে লাগবে!'

ঠিক এগারোটার সময়ে সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকলেন স্বনামধন্য কোটিপতি। এক নজরেই হাড়ে হাড়ে বুঝলাম কেন ম্যানেজার ভদ্রলোক যমের মতো ভয় পান মনিবকে এবং কেনই-বা প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারিরা অভিশাপের পাহাড় জমিয়েছে এঁর মাথায়। যদি ভাস্কর হতাম, চামসিটে বিবেকসম্পন্ন লৌহকঠিন স্নায়ুতে গড়া মূর্তি গড়ার বায়না যদি পেতাম, মডেল হিসেবে বেছে নিতাম নীল গিবসনকে। এবড়োখেবড়ো পাথরের মতো বিরাট দীর্ঘ চেহারায় আগাগোড়া প্রচণ্ড লালসা আর অপরিমেয় ক্ষুধা যেন ফুটে বেরোচ্ছে। আব্রাহাম লিঙ্কনকে যদি সৎ কাজ থেকে ছেঁটে এনে বদকাজে লাগানো হয় তাহলে যা দাঁড়ায়, নীল গিবসন তাই। মুখখানা যেন গ্র্যানাইট কুঁদে তৈরি। কঠিন। অনুতাপবিহীন। অজস্র কঠিন রেখায় অসংখ্য সংকট পেরিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। ধূসর শীতল চোখ দিয়ে পর্যায়ক্রমে দুজনকে মেপে নিলেন প্রথমেই। আমার পরিচয় দিল হোমস। অভিবাদন সেরে নিয়ে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন হোমসের একদম সামনে।

বললেন, 'টাকার অভাব হবে না মিস্টার হোমস। টাকা ছড়ান— কিন্তু প্রমাণ করে দিন ভদ্রমহিলা নির্দোষ। বলুন, কত নেবেন?'

ঠান্ডা গলায় হোমস বললে, 'আমি যা নিই, তার বেশি কখনোই নিই না। অথবা একদম পয়সাই নিই না।'

'বেশ, টাকার দরকার না-থাকলে নামডাকের প্রয়োজন তো আছে। সারাইংলন্ডে হইচই পড়ে যাবে এ-কেস যদি ঠিকমতো সাজিয়ে দিতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। নামডাকের প্রয়োজন আমার নেই। আমি আড়ালে থেকে কাজ করতেই ভালোবাসি। সমস্যাটাই আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণ। বাজে সময় নষ্ট না-করে কাজের কথায় বরং আসা যাক।'

'খবরের কাগজেই নিশ্চয় সব জেনেছেন?'

'একটা খবর বাদে।'

'কোনটা?'

'আপনার সঙ্গে মিস ডানবারের আসল সম্পর্কটা কী?'

দারুণ চমকে উঠলেন স্বর্ণ নৃপতি। চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়লেন— সামলে নিলেন নিজেকে।

'মিস্টার হোমস, সীমা রেখে ডিউটি করবেন আশা করি?'

'অবশ্যই।'

'মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মনিবের সঙ্গে কর্মচারীর সম্পর্কের মতোই— ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যখন থাকে, দেখাশুনা হয় শুধু তখন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, 'তাহলে আপনি আসতে পারেন। আমি ব্যস্ত মানুষ। বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে চাই না।'

ভীষণ রাগে মুখ লাল হয়ে গেল নীল গিবসনের। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হোমসের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে বললেন বজ্রকণ্ঠে, 'তার মানে?'

'কেস ছেড়ে দিলাম।'

'কারণটা কী? দাম বাড়াচ্ছেন? না, ভয় পাচ্ছেন? সোজা জবাব দিন।'

'সোজাই বলছি! কেসটা জটিল, ভুল খবরে আরও জটিল হবে।'

'তার মানে বলতে চান আমি মিথ্যে বলছি?'

'ভদ্রভাবে বলতে চেয়েছি— কিন্তু আপনি যখন সোজাভাবে জানতে চাইছেন— প্রতিবাদ করব না।'

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম কোটিপতির মুখে পৈশাচিক ভাবের বিস্ফোরণ আর উদ্যত মুষ্টি দেখে। হোমস কিন্তু ক্লান্তভাবে হেসে হাত বাড়াল পাইপের দিকে।

বললে, 'মিস্টার গিবসন, গোলমাল করবেন না। ব্রেকফাস্টের পর চেঁচামেচি ভালো লাগে না। রাস্তায় গিয়ে হাওয়া খান— মাথা ঠান্ডা হবে।'

নীল গিবসনের প্রশংসা না-করে পারছি না। অসীম মনোবলে মুহূর্তের মধ্যে শান্ত করে নিলেন নিজেকে।

বললেন, 'কাজটা ভালো করলেন না। আমাকে ঘাঁটিয়ে কেউ পার পায় না।'

'অনেকেই অমন বলে আমাকে, এখনও আছি বহাল তবিয়তে।' হেসে হেসেই বলল হোমস। 'আচ্ছা আসুন, সংসারে এখনও অনেক শিক্ষার বাকি আপনার।'

দুমদাম করে বেরিয়ে গেলেন নীল গিবসন। পাইপ টানতে টানতে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নীরবে কিছুক্ষণ কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করল হোমস।

তারপর বললে, 'কী বুঝলে হে?'

'পথের কাঁটা যে-লোক এভাবে সরাতে চায়, তার পক্ষে রূপযৌবনহীনা স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। মিস্টার বেটস ঠিকই বলেছেন।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কী? তুমি জানলে কী করে?'

'ধাপ্পা মেরে। চিঠির ভাষা আবেগে কাঁপছে— সংযত গুছোনো মোটেই নয়। কিন্তু সামনাসামনি কথা বলছে রেখে ঢেকে— নিশ্চয় শুধু কর্মচারীকে বাঁচানোর জন্যে এ-রকম কাণ্ড কেউ করে না— ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। তাই সরাসরি ঘা মারতেই ফেটে বেরিয়ে এল আসল মূর্তি। কিছুই জানি না শুধু আঁচ করেছি।'

'ফিরে আসবেন নিশ্চয়।'

'আলবত আসবেন। এভাবে কেস ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওই তো ঘণ্টার আওয়াজ, সিঁড়ি দিয়ে সেই পায়ের মালিক আসছে না? আসুন মিস্টার গিবসন এইমাত্র বলছিলাম ওয়াটসনকে, আপনি এলেন বলে।'

অনেকটা মার্জিত চরণে ঘরে প্রবেশ করলেন কোটিপতি! হোমসের দাওয়াইতে কাজ হয়েছে— কিন্তু অপমানের জ্বালা চোখ থেকে এখনও যায়নি। কমনসেন্স দিয়ে বুঝেছেন কাজ উদ্ধার করতে হলে নতিস্বীকার করতেই হবে।

বললেন, 'ভেবে দেখলাম আপনি প্রশ্ন করেছেন সংগত কারণেই। কিন্তু আমার সঙ্গে মিস ডানবারের সম্পর্ক এ-কেসে আসছে না।'

'সেটা আমি বুঝব।'

'অর্থাৎ ডাক্তারের মতোই রুগির সব খবর আপনি জানতে চান?'

'হ্যাঁ! রুগির পক্ষে তা গোপন করা কি ঠিক?'

'দুম করে যদি একজন মহিলার সঙ্গে আসল সম্পর্ক কী জিজ্ঞেস করেন, স্পষ্ট কথা কি বলা যায়? প্রত্যেক মানুষেরই গোপন কথা থাকে— অন্যের প্রবেশ সেখানে নিষেধ। যাক কী জানতে চান বলুন।'

'যা সত্যি, তাই।'

মনে মনে কথাটা সাজিয়ে নিলেন কাঞ্চনসম্রাট। আরও ভারী, আরও গম্ভীর, আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখটা।

'সংক্ষেপে বলছি। আমার স্ত্রী মেরিয়া পিন্টোকে বিয়ে করেছিলাম ব্রেজিলে কুড়ি বছর আগে সোনা খোঁজার সময়ে[৭]। পরমাসুন্দরী বলতে যা বোঝায়, মেরিয়া ছিল তাই। বিয়ের পর আবেগ যখন থিতিয়ে এল, তখন দেখলাম ওর সঙ্গে আমার মনের মিল কোথাও নেই। আমার ভালোবাসায় ভাটা পড়ল— কিন্তু ওর ভালোবাসা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। লোকে বলে আমি নাকি নিষ্ঠুর হয়েছি স্ত্রীর প্রতি। হয়েছি ইচ্ছে করেই। যাতে আমাকে ও ঘৃণা করতে পারে। কিন্তু এত করেও ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি।

'এরপর আমাদের বিজ্ঞাপনের জবাবে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে এল মিস গ্রেস ডানবার। কাগজে নিশ্চয় তার ছবি দেখেছেন। দুনিয়া জানে সে সুন্দরী। একই বাড়িতে তার মতো মেয়ের প্রতি দুর্বলতা না-নিয়ে থাকা যায় না— আমিও পারিনি। সেটা কি দোষের?'

'দোষের হবে তখনই যখন আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলবেন ভদ্রমহিলার কাছে। কেননা, উনি এসেছেন আপনার আশ্রয়ে চাকরি করতে।'

'হয়তো তাই,' মুখে বললেন বটে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য তিরস্কারের ধাক্কায় স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল দুই চোখে। 'আমি যা নই তা বলতে চাই না নিজেকে। জীবনে যা চেয়েছি মিস ডানবারকেও আমি চাই, চাই তার ভালোবাসা। সে-কথা বলাও হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি?' ভীষণ দেখাল হোমসকে।

'বলেছি উপায় থাকলে এখুনি বিয়ে করতাম। টাকা যত লাগে দিতে রাজি— তার সুখের জন্যে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত।'

'অসীম করুণা আপনার।' অবজ্ঞা শানিত স্বর হোমসের।

'মিস্টার হোমস, আমি নীতিজ্ঞান শুনতে আসিনি।'

'অসহায় যে-মেয়েটির সর্বনাশ করার জন্যে আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন, তাকে আইনের চোখে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্যে এ-কেস আমি হাতে নিয়েছি। আপনাদের মতো বড়ো লোকদের জানা দরকার দুনিয়ায় ঘুস দিয়ে সব জিনিস কেনা যায় না।'

অবাক হয়ে গেলাম এতবড়ো একটা ভর্ৎসনা কাঞ্চন সম্রাট বেমালুম হজম করে গেলেন দেখে।

বললেন, 'এখন তা বুঝছি। ঈশ্বর যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন। মিস ডানবার আমার কোনো কথাই রাখেনি— সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল।'

'গেল না কেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমত, আমি কথা দিয়েছিলাম, আর গায়ে হাত দেব না। এই কথাতেই সে থেকে যায়। কিন্তু আমি জানি কারণ আর একটা আছে। আমার ওপর তার প্রভাবটাকে সে ভালো কাজে লাগাতে চেয়েছিল।'

'কীভাবে?'

'মিস্টার হোমস, মিস ডানবার আমার অনেক খবর রাখে। সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে যে ক্ষমতা— আমার তা আছে। আমি ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারি, গড়তে পারি। ব্যক্তিবিশেষও নয়— সমাজ।'

শহর এমনকী একটা জাতকেও। ব্যাবসা বড়ো কঠিন খেলা— এ-খেলায় দুর্বলের ঠাঁই নেই। আমি নিজে হেরে কাঁদিনি— অন্যের কান্নায় গলে যাইনি। কিন্তু মিস ডানবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য রকম। সে বলে একজন মানুষের যেটুকু দরকার, তার বেশি তার থাকার প্রয়োজন নেই এবং দশ হাজার রিক্ত মানুষকে ধ্বংস করে একজনের বিত্ত বাড়ানোও পাপ। ডলার চিরকাল থাকে না— যা চিরন্তন, মিস ডানবার ডলারের পাহাড় পেরিয়ে সেইদিকেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে— সারাদুনিয়ার মঙ্গল এইভাবেই করছিল আমার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যেই ও থেকে যায়। তারপরেই ঘটল এই ঘটনা।'

'ঘটনাটা সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?'

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে মিনিট কয়েক কী যেন চিন্তা করে নিলেন স্বর্ণ সম্রাট।

বললেন, 'কেস খুবই খারাপ। মেয়েদের মন বোঝা ভার— বাইরে এক, ভেতরে আর এক। প্রথমে তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে কী জানেন, মিস ডানবারের বাইরেটাই অ্যাদ্দিন দেখেছি।

তারপর ভেবে দেখলাম, তা নয়। ঈর্ষা জিনিসটা শুধু দেহ নয়— মনকে নিয়েও গড়ে ওঠে। মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কেবল মনের— আমার স্ত্রী তা টের পেয়েছিল। ডানবারের মনের প্রভাব যে আমার ওপর প্রচণ্ড— যে-প্রভাব আমার স্ত্রীও সৃষ্টি করতে পারেনি— তা সে বুঝতে পেরেই নিশ্চয় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক রক্তের মধ্যে আমাজনের হলকা রয়েছে তো। পিস্তল নিয়ে তাই খুন করতে গিয়েছিল মিস ডানবারকে— কিন্তু ধস্তাধস্তিতে গুলি নিজের মাথাতেই লেগেছে।'

হোমস বললে, 'সম্ভাবনাটা আমিও ভেবেছি। ঠান্ডা মাথায় খুন করার বিকল্প সিদ্ধান্ত হিসেবে শুধু এইটাই সম্ভব।'

'কিন্তু মিস ডানবার তো তা মানছে না।'

'তারপরেও ধরুন আচ্ছন্ন অবস্থায় কোনো মেয়েমানুষের পক্ষে রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড়ের আলমারিতে রেখে দেওয়া বিচিত্র নয়— কী করছে সে-হুঁশ হয়তো তখন ছিল না। পরে যখন পিস্তল পাওয়া গেল, তখন মিথ্যে বলা বা অস্বীকার করাটাও স্বাভাবিক। এই যে সিদ্ধান্ত, এর বিপক্ষে কী পয়েন্ট থাকতে পারে বলুন?'

'মিস ডানবার নিজে।'

'হয়তো।'

ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস, 'সকালটা যাবে পারমিট বার করতে, সন্ধের ট্রেনে পৌঁছে যাব উইনচেস্টার। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা বা আপনার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়।'

সরকারি অনুমতি বার করতে একটু দেরি হল। উইনচেস্টারে না-গিয়ে সেদিন আমরা গেলাম নীল গিবসনের এস্টেট থর প্লেসে। নীল গিবসন নিজে এলেন না— সার্জেন্ট কভেন্ট্রির ঠিকানা দিয়ে দিলেন। কেসটা প্রথমে ইনিই তদন্ত করেছেন। রোগা লম্বা বিবর্ণ চেহারার মানুষ। যা জানেন, যেন তার চাইতে ঢের কম বলেন— এমনি একটা রহস্য আর গোপনীয়তা জাগিয়ে রাখেন হাবভাবের মধ্যে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর ফিসফিসানিতে নামিয়ে এনে এমন একটা ভাব করেন যেন খবরটা দারুণ কিছু— আসলে তা নেহাতই মামুলি। এইসব কায়দা-টায়দার আড়ালে লোকটা অতি সজ্জন এবং ভালো মানুষ। এ-রহস্যের কিনারা করার মতো বুদ্ধি যে তাঁর ঘটে নেই, যেকোনো সাহায্য পেলে বর্তে যাবেন— তা স্বীকার করে বসলেন অকপটে— যদিও মুখখানা গোমড়া করে।

'মিস্টার হোমস, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য নিয়ে মুশকিল আছে। কেস ফয়সালা করে কৃতিত্বটা তারাই নিয়ে যাবে— আমাকে দুর্নামে ডুবিয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে আপনি অনেক ভালো। সোজা লোক আপনি। অনেক সুনাম শুনেছি।'

'কারো সাতেপাঁচে থাকি না।' শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বিষণ্ণবদন অফিসার, 'কেস ফয়সালা করলেও নিজের নাম কোনো ব্যাপারে জড়াই না।'

'আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন, মিস্টার হোমস। ডক্টর ওয়াটসনকে নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায়। চলুন, অকুস্থলে যাওয়া যাক। তার আগে একটা কথা শুধু আপনাদের বলতে চাই,' বলে

এমনভাবে জুল জুল করে চারদিক দেখে নিলেন সার্জেন্ট যেন কথাটা মুখ দিয়ে বলতে ভরসা পাচ্ছেন না, 'মিস্টার নীল গিবসন নিজেই খুন করেননি তো?'

'আমিও ভেবেছি সেইরকম।'

'মিস ডানবারকে দেখলে বুঝবেন অমন মেয়ে ত্রিভুবনে নেই। পথের কাঁটা বউকে সরিয়ে দিয়েছেন নীল গিবসন নিজেই। আমেরিকানরা সব পারে। কথায় কথায় বন্দুক চালায়। পিস্তলটাও তো তাঁর।'

'প্রমাণ পেয়েছেন?'

'এক জোড়া পিস্তলের একটায় খুন হয়েছেন মিসেস গিবসন।'

'জোড়া পিস্তল? আরেকটা কোথায়?'

'বাড়িময় তো পিস্তল ছড়ানো। মিলিয়ে দেখা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বাক্সের মধ্যে দুটো পিস্তলের জায়গা আছে দেখছি।'

'কিন্তু মিলিয়ে না-দেখলে নিঃসন্দেহ হবেন কী করে?'

'চলুন না, গিয়ে দেখবেন'খন। সাজিয়ে রেখেছি সব।'

'পরে দেখব। এখন চলুন অকুস্থলে।'

সার্জেন্ট কভেন্ট্রির সাদাসিদে কটেজটাই স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি। এখান থেকে হেঁটে গেলাম প্রায় আধ মাইল পথ। ঝরা ফার্নের সোনালি আর ব্রোঞ্জ পাতায় ছাওয়া, হাওয়ায় দামাল অনুর্বর গুল্ম সমাকীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে পৌঁছোলাম থর প্লেস এস্টেটে ঢোকবার সাইড-গেটের সামনে। দূরে রাস্তার শেষে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে একটা আধা-জর্জিয়ান আধা-টিউডর বিশাল বাড়ি—অর্ধেক তৈরি গাছের গুঁড়ি দিয়ে। আমাদের পাশেই নলবনে আকীর্ণ জলা। জলা যেখানে সংকীর্ণ, ঠিক সেই জায়গায় গাড়িতে যাওয়ার পাথুরে ব্রিজ। দু-পাশে জলা বিস্তৃত হয়ে লেকের আকার নিয়েছে। ব্রিজে ওঠবার মুখে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে গেলেন।

জমির দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এইখানে পাওয়া গেছে মিসেস গিবসনের দেহ।'

'লাশ সরানোর আগে আপনি এসেছিলেন তো?'

'নিশ্চয়। সঙ্গেসঙ্গে খবর পাঠিয়েছিল আমাকে।'

'কে খবর পাঠিয়েছিল?'

'মিস্টার গিবসন নিজে লোকমুখে খবর শুনেই সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে আসেন এখানে— পইপই করে প্রত্যেককে বলে দেন পুলিশ না-আসা পর্যন্ত যেন কিছু সরানো না হয়।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। খবরের কাগজে লিখেছে, খুব কাছ থেকে নাকি গুলি করা হয়েছে?'

'খুবই কাছ থেকে।'

'ডান রগে?'

'একটু পেছনে।'

'লাশ কীভাবে পড়ে ছিল?'

'চিত হয়ে। ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাইনি। বাঁ-মুঠোয় আঁকড়ে ধরা ছিল মিস ডানবারের লেখা চিরকুটটা।'

'আঁকড়ে ধরেছিলেন?'

'আস্তে। আঙুল খুলতে হিমশিম খেয়ে গেছি।'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এ থেকে বোঝা যায়, মিথ্যে সূত্র হিসেবে চিরকুটটা খুনের পর হাতে গুঁজে দেওয়া সম্ভব ছিল না। চিরকুটের বয়ানও তো খুব ছোট্ট, "রাত ন-টায় থর ব্রিজে থাকব।— জি. ডানবার।" তাই?'

'আজ্ঞে।'

'মিস ডানবার স্বীকার করেছেন চিরকুট তাঁরই লেখা?'

'করেছেন।'

'কেন দেখা করতে এসেছিলেন, বলেছেন?'

'যা বলবার জেলা আদালতে বলবেন, বলেছেন।'

'ইন্টারেস্টিং সমস্যা। বিশেষ করে চিঠির ব্যাপারটা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একমাত্র অকাট্য প্রমাণ।'

মাথা নেড়ে হোমস বললে, 'কিন্তু চিঠিখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে দেখা করলেন কেন গিবসন? চিঠি পেয়েছিলেন রাত ন-টার বেশ আগে— ঘণ্টাখানেক আগে তো বটেই। অতক্ষণ পরেও চিঠি ধরে রইলেন কেন? চিঠি নিয়ে নিশ্চয় কথা হচ্ছিল না? অদ্ভুত নয় কি?'

'সেইরকমই তো দেখছি।'

'বসে বসে ভাবা যাক', বলে পাথরের পাঁচিলে বসে তীক্ষ্ণ চোখে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেল ব্রিজের উলটোদিকের পাঁচিলের সামনে। পকেট থেকে আতশকাচ বার করে পাথরের কারুকাজ দেখতে দেখতে বললে— 'অদ্ভুত তো?'

'আমিও দেখেছি, স্যার। পাথরে চটা উঠে গেছে। অনেক লোক যায় তো ব্রিজ পেরিয়ে, তাদেরই কারুর কীর্তি।'

পাথরটা ধূসর, কিন্তু এক জায়গা সাদা দেখাচ্ছে চটা উঠে যাওয়ায়। ছ-পেনি মুদ্রার সাইজে খানিকটা জায়গা ভেঙে গেছে। যেন একটা জোরালো চোট লেগেছিল ঠিক ওই জায়গাতেই।

চিন্তামগ্ন চোখে হোমস বললে, 'বেশ জোরে ঘা মেরে ভাঙা হয়েছে দেখছি। হাতের ছড়ি দিয়ে গায়ের জোরে মারল পাঁচিলে, কিন্তু পাথর চটাতে পারল না। বেশ কড়া মার। লেগেওছে বড়ো অদ্ভুত জায়গায়। ওপর থেকে নয়, নীচ থেকে। পাঁচিলের তলার কিনারায়— দেখছেন?'

'কিন্তু লাশ পড়েছিল এখান থেকে কম করেও পনেরো ফুট দূরে।'

'তা ঠিক। তাহলেও ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। পায়ের ছাপ-টাপ পেয়েছেন?'

'মাটি লোহার মতো শক্ত। কোনো ছাপ নেই।'

'তাহলে যাওয়া যাক। আগে বাড়ির ভেতরে— অস্ত্রগুলো দেখব। তারপর উইনচেস্টারে— মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলব।'

নীল গিবসন তখন ফেরেননি শহর থেকে। ম্যানেজার মিস্টার বেটস ছিলেন। নিউরোটিক চেহারা নিয়ে তিনিই আমাদের মনিব সংগৃহীত রকমারি সাইজের বন্দুক পিস্তল দেখিয়ে মনে মনে যেন বিরাট তৃপ্তি পেলেন।

বললেন, 'মাথার কাছেও গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঘুমোন মিস্টার গিবসন। শত্রুর শেষ নেই—

যা ব্যাভার, হবেই-বা না কেন। আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসেন যে ভয়ে সিটিয়ে থাকি। মিসেস গিবসনও নিশ্চয় আতঙ্কে থেকেছেন যে ক-টা দিন বেঁচেছিলেন।'

'মারধর করতে কখনো দেখেছেন?'

'না। তবে কথা শুনেছি। চাকরবাকরদের সামনেই স্ত্রীকে যা মুখে আসে তাই বলে গেছেন।'

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হোমস বললে, 'কোটিপতির প্রাইভেট লাইফ খুব উজ্জ্বল নয় দেখা যাচ্ছে। মিস্টার বেটস ভদ্রলোক সম্বন্ধে যত মন্দ কথাই বলুন না কেন, শহর থেকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফেরার পর চৌকাঠ পেরোননি খুনের খবর পাওয়ার আগে পর্যন্ত। সাড়ে আটটার সময়ে তো ডিনার ঘরে ছিলেন। পক্ষান্তরে, মিস ডানবার খুনের ঠিক আগেই মিসেস গিবসনের কাছে ছিলেন মুখে স্বীকার করছেন— তার বেশি কিছু বললেন না উকিল বারণ করেছে বলে। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। শুধু একটা ব্যাপারের জন্যেই একে খুনি বলে ধরে নিচ্ছি না।'

'কী ব্যাপার হোমস?'

'ওঁরই জামাকাপড়ের আলমারিতে পিস্তল খুঁজে পাওয়াটা।'

'বল কী। সেইটাই ওঁর বিপক্ষে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ!'

'খুব অকাট্য নয়। কাগজ পড়েই খটকা লেগেছিল। কাছে এসে অসংগতিটা আরও চোখে পড়ছে। সংগতি যতক্ষণ না পাচ্ছি, ধরে নেব কোথাও একটা চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

'বুঝলাম না কী বলতে চাও।'

'ওয়াটসন, ধরো তুমি একজন মহিলা। খুব ঠান্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হনন করতে চাও। প্ল্যান ঠিক করে ফেললে। একটা চিরকুটও লেখা হল। খুন যে হবে, সে এল। হাতে তোমার অস্ত্রও আছে। খুন করলে। ভারি নিখুঁত কাজ— কোথাও কোনো ফাঁক রইল না। এরপর কি বলতে চাও অপরাধী হিসেবে তোমার এত সুনাম নষ্ট করবে পাশের নলবনে অস্ত্রটা ছুড়ে না ফেলে দিয়ে সেটাকে ধরে এনে নিজেরই ওয়ার্ডরোবে সযত্নে রেখে দিয়ে? নলবন হাতের কাছেই, ছুড়ে ফেলে দিলে জীবনে কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু এমন একটা জায়গায় রাখলে সবার আগে যেখানে সার্চ করা হবে। ওয়াটসন, তুমি যে ধুরন্ধর চক্রী, এ-অপবাদ তোমার প্রাণের বন্ধুও তোমাকে দেবে না— তা সত্ত্বেও বলব এ-রকম আহাম্মুকি তোমার দ্বারাও জীবনে সম্ভব নয়।'

'উত্তেজনার মুহূর্তে—'

'কক্ষনো না। এত ঠান্ডা মাথায় যে-খুন করা হয়— ঠান্ডা মাথায় খুনের প্রমাণ লুকিয়ে রাখাও সেক্ষেত্রে করা হয়। না হে, মারাত্মক ভুল ধারণার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের।'

'কিন্তু অনেক কিছুই তাহলে অস্পষ্ট থেকে যায়।'

'স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। দৃষ্টিকোণ পালটে গেলেই আগে যা ধোঁয়াটে পরে তা সূত্র হয়ে ওঠে। যেমন ধরো, এখানে ধোঁয়াটে ব্যাপার হচ্ছে রিভলভার। মিস ডানবার বার বার বলছেন রিভলভার তিনি রাখেননি। নতুন থিয়োরি অনুসারে তিনি সত্যি বলছেন যদি ধরে নিই, তাহলে কেউ এই বস্তুটি তাঁর ওয়ার্ডরোবে রেখেছে। কে রেখেছে? এমন কেউ যে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করাতে চায়। এই ব্যক্তিই কি প্রকৃত অপরাধী নয়? দেখলে, কীভাবে সঠিক তদন্ত লাইন ধরে ফেললাম।'

উইনচেস্টারে রাত কাটাতে বাধ্য হলাম সরকারি অনুমতি পেতে দেরি হল বলে। পরের দিন সকালে মিস ডানবারের আইনবিদ উঠতি ব্যারিস্টার কামিংসকে নিয়ে গেলাম ভদ্রমহিলার কারাকক্ষে। পরমাসুন্দরী কাউকে দেখব আশা করেই গিয়েছিলাম— কিন্তু এ-রকম আশ্চর্য রূপ দেখব ভাবতেও পারিনি। দাপুটে কোটিপতিও যে কেন এঁর কথায় ওঠবোস করেন, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। ভদ্রমহিলা কৃষ্ণাঙ্গী, চুলও কালো। ধারালো চোখে-মুখে এমন একটা ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা দেখে বোঝা যায় এঁর দ্বারা কোনোরকম অপকর্মই সম্ভব নয়— মহৎ কাজ ছাড়া আর কিছুতেই সায় নেই। জালে জড়িয়ে পড়া অসহায় প্রাণীর মতো কালো চোখ দুটিতে ভাসছে আকুলতা আর আর্তি— বেরোবার পথ যে আর নেই তা অন্তর দিয়ে যেন বুঝতে পেরেছেন। এই অবস্থায় যখন দেখলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা এসেছে তাঁকে বাঁচাতে, তখন রং ফুটল দুই গালে, আলো জাগল দুই চোখে।

খাটো গলায় উত্তেজনা ভাসিয়ে বললেন, 'মিস্টার নীল গিবসনের কাছে শুনেছেন তো আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক?'

'শুনেছি। কিন্তু কোর্টে সব কথা খুলে বলেননি কেন?' শুধোয় হোমস।

'ভেবেছিলাম একদিন সত্য প্রকাশ পাবে। ঘরোয়া কেলেঙ্কারি পাবলিককে জানাতে চাইনি। এখন দেখছি সত্য প্রকাশ পাচ্ছে না— আরও তলিয়ে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক। আপনার অবস্থা এখন খুব সঙিন। কাজেই আমার অনুরোধ কিছু লুকোবেন না।

'না, কিছুই লুকোব না।'

'তাহলে বলুন মিসেস গিবসনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কীরকম ছিল।'

'ঘৃণার, বিদ্বেষের, ঈর্ষার। আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। গরমের দেশের মেয়ে— স্বভাবও তাই। আধাআধি কিছু করেন না— যা করেন পুরোপুরি। আমাকে ঘেন্না করার ব্যাপারেও তাই। ওঁর স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আত্মিক, সম্পূর্ণ মানসিক এবং তাঁর মঙ্গলের জন্যেই ও-বাড়িতে আমি থেকে গিয়েছিলাম— তা বুঝতে পারেননি। এখন দেখছি, আমি না-থাকলেও ও-বাড়িতে সুখ কোনোদিন ফিরে আসত না।'

'ঠিক কী-কী ঘটেছিল সেই রাতে পর পর বলে যান।'

'বলব, কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারের অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

'আপনি না-পারলেও অন্যে পারবে। আপনি খালি ঘটনাগুলো বলে যান।'

'থর ব্রিজে গিয়েছিলাম মিসেস গিবসনের চিঠি পেয়ে। সকাল বেলা স্কুলরুমে বোধ হয় নিজের হাতেই চিঠিখানা রেখে গিয়েছিলেন। ডিনারের পর যেন দেখা করি, খুব জরুরি দরকার, কথা আছে। আমার জবাব যেন বাগানের সূর্যঘড়ির ওপর রেখে আসি। ওঁর চিঠিখানা যেন পড়বার পর পুড়িয়ে ফেলি। অবাক হইনি। স্বামীকে যমের মতো ভয় করতেন। স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন মিস্টার গিবসন। এ নিয়ে অনেকবার বকাবকি করেছি ওঁকে।'

'মিসেস কিন্তু আপনার চিঠি পোড়াননি— খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর সময়ে চিঠি মুঠোয় ছিল শুনে খুবই অবাক হয়েছি।'

'তারপর কী হল?'

'যা মুখে এল বলে গেলেন। কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে শুনলাম চিলের মতো চেঁচিয়ে আমার মুণ্ডপাত করছেন।'
এ. গিলবার্ট, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২২

'কথা দিয়েছিলাম বলেই গেলাম। যাওয়ার পর বুঝলাম কীভাবে মনেপ্রাণে আমাকে উনি ঘেন্না করতেন। এক বাড়িতে এতদিন থেকেছি, অথচ একবারের জন্যেও বুঝতে দেননি আমি ওঁর দু-চক্ষের বিষ। বুঝিয়ে দিলেন সেইদিন। যা মুখে এল বলে গেলেন। সেসব কথা শোনাও পাপ। কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে শুনলাম চিলের মতো চেঁচিয়ে আমার মুণ্ডপাত করছেন। দাঁড়িয়ে ছিলেন থর ব্রিজের মুখের কাছে।

'মৃতদেহ পরে কোথায় পাওয়া গেল?'

'যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার কয়েক গজ দূরে।'

'ফেরার পথে গুলি ছোড়ার শব্দ শোনেননি?'

'না। ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। শোনবার বা দেখবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। সোজা নিজের ঘরে গেছিলাম।'

'ঘর থেকে আবার বেরিয়েছিলেন সকালের আগে?'

'হ্যাঁ। মিসেস গিবসন খুন হয়েছেন শুনেই সবার সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'মিস্টার গিবসনকে তখন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ব্রিজ থেকে ফিরে ডাক্তার আর পুলিশকে খবর পাঠাচ্ছিলেন।'

'খুব বিচলিত মনে হয়েছিল?'

'মিস্টার গিবসন শক্ত মানুষ। ভেতরের আবেগ বাইরে ফোটান না। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছিল ভেতরে ভেতরে খুব নাড়া খেয়েছেন।'

'এবার আসল পয়েন্টে আসা যাক। পিস্তলটা আগে দেখেছিলেন?'

'জীবনে না।'

'পাওয়া গেল কখন?'

'পরের দিন সকালে পুলিশ এসে যখন সার্চ করল।'

'আপনার জামাকাপড়ের মধ্যে?'

'হ্যাঁ, নীচের তাকে।'

'কতক্ষণ ছিল সেখানে বলে মনে হয়?'

'তার আগের সকালেও ছিল না।'

'কী করে জানলেন?'

'ওয়ার্ডরোব গুছিয়েছিলাম বলে।'

'তাহলে ঘরে ঢুকে কেউ পিস্তল রেখে গেছে আপনাকে ফাঁসানোর জন্যে।'

'নিশ্চয় তাই।

'কিন্তু কখন?'

'খাবার সময়ে অথবা যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে স্কুলঘরে ছিলাম— তখন!'

'চিঠি পাওয়ার পর ওই ঘরেই ছিলেন?'

'সমস্ত সকালটা ছিলাম।'

'পাথরের ব্রিজে এক জায়গায় চটা উঠে গেছে। সদ্য পাথর ভেঙেছে। লাশ যেখানে পড়ে ছিল— ঠিক তার উলটোদিকে। কেন বলতে পারেন?'

'নিছক কাকতালীয়।'

'খুবই অদ্ভুত কাকতালীয়, মিস ডানবার। ঠিক যেখানে যে সময়ে খুন হল, পাথরের চটা উঠল কেন ঠিক সেই জায়গায় সেই সময়ে?'

'উঠবেই-বা কী করে? গায়ের জোরে পাথরে ঘা না-মারলে ওভাবে চটা ওঠানো যায় না।'

জবাব দিল না হোমস। আচমকা টানটান হয়ে গেল পাণ্ডুর মুখখানা— ধূসর দুই চোখে ভেসে উঠল দূরায়ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমি চিনি। রহস্যকূপের নিতলে তলিয়ে সূত্র অন্বেষণে ধ্যানস্থ এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্যসন্ধানী। ধ্যানমগ্ন সেই মূর্তির সামনে কথা বলারও সাহস হল না আমার, ব্যারিস্টারের বা মিস ডানবারের। আচমকা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে প্রচণ্ড স্নায়বিক শক্তিতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠে যেন ফেটে পড়ল আত্যন্তিক আবেগ, 'ওয়াটসন, চলো!'

'কী হল, মিস্টার হোমস?'

'মাই ডিয়ার লেডি, অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে, রহস্যের মেঘ উঠে যাচ্ছে। মিস্টার কামিংস, শিগ্‌গিরই সারাইংলন্ড কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো একখানা কেস আপনাকে দেব। মিস ডানবার, খবর পাবেন কাল সকালেই।'

উইনচেস্টার থেকে থর প্লেস খুব একটা লম্বা পথ নয়— কিন্তু ট্রেনে বসে ছটফট করতে লাগল শার্লক হোমস— পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। থর প্লেসের কাছাকাছি আসতেই আচমকা আমার মুখোমুখি বসে দু-হাত আমার হাঁটুর ওপর রেখে দুই চোখে বিষম কৌতুক আর প্রচণ্ড নষ্টামি নাচিয়ে বললে, 'ওয়াটসন, অভিযানে বেরোলেই সঙ্গে পিস্তল রাখ তুমি, তাই না?'

রাখি ওর জন্যেই। সমস্যায় ডুবে গেলে আত্মরক্ষার খাতিরে পিস্তল নেওয়ার কথাও খেয়াল থাকে না হোমসের— তাই বহুবার প্রয়োজনের মুহূর্তে আমার পিস্তল বাঁচিয়ে দিয়েছে ওর অমূল্য জীবন। কথাটা মনে করিয়ে দিলাম।

ও বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আবার একটু অন্যমনস্ক এসব ব্যাপারে। পিস্তলটা এবারেও এনেছ আশা করি?'

হিপ-পকেট থেকে বার করে দিলাম হাতিয়ার। ক্যাচ খুলে বুলেটগুলো হাতে নিয়ে হোমস বললে, 'বড্ড ভারী দেখছি।'

'নিরেট বলেই ভারী।'

মিনিটখানেক কী যেন ভাবল হোমস।

বলল, 'ভায়া, এ-তদন্তে তোমার এই পিস্তল একটা বড়ো ভূমিকা নিতে যাচ্ছে।'

'মাই ডিয়ার হোমস, ইয়ার্কি মেরো না।'

'আমি কিন্তু সিরিয়াস। একটা টেস্ট করব— টেস্টে তোমার পিস্তল যদি পাশ করে যায়— তাহলেই কেল্লা ফতে। একটা বুলেট বাইরে রাখলাম— পাঁচটা ভেতরে রাখলাম আরও ওজন বাড়ল। চমৎকার।'

ওর মাথায় যে কীসের খেলা চলছে, বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না। বসে রইলাম চুপচাপ। হ্যাম্পশায়ার স্টেশনে পৌঁছে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে হাজির হলাম সার্জেন্টের আস্তানায়।

'সূত্র পেয়েছেন নাকি, মিস্টার হোমস?'

'সেটা নির্ভর করছে ডক্টর ওয়াটসনের পিস্তল কীরকম ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে— তার ওপর। এই নিন পিস্তলটা। দশগজ সরু দড়ি দিতে পারেন?'

টোয়াইন সুতোর একটা গোলা পাওয়া গেল গাঁয়ের দোকান থেকে।

'এতেই হবে', বলল হোমস। 'চলো এবার অভিযানের শেষ পর্ব শুরু করা যাক।'

'তখন সূর্য ডুবেছে। হ্যাম্পশায়ারের দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত জলাভূমি অপূর্ব সুন্দর লাগছে পড়ন্ত আলোয়। হোমসের মস্তিষ্ক আদৌ সুস্থ আছে কি না, সে-সন্দেহ হরেকরকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে সার্জেন্টের বক্র চাহনির মধ্যে। অকুস্থলে গিয়ে বুঝলাম বাইরে যতই স্থির থাকতে চেষ্টা করুক না কেন, ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়েছে শার্লক হোমস।

আমার টিপ্পনীর জবাবে বললে, 'আগে বেশ কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি তুমি জান। আমি সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি লক্ষ্যটা কোথায়— তা সত্ত্বেও অনেক সময়ে হেদিয়ে মরেছি। এ-কেসেও উইনচেস্টার জেলে বসেই বিদ্যুৎচমকের মতো সম্ভাবনাটা খেলে গেছে মাথার মধ্যে— দেখা যাক তা কতদূর সত্যি।'

হাঁটতে হাঁটতেই টোয়াইন সুতোয় একদিক শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল রিভলভারের হ্যান্ডেলে।

অকুস্থলে পৌঁছে সার্জেন্টের মুখে শোনে ঠিক কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে মিসেস গিবসনের মৃতদেহ। তারপর খুঁজেপেতে একটা বড়োসড়ো পাথর এনে সুতোর আর একদিক বাঁধল পাথরে। ঝুলিয়ে দিল পাথরের পাঁচিলের অন্য দিকে। পাথর ঝুলতে লাগল জলের ঠিক ওপরে। তারপর লাশ যেখানে পড়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে টান টান সুতোয় বাঁধা আমার পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল সোল্লাসে, 'এইবার।'

বলেই, পিস্তল ঠুসে ধরল নিজের রগে এবং মুঠি আলগা করল পর মুহূর্তেই। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে ঝুলন্ত পাথরের ওজন পিস্তলটাকে সাঁৎ করে টেনে নিয়ে গেল ব্রিজের ওপর দিয়ে, ঠকাং করে লাগল উলটোদিকের পাঁচিলে এবং চোখের নিমেষে পাঁচিল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। একলাফে পাথুরে পাঁচিলের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিষম উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল শার্লক হোমস।

'পেয়েছি! পেয়েছি! এর চাইতে অকাট্য হাতেনাতে প্রমাণ আর হয় না! দেখলে তো ওয়াটসন, সমস্যার সমাধান করল তোমার রিভলভার!' দেখলাম, পাঁচিলের তলার দিকে চটা উঠে গেছে পিস্তলের ঘায়ে— আগের চটার ঠিক পাশে— সাইজ এবং আকার হুবহু এক।

বিমূঢ় বিস্মিত সার্জেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হোমস বললে, 'আজ রাতটা সরাইখানায় কাটাব। আঁকশি-হুক এনে আমার বন্ধুর রিভলভারটা উদ্ধার করে দিন। পাশেই পাবেন সুতো আর পাথর বাঁধা আর একটা রিভলভার— মিস্টার গিবসনের জুড়িদার রিভলভার— যা দিয়ে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়ে নিজের অপরাধ গোপন করে নিরপরাধিনীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চেয়েছিলেন মিসেস গিবসন। মিস্টারকে জানিয়ে দেবেন কাল সকালে আমি যাব ওঁর কাছে, তারপর মিস ডানবারকে খালাস করার ব্যবস্থা করা যাবে'খন।'

সেইদিনই রাত্রে সরাইখানায় বসে পাইপ টানতে টানতে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, থর ব্রিজ রহস্য নিয়ে তুমি গল্প নিশ্চয় লিখবে, কিন্তু আমার সুনাম খুব একটা বাড়বে না। আমার গোয়েন্দাগিরি আর্টের মূল ভিত হল কল্পনা আর বাস্তবের সহাবস্থান। এ-কেসে আমি তার কথা ব্যবহার করতে পারিনি। পাথরের চটা চোখের সামনেই ছিল— কিন্তু অতবড়ো সূত্রটা দেখেও কল্পনাকে কাজে লাগাতে দেরি করেছি।

'মিসেস গিবসনের মনে যে-খেলা চলছিল, তা এত গভীর যে ওপর ওপর বোঝার সাধ্যি কারোরই ছিল না। ভালোবাসা বিকৃত হলে যে অঘটন ঘটাতে পারে, আমাদের এতদিনকার অ্যাডভেঞ্চারময় জীবনে তা কখনো ঘটেনি। স্বামীর ওপর মিস ডানবারের আত্মিক অথবা মানসিক প্রভাবের কদর্থ উনি করেছিলেন। ভেবেছিলেন স্বামী তাঁর সঙ্গে যে গর্হিত আচরণ করছে, তার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন মিস ডানবার। তাই প্রথমে নিজেকে হনন করে মিস ডানবারকে এমন দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন যা আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ।

'প্লট তৈরি করলেন খুব ভেবেচিন্তে নিখুঁতভাবে। কায়দা করে চিঠি লিখিয়ে নিলেন মিস ডানবারকে দিয়ে— দেখে মনে হবে যেন তিনি নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলেন থর ব্রিজে। শেষ মুহূর্তে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিলেন চিরকুটটা মুঠোয় ধরে রেখে— এই একটা বিসদৃশ ব্যাপার দেখেই যেকোনো সন্দিগ্ধ মানুষের সজাগ হওয়া উচিত ছিল।

'বাড়িতে সিন্দুকে অনেক পিস্তল ছিল। একটা নিলেন কাজ সারার জন্যে! জোড়া পিস্তলটা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা গুলি ছুড়ে এনে সকালের দিকে লুকিয়ে রাখলেন মিস ডানবারের ওয়ার্ডরোবের জামাকাপড়ের মধ্যে। তারপর গেলেন থর ব্রিজে— অত্যন্ত মৌলিক পন্থায় হাতিয়ার উধাও করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মিস ডানবার এলেন। আশ মিটিয়ে তাঁকে গালাগাল দিলেন। মিস ডানবার পালিয়ে যেতেই চক্রান্ত যবনিকা ফেললেন নিজের জীবনে যবনিকা টেনে[৮]। রহস্য-শৃঙ্খলে এখন আর কোথাও কোনো ফাঁক নেই— পাশাপাশি সাজানো হয়ে গেল সবকটা আংটা। খবরের কাগজগুলো অবশ্য এরপর চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাবে আগেভাগে জলায় জাল ফেলা কেন হয়নি বলে, কিন্তু এতবড়ো জলায় ঠিক কোথায় জাল ফেলা দরকার হয়— সেটা জানা না-থাকলে সে-প্রশ্ন ওঠে না। যাই হোক ওয়াটসন, এক আশ্চর্য মহিলা আর এক ভয়াবহ পুরুষকে যুগপৎ সাহায্য করে গেলাম আমরা। এবার দেখা যাক দুজনের বিপুল শক্তি একত্র হয়ে আর্থিক দুনিয়ার কতখানি মঙ্গলসাধন করে। মিলিত ওঁরা হবেনই এবং সারাদুনিয়া জানবে দুঃখের যে পাঠশালায় আমরা সবাই শিক্ষালাভ করি— নীল গিবসন সেই পাঠশালা থেকে কী শিক্ষা শিখে এলেন।'

টীকা

১. **প্রস্তরের প্রহেলিকা** : 'দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ' প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে। আমেরিকার হার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনেও দুই কিস্তিতে এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯২২ সংখ্যায়।

২. **কক্স অ্যান্ড কোম্পানি** : লয়েডস টি. এস. বি. ব্যাঙ্কের শেরিংক্রস শাখার অবস্থান ছিল স্ট্র্যান্ডে। প্রবেশপথের ওপর 'কক্স অ্যান্ড কোম্পানি'-র বোর্ড টাঙানো আছে।

৩. **এইচ** : ওয়াটসনের মধ্যনামের এই আদ্যক্ষর জানানো হয়েছিল 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসে। তবে পুরো নামটি কোথাও বলা হয়নি।

৪. **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর** : ওয়াটসন ছিলেন বার্কশায়ার অ্যান্ড নর্দাম্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ার্স-এর সদস্য। এই গোলন্দাজ বাহিনী ভারতীয় নয়, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

৫. **অ্যালিসিয়া জাহাজ** : এক গবেষক জানিয়েছেন, ১৮৯১-৯২-এর লয়েডস-এর তালিকায় অ্যাসিলিয়া নামের একটি জাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাহাজ ১৮৭৭-এ নির্মিত হয় এবং ১৮৯১ পর্যন্ত চালু ছিল।

৬. **বিলি** : বিলি-র উল্লেখ পাওয়া যায় 'দ্য মাজারিন স্টোন' এবং এই গল্পে, এ ছাড়া 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' উপন্যাসে।

৭. **সোনা খোঁজার সময়ে** : ব্রেজিলে গোল্ড-রাশ হয়েছিল ১৬৯৫ সাল থেকে, যখন মিনাস গেরাইস-এ সোনা আবিষ্কৃত হয়।

৮. **নিজের জীবনে যবনিকা টেনে** : ইংলন্ডের আইনে আত্মহত্যা অপরাধ। ১৮৭০ পর্যন্ত কেউ আত্মহত্যা করলে তার সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করত। তা সত্ত্বেও ইউরোপে সর্বাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ইংলন্ডেই ঘটত বলে জানা যায়।

বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেমি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ক্রিপিং ম্যান]

বিশ বছর আগে প্রফেসার প্রেসবুরিকে ঘিরে অনেক কুৎসিত গুজব দানা বেঁধে উঠেছিল ইউনিভার্সিটিতে। শিউরে উঠেছিল লন্ডনের বিদগ্ধ মহল। শার্লক হোমস বরাবর বলেছে, জঘন্য এই গুজবের অবসান ঘটানোর জন্যেই বিচিত্র সেই কাহিনি জনসমক্ষে হাজির করা দরকার। কিন্তু কিছু অন্তরায়ের জন্যে তা পারিনি। টিনের বাক্সে শার্লক হোমসের অনেক আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে এই কাহিনিও বন্দি হয়ে পড়ে ছিল এতদিন। সম্প্রতি অনুমতি মিলেছে[২] ব্যাপারটা সবাইকে জানানোর। প্র্যাকটিস থেকে রিটায়ার করার আগে হোমস যে-কটা কেস তদন্ত করে গিয়েছিল— এটি সেইসবের অন্যতম। বিশ বছর পরেও কিন্তু সব কথা খোলাখুলি বলা যাচ্ছে না— সংগত কারণেই রেখে ঢেকে বলতে হচ্ছে।

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এক রোববারের সন্ধ্যায় একটা চিরকুট পেলাম হোমসের কাছ থেকে। 'এখুনি এসো— যদি সুবিধে হয় এবং সুবিধে করে নেওয়া যদি সম্ভব হয়। শা হো।' হোমসের সঙ্গে সে সময়ে আমার সম্পর্কটা বড়ো বিচিত্র রূপ নিয়েছিল। হোমস বরাবরই অভ্যেসের দাস— আমিও পড়ে গিয়েছিলাম তার মধ্যে। তামাক, কালোপাইপ, বেহালা, ইনডেক্স বুক এবং অন্যান্য হাবিজাবি বস্তু থেকে একটু পৃথক সত্তা ছিল আমার। দৌড়ঝাঁপের কেসে বিশ্বাসী সঙ্গীর দরকার পড়লেই আমি ছাড়া চলত না। এ ছাড়াও আমাকে দিয়ে ওর কাজ হত অনেক। আমি ছিলাম ওর মনের শানপাথর। উদ্দীপ্ত করে ছাড়তাম। আমি সামনে থাকলেও মনের চিন্তা প্রকাশ করত মুখ দিয়ে। আমি শুনতাম এবং বাগড়া দিতাম। আমার শ্লথগতি চিন্তাশক্তি ওকে খেপিয়ে তুলত, ফলে অগ্নিশিখার মতো সহজাত অনুভূতি আরও লকলকিয়ে উঠে ভেতর থেকে দ্রুত টেনে আনত স্পষ্টতর মানসছবিকে। মিলেমিশে তদন্তে নামলে এইভাবেই আমার দানহীন ভূমিকা পালন করে যেতাম আমি।

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখলাম আর্মচেয়ারে বসে পা গুটিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পাইপ কামড়ে কপাল কুঁচকে কী যেন চিন্তা করছে হোমস। নিশ্চয় বিরক্তিকর কোনো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে। হাত নেড়ে আমার প্রিয় চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল বটে, তারপর ঝাড়া আধঘণ্টা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না— অস্তিত্বই যেন ভুলে গেছে মনে হল। তারপরেই অবশ্য ঝাঁকি দিয়ে ভঙ্গ করল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা অভ্যেসমতো খেয়ালি হাসি হেসে সাদর সম্বর্ধনা জানাল আমাকে আমারই একদা আস্তানায়।

বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, কিছু মনে কোরো না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বেশ কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা হাজির করা হয়েছে আমার সামনে। ভাবছি, গোয়েন্দাগিরিতে কুকুরের ভূমিকা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখব।'

আমি বললাম, 'কিন্তু হোমস, এ নিয়ে তো আগেও অনেক লেখা হয়ে গেছে। ব্লাডহাউন্ড—স্লুথহাউন্ড—'

'না, না, সে-ব্যাপারের কথা বলছি না। ও তো আছেই। আমি যা বলছি, তা আরও সূক্ষ্ম। মনে পড়ে, একটা কেসে আত্মতুষ্ট পরম সম্মানীয় এক ভদ্রলোকের অপরাধী স্বভাবচরিত্রের কথা বলে দিয়েছিলাম তাঁরই ছেলের মন পর্যবেক্ষণ করে?'

'মনে আছে।'

'কুকুরদের নিয়েও ঠিক একই লাইনে ভাবছি। ফ্যামিলি লাইফের প্রতিফলন ঘটে কুকুরদের স্বভাবচরিত্রে। গোমড়া ফ্যামিলিতে আমুদে কুকুর কি দেখা যায়? সুখী পরিবারের বিষণ্ণ কুকুর কখনো দেখেছ? যাদের স্বভাব দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসা, তাদের কুকুররাও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসতে শেখে। বিপজ্জনক ফ্যামিলির কুকুররাও বিপজ্জনক হয়। কুকুরদের মেজাজে তাদেরই মেজাজের প্রতিফলন ঘটে!'

মাথা নেড়ে বললাম, 'কিন্তু একটু দূরকল্পনা হয়ে যাচ্ছে।'

টিপ্পনী কানে তুলল না হোমস। পাইপে তামাক ভরে ফের গুটিসুটি মেরে বসল চেয়ারে।

'যা বললাম তা খেটে যায় হাতের কেসে। সমস্যাটা জট পাকানো। একটা প্রশ্নের মধ্যে হয়তো একদিনের খেই পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্নটা এই : প্রফেসর প্রেসবুরির একান্ত অনুগত নেকড়ে-কুকুর তাঁকেই কামড়াতে গেল কেন?'

তুচ্ছ এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্যে হোমস চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে বুঝে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। বিলক্ষণ নিরাশ হলাম। অপাঙ্গে আমার নৈরাশ্য নিরীক্ষণ করে হোমস বললে, 'কিছুই পালটাওনি দেখছি! ওয়াটসন আগে যা ওয়াটসন এখনও তাই। ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্যেই যে গুরুতর সমস্যা লুকোনো থাকে, এই সোজা তত্ত্বটা এতদিনেও শিখলে না। প্রেসবুরির নাম নিশ্চয় শুনেছ? ক্যামফোর্ড[৩] ফিজিয়োলজিস্ট। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটার প্রাণের বন্ধু বলতে একটা উলফ-হাউন্ড— মনিব অন্ত প্রাণ তার। হঠাৎ এই কুকুর যদি দু-দুবার তেড়ে যায় মনিবকে কামড়ানোর জন্যে, জিনিসটা কি অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয় না? তোমার কী মনে হয়?'

'শরীর খারাপ হয়েছে কুকুরের।'

'খুব সংগত সম্ভাবনা। পরে ভেবে দেখা যাবে'খন। কিন্তু আপাতত বলো, আর কাউকে সে তেড়ে যায় না কেন, অথবা সবসময়েই মনিবকে ঘ্যাঁক করে কামড়াতে যায় না কেন— যায় শুধু বিশেষ উপলক্ষ্যে। অদ্ভুত, ভায়া ওয়াটসন— খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। মিস্টার বেনেট ছোকরা দেখছি একটু আগেই এসে গেলেন— ঘণ্টাটা নিশ্চয় উনিই বাজাচ্ছেন। ভেবেছিলাম তার আগেই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে নেব।'

বলতে বলতেই সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ এবং পরক্ষণেই আঙুলের গাঁট ঠোকার জোরালো শব্দ শোনা গেল দরজায় এবং ঘরে আবির্ভূত হলেন নতুন মক্কেল। বয়স আন্দাজ তিরিশ। দীর্ঘ, সুশ্রী যুবক। জমকালো পরিপাটি বেশ। কিন্তু হাবভাবে ছাত্রসুলভ কুণ্ঠা আর জড়তা— সংসারের সংগ্রাম ঠেলে এগিয়ে যানেওয়ালা দুঁদে পুরুষ যেন নন। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে সবিস্ময়ে তাকালেন আমার দিকে।

বললেন, 'ব্যাপারটা কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সামনে বলতে সংকোচ বোধ করছি। খুবই প্রাইভেট।'

'নির্ভয়ে থাকুন মশায়। ডক্টর ওয়াটসন বিবেচক পুরুষ। তা ছাড়া এ-কেসে তাঁর মতো সহযোগীর আমার দরকার।'

'বেশ তো, তাহলে আর আপত্তি কীসের। আমার দিক দিয়ে বলা উচিত বলে বললাম।'

'ওয়াটসন, ইনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর প্রেসবুরির একমাত্র সহযোগী, মিস্টার ট্রেভর

বেনেট। একই বাড়িতে থাকেন— প্রফেসরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যেই এত সতর্ক ঘরোয়া ব্যাপারে। যাক এখন অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করা যায় কীভাবে ভাবা যাক।'

'ডক্টর ওয়াটসন সব জানেন তো?'

'বলবার সময় পেলাম না।'

'তাহলে আমি বলছি। সম্প্রতি আরও ঘটনা ঘটেছে।'

'আগের ঘটনাগুলো তাহলে আমাকে বলে ঝালিয়ে নিতে দিন। ওয়াটসন, প্রফেসরের খ্যাতি সারাইউরোপে। পড়াশুনা নিয়েই আছেন। আজ পর্যন্ত কোনো কেলেঙ্কারি তাঁর নামে শোনা যায়নি। বিপত্নীক। মেয়ের নাম এডিথ। অত্যন্ত কর্মঠ, বীর্যবান পুরুষ, যা করার সোজাসুজি করেন— ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মানুষ নন। যুদ্ধপ্রিয় পুরুষ বলতে যা বোঝায়, তাই। মাসকয়েক আগেও উনি তাই ছিলেন।

'তারপরেই ঘটল অঘটন। একষট্টি বছর বয়েসে বিয়ে করবেন ঠিক করলেন প্রফেসর মরফির মেয়েকে। বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেছে। প্রফেসর মরফি কমপ্যারেটিভ অ্যানাটমি চেয়ারে আছেন— প্রফেসর প্রেসবুরির সতীর্থ। বুড়ো বয়েসের ভালো লাগার চাইতেও এ যেন এককাঠি বেশি— যৌবনোচিত আবেগ, উন্মাদনায় যেন ফুটন্ত ভালোবাসা। প্রেমে বুঁদ হয়ে গিয়েছেন প্রফেসর। মেয়েটির নাম আলিস মরফি। দেহমনে সুঠাম নিটোল মহিলা। পুরুষচিত্তে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রফেসরের মোহিত হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু ফ্যামিলির কেউ এ-বিয়েতে সায় দিতে পারছে না।'

'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে', বললেন মক্কেল ভদ্রলোক।

'ঠিকই বলেছেন। অস্বাভাবিক, অতিরিক্ত এবং একটু উদ্দাম ভালোবাসাই বলতে পারেন। পাত্রীর বাবার আপত্তি নেই। পাত্রীর নিজেরও আপত্তি নেই— যদিও তাকে বিয়ে করার জন্যে উপযুক্ত বয়েসের অনেকেই এগিয়ে এসেছে— কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে প্রফেসরের প্রেসবুরির সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই হয় না। প্রফেসরের বয়সটাই কেবল বেশি— টাকা আছে কাঁড়ি কাঁড়ি।

'এই সময়ে ঘটল প্রথমে রহস্যটা। যা কখনো করেন না, প্রফেসর তাই করে বসলেন। কাউকে না-জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। ফিরলেন পনেরো দিন পরে। কাউকে বললেন না কোথায় গেছিলেন। ভাগ্যক্রমে মিস্টার বেনেটের এক বন্ধু প্রাহা থেকে চিঠি লিখে জানালেন, প্রফেসর প্রেসবুরিকে তিনি সেখানে দেখেছেন— কিন্তু কথা বলার সুযোগ হয়নি। এইভাবেই তৃতীয় মুখে জানা গেল কোথায় গেছিলেন প্রফেসর প্রেসবুরি।'

'এরপর থেকেই প্রফেসর যেন আর আগের প্রফেসর রইলেন না— অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর মধ্যে। বেশ শঠ, ধূর্ত, গোপন, গুপ্ত হয়ে গেলেন। সব কিছুই যেন লুকিয়ে চুরিয়ে করতে পারলে বাঁচেন— যা তাঁর স্বভাবের ঠিক উলটো। ধীশক্তি রইল আগের মতোই প্রখর, ধারালো। কলেজের বক্তৃতার ধারও কমল না। তা সত্ত্বেও বেশ বোঝা গেল, এ যেন আরেক প্রফেসর। একটা কুটিল বদ সত্তা যেন তাঁকে আশ্রয় করেছে। এ-মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে নিজের মেয়ে— বার বার চেষ্টা করেছে বাবার সঙ্গে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে— কিন্তু

পারেনি! মিস্টার বেনেট নিজেও চেষ্টা করেছেন। এবার আপনিই বলুন চিঠিপত্রের ব্যাপারটা।'

'ডক্টর ওয়াটসন, প্রফেসর প্রেসবুরি আমাকে বিশ্বাস করতেন পুরোপুরি। সেক্রেটারি হিসেবে আমার যে-অধিকার ছিল, ওঁর ভাই বা ছেলে হলেও এত অধিকার পেতাম কি না সন্দেহ। ওঁর সমস্ত চিঠিপত্র আমি দেখতাম। কিন্তু প্রাহা থেকে ফেরার পর এ-ব্যবস্থা পালটে গেল। উনি আমাকে ডেকে বলে দিলেন লন্ডন থেকে স্ট্যাম্পের নীচে ক্রস চিহ্ন দেওয়া কতকগুলো চিঠি আসবে— আমি যেন তা না-খুলি। এ-রকম অনেক চিঠি হাত দিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছেছে— অশিক্ষিত হাতে লেখা ঠিকানা[৪]— আর লেখা E. C.[৫]। জবাব যদিও-বা দিয়ে থাকেন প্রফেসর, সে-খাম আমার হাত দিয়ে যায়নি, বা সব চিঠি যেখানে জমা পড়ে, সেই বাস্কেটেও রাখেননি।'

'এবার বলুন বাক্সর ব্যাপারটা', বললে হোমস।

'প্রফেসর প্রাহা থেকে একটা কাঠের বাক্স এনেছিলেন— জার্মানিতে যে ধরনের কাঠের কাজ চালু আছে— এ-বাক্সেও সেই কাজ দেখা যায়। যন্ত্রপাতি যেখানে থাকে, বাক্সটা রেখেছিলেন সেখানে। একদিন একটা যন্ত্র খুঁজতে গিয়ে বাক্সটা যেই তুলেছি, অমনি তেড়ে এলেন প্রফেসর। হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন বাক্সটা এবং কড়া গলায় ধমকে উঠে বললেন, আর কক্ষনো যেন বাক্সে হাত না-দিই। আমি তো অবাক। মনে খুব লাগল। এভাবে কখনো উনি কথা বলেননি আমার সঙ্গে। যদিও বললাম হঠাৎ হাত লেগে গেছে— কিন্তু উনি বিশ্বাস করলেন না। সারাক্ষণ আড়চোখে নজর রাখলেন আবার হাত দিই কি না দেখবার জন্যে।' পকেট থেকে ডাইরি বার করলেন মিস্টার বেনেট, 'সেদিন ছিল দোসরা জুলাই।'

'চমৎকার! আপনার লেখা তারিখগুলো দেখছি কাজে আসবে।' বললে হোমস।

'গুরুর কাছে গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছি অন্যান্য অনেক বিদ্যের সঙ্গে। যেদিন থেকে ওঁর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলাম, সেইদিন থেকে ওঁর সব কিছুই নজরে রাখব বলেই তারিখগুলোও পর পর লিখে রেখেছি। যেমন ধরুন, ওই দোসরা জুলাই তারিখেই স্টাডিরুম থেকে যেই হল ঘরে এলেন প্রফেসর, উলফ হাউন্ড রয় তেড়ে গেল তাঁকে কামড়ানোর জন্যে। সেই প্রথম, দ্বিতীয়বার কামড়াতে গেল এগারোই জুলাই। তারপর বিশে জুলাই। শেষকালে আস্তাবলে চালান করতে হল রয়কে। এত ভালো কুকুরটার এহেন অবস্থা ভাবাও যায় না— আমি কি বিরক্ত করছি আপনাকে?'

মৃদু ভর্ৎসনা মিশিয়ে শেষ কথাটা বললেন মিস্টার বেনেট। হোমস অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। কড়িকাঠ দেখছে। শেষ কথাটা শুনেই সম্বিৎ ফিরে এল।

'অদ্ভুত! আশ্চর্য! অসাধারণ! মিস্টার বেনেট, আপনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় অশেষ উপকার হল আমার। অনেক নতুন ব্যাপার জানলাম। এ ছাড়াও নতুন কী ঘটেছে বলছিলেন যেন?'

মুখটা কালো হয়ে গেল মিস্টার বেনেটের।

'পরশু রাতের ঘটনা। রাত দুটোয় জেগে শুয়ে ছিলাম। এমন সময়ে প্যাসেজে চাপা আওয়াজ শুনলাম। দরজা খুলে উঁকি মারলাম। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে প্রফেসরের শোবার ঘর—'

'তারিখটা?' হোমসের প্রশ্ন।

স্পষ্টত বিরক্ত হলেন মক্কেল ভদ্রলোক। কথার মাঝে তুচ্ছ তারিখ জানার কোনো মানে হয়?

বললেন, 'বললাম তো পরশু রাতের ঘটনা। চৌঠা সেপ্টেম্বর।'

'বেশ বেশ, বলে যান।'

'প্যাসেজের এক প্রান্তে ওঁর শোবার ঘর, আরেক প্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়িতে যেতে হলে আমার ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হয়। মিস্টার হোমস, লোম খাড়া হয়ে গেল এই প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে। একটিমাত্র জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ছিল প্যাসেজে— বাদবাকি অন্ধকার। আমি দেখলাম, হামাগুড়ি দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে অন্ধকার প্যাসেজ বেয়ে আমার ঘরের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারে গড়া যেন একটা প্রেতমূর্তি। আচমকা আলোর মধ্যে এসে পড়তেই দেখলাম সে কে। প্রফেসর প্রেসবুরি। হামাগুড়ি দিচ্ছেন— মিস্টার হোমস— প্রফেসর প্রেসবুরি হামাগুড়ি দিচ্ছেন! ঠিক হামাগুড়ি দেওয়া তাকে বলে না— হাঁটু টেনে টেনে আসছেন না— হাঁটছেন হাত আর পায়ের ওপর ভর দিয়ে, মুণ্ডুটা ঝুলছে দু-হাতের মধ্যে। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে— স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম তো রইলাম— উনি ওইভাবে চার হাত পায়ে হেঁটে আমার দরজা পেরিয়ে যেতেই সম্বিৎ ফিরল। পেছনে গিয়ে বললাম সাহায্য করতে পারি কি না। জবাবটা হল অসাধারণ রকমের। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রফেসর। তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ভাষায় যা মুখে এল তাই বলে গেলেন এবং ঝড়ের মতো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ ফেরার পথ চেয়ে। ফিরলেন না দেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হয় ফিরেছিলেন ভোরের দিকে।'

'ওয়াটসন। তোমার কী মনে হয়?' যেন একটা দুষ্প্রাপ্য নমুনা এগিয়ে দিচ্ছে প্যাথলজিস্ট— এমনি ভঙ্গিমায় বলল হোমস।

বললাম, 'কোমরে বাত হয়েছে। ব্যথা বাড়লে এমনিভাবেই লোকে হাঁটে, মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে যায়।'

'চমৎকার! কল্পনার ফানুসে চেপে জমিন ছেড়ে শূন্যে ভাসবার পাত্র তুমি নও। কিন্তু ভায়া কটিবাতের থিয়োরি এখানে অচল। কেননা, পরের মুহূর্তেই উনি সটান সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

মিস্টার বেনেট বললেন, 'ওঁর শরীরও ইদানীং খুব ভালো যাচ্ছে— অত্যন্ত সুস্থ সবল জোয়ানের মতোই স্বাস্থ্য হয়েছে। এডিথ আর আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। বেশ বুঝছি একটা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'ওয়াটসন, তোমার কী মত?'

'ডাক্তারে যা বলে, আমিও তাই বলব। ভালোবাসায় মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়েছিল বলে প্রফেসর দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। মাথা ঠান্ডা করার জন্যে। বাক্স আর গোপন চিঠির সঙ্গে টাকাপয়সার সম্পর্ক আছে— হয়তো ধার নিয়েছিলেন, নয়তো শেয়ার সার্টিফিকেট বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন—'

'টাকাপয়সা নিয়ে এই লুকোচুরিও নিশ্চয় বরদাস্ত করতে পারেনি উলফ হাউন্ড— তাই ঘ্যাঁক করে কামড়াতে গিয়েছিল মনিবকে। না হে না, এর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে। আমি বলব—'

যা বলতে যাচ্ছিল হোমস, তা আর বলা হল না ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতো এক তরুণী ঢুকে পড়ায়। দেখেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ধেয়ে গেলেন মিস্টার বেনেট, তরুণীও একই পোজে এগিয়ে এল মিস্টার বেনেটের দিকে।

'এডিথ! কী ব্যাপার?'

'জ্যাক[৬], আমি একা থাকতে পারলাম না। বড্ড ভয় করছিল। তাই চলে এলাম।'

'মিস্টার হোমস, ইনিই আমার ভাবী বউ— মিস এডিথ প্রেসবুরি।'

'সেইরকমই আঁচ করেছিলাম আমি আর ওয়াটসন। মিস প্রেসবুরি, নতুন কিছু ঘটল নাকি?'

'বড়ো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে মিস্টার হোমস। আমার বাবাকে আপনি বাঁচান। সকাল হতেই শহরে এসে জ্যাকের হোটেলে গিয়ে যখন শুনলাম ও নেই, বুঝেছি আপনার কাছেই এসেছে।'

'কেস এখনও অস্পষ্ট, মিস প্রেসবুরি। নতুন কিছু ঘটে থাকলে বলুন।'

'কাল সারাদিন কীরকম যেন ছিল বাবা। ঘটনাটা ঘটল রাত্রে। এসব ঘটনা যখন ঘটে, তখন যেন বাবার খোলসটাই শুধু দেখি— বাবার মধ্যে বাবা আর থাকে না। যেন অদ্ভুত ভীষণ একটা স্বপ্নের ঘোরে থাকে। পরে কী করছে-না-করছে কিছু মনে থাকে না।

'কী হয়েছে বলুন।'

'কুকুরটার ভীষণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল গভীর রাতে। রয়কে এখন আস্তাবলের কাছে শেকলে বেঁধে রাখা হয়। বাবার পরিবর্তনের পর থেকেই ও-বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকি বলে দরজায় তালা দিয়ে শুয়েছিলাম। জানলার খড়খড়ি একটু ফাঁক ছিল। বাইরে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছিল। আমি সেইদিকে তাকিয়ে কুকুরটার ভীষণ চেঁচানি শুনছি এমন সময়ে চৌকোনা ফাঁকটায় কোত্থেকে এসে গেল বাবার মুখখানা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শুয়েছিলাম তিনতলার ঘরে... শার্সির কাচে স্পষ্ট দেখলাম নাক মুখ চেপে আমাকে দেখছে বাবা... আর... এক হাত দিয়ে কাচটা ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে। আতঙ্কে আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম— কাচ খুলে ফেললে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম। চোখের ভুল নয়, ভয়ের চোটে ছায়া দেখেও আবোল-তাবোল বকছি মনে করবেন না— সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল বলে নড়তেও পারলাম না। চেয়ে রইলাম বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ কাচ থেকে সরে গেল মুখখানা। আমি খাট থেকে ছিটকে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেও সাহস পেলাম না। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম ভোরের আলো না-ফোটা পর্যন্ত। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বাবাকে দেখলাম ঝাঁঝালো চড়া মেজাজে— রাতের ঘটনা নিয়ে কোনো কথাই বলল না। আমিও বললাম না। অছিলা করে শহরে চলে এলাম জ্যাকের কাছে।'

শার্লক হোমস হাঁ হয়ে গেল অদ্ভুত এই কাহিনি শুনে।

বললে, 'তিনতলায় আপনার শোবার ঘর? বাগানে লম্বা মই নেই তো?'

'একদম না। তিনতলার জানলায় কোনোভাবেই ওঠা যায় না। তবুও দেখেছি বাবার মুখ।'

'তারিখটা দেখছি পাঁচুই সেপ্টেম্বর। ফলে আরও জট পাকিয়ে গেল ব্যাপারটা।'

এবার হাঁ হওয়ার পালা মিস প্রেসবুরির।

মিস্টার বেনেট বললেন, 'এই নিয়ে দু-বার হল তারিখ নিয়ে কথা বললেন মিস্টার হোমস। আপনি কি তাহলে চন্দ্রকলার সঙ্গে উন্মত্ততার সম্পর্ক ভাবছেন?'

'না, না, একেবারে আলাদা লাইনে ভাবছি। আপনি বরং আপনার ডাইরিটা রেখে যাবেন— তারিখগুলো ভালো করে দেখতে হবে। ওয়াটসন, শুনলে তো বিশেষ বিশেষ তারিখে প্রফেসর প্রেসবুরি কী করেন, পরে আর মনে করতে পারেন না। এই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে আমরা তাঁকে গিয়ে বলব, অমুক তারিখে তিনি আমাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন, তাই এসেছি। সেই

তারিখের কোনো কথাই মনে করতে পারবেন না— বিশ্বাসও করবেন। সেই ফাঁকে কাছ থেকে তাঁকে স্টাডি করা যাবে।'

মিস্টার বেনেট বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিই। প্রফেসর প্রেসবুরি অত্যন্ত কোপন স্বভাবের মানুষ। মাঝে মাঝে মারদাঙ্গা রূপ ধরেন।'

মৃদু হাসল হোমস, 'কিন্তু দেখা আমাকে করতেই হবে আর বেশি দেরি না-করে— কারণ আছে।'

আস্তানা ছেড়ে হোমসের পক্ষে বেরোনো সহজ— কোনো বন্ধন তো নেই। কিন্তু আমার পক্ষে বেরোনো কঠিন অত পসার ফেলে। যাই হোক সোমবার সকালে ট্রেনে চেপে ক্যামফোর্ড পৌঁছে সেকেলে সরাইখানার 'চেকার্স'-এ আমাদের সুটকেস জমা রাখলাম।

পকেট থেকে মিস্টার বেনেটের ডাইরি বার করে দেখে নিয়ে হোমস বললে, '২৬ অগাস্ট অদ্ভুত ঘোরে ভুগছেন— তার মানে ওই তারিখে কিছুই তাঁর মনে নেই। আমরা গিয়ে বলব অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন ২৬ তারিখে। লেকচার দেন এগারোটায়— লাঞ্চের সময়ে বাড়িতেই পাব। চল।'

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি চেপে পৌঁছে গেলাম প্রাচীন কলেজের সারি পেরিয়ে ভারি সুন্দর একটা বাড়ির সামনে। প্রফেসর শুধু আরামেই যে থাকেন তা নয়— একটু বিলাসের মধ্যেই থাকেন— বাড়ির চেহারা দেখলেই তা মালুম হয়। দরজা থেকেই দেখলাম জানলা দিয়ে ঝাঁকড়া-চুলো এক বুড়ো কটমট করে দেখছেন আমাদের। অচিরে হাজির হলাম তাঁর সামনে। চশমা ঢাকা চোখের মধ্যে পাগলামির ছায়াটুকুও দেখলাম না। বিরাট চেহারা। লম্বা, গভীর— কলেজ প্রফেসরের মূর্তি যেমন হয়— ঠিক তাই। দুই চক্ষু কিন্তু আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ আর ধূর্ত। চামড়া ফুঁড়ে যেন ভেতর পর্যন্ত দেখার ক্ষমতা রাখেন।

আমাদের কার্ড দেখলেন, বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, আসা হয়েছে কেন।

হোমস হাসিমুখে বললে, 'সেটা তো আপনিই বলবেন।'

'আমি বলব!'

'আপনিই তো আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন! খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছি।'

'তাই নাকি!' ধূসর চোখে ক্রূর নষ্টামির নাচ দেখলাম, 'আমি ডেকে পাঠিয়েছি! কে খবর দিল বলুন তো?'

'সেটা বলতে পারব না— কথা দিয়েছি। তবে যদি আমাদের দরকার আছে বলে মনে না করেন, আসতে পারি।'

'যাবেন কী? ব্যাপারটা তলিয়ে আগে দেখি। চিঠিপত্র কিছু আছে? টেলিগ্রাম? আমি যে ডেকে পাঠিয়েছি, তার প্রমাণ?'

'কিছু নেই।'

'তার মানে আমি যে ডেকে পাঠিয়েছি সেটা প্রমাণ করতে চান না?'

'কোনো প্রশ্নের জবাব দোব না।'

'বটে! বটে! এ-প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু এখুনি বের করা যাবে।' বলেই ঘণ্টা বাজালেন প্রফেসর। ঘরে ঢুকলেন মিস্টার বেনেট।

'বেনেট, হোমস নামে কোনো লোককে ডেকে পাঠিয়েছিলে চিঠি লিখে? এই দুই ভদ্রলোকের ধারণা নাকি আমি লন্ডন থেকে এঁদের ডেকে এনেছি।'

'আজ্ঞে, না', রক্তিম মুখে বললেন মিস্টার বেনেট।

'ব্যস, তাহলে আর কোনো কথা নয়', জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রফেসর বললেন, 'মশায়, এবার তো বেকায়দায় পড়লেন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'অকারণে ঢুকে পড়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন।'

আচমকা চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠে চোখে-মুখে উৎকট বিদ্বেষ ছড়িয়ে আমাদের পথ রুখে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'যাবেন কোথা? জবাবদিহি না-করে বেরোতে পারবেন ভেবেছেন?' অর্থহীন ক্রোধের নিদারুণ অভিব্যক্তি আর বিকট মুখভঙ্গিমা দেখে বেশ বুঝলাম গায়ের জোরে বেরোতে হবে বাড়ি থেকে। মিস্টার বেনেট মাঝে এসে না-দাঁড়ালে শেষকালে তাই করতে হত।

'গলা ফাটিয়ে বললেন, 'করছেন কী? মানসম্মান জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন দেখছি? ঢিঢি পড়ে যাবে যে ইউনিভার্সিটিতে! মিস্টার হোমস বিখ্যাত মানুষ! দেশসুদ্ধ লোক তাঁকে চেনে। এ কী অসভ্যতা করছেন!'

অপ্রসন্ন মুখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম দুই বন্ধু। হোমস দেখলাম বেশ মজা পেয়েছে এই ঘটনায়।

বললে, 'ভদ্রলোকের নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু যা জানবার জানা হয়ে গেছে। এ কী ওয়াটসন, লোকটা আবার পেছনেও ধাওয়া করল নাকি।'

খড়মড় আওয়াজ শুনলাম পেছনে। ঘুরে দেখি প্রফেসর নন, মিস্টার বেনেট দৌড়ে আসছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুঃখিত মিস্টার হোমস, সত্যিই দুঃখিত। ক্ষমা চাইছি।'

'মাই ডিয়ার স্যার, ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকারই নেই। এসবই পেশাদারি অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে।'

এ-রকম বিপজ্জনক মেজাজে ওঁকে কখনো দেখিনি। দিন দিন মেজাজ সপ্তমে উঠছে। এখন বুঝলেন তো কেন ওঁর মেয়ে আর আমি দুজনেই এত ভয় পেয়েছি। অথচ মন দেখুন প্রফেসরের— দিব্যি পরিষ্কার।'

'একেবারে। হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলেন এখানেই। কিছুই ভোলেননি— সব মনে রাখেন। ভালো কথা, মিস প্রেসবুরির ঘরটা দেখতে পারি?'

'ওই তো। বাঁ-দিক থেকে দ্বিতীয়।'

'সর্বনাশ! ওখানে ওঠা তো সোজা কথা নয়। জানলার ঠিক নীচে একটা লতা আর ওপরে একটা জলের পাইপ অবশ্য আছে।'

'থাকলেও ওই বেয়ে ওঠা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়, মিস্টার হোমস।'

'ঠিক কথা। স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কাজটা বিপজ্জনক।'

'প্রফেসর লন্ডনে যাকে চিঠি লেখেন, তার ঠিকানাটা পেয়ে গেছি। আজই লিখেছেন একটা চিঠি। ব্লটিং পেপারে ঠিকানাটা উঠে গেছে। আমি টুকে রেখেছি— এই দেখুন।'

হোমস কাগজটা দেখে পকেটে রেখে বললে, 'ডোরাক নামটা কিন্তু অদ্ভুত। স্ল্যাভেনিক মনে হচ্ছে। মিস্টার বেনেট, আর কিছু করার নেই— অপেক্ষা করা ছাড়া। প্রফেসর অন্যায় করেননি যে গ্রেপ্তার করব। পাগল নন যে ঘরবন্দি করব। এই অবস্থায় কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া যাবে না।'

'তাহলে?'

'ধৈর্য ধরুন। মঙ্গলবার একটা চূড়ান্ত সংকট দেখা যাবে আশা করছি— সেইদিন ফের আসব ক্যামফোর্ডে। তদ্দিন এই অবস্থা থেকে যদি দূরে সরে থাকতে চান মিস প্রেসবুরি— থাকতে পারেন।'

'সে-ব্যবস্থা করা যাবে।'

'তাহলে তাই করুন। প্রফেসরকে এখন ঘাঁটাতে যাবেন না।'

'ওই যে— বেরিয়ে এসেছেন দেখছি!' চাপাগলায় বললেন মিস্টার বেনেট। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম সদর দরজার বাইরে এসে ইতিউতি তাকাচ্ছেন প্রফেসর— দু-হাত ঝুলছে সামনে। সাঁৎ করে সরে পড়লেন মিস্টার বেনেট। দূর থেকে দেখলাম যেন রুখে উঠলেন প্রফেসর। উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে দুজনেই ঢুকে পড়লেন বাড়ির মধ্যে।

হোমস পা বাড়িয়ে বললে, 'প্রফেসরের ব্রেন অত্যন্ত পরিষ্কার। বাড়ি বয়ে গোয়েন্দা এসেছে দেখে সন্দেহ করেছেন সেক্রেটারিকে— মিস্টার বেনেটের এখন সময় খুব খারাপ।'

ফেরার পথে পোস্টঅফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। জবাব এল সন্ধে নাগাদ। আমিও পড়লাম, 'কমার্শিয়াল রোডে ডোরাকের সঙ্গে দেখা করলাম। সেয়ানা লোক। বোহেমিয়ার মানুষ। বয়স্ক। মনিহারি দোকান আছে। মার্সার।'

হোমস বললে, 'তুমি আমাকে ছেড়ে ডাক্তারি আরম্ভ করার পর থেকে এই মার্সারকে দিয়ে অনেক খবর আমি জোগাড় করি। প্রফেসর কাকে চিঠি লেখেন জানা দরকার ছিল। লোকটা বোহেমিয়ার লোক— প্রফেসরও প্রাহায় গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু আমি তো কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না হোমস। তিরিক্ষে মেজাজের উলফ-হাউন্ডের সঙ্গে বোহেমিয়ায় যাওয়ার কী সম্পর্ক মাথায় আসছে না। অথবা এই দুইয়ের সঙ্গে সুস্থ-সবল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিশুতি রাতে প্যাসেজে চার হাতপায়ে হাঁটার কী যোগসূত্র আছে, আমার ঘিলুতে প্রবেশ করছে না। সব চাইতে জটিল রহস্য হল তারিখ নিয়ে তোমার কচলাকচলি।'

কথা হচ্ছিল সরাইখানায় বসে, এ-শহরের বিখ্যাত সুরার বোতল সামনে নিয়ে। হোমস দু-হাতের আঙুল একত্র করে ক্লাসরুমে বক্তৃতা দেওয়ার ঢংয়ে বলল, 'মিস্টার বেনেটের ডাইরি থেকে দেখা যাচ্ছে প্রফেসরের বিচিত্র উন্মত্ততার প্রথম ঝোঁক এসেছিল দোসরা জুলাই— তারপর থেকেই এই প্রকোপ দেখা গেছে ন-দিন অন্তর— ব্যতিক্রম দেখা গেছে শুধু একবারই। শেষ আক্রমণটা ঘটেছে শুক্রবার তেসরা সেপ্টেম্বর। ২৬ অগাস্টও এই পর্যায়ের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। একে কাকতালীয় বলা যায় না।'

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমিও।

হোমস বললে, 'তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ন-দিন অন্তর প্রফেসর এমন একটা কড়া ওষুধ শরীরে প্রবেশ করান যার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বিষাক্ত। ওঁর উগ্র স্বভাবের ইন্ধন জোগায়

এই দ্রব্যটি। প্রাহায় থাকার সময়ে অভ্যেসটা রপ্ত করেছিলেন। লন্ডন থেকে এখন দ্রব্যটি জোগান দেয় একজন বোহেমিয়ার দালাল। সব মিলে যাচ্ছে তাই না?'

'কিন্তু কুকুর, জানলায় মুখ, প্যাসেজে চার হাতপায়ে হাঁটা?'

'আরে ভায়া, সবে তো শুরু করলাম। মঙ্গলবারে[৭] বোঝা যাবে কত দূর এগোলাম। আপাতত বেনেট ছোকরা কী খবর দিতে পারে দেখা যাক। আর এই চমৎকার টাউনটার হাওয়া খাওয়া যাক।'

খবর যথাসময়ে নিয়ে এলেন মিস্টার বেনেট। প্রফেসর সত্যিই খেপে গিয়েছিলেন। বাড়ির মধ্যে গোয়েন্দা হানা দেওয়ায়। সরাসরি বেনেটকে দোষারোপ করেননি যদিও, কিন্তু বিঁধিয়ে কথা বলেছেন অনেক। পরের দিন সকালেই আবার অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন। ক্লাসেও তোফা লেকচার দিয়ে এসেছেন। ব্রেন বেশ ঝরঝরে। কিন্তু মানুষটা পালটে গিয়েছে— দিব্যি গেলে মিস্টার বেনেট বললেন, 'এ-প্রফেসর সে-প্রফেসর নন।'

হোমস বললে, 'যাই ঘটুক না কেন, দিন সাতেক কিছু করা যাবে না। আমাদের কাজ আছে লন্ডনে। রুগি ফেলে এসেছেন ডক্টর ওয়াটসন। তাই এখন ফিরে যাচ্ছি— সামনের সোমবার এই সময়ে এই সরাইখানায় ফের দেখা হবে। এর মধ্যে চিঠি লিখে ওয়াকিবহাল রাখবেন আমাদের।'

পরের ক-টা দিন হোমসের টিকি দেখা গেল না। সোমবার একটা চিরকুট পেলাম। পরের দিন যেন ট্রেনে দেখা করি। ট্রেনে বসে ও বললে, বেনেট জানিয়েছে এ ক-দিন খুব খোশমেজাজে আছেন প্রফেসর। নতুন কিছু ঘটেনি। 'চেকার্স' সরাইখানায় পৌঁছোনোর পর সন্ধে নাগাদ মিস্টার বেনেট এসে বললেন, 'আজ লন্ডন থেকে একটা চিঠি আর একটা ছোটো প্যাকেট এসেছে প্রফেসরের নামে— দুটোরই ডাকটিকিটের তলায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া। কাজেই আমি খুলিনি— নিষেধ আছে বলে।'

গম্ভীর হয়ে গিয়ে হোমস বললে, 'মিস্টার বেনেট, যা বললেন, তার মধ্যেই অনেক প্রমাণ পেলাম আমার সিদ্ধান্তের। উপসংহার টানাব আজ রাতে। প্রফেসরকে চোখে চোখে রাখবেন আপনি— রাত্রে ঘুমোবেন না। দরজার সামনে দিয়ে গেলেও পথ আটকাবেন না। ধারেকাছেই থাকব আমি আর ডক্টর ওয়াটসন। সেই বাক্সটার চাবি কার কাছে থাকে?'

'প্রফেসরের ঘড়ির চেনে।'

'বাক্স নিয়েও গবেষণার প্রয়োজন হবে। দরকার হলে তালা ভাঙব। বাড়িতে শক্তসমর্থ আর কেউ আছে?'

'কোচোয়ান ম্যাকফেল আছে।'

'ঘুমোয় কোথায়?'

'আস্তাবলের ওদিকে।'

'ওকেও দরকার হতে পারে। আগে নিজেরা দেখি, তারপর। গুডবাই, কাল ভোরের আগেই ফের দেখা হবে।'

মাঝরাতে গিয়ে দুই বন্ধু ঘাপটি মেরে বসলাম হল ঘরের দরজার উলটো দিকের ঝোপের মধ্যে। বেশ কনকনে ঠান্ডা, তার ওপর হাওয়া দিচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মেঘের দল। ভাগ্যিস গায়ে ওভারকোট ছিল, তাই রক্ষে। ভাঙা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে ছুটন্ত মেঘের

আড়াল থেকে। হোমসের বিশ্বাস অভিযানের শেষ পর্ব হয়তো এইটাই, ক্লাইম্যাক্সের আর দেরি নেই— সেই আশাতেই উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতে পারলাম— নইলে বড়োই একঘেয়ে লাগত।

হোমস বললে, 'ঠিক ন-দিন অন্তর প্রফেসরের পাগলামি মাথা চাড়া দেয় এবং সেটার সূত্রপাত ঘটেছে প্রাহা থেকে ফিরে আসার পরেই। আজই নবম দিন এবং আজ রাতেই ফের ঘটবে। লন্ডনের দালাল সেই দ্রব্যটা চালান দেয় প্রফেসরকে এবং ন-দিন অন্তর সেটি সেবন করার নির্দেশ আছে প্রফেসরের ওপর। দ্রব্যটি কী এখনও জানি না— কিন্তু বাদবাকি সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ভালো কথা, ওয়াটসন, প্রফেসরের আঙুলের গাঁটগুলো লক্ষ করেছ?'

'না তো।'

'করা উচিত ছিল। চামড়া পুরু হয়ে গিয়েছে, কড়া পড়ে গিয়েছে। এ-রকমটি আর কখনো কারো আঙুলের গাঁটে দেখিনি। আঙুলের গাঁটে নজর রাখবে সবার আগে। তারপর দেখবে শার্টের হাতা, প্যান্টের হাঁটু, আর বুটজুতো। প্রফেসরের আঙুলের গাঁটের অদ্ভুত চেহারাটা দেখলে মনে হয়—' বলেই থেমে গেল হোমস। খপাৎ করে কপাল খামচে ধরে বলে উঠল, 'উফ! ওয়াটসন, ওয়াটসন, কী বোকা আমি! অসম্ভব মনে হলেও এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে বলে মনে হয় না। কড়া-পড়া আঙুলের গাঁটটা দেখেও আগে ধরতে পারিনি— মাথায় আসেনি... ইস! কী করছিলাম অ্যাদ্দিন? তারপর কুকুরের চেঁচানি... আইভি লতা... কী বোকা... কী বোকা আমি! ওই তো প্রফেসর... বেরিয়ে এসেছেন... নিজের চোখেই দেখে এবার মিলিয়ে নেওয়া যাক যা ভয় করেছি তা ঠিক কি না!'

দেখলাম, আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে হল ঘরের দরজা। ঘরের ভেতরে ল্যাম্প জ্বলছিল বলেই আলোর পটভূমিকায় দেখা গেল প্রফেসর প্রেসবুরির দীর্ঘ মূর্তি। পরনে ড্রেসিং গাউন। চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন দু-হাত পাশে ঝুলিয়ে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শেষবার এই ভঙ্গিমাতেই দেখেছিলাম ভদ্রলোককে।

তারপরেই বেরিয়ে এলেন বাইরে এবং পর মুহূর্তেই আশ্চর্যভাবে পালটে গেল দেহভঙ্গিমা। অসাধারণ সেই পরিবর্তন চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু-হাত নামিয়ে মাটি ধরে হাঁটতে লাগলেন কোমর বেঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। মাঝে মাঝে সড়াৎ করে ওইভাবেই চার হাতপায়ে দৌড়ে গেলেন। যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আর এনার্জি উপচে পড়ছে দেহে মনে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হলেন বাড়ির কোণ ঘুরে পাশের দিকে। অমনি সদর দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এলেন মিস্টার বেনেট— পা টিপে টিপে পেছন ধরলেন প্রফেসরের।

চাপা গলায় বলে উঠল হোমস, 'ওয়াটসন, এসো।' ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম যেখান থেকে প্রফেসরের কীর্তিকলাপ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রফেসর দাঁড়িয়ে ছিলেন আইভিলতায় ছাওয়া দেওয়ালের গা ঘেঁষে। আচমকা দেওয়াল বেয়ে আইভিলতা আঁকড়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় উঠতে লাগলেন ওপরদিকে এবং এক লতা থেকে লাফিয়ে গিয়ে ধরতে লাগলেন আরেক লতা— যেন ভীষণ ভালো লাগছে খেলাটা, প্রচণ্ড মজা পাচ্ছেন লতা বেয়ে লাফালাফি করতে। আশ্চর্য, একবারও পা ফসকায় না, হাত সরে গেল না। নিজের হাত পায়ের ওপরেও যেন অসীম প্রত্যয় প্রফেসরের। বেশ কিছুক্ষণ লম্ফঝম্ফ করার পরে এ-খেলা যেন আর ভালো লাগল না, এমনিভাবে সরসর করে নেমে এলেন নীচে। ঝপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে

ফের দাঁড়ালেন চার হাতপায়ে ভর দিয়ে এবং সাঁ সাঁ করে ছুটে গেলেন উলফ-হাউন্ড যেখানে বাঁধা আছে, সেইদিকে। আগে থেকেই ভয়ংকর গলায় ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করেছিল কুকুরটা— এবার বেরিয়ে এল বাইরে। প্রফেসর যতরকমভাবে পারলেন খেপাতে লাগলেন কুকুরটাকে। না-দেখলে প্রত্যয় হয় না সেই দৃশ্য। গম্ভীরবদন বিশুষ্কমূর্তি বিদগ্ধ প্রফেসর চার হাতপায়ে ভর দিয়ে কুকুরটার নাকের দু-এক ইঞ্চি দূরে হাত নাড়ছেন, কখনো মুঠোমুঠো নুড়ি তুলে মুখ টিপ করে ছুড়ে মারছেন, কখনো ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে দূর থেকে খোঁচা মারছেন। কুকুরটা এমনিতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল— তার ওপর এই খোঁচাখুঁচি পাথর ছোড়াছুড়ির মতো অকারণ নিষ্ঠুরতার ফলে বর্ণনাতীত ক্রোধ আর জিঘাংসায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পাগলের মতো চেন ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল ভয়াল নেকড়ে কুত্তা।

চোখের সামনে মাটির ওপর দিয়ে একসঙ্গে গড়িয়ে গেল কুকুর আর মানুষ এবং কানে ভেসে এল উন্মত্ত হাউন্ডের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে প্রফেসরের আতঙ্ক বিকৃত মুহুর্মুহু অদ্ভুত আর্তনাদ।

হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৩

এর পরের ঘটনা ঘটল মুহূর্তের মধ্যে! চেন ছিঁড়ল না— কিন্তু কলার পিছলে গেল। ঘাড় মোটা নিউফাউন্ডল্যান্ড হাউন্ডের ফাঁদালো কলার বলেই পিছলে গলে বেরিয়ে গেল উলফ-হাউন্ডের সরু লম্বা ঘাড়ের ওপর দিয়ে। চোখের পলকে মাটির ওপর দিয়ে একসঙ্গে গড়িয়ে গেল কুকুর আর মানুষ এবং কানে ভেসে এল উন্মত্ত হাউন্ডের ক্রুদ্ধ গর্জনের সাথে প্রফেসরের আতঙ্ক বিকৃত মুহুর্মুহু অদ্ভুত আর্তনাদ। নিমেষ মধ্যে বুঝলাম প্রফেসরের আয়ু ঝুলছে সুতোর ওপর। ধেয়ে গেলাম সামনে ততক্ষণে কিন্তু উলফ-হাউন্ডের দাঁত বসে গেছে প্রফেসরের গলায় এবং আমরা যখন কাছে পৌঁছোলাম— ততক্ষণে জ্ঞানও হারিয়েছেন; রয়কে টেনে আনাটাও আমাদের দুজনের পক্ষে তখন অতীব বিপজ্জনক— কিন্তু তাও সম্ভব হল মিস্টার বেনেটের উপস্থিতিতে। ওকে দেখে, ওর গলা শুনে উলফ-হাউন্ডের যেন চৈতন্য হল। হট্টগোল শুনে ভ্যাবাচ্যাকা মুখে ঘুম জড়ানো চোখে বেরিয়ে এল কোচোয়ান। বললে, 'জানতাম এ-রকম ঘটবে। আগেও দেখেছি রয়কে এইভাবে শুধু শুধু রাগিয়েছেন প্রফেসর।'

উলফ-হাউন্ডকে ফের চেনে বেঁধে রাখার পর প্রফেসরকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম তাঁর ঘরে। মিস্টার বেনেটের মেডিক্যাল ডিগ্রি ছিল বলেই দুজনে মিলে ড্রেস করে দিলাম ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠদেশ। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন প্রফেসর। আর একটু হলেই ক্যারোটিড আর্টারি দু-টুকরো হয়ে যেত। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সিরিয়াস রকমের— আধ ঘণ্টার চেষ্টাও তাও বন্ধ করলাম। তারপর একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম পেশেন্টকে।

বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাস সার্জনকে দিয়ে দেখানো দরকার।'

আঁতকে উঠে মিস্টার বেনেট বললেন, 'খেপেছেন? টি-টি পড়ে যাবে তাহলে। মেয়ের মাথা কাটা যাবে।'

হোমস বললে, 'ঠিক বলেছেন। এ-ব্যাপার পাঁচ কান না-করাই ভালো— নিজেরা যা পারি করা যাক। বাক্সের চাবিটা এবার খুলে দিন ঘড়ির চেন থেকে। কী রহস্য আছে বাক্সে, দেখা যাক।'

খুব বেশি কিছু ছিল না বাক্সে, কিন্তু যা ছিল, তাই যথেষ্ট। একটা শূন্য অ্যাম্পুল, একটা অর্ধেক খালি অ্যাম্পুল, একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ, কয়েকটা চিঠি। ঠিকানা বিদেশি হাতে লেখা, ডাকটিকিটের তলায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া। সব খামই এসেছে কমার্শিয়াল রোড থেকে, টাকা পেয়ে রসিদ পাঠিয়েছে এ. ডোরাক। লিখেছে, নতুন অ্যাম্পুল পাঠানো হচ্ছে। একটা খামেই কেবল দেখা গেল ঠিকানাটা শিক্ষিত লোকের হাতে লেখা, ডাকটিকিটটা অস্ট্রিয়ার, ছাপ প্রাহার। লাফিয়ে উঠে হোমস বলল, 'এই তো পাওয়া গেছে আসল জিনিস!' বলেই ভেতর থেকে টেনে বার করল চিঠিটা।

মাননীয় সতীর্থ,

আপনি আসার পর আপনার কেস ভেবে দেখলাম। এ-অবস্থায় চিকিৎসার বিশেষ যুক্তি যদিও আসে, তাহলেও বলব এ-চিকিৎসায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। আগেভাগেই হুঁশিয়ার করছি।

মানবাকার কোনো জীবের সিরাম পেলেই সব চাইতে ভালো হত— যেমন বনমানুষের। কিন্তু আগেও বলেছি আপনাকে, কালো মুখে ল্যাংগুর ছাড়া আর কিছু না-পাওয়ায় কাজে লাগিয়েছি তাকেই। ল্যাংগুর চার হাতপায়ে হাঁটে, লতা বেয়ে লাফালাফি করে। বনমানুষ জাতীয় মানবাকার জীব পেলে সিধে হয়ে হাঁটত— মানুষের কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যেত।

একটু সাবধানে থাকবেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেন সব ফাঁস হয়ে না-যায়। আপনি ছাড়া ইংলন্ডে আরও একজন মক্কেল আমার আছে। ডোরাক আমার এজেন্ট হয়ে থাকবে আপনাদের দুজনের কাছেই।

ফি হপ্তায় রিপোর্ট পেলে খুশি হব।

শ্রদ্ধাসহ

এইচ লোয়েনস্টাইন

লোয়েনস্টাইন! স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল হারিয়ে যাওয়া নামটা। খবরটা পড়েছিলাম খবরের কাগজে। জীবনসুধা আর পুনর্যৌবনের দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন অজ্ঞাত-পন্থায় প্রাহারের লোয়েনস্টাইন। কিন্তু সুধার উৎস বলতে নারাজ হওয়ায় তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান দুনিয়ায়। ইনিই সেই লোয়েনস্টাইন— বিস্মৃতপ্রায় বৈজ্ঞানিক[৮]! সংক্ষেপে বললাম যা মনে করতে পারলাম। বইয়ের তাক থেকে প্রাণীবিজ্ঞানের একটা কেতাব পেড়ে এনে মিস্টার বেনেট 'ল্যাংগুর' কাকে বলে পড়ে শোনালেন। 'হিমালয়ের মুখপোড়া বৃহদাকার বানর। লতা বেয়ে ওপরে উঠতে পারে যেসব বানর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং মানুষের নিকটতম— মিস্টার হোমস, বিজ্ঞানজগৎ কৃতজ্ঞ রইল আপনার কাছে বিষময় জীবনসুধার উৎস অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্যে।'

হোমস বললে, 'আসল কাজটা করলেন অবশ্য প্রফেসর। যৌবন ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন বিয়ের আগেই— উৎস তিনিই বের করেছেন। মানুষ স্বভাবে ঊর্ধ্বে উঠতে গেলেই আরও নীচে তলিয়ে যায়। নিয়তির সোজা সড়ক ছেড়ে বাঁকা পথ ধরলে শ্রেষ্ঠ মানবকেও পশু হয়ে যেতে হয়।' নির্নিমেষে চেয়ে রইল অ্যাম্পুলের টলটলে তরল পদার্থটার দিকে, 'এ-বিষ বাজারে ছাড়া যে আইনত অপরাধ, লোয়েনস্টাইনকে তা লিখে জানালেই আর কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না ঠিকই, কিন্তু এ-ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাবে না। ইনি না-করলেও আর কেউ অন্যভাবে এ-কাজ করে যাবে। মানবসমাজের বিষম বিপদ দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। ওয়াটসন, ভাবতে পার ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত কিছু মানুষ শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে অর্থহীন জীবন প্রলম্বিত করতে চাইছে ভয়ংকর এই বিষের সাহায্য নিয়ে? সেইসঙ্গে অবশ্য আধ্যাত্মিক মানুষ বসে থাকবে না— ভোগের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াসেও বিরাম ঘটবে না। দেখা যাক এ-সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত কে জেতে, কে হারে। বলতে বলতে স্বপ্নলোক ছেড়ে ফিরে এল বাস্তবে। ধাঁ করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। 'মিস্টার বেনেট, আমাদের করণীয় আর কিছু নেই। এখন তো সব পরিষ্কার হল? রয় কুকুর বলেই আপনার চাইতে আগেই বুঝেছিল প্রফেসর আর প্রফেসর নেই— হনুমান হয়ে গেছেন। গায়ের গন্ধেই তা বোঝা যাচ্ছে। বাঁদর তাকে জ্বালাতন করেছে— বাঁদরকেই সে তেড়ে গেছে। লতা বেয়ে বাঁদরের ফুর্তিতে লাফালাফি করতে করতে মেয়ের জানলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রফেসর। ওয়াটসন, পরের ট্রেনেই লন্ডন ফেরার আগে চলো "চেকার্স" গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যাওয়া যাক।'

টীকা

১. **বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেমি :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ক্রিপিং ম্যান' ইংলন্ডের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন এবং আমেরিকার হার্স্টস ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের মার্চ ১৯২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২. **সম্প্রতি অনুমতি মিলেছে :** অনেক ক্ষেত্রেই গল্প প্রকাশে শার্লক হোমসের অনুমতি দেরিতে পেয়েছে ওয়াটসন। কিন্তু এর কারণ জানানো হয়নি কখনো।

৩. **ক্যামফোর্ড :** ক্যামফোর্ড নাম নিশ্চয়ই কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের মিশ্রণ। তবুও 'চেকার্স' পাব বা অন্য কয়েকটি সূত্রে গবেষকরা মনে করেন কন্যান ডয়াল অক্সফোর্ডের কথা মাথায় রেখেই এই গল্পটি লিখেছিলেন।

৪. **অশিক্ষিত হাতে লেখা ঠিকানা :** অশিক্ষিতই যদি হবে, তাহলে সে লিখবে কী করে? প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন সমালোচক।

৫. **E.C. :** লন্ডনের ইস্ট-সেন্ট্রাল পোস্টাল-ডিস্ট্রিক্ট বোঝানো হয়।

৬. **জ্যাক :** ট্রেভর বেনেটকে তার প্রেমিকা হঠাৎ 'জ্যাক' নামে ডাকলেন কেন? লেখকের অন্যমনস্কতা? নাকি অন্য কোনো কারণে?

৭. **মঙ্গলবার :** শেষ আক্রমণ যদি শুক্রবার তেসরা সেপ্টেম্বর হয়ে থাকে, তাহলে মঙ্গলবার নয়, হোমস কত দূর এগিয়েছে বোঝা যাওয়ার কথা রবিবার, বারোই সেপ্টেম্বর, নয়দিন পরে। অবশ্য ১৯০৩-এর তেসরা সেপ্টেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার এবং তার ন-দিন পর বারো তারিখ ছিল শনিবার।

৮. **বৈজ্ঞানিক :** ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক ইউজিন স্টিনাখ (১৮৬১-১৯৪৪) ১৯১২ সালে জীবদেহের গ্রন্থি-নির্গত এক ধরনের রস আবিষ্কার করে তার নাম দেন 'হরমোন'। আবার ব্রাউন-সেকোয়া (১৮১৭-১৮৯৪) নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী চিরযৌবন প্রাপ্তির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবি করেন ১৮৮৯-এ। কোনো কোনো গবেষকের অনুমান লোয়েনস্টাইন চরিত্রটি এদের অনুকরণে সৃষ্টি করেছিলেন কন্যান ডয়াল।

সিংহ-কেশরের সংহার মূর্তি[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য লায়নস মেন]

গোয়েন্দাগিরি যতদিন করেছি, ততদিন ভাগ্যে এ-রকম অসাধারণ কেস জোটেনি। এমনই কপাল যে কেসটা ঘরের কাছেই ঘটল গোয়েন্দাজীবন থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডনের ধোঁয়াটে পরিবেশ ত্যাগ করে সাসেক্সের গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতির লীলানিকেতনে পরম শান্তিতে শেষ জীবন কাটাতে আসার পর। ওয়াটসন এখন দৃষ্টিসীমার বাইরে বললেই চলে। মাঝেমাঝে হপ্তাশেষে একবার দেখা করে যায়। কাজেই কাহিনিটা নিজেই লিখছি। সিংহকেশরের রহস্যভেদ করে সমাধানে পৌঁছোনোর আগে ঠিক যেরকমটি দেখেছিলাম শুনেছিলাম— সেইভাবেই প্রতিটি কথা, দৃশ্য এবং ঘটনা লিখে যাব সহজ সরলভাবে আমার ভঙ্গিমায়।

ডাউনসের দক্ষিণ ঢালে আমার ছোট্ট ভিলা থেকে ইংলিশ চ্যানেল দেখা যায়। উপকূলের এদিকে কেবল খড়িপাথরের খাড়াই টিলা। একটিমাত্র পিচ্ছিল পথ বেয়ে অতি সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে হয় জলের দিকে। পথের শেষে প্রায় এক-শো গজ চওড়া বেলাভূমিতে ছড়ানো কেবল নুড়ি আর জলে ক্ষয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো পাথর। জোয়ার এলেও বেলাভূমির পাথর আর নুড়ি

দেখা যায়। মাঝে মাঝে কতকগুলো গভীর গর্তে প্রতিবাত জোয়ারের টাটকা জল জমে ছোটো ছোটো সন্তরণকুণ্ড তৈরি হয়ে যায়। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে দু-চোখ যায় আশ্চর্য এই বেলাভূমির ছেদ নেই কোথাও— শুধু এক জায়গায় ছাড়া... ফুলওয়ার্থ গ্রাম আর ছোট্ট উপসাগর রয়েছে যেখানে।

আমার বাড়িতে আমি, মৌমাছি আর ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্যে একটা লোক[২] আর কেউ থাকে না। আধ মাইল দূরে হ্যারোল্ড স্ট্যাকহার্স্টের কোচিং হাউস। নানা ধরনের বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। স্ট্যাকহার্স্ট নিজে এককালে ভালো খেলোয়াড় এবং ভালো ছাত্র ছিল। এখন অনেক মাস্টার রেখে কোচিং হাউস চালাচ্ছে। আমার সঙ্গে খুব জমেছে। বিনা নেমন্তন্নে দুজনেই দুজনের বাড়ি গিয়ে সন্ধে কাটিয়ে আসি যখন-তখন। ওর কোচিং হাউসের নাম গেবলস।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসের শেষাশেষি প্রচণ্ড ঝড়ে উদ্‌বেল ইংলিশ চ্যানেলের জল খাড়াই খড়িপাহাড় ভাসিয়ে দিল— ঝড় থেমে গিয়ে জল নেমে যাওয়ার পর দেখা গেল বেশ একটা উপহ্রদের মতো সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। এমন মনোরম প্রভাতে হাওয়া খেয়ে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না। পিচ্ছিল পথটা বেয়ে খাড়াই খড়িপাহাড়ের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছন থেকে চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি হ্যারোল্ড স্ট্যাকহার্স্ট— সোল্লাসে হাত নাড়ছে।

'কী সুন্দর সকাল দেখেছেন! আমি জানতাম আপনি বেরিয়ে পড়বেন।' 'সাঁতার কাটতে চলেছেন দেখছি।'

'সেই পুরোনো কায়দা,' হাসতে হাসতে ঠেলে-ওঠা পকেটে হাত দিল স্ট্যাকহার্স্ট। 'ম্যাকফারসন আগেই বেরিয়েছে— আমি যাচ্ছি এখন।'

ফিজরয় ম্যাকফারসন কোচিং হাউসের সায়েন্স-মাস্টার। বাতজ্বরে বেচারার হার্টের বারোটা বেজে গিয়েছে। পঙ্গু হয়ে পড়েছে। খেলাধুলা এখনও করে এবং কেউ ওর সঙ্গে টক্কর দিতেও পারে না। তবে যে-খেলায় বেশি ধকল পড়ে, তা এড়িয়ে যায়। শীতগ্রীষ্মে সাঁতার কাটা ওর প্রিয় অভ্যেস। সাঁতারু আমি নিজেও। একসঙ্গে সাঁতারও কেটেছি অনেকবার।

ঠিক এই সময়ে দেখতে পেলাম ফিজরয়কে। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে খাড়াই খড়িপাহাড়ের ওপর প্রথমে দেখা গেল দুটো হাত, তারপর সারাদেহ। টলছে ম্যাকফারসন। যেন মদ খেয়েছে। পরমুহূর্তেই দু-হাত শূন্যে ছুড়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিষমভাবে ককিয়ে উঠে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। দৌড়ে গেলাম আমরা। চিত করে শুইয়ে সভয়ে দেখলাম ম্যাকফারসন মরতে চলেছে। চোখে আলো নেই, গালে রং নেই। ক্ষণিকের জন্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল চোখে-মুখে— সমস্ত শক্তি দিয়ে কী যেন বলতে চাইল। শেষ কথাটা কেবল আমার কানে ধরা পড়ল। 'লায়নস মেন'! যেন শেষ মুহূর্তেও সাবধান করে দিতে চাইছে সিংহকেশর সম্পর্কে। খুব অস্পষ্ট আর দুর্বোধ্য হলেও অর্থহীন শব্দ দুটো কিন্তু কানে লেগে রইল আমার। তারপরেই আধখানা শরীর মাটি থেকে তুলে দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে কাত হয়ে পড়ে গেল নিষ্প্রাণ দেহে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চনমন করে উঠল ভয়ংকর এই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। ম্যাকফারসনের গায়ে বারবেরি ওভারকোট[৩], ট্রাউজার্স আর পায়ে ফিতে-না-বাঁধা ক্যানভ্যাস জুতো। কাত হয়ে আছড়ে পড়ার সময় পিঠ থেকে সরে গেল ওভারকোট। শিউরে উঠলাম পিঠময় সরু তারের মতো চাবুকের ঘা দেখে। বিন্দু-বিন্দু ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁয়ে বেরুচ্ছে। রক্ত ঝরছে নীচের ঠোঁট থেকেও— মৃত্যুযন্ত্রণা সইতে না-পেরে কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছে ঠোঁট থেকে। সে-যন্ত্রণা যে কী নিদারুণ, তা বিকৃত বীভৎস মুখচ্ছবি দেখলেই মালুম হয়।

খোলা পিঠের দগদগে কশাঘাতের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পেছন থেকে কার ছায়া পড়ল সামনে। ফিরে দেখি আয়ান মুরডক। কোচিং হাউসের অঙ্কের মাস্টার। কালো চোখ, লম্বা পাতলা কঠোর চেহারা! কারো সঙ্গে মেলামেশা তেমন নেই। ছাত্রের সঙ্গে তেমন প্রাণের সম্পর্ক নেই। সবসময়ে নিজস্ব জগতে বুঁদ হয়ে তাকে। রেগে গেলে মাথায় তখন খুন চাপে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ম্যাকফারসনের কুকুরের বেয়াদবি সইতে না-পেরে কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল একবার। স্ট্যাকহার্স্ট তখনই চাকরি থেকে জবাব দেবে ঠিক করেছিল মুরডককে— কিন্তু অমন মাস্টার আর দুটি পাওয়া যায় না বলেই সয়ে গিয়েছিল। ম্যাকফারসনের প্রাণহীন দেহের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এহেন আয়ান মুরডককে। কুকুরের ঘটনাটা মনে পড়ার জন্যেই বোধ হয় চোখে-মুখে খুব একটা সহানুভূতির ছায়াপাত দেখলাম না। যদিও মনে হল যেন খুবই বিচলিত হয়েছে সতীর্থের মৃত্যুতে।

'আহা রে!'

'সঙ্গে ছিলেন নাকি?'

'না, না। আমি তো ঘুম থেকে উঠেছি দেরিতে। সমুদ্রের ধারেই যাইনি। সোজা আসছি গেবলস থেকে। কী করি বলুন তো?'

'ফুলওয়ার্থে গিয়ে এখুনি পুলিশে খবর দিন।'

মুখ থেকে আর একটা কথাও না-খসিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে উধাও হল মুরডক। স্ট্যাকহার্স্ট আচ্ছন্নের মতো বসে রইল মৃতদেহের পাশে। আমি উঠে পড়লাম ধারেকাছে আর কেউ আছে কি না দেখবার জন্যে। ওপরে উঠতেই অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ল। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। অনেক দূরে গোটা দুই আবছা মূর্তি ফিরছে ফুলওয়ার্থ গ্রামের দিকে। রাস্তা বেয়ে নামতে নামতে দেখলাম একই পায়ের ছাপ নেমেছে এবং উঠে এসেছে। ম্যাকফারসন একাই ছিল— কেউ আসেনি এদিকে আজ সকালে। এক জায়গায় পাঞ্জার ছাপ— আঙুলগুলো ঢালের দিকে ছড়ানো। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল ম্যাকফারসন। গোল গর্তও দেখলাম— মাটি বসে গিয়েছে— খড়িমাটি আর সার মেশানো কাদার ওপর যেন হাঁটু গেড়ে বার বার বসে পড়েছে ম্যাকফারসন ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে। পথের নীচে বেশ একটা উপহ্রদ দাঁড়িয়ে গেছে ঝড়ের পর জল সরে যাওয়ার পরেও। এইখানে এক জায়গায় ম্যাকফারসনের তোয়ালে পড়ে— পোশাক খুলেছিল নিশ্চয় জলে নামবে বলে। কিন্তু নামেনি। কেননা তোয়ালে দিব্যি খটখটে শুকনো এবং পরিপাটিভাবে ভাঁজ করা। বালির ওপর এখানে সেখানে ওর খালি পা। অথবা ক্যানভাসে জুতোর ছাপ পড়েছে। জুতো খুলেছিল জলে নামবে বলেই। কিন্তু শুকনো তোয়ালে দেখে বোঝা যাচ্ছে নামা আর হয়ে ওঠেনি।

এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল ম্যাকফারসনের মৃত্যু-প্রহেলিকা। বিজন সৈকতে ও একা ছিল বড়োজোর পনেরো মিনিট— কেননা গেবলস থেকে রওনা হওয়ার পর স্ট্যাকহার্স্টও রওনা হয়েছে। মাঝে পনেরো মিনিটে কারো নির্মম কশাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে হার্টের রুগি ম্যাকফারসন। জলে সে নামেনি অথবা গা মুছবার সময় পায়নি— ধড়ফড় করে কোনোমতে জামাজুতো পরে নিয়েছে— তাই জুতোর ফিতে বাঁধা হয়নি— ওভারকোট কোনোমতে গায়ে গলিয়েছে। কাছাকাছি কেউ ছিল না। খাড়াই খড়িপাহাড়ের গায়ে বিস্তর গর্ত আর গুহা আছে ঠিকই— কিন্তু

দিগন্তরেখায় উদীয়মান সূর্যের আলো সোজাসুজি সেসব গর্তে পড়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে— কেউ সেখানে লুকিয়ে নেই। অনেক দূরে যে আবছা ছায়ামূর্তিগুলোকে দেখলাম, এই স্বল্প সময়ে এখান থেকে অতদূরে চলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়— বিশেষ করে মাঝখানে যখন উপহ্রদ রয়েছে— যার জলে ম্যাকফারসন সাঁতরাবে মনস্থ করেছিল। সমুদ্রে দু-একটা মাছধরা নৌকা ভাসছে বটে, সে-নৌকোয় কারা আছে তা পরে অবসরমতো তদন্ত করে জানা যাবে'খন। তদন্ত করার পথ একাধিক— কিন্তু কোনোটাই প্রহেলিকা সমাধানের পথ বলে মনে হল না।

মৃতদেহের কাছে ফিরে এসে দেখলাম লোক জড়ো হয়েছে। গাঁয়ের কনস্টেবলকে নিয়ে ফিরে এসেছে আয়ান মুরডক। সব কথা শোনবার পর সে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললে, 'মিস্টার হোমস, এ-কেস ফয়সালা করা আমার সাধ্য নয়। আপনি সাহায্য না-করলে ওপরওয়ালা আমায় দাঁতে পিষবে।'

আমি বললাম ওপরওলাকে যেন এখুনি খবর দেওয়া হয়। একজন ডাক্তার দরকার এখুনি। নতুন কোনো পায়ের ছাপ যেন না পড়ে। কোনো জিনিস যেন সরানো না হয়। মৃতদেহের পকেট সার্চ করে পেলাম একটা রুমাল। একটা বড়ো ছুরি, আর একটা কার্ড কেস। কার্ড কেসের ভেতর থেকে বেরুল মেয়েলি হাতের লেখা একটা চিরকুট— 'তুমি এসো, আমি থাকব। মডি।' প্রেম-ট্রেম চলছিল মনে হল। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ হবে কোথায় তা লেখা নেই। কনস্টেবলও দেখল চিরকুটটা— রেখে দিল কার্ড কেসে। বললাম, খাড়াই কড়িপাহাড়ের তলদেশ যেন তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়। এরপর বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম।

দু-এক ঘণ্টার মধ্যে স্ট্যাকহার্স্ট এল জবর খবর নিয়ে। ডেডবডি গেবলস-এ নিয়ে গেছে পুলিশ। ম্যাকফারসনের ডেস্ক থেকে কয়েকটা প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। লিখেছে ফুলওয়ার্থের মিস মড বেলামি।

'প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল ম্যাকফারসন। কিন্তু তার সঙ্গে ওর মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার। তবে হ্যাঁ, ম্যাকফারসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল মেয়েটা।'

'পাঁচজনে যেখানে যায় চান করতে, ঠিক সেইখানে?' বললাম আমি।

'ভাগ্য ভালো ছাত্ররা গিয়ে পড়েনি।'

'সবটাই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবেন?'

চিন্তায় কপাল কুঁচকে গেল স্ট্যাকহার্স্টের।

'মুরডক অ্যালজেব্রার অংশ শেখানোর জন্যে আটকে রেখেছিল ছাত্রদের।'

'দুজনের মধ্যে কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না।'

'এককালে ছিল না— পরে হয়েছিল। বছরখানেক ওদের মধ্যে মেলামেশা ছিল। আর পাঁচজনের সঙ্গে মুরডকের মেলামেশা যতখানি— ঠিক ততখানি। সহানুভূতি বস্তুটার অভাব আছে মুরডকের স্বভাব-চরিত্রে।'

'সেটা আমিও বুঝেছি। কুকুর নিয়ে দুজনের মধ্যে একবার টক্কর লেগেছিল না?'

'সে কোনকালে মিটে গেছে।'

'তিক্ততা থেকে যায়নি?'

'না, না। সত্যিকারের বন্ধুত্ব ফিরে এসেছিল তারপরে।'

'তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে ভাবা যাক।। চেনেন আপনি?'

'কে-না চেনে। এ-অঞ্চলের একমাত্র রূপসি বলতে সে-ই— সত্যিকারের ডানাকাটা পরি। দেখলেই ফিরে তাকাতে ইচ্ছে যায়। ম্যাকফারসনের মনে ধরেছিল জানতাম, কিন্তু জল যে এতদূর গড়িয়েছে জানা ছিল না।'

'মেয়েটা কে?'

'টম বেলামির মেয়ে। মাছ ধরা কারবার শুরু করে বুড়ো টম বেলামি। এখন এ-তল্লাটের সমস্ত বোট আর চান করার কটেজের[৪] মালিক। ছেলে উইলিয়ামকে নিয়ে ব্যাবসা চালায় টম বেলামি।'

'ফুলওয়ার্থে গিয়ে চলুন আলাপ করে আসা যাক।'

'কী অছিলায়?'

'ম্যাকফারসনের মৃত্যুটা সত্যিই চাবুকের ঘায়ে হয়েছে কি না ঈশ্বর জানেন। কিন্তু মানুষের হাতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তার চেনাজানা লোকের সংখ্যা যখন কম, তখন একটা ছুতোনাতায় টম বেলামিদের সঙ্গে দেখা করতে অসুবিধে হবে না। মোটিভ পাওয়া গেলে ক্রিমিনালকেও পাওয়া যাবে।'

সুগন্ধিত ডাউনস বেয়ে হাঁটতে অন্য সময়ে ভালো লাগত, কিন্তু সে সময়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকায় প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারলাম না। ফুলওয়ার্থ গ্রামটা উপসাগর ঘিরে আধখানা চাঁদের আকারে গড়ে উঠেছে। সেকেলে কুঁড়ের সারির পেছনে খানকয়েক আধুনিক বাড়ি। এইদিকেই যেতে যেতে স্ট্যাকহার্স্ট বললে, 'ওই যে স্লেট ছাওয়া কর্নার-টাওয়ার বাড়িটা দেখছেন, ওই হল টম বেলামির বাড়ি। পকেটে কানাকড়িও ছিল না এক সময়ে— এখন দেখেছেন অবস্থাটা। আরে—! ও কে?'

বাগানের গেট খুলে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক মূর্তি? আয়ান মুরডক।

রাস্তার মুখোমুখি হতেই আড়চোখে আমাদের দেখে নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গেল মুরডক, কিন্তু ধরে ফেলল স্ট্যাকহার্স্ট।

বললে, 'এখানে কেন?'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল মুরডকের, 'কৈফিয়ত দেব যখন আপনার বাড়িতে আপনার কাজে থাকব— রাস্তায় ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়।'

অন্য সময়ে হলে স্ট্যাকহার্স্টের প্রতিক্রিয়া হত অন্যরকম— দুম করে ফেটে না-পড়ে সরে যেত। কিন্তু তখন ওরও নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। কাজেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

'মিস্টার মুরডক, জবাবটা অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে গেল।'

'আপনার প্রশ্নটাও তাই।'

'আপনার ঔদ্ধত্য এর আগে ক্ষমা করেছি অনেকবার। এবার আর নয়। আপনাকে আর আমার কাজ করতে হবে না।'

'আমিও তাই ঠিক করেছি। গেবলস-এ থাকবার মতো পরিবেশ একজনই তৈরি করে রেখেছিল— আজ সে চলে গেল।'

দুমদাম করে বেরিয়ে গেল মুরডক। রাগত চোখে স্ট্যাকহার্স্ট বললে, 'অসহ্য! বরদাস্ত করা যায় না!'

আমার কিন্তু চোখ খুলে গেল এ-ঘটনায়। স্পষ্ট বুঝলাম, আয়ান মুরডক ছুতোনাতা করে অকুস্থল ছেড়ে চম্পট দেবার ফিকিরে আছে। সন্দেহ দানা বাঁধল মনের মধ্যে। বেলামি পরিবারের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো অন্ধকারে আলো দেখা যেতে পারে। স্ট্যাকহার্স্ট সামলে নিল নিজেকে। এগোলাম বাড়ির দিকে।

টম বেলামি মাঝবয়েসি পুরুষ। দাড়ির রং আগুনের মতো লাল। মেজাজ খুব তিরিক্ষে মনে হল। আমাদের কথা শোনবার পর দাড়ির মতোই লাল হয়ে গেল মুখ।

খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'অত খুঁটিনাটি শোনবার দরকার দেখছি না। ওই আমার ছেলে উইলিয়াম।' ঘরের কোণে বিষণ্ণবদন ভারীমুখ এক জোয়ানকে দেখিয়ে, 'আমরা দুজনেই এ-ব্যাপারে একমত। ম্যাকফারসন আমার মেয়েকে বিয়ে করবে এ-কথা একবারও বলেনি— কিন্তু চিঠিপত্র দেখা সাক্ষাৎ চলছিল। আমরা তা চাইনি। মেয়েটির মা নেই। আমরাই তার অভিভাবক। তাই ঠিক করেছি—'

কথা আটকে গেল স্বয়ং মড বেলামির আবির্ভাবে। সত্যিই সুন্দরী[৫]। যেকোনো যুবাপুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। বিস্ফারিত চোখে স্ট্যাকহার্স্টের সামনে এসে বললে, 'ফিজরয় মারা গেছে আমি শুনেছি। সব খুলে বলুন।'

টম বেলামি বললে, 'আরেকজন এসে সব বলে গেছে।'

উইলিয়াম গজগজ করে উঠল, 'উইলিয়াম, ব্যাপারটা আমার— আমাকে সামলাতে দাও। খুনিকে ধরতে গেলে আমার সাহায্যের দরকার আছে— ফিজরয়ের আত্মার শান্তির জন্যে।'

মেয়েটির শুধু রূপই নেই, চরিত্রে দৃঢ়তাও আছে। স্ট্যাকহার্স্ট গুছিয়ে বলল সব কথা। শোনবার পর আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মড, 'মিস্টার হোমস, খুন যারা করেছে, তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিন— আমি সাহায্য করব!' বলতে বলতে অপাঙ্গে চেয়ে নিল বাপ আর ভাইয়ের দিকে।

আমি বললাম, 'যারা, বলছেন কেন? আপনি তাহলে মনে করেন খুনটা একজন করেনি?'

'ম্যাকফারসনের গায়ে জোর ছিল, মনে সাহস ছিল। ওর মতো পুরুষকে একা ঘায়েল করা সম্ভব নয়— বিশেষ করে ওইভাবে।'

'আপনাকে একা কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল টম বেলামি, 'খবরদার, মড!'

অসহায়ভাবে মড বললে, 'কী করি বলুন তো!'

আমি বললাম, 'তাহলে সবার সামনেই বলছি— দু-দিন বাদে দেশসুদ্ধ লোক তো জেনেই যাবে। বাবা আর ভাইয়ের সামনে প্রসঙ্গটা পাড়তে চাইনি।— ম্যাকফারসনের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে।' চিঠির বয়ানটাও বললাম। 'তদন্ত শুরু হলে এ-চিঠির প্রসঙ্গও উঠবে। আপনি কিছু জানেন এ-সম্পর্কে?'

'খামোখা রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। ম্যাকফারসনের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল— কিন্তু তা পাঁচকান করা হয়নি ওর কাকার জন্যে। তাঁর অনিচ্ছায় বিয়ে করলে সম্পত্তি পাওয়া যাবে না বলে রেখেছেন। ভদ্রলোক এখন মৃত্যুশয্যায়।'

'কথাটা আমাদের বললে পারতে', গজগজ করে বললে টম বেলামি।

'বলতাম যদি একটু সহানুভূতি দেখাতে।'

'আমি চাই না যাকে তাকে বিয়ে করুক আমার একমাত্র মেয়ে।'

'ম্যাকফারসন সম্পর্কে তোমার এই গাজোয়ারি কথাবার্তার জন্যেই কিছুই বলিনি। চিঠিটা লিখেছিলাম আমি— এই চিঠির জবাবে।' বলে একটা তালগোল পাকানো চিরকুট বার করে দিল মড।

তাতে লেখা—

'প্রিয়তমা,

মঙ্গলবার সূর্য ডোবার সময়ে সৈকতে পুরোনো জায়গায়। আর সময় হবে না বেরোনোর।— এফ.এম!'

'আজ মঙ্গলবার। সন্ধের সময়ে যাব ঠিক করেছিলাম।'

চিঠিটা উলটেপালটে দেখে বললাম, 'এ-চিঠি তো পোস্টে আসেনি। কী করে পেলেন?' 'এ-প্রশ্নের জবাব দেব না।'

হাওয়ার্ড এলকক, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৬

চিরকুটটা উলটেপালটে দেখে বললাম, 'এ-চিঠি তো পোস্টে আসেনি। কী করে পেলেন?'

'যা নিয়ে তদন্ত করছেন, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলেই জবাব দোব না। এ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে আমার সহযোগিতা পাবেন।'

কথার নড়চড় হল না। সব কথার জবাব দিয়ে গেল মড— চিঠি এনেছে কে, এ-প্রশ্নটি বাদে। ফিজরয়ের কোনো শত্রু আছে বলে তার জানা নেই। স্বীকার করল, অনেকেই তার রূপে মুগ্ধ।

'মিস্টার আয়ান মুরডক কি তাদের একজন?'

বললে, 'এক সময়ে ছিল। পরে যখন জানল আমার সঙ্গে ফিজরয়ের মন দেওয়া নেওয়া হয়েছে, তখন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল মুরডক।'

আয়ান মুরডককে ঘিরে সন্দেহের ছায়া নতুন করে ঘনীভূত হল আমার মনের মধ্যে। একই মনোভাব দেখা গেল স্ট্যাকহার্স্টেরও। লোকটার ঘর সার্চ করা দরকার গোপনে। কাগজপত্র দেখা দরকার। স্ট্যাকহার্স্ট সাহায্য করতে চাইল নিজে থেকেই। টম বেলামির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম মনের মধ্যে সেই ভরসা নিয়ে— রহস্য সূত্রের একটা প্রান্ত হয়তো হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে।

দিন সাতেক বৃথাই গেল— পুলিশ তদন্তে অশ্বডিম্ব প্রসবই সার হল। আমিও আকাশ-পাতাল ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। তার পরেই ঘটল কুকুরের ঘটনা।

আমার বাড়ির কাজকর্ম যে দেখে একদিন সে বললে, 'শুনেছেন, মিস্টার ম্যাকফারসনের কুকুরটাও এবার মনিবের কাছে গেল।'

'সে কী! কীভাবে?'

'একই জায়গায়— যেখানে মনিব খুন হয়েছে— ঠিক সেই জায়গায়।'

'তোমাকে কে বলল?'

'সবাই জেনে গেছে। সাতদিন মনের দুঃখে না-খেয়ে ছিল বেচারা। আজকে দুজন ছাত্র গিয়েছিল জলের ধারে— দেখলে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আহা রে!'

একটা কথা কানে লেগে রইল। মনিব যেখানে খুন হয়েছে ঠিক সেই জায়গাতেই পাওয়া গেছে প্রভুভক্ত কুকুরকেও। এ কি নিছক কাকতালীয়? না, বিশেষ ওই জায়গাটিতে চিরবৈরীর অদৃশ্য অনল জ্বলছে লেলিহান প্রতিহিংসারূপে? তবে কি... একটা আবছা সন্দেহ দেখা দিল মনের দিগন্তে। চটপট পা চালিয়ে পৌঁছে গেলাম কোচিং হাউসে। স্ট্যাকহার্স্ট ডেকে পাঠাল ছাত্র দুজনকে।

একজন বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাকফারসনের পায়ের ছাপ ফলো করেই যেন জলের ধার পর্যন্ত গিয়েছিল বেচারা ঠিক একই জায়গায় শেষ নিশ্বাস ফেলতে।'

হল ঘরে মাদুরের ওপর শোয়ানো কুকুরটিকেও দেখলাম। সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট, অঙ্গ বিকৃত, চোখ ঠেলে বার করা, নিদারুণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেহের সর্বত্র।

গেবলস থেকে সোজা গেলাম অভিশপ্ত সেই জায়গাটিতে। সূর্য ডুব দিয়েছে তখন— নিথর জলের ওপর আসন্ন অন্ধকারে ছায়া সিসের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে— মাথার ওপর কর্কশ শব্দে উড়ে গেল গোটা দুই সামুদ্রিক পাখি। হেঁট হয়ে মগ্ন রইলাম নিজের

মধ্যে। অনেকরকম চিন্তায় ভরে রইল মনটা— সমাধান সূত্র যেন ঠাহর করেও ধরতে পারছি না এমনি একটা আবছা দুঃসহ অনুভূতি ছটফটিয়ে তুলল আমাকে। বুঝি বুঝি করেও কী যেন বুঝে উঠতে পারছি না— মাথায় এসেও আসছে না। অবশেষে পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎচমকের মতো মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল আবছা ধারণাটা। ওয়াটসন বহুবার আপনাদের লিখে জানিয়েছে— আমার পড়াশুনা বহু বিষয় নিয়ে। মাথার মধ্যে বিস্তর জ্ঞান জড়ো করা থাকে— অগোছালো অবস্থায়। যেন অনেকরকম খবরের প্যাকেট তাগাড় করা থাকে মস্তিষ্ক নামক মাচার মধ্যে। তাই দরকার মতো ঝট করে কোন খবরটা কোথায় আছে খুঁজে পাই না— কিন্তু জানা থাকে খবরটা আমার মাথাতেই আছে— খুঁজে বার করতে হবে। আবছা সেই মনে পড়াটাকেই এবার টেনেটুনে বার করতে হবে তথ্যবহুল— মস্তিষ্ক থেকে। অবিশ্বাস্য দানবিক হলেও যা সন্দেহ করছি তা সম্ভবপর। খুবই সম্ভবপর। দেখা যাক যাচাই করে।

আমার ছোট্ট ভিলায় একটা মস্ত চিলেকোঠা আছে। রাজ্যের বই ঠাসা আছে সেখানে। ঝাড়া এক ঘণ্টা বই ঘাঁটলাম সেই ঘরে বসে। রুপোলি চকোলেট রঙের একটা মোটা বই বার করে আবছাভাবে মনে পড়া একটা অধ্যায় খুলে গ্রোগ্রাসে গিললাম বিষয়বস্তু। যা পেলাম, এ-কেসে ঠিক তা ঘটেছে ভাবতেও কল্পনাকে কষ্ট করতে হল— সম্ভাবনা তেমন আছে বলেও মনে হল না। কিন্তু বাজিয়ে দেখে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত স্থির হতেও পারলাম না। মনটা উদগ্রীব হয়ে রইল সেই প্রতীক্ষায়।

কিন্তু তার আগেই বাগড়া পড়ল বিরক্তিকরভাবে। পরের দিন ভোরবেলা চা খেয়ে সৈকত অভিমুখে রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এলেন ইনস্পেকটর বর্ডিল। নিরেট চেহারা— চোখে দুশ্চিন্তা।

বললেন, 'মিস্টার হোমস, মিস্টার ম্যাকফারসনের খুনের অপরাধে এবার গ্রেপ্তারটা করে ফেলব কি না ভাবছি।'

'কাকে করবেন? মিস্টার আয়ান মুরডককে?'

'তিনি ছাড়া এ-কাজ আর কে করতে পারে বলুন?'

'প্রমাণ?'

ইনস্পেকটর যা বলে গেলেন, সে-লাইনে চিন্তা আমিও করেছিলাম। আয়ান মুরডকের স্বভাব চরিত্র, তাঁকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠা রহস্য, হঠাৎ খেপে গিয়ে ম্যাকফারসনের কুকুরকে জানলা গলিয়ে ফেলে দেওয়া, ম্যাকফারসনের সঙ্গে অতীতে ঝগড়া, মড বেলামির প্রতি ম্যাকফারসনের অনুরাগকে কেন্দ্র করে ঈর্ষা— সবই আমার পয়েন্ট। শুধু একটা পয়েন্ট বাদে— মুরডক যে চম্পট দেওয়ার আয়োজন করছে, সে-খবর রাখে না ইনস্পেকটর।

শোনবার পর আমি বললাম, 'আপনার যুক্তির মধ্যে তিনটে ফাঁক আছে। প্রথম, মুরডকের অন্যত্র স্থিতি জোরদার? সে দেখিয়ে দেবে ম্যাকফারসন যখন খুন হয়েছে, তখন সে ছাত্রদের অঙ্ক বোঝাচ্ছিল। সৈকতে এসেছে ম্যাকফারসন আসার পর— আগে নয়। দ্বিতীয় ফাঁক— একা হাতে এভাবে চাবকে মানুষ খুন তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় ফাঁক— এ-রকম ক্ষত সৃষ্টি করার মতো হাতিয়ার কি পাওয়া গেছে?'

'নমনীয় চাবুক দিয়ে মারলে এ-রকম দগদগে ঘা দেখা যায়।'

'দাগগুলো আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি। ডাক্তারও দেখেছে।'

'আমি দেখেছি আতশকাচের মধ্যে দিয়ে। দাগগুলো অদ্ভুত।'

'কীরকম অদ্ভুত?'

উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা এনলার্জ করা ফটো নিয়ে এলাম, 'এসব কেস এইভাবেই আমি তদন্ত করি।'

'কিছুই বাদ দেন না দেখছি।'

'ডান কাঁধের ওপর এই টানা লম্বা দাগটা দেখুন, আশ্চর্য একটা ব্যাপার লক্ষ করছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'দগদগে ভাবটা সব জায়গায় সমান জোরালো নয়। এই দেখুন রক্ত চুঁয়ে পড়ছে খুব বেশি এই পয়েন্টে— তারপর এই এখানে আর একটা পয়েন্ট। এপাশের টানা লম্বা দাগেও দেখুন সেই অসমান দগদগে ভাব। এর মানে কী বলুন তো?'

'আমি জানি না। আপনি জানেন?'

'বোধ হয় জানি। বোধ হয় জানি না। তবে শিগ্‌গিরই জানব। তারপর ধরতে পারব অপরাধীকে।'

'আচ্ছা আগুনে পোড়ানো টকটকে রাঙা কোনো তারের জাল পিঠে ছড়িয়ে দিলে জালের দুটো তার যেখানে মিশেছে, গাঁটের ঠিক সেই জায়গায় এ-রকম বেশি রক্তওলা দাগ হতে পারে নাকি?'

'অথবা খুব শক্ত গাঁটওলা কোনো চাবুক দিয়ে মারলেও এমনি দাগ পড়তে পারে।'

'মিস্টার হোমস! ঠিক ধরেছেন মনে হচ্ছে!'

'অন্য ব্যাপারও হতে পারে। তাই বলছিলাম, এখুনি গ্রেপ্তার করতে যাবেন না। তা ছাড়া ম্যাকফারসন মরবার ঠিক আগে বলেছিল— লায়নস মেন।'

'আয়ান নামটার সঙ্গে কিন্তু মিল রয়েছে না?'

'তাও ভেবেছি। কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি 'মেন'— আয়ান নয়।'

'তাহলে কী হতে পারে?'

'হাতে আরও মালমশলা না-আসা পর্যন্ত সেটা বলা সংগত হবে না।'

'কখন আসবে?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে চিবুক চুলকোলেন ইনস্পেকটর বার্ডল।

'জেলে নৌকোর কথা ভাবছেন নাকি?'

'আরে না। অদ্দূর যেতে হবে না।'

'তাহলে কি বেলামি বাপ বেটাকে সন্দেহ করেছেন? ম্যাকফারসনের নাম শুনলেই তো জ্বলে উঠত দুজনে।'

'না, না। যাক গে, দুপুরে আসুন— তখন তৈরি থাকব আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে। এখন—'

এই পর্যন্ত বলার সঙ্গেসঙ্গে প্রচণ্ড বাধা পড়ল কথায় এবং শুরু হয়ে গেল শেষ পর্ব। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। স্খলিত পায়ের আওয়াজ শুনলাম প্যাসেজে। পরক্ষণেই টলতে টলতে এলোমেলো বসনে উশকোখুশকোভাবে ঘরে ঢুকল আয়ান মুরডক। মুখ যন্ত্রণাবিকৃত, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, হাতের সামনে আসবাবপত্র যা পাচ্ছে খামচে ধরে সিধে থাকবার চেষ্টা করছে।

'ব্র্যান্ডি! ব্র্যান্ডি!' বিকট গলায় গুঙিয়ে উঠে ধড়াম করে পড়ে গেল সোফায়। পেছন পেছন এল স্ট্যাকহার্স্ট। হাঁপাচ্ছে, মাথায় টুপি নেই! মুরডকের মতোই প্রায় তার চেহারা—উদ্ভ্রান্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্র্যান্ডি দিন। দম নিতে পারছে না— দু-বার অজ্ঞান হয়েছে আসবার পথে!'

আধ গেলাস ব্র্যান্ডিতে ম্যাজিক ঘটে গেল। এক হাতে ভর দিয়ে দেহটা অর্ধেক তুলে আরেক হাতে কোটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে ককিয়ে উঠল মুরডক, 'তেল! আফিং! মরফিয়া! যা থাকে দিন— এ-যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না!'

খোলা পিঠের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আমি আর ইনস্পেকটর। ম্যাকফারসনের পিঠে চাবুক মারার রক্তঝরা যে বীভৎস দাগ দেখেছি, হুবহু সেই রকমের এলোপাতাড়ি চাবুকের ঘা সারাপিঠ জুড়ে রয়েছে।

অসহ্য সে-যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বেশ কয়েকবার দম আটকে মুখ কালো হয়ে এল মুরডকের— প্রতিবারেই প্রবল চেষ্টায় অনেকক্ষণ পরে হু-উ-উ-স করে নিশ্বেস নিয়ে হার্ট চালু রাখল কোনোমতে। ঘামে ভিজে গেল কপাল। বেশ বুঝলাম, যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে বেচারা। গলায় ব্র্যান্ডি ঢালতে লাগলাম ক্রমাগত, প্রতি ঢোক গেলার সঙ্গেসঙ্গে একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল প্রাণশক্তি। সেইসঙ্গে স্যালাড অয়েলে তুলে ভিজিয়ে বিচিত্র ক্ষতস্থানে চেপে ধরায় যন্ত্রণাও কমে এল অনেকটা। শেষকালে বেদম হয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল সোফায়— অর্ধচৈতন্য অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়।

এ-অবস্থায় প্রশ্ন করা সম্ভব নয়।

স্ট্যাকহার্স্ট আতঙ্ক বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'হোমস! হোমস! এ কী! এসব কী হচ্ছে!'

'এ-অবস্থায় একে পেলেন কোথায়?'

'জলের ধারে, ঠিক যে-জায়গায় দেখেছিলাম ম্যাকফারসনকে। আসবার পথেই মারা যেত যদি ম্যাকফারসনের মতো হার্টের রুগি হত। গেবলস পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারব না বলেই এখানে ঢুকে পড়লাম।'

'সমুদ্রের ধারে দেখলেন?'

'পাহাড়ের ওপর বেড়াচ্ছিলাম— এমন সময়ে শুনলাম চিৎকার। জলের ধারে পড়ে মাতালের মতো পাকসাট খাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে জামাকাপড় জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছি! হোমস! এ কী অভিশাপ লেগেছে এ জায়গায়! যা পারেন করুন! বাঁচান আমাদের।'

'করব। আসুন আমার সঙ্গে। ইনস্পেকটর, আপনিও আসুন। দেখি মার্ডারারকে তুলে দেওয়া যায় কি না আপনার হাতে।'

হাউসকিপারের হেফাজতে অজ্ঞান মুরডককে রেখে তিনজনে গেলাম মৃত্যু-ভয়াল উপহ্রদে। জলে ক্ষয়ে যাওয়া নুড়ির ওপর তোয়ালে আর জামাকাপড়ের স্তূপ চোখে পড়ল। আহত মুরডক রেখে গেছে। জলের কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগলাম আস্তে আস্তে, সার বেঁধে পেছন পেছন

এল দুই সঙ্গী। বেশির ভাগ অঞ্চলই অগভীর— কেবল এক জায়গায় জল চার পাঁচ ফুটের মতো গভীর। জল এখানে ক্রিস্টালস্বচ্ছ— অদ্ভুত সুন্দর সবুজ রঙের— সাঁতারুর পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন। খাড়াই পাহাড়ের নীচের দিকে তাকের মতো বেরিয়ে থাকা পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম জলের দিকে চোখ রেখে! জল যেখানে সবচেয়ে গভীর আর স্থির, সেখানে পৌঁছোতেই দেখতে পেলাম এতক্ষণ চোখ যা দেখতে চাইছিল। বিপুল উল্লাসে বললাম নিস্তব্ধ সৈকত কাঁপিয়ে, 'সায়ানিয়া! সায়ানিয়া! সিংহ কেশর সায়ানিয়া!'

আঙুল তুলে বিচিত্র যে-বস্তুটার দিকে দুই সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, বাস্তবিকই তা দেখতে সিংহের কেশর থেকে ছিঁড়ে আনা একতাল জটার মতো। ফুট তিনেক গভীরে জলের মধ্যে পাথুরে তাকের ওপর অদ্ভুত দর্শন লোমশ প্রাণীদেহটা স্পন্দিত হচ্ছে, দুলে দুলে উঠছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়— হলুদ বেণিগুচ্ছের মধ্যে দেখা যাচ্ছে রুপোলি আভাস! দুলছে, গুটিয়ে ছোটো হয়ে গিয়ে ফের বড়ো হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত ছন্দে।

'স্ট্যাকহার্স্ট, অনেক খুন করেছে এই শয়তান! এবার খেল খতমের পালা! হাত লাগাও!'

হাতের কাছেই একটা বড়োসড়ো গোলমতো পাথর ছিল। ঠেলাঠেলি করে ফেলে দিলাম জলের ওপর। প্রচণ্ড শব্দে ঝপাস করে জলে পড়ল লোমশ হত্যাকারীর ঠিক ওপরেই। জল স্থির হওয়ার পর দেখলাম নীচের তাকে গিয়ে আটকে গেছে পাথরটা। একদিকে উঁকি দিচ্ছে প্রাণীটার কম্পমান শুঁড়গুলো। তেলতেলে পুরু গাঁজলা পাথরের চারপাশ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে জলের ওপরে।

অবাক হয়ে ইনস্পেকটর বললেন, 'মিস্টার হোমস, কী এটা? সাসেক্সে জন্মেছি আমি— কিন্তু একে তো কখনো দেখিনি!'

'ঝড় এনে তুলেছে সাসেক্সে,' বললাম আমি। 'চলুন, বাড়ি ফেরা যাক। সমুদ্রের আতঙ্কের সর্বশেষ শিকারের মুখেই শোনা যাক তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার লোমহর্ষক কাহিনি।'

বাড়ি ফিরে দেখলাম মুরডকের জ্ঞান ফিরেছে, উঠে বসতে পারছে। তবে আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি। যন্ত্রণার দমকে মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা কথায় যা বললে তা থেকে এইটুকুই বোঝা গেল যে কী যে হয়েছে তা সে নিজেই জানে না। আচম্বিতে সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো গরম শিক ফুঁড়ে দেওয়ার মতো একটা ভয়াবহ যন্ত্রণায় সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে তীরে এসে উঠেছিল।

চিলেকোঠা থেকে বার করা সেই কেতাবখানা তুলে নিয়ে বললাম, 'রহস্যভেদ করবে এই বই। নাম ''আউট অফ ডোরস''— লিখেছেন জে. জি. উড[৬]। উড নিজেই শেষ হয়ে যেতেন এই পিশাচ প্রাণীর খপ্পরে পড়ে— আয়ু ছিল বলেই বেঁচে যান। এর পুরো নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা[৭]। কেউটে কামড়ালে যে-যন্ত্রণা, তার চাইতে বহুগুণ বেশি যন্ত্রণা-এর ছোবলে। জীবনহানির সম্ভাবনাও বেশি। একটু পড়ে শোনাছি, শুনুন।

'চান করতে নেমে কেউ যদি সিংহের কেশর থেকে খামচে আনা একতাল পিঙ্গলবর্ণ চুল আর চামড়ার মতো কিছু দেখেন— যার ভেতরে রুপোলি আভাস— তাহলে যেন হুঁশিয়ার হন। নিরীহ দর্শন এই প্রাণীর হুল ফোটানোয় জীবন বেরিয়ে যেতে পারে। এর নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা। মূর্তিমান আতঙ্ক। এর চাইতে ভালো বর্ণনা কি আর সম্ভব?

'মিস্টার উড কেন্টের উপকূলে সাঁতার কাটছিলেন। দেখলেন প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর পর্যন্ত প্রায় অদৃশ্য শুঁড় বাড়িয়ে কিলবিল করছে সিংহ-কেশর সায়ানিয়া। অতদূর থেকেও শুঁড়ের ছোঁয়ায় উড প্রাণে মরতে বসেছিলেন। লিখেছেন, "অসংখ্য সুতোর ছোঁয়ায় রক্তলাল দাগ ফুটে ওঠে চামড়ার ওপর। খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হবে যেন সারি সারি ফুসকুড়ির লাইন— প্রত্যেকটা ফুসকুড়ি দিয়ে আগুনে তাতানো ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে নার্ভের মধ্যে।"

'বলেছেন, হুল ফোটানোর জায়গায় যে-যন্ত্রণা, শরীরময় তীব্র যন্ত্রণার তুলনায় তা সামান্যই। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার শলাকা গেঁথে যায় যেন— যেন তপ্ত বুলেটে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় হৃৎপিণ্ড— আছড়ে পড়েছিলাম হার্টের সেই অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়— তারপরেই এমনভাবে ছ-সাতবার সাংঘাতিকভাবে লাফিয়ে ওঠে। হৃৎপিণ্ড যেন বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।'

'সিংহ-কেশরের দংশন ওঁকে ঘায়েল করেছিল সমুদ্রের উদ্‌বেল জলের মধ্যে— স্নান করার শান্ত নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে নয়। লিখেছেন, পরে নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারেননি— এমন সাদা হয়ে গিয়েছিল মুখখানা— অজস্র বলিরেখায় কুঁচকে ভাঁজ খেয়ে গিয়েছিল মুখের চামড়া। পুরো এক বোতল ব্র্যান্ডি ঢকঢক করে খেয়ে কোনোমতে প্রাণটাকে আটকে রেখেছিলেন দেহপিঞ্জরে। ইনস্পেকটর, এই সেই বই। রাখুন আপনার কাছে। ম্যাকফারসন বেচারা যে কী যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছে, তার নিখুঁত বর্ণনা পাবেন এর মধ্যে।'

ক্লান্ত বিষণ্ণ হেসে আয়ান মুরডক বললে, 'সেইসঙ্গে বন্ধু হত্যার দায় থেকেও অব্যাহতি দিতে পারবেন আমাকে। আপনাদের কারোরই দোষ নেই ইনস্পেকটর। মিস্টার হোমস, আপনাকেও আমি দোষারোপ করছি না আমাকে সন্দেহ করার জন্যে! নিজেকে প্রায় মেরে এনেছিলাম একই পন্থায়— তাই আজ বেঁচে গেলাম ফাঁসির দড়ি থেকে।'

হোমস বললে, 'কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার মুরডক। আপনি যে নির্দোষ, আমি তা জেনেছিলাম। আর একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে এহেন ভয়াল অভিজ্ঞতার মধ্যেও আপনাকে পড়তে দিতাম না।'

'আপনি জেনেছিলেন? কীভাবে মিস্টার হোমস? কীভাবে?'

'রাজ্যের জ্ঞান সংগ্রহ করা আমার বাতিক। যা পাই, তাই পড়ি। স্মৃতির মন্দিরে ফেলনা জিনিসও জমিয়ে রাখি[৮]। জানেন তো যাকে রাখা যায়, সে-ই আপনাকে পরে রেখে দেয়। "লায়নস মেন" শব্দ দুটো সেই কারণেই প্রচণ্ড উৎপীড়ন সৃষ্টি করেছিল মাথার মধ্যে। কোথায় যেন পড়েছিলাম— পড়ব বলে পড়িনি— চোখে পড়ে গিয়েছিল— কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। এখন শুনলেন তো কীভাবে জলচর আতঙ্কের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন মিস্টার উড। জলে নেমে তালগোল পাকানো লোমশ এই প্রাণীকেই দেখেছিলেন মিস্টার ম্যাকফারসন। তাই মরবার আগেও শরীরের শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে— হুঁশিয়ার করতে চেয়েছে— সাবধান! জলে নেমো না! সিংহ-কেশর ওত পেতে আছে সেখানে অসংখ্য শুঁড়ের হুল বাড়িয়ে।'

অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে মুরডক বললে, 'আমি তাহলে খালাস পেলাম সন্দেহের আওতা থেকে। আপনাদের তদন্ত কোন পথে যাচ্ছিল জানি বলেই দু-একটা ব্যাপার খোলসা করে যেতে চাই। মড বেলামিকে আমি ভালোবাসতাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন জানলাম প্রিয় বন্ধু ম্যাকফারসনকে সে

মন দিয়েছে, সেইদিন থেকেই মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে গেছি যাতে মড সুখী হয়। ওদের মধ্যে খবর দেওয়া নেওয়ার কাজ করেছি। সেই কারণেই ওদের সমস্ত গোপন কথা আমি জানতাম। ম্যাকফারসনের শোচনীয় মৃত্যুর খবরটা অন্য কেউ ফেনিয়ে অন্যরকমভাবে মডকে জানিয়ে পাছে ওর মন ভেঙে দেয় তাই নিজে থেকেই গিয়েছিলাম ওকে সব কথা জানাতে। গিয়েছিলাম ওকে মন থেকে ভালোবাসি বলে। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কীরকম ছিল, মড আপনাকে বলেনি পাছে আপনারা ভুল ধারণা করেন, আর আমি অকারণ ভোগান্তির মধ্যে পড়ি। আর নয়। এবার যাই। একটু না-শুলেই নয়।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্ট্যাকহার্স্ট বললে, 'নার্ভের অবস্থা কারোরই ভালো ছিল না বলে যা ঘটে গেছে, তা ভুলে যেয়ো। মুরডক, ভবিষ্যতে যেন আমাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে।' হাতে হাত দিয়ে বন্ধুর মতোই বেরিয়ে গেল দুজনে। বলদের মতো চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে ইনস্পেকটর বললেন, 'আবার কিস্তিমাৎ করলেন মিস্টার হোমস! অনেক সুনাম শুনছি আপনার— এবার দেখলাম নিজের চোখে! ওয়ান্ডারফুল! না-দেখলে বিশ্বাসই করতাম না!'

এ-প্রশংসা হজম করা মানেই নিজেকে খাটো করা। তাই মাথা না-নেড়ে পারলাম না।

বললাম, 'প্রথম দিকে যাচ্ছেতাইভাবে দেরি করেছি। মৃতদেহ জলের মধ্যে পাওয়া গেলে এত দেরি হত না— সঙ্গেসঙ্গে ধরে ফেলতাম মৃত্যুর কারণ। তোয়ালেটাই বিপথে চালিয়েছে আমাকে। ম্যাকফারসন গা মোছবার কথাও ভাবেনি— ভাঁজ করা শুকনো তোয়ালে দেখে আমিও তাই ভেবেছি ও বুঝেছি যে জলে ও নামেনি। তাই জলচর জীবের আক্রমণের সম্ভাবনাও মাথায় আসেনি।— ভুল করেছি সেইখানেই। ইনস্পেকটর, পুলিশদের আমি বিদ্রূপ করেছি বহুবার, এবার দেখছি খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও এক হাত নিয়ে গেল সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা।'

টীকা

১. **সিংহকেশরের সংহার মূর্তি** : 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য লায়ন্স মেন' ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় এবং আমেরিকার 'লিবার্টি' পত্রিকার ২৭ নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯২-এ ওয়েস্টমিনস্টার লাইব্রেরিজ এবং লন্ডনের শার্লক হোমস সোসাইটি এই গল্পটির পাণ্ডুলিপি সংস্করণ প্রকাশ করে।

২. **একটা লোক** : ইনি কি 'হিজ লাস্ট বাও' গল্পে উল্লিখিত মার্থা? মিসেস হাডসন নিশ্চয়ই নন।

৩. **বারবেরি ওভারকোট** : গ্যাবার্ডিন কাপড়ের আবিষ্কর্তা টমাস বারবেরির ডিজাইন করা, আজকালকার ট্রেঞ্চ-কোটের মতো লম্বা ওভারকোট।

৪. **চান করার কটেজের** : স্নানের পোশাকে জনসমক্ষে আসা এড়াতে সেকালে বেশ কিছু মানুষ সমুদ্রে স্নান করতেন সবদিক ঢাকা চাকা লাগানো ঠেলাগাড়িতে বসে। গাড়ির ভেতর স্নানার্থীকে বসিয়ে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হত জলে। স্নান হলে ভেতরে থাকা স্নানার্থীর ইশারায় গাড়ি উঠিয়ে আনা হত এবং গাড়ি কোনো ঘরের ভেতরে নিয়ে এসে তাঁকে নামানোর ব্যবস্থা থাকত। এগুলির প্রচলিত নাম বেদিং-কট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরোনো দিনে বহু হিন্দু পর্দানশিন মহিলাকে পালকি শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নিয়ে বেহারারা গঙ্গাস্নান করাতেন।

৫. **সত্যিই সুন্দরী** : জুলিয়া সি. রোসেনব্ল্যাট প্রশ্ন তুলেছিলেন, মড বেলামির সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েই কি শার্লক হোমস এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন?

৬. **জে. জি. উড** : রেভারেন্ড জন জর্জ উড (১৮২৭-১৮৮৯) প্রকৃতিবিদ্যা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে প্রায় ষাটখানি গ্রন্থের

রচয়িতা। নিজে বিজ্ঞানী বা দক্ষ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল এই বইগুলি।

৭. **সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা :** ইংরেজি নাম লায়ন্সমেন জেলিফিশ, বঙ্গানুবাদে সিংহকেশর জেলিফিশ। এযাবৎ পাওয়া সর্ববৃহৎ প্রকারের জেলিফিশ। এর মাথা তিন ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে, আর শুঁড় কখনো ত্রিশ ফুটও লম্বা হতে দেখা গিয়েছে।

৮. **স্মৃতির মন্দিরে ফ্যালনা জিনিসও জমিয়ে রাখি :** 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' উপন্যাসে হোমসকে বলতে শোনা যায় 'ফালতু জ্ঞান ব্রেন-কুঠরিতে ঢোকাতে নারাজ।... বাজে জিনিস ঠাসতে গিয়ে কাজের জিনিসগুলো মানুষ ভুলে যায় এই কারণেই...'।

ঘোমটার ঘোরালো ঘটনা[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ভিইলড লজার]

তেইশ বছর গোয়েন্দাগিরি করছে শার্লক হোমস। সতেরো বছর আমি তাকে সহযোগিতা করেছি, কীর্তিকাহিনি খাতায় লিখে রেখেছি। কাজেই ওকে নিয়ে গল্প লিখতে বসলে উপাদানের অভাব কখনো হয় না— সমস্যা হয় কেবল বাছাবাছি নিয়ে। বইয়ের তাকে সারি সারি ইয়ার বুক আর তাগাড় করা ডেসপ্যাচ-কেস ভরতি কত যে কাহিনি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অপরাধবিজ্ঞানের ছাত্র তা ঘাঁটলে উপকৃত হবে, সমাজ উপকৃত হবে ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে সরকার আর সমাজের নানান গলদ আর কেলেঙ্কারির সন্ধান পেলে। পারিবারিক কেলেঙ্কারি যাঁরা চেপে রাখতে চান, তাঁরা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। এ-ব্যাপারে বন্ধুবর হোমস বড়ো সজাগ। যখন প্র্যাকটিস করেছে, তখনও যা বলবার নয়, তা বলেনি— স্মৃতির রোমন্থন করার সময়েও যা গোপনে রাখবার, তা গোপনেই রেখেছে এবং রাখবে। তবে সম্প্রতি এই ধরনের গোপন কাগজপত্র যেভাবে নষ্ট করার একটা চেষ্টা হয়েছিল আমি তার ঘোরতর নিন্দা করছি। এ-চেষ্টা যদি আবার করা হয়, হোমস আমাকে অধিকার দিয়েছে রাজনীতিবিদ, লাইটহাউস এবং প্রশিক্ষিত অতিভোজী দীর্ঘগ্রীব পক্ষী করোমোরান্ট সংক্রান্ত সমস্ত কেচ্ছা[২] পাবলিককে জানিয়ে দেওয়ার। এই হুঁশিয়ারি পড়ে একজনই বুঝতে পারবেন কী বলতে চাইছি আমি।

হোমসের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যা তার সহজাত প্রতিভা, সব কেসে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়নি। কোনো কেসে হাড়কালি হয়ে গিয়েছে ফল পাড়তে, কোথাও তা টুপ করে খসে পড়েছে কোলের মধ্যে। তাই জীবনযুদ্ধের অনেক ভয়ংকরতম ট্র্যাজেডিতে নিজস্ব প্রতিভা দেখানোর বিশেষ সুযোগ পায়নি। এ-কেসও সেই ধরনের। নামধাম কেবল পালটে দিচ্ছি।

১৮৯৬ সালের শেষাশেষি একদিন দুপুরের ঠিক আগে হোমসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমার সঙ্গ চায়। বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখলাম তামাকের ধোঁয়ায় ঘর প্রায়-অন্ধকার। হোমসের চেয়ারে বসে এক প্রৌঢ় মহিলা। বাড়িউলি টাইপের হৃষ্টপুষ্ট মাতৃসুলভ চেহারা।

আলাপ করিয়ে দিয়ে হোমস বললে, 'ইনি মিসেস মেরিলো, সাউথ ব্রিক্সটনে থাকেন। তামাকের ধোঁয়ায় আপত্তি নেই, তুমিও খেতে পার— যদিও অভ্যেসটি অতিশয় কদর্য[৩]। ইনি

এসেছেন একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং গল্প শোনাতে। গল্পের উপসংহার চমকপ্রদ হতে পারে তুমি হাজির থাকলে।'

'আমাকে তুমি যা বলবে—'

'মিসেস মেরিলো, মিসেস রোনডারকে বলে দেবেন, যদি আমি ওর সামনে যাই তো সঙ্গে একজন সাক্ষী রাখব।'

'ভগবান আপনার ভালো করবেন, মিস্টার হোমস। আপনি আসছেন শুনলে যা বলবেন, ও তাই করবে।'

'তাহলে বিকেল নাগাদ আসছি দুজনে। তার আগে ডক্টর ওয়াটসনের সামনে ঘটনাগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আপনি বলছেন, মিসেস রোনডার আপনার বাড়িতে সাত বছর ভাড়াটে হয়ে রয়েছে, কিন্তু মুখ দেখেছেন মাত্র একবার।'

'সেটুকুও না দেখতে পারলে বেঁচে যেতাম।'

'সাংঘাতিকভাবে দুমড়োনো-মুচড়োনো বিকৃত বীভৎস মুখ।'

'মিস্টার হোমস, তাকে মুখ বলা যায় না। ওপরের জানলায় যে-মুখ এক পলকের জন্যে দেখেই গয়লা দুধের বালতি উলটে ফেলেছিল বাগানে। দেখেছিলাম আমিও— মিসেস রোনডার বুঝতে পারেনি যে আমি হঠাৎ এসে যাব। তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকা দিয়ে বলেছিল— এখন বুঝলেন তো কেন বারো মাস ঘোমটা দিয়ে থাকি?'

'মিসেস রোনডারের পূর্ব ইতিহাস জানেন?'

'একদম না।'

'ঘর ভাড়া নেওয়ার আগে কারো সুপারিশ হয়নি?'

'না। তবে নগদ টাকা দিয়েছিল অনেক। তিন মাসের ভাড়া আগাম— সব শর্ত মেনে নিয়েছিল এক কথায়। আমি গরিব মানুষ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পারিনি।'

'আপনার বাড়ি পছন্দ করার কোনো কারণ দর্শিয়েছিল?'

'বাড়িটা রাস্তা থেকে ভেতর দিকে বলে। ও চায় নিরিবিলিতে একা-একা থাকতে— তার জন্যে টাকা ছাড়তেও রাজি।'

'একবারই শুধু মুখ দেখেছিলেন— তাও আচমকা। তাই তলিয়ে দেখতে চান কী ব্যাপার?'

'ঠিক তা নয়, মিস্টার হোমস। আমার টাকা নিয়ে দরকার।'

'তাহলে আজ হঠাৎ এ-ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া পড়ল কেন?'

'শরীর ভেঙে পড়েছে বলে! মিসেস রোনডার যেন মরতে বসেছে। মনটাও যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। "খুন! খুন!" বলে চেঁচাচ্ছে। একবার শুনলাম বলছে, "জানোয়ার! রাক্ষস কোথাকার!" তখন নিশুতি রাত। সারাবাড়ি গমগম করে উঠল সেই চিৎকারে। তাই পরদিন গিয়ে বললাম, "মনকে কেন খামোখা কষ্ট দিচ্ছেন? পুলিশ অথবা পাদরি— এই দুইয়ের কাকে ডেকে আনলে মন শান্ত হবে বলুন— ডেকে আনছি।" বাড়ি মাথায় করে মিসেস রোনডার বললে, "না! না! পুলিশ না! পাদরি এসেই-বা কী করবে? যা হয়ে গেছে তাকে তো আর পালটাতে পারবে না। কিন্তু মরবার আগে সব বলতে পারলে শান্তিতে চোখ মুদতে পারতাম।"

তখন বললাম, ''বেসরকারি গোয়েন্দা ডাকলে হবে? মিস্টার শার্লক হোমসকে?'' শুনেই লাফিয়ে উঠে মিসেস রোনডার বললে, ''ঠিক বলেছেন! ওঁকেই চাই। আসতে না-চাইলে বলবেন আমি বন্য জন্তু প্রদর্শক রোনডারের বউ। আব্বাস পারভা— এই নামটা বললেই উনি ঠিক আসবেন।'' এই দেখুন কাগজে লিখে দিয়েছে নামটা।'

হোমস বললে, 'হ্যাঁ, আমি আসছি— ঠিক তিনটের সময়ে।'

হাঁসের মতো দুলে দুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। সঙ্গেসঙ্গে যেন এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটল শার্লক হোমসের ভেতরে। ছিটকে গেল ঘরের কোণে স্তূপাকার রাখা রাশিরাশি পাঁচমেশালি মামুলি কেতাবের দিকে। মিনিট কয়েক কেবল পাতা উলটে যাওয়ার খসখস আওয়াজ শোনা গেল। তারপরে তৃপ্তিসূচক ধ্বনি শোনা গেল গলার মধ্যে। যা খুঁজছে, তা পেয়েছে। উত্তেজনার চোটে মেঝে থেকে উঠতেও ভুলে গেল। বিচিত্র বুদ্ধমূর্তির মতো বই পরিবৃত অবস্থায় বাবু হয়ে বসে যেন চোখ দিয়ে গিলে গেল পাতার পর পাতা।

'কেসটা তখনই ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে, ওয়াটসন ওই দেখো, মার্জিনে, নোটস লিখে রেখেছি। মাথামুণ্ডু অবশ্য তখন বুঝতে পারিনি। শুধু বুঝেছিলাম, করোনার ভুল করছে। আব্বাস পারভা ট্র্যাজেডির ঘটনা মনে পড়ছে?'

'না', বললাম আমি।

'কিন্তু আমার সঙ্গেই তখন ছিলে তুমি। তবে হ্যাঁ, আমি নিজেও তো ধাঁধার জবাব পাইনি। তা ছাড়া, দু-পক্ষের কেউ আমাকে কনসাল্ট করতেও আসেনি। পড়ে শোনাব?'

'সংক্ষেপে বলো।'

'রেনডারের নাম তখন ঘরে ঘরে। সার্কাস দুনিয়ার অতবড়ো খেলোয়াড়[৪] আর কেউ ছিল না। কিন্তু মদের পাল্লায় পড়ে নিজের আর সার্কাসের সুনাম রসাতলে যেতে বসে ট্র্যাজেডিটা ঘটবার সময়ে। বার্কশায়ারে আব্বাস পারভা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। ক্যারাভান সেই গ্রামে পৌঁছোনোর পরে ঘটে বীভৎস ঘটনাটা। যাচ্ছিল অন্যত্র, রাত কাটানোর জন্যে তাঁবু খাটিয়েছিল আব্বাস পারভার— খেলা দেখাতে নয়— অত ছোটো গ্রামে পয়সা উঠত না খেলা দেখিয়ে।

'জন্তুজানোয়ারের মধ্যে ছিল একটা ভারি চমৎকার আফ্রিকান সিংহ। নাম, সাহারা কিং। স্বামী স্ত্রী দুজনেই খাঁচার ভেতরে ঢুকে খেলা দেখাত সাহারা কিংকে নিয়ে। এই দেখো একটা ফটোগ্রাফ। দেখলেই বুঝবে চেহারার দিক দিয়ে রোনডার ছিল বিরাট শুয়োরের মতো। কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী ছিল রোনডারের বউ। সাহারা কিং যে সত্যিই বিপজ্জনক, সে-লক্ষণ নাকি আগেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তোয়াক্কা করা হয়নি।

'সাহারা কিংকে রাত্রে খাওয়ানো হত। খাওয়াত হয় রোনডার, নয় তার বউ। আর কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। কারণ ছিল। যাদের হাতে খাওয়া পাবে, সাহারা কিং তাদেরকেই উপকারী বন্ধু হিসেবে নেবে— থাবা-টাবা মারবে না— এই বিশ্বাস ছিল স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই। সাত বছর আগে এক রাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গেল সিংহের খাবার নিয়ে। তারপর ঘটল সেই ভয়ংকর ট্র্যাজেডি। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল, আজও জানা যায়নি!

'তাঁবুসুদ্ধ লোক জেগে উঠেছিল সিংহের গর্জন আর নারীকণ্ঠের আর্তনাদে। লণ্ঠন নিয়ে

লোকজন ছুটে এসে দেখলে, খাঁচার দরজা খোলা। দশ গজ দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে রোনডার। মাথার পেছনে সিংহের থাবার গভীর দাগ। খুলি গুঁড়িয়ে গেছে। দরজার সামনেই চিত হয়ে শুয়ে মিসেস রোনডার। সিংহ বসে তার বুকের ওপর! মুখ ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে। বাঁচবে বলে আর মনে হয় না। সার্কাসের সবচেয়ে স্ট্রংম্যান লিওনার্ডো ক্লাউন গ্রিগসকে নিয়ে দলবল সমেত লম্বা ডান্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে ঢুকল সাহারা কিং— তালা পড়ল খাঁচায়। কিন্তু খাঁচা থেকে সে বেরিয়েছিল কীভাবে, সে-রহস্যভেদ আর হল না! স্বামী স্ত্রী দুজনকে সামনে দেখে আর দরজা খোলা হচ্ছে দেখে সাহারা কিং নিশ্চয় নিজেই ধাক্কা মেরে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। মিসেস রোনডারকে আচ্ছন্ন অবস্থায় ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে "কাপুরুষ! কাওয়ার্ড!" বলে বারবার নাকি চেঁচিয়েছিল। ছ-মাস পরে এজাহার দেওয়ার অবস্থায় এসেছিল মিসেস রোনডার, কিন্তু তদন্ত করে শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলা হয়েছিল যে নিছক দুর্ঘটনা আর অযথা দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে রোনডার।'

'এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?'

'তা বলতে পার। কিন্তু বার্কশায়ারের ছোকরা পুলিশ অফিসার এডমন্ডের খটকা লেগেছিল। আমার কাছে এসেওছিল পরামর্শ করতে। এখন সে এলাহাবাদে।'[৫]

'রোগা চেহারা? চুল হলদে?'

'হ্যাঁ জানতাম তোমার মনে পড়বে।'

'খটকা লাগল কেন?'

'খটকা আমারও লেগেছিল। ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পলায়মান রোনডারকে পেছন থেকে থাবা মেরে শুইয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেই পারত সাহারা কিং। ফের খাঁচার কাছে ফিরে এসে রোনডারের স্ত্রীকে মাটিতে পেড়ে ফেলে মুখ চিবোতে গেল কেন? তা ছাড়া, ভদ্রমহিলা কাওয়ার্ড বলে চেঁচিয়েছিল কেন? স্বামী এসে সিংহের খপ্পর থেকে বাঁচায়নি বলে? স্বামী নিজেই তো তখন পরলোকে— সে-অবস্থায় কাওয়ার্ড বলে গাল পাড়া হল কেন?'

'তা ঠিক।'

'আরও আছে। সিংহ গর্জন আর নারীকণ্ঠের আর্তনাদের মাঝে একটা পুরুষকণ্ঠের চিৎকারও শোনা গিয়েছিল— বিষম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল সিংহ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে।'

'রোনডার নিশ্চয়।'

'মাথা ছাতু হয়ে যাওয়ার পর কেউ চেঁচায়? একাধিক সাক্ষীর মুখে শোনা গেছে একই কথা। নারীকণ্ঠের আর্তনাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বিশেষ সেই পুরুষকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার।'

'তাঁবুর প্রত্যেকেই তখন চেঁচাচ্ছিল। তাই অমন মনে হয়েছে। আসলে স্বামী স্ত্রী দুজনেই যখন খাঁচার দশ গজ দূরে, তখন খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে সাহারা কিং। দেখেই পেছন ফিরে পালাতে গিয়েছিল রোনডার। তাই সিংহের চাঁটা গিয়ে পড়ে তার মাথায়। রোনডারের বউ বেগতিক দেখে খাঁচায় ঢুকে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু খাঁচা পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই সাহারা কিং তার বুকে বসে আরম্ভ করে দেয় সিংহ গর্জন আর আঁচড় কামড়। স্বামী যদি পালাতে না যেত, সিংহ রেগে গিয়ে তেড়ে যেত না— এইজন্যেই কাপুরুষ বলে চেঁচিয়েছিল রোনডারের বউ।'

'ব্রিলিয়ান্ট! একটা খুঁত কিন্তু রয়ে গেল, ওয়াটসন।'

'যথা?'

'খাঁচার দশ গজ দূরেই যদি ছিল দুজনে, দরজা খুলল কে?'

'কোনো শত্রু নিশ্চয়।'

'যাদের সঙ্গে খাঁচার ভেতরে খেলা দেখিয়ে অভ্যস্ত, খাঁচার বাইরে তেড়ে গিয়ে তাদের থাবা মারতে গেল কেন সাহারা কিং?'

'শত্রু ব্যক্তিটি রাগিয়ে দিয়েছিল বলে।'

হোমস চুপ করে রইল। চিন্তা করল।

তারপর বলল, 'রোনডারের শুয়োরের মতো চেহারা তো দেখলে। শুনেছি, মদ খেলে তখন আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। একটু আগে ভদ্রমহিলা বলে গেলেন, নিশুতি রাতে "জানোয়ার, রাক্ষস কোথাকার!" বলে চেঁচায় তাঁর ভাড়াটে। মাতাল স্বামীর অত্যাচারের দৃশ্য স্বপ্নে ফিরে এসেছে বলেই নিশ্চয় অমন চেঁচিয়েছে। যাই হোক, খেয়েদেয়ে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।'

যথা সময়ে ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে পৌঁছোলাম মিসেস মেরিলোর বাড়িতে। চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলা। ভাড়াটে যাতে বাড়ি ছেড়ে সরে না-পড়ে, পইপই করে সে-বিষয়ে আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে ছেঁড়া কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেলেন দোতালায়— রহস্যময়ী ভদ্রমহিলার ঘরে।

ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে। আলো হাওয়া— কম। দীর্ঘকাল যে খাঁচায় আটকে রেখেছিল বনের পশুদের, নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে সে যেন নিজেই এখন খাঁচায় আটকে পড়েছে। ছায়াচ্ছন্ন কোণে ভাঙা চেয়ারে বসে ছিল ভদ্রমহিলা। মুখে ঘোমটা— শুধু ঠোঁট আর থুতনি বেরিয়ে আছে— নিখুঁত গড়ন দেখেই বোঝা যায় গোটা মুখটি এককালে নিখুঁতই ছিল। শরীরও নিটোল— যদিও দীর্ঘদিন বসে থাকার ফলে একটু ভাঁজ আর খাঁজ দেখা দিয়েছে শ্রীঅঙ্গে।

কণ্ঠস্বরও মোলায়েম, মিহি। বলল, 'আমি জানতাম আমাকে চিনবেন, মিস্টার হোমস।'

'কিন্তু আপনার কেসে আমার আগ্রহ আছে জানলেন কী করে?'

'কাউন্টি ডিটেকটিভ মিস্টার এডমন্ডের কাছে। ওঁকে মিথ্যে বলেছিলাম ইচ্ছে করেই।'

'কেন?'

'একজনকে বাঁচানোর জন্যে। যদিও সে অপদার্থ, তাহলেও সে আমার খুব কাছের মানুষ ছিল— এককালে।'

'এখন কি সে-বাধা সরে গেছে?'

'গেছে। যার কথা বলছি, সে আর ইহলোকে নেই।'

'তাহলে পুলিশকে সব বলছেন না কেন?'

'নিজের জন্যে বলছি না। আমি শান্তিতে মরতে চাই। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কেচ্ছা ছড়িয়ে কেলেঙ্কারি বাড়াতে চাই না। কিন্তু মরবার আগে এমন একজনকে সব কথা বলে যেতে চাই যার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আছে।'

'আপনার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ।'

'এ-জীবনে এখন বই পড়া ছাড়া আর কিছু করণীয় আমার নেই। পৃথিবীর সব খবর রাখি

বলেই আপনারও কীর্তিকলাপ আমার নখদর্পণে। আপনাকে বলে হালকা হতে চাই সেই কারণেই।'

'বলুন তাহলে।'

ভদ্রমহিলা ড্রয়ার খুলে একটা ফটো বার করে বাড়িয়ে দিল সামনে। পেশাদার দড়াবাজিকরের ছবি। অপূর্ব আকৃতি, পেশিবহুল পুষ্ট বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে ভারী গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসি ফুটিয়ে তুলে দাঁড়িয়ে যেন বহু যুদ্ধবিজয়ী আত্মতৃপ্ত পুরুষসিংহ।

'এরই নাম লিওনার্ডো', বলল ভদ্রমহিলা।

'স্ট্রংম্যান লিওনার্ডো? সাক্ষী হয়েছিল যে?'

'হ্যাঁ। আর এই আমার স্বামী।'

এবার যার ছবি দেখলাম তাকে মানুষের আকারে অতিকায় শুয়োর বলাই সংগত। ভয়াবহ পৈশাচিক মুখের চেহারা। রাগে যেন ফুলছে। গাঁজলা বেরুচ্ছে ঠোঁটের কোণ দিয়ে। খুদে চোখে সে কী জিঘাংসা— দগ্ধ করতে চাইছে যেন জগৎসংসারকে। জানোয়ার, ইতর, নরপিশাচ— চওড়া চৌকোনা চোয়ালের পরতে পরতে পরিস্ফুট এই তিনটে এবং আরও অনেক বিশেষণ।

'ছবি দুটো দেখলে আমার কাহিনি বুঝতে সুবিধে হবে আপনাদের। সার্কাসের গরিব মেয়ে আমি। মানুষ হয়েছি কাঠের গুঁড়োয় শুয়ে, রিঙের মধ্যে লাফালাফি করে— তখন আমার বয়স দশ বছর। বড়ো হবার পর শুয়োরের মতো এই জানোয়ারটা ভালোবেসে বিয়ে করল আমাকে। পরে বুঝলাম, প্রেম নয়— কামানলে আহুতি দিলাম নিজেকে। শুরু হল নরকযন্ত্রণা। মারধর কিছুই বাদ যায়নি। বেঁধে চাবুক মারত। যন্ত্রণায় কাতরাতাম। সার্কাসের সবাই ওকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, আমাকে অনুকম্পা করত। তার বেশি কিছু করতে সাহস পেত না। দল ভাঙা শুরু হয়ে গেল তখন থেকেই। সুনাম গোল্লায় গেল। লিওনার্ডো আর জিমি গিস কোনোরকমে চালিয়ে গেল সার্কাস।

'এই সময়ে লিওনার্ডোকে ভালোবাসলাম। ওর সুন্দর শরীরের ভেতরে যে একটা ভীতু মানুষ আছে, তখন জানতাম না। তবে রোনডারের তুলনায় সেই মুহূর্তে লিওনার্ডো ছিল আমার কাছে দেবদূতের মতো বরণীয়। রোনডার টের পেয়েছিল আমাদের গোপন ভালোবাসা। শোধ তুলতে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। একদিন আমার কান্না শুনে ভ্যানের দোরগোড়া পর্যন্ত দৌড়ে এসেছিল লিওনার্ডো। সেই রাতেই একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটত। ঠিক করলাম, আর নয়। রোনডারকে খুন করতে হবে— বাঁচবার জন্যে।

'প্ল্যানটা লিওনার্ডোর— এ-ব্যাপারে মাথা ওর সাফ। আমার অত সাহস ছিল না।

'একটা কাঠের গদা তৈরি করল লিওনার্ডো— ভেতরে ঠাসা রইল সিসে— বাইরে পাঁচটা লম্বা ইস্পাতের পেরেক। ঠিক যেন সিংহের থাবা। ঠিক হল, এই থাবার ঘায়ে খতম করা হবে রোনডারকে— কিন্তু সবাই মনে করবে মরেছে সিংহের থাবায়।

'নিশুতি রাতে অভ্যেস মতো দস্তার গামলায় কাঁচা মাংস নিয়ে স্বামী স্ত্রী গেলাম সিংহকে খাওয়াতে। নকল থাবা নিয়ে ভ্যানের আড়ালে ওত পেতে ছিল লিওনার্ডো। পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে মারল স্বামীর মাথায়। আওয়াজ শুনেই নেচে উঠল মনটা। দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম খাঁচার দরজা।

'ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই। মানুষের রক্তের গন্ধ এদের নাকে কত তাড়াতাড়ি যায়, নিশ্চয় তা জানেন। চক্ষের পলকে সাহারা কিং ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার করে উঠল লিওনার্ডোও। সেই মুহূর্তে ভয় না-পেয়ে ও যদি গদা দিয়ে মারত সাহারা কিঙের মাথায়— বেঁচে যেতাম আমি। কিন্তু তা না-করে প্রাণের ভয়ে দেখলাম ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে লিওনার্ডো। সঙ্গেসঙ্গে সিংহের দাঁত বসে গেল আমার মুখে। বিকট বোঁটকা গন্ধ, মুখের লালার বিষ আর ভয়াল গজরানিতে আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলাম। প্রাণপণে দু-হাত দিয়ে সিংহের মুখ সরিয়ে রাখলাম দূরে। কানে ভেসে এল লোকজনের চিৎকার। পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে দেখলাম লিওনার্ডো আর গ্রিগস ডান্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে সাহারা কিংকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে বুকের ওপর থেকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরঁ আয়নায় মুখের চেহারা দেখে শিউরে উঠলাম। এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। সেই থেকে মুখ ঢেকে নির্জনে থেকেছি— জখম জানোয়ারের মতোই বিবরে ঢুকে মরতে বসেছি— লোকচক্ষে কিন্তু অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে ইউজেনিয়া রোনডার।'

কিছুক্ষণ বসে রইলাম নীরবে। তারপর দীর্ঘ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ইউজেনিয়া রোনডারের হাত চাপড়ে দিল শার্লক হোমস। সমবেদনার এহেন অভিব্যক্তি হোমসের চরিত্রে একান্তই দুর্লভ— কদাচিৎ দেখেছি আমাদের সুদীর্ঘ সহাবস্থানে।

'বেচারা! নিয়তির মার দুনিয়ার বার! লিওনার্ডোর খবর কী?'

'এ-ঘটনার পর আর দেখিনি। হয়তো ওর ওপর অতটা না-চটলেও পারতাম। পরে আমার রং করা মুখটাই ও ভালোবাসতে পারত। কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এত তাড়াতাড়ি মরে যায় না। সিংহের মুখে আমাকে ফেলে সে পালিয়েছে, আমার দরকারের সময়ে আমাকে সে ত্যাগ করেছে তবুও তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চাইনি।'

'এখন?'

'মারা গেছে জলে ডুবে। গত মাসে— মার্গেটে চান করার সময়ে। কাগজে পড়লাম খবরটা।'

'পাঁচনখী থাবাটা কোথায়?'

'ঠিক জানি না। ক্যাম্পের পেছনে একটা সবুজ ডোবা ছিল খড়ি-গর্তের তলায়। হয়তো সেখানে।'

'যাক গে। থাবার আর দরকার নেই। কেস শেষ।'

'হ্যাঁ, কেস শেষ।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু শেষ কথার শেষ সুরটা হোমসের কানে বাজল।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'জীবনটা আপনার একার নয়। ওর ওপর যেন হাত না-পড়ে।'

'এ-জীবন আর কারো কাজে লাগবে কি?'

'জানছেন কী করে? মুখ বুজে সয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, অসহ্য এই দুনিয়ায় তার চাইতে বড়ো সম্পদ আর কিছু আছে কি?'

জবাবটা এল ভয়ংকরভাবে। ঘোমটা তুলে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল ভদ্রমহিলা।

'সহ্য করতে পারবেন?'

শেষ করার সুরটা হোমসের কানে বাজল। চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'জীবনটা আপনার একার নয়। ওর ওপর যেন হাত না পড়ে।'
ফ্র্যাঙ্ক ওয়াইলস, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৭

কী ভয়ংকর! কী বীভৎস! হাড়ের কাঠামোয় এক সময়ে যে-মুখ ছিল, এখন যা নেই— পৃথিবীর কোনো ভাষায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়। অদ্ভুত সুন্দর বিষণ্ণ বাদামি দুটো চোখ কেবল মুখের সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমাদের পানে। গভীর অনুকম্পায় এবং অপরিসীম প্রতিবাদে দু-হাত তুলে যেন বাধা দিল হোমস এবং আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

দু-দিন পরে হোমসের আস্তানায় যেতেই সগর্বে ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা একটা ছোটো নীল শিশির দিকে আঙুল তুলে দেখাল ও। শিশির গায়ে বিষের লাল লেবেল। ছিপি খুলতেই নাকে ভেসে এল বাদামের মিষ্টি গন্ধ।

'প্রুসিক অ্যাসিড[৭]?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ পোস্টে এসেছে। সেইসঙ্গে এই চিঠিটা। 'প্রলোভন সম্বরণ করলাম। উপদেশ গ্রহণ করলাম।' ওয়াটসন, সত্যিই বুকের পাটা আছে মেয়েটার।

টীকা

১. **ঘোমটার ঘোরালো ঘটনা :** 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ভিইলড লজার' আমেরিকার 'লিবার্টি' পত্রিকার ২২ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখের সংখ্যায় এবং ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **করোমোরান্ট সংক্রান্ত সমস্ত কেচ্ছা :** গবেষক ডোনাল্ড রেডমন্ড এই রাজনীতিবিদকে জেমস চেম্বারলেন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩. **অভ্যেসটি অতিশয় কদর্য :** একটি হোমসিয় ঠাট্টা। কারণ ঘরের ধোঁয়া হোমসেরই কীর্তি। কে বলে হোমস গম্ভীর এবং বেরসিক?

৪. **সার্কাস দুনিয়ার অতবড়ো খেলোয়াড় :** সেকালে সার্কাস জগতের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন জর্জ উমবোয়েল (১৭৭৮-১৮৫০), এবং জর্জ স্যাংগার (১৮২৭-১৯১১)। এঁরা দুজনেই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলের প্রতিষ্ঠাতা।

৫. **এলাহাবাদে :** এলাহাবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এখানে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে সিপাহীদের প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল।

৬. **জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর :** মিসেস রোনডারের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু উমবোয়েলের সার্কাসে এলেন ব্রাইট নামে এক সপ্তদশী মারা গিয়েছিল সার্কাসের বাঘের আচমকা আক্রমণে, ১৮৮০ সালে।

৭. **প্রুসিক অ্যাসিড :** বর্ণহীন তীব্র বিষ হাইড্রোজেন সায়ানাইডের আরেক নাম প্রুসিক অ্যাসিড। জলে মিশ্রিত অবস্থায় এর নাম হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। রবার বা প্লাস্টিক তৈরিতে এই রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়।

পাতালের পাপচক্র[1]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ শসকোম ওল্ড প্লেস]

অনেকক্ষণ ধরে একটা লো-পাওয়ার মাইক্রোস্কোপের ওপর হেঁট হয়ে ছিল শার্লক হোমস। এবার সিধে হয়ে বিজয়গৌরবে তাকাল আমার দিকে।

বলল, 'জিনিসটা আঠা— কোনো সন্দেহই নেই। ফিল্ডে ছড়ানো বস্তুগুলো দেখলেই বুঝবে।'

আই-পিসে চোখ রেখে ফোকাস ঠিক করলাম।

'রোঁয়াগুলো টুইড কোটের। ধূসর জিনিসটা ধুলো। বাঁ-দিকের জিনিসটা কোষ থেকে উঠে আসা খোসা। মাঝখানের বাদামি বড়িগুলো আঠা।'

হেসে বললাম, 'মানলাম। কিন্তু তাতে হলটা কী?'

'সেন্ট প্যানক্র্যাস[2] কেসে মৃত পুলিশের পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল মনে আছে? যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বলছে টুপি তার নয়। কিন্তু ছবি বাঁধানো তার পেশা— আঠা নিয়ে তার কারবার।'

'কেসটা তোমার?'

'নো, মাই ফ্রেন্ড। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা মেরিভেলের অনুরোধে একটু নাক গলিয়েছি। কোটের হাতার সেলাইয়ের মধ্যে দস্তা আর তামার গুঁড়ো পেয়ে হাতেনাতে সেবার এক জালিয়াতের টাকা জাল করার কীর্তি[3] ফাঁস করে দেওয়ার পর থেকেই ওদের টনক নড়েছে, মাইক্রোস্কোপের

গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। বলতে বলতে অধীরভাবে তাকাল ঘড়ির দিকে— 'নতুন এক মক্কেলের আসবার সময় হয়ে গেছে। ভালো কথা। ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে খবর-টবর কিছু রাখ?'

'আলবাত রাখি। পেনশনের অর্ধেক[৪] তো ঘোড়ার পেছনেই ওড়াই[৫]।'

'তাহলে তোমাকেই জিজ্ঞেস করা যাক। স্যার রবার্ট নরবারটন লোকটা কে? কী জান তাঁর সম্পর্কে?'

'শসকোম ওল্ড প্লেসে থাকেন। গরমের সময়ে কিছুদিন ছিলাম সেখানে। নরবারটন একবার এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন যা তোমার আওতায় আসে।'

'কীভাবে?'

'নিউমার্কের হীথের নাম করা কার্জন স্ট্রিট মহাজন স্যাম ব্রুয়ারকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে মারতে প্রায় মেরে এনেছিলেন।'

'ইন্টারেস্টিং! হামেশাই কি এমনি করেন?'

'সবাই জানে স্যার নরবারটন বড়ো বিপজ্জনক লোক। সারা ইংলন্ড ঢুঁড়ে এলে অমন ডেয়ার ডেভিল ঘোড়সওয়ার আর দুটি পাবে কি না সন্দেহ— বছর কয়েক আগে গ্র্যান্ড ন্যাশনালে[৬] সেকেন্ড হয়েছিল। ভালো স্পোর্টসম্যান হতে পারতেন। বক্সিং, ঘোড়দৌড়, খেলাধুলো আর সুন্দরী মেয়ে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন— ওঁর আমলে সবাই যা করেছে। কিন্তু সে-সুযোগ আর ফিরে আসবে না।

'চমৎকার! নখদর্পণ বর্ণনা দিলে দেখছি। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি স্যার নরবারটনকে। শসকোম ওল্ড প্লেস সম্পন্ধে একটু আইডিয়া দিতে পারবে?'

'জায়গাটা শসকোম পার্কের ঠিক মাঝখানে। ঘোড়া চড়ানোর, পাল ধরানোর আর ট্রেনিং দেওয়ার বিখ্যাত ঘাঁটিটা যেখানে— সেইখানে।'

হোমস বললে, 'হেড ট্রেনার হল জন ম্যাসন। চমকে উঠলে দেখছি। ওয়াটসন, এ-জ্ঞানটুকু অর্জন করলাম এইমাত্র ওই চিঠিখানা থেকে— লিখেছেন জন ম্যাসন স্বয়ং। তার আগে শসকোম সম্পর্কে আরও খবর শোনা যাক। ভালো খোরাক মিলবে মনে হচ্ছে।

'শসকোম স্প্যানিয়েলের নাম নিশ্চয় শুনেছ। সাড়া জাগানো কুকুর। ইংলন্ডে অমন স্প্যানিয়েল আর কোথাও হয় না। শসকোম ওল্ড প্লেসের লেডির ভারি জাঁক তাই নিয়ে।'

'স্যার রবার্ট নরবারটনের স্ত্রী?'

'স্যার রবার্ট বিয়েই করেননি। বউ পুষতে পারবেন না জেনেই বোধ হয় করেননি। থাকেন বিধবা বোন লেডি বিয়েট্রিস ফালডারের সঙ্গে।'

'স্যার রবার্টের সঙ্গে থাকেন লেডি বিয়েট্রিস— এই বলতে চাও তো?'

'আরে, না, না। জায়গাটা লেডি বিয়েট্রিসের স্বর্গত স্বামী স্যার জেমসের। নরবারটনের কোনো দাবিই নেই। যদ্দিন বাঁচবেন, তদ্দিন ভোগ করতে পারবেন লেডি। তারপর পাবে দেওর। বছর বছর ভাড়ার টাকাও ভোগ করেন লেডি।'

'গুণধর ভ্রাতা রবার্ট নিশ্চয় সেই টাকা ওড়ান?'

'প্রায় তাই। লোক বড়ো খারাপ। বোনকে জ্বালিয়ে মারছেন সন্দেহ নেই। তবে ভাইকে ভালোবাসেন এমন কথাও শুনেছি। কিন্তু শসকোমে এমনি কী কাণ্ড ঘটল যে এত কথা জিজ্ঞেস করছ?'

'আরে, সেইটা জানবার জন্যেই তো পথ চেয়ে বসে আছি। ভদ্রলোক এসে গেলেন মনে হচ্ছে।'

দরজা খুলে গেল। ছোকরা চাকর যাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁর চোখ-মুখের কাঠিন্য, দৃঢ়তা আর শুষ্কতা দেখলেই বোঝা যায় ঠেঁটিয়া লোক আর তেড়িয়া ঘোড়া দমন করে রীতিমতো পোক্ত পুরুষ। জন ম্যানসনের এ-সুনাম আছে বই কী। সংযতভাবে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বসলেন হোমসের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারে।

'চিঠি পেয়েছেন, মিস্টার হোমস?'

'পেয়েছি। কিন্তু বুঝিনি।'

'ব্যাপারটা এতই ঘরোয়া যে চিঠিতে জানাতে পারিনি। জটিলও বটে। সামনাসামনি বলতে চাই।'

'বলুন।'

'প্রথমেই বলতে চাই, আমার অন্নদাতা স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন।'

ভুরু তুলে হোমস বললে, 'এটা বেকার স্ট্রিট, হার্লে স্ট্রিট নয়[৭]। কিন্তু কথাটা কেন বললেন?'

'একটা দুটো অদ্ভুত কাণ্ড করলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। পর পর অদ্ভুত ব্যাপার করে গেলে খটকা লাগে। আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোকের মাথা বিগড়েছে ডার্বি[৮] আর শসকোম প্রিন্সকে নিয়ে।'

'আনাড়ি বাচ্চা ঘোড়া শসকোম প্রিন্স?'

'কিন্তু ইংলন্ডে অমন ঘোড়া আর নেই, মিস্টার হোমস তা আর কেউ না-জানুক, আমি জানি। কথাটা আশা করি এ-ঘরের বাইরে যাবে না। এ-ডার্বি জিততেই হবে স্যার রবার্টকে। দেনায় ডুবে আছেন— এই তাঁর শেষ সুযোগ। যেখান থেকে যা পেয়েছেন— ধার দেনা করে সর্বস্ব বাজি ধরেছেন। যখন ধরেছিলেন, তখন রেট ছিল প্রায় এক-শো। এখন তা চল্লিশে এসে ঠেকেছে[৯]।'

'কিন্তু ঘোড়া যদি অতই ভালো হবে তো দর পড়বে কেন?'

'পাবলিক জানে না শসকোম প্রিন্স কত উঁচু জাতের ঘোড়া। স্যার রবার্ট চালাকি করে দালালদের ধোঁকা দিয়ে রেখেছেন। প্রিন্সের মতোই দেখতে একটা ঘোড়াকে তিনি লাফঝাঁপ করাতে মাঠে পাঠান— তফাতটা কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু আমি জানি এক ফার্লং[১০] দৌড়োলেই দু-ঘোড়ার মাপে তফাত থেকে যায় দুজনের মধ্যে। ঘোড়া আর বাড়ি ছাড়া স্যার রবার্টের মাথায় এখন আর কিছু নেই। জীবনটাই ঝুলছে ডার্বির ওপর। তদ্দিন কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছেন সুদখোর ইহুদিদের। প্রিন্স হারলে স্যার রবার্টকে ছিঁড়ে খাবে এরা।'

'বড়ো মারাত্মক জুয়োয় নেমেছেন দেখছি। এবার বলুন পাগলামিটা কী দেখলেন?'

'চোখের দেখা দেখলেই বুঝবেন। রাতে ঘুমোন বলে মনে হয় না। সারারাত আস্তাবলে কাটান। চোখ দুটোই দাঁড়িয়েছে পাগলের চোখের মতো। নার্ভ আর সইতে পারছে না। এ ছাড়াও আছে লেডি বিয়েট্রিসের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত ব্যবহার।'

'কীরকম?'

'ভাইবোনে দারুণ বন্ধুত্ব। রুচিতেও দারুণ মিল। দুজনেই ঘোড়ার ভক্ত! প্রতিদিন ঘড়ি ধরে ঘোড়া দেখতে লেডি যান গাড়ি চেপে, যান স্যার রবার্টও। প্রিন্সকে দারুণ ভালোবাসেন লেডি নিজেও। এত ভালোবাসেন যে নুড়ির ওপর গাড়ির চাকার কড়মড় আওয়াজ শুনলেই কান খাড়া

করে শোনে প্রিন্স— দৌড়ে বেরিয়ে যায় লেডির হাত থেকে চিনির ডেলা খেতে। কিন্তু সব এখন শেষ।'

'কেন?'

'ঘোড়া নিয়ে আর কোনো মাথাব্যথা নেই লেডির। এক হপ্তা ধরে আস্তাবলের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন— গুড মর্নিং বলতেও দাঁড়াচ্ছেন না?'

'ঝগড়া হয়েছে, এই বলতে চান তো?'

'সাংঘাতিক ঝগড়া। নইলে যে স্প্যানিয়েলকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন লেডি, — সে-বেচারাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন স্যার রবার্ট? দিনকয়েক হল কুকুরটা দান করেছেন বুড়ো বার্নেজ, থাকে তিন মাইল দুরে ক্রেনড্যানের "গ্রীন ড্রাগনে"।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'লেডির শরীর খারাপ। হার্ট দুর্বল, সারাশরীর জলে ভরে উঠেছে 'ড্রপসি'[১১] হওয়ায়। দুর্দান্ত ভাইয়ের সঙ্গে পারবেন কেন। আগে কিন্তু এই বোনের সঙ্গেই রোজ সন্ধ্যায় দু-ঘণ্টা ঘরে বসে আড্ডা মেরে আসতেন। কিন্তু এখন সব শেষ। বোনের ছায়াও মাড়ান না। লেডির মন ভেঙে গেছে। মদ ধরেছেন। মদে ডুবে রয়েছেন।'

'ঝগড়া হওয়ার আগে মদ খেতেন?'

'এক আধ গেলাস খেতেন। এখন খান এক-এক সন্ধ্যায় পুরো বোতল। বাটলার স্টিফেন্স তো তাই বলল।

আরও আছে। পুরোনো গির্জের তলায় পাতাল সমাধি ঘরে কী করতে যান স্যার রবার্ট। রোজ একটা লোক এসে দেখা করে— কে সে?'

দু-হাত ঘষে হোমস বললে, 'চালিয়ে যান, মিস্টার ম্যাসন। ক্রমশই জমিয়ে তুলছেন।'

'লোকটাকে বাটলারই দেখেছে। রাত তখন বারোটা। দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিল। শুনে পরের রাতে আমি নিজে গেলাম দেখতে। সত্যিই দেখতে পেলাম না স্যার রবার্টকে— বেরিয়ে পড়েছেন অত রাতেও। খোঁজে বেরোলাম আমি আর স্টিফেন্স। ধরা পড়লে মেরে খুন করে ফেলতেন স্যার রবার্ট— তাই কাছাকাছি যেতে ভরসা পেলাম না। দূর থেকে দেখলাম পোড়া পাতালঘরেই ঢুকলেন— সেই লোকটাকেও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে ওর পথ চেয়ে।'

'পোড়া পাতালঘরটা কী?'

'পার্কে একটা পুরোনো ভাঙা গির্জে আছে। কত পুরোনো, তা কেউ জানে না। মাটির তলায় আছে একটা সমাধি ঘর— জায়গাটা খারাপ— দুর্নাম আছে— লাখ টাকা দিলেও রাত্রে সেখানে কেউ যেতে চায় না। ঠান্ডা, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার। কিন্তু স্যার রবার্টের ভয়ডর নেই। অত রাতে কী করতে যান পাতাল গোরস্থানে?'

'সঙ্গে যে থাকে, সে আস্তাবলের কেউ নয় তো? অথবা বাড়ির কোনো লোক?'

'সে-রকম কেউ না।'

'জানছেন কী করে?'

'লোকটাকে দেখেছি। দ্বিতীয় রাত্রে পেছন পেছন গিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিলাম আমি আর স্টিফেন্স। চাঁদের আলোয় পাশ দিয়ে চলে গেলেন স্যার রবার্ট। স্পষ্ট শুনলাম, পেছন পেছন আর একজন আসছে। তাকে অত ভয় কীসের? স্যার রবার্ট চলে যেতেই ঝোপ থেকে

বেরিয়ে এলাম। যেন হাওয়া খাচ্ছি এমনিভাবে পেছনে গিয়ে বললাম, 'আরে! তুমি আবার কে? আমরা যে পেছনে এসেছি, লোকটা তা টের পায়নি। তাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বিকট চেঁচিয়ে পাঁই পাঁই করে পালিয়ে গেল চক্ষের পলকে। কী দৌড়! কোত্থেকে এসেছে, কে সে— কিছুই জানা গেল না।'

'চাঁদের আলোয় মুখটা কিন্তু স্পষ্ট দেখেছিলেন?'

'হলদেটে মুখ— লেড়ি কুত্তার মতো নোংরা। স্যার রবার্টের সঙ্গে এমন লোকের সম্পর্কটা কী বলতে পারেন?'

কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইল হোমস।

'লেডি বিয়েট্রিসকে সঙ্গ দেন কে?'

'ক্যারি ইভ্যান্স— বছর পাঁচেক হল এ-কাজ করছেন মেয়েটা।'

'লেডি বলতে অজ্ঞান নিশ্চয়?'

'অজ্ঞান যে কার জন্যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।'

'বুঝেছি। পরিস্থিতি বিলক্ষণ ঘোরালো দেখছি। ডক্টর ওয়াটসন একটু আগে স্যার রবার্টের যে-বর্ণনা শোনালেন, তা থেকে এটুকু বোঝা গেছে যে ভদ্রলোকের খপ্পর থেকে কোনো মেয়ে রেহাই পায় না। ভাইবোনে ঝগড়ার সূত্রপাত এই নিয়ে নয় তো?'

'কিন্তু সে-কেলেঙ্কারি তো আজকের নয়।'

'লেডি বিয়েট্রিস হয়তো সম্প্রতি জেনেছেন। ধরে নেওয়া যাক, হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়েছে। মেয়েটিকে তাই ভাগাতে চান। ভাই রাজি নয়। দুর্বল হৃৎপিণ্ড আর অশক্ত শরীর নিয়ে জোর করতেও পারছেন না লেডি। মেয়েটা চোখের বালি হওয়া সত্ত্বেও কাছছাড়া হচ্ছে না। তাই কথা বন্ধ করে চুপচাপ মদ ধরলেন লেডি। রাগের চোটে বোনের 'স্প্যানিয়েলকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলেন স্যার রবার্ট। কি, সব মিলে যাচ্ছে না?'

'যতক্ষণ মেলার ততক্ষণ মিলছে।'

'যা বলেছেন। কিন্তু রাতদুপুরে পাতাল গোরস্থানে স্যার রবার্টের হানা দেওয়ার সঙ্গে কী সম্পর্ক এই ব্যাপারের? এটাকে তো খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।'

'আজ্ঞে, না। এমনি আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে যা খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। যেমন, রাতদুপুরে মাটি খুঁড়ে মড়া বার করেন কেন স্যার রবার্ট?'

আচমকা সিধে হয়ে বসল হোমস।

'আপনাকে চিঠি লেখবার পর ব্যাপারটা জানলাম— গতকাল। লন্ডনে এসেছিলেন স্যার রবার্ট। সেই ফাঁকে পাতাল গোরস্থানে গেছিলাম আমি আর স্টিফেন্স। এককোণে নরদেহের মতো একটা বস্তু দেখলাম।'

'পুলিশকে খবর দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে, পুলিশের মাথা তাতে ঘামবে বলে মনে হয় না। নরদেহ বলতে একটা মমিদেহের শুধু একটা মাথা আর খানকয়েক হাড়। হয়তো হাজার বছর আগেকার। কিন্তু আগে এ-জিনিস ওখানে ছিল না। স্টিফেন্সও বলল তাই। কোণটা ফাঁকা ছিল চিরকাল। এখন এই হাড়গোড় সেখানে জড়ো করে কাঠ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।'

'দেখে কী করলেন?'

'যেখানকার জিনিস, সেইখানেই রেখে দিলাম।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। স্যার রবার্ট গতকাল লন্ডনে এসেছিলেন বললেন। আজ ফিরেছেন?'

'আশা করছি।'

'বোনের কুকুর দান করেছেন কবে?'

'আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে। ভীষণ চেঁচাচ্ছিল বেচারা। সকাল থেকেই মেজাজ তিরিক্ষে হয়েছিল স্যার রবার্টের। এমনভাবে বেচারাকে টেনে আনলেন ভাবলাম বুঝি এবার মেরেই ফেলবেন। জকি স্যান্ডিবেনকে ডেকে বললেন, ''গ্রিনড্রাগন'-এ বার্নেজের কাছে রেখে আসতে— অমন কুকুরের মুখ আর দেখতে চান না।'

পাইপ ধরিয়ে ভাবতে বসল হোমস।

তারপর বললে, 'আমাকে দিয়ে কী করাতে চান, এখনও কিন্তু সেটা স্পষ্ট হয়নি, মিস্টার ম্যাসন।'

'এই জিনিসটা দেখলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে'— বলে, পকেট থেকে কাগজ মোড়া একটা পোড়া হাড় বার করলেন মিস্টার ম্যাসন।

সাগ্রহে দেখল হোমস, 'কোথায় পেলেন?'

'লেডি বিয়েট্রিসের ঘরের মাটির তলায় পাতালঘরে ঘর গরম করার ফার্নেস আছে। এতদিন পড়েই ছিল— জ্বালানো হয়নি। হঠাৎ স্যার রবার্ট বললেন, শীতে হাত-পা কালিয়ে যাচ্ছে— ফার্নেস জ্বালানো হোক। আজ সকালে ছাই ঘাঁটতে গিয়ে এই হাড়টা ওর চোখে পড়ে। খটকা লাগায় নিয়ে আসে আমার কাছে।'

'খটকা আমারও লাগছে। ওয়াটসন, তোমার কী মনে হয়?'

পুড়ে প্রায় কাঠকয়লার মতো হয়ে গেলেও হাড়ের গড়ন দেখে ভুল হওয়ার কথা নয়।

বললাম, 'মানুষের ঊরুর হাড়।'

'ঠিক বলেছ!' অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে গেল হোমস। 'ছোঁড়াটা ফার্নেসে আগুন দেয় কখন?'

'সকালে।'

'রাত্রে যে কেউ সেখানে যেতে পারে?'

'পারে।'

'বাইরে থেকে এসে?'

'একটাই দরজা আছে বাইরের দিকে। আর একটা দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লেডি বিয়েট্রিসের ঘর যেখানে, সেই প্যাসেজে যাওয়া যায়।'

'ব্যাপারটা গভীর জলের, মিস্টার ম্যাসন। খুবই নোংরা। স্যার রবার্ট কাল রাতে বাড়ি ছিলেন না?'

'না।'

'তাহলে হাড় তিনি পোড়াননি।'

'খাঁটি কথা।'

'সরাইখানার নামটা কী বললেন?'

'গ্রিন ড্রাগন।'

'ও-অঞ্চলে মাছ ধরা যায়?'

আরেক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল ট্রেনারের মুখচ্ছবিতে।

'যায়। ট্রাউট আর পাইক। নদীতে ট্রাউট, হল-লেকে পাইক।'

'চমৎকার! ওয়াটসন আর আমি দুজনেই নাম করা জেলে— তাই না ওয়াটসন? 'গ্রিন ড্রাগন'-এ এরপর দেখতে পাবেন আমাদের। আজ রাতেই পৌঁছোচ্ছি। নিজে আসবেন না, চিঠি লিখবেন। দরকার পড়লে গিয়ে দেখা করব। কেসটা আগে নাড়াচাড়া করি, তারপর জানাব আমার মতামত।'

মে মাসের ঝকঝকে সন্ধ্যায় ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চেপে রওনা হলাম শসকোম স্টেশন অভিমুখে। মাথার ওপর মাল রাখার তাকে থরে থরে সাজানো রইল ছিপ, রিল আর বাস্কেট। সরাইখানায় পৌঁছোনোর পর জোসিয়া বার্নেজ উল্লসিত হল আমাদের মাছ ধরার প্ল্যান শুনে।

হোমস বললে, 'হল-লেকে পাইক ধরলে কেমন হয়?'

অন্ধকার হল বার্নেজের মুখ।

'সুবিধে হবে না। ধরা পড়ে যাবেন মাছ ধরার আগেই।'

'তার মানে?'

'স্যার রবার্ট দালালদের একদম বরদাস্ত করেন না। ওঁর ট্রেনিং কোয়ার্টারের ধারেকাছে আপনাদের ঘুর-ঘুর করতে দেখলেই খেপে যাবেন।'

'ডার্বি রেসে ঘোড়া নামিয়েছেন, তাই না?'

'আজ্ঞে। ঘোড়াটা আনাড়ি, বাচ্চা। কিন্তু বাজি ধরেছেন সর্বস্ব।' বলতে বলতে চিন্তা ঘনিয়ে এল বুড়োর চোখে, 'আপনারাও রেসের মাঠে যাতায়াত করেন নাকি?'

'এক্কেবারেই না। এসেছি বার্কশায়ারের হাওয়া খেতে।'

'সেদিক দিয়ে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। তবে স্যার রবার্ট সম্বন্ধে যা বললাম, খেয়াল রাখবেন। ভদ্রলোক আগে হাত চালান, পরে কথা বলেন। পার্কের ধারেকাছেও যাবেন না।'

'তা আর বলতে! হলে একটা স্প্যানিয়েলকে কেঁউ কেঁউ করতে দেখে এলাম। চমৎকার কুকুর কিন্তু।'

'তা তো হবেই। খাঁটি শসকোম জাতের যে। ইংলন্ডে আর কোথাও এমন স্প্যানিয়েল পাবেন না।'

'কুকুর পুষতে বড়ো ভালোবাসি আমি। কীরকম দাম পড়ে এ-রকম কুকুরের?'

'এ-কুকুর কেনার টাকা আমার নেই। স্যার রবার্ট দিয়েছেন বলেই রেখেছি। চেন খুলে দিলে এখুনি হলে দৌড় দেবে।'

বার্নেজ চোখের আড়াল হতেই হোমস বললে, 'ওয়াটসন, অনেক খবর পাওয়া গেল। আরও আসবে দু-একদিনের মধ্যে। স্যার রবার্ট শুনলাম এখনও লন্ডনেই। আজ রাতেই পাতাল গোরস্থানে হানা দেব ভাবছি। কয়েকটা ব্যাপার খতিয়ে নিতে চাই।'

'কিছু আঁচ করেছ কি?'

'শুধু একটা ব্যাপার। দিন সাতেক আগে এমন কিছু ঘটেছে যা বেশ নাড়া দিয়ে গেছে শসকোম ফ্যামিলিকে। পরিণামে অনেকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।'

'যেমন রুগ্‌ণ বোনের সঙ্গে আর দেখা করছেন না ভাই। বোনের প্রাণপ্রিয় কুকুরকে বিদেয় করেছেন বাড়ি থেকে। ওয়াটসন! খটকা লাগছে না? কিছু বুঝতে পারছ না?'

'কিছু না— ভাই রেগে কাঁই— এইটাই কেবল বোঝা যাচ্ছে।'

'রেগে কাঁই হতে পারে— অন্য কিছুও হতে পারে। ঝগড়া আদৌ হয়েছে কি না জানা নেই— যদিও-বা হয়ে থাকে, তারপর থেকে কী ঘটেছে, এবার তা পর্যালোচনা করা যাক। রোজকার অভ্যেস পালটেছেন লেডি। ঘর থেকে বেরোন না, ঝিকে নিয়ে গাড়ি করে বেরোনোর সময় ছাড়া দেখা যায় না, আস্তাবলে গিয়ে প্রাণাধিক ঘোড়াকেও আর গুড মর্নিং বলেন না এবং শোনা যাচ্ছে মদও ধরেছেন। এই হল পুরো কেস, তাই না?'

'পাতাল গোরস্থানের ব্যাপারটা বাদ গেল।'

'সেটা আরেক ব্যাপার। দু-লাইনের চিন্তাধারাকে এক লাইনে মিশোতে যেয়ো না— জট পাকিয়ে যাবে। এক নম্বর লাইনে রয়েছে লেডি বিয়েট্রিসের প্যাঁচালো কাণ্ডকারখানা।'

'কিস্সু বুঝছি না।'

'দু-নম্বর লাইন হল স্যার রবার্টকে নিয়ে। ডার্বি রেস জেতবার জন্যে পাগল হয়েছেন। ইহুদি সুদখোরদের খপ্পরে পড়েছেন। যেকোনো মুহূর্তে আস্তাবল দখল করতে পারে তারা। ভদ্রলোক বেপরোয়া, দুঃসাহসী। যা কিছু আয় বোনের কাছ থেকে। বোনের ঝিকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করান।'

'কিন্তু পাতাল গোরস্থান?'

'ধরা যাক, স্যার রবার্ট বোনকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছেন।'

'মাই ডিয়ার হোমস, এ-প্রশ্নই ওঠে না।'

'স্যার রবার্ট খানদানি মানুষ। কিন্তু জানো তো ইগলদের মাঝেই কখনো-সখনো পচা মাংস খেকো কাক দেখা যায়? কাজেই আপাতত এই লাইনেই ভাবা যাক। শসকোম প্রিন্স রেসে না-জিতলে বড়োলোক হতে পারছেন না এবং বড়োলোক হতে না-পারলে দেশ ছেড়ে লম্বা দিতে পারছেন না স্যার রবার্ট। তদ্দিন ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে। থাকতে গেলে বোনের লাশ পাচার করতে হবে এবং বোনের জায়গায় নকল কাউকে দিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে যেতে হবে। ঝি-কে কবজায় রেখেছেন— কাজেই তা অসম্ভব নয়। পাতাল গোরস্থানে কেউ যায় না! কাজেই বোনের লাশ পাচার করা হল সেখানে। পরে পাতাল ফার্নেসে তা পুড়িয়েও ফেলা হল— পড়ে রইল একটাই প্রমাণ— যা আমরা দুজনেই দেখেছি। বলো বন্ধু, কীরকম বুঝলে?'

'প্রথমেই যে অসম্ভব ভয়ংকর সম্ভাবনাটা ধরে নিয়েছ, সেটা যদি সম্ভব হয়— তবেই বাকি সবই সম্ভব।'

'কাল একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করলেই এ-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ঘটবে। ইতিমধ্যে চলো বুড়ো বার্নেজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া যাক তারই এক গেলাস মদ খেয়ে, আর মাছ নিয়ে গল্প করে।'

সকাল বেলা হোমস বললে, মাছের চারা আনা হয়নি। কাজেই শিকেয় উঠল মাছ ধরা। এগারোটা নাগাদ কালো স্প্যানিয়েলকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোলাম দুই বন্ধু।

পার্ক গেটের সামনে এসে দেখলাম ফটকের মাথায় কুলচিহ্ন গ্রিফিনের মূর্তি। মাথা আর পাখা ইগল পাখির— দেহটা সিংহের। হোমস বললে, 'মিস্টার বার্নেজ বলছিলেন, বেলা বারোটা নাগাদ বুড়ি লেডি গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন। গেটের কাছে গাড়ি আস্তে চলে। গেট পেরিয়ে গেলে

ফের জোরে চলে। ঠিক তার আগেই কোচোয়ানকে যা হয় কিছু একটা প্রশ্ন করে গাড়ি দাঁড় করাবে, ওয়াটসন। আমার জন্যে ভেবো না। ঝোপের আড়ালে বসে দেখি কী করতে পারি।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখলাম দু-ঘোড়ায় টানা একটা বড়ো খোলা হলদে গাড়ি এগিয়ে আসছে। কুকুর নিয়ে ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসল হোমস। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বেতের ছড়ি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দৌড়ে এসে একজন খুলে দিল ফটক।

গাড়ি তখন হেঁটে চলার গতিতে গড়াচ্ছে— ভেতরে কারা বসে আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ-দিকে বসে চড়া রঙে রঙিন এক তরুণী—পট-রঙিন চুল— চোখে নির্লজ্জ দৃষ্টি। ডাইনে এক প্রৌঢ়া। শাল দিয়ে ঢাকা মুখ আর কাঁধ। গোলপিঠ। নিঃসন্দেহে রুগ্‌ণা এবং চলৎশক্তিহীন। গাড়ি আবার জোরে চলতে শুরু করেছে দেখে হাত তুলে পথ আটকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, শসকোম ওল্ড প্লেসে স্যার রবার্ট আছেন কি না।

ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এল হোমস, চেন খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিল কালো স্প্যানিয়েলকে। উল্লাসে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে তিরবেগে ছুটে গিয়ে কুকুর লাফিয়ে উঠল পাদানিতে।
ফ্রাঙ্ক ওয়াইলস, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন, ১৯২৭

ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এল হোমস, চেন খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিল কালো স্প্যানিয়েলকে। উল্লাসে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে তিরবেগে ছুটে গিয়ে কুকুর লাফিয়ে উঠল পাদানিতে। পরমুহূর্তেই উল্লাসধ্বনি গেল মিলিয়ে— জাগ্রত হল ক্রুদ্ধ হুংকার এবং ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরল কালো স্কার্ট।

কর্কশ কণ্ঠে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল বিষম আতঙ্কে— 'চালাও! জোরসে!' চাবুক হাঁকড়াল কোচোয়ান—ছিটকে বেরিয়ে গেল গাড়ি— রাস্তার মাঝে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

স্প্যানিয়েল তখন ফুঁসছে, উত্তেজনায় ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে। ঝটপট গলায় চেন পরিয়ে দিল হোমস।

বলল, 'কেল্লা ফতে, ওয়াটসন! কুকুর কখনো ভুল করে না। ভেবেছিল লেডি বিয়েট্রিস— তাই দৌড়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল ভুল হয়েছে— অন্য কেউ— যাকে চেনে না। তাই অত রাগ।'

'কিন্তু চিৎকারটা বেটাছেলের।'

'তা তো হবেই। হাতে আর একটা তাস বাড়ল, ওয়াটসন। এবার খেলতে হবে সাবধানে।'

সারাদিনে বন্ধুবরের নতুন কোনো প্ল্যান না-থাকায় নদীতে গিয়ে মাছ ধরলাম। রাত্রে খেতে বসে টাটকা পাইকের[১২] ঝোল পেলাম সেই কারণেই। খাওয়া শেষ হল— হোমসের উদ্যমও যেন ফিরে এল! ফের নামলাম রাস্তায়— এলাম পার্ক গেটের সামনে। জন ম্যাসনের দীর্ঘ কৃষ্ণমূর্তিকে দেখা গেল ফটকের পাশেই— আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে।

'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন। আপনার চিঠি পেয়েছি মিস্টার হোমস। স্যার রবার্ট এখনও ফেরেননি— তবে আজ রাতেই ফিরবেন আশা করছি।'

'পাতাল গোরস্থান বাড়ি থেকে কদ্দূর?' হোমসের প্রশ্ন।

'প্রায় সিকি মাইল।'

'তাহলে ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি যে না-ঘামিয়ে পারছি না। বাড়ি ফিরেই তো উনি শসকোম প্রিন্সের খবর জানতে চাইবেন।'

'তাহলে এক কাজ করুন। আপনার থাকার দরকার নেই। পাতাল কবরখানা দেখিয়ে দিয়ে চলে যান।'

আকাশে চাঁদ নেই। নীরন্ধ্র অন্ধকারেও ঘেসোজমির ওপর দিয়ে জন ম্যাসন আমাদের নিয়ে গেলেন একটা জমাট অন্ধকারের সামনে। প্রাচীন গির্জের ভগ্নস্তূপ। এককালে যেখানে গাড়িবারান্দা ছিল, সেইখান দিয়ে ভাঙা ইটকাঠপাথরের ওপর হোঁচট খেতে খেতে পৌঁছোলাম। এক কোণে একটা খাড়াই সিঁড়ি নেমে গেছে পাতাল গোরস্থানের দিকে। দেশলাই জ্বাললেন মিস্টার ম্যাসন। যা তা করে খোদাই করা বিস্তর পাথর, কোণে কোণে জড়ো করা সিসে আর পাথরের কফিন, নীচু ছাদ আলোকিত হয়ে উঠল ম্লান আলোয়— পাতালের অন্ধকারে ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছে বিষাদ ঘেরা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ। লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিল হোমস। হলদে আলোয় উদ্ভাসিত হল কফিনের ডালায় গ্রিফিন মূর্তি— এ-বংশের কুলচিহ্ন— মৃত্যুপুরীতে রওনা হওয়ার সময়ে যে-সম্মান নিয়ে যেতে হবে যমের দুয়ার পর্যন্ত।

'হাড়গুলো কোথায়, মিস্টার ম্যাসন?'

'এই তো এই কোণে', কিন্তু পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলেন পরম বিস্ময়ে, 'আরে! গেল কোথায় হাড়গুলো!'

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, 'জানতাম পাবেন না। ছাইটা পেতে পারেন ফার্নেসে।'

'কিন্তু হাজার বছর আগেকার কঙ্কাল পুড়িয়ে লাভটা কী বলতে পারেন?'

'সেইটা জানবার জন্যেই তো এসেছি। সকাল হয়ে যাবে জানতে জানতে। আপনি যান— আর আটকাব না।'

জন ম্যাসন যেতে-না-যেতেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবর পর্যবেক্ষণে মেতে উঠল শার্লক হোমস। হ্যাক্সন আমলের অতি পুরাতন কবর থেকে দেখতে দেখতে নরম্যান হিলগো আর ওডোসদের সুদীর্ঘ কবর দেখে এসে পৌঁছোল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাহিত স্যার উইলিয়াম আর স্যার ডেনিস ফালডারের কবরের সামনে। ঘণ্টাখানেক কি আরও বেশি সময় লাগল সব দেখতে। তারপর এসে দাঁড়ালাম ভল্টে প্রবেশপথের মুখে একটা সিসের কফিনের সামনে। দেখেই হর্ষধ্বনি করে দৌড়ে গেল হোমস— বুঝলাম যা খুঁজছিল এতক্ষণ, এবার তা পেয়েছে। ভারী ডালাটার প্রতি বর্গ ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল আতশকাচ দিয়ে। তারপর পকেট থেকে ছেনি বার করে ডালার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় মারতেই ক্ল্যাম্প খসে খুলে গেল ঢাকনা। মড় মড় মচাৎ করে ডালাটা সবে খানিকটা হেলেছে, ভেতরের বস্তু কিছুটা দেখা যাচ্ছে— এমন সময়ে বাধা এল অপ্রত্যাশিতভাবে।

মাথার ওপর গির্জেতে কে যেন হাঁটছে। একবারও হোঁচট খাচ্ছে না— থামছে না— চেনাজানা পথেই কে যেন দৃঢ় চরণে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সিঁড়িতে আলোর আভাস দেখা গেল— পরমুহূর্তেই পথিক খিলানের ফাঁকে আবির্ভূত হল আলোকধারী ব্যক্তির কৃষ্ণমূর্তি। ভয়ংকর আকৃতি। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি বিকট চালচলন। হাতে বিরাট আস্তাবল-লণ্ঠন, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ইয়া মোটা গোঁফ আর চনমনে ক্রুদ্ধ দুই চোখ। কটমট করে ভল্টের আনাচেকানাচে দেখতে দেখতে দৃষ্টি স্থির হল হোমস আর আমার ওপর।

শোনা গেল বজ্রনাদ, 'কে আপনারা? আমার জায়গায় কী করতে ঢুকেছেন?' হোমস নিরুত্তর দেখে দু-পা এগিয়ে এসে হাতের লাঠি মাথার ওপর তুলল অসুর মূর্তি, 'কথাটা কানে ঢুকেছে! কে আপনারা? এখানে কী করছেন?' লাঠি কাঁপতে লাগল শূন্যে।

হোমস কোথায় পেছিয়ে আসবে, তা না একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল বজ্রকঠিন স্বরে, 'স্যার রবার্ট, আমি একটা কথা জানতে চাই। এটা কী? এখানে কেন?'

বলেই পেছন ফিরে এক ঝটকায় খুলে ফেলল কফিনের ডালা। লন্ডনের জোরালো আলোয় দেখলাম পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা একটা লম্বমান দেহ— এক প্রান্তে কেবল বেরিয়ে আছে একটা ভয়াবহ ডাইনি-সদৃশ মুখ— বিরং, সিটিয়ে থাকা মুখ নাক, থুতনি, ঘোলাটে চোখ।

চিৎকার করে উঠলেন ব্যারোনেট। টলতে টলতে পিছিয়ে কোনোমতে একটা পাথরের শবাধার ধরে সামনে নিলেন নিজেকে।

'আপনি জানলেন কী করে?' তারপরেই আবার ফিরে এল সেই হিংস্র, বর্বর, উদ্ধত কণ্ঠস্বর, 'তা নিয়ে আপনার কী?'

'আমার নাম শার্লক হোমস— শুনে থাকতে পারেন। আমার কাজ আইন রক্ষা হচ্ছে কি না দেখা। জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থাকুন।'

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন স্যার রবার্ট। কিন্তু ওষুধ ধরল হোমসের নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর আর অচঞ্চল আচরণে।

'মিস্টার হোমস, দেখে যা ভাবছেন তা নয়। এ ছাড়া আর করার কিছু ছিল না আমার।'

'যা বলবার পুলিশকে বলবেন।'

বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে স্যার রবার্ট বললেন, 'বলতে তো হবেই। তার আগে আপনি নিজেই শুনে যান সব ব্যাপার।'

পনেরো মিনিট পর প্রাচীন প্রাসাদের গানরুমে এসে পৌঁছোলাম সবাই। আমাদের বসিয়ে উধাও হলেন স্যার রবার্ট। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গেসঙ্গে। পেছন পেছন এল দুটি মূর্তি। একজনকে গাড়ির মধ্যে আগেই দেখেছি— চড়া রঙে রঙিন সেই মেয়েটি। অপরজন ইঁদুরমুখো এক পুরুষ— চোখে চোরাচাহনি— দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়। হতভম্ব দুজনেই। স্যার রবার্ট হুটোপুটি করে টেনে এনেছেন নিশ্চয়— খুলে বলার সময় পাননি।

হস্তসঞ্চালনে দুজনকে দেখিয়ে বললেন, 'মিস্টার আর মিসেস নরলেট এদের নাম। মিসেস নরলেটের ডাক নাম ইভান্স। আমার বোনের পাশে পাশে থাকার কাজ নিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। আমি কী করেছি, কেন করেছি— এরা সব জানে। তাই নিয়ে এলাম আপনার সামনে।'

তারস্বরে ইভান্স বললে, 'করছেন কী স্যার রবার্ট?'

ইঁদুরমুখো লোকটা সঙ্গেসঙ্গে ধুয়ো ধরল, 'আমি কিন্তু কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না।'

অপ্রসন্ন চোখে তাকিয়ে স্যার রবার্ট বললেন, 'আমি নিচ্ছি। মিস্টার হোমস, সোজাসুজি সব বলছি— শুনুন।

'অনেক ব্যাপার জেনে ফেলেছেন— নইলে আমার আস্তানায় এভাবে ঢুকতেন না। এটাও নিশ্চয় জানেন যে ডার্বি রেসে একটা ঘোড়ার ওপর সর্বস্ব বাজি ধরেছি আমি। যদি জিতি— উতরে যাব। যদি হারি— একেবার তলিয়ে যাব। উফ ভাবাও যায় না।'

'বুঝতে পারছি', বলল হোমস।

'বোন লেডি বিয়েট্রিসের ওপর আমি পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু এস্টেট শুধু তাকেই দেখবে— আমাকে নয়। আমাকে বাঁচতে হয় ইহুদি মহাজনের টাকায়। বোনের মৃত্যু হলেই ওরা শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার আস্তাবল, ঘোড়া— সব কিছুর ওপর— পথে বসিয়ে ছাড়বে আমাকে। মিস্টার হোমস— ঠিক সাতদিন আগে দেহ রেখেছে আমার সেই বোন।'

'কাউকে তা বলেননি।'

'বলব কী করে? বললেই তো রাস্তায় বসতাম। কিন্তু হপ্তা তিনেক ঠেকিয়ে রাখলে বেঁচে যাব। এই যে লোকটাকে দেখছেন— ইভান্সের স্বামী— এর জীবিকা অভিনয় করা। ভেবে দেখলাম, একে দিয়ে বোনের ভূমিকা হপ্তা তিনেক অভিনয় করালে ইহুদিদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। রোজ একবার গাড়ি চড়ে হাওয়া খেলেই হল। ঘরে ইভান্স ছাড়া আর

কেউ ঢোকে না— কাজেই আর কোনো ঝামেলা নেই। বোন মারা গেছে ড্রপসি রোগে— ভুগছিল অনেক দিন ধরে।'

'সেটা করোনার দেখবে।'

'কয়েক মাস পরে ডাক্তারও বলেছিল, মৃত্যু হবে হঠাৎ। সার্টিফিকেট আনিয়ে দেব।'

'আপনি কী করলেন, তাই বলুন।'

'ডেডবডি তো রাখা যায় না বাড়ির মধ্যে। তাই সেই রাতেই নরলেট আর আমি লাশ পাচার করলাম বার-বাড়িতে। ওখানে কেউ যায় না। কিন্তু স্প্যানিয়েলটা গেল সঙ্গে সঙ্গে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এত ঘেউ ঘেউ করতে লাগল যে বাধ্য হয়ে ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যেতে হল আরও নিরাপদ জায়গায়। স্প্যানিয়েলকে আগে সরিয়ে দিলাম বাড়ি থেকে। তারপর ডেডবডি নিয়ে গেলাম গির্জের তলায় কবরখানায়। এর মধ্যে কোনো অসম্মান বা অশ্রদ্ধা নেই। লোকান্তরিত আত্মার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি বলে আমি মনে করি না।'

'কিন্তু আমার কাছে তা ক্ষমার অযোগ্য', বললে হোমস। অধীরভাবে মাথা নাড়লেন ব্যারোনেট, 'জ্ঞান দেওয়া খুব সোজা। আমার অবস্থায় থাকলে হয়তো অন্য বুদ্ধি আপনার মাথায় আসত না। শেষ পর্যন্ত বাড়াভাতে ছাই পড়তে যাচ্ছে— দেখলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। ঠিক করলাম, সাময়িকভাবে ভগ্নীপতির পূর্বপুরুষদের কোনো শবাধার খালি করে তার মধ্যে বোনকে রাখব— কফিনের কঙ্কাল ফার্নেসে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব। তাই করেছি আমি নরলেট— দেখতেই পাচ্ছেন!'

কিছুক্ষণ নতমস্তকে চিন্তামগ্নভাবে বসে রইল হোমস।

তারপর বলল, 'যা বললেন, তার মধ্যে একটা ফাঁক কিন্তু রয়ে গেল। রেসে জিতুন আর না-জিতুন— পাওনাদাররা তো আপনাকে ছেড়ে দেবে না— এস্টেট লুট করে নিয়ে যাবে!'

'ঘোড়াটা এস্টেটের সম্পত্তি— কিন্তু বাজির টাকার ধার ধারবে না। আমার সবচেয়ে বড়ো পাওনাদার হল স্যামব্রুয়ার। মহাবদমাশ। নিউমার্কেট হীথে হান্টার পেটা করেছিলাম একবার। আপনি কি মনে করেন সে আর আমাকে বাঁচাবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'আপনার ব্যাপার আপনি বুঝবেন। আমার কর্তব্য আমি করব— পুলিশকে খবর দেব। রাত বারোটা বাজল। ওয়াটসন, চলো ফেরা যাক।'

সবাই জানেন অত্যাশ্চর্য এই কাহিনির উপসংহারে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি— যা ঘটা একান্তই সংগত ছিল স্যার রবার্টের অসংগত আচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ। শসকোম প্রিন্স ডার্বি জিতেছিল, মালিককে আশি হাজার পাউন্ড পাইয়ে দিয়েছিল। পাওনাদারদের টাকা মিটিয়েও স্যার রবার্টের হাতে এত টাকা থেকে গিয়েছিল বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। লেডি বিয়েট্রিসের মৃত্যুর খবর দেরিতে নথিভুক্ত করার দরুন ব্যারোনেটকে মৃদু তিরস্কার করে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ এবং করোনার। পুরো লেনদেনের ব্যাপারটাকে দেখেছিল উদার চোখে। অসম্মানের ছায়া থেকে সরে এসে এখন সসম্মানে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চললেন স্যার রবার্ট।

টীকা

১. **পাতালের পাপচক্র :** ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য শসকোম ওল্ড প্লেস’ স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় শার্লক হোমস-এর গল্প ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান’-এর পরে। আমেরিকার লিবার্টি পত্রিকার মার্চ ১৯২৭ এবং স্ট্র্যান্ডের ১৯২৭ সংখ্যায় প্রকাশের আগে ওই পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় এটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যাক স্প্যানিয়েল’ নামে। আবার জন মারে প্রকাশিত শার্লক হোমসের গল্প সংকলনে লেখক স্যার আর্থার গল্পটির উল্লেখ করেন ‘দি অ্যাডভেঞ্চার অব শসকোম অ্যাবি’ নামে।

২. **সেন্ট প্যানক্র্যাস :** এই অঞ্চলে চতুর্দশ শতকে নির্মিত সেন্ট প্যানক্র্যাস ওল্ড চার্চকে ইংলন্ডের প্রথম ক্রিস্টান চার্চ বলে অনুমান করা হয়।

৩. **টাকা জাল করার কীর্তি :** ‘দি গ্রিক ইন্টারপ্রেটার’ গল্পেও হোমসকে টাকা জাল করার কীর্তি ফাঁস করতে দেখা গিয়েছিল।

৪. **পেনশনের অর্ধেক :** নিনো সিরোনের প্রবন্ধে জানা যায়, সেই সময়ে ড. ওয়াটসনের পেনশন ছিল সপ্তাহে দু-পাউন্ড। (দ্রষ্টব্য : ‘দ্য ড. জন ওয়াটসন অ্যানুয়াল প্রাইজ এসে কম্পিটিশন’ ২০০১)।

৫. **ঘোড়ার পেছনেই ওড়াই :** ‘সিলভার ব্লেজ’ গল্পে দেখা গিয়েছিল হোমস ঘোড়দৌড় সম্পর্কে বিস্তর খবরাখবর রাখলেও ওয়াটসনের এই ব্যাপারে কোনো ধারণা বা উৎসাহ ছিল না। বিভিন্ন সময়ে ওয়াটসনের শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রেসের কথা এই প্রথম।

৬. **গ্র্যান্ড ন্যাশনাল :** লিভারপুলের এইনট্রি রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক ‘স্টিপলচেজ’ প্রতিযোগিতা। স্টিপলচেজ ঘোড়দৌড় শুধু নয়, ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারের নানাবিধ কসরত প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৮৩৯ থেকে।

৭. **হার্লে স্ট্রিট নয় :** হার্লে স্ট্রিটে ডাক্তারদের অফিস বা চেম্বার। হোমস বোঝাতে চেয়েছিল, স্যার রবার্টের পাগলামি সারাতে ডাক্তদ্বার প্রয়োজন, গোয়েন্দা নয়। আরেকটি হোমসিয় ঠাট্টা।

৮. **ডার্বি :** সারে-র এপসম ডাউন্স-এ অনুষ্ঠিত উঁচু বাজির বাৎসরিক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। ১৭৮০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এই প্রতিযোগিতা বর্তমানে বিজ্ঞাপন ‘স্পনসর’-এর নাম অনুসারে ‘ভোডাফোন ডার্বি’ নামে পরিচিত।

৯. **চল্লিশে এসে ঠেকেছে :** অর্থাৎ, বর্তমান দর হল চল্লিশ।

১০. **ফার্লং :** এক মাইলের এক অষ্টমাংশ। ডার্বির দৌড় হত দেড় মাইল। অর্থাৎ বারো ফার্লং।

১১. **ড্রপসি :** শরীরের টিসু এবং শিরায় রস জমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, বিশেষত গোড়ালি বা পায়ের নীচের দিকের অন্যান্য অংশ ফুলে ওঠা। বর্তমান নাম ‘ইডিমা’।

১২. **পাইক :** ‘দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস’ উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য।

রং-ব্যাপারীর বিরং ব্যাপার[১]

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান]

বিষণ্ণ দার্শনিক মেজাজে সেদিন সকালে দেখলাম শার্লক হোমসকে।

'দেখেছ লোকটাকে?' শুধোল আমাকে।

'এইমাত্র বেরিয়ে গেল যে-বুড়োটা?'

'হ্যাঁ।'

'দরজার কাছে দেখলাম।'

'কী মনে হল?'

'দেহমনে ভেঙে পড়া মানুষ। দেখলে মায়া হয়। জীবন যেন শূন্য, অসার।'

'আহা, একেবারে খাঁটি কথা। তবে কী জান ওয়াটসন, সব জীবনই তো এমনি। শূন্য, অসার। বড়ো মায়া হয়। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটিয়ে গেল বুড়ো। সারাজীবন মানুষ মরীচিকার পেছনেই ছুটে ছুটে যা চায় তা হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর দেখে— সব ফক্কা, সব মিথ্যে, সব ছায়া। জীবনে এত দৈন্যতা তো সেই কারণেই। ছায়াবাজির চাইতেও যা মর্মান্তিক।'

'তোমার মক্কেল বুঝি?'

'তা বলতে পার। পাঠিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। হালে পানি না-পেলে বিশেষজ্ঞ যেমন রুগি পাঠায় হাতুড়ের কাছে— জানে তো আর কিছু করার নেই, এও তেমনি।'

'ব্যাপারটা কী?'

টেবিল থেকে একটা বেশ ময়লা কার্ড তুলে নিয়ে হোমস বললে, 'জোসিয়া অ্যামবার্লি। ছবি আঁকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ব্রিকফল অ্যান্ড অ্যামবার্লি কোম্পানির জুনিয়ার পার্টনার। পেন্টবক্সের গায়ে কোম্পানির নামটা দেখে থাকবে। একষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করে জমানো টাকা নিয়ে লুইহ্যামে একটা বাড়ি কিনে ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন।'

'তারপর।'

খামের পেছনে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে রেখেছিল হোমস। এখন দেখে নিয়ে বলল, 'অবসর নিলেন ১৮৯৬ সালে। বিয়ে করলেন ১৮৯৭ সালে। বউয়ের বয়স ওঁর চাইতে কুড়ি বছর কম। সুন্দরী— ছবি তাই বলছে। স্বচ্ছন্দে বাস করার মতো টাকাপয়সা, সুন্দরী স্ত্রী, অখণ্ড অবসর— জীবনটা মধুময় হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু হল না। দু-বছরের মধ্যেই সব গেল। ভেঙে পড়লেন দেহে মনে— নিজের চোখেই তো দেখলে।'

'কিন্তু কেন?'

'ওয়াটসন, গল্প সেই পুরোনো। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর চপলমতি স্ত্রী। জীবনে একটাই শখ ছিল অ্যামবার্লির— দাবা খেলা। বাড়ির কাছেই থাকতেন এক দাবাড়ে ছোকরা ডাক্তার। ডক্টর রে আর্নেস্ট। যাতায়াত ছিল— ফলে স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জন্মায়। বুড়োকে তো দেখলে— ভেতর সুন্দর হলেও বাইরেটা নয়। কাজেই স্ত্রীর আর দোষ কি। গত হপ্তায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে এই দুজন। যাবার সময়ে বুড়োর সারাজীবনের জমানো বেশ কিছু টাকা আর দলিলের

প্রচ্ছদ, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন

বাক্সটাও নিয়ে গেছে। মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে হবে, টাকাপয়সা উদ্ধার করতে হবে। সামান্য মামুলি— কিন্তু বুড়োর কাছে মর্মান্তিক।'

'কী করবে ঠিক করেছ?'

'তুমি হলে কী করতে? হাতের কেস নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত আমি। লুইহ্যামে যাওয়ার সময় নেই, অথচ অকুস্থলের প্রমাণের বিশেষ দাম আছে। বুড়ো চাইছিল আমি যাই। কিন্তু অসুবিধেটা বুঝে আমার বদলি কাউকে পাঠাতে বলেছে।'

'তাহলে, আমি যাব—যদিও খুব একটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

বিকেলের দিকে রওনা হলাম লুইহ্যাম অভিমুখে। তখন বুঝিনি মামুলি এই ব্যাপার নিয়েই ইংলন্ডের হাট বাজার পর্যন্ত গরম হয়ে উঠবে দু-দিনেই!

একটু রাত করেই ফিরলাম বেকার স্ট্রিটে। পাইপ টানতে টানতে অর্ধ নিমীলিত চোখে রিপোর্ট শুনে গেল হোমস। মাঝে মাঝে ঝকঝকে ধারালো ধূসর চোখ পুরোপুরি তাকিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন না-করলে মনে হত যেন দীর্ঘকৃশ শরীর এলিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে।

বললাম, 'জোসিয়া অ্যামবার্লির বাড়ির নাম "হ্যাভেন"। ইট বাঁধানো একঘেয়ে রাস্তার মাঝে সংস্কৃতি আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অপরূপ যেন একটা দ্বীপভূমি। রোদ্দুর পোড়া, শ্যামলা ছাওয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এমন একটা পাঁচিল যা—'

'কবিতা রাখো ওয়াটসন', কড়া গলায় বললে হোমস, 'ইটের উঁচু পাঁচিল, এই তো?'

'হ্যাঁ। রাস্তায় একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম হ্যাভেন কোথায়। লোকটা সিগারেট খাচ্ছিল দাঁড়িয়ে। লম্বা, ময়লা। মিলিটারি-মিলিটারি চেহারা। ইয়া মোটা গোঁফ। "হ্যাভেন" কোথায় জিজ্ঞেস করতেই অদ্ভুত চোখে তাকাল আমার দিকে।

'ফটক পেরোতে-না-পেরোতেই দেখলাম এগিয়ে আসছেন মিস্টার অ্যামবার্লি। সকালে এক ঝলক দেখে বিচিত্র জীব মনে হয়েছিল— এখন দেখলাম আরও বেশি। লোকটা স্বাভাবিক মোটেই নয়।'

'আমিও লক্ষ করেছি', বলল হোমস।

'পিঠ বেঁকে গেছে যেন ভারী জিনিস তুলে তুলে। অথচ রোগাপটকা দুর্বল মোটেই নন— অসুর কাঁধ আর বুকের ছাতি দেখলেই মালুম হয়। পা দুটো কিন্তু নেমে এসেছে আলপিনের মতো সরু হয়ে।'

'বাঁ-পায়ের জুতো ভাঁজ খাওয়া। ডান পায়ের জুতো মসৃণ।'

'অত দেখিনি।'

'আমি দেখেছি। নকল পা লাগিয়ে হাঁটেন বুড়ো। তারপর?'

'স্ট্র-হ্যাটের তলা দিয়ে ঝুলন্ত সাপের মতো তেল চুকচুকে চুলের গোছা আর— বলিরেখা আঁকা ভীষণ মুখচ্ছবি দেখেও অবাক হয়েছি।'

'বেশ করেছ। কী বলেছেন তাই বলো!'

'দুঃখকষ্টের কথা বলে গেলেন হাউ হাউ করে। গাড়ি চলার পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশ দেখে নিলাম। যত্ন-আত্তির চিহ্ন নেই কোথাও, বাড়ি আর বাগানের সর্বত্র অযত্ন আর হেলাফেলার ছাপ। বাগান হবে ছবির মতো— কিন্তু যা দেখলাম তা জঙ্গলের মতো। কোনো সুরুচিস্পন্না মহিলা এ-পরিস্থিতি বরদাস্ত করতে পারেন না। বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। এই একটি ব্যাপারে বুড়োর টনক নড়েছে মনে হল। কেননা হল ঘরে মস্ত গামলা বোঝাই সবুজ রং আর বুড়োর হাতে রঙের বুরুশ দেখলাম। কাঠে রং লাগাচ্ছিলেন।

'আমাকে নিয়ে গেলেন নিজের নোংরা ঘরে। অনেকক্ষণ কথা বললেন। তুমি নিজে না-যাওয়ায় হতাশ হয়েছেন দেখা গেল। বললেন, 'পথের ফকির হয়ে গেছি, কাজেই আমার মতো দীনহীন মানুষের বাড়িতে শার্লক হোমসের মতো বিখ্যাত পুরুষ আসবেন— এতটা আশা করাই অন্যায়।'

'বুঝিয়ে বললাম, টাকাকড়ির প্রশ্নই এখানে ওঠে না। বুড়ো বললেন, "তা ঠিক। তবে কি জানেন, ক্রাইমও একটা আর্ট— সেদিক দিয়ে এই কেসে মনের খোরাক পেতেন উনি। মানুষকে

চেনা মুশকিল। স্ত্রীর কোন আবদারটা রাখিনি বলুন। সে-ছোকরাকেও ছেলের মতোই দেখেছিলাম। তারপরেও কিনা এই ব্যবহার! ডক্টর ওয়াটসন, সংসার বড়ো ভয়ংকর!”

‘ঘণ্টাখানেক ধরে শুরু এই পালাগানই শুনে গেলাম। এতবড়ো একটা ষড়যন্ত্র ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি বুড়ো। বাড়িতে কর্তাগিন্নি ছাড়া আর জনমনিষ্যি নেই। একজন ঠিকে ঝি সকালে আসে সন্ধ্যায় যায়। এ-ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিন হে-মার্কেট থিয়েটারে[২] দুটো বেশি দামের আপার সার্কেলের টিকিট কেটেছিলেন বুড়ো নিজের আর স্ত্রীর জন্যে। শেষ মুহূর্তে মাথাব্যথা করছে বলে বউ আর যায়নি। বুড়ো একাই গেছিলেন। বউয়ের না-যাওয়া টিকিটটাও দেখালেন।’

হোমস বললে, ‘আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! কৌতূহল জাগিয়ে দিলে দেখছি। টিকিটটা নিজে দেখাচ্ছিল? নম্বরটা মনে আছে?’

সগর্বে বললাম— ‘তা আছে। একত্রিশ— আমার পুরোনো স্কুলের নাম্বার বলেই মাথার মধ্যে থেকে গেছে।’

‘অপূর্ব! বুড়োর সিট নাম্বার তাহলে নয় তিরিশ নয় বত্রিশ।’

একটু গোলমাল লাগল হোমসের অকস্মাৎ আগ্রহ আর কথাবার্তা শুনে। বললাম, ‘তা তো বটেই। B সারির টিকিট, তাও দেখেছি।’

‘খুব ভালো করেছ। আর কী বললেন বুড়ো?’

‘স্ট্রংরুম দেখালেন! স্ট্রংরুমই বটে। ব্যাঙ্কে যেমন থাকে— অবিকল তাই। দরজা জানলা সব লোহার। চোরের বাবার সাধ্যি নেই ভেতরে ঢোকে। ভদ্রমহিলা কিন্তু নকল চাবি জোগাড় করেছিলেন। উপপতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার পাউন্ড নগদ নোট আর কোম্পানির কাগজ নিয়ে ভাগলবা হয়েছেন।’

‘কোম্পানির কাগজ নিয়ে বিক্রি করবে কী করে?’

‘সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছেন বুড়ো। পুলিশকে লিস্ট দিয়েছেন। মাঝরাতে থিয়েটার থেকে ফিরে দেখেন বাড়ি খালি, দরজা জানলা খোলা, স্ট্রংরুম লুঠ হয়ে গেছে। যাবার সময়ে চিঠিপত্র পর্যন্ত রেখে যায়নি স্ত্রী। সঙ্গেসঙ্গে পুলিশকে খবর দেন বুড়ো।’

মিনিট কয়েক কী ভাবল হোমস!

তারপর বলল, ‘কোথায় রং করছিলেন অ্যামবার্লি?’

‘প্যাসেজ। স্ট্রংরুমের দরজা জানলা আগেই করেছিলেন।’

‘তোমার খটকা লাগেনি? এই পরিস্থিতিতে রং করা নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা একটু অদ্ভুত নয় কি?’

‘মন খারাপ থাকলে কিছু একটা নিয়ে ভুলে থাকে সবাই। কথাটা বুড়োর। মাথার ছিট আছে, তাই এমন কথা বলতে পারলেন। আমার সামনেই চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে বউয়ের একটা ফটোগ্রাফ ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললেন— কালামুখ এ-জীবনে যেন আর না-দেখি।’

‘আর কিছু লক্ষ করলে?’

‘একটা ব্যাপার খুব বেশি চোখে পড়েছে। ব্ল্যাকহীদ স্টেশনে ফিরে ট্রেনে উঠলাম। যেই ট্রেন ছেড়েছে অমনি আমার পাশের কামরায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে পড়ল। তুমি তো জান, যে-মুখ একবার দেখি, চট করে আর তা ভুলি না। লোকটাকেও ওই ঝাঁকিদর্শনেই চিনে ফেললাম।

রাস্তায় যাকে "হ্যাভেন" কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই লোক। আবার তাকে দেখলাম লন্ডন ব্রিজে। তারপর ভিড়ে হারিয়ে গেল। আমাকেই ফলো করছিল— কোনো সন্দেহ নেই।'

'ঠিক... ঠিক... কোনো সন্দেহ নেই। লোকটা ময়লা, লম্বা গুঁফো আর গগলস পরা— তাই না?'

'হোমস! তুমি কি গণৎকার? চোখে গগলস আছে আমি তো বলিনি।'

'ম্যাসোনিক টাই-পিনও আছে নেকটাইতে।'

'হোমস!'

'ভায়া ওয়াটসন এ তো খুবই সোজা ব্যাপার। কেসটা কিন্তু জমে উঠছে, আগে ভেবেছিলাম সাদামাটা— আমার মাথা ঘামানোর উপযুক্ত নয়। যদিও গুরুত্বপূর্ণ সবকটা ব্যাপারই তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে, তাহলেও যা দেখেছ তার মধ্যেই গভীর চিন্তার খোরাক পাওয়া যাচ্ছে।'

'আরে ভায়া, আঘাত দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি। যা করে এসেছ, অন্য কেউ তা করতে পারত না। কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট একদম খেয়াল করনি। যেমন ধরো, অ্যামবার্লি আর তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কী বলে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডক্টর আর্নেস্ট সম্পর্কেই-বা পাড়াপ্রতিবেশীর মন্তব্য কী? লক্কাপায়রা লম্পট কি? ওয়াটসন, তোমার একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে যে তুমি ডাক্তার। মেয়েরা সহজেই মন খোলে তোমার কাছে— জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওদের কাছেই অনেক খবর পেতে। যেমন ধর পোস্টঅফিসের কেরানি মেয়ে অথবা মুদির বউ— এরাই তোমার স্যাঙাত হয়ে উঠতে পারত। সরাইখানার মেয়েটাকেও কানে মন্ত্র দিলে অনেক কথা বেরিয়ে আসত। কিন্তু কিছুই তুমি করনি।'

'এখনও করা যায়।'

'করা হয়ে গেছে। এ-ঘর থেকে না-বেরিয়েই টেলিফোন[৩] আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দৌলতে তা করেছি। বুড়ো যা বলেছে তা সত্যি। পাড়ার সবাই তাকে মহাকিপটে আর চামার স্বামী বলে জানে। স্ত্রীর সঙ্গে মিষ্টি কথা পর্যন্ত বলত না। স্ট্রংরুমে টাকা থাকত কাঁড়িকাঁড়ি। আইবুড়ো ডক্টর আর্নেস্ট দাবা খেলত বুড়োর সঙ্গে— অন্য খেলা বুড়োর বউয়ের সঙ্গে। সবই যেন জলের মতো পরিষ্কার— তবুও যেন কোথায় একটা লটঘট ব্যাপার থেকে যাচ্ছে!'

'সেটা কী?'

'স্রেফ কল্পনা বলেই মনে হচ্ছে। আপাতত তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। চলো, অ্যালবার্ট হলে[৪] গিয়ে ক্যারিনা'র[৫] গান শুনে আসা যাক।'

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রুটির গুঁড়ো আর জোড়া ডিমের খোলা দেখেই বুঝলাম আমার আগেই উঠেছে হোমস। টেবিলে একটা হাতে-লেখা চিঠি পেলাম।

প্রিয় ওয়াটসন,

জোসিয়া অ্যামবার্লির সঙ্গে মোলাকাত করে দু-একটা পয়েন্ট পরিষ্কার করে নিতে চাই। তারপর ভাবব কেসটা হাতে রাখব না ছেড়ে দেব। তিনটের সময়ে তৈরি থেকো। দরকার হতে পারে।

সারাদিন টিকি দেখা গেল না হোমসের। বাড়ি ফিরল ঠিক তিনটের সময়ে। মুখ গম্ভীর, চিন্তাবিষ্ট এবং অন্যমনস্ক। এ-অবস্থায় ওর সঙ্গে কথা না-বলাই সংগত।

'অ্যামবার্লি এসেছিলেন?'

'না।'

'আসবেন এখুনি।'

একটু পরেই ভীষণ উদ্‌বিগ্ন ও ভ্যাবাচ্যাকা মুখে আবির্ভূত হলেন বুড়ো ভদ্রলোক।

'মিস্টার হোমস, এই টেলিগ্রামটা পেয়ে ছুটে এলাম। মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না, হাত থেকে টেলিগ্রাম নিয়ে জোরে জোরে পড়ে গেল হোমস।

এখুনি আসুন। আপনার সাম্প্রতিক লোকসান সম্পর্কিত খবর দিতে পারব।— এলমান, পল্লি পুরোহিত ভবন।

হোমস বললে, 'টেলিগ্রাম পোস্ট করা হয়েছে দুটো দশ মিনিটে লিটল পার্লিংটন থেকে! জায়গাটা এসেক্স— ফ্রিনটমের কাছে! এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। গাঁয়ের পুরুত বাজে কথা বলার লোক নন। ট্রেন ক-টায়, ওয়াটসন?'

'পাঁচটা পঁচিশে একটা আছে লিভারপুল থেকে।'

'চমৎকার। ওয়াটসন, তুমিও যাও সঙ্গে। কেসটা চূড়ান্ত আকার নিতে চলেছে। তোমার থাকা দরকার।'

কিন্তু রওনা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালেন না বৃদ্ধ মক্কেল।

বললেন, 'মিস্টার হোমস, এ বড়ো উদ্ভট ব্যাপার। আমার ব্যাপার গাঁয়ের পাদরি জানবেন কী করে? মিছিমিছি সময় আর পয়সা খরচই হবে।'

'না-জানলে টেলিগ্রাম করতেন না। পালটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিন আপনি আসছেন।'

'আমার যাওয়ার দরকার দেখছি না।'

কঠোর হয়ে গেল হোমসের চোখ-মুখ কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার অ্যামবার্লি, এ-রকম স্পষ্ট একটা সূত্র পাওয়ার পর আপনি যদি তার সুযোগ না-নেন, তাহলে আমি আর পুলিশ ধরে নেব কেসটার ফয়সালা করায় আপনার আগ্রহ নেই।'

যেন আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ মক্কেল।

'আরে মশাই, তাই যদি মনে করেন, তাহলে এক-শোবার যাব। মনে হচ্ছিল গিয়ে লাভ নেই, তাই বলছিলাম—'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার যাওয়াই দরকার।' জোর দিয়ে বললে হোমস।

রওনা হওয়ার আগে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে হোমস এমন একটা কথা বললে যা শুনে বুঝলাম বিষয়টা ওর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বলল, 'বুড়ো যেন সত্যিই যান— এইটুকুই শুধু দেখবে। যদি ভেগে পড়েন বা ফিরে আসেন, পোস্টঅফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম করবে আমাকে। লিখবে, ''ভাগলবা''। যেখানেই থাকি না কেন, সে-টেলিগ্রাম যাতে আমার কাছে পৌঁছোয় সে-ব্যবস্থা করে যাব!'

লিটল পার্লিংটন স্টেশনটা ব্রাঞ্চ লাইনে বলে যাওয়া একটু মুশকিল। যাত্রাপথও খুব সুখকর হল না। একে তো গরম পড়েছে, ট্রেনও টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে, তার ওপর বুড়ো অ্যামবার্লি মুখখানা শুকনো আমসির মতো গোমড়া করে চুপচাপ বসে রইল তো বসেই রইল। মাঝে মাঝে এক-আধবার বাঁকা সুরে শুধু বলল— পণ্ডশ্রম হচ্ছে— গিয়ে কোনো লাভ হবে না। স্টেশনে

পৌঁছে মাইল দুয়েক পথ ঘোড়ার গাড়িতে পাড়ি দিয়ে হাজির হলাম পল্লিপুরোহিত ভবনে। হৃষ্টপুষ্ট বিরাটকায় সৌম্যমূর্তি পুরুতমশায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। টেলিগ্রাম দেখে বললে, 'এ কী! এ-টেলিগ্রাম তো আমি পাঠাইনি! জোসিয়া অ্যামবার্লির নামও কখনো শুনিনি।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমি আর বুড়ো। বললাম, 'তাহলে বোধ হয় ভুল ঠিকানায় এসেছি। আর একটা পল্লিপুরোহিত ভবন নিশ্চয় এ-গ্রামে আছে। পাদরি সাহেবের নামটা দেখুন— এলমান।'

'দেখুন মশায়, এ-গাঁয়ে পুরুত-ভবন একটাই, পুরুতও একজন। এই টেলিগ্রাম জাল এবং জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের। আপাতত আর কথা বাড়াতে চাই না।'

বেরিয়ে এলাম ইংলন্ডের আদিমতম গ্রামের রাস্তায়। পোস্টাফিসে গেলাম টেলিগ্রাম করতে— অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় করা গেল না। শেষ পর্যন্ত 'রেলওয়ে আর্মস' থেকে টেলিফোন করলাম হোমসকে।

সব শুনে ও বললে, 'আশ্চর্য! সত্যিই বড়ো আশ্চর্য! আজ রাতে ফেরবার ট্রেনও তো নেই, ওয়াটসন। রাতটা গাঁইয়া চটিতে কাটিয়ে দাও প্রকৃতি আর জোসিয়া অ্যামবার্লির সান্নিধ্যে।' খুক খুক হাসির আওয়াজ শুনলাম শেষের দিকে।

বুড়ো অ্যামবার্লিকে কেন যে লোকে হাড়-কিপটে বলে, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। ট্রেনে আসার খরচপত্র নিয় গজগজ করছিলেন গোড়া থেকে, জোরজবরদস্তি করে থার্ডক্লাসে টিকিট দেওয়া নিয়ে। পরের দিন লন্ডন পৌঁছোনোর পর দুজনের মধ্যে কার মেজাজ যে বেশি খিঁচড়ে ছিল, সেটাও বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

বললাম, 'বাড়ি ফেরার আগে বেকার স্ট্রিট ঘুরে যান। মিস্টার হোমসের নতুন নির্দেশ থাকতে পারে।'

বিচ্ছিরি রকমের ভ্রূকুটি করে অ্যামবার্লি বললেন, 'কালকের মতো নির্দেশ হলে শুনে লাভ কিছু হবে কি?' মুখে বললেন বটে, কিন্তু সঙ্গে গেলেন বেকার স্ট্রিটে। হোমসকে আগেই টেলিগ্রাম করে আমার ফেরার সময় জানিয়ে দিয়েছিলাম! কিন্তু বাসায় ফিরে দেখলাম হোমস নেই। একটা চিঠি রেখে গেছে। লুইহ্যামে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে। আশ্চর্য হলাম চিঠি পড়ে। আরও অবাক হলাম বুড়োর বসবার ঘরে হোমসের সঙ্গে ম্যাসোনিক টাইপিন পরা চোখে গগলস আঁটা ময়লা চেহারার কঠোর প্রকৃতির সেই লোকটাকে বসে থাকতে দেখে— যে আমাকে এখান থেকে লন্ডন পর্যন্ত ফলো করেছিল।

হোমস বললে, 'ইনি আমার বন্ধু মিস্টার বার্কার। আপনার কেস তদন্ত করেছি দুজনেই— আলাদা আলাদাভাবে। এখন দুজনেই একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।'

'কী প্রশ্ন?'

'লাশ দুটি কোথায় পাচার করলেন?'

বিকট চিৎকার করে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেলেন জোসিয়া অ্যামবার্লি। সরু সরু হাড় বার করা আঙুল দিয়ে খামচে ধরলেন বাতাস। চোয়াল ঝুলে পড়ল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, ভয়ানক বাজপাখির মতো দেখাল ক্ষণেকের জন্যে। চকিতের মধ্যে স্পষ্ট দেখলাম আসল অ্যামবার্লিকে, দানব প্রকৃতিপিশাচ অ্যামবার্লি— যার মন দেহের মতই বিকৃত, বীভৎস, ক্রূর,

কুটিল। ধপাস করে পড়ে গেলেন চেয়ারে, পর মুহূর্তেই— ঠোঁট চেপে ধরলেন উদ্গত কাশি আটকানোর প্রয়াসে। বাঘের মতো লাফিয়ে গেল হোমস। মুখখানা সবলে চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে নামিয়ে ধরল মেঝের দিকে। খাবি খাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে টুপ করে খসে পড়ল একটা সাদা বড়ি।

'শর্টকাট রাস্তায় যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়, জোসিয়া অ্যামবার্লি? যা হবার তা আইনসংগতভাবেই হবে। বার্কার, আপনি কী বলেন?'

'গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'ওয়াটসন, তুমি বোসো এখানে। থানায় ছেড়ে দিয়ে ফিরছি আধঘণ্টার মধ্যে।'

জোসিয়া অ্যামবার্লি বুড়ো হলে কী হবে, বিরাট শরীরে সিংহের শক্তি ছিল। কিন্তু দু-দুজন অভিজ্ঞ পালোয়ানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে সুবিধে হল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বুড়োকে তোলা হল ছ্যাকড়াগাড়িতে। আধঘণ্টার আগেই স্মার্ট চেহারার এক ছোকরা পুলিশ ইনস্পেকটরকে নিয়ে ফিরে এল হোমস।

বললে, ওয়াটসন, বার্কার আমার পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। সারি উপকূলে খুব টক্কর দিয়েছে এককালে। লম্বা ময়লা একজন তোমাকে ফলো করেছে শুনেই চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিতে পেরেছিলাম সেইজন্যেই। বেশ কিছু কেসের ফয়সালা ওর হাতে হয়েছে, তাই না ইনস্পেকটর?

সংযত কণ্ঠে ইনস্পেকটর বললেন, 'নাক গলিয়েছে বলা যায়।'

'আমার মতোই ধরাবাঁধা পদ্ধতিতে বার্কার কাজ করে না— হাতে হাতে তাই পাওয়া যায়।'

'এ-কেসে যে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে তদন্ত করে ফল পেতাম না, এমনটা ভাববেন না মিস্টার হোমস। আপনাদের উলটোপালটা পদ্ধতি দিয়ে তদন্ত করে প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে আমাদের বঞ্চিত করাটা আমি ভালো চোখে দেখছি না— কিছু মনে করবেন না সোজাসুজি বলছি বলে।'

'আরে মশাই, কৃতিত্ব থেকে কে বঞ্চিত করছে আপনাদের? কেস শেষ হল— আমিও সরে দাঁড়াচ্ছি।'

শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ইনস্পেকটর।

'উত্তম কথাই বলেছেন। প্রশংসা বা নিন্দায় আপনার কিছু হয় না— কিন্তু খবরের কাগজের টিটকিরিতে আমাদের ক্ষতি হয়।'

'প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলে টিটকিরি দেবে কেন? যেমন ধরুন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কী দেখে বুড়োর গোপন পাপ আঁচ করতে পারলেন, জবাব দেবেন কী?'

ঘাবড়ে গেলেন ইনস্পেকটর।

'তিনজন সাক্ষীর সামনে আসামি স্বীকার করেছে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করার পর। এ ছাড়া আর কী থাকতে পারে বলুন?'

'বাড়ি তল্লাশির ব্যবস্থা করেছেন?'

'তিনজন কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি।'

'তাহলে লাশের খবরও এবার পাবেন। বাড়িটায় জলের পাইপ লাগানো হয়েছে বাড়ি তৈরির অনেক পরে। তার মানে এমন একটা কুয়ো কোথাও পাবেন যা এখন ব্যবহার করা হয় না। লাশ দুটো তার মধ্যে থাকতে পারে অথবা বাগানে বা পাতালঘরেও থাকতে পারে।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? খুনটাই-বা হল কী করে?

'খুন করলেন কী করে, আগে তাই বলি। বুড়ো অ্যামবার্লির ঠাঁই হওয়া উচিত পাগলাগারদে, ফাঁসিকাঠে নয়। বউয়ের ওপর এমন অত্যাচার করেছেন টাকাকে বেশি ভালোবাসার দরুন, যার ফলে ভদ্রমহিলা বাধ্য হয়েছে পরপুরুষে আসক্ত হতে। অ্যামবার্লি কুচক্রী বলেই দাবাটা ভালো খেলতেন। হাড়কিপটেরা বড়ো ঈর্ষাকাতর হয়— অ্যামবার্লিও তাই ছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে স্ত্রীর গোপন প্রণয় আঁচ করে ফেলেছিলেন। তাই প্ল্যান করে ফেলেছিলেন দুজনকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ-রকম পৈশাচিক পরিকল্পনা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কে আসে না। আসুন দেখাচ্ছি।'

যেন এ-বাড়িতেই দীর্ঘদিন বাস, এমনিভাবে পথ দেখিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল হোমস, দাঁড়াল স্ট্রংরুমের খোলা দরজার সামনে।

হোমস বললে, 'প্রথম সূত্র হল এই রঙের গন্ধ। ধন্যবাদটা ডক্টর ওয়াটসনের প্রাপ্য। গন্ধটা ওর নাকেও এসেছিল— কিন্তু ঠাহর করতে পারেনি। আমি কিন্তু লাইন করে ফেলেছিলাম। এই পরিস্থিতিতে বাড়িময় রঙের গন্ধ কেউ ছড়ায় কেন? কী উদ্দেশ্যে? নিশ্চয় অন্য কোনো গন্ধ ঢাকবার মতলবে— এমন একটা গন্ধ যা বাইরের লোকের নাকে সন্দেহ হতে পারে। তারপরেই শুনলাম এইরকম একটা ঘর রয়েছে বাড়ির মধ্যে— দরজা জানলা লোহার— বাতাস পর্যন্ত বেরুতে পারে না। দুটো বিষয় পাশাপাশি রাখুন— কী পাচ্ছেন? নিজের চোখে বাড়ি দেখার পর আমি নিজে বুঝে ফেলেছিলাম আসল ব্যাপার। কেসটা যে সিরিয়াস আঁচ করেছিলাম আগেই। হে-মার্কেট থিয়েটারের বি-সারিতে তিরিশ, আর বত্রিশ নম্বর সিটে কেউ যে আসেনি বিশেষ সেই রাতে— তা নিজে গিয়ে জেনেছিলাম। এ-সূত্রটাও ডক্টর ওয়াটসনের বাঘের চোখে ধরা পড়েছিল— কিন্তু তলিয়ে দেখেনি। কাজেই অ্যামবার্লির অন্যত্র স্থিতি ধোপে টিঁকল না— কেননা থিয়েটারে উনি যানইনি সেই রাতে। বউয়ের জন্য কাটা টিকিট দেখাতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসনকে টিকিট নাম্বার দেখিয়ে ফেলে বিরাট ভুল করেছিলেন। বাড়ির মধ্যে থেকে অ্যামবার্লিকে সরানোর জন্যে একটা কায়দা করতে হল। আমার এক এজেন্টকে পাঠিয়ে দিলাম এমন একটা দূর গ্রামে যেখান থেকে রাত্রে ফেরা যায় না— ট্রেন থাকে না বলে। গাঁয়ের পাদরির নাম দিয়ে এজেন্ট একটা টেলিগ্রাম পাঠাল অ্যামবার্লিকে। ডক্টর ওয়াটসনের সঙ্গে অ্যামবার্লিকে একরকম জোর করেই পাঠালাম সেখানে। কী বুঝলেন?

'দারুণ!' ইনস্পেকটরের সশ্রদ্ধ মন্তব্য।

'পথ পরিষ্কার করার পর হানা দিলাম বাড়িতে। সিঁধেল চোরের ব্যবসায়ে নামলে নাম করতে পারতাম। কী পেলাম নিজের চোখে দেখুন। এই যে গ্যাসপাইপটা দেখছেন— এই দেখুন পাইপের গায়ে কোণের দিকে একটা কলও রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন পাইপটা দেওয়াল বেয়ে উঠে স্ট্রংরুমের ভেতরে গিয়েছে— কড়িকাঠের যেখানে কারুকাজ করা— সেইখানে পাইপের খোলা মুখটা লুকোনো রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে বাইরের কল খুলে দিয়ে ঘরের ভেতরে গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। বাঁচবে না। স্ত্রীর আর ছোকরা ডাক্তারকে এই গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে খুন করেছেন অ্যামবার্লি— পৈশাচিক পন্থাটা বুড়োর মাথায় এল কী করে জানি না।'

পাইপ দেখলেন ইনস্পেকটর। বললেন, 'আমাদের এক অফিসার গ্যাসের গন্ধ পেয়েছিলেন। তখন অবশ্য দরজা জানলা খোলা ছিল— রঙের গন্ধও ছিল। অ্যামবার্লি রং করা শুরু করেছিলেন নাকি আগের দিন থেকে। তারপর মিস্টার হোমস?'

'তারপর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ভোররাতে ভাঁড়ার ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে খপ করে কে যেন কলার খামচে ধরে চাপা গলায় হুংকার ছাড়ল, "রাসকেল, এবার যাবি কোথায়?" ফিরে দেখলাম প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু মিস্টার বার্কারকে। হাসতে লাগলাম দুজনেই। অদ্ভুত পরিস্থিতি। বার্কারকে এ-কাজে লাগিয়েছে নিখোঁজ ছোকরা ডাক্তারের বাড়ির লোক— বার্কারও আঁচ করেছিল জঘন্য কিছু একটা ঘটেছে বাড়ির মধ্যে। ক-দিন ধরেই বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল। ডক্টর ওয়াটসনকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেই ওঁকে সন্দেহ করে এবং পেছন নেয়। গ্রেপ্তারও করত ওয়াটসনকে, কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের জানলা বেয়ে আর একটা লোককে চোরের মতো বেরোতে দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। এরপর থেকেই দুজনে কাজ করেছি একসঙ্গে।'

'আমাদের সঙ্গে না-করে তার সঙ্গে কাজ করার কী দরকার ছিল?'

'দুজনে মিলে ছোট্ট যে-পরীক্ষা করলাম এবং সফলও হলাম— সে-পরীক্ষা আপনাদের দিয়ে হত না বলে।'

'যাই হোক, কেস থেকে এখন সরে দাঁড়াচ্ছেন তো?'

'নিশ্চয়। আমার কাজের রীতিই তাই।'

'পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে ধন্যবাদ রইল।'

'আপনাকে আরও একটা প্রমাণ দিয়ে যাই। ধরুন আপনাকে এ-ঘরে কেউ আটকে রেখে গ্যাস ঢোকাচ্ছে আর বাইরে থেকে টিটকিরি দিচ্ছে। মাত্র দু-মিনিট সময় পেয়েছেন মৃত্যুর আগে। কী করবেন তখন?'

'চিঠি লিখে যাব।'

'খাঁটি কথা। কীভাবে মারা যাচ্ছেন— তা লিখে রাখার চেষ্টা করবেন। কাগজে লিখলে তা চোখে পড়ে যাবে। তাই— এই দেখুন এখানে— দেওয়ালের নীচের দিকে বেগনি কপিং পেনসিলে লেখা : "আমরা খু—" ব্যস আর লেখা হয়নি।'

'আপনি কী বুঝেছেন?'

'মেঝে থেকে মাত্র এক ফুট ওপরে লেখা। অর্থাৎ মরবার আগের মুহূর্তে— শেষ করার আগেই জ্ঞান লোপ পেয়েছে।'

'বুঝেছি। লিখছিলেন : আমরা খুন হচ্ছি।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। লাশ পেলে পকেটে পেনসিলও পেতে পারেন[৬]।'

'দেখব। কিন্তু কোম্পানির কাগজগুলো গেল কোথায়?'

'কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন নিশ্চয়। কিছুদিন পরে নিজেই বলতেন পলাতকরা পাঠিয়ে দিয়েছে কাজে লাগবে না বলে— অথবা কোথাও ফেলে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেছে।'

'আপনার কাছে সাহায্য নিতে গেল কেন?'

'অত্যন্ত সেয়ানা বলে। বড়ো বেশি বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর। পাড়াপ্রতিবেশীকে পরে

বলতেন— দেখছ, শুধু পুলিশ নয়— খোদ শার্লক হোমসকে দিয়েও খোঁজবার ব্যবস্থা করেছি।'

হেসে ফেললেন ইনস্পেকটর, 'কাজটা চমৎকার করেছেন বলেই "খোদ" শব্দটা মাপ করে দেওয়া গেল, মিস্টার হোমস।'

দিন দুই পরে 'নর্থ সারি অবজারভার' পত্রিকার একটা সংখ্যা আমার দিকে ছুড়ে দিলে হোমস। পত্রিকাটা দ্বিসাপ্তাহিক। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখ-কেড়ে-নেওয়া চনমনে কয়েকটা শিরোনামা— শুরু 'হ্যাভেন বিভীষিকা' দিয়ে, শেষ 'চমকপ্রদ পুলিশ তদন্ত' দিয়ে। তলায় অত্যাশ্চর্য এই কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। উপসংহারটাই আসল। তাতে লেখা :

'সরকারি গোয়েন্দাদের প্রখর বুদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ অপরাধ ইতিহাসে চিরকাল সুবর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে ইনস্পেকটর ম্যাকিননের অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা। রঙের গন্ধ শুঁকেই তিনি বুঝেছিলেন গ্যাস জাতীয় কোনো উৎকট গন্ধ ঢাকবার জন্যেই বিকট রঙের গন্ধ ছড়ানো হয়েছে বাড়িময়, এই থেকেই উনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে স্ট্রংরুমকে গ্যাস চেম্বারে রূপান্তরিত করা হয় এবং এই সূত্র অনুসরণ করেই লাশ দুটোকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেন কুকুরশালা দিয়ে সুকৌশলে আচ্ছাদিত একটা অব্যবহৃত কুয়োর তলদেশ থেকে। জয়তু ইনস্পেকটর ম্যাকিনন!'

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, 'ম্যাকিনন লোকটা তো খারাপ নয়। কেসটা খাতায় লিখে রাখো। একদিন আসল ব্যাপার সবাই জানবে'খন।'

টীকা

১. **রং-ব্যাপারীর বিরং ব্যাপার :** 'লিবার্টি' পত্রিকার ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় এবং 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এর জানুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. **হে-মার্কেট থিয়েটার :** ১৭২০ সালে হে-মার্কেট থিয়েটার নির্মাণ করেন জন পটার। ১৮২১-এ এর লাগোয়া বড়ো থিয়েটার হল নির্মিত হয়। তার নাম থিয়েটার রয়্যাল হে-মার্কেট।

৩. **টেলিফোন :** এই গল্প ছাড়া বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়ির টেলিফোনের উল্লেখ পাওয়া যায় 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট' এবং 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি-গ্যারিডেবস' গল্পে। এই দুটি গল্পই ১৯০২ সালের ঘটনা।

৪. **অ্যালবার্ট হল :** ২৯ মার্চ ১৮৭১-এ খোলা হয়েছিল রয়্যাল অ্যালবার্ট হল, পরলোকগত প্রিন্স অ্যালবার্টের স্মৃতিতে। সাত হাজার আসনবিশিষ্ট এই হল ইংলন্ডের বৃহত্তম কনসার্ট হল।

৫. **ক্যারিনা :** ক্যারিনা নামটি কাল্পনিক। তবে কিছু গবেষক মনে করেন এই কল্পনার পেছনে আমেরিকান শিল্পী অ্যানি লুই ক্যারি (১৮৪১-১৯২১) কিংবা ক্রোয়েশিয় গাইয়ে মিলিকা তেরনিনা (১৮৬৩-১৯৪১) অথবা ভেনিজুয়েলার পিয়ানো-বাদিকা, সুরস্রষ্টা এবং কণ্ঠশিল্পী মারিয়া টেরেসা ক্যারেনোর (১৮৫৩-১৯১৭) প্রভাব থাকা সম্ভব।

৬. **পকেটে পেনসিলও পেতে পারেন :** মরবার আগের মুহূর্তে লেখাটা শেষ করার আগেই যে লেখকের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, তার পক্ষে কি পেনসিলটা পকেটে রাখা সম্ভব?

চিত্রসূচি

দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ শার্লক হোমস

১। **বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি**
সতর্কতার সঙ্গে আমি লেখাটা পরীক্ষা করলাম। ১৩
২। **লাল-চুলো সংঘ**
দরজাটা তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। ৩০
৩। **ছদ্মবেশীর ছলনা**
শার্লক হোমস তাঁকে স্বাগত জানালেন। ৩৮
৪। **বসকোম ভ্যালির প্রহেলিকা**
কাজের মেয়েটি আমাদের জুতোগুলো দেখাল। ৫৩
৫। **পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি**
তাঁর দৃষ্টি আগুনের শিখার দিকে স্থির রইল। ৬৬
৬। **বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য**
তিনি চাবুক দিয়ে ঘোড়াটাকে আঘাত করলেন। ৭৩
৭। **নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার**
'আপনিই উপযুক্ত লোক'। ৮৮
৮। **ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান**
হোমস পাগলের মতো চাবুক মারতে লাগল। ১০৩
৯। **ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই**
বাড়ি পুড়ছে নাকি? ১১৫
১০। **খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি**
তিনি বললেন, 'এই যে!' ১২৫
১১। **পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার**
ভয়ের মতো কিছু একটা যুবতীর চোখে ফুটে উঠল। ১৩৬
১২। **রহস্য নিকেতন 'কপার-বীচেস'**
হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। ১৪৫

দ্য মেমোয়্যার্স অফ শার্লক হোমস

১৩। **ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ**
সিলভার ব্লেজ ১৫৮
১৪। **লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি**
'ওয়েলিংটন কত দূর?' ১৭৮
১৫। **হলদে মুখের কাহিনি**
তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। ১৯৩
১৬। **সোনা-দাঁতের রহস্য**
পাইক্রফট তাঁর জোড়া হাত দুটো হাওয়ায় ছুড়লেন।' ২০২
১৭। **কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট**
'হাডসন, ইনি স্যার', নাবিক বললেন। ২০৭

১৮। মাসগ্রেভ সংহিতা
এই জায়গাটার কথাই নির্দেশ করা হয়েছে। ২২০
১৯। রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার
এটা একটা খুবই সহজ পয়েন্ট। ২৩২
২০। বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান
এটা একটা খুবই সহজ কেস ছিল, যা হোক। ২৪৪
২১। আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি
হোমস ওটা খুলল আর তার মধ্যে একমাত্র যে চুরুটটা ছিল সেটা শুঁকল। ২৫৩
২২। গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা
মাইক্রফট হোমস ২৫৭
২৩। নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র
গোলাপটা কী দারুণ! ২৭৬
২৪। শার্লক হোমস বিদায় নিলেন
শার্লক হোমসের মৃত্যু। ২৯৯

দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস

২৫। মোর্যানের মারাত্মক হাতিয়ার
যে বইগুলো তিনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন...কয়েকটা পড়ে গেল। ৩০৬
২৬। কুটিল বুড়োর কুচক্র
'ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হচ্ছে, ব্ল্যাকহিদ।' ৩২৮
২৭। নাচিয়েদের নষ্টামি
'আমার মনে হয় আপনারা লন্ডনের গোয়েন্দা?' ৩৪৭
২৮। সুন্দরীর শতেক জ্বালা!
আমার বন্ধু মহিলার গ্লাভশূন্য হাতটা ধরল এবং পরীক্ষা করল। ৩৬০
২৯। গোরুর খুরের রহস্য
অঞ্চলটির একটি খসড়া মানচিত্র। ৩৮৫
ওই যে ওখানে পড়ে হতভাগ্য যাত্রী। ৩৯০
৩০। তিমি শিকারির বুকে হারপুন
হোমস গভীর মনোযোগ সহকারে ওটা পরীক্ষা করল। ৪১২
৩১। ভাংচি দেওয়ার ভয়ংকর কাহিনি
ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে থাকা রিভলভারের কুঁদোটা পরীক্ষা করছে। ৪৩১
৩২। কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয়
হোমস আমাদের মাথার ওপরে রাস্তার আলোটার দিকে দেখাল। ৪৪৮
৩৩। প্রশ্নপত্রের পলায়ন
দরজা খোলা রেখে এসেছেন? ৪৬২
৩৪। প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর
হোমস চাবিটা তুলে নিল এবং একঝলক সেটার দিকে দেখল। ৪৮৮
৩৫। খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি
আমরা শহর ছেড়ে এসেছি এবং তড়িঘড়ি গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছি। ৫১৩
৩৬। তিন গেলাসের রহস্য
হোমসের চোখ-মুখ দেখে মনে হল রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। ৫২৬
৩৭। কার্পেটের কারচুপি
সে কার্পেটের কোণটা তার হাতে নিল। ৫৫৪

হিজ লাস্ট বাও

৩৮। **উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি**
এ তো ভয়ংকর! আপনি আশা করি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন না? ৫৭২
৩৯। **রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি**
ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল, ফ্যাকাশে মুখ, দুই চোখে অসীম ভয়ার্তি। ৬০১
৪০। **নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক**
নিঃসীম আগ্রহে উদ্দীপ্ত মুখে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে ছিল আমার বন্ধু। ৬১২
৪১। **শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায়**
নামিয়ে রাখো ওয়াটসন, যেখানকার জিনিস এখুনি রেখে দাও সেখানে। ৬৩১
৪২। **লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান-রহস্য**
হোমস তার পকেট থেকে রিভলভারটা একটু টেনে বের করল। ৬৫১
৪৩। **শয়তানের পা**
দাঁতে দাঁতে ঘষটানি...অতিক্রম করে গেল আমাদের। ৬৬৩
৪৪। **বিদায় নিলেন শার্লক হোমস**
'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' জ্বলন্ত বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে
দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ভন বর্ক। ৬৯১

দ্য কেস-বুক অফ শার্লক হোমস

৪৫। **বিখ্যাত মক্কেলের বিচ্ছিরি বিপদ**
দুজন হানাদার লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় শার্লক হোমসকে। ৭০৫
৪৬। **সাদাটে সৈন্যর সাংঘাতিক সংকট**
দড়াম করে দরজাটা...আর দেখিনি। ৭২০
৪৭। **হলদে হিরের হয়রানি**
হোমস বলল, 'আমি ওই শোবার ঘরে... নিয়ে ফিরব।' ৭৩৪
৪৮। **পাণ্ডুলিপির প্যাঁচ**
'দেখুন মি. হোমস,...বুঝেছেন, মি. হোমস?' ৭৩৮
৪৯। **রক্তচোষা বউয়ের রক্তজমানো কাহিনি**
'মি. হোমস,...মাথার একদম ঠিক নেই।' ৭৫৪
৫০। **তিনের ত্র্যহস্পর্শ**
আমাদের দেখেই ভয়ংকর...ফেরানো রয়েছে দেখে। ৭৭৩
৫১। **প্রস্তরের প্রহেলিকা**
যা মুখে এল বলে...আমার মুণ্ডপাত করছেন। ৭৮৮
৫২। **বুড়ো বৈজ্ঞানিকের বিকট বিটলেমি**
চোখের সামনে মাটির ওপর...মুহুর্মুহু অদ্ভুত আর্তনাদ। ৮০৪
৫৩। **সিংহ-কেশরের সংহার মূর্তি**
চিঠিটা উলটেপালটে দেখে...জবাব দেব না। ৮১৩
৫৪। **ঘোমটার ঘোরালো ঘটনা**
শেষ করার সুরটা...হাত না পড়ে। ৮২৮
৫৫। **পাতালের পাপচক্র**
ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এল...লাফিয়ে উঠল পাদানিতে ৮৩৭
৫৬। **রং-ব্যাপারির বীরং ব্যাপার**
প্রচ্ছদ, *স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন* ৮৪৪

কন্যান ডয়াল
১৮৫৯-১৯৩০

প্রচ্ছদচিত্র

দি অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস-প্রথম সংস্করণ
দ্য মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস-পেঙ্গুইন সংস্করণ
কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় রিটার্ন অব শার্লক হোমস
কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় হিজ লাস্ট বাও-প্রথম প্রকাশ
দ্য কেসবুক অব শার্লক হোমস-এর আধুনিক সংস্করণ

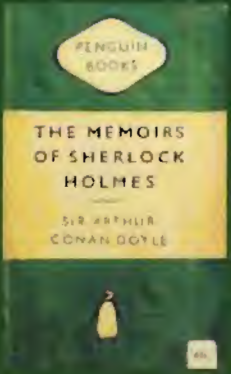

বাঙালির হোমস-চর্চর সনাতন কৃষ্টিতে এক ধ্রুপদী সংযোজন হয়ে রইল এই মননদীপ্ত বইটি। চেনা মুখের অচেনা আদল, পথঘাটের সুলুকসন্ধান, ইতিহাসের সালতামামি, স্থানকালপাত্রের ঠিকুজী-কুলুজি আর স্মৃতি-বিস্মৃতির কিওরোস্কিউরোতে মায়াময় হয়ে ওঠা লন্ডন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সম্ভাব্য সব ধরনের কৌতূহল নিবারণের দরাজ আয়োজন এ-বইতে। এক কথায় বঙ্গীয় হোমস-অনুরাগীর যখের ধন। বইটিকে শুধুমাত্র নতুন সংস্করণ বললে ভুল হবে, এ এক বৌদ্ধিক সম্প্রসারণ যা অনায়াসে দেশ ও কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হবার দাবী রাখে। এটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

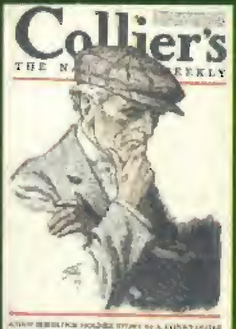

প্রচ্ছদ সৌম্যেন পাল
ফ্রাঙ্ক উইলিস অঙ্কিত শার্লক হোমসের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত

ISBN 978-9381174227
LALMATI 550

লা ল মা টি